প্রবর্ত্তক

সূচীপত্র বৈশাখ—আশ্বিন ১৩৪১

(১ম খণ্ড)

চিত্র-সূচী

— বৈশাখ —

— জ্যৈষ্ঠ —

— আষাঢ় —

শ্রাবণ

— ভাদ্র —

— আশ্বিন —

১৯শ বর্ষ, | বৈশাখ, ১৩৪১ | ১ম সংখ্যা

নব-বর্ষে

'প্রবর্ত্তকে'র নববর্ষে গ্রাহক ও পাঠকবর্গকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করি।

কথা তুচ্ছ; কিন্তু উল্লেখযোগ্য। রেলগাড়ীতে এক তরুণ মাসিক পত্রিকা দেখে' তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে নিয়েই ফেরত দিলেন, মুখ-ভঙ্গী করে' ব'ল্‌লেন—"বাপ্‌ ধর্ম্ম আর ধর্ম্ম, আর ভূরি ভূরি শাস্ত্র—'প্রবর্ত্তক' কেউ পড়ে মশাই!"

পাশেই ছিলেন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি বল্‌লেন—"খুব পড়ে, কিন্তু সে 'প্রবর্ত্তক' আর নেই। এখন অচিন্ত্যের উপন্যাস বেরুচ্ছে।" তরুণ সাগ্রহে আবার হাত বাড়িয়ে বল্‌লেন—"তাই নাকি, দেখি দেখি!"

ঘটনা সত্য। এই আমাদের অবস্থা। এই অবস্থা হিন্দু সমাজের অবস্থা। হিন্দু-জাতি আর কোন বস্তু গভীর ভাবে দেখে না, সে অন্তর্ভেদী অনুভূতির যন্ত্র তাদের বিকল হ'য়ে গেছে। ধারণার উপর চলে, সে ধারণার ব্যতিক্রম যেখানে সেখানেই স্পৃশ্য অস্পৃশ্য করার ব্যবস্থা। জীবনের ধারা নির্দ্ধারণ করা আর সাধ্যে নাই, সমস্ত জাতিটা যেন খেয়ালে চ'ল্‌ছে।

দেশের মনীষী বল্‌তে যাঁরা তাঁরা চরম রায় লিখে' পেছিয়ে দাঁড়িয়েছেন, অর্থাৎ "এ জাতি বাঁচবে না।" এই না বাঁচাটা তাঁদের স্ব-স্ব ধারণানুযায়ী দেশের অবস্থা সন্দর্শন না করে'ই সিদ্ধান্ত-স্বরূপ হয়েছে। যাঁরা সন্ন্যাসী, মহাপুরুষ শ্রেণীর মানুষ, তাঁদের কথা আজ আর বুঝবার উপায় নাই। চিরদিনই শুনা গেছে—পৃথিবীটা মায়া, কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন হ'লেই সব ফরসা; অতএব তাঁদের মুখে জাতি নিশ্চিহ্ন হওয়ার লক্ষণ দুশ্চিন্তার কারণ নহে। একটা জাতির মূল তত্ত্বই যদি হয় মিথ্যা স্বপ্ন, বর্ত্তমান অবস্থাও একটা দুঃস্বপ্ন বলা যেতে পারে। সে সু ও কু ভেদ, তাহাও মায়া-সৃষ্টি; অতএব এখনও দ্বন্দ্ববোধ থাকায় খাঁটী সন্ন্যাস-বস্তুটার প্রতিষ্ঠা হয় নি, এই কথাই বলা যায়।

তারপর, যাঁরা ঠন্‌ঠনিয়ার কালীর সামনে, মাথার শাম্‌লা খুলে, শোলার হ্যাট নামিয়ে সেলাম দিয়ে যান, কালীঘাটে পাঁঠা মানং করেন, রোগের প্রতিকারে তারকেশ্বরে ধর্ণা দেন, সন্ন্যাসীর চরণে মাথা লুটিয়ে ধর্ম্ম-ভিক্ষা করেন, তাঁদের কথা তো উল্লেখযোগ্যই নয়। উদাহরণ দেখিয়ে বিষয় জটিল কর্‌ব না। হিন্দু বাঙ্গালীকে জিজ্ঞাসা করি—তোমরা বল্‌তে পার, এই যে হিন্দুজাতি বলে' এখনও একটা নাম শুনা যায়, হিন্দু বলে' এখনও

বিশ-পঁচিশ কোটী নরনারী আত্মপরিচয় দেয়, তাদের ধর্ম্মটা কি ?

সম্প্রতি বাংলার এক জিলা-টাউনে ধর্ম্ম-সমন্বয় সভার সভাপতি হওয়ার জন্ম আহূত হয়েছিলাম—ইচ্ছা করে'ই সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলুম। দেশের হাওয়া বাহিরে না ঘুর্‌লে তেমন বুঝা যায় না, মনের রঙ পাকা হয় না। খ্রীষ্টান ধর্ম্ম যিনি বল্‌লেন, তাঁর কথা শুনে সত্যই আনন্দ হ'ল—এমন নিছক, অমিশ্র বিশ্বাস বীরজাতির কণ্ঠেই শুনা যায়।

তবুও তাঁকে বাহিরে ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—তিনি কি এই কথাই বল্‌তে চান, যে খ্রীষ্টানজাতি যখন যীশুকে ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে সেতু-স্বরূপ বলে' বিশ্বাস করেন, তখন আর কিছু আশ্রয় করে' ভগবানে পৌঁছান যায় না ? তিনি বল্‌লেন, "হাঁ, ইহা ছাড়া অন্য কথা অনেক উদার ব্যক্তি বল্‌তে পারেন ; কিন্তু খাঁটী খ্রীষ্টান বল্‌বেন না। ইহাতে বিশ্বাস ও নিষ্ঠার ব্যভিচার হয় এবং তাঁরা খ্রীষ্টান নন।"

আবার বল্‌লুম—"জগতে এই যে বিচিত্র ধর্ম্ম, ভিন্ন ভিন্ন অধ্যাত্ম মত ও পথ, তবে তাহার সমন্বয় কি!" তিনি সগর্ব্বে উত্তর দিলেন—"এই অগ্নি-বিশ্বাসে জগৎকে দীক্ষা দেওয়া—এবং তার জন্তই, প্রত্যেক খাঁটী খ্রীষ্টান যীশুর মতই বুকের রক্ত দিতে প্রস্তুত।"

ইস্‌লাম-ধর্ম্মীরও এই কথা। কিন্তু স্বাধীন বীর-জাতির কণ্ঠে এই সত্যোক্তি যেমন স্পষ্ট ও উদাত্ত স্বরে বাহির হ'ল, তাতে সত্যই অন্তর তৃপ্তিতে ভরে' গেল। এই বিশ্বাস ও নিষ্ঠা খ্রীষ্টান জাতির আছে। ধর্ম্মকে তারা নির্জ্জলা দুধের মত রক্ষা কর্‌ছে। ইউরোপের একটা শ্রেণীর মধ্যে, যেন মনে হ'ল, ভারতের ঈশ্বর-বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ জন্ম নিয়েছে।

কথা আরও একটু আছে। পথে আর একজন খ্রীষ্টান পাদ্রীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি বল্‌লেন, "যীশু ঈশ্বরের সন্তান নন, স্বয়ং ঈশ্বর। ঈশ্বর তাঁর প্রেম ও পবিত্রতা নিয়ে মূর্ত্ত বিগ্রহ ধারণ করেছিলেন যীশুতে, যীশুতে আত্মসমর্পণ সিদ্ধ হ'লে, আমরা ভাগবত হব।" কথা শুনে মনের ধাঁধা ঘুচ্‌ল। গীতার 'মামেতি' মন্ত্রের সাধনা যেন ইউরোপে আরম্ভ হ'য়ে গেছে। বক্তাকে বুক-ভরা আলিঙ্গন দিয়ে এই কথাই ভাব্‌ছি—ধর্ম্ম-তত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য সত্য বীরেরই কাছে স্পষ্ট ও জীবন্ত হয়ে ওঠে। হিন্দুজাতি ধর্ম্ম নিয়ে ছেলে-খেলাই কর্‌ছে।

হিন্দুর ধর্ম্ম কি ? মেয়েদের ঝুঁটি ছিঁড়ে, ঢিল বেঁধে' পঞ্চাননতলায় ঝুলিয়ে আসা, না বাড়ীতে ভারী ব্যারাম হ'লে একদিকে ডাক্তার বৈদ্য ডেকে', অন্যদিকে সত্য-নারায়ণ, শুভচণ্ডীর সিন্নি মানা ! অথবা গাঁজার ধূঁয়ায় মূর্ত্তিমান্ মোক্ষকে দেখে' হতভম্ব হওয়া ? অথবা পথে পা বাড়াতে আগুসার মন্ত্র আওড়ে' গঙ্গায় ডুবান খাওয়া এবং দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত আচার-নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে বুক ফুলিয়ে বলা—'হিন্দুধর্ম্মের ধ্বজা আমি ধরে' আছি !'

ধর্ম্ম বল্‌তে যদি বলি, বর্ণাশ্রম নয়, বিগ্রহ নিয়ে টানাটানি নয়, যোগে-যাগে নদী-নালায় ডুব পাড়া নয় ; টিকি রাখা, গলায় মালা, নাকে রগে তিলক কাটা নয়—হিন্দুসমাজ পাষণ্ড বলে' আমায় যে অস্পৃশ্য বোধেই মুখ ফিরাবেন, সে বিষয়ে সংশয় নাই। ধর্ম্ম বল্‌তে এই সকল আচার ও ব্যবহার আমাদের পঙ্গুও করেছে যেমন, আড়ষ্ট জীবন জড় পাথরের মতই তেমনি অহঙ্কারে শক্ত হয়েও উঠেছে ; ভগবান যেন তাই এ জাতিটার আমূল উচ্ছেদ করার বজ্র নিক্ষেপ কর্‌ছেন। ঈশ্বরের নামে হিন্দুজাতির অসাড় জীবন-যাত্রার বিধিনিষেধ বিধাতা যেন আর সহ্য কর্‌তে প্রস্তুত নন।

হিন্দুজাতি একটা অখণ্ড জাতি নয়। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নমঃশূদ্র, মাহিষ্য, রাজবংশী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির সমষ্টি বল্‌লে অত্যুক্তি হয় না। জাতি বল্‌তে তাহার পশ্চাতে এমন এক কৃষ্টি থাকা চাই, যা সকলের ; কিন্তু ব্রাহ্মণের যে আচার ও ধর্ম্ম, তা ব্রাহ্মণেতর জাতির নহে। ইহার উপর অস্পৃশ্য নামে যে বিপুল জনসংখ্যা এখনও নিজেদের হিন্দু বলে' পরিচয় দেয়, তাহাদের ধর্ম্মের ধারণা অথবা ধর্ম্মাচার অন্যান্য হিন্দুর সহিত মিলে না, বলা যেতে পারে। ইহারা অবাধে পরধর্ম্ম আশ্রয় করে' হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস কর্‌ছে।

যখন হিন্দু এমন ধর্ম্ম আশ্রয় করেছে, যা এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীর পৃথক্, তখন বুঝ্‌তে হবে, খ্রীষ্টান ও মুসলমানের মত হিন্দুধর্ম্ম বল্‌লেই এক অখণ্ড ও বিপুল সংহতিকে বুঝাবে না। এমন দিন আস্‌ছে, যেদিন

ব্রাহ্মণকে বল্‌তে হবে—আমরা 'ব্রাহ্মণজাতি, আমাদের সঙ্গে অন্য জাতির সম্বন্ধ নেই। আমরা বাংলাদেশে প্রতি মাইলে আটাশ জন বাস করি। সমগ্র বৃটিশ-ভারতে প্রতি মাইলে আমাদের সংখ্যা ৬৪ জন।' এইরূপ কায়স্থ, মাহিষ্য প্রভৃতি অন্যান্য জাতিও দাবী কর্‌বে, এ'ও কিছু অসম্ভব কথা নয়। ভারতে অস্পৃশ্যজাতি ঐ নাম নিয়েও একটা স্বতন্ত্র জাতি বলে'ই মাথা তুল্‌তে চায়—এ'ও স্বপ্ন বা কল্পনা নয়, জাগ্রত সত্যরূপেই প্রতিভাত।

আমরা বাংলাদেশের কথাই বলি। হিন্দু নামে যে জাতির সংখ্যা ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে সেন্‌সাস্ রিপোর্টে বাহির হয়েছে, তাদের যে সংখ্যা তাতে নির্ণীত হয়েছে, দশ বৎসর পরে যদি হিন্দু বলে সেই সংখ্যা নির্ণীত না হয়, ভিন্ন ভিন্ন জাতি বলে' তাদের অস্তিত্ব জ্ঞাপিত হয়, তাতে আমাদের আশ্চর্য্য হওয়ার কোনও কথা থাকবে না।

ব্রাহ্মণজাতির একটা বিশেষ কৃষ্টি অবশ্যই আছে। সেই কৃষ্টির মধ্যে এখনও হিন্দুজাতি বলে' যারা পরিচয় দিতে চায় তাদের যদি তুলে' নেওয়া না হয়, তবে কতকটা নিজেদের অন্ধতায়, আর কতকটা রাজ্যশাসন-ব্যবস্থার অজুহাতে এ-জাতি নিশ্চিহ্ন হবে, সে বিষয়ে সংশয় করার সত্যই কিছু নেই।

কৃষ্টির বিচার প্রয়োজন নাই। ভারতের কৃষ্টি প্রলয়াবর্ত্তে মলিন হয় নি। ঋতময় বেদমন্ত্রঃএখনও ঝঙ্কার দিচ্ছে। সেই মন্ত্রে সমগ্র হিন্দুজাতিকে দীক্ষা দেওয়ার অধিকার যদি অক্ষুণ্ণ হয়, ভারতে এই বিপুল জাতি তার মহাদান নিয়ে বিশ্বের সম্মুখে বীরবেশেই দাঁড়াতে পারে।

হিন্দুর ঈশ্বর-বিশ্বাস, ঈশ্বরানুভূতি কেবল ধ্যেয় হয়েই থাকে নি; উহা জীবনে পরিণত করার সাধনাও প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। হিন্দুর বৈশিষ্ট্য—সে ধর্ম্ম-জীবনের প্রবর্ত্তক। যেদিন বিশ্বের নিখিল নরনারী ধর্ম্ম-জীবন লাভ কর্‌বে, সেইদিনই ভারতের কৃষ্টি জয়যুক্ত হবে। ভারতের সেই ধর্ম্ম-জীবন-যাপনের সাধনা আজ প্রত্যেক হিন্দুর মধ্যে প্রবর্ত্তিত করার উপরেই নির্ভর করে হিন্দু-জাতির স্থিতি ও অভ্যুত্থান।

এখনও হিন্দু বলে' যারা পরিচয় দেয়, তাদের অন্তরে ধর্ম্ম-লাভের যে আকুল প্রেরণা জেগে উঠে, তা' দেখ্‌লে সত্যই বিস্মিত হ'তে হয়। এখনও যদি উদার মুক্ত ধর্ম্ম-গুরু বর্ণ-সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে হিন্দুর ঘরে ঘরে ধর্ম্ম-জীবনের মন্ত্র দান করেন, প্রসুপ্ত হিন্দু-জাতি আবার মাথা তুলে' উঠে।

ধর্ম্ম আজ আর পুঁথিগত করে' রাখ্‌লে চলে না। মন্দিরে তীর্থে ধর্ম্মের মেলা বসিয়ে লাভ নেই। আচার-নিষ্ঠায় উহা রক্ষা পাবে না। ধর্ম্মকে জাতির জীবনে ছড়িয়ে দিতে হবে। হিন্দুর কণ্ঠে এই অমোঘ প্রত্যয়ের মন্ত্র তুল্‌তে হবে, যে ধর্ম্ম জানার বস্তু নয়, করার বস্তু নয়, ধর্ম্মকে পেতে হবে এবং সে ধর্ম্ম পাওয়ার লক্ষণ, ধর্ম্মের বিগ্রহ-রূপেই প্রত্যেকেই অমৃতের পুত্র হয়ে উঠ্‌বে।

এই পাওয়ার সাধনা—ঈশ্বরের সহিত জীবের যুক্তি। সে যুক্তি সিদ্ধ হবে বুদ্ধি দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, দেহ দিয়ে; তাই সে যুক্তি শুধু মন্ত্র আওড়ে' নয়, ভক্তির অর্ঘ্য বিগ্রহের চরণে অর্পণ করে' নয়, ডালি দিতে হবে নিজের জীবনকে ধর্ম্মের বিগ্রহ-মূর্ত্তি ইষ্টের চরণে। এই সিদ্ধ শক্তি বাংলার পল্লীতে, গ্রামে, নগরে, বাঙ্গালী হিন্দু-জাতির মধ্যে এমন উন্মুখ হয়ে আছে, যে একবার যদি তাদের কাণে ধর্ম্মের সত্য ঋক্ দেওয়া হয়, ধর্ম্ম-জীবনের কৃষ্টির উপর এই বিশাল জাতি এক মুহূর্ত্তে মাথা তুলে' দাঁড়াবে।

আমরা হিন্দু জাতিকে তার কৃষ্টি নিয়ে বাঁচার পথে এগিয়ে দেওয়ার জন্য এক দল নব তান্ত্রিকের অভ্যুত্থান কামনা করি, যারা ধর্ম্মের বুলি না আওড়ে', ধর্ম্মে নূতন জন্ম নিয়ে উহার বিগ্রহ-রূপে জাতির কর্ণে মন্ত্রদান কর্‌বে। আমরা চাইছি, মায়াবাদী নয়, জীবন-বেদের ঋষি, অমৃতের উপাসক, যারা ধর্ম্মামৃত দানে এই পতিত জাতির মোহ দূর কর্‌বে। তাই বলি—হে তরুণ, ওঠ, জাগ্রত হও, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় ভারতের অমর কৃষ্টি আপনার সবখানি দিয়ে বরণ করে' নাও, দেবী ভারতীর জয়-টীকা ললাটে এঁকে কেশরী-গর্জ্জন তোল। বল—এ অমর জাতির মৃত্যু নাই। আপনার অমৃত-বীর্য্য দিয়ে, জাতির জীবন আমূল নূতন করে' গড়ে' তোল। ভারতের শ্মশান-স্তূপে হিন্দুত্বের কীর্ত্তি-মন্দির আবার গড়ে' উঠুক।

যদি প্রদীপ জ্বলে, তার আলো পাওয়া যায়। কি দেখ্‌ছ চারিদিক্ চেয়ে? সব নির্ব্বাপিত। কোথাও আর আলো নাই। অন্ধকার ঘনিয়ে আস্‌ছে চতুর্দ্দিক্ থেকে! খুব দুর্দ্দিন জগতের। এমন দিনেই নারায়ণ জাগেন; এমন দুঃসময়েই ভগবান মূর্ত্ত হন মানুষের তনু নিয়ে।

কিন্তু কেন তুমি আপনার মাঝে ঐ অভ্যুত্থান লক্ষ্য কর্‌বে না? কেন এই আকাঙ্খা তোমার মাঝে প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় জ্বলে' উঠ্‌বে না? কেন অকিঞ্চনের ন্যায়, বাহিরের দিকে হতাশ দৃষ্টিতে চেয়ে থাক্‌বে?

সর্ব্ব বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি হয়েছে বহির্ম্মুখী। সত্য, দান, তপস্যা, শক্তি, ভক্তি, আনন্দ, কোন বস্তুই আর আত্ম-বস্তু নয়। সংযম, ব্রহ্মচর্য্য, সদাচার, সব বাণী মাত্র। শাস্ত্রাদির অনুশীলনে একটু দ্যোতনা দেয়, দেহ একটু উত্তপ্ত হয়ে উঠে। সব টেনে' আনি বাহির থেকে। ব্রহ্ম, ভগবান, পুরুষোত্তম, এই সবই নিজের কথা নয়, অন্তরের অনুভূতি নয়; অপরোক্ষ কিছুই নয়, সবই পরোক্ষ অনুভূতি। এ জাতি বাঁচ্‌বে কেন?

আমি ভারতের শাস্ত্রগ্রন্থ, জগতের ধর্ম্মগ্রন্থ নির্ঘণ্ট করে' কেবল সেই সত্যই স্বীকার করি, যা' আমার নিজের অনুভূতির অনুকূল। আমি ব্রহ্ম, মোক্ষ, সত্য, সবই ডুবিয়ে দিই আপনার অস্তিত্বের মাঝে; আমার নিজের মধ্যে যাহা জাগে, তার উপর কোন শাস্ত্রের, কোন মহাপুরুষের, কোন ঘটনার প্রভাব পড়্‌তে দিই না। সত্য আমি, আমার অনুভূতি।

বাহির থেকে যাহা উত্তাপ দেয়, আশা দেয়, তাহাই পাপ, আপনার সত্যকে তাহা ম্লান করে। কোথাও থেকে ধার-করা, আম্‌দানী-করা বস্তু যেন গৃহীত না হয়—হউক সে প্রমাণিক শাস্ত্র বা হউক তিনি স্বয়ং পুরুষোত্তম। আমার মধ্যে যে অনাহত বেদধ্বনি উঠ্‌ছে, যে নারায়ণ জাগ্‌ছেন, সেই খানেই রাখি আমার লক্ষ্য। এই আত্ম-জ্ঞানীই মুক্তির অধিকারী। তোমরা আপনাকে জাগাও।

জীবন যখন ভগবানের জন্য ঠিক হয়ে যায়, তখন অব্যর্থ লক্ষ্যে জীবনের যাত্রা সুরু হয়। ভগবানই তখন মূর্ত্ত হয়ে ওঠেন, তাঁর শক্তির প্রবাহই তখন বয়ে যায় এইরূপ নির্দ্দিষ্ট জীবনের ভিতর দিয়ে।

মানুষ আর কিছু নয়, এই অমৃত-ধারার প্রণালী। যখন জীবন রুদ্ধ, দ্বন্দ্বময় মনে হয়, তখনই বুঝ্‌তে হবে অহং ও কামনার দ্বারা প্রণালী বদ্ধ আছে। তুমি তপস্যার আগুন জেলে, অহং ও কামনা দগ্ধ কর, রুদ্ধ প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হবে [illegible] বসন্তের আবির্ভাব হবে।

জীবের ইহাই সাধনা। নতুবা এই রক্ত মাংসের অনিত্য আয়ুঃটুকুর আর কি মহিমা থাকৃতে পারে! ফুল ফোটে, দেবতার চরণে লুটিয়ে সে ঝরে' যায়—ফোটার এইটুকুই আনন্দ। ঈশ্বরের পূজায় জীবন উৎসর্গ করাই জীবনের উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য যেখানে সিদ্ধ হবে না, সেইখানেই কলুষের পূতিগন্ধে, বায়ুমণ্ডল বিষাক্ত হয়।

কলি-যুগে কত তপস্যা, কত প্রচেষ্টা, কি অসাধারণ শক্তির দ্বারা ইহা রক্ষা করার প্রয়োজন হয়। জীবনের এই বিশিষ্ট ধারা যাহা স্বভাব, তাহা যেন ভারবহ হয়েই উঠে। প্রাতে উঠে ঈশ্বরের কাছে বিধিপূর্ব্বক সবখানি নতি জানা'বার রীতি অসামান্য রূপে প্রতিভাত হয়। কত জড়তা, কত অবসাদ আমাদের বিমূঢ় করে' রাখে। উদ্বুদ্ধ হও বন্ধু, ভগবানের মানুষ হও—স্বতঃই তোমার ভিতর দিয়ে তাঁরই আনন্দ ও প্রেমের মন্দাকিনী উৎসরিত হবে—তুমি ধন্য হবে।

বাঁচার স্বপ্ন দেখ। ভগবানের মানুষ হয়ে বাঁচ। আসুরিক জীবন আমরা চাই না। চাই ভাগবৎ জীবন। লক্ষ্য হোক জীবন—যে জীবন ভগবানে তুলে' দিয়ে অমৃতময় হবে।

মাঝ পথে এসে নিরাশ হয়ো না। সংশয়কে প্রশ্রয় দিও না! যে জীবন-যাত্রা তোমরা সুরু করেছ, তাহা অসাধারণ। যে জীবন-যাত্রা তোমাদের আশে পাশে, সেখানে আছে কেবল হাহাকার। মানুষ চলেছে মৃত্যুর বোঝা মাথায় নিয়ে। সে জীবন যখন চাও না, তখন ইহার বিপরীত পথে যে আমাদের চল্‌তে হবে, ইহা অবধারিত।

এখানে আস্বাদ অমৃতের; কিন্তু তাহা সহজে অনুভূত হবে না। কেন না, আস্বাদ-গ্রহণের যন্ত্রগুলি সবই হয়ে আছে বিকৃত, ব্যাধিগ্রস্ত। ভগবানের পথে চল্‌তে চল্‌তে—সে যন্ত্রগুলির হবে সম্পূর্ণ রূপান্তর। যতদিন না তা' হয়, মনে হবে, জীবন মরুভূমি। এই অবস্থায় নিরাশ হয়ো না। আরও এগিয়ে চল। জন্মান্তরের মধ্যে আছে নিষ্ঠুর গর্ভ-যন্ত্রণা। অসাধারণ ধৈর্য্য সহকারে যে যাত্রা সুরু করেছ, সে পথে আরও এগিয়ে পড়। স্বভাবতঃই সকল ইন্দ্রিয়-গ্রাম, মন, প্রাণ, জীবনের সকল বৃত্তিই নূতন হয়ে, তোমায় আনন্দের বিগ্রহ করে' তুল্‌বে।

ভারতের অধ্যাত্ম-তপস্যা আজও স্বপ্ন হয়ে আছে। কি দুর্জ্জয় সাহস বুকে নিয়ে সঙ্ঘ অভিযান করেছে, সেই স্বপ্ন সিদ্ধ কর্‌তে! দুঃখকে অতিক্রম কর। আছে যে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, তাতেই তোমাদের অভিষিক্ত হ'য়ে ভারতের ধর্ম্মকে বিগ্রহান্বিত কর্‌তে হবে। হে বন্ধু, কোন মতে নিরাশ হয়ে মুখ ফিরিও না, উৎসাহের সহিত এগিয়ে চল।

সমস্যা ধর্ম্মের। সনাতন ধর্ম্মের কঠোরতা সাধারণ মানুষের হাড়ে সইছে না। অন্যান্য ধর্ম্মে এমন কঠোরতা নেই; ধর্ম্ম কর্‌ছি বলার অধিকার তাদের আছে অথচ ধর্ম্মানুষ্ঠানের যে তপস্যা তা' নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে, হিন্দু সর্ব্বসাধারণকে এই কঠোর তপস্যার জন্য আহ্বান কর্‌ছে না, অধিকারী দেখে'ই তাদের সনাতন ভারত ডাকছে—"এস, হে অমৃতের পুত্রগণ, তোমরা আমার মন্দিরে এসে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-সাধনার সঙ্কেত গ্রহণ কর।"

ঋষি-কুলের মধ্যে এই ধর্ম্ম-গ্রহণের প্রেরণা জেগেছিল, তাঁরা কঠোর তপস্যায় সিদ্ধ হয়েছিলেন। ভারতের রাষ্ট্র, সমাজ তাঁদের অঙ্গুলী-হেলনে চলেছিল। তারপর এল ব্রাহ্মণ্য-যুগ—ঋষি সঙ্ঘের পরিধি বিস্তৃত হ'ল ব্রাহ্মণ-জাতিরূপে; কিন্তু এই জাতির পরিধি আর বিস্তৃত হ'ল না ব্যাপকভাবে—মানুষকে অধিকারী করে' তোলার যে শিক্ষা ও সাধনা তা' আর বিস্তৃত হ'য়ে উঠ্‌ল না। যে শক্তির বৃদ্ধি বন্ধ হয়, সে শক্তি মৃত্যুমুখে—বিকাশমান শক্তিই জাগ্রত ও জীবন্ত, ইহাতে সন্দেহ নেই। আজ সর্ব্বাগ্রে জেগে উঠ্‌তে হবে হিন্দুর মধ্যে একদল ঋষিকে, একদল ব্রাহ্মণকে। অধিকারী নির্ণীত হবে তারাই, যারা ঈশ্বর-স্মরণ-রূপ ব্রতকে ধারণ কর্‌তে পার্‌বে, যাঁরা আচার বরণ করে' নিয়ে চরিত্রকে দিব্য করে' তুল্‌বে। এমনি করে' নূতন করে'ই ভারতের সনাতন ধর্ম্মের ভিত্তি রচনা কর্‌তে হবে।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের রীতি-নীতির পার্থক্য ও তাহার কারণ

রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর, ডি-লিট্

পূর্ব্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গে আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, এমন কি ভাষারও কতকগুলি পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্য দেখিয়া এই অনুমান হয়, যে এই দুই প্রদেশ ভিন্ন রাজনৈতিক ভিন্ন শাসন-তন্ত্র ও সামাজিক আদর্শ দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, চন্দ্রপ্রতাপ বলিয়া পূর্ব্ববঙ্গে যে পরগণা আছে তাহা এবং মৈমনসিংহ, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা, এ সমস্তই সেন রাজাদের শাসন-বহির্ভূত ছিল। সেনেরা শেষ সময়ে ঢাকা ও মৈমনসিংহ জেলার অনেকাংশ অধিকার করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মতানুসারে ঐ স্থানগুলির আদর্শ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের অপরাপর প্রদেশ—বিশেষ পূর্ব্ব মৈমনসিংহ—সেনরাজাদের প্রভাব স্বীকার করে নাই।

গুপ্তদের সময়ে বঙ্গদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। সমুদ্রগুপ্তের সময়ে বঙ্গবাসীদের তাঁহার সঙ্গে একটা সংঘর্ষের কথা আমরা শিলালিপিতে প্রাপ্ত হই। গুপ্তেরা ছিলেন ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় সম্রাট্। তৎপর পালদের সময়েও পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ স্থান তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করে। শেষোক্ত কারণ বশতঃ পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ স্থান বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিল। শেষের দিকে শৈবধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম মিশিয়া গিয়া যে ধর্ম্মমত অবলম্বিত হয়, তাহা নাথ-ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্ব বঙ্গেই যে নাথ-ধর্ম্মের প্রধান আড্ডা ছিল, তাহার অনেক ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরার সংযোগস্থলে রাজা শালিবাহন, হাড়িসিদ্ধা, গোরক্ষনাথ, চৌরাঙ্গী, মৈয়নামতী প্রভৃতি নাথনেতৃবর্গের গৃহাদির ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। এই নাথ-ধর্ম্মে শিবের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়; কিন্তু বৌদ্ধভাব তখনও সমাজে পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত ছিল। শিবগৌরী পূজা প্রচলিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু বৌদ্ধদিগের কর্ম্মবাদ সমাজ পরিত্যাগ করে নাই। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সঙ্গে এই নাথধর্ম্মের একটা জায়গায় ঘোর পার্থক্য। সেন-রাজাদের প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম যে-সকল স্থানে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছিল; অষ্টম-বয়স্কা বালিকাদিগের বিবাহ প্রচলিত হইয়াছিল। এবং কর্ম্মবাদ, এমন কি জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই অস্বীকৃত হইয়া কেবল মাত্র ভক্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল। এই ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম-প্রভাবান্বিত প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে দৃষ্ট হয়, যে মানুষ বিপদে পড়িয়া একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহারা কর্ম্মের আশ্রয় বা স্বাবলম্বন একেবারেই বৃথা মনে করিত। অসুরের মত বলশালী কালকেতু ব্যাধ বিপন্ন হইয়া রন্ধনশালায় লুক্কায়িত থাকিয়া চণ্ডীর 'চৌত্রিশাবৃত্তি' করিতে লাগিল। শ্রীমন্ত ও সুন্দর মশানে বসিয়া কালীর স্তব পাঠ করিতে লাগিল। এই নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের মূলসূত্র ভক্তি; জ্ঞান ও কর্ম্ম নিষ্ফল, একমাত্র ভক্তিই অবলম্বনীয়। ভক্তি-শাস্ত্রে লিখিত আছে, একবার হরিনাম লইলে যত পাপ দূর হয়—মানুষ এক জন্মে তত পাপ করিতে পারে না। যেখানে যেখানে লোকেরা বিপদে পড়িয়াছে, সেইখানে সেইখানেই তাহারা অপগণ্ড শিশুর মত 'মা' 'মা' বলিয়া চণ্ডীর অথবা অপর কোন দেবতার নাম করিয়া কাঁদিয়াছে; কোথাও পুরুষকার দেখায় নাই। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যে ৫৪টি পল্লীগীতিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সঙ্গে এই বৌদ্ধ-মিশ্রিত শৈব-ধর্ম্মের পার্থক্য অতি সুস্পষ্টরূপেই ধরা পড়িবে। পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকার নায়ক-নায়িকাগণ শত শত বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে, কিন্তু কখনই স্বাবলম্বন হারায় নাই, স্ব-শক্তির উপর নির্ভর করিয়া শেষ পর্য্যন্ত লড়াই করিয়াছে। একবারও হরি কি চণ্ডীকে স্মরণ করে নাই। এই গীতিকার নায়িকারা সকলেই প্রাপ্তবয়স্কা হইয়া স্বামী মনোনয়ন করিয়াছে, এই মনোনয়নে অভিভাবকেরা বাধা দিলে গৃহত্যাগ করিয়াছে; কিন্তু প্রেমপাত্রের নিকট অবিশ্বাসী হয় নাই। গীতিকাতে সমুদ্রে অবাধ বাণিজ্যের কথা যেখানে সেখানে পাওয়া যায়। পূর্ব্ব বঙ্গের কবি বংশীদাস জাহাজ-নির্ম্মাণের যে পুঙ্খানুপুঙ্খ

বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে দৃষ্ট হইবে, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতেও পূর্ব্ববঙ্গের বণিকগণ উদ্যমের সহিত সমুদ্রে যাতায়াত করিতেন এবং তখনও সমুদ্রপোত নির্ম্মাণের শিল্প এ দেশে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। গীতিকার এক বণিক-নায়ক বলিতেছেন—"সমুদ্রই আমাদের বাড়ীঘর, সমুদ্রই আমাদের ধনাগমের পথ।" আর এক নায়িকা বলিতেছেন, "আমাদের দেশে বিবাহোৎসব সমুদ্রের উপর জাহাজে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।" বহু সমুদ্রপোতের সম্মেলনে সেইরূপ এক বিবাহ-উৎসব কিরূপ জাঁক-জমকের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা কবি গীতিকায় কবিত্বের ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল গীতিকায় ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যেখানে কোন উৎসব সেখানে ব্রাহ্মণ-ভোজনের কথা একেবারেই নাই। দরিদ্রদিগকে দান এবং ভোজ্য-বিতরণের কথা সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। এক কথায়, যে ব্রাহ্মণ্য-সমাজের সঙ্গে আমরা পরিচিত তাহা হইতে বহুগুণে স্ফূর্ত্তিশালী, উদ্যমশীল এবং স্বাবলম্বনবিশিষ্ট, কতকটা স্বাধীন, গৌরবদৃপ্ত একটা সমাজের চিত্র এই সব গীতিকায় আমাদের চক্ষে পড়ে। নায়ক নায়িকার মধ্যে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ প্রায়ই নাই, নিম্নশ্রেণীর লোক এবং বণিকেরাই প্রায় এই সব গীতিকায় নায়ক-নায়িকা।

সেন রাজাদের পূর্ব্বে এই দেশের ও সমাজের যে চিত্র ছিল, এই গীতিকাগুলি তাহাই উদ্ঘাটিত করিতেছে। বিশেষ গুপ্তদের সময়েকার দুষ্মন্ত, শকুন্তলা, পুরুরবা, উর্ব্বশী প্রভৃতি কাব্যের নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে এই গীতোক্ত নায়ক-নায়িকারা এক পঙ্‌ক্তিতে স্থান পাইবার যোগ্য। তখনও পূর্ব্ববঙ্গে স্বয়ম্বর প্রথা রহিত হয় নাই। একজন নায়িকা বলিতেছেন, ডাবের জল মিষ্ট, আম্র ফল মিষ্ট, এবং আরও অনেক মিষ্ট জিনিষ পৃথিবীতে পাওয়া যায়; কিন্তু যে নারী তার অভিলষিত ব্যক্তিকে স্বামী-স্বরূপ পাইয়াছে —তাহার জীবনের মিষ্টত্বের সঙ্গে অন্য কোন জিনিষের মিষ্টত্বের তুলনা হইতে পারে না। গীতি-কবিতায় স্বয়ম্বর শব্দটী পাওয়া যায় না, কিন্তু তৎস্থলে যে শব্দটী পাওয়া যায় তাহা খাঁটি বাঙ্গালী শব্দ "ইচ্ছাবর"।

ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবের পর হিন্দু-অলঙ্কার শাস্ত্রের বিধি, কাব্যের নায়ক হইতে হইলে তিনি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় হইবেন, রাজকুল সম্ভূত হইবেন, তিনি বেদবেদান্ত-পুরাণ-শাস্ত্রবিদ্ হইবেন এবং নায়িকাও তদনুরূপ ও তৎযোগ্যা হইবেন। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকায় সম্পূর্ণরূপ গণতন্ত্র। তাহাতে নিম্নশ্রেণীর লোকেরই নায়ক-নায়িকা, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। প্রাচীন চণ্ডী-কাব্যের দুইটি নায়ক, এক কালকেতু ব্যাধ, আর একটি শ্রীমন্ত সদাগার। অবশ্য দ্বিতীয় অংশে ধনপতি সদাগরকেও নায়ক বলা যায়। চণ্ডীপূজা এদেশে বহু প্রাচীন এবং শত শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে এদেশে চণ্ডী-মন্দিরের আঙ্গিনায় চণ্ডী-কাব্য গীত হইয়া আসিতেছে। যখন চণ্ডী-গীত বঙ্গদেশে প্রথম আরব্ধ হয়, তাহা সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে হইবে—তখনও ব্রাহ্মণ্য প্রভাব এদেশে বদ্ধমূল হয় নাই; সুতরাং সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র লইয়া কবিরা তখন নাড়াচাড়া করেন নাই। কিন্তু ভারতচন্দ্র যখন চণ্ডী কাব্য (অন্নদামঙ্গল) লিখিলেন, তখন সমস্ত সমাজ ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবান্বিত। তিনি কালকেতু, ব্যাধ, ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগর প্রভৃতি নিম্নোকুলোদ্ভূতদিগকে বাদ দিলেন এবং অলঙ্কার শাস্ত্রের বিধি মানিয়া যে নায়ককে সৃষ্টি করিলেন, তিনি কাঞ্চী দেশের অধিপতি গুণবন্ধু রাজার পুত্র যুবরাজ সুন্দর এবং নায়িকা হইলেন বর্দ্ধমানের অধিপতি বীরসিংহের কন্যা বিদ্যা। নায়ক নায়িকা উভয়েই সর্ব্ববিদ্যায় কৃতী। এই সময়ে ব্রহ্মণ্যপ্রভাবে বিদ্যার গৌরব খুব বাড়িয়া গিয়াছিল, স্ত্রীলোকেরাও পাণ্ডিত্যের দ্বারা পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেন।

পূর্ব্ব মৈমনসিংহ প্রভৃতি স্থানের ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, সেন-রাজারা বহু চেষ্টা করিয়াও ঐ সকল দেশ অধিকার করিতে পারেন নাই। এমন কি বল্লাল সেনের কতকগুলি শত্রু পূর্ব্ব মৈমনসিংহের জঙ্গলে যাইয়া আবাস স্থাপন পূর্ব্বক রাজার আশঙ্কার কারণ উৎপাদন করিয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বৈশ্য গারোর হস্ত হইতে এক বিদেশী সেনাপতি আসিয়া শুশুং দুর্গাপুর দখল করেন। আঠার কাহনিয়াতে রাজা দীলিপ সিংহকে পরাস্ত করিয়া মুসলমানেরা তদ্দেশ অধিকার করে। জঙ্গলবাড়ীর রাজা রাম ও লক্ষণ হাজরা ইশা খাঁর হস্তে পরাজিত

হইয়া রাজধানী ত্যাগ করেন। এই ভাবে বোকাই নগর, শাকরাইল প্রভৃতি স্থানের অধিপতিগণও পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে মুসলমানদের হস্তে বিধ্বস্ত হন। সুতরাং সেই সকল রাজ-বংশীয় লোকেরা সেন-রাজাদের কোন প্রভাবেই ধরা দেয় নাই। স্বাধীন লোকদের নিকট হইতে মুসলমানেরা তাদের রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন, সেই জন্য সেই দেশে ব্রাহ্মণ্য-কৌলীন্য প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। সে দেশে ব্রাহ্মণদের মধ্যে 'মুখোপাধ্যায়', 'চট্টোপাধ্যায়', 'বন্দোপাধ্যায়' প্রভৃতি নাই। 'চক্রবর্ত্তী'ই সেই দেশের প্রধান ব্রাহ্মণ। বৈদ্য ও কায়স্থের মধ্যে দত্তরাই প্রধান। ঘোষ, বসু, মিত্র সেখানে ততটা আদৃত ছিলেন না।

এদিকে কাপাশীয়া, ভাওয়াল ও সাভার অঞ্চল দুর্দ্দান্ত কিরাতদিগের হস্তে ছিল। তাহারাও বৌদ্ধ ভাবাপন্ন হইয়া আর্য্য সমাজের অন্তর্গত হইয়াছিল। এই কিরাতেরা বর্ত্তমানকালে হাজাং, গারো, রাজবংশী, চাকমা প্রভৃতি নামে পরিচিত। ভাওয়ালে এক সময়ে পাল রাজাদের কোন এক শাখা দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপে রাজত্ব করিতেন ইহাদেরই একজন—শিশুপালের দুর্গ ও রাজপ্রসাদের ভগ্ন-চিহ্ন এখনও ভাওয়ালের জঙ্গলে লোকেরা দেখাইয়া থাকে।

সম্ভবতঃ বল্লাল সেনের সময় তাহার আত্মীয় ভীম-সেনের পুত্রদের মধ্যে ধর্ম্মকলহ উপস্থিত হয়। ভীম সেনের পুত্র ধীমন্ত সেন বৌদ্ধ মতাবলম্বী ভ্রাতৃ-বিরোধ বশতঃ সসৈন্যে সাভারে উপস্থিত হন এবং কিরাতদের জয় করিয়া সেখানে রাজ্যস্থাপন করেন। তাঁহার পুত্রের নাম রণধীর এবং রণধীরের পুত্রের নাম হরিশ্চন্দ্র এবং তাঁহার পুত্র মহেন্দ্র। সাভারে বৌদ্ধরাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজপ্রসাদের ভগ্নাবশেষ এখনও আছে এবং মহেন্দ্রের মঠ ধলেশ্বরীর তীরে সেদিন পর্য্যন্ত বিরাজিত ছিল। এই সকল স্থান অতি প্রাচীন। খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমী ভারতবর্ষের মানচিত্রের যে খসড়া প্রস্তুত করেন তাহাতে সাভার বেনীয়া-জুড়ী ও দাসড়ার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ভাওয়ালের সন্নিহিত কাপাশিরা হইতে বহু প্রাচীন যুগে ঢাকা মসলিনের উদ্ভব হইয়াছিল।

পূর্ব্ব বঙ্গ এক বছর আগে সেদিন পর্য্যন্তও "বাজদেশ" বলিয়া সমাজে নিগৃহীত ছিল। বঙ্গীয় কুলশাস্ত্রে এই "বাজ" অর্থ বর্জ্জিত। বৌদ্ধাধিকৃত স্থানগুলি হিন্দুরা বর্জ্জন করিয়াছিলেন। লৌকিক প্রবাদ যে পাণ্ডবেরা অজ্ঞাত বনবাস কালে এই সকল স্থান দর্শন করেন নাই। পূর্ব্ব বঙ্গে নিম্নশ্রেণীর লোকের মুখে গল্প শুনিয়াছি যে মেঘনার তীরবর্ত্তী হইয়া ভীম যুধিষ্ঠিরকে "শ্যালক" সম্বোধন করিয়াছিলেন। অপরাপর ভ্রাতারা বুঝিলেন, সে দেশের প্রভাব বড় খারাপ, তাহাতে ভীম বিকৃত-মস্তিষ্ক হইয়া গিয়াছেন, তখন সেই দেশ পরিত্যাগ করিলেন। হিন্দুরা বৌদ্ধরাজন্যবর্গের হস্ত হইতে পূর্ব্ব বঙ্গ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া এইরূপ নানারূপ নিন্দাবাদ প্রচারিত করিয়ছেন। এই ভাবে তাঁহারা পদ্মা-নদীর জাতি মারিয়াছেন কিন্তু কৃত্তিবাসের সময়ে ঐ নদীর নাম ছিল, "বড়গঙ্গা"। এই সকল সত্ত্বেও পূর্ব্ব বঙ্গের সভ্যতা ও ধর্ম্ম কত উচ্চ ছিল, তাহা গীতিকাগুলি পাঠ করিলে জানা যায়।

পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় যে বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়—তাহা শুধু উচ্চারণ গত নহে, এই দুই ভাষায় কথা বলিবার ভঙ্গী ও স্বতন্ত্র। পূর্ব্ব বঙ্গে 'ড়' একরকম নাই, সুতরাং কাপড় পরা ও পুস্তক পড়া, উভয় কথারই 'র' ব্যবহৃত হয়। পশ্চিম বঙ্গে কলিঙ্গের প্রাধান্য খুব বেশী। সুতরাং সেখানে 'ড়' অক্ষরের বাহুল্য; পূর্ব্ববঙ্গে 'ড়'এর ব্যবহার একরূপ নাই বলিলেই হয়, পশ্চিম বঙ্গের কথায় চন্দ্রবিন্দুর বাহুল্য সকলেই লক্ষ করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গে 'লিখিয়া' স্থলে 'লেখিয়া' 'লেখাটার' স্থলে 'লিখাটা' এবং 'লিখিয়াছ' স্থলে 'লেখিয়াছে'-ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্ববঙ্গে 'দাও' 'শেষকর' 'ধর' 'খাও' ইত্যাদি ব্যবহার আছে, পশ্চিম বঙ্গে সেই স্থলে 'খেয়ে ফেল' 'দিয়ে ফেল' 'শেষ করে ফেল' ইত্যাদি। যেখানে পশ্চিম বঙ্গের লোকেরা বলিবেন 'হাসিয়া ফেলিল' সেখানে পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরা বলিবেন 'হাসিয়া দিল'। পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার সঙ্গে সিংহলি ভাষার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। যে সব স্থান বৌদ্ধাধিকৃত সেই সব স্থানের ভাষা ও রীতি নীতির সঙ্গে পূর্ব্ব বঙ্গের ঘনিষ্ঠ ঐক্য দৃষ্ট হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় পদ্মার পারে বত্রাদাকৃতি একরূপ জালা দৃষ্ট হয় তাহার সঙ্গে

অতি নিকটবর্ত্তী ভগীরথী তীরস্থ স্থানে তৈরী জালার কোন সাদৃশ্য নাই অথচ সারনাথ এবং গয়ার প্রাচীন কালের শিল্প সংগ্রহের মধ্যে ঠিক পূর্ব্ব বঙ্গের জালার মত জালা আমি দেখিয়াছি। পূর্ব্ব বঙ্গের মেয়েদের সাড়ী পরিবার রীতি কতকটা পশ্চিমা ধরণের। এই দুইটি দেশ এত সন্নিকট থাকিয়াও যে আচার-রীতি প্রভৃতিতে এত পার্থক্য প্রদর্শন করে তাহার ঐতিহাসিক কারণ আমাদের ভাল করিয়া অনুসন্ধান করার প্রয়োজন।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, ঢাকা বিক্রমপুরই সেন রাজাদের প্রধান রাজধানী ছিল এবং তথা হইতেই নব ব্রাহ্মণ্য বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং পূর্ব্ব বঙ্গের অধিকাংশ স্থান বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিল, এ কথা কি করিয়া সমর্থন করা যায়? আমাদের উত্তর—সেন-রাজারা কুলীন ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ও প্রভাব বিস্তারের সহায়তা করিয়াছেন কিন্তু সেই প্রভাব বল্লালসেনের বহু পরে দেশে বদ্ধমূল হইয়াছিল। বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের সময়েও এই কৌলীন্য-বিরোধী দলবদ্ধ বহু সম্প্রদায় ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে রঘুনন্দন যে অষ্টবিংশতি তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন তাহা সমাজে গৃহীত হইতেও দুই এক শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছিল। গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের নেতাগণ দুই চার শতাব্দী যাবৎ বর্ত্তমান সমাজকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিল। বস্তুতঃ রামপাল রাজার নাম ও কীর্ত্তি বিক্রমপুরে এখনও বিদ্যমান। ঐ স্থানের নিকটেই শ্রীচন্দ্রদেব প্রমুখ চন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধ-রাজারা বহুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। ত্রিপুরার নিকট খড়্গবংশীয় রাজারা বহু বৌদ্ধবিহার নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কর্ম্মান্তনগরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব বঙ্গের নিম্ন-সমাজে যে বৌদ্ধধর্ম্ম অতি প্রবলভাবে বিস্তারিত ছিল তাহার অন্যতম প্রমাণ এই যে, বর্ত্তমান কালে পূর্ব্ব বঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যার তুলনায় তথায় হিন্দুর জনসংখ্যা অতি নগণ্য। বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির পরে এই বৌদ্ধ জনসঙ্ঘ যে কিরূপ অত্যাচারের ফলে ইসলাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা শূন্য পুরাণে "নিরঞ্জনের রুষ্মা" নামক অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে। এই সম্বন্ধে আমার নিকট আরও প্রাচীন দলিল ও প্রমাণ রহিয়াছে।

কে গো তুমি এলে, প্রিয়তম !

শ্রীমাধব ভট্টাচার্য্য

প্রাণের-দেউলে মোর আজি কা'র আগমনী শুভশঙ্খে উঠিল ধ্বনিয়া
প্রভাতের মধুলগ্নে? সুললিত কার কণ্ঠ মৃদুকম্প রহিয়া রহিয়া
আকাশে বাতাসে গাহে মঙ্গলের সূচনা-সঙ্গীত? বিষাদের নিঃস্তব্ধতা
চরণ-শিঞ্জিনী তালে কে করিল বাক্যভরা, উল্লাসিয়া আনে মুখরতা?
নির্ব্বাপিত দেহ-দীপে আজিকার উষালোকে কে জ্বালিলো গন্ধ-দীপশিখা?
কালিমা-অঙ্কিত মোর ভাল 'পরে আজি কেবা লেপি দিলো চন্দনের টীকা?
বিশুষ্ক-হিয়ার ডালে আনন্দের ফুল্ল-ফুল প্রস্ফুটিত বহিয়া সুবাস,
তা'রি মোহে মেতে ওঠে চিত্তের মধুপ মোর; সর্ব্ব অঙ্গে পুলক-উল্লাস।
ব্যথা-ক্লান্তি নাহি আর, ক্ষুধাতৃষ্ণা দূরীভূত আনন্দের মাধুরী-মায়ায়,—
দুঃখ-জ্বালা নির্ব্বাপিত; কোমল পেলব স্পর্শ রাখে মোরে শান্তির ছায়ায়।
হৃদয়-মরুভূ বক্ষে সুধার-ঝরণা বহে; আলিম্পন দেহ-দেহলীতে
সুন্দরের অঙ্গরাগে মুগ্ধ আমি ছুটে যাই; স্পর্শ তাঁর দেহে প্রলেপিতে।
আঁধার অদৃষ্টশিখা আলোকিয়া ধীরে ধীরে আলোদীপ্ত অরুণের সম,
প্রাণের-মন্দির মোর সুবাসিয়া দেহধূপে কে গো তুমি এলে প্রিয়তম!

কৃত্রিম রেশম

শ্রীপতিতপাবন পাল এম, এস-সি, টেক (ম্যানচেষ্টার)

শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে দুনিয়ার প্রগতির তুলনায় ভারত যে কত পেছনে পড়ে আছে, তা হিসাব করে' দেখাবার বোধহয় প্রয়োজন হবে না। বাংলার তো কথাই নাই! বিশ্বে বিশেষ করে বাঙ্গালীই একমাত্র কাপড় পরিধান

শ্রীপতিতপাবন পাল

করে কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙ্গালী তা নিজে তৈরী করতে পারে না, করবার মত সে উদ্যমও দেখা যায় না। বিদেশীর কথা ছেড়ে দিলেও এক ভারতেই কিছু কম সাড়ে তিনশো কাপড়ের কল আছে, তন্মধ্যে বাংলায় মাত্র উনিশটী, তাও বাঙ্গালীর নিজস্ব মাত্র পাঁচটী। আমি যে শিল্পটীর পরিচয় এখানে দিচ্ছি তা ভারতবাসীর এখনও স্বপ্নের মধ্যেই এসেছে কিনা সন্দেহ, অথচ সাগরপারে পশ্চিম দেশে এর কি বিপুল কারবার চলছে, কত বড় বিরাট কারখানা—কত লোক জীবিকার্জ্জন করছে। কৃত্রিম রেশম আজ আমাদের নিত্য নৈমিত্তিকারের ব্যবহার্য্যের মধ্যে দাঁড়িয়েছে।

এই কৃত্রিম রেশম (artificial silk) বর্ত্তমান শতাব্দীর এক অভিনব বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন। কৃত্রিম সিল্ক কথাটা কিন্তু ভারী গোলমেলে। অনেকেরই ধারণা ইহা রেশম জাতীয়ই একটা কিছু হবে। আসলে কিন্তু তা একেবারেই নয়। আসল যে সিল্ক তা হচ্ছে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন উপাদান সমন্বিত একপ্রকার রাসায়ানিক চীজ কিন্তু কৃত্রিম সিল্ক সম্পূর্ণ সেলুলজ বা সেলুলজ জাত বস্তু। পাট-তুলা জাতীয় কোন দ্রব্যের উপর কারীকুরী করে' কৃত্রিম রেশমের রং চেয়ারা ফলান হয় না বলে' পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে, সাবান দিয়ে কাচতে বা ইস্ত্রি করতে এর উজ্জ্বলতার বা আঁশের কোন বিঘ্ন ঘটে না। আসল ও নকলের মাঝে যাতে কোন গণ্ডগোল না হয় সে জন্য কোন কোন ব্যবসায়ীরা প্রথম প্রথম এর নাম দিয়েছিল 'গ্লেনজ', 'লাষ্ট্রন' প্রভৃতি। অবশেষে ১৯২৪ সালে আমেরিকায় ইহার উৎপাদনকারীর এক সভায় এর বাণিজ্য নামাকরণ করা হয় 'রেয়ন' (Rayon) অর্থাৎ উজ্জ্বল রবিকিরণের তীব্রতা ও বারিবিম্ব প্রতিবিম্বিত চাঁদের স্নিগ্ধালোকের কঠিন-কোমল সমাবেশ।

স্বভাবজাত রেশমের চেয়ে রেয়নের চাকচিক্য অধিক হলেও রেয়ন আসল সিল্কের মত মজবুত বা স্থায়ী হয় না। এতৎ সত্ত্বেও উহার ব্যবহার দিনের পর দিন কিন্তু বেড়েই চলেছে। ১৯০৯ সালে সারা দুনিয়ায় উৎপন্ন নকল সিল্কের পরিমাণ ছিল মাত্র ৭,৪০০ টন ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে বর্ত্তমানে দাঁড়িয়েছে ১৫০,০০০ টনে পরন্তু বিশ্বে আসল সিল্কের মোট পরিমাণ বছরে ৪০,০০০ টন এবং অনেক দিন হ'তে এই পরিমাণ প্রায় এক রকমই আছে। রেয়নের অধিকতর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আরও কারণ এই যে উহা রং-চং ও চাকচিক্যের জন্য সাধারণের মন বেশী আকৃষ্ট করে, সস্তাও বটে। সস্তার জন্য সাধারণের ব্যবহারোপযোগী, অপর পক্ষে পকেট ভারী না হ'লে আসল সিল্কের কাছে ঘেঁষা সম্ভব নয়। সারা পৃথিবীতে যে পরিমাণ কৃত্রিম সিল্ক ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে ভারতের অংশ নিম্নে দেওয়া গেল।

আমদানী		১৯৩০-৩১ পরিমাণ ও উহার মূল্য	১৯৩১-৩২ পরিমাণ ও উহার মূল্য	১৯৩২-৩৩ পরিমাণ ও উহার মূল্য
রেয়ন সুতা	পাউণ্ড	৭,১১৯,৭৮৬	৭,৯৬২,৫৪৬	১১,০০২,০৯৩
	টাকা	৮,০৮২,৭৯২	৮,২২৪,৬২১	৯,২৫৬,৫৪৫
রেয়ন জাত দ্রব্য	গজ	২৩,০৭৯,৭১৩	৭৪,৪৭৩,৩৭৮	১১২,৮১৯,২৮১
	টাকা	৮,৩১৪,৩৭২	২১,১২৫,৯১৭	২৫,২৯৭,৪৩৪

এ ছাড়াও প্রতি বছরে তুলা-জাত দ্রব্যের সঙ্গে মিশ্রিত ভাবে বহুল পরিমাণে রেয়ন ভারতে আমদানী হ'য়ে থাকে।

এই রেয়ন কেমন করে' তৈরী হয় তা বলার পূর্ব্বে এর পেছনে যে একটি চমৎকার ইতিহাস আছে তারই একটু পরিচয় দিই।

স্বভাবকে নকল করা মানুষের এক চিরন্তন কৌতূহল। পাখীর উড়া দেখে মানুষেরও সখ হয় উড়্‌তে। এই স্বপ্ত প্রবৃত্তি থেকেই উড়োজাহাজ নির্ম্মাণ সম্ভব হয়েছে। তেমনি গুটি-পোকার রেশম বানান দেখে মানুষেরও খেয়াল জাগে রেশম তৈরী কর্‌তে। ১৭৩৪ খৃঃ ফ্রান্সের এক পদার্থবিদ্ মিঃ রোঁমার প্রথম এমনি এক স্বপ্ন দেখে এবং তারপর থেকে চেষ্টাও চলে আস্‌ছে। ব্যবসা হিসাবে এই প্রচেষ্টার সফলতা কাউণ্ট সাঁর্দোনের নামের সঙ্গে বিজড়িত। তিনি বাইও-কেমিষ্ট্রির জনক স্বরূপ মিঃ প্যাসতুরের অধীনে গবেষণা কর্‌তেন। প্যাসতুর সে-সময় রেশম-পোকার রোগ নির্ণয়ে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ইহা কারও অজানা নয় যে, পোকাগুলি তুঁত ও ওক্ গাছের পাতা খায় এবং আঠার মত এক রকম পদার্থ নির্গত করে' তাই দিয়ে নিজেকে ঘিরে এক আবরণ (Co coon) করে, যা থেকে সিল্ক প্রস্তুত হয়। কৃত্রিম রেশমের আবিষ্কারক যিনি, তিনিও পোকার এই গুটি তৈরী করার যে পন্থা তাই-ই সহজভাবেই অবলম্বন করেছিলেন। এই সকল পাতার উপাদান, প্রধানতঃ সেলুলজ, সেই জন্য সাঁর্দোনে সেলুলজকে দ্রবীভূত করে' সূক্ষ্ম ছিদ্র পথে বা'র কর্‌লেন সূতার আকারে। কথাটা শুন্‌তে যেমন, কাজে অবশ্য এত সহজ ছিল না। রেশম-কীটের জীবন, তার ধরণ-ধারণ, লালা ইত্যাদি নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করতে তাঁর কত দীর্ঘ বছর কেটে গেছে। ১৮৮৪ সালে তুঁত বৃক্ষের পাল্‌প হতে তিনি 'নাইট্রো-প্রসেস্' দ্বারা সর্ব্বপ্রথম রেশম-সূতা

কাউণ্ট সাঁর্দোনে

প্রস্তুত করতে সক্ষম হন। তারপর আজ পর্য্যন্ত বহু চেষ্টা ও অনেক অভিনব উপায়ও আবিষ্কৃত হয়েছে।

মোটামুটি বর্ত্তমানে চার রকম উপায়ে 'রেয়ন' তৈরী হ'য়ে থাকে। (১) ভিসকোস্‌প্রসেস (২) এসিটেট্ প্রসেস (৩) কিউপ্রামোমিয়াম প্রসেস (৪) নাইট্রো প্রসেস।

এই চারটি উপায়ের মধ্যে উৎপন্ন রেয়নের দামের দিক্ দিয়ে সস্তা হচ্ছে ভিসকোস প্রসেস। বর্ত্তমান দুনিয়ার সর্ব্বমোট উৎপন্ন রেয়নের শতকরা ৮৬ ভাগই এই প্রসেসে উৎপন্ন হয়ে থাকে; বাকী তিনটি উপায়ে যথাক্রমে

কটন লিনটারস

শতকরা ৭, ৫ ও ২ ভাগ হয়। শেষোক্ত দুইটি প্রসেস প্রায় উঠে যাবার মধ্যেই বলা যায়।

সমস্ত প্রসেসের আসল উপাদান হচ্ছে সেলুলজ। অমিশ্র বা খাঁটি সেলুলজ স্বভাবতঃ প্রকৃতিতে মিলে না। তুলার মধ্যে সেলুলজ বহুল পরিমাণে (প্রায় শতকরা ৯৮ ভাগ) দৃষ্ট হয়। কাষ্ঠ বা অন্যান্য ঘাস-জাতীয় পদার্থে শতকরা ৬০ ভাগেরও কম সেলুলজ আছে। অতএব কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত কার্য্যে এই সব দ্রব্য অনায়াসে ব্যবহার করা চলে। প্রতীচ্য দেশে সাধারণতঃ স্প্রুস কাঠ হতে সালফাইট (sulphite) প্রসেসের দ্বারা প্রাপ্ত পাল্পই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় এবং সে দেশের বাজারে কার্ড বোর্ডের মত থানে থানে সালফাইট উড্ পালপ (sulphite wood pulp) বিক্রীত হয়।

রেশম-সূতা তৈরী করার যে কৌশল তা প্রায় সব প্রসেসে এক রকমই। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা সেলুলজকে দ্রবীভূত করা হয় ও জেট্সের (jets) ছেঁদার ভিতর দিয়ে পিচ্‌কারির মুখ দিয়া নির্গত জলধারার মত যখন উহা বেরিয়ে এসে পড়ে এসিড অথবা গরম বায়ুর মধ্যে—তখন তা জমে পায় সূতার আকার। এই জেট্গুলো সাধারণতঃ প্লাটিনাম (platinum) বা প্লাটিনাম মিশ্রিত ধাতুর দ্বারা প্রস্তুত। প্রত্যেকটি জেটে পিচ্‌কারীর মুখের মত বিশ থেকে একশো ছিদ্র থাকে এবং প্রত্যেকটি ছেঁদার ব্যাস এক ইঞ্চির $\frac{১}{১০০০}$ হতে' $\frac{৪}{১০০০}$ ভাগ হবে। জেটের প্রত্যেকটি ছিদ্র পথে এক একটি সূক্ষ্ম সূতা (filament) তৈরী হয়। কৃত্রিম রেশমের এক একটি সূতা এইরূপ কতকগুলি সূক্ষ্ম সূতার সমষ্টি এবং উহা জেটের ছেঁদার

ভাসমান স্প্রুস কাঠের টুকরা পাল্প ফ্যাক্টরীতে নীত হইতেছে

সংখ্যানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট হয়। এই সূক্ষ্ম সূতার সংখ্যা যত বেশী হবে ততই রেয়নের সূতা কোমল হয়।

সমস্ত কৃত্রিম রেশমের সূতা কাটবার সময় প্রথম শ্রেণীর করারই চেষ্টা করা হয় কিন্তু প্রসেসের মধ্যে ট্রিটমেন্টের (treatment) তারতম্যানুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর হয়ে পড়ে। সমস্ত সূতা হ'য়ে গেলে পর শ্রেণী (Cotton linters) ১৫° হ'তে ২০° সেন্টিগ্রেড তাপে (temperature) ১৭।১৮% কসটিক সোডা সলিউশনে দুই হতে' তিন ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখা হয়। এই ভিজে সিট (sheet) গুলোকে যন্ত্রে নিংড়ে পুনরায় আর একটা কলে (Disintegrating machine) ফেলে কেটে ছোট ছোট টুক্‌রো করা হয়—যার রাসায়নিক নাম দেওয়া
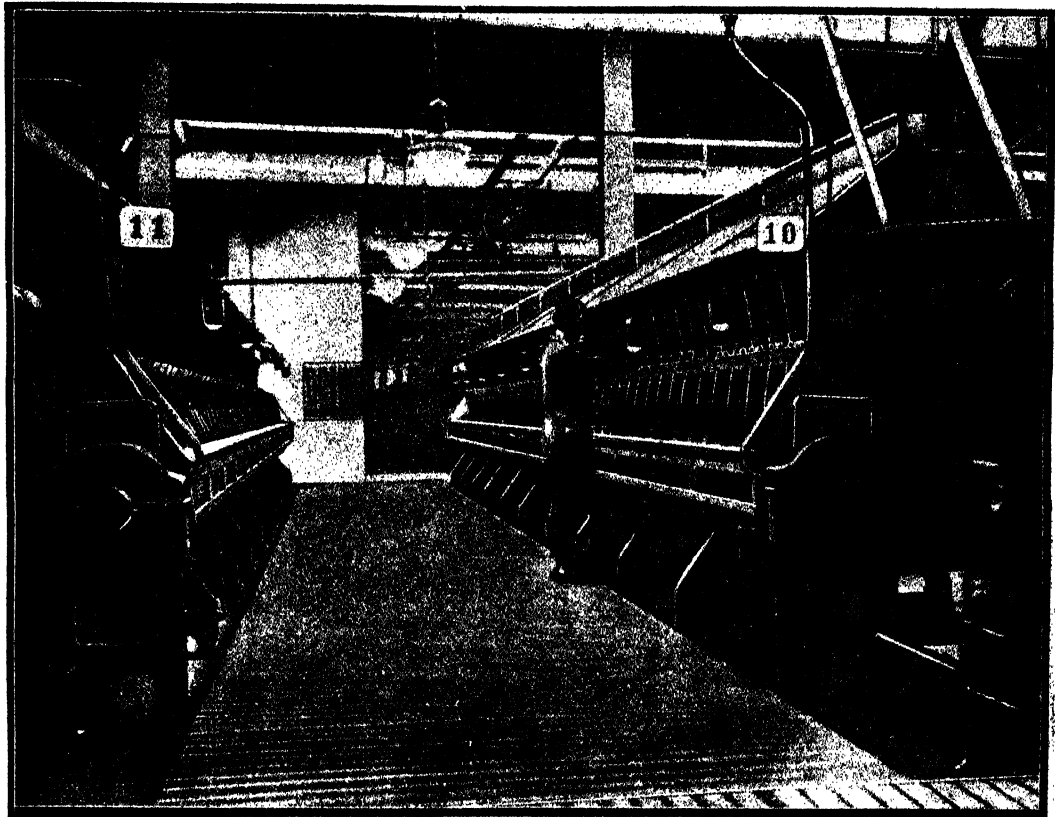
ববিন স্পিনিং মেসিন

বিভাগ করা হয়। যে সূতোগুলো একেবারে নিখুঁত থাকে সেগুলোকে প্রথম-শ্রেণী-ভুক্ত করা হয়, যে গুলোর একটু আধটু খুঁত আছে অথচ রং-চংয়ে সমান, সেগুলোকে দ্বিতীয় শ্রেণী ইত্যাদি করা হ'য়ে থাকে।

ভিসকোস প্রসেস—

পরিষ্কৃত (bleached) সালফাইট্ উড্ পালপ (sulphite wood pulp) অথবা কটন লিনটারস্ হয় এলকালি সেলুলজ (alkali Cellulose)। এই এলকালি সেলুলজকে আবার একটা মুখ ঢাকা পাত্রে দুই তিন দিন রেখে দেওয়া হয়। একে বলে পোক্ত (aging) করা। এর পরে পুনরায় ৩।৪ ঘণ্টা ধরে কারবন বাই-সালফাইড (Carbon BiSulphide) দিয়ে অনধিক ৩০° সেন্টিগ্রেড তাপে বেশ করে'সংমিশ্রিত করা হয়; এর ফলে কারবন বাইসালফাইড ও এলকালি সেলুলজের মধ্যে যে

রাসায়নিক প্রক্রিয়া হয়, তাতে সেলুলজ জ্যানথেট (Cellulose Xanthate) নামক একটি মিশ্রপদার্থ তৈরী হয়।

এই কম্পাউণ্ডকে যখন দ্রবীভূত করা হয় কসটিক সোডা সলিউশনে, তখনই একে বলে ভিসকোস সলিউশন। সদ্যপ্রস্তুত ভিসকোস সলিউশনের দ্বারা সুতো কাটা সম্ভব হয় না। এই সলিউশনকে ৩।৪ দিন যাবৎ ১৫°-২০° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে ট্যাঙ্কে (tank) রাখা হয়। একে পাকা (ripening) করা বলে। এই রকম ভাবে রাখার ফলে কতকগুলি রাসায়নিক ক্রিয়ার জন্য সলিশন সুতো কাটার উপযুক্ত হয়ে উঠে। এই সময় বেশ ভাল রকম ফিলটারও করে নেওয়া হয়। তারপর সুতো করার জন্য সলিউশনকে প্রধান একটি পাইপের দ্বারা দিয়ে হাজির করান হয় স্পিনিং মেশিনের নিকট। এই স্পিনিং মেশিনে সাধারণতঃ ন্যূনাধিক একশো সুতো উৎপন্ন করার যন্ত্র থাকে। প্রত্যেক যন্ত্রসংলগ্ন ক্ষুদ্র পাম্প ভিসকোস সলিশনকে জেটের ভিতর দিয়া সলফিউরিক এসিড ও সোডিয়াম সালফেট ইত্যাদি মিশ্রিত জলপূর্ণ পাত্রে নির্গত করতে সাহায্য করে। ঐ এসিড ইত্যাদি মিশ্রিত জলের মধ্য দিয়া ভিসকোস

সেন্ট্রিফুগাল স্পিনিং মেসিন

সলিউশন প্রবাহিত হবার সময় রাসায়োনিক ক্রিয়ার ফলে সুতার কঠিন রূপ পায়। এই সুতা সাধারণতঃ দুই রকম উপায়ে সংগৃহীত হ'য়ে থাকে, (১) সেন্ট্রিফুগাল প্রসেস, (২) ববিন প্রসেস।

সিন্ট্রিফুগাল স্পিনিং প্রসেসে সুতা স্পিনিং বাথ হ'তে একটা কাঁচের রোলারের উপর দিয়া সোজা নীচের একটি গোলাকৃতিপ্রায় বাক্সে গিয়ে জমা হয়। এ বাক্সটি

মিনিটে ৬০০০।৮০০০ বার ঘোরে। বাক্সের এই সেণ্ট্রিফুগাল ফোরসের (force) জন্যই সূতাগুলা গুটির আকারে জড়িয়ে যায়—যার থেকে পরে কেটি করা হয়ে' থাকে। কেটিগুলোকে পরে জলে উত্তমরূপে ধুয়ে শুকান হয়।

গুলোকে ঈষদুষ্ণ সোডিয়াম সালফাইড সলিউশনে ভিজিয়ে সালফার শূন্য করা হয় এবং অবশেষে ব্লিচ (bleach) করে' শুকিয়ে শ্রেণীবিভাগ করা হ'য়ে থাকে। ইহাই বাজারের উজ্জ্বল চকচকে ভিসকোস রেয়ন। এখন বেশ বুঝা যাবে যে, এই ভিসকোস রেয়ন খাঁটি সেলুলজ
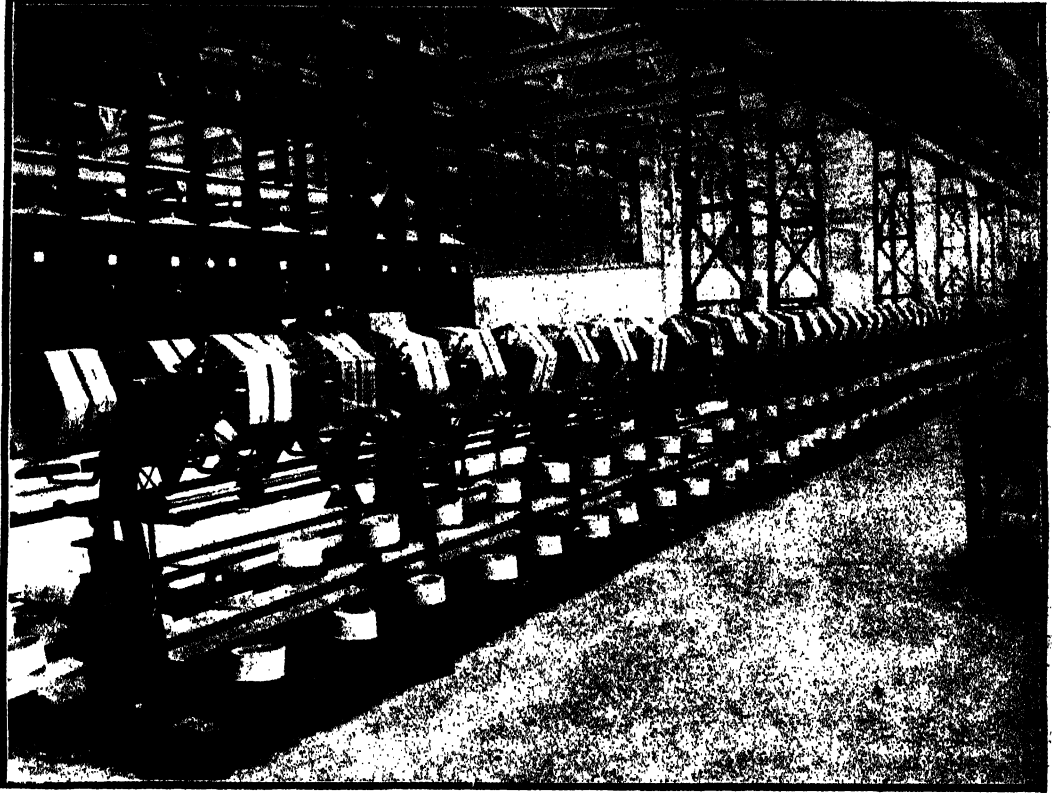
কেটি করিবার যন্ত্র

ববিন স্পিনিং প্রসেসে কোয়াগুলেটিং বাথ (coagulating bath) হ'তে সূতা একটা ববিনে জড়ান হয়। এই প্রসেসে সূতাতে কোন পাক (twist) না পড়ায় ববিনগুলোকে জলে ধুয়ে প্রথম এসিড শূন্য করা হয়, তারপর শুকিয়ে পাকান কলে (twisting machine) পাকান ও সংগৃহীত হয়, যা থেকে পরে কেটি করা হ'য়ে থাকে।

এই উভয় প্রসেসেই যে কেটি পাওয়া যায় তার সূতায় সামান্য গন্ধক থাকার দরুণ পীতাভ দেখায় বলে' কেটি-

ছাড়া আর কিছু নয় এবং প্রস্তুত-প্রণালীর উপর এর উজ্জ্বলতা ও কোমলতা নির্ভর করে। তৈরী করার প্রসেসটা যদি ঠিক ঠিক ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, তবে আসল ও নকলের মধ্যে পার্থক্য করা একরূপ

এই কৃত্রিম রেশম-শিল্প প্রথম আবিষ্কার হবার পরে কিছুদিন নাইট্রো-প্রসেস ব্যবহৃত হ'ত কিন্তু বর্ত্তমানে সস্তা ভিসকোস প্রসেস প্রায় উহার স্থানাধিকার করেছে এবং বাকীটুকুও শীঘ্রই করবে।

রেয়ন ব্লিচিং ও ওয়াসিং যন্ত্র
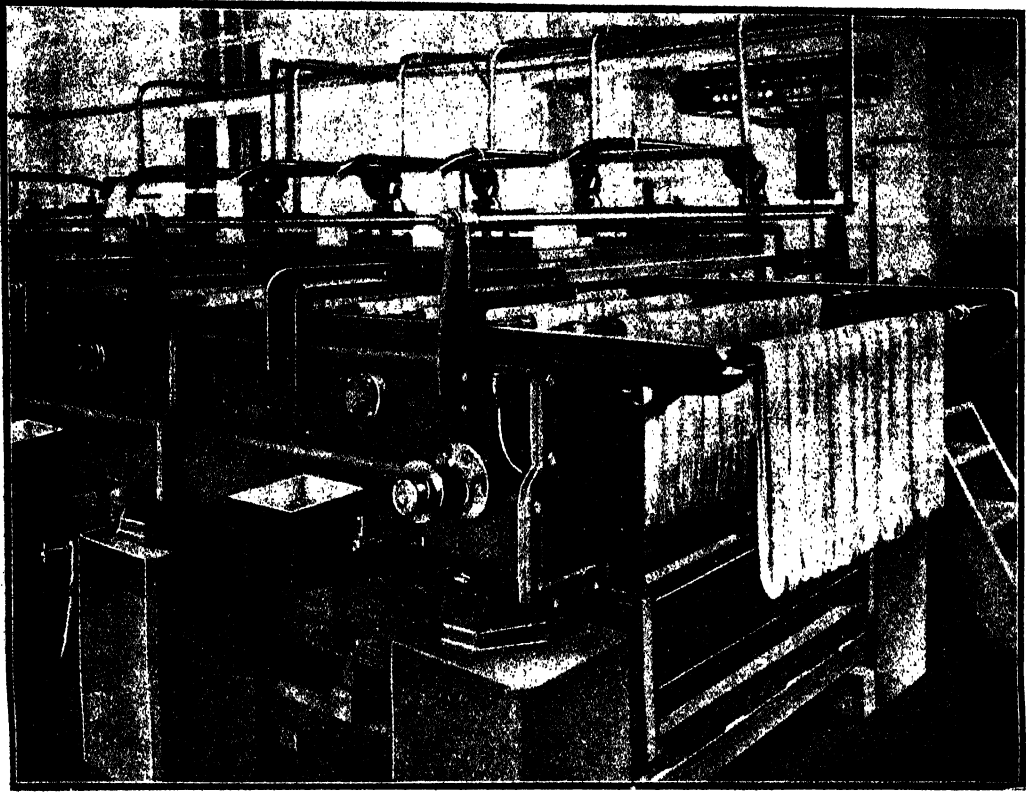
বিগত ১৫ বছরের মধ্যে ভিসকোস প্রসেস আশাতীত ভাবে উন্নতি লাভ করেছে ও কৃত্রিম-সিল্কের যে সকল নূতন কারখানা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তাতেও এই প্রসেসই গৃহীত হতে দেখা যাচ্ছে। এর প্রধান কারণ এই যে, ভিসকোস প্রসেসে যে সকল উপকরণ (উডপাল্প, কসটিক সোডা, কারবন বাইসালফাইড,) প্রয়োজন হয় তা সস্তা ও সহজে মিলে, অপর পক্ষে এসিটেট প্রসেসে যদিও উৎপন্ন মাল কিছু উৎকৃষ্ট হয় কিন্তু যে সকল উপাদান (তুলা, এসিটিক এনহাইড্রাইড, এসিটন) লাগে তার দাম বেশী হওয়ায় উৎপন্ন দ্রব্যেরও পরতা অত্যধিক পড়ে এবং সেই জন্যই সাধারণতঃ ব্যবসা হিসাবে ভিসকোস প্রসেসেই আদৃত হয়। এই সব কারণে ভিসকোস প্রসেসই সর্ব্বতোভাবে অনুমোদনীয়।

ভারতে এই কৃত্রিম রেশম-শিল্পোৎপাদনের সম্ভাবনীয়তা যে কতখানি তা আগামী সংখ্যায় সবিস্তারে বলবার ইচ্ছা রহিল।

নবনুর

(উপন্যাস)

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত
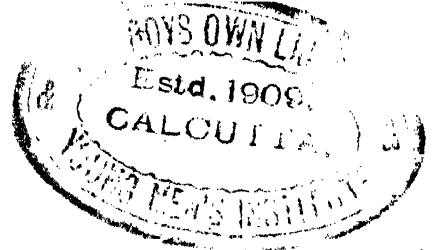
রণজিৎ রায় এক মস্ত বনেদী বংশের ছেলে। এই রায় বংশ এত পুরানো যে পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা আর এখন বলতে পারেন না, যে এঁদের আদি পুরুষ ঠিক কি রকমের দুষ্কর্ম্ম ক'রে প্রথম জমীদারী অর্জ্জন করেছিলেন। তবে বংশ-প্রতিষ্ঠা যে অনেক শতাব্দী আগে হয়েছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। গৌড়পতি আদিশূরের আমলেও এঁরা শক্তিকোটের রাজা ব'লে খ্যাত ছিলেন। পাঠান আমলে নিজেদের অবস্থার আরও উন্নতি করলেন। সুলতান হোসেন শাহ্ এঁদিকে নূতন উপাধি দিলেন রাজা-ই-রাজগান। সে সনদ আজও দপ্তরে আছে। তার পর, যে যুগে প্রতাপাদিত্য ইশা খাঁ, কেদার রায় প্রভৃতি ভৌমিকেরা অনর্থক মেজাজ খারাপ ক'রে সর্ব্বস্ব খোয়ালেন, তখন এঁরা মোগল সরকারের শ্রীচরণ সবলে আঁকড়ে ধ'রে থেকে মহারাজ বাহাদুর খেতাব সংগ্রহ করলেন। নূতন খেতাব, নূতন খেলাৎ পেয়ে খুব জেঁকে রাজত্ব করতে লাগলেন। পলাশীর সময়ে কি খেলা খেলেছিলেন আমাদের জানা নেই, তবে ইংরেজ কোম্পানীও এঁদের রাজমুকুট কায়েম করলেন। জরী-জড়োয়া প'রে এঁরা এখনও গৌড়বঙ্গ আলো ক'রে রয়েছেন। তবে হাল আমলের তুক-তাক ভাল ক'রে এই রায়েরা শেখেন নি। নইলে, এতদিন মান্যবর, স্যার, ইত্যাদি খেতাবও জোগাড় হয়ে যেত। বর্ত্তমান মহারাজ সমরজিৎ রায় ইংরেজী ভাষায় কথাবার্ত্তা কইতে পারলেও, নিজ রাজ্যেই পাত্র-মিত্র নিয়ে দিন কাটান। কলকাতায়, বাড়ী কিনে সবে এই একটু ডানা মেলবার পরামর্শ করছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা রণজিৎ রায় যে কীর্ত্তি করলেন, তাতে আর সভ্যসমাজে মুখ দেখানর পথ রইল না।

যখন ১৮৭৬ সালে যুবরাজ এডোয়ার্ড এদেশে আসেন, তখন শক্তিকোটের রাজা ছিলেন এঁদের বাবা শত্রুজিৎ রায়। যুবরাজকে অভ্যর্থনা করবার জন্য প্রিন্সেপ্‌স্ ঘাটে সমবেত রাজেন্দ্র-মণ্ডলীর মধ্যে মহারাজ শত্রুজিৎও ছিলেন। মাথায় প্রকাণ্ড মুরেঠা বেঁধে, গোঁপ-জোড়াকে পাকিয়ে কাণ অবধি তুলে দিয়ে, চোস্ত ফার্সী জবানে কথা কয়ে, তিনি খুদ সালার জঙ্গকে পর্য্যন্ত খুশী ক'রে দিয়েছিলেন। সেই ছ'ফুট লম্বা বিশাল দেহ ও দীর্ঘ বাহু দেখে হোলকর প্রমুখ মরাঠা রাজারা ধ'রেই নিলেন, যে এটী নিশ্চয় বাবুদের বর্গী, সাহেবরা আসার আগে এর বাপ দাদা নিশ্চয়ই ঠুকে চৌথাই আদায় করত।

জয়পুরের মহারাজ উদয়পুরের মহারাণাকে চুপিচুপি বললেন, "বারো-ভূঁইয়া বাঙ্গালার কথা শুনেছেন ত, মহারাণাজী? এই তার একজন। কি তকলিফই দিয়েছিল এরা আমাদের আম্বেরপতি মহারাজ মানসিংহজীকে!"

শক্তিকোটের রাজাদের সেই প্রথম কলকাতায় পদার্পণ। মহারাজ শত্রুজিৎ প্রায় ছ'মাস ধ'রে মহানগরীর আনন্দ-সমুদ্র মন্থন ক'রে দেশে ফিরলেন। সমুদ্র-মন্থন জিনিসটা ত সোজা নয়। অমৃতও উঠে, বিষও ওঠে। বিষ মহারাজের বরদাস্ত হ'ল না। দেশে ফিরে অল্পদিনেই মারা গেলেন।

তখন কুমারেরা দুজনেই নাবালক। সমরজিৎ পনের বছরের, রণজিৎ তের বছরের। রাজ্যের নিয়ম অনুসারে, জ্যেষ্ঠ সমর বিশাল শক্তিকোট রাজ্যের গদীতে বসল। রণজিৎকে বাপ উইল ক'রে দিয়ে গেছেন, বাসের জন্য ফকীরকোটের বাগান বাড়ী, আর খোরপোশের জন্য ঐ নামেরই তালুক। আপাততঃ দুজনার সম্পত্তিই কোর্ট অফ ওয়ার্ড্‌সের হাতে গেল। সমরকে লেখাপড়া শেখার জন্য যেতে হল পাটনায় না কোথায়, ওয়ার্ডদের ইস্কুলে। কনিষ্ঠকে রাজমাতা সেখানে পাঠালেন না। সরকারকে জানালেন, যে তাকে কলেজে পড়িয়ে উকীল করবেন। সরকার আপত্তি করলেন না।

শক্তিকোটের রাজবংশের দুটো আজগুবি নিয়মের এইখানে উল্লেখ করব। প্রথম, এঁরা মহা ধূমধাম ক'রে প্রতি বছর মহরম করতেন। রাজা নিজের তাজীয়া নিয়ে মিছিলে সকলের আগে আগে যেতেন। দ্বিতীয়, প্রত্যেক নূতন রাজাকে অভিষেকের পর ফকীরকোটের পীরের দরগায় গিয়ে সেলাম ক'রে আসতে হ'ত। মুসলমান প্রজারা ঘটা ক'রে কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে তাঁকে নিয়ে যেত। এই দুই নিয়ম নিয়ে লোকে চিরকাল অনেক কল্পনা জল্পনা ক'রে আসছে, কিন্তু কারণ কেউ জানে না। আসল কারণটা লেখা আছে এক দলিলে। সে দলিল সর্ব্বদা এক লোহার সিন্দুকে বন্ধ থাকে। রাজা আর রাজপুত্রেরা ছাড়া কেউ কখনও জানে না, তাতে কি লেখা আছে। এমন কি, দেওয়ানও নয়। রণজিৎ মরবার আগে কথাটা প্রকাশ ক'রে দিয়ে যায়। দলিলে যে গল্প লেখা আছে তা এই ;—

চতুর্দ্দশ শতকে যখন দিনাজপুরের মহারাজ বাঙ্গালার সিংহাসনে বসেন, তখন শক্তিকোটের সামন্ত রাজা ছিলেন, রাজা মহতাব রায়। মহতাব গণেশনারায়ণের পরম বন্ধু ও একান্ত অনুগত সেনানী ছিলেন। একজন হিন্দু বাঙ্গালার সুলতান হল দেখে, পাঠান কর্ম্মচারীরা কয়েক জন মিলে জৌনপুরের প্রবল পরাক্রান্ত নবাব ইব্রাহিম খাঁকে ডেকে নিয়ে এল। ইব্রাহিমের সৈন্য অগণ্য। দিল্লীপতিও তাঁকে ভয় করতেন। তাঁকে যুদ্ধে হারান নববঙ্গাধিপের পক্ষে অসম্ভব ছিল। গণেশ নারায়ণ এক পীরের পরামর্শে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়ে কোন রকমে আশু বিপদ্ হতে উদ্ধার হলেন। মহতাব ও অন্য দুএক জন পার্শ্বচরও মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান হলেন। ইব্রাহিম দেশে ফিরে গেলে পর, মহারাজ সুবিধা বুঝে আবার হিন্দুধর্ম্মই পরিগ্রহ করলেন। তখনকার দিনে হিন্দুসভা ত ছিলই না, শুদ্ধি নিয়ে হিন্দু হওয়ার কোন একটা সরাসরি তৈরী পন্থাও ছিল না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা অনেক ভেবে চিন্তে ব্যবস্থা দিলেন, যে এক প্রকাণ্ড সোণার গাই তৈরী করিয়ে মহারাজ যদি তার পেটে ঢুকে আবার বেরিয়ে আসেন, তাহলে তাঁর পুনর্জ্জন্ম হবে, তিনি আবার হিন্দু ব'লে গণ্য হবেন। গণেশনারায়ণ তাই করলেন। গাইটা অবশ্য পণ্ডিতেরা কেটে কুটে ভাগা ক'রে নিলেন। সোণার গাই কিনা, এতে তাঁদের জাত গেল না। মহারাজ আর ব্রাহ্মণেরা তো বেশ মজা করলেন। কিন্তু মহতাবের মতন লোক যারা নিমকহালালীর আতিশয্যে ধর্ম্মত্যাগ করেছিল, তাদের গতি কি হবে, কেউ ভাবলে না। রাজা গণেশের বাকী রাজত্বকাল নানা গোলযোগে কাটল। তাঁর মৃত্যুর পরই মহতাব রায় রাজধানী ছেড়ে নিজের দূর জায়গীরে চলে গেলেন, আর কখনও গৌড়ে ফিরলেন না। সেখানে প্রচার করলেন, যে তিনি মনিবের সঙ্গে সঙ্গে যথারীতি আবার হিন্দু হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণদের যথেষ্ট দিলেন থুলেন, তাই কথাটা বাঙ্গালী প্রজারা কেউ অবিশ্বাস করলে না। কিন্তু লাল সাহ বলে একজন ফকীর রাজার সঙ্গে গৌড় থেকে শক্তিকোটে এসেছিলেন, তিনি সব জানতেন। তাঁর মুখ ত বন্ধ করা চাই! রাজা এক পীরস্থান তৈরী ক'রে তাঁকে সেখানে বসালেন, আর অদূরে ফকীরকোট নামে নিজের এক বাগানবাড়ী করালেন। ফকীর রাজাকে দিয়ে দুটী প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন। আজ পর্য্যন্ত তাঁর বংশধরেরা সেই দুই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করছেন।

দলিল অবিশ্বাস করার উপায় নেই, কেন না তার উপর মহতাব রায়ের সহি সিক্কা আছে।

দশ বছর কেটে গেছে। তিন চার বছর হল মহারাজ সমরজিৎ জমীদারীর ভার নিয়েছেন। বিয়ে থা করেছেন। রণজিৎ কলকাতায় কলেজে প'ড়ে এম্-এ বি-এল পাশ করেছে। হাইকোর্টে নামও লিখিয়েছে; কিন্তু ওকালতী করে না। মা মারা যাওয়ার পর আর এ বিষয়ে জেদ করবারও কেউ নেই।

দুই ভাইয়ে বনতি নেই। কি ক'রে থাকবে? দুজনকার শিক্ষা দীক্ষা একেবারে আলাদা। শুধু সহোদর হলেই কি ভাব থাকে! দুজনের প্রকৃতিও উল্টো। সমর কাজের লোক। নিজে রোজ দপ্তরে ব'সে জমীদারীর কাজকর্ম্ম দেখে। ন্যায্য পাওনাগণ্ডার একপয়সাও ছাড়ে না। লেঠেল পাইক রেখেছে, উকীল মোক্তারও রেখেছে। দাঙ্গা হাঙ্গামা, মামলা মোকদ্দমা সে ভালবাসে। তাতে একটা রীতিমত আনন্দ পায়। আবার এটাও খুব বোঝে,

নিজের সুবিধার জন্য কাকে নরম ব্যবহারে, মিঠে কথায় তুষ্ট করতে হবে।

রণজিৎ অলস অকেজো মানুষ। তার নিজের যে ফকীরকোটে তালুক, তাও কখন চক্ষে দেখে নি। দাদার হাতে ফেলে রেখে দিয়েছে। কলকাতায় থাকে, বছরে দুবার শক্তিকোটে যায়। বৌদিদিকে বড় ভাল বাসে। তাঁর কাছে খুব আদর যত্ন খেয়ে, লোকের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করে, আবার শহরে ফিরে আসে। আগেই বলেছি, বিয়ে থা করে নি। বোধ হয়, করবার ইচ্ছাও নেই। ব্যবহারে অতি অমায়িক, তবে গরজ বুঝে নরম হওয়া তার আসে না। দাদা তাকে অনেক ধমকাধমকি করেন, কিন্তু তার বাঁধা জবাব "আমাকে আর এর ভেতর টানাটানি কর কেন, দাদা? যা হাত-খরচা দিতে পার দিও, আমি চুপচাপ কলকতায় প'ড়ে থাকব।"

দাদার ইচ্ছা, ভাই অন্ততঃ এষ্টেটের মোকদ্দমাগুলো হাইকোর্টে তদ্বির করে। একদিন স্পষ্টই বললে, "আচ্ছা, আমিই শুধু বেগার খেটে মরব কেন বল দেখি নি! উকীল হয়েছিস্, হাইকোর্টে আমাদের মামলা মোকদ্দমাগুলো দেখলে ত হয়।"

রণজিৎ একটু হেসে বল্লে "দাদা, তুমি রাগ কোরো না। আমার বি-এল পরীক্ষা দেওয়াই ভুল হয়েছিল। বাঙ্গালীর ছেলে, পরীক্ষা দিতে হয় তাই দিয়েছি। এক-দিনের তরেও মনে করি নি, যে ওকালতী করব।

"আচ্ছা, তা করিস্ না। জমীদারের ছেলে জমীদারীতে এসে বস্। অন্ততঃ নিজের তালুকটাও ত দেখতে পারবি। আমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়ালে অনেক শিখবি।"

"তাও শিখতে চাই না, দাদা। তোমার সঙ্গে ঘুরে বেড়ান মানে ত পাখী মারা আর প্রজা ঠেঙ্গান! কোনওটাই ভাল লাগবে না।"

"তাহলে তুই করবি কি? সহরের বাড়ীতে অন্ধকার ঘরে ব'সে ব'সে তোর দিনগুলো কাটে কি ক'রে কে জানে!"

"বললে তুমি রাগ করবে জানি, দাদা—কিন্তু আমার কিছুই করবার ইচ্ছা নেই। সারাদিন পড়াশুনো ক'রে সন্ধ্যাবেলায় বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে জটলা ক'রে বেশ সুখে দিন কেটে যাচ্ছে।" সেদিন দাদা আর কিছু বললেন না। একটুখানি মুখ বেঁকিয়ে চ'লে গেলেন।

পরদিন সকাল বেলা রণজিৎ দোতলার দালানে ব'সে খবরের কাগজ পড়ছে। মুখে সিগারেট। পাশে ছোট তেপাইয়ের ওপর চায়ের পেয়ালা। এমন সময়ে কাছারী বাড়ীর দিকে ভীষণ কান্নার রোল উঠল, "বাপ রে, মেরে ফেললে রে, দোহাই হুজুর, আমার কোনও দোষ নেই।"

সঙ্গে সঙ্গে রাণী শশব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এসে বললেন, "একবার যাও, ঠাকুরপো। কার উপর ভয়ানক রেগে গেছেন, মার-ধর করছেন।"

রণজিৎ দাঁড়িয়ে উঠল। এক চুমুকে চা শেষ ক'রে, চটী ফট ফট করতে করতে দৌড়ল। যাবার সময়ে চেঁচিয়ে বলে' গেল, "বৌদি, তোমার রাজ্যে এই সব অত্যাচার হয়। তুমি বন্ধ করতে পার না!"

কাছারী বাড়ী পৌছে দেখে, উঠানে দুজন চাষীকে পাইকরা পিছমোড়া করে' ধরেছে, আর রাজা ঘোড়ার চাবুক দিয়ে তাদের নির্দ্দয়ভাবে মারছেন। মারছেন আর চেঁচাচ্ছেন, "আমার কাছে মেজাজ দেখাতে এসেছিস্ ব্যাটারা! আজ নিজে হাতে তোদিকে খুন ক'রে এই উঠানেই গাড়ব।"

রণজিৎ বাঘের মত লাফিয়ে প'ড়ে দাদার হাত থেকে চাবুক ছিনিয়ে নিলে। নিয়ে বললে, "ছিঃ দাদা, বাড়ী যাও।"

সমরের তখন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান ছিল না। মাথায় খুন চ'ড়ে গেছে। ভাইয়ের বুকে এক ভীষণ ঘুষো মেরে বললে, "কি তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা! দে, আমার চাবুক দে।"

রণজিৎ কলিকাতাবাসী হলেও ঘুষো খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা তার ছিল। সেও ত মহতাব রায়ের বংশধর! ইতিমধ্যে সেই কৃষাণ দুজন পাইকদের হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে রণজিতের পায়ে পড়ল, "তুমিই ছোট রাজা! আমরা জানতাম না, হুজুর। তুমি এখানে থাকতে তোমার ফকীরকোটের রাইয়তের উপর এই রকম জুলুম হবে! আমরা কোনও কসুর করি নি, এ বছরের খাজনা কড়ায়-গণ্ডায় দিয়ে দিয়েছি হুজুর।"

রাজা গর্জ্জন ক'রে উঠলেন, "বাঁধ্ হারামজাদাদের। নিয়ে গিয়ে গারদ-ঘরে বন্ধ ক'রে রাখ্।"

রণজিৎ প্রজা দুজনকে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে বললে, "খবরদার, পাইক, তফাতে দাঁড়িয়ে থাক্।" তার রক্ত মাথায় চড়তে আরম্ভ হয়েছে। রাজাই প্রথম সামলে নিলেন। ঘোড়া কাছে দাঁড়িয়েছিল। এক লাফে চ'ড়ে আস্তাবলের দিকে ছুটে গেলেন।

রণজিতের একটু লজ্জা হল্। সে প্রজা দুজনকে বললে, "তোরা চুপচাপ ফকীরকোটে ফিরে যা। কেউ তোদের কিছু বল্‌বে না।"

তাদের ভেতর যে বুড়ো, সে সেলাম ক'রে বললে, "ধর্ম্মাবতার, আমার নাম শমসুদ্দিন খাঁ। আর এই আমার ছেলে কমরুদ্দিন। বরাত পড়লেই ইয়াদ কোরো হুজুর। হাসতে হাসতে তোমার জন্য জান দেব! কিন্তু তুমি নিজে, বাবা, ফকীরকোটে এসে বস। গরীব প্রজার উপর আর জুলুম হতে দিও না।"

রণজিৎ বললে, "আচ্ছা শমসুদ্দিন, তোমরা গাঁয়ে ফিরে যাও। আমি দাদাকে বলব, তোমাদের উপর রাগ না করেন।"

শমসুদ্দিন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রণজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলে, "রাগ কিসের হুজুর! আমরা ত কোনও কসুর করি নি। দু কিস্তী উসুল পুরোপুরি দিয়েছি। নায়েব নানা ছুতো ক'রে আরও আদায়ের চেষ্টা করছিল। এ জুলুম আমরা কেন বরদাস্ত করব! আমরা আপনার বংশের পুরানো গোলাম, হুজুর। সেকালে মহারাজ মহতাব রায়ের সঙ্গে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ মুরাদ খাঁ গৌড় থেকে এসেছিলেন।"

রণজিৎ নানা কথা ভাবতে ভাবতে উপরে গেল। তার মনটা বড় খারাপ হয়েছিল। দুদিনের জন্য বেড়াতে এসে মূর্খের মত দাদার সঙ্গে রাগারাগি করলে! রাণীর কাছে গিয়ে করুণস্বরে বললে, "বৌদি, ভাল করতে গিয়ে কি করলাম! কেন আমাকে নীচে পাঠালে তুমি?" ব'লে সব ঘটনাটা বর্ণনা করলে।

যখন শমসুদ্দিনের নালিশের কথা বলছে, তখন রাজা এসে পড়লেন। তিনি একেবারে সপ্তমে চ'ড়ে গর্জ্জে উঠলেন, "রণজিৎ, তোমার এ বাঁদরামির আমি প্রশ্রয় দিতে পারি না। আজ থেকে তুমি তোমার ফকীরকোট নিজে দেখো। প্রজাদের যত ইচ্ছা নাই দিয়ে মাথায় চড়িও। কিন্তু খবরদার, আমার রাজ্যে চালাকী করতে এসো না।"

রণজিৎ চেঁচালে না। কিন্তু খুব শক্ত হয়ে উত্তর দিলে, "দেখ দাদা, আমাকে তুমি মেজাজ দেখাতে এসো না। জানো তো আমি উকীল। তোমার প্রজারাও যাতে আদালতে প্রতিবিধান পায়, সেটা আমাকে দেখতে হবে।"

"আচ্ছা, দেখা যাবে কতদূর তোর ক্ষমতা!" ব'লে সমরজিৎ বেরিয়ে গেলেন।

তিনি চ'লে গেলে রণজিৎকে রাণী অনেক বকলেন, "ঠাকুরপো, তুমি না লেখাপড়া শিখেছ, সহরে বাস কর! এ কি রকম তোমার মেজাজ! প্রজার মঙ্গল করতে চাও ত, এই কি তার উপায়! তুমি ত ঠিক উল্‌টো পথে যাচ্ছ।"

বকুনি শুনে রণজিতের লজ্জা হল। সে বললে, "বৌদি, আর গালাগাল দিও না। আমার ঘাট হয়েছে। আমি মূর্খ গোঁয়ারের মতন কাজ করেছি। দাদার পায়ে ধ'রে আজই মাপ চাইব।"

সন্ধ্যাবেলা দেখলে, দাদা গালে হাত দিয়ে চুপ ক'রে ছাতে ব'সে রয়েছেন। তাঁর কাছে গিয়ে, পায়ে ধরতেই তিনি দাঁড়িয়ে উঠে ভাইকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, "রণজিৎ, তোকে কিছুই বলতে হবে না। আমরা দুজনেই অবুঝ ছেলেমানুষের মত কাজ করেছি। আমার উপর রাগ করিস্ না।"

"রাগ করার আমার কোনও অধিকার নেই, দাদা। তুমি বড় ভাই। একথা আমার কিছুতেই ভোলা উচিত ছিল না। আমাকে ক্ষমা কর। কিন্তু আমি একটা কথা স্থির বুঝেছি। আমি হাজার চেষ্টা করি, জমিদারী চালান কখনও শিখব না। তুমি ফকীরকোট নাও। আমি কলকাতা গিয়েই দলিল ক'রে দেব। আমাকে খাই-খরচ ব'লে যা ইচ্ছা দিও। শুধু একটা শেষ কথা আমার আছে। তুমি প্রজাদের বাপ। ভগবান

তোমাকে তাঁদের বাপ করেছেন। সন্তানের প্রতি পিতার কর্ত্তব্য পালন কোরো। স্নেহের বাঁধনে তাদিগকে আপনার ক'রে রেখো, নইলে একদিন এ রাজ্যপাট চুরমার হয়ে যাবে। আমি অলস লোক, ঘরের কোণে কেতাব নিয়ে প'ড়ে থাকব। আর, তোমাকেও কিছু বলতে আসব না, প্রজাদিকেও কিছু বলব না।"

ফকীরকোট তালুক শক্তিকোট এষ্টেটের মাঝখানে। সেটা পেলে যে অনেক সুবিধা, তা রাজা ভাল ক'রেই জানেন। আর, ও তালুক হস্তান্তর হলে গোলযোগও অনেক। রণজিতের যা মানসিক অবস্থা, যে কোন দিন সে তালুক বেচে ফেলতে পারে। তাই একটু ভেবে বললেন, "আমি তোর ফকীরকোট অমনই কেন নেব ভাই? আর তুই যদি তালুক না রাখতে ইচ্ছে করিস্ ত আমি কিনে নিতে পারি। নাবালক আমলের তোর ভাগের কিছু টাকা জমেছে। সেই টাকা আর ফকীর-কোটের দাম মিলিয়ে দেড় লাখ টাকা নগদ দিলে তুই খুশী হবি?"

"আমি জমীদারীর দামের কিছুই বুঝি না, দাদা। তবে, দেড় লাখ টাকা আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি আর টাকা চাই না। চুপচাপ ক'রে ব'সে থাকব।"

"কলকাতার বাড়ীটা অত্যন্ত ছোট। তবে জমী অনেক খানা। সেখানে যদি তোর বাস করা চলে, ত সেটা তোরই রইল। কালে ভদ্রে কলকাতায় গেলে আমাকে থাকতে দিবি ত? কিন্তু ভাই, দেশে যেমন মাঝে মাঝে আসিস্ তেমনই আসতে হ'বে।"

"কলকাতায় তোমার ঘর সর্ব্বদা তৈরী থাকবে, দাদা। মাঝে মাঝে ভাইয়ের ঘরকন্না দেখে আসবে বই কি! আমি বৌদির কাছে যেমন আসি, তেমনই আসব। এ সব ত ঠিক হল। কিন্তু দাদা, একটা কথা এখন থেকে কবুল কর, আমার ভাইপো হলে তাকে আমি মানুষ করব, তোমরা নয়। রাজী আছ ত?" রাজা কিছু উত্তর দিলেন না, ভাইয়ের পিঠে হাত রেখে নীরবে হাসলেন।

রণজিৎ রাণীকে সব কথা বলতে তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। বললেন, "ঠাকুরপো, আমাদের মায়া কাটাচ্ছ! তোমার মৎলব কি, বল ত, সন্ন্যাসী হবে ঠিক করেছ?" রণজিৎ তাঁর পায়ে হাত দিয়ে বললে, "আমার মত একটা নিষ্কর্ম্মা জড়ভরতকে কোন সন্ন্যাসী চেলা করবে বল! তোমাদের মায়া যেমনকার তেমনই রইল, দিদি। শুধু জমীদারীর মায়াটা কাটালাম। যদি আমাকে আরও বাঁধতে চাও, ত আমাকে শীগ্গীর একটি ভাইপো এনে দাও।" বৌদি মুখ লাল ক'রে উঠে গেলেন।

দুই ভাই মিলে ফকীরকোটের বিক্রীখতের খসড়া তৈরী করলেন। রণজিৎ কলকাতায় উকীল বাড়ীতে দেখিয়ে সই করবেন। যাবার আগে একদিন শমসুদ্দিন এল। এসে বললে, "ছোট রাজাবাবু, জমীদারী ছাড়লে কি হবে! এ বুড়ো গোলাম যখন একবার মনিব চিনেছে, তাকে ছাড়াতে পারবে না। আমিও, হুজুর, ক্ষেত-খামার সব কমরুদ্দিনকে লিখে দিয়ে এসেছি। এইবার কলকাতায় বাস করব।"

"কলকাতায় সেই ধোঁয়া কাদার মাঝে থাকতে পারবি না, শমসুদ্দিন। এই বুড়ো বয়সে দেশ ছেড়ে মিছে কেন কষ্ট পাবি?"

"হুজুর, যদি রাগ না করেন ত আসল কথাটা বলি। আর দেশে থাকার দিন নেই, হুজুর। দিনকাল সব বদলে গেছে। রাজায় প্রজায় মনের মিল আর নেই। সরকার থেকে মহরমের খরচ অর্দ্ধেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। মহারাজা একটা তাজিয়া বের করছেন এখনও, কিন্তু সে আর কদিন! তিন বছর হ'য়ে গেল তিনি গদীতে বসেছেন, কিন্তু এখনও একবার দরগায় সেলাম করতে গেলেন না। আমি পুরানো তাঁবেদার, দুতিন বার ওই বিষয়ে আর্জী করতে এসেছিলাম, তাই আমার উপর আমলাদের ও দেওয়ানজীর এত রাগ! মুসলমান প্রজারা এই নিয়ে বড় ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এতদিনের উৎসব, কর্ত্তা, বন্ধ হয়ে গেলে নিরাশ হবে বই কি!"

"আচ্ছা শমসুদ্দিন, আমি যাওয়ার আগে মহারাজের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা কইব।"

"তা কইবেন, হুজুর। যদি আপনার কথায় কিছু হয়। নইলে এ নূতন দেওয়ান দিনে দিনে সব পুরানো উৎসবই বন্ধ করবেন।"

রণজিৎ যখন দাদাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন, "কলকাতায় ব'সে বই প'ড়ে প'ড়ে তোর মাথা বিগড়ে গেছে। প্রজাদের আবদার রাখ্‌তে গেলে রাজ্য চালান যায় না। ও ব্যাটারা ত রাজাকে পথে দাঁড় করাতে পারলেই খুশী। আবার এই ফকীরকোটের মুসলমাম প্রজাগুলো সব চেয়ে নিমক-হারাম। তুই ওই শমসুদ্দিনটাকে কলকাতায় নিয়ে গেলে আমাদের হাড় জুড়ায়। ওই ব্যাটাই যত নষ্টের জড়। ওর বাপ দাদা গৌড় থেকে এসেছিল ব'লে আমাদের মাথা কিনেছে! ব্যাটা চোর! দেওয়ানজী বলেন যে আমরা পুরাণো ব্রাহ্মণ রাজবংশ, আমাদের এই মহরম দরগা ইত্যাদির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখা উচিত না।"

"তা কি হয়, দাদা? এতো কালের পুরোনো প্রথা, এগুলো ছেড়ে দিলে প্রজাদের মনে ব্যথা লাগবে।"

"ব্যথা ছাই লাগবে! ওরা ত কোমর বেঁধেই আছে। একটা কিছু ছুতো পেলেই ঘোঁট পাকাচ্ছে। দেওয়ানজী বলছিলেন, যে এই ফকীরকোটের প্রজারা আগে দলে দলে রাজবাড়ীতে দুর্গোৎসব দেখতে আসত। এখন ওদের মোল্লাদের হুকুমে ছেড়ে দিয়েছে। আমরাই বা তা'হলে ওদের উৎসবে যোগ দেব কেন? কি দায় পড়েছে আমাদের ওদের খোসামদ করবার!"

"দাদা, আমার এসব কথা ভাল লাগছে না। একটা সামান্য তুচ্ছ জমীদারীর মধ্যে এই রকম দলাদলি ভাগা-ভাগি হলে কোন মঙ্গল হবে না। তুমি চিরপ্রথামত একবার দরগায় প্রণাম ক'রে এস।"

"আমার দ্বারা হবে না, রণজিৎ। আমি স্পষ্ট ব'লে দিচ্ছি। তুই যা না, তোর যদি ভাল লাগে।"

"এতে ত ভাল লাগালাগির কথা কিছু নেই, ভাই তুমি যখন অনুমতি দিলে তখন আমি কালই যাব এখনও ত আমি ফকীরকোটের জমীদার আছি।"

তার পরদিন রণজিৎ রায় মহা ধুমধাম ক'রে, হাতী চ'ড়ে পীর লাল শাহের দরগায় সেলাম ক'রে এলেন। শমসুদ্দীন প্রভৃতি রাইয়ৎরা লাঠী-সোটা বল্লম-নিশান নিয়ে, ডঙ্কা বাজিয়ে, তাঁকে নিয়ে গেল। পীরস্থানে দাঁড়িয়ে ছোট-রাজাবাবু প্রজাদের এক বছরের খাজনা মাপ করলেন।

দেওয়ানজী এই খাজনা-মাপের কথা মহারাজকে জানিয়ে বললেন, "এ-রকম করলেও জমীদারী রাখা দুষ্কর হবে।"

মহারাজ বললেন, "দেওয়ানজী, কুমার বাহাদুর যখন কথা দিয়ে এসেছেন, তখন এবার মাপ করতেই হবে।"

আলাপ হচ্ছে, এমন সময়ে রণজিৎ সেখানে এল। দেওয়ানজী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "মহাশয়, কি ফকীর-কোটের খাজনা মাপ ক'রে এসেছেন নাকি? ও-তালুকের প্রজারা অত্যন্ত বেল্লিক, এতটা দয়ার অযোগ্য।"

রণজিৎ উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ মহাশয়, দিয়েছি। এই আমার প্রথম ও শেষ ফকীরকোটে পদার্পণ। প্রজারা একটু আনন্দ করবে না? টাকাটা কিন্তু আমার তহবিল থেকে দিয়ে দেবেন।"

এই দেওয়ানজী মহাশয়ের বিষয় একটু বলা দরকার। এঁর নাম শঙ্করনাথ চক্রবর্ত্তী। বাড়ী বারাণসী। গোঁড়া হিন্দু। সমরজিৎ যখন নাবালক ছিলেন, তখন চক্রবর্ত্তী তাঁর মাষ্টার ছিলেন। অসাধারণ বুদ্ধিমান লোক। ছাত্রকে সহজেই মুঠোর ভেতর পুরেছিলেন। গদীতে ব'সে মহারাজ এঁকে মন্ত্রীপদে বাহাল করেন। রণজিৎ কিন্তু লোকটাকে মোটে দেখতে পারত না। দাদাকে বলেছিলেন, "আমায় বল না, একজন সভ্য-ভব্য একেলে গোছের দেওয়ান জোগাড় ক'রে এনে দিচ্ছি। ও-রকম টিকিওয়ালা ফোঁটাকাটা ব্যাপারের উপর আমার বিশ্বাস নেই।"

সমরজিৎ হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, "একেলে হ্যাট-কোট-পরা লোক হলেই বুঝি চোর গাঁঠ-কাটা হয় না? ও-সব তোদের কলকাতার বাবুদের কুসংস্কার।"

দেওয়ানজী পয়সা-কড়ি সম্বন্ধে সাধুপুরুষ ছিলেন না, তা বলা যায় না। কেন না, ধরা এখনও পড়েন নি। কিন্তু তাঁর প্রজাপালন সম্বন্ধে ধারণা উৎকৃট রকমের ছিল। ক্রমাগত ব'লে ব'লে রাজার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন—ও ছোটলোক ব্যাটাদের প্রশ্রয় দেওয়া কিছু নয়, বিশেষ ক'রে যারা মুসলমান, ওদের নাই দিলেই মাথায় চড়ে। কৃতজ্ঞতার লেশমাত্র ওদের অন্তরে নেই। আগে সস্তা-গণ্ডার দিনে প্রজাদের দেওয়া-থোওয়া চলত। এখন জমীদারের নিজেরই পয়সার টানাটানি, বেশী আমীরী

চাল দেখাতে গেলে এষ্টেট্ লাটে উঠবে। এই অমুক বাবুদের দেখুন না, কি হল। মূর্খের মত দু'হাতে টাকা ছড়িয়ে বৃন্দাবনবাসী হয়েছেন।

দেওয়ানজী যে শুধু ফোঁটাকাটার বিষয়ে গোঁড়া হিন্দু ছিলেন তা নয়। তাঁর মতে, হিন্দু-জাতটার হক্ যাতে মারা না যায়, সে বিষয়ে আজ সকল হিন্দুকে সজাগ থাকতে হবে। কংগ্রেস করার দরুণ হিন্দু ত সরকারের চক্ষুঃশূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। খৃষ্টান, পার্শী, ইহুদী, মুসলমান সবাই এই সুযোগে সাহেবদের খোসামদ ক'রে নিজের সুবিধা করে' নিচ্ছে। হিন্দু চুপ ক'রে থাকলে তার প্রাপ্য তামাদী হয়ে যাবে। তাই তারও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে চেঁচিয়ে বলা দরকার, "আমরাও কংগ্রেসের লোক নই।" এই কোরাস্ চীৎকার করার উদ্দেশ্যে শক্তিকোট জেলায় এক হিন্দুসভার পত্তন হয়েছে। দেওয়ানজী সমরজিৎকে ধ'রে সেই সভার অধ্যক্ষ করেছেন।

সমরজিৎ হিন্দুর দলপতি হওয়ার নানা কারণে অনুপযুক্ত। খাওয়া-দাওয়ার বাছবিচার কিছু নেই। কাপড়চোপড়ও ওয়ার্ড-ইস্কুলে থাকার সময় হতে ইংরেজী কায়দার হয়ে গেছে। রাণীও এসেছেন সাহেবীভাবাপন্ন ঘর থেকে। হাল ফেসানের পোষাক পরেন। দার্জ্জিলিং, রাঁচী, শিলঙ্গ গেলে রঙ্‌বেরঙের ছাতা মাথায় দিয়ে হেঁটে বেড়ান। অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে খানাপিনা না করলেও, মেয়েদের চা-পার্টি ইত্যাদিতে খুব যাওয়া-আসা করেন। এ অবস্থায় টিকি-সম্প্রদায়ের নেতা হওয়ার যোগ্যতা রাজার কোথায়? তবে সমরজিৎ বুদ্ধিমান্ লোক, হিন্দুসভার অধ্যক্ষ হলে সরকারী আমলারা তাঁকে কংগ্রেসওলা বলে' কিছুতেই ভুল করবেন না। তাতে অনেক লাভ। মহরম ইত্যাদি বন্ধ ক'রে দিলে, খরচও অনেক বাঁচবে। মুসলমান প্রজাদের একতা সব চেয়ে বেশী, সেই জন্য তারা জমীদারকে অনেক কষ্ট দেয়। রাজা হিন্দুসভার কর্ত্তা হলে, হিন্দু-প্রজাদের সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে মুসলমানদের দাবিয়ে রাখ্‌তে পারবে। এই সব অনেক কথা বিবেচনা করে' সমরজিৎ দেওয়ানজীর কথায় সায় দিয়ে, শক্তিকোটের হিন্দু-সংগঠনের পাণ্ডা হয়েছিলেন।

রণজিৎ এ-বিষয়েও দাদাকে অনেক সাবধান করে' দিয়েছিল, মনে করে' দিয়েছিল, যে শক্তিকোটের ইজ্জৎ চিরদিন এই মুসলমান প্রজারা রক্ষা ক'রে এসেছে। মুসলমানদিগকে ত্যাগ করলে তাদের লাঠীধরার লোক মেলা শক্ত হবে। কেন না, এ অঞ্চলে বাগ্দী-চাঁড়ালের বাস খুব কম। তার উপর সব চেয়ে বড় কথা, মহতাব রায়ের দলিল তাদের বংশের ইতিহাস। সেটা ভুললে চলবে না। সমর ছোট ভাইয়ের পরামর্শ মনোযোগ দিয়ে সব শুনেছিলেন। শুনেছিলেন মাত্র, ফল কিছু হয় নি। তাই, কলকাতা যাওয়ার আগে রণজিৎ খুব গম্ভীর হয়ে রাজারাণীকে বলে' গেল, "তোমাদের যা মন চায় কর, কিন্তু আমার ভাইপোকে মানুষ করব আমি। তোমাদের হাতে দেব না। এ-কথা ভুলো না।"

কলকাতা ফেরবার আগে রণজিৎ একটা ছেলে-মানুষী করে' দেওয়ানজীকে আরও চটিয়ে দিয়ে গেল। রাজা সন্ধ্যাবেলা দেওয়ান ও অন্য দু'জন আমলাকে খেতে বলেছিলেন। পাঁচজনের ঠাঁই করা হয়েছে এক পঙ্‌ক্তিতে। বসবার সময়ে দেওয়ানজী একটু ইতস্ততঃ করছেন দেখে রণজিৎ বললে, "মহারাজ, একি করেছেন! দেওয়ানজী মহাশয়ের পাতাটা একটু ঘুরিয়ে দিতে বলুন। তিরিশ ডিগ্রী ঘোরালেই জাত বাঁচবে ত, মশায়?"

পাতা ঘোরান হলে সবাই বসলেন। খানিকক্ষণ পরে ছোটরাজা ঈষৎ হেসে টিপ্পনী করিলেন, "দেওয়ানজীর জাতটা কিন্তু রইল না। আমরা ত যবনান্নে পরিপুষ্ট! কলকাতার বাসায় মগ বাবুর্চ্চি রাঁধে। আমাদের সঙ্গে ব'সে খেলেন, মশায়! দাদা, তোমার বাবুর্চ্চি এখনও আছে, না হিন্দু-সভার তাড়নায় ভাগিয়ে দিয়েছ?"

রাজা হাসি চাপতে পারছিলেন না। যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে বললেন, "ছিঃ রণজিৎ, চুপ করে' খাও।"

পরদিন ছোটরাজা দাদা-বৌদির পায়ের ধূলো নিয়ে রওনা হলেন।

অগস্ত্য-যাত্রা!

(ক্রমশঃ)

সুন্দরবনে পল্লী-সৃষ্টি

শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত

বাংলার চারিদিকে পল্লী-সংস্কারের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। জাতির জীবন নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা জাগিয়াছে, চেষ্টাও কিছু কিছু স্থানে স্থানে দেখা দিয়াছে। শিক্ষা, সমাজ, অর্থনীতি সর্ব্বক্ষেত্রেই এই সংগঠনের প্রেরণা দিন দিন পরিস্ফুট হইতেছে। পল্লী-সংস্কার ও পল্লীসংগঠন ইহারই অন্যতম অভিব্যক্তি।

ইহা যে শুভ-লক্ষণ, তাহা বলাই বাহুল্য। বাঁচিবার তাগিদ যখন কোন জাতির আসে, তখন তাহার সম্মুখে যত বাধা অন্তরায়ই থাকুক না কেন, নৈরাশ্য ও অবসাদের জমাট-বাঁধা অন্ধকার-স্তূপ বিদীর্ণ করিয়া নূতন গতির ছন্দ আবিষ্কার করিয়া লইতে হয়। বাঁচার মত বাঁচিতে ভুলিয়াছি বলিয়াই তো আমরা পরমুখাপেক্ষী, পরাধীন; পৃথিবীতে যারা বাঁচিতে জানে তাদের কনুইয়ের ঠেলায় আমরা দিন দিন কোণ-ঠাসা হইয়া পড়িতেছি, জীবন-সংগ্রামে আমরা ক্রমশঃই হঠিতেছি। এই অবস্থার প্রতিকার—আবার বাঁচার ইচ্ছা লইয়া জাগা, বাঁচার মন্ত্রেই জাতির জীবন উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা, মানুষের মতই মাথা উঁচু করিয়া বাঁচা। মরা জাতির প্রাণে সত্যই বাঁচার অনুপ্রেরণা যদি জাগিয়া থাকে, তার সে জাগরণ আর বারণ মানিবে না! এই জাগরণের সাধনাই আমাদের মুক্তির সিংহদ্বারে পৌছাইয়া দিবে।

বাঁচিতে চাহি জাতি-রূপে। 'সমষ্টিত্ব' একটা তত্ত্ব। সঙ্ঘ-শক্তি এই তত্ত্বেরই বীর্য্য। খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত বাঙ্গালীর জীবনে একটা সত্য সমষ্টি সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারিলে, জাতির আত্মপ্রকাশ একদিন হইবেই। এ সমষ্টি কোনও আদর্শ বিশেষ লইয়া সৃষ্ট হইবার নয়, 'প্ল্যান, স্কীম' অর্থাৎ ছক বাঁধিয়া এরূপ সংহতি জীবন্ত ভাবে গড়িয়া তোলা যায় না; সমষ্টির প্রকাশ আপনার লয়ে। ব্যক্তিগত অহং-কামনা কোনও তত্ত্ব-বস্তুতে সংযুক্ত ও প্রলীন হইলেই প্রকৃত সমষ্টি-শক্তি অভ্যুত্থিত হয়। সঙ্ঘ-সাধনার মধ্য দিয়া জাতি-নির্ম্মাণের ইহাই নির্দ্দিষ্ট ধারা, অনায়াসে বলা যাইতে পারে।

যে সঙ্ঘ-সাধনা এখনও ব্যাপক ভাবে সর্ব্বদা সুপরিস্ফুট হইয়াছে, ইহা নহে। সমষ্টি-জীবনের একটা আকাঙ্ক্ষা মাত্র কোথাও কোথাও জাগিয়াছে—এই আকাঙ্ক্ষা খুব অপরিণত, প্রাথমিক স্তরের। রাজনীতি-ক্ষেত্রে এই আকাঙ্ক্ষা প্রবল মূর্ত্তি লইয়া একটা প্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার পরিচয় এই কয় বৎসরের রাষ্ট্রেতিহাসে পরিদৃষ্ট হয়। সে প্রবাহের গতি আজ স্তিমিত, স্তম্ভিত—ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। জাতির বুকে বেদনার অভিঘাতে কতটুকু শক্তি-স্পন্দন জাগিয়াছে, ইহা হইতে তাহাই পরিমাপ করিয়া লইতে পারি। আজ জাতির সত্তা একটা নূতন আত্মপরিচয়ের প্রণালী খুঁজিতেছে—সেই প্রণালীই গঠন-সাধনা। অবনত জাতির জীবনে ইহা অভিনব প্রণালী হইলেও অবৈজ্ঞানিক নয়।

"প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের" জীবনে এমনই একটা অভিনব প্রেরণার ধারা আকার লইয়াছে—বিচিত্র সৃষ্টি-সাধনায়। সঙ্ঘের তত্ত্ব ও বীর্য্যের কথা বিশেষ ভাবে আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। জাতি-রূপে বাঁচিবার সাধনাই সঙ্ঘ-জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য, এ-কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন। জাতি অর্থে জনতা নহে, একটা সংখ্যার রাশি নহে, অখণ্ড জীবন-বিগ্রহ। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ তিল তিল প্রাণ ও শ্রম ঢালিয়া এই প্রেম ও ঐক্যের বিগ্রহ-রচনায় দীর্ঘ দিন তপঃরত। সেই যুগাধিক কালের তপস্যায় একটা নূতন সৃষ্টির অঙ্কুর যদি দেশে দেখা দিয়ে থাকে, তাহার জন্য ধন্যবাদ দিই ভগবানকেই, যিনি পঙ্কে কমল-কলি ফুটাইয়া তুলেন, মরুর বুকে উৎসারিত করেন সবুজের ফল্গুপ্রবাহ। প্রচলিত রাষ্ট্র-নীতির বাহিরেও যে একটা জাতির সংগঠন ও কর্ম্ম-নীতি আছে, ইহারই প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ"। এই পথেও জাতি সুসংহত ও জীবন-ধর্ম্মে শক্তিমান্

হইয়া উঠিতে পারে এবং এইরূপে দৃঢ়পদে স্বাধিকার লক্ষ্যে অগ্রসর হইবারও সামর্থ্য অর্জ্জন করে।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে এই গঠনের বীজ বুকে লইয়া একদল তরুণ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, তাহাদের প্রথম উদ্দেশ্যই হইল—স্বাবলম্বনের ভিত্তির উপর একটা নূতন ধরণের অর্থনৈতিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। ইহার জন্য মাত্র ঈশ্বর-প্রেরণার উপর অটুট প্রত্যয় স্থাপন করিয়া যে লক্ষ টাকার বিপুল ঋণ-ভার সঙ্ঘের স্কন্ধে আসিয়া পড়ে, তাহার কথা নানা সুযোগে দেশবাসী অবগত আছেন, সুতরাং সে কথার পুনরুল্লেখ এখানে করিব না। এই ঋণের অর্থে যে সকল দায়িত্ব-মূলক কর্ম্ম-সূচনা হয়, তন্মধ্যে সুন্দরবনের কৃষি-প্রতিষ্ঠান অন্যতম। আমরা সঙ্ঘ-জীবনের তথা জাতীয় অভাব-পূরণের প্রয়াস লইয়া এই কার্য্যে অবতরণ করি। সঙ্ঘের বহিঃ-সমস্যা—অন্নের ও বস্ত্রের। সঙ্ঘের মূলকেন্দ্রে বস্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠান সূচিত করিয়া অতঃপর অন্নপূর্ণার দেউল-রচনায় আমরা উদ্যত হই। এই উদ্যমেরই ফলে, বিস্তৃত কৃষি-ক্ষেত্রোপযোগী ভূমির অন্বেষণে দুর্গম জঙ্গলাকীর্ণ সিন্ধুকূলে অভিযান করা হইয়াছিল। এত রাজ্যের সস্তা ও সুবিধাজনক আবাদী জমি থাকিতে কেন এই দুরধিগম্য বনভূমিতে গিয়াই ভূখণ্ড ক্রয় করা হইল, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আমাদের নিজেদের পক্ষে এক অপরিজ্ঞেয় তৃতীয় শক্তির অবধারিত অনুগমন করা ছাড়া অন্য কোনও উপায়ই যে ছিল না, ইহাই মাত্র বলিতে হয়। মহাকালী চিরদিন দুর্গমেরই ডাক আমাদিগকে দিয়াছেন; তাঁহার এই অলক্ষ্য হাত-ছানি নিরঙ্কুশ চিত্তে অনুসরণ করিব, এই সঙ্কল্পটুকু গোড়ায় স্থির করিয়াই আমাদের জীবন আরম্ভ করা হইয়াছে, ইহা বলিলে বোধ হয় মিথ্যা কথা বলা হইবে না। এই আনুগত্যের বীর্য্য ব্যতীত, অবনত জাতির জীবনে গতানুগতিক পদ-চিহ্ন ছাড়িয়া নূতন সৃষ্টির ভিত্তিপাত কোনও মানুষের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত নহে, ইহা আমাদের চিরদিনেরই সিদ্ধান্ত; অভিজ্ঞতায় এই ধারণাই দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়াছে। সৃষ্টি-যজ্ঞ যে প্রলয়-যজ্ঞের চেয়ে কোনও অংশে কম adventurous ও romantic নয়, তাহার প্রমাণ পদে পদে মিলিয়াছে। 'দুর্গং পথস্তৎ'—এই বেদমন্ত্র না হইলে উচ্চারিত হইবে কেন?

ফ্রেজারগঞ্জ সুন্দরবন মহারণ্যের শেষ প্রান্ত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহার তিন দিকেই মহাসমুদ্র—ইংরাজীতে যাহাকে High sea বলা হয়। চির গর্জ্জন-মুখর বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গ-চুম্বিত এই তটভূমি প্রকৃতির বিশিষ্ট লীলা-নিকেতন, ইহা গৌরবের সহিতই বলা চলে। আর একদিকে—বঙ্গ-জননীর শ্যামাঞ্চল-ঢাকা অপরূপ বনস্থলী। ইহারই একাংশ লক্ষ্মীপুর গ্রাম। এই লক্ষ্মীপুর উদীয়মান যুগশক্তিরই একটা নবাবিষ্কার বলিতে পারি না কি!
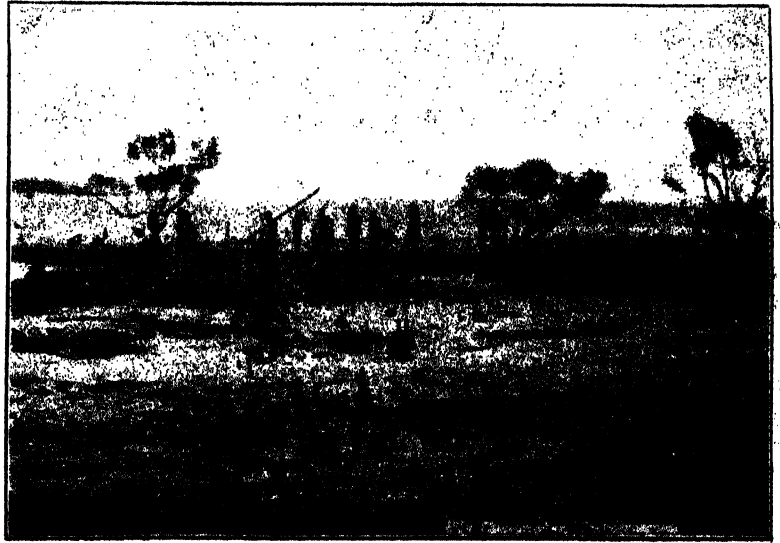
চির-গর্জ্জনমুখর বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গ-চুম্বিত তটভূমির দৃশ্য

গোসাবার স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টনেরও বহু পূর্ব্বে, মিঃ স্যাণ্ডার্স ন সর্ব্বপ্রথম এইখানে অভিযান করিয়াছিলেন, তাহার স্মৃতি-চিহ্ন ভগ্নকীর্ত্তি রূপে এখনও এখানে দৃষ্টি-

গোচর হয়। তিনিই বোধ হয় তদানীন্তন বাংলার লাট স্যার এণ্ড্রু ফেজারের নামে এই অঞ্চলের ফ্রেজারগঞ্জ নামকরণ করিয়া বনভূমি কাটাইতে আরম্ভ করেন। কিন্তু রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও তিনি এখানে প্রজা আনাইয়া, লোকের বসতি করাইয়া, জীবিকাক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই; তাই ব্যর্থমনোরথ হইয়াই পরিশেষে এ স্বপ্ন পরিত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। আজ বিধাতার বিধানে সেই অসমাপ্ত অভিযানের সমাপ্তি-ভার এই রিক্ত, নিঃস্ব, সর্ব্বত্যাগী তরুণ জাতির উপর আসিয়া পড়িয়াছে, ইহা ভাবিতেও চমক লাগে! অঘটনঘটনপটীয়সী মায়েরই ইহা এক আশ্চর্য্য লীলা-ভঙ্গী ছাড়া আর কি?

সুন্দরবনে কৃষি-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার আশু পরিকল্পনা লইয়াই আমরা প্রথম অভিযান করিলেও, ইহার মূলে ছিল বৃহত্তর সৃষ্টিরই অনুপ্রেরণা। সে অনুপ্রেরণা আজও সম্পূর্ণ মূর্ত্তি লয় নাই বটে; কিন্তু ভূমিকা প্রস্তুত হইয়াছে। আজ এই বিজন সিন্ধু-তটে, নির্ম্মাণ-সাধনার যে শুভ-চিত্র ফুটিয়াছে—ইহা যেন সত্য সত্যই মরুভূমির বুকে নির্ঝরিণীর স্বপ্ন ফলিয়াছে। দেখিলে আর সন্দেহ থাকে না—জাতি-গঠনের কোন্ সূত্র ধরিয়া আমাদের চলিতে হইবে। একটা অসাধ্য সাধন করার তপস্যা ছাড়া এপতিত দেশ, জাতি কখনও আবার নিজের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও আত্মমর্য্যাদা লইয়া মাথা তুলিতে পারে!

সুন্দরবনে এই ১৪ বৎসরে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ কি করিয়াছে তাহার একটা ইতিবৃত্ত এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—এ ইতিবৃত্ত উপন্যাসেরই ন্যায় রোমাঞ্চকর; না বলিলে, এই সৃষ্টি-সাধনার মর্ম্ম ঠিক বুঝাইতে পারিব না। "যখন সুন্দরবনে কর্ম্মিবৃন্দ প্রথম উপনীত হয়, তখন আশ্রয় ছিল না বলিলেই হয়। ভগ্নপ্রায় ক্ষুদ্র একটী কুটীরে একজন স্থানীয় শিকারী বাস করিত, কর্ম্মীরা সেইখানেই গিয়া বাসা বাঁধে। রাত্রে ব্যাঘ্রের ভয়, সুবিধা পাইলে কুম্ভীর তীরে উঠিয়া মানুষকে আক্রমণ করে, বুনো লোনা হাওয়ায় শরীর অসুস্থ হয়। সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিবার শক্তি যিনি দিয়াছেন তিনিই যে আমাদের নেতা, পথপ্রদর্শক, অচিন্তনীয় বাধার সমুদ্রে সেই কথাই আরও ভাল করিয়া আমরা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি।

আমাদের জমী হইতে বাজার ২০ মাইল দূরে, স্থানটীর নাম নামখানা। খালের উপর দিয়া রাস্তা, ইহার মধ্যে তিন বার নদী পার হইতে হয়। বর্ষাকালে পথ বন্ধ; সুতরাং আহার্য্য দ্রব্যের যে কি অভাব, তাহা সহজেই অনুমেয়। গ্রামে সপ্তাহে একদিন হাট বসে; সেখানে পাওয়া যায় লবণ, তেঁতুল, সুপারী প্রভৃতি খুচরা জিনিষ—খালে জাল দিয়া মাছ ধরা, আর ক্ষেতের ধান কুটিয়া চাউলের ভাত—তবে এক্ষণে গাভীপালনে দুগ্ধের ব্যবস্থা হওয়ায় কর্ম্মীদের কিছু সুবিধা হইয়াছে।

সুন্দরবনে প্রথম দুই বৎসর দিনের বেলায় মশারী না ফেলিয়া স্থির হইয়া বসিয়া থাকারও উপায় ছিল না। মশাগুলির আকারও বড়, হুলও লম্বা—একবার অঙ্গে বিঁধিলে আধ ঘণ্টা জালা থামে না। সুন্দরবনে জমী প্রস্তুত করিতেও আমাদের প্রাণান্ত পরিশ্রম হইয়াছে। বটগাছ কাটিয়া শিকড় উপড়াইয়া, লোণা জল ঢুকিবার পথে বাঁধ দিয়া জমীকে কৃষির উপযোগী করিতে অকাতর শ্রমের সঙ্গে ২০,০০০৲ টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে।...... ছিল যেখানে অরণ্য, বাদা লোণা জলের বিষাক্ত খাদ—আজ সেখানে গড়িয়া উঠিয়াছে বিপুল ধান্য-ক্ষেত্র, গোলাও বিস্তৃত বসত-বাটী। বালুর বুক চিরিয়া সুপেয় জলের পুষ্করিণী, প্রায় চল্লিশটী গাই ও বলদ, ধেনো জমীর সহিত সমুদ্র-তটে বাঁধ দিয়া ঘেরা 'বালুয়ারী' নামক বৃহৎ বাগান, সারি সারি নারিকেলের ঝাড়—কবির মানস-স্বপ্ন যেন রূপ ধরিয়াই এখানে চক্ষের সম্মুখে আঁকিয়া উঠে—

> "দূরাদয়শ্চক্রে নভশ্চ তন্বী
> তমালতালী বনরাজীনীলা।
> আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে-
> র্ধারা নিবদ্ধেব কলঙ্ক-রেখা।'

—এই ইতিহাসটুকুও এখন হইতে আট বৎসর আগের কার্য্যবিবরণী হইতে সঙ্কলিত। আজ চতুর্দ্দশ বৎসর পরে, সুন্দরবনে গিয়া সৃষ্টির আরও বিকশিত গৌরব-চিত্র প্রত্যক্ষ করিলে সত্যই আনন্দে, মহিমায়, বিস্ময়ে

আমাদেরও বিহ্বল হইয়া পড়িতে হয়! এ যে সৃষ্টি-লক্ষ্মীরই আশীষ-মূর্ত্তি!

(২)

কত কর্ম্মী আসিয়াছে, গিয়াছে—সঙ্ঘের সৃষ্টি-সাধনা কোনও মানুষের উপর নির্ভর করিয়া স্থির হয় নাই। সঙ্ঘ-বীর্য্য যেখানে যতটুকু আশ্রয় পাইয়াছে, তাহারই উপর ভর করিয়া আগাইয়া চলিয়াছে—কাহারও মুখ চাহিয়া প্রতীক্ষা করে নাই। সুন্দরবনের এই লক্ষ্মীপুর অঞ্চলে আজ ধীরে ধীরে লোক-সমাগম হইয়াছে, ঘন বসতিও হইতেছে। সমগ্র ফ্রেজারগঞ্জের আজ জনসংখ্যা প্রায় ২৬ হাজার, ক্রমে আরও বাড়িবে। আমাদের ক্ষুদ্র লক্ষ্মীপুর গ্রামেরই আজ লোক-সংখ্যা প্রায় ৮০০। ইহারা অধিকাংশই কাঁথি, মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণার লোক—জীবিকার উপায় বা অন্যান্য বিভিন্ন হেতুর আকর্ষণে এখানে আসিয়া উপনিবেশন স্থাপন করিয়াছে। আজ আমাদেরই সঙ্ঘ-বাটী সমুদ্র-সৈকত হইতে পল্লীর প্রায় মধ্যকেন্দ্রে উঠিয়া আসিয়াছে। জলের ঢেউ আর কুটীরপ্রাঙ্গণ ভাসাইয়া দেয় না। সন্ধ্যা হইতেই যে পথ দিয়া স্বচ্ছন্দে বন্য শ্বাপদ আনাগোনা করিত, গোয়াল হইতে গরু টানিয়া লইয়া যাইত, সেখানে নির্ভয়ে মানুষ রাত্রেও আজ চলা-ফেরা করে, ব্যাঘ্রের পদ-চিহ্নও আর বড় সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অনেক চেষ্টার পর, বকখালির কালা-জঙ্গলের ধারে গিয়া বালুর উপর যে বিপুল পদাঙ্ক খুঁজিয়া পাইলাম, তাহা স্থানীয় কেহ কেহ বাঘের থাবা বলিয়া পরিচয় করাইলেন বটে, কিন্তু কেহ আবার তাঁহাদের কথায় অনুমোদন করিলেন না। মানুষের সৃজনপ্রেরণা স্বীয় অধিকারের রাজ্য বিস্তার করিতে করিতে যতই আগাইয়া চলিয়াছে, সেই কালা-জঙ্গলের সীমা-রেখা ক্রমে ততই সরিয়া যাইতেছে। তবুও এখনও আমাদের পল্লী-ক্ষেত্রের ক্রোশ মাত্র দূরে এই বাণী ও গরাণ গাছের যে গভীর অরণ্য-কান্তার বহু যোজন যোজন দূর পর্য্যন্ত বিছাইয়া রহিয়াছে, তাহা ভেদ করিতে অতি বড় দুঃসাহসিক শীকারীরও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সুন্দরবনে সমুদ্র ও অরণ্য-শোভা-সম্পদ্ দিন দিন রূপান্তরিত হইতেছে, ইহা অবশ্য দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু তুলনায় তবুও মনে হয়, মানুষের শক্তি ও সাধনা এখানে খুবই অকিঞ্চিৎকর।

শস্য-সঞ্চয়

বঙ্গোপসাগর গ্রাস করিবার পূর্ব্বে এখানে যে এক সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল, এমন অনুমান করা দুষ্কল্পনা নহে; কেন না, কালা-জঙ্গলের ভিতর এখনও যে ভগ্ন অট্টালিকার চিহ্ন কোথাও কোথাও পাওয়া গিয়াছে, শীকারিগণের মুখে তাহার সাক্ষ্য মিলে। 'গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র বাংলাকে গড়ে নাই, ভাঙ্গিয়াছে—এই অনুমানই সত্য মনে হয়। সে প্রত্নতত্ত্ববিদের প্রশ্ন তাঁহাদিগেরই জন্য তুলিয়া রাখিয়া, আমরা দেখিতেছি, একটা লুপ্ত অথবা নবীন জনপদ ধীরে ধীরে সাগর বা বন-গর্ভ হইতে জাগিয়া

উঠিতেছে—এখানে চলিয়াছে একটা নব সৃষ্টিরই ধীর মন্থর তপস্যা। এখানে উলঙ্গ প্রকৃতির কোলে বাংলার একমুঠা মনুষ্যত্ব আছাড় খাইয়া পড়িয়াছে, যাহাদের কেন্দ্র করিয়া একটা নূতন জাতিরই সংখ্যা-বৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব নয়। এখানে জীবিকার অন্বেষণে, কিম্বা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নানাবিধ প্রকৃতির তাড়নায় যে সব নরনারী আসিয়া জুটিয়াছে, তাহাদের স্বভাব-চরিত্র যে বিশুদ্ধ নয়, তাহা তাহাদের চোখমুখ দেখিলেই বুঝা যায়, ইতিহাস শুনিলে আরও স্পষ্ট হয়; কিন্তু ইউরোপের ইতিবৃত্তে, বর্ত্তমান বীর জাতিগুলির সৃষ্টি ও অভ্যুত্থান ইহার চেয়ে বিশুদ্ধতর উপাদান লইয়া যে হয় নাই, তাহা ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই জানেন—কাজেই শিক্ষায় ও সাধনায় এই সকল ঔপনিবেশিকগণের ভবিষ্য সন্তানসন্ততিদের মার্জ্জিত ও উন্নত করিয়া লইতে পারিলে, জাতি-সৃষ্টির উপাদানে তাহারা পরিণত হইতে পারে, ইহা অপসিদ্ধান্ত নহে। ডেন্‌স্‌, ডাচ, ইংরাজ, ফরাসী, জর্ম্মাণ, আমেরিকান—পাশ্চাত্যের কোন জাতি পাঁচ শত বা হাজার বৎসর পূর্ব্বের বনচারী উলঙ্গ বর্ব্বর বা সমুদ্রচারী দুর্দ্দান্ত জলদস্যু হইতে রক্তধারা ধমনীতে টানিয়াও আজ শিক্ষা ও সাধনার উৎকর্ষে সভ্যতার চূড়ান্ত শিখরে আরোহণ করে নাই? সুন্দরবনের ২৬ হাজার নরনারীর হৃদয়ে বিশুদ্ধতর ধর্ম্মবীজ সঞ্চারিত করিয়া যদি তাহাদিগকে একবার এই আত্মোৎকর্ষের অনুপ্রেরণায় প্রবুদ্ধ ও সংহত করিয়া তোলা যায়, তবে তাহারা উদীয়মান নব জাতির শক্তি-বৃদ্ধি করিবে না কেন?

কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া যেমন সাপ বাহির হয়, তেমনি কৃষির সাহায্যে অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে গিয়া সঙ্ঘের সম্মুখে আজ এই বিপুল সম্ভাবনাই দেখা দিয়াছে। স্বীয় শিক্ষা ও অর্থনীতির অনুবর্ত্তন করিতে করিতেই বিরাট্ জাতি প্রাণের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয়ে আসা—শুধু পরিচয় নয়, এই একই শক্তি-কেন্দ্রে জাতি আজ সন্নিবদ্ধ হইতে কতখানি আকুল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এবার সুন্দরবনে সঙ্ঘ-দেবতার সহিত পরিদর্শনের সুযোগ পাইয়া গিয়াছিলাম বলিয়া অনেকখানি বুঝিতে পারিলাম। ইহাদের এই অন্তর্নিহিত পিপাসা চরিতার্থ করার যোগ্য ব্যবস্থা ও আয়োজন করা—সেও যে কতখানি দুঃসাধ্য তপস্যা-সাপেক্ষ, তাহা আজ ভাল করিয়াই বুঝিতেছি। সঙ্ঘ সে দায়-ভার-বহনে সমধিক যোগ্যতা অর্জ্জন করুক, ইহা সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা।

(৩)

'সুন্দরবনে পল্লী-সৃষ্টি' এই নাম প্রবন্ধের শীর্ষে ইচ্ছা করিয়াই দিয়াছি। কেন না, এখানে তথাকথিত পল্লী-সংস্কার বা পল্লীসংগঠন নয়, একটা সৃষ্টিরই যথার্থ উদ্যম চলিয়াছে। ক্ষেত্র, মানুষ, মন—সবই এখানে উপাদান রূপে ছড়াইয়া আছে, প্রয়োজন সৃজনেরই প্রতিভা ও শক্তি-প্রেরণা। ক্ষেত্রের জন্য আমরা স্বর্গীয় মহারাজা, কাশিম-বাজারের হৃদয়বান্ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও তাঁহার বর্ত্তমান সুযোগ্য উত্তরাধিকারী মহারাজা শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী মহোদয়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। তাঁহারা যথাযোগ্য মূল্যে এই দুর্গম ক্ষেত্রটুকু শুধু আমাদিগকে 'লীজ' দিয়াছেন বলিয়া এই কৃতজ্ঞতা নহে, পরন্তু তাঁহাদের রাজ-ষ্টেট হইতে আমরা গোড়া হইতেই সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য পাইয়াছি; এখনও নিতান্ত আত্মীয়েরই মত বর্ত্তমান নায়েব, আমাদের পরম হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় আমাদের স্নেহ ও প্রীতির চক্ষে দেখেন ও এই কঠিন ব্রতের সাফল্যকামনায় নিরন্তর উৎসাহিত করিয়া থাকেন। ইহাদের সকলেরই আন্তরিক আনুকূল্য না পাইলে আমাদের সাধনা আরও কঠিন ও বিঘ্ন-পূর্ণ হইয়া উঠিত, ইহাতে সন্দেহ নাই; এতৎ কারণে রাজ-ষ্টেট চিরদিনই সঙ্ঘের ধন্যবাদার্হ।

তারপর, মানুষ ও মনের কথা। সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়া গিয়াছেন—

> "মন তুমি কৃষি-কাজ জান না—
> এমন মানব-জমী রইল পতিত,
> আবাদ করলে ফল্‌ত সোণা।"

—কবির গান আমাদের কাছে আজ বর্ণে বর্ণে মর্ম্ম-পূর্ণ হইয়া তাগিদ দিতেছে—"আবাদ করলেই ফল্‌বে সোণা।" এই সোণা ফলাইয়া উঠা যদি কোনদিন সত্যই সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাহার পরিচয় লইয়া আর একদিন বাংলার

পাঠক-সমাজের নিকট দাঁড়াইব; আজ সুন্দরবনের পরিদর্শন-লব্ধ আর দুই একটী অভিজ্ঞতার কথা এখানে বলিয়া, দীর্ঘ প্রবন্ধ সমাপ্ত করি।

জাতির বড় অভাব—শিক্ষা ও অন্নের। ফ্রেজারগঞ্জের সহস্র সহস্র প্রজা স্বতঃ-প্রবৃত্ত বিপুল সভায় সম্মিলিত হইয়া আকুল কণ্ঠে যে নিবেদন জানাইল, তাহার মূল মর্ম্ম ইহাই। এই কথাই তাহারা ব্যক্ত করিল কথায়, কবিতায়, গানে—প্রাণের কাকলি যেন সহস্র ভাবে, ছন্দে, সুরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল—বসন্ত-সমাগম-পুলকিত মুখর বনস্থলীর মত এই নিরক্ষর শুষ্ক পল্লী-অঞ্চল যেন সহসা তাহার প্রাণের অন্তর্নিহিত অন্তহীন অভাবের বাণী উজাড় করিয়া অর্ঘ্য রূপে নিবেদন করিল। সত্যই এই মর্ম্ম-বেদনা প্রাণের গভীরতর তন্ত্রীতে যে ছোঁয়া দেয়, তাহা দেশের গণাত্মারই সজীব স্পন্দন—এ অনুভব মিলাইবার নহে।

আমরা সহরে সাহিত্যেরই সহিত আজ সুপরিচিত; কিন্তু বাংলার সহজ, সরল, পল্লী-সাহিত্যের মুক্ত নির্ঝর, নির্ম্মল অনাবিল প্রাণ-ধারা শুধু অতীতের পুরাতত্ত্বের সামগ্রী নয়,—এ উৎস এখনও শুকায় নাই, এখনও উৎসাহ পাইলে, নেতৃত্ব পাইলে এই প্রাণোৎস হইতে অফুরন্ত ভাব-ভাষা-নির্ঝরিণী নিঃসৃত হইয়া অমৃত-প্রবাহিনী সৃষ্টি করিতে পারে—বঙ্গ-সাহিত্যে একটা নব প্রাণের জোয়ার আনিয়া দিতে পারে। ইহাও পল্লী-সৃষ্টির এক অঙ্গ—উপাদেয়, প্রয়োজনীয় অঙ্গ। এ অঙ্গ উপেক্ষা না করিয়া সমাদর করিলে, আমাদের জাতীয় জীবন ও সাহিত্য যুগের কৃত্রিমতা ও সভ্যতার দৈন্য হইতেই মুক্ত হইবে।

সুন্দরবনের এই ভাঙ্গা-ভাঙ্গা সুরে ছন্দে গণ-শিশুর অর্দ্ধস্ফুট আকৃতির মত গান ও কবিতার দুই একটী নমুনা পাঠকবর্গকে সন্তর্পণে উপহার দিতেছি।

ঈশ্বর-প্রেমের যাচ্ঞা এই দৈন্যদুঃখপীড়িত, অশিক্ষিত, অভাবগ্রস্ত পল্লীবাসীর কাছেও যে উপেক্ষিত হয় নাই, তাহাই সনাতন জানা তাহার অকপট ভাষায় জানাইতেছে—

"অন্নাভাবে অনশন-ব্রতের আচার—
শিক্ষাভাবে জড়প্রায় করিস্ বিহার।
রোগক্লিষ্ট কত জন না পেয়ে বিধান,
অকালে করাল গ্রাসে করেছে প্রয়াণ॥
তোদের আঁখির জল মুছাবার তরে—
আসিয়াছে মহাপ্রাণ তোদের দুয়ারে।
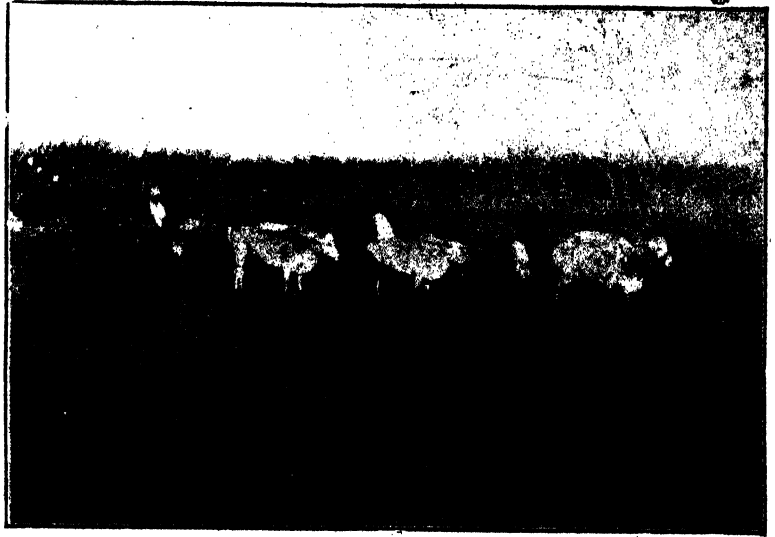
ভূমি-কর্ষণ

এখনও সময় আছে, উঠিয়া সত্বর
অনাহূত অতিথির কর সমাদর।
ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, অভিমান করি পরিত্যাগ,
আত্মা তাঁর কৃষ্ণ-প্রেমে কর অনুরাগ॥

* * *

এস ভাই সবে মিলি পড়িয়া চরণে
প্রেম-ভিক্ষা মেগে লই প্রতি জনে জনে।
কৃষ্ণ হতে ভক্ত বড় আছে চিরকাল
ভক্ত অনুকূল হ'লে কাটিবে জঞ্জাল॥"

দীন গজেন্দ্রের স্তুতির অর্ঘ্যে কবিত্বের সঙ্গে কতখানি হৃদয়ের গভীর অনুরাগ মিশিয়া রহিয়াছে, তাহা তার কবিতার প্রথম দুইটী চরণ হইতেও প্রতীয়মান হইবে—

"মহীতে এসেছ, মহীতে বসেছ, মোহিত করেছ আজি মনোপ্রাণ,
হার হয়েছে সর্ব্বকণ্ঠে তুমি তাই, গাহি আমি তব যশোগান॥"

ইহার পর, পল্লীবালগণের এই গীতাঞ্জলীর সবখানি উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করা যায় না—কেন না, সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাকে উদ্দেশ করিয়া ইহাতে তাহাদের প্রকৃত আকাঙ্ক্ষাই সহজ স্পষ্ট স্বরে অভিব্যক্ত হইয়াছে—

"আসিয়াছি মোরা সকলে মিলিয়া
নিবেদন তোমা জানাবারে;
তোমারি করুণা করে' যাও দান
আজি গো আমা সবাকারে॥
না পাই আমরা শিক্ষা এখানে,
জানাতে এসেছি তোমার চরণে;
সুব্যবস্থা তুমি কর কৃপাগুণে
পারি যেন শিক্ষা করিবারে॥
তুমি না করিলে নব-প্রাণ-দান
আর কে ঘুচাবে মোদের অজ্ঞান!
নাহি দেখি হেথা এমন মহান্
শিক্ষা দেয় মোদের চিরতরে॥
শিক্ষার অভাবে আমরা সকলে
মূর্খ হয়ে আছি পল্লীতে পল্লীতে—
(আজি) জ্ঞানের আলোক ধরিয়া সম্মুখে
স্মৃতি রেখে দাও চির-তরে॥"

সঙ্ঘ-নারীকে উদ্দেশ করিয়া প্রজাবৃন্দের নিবেদন—

"দেবীরূপা মাতৃজাতি শক্তির বিকাশ
কাটিয়াছে সবে তারা ঘোর মায়াপাশ।
ভোগ-বিলাসের আশা ত্যজিয়া হেলায়
চিন্ময়ের চিন্তা-স্রোতে ভাসিয়া বেড়ায়॥
* * *
শুন গো জননি! মোরা তোদের সন্তান;
তবে কেন হই মোরা পাপে আস্থাবান্?
আশীর্ব্বাদ কর মাগো, ফিরে যেন মন—
ভগবৎপদে যেন বাড়ে আকিঞ্চন॥"

—কত উদ্ধৃত করিব—জানা, মাইতি, দীন ভূষণ, পল্লী-কণ্ঠের এতগুলি ধ্বনি প্রতিধ্বনি সহসা শুনিয়া সত্যই বিস্মিত চিত্তে ভাবিতে হইয়াছিল—এত প্রাণ, এত দরদ ও আকুলতা, এমন অকৃত্রিম স্নেহ, প্রীতির স্বতঃস্ফুরিত তরঙ্গোচ্ছ্বাস কোথা হইতে, কেমন করিয়া উচ্ছল ধারায় ঝরিয়া পড়িল! সেই পল্লীপ্রাণের নিছক স্বরূপ পল্লী-ভারতীকে নমস্কার!

পল্লী-সৃষ্টির পথে অনেক প্রশ্ন, অনেক সমস্যাই এখনও সমাধান করিবার আছে। ১৪ বৎসরের তপস্যায়, দেখা গিয়াছে, এই অঞ্চলে জমীর উৎপাদিকা-শক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা যথেষ্ট বাড়িয়াছে; কিন্তু ধানের দর পড়িয়া যাওয়ায়, প্রজাদের দুঃখের অবধি নাই। সুন্দরবনে সঙ্ঘের অজস্র অর্থব্যয় অবশ্য ব্যর্থ হয় নাই; কেন না, তাহা দরিদ্র কৃষকেরাই পাইয়াছে। কিন্তু তাহাদের স্থায়ীভাবে রক্ষা করিতে হইলে, কয়েকটী বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

প্রথমতঃ, অল্প সুদে প্রজাদিগকে প্রয়োজন-মত কর্জ্জ দেওয়ার ব্যবস্থা। দ্বিতীয়তঃ, যে সকল শিশু ফ্রেজার-গঞ্জের ভবিষ্যৎ হইবে, তাহাদের শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা। তৃতীয়তঃ, দুই টাকার অধিক খাজনার হার রোদ করা।

প্রথম দুইটী উদ্দেশ্যসাধনের জন্য প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ নিজ প্রাণ-ঢালা তপস্যায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছে। একটী প্রাথমিক স্কুল বৎসরাধিক কাল হইল লক্ষ্মীপুরে সংস্থাপিত হইয়াছে ও এখনও চলিতেছে। শ্রীযুক্ত মতিবাবু এবার ইহাদের সাম্বাৎসরিক সভায় স্বয়ং ছাত্রছাত্রীদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন। স্কুলবাটীর আরও উন্নতি প্রয়োজন। তা'ছাড়া, ফ্রেজারগঞ্জে প্রায় ২১০০ জন বিদ্যালয়গমনোপযোগী বালকবালিকার জন্য একটী স্কুল কোনরূপেই যথেষ্ট নয়। সভাক্ষেত্রেই মহারাজগঞ্জ হইতে আর একটী স্কুল সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তত্রত্য প্রজাবৃন্দ আবেদন জানাইয়াছিল—মতিবাবু সে আবেদন সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রজাদের অর্থসাহার্য্যের জন্য "প্রবর্ত্তক ট্রেডিং এবং ব্যাঙ্কিং কোম্পানী"র একটী শাখা-কেন্দ্র এইখানে সংস্থাপিত করার ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছেন। খাজনার হার কমাইবার ব্যবস্থা উপরিস্থানীয় রাজষ্টেটেরই উপর নির্ভর করে। এই মর্ম্মে মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের সহিত শ্রীযুক্ত মতিবাবুর পত্র-ব্যবহারের কথাও আমরা অবগত আছি।

বলা বাহুল্য, এই অঞ্চলের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য একটী ডিস্‌পেন্সারীও রাজষ্টেটের সহযোগিতায় কিছু দিন হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একে দুর্গম দেশ, তাহার উপর ফ্রেজারগঞ্জে কোনও পোষ্ট অফিস ও টেলিগ্রাফ অফিস না থাকায় বাহিরের সহিত আদান্‌প্রদানের যথেষ্ট অসুবিধা ছিল, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের উদ্যোগে উহা সংস্থাপিত হওয়ায় সে অভাব সম্প্রতি দূর হইয়াছে।

সুন্দরবনে যে সৃষ্টি-প্রেরণা খেলিতেছে তাহা বাংলার জাতি-নির্ম্মাণ-যজ্ঞেরই একটা অভিনব নিদর্শন মাত্র—সে যজ্ঞ আজ সারা বাংলা জুড়িয়া, দিকে দিকে, কেন্দ্রে কেন্দ্রে কি সমারব্ধ ও সংসিদ্ধ হইবে না!

বসন্ত-বাতাস

(গল্প)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বিশ বৎসর পরে শ্যামল দুনিয়ার পানে চাহিয়া দেখিল।

এ বিশ বৎসর টাকা-পয়সার আমানতীর মধ্যে সে ছিল তন্ময়। ডেবিট আর ক্রেডিট, ক্লীয়ারিং আর ফরোয়ার্ডিং নোট, ইনভয়েস আর চেক্—এ-সবের সঙ্গে নিত্য অন্তরঙ্গতায় বাহিরের চিন্তা কোথায় মিলাইয়া অদৃশ্য হইয়া ছিল!

ছুটির দিন। লোক-জন আজ আর বাড়ী আসিয়া ভিড় জমায় নাই। যেন বিধাতার ইঙ্গিত! বিশ বৎসরে আশে-পাশে কি পরিবর্ত্তন না ঘটিয়া গিয়াছে! সেই ছোট গৃহ আজ প্রাসাদ হইয়া দেখা দিয়াছে। সমৃদ্ধির সীমা নাই!

প্রাণে আরাম বোধ করিয়া শ্যামল আসিয়া গৃহ-সংলগ্ন বাগানটিতে বসিল। ফাল্গুনের মাধুরী জাগিয়াছে দিকে দিকে! সবুজ তৃণপল্লব—তাহার বুকে মরশুমী ফুলের রংবাহার। ফ্লক্স, পোর্টুলাকা, এ্যাষ্টার, ডালিয়া, হলিহক্; ওদিকে সনাতন ক্যানা, কৃষ্ণকলি, করবীর অজস্রতা! বসন্তের স্নিগ্ধ দক্ষিণ বাতাস! শ্যামলের নয়ন মন জুড়াইয়া গেল।

গৃহিণী নীরজা ওদিকে একটা পুষ্পকুঞ্জের সামনে দাঁড়াইয়া মালীকে কি-সব আদেশ জানাইতেছে! গৃহিণীর পানে দৃষ্টি পড়িল।

সেই নীরজা! কিন্তু কি পরিবর্ত্তন! বসন্ত-মাধুরীর মত অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের সুষমা—আজ নাই!

মাথার উপর দিয়া কত বৈশাখের তপন-তাপ, শ্রাবণের মেঘ-বর্ষণ, আশ্বিনের নীল নির্ম্মল আকাশ, শীতের হিম-কুহেলি, ফাগুনের পুষ্পমঞ্জরী ফুটিয়া ঝরিয়া গিয়াছে—কাজের চাপে মন, সে-সবের পানে চাহিয়া দেখিতে পারে নাই! অথচ তাদের স্পর্শে দুনিয়ার চেহারা আজ এমন বদলাইয়া গিয়াছে! ভাঙ্গা-গড়ার বিপুল সমারোহ!

টাকা-পয়সা আসিয়াছে—যেখানে যত ফাটা-ঝরা ছিল, অসম্পূর্ণতা ছিল, টাকা-পয়সায় তাহা গড়িয়া উঠিয়াছে ঐশ্বর্য্যে দীপ্তিতে! আবার ভাঙ্গন যা ধরিয়াছে, তার পরিচয়...ঐ নীরজার অঙ্গে অঙ্গে...

মুখের সে অরুণ-রাগ, চোখের সে স্বপ্নাতুর বিবশ দৃষ্টি, দেহের সে লাবণ্য, সে পুষ্টি—কোথায় গেল!

শ্যামলের মনে প্রচণ্ড ক্ষোভ আর নৈরাশ্য হা-হা করিয়া উঠিল। নিজের পানেও দৃষ্টি পড়িল—দীর্ঘ পথ চলিয়া আজ এ কি শ্রান্তি-ঘোর!

এ-কথা মনে পড়িল না যে, পথে কেহ দাঁড়াইয়া নাই—চলিয়াছে, সকলে চলিয়াছে...রৌদ্রে ধূলায় জল ঝড় মাথায় বহিয়া! চলার এখানে বিরাম নাই।

শ্যামলের অসহ্য বোধ হইল।...সে উঠিল।

নীরজা বলিল—উঠলে কেন? বসো না একটু...

শ্যামল নীরজার পানে চাহিল। কেশে সে নিবিড়তা নাই—দু'চারিটায় রঙ ধরিয়াছে! কোথায় সে চূর্ণ অলকদাম! প্রথম যৌবনে যে-অলক লইয়া লীলার ছলে খেলিয়াছে...রেশমের মত সে মসৃণ কোমলতা!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শ্যামল কহিল—একটু বেড়িয়ে আসি।

নীরজার মুখে একটু আগে আরামের দীপ্ত হাসি ফুটিয়াছিল—অতি-মৃদু! নিমেষে সে হাসি ম্লান হইল। সে কহিল—মনে মনে তাই ভাবছিলুম, ভাগ্য ফিরেচে—কাজ ছেড়ে বাগানে এসে তুমি বসেচো...

শ্যামল কোনো কথা কহিল না—অবিচল দাঁড়াইয়া রহিল; অপলক দৃষ্টি নীরজার মুখে নিবদ্ধ!

নীরজা সে দৃষ্টি দেখিল। তার বুকটা দুলিয়া উঠিতেছিল। সে কহিল—কি দেখচো?

শ্যামল এবারো কোন কথা কহিল না।

নীরজার বুক ভরিয়া একটা নিশ্বাস ..

সে-নিশ্বাস চাপিয়া নীরজা কহিল—আমার সঙ্গে একটু গল্প না হয় করলে!

গল্প! পরীর স্বপ্ন-মেশা সে গল্প—সে কি আর আছে!

শ্যামল কহিল—না। একটু ঘুরে আসি!

নীরজা কোনো কথা বলিল না; ম্লান নয়নে স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল ..স্থির, নিস্পন্দ। এবং তার চোখের সামনে দিয়া শ্যামল চলিয়া গেল…

ময়দানে আসিয়া শ্যামল গাড়ী হইতে নামিল। আকাশে-বাতাসে সেই যৌবনের হিল্লোল! তরুণ-তরুণীর মুখে-চোখে সেই হাসির দীপ্তি!...

বসিয়া-বসিয়া দেখিয়া-দেখিয়া শ্যামলের মনে হইল, এত বড় দুনিয়ায় এমন দিনে সে একা ..একা ..নিঃসঙ্গ!

তার প্রাণে আজ এই যে আকুলতা—সে-আকুলতা বুঝিবে, এমন জন কেহ নাই!

নীরজা! একদিন এই নীরজা…

কিন্তু আজ...অতীত দিনের স্মৃতির রেখা মাত্র! জীবনের সে চঞ্চল ছন্দ তার কোথাও নাই…মুখের ভাষায়, চোখের দীপ্তিতে, চরণের ভঙ্গীতে,—কোথাও না!

প্রাণটা যেন লোহার কারাগারে বন্দী হইয়া আছে! মুক্তি, মুক্তি চাই! কিন্তু কোথায় মুক্তি?

গৃহে ফিরিলে নীরজা কহিল—বেঁকির বিয়ে। তুমি বেরিয়ে যাবার পর শশী এসেছিল। কিছু সাহায্য চায় মেয়ের বিয়েতে। তোমার সঙ্গে কাল এসে দেখা করবে।

শশী শ্যামলের সম্পর্কে ভাগিনেয়।

শ্যামল জলিয়া উঠিল। কাজ আর কাজ! বিশ বৎসর ধরিয়া কাজ চুকাইয়া গৃহে ফিরিয়া নীরজার কাছে সে কি পাইয়াছে? ও-দিকে নূতন ব্যবস্থা না করিলে নয় গো! মালীটা বড় বদ—গাছগুলার কোনো যত্ন করে না—অমন যে কলমের আমের চারা লাগাইলাম, সব নষ্ট হইয়া গেল — শুধু যত্নের অভাবে। ছেলের অসুখ, মেয়ের এগজামিন... এই অভিযোগ- লইয়া বারে বারে স্বারে —না।

আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! দুনিয়ায় পানে শ্যামলকে কোনোদিন চাহিয়া দেখিতে বলে নাই। সংসারের খুঁটিনাটি কথাতেই সে-সব মধুময় মুহূর্ত্তগুলা বিষময় করিয়া দিয়াছে! তারপর সে ছেলে জীবনের দেনা-পাওনা চুকাইয়া কোথায় চলিয়া গেল! অশ্রু আর হাহাকার ··

জীবনের এ কয়টা বৎসর কাদা মাখিয়া বিশ্রী কদর্য্য হইয়া আছে!

কিন্তু আর নয়!…

শ্যামল কহিল—যা চায়, দিলে পারো। সেজন্য আমায় কেন জালাতন করা...

বলিতে গিয়া কণ্ঠ যেন একটু রূঢ় হইল! নীরজা তাহা বুঝিল। সে কহিল,—তোমার পয়সা—তোমার অমতে তো আমি দিতে পারি না! কখনো দিই নি!

শ্যামল কহিল—দিলে আমি কোনো কথা বলতুম না!

নীরজা কহিল—তা'হলে কি দেবে?

শ্যামল কহিল—যা চায়, দিয়ো! আমাকে মোদ্দা ছুটী দিয়ো তোমাদের সংসার থেকে। সারা জীবন তোমাদের সংসারের দাসত্ব করে-করে মনটাকে ক'বৎসর পিষে মেরেচি…

নীরজা কহিল—কে তোমায় বলেচে এ-দাসত্ব করতে! কার জন্য করো! নাও না ছুটী। সত্যিই তো, অন্য মানুষও খাটে—তা বলে তোমার মতন…! যে, দুনিয়ার কিছুর পানে তাকাবার সময় নেই!

শ্যামল কহিল—আর পারচি না। দুনিয়ার পানেই দু'দিন তাকিয়ে দেখতে চাই। সুন্দর দুনিয়া!

শ্যামল চলিয়া গেল—নিজের-ঘরে। টেবিলের উপর লেজর-বহি পড়িয়া আছে—পাশে একরাশ চিঠি-পত্র। ছুটীর দিনে এগুলা সে মিলাইয়া দেখে।

আজ খাতা দেখিয়া রাগে মন তাতিয়া উঠিল। খাতাখানা হাতে তুলিয়া দূর করিয়া ছুড়িয়া দিল...

নীরজা ঘরে প্রবেশ করিতেছিল, খাতাখানা গিয়া তার পায়ের উপর পড়িল। দেখিয়া শ্যামল শিহরিয়া উঠিল।

নীরজা কহিল—কি হলো তোমার! হঠাৎ এমন রণ-মূর্ত্তি! এমন কখনো দেখি নি!

ছোট্ট 'না' এমনি রুদ্র গর্জ্জনে ফুটিয়া বাহির হইল যে সে-স্বর কাণে বাজিতে শ্যামল লজ্জিত হইল।

নীরজা হাসিল। হাসিয়া কহিল—কি হলো?

শ্যামল যেমন কাঁদিয়া ফেলিবে! উচ্ছ্বসিত স্বরে শ্যামল কহিল—আমি দু'দিন একটু বেড়িয়ে আসতে চাই—বাইরে। কাজের চাপে মন আমার হাঁপিয়ে উঠেচে।

নীরজা কহিল—বেশ তো, কে বারণ করেচে! সত্যি, সবাই কত অমন দেশ-বিদেশে হাওয়া খেতে যায়। তোমার কিছু নেই! বেড়ানো দূরের কথা—একটু সখ বা আমোদ—তাও নয়! ভালো বটে কাজ-কারবার করচো!

তা করিতেছে! কিন্তু কতখানি সমৃদ্ধি গড়িয়া তুলিয়াছে! কি ছিল? কিছু না। শূন্য চারিদিক! অভাব, অভিযোগ—প্রাণে অতৃপ্তি!

আর পাঁচজনকে দেখিয়া কত কি উপহার নীরজাকে দিবার সাধ হইয়াছে—দিতে পারে নাই! নীরজার অঙ্গে অঙ্গে তখন এই বসন্তের পুষ্পমাধুরী, এই জ্যোৎস্না! কত বাসনা তার মনে জাগিত...

সে-বাসনা মিটাইতে পারে নাই—শুধু পয়সার অভাবে। তাই সব ভুলিয়া তীব্র আক্রোশে যৌবনের সকল উদ্দীপনা-উৎসাহ লইয়া পয়সার সাধনায় নামিয়াছিল! কঠিন দুশ্চর সাধনা—তপস্বীর নিষ্ঠায়...

ও-দিকে ঝোঁক দিতে এদিককার হাসি-গান, আনন্দ-প্রীতি—কিছুর পানে ফিরিয়া তাকায় নাই। ভাবিয়াছিল, পয়সার পিছনে ছুটিয়া সবার উর্দ্ধে বসিয়া দুনিয়ার পানে তাকাইয়া দেখিবে! সে তাকানোর কথা মনে ছিল না! কাজের নেশায় এমনি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল যে পয়সা ছাড়া দুনিয়ায় তাকাইবার মত আর কিছু আছে, সে কথাও ভুলিয়া গিয়াছিল।

আজ মনে পড়িয়াছে অকস্মাৎ! কিন্তু আর নয়! কাজ খুব করিয়াছে। এবারে বিরাম চাই! বিরাম! ছুটী!

শ্যামল কহিল—আজ রাত্রে আমি পুরী যাবো...

নীরজার বুকটা আবার দুলিল। স্পন্দিত-বক্ষে সে কহিল—একা?

শ্যামল কহিল—হাঁ।

বুকের উপর কে যেন মস্ত মুগুরের ঘা দিল। তীব্র ব্যথা...

নিশ্বাস ফেলিয়া নীরজা কহিল—হারু সঙ্গে যাক...

হারু খানশামা। শ্যামল কহিল—না, কেউ না। একা যাবো।

—কষ্ট হবে।

—কোনো কষ্ট হবে না। হোটেলে থাকবো।

তাহাই হইল। সেই রাত্রেই শ্যামল ছোটখাট লগেজ লইয়া পুরী যাত্রা করিল।

এই তো মুক্তি! মাথার উপর মুক্ত উদার আকাশের সুনীল প্রসার—চোখের সামনে অথৈ জলের বিস্তার! কোথাও বাধা নাই, বন্ধ নাই। চমৎকার!

বালির উপর পাথরের মূর্ত্তির মত শ্যামল বসিয়া আছে ...হোটেলে ফিরিবার কথা মনে থাকে না। সামনে দিয়া চলিয়া যায় অগণন নর-নারী—হাসি-গল্পে বিচিত্র চমক ফুটাইয়া! শ্যামল স্বপ্নাতুর বসিয়া আছে! তার হাতে থাকে কখনো কেতাব—পড়িবার জন্য কেতাব খুলিয়া বসে। পড়া আর হয় না! কখনো বা...

সেদিন পাশে শুনিল একটি সুমধুর কোমল কণ্ঠ—আপনি একভাবে এমন করে বসে! কি দেখেন রোজ...?

শ্যামল চমকিয়া চাহিয়া দেখে—এক কিশোরী! যেন রূপের প্রতিমা!

শ্যামল কহিল—দেখতে ভালো লাগে...

কিশোরী হাসিল, হাসিয়া কহিল—ওখানা কি বই?

কিশোরী বইখানা লইল, লইয়া দেখিল, রবিবাবুর কাব্যগ্রন্থ।

কিশোরী কহিল—আপনি লেখেন?

শ্যামল বিস্মিত দৃষ্টিতে কহিল—তার মানে?

কিশোরী কহিল—গল্প? কবিতা?

শ্যামল কহিল—না।

—কিন্তু পড়চেন না তো!

শ্যামল কহিল—না। পড়বো বলে বই আনি! পড়া হয় না।

কিশোরী উচ্ছ্বসিত সাগরের পানে চাহিয়া রহিল।

শ্যামল তার পানে চাহিল। যৌবন অঙ্গে অঙ্গে লীলা-ভরে অপরূপ ছবি আঁকিতেছে!

শ্যামল কহিল—একা এদিকে এসেচো!

কিশোরী কহিল—একা নই। মা বাবা সকলে স্নান করচে।

শ্যামল কহিল—তুমি স্নান করতে নামো নি!

কিশোরী কহিল,—না। আপনার হাতে বই দেখে এখানে এলুম। রোজই দেখি, সকালে বিকেলে আপনি এই জায়গাটীতে বই নিয়ে বসে আছেন···তাই জানতে ইচ্ছা হলো, কি বই?

—ও!...তুমি বুঝি খুব পড়তে ভালোবাসো?

মৃদু-হাস্যে ঘাড় নাড়িয়া কিশোরী জানাইল, হাঁ।

শ্যামল কহিল—পড়বে?

কিশোরী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

শ্যামল কহিল—পড়ো নি এ বই?

—পড়েচি। তবু পড়বো। রবিবাবুর বই কখনো পুরোনো হয় না।

—তোমার নাম কি?

কিশোরী কহিল,—শান্তি।

শান্তিই বটে! এমন সার্থক নাম দেখা যায় না!

আরো কথা হইল। শান্তির বাবা রজত রায়—মস্ত ব্যারিষ্টার। ব্লাড-প্রেশারের দরুণ কয়েকদিন বিশ্রাম কামনা করিয়া এখানে আসিয়াছেন। থাকেন সী-ভিউ লজে। ফ্লাগ-ষ্টাফের কাছে। মা আসিয়াছে...আর আসিয়াছে তারা ভাই-বোনেরা। দুই ভাই আর ছোট একটি বোন। শান্তি সবার বড়।

শান্তি কহিল—আপনি কোথায় থাকেন?

শ্যামল কহিল—ব্লু হোটেলে।

—একা এসেচেন?

নিশ্বাস ফেলিয়া শ্যামল কহিল—হ্যাঁ।

পরের দিন সকালে শ্যামল সে জায়গায় বসিল না; সমুদ্রতীরে বালুময় পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সহসা একটা উচ্ছল হাস্য-রবের সঙ্গে-সঙ্গে একরাশ ভিজা বালি আসিয়া মুখের উপর পড়িল।

চমকিয়া শ্যামল চাহিয়া দেখে, জলের কোলে শান্তি—তার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে—আঁচলটুকু গা বেড়িয়া ঘুরাইয়া কোমরখানিকে কষিয়া বাঁধিয়াছে! মুখে-চোখে হাসির বিদ্যুৎ!

শান্তি কহিল—নাইতে যাচ্ছি। আপনি নাইবেন?

শ্যামলের মন একেবারে সেই প্রথম যৌবনের চাপল্যে ভরপূর হইয়া উঠিল। জলে নামিবে নাকি?···দুর্ব্বার লোভ! তা হউক, সে লোভ সম্বরণ করিয়া সে কহিল—না।

শান্তি কহিল—আসুন না। বেশ হবে। মিনির ভয় হচ্ছে···নামচে না।

মিনি ছোট বোন। কটি ভাই-বোনে স্নান করিতে আসিয়াছে।

শ্যামল কহিল—একলা এসেচো? বাবা? মা?

শান্তি কহিল—এখনি আসবে।

—ও!

শ্যামল দাঁড়াইল না—চলিয়া গেল। পা দু'খানা যাইতে চায় না—তবু! থাকা চলে না! বাবা আসিতেছে।

বৈকালে সেই স্থান। শান্তি আসিল। শ্যামল কহিল,—এই নাও।

একরাশ ঝিনুক!

শ্যামল কহিল—কুড়িয়ে জড়ো করেচি।

শান্তি মহাখুশী হইয়া কহিল—বা!—জলু ভারী ভালোবাসে। আমি নেবো?

—নাও।

শান্তি কহিল,—বাড়ী গিয়ে জলুকে দেবো।

শান্তি ঝিনুকে মনঃসংযোগ করিল। শ্যামল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দুই চোখের দৃষ্টি অনন্ত-প্রসারী সাগরের বুকে...

নিজের বুকে নূতন একটা সাধ...অমনি সুদূর প্রসারে বহিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে—হাজার তরঙ্গে দুলিয়া, হেলিয়া···

শান্তি কহিল—সকালে বালি ছুড়েছিলুম—আপনার চোখে লাগে নি ?

শ্যামল কহিল—না।

তার স্বর উদাস।

শান্তি কহিল—আপনার বইখানা মা পড়চে।...আর কোনো বই আছে আপনার কাছে ? কোনো গল্পের বই ?

শ্যামল কহিল—আছে।

—পড়তে দেবেন ?

—দেবো।

—আপনার সঙ্গে আপনার হোটেলে গিয়ে নিয়ে আসবো'খন। মা বললে, কার বই নিয়ে এলি রে ? আমি মাকে বললুম, আপনার কথা। বললুম, আপনার সঙ্গে খুব ভাব হয়েচে। শুনে মা বাবাকে বললে, —দেখেচো, মেয়ে এখানে ভাবসাব করে বেড়াচ্ছে। আমি খুব ফরোয়ার্ড। বাবা-মা বলে,—ভালো। কাঁচু-মাচু হয়ে থাকা—আমি কেমন থাকতে পারি না! কেন থাকবো ? কারো কিছু চুরি করিনি তো !

শ্যামলের বিস্ময় বাড়িতেছিল। মেয়েটির কথায় আচরণে এমন সহজ সারল্য! এ বয়সে এমন চমৎকার মানাইয়াছে...

শান্তি কহিল,—কাল কিন্তু আপনাকে সুমুদ্দুরে নামতে হবে। আপনি সাঁতার জানেন ?

শ্যামল কহিল,—জানি।

উচ্ছ্বসিত হাস্যে শান্তি কহিল—সুমুদ্দুরেও সাঁতার কাটতে পারেন ?

—পারি।

—বা রে !

দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া একাগ্র দৃষ্টিতে শান্তি চাহিয়া রহিল শ্যামলের পানে; তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—কাল সাঁতার কাটবেন ?

শান্তির দৃষ্টিতে শ্রদ্ধা! হাসিয়া শ্যামল কহিল—বেশ, কাটবো।

—না, মিথ্যা কথা বলে ভুলোলে চলবে না !

—মিথ্যা নয়। সত্যি কথা। সাঁতার কাটবো, দেখো।...

শান্তি কোনো কথা বলিল না—হাতের ছোট রুমাল-খানির কোণে ঝিনুকগুলা বাঁধিতে লাগিল।

শ্যামল কহিল—তুমি বেড়াও না কেন ?

শান্তি কহিল—ঢের বেড়িয়েচি। কুড়ি দিন এসেচি এখানে। বেড়িয়ে বেড়িয়ে বেড়ানো পুরোনো হয়ে গেছে। ...কত আর বেড়াবো বলুন তো ? বাড়ীর কটি লোকের সঙ্গে ছাড়া কথা কইতে পারি না—আমি যেন হাঁফিয়ে উঠি। আপনার হাতে বাঙলা বই দেখেছিলুম। তাই এসে ভাব করলুম।

কি মধুর সম্ভাষণ! শ্যামল চুপ করিয়া রহিল। তার মনের কাণায়-কাণায়...

শান্তি চুপ করিল—সমুদ্রের পানে চাহিল—কি যেন ভাবিতেছে!

শান্তি কি ভাবিতেছে ?

শ্যামল ডাকিল—শান্তি...

শান্তি কহিল—কি ?

শ্যামল কহিল—কি ভাবচো ?

শান্তি একটা নিশ্বাস ফেলিল—ডাগর দুটী চোখ যেন ম্লান!

শান্তি কহিল, কিছু নয়।...ঐ মা আর বাবা এসেচে। আমি যাই।...মনে থাকে যেন, কাল সাঁতার কাটবেন, বলেচেন।

—মনে থাকবে।

শান্তি চলিয়া গেল। শ্যামল নির্ণিমেষ নেত্রে তার পানে চাহিয়া রহিল।

মনে থাকিবে...শুধু সাঁতারের কথা নয়। অনেক... অনেক কথা। এই যে হাসি-গল্পের পরশে তার মনের উপর হইতে বিশ বৎসরের পাষাণ-ভার খশিয়া ঝরিয়া আবার সেখানে বসন্ত-শ্রী জাগিতেছে...ঐ শীতের কুহেলি-ঝরা বিশীর্ণ তরু-লতার বুকে নব-জীবনের মত...

থাকিবে! তাও মনে থাকিবে! যতদিন শ্যামল বাঁচিবে, ততদিন। স্মৃতির মত! স্মৃতি! সোনার রেখায় দীপ্ত উজ্জ্বল স্মৃতি! •

রাত্রে শ্যামলের চোখে নিদ্রা নাই। শীতের কুহেলি কাটিয়া এই যে মাধুরী মনকে ছাইয়া ফেলিয়াছে···

এ মাধুরীর নিবিড় মায়া···বর্ণে-গন্ধে এ কি উগ্র নেশা!

এই বসন্ত শ্রীতে মনকে মণ্ডিত করিয়া নূতন করিয়া সেই হারানো বিশ বৎসরকে নব জাগ্রত চেতনায় যদি আবার স্পন্দিত মত্ত করিয়া তোলা যায়···

তা কি অসম্ভব?

মনে এখনো তেমনি অধীরতা। বিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম যৌবনে যে সাধ, যে আশার পুষ্পমঞ্জরীতে মন খানি সজ্জিত ভূষিত ছিল—আবার সেই সজ্জাভূষায় সে মনকে ভূষিত করিয়া তোলা—কেন···কেন অসম্ভব! দুনিয়ার শীত-গ্রীষ্ম আসে যায়—দুনিয়া তাদের স্পর্শে শুষ্ক হয়, দগ্ধ হয়, শীর্ণ জীর্ণ হইয়া যায়—আবার সেই বর্ষে বর্ষে বসন্ত আসিয়া তার সে তাপ-দাহ মুছিয়া সে শীর্ণতাকে গন্ধে গানে বর্ণে মাধুরীতে ভরিয়া তোলে! দুনিয়ার কোনোখানে এতটুকু কালি, শীর্ণতার এতটুকু চিহ্ন দেখা যায় না! দুনিয়াকে যেন বসন্ত প্রাতে সদ্য-জাগা তরুণ বলিয়া মনে হয়! তবে? তার এ আশা কেন তবে নিষ্ফল হইবে? গুল্ম-তরু যদি মুঞ্জরিত হয়...

কিন্তু...

সে চাহিলেই···চাহা চায়, তাহা পাওয়া সম্ভব?... শান্তির বাবা আছেন। ব্যারিষ্টার রজত রায়। মা আছেন। ...শান্তির নিজের মন আছে। সে মনে সাধ আছে, বাসনা আছে, বিরাগ আছে···

রজত রায়! শ্যামলের ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই। বয়স্! হোক বয়স! মন এখনো সেই প্রথম যৌবনের স্বপ্নময়তায় আচ্ছন্ন! বিশ বৎসর শুধু মাথা লইয়া সে মত্ত ছিল, শুধু বুদ্ধি আর কৌশল! জল্পনা আর গবেষণা! মন ঘুমাইয়া ছিল। আজ জাগিয়াছে...

পরের দিন সকালে সমুদ্রতীরে আসিয়া শ্যামল দাঁড়াইল।...

শান্তি আসিল। তার সঙ্গে জলু, মিনি···

শ্যামল জামা খুলিতেছিল। শান্তি কহিল—সাঁতার কাটবেন?

মৃদু হাসিয়া শ্যামল কহিল—কথা আছে, সাঁতার কাটবো।

শান্তির দুই চোখ নিমেষে মলিন হইল। সে কহিল—না।

শ্যামল কহিল—কেন শান্তি—কথা আছে যে!

—থাক্ কথা! শান্তি আসিয়া শ্যামলের হাত ধরিল, ধরিয়া মিনতি-ভরা কণ্ঠে কহিল—না!

—কেন না?

—যদি ডুবে যান! আমার ভয় করে। আজ সকালে নুনিয়াকে জিজ্ঞাসা করছিলুম। সে বললে, পূজোর সময় একটি বাঙালী বাবু সাঁতার কাটতে গিয়ে ডুবে গেছলেন। তাঁকে আর পাওয়া যায় নি। তাই ভয় করে···

শান্তির স্বর বাষ্পার্দ্র; দুই চোখ ছলছলিয়া উঠিল।

শ্যামল চক্ষু মুদিল। এই হাতের স্পর্শ—নিমেষের এই গদ্গদ বাণী...রাত্রে যে-কল্পনা মনকে সারাক্ষণ নাড়া দিয়াছে, সে কল্পনা···

শ্যামল শান্তির মুখের পানে চাহিল। শান্তির দুই চোখে স্নিগ্ধ আবেশ! সে দৃষ্টিতে মন মাতাল হইয়া ওঠে।

শ্যামলের মনে হইল, দুনিয়াখানা যেন তার এই কোটী কোটী নর-নারী-সমেত মুছিয়া গিয়াছে—আছে শুধু সচল অতল সাগর...সেই সাগরের বুকে চারিখানি চরণ রাখিয়া দাঁড়াইবার মত ছোট ঠাঁই! আর সে ঠাঁইয়ে দাঁড়াইয়া আছে শুধু সে, আর তার হাত ধরিয়া এই শান্তি!

সে শান্তি যদি ঐ সাগরের তরঙ্গ-দোলায় অদৃশ্য হইয়া যায়! শান্তির হাত দুখানি সে আঁটিয়া চাপিয়া ধরিল।

একটা আর্ত্ত স্বর—উঃ...

চেতনা ফিরিতে চাহিয়া শ্যামল দেখে, শান্তির দুই হাত সে প্রাণপণ-বলে চাপিয়া ধরিয়াছে···তাহারি বেদনায় শান্তির চোখে বিস্ময়, কাতরতা...

শ্যামল অপ্রতিভ! কহিল—লেগেচে?

শান্তি কহিল,—না!...

বৈকালে আবার দেখা। শ্যামল কহিল—চকোলেট এনেচি আর লজেঞ্জেস।

—কৈ?

শান্তির দুই চোখে স্মিত দীপ্তি!

চকোলেট লজেঞ্জেসের প্যাকেট শান্তির হাতে দিয়া শ্যামল কহিল—এই।

শান্তি সেগুলা লইয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল—ওদের দেখাইগে। আপনি চলুন। আমি এখনি আসচি।...

শ্যামল বসিয়া রহিল। সমুদ্রের তরঙ্গ সগর্জ্জনে কূলে পড়িয়া লুটাইতে লাগিল—যেন মিনতির ক্রন্দনে ফাটিয়া ঝরিয়া! কঠিন বালুতট অটল গাম্ভীর্য্যে দাঁড়াইয়া আছে। তরঙ্গদল উচ্ছ্বসিত আগ্রহে আবার আসে, আবার মলিন-মুখে ফিরিয়া সরিয়া চলিয়া যায়! তট তবু টলে না, দোলে না, হেলে না, গলে না···

শান্তি আসিল না। অস্ত-রবির আলোয় গোধূলির ছায়া পড়িল। সে ছায়া নিশীথের কালো পর্দ্দার আড়ালে ঢাকিয়া গেল। দুই চোখের সামনে তখন শুধু অন্ধকার, অন্ধকার। কাণে বাজিতেছে কূলে-পড়া সাগর-তরঙ্গের সেই মিনতির ক্রন্দন!

নিশ্বাসে বুক ভরিয়া শ্যামল উঠিল। উঠিয়া টলিতে টলিতে ব্লু হোটেলের পথে চলিল।

রাত্রে বুকে যেন ঝড় উঠিল। সে-ঝড়ে এত দ্বিধা, এত সংশয় কাটিকুটার মত বুকে আসিয়া বাজিতেছিল···

কল্পনায় বাস্তবে মিশ খাওয়াইতে এত বিঘ্ন, ভগবান! একটা প্রাণকে জীয়াইয়া সচেতন রাখিতে আর একটা প্রাণের অবলম্বন, আশ্রয়—তা পাওয়া এমনি দুষ্কর!

রজত রায়ের কাছে গিয়া সে বলিবে, তার জীবনে একমাত্র শান্তি···এই শান্তি! শান্তিকে সে ভিক্ষা চাহিবে! শান্তিকে সে মাথায় করিয়া রাখিবে! তিলেক তার কাছ-ছাড়া থাকিবে না—আদরে-মমতায় স্নেহে-প্রীতিতে আচ্ছন্ন রাখিবে! এক দিকে তার সমস্ত ঐশ্বর্য্য, অপর দিকে এই শান্তি! কাজের বোঝা বহা শেষ করিয়া দিয়াছে। এখন শুধু প্রিয়ার পাশটিতে... জীবনকে নূতন ছন্দে ভরিয়া রাখিবে, যতদিন বাঁচিবে!...নিমেষের উপেক্ষা নয়, অবহেলা নয়...

নীরজার কথা মনে পড়িল। কেন তার দুঃখ হইবে? তার সংসার তারই থাকিবে! টাকা-পয়সার প্রাচুর্য্যে ভরিয়া! সে সংসারের এক প্রান্তে সে পড়িয়া থাকিবে—এই শান্তিকে লইয়া! শুধু একটু বিরাম-সুখ! নীরজার সংসারে কোনো উপদ্রব তুলিবে না—কোনো দৌরাত্ম্য নয়! ভিখারী—বিরাম-সুখের ভিখারী শুধু!...নীরজার মন বড় ভালো। শ্যামলের সুখের জন্য, শ্যামলের মুখ চাহিয়া সে সব করিতে পারে! শ্যামল তা জানে...

সে চিঠি লিখিল—একখানা, দুখানা, তিনখানা···

সাতখানা চিঠি ছিঁড়িয়া আটের খানা লিখিয়া এমনি দাঁড় করাইল—

নীরজা—এ চিঠি লিখিতে মনে ব্যথা পাইতেছি না, এমন কথা ভাবিয়ো না! কিন্তু উপায় নাই।

কাজের ভারে আমার মন অবসন্ন, জীর্ণ। আমি বিরাম চাই! এ বিরাম একা নিঃসঙ্গ পাইতে পারি না। এখানে দেখিয়াছি—শান্তিকে। সে আমার সমস্ত মনে এমন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে যে তাকে ছাড়িয়া বাঁচা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি তাকে বিবাহ করিব, ভাবিয়াছি। মনটা উপবাসী রহিয়া গিয়াছে। সে মনে খোরাক দিতে পারে শুধু এই শান্তি।

আমি অনেক ভাবিয়াছি। শান্তির চিন্তা ত্যাগ করা অসম্ভব। তাকে ত্যাগ করা আরো অসম্ভব।

আমি শান্তিকে লইয়া ঘুরিয়া দিন কাটাইব। সংসার তোমার—আমাদের জন্য হাতে তুলিয়া যৎকিঞ্চিৎ যাহা তুমি দান করিবে, তাহাতেই আমাদের চলিয়া যাইবে। আশা করি, এ ভিক্ষা দিতে কৃপণতা করিবে না। আমার সুখের জন্য তুমি সব করিতে পারো—জানি। জানি বলিয়াই তোমাকে এ-কথা লিখিতেছি। তোমাকে গোপন করিয়া বিবাহ করিতে পারি না। তাহাতে তোমার অপমান অমর্য্যাদা—তাহা বুঝি। তাই তোমাকে সব কথা লিখিলাম।

শান্তির সঙ্গে বা তার অভিভাবকের সঙ্গে এ সম্বন্ধে এখনো কোনো কথা কহি নাই। কাল তাঁদের কাছে ভিক্ষা জানাইব। শান্তি বোধ হয় এ ভিক্ষা দিতে কৃপণতা করিবে না। তার আচরণে আমি প্রীতির পরিচয় পাই নাই, এমন নয়।

আশা করি, আমার অন্তর বুঝিয়া আমাকে মার্জ্জনা করিবে।

শ্যামল

চিঠিখানা খামে পুরিয়া খামে ষ্ট্যাম্প আঁটিয়া শ্যামল সে-খানা জামার পকেটে রাখিল; কাল সকালে নিজের হাতে গিয়া পোষ্ট অফিসের ডাক-বাক্সে দিবে।

সকালে দিনের আলোয় একটা প্রশ্ন মনে জাগিল। সে-প্রশ্নে সে কাতর পীড়িত হইল।

এই যে শান্তিকে চাহিতেছে মন দিয়া, প্রাণ দিয়া—শান্তি তাকে চাহিবে—তার কি হেতু আছে?

হেতু কেন থাকিবে না? শ্যামলের প্রাণে ভালোবাসা আছে—অজস্র বিপুল। তবে?

বয়স! বয়সই কি সব! বয়স-হিসাবে দ্বিধা থাকিলে কিশোরী শান্তি নিত্য এমন আকুল আগ্রহে তার কাছে ছুটিয়া আসিবে কেন? কথা কহিবার লোকের এমন অভাব সত্যই তার ঘটে নাই! তার উপর সে দিনের সেই কাতর নিবেদন—সেই ছলছল দুই চোখ!

শ্যামল যে ভালো বাসিতে জানে, তার প্রাণে ভালোবাসা আছে অজস্র, বিপুল—শান্তি তাহা জানিয়াছে! নারী বিলাস চায় না, ঐশ্বর্য্য চায় না··· নারী চায় ভালোবাসা!

সেই সমুদ্র-তীর। শ্যামল আসিয়া নিত্যকার মত বসিল। আজ শান্তির কাছে ইঙ্গিতে সে প্রাণের কামনা জানাইবে···তারপর ব্যারিষ্টার রজত রায়ের গৃহে গিয়া···

তার দাবীর মস্ত বল—ঐশ্বর্য্য। অভিভাবকেরা যাহা চায়।

আর শান্তি? শ্যামলের প্রাণের পরিচয় শান্তি পাইয়াছে। না পাইলে...

ঐ না শান্তি!···তাই···

সাগরের উচ্ছল জল-তরঙ্গের মত চলচঞ্চল গতি! সে গতিতে হাসির তরঙ্গ যেন উচ্ছুসিয়া উঠিয়াছে!

শান্তি ছুটিয়া আসিল, আসিয়া শ্যামলের হাত ধরিয়া কহিল—আসুন আমার সঙ্গে। আসুন...

যেন কতকালের অন্তরঙ্গ প্রিয়জনের কাছে আব্দার তুলিয়াছে! সে-আব্দারে আদেশের সুর! সে-সুরে কোথাও বাধা নাই, দ্বিধা নাই—পরিপূর্ণ বিশ্বাস···

শ্যামলের বুকের ঝড় একটু থামিয়াছিল। শান্তির স্পর্শে আবার সেই মর্ম্মর-ধ্বনি···মুহূর্ত্তে সে-মৃদুতায় তীব্রতার আমেজ! শ্যামল কহিল—কোথায় যাবো?

শান্তি কহিল—একটা কথা বলবো। কিন্তু...

সহসা সে দীপ্ত হাসির রেখায়-রেখায় লজ্জার আভাস জাগিল। শ্যামলের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল।

শান্তি কহিল—এ-কথা কাকেও বলবেন না—আগে বলুন ..

শ্যামলের মাথার রক্ত ছলাৎ করিয়া উঠিল। সে কহিল—না।...বুকের স্পন্দন আরো তীব্র হইল। চোখের সামনে শান্তির এই লাজ-জড়িত কান্তি! শ্যামলের দুই বাহু...

শান্তি কহিল—একজন নতুন লোক এসেচে। আলাপ করিয়ে দেবো···

বুকটা ছাঁৎ করিল। শ্যামলের দুই চোখে হাজার প্রশ্ন ভিড় করিয়া দাঁড়াইল।

শান্তি কহিল—এই দেখুন লোকটির নাম ..

ছোট একখানি কার্ড শ্যামলের হাতে দিয়া শান্তি বাঁকিয়া দাঁড়াইল...

শ্যামল চাহিল শান্তির পানে। বাঁকিয়া দাঁড়াইলেও শান্তির অপাঙ্গে হাসির বিদ্যুৎ! শ্যামল কার্ডটার পানে চাহিল। কার্ডে ছাপার হরফে নাম লেখা—

T. K. Sen,
Barrister-at-Law.

শ্যামল কহিল—ইনি কে?

শান্তি কহিল—আসুন আমার সঙ্গে—আলাপ করবেন। কাল সন্ধ্যার সময় ইনি এসেচেন—অতিথি।

শ্যামল কহিল—কে?

সলজ্জ-হাস্যে শান্তি কহিল—আমার স্বামী।···

কথাটা বলিয়া শান্তি ছুটিয়া অনেক দূরে চলিয়া গেল—গিয়া দাঁড়াইল। তারপর আবার ফিরিল। ফিরিয়া কহিল—দেরী করবেন না। আসুন···শীগগির। কাকেও না বলে আমি ছুটে এসেচি। চায়ের টেবিল পড়েচে—সে-টেবিলে আপনারও নেমন্তন্ন! আসবেন?

যন্ত্র-চালিতের মত শ্যামলের মাথা নড়িল—মাথা নাড়িয়া সে জানাইল—হাঁ! শান্তির পানে চাহিতে চোখে পড়িল সিঁথির আগে সিঁদুরের সূক্ষ্ম রেখা! এতদিন ও রেখার পানে দৃষ্টি পড়ে নাই! আশ্চর্য্য!

শান্তি কহিল—এখনি আসবেন। নাহলে রাগ করবো—ভয়ঙ্কর রাগ। আর কথা কইবো না...

শান্তি চলিয়া গেল।

শ্যামলের বুকে মুগুর পড়িতেছিল—যেন এখনি ফাটিয়া চূর্ণ হইয়া যাইবে! যেন বুকের উপর দিয়া হাড়-পাঁজরাগুলাকে গুঁড়াইয়া কে লোহার ভারী চাকা চালাইয়া দিয়াছে।··· বুকের স্পন্দন···সংখ্যা করা যায় না তেমনি দ্রুত! চেতনাও বিলুপ্তপ্রায়।

চেতনা ফিরিতে শ্যামল চাহিয়া দেখে, ভাঁটার ঢেউ করুণ কলরবে তটের প্রান্তে আছাড়িয়া পড়িতেছে!

একটা কথা মনে পড়িল। পকেট হইতে রাত্রে লেখা—চিঠিখানি বাহির করিয়া চোখের সামনে ধরিল। গোটা গোটা অক্ষরে খামের উপর লেখা নাম—

শ্রীমতী নীরজা দেবী

No.........

চিঠিখানা ছিঁড়িয়া কুটি-কুটি করিয়া সাগর-জলে ভাসাইয়া দিল; দিয়া ব্লু হোটেলের পথে ফিরিল···

ফিরিয়া একটা টেলিগ্রাম-ফর্ম্ম চাহিয়া লিখিল—

Niraja Debi
Starting to-night...
Shyamal

হোটেলের ম্যানেজারের হাতে সে ফর্ম্মখানা আর একখানা পাঁচ টাকার নোট দিয়া বলিল—টেলিগ্রামটা এখনি লোক দিয়ে পোষ্ট-অফিসে পাঠাবেন—দয়া করে। আমি আসচি···

শ্যামল হোটেল ছাড়িয়া পথে বাহির হইল—সী-ভিউ লজের দিকে লক্ষ্য।

আকাশ তখন রৌদ্রে বেশ দীপ্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

দিন যে আমার অন্ধকার

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আশার স্বপন গেছে ছুটে
নেইরে মধু আবেশ তার,
প্রাণের বাঁধন শিথিল হ'ল
সুখের গীতি-গায়না আর,
দিন যে আমার অন্ধকার।

সাঁঝের বাতি গেছে নিভে—
মধুর ভাতি নাইরে তার,
আকুল পরাণ কাঁদছে কেবল
বইতে নারে বিষাদ-ভার,
দিন যে আমার অন্ধকার।

মরম বীণা বাজ্‌তে নারে—
ছিন্ন হ'ল তাহার তার,
সুধার ধারা ঢাল্‌বে কে আর
বন্ধ সবি হৃদয় দ্বার,
দিন যে আমার অন্ধকার

স্নেহের টানে ডাক্‌বে আর
সকল দিশি বন্ধ তার,
প্রাণের উজান আসে থেমে
শান্ত হবে স্রোতের ধার
দিন যে আমার অন্ধকার

বাণীর গতি নীরব হ'ল—
সান্ত্বনা কেউ দেয়না আর,
শ্রবণ আসে রুদ্ধ হয়ে
হৃদয় মাঝে বিষমভার
দিন যে আমার অন্ধকার।

ভারতে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম

(১)

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সন্ন্যাস-ধর্ম্মের দুই একটী কথা আলোচনা করিবার জন্য বর্ত্তমান এই প্রবন্ধ। ঘর-বাড়ী, বিষয়-সম্পত্তি আরাম-আয়েশের যতকিছু সব ছাড়িয়া যাঁহারা ধর্ম্মের কোন বিশেষ বা বিশিষ্ট আচরণ করেন, সচরাচর আমরা তাঁহাদের সাধু সন্ন্যাসী বলিয়া থাকি। সাধু সন্ন্যাসীদের সকল জায়গায় দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাঁহাদের কোন এক জায়গায় দীর্ঘকাল থাকিবার নিয়ম নাই। এই সব সাধু সন্ন্যাসীর সংখ্যা বড় কম নয়, তবে আগে বেশী লোকে সন্ন্যাসী হইত বা এখন বেশী লোকে হয় একথা নিশ্চয় করিয়া বলিবার মত উপাদান আমাদের নাই। অন্য দেশেও সাধু সন্ন্যাসী ছিল এখনও আছে, কিন্তু আমাদের দেশে ধর্ম্মের নামে সন্ন্যাসী যত বেশী হয় অন্য দেশে কখনও তত ছিল না—নাই-ও। আমাদের দেশে আগে যাঁহারা সন্ন্যাসী হইতেন, তাঁহারা ঋষিদের, দেবতাদের, বড় বড় বীরের তপশ্চরণের কথা শুনিয়া তপ করিবার জন্য সন্ন্যাস লইতেন। পারিবারিক কোন কারণে, ঋণের দায়ে, কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়া তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অথবা অন্য কোন কারণে যাঁহারা সন্ন্যাসী হইতেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িলে জানিতে পারা যায় যে, ঋষিরা, দেবতারা, হাজার হাজার বছর ধরিয়া তপস্যা করিতেন। এ তপস্যা—কৃচ্ছ্র সাধন তাঁহাদের কিসের জন্য; তাঁহাদের একটা কামনা থাকিত যে শরীরের উপর সমস্ত রকমের কষ্ট দিয়া দেহকে কৃশ করিয়া একান্ত ভাবে উপাসনা করিলে—তাঁহাদের প্রার্থিত অলৌকিক শক্তি মিলিবে। প্রাচীন ঋষিরা স্বর্গ ও মর্ত্ত্য-বাসীর প্রভূত প্রভাব, একরাজ্য, চক্রবর্ত্তি সুখ, শত্রু দমন প্রভৃতি লাভ করিবার জন্য তপস্যায় তনু, মন, প্রাণ নিয়োগ করিতেন। অন্যে পরে কা কথা,—পরম পুরুষকেও সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে কল্প কল্পান্ত ধরিয়া কৃচ্ছ্র সাধন করিতে হইয়াছিল। স্বয়ং শিব সংসারত্যাগী নগ্ন সন্ন্যাসী রূপে যুগ-যুগান্তব্যাপী তপস্যা করিয়াছেন। সন্ন্যাসীরা তাঁহাকে সন্ন্যাসীর আদর্শ—চূড়ান্ত মনে করিয়া তাঁহারই চরণ-প্রান্তে অঞ্জলি দান করিয়া কৃতার্থ হ'ন। সন্ন্যাসীদের আত্ম-নির্য্যাতনের শেষ নাই। তপঃপ্রভাবে অসম্ভব সম্ভব হয়। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের আখ্যায়িকা কে না জানে! তপঃপ্রভাবে বিশ্বামিত্রের অলৌকিক শক্তির কথা সকলেরই বিদিত। তপঃ করিয়া নহুষ ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন (মহাভারত আদি পর্ব্ব ৩১৫১ শ্লোক)। মহাভারতের আদি পর্ব্বে (৬৬৩৮ ইত্যাদি) ও রামায়ণের বালকাণ্ডে (৫১ হইতে ৬৫ শ্লোক) কথাটী বেশ করিয়া বিবৃত আছে।

তপের প্রভাব মহান্। ইহা দ্বারা জাতিস্মরতা লাভ করা যায় (মনু ৪র্থ অধ্যায়)। তপের বিপুল প্রভাবের কথা মনুসংহিতায় ১১শ অধ্যায়ে (২৩৯ প্রভৃতি শ্লোক, আছে। দ্বাদশ অধ্যায়ের ৮৩ শ্লোকে মনু উপদেশ করিয়া-ছেন—তপে পরমানন্দ লাভ করা যায়; ঋগ্বেদও (১০. ১৩৬. ৬) উপদেশ করিয়াছেন—

অপ্সরসাং গং ধর্বানাং মৃগাণাং চরণে চরন্।
কেশী কেতস্য বিদ্বান্সখা স্বাদুর্মদিং তমঃ ॥ ৬ ॥

—দীর্ঘকেশ সন্ন্যাসীরা ঐশী শক্তি-বলে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোলোকে বিচরণ করিয়া থাকেন।

সন্ন্যাস চারিটী আশ্রমের অন্তিম আশ্রম। ভারতবাসী যখন পঞ্জাবে বাস করিতেন, তখন ব্রাহ্মণ, জাতি বা আশ্রমের কোন কথাই ছিল না। দশম মণ্ডলের ৯০ সূক্তে (১।১২ ঋকে) একবার মাত্র জাতির কথা আছে। ঋগ্বেদে কোথাও আশ্রমের নাম-গন্ধ নাই। অথর্ব্ববেদের পঞ্চাদশ কাণ্ডে একটা জাঁকাল রকমের বর্ণনা আছে, আর সে বর্ণনাটী ব্রাত্যের বর্ণনা। এই বর্ণনায় ব্রাত্যের মূর্ত্তি সম্পূর্ণ রহস্যময়। একবার ব্রাত্য সর্ব্বব্যাপী দেবের সর্ব্বধর্ম্মমণ্ডিত হইয়া উপস্থিত হইতেছেন; আবার কখনও বা ক্ষুৎক্ষাম, বাসপ্রার্থী মানুষ পরিব্রাজকের মূর্ত্তিতে ব্রাত্যের আবির্ভাব হইতেছে। অথর্ব্ববেদের

এই অংশে আমরা ব্রাত্যের মানুষী বৃত্তির পরিচয় পাই। যথা—

ব্রাত্য আসীদীয়মানঃ। ১

স বিশোঽনুব্যচলৎ। ৯—১

তং সভা চ সমিতিশ্চ সেনা চ॥—৯-২

সুরা চানুব্যচলন্......॥৯—৩

তদ্যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যো রাজ্ঞোঽতিথি-
গৃ‍র্হানাগচ্ছেৎ॥ ১০-১

শ্রেয়াংসমেনমাত্মনো মানয়েত্তথা ক্ষত্রায় না বৃশ্চতে
তথা রাষ্ট্রায় না বৃশ্চতে। ১০-২

তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যোঽতিথির্গৃহানগচ্ছেৎ॥১॥১১-১

স্বয়মেনমভ্যুদেত্য ব্রুয়াদ্‌ব্রাত্য কাবাৎসী ব্রাত্যোদকং ব্রাত্য তর্পয়ন্তু ব্রাত্য যথা তে প্রিয়ং তথাস্তু ব্রাত্য যথা তে বশস্তথাস্তু ব্রাত্য যথা তে নিকামস্তথাস্ত্বিতি ১১-১২

তদ্‌যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্য উদ্ধৃতেষগ্নিষধিশ্রিতে
অগ্নিহোত্রে অতিথির্গৃহানাগচ্ছেৎ॥ ১২—১

স্বযমেনমভ্যুদেত্য ব্রূয়াদ্বাত্যাতিসৃজ হোষ্যামীতি॥ ১২-২

স চাতিসৃজেজ্জুহুয়ান্ন চাতিসৃজেন্ন জুহুয়াৎ॥১২—৩

তদ্‌যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্য একাং রাত্রিমতিথির্গৃহে বসতি।
যে পৃথিব্যাং পুণ্যালোকাস্তানেব তেনাবরুন্ধে॥ ১৩-১

অথর্ব্ব বেদের এই উদ্ধৃত অংশ থেকে বুঝা গেল যে (১) ব্রাত্য বেড়াইয়া বেড়ান, লোকেদের মধ্যে তাঁর যথেষ্ট গতাগতি আছে, তিনি খুব জনপ্রিয়, আর লোকে, তাঁর যথেষ্ট খাতির যত্ন করে।

(২) যখন ব্রাত্য রাজার গৃহে অতিথিরূপে আসেন তখন রাজাও তাঁহাকে কম সম্মান করেন না।

অগ্নিহোত্রীদের নিকট ব্রাত্য অনেক সময়েই অতিথি হইয়া আসেন। এইরূপ অতিথি হইয়া আসিলে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কেহ হোম করিতে পারিত না।

তারপর এই ব্রাত্য বলিলে ঠিক কি বুঝায় তাহা বলিবার উপায় নাই—ব্রাত্য যে পরিব্রাজক এ কথাও বলা যায় না; তবে ব্রাত্যের মধ্যে সাধু-সন্তের যথেষ্ট ধর্ম্ম আছে ইহা বেশ অনুমান করিয়া লইতে পারা যায়।

প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় আর্য্যগণের ভারত-বিজয়ের পূর্ব্বে ভারতে এক জাতি ছিল; পাছে তাঁহাদের সঙ্গে আর্য্যেরা মিশিয়া যান এই ভয় আর্য্যদেরও যথেষ্ট ছিল। কাজেই ক্রমশঃ শূদ্র নামে জাতি। আবার আর্য্যদের নিজেদের মধ্যেও দেখা যায় একটা শ্রেণীভেদও হইয়াছিল।

আর্য্যদের অধিকাংশই ছিল বৈশ্য। ভারত-বিজয়ের সময়ে যাঁহারা জয় করেন তাঁহারা কিন্তু ছিলেন ক্ষত্রিয়। ইঁহারা ছিলেন রাজা—বৈশ্যদের নিকট হইতে কর আদায় করিতেন, তাঁহাদের শাসন করিতেন। কিন্তু আর একটী জাতি ছিল—তাঁহারা বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব চালাইতেন। পুরাতন বৈদিক ঋষিদের বংশে ইঁহাদের জন্ম—ইঁহারা ছিলেন ব্রাহ্মণ। পুরাতন বৈদিক মন্ত্রগুলিকে ইঁহারাই বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। এইগুলি না হইলে আবার কোন ক্রিয়া-ব্যাপার সম্পন্ন হইবার উপায় ছিল না। সে যুগে উচ্চতর শিক্ষারও উপায় ছিল না।

ব্রাহ্মণদের হাতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ক্রিয়া ও আর্য্য যুবকের শিক্ষার ভার আসিয়া পড়িল। ক্রমশঃ এটী একটী পদ্ধতিতে পরিণত হইল। তারপর এই বিধি হইয়া দাঁড়াইল যে, প্রত্যেক আর্য্য-যুবা সে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য যাহাই হোক না কেন, তাহাকে কয়েকটী বছর গুরু বা আচার্য্য ব্রাহ্মণ-গৃহে কাটাইয়া আসিতে হইবে।

প্রথম প্রথম পিতাই গুরুর কাজ করিতেন। তাঁর সংসারে যতটুকু সম্ভব শিক্ষা দিতেন। প্রায়ই বাপ ছেলের শিক্ষা-বিষয়ে ছেলের যে সমস্ত কৌতুহল হইত সে গুলির নিবৃত্তি করিতে পারিতেন না। নানা গণ্ডগোল বাধিত। কাজেই যাঁহারা এ বিষয়ে উপযুক্ত ওস্তাদ (authority) তাঁহাদের কাছেই বিদ্যা-শিক্ষা হইতে লাগিল। ছাত্রকে বলা হইত—চরক। চরক শব্দের মানে যিনি ভ্রমণ করেন। চরণশীল এই চরক ছাত্র খুব ভ্রমণ করিতেন।

মদ্রেষু চরকাঃ পর্য্যব্রজাম তে পতঞ্চলস্য কাপ্যস্য গৃহানৈম—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৩য় অধ্যায় ৩য় ব্রাহ্মণ ১ম অনুবাক।

প্রসিদ্ধ আচার্য্যেরাও জায়গায় জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

অথ গার্গ্যো হ বৈ বালাকিরনুচানঃ সংস্পৃষ্ট আস

সোঽবশদৃশীনরেষু স বসন্ মৎস্যেষু কুরুপঞ্চালেষু কাশি-বিদেহেষ্বিতি স হাজাতশত্রুং কাশ্যমেত্যোবাচ।
—কৌষীতকি উপনিষৎ ৪—১।

এমন সব আচার্য্য থাকিতেন যাঁহাদের নিকট দলে দলে ছাত্রও আসিত। তারপর দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক আর্য্যকে কয়েক বৎসর গুরুগৃহে বাস করিতেই হইত। আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র স্থির করিয়া দিয়াছিলেন বার বৎসর—এ সম্বন্ধে অন্য মতও আছে।

আমরা তিন জাতির কথা বলিয়াছি। এই তিন জাতির পরিচ্ছদ বা শিক্ষা এক রকমের ছিল না। তিন জাতির শিক্ষার পদ্ধতি তিন রকমের ছিল। ঐতরেয় আরণ্যক বলেন--ন অপবক্তে—নিজে শিক্ষক না হইলে কোন মত কাহাকেও বলিবেন না। গুরু পড়াইতেন, আর শিষ্য তার পরিবর্ত্তে গুরুর সমস্ত কাজ করিত। কাজের ফাঁকে বেদ উচ্চারণ শিক্ষা করিত। পাঠ শেষ হইলে বাড়ী আসিয়া গুরু দক্ষিণা দিত। কেহ বাড়ী আসিয়া গৃহস্থ হইত, কেহ শেষ জীবন পর্য্যন্ত গুরুগৃহে থাকিয়া "নৈষ্ঠিক" হইত; কেহ জঙ্গলে গিয়া বানপ্রস্থ হইত। কেহ বা ভিক্ষু-বেশে ঘুরিয়া বেড়াইত। বেদে আমরা আশ্রম হিসাবে খুব বেশী কিছু পাই না—তবে প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলি আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ধীরে ধীরে চতুরাশ্রম গড়িয়া উঠিয়াছে। ছান্দোগ্য ৭ম প্রপাঠক ৫ম খণ্ডে তিন আশ্রমের কথা বলিয়াছেন। আবার বৃহদারণ্যকে পাই, মুনি অপেক্ষা ব্রাহ্মণ বড়। বানপ্রস্থ—ধর্ম্মস্কন্ধ—গৃহস্থাশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে ছিল। (ছান্দোগ্য ২।২৩।১) তারপর বার্দ্ধক্যে বন-গমন—এটী ক্রমশঃ হইত। দৃষ্টান্ত যাজ্ঞবল্ক্যের দেওয়া যাইতে পারে। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ানীকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা হইতে এইটুকু বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, তখনও তৃতীয় ও চতুর্থ আশ্রমের বিশেষ পার্থক্য করা হয় নাই। এ দিকে আবার বৃহদ্রথ রাজার বিষয়ে আলোচনা করিলে দেখা যায় ব্যাপারটী অন্যবিধ; তিনি রাজ্য ছাড়িলেন, বনে গেলেন, শরীরকে যতদূর কষ্ট দিবার তাহা দিলেন; একদৃষ্টে সূর্য্যের দিক চাহিয়া রহিলেন, হাত উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিন্তু শেষে ইহাও বলিলেন 'আমি আত্মাকে জানিলাম না।' আত্মাকে আবার না জানিয়া যে বহু সহস্র বর্ষ কৃচ্ছ্র সাধন করে সে কিন্তু চরম পুরস্কার লাভ করে—(বৃহদারণ্যক উপনিষদ্—৩।৮।১০)

সন্ন্যাসে পিতৃযান লাভ করা যায় (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ—৬।২।১৬)। তপঃক্লেশ দ্বারা উপবাস দ্বারা ব্রাহ্মণগণ আত্মাকে বিবিদিষন্তি"—ঐ ৪।৫।২২।

কেহ কেহ বলেন (মৈত্রেয়ানী উপনিষদ্—৪।৩)—নাতপস্কস্যাঽত্মজ্ঞানেঽধিগমঃ—তপঃ না করিলে আত্মজ্ঞান হয় না। আবার কাহারও মতে তপের কোনও দরকার নাই (জাবাল উপনিষদ্—৪)।—যদি মুক্তি মানে নিজেকে আত্মা বলিয়া জানা হয় তাহা হইলে বানপ্রস্থের জন্য তপঃ এবং গৃহস্থের জন্য যজ্ঞ বা বেদপাঠের দরকার নাই। এই উক্তি বৃহদারণ্যক উপনিষদে দৃঢ় ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে (বৃহঃ উঃ ৩।৫।৪।৪।২১)। শ্বেতাশ্বতর বলেন—যিনি আত্মাকে জানেন তিনি "অত্যাশ্রমী"—তিন আশ্রমের বাহিরে (শ্বেতাশ্বঃ ৬।২১)। বৃহদারণ্যক বলেন, তিনি সব ছাড়িয়া যাহা পাইবার পাইয়া থাকেন—তিনি সন্ন্যাসী, পরিব্রাজক, ভিক্ষু (বৃহঃ উঃ ৩।৫।৪।৪।২২)। তিন আশ্রমের যাহা কিছু সব ছাড়িয়া আত্মার অন্বেষণে থাকার নাম সন্ন্যাস—আর এই অর্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পরে অনেকগুলি উপনিষদও হইয়াছে—যেমন ব্রহ্ম, সন্ন্যাস, আরুণেয়, কণ্ঠশ্রুতি পরমহংস, জাবাল, আশ্রম।

সন্ন্যাস কিন্তু তপঃ লইয়া। এই তপঃ বা তপস্যা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা দরকার। ঋগ্বেদে তপঃ শব্দ বা তাহার অর্থের কোন কথা নাই। তপের কল্পনা আর্য্যেরা নিশ্চয়ই প্রথমে করেন নাই। যতদূর বুঝিতে পারা যায় তাহা হইতে এইটুকু বলিতে পারা যায় যে, আর্য্যেরা তপের কল্পনা বাহির হইতে পান। ঋগ্বেদ বলেন—"তপিষ্ঠেন হন্মনা হংতনা তম্" ৭।৫।৯।৮—তোমরা খুব গরম বজ্র দিয়া তাহাকে মারিয়া ফেল। মৈত্রেয়ানী সংহিতা ইহাই বজায় রাখিয়াছে ৪।১০।৫; কিন্তু অথর্ব্ববেদ (৭।৭৭।২), তৈত্তিরীয় সংহিতা (৪।৩।১৩।৪), কৌষীতকি সংহিতা (২১।১৩) 'তপিষ্ঠ' বদলাইয়া 'তপসা' করিয়াছেন। ইহা হইতেই তপের প্রভাব, তপের অলৌকিক শক্তি, তপের মহত্ত্বের ধারণা আসিয়াছে। সামবেদ, যজুর্ব্বেদ, অথর্ব্ববেদ তপের কথাই বলেন নাই। এমন কি ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে তপের উল্লেখ নাই বলিলেও চলে। তবে শতপথ-ব্রাহ্মণে তপশ্চরণ পুরাপুরি স্বীকৃত হইয়াছে (১০—৪।৪।৪) তপের ব্যাপার যাহা কিছু উপনিষদে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। তপ তৃতীয় আশ্রমের।

গীতার যোগ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

দশম পরিচ্ছেদ

গীতার সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে অধ্যাত্ম-সাধন সম্বন্ধে নিগূঢ় নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। সপ্তমে যাহার ভনিতা করা হইয়াছে, অষ্টমে তাহার ব্যাখ্যা, নবমে সবিশদ তাহাই পরিব্যক্ত হইবে।

অষ্টম অধ্যায়ের 'প্রয়াণকালে চ কথং' এই শ্লোকের উত্তর ছলে শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়তত্ত্বের সম্যক্ নির্দ্দেশ দিয়াছেন; কিন্তু বিভিন্ন মতাবলম্বীদের সম্মুখে প্রাচীন শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যও স্থাপন করিয়াছেন। যাঁহারা আত্মসমর্পণ যোগের সন্ধান পাইয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে অষ্টম অধ্যায়ের মিশ্র শ্লোকগুলির ভিতর হইতে শ্রীভগবানের অমোঘ নির্দ্দেশটী বাছিয়া লইতে বিলম্ব হয় না। মানুষ সহজে আশ্রয়তত্ত্ব সম্মুখে পাইয়া, তাহাতেই ভগবানের অধিষ্ঠান বিশ্বাস করিতে পারে না। এই জন্য অষ্টম অধ্যায়ে নানা শাস্ত্রবাদের অবতারণা করিয়া নবম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"ইদন্তু তে গুহ্যতমম্ প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।

জ্ঞানবিজ্ঞানসহিতম্ যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ।" ৯।১

ইদং (বক্ষ্যমানরূপম্) ব্রহ্মজ্ঞানম্ গুহ্যতমম্ (গোপ্যতমম্) তু বিজ্ঞানসহিতম্ জ্ঞানম্ অনসূয়বে (দোষদৃষ্টিরহিতায়) তে (তুভ্যম্) প্রবক্ষ্যামি (কথয়িষ্যামি) যজ্‌জ্ঞাত্বা (প্রাপ্য) অশুভাৎ (পাপাৎ) মোক্ষ্যসে (মুক্তোভবিষ্যসি)।

ভগবান কহিলেন—'তুমি অসূয়াবিহীন; এই হেতু তোমাকে সবিজ্ঞান তত্ত্বকথা বলিতেছি। ইহা বিদিত হইলে, তুমি পাপ হইতে মুক্ত হইবে।'

"রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।

প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখম্ কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥" ৯।২

ইদম্ (বক্ষ্যমানরূপম্ তত্ত্বম্) রাজগুহ্যম্ (গুহ্যানাম্ রাজা) রাজবিদ্যা (বিদ্যানাম্ রাজা) উত্তমম্ (শ্রেষ্ঠম্) পবিত্রম্ (পাবনম্) প্রত্যক্ষাবগমম্ ([illegible] অর্থাৎ দৃষ্টফলম্) ধর্ম্ম্যম্ কর্ত্তুম্ সুসুখম্ (সুখসম্পাদ্যম্ অব্যয়ম্ অক্ষয়ফলম্)।

'এই তত্ত্ব সকল বিদ্যার রাজা, সকল গুহ্যবস্তুর সম্রাট্ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা বিশুদ্ধ, সাক্ষাৎ ফলপ্রদ, সুখসম্পাদ্য, এই ধর্ম্ম অক্ষয় ফলপ্রদ।'

'অশুভ' শব্দের অর্থ সকল ভাষ্যকারগণই সংসারবন্ধন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"জরামরণমোক্ষায়"—আমাকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা যজনা করেন, তাঁহারাই ব্রহ্মকে জানেন, সমস্ত অধ্যাত্মবস্তু জানেন এবং অখিল কর্ম্ম বিদিত হন। ইহাতে ভগবান, ভাগবত স্বভাব ও ভাগবৎ কর্ম্মরূপ জীবধর্ম্মের তিনটি নিত্য তত্ত্বই প্রকাশিত হয়। ইহা বলাই বাহুল্য। এই তিনই এক, একই তিন এবং যে গুহ্যতম তত্ত্ব অধিগত হইলে পাপ অর্থাৎ প্রাকৃত জীবনের অশুদ্ধি দূর হয়, তাহাই এই ক্ষেত্রে উক্ত হইল। গীতার যোগ জন্ম-মৃত্যু-ভীতি অপনোদন করিবার জন্য নহে; পরন্তু জীবের কর্ম্ম ও স্বভাব ভগবানে উঠাইয়া দিয়া ভাগবত জন্মলাভ করাই তাহার উদ্দেশ্য। গীতার যোগ গোড়া হইতেই জীবন-বাদের কথাই বলিতেছে এবং এই গুহ্যতম জ্ঞানলাভে "মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ" প্রভৃতি উক্তি সপ্তম অধ্যায়ের আটাশ শ্লোকের "যেষাম্ ত্বন্তগতম্ পাপম্" ইত্যাদিরই প্রতিধ্বনি। এখানে জ্ঞান তত্ত্বের অন্তরঙ্গ বিষয়, বিজ্ঞান যাহা প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গোচর। এই সবিজ্ঞান জ্ঞানের কথা সপ্তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকেও বলা হইয়াছে। সে ক্ষেত্রে "কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ"—তাহা জ্ঞান লক্ষণার দৃষ্টান্ত, আর "ভূমিরাপোঽনল" প্রভৃতি বিজ্ঞানের ব্যঞ্জনা প্রকাশ করিয়াছে। এই ক্ষেত্রেও যোগের দৃষ্টি অধিকতর সূক্ষ্ম তত্ত্বে অরুন্ধতী প্রদর্শনের ন্যায় পূর্ব্বের স্থূল বিষয় দেখাইয়া পরম [illegible]

ততমিদম্ সর্ব্বম্” ইহা জ্ঞান; “পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্” ইহা বিজ্ঞান। এই সকল কথা পরে আসিতেছে। সপ্তম শ্লোকে, সবিজ্ঞান জ্ঞানে—যাহা জানিলে জানিবার কিছু আর বাকী থাকে না—বলা হইয়াছে। আর এই ক্ষেত্রে সর্ব্বতোভাবে অন্ধতা হইতে মুক্তির সন্ধান দেওয়া হইতেছে। যতক্ষণ ইচ্ছা, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব, মোহরূপ পাপে মানুষের চিত্ত সম্মোহিত ততক্ষণ এই সর্ব্ববিদ্যার রাজা, সর্ব্বোত্তম গোপন রহস্যের তত্ত্বকথা কেহ জানিতে পারে না। ইহা যেমন পবিত্র তেমনই আশু-ফলপ্রদ।

তপশ্চরণাদিতে যে ক্লেশ, এই ভাগবত ভক্তি-সাধনায় তাহার কিছুই নাই। ইহা তৃপ্তির পর তৃপ্তিতে হৃদয় ভরাইয়া তুলে। ইহা অক্ষয় সুখে দেহ মন অভিষিক্ত করিয়া দেয়, তাই ইহা “সুসুখম্”। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাহাদের যাহারা ইহা হইতে বঞ্চিত। তাহাদেরই কথা পরবর্ত্তী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

“অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যু-সংসারবর্ত্মনি॥” ৯।৩

হে পরন্তপ (অরিসূদন) অস্য ধর্ম্মস্য (নিরতিশয় মদ্‌বিষয়তয়া স্বয়ং নিরতিশয়প্রিয়রূপস্য) [সাধনে] অশ্রদ্দধানাঃ (শ্রদ্ধাবিরহিতাঃ) পুরুষাঃ (মানবাঃ) মাম্ (পরমেশ্বরম্) অপ্রাপ্য (অলব্ধ্বা) মৃত্যু-সংসারবর্ত্মনি (মৃত্যুব্যাপ্ত সংসারমার্গে) নিবর্ত্তন্তে (পরিভ্রমন্তি)।

‘হে অরিসূদন! এই মদ্‌বিষয়ক স্বয়ং নিরতিশয় প্রিয় ধর্ম্মের সাধনে শ্রদ্ধাবিরহিত পুরুষেরা আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া মৃত্যু-যন্ত্রণাযুক্ত সংসারমার্গে বিচরণ করিয়া থাকে।’

পূর্ব্বশ্লোকে তিনি পরম ফলপ্রদ অনায়াস লভ্য যে ধর্ম্মের প্রশংসাবাদ করিলেন, তাহাতে মনে হইতে পারে, মানুষ কেন এই সহজ তত্ত্বলাভের পথ পরিত্যাগ করিয়া সংসারে অশেষ তাপত্রয়ে জর্জ্জরিত হইয়া থাকে। ইহার কারণ, যে প্রত্যয় থাকিলে তত্ত্ববস্তুতে শ্রদ্ধাবান্ হইবে, তাহার অভাবশতঃই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। চতুর্থ অধ্যায়ে চত্বারিংশ শ্লোকেও এই কথাই তিনি বলিয়াছেন—“অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি”—ইহা একই কথার পুনরুক্তি। সাধনার পথে তিনি বিশ্বাসের মূল্য [illegible]

তিনি অর্জ্জুনের চিত্ত একাগ্র করিয়া তুলিতেছেন, পরবর্ত্তী দুইটী শ্লোকে সেই জ্ঞানবস্তুর বিশ্লেষণে উহা অধিকতর পরিস্ফুট করিলেন।

“ময়া ততমিদম্ সর্ব্বম্ জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহম্ তেষ্বস্থিতঃ॥ ৯।৪
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥” ৯।৫

অব্যক্ত মূর্ত্তিনা (অতীন্দ্রিয়স্বরূপেণ) ময়া ইদম্ সর্ব্বম্ জগৎ (দৃশ্যজাতম্) ততম্ (ব্যাপ্তম্) সর্ব্বভূতানি (স্থাবর-জঙ্গমানি) মৎস্থানি (ময়ি স্থিতানি) অহং (পরমেশ্বরঃ) চ তেষু ভূতেষু ন অবস্থিতঃ।

মে (মম) ঐশ্বরম্ (অসাধারণম্) যোগম্ (যুক্তিম্) পশ্য (অবলোকয়)। ভূতানি (ব্রহ্মাদীনি) ন চ মৎস্থানি ময়ি (স্থিতানি) মম আত্মা (পরম্ স্বরূপম্) ভূতভৃৎ (ভূত ধারকঃ) ভূতভাবনঃ (ভূতপালকঃ চ) (তথাপি অহং ন ভূতেষু অবস্থিতঃ)।

‘এই সকল পরিদৃশ্যমান জগৎ ইন্দ্রিয়াতীত আমারই রূপে পরিব্যাপ্ত। আবার সর্ব্বভূত আমাতেই অবস্থিত কিন্তু আমি তৎসমূহে অবস্থিত নহি।’

‘আবার আমার অলৌকিক প্রভাব দেখ—ভূত-সকলও আমাতে অবস্থিতি করিতেছে না—আমার আত্মা ভূত-সকলকে ধারণ করিয়া আছে এবং পালন করিয়াও ভূত-সমূহে অবস্থিত নহে।’

সর্ব্বজগৎ অর্থাৎ ভূতভৌতিক তৎকারণরূপ পরিদৃশ্যমান সব কিছুতে অতীন্দ্রিয় স্বরূপের দ্বারা তিনি বিদ্যমান আছেন। সর্ব্বভূত তাঁহাতেই অবস্থিত, অথচ তিনি কিছুতে অবস্থিত নহেন—ইহা তত্ত্ব-জ্ঞান-রহিত লোকের নিকট হেঁয়ালি বলিয়াই মনে হইবে। ভারতের পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে সৃষ্টি-তত্ত্বের যেরূপ বিশদ বিশ্লেষণ হইয়াছে এবং তাহার সামান্য আলোচনাও যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট তত্ত্বজ্ঞান-সমন্বিত বর্ত্তমান শ্লোকদ্বয় নূতন বলিয়া প্রতিভাত হইবে না। তিনি—

“পরঃ পরতাম্ পরমঃ পরমাত্মাত্মসংস্থিতঃ।
রূপ বর্ণাদি-নির্দ্দেশ-বিশেষণ-বিবর্জ্জিতঃ॥

অপক্ষয়-বিনাশাভ্যাম্-পরিণামর্দ্ধিজন্মভিঃ।
বর্জ্জিতঃ শক্যতে বক্তুম্ যঃ সদস্তীতি কেবলম্ ॥"

পরাৎপর শ্রেষ্ঠ আত্মসংস্থিত পরমাত্মা—রূপবর্ণাদি-নির্দ্দেশ-বর্জ্জিত, অপক্ষয়-বিনাশ-পরিণাম-বৃদ্ধি-জন্ম-রহিত যিনি, তিনি সর্ব্বদা আছেন; এই কথা বলিলে সত্যই কথাটা বন্ধ্যার পুত্রতুল্য কল্পনামাত্রই হয়। কিন্তু তিনি জগতে সর্ব্বত্র এবং সমস্তই তাঁহাতে বাস করিতেছে। অথচ তিনি এই সকলেতে নহেন। এই কথা উক্ত হওয়ায় দৃশ্যজাত পদার্থ-পুঞ্জের প্রত্যক্ষ অববোধের ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও, এই পরিদৃশ্যমান রূপের পশ্চাতে একটা স্বরূপেরই আভাস দেয়। তাঁহাতে নিখিল ভুবন. যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম সকল পদার্থই তাঁহাতে অবস্থিত। পরমার্থতঃ তিনি যদি ইহারই মধ্যে নিহিত হইতেন, তাঁহার অসীম স্বরূপের ব্যাঘাত হইত। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"

এই চরাচর সেই কারণরূপ ভগবানে অবস্থিত। কার্য্যভূত ঘটাদিতে যেমন তৎ-কারণ মৃত্তিকা নিঃশেষে অবস্থিত অসঙ্গত বলিলে হয়, সেইরূপ কারণ-স্বরূপ শ্রীভগবান কখনই ভূতসমূহে নিঃশেষে অবস্থিত হইতে পারেন না। অনেকে মনে করিতে পারেন, কারণ-স্বরূপ সেই পরম পুরুষ আত্ম-রূপে ব্রহ্মাদিতত্ত্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র মূর্ত্ত হইয়াছেন। তাঁহার অসীমতা প্রদর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাই বলিলেন—আমি অব্যক্ত-মূর্ত্তির দ্বারা সব কিছুকে ব্যক্ত করিয়াছি; ভূত-সমূহ আমাতে অবস্থিত, কিন্তু আমি তৎসমূহে অবস্থিত নহি।

সপ্তম অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন—

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোক্তম্ সূত্রে মণিগণা ইব ॥"

এই শ্লোকে বিশ্ব ব্যাপার তাঁহাতে সংলগ্ন রহিয়াছে, এই কথাই ব্যক্ত করার জন্য ঐরূপ দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইয়াছিল। তিনি সৎ-স্বরূপ ও তাঁহারই স্ফুরণে সর্ব্ব জগৎ অনুস্যূত ও বিকশিত; কিন্তু তিনি সৃষ্টির অতীত। এই শ্লোকে তাহাই বিশদীকৃত হইল।

এইরূপে অব্যক্ত-মূর্ত্তির দ্বারা সর্ব্বজগৎ অবধৃত বা পরিব্যাপ্ত বলায়, জড় ও চৈতন্যাত্মক জগতকে ধৃত করার সহিত নিয়মিত করারও বিজ্ঞান পাওয়া যাইতেছে। শ্রুতিতে আছে—"যস্যাত্মা শরীরম্"—আত্মা যাঁহার শরীর। শরীর থাকিলে, তাহার নিয়মনের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। শরীরকে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় হইতে নিয়ন্ত্রিত করা আমাদের স্বভাব-স্বরূপ; তদ্রূপ তাঁহার শরীর-রূপ আত্মাকে আত্ম-শক্তিতে চালাইতে, ফিরাইতে এবং রক্ষা করিতে তাঁহারই কর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদিত হয়। কিন্তু ইহাতে ভগবানের অন্তর্য্যামিত্ব ক্ষুন্ন হইয়া পড়ে। কেননা, "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ যঃ পৃথিবীং ন বেদ, যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্ যঃ আত্মানং ন বেদ," ইহাতে ব্যাপ্তি-বোধকার্থ "মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি" কথার পর "ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ" এই কথায় তাঁহার "শেষিত্ব" প্রতিপাদিত হওয়ায় তাঁহার অন্তর্য্যামিত্ব প্রমাণিত হইল।

সপ্তম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে "অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ" ইত্যাদি শ্লোকে জগদ্ব্যাপ্তির কথা বলা হইয়াছিল। এই ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ কেবল তাহার পুনরুক্তি করিলেন না, নিজের অন্তর্য্যামিত্ব প্রদর্শন করিয়া রাজ-বিদ্যার মর্য্যাদা রাখিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী শ্লোকে তিনি আবার বলিতেছেন—

"ন চ মৎস্থানি ভূতানি" অর্থাৎ ভূতসমূহ আমাতেও অবস্থিত নহে। এই কথা বলিয়া তিনি অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "আমার অসাধারণ প্রভাব অবলোকন কর। অঘটন-ঘটন-চতুর ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় আমি কোন বস্তুরই আধেয় নহি এবং কোন বস্তুর আধার নহি। আমার আত্মা যাবতীয় ভূত-পদার্থকে ধারণ ও পোষণ করিয়া থাকে, আমি কিন্তু ভূত মধ্যে সংস্থিত নহি।" কথাটা একান্ত পূর্ব্ব শ্লোক হইতে বিরুদ্ধবৎ মনে হইলেও, প্রকৃত পক্ষে এই কথায় সৃষ্টি-তত্ত্বকে যথাযথ অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা হইয়াছে। জীব যেমন অহঙ্কার-প্রভাবে এই দেহ ধারণ ও পালন করে ও তৎ-সংশ্লিষ্ট ভাবে বাস করে, জ্ঞানঘন পরম পুরুষ তদ্রূপ ভূত-সমূহকে ধারণ ও পালন করিলেও তৎ-সমূহে সংশ্লিষ্ট নহেন।

বেদোক্ত ঈক্ষণাদির কর্ত্তা সেই পুরুষ, যিনি তাঁর ব্যক্ত ও অব্যক্তাদি যোগ-প্রভাবে কালের বুকে সৃষ্টিকে প্রকাশিত করেন।

'ব্যক্ত মহদাদি তত্ত্ব, অব্যক্ত মায়া, আর সৃষ্টির সময়ে এই পুরুষ ও মায়া পরস্পর সংযুক্ত হইয়া পুনরায় বিযুক্তির ফলে যে প্রলয় উপস্থিত হয়, এই উভয় ঘটনার মধ্যবর্ত্তী অবস্থাই 'কাল' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

তিনি পূর্ব্ব শ্লোকে আপনাকে সর্ব্বভূতস্থিত বলিয়া অতঃপর সৃষ্টি আত্ম-প্রকৃতিতেই সংস্থিত এবং তাহাই যোগ ও মায়া, এইরূপ উক্তি করিলেন। তারপরই তিনি বলিতেছেন—

"যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৯।৬
সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥" ৯।৭

বায়ুঃ (অনিলঃ) সর্ব্বত্রগঃ (সর্ব্বত্র গচ্ছতি ইতি) [অপি মহান্] (অপরিসীমোঽপি) যথা নিত্যং (নিয়তম্) আকাশস্থিতঃ (আকাশে আস্থিতঃ) তথা (তদ্বৎ) সর্ব্বাণি-ভূতানি মৎস্থানি (ময়ি স্থিতানি) ইতি উপধারয় (সুনিশ্চিতম্ জানীহি)।

হে কৌন্তেয়, কল্পক্ষয়ে (প্রলয়কালে) সর্ব্বাণি ভূতাণি মামিকাম্ (মদীয়াম্) প্রকৃতিম্ (মায়াম্) যান্তি (লীয়ন্তে) পুনঃ কল্পাদৌ (সৃষ্টিকালে) তানি (ভূতানি) বিসৃজামি (উৎপাদয়ামি)।

'বায়ু সর্ব্বত্র গমনশীল এবং অপরিসীম হইয়া যেমন গগনতলে সতত অবস্থান করে, ভূতগ্রাম তদ্রূপ আমাতে অবস্থিত। ইহা অবধারণ কর।'

'হে কৌন্তেয়, প্রলয়কালে যাবতীয় ভূতপদার্থ আমার প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়, পুনরায় সৃষ্টিকালে আমি তৎ সমস্তকে উৎপাদন করিয়া থাকি।'

পূর্ব্বের শ্লোক দুইটীতে তাঁহাতে সকলই অধ্যস্ত ও তিনি কিছুতে অবস্থিত নহেন, তিনি প্রথমে এইরূপ বলিয়াছেন ; তাহারই বিশদ বিবৃতি বায়ু যেরূপ আকাশে অবস্থিত, সর্ব্বত্রগামী এবং মহান্ এবং আকাশ হইতে বিশেষরূপে বিশ্লিষ্ট, তদ্রূপ আমিও আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ও বিরাট্, কিন্তু সৃষ্টির সহিত সংযুক্ত নহি, এখানে এই দৃষ্টান্তই দিলেন।

অধিকরণ হইতে আধেয়ের বিযুক্তি যুক্তি-সঙ্গত নহে। যে পদার্থ যাহাতে অবস্থিত তাহা তাহাতে নাই, এইরূপ আশঙ্কার নিরসনার্থে বায়ু ও আকাশ, দুইটী নিরবয়ব পদার্থের দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইয়াছে। নিরবয়ব পদার্থের পদার্থান্তরের সহিত সম্পৃক্ততা সম্ভব নহে। কিন্তু আরও এক আপত্তি উঠিতে পারে। বায়ু ও আকাশ, উভয় পদার্থই অবলম্বন-শূন্য ; সুতরাং এই নিরালম্ব পদার্থের সংস্থান কিরূপে সম্ভব হইবে ? শ্রুতিবাক্যই প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধৃত হইতে পারে—

"ভিয়াস্মাদ্বাতঃ পবতে।
ভিয়োদেতি সূর্য্যঃ, ভিয়াস্মাৎ অগ্নিশ্চন্দ্রশ্চ ॥"

এই যে বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র, মৃত্যু পরমব্রহ্মের ভয়ে ধাবিত হইতেছে—ইহার মর্ম্মার্থ ভগবানের সঙ্কল্পকেই তাহারা মূর্ত্ত করিয়া ধরিতেছে। শ্রীমৎ রামানুজাচার্য্য বলেন—

মেঘোদয়-সাগর-সার্থবৃত্তি-ইন্দোবিভাগঃ
স্ফুরণানি বায়োবিদ্যুৎ-বিভঙ্গে গতিরুষ্মরশ্মেঃ
বিষ্ণুর্বিচিত্রাঃ প্রভবন্তি মায়াঃ।

—সমুদ্রের স্থিরতা, মেঘোদয়, চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি, বায়ুর স্ফুরণ, বিদ্যুৎ-বিকাশ, সূর্য্যের গতি—ইহাই ভগবানের "যোগমৈশ্বরম্"।

ইহা ব্যতীত বৃহদারণ্যকোপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন —"হে গার্গি, যাহা পৃথিবীর নিম্নে দুর্লভ, পৃথিবীর অন্তরে যাহা ত্রিকালে বর্ত্তমান, তাহা আকাশ, জগৎ তাহাতেই ওতপ্রোত।" প্রশ্ন উঠিয়াছিল—সে আকাশ কাহাতে ওতপ্রোত আছে ? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিয়াছিলেন—

"তদক্ষরম্ গার্গি"—হে গার্গি, তিনি অক্ষর। সমালোচ্য শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রাচীন শ্রুতিবাক্য সকলই দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে "কিম্ তদ্ ব্রহ্ম", এই প্রশ্নের উত্তরে "অক্ষরম্ পরমম্ ব্রহ্ম" এই কথাই তাঁহার কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছে। ইহার পর তিনি সপ্তম শ্লোকে তাঁহার যোগৈশ্বর্য্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—

—আমার এই নির্লিপ্ততার হেতু আমার যোগ-মায়াতেই এই সকল অবস্থিত ; তাহাতেই সৃষ্টি, স্থিতি ও

প্রলয় ঘটিয়া থাকে। যখন কল্পান্ত ঘটে, সর্ব্বভূতই আমার এই প্রকৃতিতে উপনীত হয়, ত্রিগুণাত্মক মায়াতে লীন হইয়া যায়। আবার নূতন কল্পে বিশেষ করিয়া উহাদিগকে সৃজন করি।

এই প্রকৃতি ভগবানেরই শক্তি। ইনি ত্রিগুণাত্মিকা এবং সকারণরূপা—কল্প ক্ষয়ে ভূতসমূহ ইহাতেই সূক্ষ্মরূপে লীন হইয়া থাকে। এই জন্যই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, "ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে" যাহা কল্পারম্ভে সৃষ্ট হইয়াছে, সেই যাবতীয় ভূত-পদার্থের স্থিতি ও প্রবৃত্তি, উৎপত্তি ও প্রলয়, সকলই পুরুষের সঙ্কল্প প্রভাবে। এই সঙ্কল্প অকাট্য ও অমোঘ। ইহাকে খণ্ডন করিতে পারে, এমন শক্তি কিছুই নাই। 'মামিকাম্' অষ্টম অধ্যায়ে "স্বভাব অধ্যাত্ম উচ্যতে," এই কথা অর্থাৎ 'মৎশরীর ভূতাম্ প্রকৃতিম্' বিশেষণে সার্থক হইয়াছে।

প্রলয় চতুর্ব্বিধ—নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, আত্যন্তিক এবং নিত্য। ইহার মধ্যে ব্রহ্ম-প্রলয় নৈমিত্তিক; যাহাতেই জগৎপতি স্বয়ং স্বপ্নরহিত হন। প্রাকৃত প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতিতেই লয়-প্রাপ্ত হয়। পুরুষ ইহা সন্দর্শন করেন। আর জ্ঞান-হেতু যোগিগণের যে লয়, তাহা নিথর পরমাত্মাতেই অবস্থিত; তাহাই আত্যন্তিক লয় নামে অভিহিত হয়। আর জাতদিগের দিবারাত্রি যে বিনাশ, তাহাই নিত্য প্রলয়। ভগবানের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশশক্তি সর্ব্বদেহের মধ্যে অহর্নিশ সদা লীলায়ত হইতেছে। যে ব্যক্তি গুণত্রয়যুক্ত এই শক্তিত্রয় অতিক্রম করে, সেই পরমপদ প্রাপ্ত হয়; তাহার আর পুনরাবৃত্তি হয় না। গীতার অষ্টম অধ্যায়ে এই পুরাণ-বাণী উক্ত হইয়াছে। প্রকৃতি পরা অপরা ভেদে দুই প্রকার। সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে এই কথাই বলা হইয়াছে।

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্
জীবভূতাম্ মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥"

কল্পারম্ভে এই যোগমায়া বিধৃত ভূতসমূহ প্রকাশ হয়, স্থিতিলাভ করে এবং বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

প্রলয়ের পর ভূতসমূহ প্রকৃতিতে লুপ্ত পদার্থের ন্যায় অবস্থিত থাকে। আমি কারণস্বরূপ মায়াতীত আত্ম-পুরুষ, আমার যোগমায়া প্রভাবেই এই সকল করিয়া থাকি। এই হেতু পরমার্থতঃ সৃষ্ট বস্তুতে আমি যে অবস্থিত নহি, তাহা প্রমাণিত হইল।'

(ক্রমশঃ)

অভাগিনী মোর জন্মভূমি

শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্ত

বেদনা-ব্যাকুলা ধূলিলুণ্ঠিতা অভাগিনী মোর জন্মভূমি,
মনে করিতেও ব্যথা বাজে বুকে—ছিলে রাজরাণী একদা তুমি।
একদা তোমার অঙ্গ ভরিয়া, যেত আনন্দ নৃত্য করিয়া;
আজিকে তোমার গণ্ড চুমিয়া অশ্রু-ঝরণা পড়িছে ঝরি'
দাঁড়ায়েছ তুমি বিশ্বের দ্বারে আজি বেদনার মূর্ত্তি ধরি'।

সবহারা হ'য়ে সাজিয়াছ তুমি ভিখারিণী আজি লক্ষ্মীরাণী!
এর চেয়ে বুঝি ভাল ছিল পড়া-শিরে, দেবতার বজ্রখানি!
তা'হলে তো মাগো ঘুচে যেতো ব্যথা, থাকিত না আর কোন ব্যাকুলতা;
এ যে গো জননি, প্রতি পলে পলে মৃত্যুরে লওয়া বক্ষে টানি'।
বুকে ব্যথা বাজে তবুও জননি, প্রকাশ করিতে পাওনা বাণী!

আজি মনে হয়—অতীত তোমার কল্পলোকের গল্প-কথা;
হায়, নিঠুরা নিয়তির ওগো, একি রাক্ষসী নির্ম্মমতা!
সেই সুদিনের বাঁশরীর রেশ, রাখিল না আর কিছু অবশেষ,
মলিন করিল উৎসব-ভূমি ঢালি' শ্মশানের ভস্মরাশি,
ভাসাল অভাগী অশ্রু-জোয়ারে তোর ও-মুখের দীপ্তহাসি।

উপবাসে মরে' সন্তান তোর—তোর ও ব্যাকুল চোখের 'পরে,
যাহা আছে তা'ও তোর কিছু নয়—স্মরিয়া সে-কথা অশ্রু ঝরে।
কি করিবে তুমি হে করুণাময়ী, আজি অবশেষ সম্বল ওই,
অতীত দিনের দীপ্ত-কাহিনী সম্বল আছে তাহার সাথে।
ওইটুকু শুধু আলোর আভাস—দুর্য্যোগ-ঘন তামসী-রাতে!

পোহাবে জননি, এ আঁধার নিশি—প্রভাত আবার আসিবে নাকি?
ছুটিবে না কি গো হাসির ফোয়ারা তোর ও আকুল অশ্রু ঢাকি'?
তোমার ব্যথার বন্ধন টুটি', আনন্দ-ধারা পড়িবে না লুটি'?
সন্তান তোর অন্নের মুঠি পাবে না জননি আবার ফিরে?
যুগ যুগ ধরি' কুলহারা তুমি—ভাসিবে কি মাগো ব্যথার নীরে?

রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যৎ

(জ্যোতিষের চোখে)

শ্রীজ্যোতিঃ বাচস্পতি

জ্যোতিষের সঙ্গে আমাদের আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও জীবনের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, সে তর্ক এখানে করিব না। আর্য্যজাতি যখন সভ্যতার চরম শিখরে উঠিয়াছিলেন, তখনও মানব জীবনের উপর জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর প্রভাব তাঁহারা স্বীকার করিতেন। বস্তুতঃ, গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাবে বিশ্বাস আর্য্য কাল্‌চারের একটা অঙ্গ। আর্য্যের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান সকলই কোন না কোনভাবে গ্রহ নক্ষত্রের সঙ্গে জড়িত। গ্রহ নক্ষত্রের এই প্রভাব মানবের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করে তাহা যদি আমরা জানিতে পারি, তাহা হইলে জগতের যে অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

"প্রবর্ত্তক" সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় "প্রবর্ত্তকের" স্তম্ভে এ সম্বন্ধে লিখিবার জন্য আমাকে আহ্বান করিয়াছেন। প্রত্যেক মাসে গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাবে দেশে কিরূপ ঘটনাবলী সূচিত হয়, তাহা সকলের চোখের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিলে, ইহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে সকলেই বিচার করিতে পারিবেন। অবশ্য, ইহা আমি স্বীকার করি যে, এই গণনার সকল সূত্র এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই এবং জগতের বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে গেলে পুরাতন সূত্রগুলিরও অনেক অদল-বদল দরকার, তথাপি ইহা দ্বারা এমন অনেক ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হইতে পারে, যাহা সাধারণ কোন বিদ্যা দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া, সাধারণ পাঠ্য মাসিকের মধ্য দিয়া ইহার আলোচনা হইলে, এ বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে এবং লোকের মনে অনুসন্ধান ও গবেষণার প্রবৃত্তি জাগরিত হইবে, যাহাতে ভবিষ্যতে জ্যোতিষের অঙ্গটি সম্পূর্ণতর ও অধিকতর পরিপুষ্ট হইতে পারিবে।

মাসের ফল গণনা করিবার পূর্ব্বে বৎসরটির সাধারণ-ভাবে গণনা করা প্রয়োজন। আমি এই প্রবন্ধগুলিতে সাধারণতঃ ভারতবর্ষ এবং বিশেষতঃ বাংলাদেশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ভবিষ্যৎ ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করিব। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ পৃথিবীর পক্ষে মূল্যবান্ হইতে পারে, "প্রবর্ত্তকের" পাঠকের কাছে তাহাদের গুরুত্ব খুব বেশী নহে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে আমি কারণ নির্দ্দেশস্বরূপে কতকগুলি জ্যোতিষিক পরিভাষা ব্যবহার করিব। সাধারণ পাঠকের কাছে তাহাদের কোন মূল্য না থাকিলেও ইহার যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে এবং ইহা যে আন্দাজি যা-তা বলা নয়, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য এই কারণ নির্দ্দেশের আবশ্যকতা আছে। তাহা ছাড়া, কোন অমিল বা ভুল-ভ্রান্তি হইলে, তাহা বিচারের ভুল অথবা জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা তাহা বিশেষজ্ঞগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন, যদি এরূপ কারণ নির্দ্দেশ করা থাকে। কোন একটি বিশেষ বৎসরের ফলাফল নির্দ্দেশ করিতে হইলে, যে দেশের ফলাফল নির্দ্দেশ করিতে হইবে, তাহার রাজ-ধানীতে সেই বৎসরের সূর্য্যের বিষুব সংক্রমণের সময় একটি রাশিচক্র প্রস্তুত করিতে হয়। ১৩৪১ সালের ভারতবর্ষের ফলাফল জানিবার জন্য ১৩৪০ সালের চৈত্র মাসে সূর্য্য যখন বিষুব রেখার উপর উপস্থিত হইয়াছে সেই সময়ে দিল্লীর রাশিচক্র আমাদের প্রয়োজন, এবং বাঙ্গালা দেশের জন্য প্রয়োজন সেই সময়কার কলিকাতার রাশিচক্র। এই রাশিচক্রে গ্রহস্ফুট উভয় ক্ষেত্রে একই হইবে কিন্তু ভাবস্ফুটের অনেক প্রভেদ থাকিবে।

১৩৪০ সালে সূর্য্য বিষুব রেখার উপর উপস্থিত হইয়াছে ৭ই চৈত্র বুধবার বেলা ১২টা ৫৮ মিঃ ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়ে। ঐ সময়ে গ্রহসংস্থান এইরূপ ছিল :—

চ ১৭।৩৭	প্র ২।৫৪	র ৭।৪ ম ১২।২৭ শ ০।৩৭ বু ১৩।৩৫
কে ২৪।২৭		শু ২৪।১০ রা ২৪।২৭
ব ১৭।৩৩ বৃ ২৭।৩৯		

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ১২টা ৫৮ মিঃ; কলিকাতার সময় ১টা ২২ মিঃ এবং দিল্লীর সময় ১২টা ৩৭ মিঃ, সে সময়ে দিল্লীতে ও কলিকাতায় ভাবস্ফুট ছিল এইরূপ :—

দিল্লী—১০ম ১১।১৪।৬ ; ১১শ ০।১৯।৬ ;
১২শ ১।২৩।৬ ;
লং ২।২৪।৫৮ ; ২য় ৩।১৮।৬ ; ৩য় ৪।১৪।৬

কলিকাতা—১০ম ১১।২৭।১৫ ; ১১শ ১।০।৪৬ ,
১২শ ২।২।৫৬ ;
লং ৩।২।৫১ ; ২য় ৩।২৭।২৭ ;
৩য় ৪।২৫।২৩ ;

দিল্লীতে যে গ্রহসংস্থান হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতের পক্ষে নিম্নলিখিতরূপ ফল সূচিত হয়।

এ বৎসর নানাদিক দিয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারিতা প্রকাশ পাইবে এবং অধিকাংশ স্থলে গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সফলও হইবে বটে কিন্তু গবর্ণমেণ্টকে নানা দিক দিয়া অসন্তোষ ও অশান্তির সম্মুখীন হইতে হইবে, গবর্ণমেণ্টের নিজের কর্ম্মচারী, সিভিল ও মিলিটারী সার্ভিস্ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে পারে। দেশের গুপ্ত সভা, গুপ্ত শত্রু, জেল, অপরাধী প্রভৃতির সংস্রবে নূতন আইনের প্রবর্ত্তন ও তাহা লইয়া এসেম্ব্লি, কাউন্সিল প্রভৃতিতে উত্তেজনা ও আন্দোলন হইবার আশঙ্কা আছে। রবি তৃতীয়াপতি হইয়া দশমে থাকায় রেল, জলপথ, রাস্তা প্রভৃতির ব্যাপারে এবং সাময়িক পত্রিকাদির বিরুদ্ধে নূতন আইন প্রবর্ত্তন ও তাহা লইয়া দেশের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইতে পারে। দেশের গুপ্তশত্রুর শক্তি গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কোন গুপ্ত-সমিতি প্রভৃতি দ্বারা গুপ্ত-হত্যার চেষ্টা প্রভৃতি হইলেও, রবি দশমে থাকায় গবর্ণমেণ্ট তাহা দমন করিয়া নিজের প্রাধান্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইবেন।

এই কুণ্ডলীতে সকলের চেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে দ্বাদশস্থ চন্দ্র। দ্বাদশস্থ চন্দ্র বলবান্ হইয়া বুধ, প্রজাপতি ও বরুণের দ্বারা পীড়িত হওয়ায় প্রজাসাধারণের পক্ষে এই বৎসরটি অত্যন্তই দুর্ব্বৎসর। অতিরিক্ত করবৃদ্ধি, অর্থাভাব ও খাদ্যাভাবে দরিদ্র জনসাধারণের বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হইবে। দেশে চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধের সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি হইবে এবং মহাদুর্ভিক্ষে দেশ নিশ্চয় পীড়িত হইবে। দরিদ্র স্ত্রীলোক ও বয়স্ক লোকের মধ্যে মৃত্যুর হার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। সকলের চেয়ে প্রকাশ পাইবে দেশের মধ্যে অর্থকৃচ্ছ্রতা। অর্থাভাবে অনেক সৎসঙ্কল্পও কার্য্যে পরিণত হইবে না। নূতন ট্যাক্স বসাইয়াও গবর্ণমেণ্টকে অর্থাভাবে বিব্রত হইতে হইবে। দ্বাদশস্থ চন্দ্র নবমস্থ বুধের দ্বারা পীড়িত হওয়ায় রেলপথে কোন বড় দুর্ঘটনা ঘটিবার আশঙ্কা আছে। এবৎসর এমন কোন মামলা মোকর্দ্দমা হইবারও সম্ভাবনা আছে, যাহাতে কোন বড় প্রতিষ্ঠানের নানারূপ কেলেঙ্কারী প্রকাশিত হইবে। এই যোগদ্বারা ইহাও সূচিত হইতেছে যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক দলগুলির শক্তি হ্রাস ও পরাজয় ঘটিবে এবং গণ-তান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি নানারূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। শিক্ষার বিস্তারে বাধা উপস্থিত হইবে এবং শিক্ষাসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিও নানারূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

বস্তুতঃ এই বৎসরটি ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ

দুর্ব্বৎসর। তৎসত্ত্বেও, চতুর্থে বৃহস্পতি শুক্রের শুভ-প্রেক্ষা দ্বারা অনুগৃহীত হওয়ায়, থিয়েটার বায়োস্কোপ প্রভৃতির উন্নতি হইবে এবং নারীপ্রগতি অতি দ্রুত অগ্রসর হইবে।

বৎসরের সকল ফল এখানে বিস্তারিত করিয়া লেখা সম্ভব নহে, মাসের ঘটনা নির্দ্দেশের সময় তাহা বিশদরূপে বলা হইবে।

কলিকাতার যেরূপ কুণ্ডলী হইয়াছে, তাহাতে তাহার ফলাফল অনেকটা ভারতবর্ষের মতই হইবে। কতকগুলি ব্যাপারে শুধু একটু বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। কাউন্সিলে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ দলের সহিত গবর্ণমেণ্টের সংঘর্ষ তীব্রতর হইবে এবং গবর্ণমেণ্টের প্রবর্ত্তিত বিধিগুলি জনপ্রিয় হইবে না, অন্ততঃ ইহা লইয়া যথেষ্ট আন্দোলন আলোচনা হইবে এবং তাহার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অত্যন্ত চিন্তিত হইতে হইবে। মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন ইত্যাদি স্বায়ত্ত শাসনের প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যাপারে নানারূপ গণ্ডগোল হইবে এবং তাহার সংস্রবে অনেক কেলেঙ্কারী প্রকাশিত হইবে। গবর্ণমেণ্টের করবৃদ্ধি, প্রজার দারিদ্র্য প্রভৃতি থাকিলেও, সাধারণভাবে বাংলাদেশের ব্যবসায়ের উন্নতি হইবে।

বৈশাখ মাসের ফলাফল দেখিতে হইলে আমাদের অমাস্তগুলি দেখা দরকার। বৈশাখ মাসে কলিকাতায় দুইটি অমাস্ত হইবে। একটি ১লা বৈশাখ প্রাতঃকালে ৫টা ৫০ মিনিট সময়ে; অপরটি ৩০শে বৈশাখ সন্ধ্যা ৬টা ২৪ মিনিট সময়ে। অতএব কার্য্যতঃ প্রথম অমাস্তটির ফলই বৈশাখ মাসে পাওয়া যাইবে। দ্বিতীয় আমস্তটির ফল জ্যৈষ্ঠ মাসেই লক্ষিত হইবে।

১লা বৈশাখ যে অমাস্ত হইয়াছে, তাহাতে কলিকাতার লগ্ন হইয়াছে মেষ রাশির ১ অংশ ৫৬ কলা। মেষ লগ্নের খুব সন্নিকটে রবি, চন্দ্র, মঙ্গল ও প্রজাপতির সংযোগ হইতেছে এবং রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল এই তিনটি গ্রহের সহিতই রুদ্র বা প্লুটো গ্রহের ঘনিষ্ট স্কোয়ার প্রেক্ষা হইতেছে, ইহা বাস্তবিকই আশঙ্কার বিষয়। ইহা দ্বারা বোঝা যায় যে, বৈশাখ মাসটি নানারূপ অপ্রত্যাশিত ঘটনায় বাংলা দেশের বুকে তাহার স্মৃতি চিহ্ন রাখিয়া যাইবে।

অগ্নি রাশিতে রবি মঙ্গলের যোগ হওয়ায় বাহিরে যেমন অসম্ভব উত্তাপে উত্তপ্ত দারুণ গ্রীষ্মের সূচনা করিতেছে, তেমনি ইহাও বুঝা যাইতেছে যে সকল সম্প্রদায়ের সকল লোকের মস্তিষ্কও উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে। কাজেই দেশ ব্যাপিয়া বিবাদ-বিসম্বাদ, আন্দোলন-উত্তেজনার সাড়া পড়িয়া যাইবে। এই মাসে দলাদলি ও সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যগুলি গুরুতর আকার ধারণ করিবে। কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি স্বায়ত্ত-শাসনের প্রতিষ্ঠান গুলিতে এই দলাদলি বিশেষ ভাবে প্রকটিত হইবে, এবং দলাদলির ব্যাপারে কোনরূপ কেলেঙ্কারী হওয়াও অসম্ভব নহে। ইহা ছাড়া, সাম্প্রদায়িক ব্যাপার, অস্পৃশ্যতার ব্যাপার প্রভৃতি লইয়া এরূপ উত্তেজনার সৃষ্টি হইবে যে, আশঙ্কা হয় ইহা শেষ পর্য্যন্ত দাঙ্গা হাঙ্গামাতেও পর্য্যবসিত হইতে পারে। এই মাসে বাংলাদেশে বিপ্লবী-দলের কার্য্যকারিতা প্রকাশ হওয়া সম্ভব এবং তাহাদের দ্বারা গুপ্ত হত্যা, ডাকাতি প্রভৃতি সংঘটিত হইতে পারে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা দৃঢ়হস্তে দমন করিতে পারিবেন। এই মাসে পুলিশ ও মিলিটারী বিভাগের কার্য্যকারিতা বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হইবে এবং সারা বাংলাদেশের মধ্যে একটা অশান্তির প্রবাহ থাকিবে। এই মাসে দেশের মধ্যে মস্তিষ্ক পীড়া ও অপঘাত মৃত্যুর বা সহসা মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এবং কোন নূতন ব্যাধির আক্রমণে জনসাধারণ সন্ত্রস্ত হইবে। অগ্নিরাশিতে লগ্ন হওয়ায় এবং সেখানে রবি মঙ্গলের যোগ হওয়ায় সহসা কোন গুরুতর অগ্নিকাণ্ড হইতে পারে। আমোদ প্রমোদের কোন জায়গায় (থিয়েটার, সিনেমা প্রভৃতি) অগ্নিকাণ্ড হইবার বিশেষ আশঙ্কা আছে। ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষেও মাসটি খুব ভাল নহে, যদিও পাট এবং নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলির মূল্য কিছু বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহা হইলেও কেনা বেচার ব্যাপারে গণ্ডগোল উপস্থিত হইবে এবং দেনা পাওনার ব্যাপারে বা ব্যাঙ্কের ব্যাপার লইয়া নানারূপ অশান্তির সৃষ্টি হইবে।

বৈশাখ মাসের গোড়ায় ১লা হইতে ৬ই পর্য্যন্ত রবি, মঙ্গল ও প্রজাপতির সংযোগের ফলে যেমন

গ্রীষ্মাধিক্য সূচিত হইতেছে, তেমনি শনির সহিত রবি ও মঙ্গলের স্নেহ-প্রেক্ষা দ্বারা তাপ কমিবার যোগও আছে। ইহাতে মনে হয় বৈশাখ মাসের প্রথম কয়দিন কাল বৈশাখী দ্বারা রাত্রিগুলি শীতল ও রমণীয় হইবে। ৬ই বৈশাখের পর মঙ্গল প্রজাপতিকে অতিক্রম করিয়া গেলে শুষ্ক উত্তাপ বৃদ্ধি হইবে। অন্য বৎসরের চেয়ে গরম বেশী হইবে বলিয়াই মনে হয়। ১৯শে বৈশাখ বুধের সহিত প্রজাপতির সংযোগ ও শনির স্নেহ-প্রেক্ষা পাওয়া যাইতেছে, ঐ সময় সাময়িক ভাবে তাপ কিছু কমিতে পারে, এবং বায়ুর আর্দ্রতা বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিন্তু সারা মাসটা রবি ও মঙ্গল কাছাকাছি থাকায় মোটের উপর তাপ বেশীই থাকিবে। ২৬শে বৈশাখ বুধ-মঙ্গলের সংযোগ—দারুণ গ্রীষ্মের সূচক।

১৭ই বৈশাখের পর হইতে পাটের মূল্য এবং চাউল, লৌহ, বস্ত্র প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। বিশেষতঃ পাটের মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা আছে।

যাঁহাদের রাশি মেষ, কর্কট, তুলা অথবা মকর, এই মাসটি তাঁহাদের বিশেষ সতর্ক হইয়া মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া চলা উচিত।

স্বাধীন

(রবার্ট নিকল্)

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

বিদ্যুৎ যেন উঠিল ঝলকি'—
পড়িনু আমরা শত্রু 'পরে ;
করি' গর্জ্জন করিনু বিলোপ
শত্রু-মহিমা ক্ষিপ্র করে' !
যেন পর্ব্বত-প্রবাহী উৎস
পড়িনু ঝরিয়া শত্রু-মাথে ;
যেন প্রচণ্ড প্রবল পবন
ছুটিনু বিষম ক্ষিপ্রতাতে।
সিন্ধুর বুকে বাত্যা যেমন
আসিনু রুষিয়া ধৈর্য্যহীন ;
বাজাই বিষাণ, করি চীৎকার—
স্বাধীন আমরা, মোরা স্বাধীন।

লড়িনু আমরা বিধাতার নামে,
লড়িনু জীবন রক্ষা তরে ;
লড়িনু রাখিতে আপন প্রভুরে
লড়িনু বাঁচাতে স্ত্রী-পুত্রেরে।
লড়িলাম মোরা গৃহ রাখিবারে,
লড়িনু আমরা বাঁচাতে দেশে ;
লড়িনু জিয়াতে তাদের সবারে
রয়েছে যাহারা দাসের ক্লেশে।
লড়িনু ভাঙিতে দাস-বন্ধন,
আনিতে মুক্তি মহিমালীন ;
দূরে যাক্ ক্লেশ, বলিব ফুকারি'—
স্বাধীন আমরা মোরা স্বাধীন।

ন্যায়-রণে যেবা হত, তার তরে
ফেল শ্বাস, ফেল অশ্রুজল।
ধিক্ ধিক্ তারা দ্বিধা-শঙ্কায়
কেঁপেছে যাদের চিত্ততল।
পড়েছে শত্রু, এসেছে স্বস্তি,
যাপো দিন এবে শান্তিসুখে ;
অত্যাচারীর ঘটেছে পতন,
দম্ভ ও বল নাহি সে বুকে।
দর্প-প্রতাপ বিগত তাহার ;
আজি মোরা দাস দুঃখহীন ;
কোথা হ'তে ঐ শুনি যেন স্বর—
স্বাধীন আমরা মোরা স্বাধীন।

নালান্দা

শ্রীমতিলাল রায়

ঐতিহাসিক অথবা প্রত্নতত্ত্ববিদের পাণ্ডিত্য আমার নাই। অতএব এই প্রবন্ধে পাঠকদের সে আশা পরিতৃপ্ত হইবে না। ঘুরিতে ঘুরিতে নালান্দায় গিয়া পড়িয়াছিলাম। সেই প্রাচীন কীর্তিস্তূপ লক্ষ্য করিয়া অন্তরে যে ভাবানুভূতি জাগিয়া উঠিয়াছিল, ইহা তারই অস্পষ্ট রেখাঙ্কনমাত্র।

ফা হিয়াং চৈনিক পরিব্রাজক ৪০৫ ও ৪১১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি তৎকালীন ভারতের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে নালান্দার নামোল্লেখ নাই। ইহার পর ৬৩০ ও ৬৪৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হিয়ং সিয়ং ভারত পর্য্যটনে আগমন করেন। নালান্দার বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে তাঁর গ্রন্থে অনেক কথাই লেখা আছে। তিনি স্বয়ং এই বিদ্যামন্দিরে বহু বৎসর বাস করিয়া অধ্যয়ন তৎপর ছিলেন। তাই অনেকের ধারণা নালন্দার বৌদ্ধ-বিহার ৪০০-৬০০ শত খৃষ্টাব্দের মধ্যেই নির্ম্মিত হইয়াছে।

নালান্দার বিশ্ববিদ্যালয়

কিন্তু ইহা সত্য কথা নহে। নালান্দা প্রাচীন মগধের রাজধানী গিরিব্রজ হইতে উত্তর পশ্চিমে সাত মাইল মাত্র। মহাভারতে জরাসন্ধ-বংশ এইখানে রাজত্ব করেন। ইহার পূর্ব্বেও গিরিব্রজপুরের নাম বাল্মীকি রামায়ণে দেখি যে রাজা বসু এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই জন্য ইহাকে বসুমতী বলা হয়। এখনও একটু অন্তর্দৃষ্টি থাকিলে দেখা যায় যে, এই প্রাচীন হিন্দু-রাজ্যের উত্তর ও পশ্চিমে বিস্তৃত প্রান্তরে সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মিত ছিল। নালান্দার ন্যায় গিরিব্রজপুর হইতে বরাবর যে সকল স্তূপ পরিদৃষ্ট হয়, তাহা খনন করিলে ইহার নিদর্শন মিলিবে বলিয়া বিশ্বাস হয়।

হিন্দু রাজধানীর প্রান্তে সুরক্ষিত দুর্গ ও তাহার পর শিক্ষা-নিকেতনের প্রতিষ্ঠা খুবই স্বাভাবিক। নালান্দার যে সকল প্রকোষ্ঠ মৃত্তিকা-গহ্বর হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার ভিত্তিগুলি পর পর নয়টী স্তরে বিন্যস্ত, অর্থাৎ একটী গৃহ মৃত্তিকাগর্ভে নিহিত হইলে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া আবার একটী নূতন গৃহ নির্ম্মাণের ন্যায়, নালন্দার বর্ত্তমান ধ্বংসাবশেষ এইরূপ নয়টী সুনির্ম্মিত অট্টালিকার উপর পর পর গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে।

নালান্দার বৌদ্ধবিহার দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নামমাত্র ছিল। কেননা এই সময় বক্তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক ইহা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই জন্য এইরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে যে, ৬০০ শত অথবা ৮০০ শত বৎসরের মধ্যে নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় একটী অপূর্ব্ব স্থাপত্য-শিল্প যে কোন ভৌগোলিক কারণে এমনভাবে একটীর পর একটী করিয়া নয়টী সৌধ আমূল ভূগর্ভে প্রোথিত হইতে পারে না।

অনেকে বলেন, যেহেতু ইহার গঠন-কার্য্য বুদ্ধগয়ার

অনুরূপ সেই হেতু ইহার নির্ম্মাতা একই ব্যক্তি, তিনি অন্য কেহ নহেন, রাজা বলাদিত্য। যিনি প্রথম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। বুদ্ধগয়ার বৌদ্ধ-মূর্ত্তির সহিত নালান্দায় যে বৌদ্ধ-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহাও আকারে আয়তনে একই প্রকার হওয়ায়, এই বিষয়ে অনেকেই নিঃসংশয়; তাহা হইলেও ১২০০ শত বৎসরের মধ্যে নালান্দার বিদ্যামন্দিরের পর পর নয়টী স্তর নিম্নভাবে প্রোথিত হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

নালন্দার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সংশয় করিবার কিছুই নাই। কেন না মহামতি বুদ্ধের যে দুইজন শিষ্য অগ্রশ্রাবক নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন সারিপুত্র। এই সারিপুত্রই মহাবল বুদ্ধের পুত্র রাহুলকে প্রব্রজ্যা প্রদান করেন। ইহার অন্য নাম ছিল উপতিষ্য। এই জন্য তিনি গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও উপতিষ্য নামে অভিহিত হইত। ইহার অন্য নাম কলাপিণাক বা নাল। ইহা নালান্দা ও ইন্দ্রশিলার মধ্যবর্ত্তী বলিয়া কথিত আছে। মহাসুদর্শন জাতকে স্পষ্ট করিয়াই লেখা আছে যে, তথাগত যখন জেত-বনে ছিলেন তখন নাল গ্রাম জাত স্থবির সারিপুত্র কার্ত্তিকী পুর্ণিমার দিন বরখ নামক স্থানে পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। সারিপুত্র জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। সংসারে থাকিবার সময়ে তাঁহার প্রচুর অর্থ ছিল। তিনি নির্ব্বাণ প্রাপ্তির আশায় সংসার ত্যাগপূর্ব্বক রাজগৃহ নগরস্থ বৈরট্রি-পুত্র সঞ্জয়ের শিষ্য হন।

নালান্দার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলিকে বরগাঁও বলা হয়। ইহা বৌদ্ধ-বিহার হইতে অর্থাৎ বিহার গ্রাম হইতে বরগাঁও নাম প্রাপ্ত হইয়াছে—এ বিষয়ে সংশয়ের কোন কারণ নাই। পূর্ব্বদিক হইতে দক্ষিণ দিকের রাস্তার উভয় পার্শ্বে যে সকল স্তূপ এখনও দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা প্রাচীন নালান্দা নগরের লুপ্ত কীর্ত্তিচিহ্ন বলিয়াই অনুভূত হয়। নালান্দাকে ষ্টিভেন্‌সেন্ সাহেব কুন্দপুর বলিয়াছেন। ইহাতে জৈন-ধর্ম্মিগণ শেষ তীর্থঙ্কর ইহা মহাবীরের জন্মক্ষেত্র বলিয়া অনুমান করেন।

কিন্তু পরে জানা গিয়াছে, তীর্থঙ্করের জন্মভূমি বৈশালীর কুন্দ গ্রামে। হিন্দুরা এইহেতু নালান্দার কুন্দপুরকে কুন্দিনাপুরে নামান্তরিত করিয়াছেন। এই কুন্দপুরই যদুকুলপতি কৃষ্ণচন্দ্রের মহিষী রুক্মিণী দেবীর জন্মস্থান। অতএব নালান্দার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের হেতু নাই। এই নগরে একদিন সহস্র সহস্র নরনারী বাস করিত; জ্ঞানে ঐশ্বর্য্যে ভারতের এক মহানগরীর মধ্যে ইহা পরিগণিত হইত এবং বুদ্ধদেবকে নালান্দায় বৌদ্ধ-বিহার

নালান্দার বুদ্ধ-মূর্ত্তি

নির্ম্মাণকল্পে যে স্থানটী প্রদান করা হয়, ইয়ংসিয়ং বলেন পাঁচ শত জন বণিক্ মিলিয়া এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রায় উহা খরিদ করা হয়। জমির মহার্ঘতা দেখিয়া ইহার সমৃদ্ধির কথা উপেক্ষা করা চলে না। কিন্তু বুদ্ধদেবের সময় হইতেই নালান্দার বিশ্ববিদ্যালয় সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। নালান্দায় এখনও যে সকল ভগ্নস্তূপ আবিষ্কৃত হইতেছে

সেগুলি নিম্নস্থ গৃহগুলি অপেক্ষা প্রশস্ত এবং স্থপতি-বিদ্যার উৎকর্ষতা জ্ঞাপন করে। আমাদের মনে হয়, প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে নালান্দায় শিক্ষাদানের বিরাট্ ব্যবস্থা ছিল। বৌদ্ধ-যুগের অভ্যুদয়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব শিক্ষা মন্দিরগুলির উপর এই বিরাট্ বিশ্ব-বিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছে।

বৌদ্ধ-যুগেও ভারতে ছয়টী বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্বের কথা শ্রুতিগোচর হয়। নালান্দা অর্থাৎ বরগাঁও বিক্রমশীলা অর্থাৎ পাথরঘাটা, তক্ষশীলা বালাভি অর্থাৎ ওয়ালাধনকটক অর্থাৎ অমরাবতী এবং কাঞ্চিপুর। নালান্দা ও বিক্রমশীলা পূর্ব্বভারতের, তক্ষশীলা উত্তর ভারতের, বালাভি (Balabhi) পশ্চিম ভারতের, ধনকটক মধ্য ভারতের, এবং কাঞ্চিপুর দক্ষিণ ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। ইহা ব্যতীত বিদর্ভদেশে সপ্তম শতাব্দীতে পদ্মপুরে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাও শুনা যায়। উজ্জয়িনী ও কাশী এই দুইস্থানের বিশ্ববিদ্যালয় চিরপ্রসিদ্ধ। এইগুলি সনাতন হিন্দুর বিদ্যামন্দির বলিয়া কথিত আছে। তক্ষশীলার গৌরব-কাহিনী কাহারও অবিদিত নাই। ইহাও ভারতের সনাতন ধর্ম্মের জয়কেতন ছিল এবং
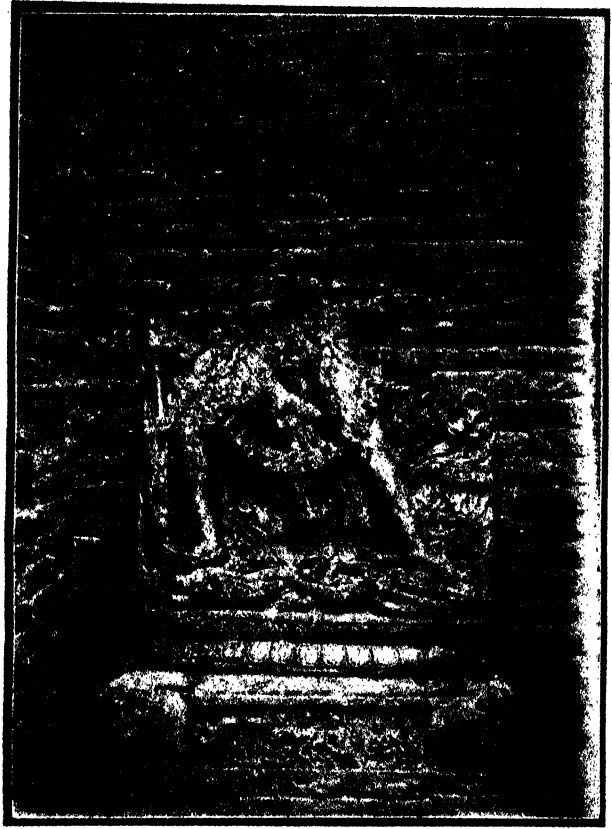
হরপার্ব্বতীর উপর শক্তি মূর্ত্তি—কণ্ঠে বুদ্ধের মালা
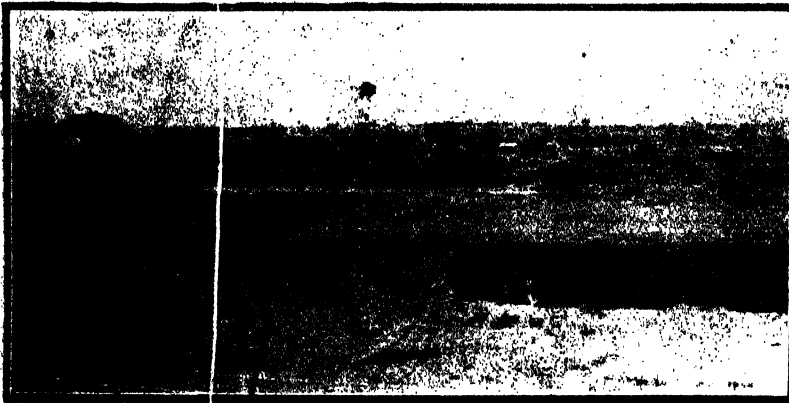
পথ হইতে নালান্দার চিত্র

তক্ষশীলার আদর্শ লক্ষ্যে রাখিয়াই নালান্দার বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠে।

নালান্দার খননকার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। এই কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে অতীত ভারতের অনেক লুপ্ত কীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইবে। গুপ্ত রাজত্বের আবির্ভাবে ভারতের বৌদ্ধকীর্ত্তি লুপ্তপ্রায় হইলেও, বৌদ্ধগয়ার বুদ্ধমন্দিরের ন্যায় নালান্দার কীর্ত্তিমন্দির তীর্থক্ষেত্ররূপেই পরিগণিত হইত। নবম শতাব্দীতে বাংলায় দেবপাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কার করিতে

করিতে তাহার নামাঙ্কিত যে তাম্র পাত্র বাহির হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, সুমাত্রার নৃপতি বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের জন্য-

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বুদ্ধ-মূর্ত্তি

এক সুবৃহৎ সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। উক্ত বিহারের ব্যয়ভার সম্পাদনের জন্য পাঁচখানি গ্রাম তিনি প্রদান করেন। ৫৩৯ খৃষ্টাব্দে মগধরাজ জীবিতগুপ্ত অথবা কুমারগুপ্তের নিকট চীন সম্রাট এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে প্রেরণ করেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে নাগার্জ্জুন বৌদ্ধধর্ম্মে মহাযান নীতির প্রবর্ত্তন করেন। নালান্দার বিহারে ইনি বাস করিয়া শিক্ষা-সাধনা নিয়ন্ত্রিত করিতেন। অসংখ্য চীন তীর্থ-যাত্রীরা পরে এই বৌদ্ধ মহাযানতন্ত্র শিক্ষা করিতে আসিতেন। ইয়ুংসিয়ং ইহাদের অন্যতম। চীন সম্রাট এই মহাযান পুস্তকের অনুবাদ যাচ্ঞা করিয়াই কুমার গুপ্তের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। গুপ্তরাজ সুপণ্ডিত পরমার্থকে এই কার্য্যে নিয়োজিত করেন। পরমার্থ চীনদেশে গমন করিয়া তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। শুনা যায়, সপ্তম শতাব্দীতেও যখন চীন-ভিক্ষু ইসিং নালান্দায় অধ্যয়ন করিতেন, তখন এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দশ সহস্র বৌদ্ধ পুরোহিত বাস করিতেন। ইসিং বলেন, ইষ্টক প্রাচীর বেষ্টিত বিপুল ময়দানের উপর ছয়টি সুবৃহৎ কারুকার্য্যখচিত বিচিত্র ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত প্রকাণ্ড সৌধ মধ্যে তিন হাজার বৌদ্ধ পুরোহিত একত্রে বাস করিতেন। ৭৪৭ খৃষ্টাব্দে নালান্দা বিহারের বৌদ্ধভিক্ষু পদ্ম-সম্ভব টিবেট্ রাজের আহ্বানে তথায় গিয়া লামাধর্ম্মের প্রচার করেন। তিব্বতের লোবরথ উপত্যকায় নালান্দার অনুরূপ বিহার তাঁরই নির্দ্দেশে গড়িয়া উঠিয়াছে।

বর্ত্তমানে নালান্দায় দশটী বিপুল সৌধের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেইগুলি আকারে ও আয়তনে এক প্রকারের না হইলেও, একই উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল-রূপে ইহার গঠনকার্য্য হইয়াছিল। এক একটি সৌধ এক একটী বিশ্ববিদ্যালয়। প্রত্যেকটীর প্রবেশ দ্বার প্রস্তর-মণ্ডিত, কারুকার্য্যখচিত স্তম্ভের উপর মণ্ডলাকারে সমুচ্চ

স্তূপ খনন হইতেছে

খিলান, সম্মুখে প্রশস্ত প্রাঙ্গন, উভয় পার্শ্বে সারি সারি ছাত্রনিবাস। প্রাঙ্গনপ্রান্তে সুবিস্তৃত হল-ঘর, পুরোভাগে আচার্য্যের সমুচ্চ প্রস্তর বেদী—কোন কোন সৌধ মধ্যে বিস্তৃত পাকা প্রাঙ্গনের উপর রন্ধনের চুলা ও কূয়ার অস্তিত্ব

এখনও দর্শকের চিত্তে কৌতূহল জাগায়। শিক্ষার্থিগণ আচার্য্যগণের সহিত একত্রে অবস্থান করিত—জীবনধারণের সকল ব্যবস্থাই অধ্যয়নের সহিত করিয়া লইতে হইত। কোন কোন প্রকোষ্ঠ মধ্যে দুইটা করিয়া শয়নবেদী এবং

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অন্যান্য মূর্ত্তি

উভয়ের গ্রন্থরাজি রক্ষার জন্য স্বতন্ত্র দুইটা করিয়া কুলঙ্গি পরিদৃষ্ট হয়। প্রত্যেক বিদ্যামন্দিরের গাত্রে, বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত স্থপতি-বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়। নালান্দার প্রস্তরগঠিত মন্দিরগাত্রে মনুষ্য ও দেবমূর্ত্তি প্রায় ২১১টী খোদিত চিত্র আছে। কোথাও কিন্নরীরা বাদ্যযন্ত্র লইয়া গীতবাদ্য করিতেছে, কোথাও শিব-পার্ব্বতী, কোথাও বা কার্ত্তিকেয় ময়ূরাসীন হইয়া বিহার করিতেছেন। অসংখ্য হিন্দু দেব-দেবীর লীলাচিত্র দেখিয়া মনে হয় যেন এইগুলি গুপ্তরাজ্যের জয়চিহ্ন।

নালান্দা ষ্টেশন হইতে দুই মাইল উত্তর দিকে মেটে রাস্তার উপর দিয়া এই প্রাচীন কীর্ত্তি-মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। দূর হইতেই সমুচ্চ ইষ্টক স্তূপগুলি লক্ষ্যে পড়ে, যত অগ্রসর হওয়া যায় ততই মনে এক অভাবনীয় ভাবের সঞ্চার হয়। এই প্রকাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় ইষ্টক-প্রাচীর-পরিবেষ্টিত ছিল; প্রশস্ত প্রবেশদ্বার কেবল-মাত্র একটী, ভিত্তিমাত্র অতীত কীর্ত্তির চিহ্ন রক্ষা করিয়া নির্জীবভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

বৌদ্ধ বিহারের উত্তর পূর্ব্ব কোণে সেদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রধান স্তূপটী মাথা তুলিয়া ছিল, যেখানে মহামতি সাক্যসিংহ তিন মাস কাল বাস করিয়া বৌদ্ধমত প্রচার করিয়াছিলেন। প্রকৃতির প্রতিশোধ আজও শেষ হয় নাই—১৫ই জানুয়ারীর নিদারুণ ভূকম্পনে তাহার উচ্চশির কতকটা অবনত হইয়া পড়িয়াছে।

ত্রৈলোক্য-বিজয়ী বৌদ্ধ-শক্তি

স্থানে স্থানে ত্রৈলোক্য বিজয়ী বৌদ্ধশক্তির প্রতিকৃতি। এই সকল মূর্ত্তি হিন্দুর দেবদেবীকে পদদলিত করিয়া গলায় বুদ্ধমূর্ত্তির মালা দুলাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ভগ্ন বুদ্ধমূর্ত্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, অবলোকিতেশ্বর, নাগার্জ্জুন, বসুমিত্র, সারিপুত্র, মুদ্গালায়ন, আনন্দ প্রভৃতির মূর্ত্তি, চতুর্দ্দিকে

খোদিত দূরে দূরে উন্নত মৃত্তিকা-স্তূপ খনন করিয়া শ্রেণীবদ্ধ সৌধ এখনও আবিষ্কৃত হইতেছে। যেন কালের সংগ্রামে ভারতের সমুন্নত কীর্ত্তি সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করিয়া আপনার অস্তিত্বকে মৃত্তিকাগর্ভে নিহিত করিয়াছিল। আজ আবার মানুষের প্রচেষ্টায় তার লজ্জার আচ্ছাদন বিদীর্ণ হওয়ায়, পরাভূতির সে নগ্ন-চিত্রের বড় বীভৎস ও করুণ দৃশ্য প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে।

নালান্দা দর্শন করিয়া গৌরাবানুভূতির অপেক্ষা পরাজয়ের ব্যথাই যেন অন্তরে অধিক আঘাত দেয়। চীন, জাপান, তিব্বত ও ভুটান প্রভৃতি দেশের বিদেশী তীর্থ-যাত্রীরা সিদ্ধার্থের পুণ্যস্মৃতি-ক্ষেত্রে আগমন করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিয়া বেড়াইতেছেন; কিন্তু ভারতবাসীর প্রাণ এই দৃশ্য দর্শনে হাহাকার করিয়া উঠে।

বড়ুস্তলপুর সূর্য্য-মন্দিরে বুদ্ধ-মূর্ত্তি

প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিই—এক সহস্র কালের মধ্যে এত বড় জাতীয় কীর্ত্তি যে দেশে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, সে জাতির ধর্ম্ম ও জাতীয় শক্তি সম্বন্ধে সংশয় জাগিয়া উঠে। এই দৃশ্য দেখিয়া নৈরাশ্যের অন্ধকার চক্ষের সম্মুখে ঘনাইয়া আসিল। অশ্রুধারায় বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইল। অতীতের কীর্ত্তি বুকে উৎসাহের আগুন জ্বালিল না।

অন্তর্য্যামী

শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত

মিথ্যা নয়, ব্যাপ্ত তুমি ধরণীর প্রতি-ফলে ফুলে,
প্রতিটী জীবনের মাঝে জানি আমি তোমার প্রকাশ;
আকাশ বাতাস ময় পৃথিবীর গ্রহ তারা মাঝে—
তোমারি সৌন্দর্য্যধারা কতরূপে নিতি নিতি বহে।

তোমারে কল্পনা করি হৃদয়ের রঙিন্ ফলকে—
পুলকে শিহরে দেহ, ভুলে যাই বেদনা পেষণ;
মুদিয়া নয়ন, কতবার কতরূপে করি আরাধনা,
বিনা পুষ্পে পূজী তোমা অন্তরের ভালবাসা দিয়া।

তুমি এস নাহি এস, বেদনার নাহি কোন লেশ,
মুদিয়া নয়ন দু'টী, রূপ তব চাই দেখিবারে;
তৃপ্তি মোর হ'বে তাই—প্রতিদিন জীবনের মাঝে।
নাহি সাধ কিছু আর, শুধু চাই তোমার চরণ—
পৃথিবীর খেলাশেষে জীবনের চির অবসানে।

ভ্রান্তি-বিভ্রাট

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ

বজ্র পড়্‌ল না প্রিয়রঞ্জনের মাথায়। তার মা-ই সকল বিপদ্ বরণ করে নিয়ে ছেলেকে ভরসা দিয়ে বল্‌লেন—"শোক কোরো না, আমি তোমার আজ থেকে মা-বাপ দুইই।"

প্রিয়রঞ্জন দেখ্‌লে তার মায়ের করুণ বৈধব্য-মূর্ত্তি; কিন্তু জগদ্ধাত্রী-শক্তি যেন সে মূর্ত্তিকে অভিষিক্ত করেছে। পিতৃ-বিয়োগের ব্যথার চেয়ে সাংসারিক বিষয়-ব্যবস্থার দিক্ রক্ষা করাই ছিল সব চেয়ে বিপদের বিষয়; কেননা, সঞ্চিত কোম্পানীর কাগজ বেচে পুত্রের ভবিষ্যৎ দেখ্‌তে গিয়ে প্রিয়রঞ্জনের পিতা কিনেছিলেন বিপুল জমিদারী। কিন্তু তা খরিদ করার পর বিষয়প্রাপ্তির পথে গোলযোগ ঘনিয়ে উঠ্‌ল অভাবনীয়ভাবে সেই মকদ্দমা নিয়ে; পিতার বিন্দুমাত্র অবকাশ ছিল না, মাতার হাতে যে টাকাকড়ি ও অলঙ্কারাদি ছিল টান পড়েছিল সবেতেই।

হঠাৎ পিতার মৃত্যু হওয়ায় প্রিয়রঞ্জন এই জটিল সমস্যা নিয়ে কেমন করে' মাথা তুলে' দাঁড়াবে সেই ভাবনায় সে কাতর হয়ে পড়েছিল; কিন্তু মায়ের ভরসায় সে নিশ্চিন্ত মনেই বই বগলে কলেজে আগের মতই যাওয়া-আসা সুরু কর্‌ল। সত্যই এখন থেকে মাকেই সে দেখ্‌তে লাগ্‌ল তার পরিপূর্ণ অভিভাবকরূপে। যথাসময়ে মকদ্দমায় জিত হ'লে, প্রিয়রঞ্জনের জননী তাকে জানালেন, সরকার-গোমস্তা নিয়ে বিষয়-সম্পত্তি অধিকার কর্‌তে যেতে হবে তাকে পিতার জয় দিতে। সে মায়ের মুখ চেয়েই বল্‌লে—কলেজে যাওয়া আর খেলা-ধূলায় কৃতিত্ব দেখান ছাড়া এ শক্তি তার নেই। মায়ের উপরই সকল ভার ছেড়ে' সে নির্ভাবনায় যেমন পড়াশুনা কর্‌ছে তাতে তার বাধা পড়া সঙ্গত নয়।

প্রিয়রঞ্জনের জননী স্বামীর কাছে কাছে থেকে শিখে-ছিলেন শুধু মুন্‌সিয়ানা নহে, বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করার কৌশল ও ফিকীর। প্রিয়রঞ্জনকে কিছুই ভাবতে হ'ল না। পিতার বর্ত্তমানে সে যেমন হেসে খেলে দিন যাপন কর্‌ত, মায়ের আশ্রয়ে তার এক বিন্দু ত্রুটি হ'ল না।

সে-বার বি-এ, পরীক্ষার সময়ে প্রিয়রঞ্জন কেতাব নিয়ে খুব ব্যস্ত, হঠাৎ মা এসে জানালেন—এই দেখ আর এক ফেসাদ্, ঝঞ্ঝাটের পর ঝঞ্ঝাট, চিঠিখানা পড়ে' দেখ্।

প্রিয়রঞ্জন বাঁকা অক্ষরে খামের উপরের ঠিকানাটা পড়ে' চিঠিখানা খুলে' দেখ্‌লে ফেসাদই বটে! বাণীবন থেকে তার কে এক বাল্য-সখী অন্তিম প্রার্থনা জানিয়েছেন, তাঁকে একবার দেখে' যেতে। চিঠি পড়ে' সে যে এর কি উত্তর দেবে খুঁজেই পেল না; মায়ের মুখপানে চেয়েই উত্তর প্রতীক্ষা কর্‌ল।

মা বল্‌লেন—"একদিন কেতাব বন্ধ থাক, চল্ আমার সঙ্গে। আহা, ছেলেবেলায় একসঙ্গে কত খেলা করেছি, 'পুণ্যি পুকুর', 'কুলকুলুতি'—কত ব্রত করেছি! দুটীতে ছিলুম এক মন, এক প্রাণ—খুব বিপদ্ না হ'লে এমন চিঠি দেয় না—চল্, গিয়ে দেখে আসি।"

ছেলে বল্‌লে—"রক্ষে কর মা, পড়ার যে-রকম রোক এসেছে যদি তা ব্রেক্ হয়, বকুনি তখন তুমিই দেবে; বল্‌বে, ফেল্ কর্‌লি কেন? সরকার মশায় আর কাদু ঝিকে নিয়ে তুমি দেখে এস, আমায় রেহাই দাও"।

মা মুখ ঘুরিয়ে বল্‌লেন, "পড়ার দোহাই'এর চেয়ে বল্‌না, ও-বেলা তোর টেনিস্ খেলার ম্যাচ্ আছে, না হয় তো কোথায় টি-পার্টিতে যোগ দিতে হবে।"

প্রিয়রঞ্জন কাঁচু-মাচু মুখে বল্‌লে—"রাগ কোরো না মা—ঠিক ধরেছ। আজ টেনিস্ খেলারই একটা ম্যাচে প্রফেসার আমায় নমিনেট্ করেছেন, না গেলে সত্যিই চল্‌বে না।"

মা বল্‌লেন—"মাথার উপর এমন করে' দাঁড়িয়েছি তাই, তা না হ'লে আজ যে তোর ঘাড়েই সব পড়্‌ত।"

প্রিয়রঞ্জন তাড়াতাড়ি মায়ের পায়ের ধূলো নিয়ে

বল্‌লে—"আমার মা তো যেমন তেমন নয়, স্বয়ং জগদ্ধাত্রী!" গর্ব্বে মায়ের মুখখানা লাল হয়ে উঠ্‌ল, ছেলের দিকে স্নেহ কটাক্ষ করে' তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রিয়রঞ্জন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছিল সিগারেট মুখে দিয়ে, মায়ের গলা পেয়ে সে চম্‌কে উঠ্‌ল; চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌লে আওয়াজটা এসেছে ঘরের ভিতর থেকে—সে তাড়াতাড়ি হাত থেকে সিগারেটটা ফেলে মায়ের সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। মা বল্‌লেন—"ঘরে একদণ্ড বস্‌তে নেই। হঠাৎ যদি আমি মরি, তখন তোর হবে কি? বাণীবন থেকে ফিরে' তোর টিকিই দেখি না—বাইরে-বাইরে সারাক্ষণ কি করিস্ বল্ দেখি?"

মাথা চুলকাতে চুলকাতে প্রিয়রঞ্জন কি যে উত্তর দেবে, খুঁজে পেলে না। তার মনে পড়ে' গেল, মা গে'ছলেন বাণীবনে তাঁর বাল্য-সখীকে দেখ্‌তে, খবরটা নেওয়া ছাড়া আর কোন কথা তার মুখে বেরুল না। মা বল্‌লেন--"স্থির হয়ে বোস্, কথা আছে—বড় জরুরী কথা।"

প্রিয়রঞ্জন ঘড়ির পানে চাইতেই মা দাব্‌ড়ী দিয়ে বল্‌লেন—"যতই তোর আজ কাজ থাক্, একটু ঠাণ্ডা হয়ে বোস্। তোর মুখের কথা না পেলে আর এগোতে পারি না। আহা, কি দুঃখেই যে মাগী ম'লো, তা চক্ষে না দেখ্‌লে তুই বুঝ্‌বি না!"

স্বভাব-বশে প্রিয়রঞ্জনের চক্ষু ঘড়ির দিকেই গিয়ে পড়ে। আবার মায়ের গালি খাওয়ার ভয়ে সন্ত্রস্ত চক্ষু ফিরিয়ে মাকে বল্‌লে, "তোমার সই মারা গেল বুঝি!"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মা বল্‌লেন—"তার দুঃখের কথা আগে যদি জানাত, তবে তার অসময়ে হয়তো মরণ হ'ত না। ছেলেটা তোর মতই হাঁদা, একটা আস্ত গাধা; মেয়েটী যেন পদ্মফুল। মা মরায় দুই জনেই পড়েছে অকূল পাথারে। আশ্রয় বল্‌তে মানুষের একখানা কুঁড়ে ঘর, আবাগীর তাও ছিল না।"

ঘড়ির কাঁটা তখন পাঁচ মিনিট গেছে সরে'; প্রতি সেকেণ্ডে তার চিত্ত হচ্ছিল অস্থির, চঞ্চল, সে একটা কৃত্রিম দুঃখ-সূচক শব্দ করে' বল্‌লে, "আচ্ছা, তবে আসি মা!"

মা ভ্রূকুঞ্চিত করে' বল্‌লেন, "আসল কথাই এখনও বলি নি। বোস্, স্থির হয়ে শোন্। সব কথা যেমন হেসে উড়িয়ে দিস্, এ তেমন কথা নয়।" প্রিয়রঞ্জন একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও, মায়ের মুখ পানে চেয়ে মেঝের উপর এসে বস্‌ল। মা বল্‌লেন—"সে কাতর মিনতি আমি এড়াতে পারি নি। দেরী করারও যো নেই। মেয়েটীর বয়সও হয়েছে, তাকে আমি ঘরে তুলে' আন্‌ব।"

"ওঃ, তার জন্যে খুব লোকের সঙ্গেই পরামর্শ করছ! তোমার ঘর-দোরের তো অভাব নেই, মা-বাপ-মরা অনেক মেয়ে ছেলেকেই আশ্রয় দিতে পার। এইবার তবে আসি, মা" ছেলে এই বলে' উঠে দাঁড়াতেই মাও তার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন, এবং তার হাত ধরে' বল্‌লেন, "যেমন তেমন করে' ঘরে আনা নয় রে, ঘরের লক্ষ্মী বধূ-বরণ করেই তাকে ঘরে তুল্‌ব।"

প্রিয়রঞ্জন হাঁ করে মায়ের মুখের পানে চেয়ে রইল।

মা বল্‌লেন—"জানি, তোর অমত হবে না। মাগী খাবি-খায় আর বলে, 'সই, মেয়েটাকে তুমি বউ কোরো, তোমার ঘরে সে একান্ত অযোগ্যা হবে না'। বাপের কাছে সেদিন পর্য্যন্ত সংস্কৃত শিখেছে; দু একটা পরীক্ষায় নাকি পাশও করেছে, আর মেয়েটীও যেন স্বর্গের পরী।"

প্রিয়রঞ্জন অবাক্ হয়ে বল্‌লে—"বল কি মা, আমার সঙ্গে তার বিয়ে দেবে!" হো-হো করে' হেসে বল্‌লে—"দোহাই তোমার, সে বয়স আমার হয় নি। তা' ছাড়া সংস্কৃত জানা একটা পণ্ডিতকে বিয়ে করে' ফেসাদ বাধাতে পার্‌ব না, আমায় রক্ষা কর।"

মা হেসে বল্‌লেন—"তুইও কি একটা গণ্ড মুখ্যু! বি-এ'র পর এম-এ-টা পাস্ করলেই তো তোরও পাণ্ডিত্য কম হবে না! হাসি ঠাট্টার কথা নয়। পরের বাড়ী সোমত্ত মেয়েকে রেখে' এসেছি দশদিনের জন্যে। শ্রাদ্ধ মিটলেই অরক্ষণীয়া কন্যা হিসাবে বিয়ে দিয়ে তাকে ঘরে তুল্‌ব। মরণকালের প্রতিশ্রুতি—এর আর নড়চড় হবে না।"

"তার চেয়ে গলায় ফাঁসী লট্‌কে দাও না! কি যে তুমি ব'ল মা, ডাল ভাত খাওয়ার মত এ যেন মুখে তুলে' দেওয়ার ব্যাপার করে' তুল্‌লে। এমন প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ভরসাও তো তোমার হ'ল। যদি মায়ায় পড়ে' থাক, বিষয়-সম্পত্তির অংশ তারে দাও, আমার আপত্তি নেই; কিন্তু হঠাৎ একটা জগদ্দল পাথর বুকে তুলে' দেবে, তাতে আমি রাজী নই।" খুব ভরসার সঙ্গেই একথা বলে' প্রিয়রঞ্জন বাহির হ'য়ে গেল। মায়ের মনে প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর হ'ল। তিনিও মনে মনে বল্‌লেন—তোর একদিন কি আমারই একদিন! হয় এই বিয়ে, নয় সংসার ছেড়ে' যাওয়া—বড় মুখ করে' যে কথা বলে' এসেছি তা বজায় কর্‌বই কর্‌ব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মায়ের মুখে কথা নেই। ছেলে আব্দার করে' বলে, "আজ কলেজ ফী না দিলে জরিমানা", মা মুখ ভার করে' গৃহান্তরে চলে' যান। পড়ার ঘরে রাশীকৃত জঞ্জাল। দেউকি বেটা খৈনী টেপে, আর বাজে বকে; মা উদাসী, তাকে ধমক দেন না। উড়ে বামুন সেদিন মাংসে দিয়েছে একরাশ বেগুন ছেড়ে', পাঁচজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে খেতে বসে' অপ্রস্তুতের সীমা রইল না। সকালে উঠে' 'চা' 'চা' করে' চেঁচিয়ে গলা ফেড়ে' যায়, বুধু বেটা নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়, মা তাকে কিছুই বলেন না। ছাড়া কাপড় রাশীকৃত জমে' যায়, যদিও গালি খাওয়ার ভয়ে তা কাচা হয়, দুদিন ধরে'ই ছাতে শুখোয়, তুলে' তেমন করে পাট করে' কেউ ঘরে রাখে না। প্রিয়রঞ্জন অস্থির হয়ে মাকে বল্‌লে—"এমন হ'লে পড়া-শুনা আর চলে কেমন করে! গিয়ে না হয়, কিছুদিন হোষ্টেলে থেকে' আসি।" মায়ের সেই বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি দেখে আর কিছু বল্‌তেও ভরসা হয় না।

প্রিয়রঞ্জন দেখ্‌লে, সত্যই সে তিনটে পাশ করেছে বটে, কিন্তু তার মত নাবালক আর নেই। একটা পাঁচ বছরের শিশুরও যে স্বাধীনতা আছে, তার তাও নেই। সে ভেবে উঠ্‌তে পারে না, মায়ের এ কেমন অধিকার—যে অধিকারের বলে তিনি ছেলের গলায় একটা মেয়েকে অনায়াসে ঝুলিয়ে দিতে পারেন, যাকে নিয়ে তাকে জীবন-মরণ সংগ্রাম কর্‌তে হবে—না, তাকে সে এমন ভাবে সম্পূর্ণ অপরিচিত অবস্থায় গ্রহণ কর্‌তে কোনমতেই পারে না।

বিয়ের কথাটা তার মনেই হয় নি এতদিন। হঠাৎ এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়ায়, যেখানে যতগুলি সে অনূঢ়া যুবতীর সঙ্গ করেছে তাদের কথাই তার মনে উদয় হ'ল। সুকুমারের বোন টুনু, তার যেমন চ'খের চাহনি হাসীর রেখাটীও তেমন মিষ্টি। বিয়ের যদি আজ প্রয়োজন হয়, টুনুর সঙ্গে হ'লেও বা কথা থাক্‌ত। মিষ্টার চক্রবর্ত্তীর মেয়েটীও দিব্যি সুন্দরী, তার সঙ্গে এক কোর্টে কয়েকবার টেনিসও সে খেলেছে। মেয়েটী যেমন ক্ষিপ্র, তেমনি তার শ্লীলতারও সীমা নেই। ব্যাটে ব্যাটে ঠোকাঠুকি হ'লে সেদিন সে কেমন করুণ দৃষ্টিতে ক্ষমা চাইলে। চক্ষের দৃষ্টি স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মত। মাথার চুল যেন দুকূল উপ্‌ছে-পড়া নদীর কাল জল। নামটীও মধুর ন্যায় মিষ্টি—সুষমা। বিয়ে যদি কর্‌তে হয়, তাকে পেলেও চলে। কোথা থেকে একটা গেঁয়ো ধেড়ে মেয়ে জোর করে' গছিয়ে দেওয়ার অত্যাচার মা বলে'ই যে সয়ে নিতে হবে, কর্ত্তব্য-বুদ্ধি তাতে সায় দেয় না। ছেলে যত বিমনা হয়ে ঘুরে বেড়ায়, মা তত স্থির অটল পাথরের মত সঙ্কল্প নিয়ে ব'সে থাকেন। শেষে প্রিয়রঞ্জন অতিষ্ঠ হয়ে বল্‌লে—"মা, দয়া কর, আমি হাঁপিয়ে মরে' যাব। তোমার কোন কথায় কোনদিন আপত্তি করি নি, আজ এই কথাটা আমার রাখ। টাকা দিলে মেয়ে পার হয়, আমার ঘাড়ে ওটাকে চাপিও না।"

মা বল্‌লেন—"কোন্ কথাটা তুই আমার শুনিস্ বল্‌ত? বিষয়-রক্ষার ভার ওটা তো দায় বলে'ই এড়িয়ে আছিস্। কলেজের পড়া ওতো তোরই যশ, তোরই গৌরব, আমার কথা ব্রহ্মা-বিষ্ণু রদ্ কর্‌বে না। আমি তোর মা, কথা দিয়ে এসেছি—এ মেয়ে যদি ঘরে না আনি আমার মর্য্যাদা যাবে। আর বিয়ে তোকে কর্‌তেই হবে। চিরদিন মা বাপই ছেলের বউ পছন্দ করে, হালফ্যাসানে যদিও অন্য রকম হয়, তাতে যে ছেলে-মেয়ের সুখ বেড়েছে তাও নয়। ভেবে দেখ্

রঞ্জন, তুই এখন বড় হয়েছিস্, তোর বুদ্ধি বেড়েছে, মায়ের কথা না শুনতেও পারিস্। আমার কথার ঠিক নেই বলে' লোকের কাছে যে অপমান, তা আমিই সইব, তোকে আর আমি এই নিয়ে জ্বালাতন কর্‌ব না।"

প্রিয়রঞ্জন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে' বাঁচ্‌ল। তার মনে হ'ল, মায়ের সুমতি হয়েছে, সে করুণ বচনে উত্তর দিল—"এ বিয়ে থেকে আমায় রেহাই দাও। যদি বউ চাও, আমি ঢের ভাল মেয়ে তোমার কাছে এনে দোব।" মা বল্‌লেন—"যাও, আর তোমায় এই নিয়ে বিরক্ত কর্‌ব না।" প্রিয়রঞ্জন যেন হঠাৎ টুঁটি টিপে ধরা থেকে মুক্তি পেয়ে খোলসা করে' নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচ্‌ল।

তারপর দিন কলেজ থেকে এসে প্রিয়রঞ্জন দেখ্‌লে, বৈঠকখানায় এটর্ণি বসে'। বুধু বল্‌লে—"পরদার আড়ালে মা আছেন—আপনাকে ডাক্‌ছেন।" প্রিয়রঞ্জন তাড়াতাড়ি মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই মুখ না তুলেই তিনি বল্‌লেন—"তুই মনে কর্‌বি, তোর সম্পত্তি দখলে রেখে' তোর উপর আমি শাসন করার সুবিধা পেয়েছি। যখন তোর এমন পৌরুষ হয়েছে, নিজের ভাল মন্দ বুঝ্‌তে শিখেছিস্, মায়ের মান অপমানের চেয়ে, মায়ের কল্যাণ-চিন্তার চেয়ে, নিজের হিত-চিন্তা যখন তোর জন্মেছে, তখন সব থেকে মুক্তি আমি শ্রেয়ঃ মনে করি। আজ থেকে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি তোর হাতে ছেড়ে' দিয়ে যাচ্ছি, আমি তোর এক কড়া নিয়ে যাব না—ট্রাষ্টি পর্য্যন্ত ছেড়ে দিচ্ছি—আজ থেকে তুই আর কারও অধীন নস্, সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীন।"

চিরদিনের খাঁচায় বদ্ধ পাখী মুক্তি পেলে, সে যেমন খাঁচার মধ্যেই প্রবেশ করে, সে তেমনি মায়ের পায়ের কাছে অবশের মত বসে' পড়্‌ল। কথাটা যেন তার মাথায় তলাচ্ছিল না। গলাটা ঝেড়ে নিয়ে সে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "এ সব কি কথা, মা?" মা ভারীমুখে মাথা নীচু করে'ই উত্তর দিলেন—"কথা বাঁকা চোরা কিছু নয়। আমি তোর মা, আমার দ্বারা তোর যে কোন অকল্যাণ হ'তে পারে, তা আমার ধারণায় ছিল না। যে মা সন্তানকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে রেখে', নিজের শোণিত দিয়ে পুষ্ট করে' তোলে, সে মায়ের মনে সন্তান সম্বন্ধে যে ভাব ও কাজের প্রেরণা জাগে তা কোথাও অমঙ্গল সৃষ্টি করে না—রঞ্জন, এই বিশ্বাসই আমার ছিল। তাই দুঃখিনী এক অভাগিনীর অন্তিম প্রার্থনায় আমার হৃদয় অসম্মতি দেয় নি; বরং তোর মঙ্গল-কামনাই অন্তর পুলকিত করেছিল। তুই যখন তা আশীর্ব্বাদ বলে' না নিয়ে অভিসম্পাত মনে করেছিস্, তখন মায়ের অধিকার আর আমার নেইই বল্‌তে হবে। আজ তাই তোর পিতৃসম্পদ্ তোর হাতে দিয়ে কাশীবাসই স্থির করেছি।"

প্রিয়রঞ্জন আকাশ থেকে পড়্‌ল। ইহার উত্তর যে কিছু আছে, তাহা সে হাত্‌ড়ে' খুঁজে পেল না। সে নিতান্ত অসহায়ের মত মায়ের পা দুটো জড়িয়ে ধরে' কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে জানালে "অপরাধী হয়েছি; ক্ষমা কর। তোমার দান আশীর্ব্বাদ বলে'ই মাথা পেতে নেব।"

ঘটনা যে এমনভাবেই দাঁড়াবে, তা এটর্ণি থেকে তার মুহুরী, বাড়ীর সরকার, গমস্তা, ভৃত্য, দাসী সকলেই বুঝেছিল। মায়ের চরণে প্রিয়রঞ্জনের এই আত্মনিবেদনে বাড়ীর গভীর গুমোট যেন ছেড়ে' গেল, দম্‌কা-বাতাসে সব দিক্ ভরে' উঠ্‌ল। মা প্রসন্নমুখে ছেলের মাথাটা বুকে নিয়ে স্নেহচুম্বন দিলেন—প্রিয়রঞ্জনের কাণে মায়ের হৃদয় স্পন্দনের সঙ্গে তার নিজের হৃৎপিণ্ডটাও যেন সমান তালে নাচ্‌ছে বলে' মনে হ'ল।

বৈশাখ মাসের জ্যোৎস্নায় গ্রীষ্মের গুমোট কাটিয়ে দক্ষিণে বাতাস হু-হু করে' বইছিল। কলিকাতার কলরবের উপর সানাই'এর মধুর রাগিণী উদ্‌ব্যস্ত নাগরিক জীবনেও এক ফোঁটা মধুর আস্বাদ দিল। পুরঙ্গনাদের শুভ শঙ্খ-নিনাদের সহিত নববধূ বরণ করে' জননী প্রিয়রঞ্জনের ললাটে একটী পবিত্র নিঃশব্দ চুম্বন আশীর্ব্বাদরূপেই প্রদান কর্‌লেন। প্রিয়রঞ্জন দেখ্‌ল—মায়ের কথাই ঠিক—কল্যাণ-শ্রী-মণ্ডিতা এক অপরূপ লাবণ্যময়ী নারী তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

(ক্রমশঃ)

আলোচনা

গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ

শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বিদ্যাবিনোদ

শ্রোত্রিয় পুরোহিত পরশমণি নহে

সুদর্শন বাবু "আনন্দবাজার পত্রিকায়" বঙ্গের স্থানে স্থানে ভিন্ন জাতির প্রতি শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণের অনুকম্পার নিদর্শন দেখাইয়া শ্রোত্রিয়গণকে পরশমণি বলিয়াছেন, তাহা সত্য নহে। তাঁহার প্রতিবাদ যুক্তিযুক্ত হইলেও কোন কোন point-এ ঠিক প্রতিবাদ হয় নাই; কারণ অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী শুদ্ধ শ্রোত্রিয়গণ নবশায়কাদি জাতির যাজন বা দান গ্রহণ করা দূরের কথা তাহাদের পুরোধা ব্রাহ্মণগণকে শূদ্রযাজী বলিয়া অপাঙ্‌ক্তেয় করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের অন্নগ্রহণ করেন না। তাঁহাদিগকে প্রকারান্তরে পতিতরূপেই রাখিয়াছেন। রাঢ়ী, বারেন্দ্র, পাশ্চাত্য বৈদিক ঠাকুরগণ পরস্পর কেহ কাহারও অন্নগ্রহণ করেন না—পরস্পরের পঙ্‌ক্তি পৃথক্। অতএব গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণের সহিত পঙ্‌ক্তির কথা উঠিতেই পারে না। গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ শ্রোত্রিয়গণের পঙ্‌ক্তি গ্রহণ করিবেন কেন?

"সম্বন্ধনির্ণয়" গ্রন্থকার রাঢ়ীয় পণ্ডিত ৺লালমোহন বিদ্যানিধি তাঁহার পুস্তকে সুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠীর কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন যথা:—

"তাদের যাজৎ সুদ্বিজ কদাচ নহে একজ,
শাতশতী যাজে যে অন্ত্যজ থাটী
—সঃ পিঃ পরিশিষ্ট ৩৮৭ পৃষ্ঠা

কনোজাগত রাঢ়ী, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের যাজৎ ছিল সুদ্বিজ, কদাচ একজ অর্থাৎ শূদ্র নহে। কায়স্থ নবশায়কাদি জাতি সনাতনী সমাজে শূদ্র বলিয়াই গৃহীত। যাজৎ জাতির যাজন করিলে ব্রাহ্মণের পাতিত্য আসে না, কারণ যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ, এই ছয় কর্ম্ম ব্রাহ্মণের। বশিষ্ঠ সূর্য্যবংশের, ধৌম্য চন্দ্র-বংশের পুরোহিত ছিলেন, এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে। বঙ্গদেশের নবাগত শ্রোত্রিয়গণকে পুরোহিত পাইয়া কায়স্থ নবশায়কের মানমর্য্যাদা বজায় হয় নাই, শ্রোত্রিয়গণের স্পর্শে তাঁহারা সোণা হইলেন কই? অতএব শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে কিরূপে পরশমণি বলা যায়?

বল্লালী খিচুড়ী

মনুসংহিতায় নবশায়কের উৎপত্তির কথা নাই, কারণ তাঁহারা মনুর সময়ে জন্মেন নাই। বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে ঘৃতাচীর গর্ভে তাঁহাদের উৎপত্তির বিবরণ আছে। তাঁহারা মাহিষ্য, কৈবর্ত্তের ন্যায় পৌরাণিক জাতি। কায়স্থ ও নবশায়কের কোন কোন সম্প্রদায়ের কেহ কেহ আধুনিক সনাতনী সমাজের শাসন অগ্রাহ্য করিয়া শূদ্রত্বের গণ্ডী ছাড়াইবার জন্য ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হইতেছেন। বঙ্গদেশে কর্ম্মকার, কুম্ভকার, মালাকার ও সদ্গোপাদি নবশায়কগণ সনাতনীদিগের মতে কায়স্থের ন্যায় এদেশে নবাগত নহেন। তাঁহারা অস্মরণীয় কাল হইতে এদেশে বসবাস করিয়া সমাজের সেবা করিয়া আসিতে-ছেন। সংসারের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি ছাড়া মন্দির, মঠ, রথপ্রতিষ্ঠা ও বৃষোৎসর্গাদি বৈদিক যজ্ঞকার্য্যে চক্রাদি যন্ত্র, ঘট, প্রদীপ ও পুষ্পমাল্যাদি যোগাইয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের দেবমন্দিরে, শ্রাদ্ধাদিযজ্ঞে নয় শত বৎসর পূর্ব্বে

কাহারা পৌরোহিত্য করিত? শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদিগের কুলপঞ্জিকামতে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ব্রাহ্মণ পঞ্চক ৯৫৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১০৩২ খৃঃ অব্দে এদেশে আসেন। তাঁহারা এদেশে আসিয়াই নবশায়কের যাজন আরম্ভ করেন নাই; পরে দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজা বল্লালের আদেশে তাঁহাদের বংশধরগণ নবশায়কাদিজাতির পুরোহিত সাজিয়াছেন। রাজা বল্লাল অনেক জাতিকে সমাজের নিম্ন স্তরে ফেলিয়াছেন, যেমন সুবর্ণবণিক জাতি রাজাজ্ঞায় সনাতনী সমাজে পতিতরূপে গণ্য হইয়াছে; কিন্তু বাংলার বাহিরে তাঁহারা পতিত নহেন। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। বাহুল্যভয়ে লিখিত হইল না। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণের আগমনের পূর্ব্বে নবশায়কগণের কি পুরোহিত ছিলেন না? তাঁহারা কি অনার্য্য ছিলেন? তাঁহারা কি দৈব-পৈত্র কর্ম্মবিহীন ছিলেন? বল্লালী আমলে ঐ সকল জাতি নিজ নিজ পুরোহিত পরিত্যাগ করিয়া নবাগত শ্রোত্রিয়গণকে পুরোহিত লইয়া নিজ সম্মান নষ্ট করিয়াছে। কেবল মাহিষ্য জাতি নিজ পুরোহিত ত্যাগ করে নাই—ইহাই তাহাদের মহাগ্লানির কারণ হইয়া উঠিয়াছে। এই বল্লালী খিচুড়ীতে সমাজের পরিপাক শক্তি নষ্ট হইয়াছে, পরস্পর মেলামেশা নাই, পরস্পরের হিংসা বিদ্বেষে এ দেশ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে।

গৌড় ব্রাহ্মণ মহিমা

মহাভারতীয় যুগের বহুপূর্ব্ব হইতে গৌড়বঙ্গে ক্ষত্রিয়াবাস প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তাঁহাদের প্রয়োজন বশতঃ ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে এদেশে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। বনপর্ব্বে লিখিত আছে, মহারাজ যুধিষ্ঠির তীর্থযাত্রাকালে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে আসিয়া বঙ্গদেশে সতত দ্বিজ-সেবিত আর্য্যক্ষেত্র সন্দর্শন করিয়াছিলেন। যে শীলভদ্র নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন, যাঁর পদতলে বসিয়া চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং সাত বৎসর ধরিয়া দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তিনি সমতটবাসী গৌড় ব্রাহ্মণ ছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের গুরু গৌড়পাদাচার্য্য ও চাণক্য গৌড় ব্রাহ্মণ ছিলেন। পাল নরপতিগণের মন্ত্রিগণ গৌড় ব্রাহ্মণ ছিলেন। ৮ম শতাব্দীতে "মাৎস্যন্যায়" দূর করিবার জন্য প্রকৃতিপুঞ্জের নায়ক থাকিয়া গৌড় ব্রাহ্মণগণ গোপালদেবকে গৌড়রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তজ্জন্য সুররাজকল্প নরপতি দেবপালদেব উপদেশ-গ্রহণের জন্য মন্ত্রীর অবসরের অপেক্ষায় তাঁর দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন। মন্ত্রিবর সভাস্থ হইলে তিনি অগ্রে চন্দ্রবিম্বানুকারী মহার্ঘ আসন প্রদান করিয়া নানা নরেন্দ্র-মুকুটাঙ্কিত পাদপাংশু হইয়াও স্বয়ং সচকিতভাবে সিংহাসনে উপবেশন করিতেন (গরুড়স্তম্ভ ৭ম ও ৮ম শ্লোক)। গৌড় ব্রাহ্মণগণ প্রকৃতিপুঞ্জের অধিনায়ক থাকিয়া রাজ-নির্ব্বাচনকারী (king-maker) ছিলেন। তাই মন্ত্রিবরের সম্মুখে দেবপালদেবের সচকিতভাবে রাজসিংহাসনে উপবেশন শ্লোকমধ্যে লিখিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-মন্ত্রিগণের হোম-ধূমে গগন-মণ্ডল আচ্ছন্ন হইত। বৃহস্পতি-তুল্য কেদার মিশ্রের যজ্ঞস্থলে বিগ্রহপাল (শূরপালদেব) স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অনেকবার শ্রদ্ধা-সলিলাপ্লুতহৃদয়ে, নতশিরে পবিত্র শান্তি-বারি গ্রহণ করিয়াছিলেন (পঞ্চদশ শ্লোক)। অতএব এদেশে যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না।

যখন রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের বীজপুরুষ ব্রাহ্মণ-পঞ্চক ও পাশ্চাত্য বৈদিক ঠাকুরগণের পূর্ব্ব-পুরুষ যশোধর মিশ্র যবনাত্যাচারে বঙ্গদেশে পলায়ন করিয়া আসেন নাই এবং গজনীর মামুদ ভারত আক্রমণ করিবার জন্য সিন্ধুনদ অতিক্রম করিতে সাহসী হন নাই, এমন কি মহম্মদ ঘোরীর নেতৃত্বে যবনদুন্দুভি দিল্লীর দ্বারে প্রতিধ্বনিত হয় নাই, তখন গৌড়ের আদি বৈদিক ব্রাহ্মণগণই আর্য্য-সমাজের কর্ণধার ছিলেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে ব্রাহ্মণগণ পূর্ণ সজীবতা দেখাইয়া গিয়াছেন আজ তাঁহাদের অঙ্কুরমাত্রের অস্তিত্ব নাই, ইহা অতি অসম্ভব কথা। যদি পাঁচজন বীজ-পুরুষ হইতে নয়শত বৎসরের মধ্যে সমস্ত বাঙ্গালা দেশ ভারাক্রান্ত হইতে পারে, তাহা হইলে বিপুল-শক্তি-সম্পন্ন বিশাল গৌড়ের আদি বৈদিক ব্রাহ্মণ বংশ একেবারে নির্ব্বংশ হইয়াছে, ইহা একেবারে বিজ্ঞানবিরুদ্ধ মিথ্যা কথা।

আদিশূর নামে কোন রাজাই ছিল না, অতএব তাঁহার পুত্রেষ্টিযজ্ঞের কথা মিথ্যা, ইহা ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করিয়াছেন। কুলকারিকায় ঘটকদিগের কাহিনী ঐতিহাসিক ভিত্তিতে লিখিত হয় নাই; উহা ঠান্‌দিদির রূপকথায় পরিণত হইয়াছে, তাহা আমি প্রমাণ সহযোগে 'ভ্রান্তিবিজয়ে' প্রতিপন্ন করিয়াছি। ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত বাংলার ইতিহাস', 'গৌড় রাজমালা' এবং Early history of India (fourth edition) by Vincent Smith (M. A. পরীক্ষার পাঠ্য) দ্রষ্টব্য।

পালরাজগণ যে মাহিষ্য কৈবর্ত্ত ছিলেন এবং তাঁহাদের মন্ত্রিগণ প্রজাশক্তি সমুত্থানের অধিনায়ক থাকিয়া সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে বিপুল সাম্রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা আমি "ভারতবর্ষ" ও "প্রবাসী" পত্রিকায় প্রতিপন্ন করিয়াছি। শ্রীদেবপালদেব মন্ত্রী দর্ভপাণির নীতি কৌশলে নৃপহস্তীর মদজল-সিক্ত, শিলা-সংহতিপূর্ণ নর্ম্মদার জনক বিন্ধ্য-পর্ব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া মহেশ-ললাট-শোভী ইন্দু-কিরণে উদ্ভাসিত শ্বেতায়মান হিমাচল পর্য্যন্ত এবং সূর্য্যের উদয়াস্তকালে অরুণ-রাগ-রঞ্জিত জলরাশির আধার পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী সমগ্র ভূভাগ (আর্য্যাবর্ত্ত) করপ্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন (৫ম শ্লোক গরুড়স্তম্ভ)। মন্ত্রী গর্গের মন্ত্রণাবল, দর্ভপাণির নীতি-কৌশল, কেদার মিশ্রের যজ্ঞশক্তি, রামগুরবমিশ্রের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও শৌর্য্য-বীর্য্যের যশোগাথা "গরুড়-স্তম্ভে" খোদিত আছে। আর্য্যাবর্ত্তের পঞ্চ-গৌড় সারস্বত-কান্যকুব্জ-গৌড় মৈথিল ও উৎকল ব্রাহ্মণগণ এক গৌড় ব্রাহ্মণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। "গুড়সি রক্ষণে"—গৌড় ব্রাহ্মণগণই বেদ ও সনাতন সমাজ রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

"সারস্বতাঃকান্যকুব্জাঃ গৌড়মৈথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়াঃ সমাখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥"

(স্কন্দপুরাণ)

শ্লোকের প্রথম চরণের মধ্যে "গৌড়" শব্দটি আছে। গৌড় ব্রাহ্মণগণ সন্ধিস্থলে থাকিয়া যেন দুই বাহুদ্বারা আলিঙ্গনে উপর চারি সম্প্রদায়কে রক্ষা করিতেছেন: তাই দ্বিতীয় চরণের প্রথমেই সকলকে "পঞ্চগৌড়াঃ" বলা হইয়াছে। ইং সন ১৯৩০ সালে প্রয়াগের কুম্ভমেলায় অখিল ভারতবর্ষীয় গৌড়-ব্রাহ্মণ-মহাসভায় ভারত-গৌরব পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের বাটীতে বাংলার গৌড়-বৈদিক ব্রাহ্মণগণ সাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ্য-মর্য্যাদা কত উচ্চ তাহা গত সেন্সাস রিপোর্টে গভর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়াছেন। বাংলার স্থানে স্থানে রাঢ়ী, বারেন্দ্র জমিদারগণ নিজ নিজ দেব-মন্দিরে গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণগণকে পূজাকার্য্যে ব্রতী রাখিয়াছেন। রাণী ভবানী, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, মহিষাদলের ব্রাহ্মণ রাজা এবং বর্দ্ধমানের ক্ষত্রিয় মহারাজ, এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। ৺তারকেশ্বর মঠের অধীনে, সন্তোষপুরে ৺বিশালাক্ষী দেবীর মঠে, পুরী মহান্তের এবং দুর্গাবাটীর মঠে ভারতী মহান্তের পুরোহিত হইতেছেন এই ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়। ইঁহারাই বিগ্রহের পূজাকার্য্যে ভোগরাগে আবহমান কাল হইতে ব্রতী হইয়া আসিতেছেন। এইরূপ সাক্ষাৎ বহু নিদর্শনের তালিকা 'ভ্রান্তি-বিজয়ে' প্রদত্ত হইয়াছে। রাঢ়ী, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পাঁচটি মাত্র গোত্র; কিন্তু গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণের বহু গোত্র বিদ্যমান। তাঁহারা শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, ঘৃতকৌশিক, হংস, মৌদ্গল্য, কণ্ব, রঘু, পুণ্ডরীক, কাত্যায়ণ, আল্যমায়নাদি বহু ঋষিবংশজাত। তাঁহারা বর্ণ-ব্রাহ্মণ নহেন। বর্ণব্রাহ্মণ মাত্রেই রাঢ়ী ও বারেন্দ্রগণের পাঁচগোত্র হইতে বাহির হইয়া কলু, বাগদী, তিওর, জালিক কৈবর্ত্ত, শৌণ্ডিক প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির পুরোহিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান তথাকথিত আধুনিক সনাতনী সমাজ এই সামাজিক গূঢ়তত্ত্ব অস্বীকার করিতে পারিবেন না। মাহিষ্য কৈবর্ত্তগণ অন্ত্যজ জালিক কৈবর্ত্ত হইতে জন্মতঃ কর্ম্মতঃ ও ধর্ম্মতঃ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাঁহারা অনুলোম-বিবাহে ক্ষত্র-বৈশ্যাজাত দ্বিজধর্ম্মী ক্ষত্রিয়সন্তান বলিয়া পিতৃবীর্য্যের যথেষ্ট নিদর্শন দেখাইয়াছেন। মাতৃশক্তির বলে গৌড়ের বিশালভূমি শস্য-শ্যামলা কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিয়া গৌড়বাসীর অন্নসংস্থান করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। বাণিজ্যব্যাপদেশে বিশাল
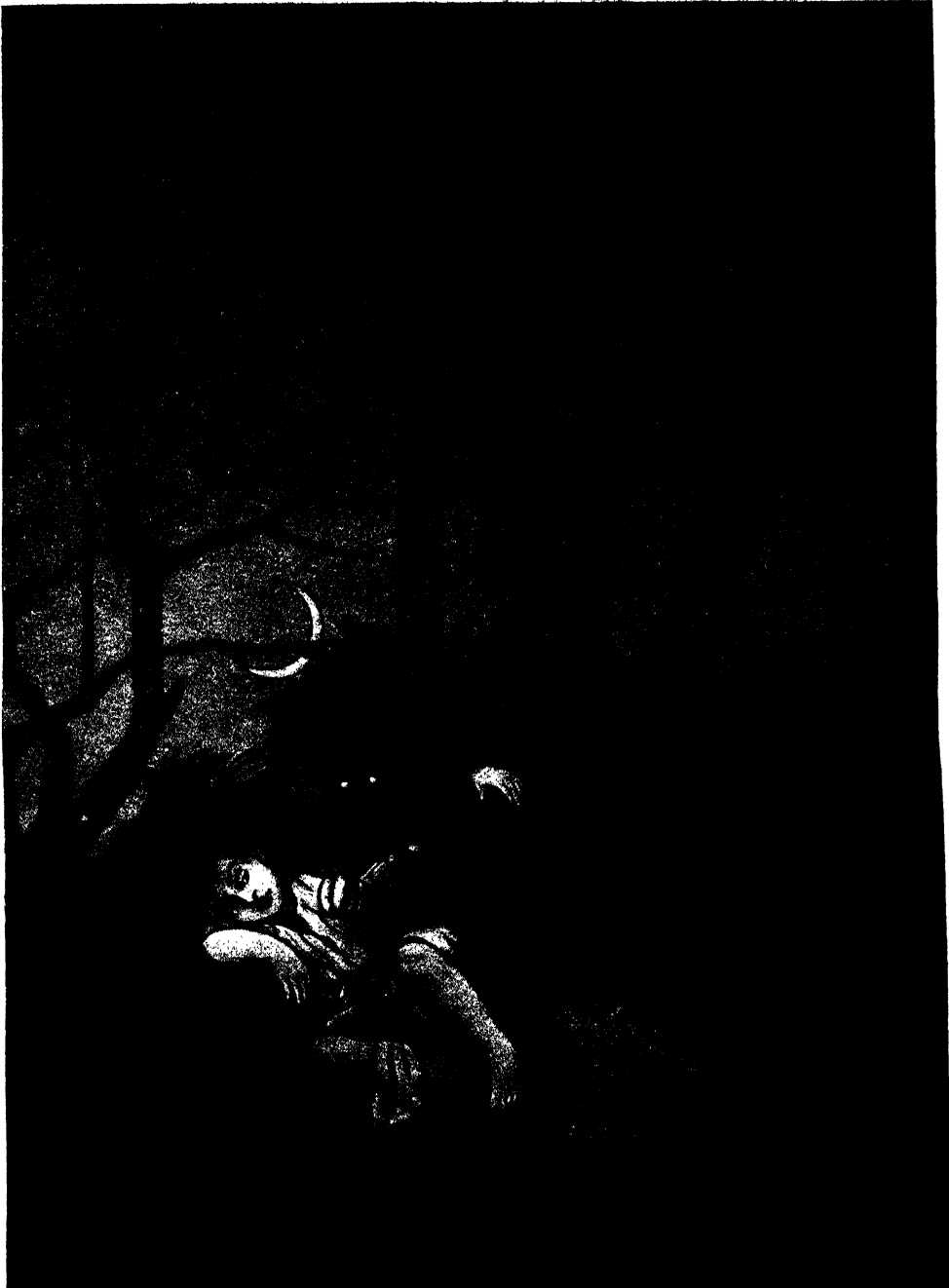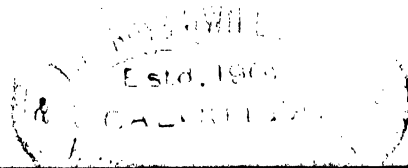
'যার কেহ নাই'

[শিল্পী—শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

Engraved by Prabartak Halftone Works

অর্ণব-যান প্রস্তুত করিয়া তাম্রলিপ্তের বন্দর হইতে চীন, জাপান, রোম, মিশর প্রভৃতি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতে ভারতের পণ্যভার ঢালিয়া স্বদেশের গৌরব বিকীর্ণ করিয়াছিল (Indian shipping by R. K. Mukherjee M. A.)। খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে তাঁহারা ভারত মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করিয়া যব ও বালী দ্বীপে স্বপুরোধা গৌড়-ব্রাহ্মণ সহ মাহিষ্য উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বাংলার বিজয়-কেতন উড়াইয়াছিল (Dr. Bulper Journal of R. A. S. 1877 vol. 6 IX p. p 116 Frederick's Report).

তাঁহারা দক্ষিণ বঙ্গে তাম্রলিপ্ত, ময়নাগড়, তুর্কা, সুজামুঠা ও কুতুবপুর পাঁচটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়া ১৬৫৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। পরে মোগল গভর্ণমেণ্টের করদ মিত্র রাজরূপে পরিণত হন। ১৪শ শতাব্দীতে গৌড়ের পাঠান বাদশাহ সেকেন্দার সুজামুঠা আক্রমণ করিলে মাহিষ্য রাজাধিরাজ বীরবর হরিদাস অশীতি সহস্র পাঠান রক্তে রসুলপুরের নদী ও প্রান্তর রঞ্জিত করিয়া বাদশাহের দর্প চূর্ণ করেন। বহু সহস্র মাহিষ্য বীরগণ জন্মভূমির জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া রসুলপুরের নদী বঙ্গের হল্‌দিঘাটে পরিণত করিয়াছিলেন (রংপুর সাহিত্য পরিষদ হইতে রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত গৌড়ের ইতিহাস ও ঢাকা জগন্নাথ কলেজের প্রফেসার বসন্ত কুমার রায় এম-এ, বি-এল কর্ত্তৃক 'বিজয়াবসান কাব্য' ও Hunter's S. A. accounts.)।

দিব্যের নেতৃত্বে প্রজাশক্তি সমুত্থানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কি কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ ?

দশম শতাব্দীতে ২য় মহীপালের অত্যাচারে গৌড়-বাসীর ধনপ্রাণ বিপদাপন্ন হইলে সমূহ প্রজাবর্গ 'নৌবলাধ্যক্ষ', 'রাষ্ট্রনীতি বিশারদ" 'ক্ষৌণী নায়ক' বীরবর দিব্যক্‌কে নেতা করিয়াছিল। তিনি "অশীতিকারম্ভরত" অত্যাচারী মহীপালকে যুদ্ধে নিহত করিলে দেশের প্রধান প্রধান সামন্তগণ প্রকাশ্য দরবারে নিজ নিজ উষ্ণীষ ও তরবারি দিব্যের পদতলে রাখিয়া দিব্যক্‌কে গৌড়রাজাধিরাজ স্বীকার করেন (বগুড়া হইতে প্রভাস-বাবুর প্রণীত "বরেন্দ্র কাহিনী")। এ দৃশ্য দেখিবার ভাগ্য বাঙ্গালীর কখনও ঘটিবে কি ? গৌড়, মিথিলা ও মগধের শাসন দণ্ড তিন পুরুষ ধরিয়া এই জাতির হস্তে পরিচালিত হইয়াছিল। যে শক্তিকে ধ্বংস করিবার জন্য রাম-পালকে বহুরাজাকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিতে হইয়াছিল, মিলিত বাহিনীর পুনঃ পুনঃ আক্রমণে দিব্যকের ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমপালের ডমর সহজে :অধিকৃত হইল না—শেষে সপ্তরথী ঘেরিয়া অভিমন্যুকে মারিবার ন্যায় অন্যায় যুদ্ধে ভীমের হত্যাসাধন করিয়াছিল ! নেপাল হইতে আনীত রামচরিতের ১ম পঃ ৩১শ শ্লোকে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, দিব্যক্ কর্ত্তব্যবোধে মহীপালের শত্রুতা সাধন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকর এই "কর্ত্তব্য-বোধকে" "কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহ" বলেন নাই। নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় কৃত রাজন্যকাণ্ডের ১৯৫ পৃঃ হইতে জানা যায় যে, প্রকৃতিপুঞ্জ কর্ত্তৃক মহীপাল নিহত না হইলে মহীপাল কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ রামপালের উদ্ধার সাধন হইত না। রামপাল বিপদের বন্ধু ভীমকে আর্য্যাবর্ত্তের মিলিত বাহিনীর সাহায্যে অন্যায় যুদ্ধে হত্যা করিয়া অকৃতজ্ঞের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার অর্থে বশীভূত সামন্ত রাজগণ ও প্রজাশক্তির নেতাকে ধ্বংস করিয়া প্রজাশক্তির সমুত্থানের মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন। দেবদ্বিজেভক্ত প্রজারঞ্জক ভীমের প্রশংসায় রামচরিত মুখরিত। মহীপালের অত্যাচার হইতে প্রজাপুঞ্জের উদ্ধার-কর্ত্তার কর্ত্তব্য-কার্য্যকে একদেশদর্শী ঐতিহাসিকগণ "কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহ" বলিতে লজ্জাবোধ করিতেছেন না। ইংলণ্ডে অলিভার ক্রমওয়েল রাজা ২য় চার্লসকে দমন করিয়া যে প্রজাশক্তির পত্তন করিয়া গিয়াছিলেন, সুমহৎ ইংরাজ জাতি সে শক্তির ধ্বংস করে নাই বলিয়া আজ ইংরাজ জগতে পূজিত। গ্রীসিয়ানদিগের কবল হইতে তুর্ক-জাতিকে স্বাধীন করার প্রচেষ্টা সংবাদপত্রে "Kamal Revolt" বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। কামালপাশা কিরূপ শৃঙ্খলায় ও বীরত্বের সহিত তুর্কজাতিকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন তাহা জগতে অবিদিত নাই। বর্ত্তমান প্রজাশক্তি সমুত্থানের ঐকান্তিক চেষ্টায় ভারত-

ব্যাপী যে তুমুল আন্দোলন উঠিয়াছে, তাহাতে দেশের বড় বড় রাজনৈতিকবৃন্দ আত্মবলিদান দিতেছেন। চিতোরাধীশ্বরী দেবী মুসলমান-কবল হইতে চিতোর-রক্ষাকামী রাণা ভীমসিংহকে আকাশ-বাণীতে বলিয়াছিলেন "ম্যায় ভূখা হুঁ।" ভীমসিংহ নিজপুত্রগণকে ঘোর যুদ্ধ-যজ্ঞে আহুতি দিয়াছিলেন। যে প্রজাশক্তির সমুত্থানে বাঙ্গালী জাতি প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে বিপুল সম্রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহারাই অকৃতজ্ঞের ন্যায় প্রজাশক্তির নায়ককে অন্যায় যুদ্ধে মারিয়া দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে।

উত্তর বঙ্গে দিব্যের বিজয়-স্তম্ভ ভীমের "ডমর" ও জাঙ্গাল, পূর্ব্ববঙ্গে সাভারে রাজা হরিশ্চন্দ্র ও নবরঙ্গ রায়ের কীর্ত্তিমালা, দক্ষিণ বঙ্গে যাঁহাদের কীর্ত্তি-গৌরবের চিত্তস্পর্শী ভগ্নাবশেষ দেখিলে অতিবড় দাম্ভিক পুরুষেরও মস্তককে লজ্জায় অবনত করে। অন্যান্য জাতি গললগ্নীকৃতবাসে যাঁহাদের আদেশ পালন করিয়াছে, যাঁহারা প্রভুর ন্যায় আদেশ করিবার পদারূঢ় ছিলেন (Had commanding position, Risely) একশত বৎসর পূর্ব্বে যে জাতির বীরবাহিনী কর্ণেল Sir Eyer coot-এর অধীনে পরিচালিত হইয়া ভেলোর বিদ্রোহ দমন করিয়াছিল, সেই ক্ষত্রিয় সন্তানের বংশধরগণ আজ স্পৃশ্য কি অস্পৃশ্য, আর তাঁহাদের পুরোধা ব্রাহ্মণগণ পতিত বা অপাঙ্‌ক্তেয়, এই প্রশ্ন উঠিতে দেখিয়া বা শুনিয়া মর্ম্মভেদী তপ্তশ্বাসে বলিতে হয়—অকৃতজ্ঞ বাঙ্গালী! তোদের অধঃপতন ভগবানের অভিসম্পাতে ঘটিত হইয়াছে।

সনাতনী টুলো পণ্ডিতগণ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", সকল দেহে নারায়ণ আছেন বলিয়া "ঘটাকাশ" নৈয়ায়িক যুক্তি সর্ব্বদা তোতা পাখীর ন্যায় কপ্‌চাইতে থাকেন, কিন্তু ছুঁৎমার্গে দেশ আচ্ছন্ন করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন। গীতায় শ্রীভগবান নিজমুখে বলিয়াছেন, হরিভক্তিপরায়ণ সপচ হরিভক্তিবিহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উচ্চ। গীতা অগ্রাহ্য করিয়া আভিজাত্যের বড়াই আর কত দিন চলিবে? জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলে উচ্চ নীচ যোনিতে জীব জন্মগ্রহণ করিলেও অঙ্গে ঘৃণার তরঙ্গ না উঠাইয়া, নাসিকা কুঞ্চিত না করিয়া সকলকেই সমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিবেচনা করিয়া প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করা উচিত। আকুমার ব্রহ্মচারী শুকদেব গোস্বামী পিতার আদেশে ব্যাধের নিকট শিক্ষালাভ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই।

যুগ-বোধন

(গান)

শ্রীঅক্ষয় কুমার কয়াল

যুগের শঙ্খ বাজে!
আয় ছুটে আয় থাকিস্ যেথায়
ভুলি' দ্বিধা-ভয়-লাজে।

গাও রে যুগের গান,
তোল্ রে যুগ-নিশান,
দাও রে জীবন যৌবন ধন
সঁপিয়া যুগের কাজে।

যুগের নৃত্য-চালে
পা ফেল্ সমান তালে,
যুগের ছন্দে চল্ আনন্দে
আজিকে যুগের সাজে।

চল্ রে ছুটিয়া সবে
যুগের মহোৎসবে!
চেয়ে' দেখ্ পথে ঐ হেমরথে
যুগের দেবতা রাজে!

প্রীতি ও মায়া

(গল্প)

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

সমর ঘোষ সদ্য জার্ম্মাণী প্রত্যাগত যুবক ডাক্তার, এম্, ডি, বার্লিন। বার্লিনে ডাক্তারি ডিগ্রি নিয়ে সে প্যারিস্ ভিয়েনা জুরিক্ মিউনিক্ ইয়োরোপের নানা সহরে হাসপাতাল-চিকিৎসার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে পাঁচ বছর কাটিয়ে দিলে। বন্ধুমহলে গুজব রটে গেছল, সমর নিশ্চয় কোন জার্ম্মাণ যুবতীর প্রেমে মসগুল; তিনি রাইনল্যাণ্ডবাসিনী না ভিয়েনার ললনা, বন্ড না ব্রুনেট, এ বিষয় তর্ক হত। তার নানা আত্মীয়ারা দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌তেন, নানা সম্পর্কিতা বিবাহ-যোগ্যা কন্যাদের মাতৃ-মণ্ডলীকে তাঁরা আশ্বাস দিয়েছেন, সমর এসে তাঁদের কথা ঠেল্‌তে পারবে না, বিলেত গিয়ে এ কোন কুহকিনীর মায়ায় পড়ল্!

সহসা সাত বছর পরে সমর কলিকাতার বাড়ীতে এসে হাজির, সঙ্গে কোন রক্তকেশা নীলাক্ষি জার্ম্মাণ দুহিতা নেই। বন্ধুরা অবাক হল, আত্মীয়ারা উৎফুল্লা হলেন। সমর সঙ্গে এনেছে তিন বড় কাঠের বাক্সভরা বই, ইয়োরোপের নানাভাষার; আর একটি নীললোহিত বর্ণের মোটরকার।

লম্বা স্থচালো বনেট, গ্রে হাউণ্ডের মুখের মত; টুসিটার বডিটা একটু বর্ত্তলাকার, পেছনটা আবার সরু হয়ে গেছে, নীললোহিত মোটরকারটি যখন অপরিমিত শব্দ করে কলিকাতার ট্রাম-বাস-গরুরগাড়ী সমাকীর্ণ পথ দিয়ে সর্পিল গতিতে যায়, মনে হয় কোন উল্‌ফ-হাউণ্ড্ ছুটে চলেছে গর্জ্জন করতে করতে। শুধু গতি নয়, চাঞ্চল্য, অশান্ত অস্থিরতা।

সমরের মোটরগাড়ী কখনও দেখা যায় গ্রে ষ্ট্রীটে, কখনও গড়িয়াহাটায়, কখনও কলেজ ষ্ট্রীটে, কখনও বালীগঞ্জ পার্কের সামনে। নীচু সিটে পিঠে চাওড়ার কুশান দিয়ে ষ্টিয়ারিং-চক্র ধরে সমর ব'সে; স্থূলকায় বন্ধুরা বলে ইয়োরোপে তার এই মেদবৃদ্ধি অত্যধিক বিয়ার-পানের ফল। সমর সে আলোচনায় যোগ দেয় না, সহসা নীরব উদাস হয়ে যায়। গায়ে লংক্লথের বা দেশী সিল্কের পাঞ্জাবী, পরণে মুগা-পাড় দিশি কলের সূতার তাঁতে-বোনা কাপড়, পায়ে কাবুলী নাগ্‌রা; মাথার সামনের চুল উঠে গেছে, সুপ্রশস্ত কপাল চক্‌চক্ করে, পেছনের চুল প্রুসিয় রীতিতে ছোট করে ছাঁটা; গোলগাল ভরা-মুখ, নাকে মোটা চশমা, ফ্রেমের রংটা মোটরকারের বর্ণের; গৌরবর্ণ মুখে যেমন বুদ্ধির দীপ্তি তেম্নি সহজ খুসির আভা ভরা। পথে কোন পরিচিত বন্ধু যাচ্ছে দেখলে, সে সশব্দে মোটর থামায়, চীৎকার করে ডাকে, জোরে হাত ঝাকুনি দিয়ে কথা বলে, উচ্চস্বরে হাসে, পিট চাপড়ে চায়ের নিমন্ত্রণ করে, জোর করে মোটরগাড়ীতে তুলে বন্ধুর গন্তব্যস্থানে পৌছে দিয়ে আসে। তার মনে সহজ সুখ, তার ব্যবহারে সরল উচ্ছ্বাস, যেন সবাইকে সে নাড়া দিয়ে সচল ক্রিয়াবান করে তুলতে চায়; সে জার্ম্মাণী থেকে শুধু চিকিৎসা সম্বন্ধে নবজ্ঞান বা মোটরকার আনেনি, নাৎসী জার্ম্মাণীর নবসৃষ্টির উল্লাস এনেছে তার অন্তরে।

কিন্তু কলিকাতায় এসে সমর যে সমস্যায় পড়েছে, তার সমাধান হিট্‌লারি বিধানে খুঁজে পাওয়া শক্ত। সেটা হচ্ছে, দিনের পর দিন বিভিন্ন স্থানে নিমন্ত্রণরক্ষা ও তৎসহিত বিবাহযোগ্যা ও অযোগ্যা নানা কন্যাদর্শন। বন্ধু, তস্য বন্ধু, নানা সম্পর্কিত আত্মীয়গণ কেউ দুপুরে, কেউ বিকেলে থেতে, কেউ ডিনারে নিমন্ত্রণ করে যায়। সমর কাউকে নিরাশ করতে চায় না, সব নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে ও রাখে। তার বৌদিদিকে একখানা ডাক্তারদের ডায়েরি দিয়েছে, সে ডায়েরির প্রতিদিনের পাতা ঘণ্টা হিসাবে ভাগ করা। বৌদিদি ডায়েরিতে নিমন্ত্রণের এন্‌গেজমেণ্টগুলি লিখে রাখেন, সকালে দুপুরে স্মরণ করিয়ে দেন কখন কোথায় কার বাড়ীতে যেতে হবে। বাগবাজারে, বহুবাজারে, বালীগঞ্জে, বেহালায় সমরের

মোটরকার সর্ব্বত্রই দেখা যায়। লোকে ভাবে, নূতন ডাক্তার, খুব প্র্যাকটিস্ জমিয়েছে।

কোন বর্ষীয়সী আত্মীয়া জিজ্ঞাসা করেন, "কেমন মেয়ে দেখ্‌লে ভাই ?" সমর গম্ভীরভাবে বলে, "কৈ, দেখতে বল্লেন না ত, কি অসুখ ?" "কেন, ওই যে মেয়েটি ফল ও মিষ্টির রেকাব হাতে করে এল!" সমর বলে, "ও, মেয়েটিকে একটু এ্যানিমিক মনে হল, ওষুধ লিখে দেব।" কেউ কেউ একটা ওষুধও লিখিয়ে নেয়। কখনও সমর বলে, "মেয়েটি নার্ভাস, হাত কাঁপছিল, সমুদ্র-স্নান ও সান্-বাথ্ করলে উপকার হবে।" তারপর হো হো করে হেসে ওঠে।

দুপুরবেলা বাড়ীতে শ্বেতপাথরের গোল টেবিলে সমর খাচ্ছিল। পায়েসের প্লেটটা শেষ করে সে বলে উঠল, "বৌদি, এ পরমান্ন সত্যই অমৃত, তোমার রান্না নিশ্চয়।"

"আর একটু দেব, ভাই ?"

"না, বড় মোটা হয়ে যাচ্ছি। এ যে দিয়ে ফেল্লে, এ পরমান্ন ফেলে রাখি কি করে!"

"আচ্ছা, ঠাকুরপো, আমার মেজ মাসীকে তোমার মনে পড়ে।"

"খুব, যিনি দর্জ্জিপাড়ায় থাকতেন ত!"

"হাঁ।"

"খুব মনে আছে, জার্ম্মাণী যাবার আগের দিন আমায় খুব খাওয়ালেন, মাছের সিঙ্গারা আর মিঠে কোর্ম্মা ভারি ভাল রেধেছিলেন।"

"আজ সকালে মেজ মাসী এসেছিলেন।"

"তাইত, দেখা হল না, তা ডায়রিতে নাম উঠে গেছে নিশ্চয়।"

"না, তোমাকে না জিজ্ঞেস করে আমি কিছু বলি নি।"

"বা, বৌদি, তোমাকে খাতা ফেলে দিয়েছি তুমি যখন যেখানে হুকুম করবে, আমি যাব, আমায় জিজ্ঞেস করার কি দরকার।"

"না ভাই, মেজ মাসীকে তুমি জান না, এক কাপ চা খাইয়ে তিনি ছাড়বেন না। বাড়ীতে দু'টি বিয়ের যুগ্যি মেয়ে—"

"এতে ভয় পাবার কি আছে, খাতাখানা দেখত বৌদি, আজ সন্ধ্যায় বোধ হয় ফ্রি আছি।"

"না, না, আজ হাতীবাগানে তোমায় যেতে হবে, পিসীমা অনেক করে বলে গেছেন, কাল সকালে আমি টেলিফোন করব, কাল বিকেলে মাসীমার ওখানে যেও, ওঁরা আজকাল বালীগঞ্জে এ্যাভিনিউর কাছে নূতন বাড়ী করেছেন।"

পরদিন সন্ধ্যায় সমর বালীগঞ্জে মিত্তির বাড়ীতে চা খেতে গেল। রাতে খাবার টেবিলে সে বৌদিদির কাছে চা-পার্টির রিপোর্ট পেশ করলে।

"বৌদি, আয়োজনটা বেশ ভালই হয়েছিল, ফিরপো থেকে এসেছিল সাণ্ডউইচ্ কেক, বউবাজার থেকে সন্দেশ, ঘরে তৈরী হয়েছিল মাছের সিঙারা—ওটা বোধ হয় তোমার টিপ্। তোমার মাসী আরও মোটা হয়েছেন দেখলুম, খুব যত্ন করলেন। সমস্ত বাড়ী ঘুরে দেখালেন—জমি কিনতে কত পড়েছে, বাড়ী করতে কত খরচ হয়েছে, ইঞ্জিনিয়ারের প্ল্যানে তিনি কি অদল বদল করেছিলেন, সব শুনতে হল। তারপর এ্যাল্‌সেসিয়ান কুকুরটির বয়স, বংশাবলী, নতুন মোটরকারটি কতদিন কত দামে কেনা হয়েছে, খানসামা মুসলমান নয় চট্টগ্রামবাসী বৌদ্ধ, ইত্যাদি নানা তথ্য জানা গেল।

"মায়া নাম্নী কন্যাটির প্রবেশ হল চা-পান পর্ব্বের প্রথমভাগে। খাবারের রেকাব হাতে করে মামুলি প্রবেশ নয়, তিনি এলেন এ্যালসেসিয়ান হাউণ্ডের গলার সরু শিকলি টান্‌তে টান্‌তে ; কিন্তু এ প্রবেশ ভঙ্গীটা তাঁর ঠিক মানায় না। মেয়েটি স্থূলকায়া ও অত্যন্ত সুশীলা ; বাড়ীতে চা-পার্টির পক্ষে বেশ ছিল বেশী জাকজমকের, সেটা মায়ের আদেশে বুঝলুম। কিছু মনে কোরোনা বৌদি—"

"বেশ লাগ্‌ছে ভাই শুনতে, তুমি স্বচ্ছন্দচিত্তে বলে যাও।"

"দেখ বৌদি, আমি একটা ওষুধ ও পথ্য লিখে দেব, ছ'মাস এ ওষুধ খেয়ে পথ্য অনুসারে চল্লে, মায়ার চেহারা বদলে যাবে দেখো, অত মোটা থাকবে না, খুব রোগাও হবে না। ওই যে ভারতীয় আর্টের তন্বী, ও আমি মোটেই পছন্দ করি না—তবে ব্যায়াম করা দরকার, রোজ একঘণ্টা

সাঁতার কাটতে পারলে সবচেয়ে ভাল এতবড় কল্‌কাতা সহর মেয়েদের একটা সাঁতার কাটবার জায়গা নেই। আচ্ছা, ওষুধটা খাইয়ে দেখ—আমিই বলে আসতুম, তারপর ভাবলুম, প্রথমদিনেই এত ইন্‌টারেষ্ট দেখান ভুল বুঝতে পারে।”

“আচ্ছা, তুমি আমায় বলো, আমি ভুল বুঝব না।”

“দেখ বৌদি, মায়ার নাম সুশীলা হলে ঠিক মানাত। ভারি শান্ত, অথচ বেশ হাসিখুসি ভাব, মন বড় সরল, তবে মায়ের শাসন একটু উগ্র রকমের, তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে হাঁপিয়ে ওঠে। তোমার মাসী বল্লেন, মায়া বি-এ, ক্লাস পর্য্যন্ত পড়েছে। কিন্তু মাসীমা একটু আড়ালে যেতেই মায়া আমায় বল্লে, দেখুন, আমি, বি, এ, পরীক্ষায় ফেল করেছিলুম, তারপর আর পড়িনি; মা যে তা বলতে কেন লজ্জা পান বুঝি না।

“চা-পানের শেষ-পর্ব্বেই এলেন প্রীতিকণা, উলফ হাউণ্ডের গলা শিক্‌লি দিয়ে টান্‌তে টান্‌তে প্রবেশ করলেই তাঁকে ঠিক মানাত। দুই বোনের মধ্যে শুধু রূপের বর্ণের নয় একবারে চরিত্রগত প্রভেদ; অথচ দুই বোনের মধ্যে কোথায় অন্তরের গভীর যোগ। প্রীতির আগমন মাসীমা পছন্দ করলেন না, অথচ মায়া তাকে জোর করে ধরে নিয়ে এল, তিনি ধীরে চলে গেলেন।

“প্রীতি বল্লে, দেখ্‌লেত দিদি, উনি উঠে চলে গেলেন, কেন ভাই তোমাদের এ্যারিষ্টোক্রেটিক পার্টিতে আমাকে লজ্জা দিতে টেনে আনা। আমি বল্লুম, আমাকে এ্যারিষ্টোক্রেটের দলে ঠেলবেন না, আমি সামান্য ডাক্তার মাত্র। প্রীতি বলে উঠল সে ভয় নেই, এ্যারিষ্টোক্রেট দেখলে আমি চিনতে পারি, আপনি একেবারে বুরজোয়ার প্রতিমূর্ত্তি অথবা নকল নাৎসী।

তারপর নাৎসী জার্ম্মাণী, ইহুদীদের ওপর অত্যাচার কম্যুনিজমের ভবিষৎ, নানা বিষয়ে তর্ক উদ্দাম হয়ে উঠল। দেখলুম প্রীতি যেমন ব্যঙ্গ-সুনিপুণা তেম্নি তীক্ষ্ণধী। সে মায়ার আহ্বানে চা-পার্টিতে আসেনি আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ তর্ক করবার লোভেই এসেছিল। সাড়ে্টা বাজতেই কমিটি মিটিং আছে বলে উর্দ্ধশ্বাসে চলে গেল। কি কমিটি বৌদি?”

“ওর স্কুল-কমিটি হবে, শ্যামবাজারের দিকে এক মেয়ে স্কুল চালাবার ভার নিয়েছে। পড়াশোনায় খুব ভাল। গত বছর ফাষ্টক্লাশ এম-এ, পাশ করেছে।”

“শুনলুম তাই, পলিটিক্সে এম-এ। মায়ার মুখে ওর প্রশংসা ধরে না। ওর বুদ্ধি, স্বাধীনতা, স্বাবলম্বীভাব, মায়ার কোনটাই নেই, সেজন্যে প্রীতিকে পেলে ও আঁকড়ে ধরে। তোমার মাসীমার শাসন প্রীতি মানে না, কোনদিকে যে কারুর শাসন আছে, তা যেন প্রীতি স্বীকার করে না। কি জানো বৌদি, ওর বুদ্ধি জেগেছে কিন্তু হৃদয় জাগেনি। ওর বুদ্ধির প্রখর দীপ্তি দেখলুম তার কালো চোখের তারায়, সেখানে অন্তরের স্নিগ্ধতা নেই।”

“তুমি ভাই এতও দেখতে পাও—”

“মেয়েটি সত্যই ইন্‌টারেষ্টিং, বাঙ্গালীর ঘরে চরস্তনী নারীপ্রকৃতির নব বিবর্ত্তনের রূপ। আচ্ছা, বৌদি, তোমার মেজ মাসীমারত ওই দুই মেয়ে—”

বৌদিদি পিছন ফিরে সাইডবোর্ডে কি খুঁজতে খুঁজতে বল্লেন, “হাঁ, আমার মেজ মাসীর দুই মেয়ে, বড় মেয়েটির দু'বছর হল বিয়ে হয়েছে, আছে এলাহাবাদে; মায়া তাঁর ছোট মেয়ে, আর প্রীতি আমার ছোট মাসীর মেয়ে। প্রীতির বাবা মা ছোটবেলাতেই মারা যান, মেজ মাসীই ওকে আপন মেয়ের মত মানুষ করে তুলেছেন। বাঃ; ঠাকুরপো, কোথায় গেলে, তোমার জন্যে যে আমের আচার বার করলুম, এত খুঁজে।”

সমর বৌদিদির কোন কথা না শুনেই উঠে গেছে অলক্ষ্যে, বৌদিদি তা কিছুই জানতে পারেন নি।

পরদিন দুপুরবেলা খাওয়ার পর সমর তার মোটরগাড়ী নিয়ে বাহির হল। অতি আধুনিক এক ক্লিনিক করবার সঙ্কল্প; সে বিষয় তার এক শ্যামবাজারবাসী ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করতে চল্ল। আর প্রীতির স্কুলও ত শ্যামবাজারের দিকে। গ্রে ষ্ট্রীট পার হয়ে অতি ধীরে মোটর চালাতে লাগল।

চৈত্রের মধ্যাহ্ন, রৌদ্রের প্রখর দীপ্তি। ফুটপাথের গাছগুলির নতুন পাতায় তীব্র সূর্য্যালোক ঝিকমিক করছে, পথে জনস্রোত স্বল্প, মোটর গাড়ীরও ভিড় নেই, চারিদিক নিঝুম।

বড় রাস্তা থেকে একটি সরু-গলি এঁকেবেঁকে চলে গেছে; তারি মোড়ে এক বড় গাছের কালো গুড়ির পাশে ফুটপাথের ওপর একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে, এক হাতে বেঁটে মোটা ছাতা, এক হাতে বই-ভরা ব্যাগ; মেয়েটি বড় উদাস ভাবে দাঁড়িয়ে, মুখ শুকনো, চোখ ক্লান্ত, এ পৃথিবীর পথে সে যেন বড় একা। তার মাথার ওপর কচি সবুজ পাতাগুলি আলোয় ঝির ঝির করে দুলছে। ওইত প্রীতিকণা, বোধ হয় ট্রাম বা বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে।

সমর তার গাড়ী ঘুরিয়া কালো গাছটার সামনে রাখলে। প্রীতি লক্ষ্যই করেনি সমরের মোটরকার; সে একটু ভ্রূকুঞ্চিত করে সরে দাঁড়াল। মোটরকার আর একটু এগিয়ে রেখে সমর গাড়ী থেকে বাহির হল, ঠিক প্রীতির সামনে গাড়ীর দরজা খুলে সহাস্যবদনে বল্লে, "নমস্কার মিস্ মিত্র, গরীবের গাড়ীতে যদি একটু পায়ের ধুলো দেন ত বাধিত হব।" প্রীতি চমকে উঠল, "ও আপনি, আপনার গাড়ী? না, না, আমি ট্রামে যাব।"

"দেখুন, যদি গাড়ীতে উঠতে আপত্তি করেন, তাহলে জানব—"

"আচ্ছা চলুন।" প্রীতি বড় শ্রান্ত, দুপুরের রোদে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তর্ক করতে সে চাইল না, ধীরে গাড়ীতে উঠল।

মোটরকার ছুটল অতি দ্রুতবেগে। বাঁধা নিয়মের অধিক দ্রুতগতিতে গাড়ী চালনার জন্য সমর দু'বার জরিমানা দিয়াছে, আজ আর একবার দিতে তার আপত্তি নেই। মত্তগতির আবেগে প্রীতি সজীব-চঞ্চল হয়ে উঠল, তার চোখ জল জল করতে লাগল। সমর বল্লে, "ভয় করছেনা ত মিস্ মিত্র!"

প্রীতি উচ্ছ্বসিত হয়ে বল্লে, 'খুব ভাল লাগছে।"

এস্প্লানেডে এসে সমর চৌরঙ্গী দিয়ে গেল না, খিদিরপুরের পথে চল্ল, উল্কার মত ছুটে চলে গেল রেসকোর্সের পাশ দিয়ে। প্রীতির হৃদয় দুলে উঠল গতির অন্ধ উন্মাদনায়, সে মাঝে মাঝে চোখ বুজে এলিয়ে পড়ল। মিত্তির বাড়ীর কাছে সমর যখন তাকে নামিয়ে দিলে, তার বুক দুল্‌ছে, মুখ রাঙা, নটরাজের প্রলয় নৃত্যের সুর তার পায়ে কাঁপছে।

সমর বুঝলে, প্রীতিকে সে যতখানি যৌবনপ্রেমহীনা ভেবেছিল, সে সত্যই তা নয়, তার নয়নেও আছে বাসনার জ্বালাময় বহ্নি, তার ভূষণে ভঙ্গীতেও আছে প্রণয়ের আকুল ইঙ্গিত।

পরদিন সন্ধ্যায় সমর বালীগঞ্জে মিত্তির বাড়ীতে হাজির হল। সামনের বাগানে সবুজ ঘাসের ওপর বেতের চেয়ারে প্রীতি বসেছিল, আর এক চেয়ারে স্কুলের খাতা।

প্রীতি একটু গম্ভীর ভাবে বল্লে, "ওঁরা ত কেউ বাড়ী নেই, সবাই বায়স্কোপ দেখতে গেছেন।"

"আপনি ত যান নি।"

"আমার সময় কোথা, এই সব পরীক্ষার খাতা দেখতে হবে।"

"তাই ত দেখ্‌ছি, আপনি তাহলে এখন ব্যস্ত।"

"হুঁ।"

"তাহলেও একটু বসা যেতে পারে।"

পরীক্ষার খাতাগুলি চেয়ার হতে ঘাসের ওপর রেখে সমর চেয়ারে চেপে বসলে।

"দেখুন, মিস মিত্র, জার্ম্মাণীতে আমি অনেক স্কুল দেখেছি, মর্ডান মেয়েদের স্কুল, সে সম্বন্ধে অনেক বইও এনেছি, এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা করতে চাই—ধরুন—"

প্রীতি দেখ্‌লে, লোকটি নাছোড়বান্দা; হেসে বল্লে "চা না কফি আনতে বলব, ইচ্ছা করলে ঘোলও পেতে পারেন।"

"ওই ঘোলই আন্‌তে বলুন, ওটা অনেকদিন খাইনি। আচ্ছা স্কুলে কো-এডুকেশন সম্বন্ধে আপনার মত কি, আমার ত মনে হয়—"

স্কুলশিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হতে আরম্ভ হল নিজ নিজ স্কুলজীবনের গল্প, নানা শিক্ষক-চরিত্র কথা, হাস্যকর ঘটনা

তারপর কলেজ-জীবনের কথা, জীবনের উদ্দেশ্য, আদর্শ। আশ্চর্য্য, সে সন্ধ্যায় কোন তর্ক বাধল না। গল্পে তারা মস্‌গুল হয়ে গেল। ধীরে অন্ধকার হয়ে এল, আকাশ গেল তারায় তারায় ভরে, শুক্লা চতুর্দ্দশীর চাঁদ উঠল তালগাছের পাশে, স্নিগ্ধ বাতাসে ফুলের বাগান সমুদ্রের ঢেউয়ের মত উঠল দুলে।

যখন তাদের চমক ভাঙ্গল, তখন রাত আট্‌টা। প্রীতি হেসে লাফিয়ে উঠল, "দেখুন ত, আপনার জন্যে আমায় আজ রাত জেগে এ সব খাতা দেখতে হবে।"

সমর উত্তর দিলে, "দেখুন আপনার বয়সে কত রাত অকারণেই জেগে কাটিয়েছি!"

সে রাতে কিন্তু প্রীতির খাতা দেখা হল না, মাথার জানালা খুলে বিছানায় শুয়ে সে আলো নিভিয়ে দিলে, চাঁদের আলোয় শুভ্র-শয্যা গেল ভেসে, যেন সমুদ্রফেনায় পুঞ্জীভূত লাবণ্য।

সে রাতে খাবার টেবিলে সমরের দৈনিক রিপোর্ট খুব সংক্ষিপ্ত হল। বল্লে, "বৌদি, সন্ধ্যেবেলায় তোমার মেজ মাসীর বাড়ী গেছ্‌লুম, তাঁর দেখা পেলুম না, সবাই বায়স্কোপে গেছেন।"

তারপর বল্লে, "বৌদি, জানা অজানা অনেকের বাড়ী অনেক নিমন্ত্রণ খাওয়া হয়েছে; এবার কাজকর্ম্মে মন দিতে হয়, তুমি আর কাউর নিমন্ত্রণ নিও না। ডাক্তার হিসাবে না ডাকলে আমি আর কারুর বাড়ী যাচ্ছি না।"

বৌদিদি হেসে বল্লেন, "আচ্ছা ভাই তাই হবে।" মনে মনে ভাবলেন, তরী বোধ হয় ঘাটে ভিড়ল, এবার বিবাহের নোঙর ফেল্লেই হয়।

প্রীতির স্কুলের ছুটি হয় চারটের সময়, সমর জেনে নিয়েছিল। ঠিক চারটের সময় সে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের সেই পুরাতন গাছের তলায় মোটরকার রাখলে। একটু পরে প্রীতির দীপ্ত মূর্ত্তি দেখা গেল, সাড়ীর সবুজ পাড় অতি প্রশস্ত।

"নমস্কার মিস্ মিত্র—"

"ও আপনি—"

"আপনার স্কুলের দিকে যাচ্ছিলুম, এর মধ্যে ছুটি হয়ে গেল—চলুন আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"কি যে ভাবেন আপনারা আমাদের—"

"কি যে ভাবি, সেই কথা বলতেই ত গরীবের গাড়ীতে উঠতে বল্‌ছি।

"থ্যাঙ্কস্"

ছাতা ঘুরিয়ে প্রীতি চলে গেল এগিয়ে, কালীঘাটগামী এক চলন্ত মোটরবাস থামিয়ে উঠে পড়ল। সমর তার গাড়ী চালিয়ে চল্ল কিছুদূর বাসের পাশাপাশি। মাঝে মাঝে দেখতে পেলে প্রীতির আরক্ত আননে হাসির ঝিলকি। সমর বুঝলে, এ মেয়ে যাকে ভালবাসবে তাকে সে কাঁদাবে।

কিন্তু ওই মেয়ের হৃদয় জয় করতেই সমরের নেশা লাগল। মুস্কিল এই, নারীচিত্ত বিজয়ের যে সব অস্ত্র ইয়োরোপে সে শিক্ষা করেছে তার কোনটাই এখানে প্রয়োগ করা চলবে না। বলা চলবে না, চলো আজ সন্ধ্যায় রেস্তোরাঁতে খেতে, তারপর মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত নাচা যাবে; অথবা চলো আজ বেরিয়ে পড়ি নগর ছেড়ে, মোটরকারে দেব লম্বা পাড়ি।

সমর খুব উদ্যোগী উৎসাহী যুবক, সন্ধ্যায় সে মিত্তির বাড়ীতে হাজির হল। মেজ মাসী বিশেষ ভাবে অভ্যর্থনা করে তাকে ড্রয়িংরুমে বসালেন; নতুন কার্পেট কত সস্তায় কিনেছেন দেখালেন, পারস্যের কার্পেট, ইয়োরোপের কলে তৈরী কার্পেটের দর সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনা হবার পর, মায়া এল বিশেষ সাজ করে; তখন মেজ মাসীর মনে পড়ে গেল অনেকগুলি জরুরি কাজ পড়ে রয়েছে। তিনি হলেন অন্তর্হিতা। মায়া সমরের সঙ্গে একা, একটু মুস্কিলে পড়ল; সমরের সঙ্গে কি কথা কইবে, ইয়োরোপ সম্বন্ধে কি জিজ্ঞাসা আলোচনা করবে, সে দু'দিন ধরে ভেবে রেখেছিল, কিন্তু সমরের সামনে এসে সব গেল ভুলে, গল্প তেমন জমল না। প্রীতির অনুপস্থিতির কারণ সম্বন্ধে দু' তিনবার জিজ্ঞাসা করাতে, মায়া গেল প্রীতিকে ধরে আনতে; প্রীতি কিন্তু কিছুতেই তার তেতলার ঘর হতে বাহির হল না। মায়া এসে বল্লে, প্রীতির বড় মাথা ধরেছে, ও একগুঁয়ে মেয়েকে আমি আনতে পারলুম

র্না। সমর কিন্তু দমল না, মায়াকে গান গাইবার জন্যে বহুক্ষণ সাধাসাধি করলে, নিজেই পিয়ানো খুলে একটা জার্ম্মান চাষার গান গাইলে, উচ্চহাস্যে তার অনুবাদ হল, মায়ার ছুটো বেসুরো-গাওয়া গান শুনলে স্থিরভাবে।

পরদিন সন্ধ্যায়ও সমর গেল মিত্তির বাড়ীতে, মিত্র-গৃহিণী সেইরূপই আশা করেছিলেন। মায়াকে বাড়ীতে রেখে তিনি বেরিয়ে গেছলেন পাড়া বেড়াতে। সে সন্ধ্যায় মায়ার সঙ্গে প্রীতিও এল, ড্রয়িংরুমের সামনে সবুজ পেটেণ্ট-ষ্টোনের চওড়া বারান্দায় তাদের আড্ডা বসল। পূর্ব্ব-পরাহ্নের রূঢ় আচরণের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপই প্রীতি এল। বাড়ীর মোটরগাড়ী থাকা সত্ত্বেও সে রোজ ট্রাম-বাসে স্কুলে যায়, পরের মোটরকারে রোজ রোজ সে কেমন করে আসে—এই কথা জানিয়ে কয়েক মিনিট থেকে সে চলে যাবে, এইরূপ ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সে কথা বলা হল না, সমর সুইজারল্যাণ্ডের এক সান্-স্কুলের বর্ণনা আরম্ভ করল, তারপর উঠল সোভিয়েট রুশিয়ায় সার্ব্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের অপূর্ব্ব উদ্যমের কথা, নারীশিক্ষার প্রণালী নিয়ে বাধল তর্ক, দেড়-ঘণ্টা গেল কেটে। তর্ক মুলতুবী রেখে সমর যখন বিদায় নিল, প্রীতির খেয়াল হল, সারাক্ষণ সে সমরের সঙ্গে কথা কয়েছে, মায়া বসেছিল নীরব শ্রোতা!

গ্রীষ্মের গভীর রাত, অতি নীরব স্থির, একটু বাতাস নেই, চারিদিক থমথম করছে; ম্লান জ্যোৎস্নায় নীলাকাশ রং-চটা পুরানো নীল সিল্কের সাড়ীর মত, তারাগুলি নিষ্প্রভ, তালগাছের পাতাগুলি কে যেন আটা দিয়ে এঁটে দিয়েছে হাল্কা নীল পটে।

বিছানাতে শুয়ে প্রীতির কিছুতেই ঘুম এল না; একা সে ছাদে ভাবছিল, সন্ধ্যায় সে-ই সমরের সঙ্গে সারাক্ষণ কথা কয়েছে। কোন প্রশ্নের আরও ভাল উত্তর দেওয়া যেতে পারত, এবার দেখা হলে কি ভাবে তর্ক সুরু করবে, না, সে আর বেশীক্ষণ সমরের সঙ্গে গল্প করবে না, ছু' চারটে কথা কয়েই চলে আসবে, ইত্যাদি নানা কথা সে ভাবছিল।

পেছন থেকে কে তার চোখ টিপে ধরলে—সে মায়া। মায়া প্রীতির চেয়ে দেড়মাস বড় হবে, স্কুলে কলেজে একসঙ্গে পড়ে এসেছে; প্রীতি মায়াকে আগে নাম ধরেই ডাকত, এখন মাসীর আদেশে দিদি বলতে হয়।

"ছাড়, মায়া, ছাড়, জড়াসনি, বড় গরম—"

"বলি, চাঁদের দিকে চেয়ে এত কি ভাবা হচ্ছিল—"

"তুই যা ভাবতে এলি—"

প্রীতির চোখ ছেড়ে গাল টিপে মায়া বল্লে, "তখন যে যেতে চাইছিলিস্ না, কিন্তু সন্ধ্যায় আড্ডাটা কে জমালে শুনি—কি তর্ক করতেই পারিস্—"

"তোমার সমরবাবু এলেই আমায় আর কিন্তু ছুটে ডাকতে এস না, আমি আর যাব না বলে রাখছি—"

"কেন শুনি?

"কেন আবার কি!"

"মা চটবেন্—"

"চটবারইত কথা, সমরবাবু আসেন তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে, আমার সেখানে অনধিকার প্রবেশ। আমরা আশা করি, তোমার সঙ্গে গল্প করতে করতে হঠাৎ একদিন তোমায় প্রপোজ করে ফেলবেন, ধর্, আমাকেই যদি ভুলে প্রপোজ করেন—"

"কিন্তু তুই ত আজীবন বিয়ে করবিনি, তোর ভয় কি—না ভাই সে হবে না—"

মায়া প্রীতির ছু'হাত নিজ হাতে টেনে নিলে, তার মুখ গম্ভীর হল, অনুনয়ের স্বরে বল্লে, "শোন, ভাই, আমি সিরিয়সলি বল্ছি, আমাকে সাহায্য করা ত তোর উচিত, জানিস্, আমি ভাল কথা কইতে পারি না, সমরবাবু যদি এসে হাঁ করে বসে থাকেন, ছু'দিন বাদে আসা ছেড়ে দেবেন, আমাদের মধ্যে তুই মাঝে মাঝে এসে বসলে, তারপর আমি চালিয়ে নেব—"

প্রীতি উঠল উচ্ছ্বসিত হেসে, তালগাছের পাতাগুলি উঠল কেঁপে, অতি মৃদু বাতাস বইতে সুরু হল'।

"আচ্ছা দিদি, স্কুলে পড়তে তোর সব হোম-টাস্ক করে দিয়েছি, কলেজে পরীক্ষার আগে প্রশ্ন উত্তর লিখে তোকে মুখস্থ করিয়েছি, কিন্তু এ পরীক্ষায় ভাই নিজের বিদ্যেতে চালাতে হবে।"

"আচ্ছা, অত যদি দেমাক হয়ে থাকে আসিস না—"

এবার প্রীতি ধরল মায়ার হাত জড়িয়ে, বল্লে, "রাগ করিস না ভাই, আমার যথাসাধ্য আমি চেষ্টা করব।" মায়ার চোখ ছল-ছল করে উঠল, সে প্রীতিকে বুকে টেনে নিলে, দুই বোনের মধ্যে নীরবে একটা বোঝা-পড়া হয়ে গেল; কিন্তু মায়ার মনের সত্যিকার কথা প্রীতি জানল না।

বাতাস উঠল উতলা হয়ে, পুষ্পবনমর্ম্মরে গন্ধোচ্ছ্বাসে স্তব্ধ রাত্রির ধ্যান গেল ভেঙে, চাঁদের আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

একমাস কেটে গেল। গ্রীষ্মকালে মিত্র-গৃহিণী সকন্যা দার্জ্জিলিং বা শিলং যান, কিন্তু এ বৎসর কলকাতায় রয়ে গেলেন, কারণ সুস্পষ্ট। মেয়ের বিয়ে দিতে মা'দের কত রকম কষ্ট সহ্য করতে হয়, গ্রীষ্মতাপ ভোগ করা ত তুচ্ছ।

প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় সমর মিত্তির-বাড়ীর নিয়মিত ভিজিটার সমর, প্রীতি, মায়া—আড্ডা বেশ জমে; তর্ক আর বেশী হয় না, সমর ইউরোপের গল্প বলে, মোটরকারে সে সমস্ত ইয়োরোপ ঘুরেছে, ভ্রমণের নানা অপূর্ব্ব দুঃসাহসিক ঘটনা বর্ণনা করে, পিয়ানো বাজিয়ে জার্ম্মাণ গান, বিলিতি অপেরেটার হাল্কা গান গায়, মায়ার বেসুরো-গাওয়া গান শোনে, প্রীতির ব্যঙ্গ-বাণ উড়িয়ে দেয় হাসির ঝোড়ো বাতাসে। গল্প করতে করতে বেশী রাত হলে, মিত্র-গৃহিণী ডিনার খেয়ে যেতে অনুরোধ করেন, ডিনার খেয়ে যেতে হয়।

রাত্রে বাড়ী গিয়ে বৌদিদির কাছে সমর রিপোর্ট দেয়। সন্ধ্যার সময় মধ্য কলিকাতা থেকে দক্ষিণ কলিকাতা যে কত স্নিগ্ধ, রমণীয়, মধুর বাতাসে ভরা, সে-সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা করে। মাসীমার সহিত কি সাংসারিক কথা হল, মায়া কি গান গাইল, নানা কথা সে বলে; কিন্তু প্রীতির সহিত দেখা, গল্প, তর্ক সম্বন্ধে বৌদিদিকে সে কিছুই বলে না, মূল্যবান রত্নের মত সে কথা অন্তরের গোপন ঘরে সঞ্চিত করে রাখতে চায়।

দুপুরে খাবার সময় বৌদিদি বল্লেন, "আজ সকালে মেজ মাসীমার ওখানে গেছলুম।"

সমর বল্লে, "দেখলুম বটে, একটা ভাড়াটে গাড়ী করে এলে, আমায় বল্লে না কেন, আমার গাড়ীতে নিয়ে যেতুম।"

"বরকে নিয়ে ঘটকালি করতে যাওয়া, তোমাদের বিলেতে চলতে পারে, আমাদের দেশে এখনও চলন হয়নি ভাই।"

"ঘটকালি?"

"হাঁ, কাল রাতে মাসী টেলিফোন করেছিলেন, এবার একটা পাকাপাকি কথা কইতে হয়।"

"আমি ভাবছিলুম, আমাকে প্রপোজ করতে হবে, বক্তৃতাটা তৈরী করছিলুম।"

"সে কষ্ট তোমায় করতে হবে না, আমরা রয়েছি, এমন দেবরের জন্য এটুকু করতে পারব না—আজ কথাটা পেড়ে এলুম, কাল তোমার দাদাকে পাঠাব, একেবারে পাকা দেখার দিন ঠিক করে আসবেন—মায়াকে অনেকদিন পর দেখলুম—সুন্দর দেখতে হয়েছে, ভারি ভাল লাগল—কি বল—এর মধ্যে উঠলে কি—ভাত পড়ে রইল যে!"

"আমায় একটু বেরুতে হবে।"

"কথার উত্তরটা দিয়ে যাও, কাল তাহলে তোমার দাদাকে পাঠাই—মত আছে ত?"

'কিন্তু মেয়ের মত জানা দরকার—"

"হুঁ, মেয়ের আবার মত কি, ও আছে—"

"না, বৌদিদি জিজ্ঞেস করা দরকার, আমার ত বোধ হয়—"

"অত বোধ হয় করলে এসব কাজ হয় না, মেয়ের মত জানা আছে—বোসো পায়েস নিয়ে আসি।"

পায়েসের প্লেট এনে বৌদিদি দেখলেন দেবর অন্তর্হিত। ঘরে গিয়েও সমরকে খুঁজে পেলেন না। গ্রীষ্মমধ্যাহ্ন সচকিত করে মোটর-ইঞ্জিনের একটা গর্জ্জন শোনা গেল।

বৈশাখ মধ্যদিনের পিঙ্গল আকাশ অগ্নিতপ্ত কটাহের মত; জনবিরল পথ উদাস বাতাসে ভরা; শুধু গাছের পাতাগুলির পুঞ্জিত সবুজে রৌদ্রদগ্ধ পৃথিবীর বুকে একটু স্নিগ্ধতার চিহ্ন।

দ্রুতগতিতে [illegible] মোটরকার চালিয়ে, সমর বালীগঞ্জে এসে [illegible]। তখন তার খেয়াল হল,

এই গ্রীষ্মের রৌদ্রময় দ্বিপ্রহরে মিত্তির-বাড়ীতে দেখা করতে যাওয়া ভদ্রসমাজোচিত হবে না। কিন্তু সে ফিরতেও পারলে না। কতখানি পেট্রল আছে দেখলে। মিত্তিরদের বাড়ীর ফটক থেকে একটি মোটরগাড়ী বেরুল, মিত্র-গৃহিণী ও মায়া বসে; গলির অন্য মোড় দিয়ে তাঁরা চলে গেলেন, বোধ হয় বাজার করতে।

সমরের বুক দুলে উঠল, এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। ফটকের সামনে নিজের গাড়ী রেখে ধীরে সে মিত্তির-বাড়ীতে প্রবেশ করলে। চারিদিক নিঝুম, যেন রৌদ্রময়ী রাত্রি, কোথাও কেউ নেই।

ধীরে সমর ড্রয়িংরুমের দিকে চল্ল, দক্ষিণের দরজা জানালা সব বন্ধ, পূবদিগের দু'টি দরজায় জলে ভেজা খস্ খস্ ঝুলছে। পিয়ানোর টুং টাং আওয়াজ আসছে। কে গান গাইছে, বড় উদাস গলা। গানটা রবীন্দ্র নাথের হবে। সমর চুপ করে খসখসের আড়ালে দাঁড়াল।

"মধ্য দিনের বিজন বাতায়নে
ক্লান্তিভরা কোন বেদনার মায়া
স্বপ্নাভাসে ভাসে মনে মনে—"

সে গলা সমর চিনলে, সে কণ্ঠে বুদ্ধির প্রখরতার পরিচয় পেয়েছে, অন্তরের করুণ উদাসতার সুর শোনেনি; আজ তার হৃদয় জেগেছে।

খস্ খস্ সরিয়ে নীরবে সে ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করলে। ঘরটি প্রায় অন্ধকার, প্রথমে ঢুকে সব আবছায়া দেখায়; আলোছায়ায় দেখা গেল, এক কোণে ধীরে ধীরে পিয়ানো বাজিয়ে প্রীতি মৃদুস্বরে গান করছে। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না, সদ্য ধোওয়া শুকনো চুলগুলি ছড়িয়ে পড়েছে পিঠে, হাল্কা নীল জামার ওপর, বেগুনে রংএর সাড়ীর আঁচল লুটিয়ে পড়েছে মেজের গালিচায়।

"যে নৈরাশ্য গভীর অশ্রুজলে
ডুবেছিল বিস্মরণের তলে
আজ কেন সে বনযূথীর বাসে
উচ্ছ্বসিল মধুর নিশ্বাসে—"

সমর একটি সোফায় বসলে। পুরাণো সোফা, সমরের দেহের ভারে স্প্রিংগুলো একটু শব্দ করে উঠল। প্রীতি চমকে চাইলে, পিয়ানো ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

"বা, আপনি! কখন এলেন?"

"চমৎকার তোমার গলা।"

প্রীতি কোন উত্তর দিলে না, তার দু'চোখে কিসের সজল উদাসতা। সমর সোফা থেকে উঠে তার দিকে এগিয়ে গেল। এবার প্রীতি উঠল সচকিত হয়ে, যেন সে ঘুমঘোরে স্বপ্নে গান করছিল, এবার জেগে উঠল। মুখে ব্যঙ্গ-হাসি খেলে গেল।

"ও ভুলেই যাচ্ছিলুম, হার্টি কন্‌গ্রাচুলেশনস্ ডক্টর ঘোষ। কিন্তু মায়া ত এক্ষুণি বেরিয়ে গেল, এই দুপুর রোদে আসাটা আপনার বৃথাই হল।"

"আমি তোমার কাছেই এসেছি।"

"আমার কাছে—আমার কাছে—" প্রীতির মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, চোখ শুষ্ক বৈশাখ-মধ্যাহ্নের মত; সে ক্ষুব্ধস্বরে বলে উঠল, "আমি আপনাদের জন্যে যথেষ্ট করেছি, আরো কি চান—"

সমরের মুখও কালো হয়ে গেল; সে বুঝলে, এ ব্যঙ্গ নয়, হৃদয়ের গভীর ব্যথা, হেসে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না; কিন্তু প্রীতি যে ভুল করছে। অতি স্পষ্ট করেই সে ভুল ভাঙান দরকার।

সমর স্থির হয়ে দাঁড়াল প্রীতির সামনে, কাতর চোখে প্রীতির বেদনাময় মুখে চাইলে, আলোছায়াভরা স্তব্ধ ঘর।

অতি ধীরে সমর বল্লে, "তুমি ভুল বুঝেছ, আমি তোমাকেই চাই, তোমাকেই ভালবাসি, তোমাকেই সেই কথা বল্‌তে এসেছি—"

"আমাকে—আমাকে—তা'হলে আজ সকালে আপনার বৌদিদি এসে যে বল্লেন—" প্রীতির গলায় আর কথা বেরুল না, তার দেহ কাঁপছে থর-থর, দু'নয়নের তটে চোখের জল ভরে উঠছে।

সমর ব্যথিত স্বরে বল্লে,- "বৌদিদি ভুল বলেছেন, আমায় ক্ষমা করো প্রীতি, ভুল হয়ত একটা কোথায় হয়েছে, কিন্তু তোমায় যে আমি ভালবাসি এ কথায় কোন ভুল নেই।"

মন্ত্রমুগ্ধের মত হেসে প্রীতি সমরের দিকে চাইল, রক্তিম কপোল বেয়ে অধরের পাশ দিয়ে চোখের জল ঝরে গেল টসটস করে।

সমর দাঁড়াল খোলা পিয়ানো ঠেসান দিয়ে, একসঙ্গে বেজে উঠল অনেকগুলি সুর।

বিয়ে-বাড়ীর হৈ চৈ অনেকক্ষণ হল শেষ হয়েছে, বাসর ঘরের সবাই হৈ রৈ করে শ্রান্ত, নিদ্রিত ; বাড়ীখানি জ্যোৎস্নালোকে নিঝুম।

লাল চেলিপরা প্রীতির হাত ধরে মায়া ছাদের নিরালা কোণে গেল। দু'মাস আগে এক বিনিদ্র রাতে ছাদের এই কোণে দুই বোনে নীরব বোঝাপড়া হয়েছিল।

প্রীতির গলার মালাটা একটু সরিয়ে মায়া তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে, "সুখী হয়েছিস ভাই ?"

"মায়া, তুই এ কি করলি ?"

"কেন ভাই ?"

"তোর মন এতদিন বুঝতে পারিনি, কিন্তু আজ রাতে বুঝছি—কেন তুই আমায় ডেকেছিলিস তোর সাহায্য করতে—"

"দেখ প্রীতি, সেই রাতের কথা বলছিস, কিন্তু তুই কি আমার কথা বুঝতে পারিস নি, আমি তখনই বুঝেছিলুম, সমর তোকে ভালবাসে, তুইও সমরকে ভালবাসিস ; কিন্তু তুই যা দেমাকী মেয়ে, আমি অমন করে না ডাকলে কি তুই সমরের সঙ্গে এসে কথা কইতিস—

"কিন্তু মায়া—"

"আমার কথা ভাবিস না ; মা সে ব্যবস্থা করে রেখেছেন, মা কি রকম হিসেবী মানুষ জানিস ত, সেই জমিদারপুত্র নব্য লণ্ডন-ফেরতটিকে ছাড়েন নি, হাতে রেখেছিলেন, দেখিস্, এক মাসের মধ্যে শুভকর্ম্ম হয়ে যাবে—"

মায়া হাসতে চেষ্টা করল, পারল না।

"শুভ-রাত্রে চোখের জল ফেলব না ভাই" বলে সে দ্রুতপদে চলে যেতে চাইল। তার পা টলে গেল, প্রীতি তাকে টেনে নিল নিজের বুকে।

তালগাছের পাশে চাঁদ অস্ত গেল, শুদ্ধ নিশীথ আকাশ যেন অতি কাছে নেমে এল, তারাগুলো দপ্ দপ্ করতে লাগল দুই বোনের বক্ষ-স্পন্দনের ছন্দে।

প্রাণ

শ্রীশিবশম্ভু সরকার

তুমি যে জেলেছ দীপ মুগ্ধনেত্রে হৃদয়ের রসে
আপন ইচ্ছার স্বপ্নে আনন্দের হিল্লোল-পরশে
বিচিত্র কৌতুকছন্দে! যে দীপের কানায় কানায়
সীমার আঁধার ডুবে অসীমের মধু জোছনায়!
তারে ল'য়ে কবে কোন দিনান্তের সুনিবিড় ক্ষণে
সুরু হ'ল পথযাত্রা অকস্মাৎ না-জানি কেমনে
অশ্রান্ত চরণ ক্ষেপে! বুকে তার অপূর্ণের জ্বালা
সংখ্যাতীত শতকর্ম্মে বিছাইয়ে নাহি যায় ভোলা
এত মর্ম্মন্তুদ! বুঝি তব অসীম অকুণ্ঠ ছায়া
সীমার গরাদ ভেদি' লক্ষ্য করে পূর্ণতার কায়া
সজল সতৃষ্ণ চোখে! বুঝি দূরে দিক্‌হারা গানে
সংসারের কলরব ডিঙাইয়ে কাহার সন্ধানে
অতীব অধীর কর্ণে ধেয়ে যায় অকুণ্ঠ উন্মনে!
আপনারে ভুলে চিত্ত আত্মহারা উন্মাদ লগনে!
এ'-যাত্রার শেষ কোথা! কবে তার স্বপ্নছায়া-বাজি
মহানন্দে ছন্দ লভি তন্ত্রে তন্ত্রে উঠিবে সে রাজি!

কবে তার ব্যথাহত অনন্তের ছায়ামুগ্ধ চোখ
রাঙিবে সূর্য্যের আলো—ভেসে যাবে রাত্রির নির্ম্মোক!

ভারতীয় নারীর আদর্শ

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

ভারতের নারীকে তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের দান করিতে হইবে দিব্যদৃষ্টি। নিজেরা অতীতের গাথা স্মরণ করুন, সংগ্রহ করুন, সঞ্চয় রাখুন—মিলাইয়া দেখুন আপনার পিতামহীর সহিত আপনার পৌত্রীটাকে। সে কি তাঁর চেয়ে উন্নতহৃদয়, উদারচরিত্র এবং ত্যাগশীলা হইতে পারিয়াছে? স্কুলে কলেজে শিক্ষা দিন, কোন ক্ষতি নাই। (স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ ছেলেমেয়েদের শিক্ষার মধ্যে অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাইবার সুব্যবস্থা করিতে থাকুন।) কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে গৃহশিক্ষাই আসল শিক্ষা। গৃহশিক্ষায় স্বধর্ম্ম, স্বীয় সমাজ, স্বজন, স্বদেশ, এই কয়টীর প্রতি যথাযথ ব্যবহার শিক্ষা করিতে পারিলে পশ্চিমতটের ঢেউ যত বড় প্রবলই হোক, পূর্ব্বতটের ক্ষয় সামান্যই হইতে পারে, তপকে ধ্বংস করা সম্ভব হইবে না। এই গৃহশিক্ষার ভার মায়েদেরই হাতে।

——

— বৈচিত্র্য —

পথহারা—

সম্প্রতি আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়া আকাশ-পথে প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, ইতালি প্রভৃতি জাতির মধ্যে বিষম ধূম পড়িয়া গিয়াছে। বীরজাতির প্রাণের পরিচয় দিতে এতটুকুও কুণ্ঠা নাই। এমনি একদল যাত্রী একবার ব্যর্থ-অভিযান হইয়া মাঝ-সমুদ্রে পথহারা হয়। তিন জন—রোডি, জোহানসেন, ভিগা—কয়দিন অপার সাগরের মাঝে ভাসিয়া বেড়ান—না খাওয়া, না ঘুমান। বীর কিনা, মরে তারা একবারই, তাই সাগরের ভীতি, অবশ্যম্ভাবী মরণের বিভীষিকা তাদের প্রাণকে চঞ্চল করিতে পারে নাই। সৌভাগ্যক্রমে একখানি অর্ণবপোতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় সে-বার তাদের জীবন রক্ষা পায়। তাদের সে সময়কার মনের অবস্থা কল্পনায় আনাও কঠিন।

অকূল বারিধি মাঝে অর্দ্ধ নিমজ্জিত অর্ণবপোতে ভাসমান ব্যক্তিত্রয়

মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়—

মঙ্গলগ্রহের বয়স আমাদের পৃথিবীর চেয়েও বেশী—ইহা বৈজ্ঞানিকের অভিমত। ক্রমশীতলতায় পৃথিবীতে যদি প্রাণসঞ্চার সম্ভব হইয়াছে, তবে মঙ্গলেই বা হবে না কেন? এই বিষয় প্রমাণের জন্যই বৈজ্ঞানিকেরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। মঙ্গলের সঙ্গে সংযোগস্থাপনের জন্য প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মার্কনি দূরবীক্ষণের সাহায্যে মঙ্গল-গ্রহ পর্য্যালোচনা করিয়া অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি রেডিও দ্বারা মঙ্গলগ্রহস্থিত জীবের সঙ্গে অদূরভবিষ্যতে আলাপের আশা করেন।

এইচ, জি, ওয়েলস নামক প্রতীচ্যের আর একজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক বহু গবেষণার পর স্থির করিয়াছেন যে, মঙ্গলগ্রহের যেখানটা জ্যাদাটে সেখানে আছে মরুভূমি, একটু পাতলা [illegible] [illegible] [illegible]
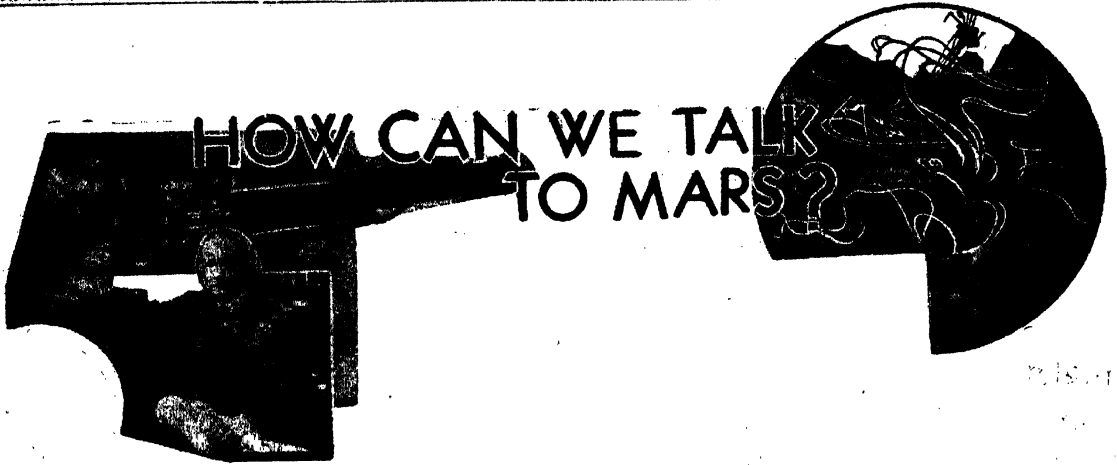
উপরে দুরবীক্ষণের সাহায্যে মঙ্গলগ্রহকে পর্য্যবেক্ষণ করা হইতেছে,
নীচে মার্কনি রেডিও'র সাহায্যে মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে আলাপ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

দুরবীক্ষণের ভিতর দিয়া মঙ্গলগ্রহ

পূর্ণ, আর মিষ কালো স্থানটা গভীর নদী অথবা সমুদ্রে পরিবেষ্টিত।

অধ্যাপক লো প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা ভরসা দেন যে, আজিকার কবির আলো সমুজ্জ্বল চাঁদ একদিন আমাদের পৃথিবীর মতই জীবন্ত হইয়া ধরা দিবে—সেদিনও খুব দূরে নয়।

টুর্ণাডোর চারিটী অবস্থা

উপরের অভিশাপ—

আকাশ-ভুবনে মানুষের অজানা কত যে রহস্য আছে তা এখনও সে আবিষ্কার করিতে তো পারেই নাই, পরন্তু যা পারিয়াছে তারও প্রতীকারে সে অসমর্থ। কাল-বৈশাখীর আগমনীর সঙ্গে তার সহচর-রূপে দেখা দিবে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়—ঝড়-তুফান-শিলাবৃষ্টি। ঘূর্ণিবাত্যা—(টুর্ণাডো) আকাশের রোষ-রূপেই যে পথ দিয়া তার ধ্বংসের পদ সঞ্চার করে, সে পথে মুহূর্ত্তে মানুষের সকল সৃষ্টি মুছিয়াই ফেলে। সেখানে মানুষ নিছক নিঃসহায়।

এখানে ছবিতে টুর্ণাডোর চারিটি বিভীষিকা-মূর্ত্তি দেখান হইয়াছে। বামদিক হইতে প্রথম ছবিটি টুর্ণাডোর ভয়ঙ্করী মেঘ-রূপ, দ্বিতীয়টিতে আকাশের মেঘের প্রবলবেগে কলার মোচার আকারে লম্বমান হইয়া মাটির দিকে ঝুঁকিয়া পড়ার দৃশ্য, তৃতীয়েতে উহা ভূমি স্পর্শ করিয়াছে, আর চতুর্থ ছবিতে কোন জলাশয়ের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় জল উপরে উঠাইয়া লইবার দৃশ্য দেখান হইয়াছে।

স্থক্তির মাঝে মুক্তি

শ্রীঅবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর

আর্ট নিয়ে যে আলোচনা—জগৎ শিল্পের সঙ্গে আর্টিষ্টের যোগ-স্থাপনে আনুকূল্য করে সেইটেই সার্থক আলোচনা, কিন্তু যে আলোচনা অনর্থক তর্কের সৃষ্টি করে তা আর্ট বোঝবার পথে বাধাই সৃষ্টি করে, আর্টিষ্টের চলার পথ ধূলা কাদায় দুর্গম করে তোলে মাত্র।

আর্টে সকল মানুষেরই চিরন্তন অধিকার, এর জন্যে কারু মুখাপেক্ষার দরকারই হয় না। রসের জগতে আমরা সবাই তো ছাড়া পেয়েছি—কেউ ডুব দিয়ে তুলছি রত্ন, কেউ ভীষণ আলোচনার তরঙ্গে পড়ে হাবুডুবু খেয়ে মরছি, বৃথা লালসায় আর্ট আর্ট করে মরীচিকার দিকে চলেছি ছুটে কেন যে তা বুঝিনে!

রসরাজের পান-ভূমিতে এসে দুয়ারে আটকা থাকি তখনি, রসের পরিবেশ দেখে যখনি কূট-বিচার-বিতর্কের মধ্যে আপনাকে হারিয়ে বসে থাকি। রসোপভোগের পন্থা এ নয়, আর্টকে পাবার উপায়ও সে নয়। উৎসবের ক্ষেত্রে এসে অতীত আর্টের শব-সাধনা কে করে? নতুন বসন্তের ফুল বাগানে বসে ফুলের কুল-পঞ্জী দেখতে কে বসে থাকে? সমুদ্রতীরে বসে বালি ঘেঁটে মুক্তা কচিৎ পাওয়া যায়, ডুবুরি চলে যায় তলিয়ে—তবে পায় সে স্থক্তির সঙ্গে ধরা মুক্তি।

—

আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত সমাজ ও জীবন-বীমা

শ্রীবরেণ্যবিনয় চৌধুরী

জীবন-বীমার উপকারিতা সম্বন্ধে আমাদের দেশে আলোচনা সুরু হইয়াছে মাত্র। বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত সমাজের পক্ষে বীমার আবশ্যকতা কত অধিক ও বীমাকৃত অর্থ কি পরিমাণে মধ্যবিত্ত সমাজের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সহায়ক হইতে পারে, সে সম্বন্ধে আজ সংক্ষেপে কিছু বলিব।

মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক বলিতে আমরা যাহাদের বুঝি, তাহারা কুল-শীলসম্পন্ন, সুরুচিপরায়ণ ও শিক্ষিত। কিন্তু এই তিনটি সংজ্ঞার সঙ্গে তুলনায় তাহারা অর্থ-সম্পদে হীন। তাহারা মার্জিত জীবনযাত্রা কামনা করেন, পুত্র-কন্যাদের শিক্ষা ও সুনীতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন ও আর্থিক অবস্থায় যতদূর সম্ভব হয় নিজেদের কামনা ফলবতী করিবার চেষ্টাও করেন। ইহাদের প্রত্যেকের আয়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকে স্ত্রী, কতিপয় পুত্র-কন্যা, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও উপার্জ্জন-অক্ষম ভ্রাতৃগণ, অবিবাহিতা ভগ্নিগণ; কোথাও বা বিধবা ভগ্নী ও পিসী-মাসীর ব্যয়ভার বহন করার দায়িত্বও মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের অনিবার্য্য প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। তাহার উপর ঝি-চাকরের খরচ আছে—পূজা-পার্ব্বণ, দোল-দুর্গোৎসব তো আছেই।

সহরবাসীদের ব্যয়বাহুল্য ও গ্রামবাসীদের আয়ের অল্পতা হেতু মূলতঃ গ্রামবাসী মধ্যবিত্ত ও সহরবাসী মধ্যবিত্তদের মধ্যে অধিক প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। সহরের অধিকাংশ মধ্যবিত্তরা চাকুরীজীবী, গ্রামের মধ্যবিত্তরা জমির আয়ের উপর নির্ভরশীল। ইহাদের উপার্জ্জনের অধিকাংশই উল্লিখিত ব্যয় বহন করিতে নিঃশেষ হইয়া যায়। অল্প আয়ের উপর নির্ভর করিয়া স্রেফ্ বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হইলেও, ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীদের জন্য কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখা প্রায় দুঃসাধ্য হইয়াই পড়ে এবং এই কারণেই পিতার মৃত্যুর পর মধ্যবিত্ত-সন্তানেরা নিতান্ত নিরবলম্বন ভাবে জীবনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। সাধারণতঃ একজন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের গড়ে ছয়-সাতটি পুত্রকন্যা জন্মে। এই ভদ্রলোকটি যদি সঞ্চয়হীন হন ও পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তবে বড় ছেলেটি তাঁহার জীবনের পথে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা পরিবারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। আয়ের অল্পতা হেতু ইহাদের জীবনযাপনের ভঙ্গী খানিকটা নীচে নামিয়া আসে এবং সবগুলি ছেলে মেয়ে বড় না হওয়া ও অল্প বিস্তর উপার্জ্জন না করা পর্য্যন্ত পরিবারের অবস্থা বিশেষ দুঃস্থ হইয়া পড়ে। এই ছেলেরাই আবার পরিণত বয়সে বিবাহ করিয়া গুটি কয়েক সন্তানের জন্ম দিয়া থাকে এবং পুনরায় পিতার জীবনেতিহাসের পুনরাবৃত্তি করিয়া থাকে। এইভাবে দিনের পর দিন, পিতার পর পুত্র, তারপর পৌত্রের জীবনেও একই ঘটনার অনুষ্ঠান ঘটিতে ব্যতিক্রম দেখা যায় না। যদি মধ্যবিত্তদের সঞ্চয় থাকিত, তবে পিতার মৃত্যুর পর পরিবারকে এত হীন অবস্থার মধ্যে পড়িতে হইত না এবং পুত্র-কন্যাদের দাঁড়াইবার স্থান থাকা হেতু, তাহারা আরও উন্নততর জীবনের আশা পোষণ করিত ও সেই আশাকে ফলবতী করিবার চেষ্টা পাইত এবং কিছুকাল পরে সমগ্র মধ্যবিত্ত সমাজকে আমরা অর্থসম্পদে সম্পদশালী দেখিতে পাইতাম। অবশ্য এ বিষয় লইয়া অনেক তর্ক উঠিতে পারে। মধ্যবিত্ত সমাজের আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণ স্বরূপ অনেক যুক্তির অবতারণা অনেকে করিয়াছেন। অধিক প্রজনন, উচ্চশিক্ষা, ব্যবসা-বুদ্ধির অভাব, পরিশ্রমবিমুখতা প্রভৃতি হেতু মধ্যবিত্ত সমাজের আর্থিক অবস্থা হীন হইতে হীনতর হইতে চলিয়াছে, এ কথা যদিও সত্য, তবুও বলিলে

বাহুল্য হয় না, যে অধিকাংশ যুবকেরাই জীবনগঠনের উজ্জ্বল প্রভাতে শুধু অভাবের তাড়নায় নিজের অন্তরের বৃত্তিগুলিকে ফোটাইয়া তুলিতে সক্ষম হয় না। তাহাদের নিজের অবস্থার জন্য তাহাদের স্বভাব অপেক্ষা বাহিরের অভাব বেশী দায়ী, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।
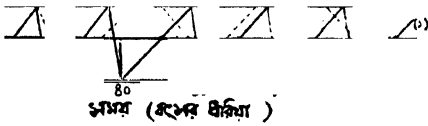
উপরের চিত্র হইতে দেখা যাইবে যে, অল্প আয় ও সঞ্চয়হীনতাহেতু প্রত্যেক পুরুষে 'জীবনযাত্রার স্তর' প্রায় একভাবেই থাকিবে (১)। শুধু সঞ্চয়শীল পরিবারের পক্ষে পুরুষপরম্পরা আর্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়া সম্ভব (১')। যেখানে সঞ্চয় আছে, সেখানে জীবনের দৈর্ঘ্য অধিক হইবে, ও সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি-হেতু হয়তো কোন কালে পরিবারের কর্ত্তার মৃত্যু হওয়া সত্ত্বেও 'জীবন-যাত্রার স্তর' সাময়িক ভাবেও ব্যাহত হইবে না।

কথা হইতেছে, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যদি অবস্থায় না কুলায় তবে তাঁহারা সঞ্চয় করিবেন কি করিয়া? আর সঞ্চয় যদি নাই বা করিতে পারেন, তবে সন্ততিদের উন্নতির আশা কোথায়? সঞ্চয়শীলতা বিশেষ অভ্যাস প্রসূত বৃত্তি। সে সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিব না। সঞ্চয়ের আবশ্যকতা যাঁহারা বিবেচনা করেন, তাঁহারা বীমা করিয়াই হোক, ব্যাঙ্কে জমাইয়াই হোক, অন্যভাবে টাকা খাটাইয়া হোক—যে কোন ভাবেই কিছু না কিছু সঞ্চয় করিতে পারেন, এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এই সঞ্চয় সমগ্র সমাজগঠনের পক্ষে কত আবশ্যক তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি।

সন্তানদের বিবাহে পণদান ও গ্রহণ, উৎসব উপলক্ষে ঋণ-গ্রহণ প্রভৃতি প্রথা আমাদের সমাজ-দেহে বিষ ছড়াইতেছে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইলে এ সকল কু-প্রথা শিক্ষিত সমাজ হইতে লোপ পাইবে, এ কথা আশা করা যায়। সমাজ-নীতি মানব-নীতিকে অনুধাবন করে। মানব-নীতির উৎকর্ষণ হইলে সমাজ পিছনে পড়িয়া থাকিবে না।

যাক্, ব্যাঙ্কে টাকা জমাইলে হঠাৎ তুলিয়া ফেলিয়া খরচ করিবার আশঙ্কা রহিয়াছে। আবার সব গ্রামে ব্যাঙ্ক নাই, ছোট খাট সহরেও নাই। সেখানকার লোকেরা দূরের কোন ব্যাঙ্কের সহিত লেন-দেন করিতে পারেন, কিন্তু ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষরা আমানতকারীর জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন না। এক কথায় ব্যাঙ্ক টাকা নিরাপদে রাখার স্থান হইলেও সেখানে টাকা জমাইবার কোন বাধ্য-বাধকতা নাই। ব্যাঙ্কের অসুবিধাগুলির নিরাকরণ করিয়াছে বীমা অফিস। বীমার মূল কথা 'সঞ্চয়-মূলক বাধ্যতা'। সঞ্চয়ের সঙ্গে প্রিমিয়াম নিয়মিত দিবার চুক্তি থাকা হেতু, বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই নির্দ্দিষ্ট-কালের মধ্যে প্রিমিয়াম দিতে কুণ্ঠিত হন না। নতুবা বীমা বাতিল হইয়া যায়। একবার সঞ্চয়শীলতা অভ্যাস করিলে আপনা হইতেই সে অভ্যাস বর্দ্ধিত হয় এবং ধীরে ধীরে নিজের অজ্ঞাতসারে একটা সম্পদের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই টাকা চুক্তির সময়ের শেষে অথবা মৃত্যুর পরে প্রাপ্য হয়, এবং সেই সময়ে সন্ততিদের অতি আবশ্যক ভরণ-পোষণের ভিত্তিস্থল হইয়া দাঁড়ায়। মৃত্যুর দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য বীমা কোম্পানী সর্ব্বদাই বীমাকারীর দেহাবসানে চুক্তিকৃত টাকা উত্তরাধিকারীদের দিতে বাধ্য থাকেন। এই মহতী সুবিধাহেতু বীমা এখন এত জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। যদি কেহ কোন অসুবিধা হেতু প্রিমিয়াম না দিতে পারেন, তবে নির্দ্দিষ্ট-কাল পরে পলিসির সর্ত্ত অনুযায়ী প্রত্যর্পণ-মূল্য বা ঋণ গ্রহণ করিতে পারেন। তা' ছাড়া বীমার আর একটা দিক্ আছে, সেটা Investment. বীমা কোম্পানী

তাহাদের আদায়ী-কৃত টাকা সুদে খাটাইয়া থাকেন। এর লাভের টাকার কতকাংশ কিছুদিন পর পর বীমাকারীদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়। ইহাকে 'বোনাস্' বলা হইয়া থাকে। সঞ্চয় ছাড়াও Investment বীমার অন্যতম উদ্দেশ্য। মধ্যবিত্ত সমাজ কি তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া সঞ্চয়ের পথের সন্ধান অন্যকে দেখাইবেন না?

শুধু নিজ-জীবন বীমা করা ছাড়া, শিশুদের শিক্ষার জন্য বীমা, বিবাহ-বীমা প্রভৃতি নানাবিধ বীমার শ্রেণী আছে। আমরা পরে তাহার আলোচনা করিব।

মধ্যবিত্তদের কোন্ শ্রেণীর বীমা করা উচিত? এ সম্বন্ধে এক কথায় কিছু বলিয়া ফেলা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন লোকের সাংসারিক অবস্থা, তার ভাবী অবশ্যকতার উপর অনেক কিছুই নির্ভর করিতেছে। তবে যাঁহাদের বীমার আবশ্যকতা সঞ্চয় প্রধান, তাহাদের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট বৎসরের জন্য প্রিমিয়ম দিয়া আজীবন-বীমা করাই উচিত। তাঁহারা যদি উপার্জ্জন-ক্ষম হন, তবে তাঁহাদের জীবদ্দশায় যতটা না আর্থিক অভাব হইবে, তার চেয়ে বেশী হইবে তাহাদের মৃত্যুর পর। কাজেই তাহাদের উচিত, অল্পহারে প্রিমিয়ম দিয়া অধিক টাকার জন্য আজীবন-বীমা করা। মধ্যবিত্তদের পক্ষে ইহাই সুবিধা।

এই অর্থসঙ্কটের দিনে বীমার সুবিধাগুলি বিশেষ বিচার করিয়া দেখা এবং শক্তি অনুযায়ী জীবনবীমা করিয়া রাখা প্রত্যেক লোকের উচিত। যাহাদের অর্থের প্রাচুর্য্য আছে, তাহাদের কথা বলিতেছি না। বীমার উদ্দেশ্য জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি—তথা দেশের ও জাতির উন্নতি বিধান। আর আমাদের দেশ ও জাতি গরীব ও মধ্যবিত্তদের লইয়াই। ইহারা এখন হইতেই এই অর্থ-সঞ্চয়ের নবপদ্ধতির সমস্ত সুযোগ ও সুবিধা গ্রহণ করিবেন এ আশা করি।

দেউলের কবুল

শ্রীযতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য

বুদ্ধের আলোক-রশ্মি স্তিমিত ভারত হ'তে
যবে চীনে আনে জাগরণ,
তখন ফুটিল হেথা ভূমার সে কোটিরূপ
ভাবুকের-হৃদি অন্তঃপুরে;
দেখাদেখি অনুকরি' কেবলি মূরতি গড়ি'
মঠে মঠে করিয়া স্থাপন,
পূজিতে লাগিল বৃথা গর্ব্বিত পূজারী দল
নিশিদিন নানা ছন্দে সুরে।

ধীরে ধীরে ভেদাভেদ বাড়িতে লাগিল ক্রমে,
ভেঙে গেল মিলন-মন্দির;
পূজিয়া বিশ্বগুরূপ ক্ষুণ্ণ করি' পূর্ণব্রহ্মে
ঈর্ষা দ্বন্দ্বে করিল কাতর;
তাই এলো এসিয়ায় ক্রমে যিশু মহম্মদ
শ্রীচৈতন্য তুলসী কবীর;
তবু দেশ জাগিল না! শ্রীরামমোহন এলো,
রামকৃষ্ণ আসে তারপর!

পূর্ণ তিনি খণ্ডরূপে জীবদেহে রাত্রিদিব
প্রাণ রূপে লভেন আদর,
নানা জাতি নানা পন্থী পরিপন্থী অনুপন্থী
এ-জগতে সবাই তাঁহার!
তাঁহার সন্তান মাঝে কাটাকাটি কেন রাজে?
সৃষ্ট হয় রক্তের সাগর?
সেবার পতাকা তুলি' জাতিদ্বেষ হিংসা ভুলি'
সকলেরে কর আপনার!

পাষাণের পিণ্ড মাঝে ভূমারে লভিতে চাও?
হারে মূঢ়, বৃথা আয়োজন!
নরনারী পশুপাখী কীটপোকা সরীসৃপে
সর্ব্বভূতে বিরাজেন তিনি!
কার্ কাছে কারে বধি' কাহার্ রুধির দিয়া
কার্ চিত্ত কর বিনোদন?
হেথা এ-দেউলে তাঁরে পাবে না, পাবে না কভু,
নন মাতা আত্মজঘাতিনী!

হিন্দুর ধর্ম্ম ও জীবন-সমস্যা

হিন্দুর জাতীয় জীবনে বর্ত্তমানে গুরুতর সমস্যা উপস্থিত। এই সমস্যা অতি গভীর এবং বাহিরে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন আকারে এই সমস্যা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অবস্থা এমন গুরুতর যে, হিন্দুর পক্ষে বাঁচিয়া থাকাই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনে বাঁচিয়া থাকার প্রতি যেমন স্বাভাবিক আসক্তি আছে, জাতিগত জীবনকে বাঁচাইয়া রাখিতেও সেইরূপ আসক্তি আছে। প্রত্যেক জাতি আপনার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া জগতে বাঁচিয়া থাকিতে চায়। হিন্দুজাতিকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে জাতীয় ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া নিজের বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করিতে হইবে এবং সেই বৈশিষ্ট্য অবলম্বনে বর্ত্তমান জটিল সমস্যার সমাধান করিয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে হইবে।

হিন্দু-জাতির বৈশিষ্ট্য তাহার ধর্ম্মপ্রাণতা। হিন্দুর রাজনীতি, সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি, অর্থনীতি, এই সকলেরই মূলে ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মদ্বারাই তাহার জাতীয় জীবনের সকল বিভাগ নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ধর্ম্মকে হারাইলে হিন্দুজাতি প্রাণহীন হইয়া পড়ে এবং এই ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াই যুগে যুগে হিন্দুজাতি সকল প্রকার প্রতিকূল শক্তিকে পরাভূত করিয়া এবং সকল সমস্যার সমাধান করিয়া আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। হিন্দুর ধর্ম্ম বেদনিহিত। খৃষ্টানের যেমন বাইবেল, মুসলমানের যেমন কোরাণ, হিন্দুর তেমনি বেদ। এই বেদ জীবন্তভাবে যে পরিমাণে হিন্দুর জীবন নিয়ন্ত্রিত করে, হিন্দু সেই পরিমাণে শক্তিশালী হয়, এবং যে পরিমাণ হিন্দু বেদ-পরাঙ্মুখ হয় সেই পরিমাণে সে দুর্ব্বল হইয়া পরপদদলিত হয়। সেই সনাতন বেদের ধর্ম্ম যুগভেদে, অবস্থাভেদে প্রয়োজনানুসারে নানা আকারে আমাদের নিকট অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। যুগোপযোগিভাবে এই সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম আমাদের জাতীয়-জীবনে প্রয়োগ করিতে পারিলেই আমাদের সকল সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব। স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বর্জ্জন করিয়া পরকীয় শিক্ষা ও আদর্শের অনুসরণে যথার্থ কল্যাণ লাভ কখনই সম্ভবপর নয়।

বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রসমূহ এবং আচার্য্য মহাপুরুষদের সাধনার প্রভাবে হিন্দুর চিন্তার ধারা বহু সহস্র বৎসর যাবৎ একটী বিশিষ্ট পথে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। এই চিন্তাধারা পাশ্চাত্য চিন্তাধারা হইতে মূলতঃই ভিন্ন। হিন্দু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সমূহকে চরম সত্য মনে করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ভোগের উৎকর্ষসাধন জীবনের চরম কল্যাণ বলিয়া মনে করিতে পারে না। সুতরাং বাহ্য সম্পদের বৃদ্ধিসাধনে আপনার সকল শক্তি নিয়োজিত করা হিন্দুর স্বভাববিরুদ্ধ। এই পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে যে ব্রহ্মতত্ত্ব বিরাজমান রহিয়াছে, হিন্দু তাহাকে কেবলমাত্র জগতের মূলসত্তা বলিয়াই জানে না। তাহাকে আপনার আত্মা বলিয়া সে অনুভব করিতে শিখিয়াছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাহা মূল কারণ তাহাই আমার যথার্থ স্বরূপ। ব্রহ্মই জীবের আত্মা—এই সত্যটী হিন্দু জাতির মহাপুরুষগণ প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন এবং হিন্দুমাত্রেরই প্রাণে প্রাণে এই ধারণাটী সজাগ রহিয়াছে। সুতরাং হিন্দু যখনই হিন্দুভাবে কোন সমস্যার সমাধান করিতে চায়, তখনই আত্মা বা ব্রহ্মের দৃষ্টিতে তাহা বিচার করে। এই আত্মা বা ব্রহ্ম সকল জীবের অন্তরে বিদ্যমান এবং সকল জীবকে নিজের আত্মা হইতে অভিন্ন দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা হিন্দুর প্রাণে বিদ্যমান। হিন্দুর দৈহিক গঠন, মানসিক গঠন সবই এই ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত। বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য জাতিসমূহকে গুরু বলিয়া মানিয়া এবং তাহাদের নিকট শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করিয়া হিন্দুর স্বভাবের ভিতরে একটা ঘোরতর জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। নিজের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া বিজাতীয় ভাব ও স্বকীয় ধর্ম্মের প্রতি একটা অনাস্থাও আসিয়া পড়িয়াছে। এই সমস্যার সমাধান হিন্দুর জাতীয় জীবন পুনর্গঠনের জন্য অত্যাবশ্যক। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর ও নচিকেতা, চৈতন্য, নানক, রামকৃষ্ণ প্রভৃতির আদর্শ তাহার জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমনভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে যে, তাহা বর্জ্জন করিয়া সম্পূর্ণ নূতন মানুষ হওয়া হিন্দুর পক্ষে সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে এই আদর্শের অনুশীলনের অভাব এবং বিজাতীয় আদর্শের প্রভাব তাহার মস্তিষ্কের কেন্দ্রগুলিকে যথাযথভাবে সনাতন ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহ অনুধাবন করিতে অক্ষম করিয়া ফেলিতেছে। আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে সনাতন ধর্ম্মের শব্দময় মূর্ত্ত বিগ্রহস্বরূপ সংস্কৃত ভাষার আলোচনা নিতান্ত উপেক্ষিত হওয়ায় আমাদের বুদ্ধির তত্ত্ব-বিচারশক্তি ক্রমশঃই মলিন হইয়া পড়িয়াছে। জাতীয় জীবনের সহিত জাতীয় ভাষার এমন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ যে, জাতীয় ভাষাকে অবহেলা করিয়া জাতীয় জীবনের সাধনাকে উদ্বুদ্ধ করা কার্য্যতঃ অসম্ভব। সুতরাং সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়া আমাদের আধ্যাত্মিক ও রাষ্ট্র-সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত অত্যাবশ্যক।

আমাদের জাতীয় শিক্ষাপ্রণালীর মূলে একটী ভাবের প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে, সেইটী শ্রদ্ধা। "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"—শিক্ষার প্রথমে আচার্য্যের নিকট হইতে অবিচলিত শ্রদ্ধার সহিত তাহার উপদিষ্ট বিষয়গুলি হৃদয় দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে। এই বিদ্যাগ্রহণের সময় মনটীকে এক প্রকার Passive করিতে হইবে

গুরু যাহা বলেন নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে তাহা গ্রহণ করিয়া তাহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে যত্নবান্ হইতে হইবে। তাহার পরে যুক্তির স্থান। প্রথমে সন্দেহকে ভিত্তি করিয়া যুক্তির সাহায্যে তত্ত্বাবধারণের চেষ্টা প্রায়শঃই ব্যর্থ হইয়া থাকে। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, গুরুবাক্যে বিশ্বাস ব্যতীত জীবনে যথার্থ সাধনার উপযোগী জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। অবশ্য গুরু বাছিয়া লইতে হইবে এবং এই নির্ব্বাচন অপরিপক্কবুদ্ধি বালকবালিকাদের পক্ষে কঠিন ব্যাপার। তাহাদের পিতামাতা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত গুরুর সন্ধান পূর্ব্বক তাঁহার হস্তে সন্তানদিগকে সমর্পণ করিবেন এবং সন্তানগণ সেই গুরুর নিকট আত্মসমর্পণপূর্ব্বক শ্রদ্ধার সহিত তাহার সাধনালব্ধ জ্ঞান আহরণ করিবে, ইহাই প্রকৃষ্ট নীতি।

আত্মসমর্পণ সম্বন্ধে অনেকের ধারণা আত্মবিক্রয় এবং ইহাতে আত্ম-বিকাশের পথে বাধা উৎপন্ন হয়। আত্মসমর্পণের যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধি না করিলে এই আশঙ্কা স্বভাবতঃই থাকে। কোন প্রকার লাভের জন্য বা কামনা চরিতার্থের জন্য যখন একজন অপরের নিকট আপনার স্বতন্ত্র সত্তা বিসর্জ্জন করে; তখন তাহা আত্মসমর্পণ নামের যোগ্য নয়। আত্মসমর্পণের মূলে থাকিবে নিষ্কাম প্রেম ও অবিচলিত শ্রদ্ধা। আত্মসমর্পণযোগে এই শ্রদ্ধা ও প্রেমের অনুশীলনে আমাদের আত্ম-বিকাশের বিরোধী শক্তিগুলি নির্য্যাতিত হয় এবং আভ্যন্তরীণ রিপু-গুলিকে জয় করিয়া বিশুদ্ধ আত্মারই উদ্বোধন হয়। ভয়, লোভ, কাম প্রভৃতিকে পরাজিত করিতে গুরু ও শাস্ত্রের নিকট প্রেমের সহিত আত্মসমর্পণ অমোঘ অস্ত্র। এই আত্মসমর্পণের ভিতর দিয়াই যথার্থ সত্যের সাধনা ও সিদ্ধি হয়।

আমাদের জাতীয় জীবনের দুর্ব্বলতা বিদূরিত করিয়া আবার এই জাতিকে গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে উপরোক্ত আদর্শানুসারে সঙ্ঘ গঠিত হওয়া আবশ্যক। এমন কতকগুলি নির্ভীক ও স্বার্থত্যাগী নারী পুরুষ প্রয়োজন, যাহারা সঙ্ঘের জন্য গুরুর আদেশে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত। সকল প্রকার ক্লেশ বরণ করিতে রাজী এবং নিজেদের কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের প্রতি যাহাদের বিন্দুমাত্রও আসক্তি থাকিবে না। আমি স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া সুদৃঢ় নিশ্চয়তার সহিত ঘোষণা করিতেছি যে, এই প্রকার দুই সহস্র নরনারী যদি নিজেদের অভিমান ও মমতা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সনাতন ধর্ম্মের আদর্শ অনুসারে ভগবৎসেবাবুদ্ধিতে জাতির সেবায় আত্মোৎসর্গ করে, তাহা হইলে বাঙ্গালী হিন্দু-জাতি সমগ্র হিন্দুজাতির গুরুর স্থান অধিকার করিতে পারিবে। হিন্দু-জাতির উদ্ধারসাধনে বাঙ্গালী হিন্দুর বিশেষ দায়িত্ব আছে। বাঙ্গালী হিন্দুই পাশ্চাত্য বিজাতীয় শিক্ষাকে ভারতে আমদানী করিয়াছে, বাঙ্গালী হিন্দুর সাহায্যেই পাশ্চাত্য জাতি ভারতীয় শিক্ষা ও সাধনাকে অভিভূত করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সাধনার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সুতরাং পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সাধনাকে কুক্ষিগত করিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও কলাকৌশলকে অধিগত করিয়া তাহার উপরে হিন্দুত্বের বিজয়-নিশান বাঙ্গালী হিন্দুই আবার উড্ডীন করিবে এবং এই ভাবে সমগ্র হিন্দুজাতির ঋণ বাঙ্গালী শোধ করিবে, ইহাই প্রত্যাশিত।

বাঙ্গালী হিন্দু-যুবক ত্যাগের পতাকা উড়াইয়া নৈতিক বহির্ব্বাস ধারণ করিয়া উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মাঠে হলচালন করিবেন, সেয়ার মার্কেটে ব্যবসা করিবেন, মুদ্রাযন্ত্র পরিচালনা করিয়া জ্ঞান বিতরণ করিবেন। সর্ব্বত্র জাতির সমক্ষে True Spiritual movement আনয়ন করিয়া জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের, সন্ন্যাসের সহিত শিল্প-বাণিজ্যের, তপস্যার সহিত বিজ্ঞানের, সনাতন ধর্ম্মের আদর্শের সহিত পাশ্চাত্য কর্ম্মকুশলতার অপূর্ব্ব সমন্বয় প্রদর্শন করিবে।

শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় গত ২৭শে ফাল্গুন মৈমনসিংহ দুর্গাবাড়ীতে হিন্দু-ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এই চৈত্রের চারুমিহির পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করা গেল।

— নিষ্কর্ষ —

অবনীন্দ্রনাথের রেখার টানে যেদিন ছবিতে রঙের মাত্রা ঠেলে জীবনের অরুণ রাগ দেখা দিল আর সে জীবনের স্পন্দন অনুভূত হলো মনীষিদের মধ্যে ভারতের চিত্রবিদ্যা কেবল সেদিন দেশের গণ্ডীর মধ্যে রইল না, সারা বিশ্ব জুড়ে সে তার ঠাঁই করে নিল। অবনীন্দ্র দিলেন দেশকে গৌরব, ভারত প্রতিভার অপূর্ব্ব পরিচয়। তাঁর হাতে গড়া যশস্বী, শিল্পী নন্দলাল যেদিন মাথা তুলে উঠ্‌লেন, বুঝা গেল, চিত্রের যে প্রাণ দেওয়ার মন্ত্র পেয়েছেন ঋষি, সে মন্ত্রশক্তি অমর, তার মাঝে আছে— 'সৃজনকরী মহাশক্তি'। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই নন্দলালের কিছু পরিচয় দিতে 'বিচিত্রায়' আর্ট সম্বন্ধে যেটুকু সঙ্কেত দিয়েছেন তা আমাদের প্রণিধানযোগ্য।

"নন্দলালের শিল্পদৃষ্টি অত্যন্ত খাঁটি, তার বিচারশক্তি অন্তর্দর্শী। একদল লোক আছে, আর্টকে যারা কৃত্রিম শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ করে দেখ্‌তে না পার্‌লে দিশেহারা হয়ে যায়। এইরকম করে দেখা, খোঁড়া মানুষের লাঠি ধরে চলার মত, একটা বাঁধা বাহ্য আদর্শের উপর ভর দিয়ে নজির মিলিয়ে বিচার করা। এইরকমের যাচাই প্রণালী ম্যুজিয়াম্ সাজানোর কাজে লাগে। যে জিনিষ মরে গেছে তার সীমা পাওয়া যায়, তার সমস্ত পরিচয়কে নিঃশেষে পরিচয় করা সহজ, তাই বিশেষ ছাপ মেরে তাকে কোঠায় বিভক্ত করা চলে। কিন্তু যে আর্ট অতীত ইতিহাসের স্মৃতিভাণ্ডারে নিশ্চল পদার্থ নয়, সজীব বর্ত্তমানের সঙ্গে যার নাড়ীর সম্বন্ধ, তার প্রবণতা ভবিষ্যতে বিপুল; সে চল্‌ছে, সে এগোচ্ছে, তার সম্ভূতির শেষ হয় নি, তার সত্তার পাকা দলিলে অন্তিম স্বাক্ষর পড়েনি। আর্টের রাজ্যে যারা সনাতনীর দল তারা মৃতের লক্ষণ মিলিয়ে জীবিতের জন্য শ্রেণীবিভাগের বাতায়নহীন কবর তৈরী করে। নন্দলাল সে জাতের লোক নয়, আর্ট তার পক্ষে সজীব পদার্থ।"

* * *

আজ যে খৃষ্টীয় সভ্যতা ও আদর্শবাদ জগৎ জুড়ে তার ঠাঁই করে নিচ্ছে, তার গোড়ায় ছিল সর্ব্বজাতি ও সর্ব্ব-ধর্ম্মীর মধ্যে তাদের শিক্ষা ও সাধনার প্রচার। ভারতের সর্ব্বোচ্চ আদর্শবাদ আজ অবজ্ঞেয়, সে কেবল ভারতের শিক্ষা সভ্যতার ধারা কোন বিশিষ্ট জাতির গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখার ফল। আচার্য্য শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার চৈত্রের 'উদয়নে' "সাহিত্য ও জনসমাজ" শীর্ষক প্রবন্ধে ইহা অতি সুন্দর করে দেখিয়েছেন। তিনি বলেন,

"সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে জ্ঞানের প্রসার না হইলে অতি উচ্চতম জ্ঞানীর জ্ঞানের ফল রক্ষিত হইতে পারে না। দেশকে যাঁহারা জ্ঞানে সমৃদ্ধ করিতে চান, তাঁদের এ কথাটী স্মরণ রাখা ভাল। আমাদের প্রাচীনকালের বিশেষ গৌরবের দিনে আভিজাত্যের মর্য্যাদায় পুষ্ট কয়েকটী শ্রেণীর লোকের মধ্যেই সুশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু জনসাধারণের লেখাপড়ার তেমন ব্যবস্থা ছিল না। উহার ফলে অনেক জ্ঞানীর আবিষ্কৃত সত্য দেশে একেবারেই উপেক্ষিত হইয়াছে।"

তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি ভারতগৌরব পণ্ডিত আর্য্যভট্টের নাম করেছেন। পৃথিবী যে গোলাকার এবং উহা যে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়, তাঁহার এই সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কৃত সত্যটী জনসাধারণের মধ্যে আলোচিত না হওয়ায়, এই আবিষ্কারে নিউটনের এইরূপ প্রসিদ্ধি সম্ভব হয়েছে। সত্যই আচার্য্যের ভাষায় বলি, "ভারতবর্ষ বহু সত্যের আদিজন্মভূমি, কিন্তু সত্যগুলি ভারতবর্ষে পুষ্ট হইয়া" যখন বর্দ্ধিত হতে পারে নি, তখন সে ভারতবর্ষ বিশ্বের দরবারে সর্ব্ববিষয়েই অনাদৃত হবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

রাজা রামমোহন একজন যুগপুরুষ; তাঁহাকে আমরা অতিমানবের মধ্যে একজন বলে' মনে করি। তাঁর শতবার্ষিকী উপলক্ষে বাঙ্গালী তাঁকে যে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়েছে ইহাতে রাজার গৌরববৃদ্ধির চেয়ে বাঙ্গালীজাতি অধিক ধন্য হয়েছে। মাঘ মাসের 'শনিবারের চিঠিতে' এই বিষয়ে

যে 'অপ্রিয় আলোচনা হয়েছে, তাতে রাজার প্রতি দেশ ও জাতির যে শ্রদ্ধা তাহা ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে। 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশ—

"এদেশে ইংরাজীশিক্ষা প্রবর্ত্তনের ইতিহাস বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন যাঁহারা তাঁহারা জানেন, এ বিষয়ে রামমোহনের কৃতিত্ব আর কাহারও তুলনায় বেশী তো নহে বরং কম বলিলেও আজ অন্যায় হইবে না! রাজা রাধাকান্ত দে, গোপীমোহন ঠাকুর প্রমুখ হিন্দু-প্রধানগণ এ বিষয়ে কম উদ্যোগী ছিলেন না। লর্ড আমহার্ষ্টকে একখানি পত্র লেখা ছাড়া এ কর্ম্মে রামমোহনের কায়িক বা আর্থিক কোন প্রযত্নের প্রয়াস আমরা পাই না।"

বাঙ্গালাভাষায় গদ্যের রীতি ও তাহার প্রগতি-সম্বন্ধে রাজার যে কীর্ত্তি আমরা ঘোষণা করি তার প্রতিবাদ স্বরূপ 'শনিবারের চিঠি' লিখেছেন।

"রামমোহন যে গদ্য লিখিয়াছিলেন তাহা বাঙ্গালা গদ্যের রীতি ও তাহার ক্রম-পরিণাম সম্পর্কের সহিত সম্পর্কহীন। কেরী ও মৃত্যুঞ্জয়, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিম প্রধানতঃ এই চারিজন ব্যক্তির পরিশ্রম ও প্রতিভায় আধুনিক বাঙ্গালা গদ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।"

রামমোহনকে বাঙ্গালী যত বড় চক্ষে দেখ্‌তে চায় তারও প্রতিবাদ খুব জোর করেই শনিবারের চিঠি লিখেছেন—

"রামমোহন ঐতিহাসিক ব্যক্তিমাত্র, ইতিহাস স্রষ্টা নহে; তিনি যুবক প্রতিনিধি, যুগাবতার নহেন।"

তবুও যে রাজা একজন কৃতিপুরুষ বলে' খ্যাতি পেয়েছেন তার কারণ প্রদর্শন করা হয়েছে এই বলে—

"আত্মরক্ষা, আত্মপ্রচার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার যত উপায় আছে রামমোহন তাহার কোনটীতে কম পারদর্শী ছিলেন না।"

আরও বলা হয়েছে—

"রামমোহন জীবনে কখনও ত্যাগ স্বীকার করেন নাই—ধর্ম্ম, দেশ বা সমাজের জন্য তিনি যতই চিন্তা করিয়া থাকুন তজ্জন্য কোনও দিকেই তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই।"

আমরা শনিবারের চিঠির ভাষায় বলি—

"বুদ্ধিমানের মত অর্থ উপার্জ্জন করে পান, ভোজন ও বিলাস-ব্যসনে রত এই রামমোহন যদি স্বাধীনতাকামী, সর্ব্বসংস্কারমুক্ত শত্রুঞ্জয়, ভোগী, মেধাবী, আত্মোন্নতিসাধনে সিদ্ধ পুরুষ বলে প্রচারিত হতে পারেন তবে তার মূলে যে নিগূঢ় কারণ নিহিত থাকে তাহা উপেক্ষা করার বস্তু নয়।"

যে কারণে আচার্য্য আর্য্যভট্টের প্রথম আবিষ্কার, নিউটনের বলে জগতে খ্যাতি পায়, সেই একই কারণে রাজা রাধাকান্ত, গোপীমোহন প্রমুখ হিন্দু প্রধানগণ রাজার চালে মাত হয়েছেন বলে মনে করা অসঙ্গত নয়।

গান

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

আমার একটি গানে তোমার বীণা
বাজিয়ে দিও করুণ তানে
যে গান আমার গাইতে হবে
সিন্ধুকূলে স্রোতের টানে।

অন্ধকারে আলোর মায়া
আনুল আজি বিষাদ ছায়া
সেই ছায়ারি অন্তরালে
মন যে আমার তোমায় জানে।

নীরব রাতির আসন পাতি'
সন্ধ্যা-বঁধু বিদায় মাগে
করুণ মধুর মূর্চ্ছনা তার—
অন্তরে মোর স্বপন্ জাগে।

এম্‌নি করে বিদায় সাঁঝে
এস তুমি গানের মাঝে
তোমার আমার হোক্ অভিসার
শেষ মিনতির একটি গানে।

ডাকঘর

চন্দনগরের সুসন্তান শ্রীযুত হরিহর শেঠ তাঁর ৩০।৩।৩৪ তারিখের পত্রে ১৩৪১ সালের 'প্রবর্ত্তক' সম্বন্ধে লিখিতেছেন—

'প্রবর্ত্তককে' নূতন শ্রীসম্পদ্ দিবার ব্যবস্থা করেছেন এ সংবাদ পূর্ব্বেই জেনেছি। 'প্রবর্ত্তক' এখন বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ মাসিক, সকলের অন্যতম একথা সর্ব্ববাদিসম্মত। ইহার অধিকতর উন্নতিসাধনে যত্নবান হয়েছেন, ইহা খুবই আনন্দের কথা। আমি সত্যই ইহাকে চন্দননগরের গৌরব বলেই মনে করি এবং ইহার কল্যাণ কামনা করি।"

বোম্বাই হইতে শ্রীযুত দুর্গাশঙ্কর মহলানবিশ প্রবর্ত্তক-সাহিত্য পড়িয়া তাঁর ধারণা ১৯।৩।৩৪ তারিখের চিঠিতে জানাইয়াছেন—

"সঙ্ঘ সম্বন্ধে আলোচনা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির কাছ থেকে নিশ্চয়ই আশা করেন নি। আগা থেকে গোড়া পর্য্যন্ত সঙ্ঘের কথাগুলি বেশ ভাল লেগেছে। এক অভিনব জিনিস এ সঙ্ঘ। নিহিলিজম্, বল্‌শেভিজম্ প্রভৃতি যেমন এই দুঃখ দৈন্যময় জগৎকে একদিন অভিনবত্বে চমৎকৃত ক'রে দিয়েছিল, প্রবর্ত্তকের বাণীও তেমনি ভাবে অনশন-ক্লিষ্ট, রুগ্ন, শীর্ণ, বিষাদমণ্ডিত জগতের প্রাণে আশার নির্ঝর এনে দেবে একদিন। বল্‌শেভিজম, কমুনিজম্ নিরীশ্বরবাদে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। তারা মুক্তি-মন্ত্রের অভিযানে চ'লে যাবে অন্ধকারে, অনুদ্দেশ্যে—পথহারা। "বিজলি শুধু ক্ষণিক আভা হানে, নিবিড়তর তিমির চোখে আনে।" যে ধ্রুবতারা সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্য্যন্ত নিশার দীপটি অম্লান ক'রে জাগিয়ে রাখে, পথহারাদের পথ দেখায়, তন্দ্রাহত জগৎ চেয়ে আছে দূরাগত সেই আলোর পানে। সে আলোক ধরা দিয়েছে ভারত-তীর্থে, প্রবর্ত্তকের আত্মোৎসর্গের ধ্যানে। গঠন, সংস্করণ, সংরক্ষণ প্রভৃতির মূলে যে ঐশীশক্তি দাঁড়িয়ে আছে, সে শক্তি জরামরণ-বিজয়িনী। এখানেই প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের বিশেষত্ব আমি দেখতে পাই। তাই তাঁদের বাণী আমার কাছে এতো ভাল লেগেছে। হ'তে পারে ছোট-বড় আরও অনেক অনুষ্ঠান এ কাজের সহায়তা করবে।"

চিত্র পরিচয়—

শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় অঙ্কিত 'প্রবর্ত্তকের' প্রথম পৃষ্ঠার উপরের ছবি সম্বন্ধে জনৈক সাধক ও শিল্প-রসজ্ঞের অভিমত প্রার্থনা করিলে, তিনি উহার সম্বন্ধে যে উত্তর দেন, তাহারই কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

"প্রমোদ বাবুর ছবি সুন্দর হয়েছে। আমার মনে হল seed of world-truth তিনি in figure আর কি রূপে demonstrate করতে পারেন? ইহা পুরুষের কোলে নারী-মূর্ত্তি নয়, উহা পুরুষ-প্রকৃতির যুগ্ম অঙ্গ। এই যজ্ঞই সৃষ্টি-তত্ত্বকে সার্থক করে। ইহা যুগল-মূর্ত্তিও বটে, এবং true ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারীরও ভাব্য; কেননা প্রকৃতিকে এইভাবে যদি সে আপনার মাঝে না পায়, তার জীবন রসবর্জ্জিত, একান্ত রুক্ষ ও হাহাকারপীড়িত অস্বাভাবিকই হবে। এই আমার অভিমত।

কিন্তু সাধারণ লোকচক্ষে কিরূপ হবে? লোক একান্ত গ্রাম্যসুখপীড়িত ও একেবারে প্রাকৃত। কিন্তু লোককে যদি বিশুদ্ধ করে তুল্‌তে হয়, বাজে লোকদেখান বৈরাগ্যকে আঘাত দিয়েই তা করতে হবে। সত্য সন্ন্যাস প্রতিষ্ঠাই বাঞ্ছনীয়। নিঃসঙ্গ কোন জীবন যদি রসতত্ত্বকে একান্ত ভাবে না অনুধ্যান করে, অনুভব করে, তার বাঁচাটাই পীড়াদায়ক হয়।"

— প্রবাহ —

অশান্ত ইউরোপ—

ইউরোপের বিশেষ করিয়া মধ্য ইউরোপের মন আজ গুমরিয়া গুমরিয়া যে অশান্তির গুমোট পাকাইয়া তুলিতেছে, কে জানে অদূর ভবিষ্যতে তা একদিন অসহ্য আত্মপ্রকাশে সারা পৃথিবীব্যাপী সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিবে না!

এ ভাবী যুদ্ধের বীজ যে কোথায় নিহিত তার সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করা সুকঠিন। তবে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেখানেই জলুক না কেন, দহ্যমান, অপ্রসন্ন অন্তর মরিয়া হইয়াই তাহাতে যোগ দিবে। বিগত মহাযুদ্ধের সূচনা হয় বলকান হইতে; এবারও রাষ্ট্রীয় ইউরোপের অবস্থা-বিবেচনায় অতৃপ্ত বিদ্রোহোন্মুখী বলকানের উপরই দৃষ্টি পড়ে। গত যুদ্ধশান্তির পরে যে আপোষনিষ্পত্তি হইয়াছিল, তারই মধ্যে সংগোপিত রহিয়াছে সে ভাবী ভীষণতর যুদ্ধের বীজ। বিজয়ী শক্তিপুঞ্জের চিরশান্তি-স্থাপনের ভাণের কোন ত্রুটি ছিল না; কিন্তু স্বার্থান্বেষী অন্তর বোধহয় হিতে বিপরীতই করিয়া বসিল—ভাবী সমরের এক বিপুল সম্ভাবনীয়তার সূচনা সেখানেই হইল সুরু।

বলকানের ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলিকে কেন্দ্র করিয়া এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আজ নূতন নহে। অটোমান তুর্কির কবল হইতে মুক্তি পাইয়া এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিশ্চান রাজ্যগুলি উনবিংশ শতাব্দীতে যে সময় আত্ম-স্বাতন্ত্র্য লাভ করিল, সে সময়ও এর পিছনে ছিল ইউরোপীয় বড় বড় রাষ্ট্রগুলির এক নিগূঢ় অভিপ্রায়। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বার্লিন-কংগ্রেস বসে। এই কংগ্রেসে মণ্টেনিগ্রো, সার্ভিয়া, রুমানিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। হতবীর্য্য রুশিয়াকে অনিচ্ছায়ই সে-সময় বার্লিন-কংগ্রেসের সর্ত্তকে মানিয়া লইতে হইয়াছিল। বলকান পেনিনসুলারের ম্যাপ এই সময় একরূপ নূতন করিয়াই অঙ্কিত হয়। এই মানচিত্রের ভাঙ্গা-গড়া সেই সময় হইতেই চলিয়া আসিতেছে। জার্ম্মাণ-কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হইবার মূলে ছিল বিচ্ছিন্ন বলকান ষ্টেটগুলিকে শক্তিশালী করিয়া রুশিয়ার বস্‌পরাসের দিকে সম্প্রসারণ প্রতিহত করা। এই জোড়াতালিকে লক্ষ্য করিয়া একজন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন, "The treaty of Berlin was a compromise and all compromises, pregnant with future troubles."

ভার্সাই সন্ধিতে বলকান জাতিসমূহের মধ্যে আবার একটা ভীষণ ওলট-পালট আনা হইয়াছে। বিজয়ী শক্তির স্বার্থ রক্ষার্থে বলকান মানচিত্রকে নির্ম্মমভাবে বদলাইয়া সেখানে নব রাষ্ট্র যুগোশ্লাভিয়াকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ক্ষুদ্র হইলেও মণ্টেনিগ্রো শতাব্দী ধরিয়া তার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। বিগত মহাসমরে সে যোগ দিল ফ্রান্স ও বৃটেনের সঙ্গে; এজন্য পুরস্কার-স্বরূপ তাকে যুগোশ্লাভিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইয়া স্বীকার করিতে হইল সার্ব্বিয়ার রাষ্ট্রাধিনতা। এর ফলে সার্ব্বিয়ার রাজা আলেকজাণ্ডার হইলেন নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের সর্ব্বময় প্রভু, আর নিরপরাধ মণ্টেনিগ্রোর রাজা প্রিন্স মিলো হইলেন নির্ব্বাসিত। শুধু তাই নয় ১৯১৯ সাল হইতে প্রিন্স মিলোর জন্মভূমিতে প্রবেশও নিষিদ্ধ হইয়াছে।

সার্ব্বিয়ার প্রভুত্বে যে যুগোশ্লাভিয়া নামক নূতন রাজ্যের পত্তন হইল, তাহাতে অন্তর্ভুক্ত করা হইল ক্রোটস, মণ্টেনেগ্রিন, স্লাভেনিজ প্রভৃতি জাতিসমূহকে। বিশ লক্ষ হাঙ্গেরিয়ান অধিবাসীসহ বনাত প্রদেশকেও ইহার অধীন করা হইয়াছে। অষ্ট্রীয়ার কার্ণিওলা প্রদেশকেও ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া যুগোশ্লাভিয়ার কর্ত্তৃত্বাধীন করা হইল। বিজয়ী শক্তিপুঞ্জ ট্রানসিলভেনিয়াকে মুহূর্ত্তের একটিমাত্র কলমের খোঁচায় দিলেন রুমানিয়াকে, অথচ উহা কত যুগ ধরিয়া হাঙ্গেরির ছিল তাহা আজও

ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া যায় নাই। আবার বুলগেরিয়ার দখল হইতে মেসিডোনিয়াকে ছিনাইয়া বাটিয়া দিলেন গ্রীস ও সার্ব্বিয়াকে। এমনি কত অদল-বদল, শত অবিচার যে শান্তি-সন্ধির মাঝে কেবলমাত্র তুচ্ছ বলকান উপদ্বীপকে ঘিরিয়া হইয়াছে তাহা চিন্তা করিলে ইউরোপের তলে তলে অশান্তি-অসন্তোষের প্রতিকূল স্রোত যে ফল্গুর মত বহিতেছে ও একদিন পার ছাপাইয়া দুকূল প্লাবিত করিয়া ফেলিবে, তাহা অনুমান করা আদৌ যুক্তিহীন নয়।
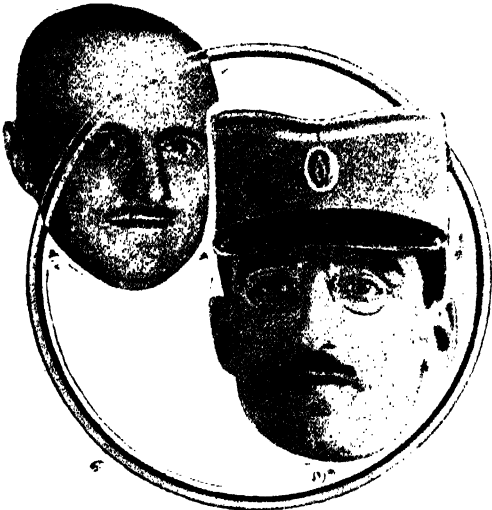
প্রিন্স মিলো ও আলেকজাণ্ডার

যুগশ্লাভিয়া ইউরোপের মধ্যে এখন মস্ত আশঙ্কাজনক স্থান। ইহাকে ইউরোপের পাউডার-হাউস (Powder-House) বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধীনস্থ রাষ্ট্র ও জাতিগুলি আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য সর্ব্বদাই পথ খুঁজিতেছে। ভার্সাই ও ত্রিয়ানল সন্ধির ফলে যে রাষ্ট্রনৈতিক গোলক-ধাঁধা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইতে শান্তির সার্ব্বজনীন উপায় বাহির করাও কঠিন। কেবলমাত্র রাজ্য বিস্তারের বুভুক্ষাই যুদ্ধের একমাত্র কারণ নয়। পরস্পরের প্রতি আশঙ্কা ও ভয় অনেক সময় অপ্রত্যাশিতকে সম্ভব করিয়া তোলে।

ইতালি আলবেনিয়ার মিতালি সূত্রে যুগশ্লাভিয়ার প্রতি লোলুপদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। এদিকে ফ্রান্স ইতালির শক্তি ইউরোপে বৃদ্ধি হইতে না দিবার জন্য যুগশ্লাভিয়ার বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

এই যে 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে' চাপান হইয়াছে তাহা পুনরায় নূতন বন্দোবস্তের দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে জাতি ও ভাষাগত ভাবে স্ব-স্ব স্বাতন্ত্র্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না হইলে ইউরোপে কিছুদিন আগে-পরে আবার যে রক্তবন্যা বহিবে তাহা অবধারিত। মণ্টেনিগ্রোর স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনিতে হইবে। ক্রোটসদের স্বাধীন হইবার ইচ্ছা বিবেচ্য। বিচ্ছিন্ন হাঙ্গেরীর অধিকাংশ অধিবাসীই মিলন চায় অষ্ট্রিয়া ও কর্ণিওলার সঙ্গে। এই সাড়ে চারকোটি লোকের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি সুবিচার করিতে হইবে। ছোট বড় সকল সমস্যার সমাধান যদি হয়, তবেই বলকান-ভীতি বিদূরিত হইতে পারে; কিন্তু তাহা কি স্থানীয় ইউরোপীয় স্বাধীন শক্তির দ্বারা সম্ভব? তাহারা ইউরোপের রাষ্ট্র-ভার-কেন্দ্র বজায় রাখার অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষায় যদি এক পা আগায় তো তিন পা পিছায়। লাঞ্ছিত জাতিগুলিও পদে পদে শান্তির অন্তরায় হইতেছে। মার্কিণ ও ইংলণ্ড যদি এ বিষয়ে আন্তরিক চেষ্টা করে, তবে অনেকটা শান্তিস্থাপনের আশা করা যায়। নচেৎ সুদূর ভবিষ্যতে এই নিপীড়িত জাতিসমূহের বলশেভিজমকেও বরণ করিয়া লইতে হয়তো বাধিবে না, যদি না ইতিমধ্যে রক্তবিপ্লব বা অন্য কোন পন্থায় বর্ত্তমান ইউরোপের রাষ্ট্র-বৈষম্য সাম্যাবস্থায় ফিরিয়া আসে।

জার্ম্মাণীর বিমান-বিজিগীষা—

মানুষের মন ও বুদ্ধির প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে তার বাহ্যলক্ষণ, জীবনের ভঙ্গী, তার চলার গতি, আচরণের রূপও বদলাইয়া যায়। বর্ত্তমান বিজ্ঞান যখন মানুষের জীবন-ক্ষেত্রে প্রবেশলাভ না করিয়াছিল, তখন মানুষে-মানুষে লড়াইয়ের জয়-পরাজয় নির্ভর করিত নিছক দৈহিক শক্তির উপর। তারপর আসিল অস্ত্র-শস্ত্র-ঢাল-তরোয়াল-বন্দুক-কামান—সাগর ছাড়িয়া মানুষ উড়িল বিমানে। এখন জাতির শক্তি পরীক্ষা হয় উড়োজাহাজের বলে ও উহার অশ্ব-শক্তিতে। প্রতীচ্যের বর্ত্তমান সমস্যা

তাই বর্ত্তমানে নিছক নৌ-বলের উপর নয়, পরন্তু সমর-আসর-সজ্জিত হইতেছে আকাশে।

বিগত মহাসমরের পর অস্ত্রহীন করা হইয়াছিল যে সকল জাতিকে, তন্মধ্যে জার্ম্মাণী অন্যতম। সত্যিই কি জার্ম্মাণী অস্ত্রহীন? বিমানের সমর-সজ্জার উপকরণ হইতে কি সে বঞ্চিত? নিরস্ত্রীকরণ-বৈঠক-সভায় সে গলা ছাড়িয়া ঘোষণা করে এ দৈন্যের কথা।

ক্যাপ্টেন গোয়েরিং

মিলিটারী নেভেল উড়োজাহাজ ফ্রান্সের আছে ২৩০০, ব্রিটেনের ১৫০০, ইতালির ১৫০০, পোলাণ্ডের ৭০০, জেকোশ্লাভাকিয়ার ৭০০, বেলজিয়ামের ২০০, আর জার্ম্মাণীর শূন্য বলিয়া জার্ম্মাণীর নিরস্ত্রীকরণ প্রোপাগাণ্ডা বিভাগ দাবী করে। জার্ম্মাণীর এ কথা বহির্জগৎ বিশ্বাস করে না। যারা জানে তারাই বুঝিবে জার্ম্মাণীর বিমান-শক্তি হিট্‌লারের আমলে এমন কি তাঁর পূর্ব্বেও জার্ম্মাণীর প্রতিবাসীর নিকট কিরূপ ভীতিজনক।

ক্যাপ্টেন গোয়েরিং রীচের বর্ত্তমান বিমান-সচিব। তিনি একাধারে রীচষ্টাগের প্রেসিডেণ্ট, প্রুশিয়ার মন্ত্রী ও হিটলারের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ। ব্যক্তিত্বে ও প্রভাবে জার্ম্মাণীতে হিট্‌লারের পরের স্থানই ক্যাপ্টেন গোয়েরিংয়ের।

বাইরের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য জার্ম্মাণী অতি কৌশলে বিমানপোত নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। সাগর-সমরে যেমন যুদ্ধ-জাহাজ সমরোপযোগী করিয়া বিশেষ ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়, উড়োজাহাজের বেলায় কিন্তু তা নয়। যাত্রী কি মালবাহী বিমান পোতগুলিকে সামান্য অর্থব্যয়ে অল্পসময়ের মধ্যেই সামরিক উড়োজাহাজে পরিণত করা আদৌ কঠিন নয়। কেবলমাত্র উহার গতির উপর নির্ভর করে। 'সিভিল' ও 'মিলিটারী' বিমানপোতের মধ্যে যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই তা নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে জার্ম্মাণী নিজেই স্বীকার করিয়াছে। এই জন্যই বোধ হয় জার্ম্মাণ ডেলিগেট্‌রা বৈঠকের প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-বিমান-পোতগুলির পার্থক্য-করণের বিরোধী ছিল। জার্ম্মাণীর লাফ্‌টা-হান্‌সা কেবল ইউরোপ কেন পৃথিবীর মধ্যেই বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংহতিবদ্ধ উড়োজাহাজের পরিচালক। ব্রিটিশের যেমন 'ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়ে'জ তেমনি জার্ম্মাণীর 'লাফ্‌টা-হানসা' ইহার পরিচালনাধীন বহু বিমানপোত আছে—যা প্রয়োজন মত সমরোপযোগী করিয়া তোলা সম্ভব।

পূর্ব্বে এই সকল উড়োজাহাজ ও উহার লাইনগুলির মালিক ছিল ড্রেসডেনার, ডিউসি প্রভৃতি ব্যাষ্টি কোম্পানী কিন্তু বর্ত্তমানে উহা ক্রমশঃ গবর্ণমেণ্টের অধীন করা হইয়াছে। এমন কি বৃত্তি ও নানা প্রকারের চুক্তির দ্বারা জাঙ্কার, হিঙ্কেল প্রভৃতি উড়োজাহাজের ফ্যাক্টরীগুলিকে গবর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হইয়াছে। উড়োজাহাজ চালকদিগের জন্য একরকম বিশেষ নীল পোষাক করা হইয়াছে। এ জন্য সার্ব্বজনীন শিক্ষার সুবন্দোবস্ত হইয়াছে ও বর্ত্তমানে ইহার উপর আরও জোর দেওয়া হইতেছে। ফ্যাক্টরীগুলিতে দিন-রাত বিমানপোত নির্ম্মাণের কার্য্য চলিতেছে। এই বিশাল বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্যাপ্টেন গোয়েরিংয়ের নেতৃত্বে বিমান-

বোর্ড সৃষ্টি করা হইয়াছে। সরকার হইতে ১৯৩৩-৩৪ সালের জন্য ৮০,০০০,০০০, মার্কস (৪,০০০,০০০, পাউণ্ড) বাজেট করাও হইয়াছে। প্রকাশ্যভাবে এই অঙ্ক দেখান হইয়াছে বটে কিন্তু তলে তলে আরও কত টাকা এই অভিপ্রায়ে খরচ করা হইবে কে জানে!

ক্যাপ্টেন গোয়েরিং জার্ম্মাণীর বিমান-প্রভু। তিনি বিশ্বাস করেন যে, ভাবী যুদ্ধের ফলাফল নিরূপিত হইবে বিমান-শক্তির বলে। আগামী বিশ্ব-যুদ্ধ নির্ভর করিতেছে উড়োজাহাজ, বিষাক্ত-গ্যাস ও বোমার উপর। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই যে-সময় অপরাপর দেশ নৌ-বল, স্থল-সৈন্য, দুর্গ ইত্যাদি নির্ম্মাণে ব্যাপৃত, জার্ম্মাণী বিমান-শক্তি বৃদ্ধিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। জার্ম্মাণী যদি আজও দুনিয়ার বিমান-প্রভুত্ব লাভ করিতে না পারিয়া থাকে তবে শীঘ্রই যে করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

নাৎসী গবর্ণমেণ্টের নিগূঢ় অভিপ্রায় যদি সিদ্ধ হয়, তবে ভাবী যুদ্ধ যে কি ভীষণতর হইবে, তা কল্পনা করিতেও শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠে।

মুসোলিনীর ইতালি—

সম্প্রতি ফ্যাসিষ্ট শাসনের দশম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সাত সহস্র বিশিষ্ট ফ্যাসিষ্টের সম্মুখে নব্য ইতালির স্রষ্টা

সিনর মুসোলিনী

সিনর মুসোলিনী ইতালির ভাবী আদর্শের কথা মুক্তকণ্ঠে জ্ঞাপন করেন।

"ইতালির বংশধরদিগের কর্ত্তব্য হইতেছে, আফ্রিকার উপনিবেশের বিস্তারসাধন। ইহার দ্বারা জোরপূর্ব্বক রাজ্য দখলের কথা উঠিতেছে না। কিন্তু ফ্যাসিষ্ট ইতালির নৈতিক এবং আর্থিক বিস্তৃতিলাভের যে অধিকার আছে, সে পথ রুদ্ধ করিয়া রাখা জাতিসমূহের উচিত নয়।...আফ্রিকার অপরিমেয় সম্পদ্ যাহাতে কাজে লাগিতে পারে, তাহার ব্যবস্থাই ইহার উদ্দেশ্য এবং ইহার ফলে সমস্ত দেশকে গভীর ভাবে বিশ্ব-সভ্যতার কোলে টানিয়া লইবে।"

* * * *

সিনর মুসোলিনী এবারও ইতালির সাধারণ নির্ব্বাচনে শতকরা নব্বই ভোটেরও উপর পাইয়া জয়লাভ করিয়াছেন। নানালোকে নানা কথা বলিলেও ইতালির উপর তাঁর অসাধারণ প্রভাব অস্বীকার করিবার যো নাই।

শান্তিরক্ষার বিড়ম্বনা—

এবার বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ রিড্ পুলিশ খরচ বাবদ ২০,৮৩০,০০০ টাকা বরাদ্দ করিবার জন্য যে প্রস্তাব করেন, সেই উপলক্ষে গত কয়েক বৎসরের পুলিশ ব্যায়ের একটা হিসাব দাখিল করেন। ১৯২৯-৩০ সালে পুলিশ বিভাগের জন্য মোট খরচ হয় ২০,৯১৬,০০০ টাকা। ১৯৩০-৩১ সালে বিপ্লব আন্দোলন এবং আইন অমান্য আন্দোলন দমন করিবার জন্য অতিরিক্ত খরচ হয় ১,৪১৬,০০০ টাকা এবং উহা যথাক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৩১-৩২, ১৯৩২-৩৩, ১৯৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দে হয় ১,৫৩৯,০০০ টাকা, ২,০২৬,০০০ টাকা ও ২,১৮৩,০০০ টাকা। উহা ১৯৩৪-৩৫ সালের বাজেটে ধরা হইয়াছে ২,২১২,০০০, টাকা।

তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, অরাজকতা দমনের জন্য গোয়েন্দা পুলিশ বৃদ্ধি করিতে হইয়াছিল—

	কলিকাতা পুলিশ	বাংলা পুলিশ
১৯২৯ সাল	৮০	৭৭৯
১৯৩৩ সাল	২৪৫	৩,০২৮

সিং সিং—

সিং সিং নিউইয়র্কের মাঝে বৃহত্তম কয়েদখানা মোট আড়াই হাজার কয়েদী বাস করে ও তাদের বন্দী-

জীবনের মেয়াদ একত্রিত করিলে হয় বিশ হাজার বৎসর। মিঃ লুই ই, লয়েস আজ তের বৎসর যাবত এই বিশাল

মিঃ লুই, ই, লয়েস

জেলের ওয়ারডেন ; মানবতার আঁধারের চিত্র, পশুত্বের দিক্‌টা এখানে সুস্পষ্ট। খুন-চুরী-ডাকাতি, এমন কত জঘন্য পাপের জন্য এরা বন্দী। মানুষের এই বীভৎস ছবি মুক্তি পাইয়াছে সেখানকার এক ছায়া-শিল্পে। মানুষের ইহা অভিশাপ হইলেও তার স্বভাবে এ নিত্যকারের সত্য।

আর একদিক্‌—

মানুষের ব্যথা-বেদনায় ব্যথিত হৃদয় ডক্টর লেইড'ল ও মেজর ডানকান মিডলসেক্সের অন্তর্গত মিল হিলের নিকটবর্ত্তী একটি সবুজ ছায়াঘন নীরব পল্লীপ্রান্তে একখানি নগণ্য টাইলের ছাদওয়ালা ঘরের মাঝে সমস্ত জন-কোলাহল ও হুজুগ হইতে দূরে অজানায় দিবারাত্র মনুষ্য জীবনকে নিরাময় করিবার সাধনায় ব্যাপৃত। এই মহাপ্রাণ ব্যক্তিদ্বয় মুক্তি-ফৌজ দলের সভ্য ও নিষ্কাম নিঃস্বার্থ জগদ্ধিতায় উৎসর্গীকৃত। মানুষের অন্যতম প্রধান শত্রু ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ প্রতীকারের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য ডাক্তারদ্বয় আজ দীর্ঘদিন হইল গবেষণা করিতেছেন এবং আংশিক ভাবে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। তাঁদের এই একনিষ্ঠ সাধনা মানবতারই জয়গান।

লেইড'ল ও ডানকানের ইনফ্লুয়েঞ্জা নিবারণী গবেষণা-মন্দির

পৃথিবীকে বাসোপযোগী করিল কে ?

(পৌরাণিক গল্প)

দীর্ঘ নিদ্রার পর সৃষ্টিকর্ত্তা চাহিয়া দেখিলেন—সব একাকার। কেবল জল আর জল, আকাশ নাই, বাতাস নাই—জল, জল, জল। এ জল সরোবরের জল নয়, নদীর নয়, সমুদ্রের নয়, এ জল পৃথিবী-অন্তরীক্ষ ত্রিভুবন মগ্ন-করা কারণ-সলিল। প্রজাপতি ব্রহ্মা চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, আবার প্রজাসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা হইল। তিনি তখন আত্মচিন্তায় এই প্রলয় কারণ-সলিল উদ্ভিন্ন করিয়া লয়-প্রাপ্ত ধরণীকে পুনরুদ্ধৃত করার জন্য বিরাট্ বরাহ-রূপ ধারণ করিলেন। তারপর জলোচ্ছ্বাসের ভীম গর্জ্জন শ্রুত হইল। এই বিপুলকায় বরাহ-মূর্ত্তি জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন ও এক মুহূর্ত্তেই নিমজ্জিত ধরণীকে শুভ্র-দন্তমুখে সংলগ্ন করিয়া পুনরুত্থান করিলে অন্তরীক্ষ নীল কটাহে দেখা দিল—সমীরণ বহিল, দূরে দূরে মাল্যাকারে প্রফুল্ল অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল। কল কল রবে জলরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া অধোদিকে অপসারিত হইল। স্নিগ্ধ-শ্যাম-বিকশিত পদ্মলোচন নীল হিমাদ্রির ন্যায় এই বরাহ-মূর্ত্তি দেখিয়া জগতে জয়ধ্বনি উঠিল। বাংলার জয়দেবের কণ্ঠে এখনও তাহার প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

বসতি দশন শিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনীকলঙ্ক কলেবর নিমগ্না
কেশবধৃত শূকররূপ জয়জগদীশ হরে

কিন্তু দীর্ঘ দিন জলরাশির মধ্যে পৃথিবী অবস্থিত থাকায় গাত্র শৈবালাচ্ছাদিত ও কর্দ্দমরাশি লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অন্তরীক্ষে দিবাকর উঠিল, উনপঞ্চাশ পবন বহিতে আরম্ভ করিল, পর্জ্জন্য বারিবর্ষণ করিল। পৃথিবীর বুকে শ্যামল শ্রী মুঞ্জরিত হইল। বৃক্ষ-লতা-কুঞ্জে বিচিত্র নদনদী বিভূষিতা ধরণী আবার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিলেন; কিন্তু জীবসৃষ্টি হইল না। তাঁহার ভ্রূকুটী কটাক্ষ হইতে এক প্রচণ্ড রুদ্র অর্দ্ধ নারী-নর মূর্ত্তি আবির্ভূত হইলেন। প্রজাপতি এই পুরুষকে স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্বরূপে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন। আবার নূতন কল্প আরম্ভ হইল। ইহাকেই বলে শ্বেতবরাহ-কল্প। এই কল্পকাল ৪৩২ কোটী বৎসর। কত যুগ যুগ এই সৃষ্টিকাল অব্যাহত থাকিবে!
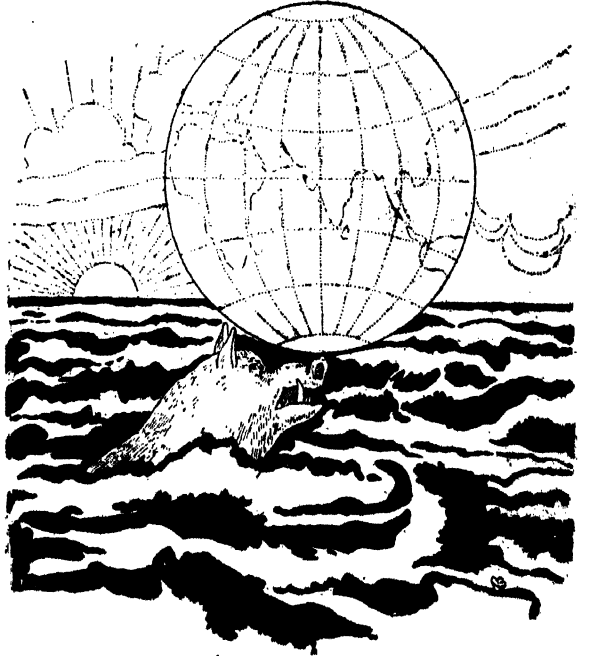
বরাহরূপী প্রজাপতি ব্রহ্মা লয়-প্রাপ্ত ধরণীকে পুনরুদ্ধার করিতেছেন

প্রজাপতি স্বয়ং মনু হইলেন—ইঁহারই নাম স্বয়ম্ভুব মনু। উত্তানপাদ তাঁহার পুত্র, তাঁহার পুত্র ধ্রুব, সৃষ্টি, রিপু, চাক্ষুস, মনু, উরু, অঙ্গ, ইঁহারা পর পর পুত্ররূপে জন্মিলেন।

অঙ্গের পুত্র বেন। এই সময়ে পৃথিবী অনেকখানি সুন্দর ও শ্যামল হইয়া উঠিয়াছে। অতিকায় জল ও বন্য-জন্তুগণ প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে—বৃক্ষলতাদি আর তত রমণীয় নহে, অনেকখানি কঠিন ও শ্যামমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। মানুষের মুখশ্রীও আর তেমন বিকট-দর্শন নয়।

এই বেনের পুত্রই পৃথু। পৃথু পিতার দক্ষিণ হস্ত হইতে সৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই মহামানবের জন্মদিনে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল। সমুদ্র, নদী সর্ব্ব-প্রকার রত্ন ও অভিষেকের জল লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ইনি নিখিল ধরণীর রাজা হইলেন। এই সময়ে বসুন্ধরা মানুষের বিনা প্রয়াসে, বিনা কর্ষণে অভীষ্ট ওষধি ফল-মূলাদি উৎপাদন করিতেন; ধেনুগণ বিনা দোহনে কামদুঘ ছিল, কমলদলে মধু পরিপূর্ণ থাকিত। কুশবৃক্ষ সুবর্ণকান্তি ধারণ করিয়াছিল, সুখাবহ হইয়াছিল। প্রজারা কুশের শয্যা রচনা করিয়া সুখে শয়ন করিত, কুশের চীর পরিধানে তাহাদের লজ্জা নিবারণ হইত। পৃথিবীতে নিরাহারে কেহই থাকিত না, বনে বনে অমৃতকল্প স্বাদু ও মৃদু ফল সকল অজস্র ফলিত। জগতে-জরা ব্যাধি ছিল না, নির্ভয় চিত্তে প্রজাগণ পত্রপুষ্পশোভিত বৃক্ষতলে পরিচ্ছন্ন গিরিগুহায় অবস্থান করিত।

নিখিল ধরণীর অধীশ্বর পৃথু যখন সমুদ্রযাত্রা করিতেন, অসীম জলরাশি স্তম্ভিত হইত; তাঁর গতির সম্মুখে দুর্ভেদ্য গিরিমালা দ্বিধা বিভক্ত হইত। পৃথিবীর লোক তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াই দেশ-দেশান্তরে যাইতে শিখিল।

সুখ-সম্পদের সঙ্গে প্রজাবৃদ্ধিও ঘটিল। পৃথিবীর অযাচিত দান তাহাদের অপ্রচুর বলিয়া মনে হইল। পৃথিবীও ক্রমে শস্যশূন্যা হইয়া পড়িলেন। বনবৃক্ষে ফলাভাব দেখা দিল, সম্রাটের নিকট অভিযোগ পৌঁছিল, প্রজারা জানাইল, আমাদের ইচ্ছামত পৃথিবী আর ফলমূল-ওষধি-শস্যাদি উৎপাদন করে না—আমাদের রক্ষা করুন।

পৃথু দেখিলেন—ধরাবক্ষ নিরন্তর শোষণে মরুভূমি-সদৃশ হইয়াছে—প্রজাগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে হাহাকার তুলিয়াছে, সকলের কণ্ঠে একই রব উঠিয়াছে—ধরিত্রী সকল ওষধি গ্রাস করিয়াছে, প্রজাকুল ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, হে প্রজাপালক মহারাজ পৃথু—আমাদের রক্ষা করুন!

ক্রোধাবিষ্ট পৃথুর ভয়ে পলায়নরতা গো-রূপা বসুন্ধরা

অনন্তর রাজা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া একান্ত নিরুপায়ের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট কলেবরে বসুধাকে বিদীর্ণ করার জন্য অস্ত্র উত্তোলন করিলে বসুন্ধরা প্রাণভয়ে গো-রূপ ধারণ করিয়া ব্রহ্মলোকে পলায়ন করিলেন। কিন্তু সেখানেও পৃথু হইতে পরিত্রাণ নাই দেখিয়া ত্রাসকম্পিত কলেবরে বলিলেন—"হে নৃপ, তুমি কি স্ত্রী-বধ করিবে?" পৃথু বলিলেন—"ওরে দুষ্টকারিণী! একজন নিধনপ্রাপ্ত হইলে অনেকের যদি প্রাণ রক্ষা হয় সেখানে সেই একেরই বধ পুণ্যপ্রদ।" পৃথিবী কহিলেন, "প্রজাদের উপকারই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়, তবে আমার নাশে তাহাদের আধার হইবে কে?" রাজা বলিলেন, "তুমি আমার শাসন-পরাঙ্মুখী, তোমাকে নিহত করিয়া আত্মযোগবলে এই সকল প্রজা ধারণ করিব।" কম্পিতাঙ্গী বসুধা কহিলেন—"উপায় অনুসারে কার্য্য না করিলে সর্ব্বত্রই ব্যর্থ হইতে হয়। আমাকে নিরন্তর শোষণ করিয়া তোমার প্রজাগণ আমায় জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। যদি ইচ্ছা হয় প্রজা-রক্ষার উপায় বলিতেছি শোন—আমার এই মরুবক্ষে তাহা হইলে আবার ক্ষীর, পরিণামিনী ওষধি উদ্ভূত

হইবে। আমাকে সর্ব্বত্র সম কর, বন্ধুর কঠিন মৃত্তিকান্তর বিদীর্ণ করিয়া সমতল ও প্রশস্ত ক্ষেত্র রচনা কর, পঙ্কিল অনুন্নত কর্দ্দম গহ্বরগুলিকে পরিপূর্ণ করিয়া তোল। বন-ওষধির বীজভূত ক্ষীর আমি সর্ব্বত্র ধারণ করিব। তোমার প্রজাদের আর কোন কালে ক্ষুৎপিপাসার কারণ থাকিবে না।"

মহামতি পৃথু প্রজাদের লইয়া ধনুষ্কোটীর দ্বারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শতসহস্র শৈল উৎসারিত করিয়া তাদের একত্র করিয়া রাখিলেন। পৃথিবীর শোভা তাহাতে অধিক বর্দ্ধিত হইল। যে সকল অসমতল ক্ষেত্রে ক্লেদময় সলিল বিষাক্ত বায়ু সৃষ্টি করিয়া প্রজাবর্গের স্বাস্থ্যক্ষয় করিত সেইগুলি সমুচ্চ মৃত্তিকাশৈল ছেদন করিয়া পূরণ করিলেন। বিষম পৃথিবী সর্ব্বপ্রথমে মহারাজ পৃথুর প্রচেষ্টায় আজিকার ন্যায় এমন সুন্দর ও সমান হইয়াছে। পৃথুর পূর্ব্বে গ্রামের প্রবিভাগ ছিল না, কেহ শস্য উৎপাদন করিতে জানিত না, গোরক্ষার ব্যবস্থা ছিল না— কৃষিবিদ্যা লোকের অজ্ঞাত ছিল, বণিক-পথও আবিষ্কৃত হয় নাই। পৃথু হইতেই এই সকল সম্ভব হইল।

পৃথিবী যে আজ সর্ব্ব জগতের ধাত্রী বিধাত্রী, ধারিণী ও পোষিণী, বসুন্ধরার আদিরাণী এই ভারত-ভূমির বেন-পুত্র পৃথুর তপস্যায় এমন শ্রী ও কল্যাণ-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন।

পৃথুর এই উত্তম জন্ম, কর্ম্ম ও প্রভাবের কথা নরলোকে চিরযুগ প্রথিত থাকিবে।

বর্ত্তমান হুগলী

(১)

কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, এম্, এল্, সি

[হুগলী জেলার পরিমাণ মোট ১:৮৮ বর্গ মাইল তন্মধ্যে ২৯ বর্গ মাইল ১০টী মিউনিসিপ্যালিটীর অধীন এবং তাহাতে মোট ২,৩৫০০০ লোক বাস করেন। বাকী ১:৫৯ বর্গ মাইল জেলা বোর্ডের অধীনে এবং তাহাতে মোট ৯,১০,৬০০ লোকের বাস। হুগলী জেলা তিনটী মহকুমায় বিভক্ত ; হুগলী, শ্রীরামপুর ও আরামবাগ। হুগলী মহকুমার পরিমাণ ৪২৯ বর্গ মাইল, থানা ৬টী, ইউনিয়ান বোর্ড ৪৯। অধিবাসী, হিন্দু ২,৬২,৪০০, মুসলমান ৬৬,৬০০, অপর ৫,২৪,৪০০। শ্রীরামপুর মহকুমা ৩২৯ বর্গ মাইল, থানা ৮টী, ইউনিয়ান বোর্ড ৩৭টী; অধিবাসী হিন্দু ৩,১৬,৩০০, মুসলমান ৮২,১০০, অপর ২,২০০, মোট ৫,০০,৬০০। আরামবাগ মহকুমার পরিমাণ ৪০১ বর্গ মাইল, থানা ৪, ইউনিয়ান বোর্ড ৪০, অধিবাসী, হিন্দু ২,৪৫,১০০, মুসলমান ৪১,৪০০, অপর ১৭০০, মোট ২,৮৮,২০০। মোট থানার সংখ্যা ১৮। ইউনিয়ান বোর্ডের সংখ্যা ১২৬, ইউনিয়ান বোর্ডগুলির অধীনে পল্লী-গ্রামের সংখ্যা ২,৬০০। অধিবাসী, হিন্দু ৯,২৩,৮০০, মুসলমান ১,৮০,১০০, অপর ৯,৩০০, মোট ১১,১৩,২০০। মিউনিসিপ্যালিটী দশটী যথা:—হুগলী-চুঁচূড়া (স্থাপিত ১৮৬৫)। অধিবাসী সংখ্যা ৩২,৬৩৪ ; আয় ১,৫০,৪৭৭৲। বাঁশবেড়িয়া (স্থাপিত ১৮৬৯), অধিবাসী ১৪,২২১, আয় ২৭৪১০৲ ; শ্রীরামপুর (স্থাপিত ১৮৬৫) অধিবাসী ৩০,০৫৬, আয় ১,৫৬,০৫৫৲ ; বৈদ্যবাটী (স্থাপিত ১৮৬৯), অধিবাসী ১৮,৪৮৬, আয় ৬৮,৮৬৫৲ ; চাঁপদানী (স্থাপিত ১৯১৭), অধিবাসী ২৫,৩৬৫, আয় ৪৭,১৭৯৲ ; ভদ্রেশ্বর (স্থাপিত ১৮৬৯), অধিবাসী ২২৯৯২, আয় ৬৭৮৪৩৲ ; রিষড়া-কোন্নগর (স্থাপিত ১৯১৫), অধিবাসী ২৬,৮৬৮, আয় ৫৯,৪৫৯৲ ; কোতরাং (স্থাপিত ১৮৬৯), অধিবাসী ৭,১৬০,

আয় ১৫,১৭০৲ ; উত্তরপাড়া (স্থাপিত ১৮৬৫), অধিবাসী ৯,৩৫০, আয় ৪৮,৬৩৩৲ ; আরামবাগ (স্থাপিত ১৮৮৬), ৭,৪৬১, আয় ১১,৮১৪৲। দশটী মিউনিসিপ্যালিটীর মোট আয় ৫,৯২,৯০৫৲ ; আর হুগলী জেলা বোর্ডের আয় ৪,০৯,০০০৲। জেলা বোর্ডের মোট শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যয় ৮০,৯০০৲ দশটী মিউনিসিপ্যালিটিতে শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যয় ২৮৬৭৯৲ অর্থাৎ সমগ্র জেলার শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যয় ১০৯,৫৭৯৲]
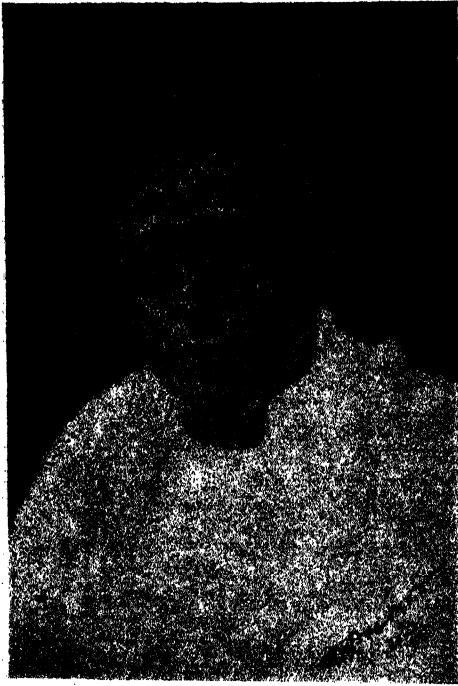
কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়

কালের প্রভাবে লোকের শিক্ষা দীক্ষা, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, মতিগতি, নিত্যনৈমিত্তিক জীবনযাত্রার প্রণালী সব ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে। রক্ষণশীল সমাজ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে সব রীতিনীতি, বহুকাল-সঞ্চিত সংস্কার আঁকড়াইয়াছিল, কালস্রোতে সে সব আপনা হইতে ভাসিয়া যাইতেছে, নব চেতনায় দেশ উদ্বুদ্ধ হইতেছে, নবভাবে সমাজ গড়িয়া উঠিতেছে। পুরাতনের সহিত সংযোগ ক্রমশঃই টুটিয়া যাইতেছে, নূতনের আবির্ভাবে পুরাতন বিলুপ্ত হইতেছে, তাহা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর বা অকল্যাণকর সে বিষয়ে আজ আলোচনা করিব না। এখন নূতন যে পথে চলিয়াছে তাহারই যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব। কি শিক্ষা-বিষয়ে, কি স্বাস্থ্য-সংরক্ষণে, কি সাধারণ জীবনে এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে, তাহার বিশদ পরিচয় দেওয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নহে। হুগলী জেলা বহুকালপূর্ব্ব হইতে জ্ঞান গৌরবে বাংলার শীর্ষস্থানীয় ছিল। এই জেলা একদিন স্বাস্থ্য, কৃষি ও শিল্পসম্পদে গরীয়ান্ ছিল। এখন নদ-নদী, খাল বিল শুখাইয়া গিয়া সব সম্পদই নষ্ট হইতে বসিয়াছে। দেশ ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা, যক্ষ্মা প্রভৃতি নিবারণশীল ব্যধিতে উজাড় হইতেছে—কৃষির অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আর শিল্প তো নাই বলিলেই চলে। এ সব কারণে লোকের অর্থনৈতিক দুরাবস্থার একশেষ ঘটিয়াছে। তাই এই জেলার স্বাস্থ্যোন্নতি কল্পে ম্যালেরিয়া-নিবারণ-সমিতি, দাতব্য-চিকিৎসালয়, হাঁসপাতাল, মাতৃসদন প্রভৃতির সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়াইবার চেষ্টা হইতেছে—কৃষির উন্নতি কল্পে কৃষি সমিতি, আদর্শ কৃষিক্ষেত্র ও কৃষিশিক্ষা বিদ্যালয় (ভূতনাথ কৃষি বিদ্যালয়) স্থাপিত হইয়াছে। শিল্পোন্নতি কল্পে শ্রমশিল্প সমিতি, টেকনিক্যাল স্কুল (মোবারলি টেক্‌নিক্যাল স্কুল), বস্ত্রবয়ন শিক্ষা দিবার স্কুল (শ্রীরামপুর উইভিং স্কুল) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তা ছাড়া পিতল কাঁসার তৈজসপত্র, চিনামাটীর বাসন, ছাতা তৈয়ারী প্রভৃতি অস্থায়ী ভাবে শিক্ষা দিবার জন্য demonstration partyর বন্দোবস্ত হইয়াছে। আর কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অর্থ-সংস্থান জন্য সমবায় ব্যাঙ্কও স্থানে স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যা-শিক্ষায় এখন সে কালের পাঠশালা বা চতুষ্পাঠীর প্রভাব নাই। এখন শিক্ষার ধারা পাল্টাইয়া গিয়াছে। বিজ্ঞান, দর্শন, রসায়ন, পদার্থ-বিদ্যা, উচ্চগণিত, ইতিহাস, তুলনামূলক ভাষাশিক্ষা, উচ্চাঙ্গের সাহিত্য প্রভৃতি শিক্ষার জন্য কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। এই জেলার মধ্যে চারিটী কলেজ আছে, তন্মধ্যে দুইটী প্রথম শ্রেণীর—হুগলী কলেজ ও শ্রীরামপুর কলেজ, আর দুইটী দ্বিতীয় শ্রেণীর—চন্দননগর ডুপ্লে কলেজ ও উত্তরপাড়া কলেজ। উচ্চ ইংরাজী

শিক্ষা দিবার জন্য তিনটী সরকারী স্কুল আছে—। কলেজিয়েট স্কুল, হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল ও উত্তরপাড়া গবর্ণমেণ্ট স্কুল। তা ছাড়া প্রতি বৰ্দ্ধিষ্ণু গ্রামেই বে-সরকারী উচ্চ বা মধ্য ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। মুসলমান ছাত্রের জন্য হুগলী কলেজ সংলগ্ন সরকারী মাদ্রাসা ও বহু মকৃতব স্থাপিত হইয়াছে। হুগলী জেলা বোর্ডের সাহায্য প্রাপ্ত মকৃতবের সংখ্যা ২০৭। তা ছাড়া হুগলীতে শিক্ষকের কার্য্য শিখিবার একটী সরকারী স্কুল আছে। নারী-জাতিকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিবার জন্য ও স্বাধীনতা দিবার জন্য কত সমাজসংস্কারক গগন-ভেদী বক্তৃতার রোলে দেশ কাঁপাইয়াছিলেন, আরও কতভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাহারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিয়া গিয়াছিল। কালের স্রোত কোন্ দিকে কখন কি ভাবে বহে বলা যায় না। দেখিতে দেখিতে যেন কোন্ ঐন্দ্র-জালিকের মোহন স্পর্শে অসূর্য্যম্পশ্যা অন্তঃপুর স্পন্দিত হইয়াছে—নবজাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে; যুগ যুগান্তরের অনড় অসাড় ভাব সহসা পরিহার করিয়া নারী জাগিয়া উঠিতেছে। অন্ধ যেমন সহসা চক্ষুষ্মান হইলে বাহ্য প্রকৃতির সহিত পরিচিত হইবার আশায় উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, সেইরূপ নারী-স্বাধীনতার গতি কিছুকাল উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল ভাব ধারণ করিবে, তাহাতে সন্ত্রস্ত হইবার কোন কারণ নাই। ক্রমে তাহা আপনা হইতে সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিবে। তবে নবভাবে শিক্ষা-দীক্ষার প্রবর্ত্তন দ্বারা তাহার অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে হইবে। যখন নারী শিক্ষা প্রথম অনুষ্ঠিত হয়, যখন কলিকাতায় মেয়েদের শিক্ষার জন্য বেথুন কলেজ স্থাপিত হয়, তখন রক্ষণশীল সমাজ তাহাতে কন্যা পাঠাইতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। যাঁহারা সমাজশাসন উপেক্ষা করিয়া প্রথম কন্যা পাঠাইয়াছিলেন, সমাজ তাঁহাদিগকে ঠেলিয়া রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। আর আজ সহর অঞ্চলে মেয়েদের জন্য বহু বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না, পুরুষদের জন্য স্থাপিত কলেজেও মেয়েদের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইতেছে—কালের স্রোত রোধিবে কে?

আমাদের জেলায় উত্তরপাড়া হিতকরী সভা প্রথমে অন্তঃপুরের গণ্ডীর মধ্যে মেয়েদের বিদ্যার্জ্জনে উৎসাহ দিবার ব্যবস্থা করেন। তারপর খৃষ্টান মিশনারীদের অনুকম্পায় স্থানে স্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় বটে; কিন্তু তাহাতে আশানুরূপ ফল লাভ হয় নাই। নারী জাগরণের পর হইতে তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থার
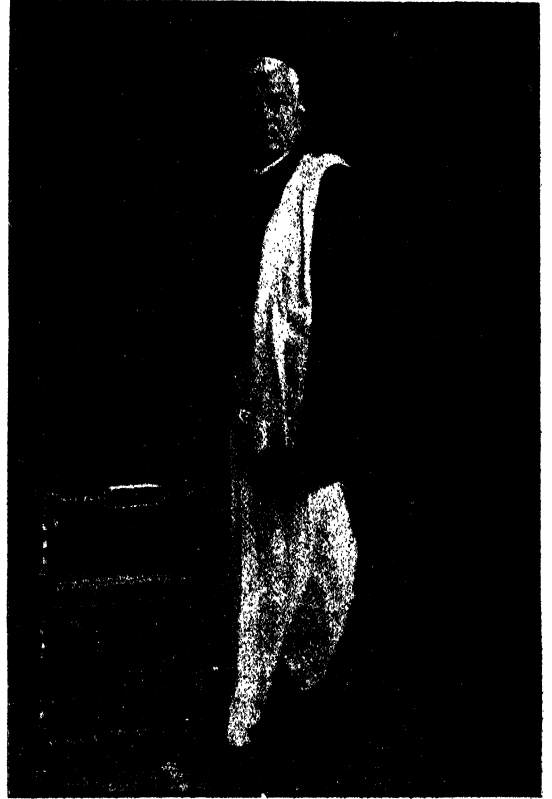
শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

জন্য চারিদিকেই প্রচেষ্টা চলিতেছে। এখন এ জেলার মধ্যে এমন বৰ্দ্ধিষ্ণু গ্রাম নাই, যেখানে মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই। তবে তাহার অধিকাংশ নিম্ন বা উচ্চ প্রাথমিক। হুগলী জেলা বোর্ডের অধীনে এরূপ স্কুলের সংখ্যা ১৩৯, আর ছাত্রী সংখ্যা ৬০০০। তা ছাড়া হুগলী জেলায় দশটী মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তবে সেগুলি উচ্চ বিদ্যালয় নহে। এখনও চুঁচুড়া সদরে বালিকা

বাণী-মন্দিরটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়। সমগ্র জেলার মধ্যে মেয়েদের জন্য মাত্র একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, সেটী হইতেছে চন্দননগর "কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষা-মন্দির।" শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু দানবীর হরিহর শেঠ মহাশয়ের বদান্যতায় এই স্কুলটী স্থাপিত। চন্দননগরে আর একটী নারীশিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে, সেটী হইতেছে 'প্রবর্ত্তক-নারী-মন্দির'। ইহার উদ্দেশ্য ও কার্য্য প্রণালীর অভিনবত্ব আছে। ইহারা

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু

ভারতীয় ভাব বজায় রাখিয়া মাতৃভাষা ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার দিকে একটু বেশী রকম নজর দিয়াছেন। তা ছাড়া ইহারা রন্ধন হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহস্থালীর সকল রকম কাজকর্ম্ম এবং কার্য্যকরী শিল্প-শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে ইহার যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা পরিস্ফুট করিবার জন্য এই বিদ্যালয়ের সম্পাদিকা মহাশয়ার কথা উদ্ধৃত করিতেছি—"নারী শক্তি ও প্রেমের মূর্ত্তি। ভারতের নারীশিক্ষা এই প্রেম ও শক্তির আদর্শ লক্ষ্যে রাখিয়া। যে বিদ্যা ও জ্ঞানের অনুশীলনে নারী তার এই বিশুদ্ধ ও কল্যাণময় স্বরূপটী চিনিতে ও উপলব্ধি করিতে পারে, যে ভাবে চরিত্র গড়িলে তাহাকে অধিকার-সাম্য লইয়া পুরুষের সহিত অনর্থক কলহ ও প্রতিযোগিতা করিতে হয় না, পরন্তু মিলন ও ঐক্যের রাগিণী উভয়েরই জীবনে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে, যে অপার্থিব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া নারী তাহার উৎসর্গ ও সেবার অবদানে সমাজ, সংসার ও জাতিকে উন্নত ও শ্রীসম্পন্ন করিয়া তুলে, সেই বিদ্যা ও জ্ঞান, শিক্ষা ও দীক্ষা, সেই জাগ্রত অনুপ্রেরণাই আমরা জীবনে বরণ করিয়া চলিয়াছি। শুধু লেখা-পড়া বা কারুশিল্প শিক্ষা করাই আমরা বড় কথা মনে করি নাই, নারীর যথার্থ মর্ম্ম ও মর্য্যাদা হৃদয়ঙ্গম করাই আমাদের আসল তপস্যা।"

শ্রীহরিহর শেঠ

শিক্ষার আদর্শ ও ধারা পাল্টাইয়া গেলেও শিক্ষাক্ষেত্রে হুগলী জেলার স্থান নিতান্ত নগণ্য নহে। তবে, সরকারের ঔদাসীন্যে, দারুণ অর্থাভাবে ও সাধারণের নিশ্চেষ্টতায় সকল রকম শিক্ষার উন্নতি, এমন কি প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের পথ সঙ্কুচিত থাকিয়া যাইতেছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দূরে থাকুক, অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প তাই জ্ঞানের প্রসার মন্থরগতিতে চলিয়াছে। হুগলী জেলা বোর্ডের সাহায্য-

প্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হইতেছে ৭২০ ও মক্তবের সংখ্যা ২০৭। তা ছাড়া মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মক্তব আছে। আর

শ্রীমতিলাল রায়

কৃষক এবং শ্রমিকদের জন্য নৈশ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। হুগলী জেলা বোর্ডের সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩২০০০ বালক এবং ছয় হাজার বালিকা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। জনসংখ্যার তুলনায় এত অল্প সংখ্যক বালক বালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা কখনই সন্তোষজনক বলা চলে না। শিক্ষা বাবদ মোট ব্যয় হয় ৮০,০০০৲ তন্মধ্যে উচ্চ ও নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ব্যয় হয় ৪৯,৯০০৲ আর বাকী ৩১,০০০৲ মধ্যে বিভিন্ন অবৈতনিক বিদ্যালয়ের জন্য ১১,৪০০৲, মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় সমূহে সাহায্য ১১,৬০০৲, সংস্কৃত টোলের সাহায্য ২২০০৲, কৃষি ও টেকনিক্যাল বিদ্যালয়ে ২৮০০৲, বাণী-ভবন, কালা ও বোবার স্কুল ও তাঁত স্কুলের বৃত্তি ৯০০৲ টাকা বরাদ্দ আছে। নয় লক্ষাধিক লোকের শিক্ষাকল্পে অর্দ্ধলক্ষ টাকা ব্যয় যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। জেলা বোর্ডের নির্দ্দিষ্ট আয় মধ্যে অনেক কাজই করিতে হয় সুতরাং শিক্ষার জন্য ইহার অধিক ব্যয় বোর্ডের পক্ষে সম্ভবপর নয়। আর সরকার প্রাথমিক-বিদ্যা সংক্রান্ত আইন পাশ করিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন, তাহার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

ছেলেদের দৈহিক উন্নতি কল্পে প্রায় প্রতি গ্রামেই নানারূপ ব্যয়াম ও ক্রীড়ার ব্যবস্থা হইয়াছে, তন্মধ্যে ফুটবলের প্রাধান্যই চলিতেছে। Inter-School sports ও ফুটবল ম্যাচ্ জনপ্রিয় হইয়াছে। চুঁচুড়া ফিজিক্যাল ইনষ্টিটিউট, হুগলী সেন্ট্রাল এসোসিয়েসনের সন্তরণ, ভ্রমণ ও সাইকেল প্রতিযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সঙ্গীতচর্চ্চা, সখের থিয়েটার, ড্রামাটিক

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

ক্লাব এইরূপ একটা না একটা প্রতিষ্ঠান প্রত্যেক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামেই দেখিতে পাওয়া যায়। চুঁচুড়ার শিল্পী শ্রীযুত মহাদেব মণ্ডল প্রভৃতির প্রচেষ্টায় কলা-বিদ্যা শিক্ষার জন্য একটী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতি বর্ষে তাঁহাদের একটী প্রদর্শনী হইয়া থাকে; তাহাতে জেলার

শিল্পীগণ তাঁহাদের অঙ্কিত চিত্র ও মূর্ত্তি প্রদর্শনের সুযোগ পাইয়া থাকেন।

নানা কারণে হুগলী জেলায় চুরি ডাকাতি বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাদের শাসনে আনিতে সরকার যে পুলিশের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা পর্য্যাপ্ত না হওয়ায়, এখন বহু গ্রামে আত্মরক্ষা কল্পে যুবকগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া Defence Party সংগঠন করিয়াছেন। আমার বাসগ্রাম বাঁশবেড়িয়ায় যে Defence Party আছে, তাঁহারা প্রত্যহ রাত্রি ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত গ্রাম-প্রহরায় নিযুক্ত থাকেন, নিজেরা বিনিদ্র থাকিয়া প্রতিবেশীর সুনিদ্রার ব্যাঘাত না ঘটে তাহার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইঁহাদের কার্য্যকারিতায় চুরিডাকাতি একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন যে কাল পড়িয়াছে, তাহাতে আমাদের আত্মরক্ষার জন্য স্বাবলম্বী না হইলে গত্যন্তর নাই।

হুগলী জেলা বহু মনীষীর জন্মস্থান—জ্ঞানগৌরবে চিরকাল গরীয়ান্। বর্ত্তমান সময়েও এই জেলার বহু সুসন্তান নানা বিভাগে শীর্ষস্থানীয়। তাঁহাদের মধ্যে কাহাকে ফেলিয়া কাহার নাম করিব? এই প্রবন্ধে ২।৪ জনের উল্লেখ করিব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইসচ্যান্সালার, খ্যাতনামা এটর্ণি স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ভারতের প্রতিনিধিরূপে জেনেভার লীগ্-অফ্ নেশান্সের এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় দৌত্যকার্য্যে অশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া হুগলী জেলার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের প্রতিনিধিরূপে সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ভারতের ন্যায্য দাবী সংরক্ষণের জন্য বিপুল প্রচেষ্টার দ্বারা তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীর হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় দুর্নীতি-মূলক ব্যবসা নিরোধ আইন পাশ করাইয়া তিনি দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, এহেন সুসন্তানের কৃতিত্বে হুগলী জেলার মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। রাধানগরে রাজা রামমোহন স্মৃতি-সৌধের অদূরে যতীন বাবু তাঁহার পৈত্রিক বাসভবনে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার নেতৃত্বে তাঁহার বাসগ্রাম ও তাহার

কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষা-মন্দির—চন্দননগর

আশে পাশে থানাকুল, কৃষ্ণনগর, রঘুনাথপুর প্রভৃতি গ্রামে বহু সদানুষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। লেখক সম্প্রতি ঐ সকল স্থানে গিয়া তাহা সচক্ষে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন।

চন্দননগর "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের" প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুত মতিলাল রায় মহাশয়ের কীর্ত্তি-কলাপ হুগলী জেলার আদর্শস্থানীয়। অধ্যাত্ম-চেতনা জাগাইয়া তোলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রত্যেককে স্বাবলম্বী করিতে চান। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের ইহাই বিশিষ্টতা। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত যোগ ও ব্রহ্মবিদ্যা-মন্দির, বিদ্যার্থি-ভবন, নারীশিক্ষা-মন্দির, নানাস্থানে মনে স্বতঃই একটা স্পন্দন আনিয়া দেয়। প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া তিনি আধুনিকের সহিত সংযোগ রাখিতে চান; তাই প্রতি বর্ষে তিনি হিন্দুধর্ম্ম-সম্মেলন আহ্বান করিয়া দেশে ধর্ম্মভাব সজাগ রাখিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তাঁহার শিক্ষা ও দীক্ষাগুণে আদর্শ, ত্যাগী, জিতেন্দ্রিয় ও স্বাবলম্বী সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতেছে। মতিবাবু যে কার্য্যে হাত দিয়াছেন তাহাই জীবন্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, ইহা কম গৌরবের কথা নহে। তাঁহার গৌরবে হুগলী জেলা গৌরবান্বিত।
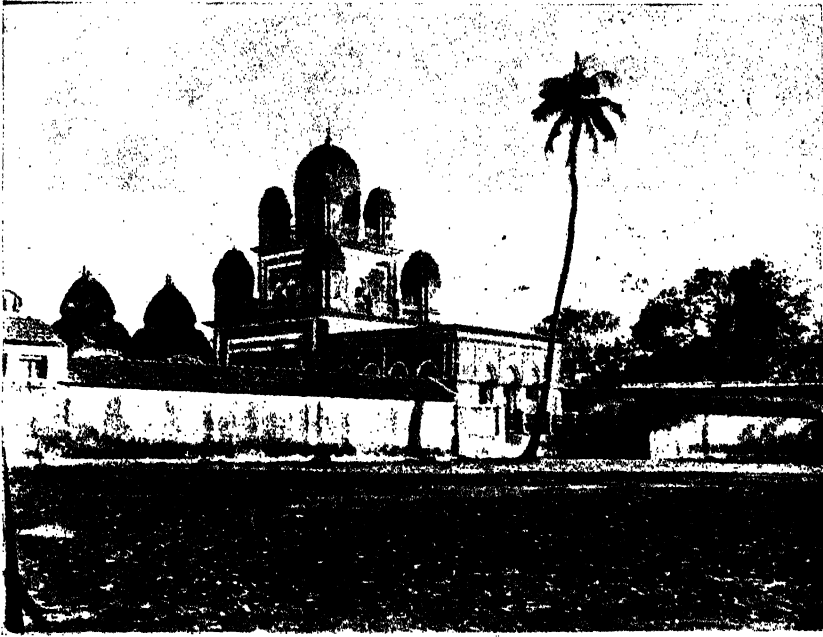
প্রবর্ত্তক যোগ ও ব্রহ্মবিদ্যা-মন্দির—চন্দননগর

প্রবর্ত্তক আশ্রম, প্রবর্ত্তক গ্রন্থাগার, অক্ষয়তৃতীয়া মেলা ও প্রদর্শনী, সুপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্র 'প্রবর্ত্তক', প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক ও জীবনবীমা, কৃষিক্ষেত্র, খাদি ও আসবাবের কারখানা প্রভৃতি তাঁহার কর্ম্মকুশলতার পরিচায়ক। ধর্ম্ম ও কর্ম্মের অপূর্ব্ব সংযোগ দ্বারা এতগুলি অভিনব প্রতিষ্ঠান তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন। তিনি কেবল "প্রবর্ত্তক" সম্পাদন করিয়া নিশ্চিন্ত নহেন, পাক্ষিক 'নবসঙ্ঘ'ও সম্পাদন করিয়া থাকেন, তা ছাড়া ধর্ম্মগ্রন্থ, উপন্যাস ও নাটক প্রভৃতি রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁহার ওজস্বিনী ভাষা পাঠকের

বাংলায় সাহিত্যক্ষেত্রে যে সকল মনীষী যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আর দুই জনের উল্লেখ করিয়া এবারকার প্রবন্ধ শেষ করিব। দেশবরেণ্য কথাশিল্পী সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই জেলাস্থ দেবানন্দপুরে জন্মগ্রহণ করিয়া জেলার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহার লেখনীর মোহন স্পর্শে বঙ্গবাসীর সুপ্ত প্রাণবৃত্তি উদ্বুদ্ধ হইয়াছে ও মূর্চ্ছিতপ্রায় অন্তঃকরণে অনুভূতির চেতনা আনিয়াছে। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া তিনি চিনিয়াছেন ও ভালবাসিয়াছেন মানুষকে।

কোথায় তাহার বেদনা, কোথায় তাহার আনন্দ—কিছু তাঁহার কাছে অপ্রকাশ নাই। সংসার যাহাকে দিয়াছে শুধু লাঞ্ছনা ও ধিক্কার তাহার ভিতরে তিনি মানুষের প্রাণের ঠাকুরের আবির্ভাব দেখিয়াছেন। বঙ্গভারতীর যে মণিময় হর্ম্ম্য তিনি রচনা করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটী ইষ্টক দেশের মৃত্তিকায় নির্ম্মিত, বিদেশের মুখ চাহিয়া তিনি লেখনী চালনা করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন দেশ-বাসীর প্রতি প্রাণের টানে, তাঁহার লেখার ছত্রে ছত্রে ফুটিয়াছে দেশবাসীর প্রতি গভীর সমবেদনা।

সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীমতী অনুরূপা দেবী সাহিত্য-ক্ষেত্রে সম্রাজ্ঞীর আসন অধিকার করিয়াছেন। শ্রীমতী অনুরূপা হুগলী জেলার গৌরব স্বর্গীয় মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্রী এবং পাটনার সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট স্বর্গীয় মুকুন্দ দেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা। বাল্যে অনুরূপার শিক্ষাদীক্ষা হইয়াছিল ভূদেববাবুর নিকট। কেবল উপন্যাস রচনায় অনুরূপা সিদ্ধহস্ত নহেন, বঙ্গভাষায় তাঁহার অসামান্য অধিকার এবং শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য আছে। নাটকাকারে পরিণত করিয়া কলিকাতার বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চে তাঁহার কয়েকখানি উপন্যাস দীর্ঘকাল ধরিয়া সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইতেছে—দিনের পর দিন অভিনয় চলিয়াছে, তবুও দর্শকের আগ্রহ কমে নাই, ইহা কম গৌরবের কথা নহে। বিহারের বিগত ভূকম্পে তিনি আহত হইয়া চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন, ভগবান তাঁহাকে নিরাময় ও দীর্ঘায়ু করুন। হুগলী জেলা এ হেন মহীয়সী কন্যার নিকট এখনও অনেক আশা করিয়া থাকে।

প্রবর্ত্তক নারী-শিক্ষা-মন্দির—চন্দননগর

— সমালোচনা —

আর্য্যভূমি—শ্রীআশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—সারস্বত লাইব্রেরী ও শ্রীরাইমোহন বন্দোপাধ্যায়, প্রকাশকের নিকট। ১৯০ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা মাত্র।

আঠারটি অমিশ্র ও বিশুদ্ধ ভারতীয় সনাতন ভাব-অর্ঘ্য সমন্বিত এই অনবদ্য ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থখানি দরদীর মর্ম্মস্পর্শ করিবে। আজিকার ভাষার মৃদুগুঞ্জন, বসন্তের সবুজ শোভা ও পাপিয়ার কলতান মুখরিত লঘুচিত্তের ক্ষণিক উত্তেজনাকরী হাল্‌কা কবিতার প্লাবন-যুগে গ্রন্থকারের এ দুঃসাহস অর্থকরী না হইলেও মহনীয়। যে মূল্য ধার্য্য হইয়াছে তাহাতে পুস্তকখানির অঙ্গসৌষ্ঠব বেশ আধুনিকী করা যাইতে পারিত বলিয়াই মনে হয়।

নাবিক সিন্ধবাদ—শ্রীমনোরম গুহঠাকুরতা প্রণীত। মূল্য দশ আনা।

দেশ-বিদেশের গল্প—শ্রীবিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীমনোরম গুহঠাকুরতা প্রণীত। মূল্য দশ আনা।

সোনার ঝরণা—শ্রীসদাশিব বন্দোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ছয় আনা। ঢাকা, সন্তোষ লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত।

তিনখানি বই-ই ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ্যে রচিত। রচনা সার্থক হইয়াছে। যথেষ্ট ছবি থাকায় শিশুদের আরও মনোজ্ঞ হইবে। 'দেশ-বিদেশের গল্পে' গল্পচ্ছলে নানা দেশের পরিচয় শিশু মনের নিকট ধরিবার সার্থক প্রচেষ্টা হইয়াছে। 'সোনার ঝরণা' পবিত্র নীতিমূলক। 'নাবিক সিন্ধবাদ' পরিচিত উপকথা হইলেও শ্রীযুক্ত গুহ ঠাকুরতার বর্ণনার সহজ মাধুরী ইহাকে অভিনব আকার দান করিয়াছে। গ্রন্থত্রয়ের কাগজ, ছাপা, বাঁধাই মনোরম।

গাজী আবদুল করিম—সালামত্‌ আলী প্রণীত, মূল্য গ্রাহক পক্ষে ।৵০, অপরের পক্ষে ॥৵০

খেলাফত সিরিজের দুই নম্বর বই। সুদূর আফ্রিকার পশ্চিম প্রান্তের অবিদিতপ্রায় রীফের পরিত্রাতা গাজী আবদুল করিমের নিঃসহায় স্বাধীনতা-সংগ্রামের করুণাময় পরিচয় বইখানিতে দেওয়া হইয়াছে। পরাধীনতার যে ব্যথা তার স্পর্শ ইহাতে কিছু মিলে। কাগজ ও ছাপার তুলনায় 'অপরের পক্ষে দাম দশ আনা' অধিক বলিয়া মনে হয়।

মুক্তি-মন্ত্রে মুস্‌লিম নারী—মোহাম্মদ মোদাব্বের কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। ১৪ নং কড়েয়া রোড, কলিকাতা, দাম বারো আনা।

বাংলা ভাষায় তুরস্ক, পারস্য, ইরাক, আফগান ও মিশরের আধুনিক নারীদিগের সংক্ষিপ্ত জাগরণের বিবরণ প্রকাশ করিয়া মৌঃ মোহাম্মদ মোদাব্বের সাহেবের বাংলার মুসলিম বিশেষ করিয়া অবরুদ্ধ মুস্‌লিম নারী-সমাজের অনড়-আড়ষ্ট ও বহির্জগতের যুগ-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন আঁধার চিত্তের উপর আলোকপাত করিবার এ প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। রুদ্ধদ্বার মুস্‌লিম-নারীর মন যে কতখানি জাগরণ-পিয়াসী তা সুলেখিকা মিসেস আর, এস হোসেনের লিখিত ভূমিকায় স্পষ্ট প্রতিধ্বনিত। কামনা করি, লেখকের উদ্দেশ্য সার্থক হোক। ছবিগুলি গ্রন্থের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। কাগজ, বাঁধাই ভাল।

রাজা রামমোহন রায়—২৫৩ নং বালিগঞ্জ এভিনিউ, কালীঘাট হইতে শ্রীগিরিজাকান্ত রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

রাজার জীবনচরিতের খসড়া—৪৭ পৃষ্ঠার মধ্যে প্রায় সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ের চুম্বক সন্নিবেশিত হইয়াছে।

কলিকাতা সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম বার্ষিক বিবরণী—তালতলা পাব্‌লিক্‌ লাইব্রেরী ১২, নিয়োগী পুকুর লেন, কলিকাতা।

১৯৩৩ সালে তালতলা পাবলিক্‌ লাইব্রেরী কর্ত্তৃক কলিকাতা সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই পুস্তিকায় উহারই বিভিন্ন শাখার অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধগুলির মাঝে বিশিষ্ট কয়েকটির পুনর্মুদ্রণ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যি

বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতির চিন্তাশীল প্রবন্ধে যে মনের খোরাক আছে, তাহা সম্মেলনের সঙ্গেই নিঃশেষিত হইতে না দিয়া পুস্তকাকারে সন্নিবদ্ধ করিয়া লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষগণ বুদ্ধিমানেরই কাজ করিয়াছেন। ১৯৩২-৩৩ সালের লাইব্রেরীর কার্য্য-বিবরণী ও উহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ইহার পরিশিষ্টে আছে। শিশু-সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা তালতলা সাধারণ গ্রন্থাগারের বৈশিষ্ট্য।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট— (ষষ্ঠ স্বাস্থ্য-সংখ্যা) সম্পাদক—শ্রীঅমল হোম, প্রকাশক—আর মল্লিক, ৫নং স্থরেন্দ্রনাথ বানার্জ্জি রোড, কলিকাতা। দাম চারি আনা মাত্র।

গেজেটখানির প্রথম দর্শনেই দেয় আঁখির তৃপ্তি। প্রচ্ছদপটের ছবিখানিতেই সারা পুস্তকের উদ্দেশ্য সুপরিস্ফুট—সাংসারিক জীবনের সকল আনন্দ-কেন্দ্র কোথায় তাহারই নিখুঁত নির্দ্দেশ। পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় মিলিবে বুদ্ধির ভাবিবার বিষয়, মনের খোরাক, চিত্তের উল্লাস, স্বাস্থ্য-সুখে সুখী হইবার অব্যর্থ নির্দ্দেশ। মানুষের এই আজগুবি দেহ-যন্ত্রের (Human Factory) ছবি দেখিয়া অতি সাধারণ লোকও সহজেই বুঝিবে তার আভ্যন্তরিক রহস্য। কাগজ-ছাপা-বাঁধাই—সবই মনোরম। এমন সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর পুস্তকখানির দাম মাত্র চারি আনা; কারণ এর পশ্চাতে আছে জাতির বিগত স্বাস্থ্য-সম্পদ্ ফিরাইয়া আনিবারই একটা নিগূঢ় প্রেরণা। ইহা ইংরাজীতে লেখা বলিয়া দুঃখ হয়, যাদের উদ্দেশ্যে ইহা লেখা বা লিখিত হওয়া উচিত তারাই ইহার কিছু বুঝিবে না। গেজেটখানির সুষ্ঠু সম্পাদনার জন্য সম্পাদক অমলবাবু ধন্যবাদার্হ।

শোকাঞ্জলী

স্বর্গীয় কুমুদ নাথ চৌধুরী-

কুমুদনাথের আকস্মিক শোচনীয় মৃত্যু মর্ম্মন্তুদ। নিয়তির এমনি [illegible] যিনি আজীবন শতাধিক ব্যাঘ্র হত্যা করিয়াছেন, খেলার মত কত হিংস্রজন্তু শিকার করিয়াছেন, তিনি অবশেষে নিঃসহায় নির্ব্বান্ধব সুদূর কালাহাণ্ডি ষ্টেটের এক নিবিড় জঙ্গলের মাঝে শিকারের দ্বারায়ই নিহত হইলেন। এ দুঃসংবাদ বাঙ্গালাকে মর্ম্মাহত করিয়াছে। শিকারী হিসাবে তাঁর স্থান ছিল বাংলায় অদ্বিতীয়—সহসা এ শূন্যস্থান পরিপূর্ণ হইবার নয়। 'ঝিলে জঙ্গলে' প্রভৃতি বিভিন্ন শিকার বিষয়ক পুস্তক তাঁরই রচিত।

পাবনা জিলার হরিপুর গ্রামে কুমুদনাথের বাড়ী ছিল। স্বর্গীয় দুর্গাদাস চৌধুরী বনগাঁওয়ে ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট থাকাকালীন সেখানেই ১৮৬৫ সালে তাঁর জন্ম হয়। শিশুকাল হইতেই তিনি শিকারপ্রিয় ছিলেন। তিনি ছিলেন সুপুরুষ ও মিষ্টভাষী। একধারে যেমনি ছিল আভিজাত্যেরও চূড়ান্ত তেমনি সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে মেলা-মেশায়, অমায়িকতায়ও ছিলেন সকলেরই একজন। কুমুদনাথের মৃত্যুতে তাঁর প্রজারা সত্যই অভিভাবকশূন্য হইল। তাঁর স্বদেশের স্কুল, হাঁসপাতাল প্রভৃতি হিতকরী প্রতিষ্ঠানগুলি অনেকাংশেই তাঁর নীরবদানে পরিপুষ্ট।

শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ ও আত্মীয় স্বজনদিগকে আমাদের অন্তরের সহানুভূতি ও সান্ত্বনা জ্ঞাপন করিতেছি। পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

— মত ও পথ —

— ধর্ম্ম —

দুর্ভাগ্য ভারতের হিন্দুধর্ম্মী যারা তাদেরই; কেননা হিন্দুধর্ম্মীর মধ্যে এমন কয়েকজন জীব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যাঁহাদের ধারণা ধর্ম্মবস্তুটা ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এই হেতু ইহার রক্ষার ভার ব্যক্তিবিশেষের। এরূপ হইলে যাহা ঘটিবার হিন্দুধর্ম্মে তাহাই ঘটিতেছে। অর্থাৎ ব্যক্তির ধর্ম্ম যদি জাতি-ধর্ম্মের সম্মুখে দাঁড়ায় তাহা হইলে 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম' সম্পত্তি-রূপ এই ব্যক্তির ধর্ম্ম লয় পাইয়া যায়।

যে খৃষ্টান তাহার ধর্ম্ম আছে। খৃষ্টধর্ম্ম ব্যক্তি-বিশেষের সম্পদ নহে, একটা জাতির সম্পদ। সে সম্পদ রক্ষা করিবার জন্য ব্যক্তির দায়িত্বের সঙ্গে নিখিল জাতির দায়িত্ব সংজড়িত এবং ইস্‌লাম ধর্ম্মের তো কথাই নাই। তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস কোন অংশে কোথাও ক্ষুণ্ণ হইলে তাতার, তুর্ক, আরব হইতে চীন, জাপান ঘুরিয়া স্পেনের মুসলমান জাতি পর্য্যন্ত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। অতএব হিন্দুর ধর্ম্ম ব্যক্তিগত যদি হয় তার অবস্থা 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা'! জগতে জাতি বলিয়া যাহাদের খ্যাতি, ধর্ম্মই তাহাদের কেন্দ্রশক্তি। এই ধর্ম্মের পতাকা ধারণ করিয়া তাহারা যে অখণ্ড সাম্রাজ্যস্থাপনের প্রয়াস করে, সেই এক ধর্ম্মরাজ্যপাশে "বিচ্ছিন্ন" বিভক্ত, ধর্ম্মবিভাগ-গুলিকে নিশ্চিহ্ন করিয়া তাহাদেরই ধর্ম্মপাশে সকল ধর্ম্মকে একত্র করারই ইহা প্রেরণা।

যাঁহারা বলেন ধর্ম্ম ব্যক্তিগত সম্পদ্‌, তাঁহারা ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কোনদিন যে কোন অনুশীলনই করেন নাই, ইহা তাঁহাদের যুক্তি ও লেখনীতে সুস্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পায়। অনেকেই দৃষ্টান্তস্বরূপ এই কথার উল্লেখ করেন যে, রুশ ও জাপান ধর্ম্মকে কেন্দ্র না করিয়াই জগতে বেশ সুখের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা রুশ-জাতির ইতিহাস জানেন এবং বর্ত্তমান রুশের খবর রাখেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে এই কথাই বলিতেছেন যে, রুশের রাষ্ট্রবিপ্লবের যুগে ধর্ম্মকে তাহাদের পশ্চাতে ফেলিয়া আগাইতে হইয়াছিল বটে; কিন্তু রাজ্যশাসন-ব্যবস্থা সুশৃঙ্খলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় তাহাদের চিরযুগের ধর্ম্মতত্ত্ব জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। একজন ইংরাজ রাশিয়ার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন—

"Indeed their five and ten years plan all as much directed to making Russia self-sufficient, in time of war as to improving her life, in time of peace. Yet all the time the accepted religion of Europe and America (christianity is still the religion of the Russian people whatever the Soviet may say) confidently assert that there is a solution."

ধর্ম্ম যে ব্যক্তির সম্পদ নহে পরন্তু জাতির, একথা হিন্দু-ব্যতীত অপর সকল ধর্ম্মী একবাক্যে স্বীকার করিবে। ইংরাজ-খৃষ্টানের কথাটা এই স্থানে উল্লেখযোগ্য—

"The assertion of christianity is that human nature can be altogether changed so that the flow shall disappear and the whole race of mankind attain a consciousness of itself similar to that which appears to animate a flight of birds in formation, but an awareness of one's neighbour which is also a realisation of God and a divine order. It would appear certain that either the human race will destroy itself or else that the christians hope which is also the hope of other releglons, will be fulfilled."

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" হিন্দু যত ক্লীব ও পঙ্গু হইয়া পড়িবে, তাহার কণ্ঠে ততই ধর্ম্মবস্তু নগণ্য বোধ হইবে, ইহা বিচিত্র কথা নহে।

জাপানের ধর্ম্ম যে ব্যক্তিগত নহে, তাহাও বলি। দূর হইতে এইরূপ মনে হওয়া মানুষের খুবই স্বাভাবিক। ১৯২৩ খৃঃ James H. Cousins নব্য-জাপান সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে এখনও Japan may be roughly divided religiously as half Shintoist and half Buddhist." ইহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, জাপানে প্রাচীন শিন্টো-ধর্ম্ম, চীন হইতে সমাগত কনফুসিয়াসের ধর্ম্ম এই উভয় হইতেই ভারতের বৌদ্ধধর্ম্ম যে বিশিষ্ট স্থান করিয়া লইয়াছে, তাহাতে জাপানকে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের কেন্দ্র-তীর্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

জাপানের বর্ত্তমান লোকসংখ্যা ৫৯,০০০,০০০। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে জাপানের Census report-এ দেখা যায় জাপানে ৪৬,০০০,০০০ লোক বৌদ্ধধর্ম্মী, বাকী ৩০ লক্ষ লোক অন্যান্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া আছে। খৃষ্টানের সংখ্যা ২ লক্ষ ২০ হাজার, টাও ইস্‌লামধর্ম্মী প্রভৃতি অবশিষ্ট সংখ্যার অন্তর্গত। এইরূপ হইলে জাপানে ধর্ম্ম ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া অনুমান করা কতখানি সঙ্গত তাহা সুধীবর্গ বিচার করিবেন।

জাপানে ধর্ম্ম জাতিগত বলিয়াই ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জাপানের প্রাচীন শিন্টোচার ধর্ম্মের সহিত 'টাও' খৃষ্টান, বৌদ্ধ, কনফুসিয়াস্ প্রভৃতি ধর্ম্মের যে সংঘর্ষের ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা যেমনই ভয়ঙ্কর, তেমনি রক্তরঞ্জিত, বীভৎস। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের পর জাপানে যাহাতে সর্ব্বধর্ম্ম অবাধে স্থান পাইতে পারে এইরূপ রাষ্ট্রবিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহারই ফলে বর্ত্তমান জাপানে ধর্ম্মবিরোধের কারণ ঘটে না, ঘটিবার কারণও দেখা যায় না। ভারতে যদি ৩৫ কোটী লোকসংখ্যার মধ্যে ৩৪ কোটী ৬০ লক্ষ লোক হিন্দু হইত, আর সেই হিন্দু-ভারত সর্ব্বধর্ম্ম আশ্রয় দেওয়ার ঔদার্য্য প্রকাশ করিত, তাহাতে হিন্দু-ভারতের কিছু আসিয়া যাইত না। জাপানের এই অবস্থা নহে কি? দৃষ্টান্তস্বরূপ যাঁহারা ধর্ম্ম ও ভগবানকে দেশের ও জাতির সম্পদ বলিয়া গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা পাঠকবর্গের চক্ষে ঝাপসা মারিয়া বলেন—জাপান-পরিবারের স্বামী খৃষ্টান, পত্নী শিন্টো হইলেও পারিবারিকজীবনে কোনরূপ অশান্তি দেখা যায় না। রাষ্ট্রবিধান অনুকূল হইলে এমন ঘটনা ক্ষেত্রবিশেষে সম্ভব হওয়া কিছু নূতন কথা নহে। ভারতের রাষ্ট্রবিধানে অসবর্ণ বিবাহ অবাধ হইয়াছে, এদেশে তাই ইহার সম্ভাবনাও ঘটিয়াছে। জাপানেও সেইরূপ বিভিন্ন ধর্ম্মীর মধ্যে আদানপ্রদানে আপত্তি রাষ্ট্রশক্তি তুলিয়া লওয়ায় ইহার সম্ভাবনা ঐ ক্ষেত্রে কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হয়। যে দেশে ৫ কোটী ৯০ লক্ষ প্রজার মধ্যে ৪ কোটী ৬০ লক্ষ বৌদ্ধ সে দেশে উক্তরূপ ঘটনা কত বিরল, তাহা সহজেই অনুমেয়। আমাদের দেশেও মহাত্মা গান্ধীর প্রিয়শিষ্য কেলাপ্পন একজন খৃষ্টান নারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, তাই বলিয়া এসব ঘটনা নিত্য ঘটিতেছে বলা নিজেদের মত জাহির করারই জবরদস্তি বলিয়াই মনে হয়। বাংলা দেশেই এমন প্রসিদ্ধ নেতৃপুরুষের নাম করিতে পারা যায়, যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মী হইয়াও খৃষ্টান পত্নী গ্রহণ করিয়াছেন।

দুঃখের বিষয় বীর্য্যহীন জাতি আজ ধর্ম্ম লইয়া প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা স্যার সিকান্দার হায়াৎ খাঁ 'ঈদের' দিন আত্মধর্ম্মকে কতখানি অকপটচিত্তে রক্ষা করিতেছেন, তাহা তাঁহার মস্‌জিদে উপস্থিত হইয়া ইস্‌লামধর্ম্মীদের বুকে তুলিয়া লওয়ায় প্রমাণিত হয়। ব্যক্তিগত ধর্ম্ম হইলে তাঁহার স্বজাতিদের সংস্রবে মস্‌জিদে যাওয়ার প্রয়োজন হইত না।

উপসংহারে বক্তব্য, মানুষ বাঁচে মাটী খাইয়া নহে, তার অন্তরে অমৃতের উৎস ঝরে বলিয়াই সে আপনাকে 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' বলিয়া ঘোষণা করে। ধর্ম্মই অমৃতস্বরূপ; অতএব কালবশে দেশ ও জাতির আচার ব্যবহার-পার্থক্যে ধর্ম্মের নামভেদ স্বাভাবিক, কিন্তু ধর্ম্মবিশ্বাস যেদিন মানবজাতিকে অগ্নিমূর্ত্তি দিবে, সেদিন আমরা মানুষজাতির মধ্যে একই সত্যকে মূর্ত্ত হইতে দেখিব-সেদিন যতই সুদূরাগত হউক এই ক্ষেত্রে আমরা প্রেম ও ঐক্যকে বরণ করার জন্য ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইব।

— সমাজ —

হিন্দুসমাজ লইয়া আজ যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, আমরা মনে করি এই আন্দোলন ও সঙ্ঘর্ষের মধ্য দিয়া হিন্দু জাতির সত্য স্বরূপের নিদর্শন ফুটিয়া উঠিবে। যাঁহারা বলিতেছেন হিন্দু জাতির মধ্যে পতিতদের উচ্চবর্ণে পরিণত হওয়ার পথে হিন্দুসমাজ অন্তরায় হন নাই, তাহা যে সত্য কথা নহে, তাহা নাসিকের কালারাম মন্দিরের রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে পরিলক্ষিত হয়। হিন্দু বলিতে যে সংখ্যাধিক্যের দাবী করিয়া আজ আমরা ভারতের রাষ্ট্রীয় পরিষদে অধিকসংখ্যক প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের দাবী করি, তাহাতে কালারামের মন্দির-বিগ্রহের রথযাত্রা উপলক্ষে আমরা যদি অনুন্নত হিন্দু-সম্প্রদায়কে ইহা হইতে দূরে রাখিয়াই চলি, তাহা হইলে ইহা অনায়াসেই বলা যায় যে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট আজ যে মুসলমানের ন্যায় অস্পৃশ্য হিন্দুদেরও স্বতন্ত্র ভোটাধিকার দিয়াছেন তাহা ন্যায্যই হইয়াছে। হিন্দু সংখ্যাধিক্যবশতঃ ভারতের রাষ্ট্র পরিষদে হিন্দুর প্রভাব কেমন করিয়া রক্ষা করিবে, যদি হিন্দুজাতি এক ও অখণ্ড হইয়া না মাথা তুলিতে পারে।

আমরা বাংলাদেশেই দেখি, হিন্দুজাতির সংখ্যা প্রতি হাজারে ব্রাহ্মণ ৬৫ জন, কায়স্থ ৭০, নমঃশূদ্র ৯৪, মাহিষ্য ১০৭ এবং রাজবংশী ৮১। ইহা ব্যতীত আগুরি, বাগদী, বাগুই, ভূইমালী, চামার, ধোপা প্রভৃতি অসংখ্য হিন্দুজাতি আছে যাহার সহিত উচ্চবর্ণের হিন্দুর কোনই সম্পর্ক নাই। আগুরি যে নিজেকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে চাহে, বাগদী, হাড়ি, ঝালা, কাহার প্রভৃতি অনুন্নত জাতি এবং ভূইমালী, ধোপা, প্রভৃতি যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিতে উদ্যত হইয়াছে তাহার মূলে আছে হিন্দুসম্প্রদায়েরই প্রতি তাহাদের অন্তরের দরদ। হিন্দুসমাজ যদি তাহাদের মানুষের মত মর্য্যাদা দিত, তবে এইরূপ উত্তেজনা তাহাদের মধ্যে দেখা দিত না। আজ যাঁহারা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বলিয়া আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের জাগরণের নিগূঢ় উদ্দেশ্য না বুঝিয়া যাঁহারা সমালোচনার তীক্ষ্ণবাণ নিক্ষেপ করিয়া ইহাদের বুঝাইতে চাহেন যে ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের গুণ ও কর্ম্মের সাধন না করিয়া এইরূপ আস্ফালন ফ্যাসান্ মাত্র। আমি এইরূপ সমালোচকদের জিজ্ঞাসা করি, যাঁহারা জাতিব্রাহ্মণ এবং জাতিক্ষত্রিয়, তাঁহারাই কি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের স্বভাবধর্ম্ম পালন করিয়া যজ্ঞোপবীত কণ্ঠে ধারণ করেন? মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলা যায়, আজ ইংরাজ শাসনে যাঁতায় পড়িয়া সব কলাই গুড়া হইয়া গিয়াছে। আপৎকালে ব্রাহ্মণও আজ শূদ্রধর্ম্মী, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের তো কথাই নাই। ইহার পর এই শূদ্রের স্তর হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চাতুর্ব্বর্ণকে আজ বাছিয়া নেওয়া সম্ভব হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। দম্ভবশতঃ যদি আজিও জাতিধর্ম্মের দোহাই দিয়া হিন্দুসম্প্রদায়ের উচ্চবর্ণ সমাজের মাথায় চাপিয়া বসিতে চাহেন এবং এই জিদ যদি কোন পক্ষ ছাড়িতে কুণ্ঠা করেন, তবে আমরা অচিরেই দেখিব যে শুধু হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, অনুন্নত জাতির মধ্যে গুরুতর স্বাতন্ত্র্য নহে, পরন্তু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, রাজবংশী প্রভৃতি জাতিও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আদর্শে, ধর্ম্মে, সভ্যতায় আত্মবৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবে। হিন্দু সম্প্রদায়ের ইহা যে কত বড় অধঃপতনের দিন হইবে, তাহা ভাবিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়।

আজ যদি ভারতসম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ বিজয়ী হইয়াও বিজিত ভারতপ্রজাকে বলেন, তোমাদের ললাটে একখণ্ড কাগজে দাস-জাতি বলিয়া লিখন আঁটিয়া পথে বাহির হইতে হইবে, তাহা হইলে মানবত্বের এই অপমান পরাজিত জাতি বাধ্য হইয়া সহিলেও তাহাদের ক্ষুব্ধতার ধূমায়ত বহ্নি ভবিষ্যতে কি প্রলয়ের সৃষ্টি করিবে, তাহা অনুমান করা শক্ত নহে। ব্রাহ্মণ এইরূপ অত্যাচারই ভারতের বিপুল জনসংখ্যার উপর চিরদিন করিয়া আসিয়াছে। তাহাদের মুখে ভাষা, তাহাদের অন্তরে নারায়ণ, তাহাদের বাহুতে শক্তি, এ সকল সাধনায় তাহাদের বঞ্চিত করিয়াছে। অধিকন্তু তাহাদের ললাটে চিরদিন 'দাস' কথাটা আঁটিয়া সমাজে ছাড়িয়া দিয়াছে। মানবত্বের এই অপমান শাস্ত্রের দোহাই দিয়া আজ আর নিবারণ হইতে পারে না। 'পুরাণ, সংহিতা হইতে এই বিধান আজই মুছিয়া নিখিল হিন্দু জাতিকে অখণ্ডমূর্ত্তিতে

বিগ্রহান্বিত করিয়া তুলিতে হইবে। যদি হিন্দুজাতির মধ্যে এই উদ্ভট দাবী কোন সম্প্রদায় রক্ষা করিতে চাহেন তবে আমরা বলিব, হিন্দুজাতির কুক্ষি বিদীর্ণ করিয়া একটা নূতন জাতিরই অভ্যুদয়কাল সমুপস্থিত হইয়াছে। সে জাতি বর্ণজাতি নহে, সে জাতি দেব-জাতি। কৃত-যুগে যে এক জাতির কথা পরিশ্রুত হয়, ভারতে তাহারই সূচনাকাল বুঝি উপস্থিত। আজ হিন্দুসমাজে এই মন্ত্রধ্বনি সমুচ্চারিত হউক—

অগ্নে যং যজ্ঞং অধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি
স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি।

— শিক্ষা —

বর্ত্তমান যুগকে আমরা মানবতার অভ্যুদয়যুগ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি। কালচক্রে জগতের সকল ধর্ম্মী, ভিন্ন ভিন্ন জাতি, বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে একত্রিত হওয়ায় আমরা নিখিল মানবজাতির মধ্যে এক বিরাট প্রেম ও ঐক্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলিয়া স্বপ্ন দেখি। কিন্তু শিক্ষা-বিষয়ে রাজশক্তির কার্পণ্য দেখিলে অবসাদে বিদ্যোৎসাহীর হৃদয় মুষ্ড়িয়া পড়ে।

নিখিল ভারতে আজ পর্য্যন্তও শতকরা ৯২ জন নারীপুরুষ অক্ষর জ্ঞানহীন। রুশিয়ায় পনরো বৎসর পূর্ব্বে শতকরা ৭০ জন লোক নিরক্ষর ছিল কিন্তু নবশাসন-তন্ত্রের ঐন্দ্রজালিকপ্রভাবে আজ সেখানে শতকরা ২৬ জন লোকমাত্র অশিক্ষিত। সহজেই অনুমান করা যায় যে, আগামী ১০ বৎসর মধ্যে রুশের আপাদমস্তক শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। রুশরাজ্যের চেয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের খ্যাতি, বৈভব ও বীর্য্য আমরা সমধিক বলিয়াই বিশ্বাস করি, এই হেতু ভারত শিক্ষায় এই দীর্ঘ দিন ধরিয়া অবনত থাকায় আমাদের মর্ম্মাহত হওয়া অসঙ্গত নহে। বাংলায় বর্ত্তমানযুগে ৬৯,০৩৬টী বিদ্যালয় আছে। আশ্চর্য্য, অনেক বৈদেশিক মনীষীবর্গের লেখা হইতে জানিতে পারি, ইংরাজরাজ্যের পূর্ব্বে এই বাংলাদেশেই ৮০,০০০, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল। এই হেতু, এই অভ্যুদয়যুগে আমরা বাংলায় ততোধিক বিদ্যালয় সংস্থাপন [illegible]। এই দিকে রাজশক্তির সহায় প্রজাশক্তির প্রাণে উৎসাহের সঙ্গে রাজভক্তিরও উন্মেষ করিবে।

বাংলার প্রজাসংখ্যা—৫,০১,১৪,০০০ কোটী। ১৯২৭ খৃঃ পর্য্যন্ত যে শিক্ষাবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাবিভাগে ৬,৪০,০০০ হিন্দু ছাত্র অধ্যয়ন করিয়াছিল। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের বিবরণীতে প্রকাশ হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা ৬,৩১,০০০ হইয়াছে। ইহাতে হিন্দুসম্প্রদায়কে বিশেষভাবে সচেতন হইতে হইবে। যে দেশে শতকরা ৮ জন মাত্র শিক্ষিত বলিয়া পরিগণিত হয়, সে দেশে শিক্ষার্থীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হওয়াই জাতীয় উন্নতির পরিচায়ক।

শিক্ষা বলিতে আমরা ভারতের অতীতযুগের পরমার্থ-শিক্ষাকেই যখন আর শিক্ষার উপকরণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না, স্বীকার করিলেও তাহা যখন যুগধর্ম্মে সম্ভব হওয়া সুকঠিন, তখন 'অবিদ্যয়া মৃত্যুম্ তীর্ত্ত্বা' অর্থাৎ এই যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রণালী, তাহাতেই আমাদের চিত্তকে উন্নত করিতে হইবে এবং যে বিদ্যা অমৃতের সন্ধান দেয় সে বিদ্যার উৎস-ধারা আমাদের অন্তরতম প্রদেশে দেবতার মন্দিরে মন্দিরে জাগাইয়া রাখাই শ্রেয়ঃ হইবে।

শুনিতে পাওয়া যায়, মাধ্যমিক শিক্ষানিকেতনের সংখ্যা হ্রাস করিয়া প্রাথমিক শিক্ষার বিদ্যালয়ের সংখ্যা-বৃদ্ধিই নাকি শ্রেয়ঃ হইবে—এইরূপ অনেকেই মনে করেন; কিন্তু বিদ্যাধন যে অমূল্যরতন, ইহার দানের প্রবাহ রুদ্ধ করা উচিত হইবে না বরং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহিত প্রাথমিক বিদ্যালয়েরও সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে দেশবাসীকে ও রাজশক্তিকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে।

অর্থাভাবপ্রযুক্ত আজ যাহা সচল ও জীবন্ত তাহাকে অচল ও পঙ্গু করিয়া অন্য একটী ক্ষীণপ্রবাহের সৃজন বুদ্ধি-মত্তার পরিচয় নয়। আমরা শ্রদ্ধেয় শ্যামাপ্রসাদবাবুর মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া হিন্দুজাতির মধ্যে শিক্ষাদানের উৎসাহ কতখানি প্রবল তাহা বুঝিয়াছি। বিগত চারি বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকল্পে ১৬ লক্ষ টাকা দানের মধ্যে ২৫,০০০৲ টাকা খৃষ্টান ও ৬০০৲ শত টাকা

মুসলমানসমাজের দান ব্যতীত অবশিষ্ট অংশ হিন্দু-সমাজই দান করিয়াছেন। আরও কথা এই, যে ৬০০৲ টাকা মুসলমান বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দান করিয়াছেন, তাহা কেবল মুসলমানছাত্রদেরই সুবিধার জন্য। হিন্দু ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের দান কিন্তু সর্ব্বসাধারণের জন্য প্রদত্ত হইয়াছে।

এই অবস্থায় যদি কথা উঠে, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন-সভায় হিন্দুর সংখ্যাধিক্য হ্রাস করিয়া মুসলমানের প্রতিনিধিসংখ্যা বাড়াইতে হইবে, তাহা হইলে আমরা বলিব, আজ মুষ্টিমেয় হিন্দু বাঙ্গালী রাষ্ট্রবিপ্লবে যোগদান করায় হিন্দুসম্প্রদায়ের উপর স্বভাবতঃই যে রাজরোষ নিপতিত হইয়াছে, আমাদের মুসলমানভ্রাতৃবৃন্দ কি এই সুযোগে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে হিন্দু-সমাজের যে উৎসাহ ও আত্মদান তাহাও ক্ষুণ্ণ করিতে চাহেন! ইহা ব্যতীত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরিচালনসভায় যখন শতকরা ৯০জন সদস্য রাজশক্তির মনোনয়নের উপর নির্ভর করে, তখন এই দাবীর পক্ষে বা প্রতিপক্ষে কিছুই বলিবার নাই। তবে হিন্দুসমাজ এই ঔদার্য্য চিরদিন দেখাইবে যে, যেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণসভার প্রতিনিধি সাধারণের অভিমতে নির্ব্বাচিত হইবে, সেদিন অধিকসংখ্যক মুসলমানও যদি এই সভার নির্ব্বাচিত হয়েন, তথাপি হিন্দু অকপটে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সেবাই করিবে। শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দু চাহে না সাম্প্রদায়িকতা। এইখানেই বিশ্বজনীনভাবের স্ফুরণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই পবিত্রক্ষেত্রকে যেন আমরা আমাদের সঙ্কীর্ণতার দায়ে কলুষিত না করি।

— প্রবর্ত্তক ব্রতী বিভাগ —

আগামী ৩রা জ্যৈষ্ঠের মধ্যে যাঁহারা ব্রতী বিভাগে যোগদান করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন ও আবেদন করিবেন তাঁহাদের মধ্যে মাত্র পাঁচ জনকে এ বৎসরে গ্রহণ করা হইবে। যাঁহারা ব্রতী বিভাগে ভর্ত্তি হইতে চাহেন তাঁহারা মনে রাখিবেন, এই আর্থিক দুরবস্থার দিনে তাঁহাদিগকে বিনা খরচে স্বাবলম্বী করিয়া তোলা, এবং শিক্ষা ও সাধনা প্রদান করা কত বড় শক্ত কাজ। ব্রতীবিভাগের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে আবেদনের সঙ্গে অভিভাবকের ও স্থানীয় কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির পরিচয়পত্র পাঠাইতে হইবে। অন্ততঃ ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত যিনি পড়েন নাই তাঁহার পক্ষে ব্রতীবিভাগে ভর্ত্তি হওয়া সম্ভব নহে। ব্রতীদের জানিয়া রাখিতে হইবে—দুই বৎসর কাল একাদিক্রমে ব্রতী-বিভাগের আচার্য্যগণের আনুগত্যে থাকিয়া শিক্ষার সহিত তাঁহারা যে কার্য্যে তাঁহাদিগের উপযোগী মনে করিবেন সেই কার্য্য অবহিত হইয়া পালন করিতে হইবে। দুই বৎসর শিক্ষার পর ব্রতী ইচ্ছা করিলে এবং আচার্য্যগণের অভিমত হইলে, তাঁহাকে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের সভ্য বলিয়া পরিগণিত করা হইবে। ব্রতী দুই বৎসর শিক্ষার পর স্বাধীন উপজীবিকার জন্য প্রবর্ত্তকসঙ্ঘের যে কোন কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিয়া স্বাবলম্বী হইতে পারে। আমরা এই সঙ্গে এই বৎসর প্রবর্ত্তক চতুষ্পাঠীতেও দুই জন ছাত্র গ্রহণ করিব। সংস্কৃতচর্চ্চা করাই যাঁহাদের লক্ষ্য, সংস্কৃত ভাষা ও সনাতনধর্ম্ম প্রচার করাই যাঁহাদের উদ্দেশ্য, তাঁহারা এই ক্ষেত্রে নিয়োজিত হইতে পারিবেন। ইঁহাদিগকে একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর আচার্য্যের নিকট শিক্ষাগ্রহণ ও আচার্য্যের নির্দ্দেশে যথানির্দ্দিষ্ট কর্ম্মাদিতে নিয়োজিত থাকিতে হইবে। ৩রা জ্যৈষ্ঠ অক্ষয় তৃতীয়ার পর আর এক বৎসরের মধ্যে কোন ব্রতী গ্রহণ করা হইবে না।

— বিনামূল্যে মাসিক পত্রিকা —

চৈত্রের প্রবাসীতে অতি দুঃখেই প্রবীণ সম্পাদক বিনামূল্যে কাগজ চাহিদাদের সদুপদেশ দিয়াছেন। একখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাসিক পরিচালনা করিতে হইলে শ্রম ও অর্থ যেরূপ অকাতরে ব্যয় করিতে হয়, তাহাতে বৎসরে চার পাঁচ ছয় টাকা সংগ্রহ করিয়া মূল্য-স্বরূপ প্রদান করায় কৃপণতা করিলে মাসিক-পত্রের সত্বাধিকারী-গণের হৃদয় নৈরাশ্যে ভাঙ্গিয়া পড়ে। বিনামূল্যে বা ন্যূনমূল্যে কাগজ দিতে কেহ অনুরোধ করিলে সে অনুরোধ যদি রক্ষিত না হয়, তাহা হইলে সত্যই সত্বাধিকারীগণকে এই বিষয়ে ক্ষমা করা উচিত। যে মাসিক-পত্র দেশের ও দশের উপকার সাধন করিয়া দীর্ঘদিন আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছে, যথামূল্যে উহার গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিলেই তাহার প্রতি সত্য দরদ প্রকাশ পায়; অন্যথা এইরূপ চাহিদাদের কাগজ-খানি শ্রদ্ধার বস্তু না হইয়া বিনা কড়িতে পাওয়া একটী বিলাসের বস্তুতেই পরিগণ্য হয়। আমরা এই বিষয়ে 'প্রবাসী'-সম্পাদকের অভিমত সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করি।

আশ্রম-সংবাদ

(আশ্রমি-লিখিত)

মৈমনসিংহে শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়

চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর লোহ ও শ্রীরাজেন্দ্র কিশোর লোহ সঙ্ঘভুক্ত হওয়ার ফলে তাঁহাদের স্বগ্রামে মৈমনসিংহজেলাস্থিত মেলান্দহে সঙ্ঘের একটি শাখা-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। শ্রীযোগেন্দ্র কিশোর লোহ সস্ত্রীক চারি বৎসর সঙ্ঘের মূলকেন্দ্রে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রত ও সাধনসমাপনান্তে বিগত অগ্রহায়ণ মাসে মেলান্দহে ফিরিয়া আসেন।

এই সংস্থা পরিদর্শনে ও মৈমনসিংহ টাউনের রামকৃষ্ণ-প্রতিষ্ঠানের আহ্বানে শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় গত ৫ই মার্চ্চ মেলান্দহে আগমন করেন এবং পরদিন অপরাহ্নে তথায় এক বিরাট জনসভায় ধর্ম্মসাধনার সঙ্কেত ব্যক্ত করেন। উহাতে মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ সাতিশয় অনুপ্রাণিত হয়। ১০ই মার্চ্চ সন্ধ্যায় মৈমনসিংহ টাউনের সূর্য্যকান্তহলে পরমহংসদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে যে বিরাট ধর্ম্মসমন্বয়-সভা হয় তিনি তাহার পৌরোহিত্য করেন। এই সভায় খৃষ্ট, ব্রাহ্ম ও ইসলামধর্ম্মের প্রতিনিধিবর্গ স্ব-স্ব ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলে পর শ্রীযুক্ত মতিবাবু আবেগময়ী ভাষায় ধর্ম্মসমন্বয়ের মৌলিকতত্ত্বসম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। 'চারুমিহির' এই সভা সম্বন্ধে বলেন যে, টাউনহলে এইরূপ সর্ব্বশ্রেণীর শিক্ষিতব্যক্তির একত্র সমাবেশ ইতিপূর্ব্বে প্রত্যক্ষ হয় নাই।

তারপর তিনি মৈমনসিংহ দুর্গাবাড়ীতে, জামালপুর প্রভৃতি স্থানে সেখানকার অধিবাসিবৃন্দের আন্তরিক আহ্বানে ধর্ম্মসম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া মেলান্দহে ফিরিয়া আসেন। হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে তাঁহার নিকট ধর্ম্ম-বিষয়ক নানাবিধ প্রশ্নের সদুত্তরে সুখী হন। সকলেই সাশ্রুনয়নে তাঁহাকে বিদায়-অভিনন্দন প্রদান করেন।

বিদ্যার্থি-ভবনে পারিতোষিক-বিতরণ সভা

গত রবিবার ১লা এপ্রিল যোগ ও ব্রহ্মবিদ্যা মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থিভবনের ও প্রবর্ত্তক নারীমন্দিরের পারিতোষিক বিতরণ সভার অধিবেশন
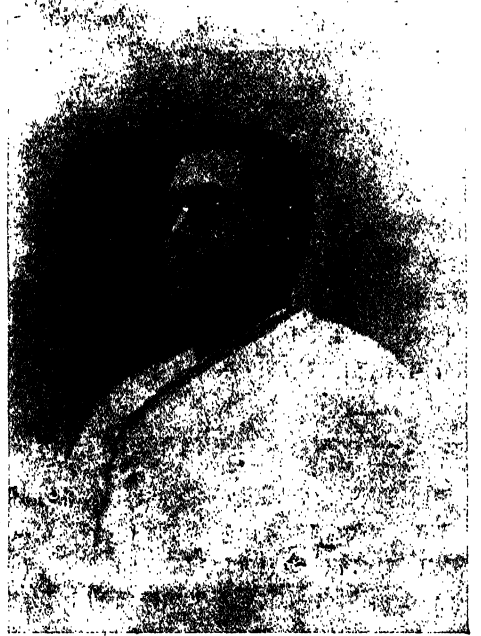
শ্রীক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন কলিকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষাবিভাগের পরিচালক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছিলেন তাঁহারই যোগ্যা সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী দেবী। ছেলেদের আবৃত্তি ও মেয়েদের 'ধ্রুব' অভিনয় সাতিশয় মনোজ্ঞ হইয়াছিল। ক্ষিতীশবাবু সঙ্ঘের আদর্শ ও চরিত্রগঠনের প্রসঙ্গের সহিত সঙ্ঘের শিক্ষাসাধনার কথা

উল্লেখ করিয়া ছাত্র ও ছাত্রীর জীবন শ্রী, শক্তি ও মাধুর্য্যে কেমন ঐশ্বর্য্যময় করিয়া তুলিতেছে, তাহারই উল্লেখ করেন। মতিবাবু সভাপতিকে ধন্যবাদ দিলে সভার কার্য্য ভঙ্গ হয়।

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব

আগামী ৩রা জ্যৈষ্ঠ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব আরম্ভ হইবে। এইবার উৎসবের দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হইবে। অধ্যাত্ম চেতনার উন্মেষের সঙ্গে জাতির সর্ব্বোতোমুখী প্রাণের জাগরণই এই উৎসবের বাহ্যরূপ। ধর্ম্মের বীর্য্য বাঙ্গালীকে স্বাবলম্বী ও অভী করিবে।

এ বৎসর যে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইতেছে তাহাতে দেখান হইবে—শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্যোদ্গীত ভারতের উত্তম রহস্যময় পরমধর্ম্ম, আর্থিক সঙ্কটাপন্ন বাংলার দুরবস্থার করুণ-চিত্র, ১৯৩১ সালের সেন্সাস-বিবরণ, ধর্ম্মের কুসংস্কার, এবং দ্বাদশ বৎসরের উৎসব-যজ্ঞের পুরোহিতবৃন্দের চিত্র-গৃহ। আরও অনুষ্ঠিত হইবে সৎসাহিত্য-প্রসার, ব্যায়াম, কৃষি, শিল্প, সঙ্গীত বিষয়ক সভা-সমিতি।

তৃতীয়া হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত, হোম, শাস্ত্রচর্চ্চা, স্বাধ্যায়, কথকতা ও কীর্ত্তনের অবিরাম প্রবাহের মধ্য দিয়া ধর্ম্মভাব জাগাইয়া রাখিবারও থাকিবে সুবন্দোবস্ত। আমরা সকলেরই ইহাতে যোগদান ও আনুকূল্য প্রার্থনা করি।

মাস-পঞ্জী

কৃষি—

বৈশাখে লাউ, চাল-কুমড়া, মিষ্টি কুমড়া, চিচিঙ্গা, ঝিঙা, ঢেঁড়শ, ধুন্দুল, শশা, করলা, কাঁকরোল, বরবটী, দেশী সীম, আউসে, বেগুন, ভুট্টা, লঙ্কা, নটে, কনকা, পুই, কাটোয়ার ডাঁটা, শাঁক আলু প্রভৃতির বীজ বপন করিবার সময়। ৩।৪ মাসের মধ্যেই প্রায় ইহার সকলগুলিরই ফলন পাওয়া যায়। স্বল্প ব্যয়ে কেবল মাত্র কায়িক মেহনতে গৃহ-সংলগ্ন উদ্যানে এই সকল লাভজনক ফসলের চাষ গৃহস্থের পক্ষে সম্ভব।

এ সময়ে বেগুন ও লঙ্কা প্রভৃতির চারা পুতিবারও সময়। আদা, হলুদ, কচু, মানকচু, মেটে আলু প্রভৃতির গেঁড়ও লাগান হইয়া থাকে। ইহার ফসল পাইতে প্রায় এক বৎসর লাগে। গেমা প্রভৃতি গরুর খাদ্য, অড়হর, পাট, আঁক, আউস ধান্য প্রভৃতি মাঠের ফসল ফলাইবারও ইহাই সময়। বৈশাখের শেষাশেষি বৃষ্টি পড়িলে পূর্ব্ব-প্রস্তুত ক্ষেত্রে পানের ডগাও বসান উচিত। আনারস, কলার চারা তুলিয়া রোপনের বৈশাখই উপযুক্ত সময়। পরবর্ত্তী ফসলের জন্য জমির চাষ ও ঘাস মারিয়া জমি তৈরী এই সময় হইতেই করা উচিত।

সাময়িকী—

বাংলার শাসন পরিষদে স্যার প্রভাসচন্দ্রের অভাবে যে শাসনপদ শূন্য হইয়াছিল, তৎস্থলে স্থায়ীভাবে স্যার বি, এল, মিত্র নিযুক্ত হইয়াছেন।

নিম্নলিখিত সভা সমিতিগুলি অনুষ্ঠিত হইয়াছে—

১১ চৈত্র রবিবার পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নবম বার্ষিক অধিবেশন হয়।

* * *

নিখিল বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ মহাসম্মেলন ও প্রদর্শনীর অধিবেশন বিগত ১৬।১৭।১৮ চৈত্র অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি কবিরাজ শিরোমণি শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বাচস্পতি। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন। কলিকাতায় এইরূপ সম্মিলনী এই প্রথম।

* * *

১৫ই চৈত্র হইতে ১৯শে চৈত্র তালতলা পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে ৪৬নং ইণ্ডিয়ান মিরর, ষ্ট্রীটে কুমার সিং হলে কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হয়। মূল সভাপতি ছিলেন আচার্য্য বিজয় চন্দ্র মজুমদার।

* * *

১৭ই ১৮ই চৈত্র তারিখে রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে আসানসোলে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সম্মিলনীর ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশনের অনুষ্ঠান হয়। ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন।

* * *

১৭ই ও ১৮ই চৈত্র তারিখে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ হলে নিখিল বঙ্গ অধ্যাপক ও শিক্ষক সম্মেলন হয়। সভাপতি ছিলেন ডাঃ ডব্লিউ, এস, আরকুহার্ট।

* * *

কলিকাতা বিডন স্কোয়ারে নিখিল ভারত কৃষি-শিল্প-কলা প্রদর্শনী এখনও চলিতেছে। ইহার অন্তর্গত লাইব্রেরী ও ম্যাগাজিন বিভাগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উক্ত বিভাগের পরিচালক তরুণ কর্ম্মী শ্রীযুত শৈবালচন্দ্র দত্ত।

* * *

বিগত ২৫শে মার্চ্চ রবিবার সন্তোষের রাজা স্যার মন্মথ নাথ রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক চিত্তরঞ্জন এভিনিউএর প্রারম্ভস্থল ও চৌরঙ্গির মোড়ে স্থাপিত পরলোকগত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচিত হইয়াছে।
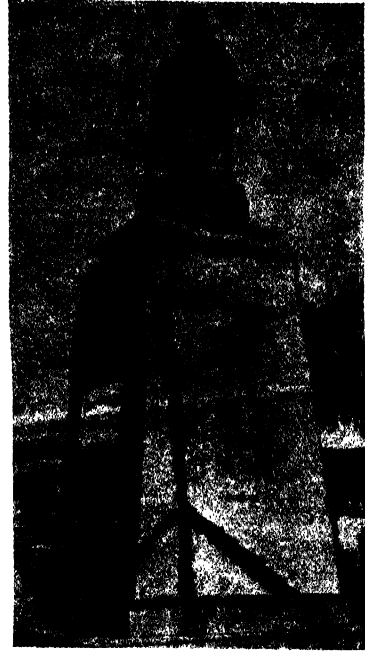
স্যার আশুতোষের প্রতিমূর্ত্তি

কলিকাতা মহানগরীতে একজন ভারতীয়ের ইহাই সর্ব্বপ্রথম ব্যক্তি-প্রতিমূর্ত্তি। সুপ্রসিদ্ধ ভাস্কর শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর ইহা নিখুঁত শিল্প-সৃষ্টি।
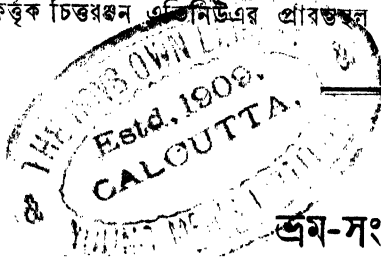
ভ্রম-সংশোধন

প্রথম কলমের ৩।৪ পংক্তিতে মাইলের স্থলে মিল্লে (Mille) অর্থাৎ হাজার প্রতি হইবে।

Published by Krishnadhan Chatterjee M. A.—Prabartak Publishing House, 61, Bowbazar St., Calcutta.
...hna Prosad Ghosh, at Prakash Press—61, Bowbazar St. Calcutta.

মায়ার পীড়ন

[শিল্পী—শ্রীযুক্ত চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়]
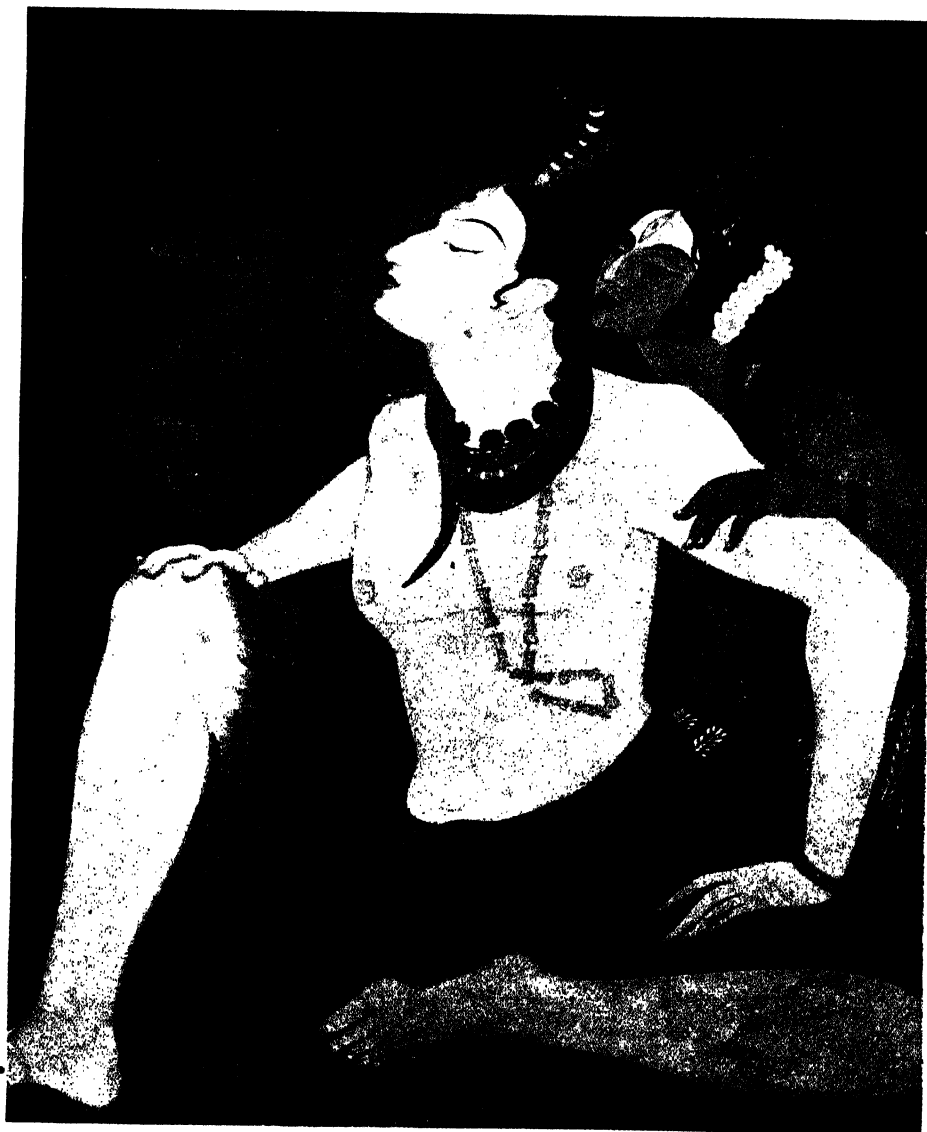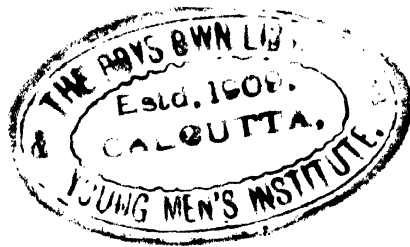
২৯শ বর্ষ, | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১ | ২য় সংখ্যা

ভারতের কৃষ্টি রক্ষা

"বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে"—এই কথাটা আজ আর সবখানি সত্য ব'লে স্বীকার করা যায় না। আজ মনে হয়, বাণিজ্যও ছিল তার উপলক্ষ্য। আসলে সে এসেছিল, ভারতে শিক্ষা সভ্যতার অভিনব আদর্শ প্রবর্ত্তন কর্‌তে। ইংরাজ-শক্তি আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের চেয়ে জগৎ জু'ড়ে চায় শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা; আর চায়—তাদের কৃষ্টি দিয়ে জগৎকে নূতন ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে। তারা কারও ধর্ম্মে ও আদর্শে হাত দিতে চায় না বটে, কিন্তু চক্ষের সম্মুখে রাখে এমন একটা উজ্জ্বল, হিতকর জীবনের দৃষ্টান্ত—খুব শক্ত, দৃঢ় ক'রে কোন জাতির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য যদি ধরা না থাকে, তবে যে কোন জাতি ইহাদের প্রত্যক্ষ জীবনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠ্‌বেই।

ইংরাজ শাসনশৃঙ্খলে ভারতকে কেবল বাঁধে নি—শিক্ষায়, সমাজ-বিধানে ও সেবায় সর্ব্ববিধ-ভাবে ভারতের প্রাণ আকর্ষণ করেছে। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ে আকৃষ্ট-চিত্ত ভারতের তরুণ তরুণী আজ দিশেহারা। কবি "মূক-মুখে ভাষা দিতে হ'বে" মানবতার এই চরম বাণী উচ্চারণ করেছেন, কিন্তু খৃষ্টান মিশনারীই দুর্গম অরণ্য, বন্ধুর গিরি-পথ অতিক্রম ক'রে, বোধহীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন অসংখ্য নরনারীর মুখে ভাষার ঝরণা ঝরিয়েছে। আতুরের সেবা, দারিদ্র্যের প্রতিকার, অক্ষমের বুকে উৎসাহের আগুন জ্বালা, সবই ইংরাজের দান। ভারতের কুষ্ঠ-রোগী আজ ইংরাজের সেবাশীতল করস্পর্শে সান্ত্বনা পায়। দুই হাত তুলে, আকাশের দিকে চেয়ে জয় দেয় মুক্ত কণ্ঠে। একটা জাতির প্রতিভা যেন বিশ্বময় আগুন জেলে দিয়েছে। আজ তাদের রাজ্য, তাদের অভিযান, তাদের জীবনের সর্ব্ববিধ গতি কেবলই যে বণিকের মানদণ্ডের মহিমা তাহা নহে, সে তার কৃষ্টি দিয়ে জগৎ অধিকার কর্‌তে চলেছে, তার পোষণ ও বর্দ্ধন ভগবানের আশীর্ব্বাদ।

ভারতের প্রাণ নাকি জেগেছে, কেন জেগেছে তার কোন সদুত্তর নাই। এক কথা স্বরাজ চাই। কেন স্বরাজ চাই, ইহার উত্তর যদি অন্তরাত্মার কাছ থেকে না পাওয়া যায়, তবে ইহা একটা নেশারই উত্তেজনা। প্রাণ বলি

দেওয়াও বড় কথা নয়। রাজপুত জাতির আত্মবলির ইতিহাস আমরা ভুলি নি, জহরব্রতের সে নিষ্ঠুর আহুতি, এখনও শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ বর্ষণ করে; কিন্তু জাতির সত্তা যদি তাতে বিজয়ী মূর্ত্তি না ধরে, তবে তা শুধু একটা উত্তেজনাময় মনোবৃত্তির আকস্মিক করুণ ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়।

ভারত জেগেছে, অন্ততঃ জাগার আকাঙ্ক্ষা তার প্রাণকে আকুল ক'রে তুলেছে। তার কারণ যদি হয় অভিমানের পুষ্টি, বিজয়ীর জীবনাদর্শের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, তবে সে জাগরণ বা জাগরণের আকাঙ্ক্ষা অধিক মূল্যবান্ বস্তু নয়। এই আকস্মিক উত্তেজনার দীর্ঘকালস্থায়ী অবসাদ আছে, প্রতিক্রিয়া আছে। ভারতের ভাগ্য, ক্রমেই যে অন্ধকারময় হ'য়ে আসে, তার গোড়ায় আছে জাতির এই অন্ধতা।

অন্ধতা নহে কি? আমরা যে জাতির নামে পরিচয় দিই, সেই জাতির কৃষ্টির অনুশীলন নাই, বিচার নাই, অনুভূতি নাই, অথচ চাই আত্মবৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য। কোন এক মনীষী বলেন—না, এই স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করার কথাই আমাদের আজ ছাড়তে হবে। সম্মুখে যে দুর্দ্ধর্ষ বিজয়ী জাতির অভ্যুদয় লক্ষ্যে পড়ে, তাহাদের সঙ্গেই ভারতীয় অসীম প্রাণকে নিঃশেষে মিশিয়ে দিতে হবে। যুগের ডাক এসেছে ব'লেই ইংরেজ এসেছে আমাদের দুয়ারে অতিথি হ'য়ে, তার কাছে আমাদের সর্ব্বতোভাবে আত্মদান সকল অশান্তি ও দুরবস্থার চূড়ান্ত প্রতিকার। আমাদের সম্মুখে আজকে আত্মরক্ষার যে জটিল সমস্যা, ইহাতে তাহার সমাধান আছে বটে; কিন্তু বিজয়ীর কাছে কোন প্রাচীন জাতি নিঃশেষে আত্মদান করেছে, ইতিহাসে এমন ঘটনা খুঁজে পাওয়া যায় না। ভারতের ভাগ্যে বিধাতার লিখন যদি এমনই হয়, তবে একটা অভিনব ইতিহাস ভারতবাসী সৃষ্টি করবে, এ বিষয়ে আর সংশয় নাই।

এইরূপ মনোবৃত্তিপরায়ণ মানুষের আধিক্য পরাধীন জাতির মধ্যেই সম্ভব। কিন্তু বাহিরের অক্ষমতা অথবা সামর্থ্য কোন জাতির অন্তরের সবখানি সত্য নয়: বাহিরে যখন জাগরণ, অন্তরে তখন প্রচ্ছন্ন-ভাবে পরাজয়ের কারণ নিহিত থাকে। আবার বাহিরে যেখানে নিদারুণ পঙ্গুত্বের লক্ষণ, অন্তরে অন্তরে তখন চলে প্রচুর সামর্থ্যের ফল্গুধারা। অন্তর বাহিরের এই বৈষম্যই কালে ভীম বিপ্লব-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। ভারতের বাহ্য পঙ্গুত্ব যদি অন্তরের সত্য অভিব্যক্তি হয়, তবে উদীয়মান যে কোন জাতির সঙ্গে তাহার সর্ব্বতোভাবে মিশ্রণ হ'য়ে যাওয়াই ভাল। একটা মরা জাতি কোন জাগ্রত জাতির সহিত অকাতরে যদি সংমিশ্রিত হ'য়ে প্রাণের সন্ধান পায়, সেই জাগ্রত জাতির সহিত ভেদহীন প্রবল জাতিতে পরিণত হয়, মরার চেয়ে ইহা শ্রেয়ঃ ব'লতে হবে।

কিন্তু এমন অবস্থা ভারতের নহে। আপাত দুঃখের অশ্রু তাকে যতই মলিন করুক, অন্তরে তার প্রলয়-বজ্র গুম্‌রে গুম্‌রে গর্জ্জন তুল্‌ছে। সে কোন জাতির আততায়ী হ'য়ে মাথা তুল্‌তে চায় না। কোন বিজয়ী জাতির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মত শক্তি-সম্পদ্ জাহির করা যেন তার উদ্দেশ্য নয়। সে বোধ হয় চাইছে কোটী কোটী বৎসর ধ'রে অন্তরে বাহিরে যে অমৃতধারার সে সন্ধান পেয়েছে, তারই একটা প্রবল প্লাবনে জগৎ ভাসিয়ে দিতে। সে একটা জাতির জয় নয়, দেশের জয় নয়, সে জয় দিতে চায় তার স্রষ্টার। ইহাই তার দেশের জয়, জাতির জয়—পরম অনুভূতির জয়। সে চাইছে না, নশ্বর জীবনের দাম্ভিকতা প্রকাশ করতে। যেন সে স্রষ্টার মহিমা-কীর্ত্তনের জন্য অন্তরে অন্তরে আকুল হ'য়ে উঠেছে এবং এই আকুলতাই তাকে অসংখ্য বিচিত্র আকারে নানা ভাবে ও ভঙ্গীতে খণ্ডে খণ্ডে বিচ্ছিন্ন ধারায় প্রকাশ ক'রে তুল্‌ছে।

কাব্যে, সাহিত্যে, চিত্রশিল্পে, সমাজ-সংস্কারে, স্বরাজ-আন্দোলনে, স্বাধীনতার সংগ্রামে এমন অসংখ্য আকারে সে রূপ নিচ্ছে নানা ভঙ্গীতে। প্রত্যেক ধারা ছুটে চলেছে নক্ষত্রবেগে—আত্মহারা হ'য়ে, ক্রমে সে পড়্‌ছে ক্ষীণ নিশ্চিহ্ন হ'য়ে। যতখানি পূর্ত্তি, যতখানি সম্বল, গোড়ায় সঞ্চয় ক'রে অভিযানে অগ্রসর হ'তে হবে, অন্তর-প্রেরণার উন্মাদনায় সে হিসাব করার খেয়াল তার নাই। আকাশের ভ্রষ্ট নক্ষত্রের মত তাই এই শতাব্দী কাল ধ'রে কেবল বাংলা দেশেই আমরা বিচিত্র আন্দোলন উত্তেজনার প্রবাহ লক্ষ্য করলুম; কিন্তু ভারতকে অভিষিক্ত ক'রে

কোন ধারাই অমৃতস্বরূপ জাতির অন্তর-নিহিত প্রেরণাকে মুক্তি দিল না।

যুগের ঢেউ যখন প্রবল মূর্ত্তি ধ'রে আমাদের কুটীর-দ্বারে এসে আঘাতের পর আঘাত দিয়ে জাগিয়ে তুল্লো, যুগ-যুগান্তর পূর্ব্বে সুপ্তির ঘোরে চোখ বুজে আর আরাম-শয্যায় শুয়ে থাকা যে চল্‌বে না তা স্থির ক'রে নিয়েই, ঝাঁপ দিয়ে সেদিন পড়েছিলাম সে উচ্ছ্বসিত প্লাবনের বুকে। কোথায় নিয়ে যাবে সে প্রবাহ, হিসাব করার যুগ তখন ছিল না। অকস্মাৎ গৃহহারা হওয়ার উন্মাদনায়, সে বোধের উন্মেষ হওয়ার সুযোগও সেদিন পাওয়া যায় নি। বন্যা আসে, চলে যায়, রেখে যায় পৃথিবীর বুকে পলিমাটি; বড় উর্ব্বরা শক্তির ক্ষেত্র হ'য়ে ফসল ফলায় গুণান্বিত ক'রে। যে কৃষক, সে পায় তখন বড় সুযোগ, দুর্দ্দিনের দুঃখ তার ঘুচে যায়, গ'ড়ে তোলে নূতন ক্ষেত্রে লক্ষ্মীর দেউল। প্রলয়-বন্যার পর এমনই গঠনের মন্ত্রসিদ্ধি দেবতার আশীর্ব্বাদে নেমে এসেছিল আমাদের মাঝে তপস্যার মূর্ত্তি নিয়ে। সেই গঠন-দেবতার পূজারী ব'লে তাই গর্ব্ব করতে পারি। আর উদাত্ত কণ্ঠে ভ্রান্ত পথিককে ডেকে বলার সাহস হয়—এস এই পথে, কৃষ্টির সাধনায়, গ'ড়ে তুলি জাতির জীবন। মাটীর বুক চিরে যে তরু পাতার পর পাতা কাণ্ড ধ'রে আকাশে মাথা তু'লে ওঠে, তাকে অন্ধ যদিও করে অস্বীকার, যার চক্ষু আছে, তাকে সে বস্তু স্বীকার ক'রে নিতে হবে তার সবখানি দিয়ে।

গঠন তাই আজ উদাত্ত-স্বরে সিদ্ধি-মন্ত্র রূপে উচ্চারিত হচ্ছে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর কণ্ঠে। আজ রাষ্ট্র নাই, সমাজ নাই, অত্যাচারের প্রতিকার নাই; কৃষি-বাণিজ্যের, বেকার-সমস্যার আলোচনা আন্দোলন নাই—বাণীর প্রতিধ্বনি ভারত ছেয়ে রব তোলে, গড়, গড়, গড়; গঠনমূলক আন্দোলনে জাতির প্রাণ জাগিয়ে তোল। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, রাজা, প্রজা সকলের কণ্ঠে, সকলের প্রচেষ্টায় গড়ার বাণী গড়ার আয়াস উপলব্ধ হয়। গর্ব্বে আমার প্রাণ তাই দুলে ওঠে, গঠনের মূলে যে সত্যের দর্শন পেয়ে সর্ব্বহারা আমি—ভাগবত প্রেরণার সে আশীষ বুঝি সফল হবে দেশ জু'ড়ে। গড়, গড়, গড়—যৌবনে যে বাণী উচ্চারণ ক'রে ক'রে দেহ মন নিংড়ে দিয়েছি, বার্দ্ধক্যে সেই বাণী পুনরুচ্চারণ করি, গড়, গড়, গড়!

রাষ্ট্র নয়, সমাজ নয়, দল নয়; এ সব গড়ার বস্তু নয়। গঠন পল্লী-সংগঠন নয়, ম্যালেরিয়া-নিবারণ নয়, কৃষি-শিল্পের পুনরুদ্ধার নয়। গড় আপনাকে, গড় নিজের স্বভাব-ধর্ম্মকে ভিত্তি ক'রে ভারতের জীবন। অতীতকে বিসর্জ্জন দাও, দূর কর পুরাতন জীর্ণবস্ত্রের মত। একেবারে লও নূতন জন্ম, হও ভগবানের মানুষ। আর সে অধিকার আছে তোমাদের। ভারতের তন্ত্রে, পুরাণে, উপনিষদে, সংহিতার ছত্রে ছত্রে, এই গড়ার মন্ত্র ছন্দে ছন্দে লীলায়ত। বিস্মৃতির ব্যথা, সে যে কত ব্যথা, সে ঐ পথের পাগল যে ধূলায় কর্দ্দমে কাতর মলিন মূর্ত্তিতে ঘু'রে বেড়ায়, দেখ সে তার সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত। এ তো আত্মবিস্মৃত ব্যক্তির চিত্র। একবার ভেবে দেখ, ভারতের মত একটা বিপুল আত্মবিস্মৃত জাতির মূর্ত্তি কত কদাকার, কত ঘনীভূত ব্যথা সেখানে!

তাই যুগ যুগ ধ'রে গড়ার মন্ত্র দিয়েছে—"প্রবর্ত্তক"। বর্ত্তমান জগতে বড় হয়ে উঠেছে অর্থের দায়, "প্রবর্ত্তকে"র পাতায় মানুষের মন-ভুলান গল্প উপন্যাস তাই বড় কথা নয়। ওগো ভারতের নরনারী, গ'ড়ে তোল তোমার সনাতন কৃষ্টি দিয়ে নূতন ক'রে নিজেদের। ভগবানের মানুষ হওয়ার প্রেরণায় ভারতে হয়েছিল একদিন মানবাত্মারই অভ্যুত্থান। এই দিব্য জন্মের আকাঙ্ক্ষায় ভারতের ঋষিমণ্ডলী আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছিল বেদমন্ত্র। এই নারায়ণী সেনা গড়ার প্রেরণায় ভারতে হয়েছিল আর্য্যজাতির প্রতিষ্ঠা। চাতুর্ব্বর্ণ্য গঠন ক'রে ভারতে মাথা তুলেছিল তপোমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ। এই গড়ার প্রেরণায় বেদ-বেত্তা ব্রহ্মজ্ঞানী উলঙ্গ মূর্ত্তিতে ভারতের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছিল, 'বেদবাসী' হ'তে, বেদের সত্যেই জীবনকে প্রতিষ্ঠা করতে। বেদ-বীজ—শ্রী-বীজ; 'বেদাধিপ' অর্থাৎ বেদ-সিদ্ধ জীবনই ছিল ভারতের গর্ব্ব ও ঐশ্বর্য্য। এই বেদের অন্ত খুঁজ্‌তে গিয়ে ষড়দর্শনের আবিষ্কার। ভারতের কৃষ্টির কথা অস্বীকার করার বস্তু নয়। আজও যদি কোথাও অভ্যুত্থানের প্রেরণা প্রবুদ্ধ হয়, তবে বল্‌ব, সেখানে আর যুক্তি নাই, বিচার নাই, হও তুমি পুরুষ, হও তুমি নারী, বেদপারগ হও, কণ্ঠে

তোমাদের উচ্চারিত হউক, নব বেদের গায়ত্রী, গঠনেরই মহামন্ত্র। সর্ব্বত্যাগী হ'য়ে গ'ড়ে তোল আবার এক নূতন গোষ্ঠী। ভারতের দেব-জাতির স্বপ্ন ব্যর্থ হয়েছে, আর্য্য-জাতির ভিত্তি ভেঙ্গেছে, ঋষিবংশের নাম আছে বটে, কিন্তু রক্তধারা মুছে গেছে, বেদ-রক্ষায় ব্রাহ্মণ আর সমর্থ নয়, ক্ষত্রিয় আর উপনিষদ্-রচনায় পারদর্শী নয়। পরাশরের বাণী আজ সত্য হয়েছে—

ব্রহ্মক্ষত্রস্য যো যোনির্বংশোরাজর্ষিসংকৃতঃ
ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং সসংস্থাম্ প্রপস্যতে কলৌ ॥

"অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের উৎপত্তিকারণস্বরূপ যে বংশে অনেক রাজর্ষিগণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কলিযুগে ক্ষেমক নামক রাজাকে প্রাপ্ত হইয়া তাহা সমাপ্তি লাভ করিবে।" আজ বর্ণাশ্রম-রক্ষার প্রচেষ্টা এই ঋষির বচন অস্বীকার করারই হঠকারিতা। ভারতে জাতি-বর্ণ-লোপ হউক, ভারতের কৃষ্টি অমর। এক অভ্যুদীয়মান নবজাতিকে সেই ভারতের বিশিষ্ট কৃষ্টি ধারণ ক'রে দুর্জ্জয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করতে হবে। এই কৃষ্টিসাধনায় প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ ভারতের নরনারীকে পাঞ্চজন্য-ফুৎকারে আহ্বান করছে।

চিন্তা-কণা

পৃথিবীতে যত কিছু পাওয়ার সামগ্রী সবই পেয়েছি, অভাব আমার কিছু নাই; কিন্তু তবুও ব্যথা আমার ঘুচ্‌ল না। আমার পাওয়ার যা তা মিল্‌ল না। হৃদয় তাই হাহাকার করে। আজ চাওয়া আমার পাগল হয়েই রূপ নিতে চায়—বড় দীন কঙ্কাল-মূর্ত্তি তার—সত্যই ভিক্ষাপাত্র হাতে পথের ধুলায় ধূসরিত হয়ে দিন গুণে' যেতে চাই। সকল বাঁধন ছিঁড়ে, সকল আদর্শ স্বপ্ন-জাল টুটিয়ে কেবল বিশ্বের বুকে উন্মাদ হয়ে আজ ছুটে বেড়াই দরদের গান গেয়ে। সব পাওয়ার পর, অপ্রাপ্তির ব্যথায় যেন সর্ব্বশরীর কণ্টকিত।

ছাই বেদ, পুরাণ, উপনিষদ্—ছাই সাধন, ভজন, উপাসনা—ধন-জন-সম্পদের মত আর একটা বন্ধন। জীবন কৈ? পেট-ভরা ক্ষিধে, ছাইভস্ম মুখে তুলে' তৃপ্তির আনন্দ কৈ? নেশাখোরের মত জীবন—তার মাঝে সত্য কৈ? ঋত কৈ?

শ্যাম তরুলতার শ্রী—গোষ্ঠের গাভী—বনের পশু—সমাজের নর-নারী—কি বিরহের ব্যথায় শিহরিত, লক্ষ্য কর কি? কেমন করে' পৃথিবী ভর্‌বে আনন্দের মদিরায়? কেমন করে' সেই রূপের আলোয় বিশ্বের মূর্ত্তি রূপান্তরিত হবে—যাহা সত্যই নয়নের আনন্দ, যাহা দেখ্‌তে দেখ্‌তে অমৃতের আস্বাদে প্রাণ-মন মাতাল হয়? তেমন দেখা, তেমন করে' এই পৃথিবীকে পাওয়া আমার হ'ল কৈ?

এক বিন্দু সুধায় অনন্তের তৃপ্তি—এই সান্ত্বনা আজ স্তোক-বাক্য মাত্র। আমি চাই অমৃতের সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়া। আমি চাই, অনন্তের মাঝে আপনাকে ঢেলে দিয়ে অশেষ সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে মর্ত্ত্যকে পূর্ণ করা। আমার এই ক্ষুধার তৃপ্তি আর যে কিসে হয়, তাহা খুঁজে' পাই না। শুধু কথা আর কথা; শুধু বেঁচে থাকার ব্যবস্থা—ছাই সব কাল-ক্ষয় করা! কোথায় সেই সন্ন্যাসী—আসক্তির সকল বাঁধন ছিঁড়ে বিশ্বের সম্মুখে অমৃত-বাণী শুধু নয়, অমৃতময় জীবন বণ্টন করবে, আপনি মেতে' জগৎ মাতাবে। বাল্য যায়, যৌবন যায়, বার্দ্ধক্য আসে—মানুষ করে কি! ছাই জল্পনা কল্পনা, ছাই সাধনার ছলনা! পরশ-পাথর যে লৌহ স্পর্শ করে, সে সেই মুহূর্ত্তে সোণা হয়। তোমরা সব ছেড়ে নবজন্ম লাভ কর।

ইষ্ট ভাগবত স্বরূপ। এই প্রত্যয় ও শ্রদ্ধা জন্ম-জন্মান্তরের সাধনায় লাভ হয়। ইহা তর্কে যুক্তিতে নির্ণীত হয় না। আত্মার অমরত্বে আমরা এই জন্যই বিশ্বাসবান্; জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যাই আমাদের কাছে ইষ্টকে মূর্ত্ত করে' ধরে।

ইহার পর লয়ের কথা। ইষ্টপ্রাপ্তির পর সর্ব্বকালে ইষ্টস্মরণ সম্ভব হয়। ইহার পূর্ব্বে সাধনার কথা কেবল শব্দ মাত্র। শব্দ রূপ নেয়, যখন সাধক পায় ইষ্টকেই।

ইষ্টে—ইষ্টের ইচ্ছায় ও ভাবে আপনাকে লয় করে' দিতে হয়। ইষ্ট-তত্ত্ববস্তু। ভাব—তত্ত্বের স্বভাব বা ইচ্ছাশক্তি। সাধকের আত্মতত্ত্ব ইষ্ট-তত্ত্বে লীন হবে; তার প্রকৃতি ইষ্টের ভাবে ডুবিয়ে দিতে হবে। শুধু "মামেব" প্রাপ্তি নহে, 'মদ্ভাব' প্রাপ্তির কথাও ভগবান গীতায় বলেছেন।

যত ক্ষণ না তোমার স্বভাব থেকে অহং ও কামনা নিরসিত হয়, এই ভগবানে উন্নীত হওয়া অসম্ভব। যে যাই বলুক, মৃত্যুপণে এই সাধনায় সতত তোমায় উদ্বুদ্ধ থাক্‌তে হবে। এই কাজ হয় ত একজন্মে সিদ্ধ না হতে পারে, তাহার জন্য চিন্তা নাই। যার ধৈর্য্য নাই, সে সাধন পথে আস্‌তে পারে না। তোমার ধৈর্য্য হউক অসাধারণ—তাই তোমার কথা হউক—"পাব জীবনে না হয় মরণে"।

সঙ্ঘের সিদ্ধি এইখানেই। আর ইহার জন্যই তোমার সবখানিকে ইষ্ট শনৈঃ শনৈঃ আকর্ষণ করে' নিচ্ছেন। দিয়েছ যা তা পাওয়ার তুলনায় অতি নগণ্য। ইষ্টে সমাধি সিদ্ধ না হলে নব জন্ম সার্থক হয় না। এই জন্য সঙ্ঘ-ধর্ম্মী মাত্রকেই ভগবানে অবগাহিত হতে বলি। তোমার অহং ও তোমার প্রকৃতি—উভয়ই ভগবানের মধ্যে বিসর্জ্জন দাও। মুক্তি লাভ কর।

ঈশ্বর তোমাতে বাস কর্‌ছেন; তুমিও ঈশ্বরচেতনায় অবস্থান কর। ধর্ম্মের ইহাই নিগূঢ় কথা। এখানে তোমার ভাবনা কি? তোমায় ত মাটী ছেড়ে উঠ্‌তে বল্‌ছি না; তোমার আসক্তির ক্ষেত্র থেকে একেবারে টেনে আন্‌ছি না—কেবল বল্‌ছি, কপট হয়ো না, ভাগবত চেতনায় আত্ম-চেতনাকে তুলে দাও। যাহা থেকে তোমার সৃষ্টি, তাহা থেকে বিযুক্ত হয়ো না।

এই এক মাত্র অধ্যাত্ম-চেতনায় তুমি আপনার সর্ব্ব দৈন্য দূর কর্‌তে পার। এই একমাত্র সাধন-নীতি আশ্রয় করে' তুমি আনন্দের সন্তান হতে পার। তোমায় আর কিছু কর্‌তে হবে না—শুধু চেতনাকে উপরে পৌঁছে দাও, ঈশ্বর-চেতনায় নিজেকে সর্ব্বদা সংযুক্ত করে' রাখ।

উঠ, তামসিকতায় আচ্ছন্ন থেক না। এখনও তোমার যৌবন আছে, এখনও তুমি ক্রমশক্তি প্রকাশ করার উৎস-হারা নও। যে দিন জরা-বার্দ্ধক্যে তোমায় আক্রমণ করবে, সে দিন আর উপায় থাকবে না। ইচ্ছা থাকলেও

আর দেহ বইবে না তোমার এই সমুন্নত চেতনাকে। ভগবানকে সে গাভী দিও না, যাহা শেষ তৃণ চর্ব্বণ করেছে, শেষ দুগ্ধবিন্দু যাহা থেকে দোহিত হয়েছে ; যদি উৎসর্গ-যজ্ঞে আহুতি দিতে চাও, যৌবন-যুগেই তাহা সম্ভব কর।

*　　*　　*　　*

আজ কাল করে' বৃথা সময় অপহরণ করো না। এই মুহূর্ত্তে উৎসর্গের সঙ্কল্প গ্রহণ কর। ভয় নাই, তোমার ক্ষতির ইংগতে কারণ নাই। প্রিয় আজ যাহা তাহাই তোমায় নিরয়ে নিয়ে যাবে। শ্রেয়ঃ আজ তপস্যা ; কিন্তু তাহাই তোমায় অমৃতের অধিকারী করবে। এই জন্য সর্ব্বদা বলি, উঠ, আপন ইষ্টের অনুসরণ কর—ইষ্টই তোমায় সেই যুক্ত-চৈতন্যের অধিকারী করবেন।

শুদ্ধি চাই সর্ব্বাগ্রে, তার জন্যই সাধনা। যে শুদ্ধির সাধনায় অসতর্ক, তার সাধন জম্‌বে না। অন্ততঃ মনে প্রাণে ঠিক করে' নিতে হবে—যদি চাই তাকে যাকে ভালবাসি, তবে আর সব চাওয়া ছাড়্‌তে হবে। এই-খানেই দরকার সংযমের।

সংযম যখন স্থির, যখন চিত্ত প্রকৃতির প্রলোভনে আর আকৃষ্ট নয়, ইষ্টে উন্নীত, তখনই জেনো—শোধনের যুগ শেষ হয়েছে। যত ক্ষণ অন্তরের আকর্ষণ ইতস্ততঃ ধাবিত হবে, তত ক্ষণ কপট হয়ো না ; শোধনের জন্য উদ্বুদ্ধ থেকো। গৃহী, সন্ন্যাসী, ব্রতধারী, সংশিতব্রতী, সকলকেই বলি, শোধন সঙ্গে রাখ—বিনা আত্মশুদ্ধিতে ভগবানের পথে চলা যায় না।

তারপর, সাধন। প্রভুর আজ্ঞা সেই পালন করে, অন্ততঃ করতে পারে, যে বিশুদ্ধ-চিত্ত। কেবল ব্রহ্মচর্য্যই শোধনের একমাত্র লক্ষণ নয় ; ছাড়্‌তে হবে তোমার কর্ত্তৃত্ব, ছাড়্‌তে হবে তোমার আভিজাত্য, তোমার সকল প্রকার দম্ভ। যদি প্রভুর পথেই চল্‌তে চাও, তবে সেবা-ব্রত পালন কর। সেবায় চিত্ত অমায়িক হয়। তুমি যত নম্র বিনয়ী হবে, তত প্রভু তেমোর ভিতর দিয়ে প্রকাশ হবেন। প্রকাশ যখন হন না, তখন অন্যকে দায়ী করো না, আপনার ভিতর অন্বেষণ কর। আবার বলি, শোধন রাখ, শুদ্ধ হও—অন্তরে বাহিরে তাঁকেই পাবে।

*　　*　　*　　*

আমি সত্যই একটা বড় কিছু করে' দেশকে তাক্ লাগিয়ে দিব, এমন মনে করি না। দেশের অবস্থা দেখে' নিরাশ হ'তে হয়। যে অবস্থায় মানুষের চিত্ত মন উন্নীত হলে বাঁচার আশা হয়, সে অবস্থায় মানুষ বাস করে না। এখনও আছে আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু সে প্রাণ নাই। আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে হলে যে সাধনা দরকার, তা করতে হবে।

তোমরা অন্ততঃ এক শত মানুষ জীবন সিদ্ধ করার তপস্যা কর। এই এক শত মানুষের তপস্যা জাতিকে উন্নীত করার সম্পদ্ হবে। এত বড় দেশে মাত্র এক শত খাঁটি মানুষ আমি গুনতি করে' নিতে চাই। এই সামান্য কাজটুকুও সিদ্ধ করা কত কঠিন! সারা জীবন দিয়ে আমি সংখ্যায় এইরূপ এক শত সিদ্ধ মানুষ রেখে যেতে পারলেও কৃতার্থ হব।

আপনাকে সর্ব্বদা ভাগবত চেতনায় সংস্থিত রাখার তপস্যাই একটা নূতন সৃষ্টি। এই সাধনার যে রূপ, তাহাই মরা জাতির প্রাণে অমৃত সঞ্চার করবে। কতখানি স্বাস্থ্য থাকলে ইহা সম্ভব হবে, তাহা যারা এই পথে তারা অনায়াসে অনুভব করবে।

সর্ব্বদা লক্ষ্য রেখো—তুমি শক্তিহীন যাতে না হও। বীর্য্যক্ষয় রোধ করা চাই। এইখানে তোমরা খুব সতর্ক হও। কেবল কার্য্যতঃ বীর্য্য-ক্ষয় না হ'লেই যে তুমি বীর্য্যবান্ হবে তা নয় ; চিত্ত ঈশ্বর-চেতনা থেকে বিচ্যুত হ'লেই জানবে ভিতরে বীর্য্যক্ষয় হয় এবং যথাসময়ে সে বীর্য্য স্খলিত হয়ে পড়ে। হিন্দুর ধর্ম্ম বীর্য্য ব্যতীত ধারণ করা যায় না। সকল দিক্ থেকেই ক্ষয় নিবারণ কর।

আপনাকে এই ভাবে গড়ে' তোল। অনিন্দ্যসুন্দর, অমৃতময় জীবন তোমায় গ্রহণ করতে হবে—পৃথিবীর কল্যাণের জন্য, সর্ব্বভূত-হিতের হেতু। আত্মসাধনাও অন্যের জন্য। তোমার সিদ্ধি জগৎকেই ধন্য করবে

'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা !'

স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

বাংলার বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থা ও বাঙ্গালীর আজিকার উৎকট বেকার-সমস্যার বিষয়ে মাথা ঘামাইতে গিয়া প্রায়শঃই বর্ত্তমান শিক্ষার ঘাড়ে সকল দোষ চাপান হইয়া থাকে। ছোট বড় সকলের মুখে ঐ একই কথা। অর্থাভাবের মূল কারণ বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, শিক্ষিতের সর্ব্ববিষয়ে অসহায়তা ও উপায়হীনতার জন্য যেন দায়ী এই শিক্ষা—এ কথা তোতাপাখীর বুলির মত কারণে অকারণে, সময়ে-অসময়ে, শিক্ষিত অর্দ্ধ-শিক্ষিতের কণ্ঠে আজ অবাধে উচ্চারিত। এমন কি, স্যার পি, সি, রায় ও স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু পর্য্যন্তও এই মতই পোষণ করেন এবং সম্প্রতি নবীন ভারতসচিব স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারও এই দলে যোগ দিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্বাৎসরিক (Convocaticn) অধিবেশনের অভিভাষণের মাঝেও ছোঁয়াচে ব্যারামের প্রলাপোক্তির মত ইহারই প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়।

সত্যই কি বাংলা আজ তার প্রয়োজনের ও তথাকথিত ক্ষমতার অধিক শিক্ষালাভের ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে? শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর শক্তি ও সামর্থ্যের অপচয় কি আজ এতই অধিক? বাংলার দেউলিয়া হইবার কি ইহাই একমাত্র কারণ। তাই-ই যদি হয়, বাংলার শিক্ষা-সমালোচকদের কথার প্রতিবাদে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, যে সরকারী শিক্ষাবিভাগের, মিউনিসিপালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতির মধ্য দিয়া বাঙ্গালীই তার এ শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিয়াছে বা করিতেছে। এ বিষয়ে বাংলা কাহারও মুখাপেক্ষী নয়; এই সম্বন্ধে সংযত ভাবে ভাবিবার দিন আজ সমাগত।

গত সেন্সাস রিপোর্টানুযায়ী বাংলার সর্ব্বশুদ্ধ লোক-সংখ্যা ৫০,১১৪,০০২; তন্মধ্যে পুরুষ ২৬,০৪১,৬৯৮ ও স্ত্রীলোক ২৪,০৭২,৩০৪। ইহার মধ্যে শিক্ষা পাইবার উপযুক্ত বয়স্কের সংখ্যা ১০,৩১৩,৪৯৩ ইহার সঙ্গে ধরিতে হইবে। আসামের জনসংখ্যা (মোট জনসংখ্যা ৯,২৪৭,৮৫৭, তন্মধ্যে পুরুষ ৪,৮৪৪,১৩৩, স্ত্রীলোক ৪,৪০৩,৭২৪, শিক্ষা পাইবার উপযুক্ত বয়স্কের সংখ্যা ৩৬৪,৭৭৪) এই দুই সংখ্যা যোগ করিলে দেখা যাইবে, যে আসাম ও বাংলার সর্ব্বশুদ্ধ ৫৯,৩৬১,৮৫৯ লোক-সংখ্যার (পুরুষ ৩০,৮৮৫,৮৩১, ও নারী ২৮,৪৭৬,০২৮) মধ্যে শিক্ষা পাইবার উপযোগী বয়স্কের সংখ্যা হয় মাত্র ১৩,০১৩,৮৬০। শত অভিশাপ-জর্জ্জরিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা হিসাব করিলে দেখা যায়, ১৮৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বোধন হইতে ১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত মোট গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ৬১,৮২১; তন্মধ্যে আর্ট-বিভাগে ৫২,০২৯ ও বিজ্ঞান-বিভাগে ৯,৭৯২।

কিন্তু এই সংখ্যার দ্বারা আজিকার অবস্থা সঠিক অনুমিত হয় না। কারণ ইহার মাঝে বহু সহস্র গ্র্যাজুয়েট গতায়ুঃ হইয়াছেন; তাঁহারা চাকুরীর ব্যবসায়ের বাজারে ভীড় পাকাইয়া আর বাধা সৃষ্টি করিতে আসিবেন না। চাকুরীর কথাটা বিশেষভাবে উল্লেখ করিবার হেতু এই যে, আজকাল যেরূপ মনোবৃত্তি দৃষ্টিগোচর হয় তাতে মনে হয়, যেন চাকুরী বা অর্থোপার্জ্জনই শিক্ষার একমাত্র না হইলেও মুখ্যতম উদ্দেশ্য। আসাম ও বাংলার লোকসংখ্যার অনুপাতে যে গ্রাজুয়েটের সংখ্যা দেওয়া হইল, তাহা যদি কেবলমাত্র এই দুই দেশে আবদ্ধ থাকিত, তবুও একটা কথা থাকিত। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র ৫০ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছে। যে সময় হইতে হিসাব ধরা হইয়াছে তার বহু পরে সীমান্ত প্রদেশ (Frontier Province), যুক্ত প্রদেশ, বিহার-উড়িষ্যা, বর্ম্মা, সিংহল, মধ্য প্রদেশ প্রভৃতির বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিও স্থাপিত হইয়াছে এবং প্রথম প্রথম এই প্রদেশগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছিল। সুতরাং এই দীর্ঘ ৭৬ বৎসরে ৬১,৮২১ জন গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা আপাততঃ শুধু বাংলা ও আসামের অধিবাসীর অনুপাতে অধিক বলিয়া মনে হইলেও, ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, বর্ম্মা, সিংহল প্রভৃতির অংশও এই সংখ্যার মধ্যেই রহিয়াছে। অতএব বৎসরে গড়ে এক হাজারের কমও গ্র্যাজুয়েট প্রসব করিয়া

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছে তাহা একবার ধীর-স্থির-ভাবে পাঠক বিবেচনা করিবেন। অবশ্য এই হিসাবের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের M Bs. ও B. E-. দের ধরা হয় নাই।

যদিও ঠিক নয়, তবুও যদি মোটামুটি ধরা যায়, যে আসাম ও বাংলায় মোট গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ৬১,৮২১ এবং তাহারা সকলেই জীবিত আছেন; তত্রাচ এই দুই প্রদেশের বিপুল জনসংখ্যা ৫৯,৩৬১,৮৫৯ ও শিক্ষাপ্রাপ্তির উপযুক্ত বয়স্কের ১৩,০৫৩,৮৬০ সংখ্যার তুলনায় উহা নিতান্ত নগণ্য হইতেও নগণ্য। এই হিসাবে গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা মোটামুটি হয় লোকসংখ্যার তুলনায় শতকরা ০·১০ ভাগ ও শিক্ষা পাইবার উপযুক্ত বয়স্কের তুলনায় শতকরা ০·৪৭ ভাগ।

এখন ইহা জিজ্ঞাসা করা কি অশোভনীয় হইবে, যে বাংলায় উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা অসম্ভব এবং অসহনীয় রূপে অধিক কি? কোন সমালোচকই বোধ হয় স্থির মস্তিষ্কে এ কথা স্বীকার করিতে পারিবেন না। তাই যদি হয়, তবে এ বিরুদ্ধ সমালোচনা আপাততঃ বন্ধ করা উচিত। এইরূপ অসত্য সমালোচনায় দেশের প্রতি অবিচার এবং অনিষ্ট করা হইয়া থাকে। রাজা রামমোহনের মৃত্যুর পর এই দীর্ঘ শতাব্দী ধরিয়া শিক্ষাপ্রগতি যেরূপ হওয়া উচিত ছিল তাহা আদৌ হয় নাই; এজন্য বরং সরকারী বে-সরকারী সমালোচকগণ, যাঁহারা উচ্চকণ্ঠে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর বিরুদ্ধে চীৎকার করেন, তাঁহাদের লজ্জিত হওয়াই উচিত।

ইংলণ্ডে লোকের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন কোটি, ইহার মধ্যে শিক্ষাপ্রাপ্তির উপযুক্ত বয়স্ক মাত্রেই রাষ্ট্রীয় নিয়মানুসারে শিক্ষিত; তাহারা যে শিক্ষা পায়, এদেশের তুলনায় তাহা উচ্চশিক্ষা বলিলে অসঙ্গতি হয় না। তাই বিশেষ করিয়া—বৈদেশিকের মুখে যখন শুনি, যে অতিরিক্ত ও অনাবশ্যক শিক্ষার ফলে বাংলা উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, তখন সে কথা নিতান্ত ভিত্তিহীন ও হাস্যকর বলিয়া প্রতিভাত হয়। নিজেদের দেশে ঠিক বিশ্ববিদ্যালয়-শ্রেণীর না হইলেও, সফলভাবে সাধারণ শিক্ষার ব্যাপক প্রবর্ত্তন করিয়া এবং শিক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগিতা বুঝিয়াও অপরের দেশে শিক্ষা-বিস্তারের কুফল প্রদর্শন করার মাঝে নিছক স্বার্থপরতা-প্রণোদিত ভণ্ডামী ছাড়া আর কি বলা যায়; বরং আরও শিক্ষা-বিস্তারের অনুকূল আব্‌হাওয়া সৃজন করাই বাঞ্ছনীয় এবং যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষার পরিচয়। নিজের অন্তরের গলদ ইহাতে ঢাকা পড়ে না, বরং প্রকাশিত হইয়াই পড়ে। এই প্রসঙ্গে পুণ্যস্মৃতি গোখেলের কথা মনে পড়ে। লর্ড কার্জ্জনের প্রবর্ত্তিত 'বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল' প্রতিরোধ করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'ভাল হউক মন্দ হউক, কোন উপকারে আসুক আর নাই আসুক, দেশে শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতেই হইবে এবং উহা শিক্ষাহীন অবস্থার চেয়ে বহুগুণে বাঞ্ছনীয়।' বাংলায় শিক্ষার গোড়া-পত্তন করিতে না করিতেই উহা বন্ধ করিবার প্রচেষ্টা অদূরদর্শিতারই পরিচায়ক। এজন্য কত কমিটী, কমিশন, কন্‌ফারেন্স ইতিমধ্যেই বসিয়া গিয়াছে। যখনই শিক্ষা সম্বন্ধে বাধা দিবার প্রয়োজন হয়, তখন নূতন কমিটী-নিয়োগের ন্যায় অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র আর নাই। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, এ শিক্ষার অগ্রগতি এত শীঘ্র বা অত সহজে রুদ্ধ হইবার নয়। বর্ত্তমান বৎসরের পরীক্ষার্থীর অত্যধিক সংখ্যা শিক্ষার প্রতি জনসাধারণের অনুরাগই সূচিত করে। তাই মনে হয়, বৃথা হৈ-চৈ না করিয়া, শাসক-শাসিত, ধনী-দরিদ্র, দেশের সর্ব্বাবস্থার লোকেরই একযোগে এমন উপায় উদ্ভাবন করা উচিত, যাহাতে দেশের বর্ত্তমান অর্থ ও সামর্থ্যানুযায়ী আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিকে সর্ব্বসাধারণের হিতকারী করিয়া তোলা যায়।

পাশ্চাত্য দেশের সাধারণ অভিজ্ঞতা এই যে, সেখানে জনসাধারণ বাধ্যতামূলক শিক্ষাপ্রণালীর অধীন এবং ভারতবর্ষে যাহা উচ্চশিক্ষা নামে অভিহিত সেই শিক্ষাই পায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ঐ সকল দেশে জনসংখ্যার অনুপাতে বাংলার সংখ্যা অপেক্ষা অনেক অধিক। মার্কিণে পেটের চিন্তায় পুরুষেরা অতি ব্যস্ত হইলেও, কোন না কোন রূপ শিক্ষা হইতে তাহারা বঞ্চিত হয় না।

সেখানে জেলায় জেলায় শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। নারী-প্রগতির যুগে এই সকল কেন্দ্রে নারী-শিক্ষার্থিনীর সংখ্যাও যথেষ্ট। সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে হইবে, যে পাশ্চাত্য দেশে শিল্প-বাণিজ্য-কৃষি-শিক্ষার ক্ষেত্র ও সুযোগ প্রচুর।

আমাদের দেশে এইরূপ অর্থকরী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আজও প্রয়োজনানুযায়ী গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পায় নাই বা সে দিকে দেশ এবং শাসনপ্রণালীর পরিচালকদিগের কার্য্যকরী প্রচেষ্টারও আশানুরূপ অভাব পরিলক্ষিত হয়। তথাকথিত উচ্চ-শিক্ষার ওজরে এই সকল সুযোগ ও সুবিধার অসদ্ভাব কোন ক্রমেই ক্ষমাযোগ্য নহে। একটির অভাবে যদি সমালোচদিকগের সমস্ত আক্রোশ গিয়া পড়ে যৎসামান্য যাহা আছে সেই সবে-ধন-নীলমণি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপর, তাহা হইলে ইহার বিষময় পরিণাম অপরিহার্য্য।

আমাদের দেশে এই সকল বিষয়ের দারুণ দুর্গতির কথা মনে করিলে হৃৎকম্প হয়। যখন দেশের লোক বিদেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ভাগ্যপরীক্ষার জন্য অসমর্থ বা অশক্ত ছিল, তখন কথায় কথায় শুনা যাইত যে, ভারতবাসী গৃহকোণ-বিলাসী। গ্রাম্য-কথায় তাহাদিগকে "কুণো" নামে অভিহিত করা হইত। যখন তাহাদের সে অপবাদ ঘুচিল, দেশ বিদেশে উপনিবেশ-স্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তাহারা স্বীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিল, উপনিবেশের সমৃদ্ধি-স্থাপনে প্রচুর সহায়তা করিল, তখন আর তাহাদের উপনিবেশে স্থান রহিল না। উপনিবেশ হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করাই মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইল। দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্ব্ব আফ্রিকা, ফিজি, নিউ গায়না, মরিসস, কানাডা, এমন কি সিঙ্গাপুর, মালয়, ব্রহ্মদেশ এবং সিংহলেও এই বিপৎপাতের ভুরি ভুরি পরিচয় পাওয়া যায়। "ধূয়া" উঠিল, দেশবাসী ইংরাজী শিক্ষাবিষয়ে যত্নহীন এবং শ্রদ্ধাহীন, কেবল সংস্কৃত, আরবী এবং পারসী শিক্ষাই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য; তখন নবশক্তিতে শক্তিমান্ দেশবাসী ইংরাজী শিক্ষায় মন দিল—নিজ চেষ্টায়, নিজ ব্যয়ে সেই নবীন শিক্ষাসৌধ গড়িয়া তুলিল। দয়া-পরবশ হইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়া অদ্ভুত বদান্যতার পরিচয় দিলেন। এই উচ্চশিক্ষিত হইতে না হইতেই আবার "ধূয়া" উঠিল, উচ্চশিক্ষার বেজায় বাড় ও দৌড় হইয়াছে। তোতা-পাখীর বুলির অনুকরণে সর্ব্বকর্ম্মবিৎ আচার্য্যবর প্রফুল্ল-চন্দ্র রায় প্রমুখ দেশহিতৈষিগণ তারস্বরে প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, উচ্চশিক্ষায় দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে, দেশবাসিমাত্রকেই চাষ ও অন্যান্য শ্রমিকের কার্য্যে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা জাতিভেদ তুলিয়া দিয়াছেন; ছুতোর, কামার, কুমোর, তাঁতী, মুচি কেহই কাহারও জাতিগত ব্যবসা করিবে না, অপরের ব্যবসায়ে ভাগ বসাইবে—ইহাই আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণের আদেশ। যাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের কাজে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের দশা কি হইবে, তাহা কেহ ভাবিলেন না এবং তৎসম্বন্ধে কোন ব্যবস্থাও করিলেন না। উচ্চশিক্ষা বন্ধ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের টাইপ রাইটিং, একাউণ্টেণ্টশিপ, টেলারিং বিভাগ খুলিলে যদি দেশের আর্থিক সমস্যা দূর হয় এবং হইত, তাহা হইলে যাঁহারা এই সকল কাজে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের দশা কি হইবে তাহা ভাবিবার কাহারও অবকাশ নাই, ক্ষমতা নাই, প্রবৃত্তিও নাই। চন্দননগরের প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের অধিনায়ক, ধর্ম্মে কর্ম্মে সমকৃতী, মহাত্মা শ্রীমতিলাল রায় এই সমস্যা-পূরণের যে চেষ্টা করিতেছেন, সকলেরই তাহা প্রণিধানযোগ্য—ইহলোক ও পরলোকের মঙ্গল-বিষয়ে তিনি সমদর্শী। আর্থিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা-বিষয়ে সম-যত্নবান্। উচ্চ-শিক্ষা-প্রণালীর মধ্য দিয়া তাঁহার প্রবর্ত্তিত প্রণালীর সাধনা করিলে প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। একদেশদর্শিগণের তোতাপাখীর বুলির সাহায্যে এ বিষম সমস্যার সমাধান হইবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার সপক্ষে আমি যাহা বলিলাম তাহাতে যেন কেহ না মনে করেন, আমি টেক্‌নিক্যাল বা অর্থকরী শিক্ষার বিরুদ্ধে। ন্যাশানাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন ও বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল স্কুলের সূচনা হইতে আমি সেই প্রতিষ্ঠানের সহিত এ পর্য্যন্ত ঘনিষ্ঠ-ভাবে সংলিপ্ত; কিন্তু যে সকল কৃতী ছাত্র এই প্রতিষ্ঠানে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারাও অন্নাভাবে হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছেন। এই বিপদ্-নিবারণের কে চেষ্টা করিতেছেন? "উচ্চশিক্ষা" বন্ধ করিয়া অর্থকরী শিক্ষার প্রবর্ত্তনে সে বিপদ্ বন্ধ হইলে ভাবনা ছিল না; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ফল সম্পূর্ণ বিপরীত। অন্য উপায় ভাবিতে হইবে। দেশের সার্ব্বজনীন উন্নতি করিতে হইলে,

সকল রকম শিক্ষারই প্রয়োজন আছে। সকল দিকেই দেশের যাঁরা মাথা তাঁদের সমান দৃষ্টি দেওয়া উচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, আমাদের ডাক্তারী শিক্ষার কথা। দেশবাসীর স্বাস্থ্য ও সুখের জন্য এই বিভাগের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোন মতদ্বৈধ নাই। বর্ত্তমানে M. Ds., M. Bs. L M. S. ডিপ্লোমাধারী ও মেডিক্যাল স্কুলোত্তীর্ণ লাইসেন্স-প্রাপ্ত ডাক্তারের সংখ্যা মোট ৮০০০ অর্থাৎ লোক-সংখ্যার তুলনায় গড়ে ৭,৪০০ জনের প্রতি একজন মাত্র ডাক্তার। কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, অন্ততঃ গড়ে ২০০০ লোকের জন্য একজন ডাক্তার হওয়া উচিত। যে হারে ডাক্তারী শিক্ষা চলিতেছে, তাহাতে বর্ত্তমানের চতুর্গুণ ডাক্তারের সৃষ্টি হওয়া এখনও বহু সময়সাপেক্ষ। অবশ্য আয়ুর্ব্বেদীয়, হোমিওপ্যাথ ও হাকিমি চিকিৎসক-গণের সংখ্যা গণ্য করিয়াও এই হিসাবানুযায়ী পাশ-করা ডাক্তারের প্রয়োজনীয়তা আছে। লাইসেন্সধারী ডাক্তার-গণের সাধারণতঃ সহরে ভীড় করিয়া থাকার মনোবৃত্তির দরুণ সুদূর পল্লী এখনও সুচিকিৎসা হইতে বঞ্চিত।

গড়া জিনিষ ভাঙ্গা সহজ; কিন্তু যত ক্ষুদ্রই হউক, তাহা আবার গড়ান বিপুল শ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আজ যাহা আমাদের অভাব, তাহাই সকলকে একযোগে পূরণ করিতে হইবে। ইহাই আমাদের দেশে বর্ত্তমানে সব-চেয়ে শিক্ষার বড় সমস্যা এবং উহার সমাধানের প্রতি অনতিবিলম্বে সকলের দৃষ্টি, মনোযোগ এবং চেষ্টা নিতান্ত প্রয়োজন।

তর্কস্থলে ধরিয়া লওয়া যাউক, শতকরা ০'৪৭ উচ্চ-শিক্ষিত অপগণ্ড বেকার-সমস্যা বাড়াইয়া সমাজের অশেষ অহিতসাধন করেন এবং তাঁহাদের সংখ্যা সর্ব্বতোভাবে হ্রাস পাওয়া কর্ত্তব্য। এই সকল ভক্ত দেশপ্রেমিককে জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, অবশিষ্ট ৯৯'৫৩ ভাগ অধিবাসি-গণের অন্ন-সমস্যা ও বেকার-সমস্যা তিরোহিত করিবার জন্য তাঁহারা কি উপায় করিয়াছেন বা করিতে পারেন? শতকরা এক শত জনেরই তো উদর শূন্য; লাভের মধ্যে শতকরা ০'৪৭ ভাগ অধিবাসী যদি শূন্য উদরেও শিক্ষা সাহায্যে অন্ততঃ মনকে শূন্যতা হইতে রক্ষা করিয়া, সমাজের হিতসাধনে না হউক হিতচিন্তায় নিযুক্ত থাকিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অথবা দেশেরই বা ক্ষতি কি? অবশিষ্ট অপূর্ণ উদর ৯৯'৫৩ ভাগ অধিবাসীরই —এ সাধনায় ক্ষতি কি?

আর একটা গুরুতর কথা ভুলিলে চলিবে না। যাঁহারা প্রাথমিক শিক্ষার ভাণে ও ওজরে উচ্চশিক্ষার বিরোধী তাঁহারা কি ভাবিয়াছেন যে, এই বিপুল লোক-সংখ্যার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার উপযুক্ত বালক বালিকার শিক্ষার ভার লইতে পারেন, এইরূপ শিক্ষক উচ্চশিক্ষার অভাবে কোন উপায়ে সংগৃহীত হইবে? বোধ হয় তাঁহারাও স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারিবেন না যে, যাঁহারা প্রাথমিক শিক্ষামাত্র পাইয়াছেন তাঁহারা উচ্চশিক্ষা না পাইয়াও পরবর্ত্তী যুগের প্রাথমিক শিক্ষার ভার লইতে পারিবেন। তাহা যদি পারেন, তাহা হইলে হোমিও প্যাথিক ডাইলিউশনের চূড়ান্ত হইবে।

বারশতাধিক হাই স্কুলের জন্য স্কুলপ্রতি অন্ততঃ ২০ জন শিক্ষক প্রয়োজন এবং কলেজের জন্য অন্ততঃ কলেজ প্রতি গড়ে ২৫ জন অধ্যাপকের প্রয়োজন। তাহা ছাড়া আইন ও চিকিৎসা শাস্ত্র শিখিবার জন্য গ্র্যাজুয়েটের প্রয়োজন। যেরূপ দিনকাল আসিয়া পড়িতেছে, যদি উচ্চশিক্ষার হার সরকারী ফতোয়া-মত হ্রাস করা যায়, তাহা হইলে এই সকল শিক্ষক, অধ্যাপক, ব্যবহারজীবী চিকিৎসক আসিবে কোথা হইতে? প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তিতেই কি তাহাদিগকে এই গুরুভার বহন করিতে হইবে? এই হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষাবিদ্যালয় মধ্যশ্রেণীর শিক্ষালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষকের উল্লেখ করা হইল না। সরকারী কর্ম্ম, বিষয়কর্ম্ম ও ব্যবসায়-স্থলে নানা বিভাগের নিয়োজিতব্য কর্ম্মচারীর কথা উল্লেখ করা হইল না। যেরূপ দিন-কাল পড়িতেছে, হয়তো তাঁহাদের কোনরূপ শিক্ষারই প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হইবে না, হয়তো Quota system অনুসারে জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-ও-সম্প্রদায়গত পার্থক্যের সার্টিফিকেট দাখিল করিলেই হাঙ্গামা মিটিয়া যাইবে।

লাট বাড়ীর নূতন কনফারেন্সের বৈঠকে "Delenda Est Carthego' ভৈরব নিনাদ উঠিয়াছে। দেশে যে ১২৫৪টি হাইস্কুল আছে, তাহা "যেন তেন প্রকারেণ" অর্দ্ধেক কমাইতে হইবে। দেশে যে ৬৩ কলেজ আছে, তাহার সংখ্যা কত কম করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে ফতোয়া এখনও প্রকাশিত হয় নাই; কিন্তু ভাইসচ্যান্সলার স্যার হাসান সরওয়ার্দি গত কনভোকেশন-বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, উচ্চশিক্ষা-বিস্তারের জন্য সহরের বাহিরে স্থানে স্থানে আরও Second-grade কলেজ স্থাপিত হওয়া উচিত। এদিকে তাহার পূর্ব্ব বৎসর কনভোকেশন-বক্তৃতায় চ্যান্সলার স্যার জন এণ্ডারসনও আইন অধ্যাপনায় কালাপাহাড় স্যার পি, সি, রায়ের উক্তির ভিত্তিতে বলিয়াছেন, যে দেশে তথাকথিত উচ্চশিক্ষার হার বর্দ্ধিত হইয়া বেকার-সমস্যা বাড়াইতেছে। এখন "বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা।"

রাজগৃহ বা গিরিব্রজপুর

শ্রীমতিলাল রায়

রাজগিরি বা রাজগৃহের কথা শুনিয়াছিলাম। উষ্ণ প্রস্রবণ থাকায় শীতকালে ইহা একটী উত্তম স্বাস্থ্যনিবাস বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম। ইহার উপর জগদীশচন্দ্রের উষ্ণ প্রস্রবণের সুখ্যাতি-পত্র পড়িয়া একবার ইহাতে অবগাহন করার ইচ্ছা প্রবল হইয়াছিল। তাই পাটনা হইতে লট-বহর লইয়া বক্তিয়ারপুরে নামিয়া মার্টিন্ কোম্পানীর ছোট গাড়ীতে একেবারে রাজগিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

ষ্টেশনে যখন গাড়ী আসিয়া পৌছিল, তখন প্রায় মধ্যাহ্ন-কাল। মাঘের শেষাশেষি, কাজেই রৌদ্রের প্রাখর্য্য ছিল, আর কঙ্করমিশ্রিত ধূলা উড়িতেছিল প্রচুর। ষ্টেশনে নামিতেই কুলি ও পাণ্ডার উপদ্রব এড়াইয়া ষ্টেশনের বাহিরে লক্ষ্য পড়িল দক্ষিণ-দিকের গিরিমালা আর সবুজ মাঠের প্রান্তে একটী নবনির্ম্মিত অট্টালিকা; জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—উহা একটী বৌদ্ধ-মঠ, স্বত্বাধিকারী একজন ব্রহ্মবাসী। ধর্ম্মশালার চেয়ে এইরূপ ক্ষেত্রে কিছু অধিক আরাম ও শান্তি পাওয়ার আশায় এই দিকেই চরণ দুটী ছুটাইয়া দিলাম। মঠে আশ্রয় পাইলাম বটে; কিন্তু মঠাধিকারী শুধু ব্রহ্মবাসী নহেন, একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুও বটেন—তিনি বাঙ্গালীকে বিশ্বাস করেন না, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী সাধুকে অতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখেন। তাহার এক কারণ, বাঙ্গালী সাধু পয়লা নম্বরের মিথ্যাবাদী; অন্য কারণ ভয়ঙ্কর রকমের ছুঁৎমার্গী। আমরা ইহার কোনটীই নহি বলিয়াও পার পাইলাম না। হুকুম হইল, আহারাদির পর তল্পি-তল্পা উঠাইয়া প্রস্থান করিতে হইবে। এইটুকু দয়াই তখন যথেষ্ট হইয়াছিল। কেননা, এই মধ্যাহ্নের রৌদ্রে আবার একটী নূতন আশ্রয় খুঁজিয়া লওয়া তখনই সম্ভব ছিল না।

স্নান সারিয়া লওয়ার জন্য অনতিদূরে উষ্ণ প্রস্রবণের অভিমুখে যাত্রা করিলাম। প্রবেশ পথে দুই দিকে দুইটী অত্যুচ্চ পাহাড় বিপুল সিংহ-মূর্ত্তির ন্যায় থাবা গাড়িয়া বসিয়া আছে। একটী ক্ষীণস্রোতা পয়নালী অতিক্রম করিয়া প্রস্তরসোপান অধিরোহণ করার পর সম্মুখে কয়েকটী মন্দির ও একটী মস্‌জিদের পার্শ্ব দিয়া স্নানার্থীর ভীড় চক্ষে পড়িল। একটী নাতিদীর্ঘ-প্রস্থ কক্ষের মধ্যে আকণ্ঠ-নিমজ্জিত কয়েকটী নরনারীকে নিস্পন্দ মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলাম। প্রাচীরপরিবেষ্টিত অন্য একস্থানে সারি সারি সাতটী ঝরণা লক্ষ্যে পড়িল। ইহার মধ্যে একটী দিয়াই অজস্র বারি নির্গত হইতেছে। স্নানার্থিগণ

বর্ত্তমান সহর হইতে রাজগৃহের উত্তর দ্বার

এইখানেই স্নান-কর্ম্ম সমাপন করিতেছে। আমরাও এই ধারাপ্রপাতের মুখে অঙ্গ পাতিয়া দিলাম। মনে হইল সর্ব্বশরীর দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। শীতের শিহরণ তখনও ঘুচে নাই, কিন্তু এই অত্যুষ্ণ জলধারা শরীরের পক্ষে আদৌ উপযোগী নহে; তবে আশ্চর্য্য, ইহার প্রথম স্পর্শ যে-রূপ অসহনীয় বলিয়া মনে হইয়াছিল, শরীর পূর্ণাভিষিক্ত হইয়া যাওয়ার পর আর উঠিতে ইচ্ছা হইল না। মনে হইল, সর্ব্বাঙ্গ যেন কেহ সযত্ন করপল্লব দিয়া "ফোমেণ্ট্" করিয়া দিতেছে। সে যে কি আরাম, ব্যক্ত করিবার নহে। স্নানান্তে শরীর ও মনের প্রফুল্লতার সঙ্গে অঙ্গবর্ণ ও মুখশ্রী মসৃণ ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। স্যার জগদীশচন্দ্র বলেন—রাজগৃহের উষ্ণ প্রস্রবণে প্রচুর পরিমাণে 'রেডিয়াম' আছে, ইহা বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া মনে হইল। স্নানার্থীদের মধ্যে অস্থি-ও-চর্ম্মরোগগ্রস্ত নরনারী অধিক। অস্থিগ্রন্থীর বেদনা দূর করার পক্ষে এই উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান মহৌষধ-

স্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আহারান্তে আমরা এই উষ্ণ প্রস্রবণের আরও উর্দ্ধে, বিপুল পর্ব্বতগাত্রে, আমাওয়ার রাজবাটীর দুইটী প্রশস্ত কক্ষে আশ্রয় লইলাম। দূর নীল-কটাহ-তলে গিরিশ্রেণী দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে, হরিৎ, পীত, নীল বনরাজির মেলা, আর তার কোলে কোলে জৈন ও বৌদ্ধগণের মঠ ও বিহার, নিম্নে সমতল ক্ষেত্রে বিরল কুটীর ও অট্টালিকার শোভা নয়ন ও মন বিমুগ্ধ করিল।

পরদিন অতি প্রত্যুষে আমরা ভ্রমণের জন্য বাহির হইলাম। গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া সমতল ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, এক বিস্তৃত রাজপথ আঁকিয়া বাঁকিয়া দক্ষিণদিকে ছুটিয়া গিয়াছে। উষালোকের অস্পষ্ট দৃশ্য যেন স্বপ্ন রচনা করিয়াছে; পথের উভয় পার্শ্বে তরুলতা-সমাচ্ছন্ন অরণ্যানী, দক্ষিণে বামে, সম্মুখে পশ্চাতে, আলো-অন্ধকারে পর্ব্বতরাজির সুগভীর অধিষ্ঠান। স্থানটী শুধু মনোরম বলিয়া বোধ হইল না—বড় পবিত্র ও মহিমামণ্ডিত বোধে অন্তরে আনন্দের অনুভূতি সঞ্চারিত হইল। বিস্মিত হইয়া সম্মুখে দেখিলাম, সারারাত্রি বিচরণশীল মৃগ-যূথ ক্লান্ত হইয়া, করুণ-নয়ন বিস্ফারিত করিয়া পর্ব্বতের সানুদেশে চিত্রার্পিতের ন্যায় নিস্পন্দ-ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। চক্ষের ভ্রান্তি বলিয়াই মনে হইল; কিন্তু তাহারা আমাদের পদশব্দে যখন বিদ্যুদ্বেগে দুর্গম পার্ব্বত্যপথে ছুটিয়া পলাইল, তখন এই কৌতুক-দৃশ্যে অপূর্ব্ব বিস্ময় ও আনন্দে চিত্ত ভরিয়া উঠিল। বালুময় পথের উপর তীক্ষ্ণ নখর-সংযুক্ত পদচিহ্ন তখনও মিলাইয়া যায় নাই। এই পর্ব্বতপরিবেষ্টিত গভীর অরণ্য ব্যাঘ্র-ভল্লুক-সমাকুল বলিয়া ধারণা হইল। পরে লোকমুখে শুনিলাম, আমওয়ার রাজবাড়ীর পশ্চাতে পার্ব্বত্য জঙ্গলে প্রায় ভল্লুকাদি শ্বাপদ জন্তুদিগকে পরিভ্রমণ করিতে দেখা যায়।

নূতন রাজগৃহের ভগ্ন প্রাকার

যত দূর অগ্রসর হই ততই মনে হয়, যেন পায়ের তলায় মৃত্তিকা-নিম্নে প্রাচীন ভারতের অক্ষয়কীর্ত্তি ঢাকা পড়িয়া আছে। দুই পার্শ্বে হঠাৎ লক্ষ্যে পড়িল, নিবিড় বেণুবন। বৌদ্ধযুগের বেণুকুঞ্জের কাহিনী স্মৃতি-পথে উদিত হইল পাহাড়ের কোলে বনপথে যত চলি তত অভাবনীয়
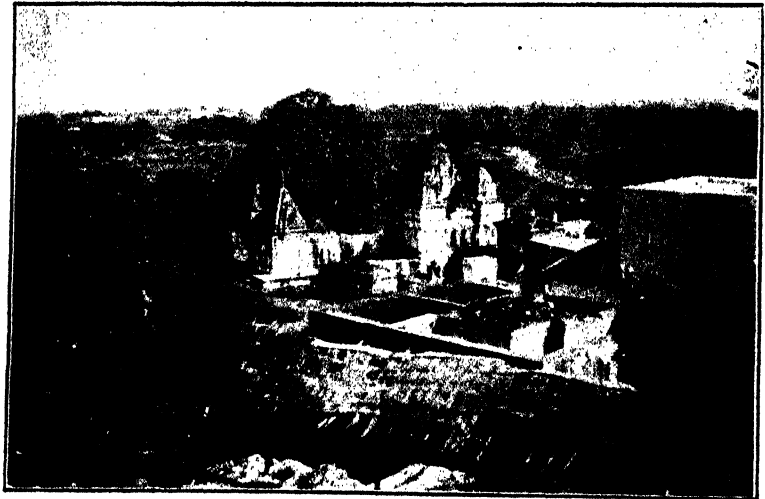
বৈভর-গিরি হইতে উষ্ণ প্রস্রবণ

আনন্দে-বিস্ময়ে বুক যেন ভরিয়া উঠে। এই গিরি-রাজিমেখলা, লোক-বিরল বনকুঞ্জে, শুষ্কপ্রায় তটিনীতীরে, অসংস্কৃত বন্ধুর পথের ধারে ধারে স্বপ্নের মত বিচিত্র উদ্যান, উপবন, পণ্যবীথিকা, মনোহর অট্টালিকার শোভা ফুটিয়া উঠিতেছিল। রাজগৃহ সম্বন্ধে আমার পূর্ব্ব ধারণা বিশেষ কিছু ছিল না; সুতরাং এইরূপ কল্পনা মাত্রে বিভোর হইয়া একপ্রকার মাতালের মতই গিরিপথে ভ্রমণ করিতে করিতে এক অনুচ্চ প্রাচীর আর ইহার প্রবেশপথে ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তিচিহ্নরক্ষার সরকারী বিজ্ঞাপন লক্ষ্যে পড়িল। প্রাচীরবেষ্টিত ভূমি দৈর্ঘ্যে প্রায় দুইশত গজের অধিক হইবে। উহার পূর্ব্বদিকে সমুচ্চ পর্ব্বত। এই ভূমিখণ্ডের উপর পাথর কুঁদিয়া অক্ষরের সমাবেশ সন্দর্শন করিলাম। কালপ্রভাবে তাহা অস্পষ্ট এবং অক্ষরগুলি দুর্ব্বোধ্যও বটে। এই ভূমির একপার্শ্বে শকটচক্রের গভীর সমরেখা লক্ষ্য করিয়া বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এই দৃশ্য অবলোকন করার পর মহাভারতে বর্ণিত গিরিব্রজপুরের কথা স্মরণ-পথে সমুদিত হইল। এত ক্ষণ ভাব-দৃষ্টিতে যে ঐশ্বর্য্য মাহাত্ম্য দেখিতেছিলাম, তাহার যথার্থ কারণ অনুভব করিয়া আত্মানুভূতির সত্যতার উপর শ্রদ্ধা জন্মিল।

এই সেই গিরিব্রজপুর!

বাল্মীকি-রচিত রামায়ণে, কুশ নামক রাজার ঔরসে বসু নামক মহাবলসম্পন্ন যে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তিনি গিরিব্রজ নামে উত্তম পুর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্রকে বলিতেছেন—"রাম! ঐ দেখ চতুর্দ্দিকে পাঁচটী পর্ব্বত দেখা যাইতেছে; এই শোনা নদী এই পাঁচটী প্রধান পর্ব্বতের মধ্যদেশ দিয়া রমণীয় মালার ন্যায় শোভমানা, ইহাই মগধদেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। এইজন্য ইহার আর একটী নাম মাগধী।"

বসুর পুত্র বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের পুত্র জরাসন্ধ। বসুরাজ-নির্ম্মিত এই গিরিদুর্গ-পরিবেষ্টিত প্রধান রাজনগরী গিরিব্রজপুরের অধিপতি রাজা জরাসন্ধ ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কংসকে নিধন করিয়া মথুরার সিংহাসন অধিকার করিলে, কংসের পত্নীদ্বয় তাহাদের পিতার নিকট শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছেদ-সাধনে অনুযোগ জ্ঞাপন করায়, মদমত্ত কুঞ্জরের ন্যায় জরাসন্ধ একুশ বার মথুরা আক্রমণ করেন। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের পরাজয় ইহাতে সাধিত হয় নাই। পরিশেষে, তিনি কালযবনের দল লইয়া মথুরা আক্রমণ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ মথুরা নগরী পরিত্যাগ করিয়া দ্বারকায় প্রস্থান করেন। পরে জরাসন্ধকে সম্মুখ-সংগ্রামে পরাজিত করা অসম্ভব মনে করিয়া ভীম ও অর্জ্জুনের সহিত ছদ্মবেশে কৃষ্ণ মগধ-রাজনগরীতে প্রবেশ করেন। তাঁহারা মিথিলা হইতে পূর্ব্বমুখে মগধদেশে গমন করিয়াছিলেন। গণ্ডকী ও মহাশোন অতিক্রম করিয়া গোরথ পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহারা মগধপুর নিরীক্ষণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই গিরিব্রজপুরের যে বর্ণনাবাণী বাহির হইয়াছিল তাহা

গৃধ্রকূট পর্ব্বত

কালের যবনিকান্তরালে চিরদিনের জন্য অদৃশ্য হইলেও, মগধপুরের প্রাচীন সমৃদ্ধির চিত্রখানি আজ আমার মানসপটে আঁকিয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—"হে পার্থ! ঐ দেখ বিবিধ পশুসমাকীর্ণ, বাপী-তড়াগাদি-যুক্ত, সুরম্য হর্ম্মো অলঙ্কৃত, উপদ্রবশূন্য, মগধরাজ্য শোভা পাইতেছে; ঐ দেখ বৈহার, বরাহ, বৃষভ ঋষিগিরি ও চৈতক নামে পাঁচ পর্ব্বত রহিয়াছে; এই শীতল দ্রুম-সুশোভিত উন্নতশিখর পর্ব্বত সকল পরস্পর মিলিত হইয়া যেন গিরিব্রজ রক্ষা করিতেছে। সুপুষ্পিত শাখাসমূদয়ে সুশোভিত, সুগন্ধযুক্ত, কামিজনপ্রিয়, মনোহর-লোধ্র বন-রাজি উহাদিগকে যেন গোপন করিয়া রাখিয়াছে।" আজও সেই গিরিব্রজ-সমুন্নত বৈহার প্রভৃতি পর্ব্বত-বেষ্টিত, সুপুষ্পিত, সুশোভিত, বিবিধ বৃক্ষরাজি-সমন্বিত হইয়া শোভা পাইতেছে বটে; কেবল নাই সুরম্য হর্ম্ম্যরাজি, শোণ নদীর

সিত প্রবাহ, আর তার উভয় তীরে রাজনগরীর অশেষ ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যের চিহ্নস্বরূপ মগধরাজের প্রাসাদ, দুর্গ, উপবনাদি ও সাম্রাজ্যের অতুলনীয় কীর্ত্তি। আজ খরস্রোতা শোণ নদীর পরিবর্ত্তে পর্ব্বতগাত্র বিধৌত করিয়া ক্ষীণকায়া সরস্বতী উত্তরগামিনী, উহাই পয়ঃপ্রণালীর ন্যায় আজ শ্রীহীন নগণ্য; আর গিরিব্রজের দক্ষিণভাগে বনগঙ্গা অতীতের স্মৃতি বুকে লইয়া অতি ক্ষীণ-মূর্ত্তিতে সাক্ষ্য দিতেছে।

বৌদ্ধযুগে এই পর্ব্বতপঞ্চের নামভেদ ঘটিয়াছে; বৈহারের নাম হইয়াছে বৈভর, বরাহের নাম হইয়াছে বিপুল, বৃষভের নাম হইয়াছে রত্নকূট, ঋষিগিরির নাম হইয়াছে গিরিব্রজগিরি আর চৈতক রত্নাচল নামে অভিহিত হইয়াছে। পালিগ্রন্থে নামান্তর ঘটিয়াছে আরও অধিক। ভবিষ্যতে অধিকতর বিকৃত নাম হইতে পারে; তখন আর এই পাঁচ হাজার বৎসরের প্রাচীন রাজনগরীর সন্ধান করাও বোধ হয় ঘটিয়া উঠিবে না।

"আমাওয়ার" রাজবাটী বৈভরশৈলের কটিদেশে অবস্থিত; অদৃশ্য অঙ্গুলীসঙ্কেতে পৌরাণিক ভারতের ও বৌদ্ধযুগের কীর্ত্তিক্ষেত্রে আসিয়াছি ভাবিয়া অন্তরে আনন্দের সঞ্চার হইল। এই বৈভর-পর্ব্বত গিরিব্রজপুরের উত্তর-দ্বার-রক্ষার একদিক, অন্যদিকে বরাহ পাহাড় অবস্থিত, পূর্ব্ব-পশ্চিম-প্রসারিত গিরিমালার মধ্যদেশ বিদীর্ণ করিয়া গিরিব্রজপুরের যেন প্রবেশ-পথ নির্ম্মিত হইয়াছিল; এইজন্য ইহাকে সূর্য্যদ্বারও বলে।

গিরিব্রজপুরে প্রবেশ করিতে হইলে, উত্তরে যেমন সূর্য্যদ্বার, দক্ষিণে সেইরূপ ঋষিগিরি ও চৈতকের মধ্যভেদ করিয়া পুরপ্রবেশ করিতে হয়, ইহার নাম গজদ্বার। পূর্ব্বদ্বার বরাহ ও বৃষভগিরি রক্ষা করিতেছে, এই বৃষভগিরিকে উদয়গিরি নামে অভিহিত করা হয়। আর পশ্চিমে বৈভরগিরির কিয়দংশ গিরিব্রজগিরি ও রত্নাচল দ্বাররক্ষকস্বরূপ দণ্ডায়মান আছে। মগধ রাজপুরী প্রকৃতির বিধানে সেদিন সত্যই অপরাজেয় ছিল।
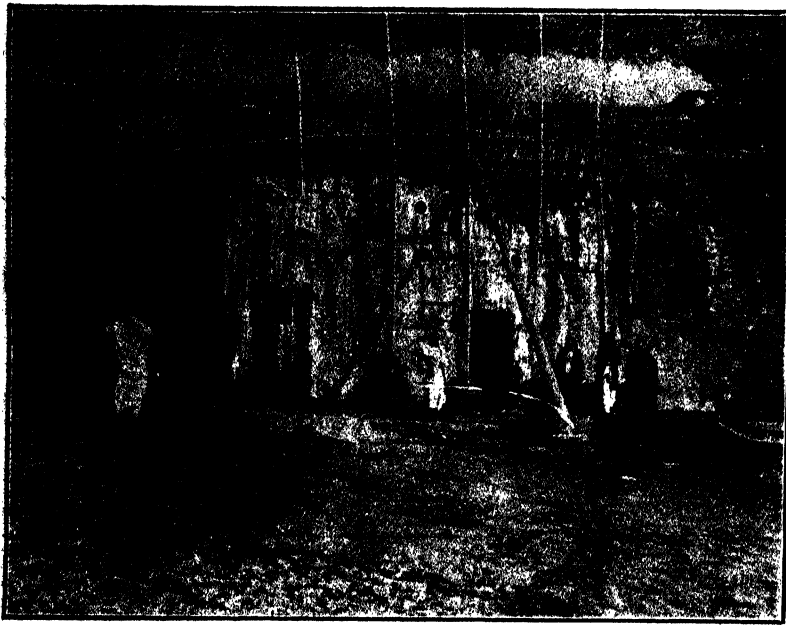
প্রাচীন স্বর্ণভাণ্ডার গুহা

জরাসন্ধের রাজপ্রাসাদ বৈহার ও রত্নাচল পর্ব্বতের মধ্যে অবস্থিত ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র ভীম ও অর্জ্জুনকে লইয়া দক্ষিণ-দ্বারে প্রবেশ না করিয়া চৈতক পর্ব্বত উলঙ্ঘন পূর্ব্বক গিরিব্রজে সমুপস্থিত হন। নগরবাসীকে তাঁহারা হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ, বর্ণচতুষ্টয়সম্পন্ন দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা রাজমার্গে গমন করিতে করিতে নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য, মাল্য, আপণ ও বহুবিধ সমৃদ্ধি নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। মগধনগরী গিরিমালা-বেষ্টিত হইলেও, ইহার অন্তরভাগ কয়েকটী উন্নত প্রাকার-দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। এইরূপ তিনটী বহুজনাকীর্ণ কক্ষ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা রাজপ্রাসাদের সমীপবর্ত্তী হন। বৈহার পাহাড়ে সুরক্ষিত রণভূমি ছিল, উন্নত গিরিশৃঙ্গ সমতল করিয়া এখনও বিস্তৃত উপত্যকা তাহার ধ্বংসাবশেষের ন্যায় পরিলক্ষিত হয়।

গিরিব্রজপুরের দক্ষিণদিকে পূর্ব্বে যে পার্ব্বত্য ক্ষেত্রে প্রস্তরলিপির কথা উল্লেখ করিয়াছি—উহারই সন্নিকটে রাজন্যবৃন্দকে জরাসন্ধরাজ বন্দী করিয়া রাখিতেন। বিপুল অথবা চৈতক পর্ব্বতের পার্শ্ব দিয়া পূর্ব্বে পঞ্চননদী প্রবাহিত হইত; এই পঞ্চননদী অতিক্রম করিয়া চৈতক পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন-কালে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন পর্ব্বত-গাত্রে এখনও নাকি লক্ষিত হয়। বৈহার পর্ব্বত-গাত্রে একটী

ক্ষুদ্র মন্দিরমধ্যে ইহা তীর্থ-যাত্রীর পূজার ক্ষেত্ররূপে বিদ্যমান আছে।

বৈহার পর্ব্বতের পদতলে সাতটী উষ্ণপ্রস্রবণ আছে।

রাজগৃহে পথমধ্যে প্রাচীরবেষ্টিত প্রস্তর লেখ

ব্যাস, মার্কণ্ড, সপ্তধারা, ব্রহ্ম, কাশ্যপ, গঙ্গাযমুনা, অনন্ত। ইহার মধ্যে সপ্তধারায় এখনও অজস্র বারি নির্গত হইয়া থাকে; পর্ব্বতগাত্রে পাথরের বিস্তৃত নলের মুখ দিয়া জল নির্গত হয়। আর ব্রহ্মকুণ্ডে মৃত্তিকাতল হইতে অনর্গল বারি উত্থিত হয়। অন্যান্য কুণ্ডগুলি ক্রমেই অব্যবহার্য্য হইয়া উঠিতেছে। এই সপ্তকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে আর পাঁচটী উষ্ণ-প্রস্রবণ আছে, তাহাদের নাম —সূর্য্য, চন্দ্রমা, গণেশ, রাম এবং সীতাকুণ্ড। ইহার অনতি-দূরে আর একটী উষ্ণপ্রস্রবণ শৃঙ্গি-ঋষিকুণ্ড বলিয়া অভিহিত হইত; কিন্তু উপস্থিত এক মুসলমান মগদুম্ শা ফকিরের নামে ইহার মগ্দুমকুণ্ড নাম হইয়াছে। এই কুণ্ডের ধারে একটী পর্ব্বতগুহার মধ্যে মগদুম্ নামক কবর আছে। তীর্থ-যাত্রীরা এই ফকিরের পূজা দিয়া থাকে। এই পর্ব্বতগহ্বরের উপরে একটী বিপুল প্রস্তরখণ্ড পতনোন্মুখ-রূপে দেখা যায়। কিম্বদন্তী রাওয়াল ও লাঠা নামক দুই ভাই যুক্তি করিয়া এই ফকিরকে বিনাশ করিবার জন্য পর্ব্বতগাত্র হইতে ইহা ঠেলিয়া দিয়াছিল; কিন্তু মগ্দুম্ শার তীব্র কটাক্ষে উহা অগ্রসর হইতে পারে নাই। এই উপকথা মহামতি বুদ্ধকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে দেবদত্তের প্রস্তর নিক্ষেপের ইতিবৃত্ত হইতেই অনুকৃত হইয়াছে, ইহা সহজেই বুঝা যায়। সেই নিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড দুইটী সুদৃঢ় প্রস্তর-মধ্যে আটকাইয়া যাওয়ায় দেবদত্তের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়।

বৃহদ্রথের পুত্র জরাসন্ধ নাকি উভয় রাণীর গর্ভে দুইখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ধাত্রীরা এই খণ্ডিত শিশুকে রাজপথে নিক্ষেপ করিয়া আসে। জরা নামক রাক্ষসী উভয়খণ্ড একত্র করার ফলে জরাসন্ধ জীবিত হয়। গিরিব্রজের উত্তর দ্বারের সন্নিকটে সপ্তকুণ্ডের পার্শ্বে জরাদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বৈহার, বিপুল, উদয় ও শোণগিরিতে জৈন মন্দিরে মহাবীর পরেশনাথ, ও

জৈন তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি

অন্যান্য তীর্থঙ্করদের স্মৃতি রক্ষিত রহিয়াছে। জৈনধর্ম্মিগণের ইহা প্রধান তীর্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বুদ্ধদেব প্রথম যখন রাজগৃহে আসেন, তখন রত্নগিরিতে অর্হত নামে এক মহাপুরুষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তারপর এইখানেই রুদ্রকের শিষ্য হন। কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষা-সাধনায় অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি রাজগৃহ হইতে প্রস্থান করেন। তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া যখন পুনরায় রত্নগিরির পূর্ব্বভাগে কৃষ্ণশিলায় প্রত্যাগমন করেন, তখন মহারাজ বিম্বিসারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। রাজগৃহ এই সময়ে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারের প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। জরাসন্ধের রাজ-প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী যে স্বর্ণভাণ্ডার গুহা এখনও বিদ্যমান আছে, সেইখানেই বুদ্ধদেব ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। ইহারই অনতিদূরে এক পর্ব্বতগুহায় বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য আনন্দ সাধন করিতেন।

সপ্তপর্ণী গুহা

গিরিব্রজপুরের উত্তরদ্বারের সম্মুখে, বিস্তৃত আম্র-কানন অম্বাপালির স্মৃতি জাগাইয়া দেয়। বুদ্ধদেবের চরণে এই মহীয়সী নারী আত্মোৎসর্গকালে এই আম্রকানন তাঁহাকে দান করেন। এইখানে তিনি ১২৫০ জন শিষ্যসহিত "তত্ত্ব-গাথা" প্রচার করিতেন। এইখানেই নালান্দার শারিপুত্র ও মুদ্গালায়ন বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বৈহার পর্ব্বতের মধ্যদেশে এক বিস্তৃত গুহা এখনও বিদ্যমান আছে; যে গুহায় আহারান্তে তিনি বিশ্রাম করিতেন আজ সেই গুহার উপর কয়েকটা কবর ভারতে মুসলমান-বিজয়ের সাক্ষ্য প্রদান করে। মহারাজ বিম্বিসার গিরিব্রজপুরের মধ্যে সুরম্য বেণুবন বুদ্ধদেবকে প্রদান করেন। মনে হয়, যেন এখনও তাঁর পদচিহ্ন এই নির্জ্জন বনকুঞ্জে বিদ্যমান থাকিয়া তীর্থযাত্রীর প্রাণে মহাভাব জাগাইয়া তুলে। বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু, মুসলমান ভারতের সকল জাতি সকল সম্প্রদায়ের 'রাজগির' এক মহাতীর্থ-রূপেই ধীরে ধীরে পরিগণিত হইবে। মহারাজ জরাসন্ধের ধ্বংসের পর ভারতে মহাকুরুক্ষেত্র-সংগ্রাম বাধে। গিরিব্রজপুরের কীর্ত্তিকাহিনী বৌদ্ধযুগারম্ভের পূর্ব্বে আর কাণে পৌছায় নাই। এই কালে প্রাচীন গিরিব্রজপুর পরিত্যাগ করিয়া ইহার উত্তরে সুনির্ম্মিত রাজনগরী নির্ম্মাণ করিয়া বিম্বিসার রাজত্ব করেন। দেবদত্তের ষড়যন্ত্রে তদীয় পুত্র অজাতশত্রু-কর্ত্তৃক তিনি নিহত হইলে পর, মগধ রাজপুরীর শ্রী মলিন হইয়া পড়ে; কিন্তু প্রাচীন গিরিব্রজ-পুর বুদ্ধের লীলানিকেতনরূপে জগৎকে আকর্ষণ করিয়াছে। সোনাভাণ্ডার গুহার প্রাচীর-গাত্রে যে সকল অক্ষর খোদিত আছে, তাহা বৌদ্ধযুগেরই গৌরবকাহিনী। এই গুহার মধ্যেই বৌদ্ধধর্ম্মিগণের প্রথম ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে যে কাহিনীর শিলালিপি গিরিব্রজপুরের দক্ষিণে মৃত্তিকাবক্ষে পাওয়া যায়, সোনার ভাণ্ডারের গুহার ভিত্তিগাত্রে এখনও তাহার কিছু কিছু নিদর্শন থাকায়, এইগুলির পাঠোদ্ধার যদি হইত, প্রাচীন ভারতের লুপ্ত ইতিহাসের এক উজ্জ্বলতম অধ্যায় আবিষ্কার করিয়া ঐতিহাসিক জগতে নূতন আলো ফুটাইয়া তোলা অসম্ভব হইত না। নালান্দার অপেক্ষা রাজগিরের পর্ব্বততলে যে সকল উন্নত স্তূপ এখনও বিদ্যমান আছে, তাহা খনন করিলে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী যে ইতিহাস নহে, এইরূপ প্রগল্‌ভতা কোন ঐতিহাসিক আর করিতে পারিবেন না বলিয়াই আমরা ধারণা করি। বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে ভারতের উন্নতি-যুগ ছিল। ভারত-গ্রন্থাদিতে সংশয়ী যাঁহারা, ভারতের বুক চিরিয়াই তাঁহাদের ভ্রান্তি দূর করা যাইতে পারে। মাহেঞ্জোদারোর ন্যায় রাজগৃহের বুকেও ভারতের অতি প্রাচীন কীর্ত্তি গুপ্ত আছে, এ অনুভূতি প্রত্যক্ষ দর্শনের ন্যায় আমার হৃদয়কে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে।

নবন্নুর

(উপন্যাস)

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কলকাতায় চার্ণক স্কোয়ারের উত্তর দিকে শক্তিকোটের রাজাদের বাসাবাড়ী। এই বাড়ীতে থেকেই রণজিৎ এত কাল পড়াশুনো করে আসছেন। বাড়ীখানি ছোট। উপরে তিনটি, নীচে তিনটি, সারবন্দী ঘর। দক্ষিণ দিকে প্রশস্ত বারান্দা। সামনে পিছনে বিস্তর জমী, দু বিঘার উপর। সামনে বাগান, পিছনে সিমেণ্টের টেনিস কোর্ট। রণজিৎ ফুল বড় ভালবাসে, তাই বাগানটি সুন্দর। নানা রঙ্গের দেশী বিলাতী ফুলে যেন হাসছে। কাঁকরের রাস্তাটি ঝক্ ঝক্ করছে। টেনিস কোর্টের অবস্থা ভাল নয়, ফাট ধরেছে। বাবুর খেলাধুলোর সখ নেই। কালেভদ্রে মহারাজ কলকাতায় এলে টেনিস হয়, নইলে খেলার সরঞ্জাম গুদাম-জাত হয়ে পড়ে থাকে, ইঁদুরের খোরাক জোগায়। রণজিৎ ভোরে উঠে ছাদে নিয়মিত স্যাণ্ডোর কসরৎ করে। তারপর খাকী রঙের কাটা ইজার পরে, মাথায় ধুচুনী-টুপী দিয়ে মালীদের সঙ্গে মাটি কোপায়। বেলা দুপুরে স্নান করে খেয়ে দেয়ে একগাদা খবরের কাগজ, মাসিক পত্রিকা, কেতাব-পত্র নিয়ে উপর তলায় আপিস-কামরায় আরাম কেদারাতে বসে। শ্রান্ত বোধ হলে সেই অবস্থাতেই একটু চোখ বোজে, কিন্তু বিছানায় শুয়ে দিবানিদ্রা দেবার অভ্যাস নেই। পাঁচটা পর্য্যন্ত পড়ে শুনে, চা খেয়ে, বাগানে পায়চারি করতে করতে বন্ধুদের জন্য অপেক্ষা করে। তারা সব জমা হলে পর আবার উপরে আপিসঘরে গিয়ে বসে। বৈঠক নটা সাড়ে নটায় ভাঙ্গে। তবে এক-আধ জন বন্ধু রোজ রাত্রে খেয়ে যান। রণজিতের খাওয়া দাওয়া সাহেবী কেতায় হয়। সুপকার জাতে চাটগেঁয়ে মগ। তাকে খাড়া হুকুম দেওয়া আছে যে রোজ দুজনের খানা রাঁধবে, কেউ থাক্ চাই না থাক্। একটা মার্কিনদেশী মোটর গাড়ী আছে। কদাচ কখন বন্ধুদের নিয়ে গঙ্গার ধারে হাওয়া খেয়ে আসে। নইলে একা তার বেরোন ঘটে উঠে না। ফটকে এক শ্বেতপাথরের ফলকের উপর আগে লেখা ছিল, শক্তিকোটের কুমার রণজিৎ বাহাদুর। এখন সেটা বদলে নূতন করে লেখা হয়েছে—

R. Roy, Esq. M. A , B. L. Vakil.

উকীল লেখা থাকলেও সাহেব আদালতে কখন যান না। মক্কেলও কেউ কোনদিন আসে নেই। ফটকের দুপাশে দুটী ছোট ছোট ঘর। তাইতে শমসুদ্দিন খাঁ বাঁধে বাড়ে, থাকে। রোজ রাত্রে দশটা থেকে বারোটা পর্য্যন্ত রণজিৎ নিজের পড়াশুনো করে। দিনে-রেতে লেখাপড়ার যা ফর্দ্দ দিলাম, তার থেকে মনে হতে পারে যে রণজিৎ নিয়মিত কোন রকম বিদ্যাচর্চ্চা করে। তাই তাড়াতাড়ি বলছি যে তার পড়ার কোন নিয়মই নেই। এই বুড়ো বয়সে তাকে রবিনসন ক্রুসো কি জুল ভের্নের আষাঢ়ে গল্প পড়তেও দেখা যায়। আবার কখন কখন দেখা যায়, দিনের পর দিন উপনিষদ নিয়ে পড়ে আছে, কি আধুনিক অর্থনীতির গোলক-ধাঁধায় প্রবেশের পথ খুঁজছে। মোট কথা, রণজিৎ রায় হাড়-কুঁড়ে লোক, পড়াটা তার একটা ব্যসন বই কিছু নয়।

সন্ধ্যাবেলায় যে আড্ডা জমে সেও ঐ একই ব্যাপার। দুনিয়ায় যত রকম শাস্ত্র কি শিল্পকলা আছে, সেখানে তার অনধিকার চর্চ্চা হয়। সঙ্গে সঙ্গে এক টিন সিগারেট আর গোটা বারো পেয়ালা চা ওড়ে। যাঁরা এই কীর্ত্তি করেন তাঁরা পাঁচজন। তাঁদের নামগুলো ক্রমশঃ প্রকাশ পাবে। তাঁরা নানা রঙ্গের লোক, তবে সকলকেই খেটে খেতে হয়। সকলেই লেখাপড়ার চর্চ্চা রাখেন, তবে জীবিকা অর্জ্জন করা ছাড়া আর কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত

হওয়ার ইচ্ছা তাঁদের কারও নেই। সন্ধ্যাবেলা পাখার নীচে বসে রণজিতের চা সিগারেট ধ্বংস করবার জন্য জমায়েৎ হন, বললে অন্যায় হবে। কেন না, পাঁচজনেই রণজিৎকে ভালবাসেন, তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে আনন্দ পান। বন্ধুমণ্ডলীর ঠিক রকম বর্ণনা করতে পারলাম কিনা জানি না। একবার নেতি, নেতি করে চেষ্টা করা যাক। এই ছয়জনের কেউ অতনুর বাণে বিদ্ধ হন নেই। কেউ কবিতা লেখেন না। কেউ ছবিও আঁকেন না। কেউ কখন সভাসমিতিতে যান না। কারও কোন খেলা-ধুলোর বাতিক নেই; ফুটবল ক্রিকেটেরও নয়, তাস-পাশারও নয়। স্বাস্থ্য সকলেরই ভাল, তবে কেউই গামা পালোয়ান নয়। দেশ-ভ্রমণ সবাই করেছে তবে কেউ **Livingstone, Stanley** নয়।

রণজিৎ জমিদারীর বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে যখন কলকাতায় ফিরল, তখন তার মনটা বড় উদাস হয়েছিল। তবে ও বিষয় নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে নেই। ফটকে নূতন ফলক দেখে ভবেশ একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, "কিহে রণজিৎ, এইবার মক্কেল শিকার সুরু করলে নাকি?"

রণজিৎ উত্তর দিয়েছিল, "না ভাই, ওসব আমার নসীবে নেই। তবে একটা নাম সংজ্ঞা চাই ত! আগে ছিল জমীদার, এখন সেটা খসেছে। ভবঘুরে ভাল শোনাবে না, তাই উকীল লিখেছি।" আর কোন কথা হয় নেই।

ভবেশ জাতে বামুন। ভট্টনারায়ণের বংশধর। বাপ ছিলেন অধ্যাপক ব্রাহ্মণ। ছেলে বি-এ, পাশ করেছে। এক সাহেবী ভোজনালয়ে খাজাঞ্চীগিরি করে। সেখানে ঘ্রাণপথে নিত্য যে সব খাদ্যের সৌরভ পেটে যায়, আগেকার দিন হলে পীরালী হয়ে যেত। তা যাই হোক, ভবেশ সংস্কৃত খুব ভাল জানে, ষড়দর্শনে তার গভীর জ্ঞান। সংস্কৃতের মাষ্টার হয়েই রণজিতের বাড়ী প্রথম ঢোকে। এখন দুজনের বেশ ভাব হয়েছে। এদের সান্ধ্যবৈঠকে ভবেশই সনাতনপন্থীদের প্রতিনিধি ছিল। ইংরেজী পোষাকও পরত না, বড় বড় মাংসগুলোও খেত না, তাই একরকম মানিয়ে যেত।

দিন দশেক বাদ একদিন বিকেলবেলা রণজিৎ চুপচাপ উপরের ঘরে বসে রয়েছে, এমন সময় তার বন্ধু আহমদ ভাই এল। আহমদকে দেখেই সে লাফিয়ে উঠল। বললে, "তোমার সঙ্গে নিরিবিলি একটু কথা আছে, ভাই। ভবেশটা এসে পড়লে গণ্ডগোল। চল, আধ ঘণ্টা বেড়িয়ে আসা যাক!" দুজনে গাড়ীতে বেরিয়ে গেল।

গঙ্গার ধারে বসে আহমদ জিজ্ঞাসা করলে, "কি হয়েছে বল দেখি রণজিৎ? তোমার মনটা ভাল নেই, বোধ হচ্ছে।"

"সত্যি মনটা ভাল নেই, ভাই। আমার বাড়ীর ব্যাপার তোমাকে ত বলেছি। আজ বৌদির এক চিঠি পেলাম, যে দাদা এ বছর থেকে মহরমে আর তাজিয়া বের করবেন না। দরগায় যা পয়সা-কড়ি এষ্টেট থেকে দেওয়া হয় তাও বন্ধ করে দিয়েছেন। সামান্য যা দেবোত্তর জমী আগে কর্ত্তারা দিয়ে গেছেন সেইটুকু থাকবে। কিন্তু সে ত বেশী নয়। বল দেখি ভাই, এ কাজটা কি ভাল হল? এতকালের পুরাণো ব্যাপার!"

আহমদ বললে, "তাতে তোমার দুঃখ কেন রণজিৎ? ভারতবর্ষের এখনকার ধারাই ত এই হয়েছে। হিন্দু মুসলমান আর পরস্পরের উৎসবে ত যোগ দিতে চায় না।"

"কিন্তু আহমদ, এ কি উচিত? এ কি স্বাভাবিক? এই নিয়ে একটা মহান্ রাষ্ট্র গড়ে উঠবে কি করে? আমি রাষ্ট্রনীতির ধার ধারি না বটে, কিন্তু পাড়াপড়শীর মাঝে কি এটা শোভা পায়?"

"নিশ্চয় শোভা পায় না রণজিৎ, কিন্তু উপায় কি? একটা গোঁড়ামির হাওয়া দেশময় বইতে লেগেছে। যতদিন এ হাওয়া বইবে, ততদিন আমাদের রাষ্ট্রনীতি বেশী দূর এগোবে না।"

"দাদা একদিন বলছিলেন যে, আগে আমাদের মুসলমান রাইয়ৎরা দলে দলে দুর্গোৎসবে আসত, এখন আসে না—বলে, মোল্লাদের মানা আছে।"

"তা ভাই, তারা আসবে কেন? তারা যে আজ গোঁড়া মুসলিম হয়েছে! গোঁড়া মুসলিমের চোখে মূর্ত্তি-পূজার প্রশ্রয় দেওয়া মহাপাপ। অথচ দেখ, আমরা

মুসলমানেরা যদি এই রকম করে পুরানো সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করি, ত তোমরাই বা কেন না করবে? তোমার দাদাকে আমি দোষ দিতে পারি না। তোমার আমার কথা স্বতন্ত্র। আমাদের মাঝে ধর্ম্মমূলক বিদ্বেষ আসতে পারে না, কেন না, আমি সুফী হাফেজ রুমীর শিষ্য, আর তুমি হিন্দু হলেও গো-খাদক। আমি ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র দেখি, মুসলমানের মসজিদে, নসরানীর গির্জ্জায়, বৌদ্ধদের মন্দিরে। তুমিও কিছু কোরবানি নিয়ে লাঠালাঠি করতে বেরোবে না।"

"আহমদ, এই কোরবানি শুনে একটা কথা মনে পড়ল। ভবেশ যে দিবারাত্র তর্ক করে, হিন্দু উদার তার কোন সঙ্কীর্ণতা নেই, কিন্তু ভারতবর্ষে প্রত্যেক হিন্দু রাজ্যে গো-বধ নিষিদ্ধ, অথচ কোন মুসলমান রাজ্যে পৌত্তলিকতা নিষিদ্ধ নয়। এর থেকে কি বুঝতে হবে?"

"মুসলমানের কাছে হিন্দু অস্পৃশ্য নয়, কিন্তু হিন্দুর পূজাপদ্ধতি অসত্য। আর হিন্দুর চোখে মুসলমান অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ, কিন্তু তার পূজাপদ্ধতি অসত্য নয়। হিন্দু তার হিন্দুত্ব বজায় রাখে, নিজের দেহকে অস্পৃশ্যের স্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে, আর মুসলমান ইস্‌লাম ধর্ম্ম বজায় রাখে নিজের এক অদ্বিতীয় আল্লার আরাধনাকে পবিত্র রেখে।"

"সে সব ত বুঝলাম ভাই, কিন্তু আমি করি কি? শক্তিকোটে গিয়ে চিরপ্রথামত তাজিয়া বের করব? লাল শাহের দরগায় নিজের যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে আসব?"

"তা করে কোন ফল নেই, রণজিৎ। তাতেও এই ধ্বংসের আগুন নেভাতে পারবে না। আগুন যে শুধু শক্তিকোটে জ্বলছে তা ত নয়। চল রণজিৎ, দিন কয়েক ফকীরী নিয়ে ঘুরে আসি। আমি তোমাকে গোটাকতক তীর্থস্থানে নিয়ে যাব। মনে শান্তি পাবে।"

"তাই চল আহমদ। কংগ্রেস-পন্থী নই, তবু সময়ে সময়ে বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। এক অখণ্ড ভারত কি কেউ কখন দেখবে না!"

"খোদার মরজী হয় দেখবে, কিন্তু এখনও বহুদিন আমাদের দণ্ডবিধান করবার জন্য বিদেশী কাজী কোটালের প্রয়োজন।"

আহমদ ভাইয়ের সঙ্গে রণজিতের পরিচয় হয় একদিন রেলে। একটু আলাপ করে দুজনেই আশ্চর্য্য হয়ে গেছল। কংগ্রেসপন্থী মুসলমানও বেশী নেই, ফার্সী কবিতা অনর্গল আওড়াতে পারে, এ রকম বাঙ্গালীও বড় একটা দেখা যায় না। খুব আনন্দে সময় কাটল। হাওড়া ষ্টেশনে দুজনে দুজনার ঠিকানা টুকে নিলে। তারপর একদিন রণজিৎ গিয়ে আহমদকে ধরে আনলে তাদের সান্ধ্য বৈঠকে। এক দিনেই আহমদের সঙ্গে সকলের ভাব হয়ে গেল। রণজিৎ কাউকে সেদিন ছাড়লে না। সবাইকে খাইয়ে দাইয়ে রাত বারোটার সময় বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এল। আহমদ জাতে খোজা মুসলমান, বাড়ী বোম্বাই। রাধাবাজারে কারবার আছে। বি-এ পাশ করে বাপের আপিসে ঢোকে। একবার বিলেতও ঘুরে এসেছে। বাপ, তৈয়ব আলি শেঠ, চিরদিন কংগ্রেসের লোক। মুসলমান সম্প্রদায়ের এত রকম বেশ-পরিবর্ত্তনের মাঝে বৃদ্ধ এক তিল এদিক ওদিক হেলেন নেই। ছেলে নিজের ব্যবসা বাণিজ্য লেখাপড়া নিয়েই থাকে। কংগ্রেসে যায় নেই, তবে বাপের উদারতা পূর্ণমাত্রায় পেয়েছে। বাঙ্গলা বেশ বুঝতে পারে। একটু একটু বলতেও পারে।

এদের বৈঠকে আর একটি মুসলমান আছেন, নাম আলিম-উজ্জমান। তাঁর বাড়ী পাটনা। পেশাদার মৌলবী, তবে একেলে লোক। ইংরেজী জানেন। বাংলা জানেন না। জাতে শিয়া মুসলমান। শিয়ার পক্ষে যতটা গোঁড়ামি সম্ভব, তা এঁর আছে। সময়ে সময়ে ভবেশের সঙ্গে তুমুল তর্ক লেগে যায়। তবে এঁদের তর্ক-বিতর্ক বুদ্ধিমান লোকের যোগ্য। কেউ আত্মহারা হয়ে যায় না।

দলের চারজনের পরিচয় দেওয়া হল। এখনও রইল দুজন। তার একজন হরিমোহন সেন, বাড়ী বিক্রমপুর। জাতে বৈদ্য, পেশা টাউন কলেজে মাষ্টারী। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ, এম্, এ, পি, আর, এস্। কিন্তু বিদ্যা যতটা গলাধঃকরণ করেছেন, তার অর্দ্ধেকও হজম করতে পারেন নেই। সমাজ ও রাজনীতিতে ভবেশের ভক্ত। তবে একে নিজে ব্রাহ্মণ নয়, তায় গোঁড়া তিলক-কাটা বৈষ্ণব, ভবিষ্যৎ ভারতে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্বীকার করতে গররাজী। তা হলেও মুসলমানদের আমল দেওয়া সম্বন্ধে ঘোর

আপত্তি। ভদ্রলোকের বাঁধা বুলি, "মুসলমান cycle (যুগ) হয়ে গেছে। এখন ইংরেজ cycle চলেছে। ভবিষ্যতে হিন্দু cycle।" আহমদ একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল। "হরিমোহন সাইকেল চড়েন না, সেই সাধটা ইতিহাসের সাইকেল চড়ে মেটান।"

আড্ডার বাকী লোকটির নাম সত্যকিঙ্কর মুখার্জ্জী। জাতে ব্রাহ্ম, বা ব্রাত্য ব্রাহ্মণ। পেশা ব্যারিষ্টারী। সর্ব্বদা সাহেবী কাপড় পরেন। বলেন, "ধুতি নেই, ভাই। একটু পশার জমলেই ও সব সরঞ্জাম জোগাড় করব।" বিলেত মুলুকটার নানা রকম তারীফ করেন। ভবেশের সঙ্গে আগে নানা রকম তর্ক বাধত। কিন্তু ইদানীং ব্রাহ্ম আর সনাতনীর একটা বোঝাপড়া হয়ে গেছে। কারণটা বোধ হয় রাষ্ট্রনৈতিক (আহমদ বলে, মুসলমান পীড়ন)। তবে, মুখার্জ্জী এখনও গঙ্গাস্নান তিলককাটা ইত্যাদি বিষয়ে আগ্রহ দেখায় নেই।

যখন রণজিৎ আর আহমদ ফিরে এল, বাকী চারজন আগানে বসে। তারা হৈ হৈ করে উঠল "আমাদের জন্য একটু দাঁড়াতে পারলে না! কি স্বার্থপর লোক তোমরা!"

রণজিৎ চুপ করে রইল। আহম্মদ বললে, "ভাই, কিছুদিন তোমাদের চারজনকেই বৈঠক আলো করে থাকতে হবে। রণজিৎকে আমি দিন পনের আমার দেশে নিয়ে যাচ্ছি।"

ভবেশ জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায়, কোথায়? আমাদের একবার বললে না হে!"

আহমদ ভাই উত্তর দিলে, "আমার বাবা নিমন্ত্রণ করেছেন। প্রথম বোম্বাই যাচ্ছি। তারপর বাবা যেখানে নিয়ে যাবেন, সেইখানে যাব। তাঁর ত পুণায় ও মহাবলেশ্বরে বাড়ী আছে।"

ভবেশ একটু ঠাট্টার ছলে বললে, "রণজিৎ, ভাই, একেবারে মুসলমানের বাড়ীতে উঠবে? তোমরা আর জাতধর্ম্ম কিছু রাখলে না দেখছি!"

রণজিৎ ঠাট্টা বুঝলে না। একটু ঝাঁঝাল স্বরে বললে, "ছিঃ ভবেশ, এদের সামনে এ কথা বলতে একটু লজ্জা করল না? চাকরী কর ত ফিরিঙ্গীর হোটেলে! চাচার দোকানের কাটলেট পেলে মহাপ্রসাদের মতন ভক্তিভরে খাও! তুমি কিসের হিঁদু?"

ভবেশও একটু বিরক্ত হল। বললে, "তোমরা ঠাট্টা বোঝ না। তোমাদের কাছে কিছু বলাই মুস্কিল। তবু, এ কথা আমি বলব, যে ব্রাহ্মণের ছেলে একেবারে মুসলমানের ঘরে বাস করা বাড়াবাড়ি।"

মুখার্জ্জী একটু মুখ টিপে বিলেত-ফেরতা হাসি হেসে বললে, "Caste আমি মানি না। You know, মানতে পারিও না। কিন্তু তাই বলে, you see, হিন্দু মুসলমানের একটা ভেদ আছে ত!"

মৌলবী সাহেব উপহাস করে বললে, "ভেদ আছে বই কি, মিষ্টার হিন্দু সাহেব! পৌত্তলিকের সঙ্গে মেলামেশা করলে মুসলমানের ধর্ম্ম বিগড়ে যায়, জান? আরব দেশের পবিত্র ইসলামধর্ম্ম হিন্দুস্থানে এসে কি রকম বিকৃত হয়েছে, তা আমরা সবাই জানি। এই পবিত্রতা রক্ষা করবার জন্যই ত আজ ওয়াহাবীরা মহরমে তাজিয়া বের করতে অবধি দিতে নারাজ।"

আহমদ একটু হেসে বললে, "সকলই সময়ের গুণে হয়। মুসলমান আমলে, মুসলমান বাদসাহের রাজ্যে, লোকে, রাম রহিম না জুদা করো দিলকো সাচ্চা রাখো জী, গেয়ে গেছে। আর আজ বিশ শতকে সবাই সুসভ্য সাহেব সেজে ভেদের সৃষ্টি করে ধর্ম্মকে ছুঁৎ থেকে বাঁচাচ্ছে। আলিম-উজ্জমান ভাই, ইসলাম কি এত ঠুন্‌কো জিনিস, যে ছুঁৎকে ভয় করে!"

রণজিৎ এই সব কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠছিল বললে, "ভবেশচন্দ্র, পাঁচশো বছর এই মুসলমানের পদরজঃ লেহন করে ত তোমার সাত্ত্বিকতার হানি হয় নেই! কিসের বড়াই তোমার এত? বাঙ্গালী তুমি, বাঙ্গলা দেশে পাঁকের মাঝে তোমার উৎপত্তি, তোমার আভিজাত্যের গৌরব একটা হাস্যাস্পদ জিনিস। আহমদ, আলিম, চিরকেলে রাজার জাত। তোমার সঙ্গে আজ মেহেরবানী করে ভাত খায়, সাহেবদের মত দূরে ঠেলে রাখে না এ ত একটা অভাবনীয় জিনিষ।"

ভবেশ বললে, "ভাই, তুমি এই সব বাজে মার্কা তোতাবুলি না আউড়ে যদি হিন্দু-সংঘটনে মন দাও, ত, অনেক উপকার হবে।"

"হিন্দু সংঘটন! কবে থেকে দেশে এ বুলি উঠল, ভবেশ? ভারতে মহাজাতি-সংঘটনের বিষাণ শুনতে শুনতে আমরা বড় হয়েছি। অন্য আওয়াজ এখন আমার কানে ঢোকে না।"

আহমদ দাঁড়িয়ে উঠল, বললে, "চল, সব বাড়ী যাওয়া যাক আজকের মত। কথা কাটাকাটি করে বা মেজাজ খারাপ করে কি লাভ বল? হিন্দু হই বা মুসলমান হই, আমরা ছজন বন্ধু। ভগবান করুন সেই বন্ধুত্ব যেন কায়েম থাকে।"

সবাই উঠল। হরিমোহন বললে, "Amen, তথাস্তু! কিন্তু ভাই, মুসলমানের cycle হয়ে গেছে, এটা তোমাদের মানতেই হবে।'

পরদিন সকালবেলা যখন রণজিৎ বাগানে কাজ করছে, একটি ছোকরা এসে নমস্কার করলে। রণজিৎ জিজ্ঞাসা করলে, "কে তুমি, কাকে চাও?"

"আজ্ঞে, আমার নাম নরেন্দ্রনাথ মিত্র। আমি আপনার সতীর্থ সুরেন্দ্রবাবুর ভাই। তাঁর বড় অসুখ। বাঁচবার আশা নেই। একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন, তাই আমি খবর দিতে এসেছি।"

"আচ্ছা ভাই, এখনই যাব। তুমি আমার সঙ্গে এস। অরি সিং, মোটর বের কর।"

একটু পরে রণজিতের মোটর গিয়ে দাঁড়াল এক অন্ধকার গলিতে, অতি পুরানো ভাঙ্গা এক বাড়ীর সামনে। নরেন তাকে ভেতরে নিয়ে গেল। সে দেখলে বন্ধু সুরেন এক তক্তায় পড়ে রয়েছে। অস্থিচর্ম্ম-সার। চোখ কোটরে বসে গেছে। শিয়রে বসে একটি মলিন-বসনা স্ত্রীলোক পাখা করছেন। রণজিৎ আসতে স্ত্রীলোকটি উঠে গেলেন। সে তক্তায় বসে রোগীর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞাসা করলে, "কি হয়েছে, ভাই সুরেন, আমি ত কিছুই জানতাম না। একবার খবর দিতে নেই!"

সুরেন খুব আস্তে আস্তে উত্তর দিলে, "দিই নেই, ভাই। দুর্ব্বুদ্ধি হয়েছিল। অহঙ্কার, রণজিৎ। দেমাক! মনে হল, কারও কাছে হাত পাতব! হলামই বা গরীব?" আর কথা কইতে পারলে না।

রণজিৎ চোখের জল মুছতে মুছতে বললে, "আমি যে তোমার কত কালের বন্ধু, সুরেন! আমাকে সামান্য কর্ত্তব্যটুকু করবার সুযোগ দিলে না!"

সুরেন একটু থেমে ম্লান হাসি হেসে বললে, "তাই ত তোমাকে ডেকেছি, ভাই। সুযোগ বল, কুযোগ বল, তোমার এই ভাই ভাজের ভার তোমার হাতে তুলে দিয়ে আমি ছুটী নিতে চাই। এরা কাল যে কি খাবে তার সংস্থান নেই।" বলে একটু চোখ বুজলে।

রণজিৎ নরেনকে বললে, "তোমাদের ত অনেক আত্মীয় কুটুম্ব। তাঁরা কেউ খবর রাখেন না?"

নরেন কাঁদছিল। বললে, "প্রথম মাস দুই চার, কেউ কেউ লোক পাঠিয়ে খবর নিতেন। ইদানীং আর কেউ আসে না। বৌদি একদিন আমাদের এক পিসের বাড়ী লুকিয়ে লুকিয়ে গেছলেন। পিসীমা বললেন,—আমরা কিছু করতে পারব না। যা দিন কাল পড়েছে, নিজেদেরই খরচ কুলোতে পারি না। আমাদের এই পিসেমহাশয়ের মস্ত তেতলা বাড়ী, দুখানা মোটর গাড়ী, কত দাস দাসী, আমলা মুহুরী!"

এমন সময় সুরেন চোখ চেয়ে ডান হাতটা বাড়িয়ে, দিলে রণজিতের দিকে। ধীরে ধীরে বললে, "ভাই, এইবার ছুটী" বলে কি রকম হাঁপাতে লাগল। রণজিৎ বাইরে গিয়ে গাড়ীতে বসল। দুচার মিনিট বাদ ভেতর থেকে কান্নার রোল উঠল।

খানিক পরে নরেন বাইরে এসে বললে, "রণজিৎদা, এখন কি হবে?"

রণজিৎ সস্নেহে তার পিঠে হাত বুলিয়ে বললে, "আমি এই খানে আছি, ভাই। কোনও ভয় নেই। তুমি আমার গাড়ীখানা নিয়ে একবার তোমার আত্মীয় স্বজনদের বাড়ী বাড়ী খবর দিয়ে এস।"

সুরেনের পাড়া পড়শী অধিকাংশ ছুতোর, কামার, মিস্ত্রী। তারা কান্না শুনে একবার এল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

খবর নিয়ে যে যার কাজে চলে গেল। পাড়ায় দুই এক ঘর গেরস্ত কায়েত বামুন যারা থাকত, তারা কাছে ভিড়ল না। একটু দূরে দাঁড়িয়ে, কৃপাদৃষ্টি করে সরে পড়ল। গলির মোড়ে একঘর বণিক বড়লোক থাকতেন। তাদের বাবু আফিস যাওয়ার পথে গাড়ী খাড়া করে, পান চিবোতে চিবোতে, রণজিৎকে আপ্যায়িত করে গেলেন। "কি হে, তোমাদের এখনও মড়া উঠল না! লোক-জন জমাতে পার নেই বুঝি? গরীবের কষ্ট কেউ দেখে না। আজকাল লোকে বড় স্বার্থপর হয়েছে।"

রণজিৎ এই দয়ালু লোকটির কথার কিছু জবাব দিলে না। সে দরজার চৌকাটের উপর বসেছিল। নিকটের ডোমপাড়ার দুজন বুড়ো সরদার এসেছিল। তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইছিল।

একজন বললে, "বাবু, আপনার বাঙ্গালী লোক বড় আপ-গরজী। সবাই এসে একবার দাঁত বের করে চলে যাচ্ছে। আমাকে হুকুম করুন, এক লহমায় বিশটা ডোম নিয়ে আসব। আপনার বড় জোর বোতল দুই চার দারু খরচ হবে। মুরদা নিয়ে যাওয়া ও ধরমের কাজ, বাবু। লেকিন সে ত হবার নয়। আপনাদের লোকেদের জাতের গোলমাল আছে। স্বরেন বাবু আর বহুমা বড় ভাল লোক, হুজুর। এই গেল মাসেই আমর ছোকরাটার বেমারির সময় তেনারা রোজ দু ঘণ্টা করে কাছে বসে দাওয়াই দিয়ে আসত।"

রণজিৎ ভারী গলায় উত্তর দিলে "আচ্ছা সর্দ্দার, দরকার হয় তোমাকেই ভার দেব। জাতের গোলমাল আমাদের নেই।"

"সেই ভাল, বাবু। জাত বড় পাজী জিনিষ। মুসলমানের কি আমাদের ঘর হলে এতক্ষণ বিশ তিরিশ জন লোক জমে যেত।"

নরেন যখন ফিরে এল, তার সঙ্গে এলেন এক আধবয়সী খোঁড়া ভদ্রলোক, তিনি নিজের পরিচয় দিলেন, স্বরেনের জ্ঞাতি খুড়ো বলে। নাম হরেন বাবু, এক পোদ্দারের দোকানে দশটাকা মাইনের চাকরী করেন। রণজিৎকে ভক্তিভরে প্রণাম করে বললেন, "মহাশয়ের পরিচয় নরেনের কাছে শুনলাম। সাতপুকুরের রাজা মহারাজা না হলে এ রকম হৃদয় দেখা যায় না। আমাদের বড় লোক আত্মীয় কুটুম্বরা ত কেউ গা করলেন না, মশায়। আমরা সাত বাড়ী গেছলাম। দুই বাড়ীতে দরোয়ানের ঘর পর্য্যন্ত গিয়ে আটকে পড়লাম। তিন বাড়ীতে দপ্তরখানা পর্য্যন্ত, তাও আপনার মোটরের খাতিরে। বাকী দুই বাড়ীতে বাবুদের সাক্ষাৎ পেলাম। কিন্তু তাঁরা রুগ্নশরীর, কেউ বাত, কেউ অম্লশূল, কেউ হাঁপানীতে ভুগছেন। নিজেরা বার হতে পরেবেন না, কায়স্থ আমলা এলে পাঠিয়ে দেবেন।

রণজিৎ একটুক্ষণ চুপ করে রইল, তার পর নরেনকে বললে, "ভাই, তুমি তোমার বৌদিদিকে জিজ্ঞাসা করে এস, তিনি অনুমতি দেন ত আমরাই সৎকার করে আসি। কি বল সর্দ্দার? লোক নিয়ে এস।"

হরেন বাবু বললেন, "ডোম দিয়ে স্বরেনের সৎকার করাবেন মশায়, এ কি কথা! হলই বা গরীব, কুলীন কায়স্থের ছেলে ত!"

"ডোম দিয়ে বওয়ানতে আপনার আপত্তি আছে, হরেনবাবু! তা বেশ ত, আমি কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে, আমি এক দিকে কাঁধ দেব, আপনি আর নরেন আর এক দিকে দেবেন। ডোমেরা স্বরেনের বন্ধু, তারা সঙ্গে আসবে, রাম নাম করবে।"

লছমন ডোম প্রণাম করে বললে, "বাবু, আপনি ব্রাহ্মণ! এতক্ষণ কিছু বলেন নেই ত! দেখে বামুন বলে চিনতে পারি নেই। মনে হচ্ছিল কোন আমীর বাবু লোক।"

নরেন বেরিয়ে এসে বললে, "লছমন সর্দ্দাদের লোকেরা দাদাকে নিয়ে গেলে বৌ-দিদির কিছুমাত্র আপত্তি নেই। হরেনকাকা খোঁড়া মানুষ, কাঁধ দিতে পারবেন না। উনি বৌদিদির কাছে থাকুন। চলুন দাদা, আমরা দুজনে যাই। কিন্তু আপনার যে বড় কষ্ট হবে!"

রণজিৎ গম্ভীর হয়ে বললে, "দাদার সঙ্গে জ্যাঠামি করতে নেই, নরেন!"

খানিক পরে রণজিৎ ও নরেন লছমনের সঙ্গে "রাম নাম সৎ হ্যায়" বলতে বলতে বেরিয়ে গেল। বাবুর হুকুমে অরি সিং মোটর নিয়ে বাড়ীর সামনে হাজির রইল।

পাঁচটার সময় রণজিৎ বাড়ী ফিরল। অবসন্ন ক্লান্ত দেহ মন। আরাম কেদারায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল। ঝোঁকের মাথায় কত কি করে ফেললে! কোথাও কিছু নেই; হঠাৎ এক বালকের ও অনাথা বিধবার ভার নিয়ে বসল। ডোমেদের সঙ্গে হৈ হৈ করে শবদাহ করে এল। তা হয়েছে কি! বেশ করেছে। বন্ধুর দেহটাকে ত রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসতে পারে না। তার বিধবাকেও উপবাসে মরতে হুকুম করতে পারে না। নরেনকে বছর সাত আট পড়াবার মতন সঙ্গতি তার আছে। তার পর নিজেই সেসব ভার মাথায় করতে পারবে। কিন্তু ইতিমধ্যে ওদের বড়লোক আত্মীয় কুটুম্ব ওদের উপর জুলুম না করে! তা, তাদের তে-সীমানায় না গেলেই হল। কোন ভদ্র-পল্লীতে একটা ছোট বাড়ী ভাড়া করে দেবে, আর হরেনকে কিছু পয়সা কবুল করলে সেই দেখাশুনো করবে এখন।

ভাব-বিলাসী যুবকের পক্ষে কর্ম্মপ্রচেষ্টা কি সহজ ব্যাপার! অরি সিংকে দিয়ে এক গাদা ফল পাঠিয়ে দিলে, নরেনের জলখাবারের জন্য। সরকারবাবুকে ডেকে হুকুম করলে, যেন হপ্তাখানেক দিনরাত সুরেনের বাড়ী হামেশাল হাজির থাকে। এই সব ব্যবস্থা করে, একটা ভাল চুরুট ধরিয়ে আবার আড় হয়ে পড়ল কেদারায়। ঠিক সেই সময় ভবেশ এসে ঢুকল। রণজিৎকে দেখেই সে চেঁচিয়ে উঠল, "কিহে বাবু, এত বেলাতেও ঘুম ভাঙ্গল না! বেশ আছ। আর জন্মে আমিও বড়লোক হয়ে জন্মাব, বাবা!"

রণজিৎ লাফিয়ে উঠল। সেও চেঁচিয়ে বললে, "এস, ভবেশচন্দ্র। তোমাকেই খুঁজছিলাম। হিন্দু-সংগঠন! হিন্দু-সংগঠন! লজ্জা করে না! আর মুখ খুলতে এসো না কোনদিন।"

"কেন হে, হয়েছে কি? তুমিও হিন্দু, আমিও হিন্দু, তার সংগঠনে দোষ কি?"

"না, আমি হিন্দু নই; হিন্দু হতেও চাই না। আজ বেশ জোর সংগঠন করে এসেছি। এক কায়েতের মড়া ডোমেদের সঙ্গে বয়ে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে এসেছি। তোমাদের বর্ণাশ্রমের মুখে ঝাড়ু মারব বলে এই কাজ করেছি।"

"এতটা energy (ফূর্ত্তি) তোমার এল কোথা থেকে হে? তাই এমন এলিয়ে পড়েছ!"

"আরও একটু energy বাকী আছে, কথাটা ষ্টেটসম্যানে ফেনিয়ে লিখে দেবার মত। তোমাদের সনাতন ধর্ম্মের তাতে মঙ্গল হবে।"

"ছিঃ রণজিৎ, ঐটে কোরো না। তুমি হিন্দু হয়ে ফিরিঙ্গীর কাগজে হিন্দুদের গালাগালি দিতে যেও না। সমাজে যদি কিছু গলদ থাকে, ত বসে বসে টিপ্পনী না কেটে চেষ্টা কর না সেটা শোধরাতে!"

"যদি! যদি হয়ে থাকে! তুমি কি অন্ধ? আমি গলদ বই আর কিছুই দেখি না। সমাজ আগাছায় ভরে গেছে। আমার এই এত যত্নের বাগান দশ বছর কেউ না দেখলে যে রকম হবে, তোমাদের সমাজ তার চেয়েও নোঙ্গরা হয়ে গেছে।"

"আমাদের সমাজ কাকে বলছ, তোমার নয়?"

"হ্যাঁ, ভাই আমারও। জন্মান্তরে অনেক পাপ করেছিলাম, তাই আমারও। জান ভবেশ, যখন সুরেনের সদর দরজায় বসে বসে ভাবছি, কি করে তার দেহ শ্মশানে নিয়ে যাব, একজন বুড়ো ডোম কি বললে? বললে মুসলমানের কি ডোমের ঘর হলে এতক্ষণ বিশ তিরিশ জন লোক জমে যেত। শেষ কি হল, জান? পাড়াপড়শী, ছুতোর, কামার, বেণে, কায়েত, বামুন একবার দাঁড়িয়ে দেঁতো হাসি হেসে চলে গেল। সুরেনের হৃষ্টপুষ্ট আত্মীয়েরা ত কাছেই এলেন না। তাঁরা কেউ শূলহরণ-বটিকা খাচ্ছেন, কেই বেতো হাত-পা মালিশ করাচ্ছেন, কেউ ইনসুলিন ফুঁড়ছেন, তাঁদের ফুরসৎ কোথায়! আমারও তাঁদের মেহেরবানীর জন্য বসে থাকতে প্রবৃত্তি হল না। লছমন ডোমের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম।"

"আহা, আমাদের সুরেন মিস্তিরটি গেল! তোমার মন খারাপ হবেই ত! এত কাল এক সঙ্গে পড়েছিলে! কিন্তু ভাই, একটা ব্যাপার থেকে ধরে নিলে চলবে কেন, যে হিঁদু মলে কেউ কাঁধ দিতে আসে না? এই ত কালই সন্ধ্যাবেলা এই রাস্তা দিয়ে খোল খরতাল বাজিয়ে প্রায় দুশো লোক এক শব নিয়ে গেল।"

"তা যাবে না কেন? ও রকম ত সর্ব্বদাই যায়। ওরা যে বড়লোক! বাবুটি ছিলেন হাইকোর্টের নামজাদা উকীল—কলকাতায় দশখানা বাড়ী, বেহার উড়িষ্যায় মস্ত জমীদারী। তবে কি জান ভবেশ, আমিও জানালা থেকে নজর করছিলাম। ভাড়াটে বৈষ্ণবের বেগার সারা কীর্ত্তন, বাবুদের রঙ্গ-বেরঙ্গের পিরান পরে সিগারেট মুখে মৃত মহাত্মার সম্মানরক্ষা, সবই নজরে পড়ল। এগুলো দেখলে পরে তোমার কি সত্যি গৌরব বোধ হয়? এমনই কি অন্ধ তুমি?"

"নাঃ, তোমার আজ সত্যি মেজাজ বড় খারাপ হয়েছে। অন্য কথা কওয়া যাক্। স্বরেন মিত্তির কিছু রেখে-টেকে গেল কি?"

"এক পয়সাও না। ডোমেদের কথাবার্ত্তা থেকে বুঝলাম, সে কখনও রোজগারে মন দেয় নেই। কেবল পরের বেগার খেটে বেড়াত।"

"তা ও রকম যার মতিগতি, সে বিয়ে থা করে কেন? আমি ত বুঝতে পারি না।"

"তুমি আমি কখন বুঝতে পারবও না, ভবেশ! আমাদের এই মাপ-জোখ করা সুন্দর সুশৃঙ্খল সংসারের মাঝে পাগলের স্থান নেই। চোর-ছ্যাঁচড়ের স্থান আছে, কিন্তু পাগলের নেই। স্বরেনটা যে চিরদিন বদ্ধ পাগল ছিল! কলেজে যখন পড়ত, একবার সারা গ্রীষ্মের ছুটীটা কাটালে আমাদের শক্তিকোট অঞ্চলে ওলাউঠো রোগীর সেবা করে।"

"তা করুক না। কিন্তু একটা পরের মেয়েকে তার খামখেয়ালী জীবনের মাঝে এনে কষ্ট দেয় কেন?"

"অন্যায় করে, ভাই। আমি স্বরেনের হয়ে ঘাট মানছি। আমার সঙ্গে তার অনেকদিন দেখাশুনো নেই, বিয়ে করেছে তাও জানতাম না, তবে নরেনের কাছে আজ যতটুকু শুনলাম স্বরেনের স্ত্রী স্বামীর মতনই ভবঘুরে পাগলী। কোথায় কোন জায়গায় কি কাজ করতে গিয়ে দুজনের দেখা হয়েছিল। গেল বছর বিয়ে করেছে। তাঁর তিনকুলে কেউ নেই।"

ভবেশ সুবিজ্ঞের মত একটু হেসে বললে, "তোমার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছে নাকি?"

"না ভাই, আমি তাঁকে দেখি নেই। তবে typeটা ইংরেজী সাহিত্যে পরিচিত।"

অন্য বন্ধুরা সব এসে পড়ল। সেদিন এ সম্বন্ধে আর কিছু কথা হল না। শুধু রণজিৎ আহমদকে বললে, "ভাই, তোমাদের দেশে যাওয়ার ব্যবস্থাটা তাড়াতাড়ি করে ফেল।"

পরদিন সকালে নরেন এসে বললে, "রণজিৎদা, বৌদি আজই আহমদাবাদ চলে যেতে চান। আপনার অনুমতির জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন।"

"আহমদাবাদ! সেখানে কি তোমাদের কেউ আত্মীয়-কুটুম্ব আছেন?"

নরেন হেসে বললে, "কুটুম্ব! আজ্ঞে না, কুটুম্ব কেউ নেই। তবে দাদা বৌদির পরম আত্মীয় পূজ্যপাদ গুরুদেব থাকেন। তাঁর কাছেই বৌদি যাচ্ছেন।"

"কতদিন সেখানে থাকবেন?"

"সে কথা তিনি নিজেই আপনাকে জানাবেন।"

"চল এখনই যাই, দেখা করে আসি।"

নরেনদের বাসায় যেতেই তার বৌদি বেরিয়ে এলেন। বছর কুড়ি বাইশের মেয়ে, শ্যামবর্ণ, রোগা, কিন্তু মুখে কি স্নিগ্ধ জ্যোতি, চোখে কি মায়া! রণজিতের পায়ের ধুলো নিয়ে মাথা নীচু করে বললে, "দাদা, আমাকে অনুমতি দেন, আমি আমার গুরুদেবের কাছে যাই।"

"আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, সেটা ভাল হবে কি না। আপনার শরীর বড় রুগ্ন দেখাচ্ছে। কিছুদিন বিশ্রাম দরকার। আর নরেনকে এ অবস্থায় একলা ফেলে যাওয়াও কি ঠিক মনে করছেন? আহমদাবাদে কি আপনি আগে কখন গেছলেন?"

"আমাকে আপনি আপনি করবেন না, আমি আপনার ছোট বোন নিবেদিতা। হ্যাঁ দাদা, আমি গুরুদেবের কাছে দু বছর ছিলাম। আমরা পশ্চিমের বাসিন্দা। আমার বাবা আমাকে শিক্ষার জন্য আশ্রমে রেখেছিলেন। তারপর মা বাবা দুজনেই হঠাৎ প্লেগে মারা গেলেন। মন বড় খারাপ হয়ে গেল। মাস দুই পরে গুরুদেব আমাকে কাজ নির্দ্দেশ করে বাঙ্গালাদেশে পাঠিয়ে দিলেন।"

"সুরেনদার সঙ্গে কি পশ্চিমেই আলাপ হয়েছিল।"

"আজ্ঞে না, দাদা। এই দেশেই কার্য্যসূত্রে দুজনের দেখা হয়। দুজনে একত্রে কিছুদিন কাজ করতে করতে তিনি আমার সঙ্গে একদিন মিতা পাতলেন। বললেন—নিবেদিতা, একক্রিয়ো ভবেন্মিত্রং, আজ থেকে আমরা মিতা। এর কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন তিনি একখানা চিঠি আমার হাতে দিয়ে বললেন—কি বল মিতা, গুরুদেবের উপদেশ শুনবে ত? চিঠিখানা পড়ে দেখলাম, গুরুদেব লিখেছেন—হ্যাঁ সুরেন, আমার নিবেদিতাকে তুমি নিলে আমি বড় সুখী হব। দুজনে আমার আশীর্ব্বাদ জেনো। —আমি তাঁকে প্রণাম করলাম।"

একটু থেমে নিবেদিতা আবার বললে, "তিনি আমাকে আশ্রমে গিয়ে কাজ করতে আদেশ করে গেছেন, তবে বলেছেন আপনার অনুমতি নিতে হবে। আপনি দয়া করে অনুমতি দেন। নরেন আপনার কাছে রইল, তার জন্য আমার কোন ভাবনা নেই। আপনি তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে কর্ম্মের দীক্ষা দেবেন।"

"আমি কর্ম্মের দীক্ষা দেব। নিবেদিতা, আমার মত অলস, অকর্ম্মণ্য লোক দুনিয়াতে নেই। এতদিন তবু সোনার পিঁজরায় একরকম সুখেই ছিলাম। কিন্তু আর পারছি না। পিঁজরার শিকে ঝাপটে ঝাপটে নিজের ডানা ভাঙ্গছি।"

"এ আমি বিশ্বাস করলাম না, দাদা, ক্ষমা করবেন। ভগবান যার মুখে ঐ মধ্যাহ্নভাস্করের তেজ দিয়েছেন, সে কি অকর্ম্মণ্য অলস হয়ে কাল কাটাতে পারে! আপনার শক্তির নমুনা ত কাল দেখলাম, দাদা! আমাদের দেশমাতা যে ঐ শক্তি চান।"

"এই দেশ! আমাদের দেশ! এর কি কোনও আশা আছে, নিবেদিতা? কালকের কথা বলছ, কালই ত দেখলাম, যে আমাদের দেশের লোক, আমার স্বজাতি, কি রকম হাজার হাজার নির্জীব নিস্পন্দ ছোট ছোট টুকরোয় ভাগ হয়ে রয়েছে। তারপর বল দেখি বোন, এ দেশ কার? মুসলমানের না হিন্দুর, উচ্চবর্ণের না অস্পৃশ্যের? সবাইয়ের মন তুমি কি করে পাবে?"

"আমি মূর্খ স্ত্রীলোক, দাদা। অত কথা জানি না। ও সব আপনারা ঠিক করবেন। কিন্তু আমার গুরুদেব বলেন, প্রেম দিয়ে, সেবা দিয়ে, সকলের হৃদয় জয় করা যায়। আশীর্ব্বাদ করুন যেন প্রাণ দিয়ে সেবা করতে পারি।"

"তাই হোক্, নিবেদিতা, তুমি গুরুগৃহে যাও। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার কাজ সার্থক হোক্। নরেনের জন্য ভেবো না। তাকে আমি যথাসাধ্য বিদ্যাদান করে, তোমার কাছেই পাঠিয়ে দেব। আমিও পশ্চিমদেশে বেড়াতে যাচ্ছি, একবার তোমার গুরুদেবকে প্রণাম করে আসতাম। কিন্তু আমি নিষ্ঠাহীন, ভক্তিহীন। আজ পর্য্যন্ত দেশ, ভগবান, কর্ম্ম কোনটাই ধরতে পারি নেই। আমার ঘরের কোণেই পড়ে থাকাই ভাল।"

নিবেদিতা পায়ের ধুলা নিলে। রণজিৎ আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

সেদিন বিকেল বেলা রণজিতের আর পড়াশুনো হল না। কেবল ভাবতে লাগল, "এত পড়ে শুনে হচ্ছে কি! কেবল কেতাব পড়া, আর তার জাবর কাটা! এ রকম করে কি দিন কাটে! দিন কাটবে না কেন? এই ত এতদিন বেশ কেটেছে। তা মদ ভাঙ্গ খেয়েও ত মানুষের দিন যায়। জুয়ো খেলেও মানুষের সহজেই দিন কেটে যায়। এই যে ছ'টি বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ মানুষ রোজ সন্ধ্যাবেলায় জীবনের সব সমস্যা নিয়ে তোলাপাড়া করে, সে ত একটা নাটুকে ঢঙ্গ বই কিছু নয়। তার পেছনে কি একটা সত্য, ধ্রুব, কিছু আছে? থাকবে কি করে? তাদের তর্ক বিচারে শ্রদ্ধা কি দরদের লেশমাত্র সম্পর্ক নেই। সবটাই ভুয়ো। আমি বিষম Sentimental (ভাবপ্রবণ) হয়ে গেছি। হঠাৎ এত Sentimentই বা এল কোথা থেকে? নিবেদিতা সুরেনের ব্যাপারে ত রস কিছুমাত্র নেই। তারা একটা লক্ষ্য, একটা কাজ, স্থির করে নিয়ে তার চারিধারে সুন্দর Romance কাব্য, গড়ে তুলেছিল। এমন Romance যে, একজন চলে গেলেও আর একজন লক্ষ্যভ্রষ্ট হল না। আজ এদের কাছে কথাটা পাড়তে হবে। দুনিয়ার মধ্যে কি আমরাই শুধু এই রকম নিষ্কর্ম্মা নির্ব্বিকার হয়ে পরের কাজের সমালোচনা করতে থাকব!"

বন্ধুরা সন্ধ্যাবেলায় আসতেই রণজিৎ ভবেশকে বললে, "ভাই, সুরেনের ব্যাপারটা এদের ভাল করে বল। একবার সবাই শোন। এতে আমাদের ভাববার বিষয় অনেক আছে। সুরেনের স্ত্রী নিবেদিতা এইমাত্র নাগপুর মেলে গুজরাত চলে গেল, তার গুরুর আশ্রমে। তাকে দেখলাম একেবারে স্থির, ধীর, নির্ব্বিকার। কুড়ি বছরের মেয়ে, লেখাপড়াও এমন কিছু জানে না, এই অবস্থায় সে এমন শান্তি পেলে কোথা থেকে ?"

অধ্যাপক হরিমোহন বললে, "নির্ব্বিকার আমরাই কি কম ! পৃথিবীতে কত ঝড় তুফান বয়ে যাচ্ছে, আমরা যেন শিবের ত্রিশূলের উপর বসে রয়েছি। দিব্যি নিয়মিত আপিস করছি আর আড্ডা জমাচ্ছি।"

মুখার্জ্জী বললে, "শান্তিই ত জীবনের যথার্থ কাম্য জিনিষ। আমরা তা পেয়েছি।"

আহমদ একটু হাসলে, "কর্ম্ম দু-রকমে ত্যাগ করা যায়। এক, ধ্যান সমাধি করে যোগী সুফীর মতন। আর অন্য, চোখ বুজে পাঁকে শুয়ে, মহিষের মতন। ব্যারিষ্টার, একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে আমাদের কর্ম্মহীনতা কোন প্রকারের।"

রণজিৎ বললে, "সুরেনদের জীবনের গল্পটা আগে শোন, তারপর বিচার তর্ক হবে।"

ভবেশ আর রণজিৎ গল্পটা বললে। সকলে একটু চুপ করে থাকার পর আলিম বললে, "রণজিৎ, তোমার বন্ধুদেরও নির্ব্বিকার বলতে পারলাম না। এরা একটা তীব্র কর্ম্মের নেশায় দিন রাত ডুবে থেকে জগৎটাকে ভুলে রয়েছে।"

রণজিৎ একটু ক্ষুব্ধ হল, "জগৎকে ভুলে রয়েছে, আলিম, এরা জগৎকে ভুলে রয়েছে ! এই বুঝলে তুমি ? এরা সেই মানুষ যারা জগতের প্রেমে আত্মহারা হয়ে থাকে। এরা সেই আশক্, যাদের কথা ইরাণের কবিরা চিরকাল গেয়ে এসেছেন।"

মুখার্জ্জী একটু ব্যঙ্গের সুরে বললে, "মাই ডিয়ার রয়, তুমি বড় ভাবপ্রবণ হয়ে যাচ্ছ। ছেড়ে দাও সেন্টিমেন্ট। নইলে ডুববে। আমাদের ক্লাবের যে একটা detached ভাব আছে, দূর থেকে সব জিনিস খুঁটিয়ে দেখবার ক্ষমতা আছে, সেটা ছেড়ো না, ফ্রেণ্ড। তা হলেই পাঁকে ডুববে।"

রণজিৎ খুব শান্ত হয়ে উত্তর দিলে, "আচ্ছা ভাই, detached থাকতেই চেষ্টা করব। একবার একটু ঘুরে ফিরে আসি।"

আহমদ বললে, "সব ঠিক। চল সোমবারেই বোম্বাই মেলে যাওয়া থাক। দোস্ত, তোমার গায়ে সত্যিই কর্ম্মের হাওয়া লেগেছে। আর বোধ হয় আফিং খেয়ে বসে ঝিমোতে পারবে না। কুছ পরোয়া নেহি। আমি তোমার বন্ধু তোমার সঙ্গ ছাড়ব না।"

(ক্রমশঃ)

এস

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কাব্যবিনোদ

এস, এস, এস মোর দখিন হাওয়ার সাথী—
তোমার সাথে জ্যোৎস্নালোকে কাটাব এই রাতি।
নবীন সুখে বনবীথি
ছড়িয়ে দিল ফুলের গীতি গো
প্রাণের ব্যথা ঘুচাব গো আজ তোমার প্রেমে মাতি

পাখির গানে ঢেউ খেলেছে বনের কোলে কোলে
'এস' তুমি তরী বেয়ে ঢেউয়ের দোলে-দোলে।
তোমার চরণ-সেবার মত
নাইকো কিছু দেবার মত
শুধু তোমায় বসাবো মোর ছেঁড়া আসন পাতি—
এস, এস, এস মোর দখিন হাওয়ার সাথী ॥

ভারতে কৃত্রিম-রেশম শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনীয়তা

শ্রীপতিতপাবন পাল, এম, এস-সি, (কলিকাতা),
এম, এস-সি, টেক (ম্যান) ; এ, এম, সি, টি ; এ, আই, সি ;

বর্ত্তমানে ভারতবাসী দুঃখদৈন্যপীড়িত, অর্দ্ধ-উলঙ্গ ; তথাপি আজিকার এই বাস্তব জগতে বিলাসিতার লোভ সে সাম্‌লে থাক্‌তে পার্‌ছে না। কেবল ভারত নয়, এই স্বভাবসিদ্ধ ভোগ-লিপ্সার দুর্দ্দাম গতির প্রতিঘাত জগতের অধিকাংশ অধিবাসীর উপরই প্রতিফলিত হয়েছে, তাই আজ তাদের পিপাসিত জীবন তৃপ্ত কর্‌তে নিত্য নূতন কৃত্রিমজাত শিল্পের প্রতিষ্ঠান !

কৃত্রিম রেশম (রেয়ন) বিংশ শতাব্দীর দান হলেও, আজ কৃত্রিমজাতীয় শিল্পের মধ্যে সে যে শীর্ষস্থান দখল করে' বসেছে সেটা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। দাম সস্তা ব'লে ইহা গরীব ও মধ্যবিত্ত লোকের বিলাস-ব্যসন চরিতার্থ করতে সমর্থ; কেবল তাই নয়, কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলের নিকটই আদৃত হ'য়েছে তার মনোরম চাকচিক্যে। একটা খাঁটী রেশমের পোষাকের দামে কতকগুলি কৃত্রিম রেশমের পোষাক পাওয়া যায়—আর দেখ্‌লে আসল বা নকল চেনা যায় না, তাই আজ বিলাসোপকরণ হিসাবে পাশ্চাত্য দেশে এর সমাদর খুবই হচ্ছে। বিপুল ভারতবর্ষও এর মস্ত বাজার। কৃত্রিম রেশমের উপর এ দেশের যে কতখানি অনুরাগ ও কোন দেশ হ'তে কতখানি আমদানী হচ্ছে, নীচের তালিকা থেকে তার অনেকটা উপলব্ধি হ'বে।

কৃত্রিম রেশম সূতার আমদানী
(১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ১২ মাস)

	১৯৩০-৩১		১৯৩২-৩৩	
দেশের নাম	পরিমাণ পাউণ্ডে	মূল্য টাকায়	পরিমাণ পাউণ্ডে	মূল্য টাকায়
যুক্তরাজ্য	১,০০৫,৮৬০	১,৯৭,৮৪২	১,৬৫৬,৪৫০	১,৪৩৪,৯৫,১
জার্ম্মাণী	*২৬৯,৯৪৪	৩২৮,৭০৭	৪০৬,৩৪৩	৩৩৫,৪২৬
নেদারল্যাণ্ডস্	৭৬২,৯৮০	৮৬৭,১৭২	৮৪৭,১৩০	৭১৪,০৮২
ফ্রান্স	১২০,৭৪২	১৩৯,৭৪৯	৩৬০,১২৯	৩২৬,৩০৭
সুইজারল্যাণ্ড	৮০,৪৬০	৮৯,২২৬	৬৭,৮১৬	৬৭,২৬২
ইতালি	৪,৫১৯,৮০৭	৫,০৬০,২৬৩	৫,৬০৮,৭৫৬	৪,৭৮০,৫০৪
জাপান	১৯,৪২০	১৯,৬১৮	১,৭৯৮,৯০৩	১,৩৭৫,৯৯০
অন্যান্য দেশ	৩৪০,৫৭৩	৩৮০,১১৫	২৫৬,৫৩৬	২২২,০১৬
	৭,১১৯,৭৮৬	৮,০৮২,৬৯২	১১,০০২,০৯৩	৯,২৫৬,৫৪৫

খাঁটি রেয়নজাত বস্ত্র আমদানী—

	বর্গগজ		বর্গগজ	
যুক্তরাজ্য	৯৪,৭১০	৮৮,৪৯৫	৪২৯,৮৮৩	৩৫৩,৫৭৭
জার্ম্মাণী	১৩,৯৭৯	১৭,৫৪৫	৪,৮৯৬	৭,৯৪৬
ইতালি	১০১,৫৯৩	৫৯,৭১৫	১২৮,০২৭	৬৮,১০৩
জাপান	২২,৫৫৮,৭৮৫	৮,০২৮,৯১৩	১১১,৭০৩,৪৫৯	২৪,৬১১,৭৮১
অন্যান্য দেশ	৩১০,৬৪৬	১১৯,৭০৪	৫৫৩,১০৬	২৫৫,৯২৭
	২৩,০৭৯,৭১৩	৮,৩১৪,৩৭২	১১২,৮১৯,২৮৬	২৫,২৯৭,৪৩৪

এ ছাড়া তুলা, রেশম ও পশমজাত কাপড়ের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে কৃত্রিম রেশম বহুল পরিমাণে এ দেশে আমদানী হয়ে থাকে। করদ-মিত্র-রাজ্যের আমদানীর পরিমাণ এখানে ধরা হয় নাই। এ সমস্ত একত্র কর্‌লে, আমদানীর পরিমাণ কি বিপুল হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

১৯২৭ সালে যতদূর সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করে' কোনদেশে কতটুকু কৃত্রিম রেশম মাথাপিছু ব্যবহার হ'চ্ছে, তার একটা হিসাব করা হ'য়েছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হ'ল।

দেশের নাম	মাথা পিছু কত আউন্স
সুইজারল্যাণ্ড	২৬·৪
বেলজিয়ম	১৭ ৮
যুক্তরাষ্ট্র	১৩·৬
জার্ম্মাণী	১১·৫
ইংলণ্ড	১০·৭
ভারতবর্ষ	১০·৩
অষ্ট্রেলিয়া	৮ ৬
ইতালি	৬ ৬
অষ্ট্রিয়া	৬·১
ফ্রান্স	৬·১
যুগোস্লাভিয়া	৫·৯
হলাণ্ড	৫·৩
জাপান	৩ ২
স্পেন	৩ ২
চীন	১·০
পোলাণ্ড	১·০

বছরের পর বছর কৃত্রিম রেশমের ব্যবহার যেরূপ বেড়ে চলেছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে ইহা যে ভারতের

বাজার ছেয়ে ফেল্‌বে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পৃথিবীর উন্নতিশীল জাতির মধ্যে কৃত্রিম রেশম উৎপাদন শিল্প দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। ভারতবর্ষ চুপ করে' এক পাশে বসে' আছে তাদের মুখ চেয়ে। অবশ্য ভারতের রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সকল শিল্পের সম্প্রসারণই স্বাভাবিক, এবং তার মধ্যে কৃত্রিম রেশম-শিল্পের ভাবী স্থান নগণ্য হবে না, সে কথা জোর করে' বলা চলে; কিন্তু তাই বলে' কি আমাদের পিছিয়ে পড়ে' থাকা যুক্তি-সঙ্গত? এখন হ'তেই আমাদের এই শিল্পপ্রতিষ্ঠানের চেষ্টা করা উচিত। এখন জিজ্ঞাস্য হ'তে পারে, যখন আমাদের দেশে স্বভাবজাত রেশম-শিল্প বিপন্ন এবং বিদেশীয় রেশম ও কৃত্রিম রেশম এসে দেশের শিল্প গ্রাস করতে বসেছে, তখন আমাদের শক্তি ঐ দিকে প্রয়োগ করা কি একান্ত কর্ত্তব্য নয়? জাপানের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে এই প্রশ্নের সমাধান সহজেই হয়ে যায়। জাপানে আসল রেশমের শিল্প পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে' রয়েছে এবং এখানকার রেশমই ডুনিয়ার অধিকাংশ চাহিদা মিটায়। তাহা সত্বেও, জাপানে কৃত্রিম রেশমের উৎপাদনে এত সাড়া পড়ে' গেল কেন? এশিয়াতে জাপানই সর্ব্বপ্রথম এই শিল্পে মনোনিবেশ করেছিল। বলা বাহুল্য, ১৯১৮ সালে জাপানে কৃত্রিম রেশম-শিল্প প্রথম স্থাপিত হয়—তখন মাত্র বৎসরে ১ লক্ষ পাউণ্ড উৎপাদনের কারখানা নিয়ে কাজ আরম্ভ হ'য়েছিল। যখন দেখা গেল, দেশের অভাব পূর্ণ করতে বিদেশ থেকে বহুল পরিমাণে কৃত্রিম রেশম আন্‌তে হচ্ছে, তখন ব্যবসাবুদ্ধি-সম্পন্ন জাপানের এই শিল্প-প্রসারণের প্রতি দৃষ্টি পড়্‌ল। এখন জাপানে প্রায় ১৭।১৮টী বৃহৎ কারখানার সৃষ্টি হয়েছে; সেখানে দিবারাত্র অবিশ্রান্ত-ভাবে যে পরিমাণে কৃত্রিম রেশম উৎপন্ন হ'চ্ছে, তা দেশের অভাব মিটিয়ে পৃথিবীর বাজার ছেয়ে ফেলেছে। আসল রেশমের চেয়ে দাম অনেক কম বলে' ও চাহিদা বেশী দেখে' জাপানের রেশম-বয়নকারীরা অধিকাংশ স্থলে এখন কৃত্রিম রেশম ব্যবহার করছে। এ সম্বন্ধে জাপানের এক জন বড় রেশম-ব্যবসায়ী Mr. N. Y. Tagura, যাঁর হাত দিয়ে জাপানের এক চতুর্থাংশেরও অধিক স্বভাবজাত রেশম জাপান থেকে রপ্তানী হয়, তাঁর মত উল্লেখযোগ্য। তিনি জাপানের কৃত্রিম রেশম-শিল্প যাহাতে বিস্তারলাভ করে, সে জন্য বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তিনি এক দিন বলেছিলেন, "সেদিন খুবই নিকট, যেদিন কৃত্রিম রেশম বয়নশিল্পের জন্য প্রাধান্য লাভ করবে, কারণ জনসাধারণ বহুমূল্যের একটি পোষাকের পরিবর্ত্তে অল্প দামের কতক-গুলি মনোরম পোষাক রাখা শ্রেয়ঃ মনে করে।" আরও তিনি সাহস করে' বলেছিলেন যে, "এমন কি পূর্ব্বদেশে যেখানে বহুল রেশম-কীটের চাষ হয়ে থাকে, সেখানেও তার পরিবর্ত্তে কৃত্রিম রেশম-শিল্প বিশিষ্ট স্থানাধিকার করবে।" তাঁর স্বপ্ন আজ সত্যে পরিণত হয়েছে।
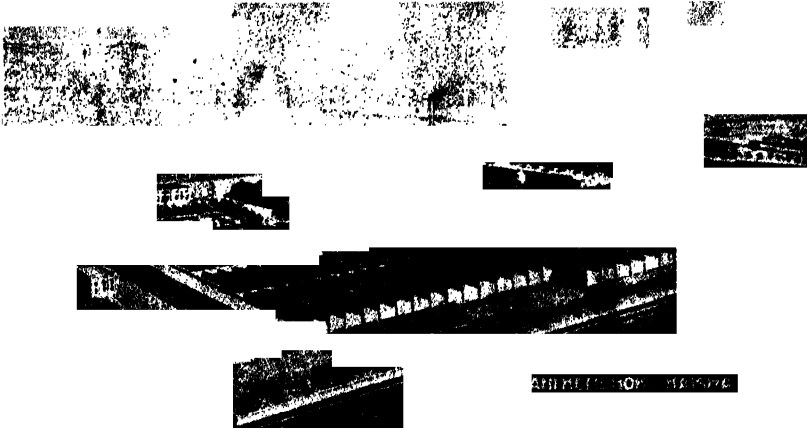
জাপানের একটি কৃত্রিম-রেশম ফ্যাক্টরীর দৃশ্য

জাপান সম্বন্ধে ১৯২৫ সালের যুক্তরাজ্যের Commerce Department-এর Textile Division যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন তার মর্ম্মাংশ এইরূপ—"The Japanese annual demand for Rayon is

increasing steadily and at present amounts to 3,500,000 pounds. At first consumers in Japan did not seriously consider the use of artificial product, due to the fact that the cultivation of the silk-worm is a national industry on which the prosperity of the country depends and naturally anything that retarded the production of silk was looked on askance. Due to lower prices and increasing popularity of rayon not only were large quantities imported but its manufacture in Japan on a large scale is now assured."

কোম্পানীর নাম	পেড আপ্ মূলধন (ইয়েন)	গড়ে বাৎসরিক উৎপন্ন রেয়নের পরিমাণ পাউণ্ড
আসাই সিল্ক উইভিং কোং		
টেইককু আর্টিফিসিয়াল সিল্ক কোং		৭,৫০
টোকিও আর্টিফিসিয়াল সিল্ক কোং	২,৫০	
মিইয়ি আর্টিফিসিয়াল সিল্ক কোং	১	
নিপন রেয়ন কোং	৩	১,২০
টইয়ো রেয়ন কোং	৫	২,০০
রেয়ন ইনডাসট্রি কোং	১,৫০	
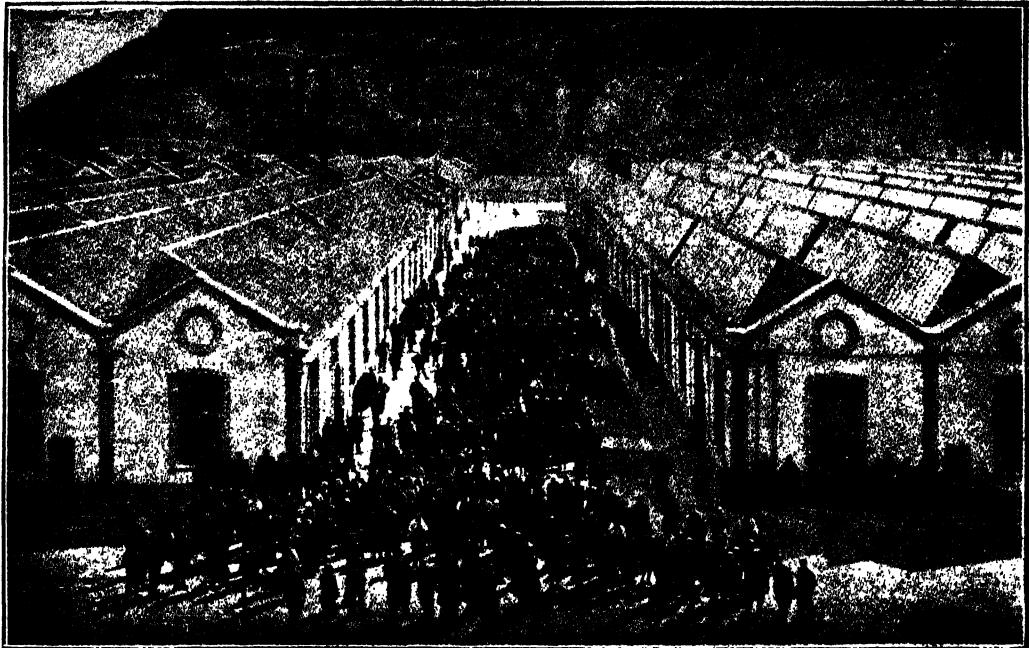
কারখানার ছুটীর পর

জাপানে কৃত্রিম রেশম শিল্প বিপুল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে'ই আজিকার উন্নতিশীল অবস্থা লাভ করেছে। কৃত্রিম রেশমের জন্য জাপানকে অনেক দিন পর্য্যন্ত অন্যান্য দেশের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। বর্ত্তমানে ইহার উৎপাদন জাপানে সম্পূর্ণতা লাভ করে' পৃথিবীর বাজার গ্রাস করতে চলেছে। নিম্নের তালিকা হতে রেয়ন শিল্পে জাপানের ক্রমোন্নতির ধারা অনুমিত হবে।

এখানে যে তালিকা দেওয়া হ'ল, তাহা ১৯২৬ সনের হিসাব অর্থাৎ জাপানের রেয়ন যুগারম্ভের বছর আটেকের পরের কথা। বর্ত্তমানে আরও বহুল পরিমাণে মূলধনও যেমনি নিয়োজিত হয়েছে, তেমনি উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নের তালিকা দৃষ্টে বুঝা যাবে, ১৯২৬ সাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৯ বৎসরের মধ্যে জাপানে কৃত্রিম-রেশম-শিল্প কিরূপ আদৃত ও প্রসার লাভ করেছে।

সাল	উৎপন্ন	আমদানী	মোট	রপ্তানী	নিজেদের দেশে ব্যবহৃত	পৃথিবীর মোট উৎপাদন
	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড
১৯১৮	১০০,০০০	৭৭,০৮৬	১৭৭,০৮৬	৭,০০০	১৭০,০৮৬	—
১৯২০	২০০,০০০	৭৯,৮০৫	২৭৯,৮০৫	১৫,০০০	২৬৪,৮০৫	—
১৯২৪	২,০০০,০০০	৮৯৫,৬৫৫	২,৮৯৫,৬৫৫	—	২,৮৯৫,৬৫৫	১৪১,১৬৪,০০০
১৯২৬	৭,০০০,০০০	৩,১৬৩,৯১৪	১০,১৭৩,৯১৪	৬,০৪৮	১০,১৬৭,৮৬৬	২১০,০

১৯১৮ হতে ১৯২৬ সাল পর্য্যন্ত জাপানে কৃত্রিম-রেশম-শিল্প যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, তারপর থেকে বৃদ্ধির হার ক্রমশই বিস্ময়কর-ভাবেই বেড়ে গেছে। জাপানের মত ক্ষুদ্র দেশে যদি ইহা সম্ভব হয়, তবে ভারতেও এই শিল্পের ভবিষ্যৎ যে খুবই বিপুল ও উজ্জ্বল, তাহা সহজেই অনুমেয়। জাপানের সকল সুবিধা ভারতে তো আছেই; তা'ছাড়া এত বড় দেশ নিজেই ইহার মস্ত খরিদ্দার।

কৃত্রিম রেশমের তৈরী একখানি পর্দ্দার নমুনা

যদি জাপানে জনসাধারণের আর্থিক অনটনের দিক দেখে রেশম-শিল্প-স্থাপনের উদ্যম বিশেষ ভাবে হ'তে পারে—ভারতবর্ষে তাহা হবে না কেন? যদিও ভারতের আদি রেশম-শিল্প মৃতপ্রায়—"সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ"—এই নীতি অনুসরণ করে' আমাদের দেশেও কৃত্রিম রেশম-শিল্প-স্থাপনের বোধ হয় প্রয়োজন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কৃত্রিম রেশম-সূতার দাম প্রতি পাউণ্ড গড়ে ১৶০ আনা। মিলের সূতা প্রতি পাউণ্ড গড়ে ৷৶০ আনা। এক পাউণ্ড কৃত্রিম রেশমের সূতায় অধিকাংশ স্থলেই প্রায় তিন পাউণ্ড মিলের সূতার কাজ পাওয়া যায়—সেজন্য ইহা থেকে প্রস্তুত কাপড় মিলের কাপড়ের সহিত প্রতিযোগিতায় সন্তোষজনক স্থান অধিকার করতে সমর্থ। ইহা সাধারণ তাঁতীদের পক্ষে কম সুবিধাজনক নয়। তারপর সাধারণ কাপড়ের সহিত মিশ্রিত করে' বুনলে চাকচিক্যের জন্য অনায়াসে উচ্চ দামে বিক্রীত হয়; সেজন্য অনেক জায়গায় দেশীয় তাঁতীরা মিলের সহিত প্রতিযোগিতায় দু' পয়সা লাভ রেখে'ই কাজ চালিয়ে নিতে পারে। আজ কাল অল্প দামের বেনারসী সাড়ীতে কৃত্রিম রেশম মিশিয়ে তৈরী করা হয়ে থাকে।

গুটীপোকা থেকে যে রেশম ভারতে উৎপন্ন করা হয়, তাহা উপস্থিত ক্ষেত্রে বাজারে পাউণ্ড ৬৲৬৷০ টাকার কম বিক্রীত হ'তে পারে না। বিদেশী রেশম জাপান থেকে এসে ৩৷৪৲ পাউণ্ড বিক্রীত হ'চ্ছে। এ অবস্থায় বিশেষ শুল্ক বসাইয়া ভারতীয় রেশম-শিল্পের প্রাণ দিতে পারা যাবে, অবশ্য স্বীকার করা যেতে পারে; কিন্তু এই আর্থিক দুরবস্থার দিনে গুটীপোকা-রেশমের উৎপাদন-প্রণালী বিশেষভাবে উন্নত করে' পড়্‌তার দিক্ দিয়ে এর দাম না কমাতে পারলে, কাটতির দিকে এই শুল্ক বসান হওয়ায় কতটা উন্নতি হ'বে, বিশেষ বোঝা যায় না।

উপস্থিত এই গুটীপোকা-রেশম-শিল্প বিদেশী প্রতি-যোগিতার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য এই জাতীয় আমদানী মালের উপর, পাউণ্ড প্রতি ২।৶০ বা দামের উপর শতকরা ৫০৲ টাকা বিশেষ শুল্ক বসাবার জন্য **Tariff-board** অনুমোদন করেছেন এবং

একস্‌পেরিমেণ্টাল ববিন স্পিনিং মেসিন

কৃত্রিম রেশম-সুতার পাউণ্ড প্রতি ১৲ টাকা ও কৃত্রিম রেশমের কাপড় ও মিশ্রিত রেশমের কাপড়ের দামের উপর শতকরা ৮৩৲ বা প্রতি বর্গ গজের উপর ।০ আনা (উভয়ের মধ্যে যাহা বেশী) শুল্ক বসাবার প্রস্তাব করা হয়েছে। আশা করা যায়, **Legislative Council** খুব কাছাকাছি একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হ'বে। এইরূপ শুল্ক স্থাপিত হ'লে, যেরূপ একদিকে গুটী-রেশমের উৎপাদনের উন্নতির উপায় নির্দ্ধারিত করার সুযোগ পাওয়া যাবে ; অপর দিকে তেমনি কৃত্রিম রেশমের শিল্পস্থাপনের জন্যও মহেন্দ্র-সুযোগ আরম্ভ হ'বে। আশা করা যেতে পারে, এই শুল্কের পাঁচ বৎসর বলবৎ থাকার মধ্যে আসল রেশমের বিশেষ উন্নতি-সাধন না হ'লেও কৃত্রিম-রেশম-শিল্প উন্নত প্রণালীতে গড়ে' উঠতে পারবে। এটাও জাতির কম লাভের বিষয় হ'বে না। পরন্তু রেশম-শিল্প উন্নত হ'লেও, দাম কম বলে' কৃত্রিম রেশমের আদর দিন দিন বেড়েই চল্‌বে—অতএব ভবিষ্যৎ নৈরাশ্যজনক হ'বে না।

অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে কৃত্রিম রেশম উৎ-পাদন করার সুবিধাও কম নয়। সেলুলজ আছে এমন উপকরণের অভাব ভারতে নাই। ভারতে বন-সম্পদ্ বিস্তর। ব্রিটিশাধিকৃত ভারতের প্রায় এক পঞ্চমাংশই (২৫০,০০০ বর্গ মাইল) জঙ্গল-বিভাগের অন্তর্গত। তা'ছাড়া করদ মিত্র-রাজ্যেও অনেক মূল্যবান্ জঙ্গল আছে। অরণ্য-সম্পদ্ ভিন্ন খড়, বাঁশ ইত্যাদি এই জন্য কাজে লাগান যেতে পারে। এতে এ সবের বর্ত্তমান মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাবে। অধিকন্তু এমন অনেক প্রকার তুলা আছে, যা সাধারণতঃ সূতা কাটার জন্য কোন কাজেই আসে না, কিন্তু রেশম-শিল্পে ব্যবহৃত হ'তে পারে। অনেক পতিত জমি আছে, যা এই তুলার উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হ'তে

একস্‌পেরিমেণ্টাল সেণ্ট্রিফুগাল স্পিনিং মেসিন

পারবে। চাষী-মজুর, মধ্যবিত্ত ভদ্রসন্তানেরাও কাজ পাবে।

ভারতের মত এমন সস্তা শ্রম ও শ্রমিকের প্রাচুর্য্য দুনিয়ায় আর কুত্রাপি নাই। সব দেশেই শ্রম-সমস্যা

ভীষণ কঠিন। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে এই কৃত্রিম রেশমের যে খরচ-পড়তা পড়ে, তার শত করা ৪০-৫০ ভাগই শ্রম-খরচ। ভারতে বর্ত্তমানে সব চেয়ে উচ্চ হারের মজুরী ধরলেও উহা ১০% অধিক হবে না।

কৃত্রিম রেশম-শিল্পে যে সকল কেমিক্যালের প্রয়োজন, সে বিষয়ে ভারতের অবস্থা একটু অন্য রকম। অবশ্য সব দেশকেই এজন্য কতকটা বাহিরের উপর নির্ভর কর্‌তেই হয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে স্প্রুস, উড, পাল্প, কানাডা বা সুইডেন হ'তে আমদানী কর্‌তে হয়। অধিকাংশ উপাদান, যা বিদেশ থেকে আন্‌তে হবে, তার জন্য অপরাপর দেশে যা দাম দেয় তার চেয়ে আমাদের খুব বেশী দিতে হবে না।

অন্যান্য কেমিক্যাল উপাদানের মধ্যে একমাত্র কার্ব্বন-বাই-সালফাইড বর্ত্তমানে ভারতে দুষ্প্রাপ্য।

ইংলণ্ড কিংবা জার্ম্মাণী হ'তে আনীত কার্ব্বন-বাই-সালফাইডের দাম খুব বেশী, প্রায় পৌনে দুই টাকা পাউণ্ড। জার্ম্মাণীতে উহার এক পাউণ্ডের বাজার-দর মাত্র দুই আনা দশ পয়সা। ভারতে আনার খরচই দামের চেয়ে বেশী। দহ্যমান জিনিষ বলে আনার হাঙ্গামা প্রচুর ইন্সিওরেন্স, জাহাজভাড়া, সরকারী মাশুল ইত্যাদি অত্যধিক। ভারতে কৃত্রিম-রেশম-শিল্পের কারখানার সঙ্গে কার্ব্বন বাইসালফাইড তৈরী করে' নিলে খরচ হন্দর প্রতি সাড়ে দশ টাকার বেশী পড়ার সম্ভাবনা নেই বা পাউণ্ড প্রতি ছয় পয়সার বেশী পড়্‌বে না। ভিসকোস ফ্যাক্টরীর সঙ্গে কার্ব্বন-বাই-সালফাইড তৈয়ারীর বন্দোবস্ত থাক্‌লে তৈরী করা বেশী কঠিন নয়। ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে অনেক কারখানার সঙ্গে এরূপ আয়োজন আছে। দৈনিক ১০ হন্দর হিসাবে তৈরী কর্‌লে প্রস্তুতের খরচ এইরূপ হিসাবে ধরা যেতে পারে।

এখন ভারতে কৃত্রিম-রেশম-শিল্পের কারখানা প্রতিষ্ঠা কর্‌লে কি মূলধন বা খরচের পড়্‌তা পড়্‌তে পারে তারই একটা হিসাব করে' দেখা যাক। সমগ্র জগতের উৎপন্ন কৃত্রিম রেশমের শতকরা ৮৬ ভাগই যখন ভিসকোস প্রসেসে হয়, তখন ভারতেও এই প্রসেস লইয়াই আরম্ভ কর্‌তে হবে। ১৫০ ডিনিয়ারের সুতা গড়ে দৈনিক ১ টন হিসাবে ভারতে উৎপাদন কর্‌তে যে খরচ পড়্‌বে তারই একটা মোটামুটি হিসাব পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় (ক) চিহ্নিত স্থানে দেওয়া গেল।

এই অনুপাতে এক পাউণ্ড কৃত্রিম রেশম তৈয়ারীর খরচ পড়ে প্রায় ৸৵৫ আনা। অতএব গড়ে পাউণ্ড ১৵৫ টাকা মূল্যে বিক্রয় কর্‌লে মূলধনের উপর শতকরা দশ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া যেতে পারা যায়। এ কথাও স্মরণ রাখ্‌তে হ'বে, যে কারবার যত বড় হবে ততই খরচ কম পড়্‌বে এবং লাভের অংশও বেড়ে যাবে। একমাত্র জাপান ছাড়া আর সব দেশের মূল্য তুলনায় ১৵৫ দাম সন্তোষজনক। অবশ্য জাপান হ'তে সাধারণতঃ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কম দামের কৃত্রিম রেশম ভারতে বেশী রপ্তানী হয়। গড়ে ১৫০ ডেনিয়ারের জাপানী রেশমের উপস্থিত বাজার-দর ১৶০ আনা ভারতে কৃত্রিম রেশম-শিল্প প্রায় সব দিক্‌ দিয়েই নিরাপদ্‌। আশঙ্কা যা কেবল জাপানকে নিয়ে। গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে আমদানী শুল্ক বসিয়ে জাপানী প্রতিযোগিতা প্রতিরোধ করা যেতে পারে। Tariff Board-এর অনুমোদিত পাউণ্ড প্রতি ১৲ টাকা শুল্ক বস্‌লে কৃত্রিম রেশম যে খুব লাভজনক কারবার হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই শুল্ক-প্রাচীর উঠিয়েই স্ব স্ব দেশের রেয়ন শিল্পকে দাঁড় করান হ'য়েছে। তা' না হ'লে ইংল্যাণ্ডে কি আজ ৩৷০ শিলিং করে পাউণ্ড বিক্রয় হ'তে পার্‌ত।

				টাকা	আনা
১০ হন্দর গন্ধক	@ ১০০ টাকা	টন	হিসাবে	৫০	০
২ " কাঠ কয়লা (charcoal)	@ ৩ "	হন্দর	"	৬	০
৮৮০ K. W. H.	@ ৵১০ "	K. W. H.	"	২৭	৮
৫০ হন্দর ষ্টীম (=১০ হন্দর কয়লা	@ ৭ "	টন	")	৩	৮
কাঁচা মালের উপর ২০ " তৈরী খরচ				১৭	৮
১০ হন্দরের জন্য সর্ব্বমোট খরচ			টাকা	১০৪	৬

অতএব ১ হন্দরের তৈরী খরচ প্রায় সাড়ে দশ টাকা

(ক)

পরিমাণ	বিবরণ	হার		টাঃ	আঃ
২৭৫০	পাউণ্ড সালফাইট উড পালপ	@ ১০	টাকা হন্দর হিসাবে	২৪৫	৯
২৫৩০	„ কসটিক সোডা (৯৪%)	@ ১২	„ „ „	২৭১	২
৭২৬	„ কারবন বাইসালফাইড	@ ১০॥০	„ „ „	৬৮	১
৩,৫২০	„ সলফিউরিক এসিড	@ ৫	„ „ „	১৫৭	৩
৫০৪	„ জিঙ্ক সালফেট	@ ১২	„ „ „	৫৪	০
১১০০	„ সোডিয়াম সালফেট	@ ২।০	„ „ „	২২	২
৫০	„ সেডিয়াম হাইপোক্লোরাইট	@ ১৩৲	„ „ „	৫	১৩
১৬৫	„ হাইড্রোক্লোরিক এসিড	@ ১০॥০	„ „ „	১৫	৮
৩৩	„ ফিলটারিং মেটিরিয়াল	@ ।৵০	„ পাউণ্ড „	১২	৬
৩০৮	„ সোডিয়াম সালফাইড	@ ৭॥০	„ হন্দর „	২০	১০
৬৬	„ টার্কি রেড অয়েল	@ ২১	„ „ „	১২	৬
১১০,০০০	গ্যালন জল	@ ।০	১০০০ গ্যালন „	২৭	৮
৫০০০	K. W. H.	@ ।/০	„ K. W. H.	১৫৬	৪
৫	টন কয়লা	@ ৭	„ টন „	৩৫	০
	ডেপ্রিসিয়েশন (Depriciation)				
	অন্ মেসিনারী (on machinary)	(১,৩০০,০০০ টাকা)	@ ১০%	৩৫৬	৩
	অন্ বিল্ডিং প্রভৃতি (on building etc)	(৩০০,০০০ টাকা)	@ ৫%	৪১	১
	মূলধনের সুদ	(২,০০০,০০০ টাকা)	@ ৩%	১৬৪	৭
	শ্রমানা ইত্যাদি			২০০	০
	এক টন রেয়ন উৎপাদনের খরচ		সর্ব্বমোট টাকা	১৮৬৫	৪

কৃত্রিম রেশম-শিল্প-প্রতিষ্ঠার প্রথমেই বিপুল মূলধন প্রয়োজন। এক টন উৎপাদনের উপযোগী করে' প্রথম প্রথম কারবারটা সুরু করা যেতে পারে এবং পরে বৃদ্ধি-ক্রমে দুই টনও উৎপন্ন করা যেতে পারে। ভারতে মেশিনারীর ডিপ্রিসিয়েশনের উপরই খরচের বড় দিক্‌টা নির্ভর করে। কারবার যত বৃহৎ হবে, উৎপাদনের খরচের দিক্‌টাও ততই কম হবে। দুই টন দৈনিক রেয়ন-উৎপাদন-ক্ষম কলের দাম ২,১০০,০০০ টাকা; কিন্তু এক টনের দাম ১,৩০০,০০০ টাকা।

এইখানে কৃত্রিম রেশম উৎপাদন করার জন্য এই কারবারে কিরূপ মূলধন নিয়োগ করা হয়েছে, তার উদাহরণ স্বরূপ ইংলণ্ডের ১৯২৮ সালের চল্‌তি কারখানা-গুলির মূলধন ও উৎপন্ন কৃত্রিম রেশমের একটি তালিকা পরবর্ত্তী পৃষ্ঠার (খ) চিহ্নিত স্থানে উদ্ধৃত করা গেল।

ভারতের সমস্ত অবস্থার বিবেচনায় খুব কমপক্ষে এক লক্ষ টাকা মূলধন দিয়ে অন্ততঃ পরীক্ষার জন্য এই কারবার আরম্ভ করা উচিত। এতে দৈনিক এক হন্দর কৃত্রিম রেশম উৎপন্ন হবে। খরচের হার পড়্‌বে এইরূপ :—

(পরবর্ত্তী পৃষ্ঠার (গ) চিহ্নিত অংশ দ্রষ্টব্য)

এক হন্দরে ১১৪৸০ টাকা হ'লে পাউণ্ড প্রতি পড়ে ৸৵৫ আনা মাত্র। মূলধনের উপর শতকরা ১০৲ টাকা লাভ রাখ্‌লে পাউণ্ড ১৶৫ বিক্রয় করা যেতে পারবে।

ইহা নেহাৎ নৈরাশ্যজনক নহে। সকল বিষয়েই বিশেষ করিয়া শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রে ভারতবাসী উদ্যম ও মৌলিকতার অভাবে পিছিয়ে পড়ছে। রেয়ন শিল্পের উজ্জ্বল অদূর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েই দেশবাসীর এ দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। এমন ধনী এখনও

আমাদের দেশে আছে যারা একাই এই কারবার আরম্ভ করতে পারেন। দশজন মিলেমিশে এই লাভজনক শিল্পের প্রতিষ্ঠা করলে একই সঙ্গে ভারতে অনেক ফাক্টরী আরম্ভ করাও অলীক কল্পনা হ'বে না।

(খ)

কোং নাম	স্থাপিত	স্থানের নাম	কারখানার সংখ্যা	প্রোসেস	সাপ্তাহিক উৎপন্ন মালের পরিমাণ, পাউণ্ডে (lb)	মূলধন পাউণ্ড (£)
কোটয়লড্স লিঃ	১৯১৩	লণ্ডন	৩	ভিসকোস / এসিটেট	২৬,৫০০,০০০	২০,০০০,০০০
ব্রিটিশ সেলানিজ লিঃ	১৯২০		২	এসিটেট	৯,০০০,০০০	
দি ব্রিটিশ এন্কা-আর্টফিসিয়াল সিল্ক লিঃ	১৯২৬	”	১	ভিসকোস	১,৫০০,০০০	
ওয়েসটারণ ভিসকোস মিল্স লিঃ	১৯২৭	ব্রিসটল	১		১,৩০০,০০০	
ব্রিটিশ এসিটেট লিঃ	১৯২৫	ষ্টোরোমার্কেট	১	ভিসকোস	২০০,০০০	২,৭০০,০০০
				এসিটেট	১,৩০০,০০০	
হারলিনস লিঃ	১৯২৬	গোলবোয়ন		ভিসকোস	১,১০০,০০০	৫৭১,৩০০০
ব্রিটিশ ভিসডা লিঃ	১৯২৭	লিট্‌লবরোফ লিঙ্গ্			৮৮০,০০০	৩৬০,০০০
কেমিল লিঃ	১৯২৩	মানচেষ্টার	১		৭৭০,০০০	——
স্যুয়ে আর্ট সিল্ক লিঃ	১৯২৬	সুটন	১		৬৬০,০০০	৬৩০,০০০
কার্কলিন আর্ট সিল্ক ম্যানুফ্যাকচারি লিঃ	১৯২৬	বেরি	+			
এপেকস্ আর্ট সিল্ক লিঃ	১৯২৮	ষ্ট্রাটফোর্ড	+	এসিটেট		
ব্র্যানসন আর্ট সিল্ক কোং লিং	১৯২৭	ব্রাঙ্গটন	+	ভিসকোস		১,৪০০,০০০
ব্রাইসিল্কা লিঃ	১৯২০	ব্রাডফোর্ড		কিউ প্রোমেণিয়াম		৪০৫,০০০
সেলুলজ এসিটেট কোং লিঃ	১৯২৮			এসিটেট	৫,২৮০,০০০	——
নর্থ ব্রিটিশ কোং লিঃ	১৯২৮			ভিসকোস	১,৫০০,০০০	৩৮৫,০০০
রেয়ন ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ	১৯২৫	লণ্ডন			——	——
সানসিন কোং লিঃ	১৯২৫				১,৩২০,০০০	৩৫০,০০০
ইয়ার্ক সায়ার কোং লিঃ	১৯২৮				১,০০০,০০০	৩২৫,০০০
স্কটিশ আর্ট সিল্ক কোং লিঃ	১৯২৭	নিউটন			২৮৬,০০০	২৫০,০০০

(গ)

			টাকা	আনা
কাঁচা মাল, পাউয়ার (power) প্রভৃতির খরচ			৫৬	০
শ্রমানা			৩০	০
ডিপ্রিসিয়েশন				
অন মেশিনারী (৭০,০০০ টাকা)	@		১৯	
ঐ ইমারৎ ইত্যাদি বাবদে (১০,০০০ টাকা)	@	৫%	১	
মূলধনের টাকার সুদ (১০০,০০০ টাকা)	@	৬%	৮	
		মোট টাকা	১১৪	১২

সাহিত্যের প্রসার

আচার্য্য শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

ইঙ্গিত আসিয়াছে—সারা পৃথিবীর মানুষের জীবন নূতন ধারায় বহিবে। সাহিত্য—জীবনেরই ফুল, ফল; তাই সাহিত্যের ধারা বদ্‌লাইবার ইঙ্গিত আসিয়াছে অতি সে-কালে মানুষের কাছে আমাদের অফুরন্ত মনে হইত; এক দেশের মানুষ অজানা আর এক দেশের অদ্ভুত কাল্পনিক বিবরণ লিখিত, লিলিপুটের মত ছোট মানুষের কল্পনা করিত, নানা আকারের দৈত্য-দানার কথা লিখিত, আর পাঠকেরা তাহা সত্য ইতিহাসের মত পড়িত। এখন আমাদের পৃথিবী খুব বড় হইলেও ছোট হইয়া পড়িয়াছে; এমন স্থান নাই—যেখানকার মানুষের বিবরণ জানা যায় নাই। পৃথিবীতে মানুষের জন্মের পর যখন তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়াছিল, আর পেটের দায়ে লোকে দলে-দলে নানা দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তখন দূরে-দূরে পৃথিবীর নানা স্থানে মানুষেরা এমন-ভাবে আপনাদের আবাসের দেশ রচিয়াছিল, যাহাতে নূতন-নূতন দলের লোকেরা তাহাদের দেশে ঢুকিয়া পরিমিত খাদ্যটুকু কমাইতে না পারে। এই পদ্ধতিতে লক্ষ-লক্ষ বৎসর ভিন্ন-ভিন্ন দলের লোকেরা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখিয়া আলাদা-আলাদা সমাজ বাঁধিয়াছিল। ইহার ফলে ভিন্ন-ভিন্ন দেশের আব্‌হাওয়ার গুণে মানুষেরা আলাদা আলাদা ছাঁচে-ঢালা জীবের মত বাড়িয়াছিল ও আলাদা-আলাদা ভাষা ও সামাজিক প্রথা সৃষ্টি করিয়াছিল।

তাহার পর আবার এদেশে সে দেশের লোকেরা ভাত-কাপড় জুটাইবার তাড়নায় পাহাড়-পর্বত পাড়ি দিয়া, সাগর পাড়ি দিয়া নানা দেশে পৌঁছিতে লাগিল। স্বার্থের এই তাড়নায় এখন দাঁড়াইয়াছে এই—এমন দেশ নাই, যেখানে অন্য দেশের লোক গিয়া পৌঁছায় নাই। আমাদের এই ভারতবর্ষ যাহারা বহু দূর-দেশ হইতে আসিয়া দখল করিয়াছে, তাহারা ছাড়াও পৃথিবীর সকল বড়-বড় জাতির লোকেরা নানা বাণিজ্য চালাইবার জন্য এদেশে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে। ইংলণ্ড প্রভৃতি ইউরোপের বড়-বড় দেশ আমাদের মত পরাধীন নয় বটে, তবে এমন দেশের নাম করিতে পারিব না, যে দেশে অন্য দেশের বড় জাতির লোকেরা গিয়া বাসা বাঁধে নাই। এখন পৃথিবীর কোন দেশের লোকের সাধ্য নাই—অন্য দেশের লোক তাড়াইয়া আপনাদের মত আলাদা থাকিয়া রাজ্য চালাইবে বা সমাজ গড়িবে। আমরা যদি স্বাধীন হই, অর্থাৎ এই দেশের লোকেরাই যদি এদেশ শাসন করিতে পায়, তবুও পৃথিবীর সকল দেশের লোককে তাড়াইতে পারিব না—তাহাদের বাণিজ্য বন্ধ করিতে পারিব না।

নানা শ্রেণীর লোককে নিয়া যখন সকল দেশেই মানুষকে বাস করিতে বাধ্য হইতে হইবে, তখন জীবনের গতি না বদ্‌লাইলে চলিবে না ও জীবনের লক্ষ্য নূতন করিয়া স্থির না করিলে চলিবে না। এই অবস্থায় আসিয়াছে মানুষের জীবনধারার নূতন ইঙ্গিত।

আমাদের দেশে যাহারা আসিয়াছে তাহারা চেহারায়, ভাষায়, পরিচ্ছদে আর সামাজিক নানা রীতি-নীতিতে একেবারে বিভিন্ন; জাতীয় অভিমানে বিদেশীরা আমাদের দেশকে হীন মনে করে, আর আমরাও পরকে বা পরের প্রথা-পদ্ধতিকে ভাল চোখে দেখি না। এ অবস্থায় পরস্পরে ভালবাসা জন্মে না, বরং নানা বিষয়ে ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্মে; কিছুতেই আমরা আপনাদের স্বতন্ত্রতা অপরের সামাজিক প্রথার মধ্যে ডুবাইয়া দিতে পারি না। এই যে আমরা আপনাদের জাতি ও বিশিষ্টত্ব রক্ষা করিতে চাই, ইহাতেও বিশ্বনিয়ন্তার ইঙ্গিত আছে। একদিকে যেমন ইঙ্গিত আসিয়াছে—বিশ্বের সঙ্গে মিলিতে হইবে; তেমনই অন্যদিকে ইঙ্গিত আসিয়াছে—সকলকে আপনাদের বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া বাঁচিতে হইবে। এই দুইটি ইঙ্গিত কেমন করিয়া পরস্পরে মেলে, তাহা বলিতেছি।

এই বিশ্বে—এই আমাদের পৃথিবীতে ছোট বড় এমন কোন পদার্থ নাই, যাহা সারা পৃথিবীর উন্নতির জন্য

সৃষ্ট হয় নাই; ছোট একটি ঘাসের ডগা বা বালির দানা থেকে বড়-বড় শালগাছ বা পাহাড় পর্য্যন্ত সকল পদার্থেরই মূল্য আছে—দরকার আছে। আমরা বা অন্য কোন দেশের লোক কুণো অভিমানে ও নির্বুদ্ধিতায় অপরকে তুচ্ছ করিতে পারি ও অকেজো ভাবিতে পারি, কিন্তু একদিন সকলেই সুবুদ্ধির কৃপায় ও ভালবাসার মহিমায় অপরের বিশেষত্বের মূল্য বুঝিব ও তাহাকে আদর করিয়া সমাজের ও জীবনের অলঙ্কার করিব। যতদিন জয়-পতাকার গৌরবে পরের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিব না—যতদিন বিদ্বেষ-বুদ্ধির তাড়নায় অপরকে বিষ-চোখে দেখিতে থাকিব, ততদিন কোলাহল ও বিবাদের শেষ হইবে না। বিবাদের ফলে কেমন করিয়া পরে মানুষে-মানুষে পরিচয় হয় ও মানুষেরা পরের গুণ চিনিয়া এক সঙ্গে মেলে—প্রাচীন ইতিহাসে তাহার অনেক বিবরণ আছে। নৃ-তত্ত্বের সেই ইতিহাস এখানে না দিলেও চলে।

বহু দেশের বহু জাতি আপনাদের অস্তিত্ব হারাইবার ভয়ে, আপনাদের বিশেষত্ব বজায় রাখিবার ঝোঁকে, হয় ইহুদী তাড়াইয়া, না-হয় বাণিজ্যের কড়া নিয়ম করিয়া, আর না-হয় অন্য উপায়ে আত্মস্থ হইবার চেষ্টা করিতেছেন; সে চেষ্টা স্থানে-স্থানে খুব নিন্দনীয় হইলেও, ভবিষ্যতের জাতি-মিশ্রণের কাজে অনেক প্রয়োজনের মাল-মসলা সরবরাহ করিবে।

সত্য বটে, একটি অদম্য প্রাকৃতিক শক্তি জাগিতেছে, যাহার প্রভাবে পৃথিবীর সকল বিচ্ছিন্ন জাতি একসঙ্গে মিলিয়া ভবিষ্যতে একটি বৃহৎ জাতিতে পরিণত হইবে; কিন্তু এই মিলনের সময়ে ভিন্ন-ভিন্ন জাতির লোকেরা যদি আপনাদের বিশিষ্টতা নিয়া উপস্থিত হইতে না পারে, তবে কোন জাতিরই উদ্ধার হইবে না, আর বিশিষ্টতার অভাবে মহামিলনের দিনে উপেক্ষিত হইয়া মানুষের অনেককে মুছিয়া যাইতে হইবে। মানুষের উন্নততর স্থিতির জন্য ভবিষ্যতে যে মহাসমাজ জন্মিবে, তাহাকে একটা বড় কলের সঙ্গে তুলনা করিতেছি। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির লোকেরা যেন তাহাদের বিশিষ্টতায় সেই কলের ভিন্ন-ভিন্ন অংশ গড়িতেছে; কেহ যেন গড়িতেছে স্প্রিং, কেহ চাকা, কেহ আর কিছু। সারা কলটি গড়িবার সময়ে, যদি ভিন্ন-ভিন্ন জাতির দেওয়া অংশগুলি সেই কলে খাপ খায়, যদি সে কলে লাগিয়া কলকে পূর্ণ করিতে পারে ও চালাইতে পারে, তবেই ভিন্ন ভিন্ন জাতির দেওয়া অংশগুলি সার্থকতা পাইবে; আর তাহা না হইলে, অনেক জাতির গড়া অনেক অংশ জঞ্জালের মত উপেক্ষিত হইবে। এই জন্য প্রয়োজন আছে—প্রতি জাতির লোকেরাই আপনাদের বিশেষত্ব রক্ষা করিবার সময়ে তাহাদের ঠিক প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া নিবে ও তাহা বিশ্বের উন্নতিতে বাধাস্বরূপ হইবে কি না, তাহা তাহাদের অভিজ্ঞতার বলে স্থির করিবে। নইলে কেবল স্বতন্ত্র হইবার ঝোঁকে ও বিশিষ্টতা বাড়াইবার নামে যদি কুণো হইয়া পড়ে ও বিশ্বের গতির প্রকৃতি না বুঝিয়া চলে তবে সেই এক-ঘরে জাতি আপনার কোণে আপনি পচিয়া মরিবে, আর ভবিষ্যতের মহামিলনের দিনে কোন কাজে না লাগিয়া ধ্বংস হইবে।

আমাদের বিশিষ্টতা কিসে, আর আমাদের কিরূপ বিশিষ্টতা সকলের কাছে উপাদেয় বিবেচিত হইবে, তাহার বিচারের পূর্বে দেখিবার প্রয়োজন আছে, বিদেশের প্রভাবে আমাদের প্রাচীন সমাজে কোনরূপ মৌলিক পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা দিয়াছে কি-না। মানুষেরা অভিমানে ও আত্মসম্মান-বোধের নামে যতই বলুক না কেন, যে তাহারা অপরের কিছু অনুকরণ করিবে না, অতর্কিতে কিন্তু এ পৃথিবীর সকলেই অপরের কিছু-না কিছু অনুকরণ করিয়া থাকে; তবে চপলের অনুকরণ হয় এক রকম, আর বুদ্ধিমানের হয় অন্য-রকম। এখানে একথাও বলিয়া রাখি যে, নিদানপক্ষে ছয়লক্ষ বৎসর ধরিয়া মানুষেরা আলাদা-আলাদা থাকিলেও, চিরকাল পরের অনুকরণ করিয়া আপনাদের দোষ ও গুণ বাড়াইয়াছে। নৃ-তত্ত্বের সে বিবরণ না-হয় না-ই দিলাম; কিন্তু আমরা বিদেশীদের যাহা অনুকরণ করিয়াছি ও করিতেছি, তাহার এমন গোটাকতক ছোট-ছোট দৃষ্টান্ত দিব, যেগুলি অতি সাধারণ লোকের কাছেও প্রত্যক্ষ।

প্রথমে বলি, আমাদের আমোদ-প্রমোদের দিকের কথা। এদেশে যাত্রা-গান ছিল, কবির গান ছিল, পাঁচালী ছিল, ঢপের গান ছিল, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

প্রাচীন কালের বই খুলিয়া দেখাইতে পারি, এদেশে নাটক ছিল ও নাটকের অভিনয় ছিল; কিন্তু সে অভিনয়ের নূতন সংস্করণ না করিয়া আমরা যে বিদেশী অভিনয়ের নকল করিয়াছি তাহার প্রথম প্রমাণ— আমাদের একালের নাটকাভিনয়ের নাম হইয়াছে "থিয়েটর্", আর এই থিয়েটর নাম শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের মধ্যে চলিয়াছে।

থিয়েটরি কায়দায় সে-কালের যাত্রাগান নূতনরূপে বদ্‌লাইয়াছে, আর কবি, পাঁচালী প্রভৃতি একেবারে উঠিয়া গিয়াছে, বলা চলে। একালে যে নাটক রচিত হয়, তাহা প্রাচীনের রূপক বা উপ-রূপকের ছাঁচে তৈরি হয় না, বিলাতী ছাঁচে গড়া হয়। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দিতেছি, আমাদের সকল রকমের পদ্য-গদ্য কাব্য-রচনার পদ্ধতি দেখিয়া। হোমরের সময় থেকে এ পর্য্যন্ত ইউরোপের কাব্য-রচনায় এই একটি ধরণ লক্ষ্য করি যে, কাব্যের বর্ণিত বিষয়ের ইতিহাসটুকু গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক-ভাবে দেওয়া হয় না; কাব্যের বস্তুর যে অংশ বা যে ঘটনা সহসা বিস্ময় ও কৌতূহল জাগায়, তাহাই লিখিয়া কাব্যের আরম্ভ করা হয়, আর ইতিহাসটুকু সারা কাব্য পড়িয়া ধরিয়া লইতে হয়। হোমরের কাব্যের গোড়ায় আছে Wrath of Achillis; একিলিস্‌ কে আর তাহার ক্রোধই বা কেন, এই ইতিহাস না জানিয়াই পাঠকেরা কৌতূহলে ও বিস্ময়ে পড়া সুরু করে।

কাহার সঙ্গে, কি কারণে বিচ্ছেদ ঘটিল, তাহা না জানিয়াই Byron-এর লেখায় পড়িতে পাই—

> When we two parted
> In silence and tears,
> Half-broken-hearted
> To sever for years.

কাব্যরচনার এই ধরণ এদেশে সম্পূর্ণ চলিত হইয়াছে। এখন আর সে-কালের ধরণে—এক যে ছিল রাজা বলিয়া গল্পের গোড়া বাঁধিয়া বর্ণনা করা চলে না। বাণভট্টের শূদ্রক রাজার সভার বর্ণনায় অনেক ছত্র ধরিয়া নানা কথা-বিন্যাসের কারিগরি ঠেলিয়া শূদ্রকের নাম পাই; এই ধরণের রচনাকে কবি রবীন্দ্রনাথ ওস্তাদী গানের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন, গানে আছে 'চলত রাজকুমারী' কিন্তু গায়ক 'চলত রা' আওড়াইয়া নানা সুর ভাঁজিতে থাকেন, আর রাজকুমারীর চলা হয় না। আমাদের কাব্য-রচনার ছাঁচ-কাঠাম বিদেশের অনুকরণেই বিলক্ষণ বদ্‌লাইয়াছে। নিয়ত নানা কাজে ব্যস্ত ইউরোপীয়েরা চট্‌ করিয়া বিস্ময় জাগাইবার কথা লিখিয়া যেমন পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তেমনই তাঁহাদের খেলাতেও এই ধরণ লক্ষ্য করি। আমাদের দেশের দাবা-খেলা ইউরোপে গিয়াছে; এই খেলায় এক ঘর, এক ঘর করিয়া বোড়ে টিপিতে হয়; একবার ঘোড়ার মত রাজাকে চালাইয়া ঘর বাঁধিতে হয়; তাহাতে খুব তাড়াতাড়ি খেলা জমান যায় না বলিয়া সে বিষয়ে এখন একটু পরিবর্তন করা হইয়াছে, যাহাতে খেলার যুদ্ধ আরম্ভ করিতে বিলম্ব না হয়। পাশা-খেলাতেও এদেশে ঐরূপ দৃষ্টান্ত পাই। যুদ্ধপ্রিয় মহারাষ্ট্রীরা শিবজীর সময়ে নিয়ম করিয়াছিল যে, ৬।৩।৯ প্রভৃতি দান ফেলিয়া হাত-খোলার অপেক্ষা না করিয়া একেবারে যে-কোন দানে খেলা সুরু করা চলে। যে দেশে ও সমাজে বিস্তর অবসর নাই আর কাজের তাড়া আছে অনেক, সেখানে মনের ভাব হয় আলাদা, আর মনের ভাবের ফলে সাহিত্যের কাঠামও গড়ে ভিন্ন রকমে।

আর একটি সামাজিক অবস্থার কথা বলিব। এই ভারতবর্ষে প্রদেশে-প্রদেশে অনেক বিভিন্ন জাতির বাস। আর প্রদেশে-প্রদেশে ভাষা-ভেদ আছে বিস্তর; তবুও প্রাচীনকালের সভ্যতার একটি বিশেষত্বের ফলে এ-প্রদেশে সে-প্রদেশে সেরূপ প্রভেদ জন্মে নাই, যেরূপ প্রভেদ ইংলণ্ড, জর্মনি ও হলাণ্ড প্রভৃতির মধ্যে আছে। চিরকালই ভারতের এক প্রদেশের লোক কাহারও অনুমতি না নিয়া অন্য প্রদেশে আবাস রচিতে পারিয়াছে। অনেক প্রভেদ থাকিলেও সকলেই যে ভারতবর্ষের লোক— অতর্কিতে যেন সকলের মনে এই ভাব ছিল, অথচ জাতি-ভেদের দরুণ একজন অপরকে না ছুঁইবার ভাবও ছিল। তাহার পর আবার দেখা যায় যে, এক সময়ে প্রদেশে-প্রদেশে বহু স্বাধীন রাজারা রাজত্ব করিয়াছেন ও কত সময়ে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহও ঘটিয়াছে। তবুও

এক প্রদেশের লোক যেন আলাদা হইয়া অন্য দেশের লোককে বড়াই করিয়া শোনায় নাই যে, তাহারা সেই দেশের জেতা। এ সম্বন্ধে ইউরোপের অবস্থা একেবারে আলাদা। কবে কোন দেশের লোকেরা অপর দেশের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিল, সেই গৌরবের স্মৃতি আনন্দে পুষিবার জন্য ইউরোপে যে শ্রেণীর ইতিহাসের সৃষ্টি হইয়াছিল, এদেশে সে শ্রেণীর ইতিহাস জন্মিতেই পারে না। ভারতী কথায় যে বিপুল যুদ্ধের বিবরণ আছে, তাহাতে জেতাদের দলের বিশেষ গৌরব অথবা প্রদেশবিশেষের বিশেষ গৌরব স্মৃত হয় নাই বা কীর্তিত হয় নাই। ইউরোপে যেখানে ইতিহাসে আছে—যুদ্ধের পর জাতি-বিশেষের গৌরবের কথা, ভারতে সেখানে বিশিষ্ট দলের গৌরব কীর্তিত না হইয়া ইহাই প্রচারিত হইয়াছে যে—'যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ'। এইখানেই ভারতের প্রাচীন অবস্থার একটি বিশিষ্টতা পাই। এই বিশিষ্টতাটির কথা আরও গোটা দুই দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছি।

লেবর এসোসিএশন্ বা কুলী-সংগ্রহের দলের একজন প্রধান ব্যক্তি লেখককে বলিয়াছিলেন যে, অনার্য্য জাতির লোকেরা দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র গেলে আর্য্য-সভ্যতায় পুষ্ট লোকেদের সমাজ-প্রসারের সুবিধা হইতে পারে। এ প্রসঙ্গে তিনি একথাও বলিয়াছিলেন যে, ভারতের আর্য্যেরা জীবন-যুদ্ধে কিছুতেই মলিন হইতেন না, যদি আর্য্যেরা প্রাচীনকালে ছলে ও বলে অনার্য্যদিগকে একেবারে উচ্ছেদ করিতেন। আমি তাঁহাকে আনন্দে বলিয়াছিলাম—উন্নতির পথে বাধা হইলেও, আমাদের পিতৃপুরুষেরা দল-বিশেষকে মারিয়া উৎসন্ন করেন নাই—ইহাতে গৌরব অনুভব করি। ভারতের নানা স্থানকে তস্মেনিয়া (Tasmania) প্রভৃতির মত না করায় আর্য্যেরা নীতি-নিপুণদের যে নিন্দা পাইয়া থাকেন, তাহারই মধ্যে আছে ভারতের বিশিষ্টতার গৌরব। রাষ্ট্রনীতির খাতিরে ও সারা দেশে এক রকমের ভাব জাগাইবার চেষ্টায়, রুশিয়ার কর্তারা সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার পতাকা হাতে করিয়া কসাক্ সম্প্রদায়ের লোকদিগকে অভাবের দুঃখে পিষিয়া উৎসন্ন করিতেছেন; কিন্তু ঐ পতাকা যাঁহাদের ছিল না, তাঁহারা জীবনের [illegible] আর এক [illegible] প্রভাবে কোন প্রকার সুবিধার খাতিরে মানুষকে মারিয়া শেষ করেন নাই। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি দিতেছি।

ইউরোপে যাহাকে ইতিহাস বলে, প্রাচীন ভারতের লোকেরা সে ইতিহাস সৃষ্টি করে নাই, তাই ভারতবাসীদের লিখিত এমন ইতিহাস নাই, যাহাতে জানিতে পারি—কি উপায়ে ও উদ্যোগে ভারতের লোকেরা সারা পূর্ব উপদ্বীপে ও উহার দক্ষিণের দ্বীপপুঞ্জে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এখন ঐ দেশগুলিতে ভারতীয়েরা বাস করে না; তবুও ঐ দেশের লোকেরা কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া গৌরবের সঙ্গে বলে—তাহাদের সভ্যতার মূলে আছে ভারতের সভ্যতা ও তাহাদের রাজবংশের লোকেরা নাকি এখনও ভারতের রাজবংশের বংশধর। ইউরোপীয়েরা আমাদের মাথার উপরে পূজ্য আসন পাতিয়া বসিয়াছেন ও যথার্থই অনেক বিষয়ে আমরা ইউরোপীয়দের অনুকরণ করিতেছি; তবুও আমরা তাহা স্বীকার করিতে লজ্জিত হই। ভারতের কোন প্রভাব না থাকিলেও, পূর্ব উপদ্বীপ প্রভৃতিতে ভারতের গৌরব কীর্তিত হয়। কিরূপ ব্যবহারের ফলে এইরূপ ঘটিল, তাহা বুঝিতে পারিলে ভারতের বিশিষ্টতা বুঝিতে পারিব। এ কালে আমাদের দেশের শ্রমিকেরা আফ্রিকা হইতে তাড়া খাইতেছে; কিন্তু ভাস্কোডিগামা প্রভৃতি অনেকের পূর্বপুরুষের জন্মের পূর্ব হইতে পূর্ব আফ্রিকায় ভারতবাসীরা বাণিজ্য করিত, আর সে দেশের লোকদের সঙ্গে কখনও তাহাদের বিবাদ ঘটে নাই। তিব্বত প্রভৃতি দেশে ভারতের সভ্যতা গিয়াছে, আর চিরকালই সে সকল দেশে ভারতীয়েরা অবাধে যাইতে পারিত। এখন কিন্তু ইউরোপের উচ্চতম সভ্য জাতির লোকেরা এসকল দেশে অবাধে প্রবেশ করিতে অধিকার পান না।

যে বিশিষ্টতার ফলে ঐরূপ ঘটিয়াছিল, সে বিশিষ্টতাকে ধর্ম নাম দিতে পারি বটে; কিন্তু সে ধর্মকে পূজা অর্চা শ্রেণীর ধর্ম বলা চলে না। উহার ব্যাখ্যার জন্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে হয়। নীতি অর্থ যেখানে policy-বাজদের অর্থাৎ ক্ষণিক লাভের সুবিধাবাদীদের পদ্ধতি, তাহাকে উপেক্ষা করিয়া জীবনের মূলে আছে যে জ্ঞানের বৃদ্ধি,

তাহারই মধ্যে আছে, সেই ধর্ম্মের স্বরূপ, যাহার দৃষ্টান্তে বলিয়া থাকি—'যতোধর্মস্ততো জয়ঃ।' ঐ ধর্মে অটল হইবার কথায় আছে—'নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু। লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্। অদ্যৈব বা মরণমস্তু, যুগান্তরে বা। ন্যায়াৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ।' বাঙ্গালী পাঠকদের জন্য উহার দুর্বল অনুবাদে লিখিতে পারি—

স্তুতি-নিন্দা নীতিপটুর খাতিরে না আনি,
আসুন লক্ষ্মী, যান্ বা বালাই, কিসের তাহে হানি!
দুদিন আগে, দুদিন পিছে হবেই মরণ জানি,
ন্যায়ের পথে থাক্‌ব অটল—এই ত সাধুর বাণী।

জীবনের ও সমাজের প্রসারে আমাদিগকে বাড়িয়া বিশ্বের সঙ্গে মিলিতেই হইবে। এই সময়ে ভারতের যথার্থ বিশিষ্টতা কিসে, তাহা নানা অনুসন্ধানে বুঝিতে হইবে ও তাহা স্থির করিয়া বিশ্বের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে ও পরের অনেক মাহাত্ম্য সংগ্রহ করিতে হইবে। অনেক সঙ্কীর্ণতা ও প্রাদেশিকতা বিসর্জন দিতে হইবে; কিন্তু যাহা আমাদের খাঁটি সোণা, তাহা ফেলিয়া আঁচলে গিরা দিতে পারিব না। সাহিত্যিকদের মনে এই বুদ্ধি বিকশিত হোক্।

[তালতলা পাব্‌লিক লাইব্রেরীর সাহিত্য-সম্মেলনের উৎসবে মূল সভাপতি আচার্য্য শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদারের প্রদত্ত অভিভাষণ]

দুঃখ-হরণ

শ্রীবিভূতিভূষণ সরকার

আমার প্রাণের মাঝে কি গো তুমি
দুখের হরণ এলে,
গোপনে চরণ ফেলে তালে তালে
প্রেমের অরুণ ঢেলে!

এত প্রেমের যোগ্য কি নাথ আমি,
মোর সকল দুখের, সকল সুখের স্বামী,
তবু সফল কর সকল দিবস যামি,
তব প্রেমের চরণ ফেলে!

তোমার ইচ্ছা হোক্ হে পরাণ-প্রিয়,
তোমার যা' খুসি তাই আমারে দিও;
সকল আমার হরণ করি' নিও,
হেমরূপের বরণ মেলে!

গোত্রহারা

(গল্প)

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

জয়ন্ত যেদিন গ্রামে এসেছিল সে দিনের কথা লোকে আজ ভুলে গেছে। নিমাই দাসের আশ্রয়ে সে থাকে, তারই সঙ্গে সে বছরে নয়মাস বিদেশে ঘুরে আসে—সঙ্গে থাকে একটা গোপীযন্ত্র।

ঘরখানা থাকে তখন চাবী-বন্ধ, উঠান ভরে' ওঠে জঙ্গলে; বাড়ী ফিরে এসে নিমাই দাস জয়ন্তের সাহায্যে উঠান পরিষ্কার করে, ঘর পরিষ্কার করে।

গ্রামের লোকের সঙ্গে জয়ন্তের সম্পর্ক নেই বল্‌লেই হয়। যে দু-তিন মাস সে এখানে থাকে, সে মাস কয়টা সে বাগানে কাজ করে, গান শেখে।

গ্রামে সমবয়সী অনেক ছেলেই থাকে, তারা উঁকি-ঝুঁকি মারে, অথচ কাছে কেউ আসে না; জয়ন্তও তাদের সঙ্গে মিশ্‌বার ঔৎসুক্য প্রকাশ করে না।

গ্রামের রাম অধিকারী সম্প্রতি একটা যাত্রার দল করেছে, এর মধ্যে নানা যায়গা থেকে বেশ ডাকও আস্‌ছে, নামও হয়েছে যথেষ্ট।

অধিকারী এই সুকণ্ঠ ছেলেটাকে নিজের দলে নেওয়ার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল, সেই জন্যেই সে একদিন নিমাই দাসের কাছে এসে দাঁড়াল।

মাইনে নাকি বেশী, তাই নিমাই দাস সহজেই রাজি হয়ে গেল।

জয়ন্তেরও ইচ্ছা ছিল, সে যাত্রার দলে মেশে; মহা আনন্দে সে যাত্রার দলে যোগ দিলে।

তারপর তাকে কত কিই না সাজ্‌তে হয়! চেহারা ভালো হওয়ায় কখনও সে হয় প্রহ্লাদ, কখনও রাম, কখনও কুশ। এ সব 'পার্ট' তার মুখস্থ; কেউ তাকে কোন দিন হার মানাতে পারে না।

অধিকারী ভারী খুসী—

তার দলের নাম দিন দিন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

সে-বার নিমাই দাস যখন তীর্থ-পর্য্যটনে গেল, জয়ন্ত তার সঙ্গে গেল না। তাতে তার দুঃখ ছিল না, কারণ বাড়ীতে বাড়ীতে গান গেয়ে ভিক্ষা মিল্‌তে পারে, নাম মিল্‌তে পারে না।

এক ভাবে, এক জায়গায় এরকমভাবে টিকে থাকা তার অসহ্য—তবু জয়ন্ত রয়ে গেল কেবল নামের জন্যে।

মন তার বন্ধনহীন, উদার আকাশের তল দিয়ে পাখীর মত ভেসে' চলে। যেখানে যায় নিজের স্থান সে নিজেই গড়ে' নেয়, নিমাই দাসকে তার স্থান গড়ে' দিতে হয় নি। যেখানেই গেছে, দুদিনেই পরকে আপন করে' নিয়েছে।

ব্যতিক্রম ঘট্‌ল যাত্রার দলে ঢুকে। মুক্ত পাখী হয় তো শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, বিশ্রাম চেয়েছিল; তাই দিনগুলা একে একে কেটে চল্‌লো, জয়ন্ত যাত্রার দলে থেকে নানা দেশে ঘুরতে লাগ্‌ল—বাঁধন সে ছিঁড়্‌তে পার্‌ল না।

নিমাই দাস আর দেশে ফির্‌ল না; শোনা গেল, সে নবদ্বীপে কোন আখ্‌ড়ায় নিজের জীবন কাটাতে মনঃস্থ করেছিল। ঘরখানা কবে মাত্র কুড়ি টাকায় নন্দ দাসকে বিক্রয় করে' গিয়েছিল তা কে জানে।

ইচ্ছা ছিল—এমনই ভাবে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া চল্‌বে, কিন্তু অদৃষ্ট তার বৈরী; তাই অধিকারীর আদর, যত্ন তুচ্ছ হয়ে গেল।

হঠাৎ একদিন সমবয়স্ক ছেলেদের তীব্র সমালোচনায় কানে এলো তার জন্ম সম্বন্ধে—সুদাম স্পর্দ্ধিত-ভাবে তাকে শুনিয়ে বল্‌লে, "নেহাৎ যাত্রার দলে এক সঙ্গে কাজ করি, তাই; নচেৎ যার মা বাপের পরিচয় কেউ জানে না—তার সঙ্গে কেউ মেশে! নিমাই দাসের সঙ্গে

জয়ন্তের সম্পর্কটা কি? শুনেছি, জয়ন্ত তখন এতটুকুটি ছিল—নিমাইদাস ওকে তুলে' এনে' মানুষ করেছে। জাতের যার ঠিক নেই,—ছোঃ—"

মা বাপ, মা বাপের পরিচয়—

কথাটা এতকাল মনে হয় নি, কেউ কোনদিন এ কথা তুল্‌বে তাও জানা ছিল না। জীবনের একটা দিক্‌ একেবারে চাপা পড়ে গিয়েছিল, আজ হঠাৎ সে দিক্‌টায়ও দৃষ্টি পড়্‌তেই, জয়ন্ত স্তম্ভিত হয়ে গেল।

নিমাই দাস তার কেউ নয়, তা সে জানে। আজই তার মনে পড়্‌ল—নিজের বাপ মায়ের কথা সে একটি দিনও জানতে চায় নি; বাপ মা কে ছিল, এ কথাটাও সে ভাবে নি।

যাত্রার দলে এমন অনেক ছেলে আছে যারা মায়ের পরিচয় বেশই জানে, বাপের পরিচয় হয় তো তারা দিতে পার্‌বে না। অধিকারী কোনদিন কারও বংশ পরিচয় জিজ্ঞাসা করে নি। যে যাই হোক, সকলের নামের শেষে "দাস" উপাধিটা বসিয়ে দিয়ে কাজ চালাত। এ নিয়ে এই সব গোত্রহীন ছেলেদের মধ্যে যে কোনদিন কোন কথা উঠ্‌তে পারে, এ যেন তার জ্ঞানেরও অতীত ছিল।

কিন্তু হ'লও ঠিক তাই।

জয়ন্ত একেবারে বিগ্‌ড়িয়ে বস্‌ল।

এত বড় অপমান সহ্য করে' সে আর এখানে থাকৃতে চায় না। এতদিন যে কথা সে ভাবে নি আজ সেই ভাবনা তার মনে জেগেছে, যে দিক্‌টা সে দেখ্‌তে পায় নি সেদিকে তার দৃষ্টি পড়েছে। নূতন করে' সে আজ ভাবলে দশ, দেশ ও সমাজের উপায়,-অভিনয়ে সে রাজা-রাজপুত্র সেজে কৃতিত্ব দেখাতে পারে, তবু বাস্তবিক পরিচয় তার নেই। তার নাম আছে, গোত্র নেই।

সে মানুষ, কিন্তু এইটুকুই তার শ্রেষ্ঠ পরিচয় নয়। পরিচয় দিতে বংশ চাই—তার স্থান চাই, আলো চাই, —চাই সত্যকার প্রাণ, মনুষ্যত্বের বিকাশ যাতে হবে।

পরিচয় সংগ্রহ কর্‌তেই হবে—যেমন করে'ই হোক শুধু নাম নিয়ে তার আর চল্‌বে না, একপাশে পড়ে' থাকৃলে হবে না, তাকে সকলের মাঝখানে স্থান করে' নিতে হবে।

বাহু-বলে তা সম্ভব নয়, সম্ভব হবে তার পূর্ব্বপুরুষের পরিচয়ে।

অধিকারীর কাছে গিয়ে সে বিদাই চাইলে। বংশ-পরিচয় সংগ্রহ কর্‌তে তাকে যেতে' হবে।

সমস্ত কথা শুনে অধিকারী হেসে উঠ্‌লেন, বল্‌লেন পাগল হয়েছ জয়ন্ত, যা তা কথা মুখে এনো না। তোমার মত গোত্রহীন অনেক ছেলেই এখানে আছে,—যে তোমায় বলেছে—সেও নিজের কথা কিছু জানে না।

দৃঢ়কণ্ঠে জয়ন্ত বল্‌লে, "তবু তাদের মা আছে, গোত্রহীন হ'লেও কোনদিন তার গোত্রের পরিচয় পাবে; আমি পাব না।" আমি আমার মা বাপকে খুঁজে বার কর্‌বই!

সেই দিনই সে বিদায় নিলে, কারও একটী কথা কাণে তুল্‌লে না!

প্রদীপের তলায় অন্ধকার জমাট হয়ে থাকে অনেকখানি। লোকে দেখে যায়, কিন্তু তা দেখাই মাত্র; অন্ধকারের দিকে বড় বেশীক্ষণ তাদের দৃষ্টি বদ্ধ হয়ে থাকৃতে পারে না, চট্‌ করে আলোর দিকে তাকায়। আলোর জীব অন্ধকারের কল্পনা কর্‌তেও শিউরে ওঠে, ভাব্‌তে পারে না সেখানে প্রাণী থাকে; কিন্তু যারা অন্ধকারে থাকে, তারা স্বচ্ছন্দে অন্ধকারেই চলাফেরা করে, স্পষ্ট দেখতে পায়, আহার সংগ্রহও করে। অন্ধকারেই তাদের জন্ম, তাদের বিস্তৃতি, আবার অন্ধকারেই তাদের ধ্বংস হয়।

মানুষই কতকগুলি মানুষকে শ্রেণীবদ্ধ করে একই আইনের বশবর্ত্তী করেছে এবং তারই নাম দিয়েছে সমাজ; কিন্তু এই সমাজের বাইরে অথচ এরই আওতায় আরও অনেক জীব বাস করে। সমাজের অন্তর্ভুক্ত তারা না হোক, ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে তারা সীমাবদ্ধ হতে না পারুক, মানুষের যেখানে বিচার হয়, সেই বৃহতের দরবারে তাদের ঠেকাবার যো নেই,—সেখানে তারাও দাঁড়াবে কেবল মানুষ হওয়ার দাবী নিয়ে।

সমাজ তাদের আশ্রয় দিতে না চাক, তাদের কাজ চায়। জগতে এদের মত জীবেরও আবশ্যকতা আছে;

অকল্যাণ হয় তো হয়, কিন্তু কল্যাণও হয় ততখানি বা তার চেয়ে বেশী।

জয়ন্ত আকাশের পানে চেয়ে ভাবে।

মনে পড়ে একদিন নিমাই বারাণ্ডায় বসে গোপাল ময়রার সঙ্গে গল্প কর্‌ছিল। সে খানিকটা কথা আড়াল হয়ে শুনেছিল তাতে জেনেছিল—একটী ছেলের কথা হচ্ছে।

আঠার বছর আগে পথের ধারে একটী সদ্যঃপ্রসূত ছেলেকে লোকে দেখ্‌তে পেয়েছিল। সযত্নে তাকে তুলো দিয়ে জড়ানো হয়েছিল, তার গায়ের উপর বহুমূল্য একখানি শাল থেকে তার আভিজাত্য-গৌরব ব্যক্ত করেছিল। সেই সদ্যোজাত শিশুটী রাত্রের অন্ধকারে চুপি চুপি ধরার বুকে এসেছিল, ভোরে ঘুম ভেঙ্গে আলো দেখে' সে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, কাঁদ্‌বার কথা বুঝি তার মনেও পড়ে নি। সেই শিশু—নিজের হাতখানা নিজের অজ্ঞাতে মুখের কাছে গিয়ে পড়্‌লে কোন রকমে সে হাত চুষ্‌তে শিখেছিল মাত্র। সেই হাত সরে' গেলে কোনরকমে কাছে আন্‌বার শক্তি তার ছিল না।

সেই শিশু—কোথায় সে আজ?

সে আজ আঠার বছরের শক্তিশালী তরুণ, তার দেহে পৌরুষ-ভঙ্গী।

নিমাই দাস তার কাজে মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে স্পষ্টই জানাত—"আঁস্তা-কুড়ের পাত্র কোনদিন স্বর্গে যেতে পারবে না। পূজোর কাজে কলাপাত লাগ্‌লেও সে যেমন আঁস্তা-কুড়ে জায়গা পায়, তোরও ঠিক সেই দশা হবে দেখিস্।"

সেদিনে কথাটা জয়ন্ত হেসে' উড়িয়ে দিলেও, আজ সে কথা মনে পড়ে' সে অধীর হয়ে উঠ্‌ল।

সেই যে শিশুটী পথের ধারে পড়েছিল, সে কে,—সে কি সেই'?

মানুষের জন্মবৃত্তান্ত এমন ঘনতম নিকষ অন্ধকারেও ঢাকা থাকে? মায়ের পরিচয় সে জানে না, বাপেরও না;—সে মানুষ, কিন্তু কেবল এইটুকুই কি তার শ্রেষ্ঠতম পরিচয়?

জয়ন্তের মুখ লাল হয়ে ওঠে,—

দুই হাতে মাথার চুলগুলা অধীর-ভাবে টান্‌তে টান্‌তে সে বলে, "জানা চাই নিশ্চয়ই জানা চাই, তার জন্ম-ব্যাপারটাকে এমন অন্ধকারে সে ফেলে রাখ্‌তে দেবে না।"

নিমাই'এর কাছে সংবাদ পাওয়া যাবে, তাতে একটুও সন্দেহ নাই।

জয়ন্ত নবদ্বীপে যাওয়ার উদ্যোগ করে' ফেল্‌লে।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। নবদ্বীপে পৌছে জয়ন্ত শুন্‌তে পেলে মাত্র সাতদিন আগে নিমাই ইহলোক ত্যাগ করেছে।

একমাত্র উপায় ছিল জান্‌বার—নষ্ট হয়ে গেল, জয়ন্ত বসে' পড়্‌ল।

যাক,—জয়ন্ত নিজেই চেষ্টা করে' বার কর্‌বে সে কে, তার বাপ মা কে?—

জয়ন্ত দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে আবার গ্রামে ফিরে' এল।

গ্রামে ফিরে'ত জয়ন্ত বিরাট্ ব্যাপার দেখ্‌তে পেল।

বহুকাল পরে জমীদার সুনীতি রায় দেশে ফিরেছেন, সঙ্গে তাঁর মেয়ে কমলা।

স্ত্রী-বিয়োগের কিছুকাল পরে সুনীতি রায় বিধবা মেয়েকে নিয়ে কাশী চলে গিয়েছিলেন; মাঝে দু-চার বার এখানে দু-এক দিনের জন্যে এসেছিলেন,—জয়ন্ত তাঁদের কোনবারই দেখ্‌তে পায় নি। বৎসরের মধ্যে কয়টা মাস সে নিমাইয়ের সঙ্গে বিদেশে ঘুরত, দেশের সঙ্গে সম্পর্ক তার ছিল না বল্‌লেই চলে।

কমলা কি ব্রত নিয়েছিলেন, এবারে তাঁর ব্রত শেষ হবে; সে জন্যে তাঁকে অন্ততঃ পক্ষে মাসখানেক এখানে থাকতে হবে, এর মধ্যে জমীদারবাবুও তাঁর কাজ কর্ম্ম সব দেখে' নেবেন।

জমীদার বাড়ী লোকে পূর্ণ। গ্রামের ছোট বড় সবাই সেখানে যাওয়া আসা করছে। কত লোকে কত কাজও পেয়ে গেল; অধিকারীর যাত্রার দল বায়না পেয়ে বেশী পরিশ্রমে রিহার্সাল দিতে সুরু করে' দিলে।

প্রহ্লাদ-চরিত্র যাত্রা হবে, উপযুক্ত প্রহ্লাদ পাওয়াই মুস্কিল হয়ে উঠ্‌ল।

জয়ন্ত কেমন নিখুঁতভাবে প্রহ্লাদের ভূমিকায় নামত এমনভাবে আর কেউ পারে না। অধিকারী অধীর হয়ে উঠ্‌ল, কাউকেই তার পছন্দ হয় না।

কমলা নিষ্ঠাবতী বিধবা—ধর্ম্মাচরণেই নিজের জীবনটা তিনি কাটিয়ে দিতে চান। দেশ বিদেশে এই ধার্ম্মিক দয়াশীলা মেয়েটীর নামের প্রচার বড় কম নয়। লোকে বলে—মা ভবানীর পর এমন মেয়ে আর একটী জন্মায় নি।

সুনীতি রায় মেয়ের ধর্ম্মাচরণে কোনদিন এতটুকু বাধা দেন নি।

বালবিধবা মেয়ে, তের বৎসর বয়সে বিবাহ হয়েছিল, চৌদ্দ বৎসর বয়সেই বিধবা হয়েছেন। তাঁর সংযম-নিষ্ঠার উপর কেবল তাঁর পিতারই নয়, লোকেরও বিশ্বাস অপরিসীম।

লোকে এই মেয়েটীরই দৃষ্টান্ত দেয়, মেয়ে যেন লোকের এমনই হয়, সেই প্রার্থনাই করে।

প্রহ্লাদ-চরিত্র নাকি তিনি খুব ভালবাসেন। সেদিনে অধিকারীকে বায়না দেবার সময়ে কমলা তাকে বলে' দিয়েছিলেন, "দেখ ঠাকুর, যা তা পালা গাইলে হবে না। আজকাল যে সব অপেরা হয়েছে আমি তা চাইনে। তোমায় দুশো চারশো টাকা দেব—কিন্তু কথা এই—ঠিক আমার মনের মত জিনিস চাই।"

ধনীর খেয়াল—

অধিকারী বুঝ্‌তে পারে না কিসের অভিনয় করে' সে এই খেয়ালী মেয়েটীর মন যোগাবে। অনেক চেষ্টা করে অবশেষে সে জান্‌তে পারলে প্রহ্লাদ-চরিত্রই নাকি কমলা খুব পছন্দ করেন।

বিষয়টা তো জানা গেল, এখন উপযুক্ত প্রহ্লাদ পাওয়া যায় কোথায়?

এই সময়ে জয়ন্ত নবদ্বীপ হতে ফিরে' এল।

অধিকারী তাকে ধরে' বস্‌লে,—মাত্র এই একবার, তারপর অধিকারী আর তাকে অনুরোধ করবে না; এই বারটা তাকে প্রহ্লাদ সাজ্‌তেই হবে, অধিকারীর মুখ রক্ষা করতে হবে।

এই শেষবার—

জয়ন্ত খানিক চুপ করে' ভাব্‌ল,—তারপর মাথা নাড়্‌লে।

ব্যাকুলভাবে অধিকারী তার হাত দুখানা চেপে ধর্‌লে—"মাত্র একবার জয়ন্ত, অনেককাল আমার দলে ছিলে, আমার দলের সুখ্যাতি তোমা হতে। এ বারটা আমার মুখ রাখ—আমি তোমায় অনেক টাকা দেব—যা চাইবে তাই দেব।"

জয়ন্ত স্থিরকণ্ঠে বল্‌লে, "কিছু চাই নে অধিকারী মশাই, আমি প্রহ্লাদের পার্ট নেব, আপনি আয়োজন করুন।"

আগে কয়েকবার প্রহ্লাদ-চরিত্র অভিনয় হয়েছিল, তাতে প্রহ্লাদের অংশে জয়ন্ত নেমে যে প্রশংসা অর্জ্জন করেছিল, তার জন্যই এই যাত্রার দলের খ্যাতি আজও রয়েছে।

সেদিন কমলাকে সে দেখ্‌তে পেলে—কমলা নদীতে স্নান করতে চলেছেন, সঙ্গে দু-তিন জন দাসী।

মেয়েটীকে দেখ্‌বার কৌতূহল যদিও তার ছিল না, তবু না তাকিয়ে পারলে না।

একবার মুহূর্ত্তের দৃষ্টিপাত করতে সে বিস্মিত হয়ে গেল।

এ পর্য্যন্ত সে এমনভাবে কোন মেয়ের পানে চায় নি, কেন না এমন বিশেষত্ব কারও মধ্যে সে দেখ্‌তে পায় নি।

আশ্চর্য্য এই মেয়েটী—

বয়স বোধ হয় ৩৬।৩৭ হবে, দেখ্‌লে মনে হয় ত্রিশের বেশী নয়। এমন শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি কোন মেয়ের দেখা যায় না।

আত্মবিস্মৃত-ভাবে সে তাকিয়েছিল কমলার দিকে—

"আরে ম'ল ছোঁড়া,—কি করে' তাকিয়ে আছে দেখ একবার;—"

দাসীর কর্কশ কণ্ঠস্বরে জয়ন্ত চমকে উঠ্‌ল, কমলাও তার দিকে, ফিরে চাইলেন।

সে দৃষ্টিতে ফুটে' উঠেছিল অসীম বিস্ময়,—

জয়ন্ত সে দিকে পেছন ফিরে' চলে' গেল।

যাত্রার আসর লোকে পরিপূর্ণ—

প্রহ্লাদ স্বয়ং জয়ন্ত,—

অভিনয় সে করে প্রাণ ঢেলে, নিজের অস্তিত্ব তখন সে ভুলে যায়; সেই জন্যেই তার অভিনয় হয় জীবন্ত। দর্শক নিজেকে ভুলে যায়, স্থান কাল ভুলে যায়, তন্ময় হয়ে অভিনয় দেখে' কখনও কাঁদে, কখনও হাসে, কখনও ক্রোধে আত্মহারা হয়।

অধিকারীর আনন্দের শেষ নেই। জয়ন্ত আজ অভিনয়ে অসাধারণ সাফল্য লাভ কর্‌বে, এ সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ ছিল না।

সাম্‌নের বারাণ্ডায় পরদার আড়ালে বসে' কমলা। তাঁকে ঘিরে অনেক মেয়েই ছিল, অনেকে অনেক কথাও বল্‌ছিল, কোনদিকে তাঁর কান ছিল না, দৃষ্টি ছিল না।

এ পর্য্যন্ত অনেক অভিনয় তিনি দেখেছেন—সে অভিনয়ে এমন সজীবতা ছিল না, অভিনয় বলে'ই মনে হয়েছে।

বাইরে গদীর উপরে বসে' সুনীতি রায়, তাঁর চোখ ফেটে কখনও জল ঝর্‌ছে, কখনও উচ্ছ্বসিত হয়ে হাস্‌ছেন, কখনও ক্রোধে অধীর হয়ে উঠ্‌ছেন।

অভিনয়ের মাঝখানে তিনি প্রহ্লাদকে কাছে ডেকে নিজের হাতের আংটীটা দান করে' ফেল্‌লেন, প্রহ্লাদ নতমস্তকে তাঁর দান তুলে' নিলে।

পরদার আড়ালে কমলার চোখ দুটি সজল হয়ে উঠেছিল। দাসীকে লক্ষ্য করে' তিনি বল্‌লেন, "ছেলেটীকে একবার আমার কাছে ডেকে দিতে পারিস্, বিন্দে—?

সেই অঙ্কটা শেষ হ'লে সুদর্শন ছেলেটী পরদার মধ্যে এসে দাঁড়াল।

শান্তকণ্ঠে কমলা বল্‌লেন, "তোমার অভিনয় দেখে' আমি ভারি খুসী হয়েছি, এমন অভিনয় আমি আর কখনও দেখি নি, তোমায় পুরস্কার দিতে চাই, এই হারটা তোমায় দিলুম'।"

ছেলেটী মাথা নত করে' হাত পেতে তাঁর দেওয়া হার নিয়ে তাঁকে প্রণাম কর্‌লে। তার দুটি চোখ সজল হয়ে উঠেছিল, আস্তে আস্তে সে বার হয়ে গেল।

অভিনয় আবার আরম্ভ হ'ল।

কমলা পার্শ্ববর্ত্তিনী দাসীর পানে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "ছেলেটীর পরিচয় কিছু জানিস্ বিন্দে, ওর বাড়ী কি এখানেই?

পার্শ্ববর্ত্তিনী কাত্যায়ণী বলে' উঠ্‌লেন, "ওমা, ও যে আমাদের নিমাই বাবাজির কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে গো, ওকে তুমি চেনো না মা—ও যে সব-চিন্ ছেলে!

কমলা আশ্চর্য্য হয়ে গিয়ে বল্‌লেন, "কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে,—মানে? নবদ্বীপ কি বৃন্দাবন থেকে কুড়িয়ে এনেছে বুঝি—?"

কাত্যায়ণী বল্‌লেন, "না, না, নবদ্বীপ বৃন্দাবন কেন—ওকে যে আমাদের এখানেই পাওয়া গেছে গো। বড় রাস্তার ধারে আজ সতের আঠার বছর আগে দিব্যি তুলোয় আর দামী শালে জড়ানো ওই ছেলেটী পড়েছিল। গাঁয়ের কেউ ওকে ছোঁয় নি, শেষটায় নিমাই বাবাজি ওকে তুলে' আনে। যাই হোক, নিমাই বাবাজি ছিল তাই, নইলে ওই কচি ছেলেটাকে ওইখানে শিয়াল-কুকুরে ছিঁড়ে খেয়ে ফেল্‌ত।"

কমলার কাণে কথাগুলা গেল কিনা বুঝা গেল না, তিনি আবার অভিনয় দেখতে নিবিষ্টচিত্ত হয়েছেন।

তখন প্রহ্লাদকে হাতীর পায়ের তলায় ফেলা হয়েছে, প্রহ্লাদ করজোড়ে সাশ্রুনয়নে হরিকে ডাকছে।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে কাত্যায়ণী বল্‌লেন, আহা কোন পোড়াকপালির ছেলে গো বাছা, মা হতভাগী এমন সোণার চাঁদ ছেলে পেয়েও কোলে রাখ্‌তে পারলে না, পথের ধারে ফেলে রেখে' গেল—এ কি কম কষ্টের কথা গো—?"

কমলা মুখ ফিরিয়ে তিরস্কারের সুরে বল্‌লেন "বকো না পিসি কথাগুলো শুন্‌তে দাও। তোমার কথা তো কালও শুন্‌তে পাব, এমন যাত্রাটা আর দেখা হবে না। এখানে এখন তোমার পাঁচ কাহন কথা শুন্‌তে তো বসি নি, বাছা—চুপ কর।"

কাত্যায়ণী অগত্যা চুপ করে' গেলেন।

নিবিষ্ট মনে অভিনয় দেখ্‌তে দেখ্‌তে হঠাৎ কমলা উঠে' দাঁড়ালেন।—

সকলেই বিস্মিত হয়ে গেল—এমন অভিনয় দেখা ফেলে' কমলা উঠলেন কেন?

কপালটা চেপে ধরে' কমলা বল্লেন, "ভয়ানক মাথা ধরে' উঠেছে, আমি উঠে চল্লুম।"

সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠ্‌ল—

মাথা আর ধরবে না, সারাদিন উপবাস করে' ব্রত শেষের পূজার্চ্চনা করা, অত লোক খাওয়ানো, তারপরে আবার রাত জেগে যাত্রা শোনা—?

কমলা তাদের ব্যস্ততা দেখে' সান্ত্বনা দিলেন, "কিছু ভয় নেই, আমার এরকম মাঝে-মাঝে হয়, ঘণ্টাখানেক ঘুমুতে পারলে সেরে' যাবে, ঘণ্টাখানেক পরে আমি আবার আস্‌ছি, তোমরা ব্যস্ত হয়ো না।"

তিনি চলে' গেলেন।

ভোর পাঁচটা পর্য্যন্ত যাত্রা চল্লো; সে সময়ের মধ্যে কমলাকে আর দেখ্‌তে পাওয়া গেল না।

দিনের পর দিন যায়—

প্রথম যখন জর হ'ল, জয়ন্ত মোটে গ্রাহ্য করে নি; কিন্তু সেই জর এত বেশী হল যাতে সে বেহুঁস হয়ে পড়ে' রইল।

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কেটে গেল, গ্রামের কেউ তাদের বিখ্যাত অভিনেতার খোঁজটাও নিলে না।

পরের দিন যখন জয়ন্তের জ্ঞান ফিরে' এলো, তখন তার মনে হ'ল—তখন দিন নয়—রাত, ঘরের কোণে যেন একটা আলো জলছে। সবচেয়ে আশ্চর্য্য মনে হ'ল—যেন কার কোলে তার মাথা রয়েছে!

অতি ক্ষীণ কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করলে—"কে, তুমি কে?"

মানুষটাকে সে দেখ্‌তে পাচ্ছিল না; মনে হচ্ছিল একটা ছায়া!

উত্তর পাওয়া গেল না।

চক্ষু মুদে' জয়ন্ত পড়ে' রইল নরম কোলের উপরে মাথা রেখে'। একটা মাত্র অস্ফুট শব্দ তার মুখ ফুটে' বার হ'ল—"মাগো—"

মনে হ'ল তার কপালের 'পরে কার চোখের দুই ফোঁটা জল ঝরে' পড়্‌ল।

ক্ষীণ অথচ অতি তীব্র কণ্ঠে জয়ন্ত চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "না না, বল তুমি কে—বল। তুমি কি আমার মা—? লণ্ঠনটা জোর করে' দাও, আমায় একবার তোমায় দেখ্‌তে দাও।

কিন্তু আলো যেমন ক্ষীণ তেমনই ক্ষীণ রইল।

জয়ন্ত নিজে উঠ্‌বার চেষ্টা করলে—শক্তি নাই, শ্রান্তভাবে সে আবার শুয়ে পড়্‌ল।

"যেই হও, আমায় এ রাতে একা ফেলে যেয়ো না, আমি মরে' যাব—ভয় পেয়ে গলা শুকিয়ে মরে' যাব। তোমায় মিনতি করে' বলছি—সকাল পর্য্যন্ত তুমি থাকো।"

কখন আস্তে আস্তে ঘুমের ভারে তার দুই চোখ মুদে' এল—সে ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

যখন ঘুম ভাঙ্গল্ তখন বেশ সকাল হয়ে গেছে।

সে তাড়াতাড়ি মাথা উঁচু করে' দেখ্‌লে।

কোথায় কে?

বালিসে তার মাথা রয়েছে। সে কি স্বপ্ন? মন তার সঙ্গীহারা ত্যক্ত অবস্থায় পড়ে' থেকে হারানো মাকে পেতে চাইছিল, এ তার মা তাই স্বপ্নে বুঝি দেখা দিয়েছেন?

জয়ন্ত অতি সহজেই এ কথা ভুলে' গেল—স্বপ্ন চিরদিনই স্বপ্ন—সত্য নয়।

স্বপ্ন যদি সত্য হ'ত?

আস্তে আস্তে সে উঠ্‌ল, মাথাটা তখনও বেশ ভার রয়েছে, দেহটা বেশ হাল্কা হয়ে গেছে।

নিস্তব্ধভাবে জয়ন্ত মাদুরের উপরে পড়েছিল—

রাত্রি গভীর, পল্লীগ্রাম নিস্তব্ধ।

ভেজানো দরজা ঠেলে' ঘরে এসে ঢুকলেন একটী মেয়ে, হাতে তাঁর লণ্ঠন। লণ্ঠনটা পাশে রেখে' তিনি জয়ন্তের বিছানার কাছে এগিয়ে এলেন।

বুক টিপ্ টিপ্ করছিল, জয়ন্ত একটীবার নড়ল না—অচেতনের ভানে পড়ে' রইল।

মেয়েটী তার পাশে দাঁড়ালেন, ঝুঁকে পড়ে' তার নাকের কাছে হাত দিলেন, তার বুকে হাত দিয়ে দেখ্‌লেন।

তারপর আস্তে আস্তে তার মাথার কাছে বসে' পড়ে' সস্নেহে তার মাথায় আলগোছে হাত বুলোতে লাগ্‌লেন।

হঠাৎ জয়ন্ত ধড়ফড় করে' উঠে' বসল—একি—এ কে?

এ যে কমলা, রায়-বাবুর মেয়ে কমলা।

স্তম্ভিত জয়ন্ত খানিক নিষ্পলকে চেয়ে রইল, নিজের চোখ দুটীকেও সে বিশ্বাস করতে পারছিল না—

আপনি—এত রাত্রে ?

স্নিগ্ধকণ্ঠে কমলা উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, আমিই একা এত রাত্রে তোমায় দেখ্‌তে এসেছি জয়ন্ত, আমিই প্রতি রাত্রে আসি।"

সন্দেহে, উদ্বেগ জয়ন্তের সারা বুক ভরে' উঠল—

ব্যাকুলকণ্ঠে সে বল্‌লে, "কই আর তো কেউ আসে না—কেউ তো একটীবার এ দরজায় এসে দাঁড়ায় না। আপনি কেন আসেন—দিনে নয়—গভীর রাত্রে—যখন সব লোক ঘুমিয়ে পড়ে—"

বাধা দিয়ে কমলা বল্‌লেন, "হ্যাঁ, এই আমার সময়। এখানে আসার পক্ষে দিন আমার উপযুক্ত নয় জয়ন্ত, রাত্রিই আমায় এ সুযোগ দেয়, তাই আমি রাত্রের অন্ধকারে গা ঢেকে' আসি। কেউ আজও জানে নি, জানি শুধু আমি, জানেন শুধু সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান। ফাঁকি সকলকে দেওয়া যায়, দেওয়া চলে না নিজেকে, দেওয়া চলে না বিশ্ব-দ্রষ্টাকে।"

তাঁর কণ্ঠস্বর কাঁপ্‌ছিল—

জয়ন্ত হঠাৎ তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়্‌ল—রুদ্ধ-কণ্ঠে বল্‌লে "আমার মন সন্দেহে ভরে' উঠেছে, আমি আর সাম্‌লাতে পারছি নে। আমার সে মাকে আমি কখনও চোখে দেখিনি তবু তার সন্ধানে ফিরছি, সেই মায়ের দৃষ্টি আপনার চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছি, সেই মায়ের স্নেহ-কাতর কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি, আমায় বলুন, আমায় আমার হারাণো মায়ের সন্ধান দিন, বলুন—বলুন আপনি—"

আর্দ্র কণ্ঠে কমলা উত্তর দিলেন, "আমিই সেই—আমিই তোমার মা।"

মা—মা—

বিস্ফারিত চোখে জয়ন্ত কমলার পানে তাকিয়ে রইল।

কমলা তার মাথায় নিঃশব্দে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লেন, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একটী কথাও তিনি বল্‌তে পারলেন না।

জয়ন্তের উন্নত মাথা আস্তে আস্তে নুইয়ে পড়্‌ল, সে কমলার কোলের উপরে মাথা রাখ্‌লে—

তারপর হঠাৎ ক্ষুদ্র বালকের মতই উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে উঠ্‌ল।

অনেককালের ব্যগ্র কামনার পরিসমাপ্তি, তার সাধনা সিদ্ধ হয়েছে, সে তার মাকে ফিরে' পেয়েছে।

সে আর কিছু চায় না। লোকে আজ তাকে তুচ্ছ মনে করুক, ঘৃণা করুক, পদাঘাত করুক, সে সব সয়ে যাবে, কেন না বুক তার পূর্ণ, অন্তর তার আনন্দে উজ্জ্বল। দুঃখ বেদনা আর তাকে বিঁধ্‌তে পারবে না, ধ্বংসের চূড়ায় উঠ্‌লেও জয় তার অবশ্যম্ভাবী। সে জীবন লাভ করেছে, সে অন্ধকারে আলো দেখেছে।

মায়ের কোলে সে মুখখানা গুঁজে পড়ে' রইল, নিবিড়-ভাবে মাতৃস্নেহ উপভোগ করতে চাইল।

গোপনে চোখ মুছে' কমলা মুখ তুল্‌লেন, আর্দ্রকণ্ঠে ডাক্‌লেন, "জয়ন্ত—ওঠ, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

জয়ন্ত মুখ তুল্‌লে, চোখের জলে তার মুখ ভেসে যাচ্ছে।

কমলা বল্‌লেন, "উঠে বসো।"

জয়ন্ত উঠ্‌ল।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে' কমলা বল্‌লেন, "আজ তোমায় অনেক কথা জানানোর দিন এসেছে। আগে একটা কথা বল—এর আগে কোনদিন নিজের জন্ম-বৃত্তান্ত জানবার ইচ্ছা তোমার মনে জেগেছিল কি, কোনদিন আমাকে খুঁজেছিলে ?"

জয়ন্ত রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর দিলে' "খুঁজেছি মা।"

কমলা বল্‌লেন, "দেখা পাওনি ;" স্বপ্নেও কোনদিন ভাব নি কে তোমায় কয়েক ঘণ্টার ছেলে পথের ধারে তুলোর মধ্যে শুইয়ে দিয়ে গিয়েছিল ? এমন জায়গায় রেখে গিয়েছিল যেখানে ভোর হ'তেই সকলের চোখে পড়্‌বে—"

জয়ন্ত দুই হাতে মুখ ঢাক্‌লে—

কমলা শুষ্ক-কণ্ঠে বল্‌লেন, "তবুও শুনতে হবে জয়ন্ত, না শোনা ছাড়া উপায় নেই। আজ আমি যেখানে

দাঁড়িয়ে আছি, এক মুহূর্ত্তে সেখানে থেকে গড়িয়ে কোথায় পড়ে' যাব জান—অতল গর্ভে, সেখান থেকে আমি আর উঠ্‌তে পার্‌ব না। তোমায় ভুল্‌বার চেষ্টা করেছিলুম—হাঁ, প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলুম"—

অধীরভাবে তিনি নিজের মাথা চেপে ধর্‌লেন।

"কিন্তু পেরেছি কি? পারি নি। আমার ধর্ম্ম-কর্ম্ম, পূজাহ্নিক সব ব্যর্থ হয়ে গেছে। আমি পূজা কর্‌তে বসে' ঠাকুরের মুখে দেখেছি ক্ষুদ্র শিশুর প্রতিচ্ছায়া—হাজার কাজের মধ্যে শুনেছি শিশু-কণ্ঠের 'মা-মা' ডাক—আমি সব ফেলে দুই হাতে বুক চেপে' ধরে' মাটিতে লুটিয়ে পড়েছি, আমি হাহাকার করে কেঁদেছি।"

অবুঝের মত জয়ন্ত প্রশ্ন কর্‌লে, "আমায় কাছে রাখ নি কেন, মা?"

"কাছে রাখ্‌ব—"

কমলার মুখে মলিন হাসি ফুটে' উঠ্‌ল—আমি যে বাল-বিধবা, তুই যে বাল-বিধবার গর্ভে এসেছিলি জয়ন্ত, তোকে কাছে রাখ্‌বার উপায় আমার ছিল না। আজ—আজও যদি কেউ ঘুণাক্ষরে সন্দেহ করে, আমি কোথায় যাব তা ভেবেছিস্, জয়ন্ত?"

জয়ন্ত মুখ ফিরালে—

গোত্রহীন সন্তান, সমাজের বাইরে তার স্থান। দুনিয়ায় সে জায়গা পাবে—মানুষের মাঝে নয়, মানুষ তাকে তাড়িয়ে দেবে।

দুর্ভাগিনী নারী,—এই তোমার দণ্ড। মুহূর্ত্তের যে ভুল করেছ, সেই ভুলের জের তোমায় টেনে' চল্‌তে হচ্ছে, আজীবন টেনে' চল্‌তে হবে। শ্রেষ্ঠ অভিশাপ! সকলের চেয়ে আপন, সকলের চেয়ে প্রিয় সন্তান—তাকে চিরদিন পর বলে' দূরে রাখ্‌তে হবে। প্রকাশ্যে তাকে কাছে রাখ্‌বার উপায় নেই, তার ব্যারাম হ'লে, তার কাছে আস্‌তে হ'লে আস্‌তে হবে নিশীথের অন্ধকারে গা লুকিয়ে!

ভগবান কোথায়? জয়ন্ত আজ যদি তাঁকে দেখতে পেতে,—তাঁকে চেপে ধর্‌ত, তাঁকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে' ফেল্‌ত, ভগবানের অস্তিত্ব জগৎ থেকে লুপ্ত করে' দিত!

মুখ তুলে সে সামনে অভাগিনী মেয়েটীর পানে চাইলে। মাতৃস্নেহ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। মান সম্ভ্রম সব তুচ্ছ হয়ে গেছে, সমাজের অনুশাসন তুচ্ছ হয়ে গেছে,—সকলের উপরে স্থান নিয়েছে মাতৃস্নেহ।

কমলা ত্যক্ত সন্তানকে চিন্‌তে পেরেছেন সেই যাত্রার রাত্রে—

মায়ের কাণে পৌঁছেছিল জয়ন্তের রোগশয্যার পাশে কেউ নেই, মা নিজের মর্য্যাদা ভুলে সেই হতভাগা ছেলের কাছে ছুটে এসেছেন।

জয়ন্তের দুটি চোখ অল্পে অল্পে সজল হয়ে উঠ্‌ল—

শান্ত কণ্ঠে সে বল্‌লে, "এখন বাড়ী যাও মা, ভোরের হাওয়া বইতে সুরু করেছে। আমি একটু সুস্থ হয়ে উঠি, তারপরে যা হয় একটা কিছু উপায় ঠিক করে' ফেল্‌ব।"

ব্যাকুল দৃষ্টিতে মা সন্তানের পানে চাইলেন।

জয়ন্ত তাঁর মনের কথা বুঝ্‌তে পেরেছিল, বল্‌লে, "তোমার কোন ভাবনা নেই মা, যা' কর্‌ব তা' পরে দেখ্‌তে পাবে।"

কমলা তার মাথায় হাতখানা রাখ্‌লেন—কি বল্‌লেন বুঝা গেল না, তাঁর চোখ দিয়ে নিঃশব্দে শুধু ঝর্ ঝর্ করে' জল ঝরে' পড়্‌ল।—

কয়েকটা দিন পরে—

জয়ন্ত কমলার দর্শনপ্রার্থী হয়ে জমীদার বাড়ীর দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

দাসী সঙ্গে ক'রে তাকে ভিতরে নিয়ে গেল, কমলা আগেই এ আদেশ দিয়ে রেখেছিলেন।

কমলাকে প্রণাম করে' দাঁড়াতে তিনি শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "তুমি নাকি একেবারেই গ্রাম ছেড়ে' চলে' যাচ্ছো, জয়ন্ত?"

জয়ন্ত উত্তর দিলে, "হ্যাঁ, আর আস্‌ব না।"

কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আস্‌ছিল,—কমলা প্রশ্ন কর্‌লেন, কোথায় যাবে?"

জয়ন্ত একটু হেসে উত্তর দিলে, "ভিখারীর জায়গার কি অভাব আছে, মা! পথ তো আমাদের একচেটিয়া। তোমরা তোমাদের দরজা বন্ধ করে' দিতে পার, পথ তার বুকে আমাদের জায়গা চিরকালের জন্যে ছেড়ে দিয়েছে।"

আস্তে আস্তে সে কমলার সাম্‌নে তাঁর দেওয়া হার ও সুনীতি রায়ের দেওয়া আংটী রাখ্‌লে— ।

বিবর্ণ হয়ে গিয়ে কমলা বল্‌লেন, "এ গুলো নিলে না ?"

হাত দুখানা কপালে ছুঁইয়ে জয়ন্ত বল্‌লে, "অহঙ্কার করে' নয়, মা,— মনে হবে বলেই নিলুম না, কাছে রাখ্‌তে পার্‌লুম না। ভগবান আমায় কোনদিক দিয়েই সঞ্চয় কর্‌তে দেন নি,—না মনের ভাণ্ডারে, না বাইরের ভাণ্ডারে। নিঃস্ব ভিখারী চিরদিন সর্ব্বহারার গান গেয়ে পথে পথে চল্‌বে মা, আপনার দান সে তাই ফিরিয়ে দিয়ে গেল।"

আস্তে আস্তে সে যেমন এসেছিল, তেমনই চলে' গেল।

যতক্ষণ তাকে দেখা যায়, দুর্ভাগিনী জননী ততক্ষণ চেয়ে রইলেন।

কাঁদ্‌বার পথ নেই, মুখ ফুটে' একটী কথা বল্‌বার উপায় নেই !

একবার মাত্র ঊর্দ্ধপানে তাকিয়ে আর্ত্তকণ্ঠে তিনি ডাক্‌লেন, "ভগবান—"

পথিক তখন গুণ্ গুণ্ করে' গান কর্‌তে কর্‌তে চলেছে—

"কেউ কারও নয় দেখ না চেয়ে
কবে ফুট্‌বে আঁখি ?
আপন রতন বেছে নে চল
হরি বলে ডাকি।"

জৈত্র-যাত্রা

আচার্য্য শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

হয় নাই কভু জড়ের মরণ—নাই রে মরণ চেতনার,
সবাই অমর, বিকশিত নর ; মথি' অন্তর বেদনার—
যুদ্ধের পর আসিছে যুদ্ধ, জাগে প্রবুদ্ধ সুরবীর—
উদয়ের পর আসিছে উদয়, উজ্জল তার দূর তীর।

গতিবিভঙ্গে বাড়িছে চেতনা বাধার আঘাতে আঘাতে,
মথিত ধারায় প্রেমের ঊর্মি নাচিছে তাহায় জাগাতে।
বিরহে-মিলনে শিহরি শিহরি উথলে মাধুরী জীবনের—
উদিছে বৃদ্ধি, আসিছে ঋদ্ধি, সাধিছে সিদ্ধি ভুবনের।

বজ্রে প্রহত বিজয়-ডঙ্কা স্থিতি-ভূকম্পে আগুয়ান্।
ঝড়ের বাতাসে আসিছে শুদ্ধি ; ক্রুদ্ধ নহে রে ভগবান্।
চূর্ণ রেণুর কণায় কণায় গড়িয়া উঠিছে অসীমায়,
ভিত্তির পরে নূতন ভিত্তি অশেষ কীর্ত্তি মহিমায়।

ভাঙ্গিয়া রুদ্ধ গুহার দুয়ার উৎসরে প্রীতি-নির্ঝর—
করিছে সিক্ত তৃষিত কণ্ঠ, করিছে জীর্ণে নির্জ্জর।
দুহিয়া পীযুষ বক্ষে-বক্ষে তুলিছে দুঃখ-নবনী—
চোখের ধারায় করুণা গড়ায় প্রেমেতে জড়ায় অবনী।

সীমায় অধীর—চল সুরবীর জয়ের পতাকা তুলিয়া,
প্রসারিয়া প্রাণ কর গো মহান্—বাধা-ব্যবধান ভুলিয়া।

— বৈচিত্র্য —

অগ্নি-নিবারক পোষাক—

আধুনিক যুগে অগ্নি-নিবারক বিচিত্র পোষাক উদ্ভাবন করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা সকল স্বাধীন দেশেই চলিয়াছে। সম্প্রতি ইংলণ্ডে ইহার এক প্রদর্শনী হয় এবং উহাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হয় সাবানের ফেণার

অগ্নি-নিবারক পোষাক

পোষাক। অতি সহজ উপায়—নব্বই ভাগ বায়ু, ৮ ভাগ জল ও কয়েক পয়সার বিশেষ-ভাবে তৈরী সাবানের গুঁড়া একত্রে মিশ্রিত হইলে যে ঘন-ফেণপুঞ্জের সৃষ্টি হইবে, তাহাতে অগ্নি-যোদ্ধারা ডুব দিয়া উঠিলে তাহাদের পোষাক আর পুড়িবার সম্ভাবনা থাকিবে না। জিনিষটীও আদৌ অনিষ্টকারী নয় এবং আপনা-আপনি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ঐ ফেনপুঞ্জ অদৃশ্য হইয়া যাইবে—ধুয়া-মুছারও প্রয়োজন হইবে না। যে সময়টুকু উহা থাকিবে তাহাই একটি বড় রকমের অগ্নি-নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট।

চর্ম্মের গঠন-প্রণালী—

এই ছবিখানিতে মানুষের ত্বকের গঠন-প্রণালী যাহা তাহা তিনশো গুণ বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। সাধারণ লোকের পক্ষেও ইহা দেখিয়া মানুষের দেহযন্ত্রের আবরণ

চর্ম্মের গঠন-প্রণালী

যে চামড়া তাহার নির্ম্মাণ-কৌশল বুঝা আদৌ কঠিন হইবে না। জার্ম্মাণ স্বাস্থ্য-সংসদে মানব-শরীরের প্রত্যেক অংশটিই এমনি করিয়া দেখার প্রচেষ্টা চলিয়াছে। লোক শিক্ষার পক্ষে ইহা সর্ব্বত্র অনুকরণীয়।

"জেপলিন" রেল-গাড়ী—

এই 'জেপলিন' ধরণের রেলগাড়ী-চালনার প্রচেষ্টা প্রথমে হ্যানোভারে হইয়াছে। চল্লিশ জন যাত্রীসহ ঘণ্টায় তিরানব্বই মাইল ইহার গতি। গাড়ীর অবয়বের নির্ম্মাণ-
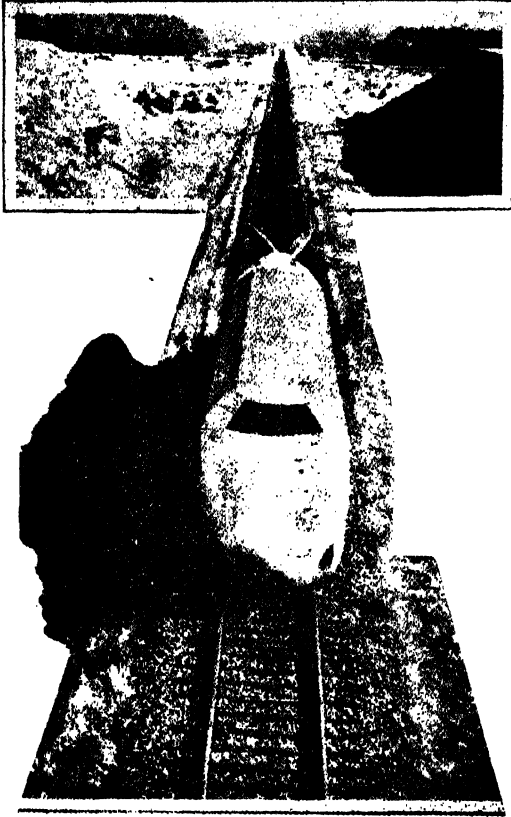
"জেপলিন" রেলগাড়ী

দক্ষতার জন্য বায়ুর প্রতিরোধ খুব কম হইবে। এয়ার-স্ক্রু'র সাহায্যে উহার বহিরাবরণ সহজেই খোলা যায়। বৈজ্ঞানিকেরা আশা করেন, ভবিষ্যতে সর্ব্বত্রই এইরূপ ধরণের রেলগাড়ী প্রচলিত হইবে।

সাপে-পাখীর লড়াই—

পার্শ্বের ছবিখানি মেক্সিকোর সুবিদিত রোড্-রানার পক্ষী ও বিষাক্ত র‍্যাট্‌ল-সর্পের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব-চিত্র। এইরূপ যুদ্ধে পাখীই প্রায় জয়ী হয়। সব দেশেই জন্তু-জগতে বিশেষ বিশেষ প্রাণীর মধ্যে একটা জন্মগত প্রতিহিংসা দেখা যায়। সাপে-নেউলের দ্বন্দ্ব ভারতে
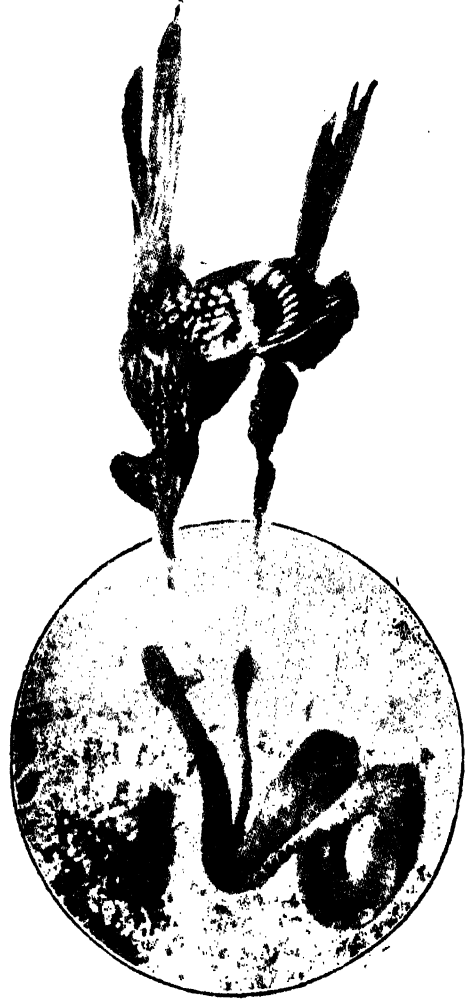
সাপে-পাখীর লড়াই

প্রবাদ-বাক্যের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। সর্প দেখিলেই ফিঙ্গেরাজ পক্ষী কেমন ছোঁ মারিয়া উহাকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তোলে তাহা সাধারণ অভিজ্ঞতা।

গীতার যোগ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

একাদশ পরিচ্ছেদ

পুরুষ নিঃসঙ্গ ও নির্ব্বিকার হইলেও জড় প্রকৃতির ভিতর দিয়া কিরূপে সৃষ্টি সম্ভব হয়, এবং নানাবিধ কর্ম্ম-সঙ্কল্প পুরুষের মধ্যে উপহিত থাকা সত্ত্বেও তাঁহার কর্ম্ম-বন্ধন কি কারণে ঘটে না, তাহাই পরবর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ে প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃপুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৯।৮
ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনং অসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯।৯

স্বাম্ (স্বাধীনাং) প্রকৃতিং (মায়াং) অবষ্টভ্য (বশীকৃত্য) প্রকৃতেঃ বশাৎ (প্রাচীন-কর্ম্মনিমিত্ত-তত্তৎ-স্বভাববশাৎ) ইমম্ কৃৎস্নং (সমগ্রং) অবশং (কর্ম্মাদি-পরবশং) ভূতগ্রামম্ (ভূতসমুদায়ং) পুনঃ পুনঃ (ভূয়ঃভূয়ঃ) বিসৃজামি (উৎপাদয়ামি)।

হে ধনঞ্জয়, তেষু (কর্ম্মসু) অসক্তং উদাসীনবৎ (উপেক্ষক-সদৃশঃ) আসীনং (বর্ত্তমানং) চ মাম্ তানি কর্ম্মাণি (সৃষ্টিব্যাপারদীনি) ন নিবধ্নন্তি (বন্ধনং উৎপাদয়ন্তি)।

'আমি আত্মপ্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্ম-নিমিত্ত স্বভাব-বশতঃ এই নিখিল সৃষ্টি কর্ম্ম-পরবশ হইয়াই পুনঃ পুনঃ উৎপাদন করি। কিন্তু হে ধনঞ্জয়, উদাসীনের ন্যায় সেই সকল কর্ম্মে আসক্তি-রহিত আমাকে সৃষ্টি-ব্যাপারে বন্ধনগ্রস্ত হইতে হয় না।'

এই ক্ষেত্রে পূর্ব্ব শ্লোকে স্বভাবের শক্তি প্রদর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দেখাইলেন, যে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হওয়ার মূল কারণ —প্রকৃতি পাইয়াছে প্রাচীন কর্ম্মসৃষ্টি বশতঃ সৃজনকরী স্বভাব। অচিন্ত্য পুরুষের নিত্যসঙ্গিনী প্রকৃতি; পুরুষের সঙ্কল্প সংবিৎ-রূপে ইহাতে স্পন্দিত হইয়া উঠে, তাহাই সৃষ্টি-সংস্কার-রূপে পরিণত হয় এবং এই সংস্কার কল্পান্তস্থায়ী। কেন না, সৃষ্টি-কর্ত্তার মৌলিক প্রেরণার মধ্যে বিধৃত আছে যে কাল ও ভূতগ্রাম, তাহা কোন বিরুদ্ধ ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে ব্যর্থ বা ব্যাহত হইতে পারে না। "পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করি"—এই কথা বলায় অসঙ্গ নির্ব্বিকার ব্রহ্মকে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য-সিদ্ধি-সংযুক্ত বলিয়া কল্পনা করা অসঙ্গত হয় না এবং এরূপ হইলে বলিতে হইবে, ঈশ্বরের ভোক্তৃত্ব আছে। ভোক্তৃত্ব থাকিলে তিনি নির্ম্মল, সর্ব্বসাক্ষীভূত চৈতন্যমাত্র, এইরূপ প্রত্যয় সম্ভব হয় না। যদি এমন কথাই বলা যায়, যে তিনি স্বকীয় ভোগার্থ জগৎ-সৃষ্টি করেন নাই, পরন্তু প্রকৃতিকে সম্ভোগ দিতেই তাঁহার এই কর্ম্ম-সৃষ্টি, তাহা হইলেও বলিতে হয়, অন্যের মধ্যে ভোক্তৃত্বের চেতনা বিদ্যমান আছে, এইরূপ স্বীকার করায় অন্য চেতনার অবস্থিতির কথাও স্বীকৃত হয়; কিন্তু ইহা অসঙ্গত। ব্রহ্ম ভিন্ন চেতনান্তরের অবধৃতি শ্রুতি-বিরুদ্ধ। আর অচেতনার ভোক্তৃত্বও অসিদ্ধ। এই সৃষ্টি-ব্যাপারে স্রষ্টার পারলৌকিক নিঃশ্রেয়স্-লাভার্থ কোন উদ্দেশ্য আছে, এ-কথাও সুসঙ্গত নহে; কেন না, সচেতন ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় যখন কিছুই নাই, তখন তাঁহার মোক্ষের প্রয়োজন কোথা? মোক্ষের প্রয়োজন হয় তাহারই যাহার বন্ধন আছে; যিনি বন্ধনাতীত তাঁহার মুক্তির আবশ্যকতা হয় না। অন্য প্রশ্নও উঠিতে পারে, চেতন-স্বরূপ ঈশ্বর-তত্ত্বের সহিত যদি এই সৃষ্টি-তত্ত্বের কোন যুক্তি না থাকে, অর্থাৎ তিনি যখন নির্ব্বিকার তখন এই আকার-ভূত বিশ্বপ্রপঞ্চ মিথ্যা মায়া, সুতরাং মায়াতীত হওয়াই জীবাত্মার লক্ষ্য। কিন্তু এইরূপ কল্পনায় জ্ঞানঘন ভগবানের চেয়ে মানুষের অধিক জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হয়। ইহা ধৃষ্টতা। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—'কল্পক্ষয়ে বিশ্বপ্রপঞ্চ আমার মধ্যে সংহরণ করিয়া লই, এবং কল্পাদিতে আবার পুনঃ পুনঃ তাহাই প্রকাশ করিয়া থাকি। এই উত্তম লোক-সংগ্রহ-রহস্য যিনি সর্ব্বতোভাবে বিদিত হন তিনিই অহোরাত্রবিৎ, ঈশ্বর-যুক্তি সেইখানেই সিদ্ধ হয়।' ইহাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ

বলিয়াও গীতায় উক্ত হইয়াছে। ধরণী ধন্য হইবে, এইরূপ দিব্য-জন্ম ও দিব্য-কর্ম্মের আধারভূত ঘটে ঘটে নারায়ণের আবির্ভাব যেদিন সিদ্ধ হইবে।

এই হেতু আচার্য্য শ্রীধরের ভাষায় বলিতে হয়—"প্রাচীন কর্ম্মনিমিত্ত ইত্যাদি।" ইহা এই সৃষ্টির নিয়ামক প্রাচীন কর্ম্ম। প্রাচীন কর্ম্ম-জনিত স্বভাবের অনুগমন করিয়াই এই সৃষ্টি-ক্রিয়া সিদ্ধ হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছাই এই স্বভাব। সুতরাং যাঁহার স্বভাব তাঁহাকে অচিন্ত্য ও অসঙ্গ বলিলে যুক্তি-বিরুদ্ধ হয় না। চতুর্থ অধ্যায়ে এই কথাই একবার বলা হইয়াছে—'আমি অজ, অব্যয়, ভূত সকলের ঈশ্বর হইয়াও প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া আত্ম-মায়ার দ্বারা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি।' এই শ্লোকের 'অবষ্টভ্য' শব্দ এবং চতুর্থ অধ্যায়ের 'অধিষ্ঠায়' শব্দের মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য আছে, তাহা লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

'স্থা' ধাতুর অর্থ স্থিতি অর্থাৎ 'আমি প্রকৃতিতে অবস্থিত থাকি' এই অর্থে প্রকৃতির সহিত পুরুষের সর্ব্বতোভাবে সংযুক্তি জ্ঞাপিত হয়; কিন্তু বর্ত্তমান অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকে ভূত-সমূহ হইতে নিজের অসংশ্লিষ্টতা প্রতিপাদন হেতু এখানে 'অবষ্টভ্য' কথার প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। আচার্য্য শ্রীধর "অবষ্টভ্য" শব্দের অর্থ "অধিষ্ঠায়" বলিয়াছেন; কিন্তু "স্তন্‌ভ্‌" ধাতুর অর্থ ঠিক অধিষ্ঠান নহে। স্তন্‌ভ স্তম্ভনে। অব্যয় "অব" শব্দের অর্থ সাকল্য। এই দিক্ হইতে আচার্য্য শঙ্কর 'অবষ্টভ্য' অর্থে 'বশীকৃত্য' করিয়া শব্দের মূলগত ভাব রক্ষা করিয়াছেন। আচার্য্য রামানুজ বলেন—"অষ্টধা পরিণমজ্জমঙ্কুতু ষিধম্‌" অর্থাৎ সপ্তম অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকে 'অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা' এই অর্থ এই ক্ষেত্রে প্রযুজ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা আচার্য্য শ্রীমৎ মধুসূদনের অর্থ এই ক্ষেত্রে সমধিক প্রযুজ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। তিনি 'অবষ্টভ্য' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—.

"স্ব সত্তাস্ফূর্ত্তিভ্যাম্‌ দৃঢ়ীকৃত্য" ইত্যাদি অর্থাৎ স্বীয় সত্তার আনন্দ প্রকৃতিতে উপহিত করিয়া প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টিকরী যে দিব্য স্বভাব তাহারই প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহারই বশে সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে; সুতরাং ইহার জন্য তাঁহার সংসর্গ-গন্ধ বা কোনরূপ খেদ-লেশ থাকিতে পারে না। এই জন্যই কৃষ্ণ পরবর্ত্তী শ্লোকে পুরুষকে একান্ত উদাসীন বলিতে পারেন নাই; কেন না, সৃষ্টির প্রেরণা সঙ্কল্প-রূপে তাঁহাতে দৃঢ়ীকৃত আছেই, নতুবা প্রকৃতি সৃষ্টি-স্বপ্ন পাইবে কোথা হইতে? তিনি 'উদাসীনবৎ' এই ভাবই তথায় ব্যক্ত হইয়াছে। 'উদাসীন' বলিলে সৃষ্টি-ব্যাপারের প্রভুত্ব বা ঈশিত্ব-বোধের হানি হয়। এই হেতু 'উদাসীনবৎ' ইহা যথার্থ উক্তিই হইয়াছে। এই ঔদাসীন্য এই হেতু একান্ত কর্ত্তৃত্ব-বিরহিত নহে। প্রশ্ন উঠিতে পারে, কর্ত্তৃত্বভাব-বিরহিত হইয়া কর্ম্মকরা ব্যতীত কর্ম্মের সহিত আসক্তিশূন্য হওয়ার অন্য উপায় নাই; এই ক্ষেত্রে তাঁর কর্ম্মে প্রভুত্ব আছে, এই যুক্তি স্বীকার করিয়া লইলে কিরূপে তাঁহাকে কর্ম্মাসক্তিশূন্য বলিয়া প্রতীতি করা যায়? জীবের সহিত ঈশ্বরভাবের তুলনায় এই বৈষম্য উপস্থিত হয়; পরন্তু দেখা যায়, গুটীপোকা ফলাসক্তি-রহিত ও কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য হইয়া পরিশেষে স্বকীয় কোষ-রূপ কর্ম্ম-ফলে আবদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে কর্ম্ম-বন্ধনের কারণ নহে, মূঢ়তাই বন্ধনের হেতু বুঝিতে হইবে। বেদান্তে আছে—'বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ'। আচার্য্য শঙ্কর বলেন, সৃষ্টি ও প্রলয় ব্যাপারের কারণ-রূপে ব্রহ্ম নির্দ্দেশ করিলে তাহাকে 'বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্য' এই দুই দোষের ভাগী করা হয়। কিন্তু এই আশঙ্কা অমূলক; বস্তুতঃ ঈশ্বরে 'বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্য' আরোপিত হইতে পারে না; কেন না, তিনি নিরপেক্ষ হইয়া এই সৃষ্টি-ব্যাপার সংসাধিত করেন নাই, সাপেক্ষ হইয়াই সৃষ্টি সম্পাদিত হইয়াছে। জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে অপেক্ষা করিয়া যে সৃষ্টি, সৃজ্যমান প্রণালীর ধর্ম্মাধর্ম্মের অপেক্ষাক্রমেই সেই বিষম অবস্থা সৃষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং ঈশ্বরের বৈষম্য-দোষ ইহাতে ঘটিতে পারে না। সাপেক্ষতা হেতু ঈশ্বরে নৈর্ঘৃণ্য-দোষও সম্ভব হয় না। পুণ্যবানের প্রতি অনুরাগ, পাপীর প্রতি দ্বেষ, এইরূপ আপেক্ষিকতা তাঁহার নাই। উদাসীনের ন্যায় সকল কার্য্য সাধিত হয়। জীবের প্রকাশ-বৈচিত্র্য ও অসাধারণ কর্ম্ম হেতু বিভিন্ন রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঈশ্বরের বৈষম্যাদি দোষ তাঁহার নিয়ন্তৃত্ব থাকা

সত্ত্বেও ঘটিবার হেতু নাই। "ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি, ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা"—গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ১৪শ শ্লোক এই স্থলে অধিকতর সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং এই হেতু এই সিদ্ধান্ত উপপাদন করিবার জন্য পরবর্ত্তী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥৯।১০

অধ্যক্ষেণ (অধিষ্ঠাত্রা) ময়া (ভগবতা) প্রকৃতিঃ (মায়া) সচরাচরম্ (বিশ্বং) সূয়তে (জনয়তি)। হে কৌন্তেয়, অনেন (অধ্যক্ষত্বেন) হেতুনা (নিমিত্তেন) ইদং জগৎ বিপরিবর্ত্ততে (পুনপুনর্জায়তে)।

অধিষ্ঠাতৃ-রূপ মৎ-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব প্রসব করিয়া থাকেন। হে কৌন্তেয়, এই কারণেই জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলেন—

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলোনির্গুণশ্চ ॥

—অর্থাৎ একই দেবতা সকল ভূতে গূঢ়রূপে বিদ্যমান। তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, কর্ম্মাধ্যক্ষ, সর্ব্বভূতের অধিবাস, সাক্ষী, চেতয়িতা, কিন্তু কেবল এবং নির্গুণ।

বিশ্ব-ব্যাপার ভগবানের সৃষ্টি, অথচ তিনি উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত, এরূপ কথা আপাততঃ অসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু রাজা যেমন অমাত্যগণের দ্বারা স্বকার্য্য সাধন করেন, তিনিও তেমনই তাঁহার বশীকৃত প্রকৃতির সাহায্যে সকল কার্য্য সংসিদ্ধ করিয়া থাকেন। প্রকৃতি জড়, পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান-চ্যুত ও অধ্যক্ষতা-পরিশূন্য হইলে কোন কর্ম্মই সিদ্ধ হইতে পারে না—এই হেতু তাঁহার ঔদাসীন্য তাঁহার অধিষ্ঠান ও প্রভুত্ব-ভাব হইতে বর্জ্জিত নহে। পূর্ব্ব শ্লোকে 'অবষ্টভ্য' কথার এই জন্যই উল্লেখ করা হইয়াছে।

এইবার যে মূর্ত্ত বিগ্রহ অর্জ্জুনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই ভাবে আত্মতত্ত্ব প্রচার করিতেছেন, তাঁহাকে এই নিখিল তত্ত্বের মূর্ত্ত প্রকাশ বলিয়া মানুষের অবধারণা করা কেন সম্ভব হয় না, সেই কথাই পরবর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ে ব্যক্ত করিতেছেন।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ৯।১১
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানাবিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহনীং শ্রিতাঃ ॥৯।১২

—মোহিনীং (বুদ্ধিভ্রংশকারিণীং) রাক্ষসীং (তামসীং) আসুরীং (রাজসীং) চ প্রকৃতিং এব আশ্রিতাঃ সন্তঃ মোঘাশাঃ (বৃথা আশা যেষাং তে) মোঘকর্ম্মাণঃ (বিফলানি কর্ম্মাণি যেষাং তে) মোঘজ্ঞানাঃ (নিষ্ফলং জ্ঞানং যেষাং তে) বিচেতসঃ (বিক্ষিপ্ত-চিত্তাঃ) ভূতমহেশ্বরম্ (সর্ব্বভূতানাম্ মহান্তম্ ঈশ্বরং) মম পরম্ (প্রকৃষ্টং) ভাবং (তত্ত্বং) অজানন্তঃ (নোপলভন্তঃ) মূঢ়াঃ (মূর্খাঃ, অবিবেকিনঃ) মানুষীং (মনুষ্যতুল্যাং) তনুং (শরীরং) আশ্রিতং (গৃহীতবন্তম্) মাম্ অবজানন্তি (অবমন্যন্তে)।

—অর্থাৎ 'বুদ্ধিভ্রংশকারিণী তামসী ও রাজসী প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া নিষ্ফল-কর্ম্মা, নিষ্ফল-কামা, বিফলজ্ঞান ও বিচারশূন্য হইয়া আমার সর্ব্বভূত-মহেশ্বর-রূপ যে পরম তত্ত্ব মূঢ়গণ তাহা বিদিত হইতে পারে না। সেই মূঢ়জনেরা মনুষ্যতনুতে আশ্রিত আমাকে তাই অবহেলা প্রদর্শন করে।'

আকাশস্থিত নিঃসঙ্গ বায়ুর ন্যায় তাঁহার সহিত সৃষ্টির সম্বন্ধ, এই কথার পর "মানুষীং তনুমাশ্রিতম্" অর্থাৎ মনুষ্য-শরীরেই তুরীয় সত্তাকে অবলোকন করার নির্দ্দেশ খুবই আকস্মিক বলিয়া বোধ হয় এবং ইহা অনুভব করাও শক্ত হইয়া পড়ে। গীতার এই তত্ত্বই দুর্জ্জ্ঞেয় নিগূঢ় রহস্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্য-শরীরকে তাঁহার আশ্রয়-স্বরূপ বলিয়াছেন, তাহাতে আশ্রিত যে "পরম ভাব", মনুষ্য-দেহ গ্রহণ করার ফলে সেই ভাবকে মূঢ়-জনেরা অবজ্ঞা করে—শ্লোকের ইহাই মর্ম্ম। এই পরম ভাব কি? উহাই আত্মতত্ত্ব। আকাশের ন্যায় নিগূঢ় নিঃসঙ্গ সেই পরম ভাব সর্ব্বত্রগ, অতএব তাহা মূর্ত্ত বিগ্রহ মধ্যেও অবস্থিত হইতে পারে, ইহা অসম্ভব কথা নহে। আত্মারও স্বরূপ আছে। উহা হইতেছে সৎ-চিৎ-আনন্দ। স্বরূপ থাকিলেই সঙ্গে সঙ্গে উহার শক্তিরও প্রকাশ হয়। এই শক্তিই মায়া। উহাই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সামর্থ্য। বস্তুকে মানুষের বুদ্ধিগত করিতে হইলে, তাহার বিচার ও

বিশ্লেষণ এই ভাবেই করিতে হয়। স্বরূপ ও স্বরূপ-শক্তি বস্তুতঃ একটী অখণ্ড ভাব। ইহাই পরমভাব। এই পরমভাব গুণাদির আশ্রয়ে জীব-ভাব পরিগ্রহ করে। কিন্তু অবিবেকী অহঙ্কারী ব্যক্তি ইহা স্বীকার করিতে পারে না। এই জন্য পরবর্ত্তী শ্লোকে তিনি বলিতেছেন--

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ৯।১৩

—হে পার্থ! দৈবীং প্রকৃতিং (দেবানাং স্বভাবম্) আশ্রিতাঃ (প্রাপ্তাঃ) মহাত্মনঃ তু অনন্যমনসঃ (অনন্য-চিত্তাঃ) (সন্তঃ) ভূতাদিম্ (জগন্মূলং) অব্যয়ং (নিত্যং) জ্ঞাত্বা (নিশ্চয়ং কৃত্বা) মাং (পরমেশ্বরম্) ভজন্তি (সেবন্তে)।

'হে পার্থ! দিব্য-প্রকৃতি-সম্পন্ন মহাত্মারা অনন্যচিত্ত হইয়া জগতের আদি কারণ আমাকে অবিনশ্বর জানিয়া উপাসনা করেন।'

মহাত্মগণ অর্থাৎ সকল কামনা হইতে মুক্ত বিশুদ্ধ-স্বভাব-সম্পন্ন যাঁহারা তাঁহারা অনন্যচিত্তে ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত যাবতীয় ভূতের কারণ-স্বরূপ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ-সেবার অধিকারী হইয়া তদ্ভাবই প্রাপ্ত হন। স্বরূপের রূপ অবিশুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তির নিকট অজ্ঞাতই থাকিয়া যায়।

গীতার সপ্তম অধ্যায়ে—"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়া প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ" এবং "মদ্ভক্তা যান্তি মামপি", এই দুই কথার প্রশস্ত দৃষ্টান্ত এই স্থানেই প্রদর্শিত হইল। ভগবানের নর-রূপ-ধারণের শক্তি যদি অসম্ভব হইত, তবে তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া স্বীকার করায় বাধিত। তিনি বহু বার বলিয়াছেন—জীবের ন্যায় আমি ও আমার তনু বিভিন্ন নহে। মহামতি শুকদেবও বলিয়াছেন—

"শাব্দংব্রহ্মদধদ্বপুঃ"—শব্দ-ব্রহ্ম-রূপ ভগবান শরীর পরিগ্রহ করিলেন।

বিষ্ণুপুরাণে মনুষ্য-দেহধারী ভগবান্‌কে দেবরাজ ইন্দ্র এই কথাই বলিয়াছেন—

বিমোহয়সি মামীশ মর্ত্ত্যোঽহমিতি কিং বদন্!
জানীমস্তদ্ভগবতো ন তু সূক্ষ্মবিদো বয়ম্ ॥

—পরিদৃশ্যমান্ ভাগবতমূর্ত্তি স্থূল ব্রহ্মাণ্ডে জ্ঞানগোচর হয়, সূক্ষ্ম-রূপ অবধারণগম্য হয় না। পুরাণে এইরূপ কথা আরও আছে—"কৃষ্ণ কৃষ্ণ জগন্নাথ জানে তাং পুরুষোত্তমম্। পরেশং পরমানন্দং অনাদিনিধনং পরম্"। কৃষ্ণকে জগন্নাথ, পুরুষোত্তম, পরেশ প্রভৃতি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন—"যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি", তখন ইহা নিছক অধ্যাত্ম অনুভূতি ব্যতীত বস্তুতন্ত্র ব্যাপার হইয়া উঠে নাই। গীতার তত্ত্বে নারায়ণের নর-রূপে জন্মগ্রহণ সম্ভব হওয়ায়, মর্ত্ত্যবাসীর ভাগবত জন্মলাভের পথ প্রশস্ত হইয়াছে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে—গীতার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেই নরাকৃতি পরমব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিলে, মনুষ্য-দেহধারী অন্য মূর্ত্তিকেও ভগবান বলিয়া স্বীকার করিতে আপত্তি হইবে কেন? জরাসন্ধ প্রভৃতি নরপতিবৃন্দও তো আপনাদের ঈশ্বর বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারেন? জয় পরাজয়, জন্ম মৃত্যু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেরও তো জীবন-ব্যাপারে ঘটে নাই, এমন নহে! তাহার উত্তর—যিনি অব্যয়, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, তিনি কামনাহীন, এবং তাঁহার আত্ম-চৈতন্য জন্মমৃত্যুতে মলিন হয় না। এবং এই পুরুষে শম-দম-দয়া-শ্রদ্ধাদি-গুণসম্পন্ন মহাত্মারা নিষ্কলুষ চিত্ত আরোপিত করিয়া সচ্চিদানন্দময় ভাগবত-তনু লাভ করিয়া থাকেন। যেখানে অনন্যচিত্তে নিষ্ঠা, ভক্তি, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা যেখানে নিষ্কাম উৎসর্গ-যজ্ঞ আরম্ভ হইতে দেখা যায়, সেইখানেই খুঁজিয়া দেখিও, নরদেহ-ধারী যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ আবির্ভূত হইয়াছেন। এই তত্ত্ব কলিযুগের সন্ধিক্ষণে আবিষ্কৃত হইয়াছিল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম ও কর্ম্মে। এই সিদ্ধতত্ত্বের প্রবাহ পরবর্ত্তী যুগে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় ভারতকে অভিষিক্ত করিয়াছে। তাই গুরু ও শাস্ত্র সাধন-জীবনে অনিবার্য্য প্রয়োজন-রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। বহু জন্মের পুণ্যফলে গুরু ও শাস্ত্রে বিশ্বাসীর চিত্তে ভাগবতস্বরূপ রূপ লইয়াই তাহার সবখানিকে পূর্ণ করিয়া দেয়, রসে ও মাধুর্য্যে। তাই বৃন্দাবনের মুরলীধ্বনি, তাই কুরুক্ষেত্রের পাঞ্চজন্য, তাই শ্রীচৈতন্যের অমিয়-মধুর হরিধ্বনি আজও দিব্যজন্ম, দিব্যকর্ম্মের পথে জীবকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে। তাই বেদান্তের ঋষি কণ্ঠ চিরিয়া গুরুবন্দনায় আকুল; তাই ভক্তপ্রধান গদগদ-কণ্ঠে দৃঢ়স্বরে বলিতেছেন—

"যো বেত্তি ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
সঃ সর্ব্বস্মাৎ বহিস্কার্য্যঃ শ্রৌতস্মার্ত্ত-বিধানতঃ॥
মুখং তস্যাবলোক্যাপি সচেলম্ স্নানমাচরেৎ।"

—অর্থাৎ কৃষ্ণের দেহকে যে ভৌতিক বলিয়া মনে করে সে শ্রুতি স্মৃতির বিধানুযায়ী যাবতীয় কর্ম্মের অধিকার হইতে বহিষ্কৃত হয়। তাহার মুখ দেখিলে পরিহিত বস্ত্রসহ তৎক্ষণাৎ স্নান করিবে। নরোত্তম দাসও এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—"গুরুকে মানুষ জ্ঞান করে যেই জন, দারুণ নরকে তার হয় নিপাতন।" অতএব কৃষ্ণচন্দ্র হইতে দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্মের অধিকারপ্রাপ্তির পথ কি ভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

এই ভাগবত-বিগ্রহের ভজন পরবর্ত্তী শ্লোক হইতে উক্ত হইয়াছে।

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ ৯।১৪

সততং (সর্ব্বদা) কীর্ত্তয়ন্তঃ (কীর্ত্তনং কুর্ব্বন্তঃ) দৃঢ়ব্রতাঃ (দৃঢ়ানি ব্রতানি যেষাং) যতন্তঃ (প্রযত্নং কুর্ব্বন্তঃ) চ (কেচিৎ) ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্ব্বকং) নমস্যন্তঃ (নমস্কারম্ কুর্ব্বন্তঃ) চ (কেচিৎ) নিত্যযুক্তাঃ (সমাহিতাঃ) (সন্তঃ) মাং উপাসতে (সেবন্তে)।

—কেহ নিরন্তর আমার নাম-কীর্ত্তন, যত্নসহকারে দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাকে প্রণাম এবং কেহ বা আমাতে সমাহিত-চিত্ত হইয়া আমার উপাসনা করেন।

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥

অন্যে অপি চ জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তঃ (পূজয়ন্তঃ) মাম্ উপাসতে (ভজন্তে)। কেচিৎ একত্বেন (অভেদ-ভাবনয়া) কেচিৎ পৃথক্ত্বেন (পৃথক্-ভাবনয়া), কেচিৎ বিশ্বতোমুখম্ (সর্ব্বাত্মকম্) মাং বহুধা (নানা-রূপেণ) উপাসতে।

—কোন কোন মহাত্মা জ্ঞান-রূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া আমার আরাধনা করেন; কেহ কেহ বা আপনাকে আমার সহিত অভেদ-জ্ঞানে ভাবনা করেন, কেহ কেহ বা আমাকে স্বতন্ত্র-ভাবে চিন্তা করেন, এবং অনেকে নানা প্রকারে আমার উপাসনা করেন।

সাধনার বিচিত্র পর্য্যায়ের আলোচনা পরে করিব।

(ক্রমশঃ)

সংযোগে

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

জীবন আমার তটিনীর মত, তোমারি পথেতে চলেছে বহি',
তোমার অমৃতে মগন হইতে, আমার বিরহ-দুঃখ সহি!
তোমার নয়নে আমার নয়ন মিলে যায় কোথা ধ্যানের দেশে,
আমার অঙ্গে পরশ বুলায়ে, তোমার অঙ্গে আপনি মেশে।
আমার আশার প্রদীপ-শিখায়, আমার বেদনা-ধূপের বাসে,
অন্তর সারা উজ্জ্বল হ'য়ে তব আশ্বাস-পুলকে হাসে!
তোমার করুণা-স্নেহের প্রবাহে, মোর ব্যাকুলতা ভক্তি ধারা,
কোন্ নন্দন-মাধুরীর মাঝে হ'ল যে তোমার হৃদয়ে হারা!
আমার গানের মুখর-ছন্দ, তোমার নীরব সুরের মাঝে,
কোন্ অসীমের ঝঙ্কার ল'য়ে স্পন্দিত মোর বীণায় বাজে!
আমার দিবস, আমার রজনী, আমার আলোক-আঁধার ঘেরি',
অরূপ, তোমার রূপের প্লাবনে সুন্দর-রূপে তোমারে হেরি!
তোমার অসীম-আহ্বানে আজি, আমার সীমার সাগর-বেলা,
তোমার বক্ষে ভেসে যেতে চায়, মুক্তির সুখে করিতে খেলা!

ভ্রান্তি-বিভ্রাট

(উপন্যাস)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উৎসবপুরী অকস্মাৎ বিষাদময়ী হয়ে পড়ল। প্রিয়রঞ্জনের জর এল কেঁপে'। মাথার যন্ত্রণায় সে অস্থির হয়ে, মায়ের কোলে মাথা রেখে, চোখের জলে বাড়ীশুদ্ধ লোকের হৃদয় ভাসিয়ে দিলে। প্রিয়রঞ্জনের চেহারা ছিল শাল-মুগুরের মত শক্ত। এতখানি বয়স হয়েছে, একদিনও তার মাথা ধরে নি। হঠাৎ এই জরে তার বুকেও যেমন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল, মায়ের মনেও তেমনি দুর্ভাবনার সীমা ছিল না। এক দিন গেল, দু দিন তিন দিন কেটে গেল; জরের বিরাম নেই। আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবাসী, এমন কি বাড়ীর ভৃত্য দাসী পর্য্যন্ত কাণা-ঘুষা কর্‌তে কর্‌তে কথাটা মায়ের কাণে এসেও পৌঁছিল, যে মেয়েটা বাপ-মা-খেগো, অলপ্পেয়ে অলক্ষণা। বিয়ে হ'তে না হ'তেই প্রমাদ নিয়ে এল। মা ভারী মুখে কপাল কুঁচ্‌কে জানিয়ে দিলেন, "এমন কথা কেউ মুখে এনো না। রঞ্জনের ভালমন্দের ভার আমা ছাড়া আর কারু নেই; আমার বুক যখন খুটী আছে, তখন রঞ্জন আমার ভাল হ'য়ে উঠ্‌বেই।" তারপর নব বধূকে ডেকে বল্‌লেন—"যাও বৌমা, লজ্জা করো না। আমি পূজা আহ্নিক নিয়ে ব্যস্ত, তার উপর আছে বিষয়-সম্পত্তি দেখার ঝামেলা; চাকর-বাকর দিয়ে রোগ দেখা হয় না। তোমার মত দরদ দিয়ে কেউ দেখ্‌বে না ভয় নেই, আমি আশীর্ব্বাদ করি; তোমার হাতের নোয়া মাথার সিঁদুর অক্ষয় হোক।'

মা গেলেন ঘর থেকে বেরিয়ে। তিন দিন অসহ্যযন্ত্রণার পর রঞ্জন পড়েছিল কিছু অবসন্ন হয়ে। মায়ের কথা তার কাণে গেছল, কাতর দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল নবপরিণীতা বধূর দিকে।

নব বধূর নাম জ্যোৎস্না। নামের সঙ্গে রূপের মিল ছিল খুবই। এমন অমল শুভ্রকান্তি সর্ব্বদা বড় চোখে মাথার কাছে গিয়ে বস্‌ল। কম্পিত কুসুমপেলব হাতখানি ললাটে রেখে' সে শিউরে উঠ্‌ল গায়ের উত্তাপ দেখে'। চোখের পাতা ভারী হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে জল আর বারণ মান্‌লে না, টস্ টস্ করে গণ্ড বয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল বিছানার উপর।

রঞ্জন সোয়াস্তির নিশ্বাস ছেড়ে তার হাতখানা ললাটের উপর চেপে' ধরে' বল্‌লে "ভেবো না, ভয় নেই—তোমার ছোঁওয়া পেলে দুইদিনেই সেরে উঠ্‌ব।"

জ্যোৎস্না স্বামীর মুখে এই কথাটী শুনে ভরসায় বুক বেঁধে অক্লান্ত সেবায় প্রাণ ঢেলে' দিল। আহার নিদ্রার সময় রইল না। কাদু ঝি এসে ডাকাডাকি করে'ও তাকে রোগীর শয্যাছেড়ে তুল্‌তে পারে না! শেষে মা এসে বলে'—"যাও মা, দুটী না খেলে তুমিও বিছানা নেবে, তখন আমার বিপদের সীমা থাক্‌বে না।" নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও জ্যোৎস্না দুঘটী জল মাথায় ঢেলে' রান্না ঘরে গিয়ে আসনে বসে। পাতের ভাত পাতেই থাকে, তার পেট যেন ভরে' গেছে কিসে, তা সে নিজেই জানে না। রোগীর কাছ থেকে এইটুকু ছাড়ান পাওয়ার মধ্যে আরও ব্যথাই তাকে ঘিরে' ধরে। বাহিরে এলেই সে শোনে দাসদাসীর মুখে তার ভাইটী করেছে অনেক অপকর্ম্ম। গিন্নীমা খুব ব্যস্ত, এসব কথা তাঁকে জানান হয় না। কিন্তু সরকারমহাশয় বলেছেন, এবার তিনি কারও কথা শুন্‌বেন না, নিধুবাবুকে দেবেন বাড়ী থেকে তাড়িয়ে।

জ্যোৎস্নার চক্ষে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। বিবাহের পর একান্ত নিরাশ্রয় এই ভাই-বোন দুটীকে এই বাড়ীতেই আশ্রয় দিয়েছেন যিনি, তাঁর ভালমন্দ যদি হয়, কি হবে তাদের ভবিষ্যতে। আর এই দুর্দ্দান্ত ভাইটি বয়সে ছ বছরের বড় হ'লেও তার ছেলেমানুষীর জ্বালায় পাড়ার লোক হয়েছিল অস্থির। এ বাড়ীতে তার দৌরাত্ম্য খুবই

[illegible] রঞ্জনের আন্তরিক। নব বধূ সে এখানে তার কিছু না করবার

আছে! সে বিশীর্ণ মুখে কেবলই খবর শোনে, আজ এটা ভেঙ্গেছে, আজ ওটা চুরি করে' নিয়ে পালিয়েছে। জবাব সে দিতে পারে না। তার কেবলই মনে পড়ে, ঐ দক্ষিণ-দিকের প্রশস্ত ঘরে খাটের উপর পড়ে' আছেন যিনি তাঁকে; তিনি যেদিন উঠে' বস্‌বেন সুস্থ হয়ে, এই সকলের প্রতিকার সেইদিন হবে।

নাকে মুখে দুটী ভাত গুঁজে বিষণ্ণমূর্ত্তি জ্যোৎস্না স্বামীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হওয়ার জন্যে যেমনি ঢুকবে বারান্দায়, নিধুবাবু দৌড়ে এসে, কাপড়ের ভিতর থেকে হাত বা'র করে' দেখালে একটা হস্তিদন্ত নির্ম্মিত বিচিত্র নস্যের ডিবা। আশে পাশে বহুমূল্য পাথর খচিত। জ্যোৎস্না সহসা তার হাতখানা ধরে' সেটা কেড়ে নিতেই নিধুবাবু এক প্রচণ্ড চপেটাঘাতে সঙ্গে সঙ্গেই নিলে প্রতিশোধ। আঘাতটা হয়েছিল খুবই গুরুতর। চাপা গলায় "মাগো" বলে' চেঁচিয়ে উঠ্‌তেই, কাদু ঝি গলা ছেঁড়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "মেরে ফেললে গো" বলে; যে যেখানে ছিল দৌড়ে এসে হাজির হ'ল ঘটনাক্ষেত্রে। মায়ের কাণেও এ রব পৌঁছেছিল। তিনি দরজা দিয়ে মুখ বাড়ীয়ে দেখ্‌লেন, সত্যই একটা কাণ্ড বেধেছে। জ্যোৎস্না সাম্‌লে নিয়ে উঠে' দাঁড়িয়ে কাদুকে বল্‌লে—"এই নস্যের ডিবেটা কোত্থেকে নিয়ে এসেছে, কেড়ে নিয়েছি ব'লে এত রাগ!" নিধুবাবু দিলে চোঁচা দৌড়। কাদুর সঙ্গে আর সকলেই সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে বলে' উঠ্‌ল, "ওমা, চোর চোর!" বাবুর নস্যের ডিবে, মা সেদিন এক্‌জিবিশন দেখ্‌তে গিয়ে পঁচাশি টাকায় কিনে' এনেছিলেন। জ্যোৎস্না কাদু-ঝির হাতে হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত নস্যের ডিবেটা দিয়ে অবনত মুখে ঘরে এসে' প্রবেশ করল। মা বুঝে নিয়েছিলেন ঘটনা। বল্‌লেন—"ছেলে-মানুষ কখন কি করে' বসে, তার কি ঠিক আছে? তুমি মা এর জন্য কিছু ভেবো না। পাড়া-গাঁ থেকে নূতন এসেছে, এত জিনিষপত্র দেখে' লোভ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আমি একটু চোখ রাখ্‌ব শুধ্‌রে যাবে।" জ্যোৎস্নার যেন মাথা কাটা গেল, তবুও সান্ত্বনা, অশেষতৃপ্তি, স্নেহ-শীতল মিষ্ট কথায়।

সে এসে দেখেছিল তার স্বামীর স্বাস্থ্য ও রূপ রাজার গায়, তার অট্টালিকা, বিষয় সম্পদের প্রাচুর্য্য, সাক্ষাৎ ভগবতীর ন্যায় শাশুড়ী—এইটুকু বোঝার মত তার বয়স হয়েছে, যে এই সবেরই সে বিবাহের দিন থেকেই হয়েছে কর্ত্রী; কিন্তু আজন্ম দুঃখ দুর্দ্দশার ভিতর দিয়ে তার মনের দৈন্য হঠাৎ স্বামীর এই কঠিন ব্যামো দেখে অসংখ্য বিকৃত আকারে তাকে বিষণ্ণ করে' তুল্‌লে। দিনের পর দিন যায়, আরোগ্য-লক্ষণের চেয়ে দুশ্চিন্তার কারণই বাড়ে। বাড়ীর লোকে আড়ালে দাঁড়িয়ে তারই দোষ দেয়। তাকেই অলক্ষণা বলে। সে নিজেকেও ধিক্কার দেয়, 'বুঝি এদের কথাই সত্য—আমার মত হতভাগীকে বাড়ী নিয়ে এসে হ'ল এই মহাবিপদ্।' কিন্তু ভরসা তার বুকে জড় হয় মায়ের কথায়; সে সান্ত্বনা পায়, আশা পায়; শাশুরীর মুখ চেয়ে। তিনি বলেন—"ভয় নেই—মা; সাক্ষাৎ লক্ষ্মী তুমি, রঞ্জন আমার ভাল হয়ে উঠ্‌বে।"

দশদিন পরে আশা ক্ষীণ হয়ে এল। রোগী আর প্রকৃতিস্থ নয়। বিছানা ছেড়ে তেড়ে উঠে' বসে। জ্যোৎস্নার দিকে ক্রূর দৃষ্টিতে চায়। হস্ত প্রসারিত করে' কখনও তাকে স্নেহ করে, জড়িয়ে ধরে, কখনও বা নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে তার সর্ব্ব শরীর গুঁড়িয়ে দেয়। জ্যোৎস্না অশ্রু-নত নয়নে স্বামীর রোগক্লিষ্ট বিশীর্ণ মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তার উদার দৃষ্টির সম্মুখে নিজের প্রফুল্ল-কমল মুখখানি রেখে স্বামীকে বোঝাতে চায়, 'ওগো তুমি ভাল হও, একবার তেমন করে' চাও, যে চাওয়ায় আমায় চিরদিনের জন্য কিনে' নিয়েছ, আমার পরাণটুকু নিয়ে তুমি সবল সুস্থ হয়ে দাঁড়াও, আমি তোমার চরণতলে উৎসর্গের ফুল হ'য়ে লুটিয়ে পড়ি।'

আজ মায়ের মুখে আলো নাই। উৎসাহের দীপ তার চোখেও দীপ্তি দেয় না। জ্যোৎস্না চাপা গলায় মায়ের গলা জড়িয়ে বলে' উঠ্‌ল—"মা, আমায় বিদায় দাও, সত্যই আমি অলক্ষণা।" মা বধূকে বুকে নিয়ে, জড়-করা বুকের আশা চেষ্টা করে' চোখের কোণে এনে উৎসাহ-কণ্ঠে বল্‌লেন "ছিঃ মা, বিপদের দিনে বুকভাঙ্গা হ'তে নেই। সতীলক্ষ্মী তুমি, ভগবান তোমায় পতিহারা করবেন না। রঞ্জন যদি বাঁচে, সে তোমার সিঁথের সিঁদুরের জোরেই বাঁচ্‌বে, সে যে একান্ত তোমারই!"

মায়ের এই সান্ত্বনায়, এই আশার কথায় চিন্তার দাবানল

থেকে মুক্ত হয়ে হৃদয় বিন্দু বিন্দু শীতল অমৃতে অভিষিক্ত হয় বটে ; কিন্তু কি এক গুরু দায়িত্বে তার সবখানি আচ্ছন্ন হয়ে' পড়ে। সে যে একটা চৈতন্যময় পদার্থ, এই জ্ঞান থাকে না। জড় পদার্থের ন্যায় যেন কে তাকে চালায়, স্বামীর সেবা করায় ; সে যেন হয়ে গেছে একটা যন্ত্রপুত্তলিকা।

ঘর ভরে' গেছে বড় বড় ডাক্তারে। সোঁ সোঁ করে ফানেলের মুখ দিয়ে অক্সিজেন গ্যাস। মা দাঁড়িয়ে আছেন পুত্রের শিয়রে, যেন সাক্ষাৎ দেবীমূর্ত্তি। বিছানার এক-প্রান্তে জ্যোৎস্না বসে' মায়ের মুখ পানেই চেয়ে ছিল। মা চেয়ে আছেন পুত্রের দিকে অনিমেষ নয়নে। রঞ্জন হাঁপাচ্ছে, কে যেন তার গলা বুক চেপে ধরেছে। দম্‌কে দম্‌কে সে আর নিশ্বাস নিতে পারে না। চক্ষের আর সেই রক্তাভ ঘোরাল বর্ণ নেই। মার্ব্বেল পাথরের ন্যায় সাদা চোখে মিশ্‌-কালো দুটী তারা একবার উর্দ্ধে, একবার চতুর্দ্দিকে ঘুরে' বেড়াচ্ছে। মায়ের দিকে চোখ পড়্‌তেই তার দৃষ্টি হয়ে' পড়্‌ল ঝাপ্‌সা, গড়-গড়িয়ে গণ্ড বয়ে' জলধারা ঝর্‌ল। মায়ের ওষ্ঠপুট দৃঢ়, নয়নে প্রশান্ত দৃষ্টি, অকুঞ্চিত প্রশস্ত ললাট, স্নেহশীতল বাহু দুটী রঞ্জনের চিবুক স্পর্শ করে' মধুর স্নিগ্ধ কণ্ঠে তিনি বল্‌লেন—"কি কষ্ট হচ্ছে, রঞ্জন?" রঞ্জন হাঁপাচ্ছে, দম্‌কে একটা নিঃশ্বাস ফেলে' বলে' উঠ্‌ল, "মা, মা," জ্যোৎস্না চেয়ে আছে মায়েরই দিকে, বুঝি তাঁর চক্ষু বিদীর্ণ হয়, অশ্রু-উৎস উথ্‌লে ওঠে। জ্যোৎস্নার সমস্ত হৃদয় মুচ্‌ড়ে উঠ্‌ল। তার কণ্ঠে যেন কে আর্ত্তনাদ তুল্‌তে ব্যগ্র হয়েছে, তাকে যেন চেঁচিয়ে কেঁদে উঠ্‌তেই হবে। কিন্তু মায়ের কণ্ঠে এক অপার্থিব সুগভীর স্নেহ-মূর্চ্ছনা ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল, "রঞ্জন, আমি তোর মা—আমার বুকে তোর আছে নিরাপদ্‌ স্থান, ভয় কি বাবা—দুঃখ কি বাবা!"

যেন জীবনের কি এক অপূর্ব্ব প্রভাব ঘরে স্পষ্ট আলোর মত বিছিয়ে গেল, দম্‌কে দম্‌কে নিঃশ্বাস যেন স্থির লঘু হয়ে' পড়ল। ডাক্তারের হাতে মধু দিয়ে মকরধ্বজ ও মৃগনাভি মাড়া খলটী থর থর করে' কাঁপ্‌ছিল ; তিনি এই অবস্থায় উহা অমৃতের মত ঢেলে' দিলেন রঞ্জনের মুখে। রঞ্জন লেহন কর্‌তে কর্‌তে মায়ের দিকে চেয়ে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলে' উঠ্‌ল, "না মা, মরা আমার হ'ল না—।"

* * *

সেইদিন সন্ধ্যার সময়ে, প্রশান্ত কক্ষে চাঁদের আলো এসে পড়েছে রঞ্জনের বিছানার উপর। রঞ্জন যেন দীর্ঘ সংগ্রামের পর বিশ্রাম কর্‌ছে নিরাপদে। নিশ্বাসের তালে তালে তার বক্ষ দুলে উঠ্‌ছে স্বচ্ছন্দে। ধীর পদে মা ঘরে এসে দাঁড়ালেন। জ্যোৎস্না নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে উঠে' এসে মায়ের চরণে পড়্‌ল লুটিয়ে। কৃতজ্ঞতায় তার বুক ভরে' উঠেছিল। কি যেন আর বল্‌তে গিয়ে বলা হ'ল না। মা তাকে তাড়াতাড়ি তুলে' নিয়ে, বুকের মধ্যে টেনে' নিলেন। সীঁথির উপর সুগভীর নিঃশব্দ চুম্বন। জ্যোৎস্নার হৃদয় পুলকিত হয়ে উঠ্‌ল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এক বৎসর পরের কথা। প্রিয়রঞ্জনকে পূর্ব্বস্বাস্থ্য ফিরে' পেতে মায়ের অনুরোধে তাকে ছয় মাস পুরীতে আস্‌তে হয়েছে। নিধুবাবু নস্যের ডিবা চুরি করার দিন থেকেই উধাও। জ্যোৎস্না অনেক খোঁজ খবর করে'ও তার সন্ধান পায় নি। তার পরিপূর্ণ আনন্দ মাখান মুখখানিতে এই জন্য মাঝে মাঝে বিষণ্ণতার একটী ঘন ছায়া এসে পড়ে। প্রিয়রঞ্জন সান্ত্বনা দিয়ে বলে—"ভাবনা নেই, যাবে কোথায়! এবার পূজায় সে বাড়ী ফিরবেই।"

পিঠোপিঠি দুটী ভাই বোন সুখে দুঃখে একত্র খেলা-ধূলায় মানুষ হয়েছে; আজ তাকে ছেড়ে থাকায় দুঃখের স্মৃতি বুকে অধিক করে' জেগে ওঠে। এক দিকে যেমন মনে পড়ে অন্তিম শয্যায় মায়ের নিঃসহায় কাতরতা, অন্য দিকে তেমনি এই উদার আশ্রয় তার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়ে তোলে।

মায়ের মৃত্যুস্মৃতি, শাশুড়ী ঠাকুরাণীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ, তাঁর স্নেহশীতল নয়নের সেই প্রথম দৃষ্টি, বিবাহ, স্বামীর কঠিন ব্যারামের কথা, বিশেষ করে' সব কিছুকে ঢাকা দিয়ে জেগে ওঠে গত ছয়মাস পুরীতে প্রিয়রঞ্জনের কাছে কাছে থাকার সুখস্মৃতি। সেই তটপ্রান্তে নীল ফেণিল তরঙ্গোচ্ছ্বাস, বিস্তৃত বালুভূমির সীমান্তে তাদের সেই ক্ষুদ্র একতলা বাসাটীর কথা, সম্মুখে সমুচ্চ প্রাচীন ঝাউ-বৃক্ষটী অপরাহ্নের ঝড়ো বাতাসে পাতায় পাতায় শিস্‌ দিয়ে চিত্ত আকুল করে' তুলত, দমকা হাওয়ায় বালুবর্ষণ হ'ত,

চোখে মুখে ঝাপ্‌টা খেয়ে কখনও প্রিয়রঞ্জন, কখনও বা সে চোখ বুজে পরস্পরকে বল্‌ত, চোখের যন্ত্রণার কথা। প্রিয়রঞ্জন মুছিয়ে দিতো রুমাল দিয়ে জ্যোৎস্নার চক্ষু-দুটী, আবার কখনও বা জ্যোৎস্না তার কোমল অঞ্চল দিয়ে প্রিয়রঞ্জনের রক্তাভ চক্ষে জলধারা মুছে দিত পরিপাটী যত্নের সহিত; আর প্রিয়রঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়ে দিত তার রক্ত অধরে ক্ষুদ্র একটী চুম্বন। উপকারের প্রতিদান—লজ্জায় তার মুখ রাঙ্গা হয়ে উঠ্‌ত।

সন্ধ্যায় দু-জনে বেড়াত, সিক্ত বালুভূমির উপর নেচে নেচে ঢেউ এসে তাদের চরণ চুম্বন করত। আকাশে উঠ্‌ত পরিপূর্ণ, মূর্ত্তি নিয়ে চন্দ্রদেব। রূপার ধারায় জল-স্থল উদ্ভাসিত হ'ত। কে অধিক সুন্দর, এই নিয়ে দুজনের মধ্যে তর্কাতর্কির সঙ্গে ঝগড়া বেধে যেত। তারপর লোকবিরল সেই সমুদ্র-সৈকতে জ্যোৎস্না ঢলে' পড়্‌ত নীরব নিস্তব্ধ হয়ে' প্রিয়রঞ্জনের বুকে। সেই সুখের স্পর্শ ও স্মৃতি তাকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে' রাখে যে অতীতের দুঃখ মনেই আসে না। কিন্তু এত ঘনীভূত সুখের লালিমা ভেদ করে'ও তার দাদার করুণ স্মৃতিটী জেগে উঠ্‌ত, তাই তার প্রফুল্ল-কমল-সদৃশ মুখখানিতে বিষাদের ছায়া দেখা দিত। রঞ্জনের চক্ষে তা' এড়িয়ে যেত না। তার মুখের একটী সান্ত্বনা-বাক্যে জ্যোৎস্না পুলকে আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌তো। এমন করে'ই এই দম্পতির দিন কেটেছিল।

পূজা এসে পড়্‌ল। পঞ্চমীর চাঁদ সন্ধ্যার পরেই পূব-দিকের আকাশে ভেসে উঠেছে। জ্যোৎস্না ছাদের উপর মাদুরে বসে' সারা বিকাল ধরে' কার্পেটের উপর যে নিখুঁৎ পদ্মফুলটী ফুটিয়ে তুলেছে, তাই একদৃষ্টিতে দেখ্‌ছিল, এমন সময়ে, প্রিয়রঞ্জন এসে হেসে বল্‌লে, "আমার কথা সত্যি হ'ল কিনা দেখ তোমার ভাই এসে হাজির হয়েছে।" উৎসাহে আনন্দে জ্যোৎস্নার মুখে কথা ফুট্‌ল না, উদ্‌গ্রীব দৃষ্টিতেই প্রশ্ন তুললে কোথায় সে? প্রিয়রঞ্জন হেসে বললে,— "তোমার প্রকৃতি একেবারেই উল্টা রকমের—এই জীবটি কি কাণ্ড করেছে শুনলে তুমি রেগেই যাবে।" জ্যোৎস্নার মনে যে আনন্দের উচ্ছ্বাস জেগেছিল তা' যেন স্তিমিত হ'য়ে পড়্‌ল। সে বল্‌লে—"কি কাণ্ড শুনি?" কথার উত্তর প্রিয়রঞ্জনকে দিতে হ'ল না, একটা মলিন ছেঁড়া পাঞ্জাবী গায়ে নিধুবাবু স্বয়ং উপস্থিত হ'ল। বলে' উঠ্‌ল হঠাৎ ভগ্নীর দিকে চেয়ে করুণস্বরে—"আমার দোষ কি! সেদিন ঝি চাকর মিলে অমন অপমান—সহ্য না কর্‌তে পেরেই তো বাড়ী ছেড়ে যেতে হ'ল। দাদাবাবু ভাল থাক্‌লে এমনটী হ'ত না।"

জ্যোৎস্না ঘটনা শুনে ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হ'ল এমনই, যে সে আর মুখ তুলে' কারু সঙ্গে কথা কইতে পার্‌ল না। এমন ভাবে তার ফিরে আসার চেয়ে চিরদিনের জন্য তাকে বিসর্জ্জন দেওয়াও শ্রেয়ঃ মনে হ'ল। বাড়ী ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে সে গাঁট-কাটা জুয়াচোরদের আড্ডায় গিয়ে মিশেছে। বড়বাজারে পকেট কাটার দলে পড়ে' সে পুলিশের কাছে ধরা পড়ার পর জানিয়েছিল, তার আপনার জন প্রিয়রঞ্জনের কথা। প্রিয়রঞ্জন এ সকল কথা জ্যোৎস্নাকে না জানিয়েই জামিনে তাকে খালাস করে' এনেছে, কিন্তু ঘটনা যা দাঁড়িয়েছে তাতে তার জেল হবে নিশ্চয়ই।

রাত্রে নতমুখে সে স্বামীকে জানালে—"কেন তুমি আমায় না জানিয়ে ওকে খালাস ক'রে নিয়ে এলে? ঝি চাকরের কাছে আমি মুখ তুল্‌তে পারি না, অমন ভায়ের মুখ দেখ্‌তেও আর রুচি নেই—ওকে তুমি বিদায় করে' দাও। প্রিয়রঞ্জন বল্‌লে—"জেল ত হবেই, তবে চেষ্টা করব, বদ্-সঙ্গে প'ড়ে ভদ্রলোকের ছেলে প্রথম অপরাধ করেছে—শাস্তি যদি কম হয়।"

"না, না ওই নিয়ে তুমি পুলিশে যাওয়া আসা ক'র না; নিন্দে হবে। তুমি তার ভগ্নিপোত ব'লে তোমার দিকেও কত লোক চেয়ে দেখ্‌বে, আমার যেন মাথা কাটা যাচ্ছে! মায়ের পেটের ভাই বটে, কিন্তু আমার ওর নাম করলে ঘৃণা হচ্ছে।" ঘৃণায় লজ্জায় জ্যোৎস্নার মুখ বিবর্ণ, তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে' এল। পরদিন সন্ধ্যায় প্রিয়রঞ্জনের কাছে সে শুন্‌ল, নিধুবাবুর ছয়মাস শ্রীঘর-বাসের বিধান হয়েছে। অনেক চেষ্টা করে'ও হাকিম তাকে ছাড়্‌লে না, রাজদণ্ডই তার অদৃষ্টে ছিল। জ্যোৎস্নার বুকের ভিতর কি এক অব্যক্ত সূচিবিদ্ধ যন্ত্রণা হচ্ছিল; কিন্তু সে তা গোপন করে'ই অতি সহজ ভাষায় বল্‌লে—"মরুক গে, এত বড় কালি যে আমার বাপ মায়ের নামে দিতে পারে, সে আমার ভাই

নয়, শত্রু।” প্রিয়রঞ্জন জ্যোৎস্নার মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লে ন্যায় ও সততার অম্লান উজ্জ্বল মূর্ত্তি, ইহার পার্শ্বে সত্যই তার ভায়ের ঠাঁই নাই।

আজ সপ্তমীর প্রভাত। কোলাহলময়ী রাজনগরী কলিকাতাও শারদ জননীর আগমনে যেন কি এক অসাধারণ ভাবময়ী মূর্ত্তি ধরেছে। বিরল রাজপথ। পূজার সময়ে কলিকাতায় কেবল বিদেশীরাই থাকে না তা' নয়, কলিকাতাবাসীও কলিকাতা ছেড়ে বাহির হয়ে যায়। হাট, বাজার, বিপণি কয় দিন পণ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ হয়েছিল, আজ সব যেন খালি ও শ্রীহীন হয়ে' পড়েছে; খরিদ্দারের ভীড় নেই। লোকের মুখে আনন্দের আভা ফুটে' উঠ্‌ছে। পথে, ট্রামে বাসে নব পরিচ্ছদে নারী পুরুষ চলেছে। হাসি কথায় কোন কালিমা নেই। স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছতার বিমল আলোর ঝরণায় মানুষের সকল মলিনতা যেন মুছে গেছে। দূরে দূরে পূজাবাড়ী থেকে বাদ্যধ্বনি শোনা যাচ্ছে, সানাইয়ের রাগিনী-আলাপ বাতাসে ভেসে আস্‌ছে। উৎসবের ধুম লেগেছে যেন ঘরে ঘরে। মা পুত্রবধূকে ডেকে গহনার বাক্স খুলে সাজিয়ে দিলেন সর্ব্বাঙ্গে নূতনের সহিত পুরাতন অলঙ্কার; মাথায় দিলেন সীঁথি, গলায় গিনিহারের পাশে শতনরের শোভা ঝক্‌মকিয়ে উঠ্‌ল। পাক-দেওয়া অনন্তের পাশে নিরেট হাঙ্গর-মুখো তাগা, আর হাতের কব্জা থেকে কনুই পর্য্যন্ত রতন-চূড়, বরফি ঠাস্ দিয়ে পরিয়ে দিলেন। নিতম্বে দুলিয়ে দিলেন সোণার বিছার সঙ্গে চন্দ্রহার। হেসে বল্লেন—“এ-যুগে বাবু এ-সবের চলন নেই; এসব আমার শাশুড়ীর আমলের। আমার ঐ এক ছেলে, তাই তোমায় দিয়ে আজ আমার সাধ মিট্‌ল। একবার বাড়ীখানি ঘুরে খুলে রেখো—এত গহনা একটা ভারী বোঝার মতই মনে হবে। আজ থেকে এসব তোমারই।”

দারিদ্র্যের কোলে অতি দুঃখে মানুষ হয়েছে জ্যোৎস্না, আজ তার সৌভাগ্যের সীমা নেই। ভায়ের জন্যও বুকের মাঝে দরদ রাখার স্থানটুকুও সে মুছে দিয়ে পরিপূর্ণ ভাবে আপনার সবখানি ঢেলে দিয়েছে তার স্বামীর চরণে। আত্মদানের এই তার অশেষ সৌভাগ্য তার মনে গৌরবের চেয়ে এই দুটী গুরুজনের প্রতি কৃতজ্ঞতাই বাড়িয়ে তুলে। সে তার হৃদয়টাকেই দুইয়ে মাথাটা লুটিয়ে দিলে শাশুড়ীর চরণে। মার মনে হ'ল, গরীবের মেয়ে বটে, কিন্তু ভগবান তার যোগ্যবধূই মিলিয়ে দিয়েছেন।

রাত্রিকালে রঞ্জন ঘরে এসে দেখ্‌ল, রূপ-যৌবনের মেলা বসে' গেছে তার ঘরখানি জুড়ে'। সে সারাদিন দেখেছে অলিন্দে অলিন্দে সোণার প্রতিমা-রূপে তার পত্নীকে ঘুরে বেড়াতে নানা কাজে। নব বস্ত্রের সুগন্ধে, কেশমার্জ্জনের সৌরভে, সুবাসিত তৈলের আঘ্রাণে সমস্ত বাড়ীখানি সারাদিন আমোদিত হয়ে' আছে। পূজার উৎসব, লক্ষ্মী-প্রতিম এই বধূটিকেই কেন্দ্র করে' মাতিয়ে তুলেছে।

শয়ন-কক্ষের শোভা আজ তুলনাহীন। আভরণ-রাশির আড়ম্বর আর নেই। বিচিত্র বসনের চাক্‌চিক্য নাই। বনকুসুমের মত সুবিমল-সৌরভপূর্ণ সে অতুল্য রূপের উলঙ্গ শোভায় রঞ্জন মাতাল হয়ে' গেল। সাজ-সজ্জাহীন ভগবানের দেওয়া অকৃত্রিম রূপের অগ্নিশিখাই তার সম্মুখে যেন জ্বলে' উঠেছে। সে রূপ যেন ভোগের নয়, আরাধনার—রঞ্জন চেয়ে রইল অপলক দৃষ্টিতে।

জ্যোৎস্না সত্যই নিরাভরণা। সারাদিন সে মায়ের অনুরোধে অলঙ্কারের গুরুভারে ক্লান্ত হয়ে' পড়েছিল, সন্ধ্যার পর সংসারের সকল দেখাশুনা শেষ করে', সে একে একে সকল অলঙ্কারগুলি খুলে রেখে, সন্ধ্যাস্নান সমাপন করে' পরিধান করেছিল রঞ্জনেরই একখানি সরু রেশমী পাড়ের ফিন্‌ফিনে ধুতি। হাতে তার দু-গাছি সোণার সরু রুলী, পৃষ্ঠে আলুলায়িত মেঘরাশির ন্যায় কুন্তল, ললাটে সিন্দুর ঘন উষারাগের ন্যায় উজ্জ্বল—রঞ্জন বিহ্বল অনিমিষ নয়নে তার পানে চেয়ে রইল। রক্তরাগ ওষ্ঠপুট, বিকশিত কুন্দদন্ত ঝক্‌ঝকিয়ে উঠ্‌ল, সঙ্গে সঙ্গে বংশী-ধ্বনি —“হাঁ করে দেখ্‌ছ কি? ভাল দেখাচ্ছে না বুঝি! সেজেগুজে থাকা কি পাপ বল ত, আমার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে আছে। কি করি মায়ের সাধ”—“না জ্যোৎস্না, আড়ষ্ট হয়ে' আর তুমি থেকো না; প্রভাত-পদ্মের মত অমল রূপশ্রী এমনই মনোহর-মূর্ত্তিতে আমার হৃদয়ে তুমি নিত্য কাল ফুটিয়ে রেখো। রূপের পূজা আমি শিখি নি, কোন দিন এ পাঠ আমি পড়ি নি; রূপের স্তুতি কি করে' করতে হয় জানি না। আমি তোমার অনুগত পূজারী, আমার পূজা তুমি অকিঞ্চন বলে'ই সহজ-ভাবেই নিও।”

"কি যে বল, লেখাপড়া শিখেছ বলে', এমন করে' বুঝি লজ্জা দিতে হয়!" এই বলে' রঞ্জনের গলায় দুটো হাত একসঙ্গে তুলে দিয়ে সে তার বুকে এসে প'ড়্‌ল। রঞ্জন অনুভব কর্‌লে, যেন সে পুরাণবর্ণিত কোন এক অপ্সরা-লোকে উপনীত হয়েছে; তার মনে হ'ল, বুঝি এমন আচম্বিতে কিছুর ত্রুটি হ'য়ে যেতে পারে, যার ফলে, তাকে যেন হয় তো একদিন উর্ব্বশী-হারা পুরূরবার মত বিরহ-বিধুর হ'তে হবে। বিস্ময়ে, আহ্লাদে, আতঙ্কে সে উদাসীন পুরুষমূর্ত্তি অনিন্দ্যসুন্দরী প্রকৃতির কোলে আন্দোলিত হয়ে উঠ্‌ল। সপ্তমী-পূজার আরতির বাদ্য তখনও শোনা যাচ্ছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মার কাছে গিয়ে ছেলে আব্দার জানালে—বন্ধু-বান্ধবেরা আর ছাড়ে না, তাদের একদিন ভোজ না দিলেই নয়। মা হেসে বল্‌লেন—"আমিও চুপ ক'রে আছি। এতদিন মনে মনে ভাব্‌ছি, রঞ্জন বুঝি ভুলেই গেছে তার বন্ধুদের। বিয়ের পর ফুলশয্যেও করা হয় নি, পেটের পিলে চমকে গেছ্‌ল, নারায়ণ মুখ রেখেছেন। একদিন সবাইকে ডেকে, আমোদ আহ্লাদ কর।"

পূর্ণিমার দিন একটা বড় রকমের পার্টি দেবার আয়োজন করা হয়েছে। তার আগের দিন রঞ্জন বুঝিয়ে দিচ্ছল জ্যোৎস্নাকে, কি তাকে করতে হবে। রঞ্জনের আজগুবি কথা শুনে' সে কপালে চক্ষু তুলে ব'ল্‌লে—"তুমি বল কি গো, তোমার ধেড়ে ধেড়ে পুরুষ-বন্ধুদের কাছে আমায় দাঁড়াতে হবে? লজ্জায় যে মরে' যাব, ও-সব আমি পারব না।" "না পারলে অপমানের আর শেষ থাক্‌বে না। তাদের বাড়ী গেছি, বন্ধুর চেয়ে বন্ধু-পত্নীরাই আদর আপ্যায়নে তৃপ্তি দিয়েছে বেশী; আমার বাড়ী এসে তারা তোমায় যদি না দেখ্‌তে পায়, গঞ্জনা দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দেবে।" "এ্যা, বল কি? হাঁগা, বউ-মানুষ, তোমরা পুরুষ, কি বলে' আদর আপ্যায়ন করে গো, চোখ তুলে তারা পুরুষের মুখপানে চায় নাকি?" "হুঁঃ, চোখ তুলে চাওয়া—দস্তুরমত শেক্‌হাণ্ড করে' চেয়ারে নিয়ে গিয়ে বসায়। খেতে লজ্জা ক'র্‌লে, হাত চেপে ধরে, মুখে তুলে দেয়।" "ওরে বাবাঃ, ওসব আমি পারব না, আগে থাকতেই বলে' দিচ্ছি। এ কোন দেশী কথা, পর-পুরুষকে ছোঁওয়া—তাদের স্বামীরা কিছু বলে না?" "তোমাকেও তো তাদের মত কর্‌তে হবে, আমিও তো তোমার স্বামী, তার জন্যে তোমাকে কি কিছু বল্‌ব?" "তা না বল বাপু, আমার এই চোখ দুটো আর কারু দিকে যদি চায়, সে আমি খোঁচা দিয়ে শেষ করে' ফেল্‌ব। প্রিয়রঞ্জন হেঁসে বললে—"সে সব কথা তোমায় বলি নি বুঝি?" "কি কথা?" "তখন কে জানে তুমি এমন হ'বে! মা তোমার কথা উত্থাপন কর্‌তে না কর্‌তেই আমি বসেছিলাম এমন বেঁকে, যে মায়ের সঙ্গেই বুঝি ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।" "কই, এসব কথা তো তুমি বল নি আমাকে!"

"সে কি আর কথা! আমার ধারণা ছিল গেঁয়ো-মেয়েগুলো আর এক রকমের জীব, একেবারেই আপ্-টু-ডেট্ নয়। আমার সঙ্গে পোষাবে না বলে' সে কি আব্দার!"

"তারপর—?"

"মাকে দেখ্‌ছ তো? উনি যা জিদ্ ধর্‌বেন, ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু এলেও তা কেউ ছাড়াতে পার্‌বে না; শেষে রাজি হলুম।"

"ওঃ বুঝেছি—মায়ের জবরদস্তিতেই তবে তোমার বিয়ে করা—আমি তো সত্যিই পাড়াগেঁয়ে, তোমার মনের মত হই নি—না?"

প্রিয়রঞ্জন কথাগুলির উত্তর দিল নিতান্ত লঘুভাবেই—সে লক্ষ্য রাখে নি নারীর কোমল হিয়া তার এই সামান্য কথায় আঘাত পেয়ে কেমন চঞ্চল হয়ে' উঠেছে। জ্যোৎস্নাও হাস্‌ছিল বটে; কিন্তু সে হাসিতে আর তেমন রং ছিল না, কষ্ট করে'ই ঠোঁটের কোলে কোলে কৃত্রিম হাসির রেখা টেনে যাচ্ছিল। রঞ্জন বল্‌লে—"আমি জান্‌তুম বিয়ে হবে আমার টুনুর মত, সুষমার মত অথবা মিসেস্ চ্যাটার্য্যির মত একটা মেয়ের সঙ্গে। বেপরোয়া টেনিস্ খেল্‌বে, সে মটর হাঁকিয়ে ছুটবে, আমি তার পাশে সিগারেটটা ঠোঁটে চেপে বেশ আমেজ করে' বসে' থাক্‌ব—শুনছ?

জ্যোৎস্না একটু উদাসীন হয়ে পড়েছিল—হঠাৎ সতর্ক হয়ে' বলে' উঠ্‌ল, "বেশ হ'ত, আমি একটা আপদ্ হয়েছি না? ঐ যে টুনু মুনু সব কি বল্‌লে? তারা সত্যি সত্যি কোন মানুষ, না তোমার গল্প-কথা?"

"গল্প কেন? টুনুকে তোমায় দেখাব, সুকুমারের বোন টুনু। আর ঐ মিস্ চক্রবর্ত্তীর নাম করলুম—যেমন রূপ, তেমনি হাতে যদি ব্যাট্ পড়্‌ল, একেবারেই ফ্লায়িং বার্ড, সে তুমি দেখ্‌লে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে।" "হুঁঃ—"একটা চাপা নিশ্বাস বেরিয়ে এল, জ্যোৎস্নার বুক ঝল্‌সে। রঞ্জন নিজের খেয়ালেই ছিল; সে বল্‌লে পার্টিতে সবাই আসবে, দেখো, জড়-ভরতের মত গুটিয়ে থেকো না; মাথা নীচু হবে।" জ্যোৎস্নার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ হঠাৎ যেন কে চেপে ধরেছে—সে অনুচ্চ অস্ফুট স্বরেই বল্‌লে—"আমি একটা আস্ত পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, তোমাদের এই সহরের কেতা রাখ্‌তে পার্‌ব না।" সে ত্বরিৎ-পদে রঞ্জনের কাছ থেকে সরে' পড়্‌ল।

তার পরদিন সন্ধ্যার সময়ে ফটকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে নীল, লাল, সবুজ বাল্‌বে বিদ্যুৎ ঝল্‌সে উঠেছে। বাহির-বাড়ীর বন্ধ-করা হল-ঘরখানি আজ খোলা হ'য়েছে—জ্যোৎস্না আড়াল থেকে উঁকি মেরে ঘরের ঐশ্বর্য্য দেখে' নিজের দৈন্যে সে যেন আজ ম্লান হয়ে' গেছে; কেবলই তার মনে হয়েছে, পত্নী বলে' স্বামী যেন কর্ত্তব্যের দায়েই তাকে ভালবাসে, তাকে সুন্দর দেখে—আসলে স্বামীর সে যোগ্য নয়।

ব্যাগ হাতে নীল আর সবুজের চওড়া পাড়ে পাড়ে ছাওয়া গোলাপী রং'এর সাড়ী পরে', একজন এসে ফটকে দাঁড়াল—বারান্দার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না স্পষ্টই দেখ্‌লে প্রিয়রঞ্জনকে তার হাত ধরে' হাসি-মুখে কি ব'ল্‌তে। কথা শোনা গেল না; কিন্তু মনে হ'ল ভঙ্গী দেখে' বহুদিনের পর দু-জনায় যেন দেখা। রঞ্জনের ভাব মিনতিপূর্ণ, আর মেয়েটী অভিমানে উপেক্ষায় সম্ভাষণ গ্রহণ করে' তার পাশে স্তব্ধ হয়ে' দাঁড়াল। দলে দলে নারী পুরুষের আগমন। মেয়েরা এসেছে যেন নাচ গান ক'র্‌তে, প্রায় প্রত্যেকের হাতে বাদ্য-যন্ত্র। বহির্বাটী আনন্দে উচ্ছ্বাসে মুখরিত হয়ে' উঠ্‌ল। জ্যোৎস্না খড়খড়ির ধারে নিস্পন্দ হয়ে' দাঁড়িয়ে। হঠাৎ রঞ্জনের গলার আওয়াজ পেয়ে ফিরে চাইতেই সে দেখ্‌লে, তার স্বামীর মুখে বিরক্তির চিহ্ন! কাণে যে কয়টা কথা গেল, তার সুরও প্রীতিপূর্ণ নয়, "তুমি এখনও দাঁড়িয়ে? একবার যে তোমায় যেতেই হ'বে নীচে নেমে। শীগ্‌গির যাও, কাপড় চোপড় ছেড়ে এসো।" জ্যোৎস্না যেন আজ ভূতাবিষ্ট, কোথা থেকে দুর্জ্জয় গর্ব্ব এসে তাকে যেন অজেয় করে' তুলেছে। সে আজ ভুলে গেছে কত অনুগ্রহ দিয়ে এরা তাকে দৈন্য ও অসহায় অবস্থা থেকে তুলে এনেছে এই সুখের স্বর্গে। সে উদ্ধত স্বরে বলে' উঠ্‌ল—"আমি যাব না কোন মতেই নীচে নেমে ঐ সব সহুরে সবচুর মেয়েদের সঙ্গে আলাপ ক'র্‌তে।" রঞ্জন জ্যোৎস্নার এমন কঠিন মূর্ত্তিও কখন দেখে নি, এমন পরুষ ভাষাও কখন শোনে নি—সে অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইল তার পানে। কিন্তু জ্যোৎস্না সেখানে আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াল না—সে ক্ষিপ্রপদে নিজের গৃহে গিয়ে প্রবেশ কর্‌ল।

বিছানায় পড়ে' জ্যোৎস্না ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল অনেক, কিন্তু কেন? তার সুখের নীড়ে কে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে? এত দুঃখের সে কোন কারণই খুঁজে পেল না। রঞ্জন চোরের মত ঘরে এসে, জ্যোৎস্নাকে এমন ভাবে পড়ে' থাক্‌তে দেখে' অতিশয় আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। যে আকাশ কিছু পূর্ব্বে জ্যোৎস্নাধারায় হয়ে' উঠেছিল উদ্ভাসিত, চকোর উড়ে বেড়াচ্ছিল ডানা মেলে চাঁদের দিকে চেয়ে, বাতাস বয়ে চলেছিল ধীর মন্থর ছন্দে, মধুযামিনী অকস্মাৎ ঝড়ের মুখে কালো-মেঘে ছেয়ে গেল অন্ধকারে। প্রকৃতির কোলে এমন অলৌকিক লীলা-রহস্য সে অনেক দেখেছে, তার মনে হ'ল নারীপ্রকৃতিও বুঝি এই নৈসর্গিক স্বভাবের ছন্দে সুর-বাঁধা। জ্যোৎস্নার এমন অকস্মাৎ ভাবান্তর তা' না হ'লে কেমন করে' সম্ভব হ'তে পারে? তার পিঠে হাত দিয়ে সে বল্‌লে—"জ্যোৎস্না, লক্ষ্মীটী, সোণাটী, তোমার কি হয়েছে জানি না—এমন জান্‌লে এ সব ব্যাপারে হাত দিতুম না। তুমি যদি আজ এমন বিষাদিনী হয়ে' থাক, বন্ধু-মহলে শুধু যে একটু অপ্রস্তুতই হ'ব তা' নয়, আমার বুকটা সত্যই তোমায় দেখে এমন অবসন্ন ম্রিয়মান হয়ে' প'ড়্‌ছে, মাথা ঘুরছে

আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতেও পারব না।" রঞ্জন জ্যোৎস্নার শয্যাপার্শ্বে হতাশ হ'য়ে বসে' প'ড়ল। জ্যোৎস্না রঞ্জনের মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে—"এই সব কাজের মত করে' গড়ে' উঠিনি—এক বৎসর যে, ভাবে তুমি আমায় চাও, তার মতন করে' আমায় গড়ে'ও তোল নি, কোন শিক্ষাও দাও নি—বল তো সহরের এই সব আদব-কায়দা দোরস্ত তোমার বন্ধুদের কাছে আমি কেমন করে' গিয়ে দাঁড়াব?" রঞ্জন জ্যোৎস্নার গ্রীবাদেশ আকর্ষণ করে' নিজের বুকের কাছে নিয়ে এসে আদর করে' বল্‌লে—"আমায় অপরাধী করো না, জ্যোৎস্না। এই এক বৎসর পৃথিবীতে যে আর কিছু আছে, তুমি ছাড়া আর কাউকে যে মনে রাখ্‌তে হবে তা' আমি ভাব্‌তে পারি নি। এই ঘটনা শেষ হোক্, তোমার প্রতিভা আছে, শিক্ষার ব্যবস্থা করব। শুধু রূপে তুমি অতুলনীয়া নও, সর্ব্বগুণে তোমার মত নারী দ্বিতীয় খুঁজে কেউ পাবে না।" জ্যোৎস্নার বুকে কেন যে মেঘের সঞ্চার হয়েছিল সে নিজেই তার কারণ খুঁজে পেল না। সে সুস্থ হয়ে হেসে বল্‌লে—"আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌ব। একলা আমায় ছেড়ে দিও না—যা করতে হবে ইশারায় আমায় জানিও। আশীর্ব্বাদ করো, এই দায় থেকে যেন ভালয় ভালয় উদ্ধার পাই।"

"ব্র্যাভো ব্র্যাভো"—কি বিকট চীৎকার সমস্বরে সরু মোটা গলায় একেবারে জন পঞ্চাশ চেঁচিয়ে উঠ্‌ল। জ্যোৎস্না বেতসপত্রের মতন কাঁপ্‌ছিল—সে তার স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে, এদিক্ ওদিক্ উপবিষ্ট তার বন্ধুদের নমস্কার ঠুকে, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে একান্ত ক্লান্ত হয়ে এক রমণীর আকর্ষণে তার পাশে এসে সোফায় বসে' পড়্‌ল। আড়চোখে চেয়ে দেখ্‌লে, এ সেই ব্যাঞ্জ হাতে সুন্দরী। জ্যোৎস্নার চক্ষের পাতা পাথরের মত ভারী হয়ে পড়্‌ছিল, এতগুলি মানুষের চক্ষের দৃষ্টিতে। আর তার মাথা ঘুরছিল অযাচিত রূপের প্রশংসায়। সেই সুন্দরী তার হাত ধরে' বললে—"মিষ্টার মুখার্জ্জির বিবাহ উপলক্ষে আমি এক পার্টি দেব, আপনাকে কিন্তু যেতে হবে। জ্যোৎস্না ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে আড়ষ্ট হয়ে' সেইখানেই রইল বসে'। একটা গোলটেবিল ঘিরে মেয়েরা "কুরুং কুরুং" করে' তারের যন্ত্রগুলো নিচ্ছল বেঁধে, এখুনি তাদের আরম্ভ হ'বে ঐক্যতান বাদন। ব্যাঞ্জ হাতে সেই সুন্দরীরও ডাক প'ড়ল সেইখানে। জ্যোৎস্না ফাঁক পেয়ে হল-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। হলঘরে আমোদ-প্রমোদের কোলাহল অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত শোনা যাচ্ছিল।

আহারান্তে একে একে বিদায় নিয়ে সবাই প্রায় চলে' গেছে, মিস্ চক্রবর্ত্তী রঞ্জনের হাত ধরে' বল্‌লে—"মিষ্টার মুখার্জ্জি, আমি এসেছিলুম ট্রামে, রাত হয়েছে অনেক, আমায় একখানা ট্যাক্সি ডেকে দিন।" রঞ্জন বল্‌লে—"ভাগ্যিস্ বল্‌লেন, চলুন আমি আপনাকে রেখে আসি।" সোফারকে বলা ছিল না—সে কোথাও আড্ডা দিচ্ছিল বসে'। রঞ্জন মিস্ চক্রবর্ত্তীকে নিয়ে নিজেই মটর হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল।

রাত অনেক হয়েছে; সাড়া পাওয়া যায় না আর কারও কণ্ঠের। হল-ঘর খোলা আছে; বিদ্যুতের আলোয় তার সামনের বারান্দা সমুজ্জ্বল। কিন্তু রঞ্জন কোথায়? অনেক ক্ষণ প্রতীক্ষার পর জ্যোৎস্না পা টিপে টিপে নীচে এল নেমে—বন্ধ সাড়্‌সির কাঁচ দিয়ে তার চক্ষে পড়্‌ল, সোফায় বসে' আছে সেই অনিন্দ্যসুন্দরী, যে তাকে আদর করে' কাছে বসিয়েছিল, আর তার কোলে শুয়ে আছে এক তরুণ। মাথাটা আছে উল্টা দিকে, দেখা যায় না তার মুখ। কিন্তু কাপড়ের পাড় কামিজের রং—ঐ যে রঞ্জনেরই। জ্যোৎস্নার বুকটা ধড়াস্ করে' উঠ্‌ল। তার মনে হ'ল—বোধ হয়, সহরের নারী পুরুষের মাঝে এমন আচরণ দোষের নয়। তা না হ'লে এমন প্রকাশ্য-ভাবে একজন যুবতীর কোলে তার স্বামী এমন নির্ভরসায় শুয়ে থাক্‌তে পারে? তার চক্ষুকে সে বিশ্বাস ক'রতে পারল না। ঘুরে আরও কাছে একটা খড়খড়ির ধারে গিয়ে দাঁড়াল। মাথাটা তার ডুবে ছিল সুন্দরীর কোলের মধ্যে। কিন্তু অস্ফুট যে কথা তার কানে গেল, তাতে তার মনে হ'ল পায়ের তলা থেকে যেন পৃথিবী সরে' যাচ্ছে। পুরুষের কণ্ঠ বিকৃত সঙ্কোচ-জড়িত, স্পষ্টই মনে হ'ল এ রঞ্জনের গলা নয়, কিন্তু কথাগুলি তারই। সে

বল্‌ছে "টুনু, তুমি যে তবুও আমায় ভালবাস, এ তোমার মহত্ত্ব।" গলা খুব জড়িয়ে এল, মাঝে আর কোন কথা শোনা গেল না, টুনু হেসে বল্‌লে—"আমি কোনদিন মনে করি নি—তুমি আমায় বিয়ে করবে। বাড়ীর জিদ্ সত্যই উপেক্ষা করতে পার না—আমিও তাই জান্‌তুম। তবে নিশ্চয়ই জেনো, তোমরা পুরুষ, নারীকে চেনো না—সে যেখানে আপনাকে হারিয়েছে, চিরজীবন তার স্মৃতি আর মুছ্‌বে না। তবে"—আবার কথা গেল জড়িয়ে—অনেক কষ্টে সে অস্পষ্ট কথাগুলিকে একত্র করে' শব্দের অর্থ এইরূপ অনুভব করে' নিল। তারপর আবার পুরুষের জড়ান গলায় কথা আরম্ভ হ'ল—একেবারেই দুর্ব্বোধ্য। জ্যোৎস্না অতিশয় আগ্রহের সহিত উৎকর্ণ হয়ে কথাগুলি শোনবার চেষ্টা কর্‌ছিল, এমন সময়ে ফটকের সামনে হর্ণ শুনে সে আঁৎকে উঠ্‌ল এবং ঊর্দ্ধশ্বাসে একেবারে নিজের ঘরে গিয়ে পাগলের মত ছুটাছুটী আরম্ভ করে' দিল—মাথার মধ্যে তখন তার বিপ্লবের ঝড় উঠেছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইহার পর তিনমাস কেটে গেছে। রঞ্জন জ্যোৎস্নার কাছে যে সুখের ও তৃপ্তির আস্বাদ পেয়েছিল, তা আর খুঁজে পায় না। জ্যোৎস্না যন্ত্রের মত ঘুরে বেড়ায়, যন্ত্রের মত স্বামীর ডাকে সাড়া দেয়, যন্ত্রের মতই কর্ত্তব্য পালন করে। কণ্ঠের উচ্ছ্বাস রুদ্ধ, ওষ্ঠপুটে হাসির রেখা শুষ্ক। লাবণ্যময়ী প্রতিমা দিন দিন মলিন হয়ে' যাচ্ছে। রঞ্জন কত বার জিজ্ঞাসা করেছে—তোমার কি হয়েছে বল? দাদার জন্যে মন কেমন করছে? কোন অসুখ হয়েছে? জ্যোৎস্না সব কথারই উত্তর দেয়, না, না, না, আমার কিছুই হয় নি।"

জ্যোৎস্না কিছু সংস্কৃত জানে; তাই একদিন কালিদাসের শকুন্তলা এনে রঞ্জন কাছে ডেকে বল্‌লে—"একটু পড় শুনি। জ্যোৎস্না ম্লান মুখে উত্তর দিলে "ভুলে গেছি। তুমি পড়, আমি শুনি।" জ্যোৎস্না রঞ্জনের মুখের দিকে চেয়ে থাকে, রঞ্জন পড়ে যায়; যখন সে আবার মুখ তুলে চায়, জ্যোৎস্না মাটীর দিকে দৃষ্টি নত করে! ভাবে, কই কোথাও তো এক ফোঁটা কালিমা ঐ মুখশ্রীতে খুঁজে পাই না—কে তবে সুন্দরীর কোলে শুয়ে ছিল? জিজ্ঞাসা করতেও ভরসা হয় না। একদিন কথাপ্রসঙ্গে কেবল রঞ্জন বলেছিল—টুনু ব্যাঞ্জো বাজায় বড় চমৎকার। সুকুমারের বোন খুব ভাল মেয়ে; সে বিয়ে কর্‌বে না, প্রতিজ্ঞা করেছে। জ্যোৎস্না বলেছিল—"কেন করবে না, শুনি।" রঞ্জন তার সদুত্তর দিতে পারে নি—কি জানি কেন, অমন সুন্দর মেয়ে—অমন সুন্দর! তুমি তো তারে দেখেছ!" জ্যোৎস্না আর কথা কইতে পারে না।

সংস্কৃত পড়া বন্ধ হল। জ্যোৎস্না বল্‌লে—"তোমার মত স্বামীর যোগ্য হ'তে হ'লে, টুনুর মত গান, বাজনা, আদব-কায়দা, কিছু ইংরাজি শেখার দরকার; আমায় এই সব শেখাবে?" রঞ্জন উৎসাহ সহকারে জ্যোৎস্নার জন্য সকল ব্যবস্থাই করে' দিতে হ'ল রাজী; কিন্তু শেষে জ্যোৎস্নাই পেছিয়ে গেল এই ব'লে—"আমার ওসবের আর দরকার কি! বেশীদিন বোধ হয় বাঁচ্‌ব না।" কথায়, আচরণে দুজনের মধ্যে যে সুর পাওয়া যেত আগে তা আর খুঁজে না পেয়ে রঞ্জন ক্রমেই হতাশ হয়ে' পড়ে। ক্রমেই সে বাড়ী-ছাড়া হয়ে পড়্‌তে লাগল ক্ষোভে ও অভিমানে। বাহিরে বাহিরে ঘুরে সে কেমন লঘু ও তরল হয়ে' পড়্‌ছিল। জ্যোৎস্নার বুক যেন ভেঙ্গে গেছে; অনেক বার মনে মনে করেছে—কথাটা খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করে' ফেলি। যদি অস্বীকার করে! অপরাধী হয়ে' থাক্‌তে, হবে। আমি যে তাকে অবিশ্বাস করি, এই ক্ষত আর যে শুকাবে না—তার চেয়ে একা জলে মরাই ভাল। স্বামী যাই হোক—গুরু, দেবতা; তাকে কোনদিন ব্যথা দেবো না।

কিন্তু সংশয়ের বৃশ্চিক-জ্বালায় সে একান্ত অধীর হয়ে' একদিন স্থির করে' নিলে—কপালে যাই থাক, একবার জিজ্ঞাসা করব, সেদিন সে টুনুর কোলে মাথা দিয়ে শুয়েছিল কিনা—বিয়ের কথা নিয়ে দু-জনের মধ্যে আলাপ হয়েছিল কি না। কিন্তু অনেকবার চেষ্টা করে'ও এমন ভরসা তার হোল না যে কথাটা সে জিজ্ঞাসা ক'রে। ঐ এক ভয়, যদি রঞ্জন অস্বীকার করে, তারপরও যদি সে এ-কথায় বিশ্বাস না রাখে, তবে তাকে উভয় দিক্ থেকেই জলে মরতে হবে। কালে শোক দূর হয়, এই মনের ব্যথাও

সর্ব্বহারা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত শিবপদ ভৌমিক]
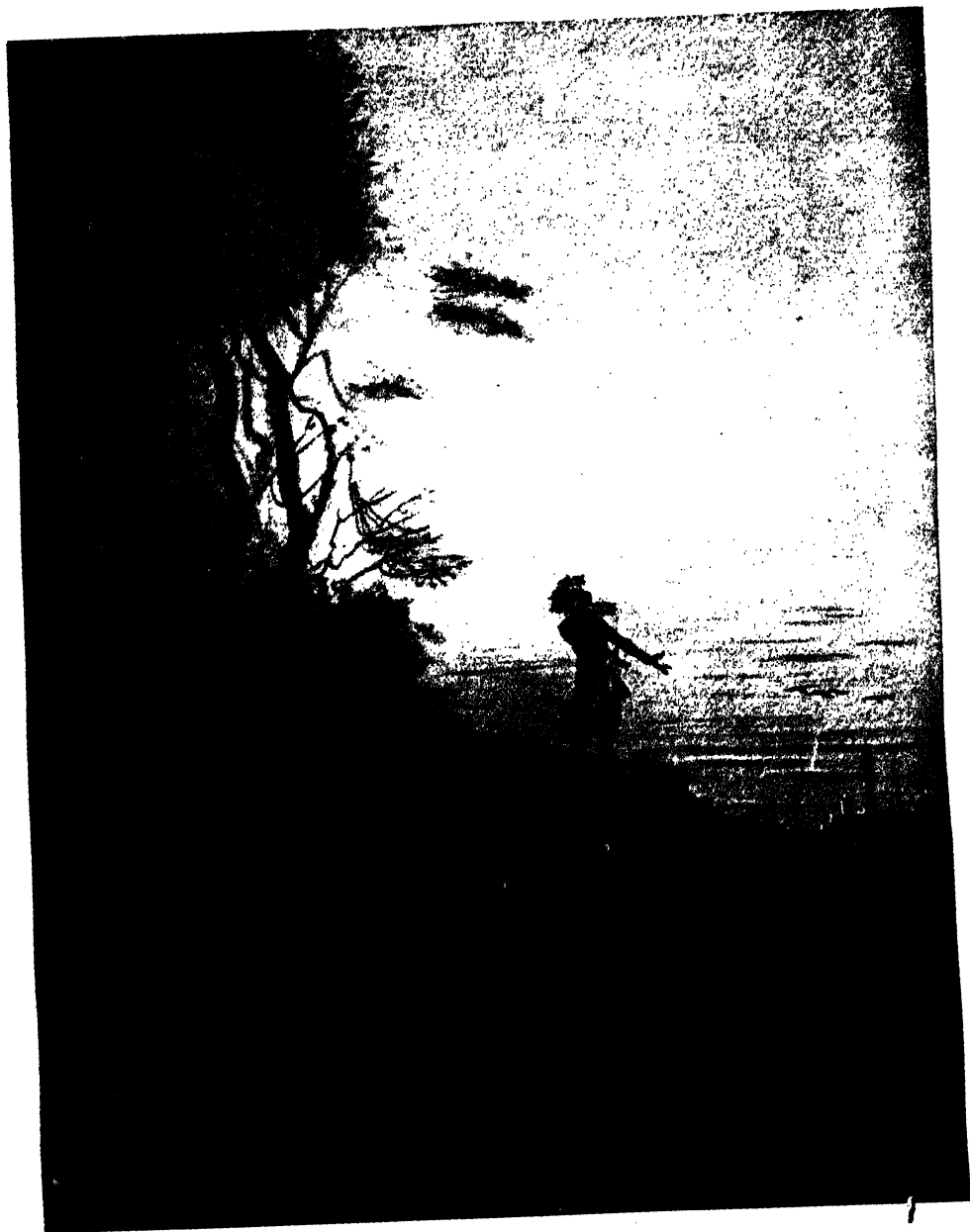
একদিন দূর হবে। কিন্তু দিন দিন সংশয়ের রেখা বিস্তৃত হয়ে' দু-জনকেই যে বহু দূরে নিক্ষেপ করে, এ দূরত্বের ব্যবধান ক্রমেই যে বেড়ে যায়, নিরুপায় সে, বুক তার হাহাকার করে' ওঠে।

দশটা এগারটা বারটা বেজে গেল, রঞ্জন এখনও বাড়ী ফেরে নি। আজ কাল কোনদিনই অধিক রাত্রি না হ'লে সে আর বাড়ী ফেরে না। কিন্তু এত রাতও কোনদিন হয় নি—আজ জ্যোৎস্না মনকে ঠিক করে' নিলে এই বলে' যে, নিজের মনের কালি নিজেই ধুয়ে ফেলে আবার সে আগেকার মত অনাবিল প্রেমের টানে রঞ্জনের সহিত ভেসে যাবে। এমন করে' ডাঙ্গার উপর জীবনতরী বেঁধে রাখ্‌বে না। শুষ্ক মরুভূমির মাঝে নিঃশ্বাস নিতেও বুকে বাজে। স্বামীর উপর তার যে স্বাভাবিক অধিকার, কেন সে তা থেকে বঞ্চিত হবে তুচ্ছ সংশয়ের আঘাত বুকে নিয়ে। ঘড়িতে ঢং করে এক ঘা বেজে উঠ্‌তেই জ্যোৎস্না উঠে দাঁড়াল বিছানা ছেড়ে মেঝের উপর। সামনেই রঞ্জন—চক্ষের দৃষ্টি তার অস্বাভাবিক; যেন সেও অতৃপ্তির মাঝে হাঁপিয়ে উঠেছে; অস্বাভাবিক সুখের অন্বেষণেই ফিরছে। জ্যোৎস্না ধিক্কার দিল নিজেকে—কোমল করুণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—"কোথায় ছিলে এত ক্ষণ—এত রাত?"

"কই কোনদিনও তো জিজ্ঞাসা কর না—সারাদিন সারারাত তোমার সঙ্গ ছাড়ি নি—সারাদিন দূরে থেকে সন্ধ্যায় কাছে এসেছি—সাড়া দাও নি, মুখ ভার করে' থেকেছ—ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিলম্ব করে' ঘরে এসেছি কিছু তো তোমার এসে যায় নি তাতে, আজ এসেছি অর্দ্ধরাত্র শেষ করে', কাল আস্‌ব রাত শেষ কর' ভোরের বেলা চোরের মত, মা না জান্‌তে পারেন, ছেলে তাঁর রাত কাটিয়ে আসে বাইরে। ব্যথা তাঁর প্রাণে যদি বাজে, কুসন্তান হব। সে অভিশাপের জ্বালা কিছুতে জুড়োবে না।"

জ্যোৎস্না হাত ধরে' বল্‌লে—"অপরাধ করেছি ক্ষমা করো—মানুষের ব্যাধি হয় তার তো প্রতিকার আছে; মনে ক'র, আমি আজ ব্যাধিগ্রস্ত—তুমি কি তার চিকিৎসা করবে না?"

"অনেক দিন পরে জ্যোৎস্না, তোমার বুকের অকৃত্রিম দরদের স্পর্শে আমার বুকের তন্ত্রীগুলো সব যেন এক সুরে বেজে উঠ্‌ল। কি হয়েছে তোমার, জ্যোৎস্না?" "ভূতে পেয়েছে! পাপ করেছি অনেক, প্রায়শ্চিত্ত করছি—বল, কাল থেকে তুমি আর আমার কাছ-ছাড়া হবে না? বল, তুমি আর আমায় কাছ-ছাড়া করবে না?"

জ্যোৎস্নার চোখে জল গড়িয়ে পড়্‌ল, সাম্‌লে নিয়ে বললে—"কোথায় থাক তুমি এত রাত্রি পর্য্যন্ত?"

"মিথ্যা তোমায় বল্‌ব না—বসন্তের ফুল্লবাতাস যদি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, যৌবনোচ্ছ্বাস যার বুকের কাণায় কাণায় উপ্‌ছে ওঠে, তার যে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যায়, জ্যোৎস্না! আমার আছে কি -মায়ের কোলে নির্ভাবনায় জীবনের দিন গুনে যাই—পরিপূর্ণ অবকাশময় চিত্তখানি দিয়েছিলে তোমার প্রেমে ভরিয়ে, হঠাৎ হ'লে অন্তর্দ্ধান! বল দেখি জ্যোৎস্না, এই লঘু হাল্কা মন নিয়ে, এই শক্ত পাথরের মত পৃথিবীতে কি সুখে, কি নিয়ে আমি বেঁচে থাকি? তাই এমনিই উদাস, বাঁধনহীন, লক্ষ্যশূন্য প্রাণের সন্ধান যেখানে পাই, সেইখানেই সহানুভূতির সাড়ায় প্রাণটা নেচে ওঠে, তপ্ত হয়, অলস জীবনভার সেইখানেই নামিয়ে একটু নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচি।"

জ্যোৎস্নার বুক মোচড় দিয়ে উঠ্‌ছিল, এই আপন-ভোলা সরল মানুষটীর বাইরের রূপটা যত বড়, যত দৃঢ়, অন্তরটা কিন্তু তরল কর্দ্দমের মত তেমনি কোমল ও নমনীয়। তাকে কাছ-ছাড়া করা যেন তার উপর ভীষণ অত্যাচার। সে আজ নিজের হাতেই তার গায়ের চাদরখানি খুলে নিয়ে, গলার বোতামে হাত দিয়ে মুখের পানে চেয়ে হেসে বল্‌লে—"আমার না হয় দুদিন মুখের হাসিই শুকিয়েছে নিদাঘের নিষ্ঠুর উত্তাপে, তুমি কি তাই বলে' আমায় ছেড়ে ব্যথার উপর ব্যথা দেবে? কাল থেকে কোথাও আর বেরুতে পার্‌বে না, তা আমি বলে' দিচ্ছি।"

"আচ্ছা, কোথাও যাব না। যেতে তুমি না দিলে, যাওয়া তো কোথাও হ'বে না। যেতে দিয়েছ, ছাড়া পেয়েছি, ঘুরে বেড়াই—এ কথাও তুমি ভুলে গেলে চল্‌বে না।"

কথায় কথায় জ্যোৎস্নার যেন কি জানার ইচ্ছা হয়েছিল, তা রুদ্ধ হ'য়ে গেছে। সে তাড়াতাড়ি বলে' উঠ্‌ল, কণ্ঠে সংশয়ের বিষ যেন সঞ্চিত ছিল, তারই মিশ্রণে

যে কয়টী শব্দ উচ্চারিত হ'ল, তা' হৃদয়গ্রাহী নহে, তিক্ত এবং কর্কশ। "চাপা দিলে যে কথা! চালাকি—না? কোথায় যাও, সে কথার উত্তর দিলে কই?"

জ্যোৎস্নাও বোঝে নি কথার সঙ্গে তার ভ্রূ-ভঙ্গী বিকট আকৃতি ধরেছে, কটাক্ষে কুটিলতা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। রঞ্জন জ্যোৎস্নার মুখের দিকে চেয়েই, শক্ত দাঁতে চিবিয়ে চিবিয়ে যেন আঘাত দিতেই বলে' উঠ্‌ল—"সে একজন আমারই মত কি এক অজানা ব্যথায়' ব্যথিত, তারই সাহচর্য্যে ক্ষণিকের তৃপ্তি পেতেই দিবারাত্রি বাড়ী-ছাড়া—সে স্বকুমারের বোন টুনু; টুনুই হয়েছে আজ আমার আশ্রয়, সান্ত্বনা।"

ঠিক মাথার উপর বজ্র এসে ভেঙ্গে পড়্‌ল। জবাব আছে—স্বচক্ষে যা দেখেছি, যে ব্যথা পেয়েছি—তিলে তিলে যে গরল বুকে জমে' উঠেছে, উদ্যত দংশনে এই নিষ্ঠুর প্রগল্‌ভ পুরুষ মূর্ত্তিকে বিষ-জর্জ্জরিত করা যায়—কিন্তু না—দহনের উপর আজ ঘৃতাহুতিই পড়ুক। শত্রু সাম্‌নেই আছে দাঁড়িয়ে, কিন্তু উত্তর আর দেব না; ব্যথার আগুন বুকে চেপেই দেখি আরও কতদূর চলা যায়! জ্যোৎস্না হো-হো ক'রে হেসে উঠ্‌ল। রঞ্জনও ছিল না প্রকৃতিস্থ; তা না হ'লে সে দেখ্‌তো, তার সাম্‌নে সেই প্রেমবিহ্বলা, একনিষ্ঠা, পতিপরায়ণা, সোহাগিনী, সে সেই জ্যোৎস্নাময়ী রমণী নয়—এক অসহায়া, নৈরাশ্যপীড়িতা, উন্মাদিনী রমণী-মূর্ত্তিই তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে। জ্যোৎস্না হো-হো করে' শুষ্ককণ্ঠে খুব হেসে নিল। তারপর রঞ্জনের গা থেকে জামাটী খুলে, ঢাকা খুলে খাবারের থালা সাম্‌নে নিয়ে, লুচির টুক্‌রা মুখে গুঁজে দিতে দিতে বল্‌লে—"এত রাত হয়, টুনু তোমায় খাওয়ায় না?"

(ক্রমশঃ)

'সকলি কী গেছে ডুবে'

শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

তোমায় আমায় মিলে বসন্তের-প্রাঙ্গণেতে সেই,
কতবার চোখাচোখী তার আর চিহ্ন কিছু নেই,
সীমাহীন ধরণীর বুকে।
সে প্রেম গুঞ্জন-ধ্বনি—
আর তো ওঠে না আজ হিয়ার মাঝারে রণরণি'?
সকলি কী গেছে ডুবে, কালের তিমির গর্ভতলে?
হায়! সে কি উঠিবে না—হাতছানি—নয়নের জলে?

ফাগুন আগুন লাগি' সকলি কী ছাই হয়ে গেল,
মানস প্রতিমাটীরে করিবে না যৌবন-চঞ্চল?
সুস্নিগ্ধ শ্যামল ধরা ফিরাইয়া দেবে না কী আর,
তোমায় আমার পাশে, সে বাঁশী আবার
বাজিবে না—বাজিবে না সখি' আনন্দে কাঁপিয়া,
যৌবন-তরঙ্গ আসি' পড়িবে না—এ অঙ্গ ছাপিয়া,—
স্মরণের পরপারে সে কি?

গুণিব কী বাসনার ঢেউ,
ব্যাকুল নয়ন মেলি', ফিরাইয়া দেবে না কী কেউ,
তোমায় এ লক্ষ্যহীন প্রাণে? কেমনে প্রকাশি আমি বল,
অন্তর গুমরি উঠে অতীতের কাহিনী সকল,—
কহিবারে; কিন্তু ভাষা ফিরে যায়, অন্তর্দ্বার হ'তে,
শৃঙ্খলিত বাণীরূপে, বার বার, বিস্মরণী-স্রোতে।

জ্যৈষ্ঠের গ্রহ

শ্রীজ্যোতি বাচস্পতি

গত সংখ্যায় রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছিল, তাহার সাফল্য বা বিফলতা সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিবার সময়েও বলা যাইতেছে না। তবে চৈত্র মাসের কতকগুলি ঘটনা দেখিয়া ইহা মনে হয় যে, ঐ সকল ভবিষ্যদ্‌বাণীর প্রধান কতকগুলি ঘটনা মিলিবার সম্ভাবনা খুব বেশী। গত সংখ্যার ভবিষ্যদ্বাণীগুলি লিখিত হইয়াছিল চৈত্র মাসের প্রথমেই। উহা লিখিত হইবার পরে চৈত্রমাসের মধ্যেই এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়াছে যাহা দ্বারা বোঝা যায় যে, গ্রহসূচিত ফলের মধ্যে সত্যতা আছে। ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে ছিল যে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির শক্তি-হ্রাস ও নানা-রূপে অনিষ্ট হইবে। চৈত্র মাসের শেষে মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলনের বিফলতা-স্বীকার এবং ঐ আন্দোলনের প্রত্যাহারের দ্বারা এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল করিয়াছেন। ভবিষ্যদ্বাণীর আর এক স্থলে ছিল, যে কর্পোরেশনে দলাদলির ব্যাপারে কোনরূপ কেলেঙ্কারী হইতে পারে। চৈত্র মাসের শেষে মেয়র নির্ব্বাচনের ব্যাপারে দলাদলি যে-রূপ প্রকট হইয়াছে এবং ইহা লইয়া যে-রূপ অশোভন আলোচনারও সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, বৈশাখ মাসেও ইহার জের চলিবে। রবি-মঙ্গলের যোগ চৈত্র মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে সুরু হইয়াছে। তাহাতে চৈত্র মাসেই গ্রীষ্মাধিক্য হইয়াছিল। ভবিষ্যদ্বাণীতে ছিল, বৈশাখ মাসের প্রথমে রবি-মঙ্গলের সহিত শনির স্নেহ-প্রেক্ষা কাল-বৈশাখীর দ্বারা রাত্রিগুলিকে শীতল ও রমণীয় করিবে। বস্তুতঃ চৈত্র মাসের শেষ হইতেই শনির প্রেক্ষা সুরু হইয়াছে এবং সেই জন্য চৈত্রের শেষ সপ্তাহে কাল-বৈশাখের সূত্রপাত হইয়াছে। চৈত্র মাসে রবি-মঙ্গলের যোগে বহু অগ্নিকাণ্ডও ঘটিয়াছে। বৈশাখ মাসে কি হয়, তাহা দেখিবার বিষয়।

৩০শে বৈশাখ ১৩৪১ ইংরাজি ১৩ই মে ১৯৩৪ বৈকাল ৬টা ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়ে একটি অমান্ত হইতেছে। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৬টা, কলিকাতায় ৬টা ২৪ মিনিট এবং দিল্লীর ৫টা ৩৯ মিনিট। ঐ সময়ে নিম্নলিখিতরূপ গ্রহ-সংস্থান পাওয়া যায়।

ক্রু ২৯।৫৭	বু ২৯।৩১ র ২৯।৭ চ ২৯।৭ ম ২২।৩১ প্র ৫।৫৬	শু ১৪।৪৯ শ ৪।৪২
কে ২১।৩৮		রা ২১।৩৮
ব ১৬।৪১		

দিল্লীতে ঐ সময়ে ভাবস্ফুট হয় এইরূপ :—

১০ম ৩।১৯।৫৫ ; ১১শ ১০।২১।৫৫ ; ১২শ ১১।২১।৫৫ ; লং ৬।১৮।২২ ; ২য় ৭।১৭।৫৫ ; ৩য় ৮।১৭।৫৫ ;

কলিকাতায় এইরূপ :—

১০ম ৪।১।২০ ; ১১শ ৫।৩।২০ ; ১২শ ৬।৩।২০ ; লং ৬।২৮।১৬ ; ২য় ৭।২৮।২০ ; ৩য় ৮।২৮।২০ ;

অমান্তের এই রাশিচক্রটি রবির বসন্ত বিষুবসংক্রমণের রাশিচক্রের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে এই অমান্তের সময় রবি, চন্দ্র ও বুধ একই অংশে থাকিয়া সংক্রমণ-চক্রের শনির সহিত ঘনিষ্ঠ স্কোয়ার প্রেক্ষা করিতেছে। রবি, চন্দ্র ও বুধ মেষস্থ এবং শনি কুম্ভস্থ। রবি, চন্দ্র, বুধ অমান্তচক্রের সপ্তমস্থ এবং দিল্লী ও কলিকাতা উভয়েই সংক্রমণ-চক্রের একাদশস্থ। শনি দিল্লীর সংক্রমণ-চক্রের অষ্টমপতি হইয়া নবমস্থ এবং কলিকাতায় সপ্তম-অষ্টম-নবমপতি হইয়া অষ্টমস্থ।

অমাবস্যাকালে অষ্টমপতি ও অষ্টমস্থ শনির সহিত রবি, চন্দ্র ও বুধের এই অশুভ প্রেক্ষা কোন দিক দিয়াই শুভ-সূচনা করে না। রাজা প্রজা কাহারও পক্ষে মাসটি সুখের হইবে না—এই মাসটিতে সারা দেশ ব্যাপিয়া একটা অবসাদ ও নৈরাশ্যের স্রোতঃ বহিয়া যাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কি রাষ্ট্রে, কি সমাজে, কি সাধারণ স্বাস্থ্যের ব্যাপারে, কি ব্যবসায়-বাণিজ্যে, সব দিকেই যেন একটা অবসাদ ও নৈরাশ্যের ভাব লক্ষিত হইবে।

এই মাসে রাষ্ট্রের ব্যাপারেও এই অবসাদ লক্ষিত হইবে। গভর্ণমেণ্ট-প্রবর্ত্তিত কোন নূতন আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াও, তাহা দ্বারা যে-রূপ সুফল পাইবার প্রত্যাশা করা হইয়াছিল তাহা পাওয়া যাইবে না। উপরন্তু কোন কোন ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের অর্থের অনটন চলিবে। গভর্ণমেণ্টকে ব্যয়বৃদ্ধির জন্য চিন্তিত হইতে হইবে। মিত্র-রাজদের ব্যাপারেও এই মাসে নানা-রূপ গণ্ডগোল উপস্থিত হইবে, তাহা লইয়া গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তিদের মধ্যে মতভেদ হইবারও সম্ভাবনা আছে। মোট কথা, এই মাসে এমন সকল সমস্যা গভর্ণমেণ্টের সামনে উপস্থিত হইবে, যাহার সমাধানের জন্য গভর্ণমেণ্টকে সকল চিন্তা শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। বস্তুতঃ এই মাসে মিত্র-রাজদের ব্যাপার লইয়া গভর্ণমেণ্ট এবং রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে বেশ একটা তর্কবিতর্ক চলিবে এবং কোন কোন মিত্র-রাজ্যের ব্যাপার সংবাদপত্রে বিশেষ-ভাবে আলোচিত হইবে। মিত্র-রাজদের মধ্যে কাহারও অথবা উচ্চপদস্থ কোন ব্যক্তির মৃত্যুর আশঙ্কাও এ মাসে লক্ষিত হয়। তাহা ছাড়া, উচ্চপদস্থ কোন ব্যক্তির সহিত বা কোন মিত্র-রাজ্যের সহিত গভর্ণমেণ্টের মনোমালিন্য দ্বারা গবর্ণমেণ্টের জনপ্রিয়তা হ্রাস হইতে পারে।

জন-সাধারণের মধ্যেও অবসাদ ও নৈরাশ্যের ভাব প্রকট হইবে। শস্যোৎপাদনের পক্ষে বিঘ্ন হইবে, অর্থাভাবে ও অন্নাভাবে প্রজাসাধারণ ক্লিষ্ট হইবে।

বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি হইবে এবং চাষী ও শ্রমিকদের মধ্যে অন্ন-সমস্যা একটা প্রধান ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে। স্থানে স্থানে ধনী ও শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ দেখা যাইবে এবং শ্রমিকদের কোন বড় ধর্ম্মঘট হওয়াও বিচিত্র নহে। —ধনী ও শ্রমিকদের মধ্যে যে মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহার ফলে উভয়েই যে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। দেশের স্বাস্থ্য মোটেই ভাল থাকিবে না এবং বৃদ্ধ ও শিশুর মধ্যে মৃত্যুহার বৰ্দ্ধিত হইবে। দুর্ভিক্ষের পরিণামে দেশ ব্যাপিয়া নানা মহামারীর প্রকোপ চলিবে। অভাব ও অনশন বা অর্দ্ধাশন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জনসাধারণের মৃত্যুর কারণ হইবে। বস্তুতঃ এ মাসটী সর্ব্বসাধারণের পক্ষে বিভীষিকা-পূর্ণ মাস বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

অন্য দিক্ দিয়াও এ মাসটি শুভ নহে। শিক্ষাবিস্তারে বহু বাধাবিঘ্ন হইবে এবং শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণ-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তাহা ছাড়া, এ মাস কেরাণী বা ঐ শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের পক্ষেও অশুভ, অল্প বেতনের কর্ম্মচারীদের বেতন কমিতে পারে এবং কোন কোন স্থলে—Retrenchment হইয়া তাঁহাদের বেকার অবস্থা উপস্থিত হইতে পারে।

এই মাসে রেলপথে কোন দুর্ঘটনা ঘটিবে এবং সাধারণতঃ ট্রাম, মোটর, বাস প্রভৃতিতে দুর্ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। সাহিত্যের ব্যাপারে কোনরূপ দলাদলি, কোন সাহিত্যিকের বিশেষ অখ্যাতির যোগ এই মাসে লক্ষিত হয়। এই মাসে জাল, চুরি, জুয়াচুরি, বিশ্বাস-ভঙ্গ প্রভৃতি অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার যোগ আছে এবং ইন্‌সিওরেন্সের ব্যাপারে অথবা কোন লিমিটেড্ কোম্পানীর ব্যাপারে বড় জুয়াচুরি প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা আছে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষেও মাসটি শুভ নহে। বিশেষতঃ, বহির্বাণিজ্যের ব্যাপারে নানা-রূপ গণ্ডগোল উপস্থিত হইবে। মালের রপ্তানী বিশেষ কমিবার আশঙ্কা আছে এবং বিদেশী কন্‌ট্র্যাক্ট লইয়া নানা ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হইবে। কোন কোন রাষ্ট্রে মাল চালান করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে, অথবা মাল চালানের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। অন্তর্বাণিজ্যের পক্ষেও জ্যৈষ্ঠ মাস সুবিধার নয়, বিশেষতঃ যে সকল ব্যবসায়ে "ফরওয়ার্ড কন্‌ট্র্যাক্টের" রীতি আছে সেই ব্যবসায়গুলি দস্তুরমত মন্দা চলিবে এবং দালালদের মধ্যে কোন কোন বড় দালালকে কন্‌ট্র্যাক্টের

ব্যাপারে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। ইহা লইয়া কোন বড় মামলা মোকদ্দমার উৎপত্তিও অসম্ভব নয়। ব্যাঙ্কের কাজ খুব ভাল চলিবে না এবং শেয়ার, কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতির দর কমিবার সম্ভাবনা আছে।

স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ইত্যাদিতেও শনির স্পষ্ট অভাব ও অবসাদ লক্ষিত হইবে। এগুলিতেও অর্থাভাবের জন্য কর্ম্মচারীর সংখ্যা হ্রাস করিতে হইবে। কর্পোরেশনের শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ খুব বেশী বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহার ফলে কোনরূপ ধর্ম্মঘট হওয়াও অসম্ভব নহে।

এই মাসে রাজনীতি-ক্ষেত্রের কোন প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তির জীবনের আশঙ্কা আছে এবং সর্ব্বত্র উচ্চপদস্থ বা বিখ্যাত ব্যক্তিগণের নানা-রূপ ঝঞ্ঝাট ও অশান্তির কারণ উপস্থিত হইবে। এই মাসের একটি অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতির মূল্য যথেষ্ট হ্রাস পাইবে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রজাসাধারণের মধ্যে দারুণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইবে. মোটের উপর, এ মাসটিতে বিবাদ ও অবসাদের একটা কাল মেঘ সারা বাংলাদেশটিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে। বৃদ্ধ ও বালকদের পক্ষে মাসটি বিশেষ অশুভ।

এই মাসটিতে পঞ্জিকায় বিবাহের যোগ লিখিত আছে; কিন্তু মাসটি বিবাহের পক্ষে শুভ নহে। বিশেষ করিয়া মাসের প্রথমার্দ্ধটি বিবাহ বা কোন Contract agreement প্রভৃতির ব্যাপারে অনুকূল নহে। এই মাসে অভিজাত সম্প্রদায়ের কোন বিবাহের ব্যাপারে কোনরূপ দুর্দ্দৈব অথবা কেলেঙ্কারি হইবার আশঙ্কা আছে। পঞ্জিকায় শুধু বচন ধরিয়া বিবাহের ব্যবস্থা দেওয়া হয়, যদি গ্রহের অবস্থান দেখিয়া বিচার করিয়া বিবাহের বিধান দেওয়া হইত, তাহা হইলে এ মাসে বিবাহের কোন দিনের উল্লেখ থাকিত না।

আব্‌হাওয়ার ব্যাপারে মাসটির গোড়ার দিকেই আমরা পাইতেছি রবি ও বুধের সহিত শনির অশুভ স্কোয়ার প্রেক্ষা; ইহাতে অনুমান হয় যে, জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে তাপ (Temperature) খুব বেশী না হইলেও, বায়ুতে আর্দ্রতা খুব বেশী হইয়া গুমট গরম হইবে। জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত যেরূপ যোগ চলিয়াছে তাহাতে বিশেষ গ্রীষ্মাধিক্যের সূচনা করে। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গল শনির সহিত অশুভ স্কোয়ার প্রেক্ষা করিবে, ঐ দিনেই সঙ্গে সঙ্গে বুধের সহিত শনির শুভ ট্রাইল-প্রেক্ষাও হইবে; সুতরাং ঐ দিনের পর হইতে গ্রীষ্মের তাপ কিছু কমিবার আশা করা যায়। ২১শে জ্যৈষ্ঠ রবির সহিত বৃহস্পতির শুভ ট্রাইল প্রেক্ষা হইবে এবং ২৪শে জ্যৈষ্ঠ বুধের সহিত বরুণ গ্রহের শুভ সেক্সটাইল সংঘটিত হইবে, কাজেই ঐ সময় তাপ কমিবার সম্ভাবনা এবং বর্ষার পূর্ব্ব-সূচনা দেখা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বাংলাদেশের পক্ষে এই মাসটি দারুণ অবসাদের মাস। যাঁহাদের মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, মকর অথবা কুম্ভ রাশি তাঁহাদের এ মাসে বিশেষ সতর্ক হইয়া চলা দরকার। নূতন কোন কাজে প্রবৃত্ত হওয়া অথবা কোনরূপ পরিবর্ত্তন করা কিম্বা কাহারও সঙ্গে কোন বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হওয়া এ মাসে তাঁহাদের মোটেই উচিত নয়। স্বাস্থ্যের দিকেও তাঁহাদের একটু লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। ঐ সকল রাশির এই মাসে বন্ধু-বিরোধ, আত্মীয়বিচ্ছেদের আশঙ্কা আছে, এবং তাঁহাদের এ মাসে অপর কাহারও জন্য জামিন হওয়া অথবা অন্যরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করা অথবা ব্যবসা সংক্রান্ত চিঠিপত্র লেখা বিশেষ না দেখিয়া শুনিয়া করিলে তাঁহাদের ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা আছে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, গুরুজন, মহাজন কিম্বা অফিসের Superior-এর সঙ্গে ব্যবহারেও তাঁহাদের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

আলোচনা

স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি

মাননীয় প্রবর্ত্তক সম্পাদক মহাশয়,

আপনাদের বিশ্ববিশ্রুত "প্রবর্ত্তকে"র ১৩৩০ সনের চৈত্র সংখ্যায় "শিবরাত্রি" নামক প্রবন্ধে "শিব সত্য এবং সুন্দর" কথাটী পাঠে উহা সম্ভবতঃ প্রচলিত "সত্যং শিবং সুন্দরং" বাক্যের অনুবাদ হইবে, মনে করিয়াছি। অনেক স্থলে ঐ বাক্যটীর আর্ষ-বাক্য বলিয়া প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। দুর্ভাগ্য-বশতঃ ঐ বাক্য কোন উপনিষদাদি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া দেখি যে, শিবপূজা অর্ব্বাচীন ও উহা অনার্য্যাগত বলিয়া শিক্ষিত সমাজ গ্রহণ করিয়াছেন। স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় "অনার্য্যের মহাদেব অনার্য্যের কালী" কথা তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে বহু ব্যক্তি মহেন্দ্রজারোর খননপ্রাপ্ত পদার্থাদির বিবরণলিপি করিতে গিয়া গোলাকার যোনিপ্রতীক ও শিবলিঙ্গাদি যাহা তথায় মিলিয়াছে, তৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, উহা অনার্য্য সভ্যতার অঙ্গীয়। ঐ নগরের সভ্যতা আর্য্যসভ্যতা নহে; আর্য্য-সভ্যতাপ্রাপ্ত অনার্য্যগণের সভ্যতা কি না তাহা কেহ বিবেচনা করেন নাই। শিবলিঙ্গ-পূজা প্রাচীন গ্রীক, রোম, মিশর, বেবিলনেও প্রচলিত ছিল, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। যদি আর্য্য-সভ্যতাসম্ভূত শিবলিঙ্গ-পূজন হয়, তাহা হইলে আর্য্য-সভ্যতা মহেন্দ্রজারোর সভ্যতার পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া পড়ে। ইহাতে অনেকের আপত্তি। মহেন্দ্রজারোর বয়স বর্ত্তমান সময় হইতে ৭।৮ হাজার বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী কালের। বৈদিক আর্য্যসভ্যতা তদপেক্ষা প্রাচীন হইতে পারে কি না, এ বিষয়ে গবেষণা হইতেছে। জিওলজি ও জ্যোতিষের মতে প্রাচীন, ইহা স্বীকার্য্য। তত্রাচ কম্পেরিটিভ ফাইলোলজি, মিথোলজী ইত্যাদির চর্চ্চায় এবং আর্য্যমূলাবাস-বিচারে বৈদিক সভ্যতা অত প্রাচীন নয়, ইহাই প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের মত। কেহ কেহ ঋগ্বেদোক্ত "শিশ্নদেবাঃ" (৭।২১।৫) ও শিশ্নদেবান্ (১০।৯৯।৩) এই দুইটী প্রয়োগ দৃষ্টে বলিতে চাহেন, ইহাই লিঙ্গপূজার দ্যোতক এবং ঋগ্বেদে উহাতে দোষ-দৃষ্টিই দেখা যায়। মহামুনি যাস্ক ও আচার্য্য সায়নাদি উহা পশুবৎ কামপোভোগকারী লিঙ্গপরায়ণ ব্যক্তিগণের অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন। মহাপণ্ডিত কেইথ সাহেব তাঁহার ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ও শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণের অনুবাদের ভূমিকায় (২৬ পৃঃ) লিখিয়াছেন যে, রুদ্রবাচী, ঈশান ও মহান্ দেব শব্দ কৌষিতকীতে থাকায় উহা অর্ব্বাচীন বলিয়া গৃহীত হইবে। যেহেতু উহা যজুর্ব্বেদীয় শতরুদ্রীয় অধ্যায়ে নাই, তৈত্তিরীয় সংহিতায় নাই। উক্ত পণ্ডিত সাহেবের কথা ঠিক নহে। শতরুদ্রীয়ের ৫ অধ্যায়ে ৫৩ ও ৭ অধ্যায়ের ২ মন্ত্রে মাত্র ঈশান শব্দ উক্ত সংহিতার ১৫।৩৫, ১৬।৫৬, ২৪।২৮, ২৫।১৮, ২৭।৩৫, ৩১।২ মন্ত্রেও আছে। যজুর্ব্বেদ সংহিতা ঋগ্বেদ অপেক্ষা অর্ব্বাচীন গণ্য হয়; ঋগ্বেদ বর্ত্তমান কালে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া পাশ্চাত্যগণ বলিতেছেন। সেই ঋগ্বেদে ঈশান ও মহাদেব শব্দ রুদ্রের প্রতিশব্দ-স্বরূপ পাওয়া যায়; ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ১ সূক্তের ৬ মন্ত্রে মহাদেব ও ৩৩ সূক্তে ৯ মন্ত্রে ঈশান শব্দ দ্বারা রুদ্র স্তুত হইয়াছেন। ঈশান, শিব প্রভৃতি ঋগ্বেদে বহু স্থানে আছে। এমত স্থলে রুদ্র-বা-শিবোপাসনা অর্ব্বাচীন অনার্য্যগত বলা সমীচীন বোধ হয় না। রুদ্র বা মহাদেবের শ্বেতবর্ণ ঋক্ (২।৩৩।৮) ঔষধামৃতদাতা ১।১১৪।৫; ২।৩৩।২,৪। অগ্নিই রুদ্র ২।১।৬। জ্ঞানদাতা ১।৪৩।১ স্বয়ম্ভু—৭।৪৬।১ কপর্দ্দী (জটাধারী) ১।১১৪।১

মঙ্গলময় আশুতোষ ১।১১৪।৯ ২।৩৩।৫৭। জগৎপিতা ৭।৪৬।১২ আছে। শুক্লযজুর্ব্বেদে রুদ্রাধ্যায়ে রুদ্রেরই অর্চ্চনাত্মক মন্ত্ররাশি। উহার ৩।৬১ তাঁহার বাসস্থল মুজাবৎ পর্ব্বত লিখিয়াছেন।

শৈবপুরাণে মহাদেব সৃষ্টিস্থিতিবিনাশকর্ত্তা, সগুণ-ব্রহ্ম। বৈষ্ণবপুরাণে শিব সংহারকর্ত্তা। সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশকারী ত্রিদেবের একজন। তিনি মহাকাল, তাঁর ত্রিনেত্র ত্রিকালদর্শনসূচক। অর্দ্ধচন্দ্র মাস-প্রকাশক। গলসর্প সম্বৎসর-দ্যোতক। মুণ্ডমালা ও সর্পবাণ কল্পযুগাদির অবিরত সংসার-চক্রে ঘূর্ণন ও জীবগণের পুনঃ পুনঃ গতাগতির জ্ঞাপক। গঙ্গাবতরণে পৃথ্বী রসাতলগামিনী না হন, তাই শিরে জটা। গলে কালকূট পাপজনিত নীলিমা। ত্রিশূল ত্রিতাপহারক হরের সংহারাস্ত্র। ইত্যাদি বর্ণিত। বেদোপনিষদে যে শিবতত্ত্ব বর্ণিত তাহা অন্যরূপ। শিব শব্দটী শয়নে—যাহাতে সব শয়ান থাকে, অবস্থিত করে। এই ভাবটী নিম্নলিখিত শ্লোকে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় :—

আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা।

আলয়ঃ সর্ব্বদেবানাং লায়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে॥

শিবের ঋগ্বেদে প্রকটিত নাম "রুদ্র"। রোদয়ন্তি অসুরান্ ইতিরুদ্রঃ। অথবা ইন্দ্রিয়মনো-প্রাণাদির উৎক্রমনের দ্বারা রোদনের কারণ হন, এই জন্য রুদ্র।

একোহিরুদ্রোনদ্বিতীয়ায়তস্থুর্যইমাঁল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ। প্রত্যঙ্‌জনাস্তিষ্ঠতি সংচুকোপান্তকালে সংসৃজ্য বিশ্বাভুবনানি গোপাঃ। শ্বেত ৩।২

শিব শব্দ মঙ্গল আনন্দজ্ঞাপক। রসস্বরূপ আনন্দাধার সচ্চিদানন্দ পুরুষ যখন সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিত তখন তিনিই শিব। প্রপঞ্চোপশমং শান্তম্‌শিবমদ্বৈতং (মাণ্ডুক্য)। যদা-তমস্তন্নদিবানরাত্রির্ন সন্নচাসচ্ছিব এব কেবলঃ। শ্বে ৪।১৮

পশুপতিরহংকারাবিষ্টঃ সংসারী জীবঃ স এব পশুঃ (সর্ব্বজ্ঞঃ পঞ্চকৃত্য সংপন্ন সর্ব্বেশ্বর ঈশঃ পশুপতিঃ॥ জাবালি) দেহোদেবালয়ঃ প্রোক্তজীব এব কেবলঃ শিবঃ। ইত্যাদি শ্রুতি শিব কি তাহা নির্ব্বাচন করিয়াছেন।

বর্ত্তমান কালে লোকে এমনি সংসারমোহমুগ্ধ যে, সংহার বা লয়শব্দেই তাহারা সন্ত্রাসিত হয়। তাহাতে যে আনন্দ হয় তাহা বুঝিতেও চায় না। তাই সংহার-কর্ত্তার প্রতীক জানিয়াও তৎপ্রতীকে সৃষ্টি-তত্ত্ব রাখিতে চায়। জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তি ও ধ্যান, সমাধি ইত্যাদি অবস্থা-চতুষ্টয় কল্পিত হইয়া থাকে। মুনিগণ সুষুপ্তি-অবস্থা-দৃষ্টেই ধ্যান-সমাধিদশার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সুষুপ্তি বা গাঢ়-নিদ্রাকালে ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি কারণে লয়-প্রাপ্ত হয়। এজন্য শাস্ত্রে উহাকে দৈনন্দিন প্রলয় বলিয়া থাকে। জাগ্রতাবস্থায় যে সব সুখসম্পদ্ উপস্থিত থাকে তাহা নিরাবিল নহে, কোন না কোন অভাব-বোধ তাহা মলিন করিয়া দেয়। মহারাজাধিরাজচক্রবর্ত্তীও নিজ-দৈহিক, পারিবারিক বা রাজ্যসংক্রান্ত ব্যাপারে কোন না কোন অভাব-বোধে ক্লিষ্ট থাকেন। স্বপ্নে যাহা দৃষ্ট হয় তাহা মিথ্যা, ইহা সর্ব্বসম্মত। সুষুপ্তিকালে নিজ দেহ-গেহ-ধন-যৌবন-জীবন, সূর্য্যচন্দ্রসাগরপর্ব্বতাদি কোন বিষয়ই জাগে না; অথচ নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া সকলেই বলে "বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম।" জাগ্রতের সুখের তুলনায়ই উহা বড় সুখ বলা হইয়া থাকে। সেই বড় সুখের উপভোগের কোন সাথী নাই, অসঙ্গ অবস্থায় সব বিলীন হইলে বড় সুখ, দৈনন্দিন প্রলয়ে বড় সুখ। জীব যখন শিবে লয় হয়, তখন বড় সুখ। এই সুখের অবস্থাদৃষ্টে ধ্যানাবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। ধ্যানে ধ্যেয়বস্তু ব্যতীত অন্য কিছু ভাসে না, তাই জগৎও থাকে না। তখনও বড় সুখ উপভোগ্য হয়। জাগ্রত অবস্থার অর্থ—ইন্দ্রিয়গণের আয়ত্তাধীনতা, ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে বাস, একাদশ ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব। একজনের এগার জন মনিব হইলে যেমনটী হয়, জাগ্রতের ঝালাপালা তেমনটীই বটে। তাই সুষুপ্তির সুখ বড় সুখ। শ্রুতিও বলেন "নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং।" অল্পে সুখ কোথায়? "ভূ" যেখানে "মা" বা নিষেধিত হন, চিত্তে ভাসে না অর্থাৎ যখন জগৎ-সংসার থাকে না, তখনই ভূমাখ্য সুখ। তাই লয়ের কর্ত্তা শিব আনন্দস্বরূপ। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তে সৃষ্টি বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রুতি বলিতেছেন, "তুচ্ছনাভ্যপিহিতং যদাসীৎ তপসা তন্মহিনা জায়তৈকং।"

অর্থাৎ তুচ্ছ মায়া দ্বারা যখন সব আবৃত হইল, তখন তাঁর জ্ঞানময় তপস্যায় এক (প্রথমজ) উৎপন্ন হইলেন। তৎপর শ্রুতি এই আবরণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন

"কামস্তদাগ্রসমবর্ত্ততাধিমনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ সতো বন্ধমসতি" অর্থাৎ প্রথম মায়োপহিত হইয়া তিনি কামনা করিলেন—বহু হইব। তৎপর মায়ার আবরণ-শক্তিদ্বারা আবৃত হইয়া সূক্ষ্ম (ইন্দ্রিয়াদি) মানস সৃষ্টি যখন করিলেন, তখনই অসতের দ্বারা সতের বন্ধন ঘটিল। তৎপর শ্রুতি আরও বলিয়াছেন—"স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিপরস্তাৎ" ইত্যাদি অর্থাৎ যিনি স্বগত ভেদ, স্বজাতীয় ভেদ, বিজাতীয় ভেদ রহিত হওয়ায় অখণ্ডীকৃত স্ব-স্বরূপে স্ব-প্রকারে বিদ্যমান তিনি নিম্নে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি-জন্য দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিত; আর প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা, উপরে ভাসমানা। এই মন্ত্রসকল হইতেই অসৎ রূপা অহি-বেষ্টিত শিবলিঙ্গ। অসতের বন্ধনই নাগপাশ বা সর্পভূষণ; অসতের আচরণই সেই হিরণ্ময় আবরণ বা গৌরীপট্ট—যাহার উন্মোচনের জন্য ঋষি দধীচি দৃষ্ট মন্ত্রসকল ঈশোপনিষদে আছে—হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং তৎত্বম্-পূষন্ অপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে। পূষন্ একর্ষে যম সূর্য্য প্রজাপত্য ব্যূহরশ্মীন্ সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি।" সেই সৎ-স্বরূপ পুরুষই শিব। যখন সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত নহেন তখন শিবও সাপাধিক জীব। এই উপাধিরূপ আবরণের উন্মোচনার্থই সাধন। উপাসনা, ধ্যান ধারণাদির দ্বারা জীবই শিব হন।

মোর পথ

শ্রীনীলিমা দাস

মোর পথ আরো দূর—দুর্গম, দুশ্চর।
সহজের তপস্যায় জীবনের পরম প্রহর
নিঃশেষে ফুরায়ে ফেলা,—নহে, নহে সে মোর কামনা;
ভাগ্যের ভিক্ষুক নহি, অদৃষ্টের করি না অর্চ্চনা।

আকাশ আড়াল করি' তুচ্ছ নীড়ে জীবনের অজস্রতা ব্যয়,
আত্মপ্রবঞ্চনা আর হিংসা-লোভ-দ্বেষ, ক্ষুদ্র ক্ষতি-ক্ষয়—
এদের সবার সাথে একযোগে আপোষ-স্থাপন, সে নহে আমার পথ।
আমি দেখি উন্মুক্ত আকাশ আর প্রাণস্রোতঃ-আবর্ত্তিত পৃথিবী বৃহৎ;
আপন শক্তির বেগে উড়ে' চলি দুই ডানা মেলে';
বিকার, বিভ্রান্তি, ব্যাধি—ঠেলে' চলে' যাই অবহেলে
সংসারের ক্ষুদ্রতার বহু উর্দ্ধে; সংশয়ের, দ্বিধার ও-পারে;
প্রাণ সেথা মুক্তি লভে, আত্মা আপনারে সম্প্রসারে।

শরীরের আগে ঝরে যাহাদের হৃদয়ের রস,
মৃত্যুর দুয়ারে বসে' তারা শুধু স্বপ্ন দেখে জীবনের সুখের দিবস;
ফেলে'-আসা অতীতের ছেঁড়া-স্মৃতি জুড়ে'
তাহারা কবিতা রচে, গান গায় সুকরুণ সুরে;
অবশেষে একদিন মলিন সন্ধ্যায়—
জীবনের অসমাপ্ত সুখ-আশা নিয়ে অবেলায়
ভেঙে' ফেলে নীড়;
তাদের ব্যথায় মোর চিত্ততল বেদনা-অধীর।

তাই, আমি আনন্দের বার্ত্তা বহি মেঘপঙ্কমলিন প্রভাতে,
উৎসবের গান গাহি দুর্য্যোগের রাতে।
দুঃখ, বেদনার সিন্ধু যত হয় উতরোল—দিগঙ্গন ধূমল ধূসর,
জীবনের মহোৎসব তত মোর হ'য়ে ওঠে পরম সুন্দর!

আমি জানি, প্রাণ মোর জ্যোতির্লোকে উর্দ্ধশিখা জ্বলে অবিচল,
রশ্মিহীন সূর্য্যসম অনল-উজ্জ্বল!

সেবার অধিকার সবারই সমান

শ্রীমতী আমেনা খাতুন

[যশোহরের উকিল ও যশোহর মিউনিসিপালিটির ভাইস্ চেয়ারম্যান আবদুল সালাম সাহেবের যোগ্যা সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী আমেনা খাতুন সম্প্রতি যশোহর মিউনিসিপ্যাল ইলেক্‌শনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী উকিল, ভূতপূর্ব্ব মিউনিসিপাল কমিশনার ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সভ্য মৌলভি মোফিজুদ্দিন আহম্মেদ সাহেবকে দুইশত ভোটে পরাজিত করিয়া মিউনিসিপালিটির কমিশনার নির্ব্বাচিতা হইয়াছেন।

ভারতীয় মুস্‌লিম নারী-সমাজের মধ্যে সাধারণ মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন-প্রার্থিনীর জয়যুক্তা হইবার গৌরব বোধ হয় শ্রীমতী খাতুনেরই সর্ব্ব প্রথমে। হিন্দুদিগের তিন চতুর্থাংশ, মুসলমানদের এক চতুর্থাংশ ও সমস্ত নারীর ভোট তাঁর আনুকূল্যে প্রদত্ত হওয়ায় তাঁর লোকপ্রিয়তাই সূচিত করে। যশোহরের বহু সামাজিক অনুষ্ঠানে ও নারী-আন্দোলনের সঙ্গে ইনি সংশ্লিষ্টা।

বর্ত্তমানে লেখিকার বয়স মাত্র ২৬ বৎসর। প্রঃ সঃ]

শ্রীমতী আমেনা খাতুন

মাকে সেবা করিবে মাত্র পুত্র, কন্যা নহে, ইহা কখনও হইতে পারে না। সেই দেশমাতৃকার সেবা করিবার অধিকার পুরুষ ও নারী উভয়েরই আছে। সে অধিকার হইতে নারীকে বঞ্চিত করিয়া দেশের কি লাভ-লোকসান হইয়াছে, তাহার হিসাব-নিকাশের সময় আসিয়াছে। গৃহকোণে আবদ্ধ নারী কদাচিৎ বীরপুরুষের জননী হইতে পারেন। অনেকে মনে করেন যে, গৃহের বাহিরে ঝঞ্ঝা-বাত্যা নারীর জন্য নহে। ঝঞ্ঝাবাত্যা, রৌদ্র-জলে অনেক বৃক্ষ ধ্বংস হইলেও ঐ চারিটী বন্ধুর অভাবে মহীরুহ কখনও জন্মিতে পারে না। সমাজের কুসংস্কারে এই চিরন্তন সত্য এতদিন আচ্ছাদিত ছিল। ভগবানের মহতী ইচ্ছায় আবার সেই সুপ্ত সত্য জাগ্রত হইয়াছে—রক্ষণশীলের তর্জ্জন-গর্জ্জন উহার গতি রোধ করিবে কি করিয়া?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—হিসাব-নিকাশের দিন আসিয়াছে। বাংলার যে কোন প্রতিষ্ঠানের দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায় না কেন, সেই দিকেই দেখিতে পাই দ্বন্দ্ব, কলহ, ভেদাভেদ।

প্রশ্ন হইতেছে—কেন এমন হইল এবং ইহার প্রতিকারই বা কি? এই প্রশ্ন বহু স্থানে বহুদিন হইতে জিজ্ঞাসিত হইয়া আসিতেছে। উহার উত্তরে আমি বলিতে চাই যে, স্বার্থত্যাগই জনসেবার মূলমন্ত্র এবং ঐ স্বার্থত্যাগ যাহার নাই তাহার জনসেবা স্বার্থসেবায় পরিণত হয়।

ফলে আইসে দ্বন্দ্ব, দ্বেষ ও ভেদাভেদ। ত্যাগই নারীর দৈনন্দিন জীবনের প্রধান ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। চিরদিন গৃহ-কোণে তাহার সেবার কার্য্যই করিতে হয়। প্রত্যেক নারীর স্বামী-গৃহ তাহার একটী মিউনিসিপ্যালিটী সদৃশ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান। ঐ প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রভৃতি সমস্ত বিভাগই আছে। ঐ প্রতিষ্ঠানের তিনি একাধারে চেয়ারম্যান, কমিশনার, হিসাবী ও সর্দ্দার। ঐ সমস্ত বিভিন্ন কার্য্যের জন্য তিনি না পান বেতন, না পান মোটরগাড়ী, না পান কোন ভাতা। বরং ঐ কার্য্যের বিনিময়ে তাঁহাকে দিতে হয় স্নেহ ভালবাসা, নিজের বিত্ত, সময় ও স্বাস্থ্য। দিনের পর দিন গৃহকোণে থাকিয়া ঐরূপ সেবাই যাহাদের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম, তাহারা সাধারণ প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিতে অক্ষম, ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

বাংলার সহর ও পল্লীর অনেক সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলি স্বার্থান্বেষীদিগের ঘৃণ্য দলাদলিতে ধ্বংস পাইয়াছে এবং এখনও অনেকে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। এই ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে হইলে, চাই পুরুষের পার্শ্বে নারী-শক্তির অভ্যুত্থান। কলহপ্রিয় সন্তানগণের মধ্যে সাম্য ও শান্তি স্থাপন করিবার শক্তি আছে একমাত্র জননীর। সত্যের সন্ধান-লাভই প্রত্যেক মানুষের প্রধান লক্ষ্য। উহা লাভ করিবার জন্য বিভিন্ন লোক বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন। দেশসেবা বা জনসেবা উহার অন্যতম পন্থা মাত্র। যিনি যে পথই অবলম্বন করুন না কেন, প্রত্যেক পথের পাথেয় যিনি সঞ্চয় করিয়াছেন তিনি পুরুষই হউন আর নারীই হউন, তাঁহার অভিযান জয়যুক্ত হইবেই।

বাহিরের ঝঞ্ঝা-বাত্যা নারীর জন্য নয়—এই আপত্তি অনেকে করেন। বাহিরের ঝঞ্ঝা সহিবার শক্তি অনেক পুরুষ ও নারীর নাই সত্য। যাহাদের ঐ শক্তি নাই তাহারা তো মরিবেই। ঝড় তুফানের ভয়ে কি নারী খেয়ায় উঠিবে না? এপারে শুধু নারীই বসিয়া রাহিবে আর ওপারে যাইবে শুধু পুরুষ? ইহা কখনও ভগবানের ইচ্ছা হইতে পারে না। যত দিন এই সত্য দেশবাসী সম্যক্ উপলব্ধি না করিবে, ততদিন ভারত যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিবে।

ডাকঘর

স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভাপতি ও চন্দননগরের মেয়র শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বসু মহাশয়কে উৎসব সম্বন্ধে তাঁর ৩০।৪।৩৪ ইং তারিখের চিঠিতে লিখিয়াছেন—

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ প্রবর্ত্তিত বাৎসরিক অক্ষয় তৃতীয়ার উৎসবের সাফল্য অক্ষয় হউক; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—যে সার্থকতার অন্তর্নিহিত। দেশের ও সমাজের সার্ব্বজনীন ও সমগ্র মঙ্গলও সেই সার্থকতারই অন্তর্ভুক্ত। [illegible] দ্বাদশ বার্ষিক উৎসবে ইহাই পরম মন্তব্য। ইহা সাধারণ [illegible]—ব্রত উদ্‌যাপন।

কর্ম্মী ও ব্রতীগণের সাধু-[illegible] অক্ষয় ও শ্রীমণ্ডিত হউক।

দেওঘর পিতৃ-প্রাসাদ হইতে অবসরপ্রাপ্ত এডিশনাল ইনস্পেক্টার অফ্ স্কুলস্ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম এ মহোদয় তাঁর ৭।৫।৩৪ ইং তারিখের চিঠিতে সঙ্ঘ-সাধক শ্রীমান রাধারমণ চৌধুরীকে জানাইয়াছেন—

তোমার স্নেহলিপি ও তৎসঙ্গে একখানি 'প্রবর্ত্তক' (বৈশাখের) পাইয়া সুখী হইলাম। * * * 'প্রবর্ত্তক' আমাকে নিয়মিত-ভাবে পাঠাইবে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয়ের দর্শনের ভাগ্য আমার হয় নাই। তবে তাঁহার লেখা পড়িয়া আনন্দলাভ করিয়াছি। তিনি যে সমুদয় লোকহিতকর কার্য্য করিতেছেন তাহার জন্য সকলেরই তিনি শ্রদ্ধার্হ।

"সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়"

"সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় সভার" সভাপতি মহাশয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতার সময়ে সভায় যেন মূর্ত্ত নীরবতা বিরাজ করিতেছিল। তিনি সর্ব্বপ্রথম বলিলেন যে, "সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় সভার" সভাপতির আসন হইতে হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য ও গৌরব সম্বন্ধে আমার বিশেষভাবে বলিবার অধিকার নাই। যদিও আমি জ্ঞান বিজ্ঞানে এবং সাধনায় সম্পূর্ণরূপেই হিন্দু, এবং হিন্দুসমাজ ও ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব প্রচার করাই আমার ব্রত, তথাপি এই ক্ষেত্রে আমাকে সকল ধর্ম্মের সমন্বয়ের কথাই সাধারণভাবে বলিতে হইবে। আমি ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া কৌপীন ধারণপূর্ব্বক ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়াছি। আমি সূর্য্যোদয়ের অনেক পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করি, কিন্তু এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে সনাতন ধর্ম্মের প্রণবধ্বনি আমি ভারতের কোথাও শ্রবণ করি নাই, শুনিয়াছি মুসলমানের আজান। মুসলমানের এই সাধননিষ্ঠা আমি নতশিরে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু হিন্দুর এই জীবনহীনতা আমার প্রাণে নিদারুণ ক্লেশ প্রদান করে।

মুসলমান সম্প্রদায়ের রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা যে-মতই পোষণ করি না কেন, তাহাদের ইসলামের গৌরব-বোধ এবং ইসলামের জন্য তাহারা যেরূপ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত, এই ভাব আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধেয় ও অনুসরণীয়। মুসলমানের ন্যায় খ্রীষ্টানদের ভিতরেও এই নিষ্ঠা ও খৃষ্টের জন্য জীবনোৎসর্গের পরিচয় পাইয়া থাকি। খ্রীষ্টের জীবন তাহাদের আদর্শ। খ্রীষ্টই বস্তুতঃ খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম। আমি যখন খ্রীষ্টের জীবন ও মৃত্যু আলোচনা করি, তখন শ্রদ্ধা-ভক্তিতে আমিও এক প্রকার খ্রীষ্টান হইয়া যাই। খ্রীষ্টের জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে একবার মাত্র ক্ষণিকের তরে একটু দুর্ব্বলতা দেখিতে পাই; তাঁহার শত্রুপক্ষ তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিতেছে, দেহের যন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া একবার মাত্র তাঁহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল—"হে পিতঃ (হে ঈশ্বর)! তুমি কি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ?" ভগবদ্ভাবভাবিত ভক্ত প্রেমভক্তির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিলেও দৈহিক যন্ত্রণাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিতে পারেন না। যিশুর এই দুর্ব্বলতা এই সত্যেরই পরিচায়ক। কিন্তু পরক্ষণে তাঁহার এই দুর্ব্বলতা দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রেমবিগলিত হৃদয়ে তিনি তাঁহার শত্রুদেরও মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন। শত্রুমিত্র নিরপেক্ষভাবে বিশ্বের সকলের মঙ্গল কামনা—ইহাই যিশুর জীবনের পরম সৌন্দর্য্য।

খৃষ্ট বলিতেন, যে পুত্রকে দেখিয়াছে সে পিতাকে দেখিয়াছে। বস্তুতঃ ভগবদ্গত-প্রাণ ভক্তের মধ্যেই সেই অবাঙ্‌মনসোগোচর ভগবানের পরিপূর্ণ প্রকাশ, সেই হেতু খ্রীষ্টানগণ খৃষ্টের মধ্যেই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেন এবং খ্রীষ্টের জন্য তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হন। খৃষ্ট ভগবান ও মানুষের মধ্যে মিলন সম্পাদন করেন। খৃষ্ট ভগবান ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থ।

এই তত্ত্বদৃষ্টিতে খ্রীষ্ট এবং খৃষ্টান ধর্ম্ম অনুধাবন করিলে আমরা সকলেই এই ভাব গ্রহণ করিতে পারি। রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি তৎ-তৎ-পিপাসুদের নিকট এইরূপ খ্রীষ্টস্থানীয়। ভক্তগণ তাঁহাদের মধ্যে ভগবানকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহাদের শরণাগত হইয়া ভগবানকে লাভ করিয়া থাকেন। খৃষ্টভক্ত যেমন বলেন, আমরা খ্রীষ্টের জন্যই প্রাণদান করিতে পারি, সেইরূপ হিন্দুগণ যদি রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ প্রভৃতির জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্ম যথার্থ জাগ্রত হইতে পারে, হিন্দুসমাজের এই অবসাদ দূরীভূত হইতে পারে।

মুসলমান ও খ্রীষ্টান এই উভয়ের মধ্যে আমরা এই Bull-dog will দেখিতে পাই। মুসলমান নির্ব্বিচারে মহম্মদের উপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক জীবন পরিচালনা করেন, কোরাণের বাণী আধুনিক বিচারপ্রণালীতে পর্য্যালোচনা করিতে তাঁহারা নারাজ। মহম্মদ যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহাই তাঁহাদের নিকট ভগবানের বাণী, মহম্মদের নামে ও তাঁহার উপদেশের অনুসরণে তাঁহারা সকলই করিতে প্রস্তুত।

বস্তুতঃ এই প্রকার ইষ্ট-নিষ্ঠা ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা সমাজ বা সম্প্রদায় উন্নতি লাভ করিতে পারে না। শুধু বুদ্ধি দ্বারা সমন্বয়ের তত্ত্ব বুঝিলে বা মুখে সমন্বয়ের কথা বলিলে যথার্থ সমন্বয় হয় না। নিজের ইষ্টের প্রতি সর্ব্বাঙ্গীন নিষ্ঠা ও প্রেম প্রতিষ্ঠিত হইলেই এবং তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিলে ক্রমশঃ অন্তঃকরণ উদার হইতে উদারতর ভূমিতে আরোহণ করে এবং তখনই রামকৃষ্ণের উপদিষ্ট সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় উপলব্ধি করিবার অধিকার হয়। নিজের গুরু ও শাস্ত্রের প্রতি অটল বিশ্বাস, সমস্ত জীবন দ্বারা তাঁহাদের বাণীর অনুসরণ, জীবনের সকল বিভাগে তাঁহাদের উপদিষ্ট তত্ত্ব প্রয়োগ ও উপলব্ধি করার চেষ্টা—ইহাতেই ধর্ম্মকে জীবন্ত করে এবং ধর্ম্ম তখন যথার্থ প্রাণের জিনিষ হয়। ধর্ম্ম শুধু বুদ্ধির ব্যাপার নয়, Philosophy নয়, ধর্ম্ম প্রাণের জিনিষ, Realisation হইলেই বাক্যের ভিতরে শক্তি সঞ্চারিত হয়। প্রত্যেক

ধর্ম্মই এই প্রকার Realisation-এর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই হেতুই প্রত্যেক ধর্ম্মই সত্য। প্রত্যেক ধর্ম্মই মানবজীবনের সম্যক্ চরিতার্থতা-সাধনের এক একটি বিশিষ্ট পথ।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ প্রত্যেক ধর্ম্মের সাধনায় বিধিপূর্ব্বক দীক্ষিত হইয়া প্রত্যেক ধর্ম্মের অন্তরনিহিত সত্য ও বৈশিষ্ট্য নিজের জীবনে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

আমাদের হিন্দু-সাধনায় মানবজীবনে পরমপুরুষার্থ সম্বন্ধে একটা মতবাদ যুগযুগান্ত ধরিয়া প্রচারিত হইয়াছে। সেইটীর নাম মোক্ষবাদ বা নির্ব্বাণবাদ। সংসার দুঃখময়, এই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি চাই, তজ্জন্য সংসারের সর্ব্ববিধ ব্যাপার সম্বন্ধে ঔদাসীন্য অবলম্বনপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে নির্ব্বাণ বা মোক্ষ লাভ করিতে হইবে। এই মতবাদটী আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতার অন্যতম কারণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই মতবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। মানবতার প্রতীক অর্জ্জুন—যাহাকে অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার নূতন জীবন্ত ভাগবৎ-ধর্ম্ম ভারতে প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তিনিও সেই মোক্ষবাদের প্রভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে এই সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণকর ভাগবৎ ধর্ম্মের তত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মুখ হইতে গীতা-শাস্ত্রের আবির্ভাব। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, যে পাণ্ডবদিগকে যন্ত্র করিয়া তিনি এই মহাভারত প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহারাও শেষে সেই মোক্ষবাদের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। যুধিষ্ঠিরের অনুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-সখা অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

ভগবান্ বুদ্ধ সেই নির্ব্বাণবাদ ও অহিংসাবাদই প্রচার করিলেন। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর রামকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেই সর্ব্বাঙ্গীন ধর্ম্ম অভিনব আকারে নিজের জীবনে প্রতিফলিত করিয়া প্রদর্শন করিলেন। মোক্ষের কামনায় ব্যাকুল হইয়া শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) যখন তাঁহার নিকটে উপনীত হইলেন এবং সমাধিগর্ভে চিরনিমজ্জিত হইবার প্রার্থনা জানাইলেন, তখন তিনি বলিলেন, "আমি ব্রহ্ম, তুই কালী, আর তুই কালী আমি ব্রহ্ম"—নরেন্দ্রকে তিনি সমাধির আস্বাদন করাইলেন। কিন্তু সমাধিতে ডুবিয়া যাওয়া অপেক্ষা নারায়ণ-বোধে সকল জীবের সেবা-দ্বারা জীবন সার্থক করা আরও উচ্চতর আদর্শ বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াও সংসারের প্রতি ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন নাই। সাধারণতঃ লোকে তাঁহার কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগের কথাই আলোচনা করে। কিন্তু সন্ন্যাসের পরেও, তিনি যে দাম্পত্য জীবনের এক মহান আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য কেহ অনুধাবন করে না। পরমহংস রামকৃষ্ণ তাঁহার স্ত্রীকে নিজের সন্নিধানে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহাকে সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করিলেন। স্ত্রীকে কামিনীরূপে বা ভোগের উপকরণ-রূপে শয্যা-সঙ্গিনী করিবার জন্য বিবাহ নয়। এবং এইরূপ ব্যবহার স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে প্রেমের পরিচায়কও নয়। যাহাকে যথার্থ ভালবাসা যায় তাহাকে ভোগের উপকরণ করিবার প্রবৃত্তি হয় না। স্ত্রীর প্রতি যখন যথার্থ প্রেম জন্মে, তাহাকে কামিনী-দৃষ্টিতে দেখিতে ইচ্ছা হয় না, ভোগের জন্য তাহাকে স্পর্শ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না। নিজের জীবনটীকে যেমন ভাগবৎ জীবনে পরিণত করা আবশ্যক, ধর্ম্মসঙ্গিনী স্ত্রীকেও সেই ভাগবৎ জীবন-সাধনায় দীক্ষা ও শিক্ষা প্রদান স্বামীর প্রকৃত প্রেমের পরিচায়ক। শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজের স্ত্রীকে এই-ভাবে সম্পূর্ণরূপে আপনার ধর্ম্মে দীক্ষা ও শিক্ষা প্রদান পূর্ব্বক গার্হস্থ্যধর্ম্মের সুমহান্ আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন।

সন্ন্যাসের সহিত গার্হস্থ্যের, জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের, ইষ্টনিষ্ঠার সহিত সার্ব্বজনীনতার জীবন্ত সমন্বয় শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার সাধনা ও উপদেশের ভিতরে সর্ব্বাঙ্গীন সামঞ্জস্যের সহিত প্রদর্শন করিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার পর শ্রীযুত ডাঃ বৈদ্যনাথ রায় মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তৎপর সভার কার্য্য শেষ হয়। এই সভায় সর্ব্বশ্রেণীর প্রতিনিধিস্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। এইরূপ শিক্ষিত সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোকের একত্র সমাবেশ শীঘ্র বড় দেখা যায় নাই। *

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে মৈমনসিংহ সূর্য্যকান্ত টাউনহলে "রামকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠানের" উদ্যোগে যে "সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় সভার" অধিবেশন হয়, সেই সভার সভাপতি শ্রীমতিলাল রায়ের অভিভাষণের সারমর্ম্ম স্থানীয় "চারুমিহির" পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।

— প্রবাহ —

জার্ম্মানীর অন্তরালে—

দূর হইতে সব-চেয়ে বড় যে বৃক্ষটি তাই-ই পড়ে প্রথম চোখে, তার নীচে যে আছে অসংখ্য গুল্ম-লতা, সংখ্যাহীন ভাবী মহীরুহের শিশু-চারা, তা দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। হিটলারের প্রোজ্জ্বল জীবন্ত ব্যক্তিত্বের আব্‌ছায়ায় আজ জার্ম্মানীর কোণা-কাঞ্চিতে যে অন্ধকার উপেক্ষিত, সংগোপিত, কে জানে তা একদিন বর্ত্তমানের আলো গ্রাস করিয়া ছাইয়া ফেলিবে কি না সারা জার্ম্মানীকে!

জার্ম্মানীর নূতন শ্রমিক আইন-কানুনের ধারা দেখিয়া স্বভাবতঃই মনে হয়, শক্তির মোহ-গর্ব্বে হিটলারের জার্ম্মানী তার মূলনীতি হইতে ক্রমশঃ সরিয়া দাঁড়াইতেছে। জার্ম্মান ফ্যাসিজমের স্ব-রূপ যে কি তাহা আজিকার নিত্য পরিবর্ত্তনশীল হিটলারী শাসনতন্ত্রের কার্য্যকলাপ হইতে বাছিয়া লওয়া মুস্কিল।

অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া জার্ম্মনীর পতিত শ্রমিক-শূদ্র যে সুবিধাটুকু অর্জ্জন করিয়াছিল তাহা হিটলারী আমলে অবসান-প্রায়। শ্রমিক হারাইয়াছে তার সমস্ত ক্ষমতা—সংহতি-সৃজনের, সমবায়-সংগঠনের, ধর্ম্মঘটের। ফ্যাক্টরীর যে মালিক সে হইয়াছে বা হইতে চলিয়াছে আবার সর্ব্বময় প্রভু (der Führer); শ্রমের কড়ি, কাজের সময়—সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হইবে মালিকের ইচ্ছায়। গবর্ণমেণ্টের ট্রাষ্টী'র উপর পরিদর্শনের ভার তাহাও নাম মাত্র; কার্য্যতঃ ইহা শ্রমিকের স্বার্থ যে কতটুকু দেখিবে তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। সেই পুরান ধনতন্ত্রবাদের পুনরভ্যুথানের সূচনা আবার জার্ম্মানীতে হইতে চলিয়াছে। হিটলারের মতিগতি নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করিলে, হিটলারী ফ্যাসিষ্ট আদর্শবাদ দুনিয়াব্যাপী ছড়াইয়া দিতে তাঁর পশ্চাতে আছে যে ধনিকের প্রভাব—এ অনুমান ভিত্তিহীন নয় বলিয়াই বোধ হয়।

দরিদ্র জার্ম্মানী, দীর্ঘদিনের উপেক্ষিত জর্ম্মানী জমিদার ধনীর প্রভাব-মুক্ত হইয়া চাহিয়াছিল আত্ম-নিয়ন্ত্রণ; ন্যাশনাল সোস্যালিষ্টের প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইয়া এই অবহেলিত শূদ্র জার্ম্মনীর স্বার্থ-সংরক্ষণার্থ হিটলার দিনের পর দিন যে সকল বক্তৃতা দিয়াছেন তাহারই ফলে সে হইয়াছে আজ যাহা তাই।
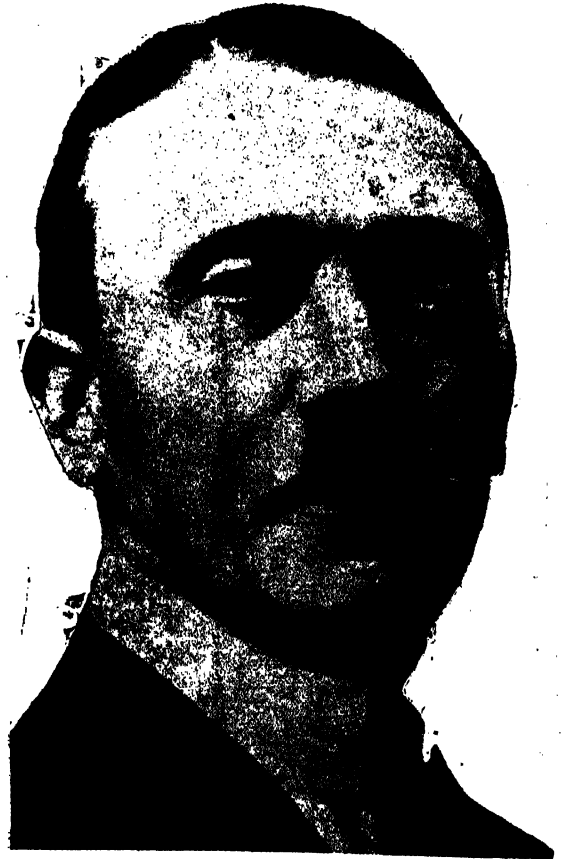
হার হিটলার

তাই মনে হয়, সোস্যালিষ্ট আদর্শবাদী জার্ম্মান-সর্ব্বসাধারণ স্বেচ্ছায় হিটলারের এই অনুজ্ঞা মানিয়া লইবে না,—এখন লইলেও দু'দিন আগে-পরে জার্ম্মানীর শ্রমিক

বিদ্রোহ অনিবার্য্য। এ সুপ্ত আগুন জ্বালাইয়া রাখিবার জন্য এখনও জার্ম্মানীতে প্রকাশ্যভাবেই প্রায় একলক্ষ কমিনিউনিষ্ট আছে। শাসকের প্রতি যদি শাসিতের শ্রদ্ধা-নতি না থাকে, সে গবর্ণমেণ্টের ভিত্তি যে খুব পাকা নয় তা' জীবন্ত মানুষের ইতিহাসেরই অভিজ্ঞতা।

ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ্‌গণের গৃহযাত্রা—

ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা ও শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে বিলাত হইতে যে অভিজ্ঞ বার্ত্তাবিশারদের কমিটী নিয়োজিত হইয়াছিল, তাহার সদস্যগণ সম্প্রতি কার্য্য-শেষ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে ইংলণ্ড হইতে আসিয়াছিলেন ডাঃ এ, এল, বোলে ও অধ্যাপক রবার্টসন এবং তাঁহাদের পরিদর্শন-কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন মাদ্রাজের ডাঃ থমাস, বোম্বাইয়ের মিঃ ঘোষ ও পাঞ্জাবের মিঃ কজল। এই কমিটীর সদস্যগণ ভারতের ছয়টি প্রধান প্রদেশ ও সতরটি সহরে গমন করিয়া সকল অবস্থা স্বচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। এত ঘটার ফল ভারতবাসীর যদি হাতে-পায়ে ভোগ করিবার সৌভাগ্য পায়, তবেই এই বিপুল অর্থ-ব্যয়ের সার্থকতা হইবে।
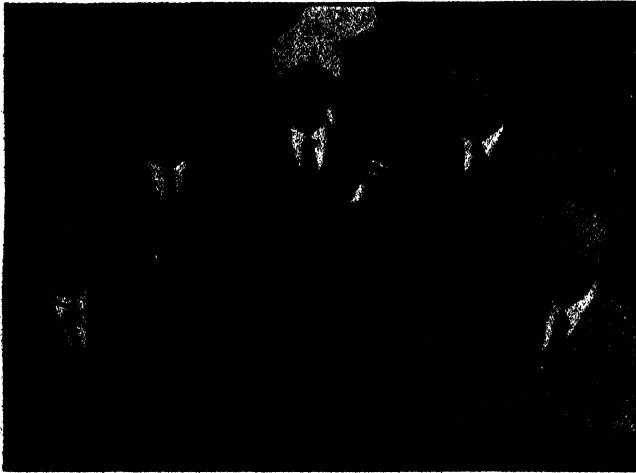
ডাঃ বোলে, ডাঃ থমাস, মিঃ ঘোষ, মিঃ কজল অধ্যাপক রবার্টসন

বিমান জগতের বিস্ময়-বার্ত্তা—

ইংলণ্ডের বিশ্ব-বিশ্রুত বিমানবীর ক্যাপটেন জি, পি অলে সম্প্রতি তাঁর সুদীর্ঘ বিশ বছরের বিমান-চালনার অদ্ভুত অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর, কল্পনার চেয়ে সুদূরপ্রসারী অথচ বাস্তব সত্য।

১৯১৫ সালে তিনি সর্ব্বপ্রথম আমাদের পৃথিবীর মাটি ছাড়িয়া শূন্যে অভিযান করেন এবং সেই হইতে বলিতে গেলে তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই ধরণীর বহু উর্দ্ধে কাটিয়াছে। কত আপদ্-বিপদ্, কত নৈসর্গিক অজানা বিস্ময়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তিনি অর্জ্জন করিয়াছেন!

মিঃ জে, পি, অলে

এই দীর্ঘ বছরের প্রায় দশ হাজার ঘণ্টা ক্যাপটেন আকাশের গায়ে ভাসিয়া বেড়াইয়াছেন ও প্রায় দশ লক্ষ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছেন অর্থাৎ আমাদের পৃথিবীকে চল্লিশ বার প্রদক্ষিণ করিয়াছেন। তিনি তিন হাজার বার আকাশ-পথে ইংলিশ চ্যানেল পারাপার করিয়াছেন ও প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার যাত্রী নিরাপদে বহন করিয়াছেন। ১৯১৯ সালে লণ্ডন-প্যারিস বিমান-পথ প্রতিষ্ঠিত হইলে, ক্যাপ্টেন অলে ছিলেন প্রথম বিমান-চালকদিগের অন্যতম।

ব্রিটিশ ইম্পিরিয়াল এরায়-ওয়েজের দৃঢ়-প্রতিষ্ঠা ও আধুনিক বিমান চালনার উন্নতির ইতিহাসে তাঁর অবদান যথেষ্ট।

জাপ-ভারত বাণিজ্য-সন্ধি—

দীর্ঘদিন কথা-কাটাকাটি ও আলাপ-আলোচনার পর ১২শে এপ্রিল জাপ-ভারত বাণিজ্য-সন্ধি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। জানুয়ারী মাসের প্রথমে যে চুক্তি উভয় দেশের মধ্যে স্থিরীকৃত হইয়াছিল, এই সন্ধি-পত্রে তাহাই অনুমোদিত হইয়াছে। "হোয়াইট হলের" চরম অনুমোদন মাস-খানেকের মাঝেই পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বোম্বাইয়ের মিঃ এইচ, পি, মোডি ও জাপানী বে-সরকারী প্রতিনিধিদলের নেতা মিঃ কে, কুরাতা

এই চুক্তি সম্বন্ধে এসোসিয়েটেড চেম্বার অফ কমার্সের ৮ই জানুয়ারী তারিখে কলিকাতায় যে বাৎসরিক অধিবেশন হয়, তাহাতে ভারতের বড় লাট বাহাদুর মত প্রকাশ করেন যে—

"In a year that has been remarkable in more ways than one in the commercial history of India, no event has greater significance than the negotiation by Indias' own representatives, and in India, of an agreement governing her relations with an important foreign power."

নূতন টেরিফ নিয়ম ও জাপ-ভারত চুক্তি সম্বন্ধে—দিল্লীর বণিক্ সম্প্রদায় প্রতিবাদ জানাইয়া বলিয়াছিলেন—

"Neither the Indian Government nor the Indian mill-owner has any reason to congratulate himself on this very one-sided agreement. Another respect wherein the agreement adversely affects a very important section of Indian commerce, is that it continues to severly penalise to a point, almost to extinction, India's important trade in piece-goods, including embroidered goods from other countries."

এই চুক্তি সম্বন্ধে বিলাতী সংবাদপত্রের অভিমত :—

"The new Indo-Japanese commercial agreement is of much importance to the Lancashire cotton trade."......*Manchester Guardian.*

"It is a mistake to found on the Indo-Japanese Agreement hopes for Lancashire. The Indian, rather than the Lancashire, mill-owner is intended to be the principal beneficiary."—*The Times.*

অন্যান্য সংবাদপত্রের অভিমত :—

"It marks a milestone in India's History. This is the first time that a commercial agreement has been predominantly thrashed out by India for India alone." *Times of India, Bombay.*

* * * *

"An evil, as the Indo-Japanese Pact is, however necessary, it is most likely to create a worse evil with regard to Lancashire inroads into India." *The Bombay Chronicle.*

"The agreement definitely helps the Indian cotton-grower.......From reciprocal arrangement on this basis India, Japan and Britian all stand to gain." *The Statesman, Calcutta.*

জাপ-ভারত চুক্তির অন্তরালে আছে ল্যাঙ্কাশায়ারের স্বার্থ। বাণিজ্য-জগতে নবীন জাপানের প্রবেশ ও অভ্যুদয় সাগরপারের সকল দেশের ব্যবসায়ীদিগকেই তাক্ লাগাইয়াছে। জাপ-ভারত-ল্যাঙ্কশায়ার চুক্তি তাই প্রতিদ্বন্দ্বী মনোবৃত্তির চরম অসহায় অবস্থা। ভারতের পক্ষে সোজা হিসাব এই যে, ভারতে মোটামুটি ৩,৬০০ মিলিয়ন গজ মিল-জাত বস্ত্র বছরে ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে ১৯৩২ সালে ভারতীয় মিল-সমূহেই ৩,২০০ মিলিয়ন গজ

কাপড় উৎপন্ন হইয়াছিল। জাপ-ভারত চুক্তি মতে ৪০০ মিলিয়ন গজ জাপান হইতে আমদানী হইতে পারিবে। এইরূপ অবস্থায় যদি ল্যাঙ্কাশায়ারও বস্ত্র প্রেরণ করে, তবে ভারতীয় মিলগুলিকে বাধ্য হইয়াই তার উৎপন্নের হার কমাইতে হইবে। অথচ ল্যাঙ্কাশায়ার ভারতীয় তুলা-খরিদেরও কোন নিশ্চিত সর্ত্তে আবদ্ধ হইতেছেন না। অটোয়া-চুক্তিও বিফল হইয়াছে। আসলে নিজের দেশের বস্ত্র-শিল্পের ক্ষতি না করিয়া ভারতের পক্ষে বিদেশ হইতে বস্ত্র আমদানী করা সম্ভব নয়।

যমের দুয়ার—

আধুনিক জগতের প্রমোদ-কেন্দ্রগুলির চাকচিক্য ও বাইরের মনোহর দিক্‌টাই সাধারণতঃ চোখে পড়ে। ইহার অন্তরালের সংগোপিত আঁধার মানব-সমাজের উপর অজ্ঞাতে যে কি বিভীষিকাময়ী ধ্বংসের পদ

প্রেক্ষা-গৃহের রুদ্ধ-আব্‌হাওয়া-ক্লিষ্টের পরিণতি চিত্র

সংগোপনে সঞ্চার করিয়া চলিয়াছে, তাহা অগভীর জন-সমাজের এক-রূপ অজানাই থাকিয়া যায়। লণ্ডনের ন্যাশনাল এসোসিয়েশান অফ্ থিয়েট্রিক্যাল এমপ্লয়িজের সাধারণ সম্পাদক মিঃ টি. ও. ব্রিমেন লণ্ডনের চলচ্চিত্রের পর্য্যালোচনা-প্রসঙ্গে এই সম্বন্ধে গুটিকতক মূল্যবান্ কথা বলিয়াছেন।

উজ্জ্বল বিচিত্র রংয়ের আলোকমালার পরিশোভা, চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞাপন, নয়ন-বিমোহন ছবি, কামোদ্দীপক নারী-পুরুষের অঙ্গভঙ্গীর অশ্লীল প্রতিচিত্র, অজ্ঞ বিস্মিত জনতার উদ্দীপনার জোয়ার—সিনেমার বহির্ভাগের দৃশ্য, আর অন্তরালে তার চির-অন্ধকার, রুদ্ধ-বিষাক্ত বায়ু ও অপবিত্র আব্‌হাওয়া! অধিকাংশ চলচ্চিত্রেরই আজ এমনি অবস্থা।

অবশ্য প্রথম শ্রেণীর আধুনিক সিনেমাগুলির কথা স্বতন্ত্র। তৃতীয় শ্রেণীর পুরোণো প্রেক্ষাগৃহগুলি যমের সদর-দুয়ার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এইগুলির যে আভ্যন্তরিক অবস্থা কি, তাহা লোকচক্ষুর সাম্‌নে ধরিতেও ইহার কর্ত্তৃপক্ষ গররাজী।

'আবর্জ্জনার কীটের সঙ্গে বাস কর'—এমনি ধরণের বহু সতর্ক-বাণী ওয়েলসের স্বাস্থ্যবিভাগ সেখানকার বাজে সিনেমা-গৃহের দেউলে লিখিয়া রাখিয়াছে অবিবেচক জনসাধারণকে সতর্ক করিবার জন্য।

সিনেমা-গৃহগুলিকে স্বাস্থ্যকর করিবার প্রতি খুব কমই দৃষ্টি দেওয়া হইয়া থাকে। জন দুই লোক এত বড় গৃহটিকে ঘণ্টা দুই সময়ের মধ্যে পরিষ্কার করিয়াই সকল কর্ত্তব্য শেষ করে।

কোন্ মান্ধাতার আমলে সেই যে বসিবার কুশন তৈরী করা হইয়াছে তাহা আর ধুইবার নাম নাই —ঝাড়ুনি দিয়া ঝাড়া ছাড়া সাবান-জল বা অন্য কোন প্রকারে পরিষ্কৃত করিবার নাম-গন্ধ নাই। ঐগুলা হয় ছারপোকার বাসা, রোগ-বীজাণু-প্রসারের পথ হয় সহজ। কিন্তু তা খেয়াল করে কে? কার্পেটগুলিরও ঐ একই অবস্থা!

এইরূপ অস্বাস্থ্যকর সিনেমায় যারা চাকুরী করে তাদের প্রায়ই পীড়িত হইতে দেখা যায়। দুই তিন মাস বা সপ্তাহের মধ্যেই বাজে চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী গল-ক্ষত বা টনসিলাইটিস্ প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়। দর্শকদের মধ্যে যারা ঘন ঘন বায়স্কোপ দেখে, তারাও এই সকল ব্যাধি হইতে মুক্তি পায় না। অভিনেতা বা

অভিনেত্রীদের মধ্যে সপ্তাহে যে কয়জন মূর্চ্ছা যায় বাইরের কয়জন সে খবরই বা রাখে! তারপর শৌচাদির ব্যবস্থাও প্রায়ই অতি জঘন্য। রোগ-ব্যপ্তির শত দরজা সেখানে উন্মুক্ত। পুলিশও এ সব দিকে বেশী নজর করে না—হাঁ করিয়া ছবিই দেখে।

সবাক্ চিত্রের প্রশংসা আজ সকলের মুখে মুখে। কিন্তু এর খারাপ দিক্‌টা কেউ ভাবিয়া দেখে না। ছোট্ট একটি ঘর, তার মধ্যে 'লাউডস্পীকারের' ঘরময় প্রতিধ্বনি; গুমোট-গরম হাওয়া—ক্রমাগত কিছুদিন এই অবস্থার মাঝে সিনেমা দেখিলে ভাল মানুষেরও মস্তিষ্ক বিকৃত না হইয়া পারে না। এখনও ইহা অনেক উন্নতি-সাপেক্ষ।

কারখানা-শিল্পের ব্যারামের মধ্যে এই সবকে গণ্য করা উচিত।

এনাৎগঞ্জ

(গল্প)

(১)

"বাপ পিতামোর কৃত দুইশত বিঘা জমি আর পাঁচটী হাজার নগদ রৌপ্য মুদ্রা! আমি যাব রোদে-জলে মাঠে হাল চষ্‌তে?

না—আদরের মানিক সুবলকে দেবো কুলি মজুরের মত গায়ে গতরে খেটে উপায় কর্‌তে! বলে কি আবাগের বেটা ভূতেরা! সহর ছেড়ে গাঁয়ে এসেছে লেক্‌চার দিতে! ছুঁচো বেটাদের উঠ্‌ খেতে খুদ নেই, করে আর কি—কথায় আছে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান; এখন দেখ্‌ছি. পরের ঘাড়ে কাঁঠাল ভেঙ্গে, বনের নয়, ঘরের ছেলের মাথা বিগ্‌ড়ে দেওয়া। কোম্পানী এ বেটাদের আট্‌কায় না কেন?"

সতীশ চক্রবর্ত্তী ঘন ঘন তামাক টান্‌তে টান্‌তে গজ্‌ গজ্‌ করে' কথাগুলো আওড়ে যাচ্ছিল। কালই হয়ে গেছে, গাঁয়ে একটা বেকার সমস্যা নিয়ে মিটিং—ইহা তারই জের। উঠানে গাদা দিয়ে মাঠের ফসল জড় হয়েছে নানান রকমের। কাঁটা বসেছে। ওজন হচ্ছিল বাণ্ডিল-বাঁধা পাট্। এনাতুল্লা হেঁকে বল্‌লে—"সাড়ে বার মণ পাট হ'ল, বাবু। এইবার টাকার হিসাবটা করে' ফেলুন।"

চক্রবর্ত্তীর এক দূরসম্বন্ধীয় শ্যালক রমাকান্ত সঙ্গে সঙ্গে বলে' উঠল—"সাড়ে বার মণ কি রে? এগার মণ আঠার সের দু ছটাক।" এনাতুল্লা খিঁচিয়ে বল্‌লে, "হাঁ, হাঁ, ঐ সাড়ে বার মন। কাঠ-ফাটা রোদে একগলা পচা-পুকুরের জলে দাঁড়িয়ে, এই উপার্জ্জনের কড়ি কমিয়ে লাভ কি হবে, কর্ত্তা? ঐ সাড়ে ১২ মনই ধরা হোক।"

কর্ত্তা খাট-গলায় বল্‌লে—"অধর্ম্মের কড়ি থাকে না, আনাতুল্লা। খাঁটী পথে চল্‌বি, ফাঁকি দিতে নেই। ও রমা, কত বল্‌লি—এগার মণ আঠার সের দু ছটাক?

ঐ এগার মণে হ'ল ৮৮৲ টাকা, এই আঠার সেরে গোটা দুয়েক টাকা ধরে' দে, মোটামুটী ৯০৲ টাকা। ভাগের অর্দ্ধেক গেলে বাকি ৪৫৲; খোরাকী নিয়েছে ৩৷০ টাকা, তার দরুণ বাদ যাবে ওরই ডবল ৭৲। বলদের দরুণ কাটান দে গোটা আষ্টেক টাকা। তবেই তোর দাঁড়াল—পাওনাগণ্ডা ৩০৲টী টাকা। আমার কাছে চুরি জোয়াচুরি নেই বাপু!"

এনাতুল্লা 'হাঁ' করে' বসে' পড়্‌ল। সে এই ১২মণ পাট মাটীর বুক চিরে' বার কর্‌তে শরীরের রক্ত অকাতরে ঢেলেছে; কাঠ-ফাটা রোদে মাথা ঠিক্‌রে পড়েছে, সে তবু হাল ছাড়ে নি। মণ্ডলদের কলাবাগানের পাশের

জমি-টুকু সেরে' তবে সে বাড়ী ফিরেছে। পাট পচার গন্ধে সে বিরক্ত হয় নি; কেন না, এই সম্পদটুকুই তার সারা বছরের আশা। ভীষণ জ্বর নিয়েও সে পচা ডোবায় গিয়ে নেমেছে পাট কাট্‌তে, আজ তার মূল্য মাত্র তিরিশ টাকা! সে চুপ করে' বসে' রইল, যেন বজ্রাহত!

উঠানে আরও ছিল অনেক বরগাদার। এনাতুল্লার হিসাব শুনে তাদেরও মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়্‌ল। একজন কপাল কুঁচ্‌কে বলে' উঠ্‌ল, "রেলীর গুদোমে পাট বিকোচ্ছে ১২৲ টাকায়, আপনি কন্ আট টাকা—এ দরে পাট ছাড়্‌ছি না, কর্ত্তা—"

সতীশ চক্রবর্ত্তী—"সে খবর তো আমি জানি না বাপু; তোদের পাট যদি ১২৲ টাকায় বিকোয় আর এক টাকা ধরে' দেবো।"

সে বল্‌লে—"আর এক টাকা কি, কর্ত্তা!"

"তবে কি গুদোমের দরই তোদের দিতে হবে?"

"দিলেনই বা—ঘরে বসে ষোল আনাই তো চুষে খান, গরীবের মজুরীর কি দাম নেই?"

"তোরা বড় নিমকহারাম! জমির আদায়, আগাম পেটে খেয়েছিস্, তার উপর বলদ দিয়েছি—তা' না হ'লে এক পয়সাও পেতিস্ কোথায়?" কথা শুনে সকলেই হাত গুটিয়ে বস্‌ল। গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল। সকলেই মনে মনে হিসাব করে' দেখ্‌লে, পাটের দর চড়া হ'লেও, কিষাণ মজুরের দুঃখ ঘুচবে না। শুধু তো জমির দাবী নয়; মুদীর ঋণ আছে, গত শীতে একটা করে' র‍্যাপার কিনেছিল তারা কাবুলীর কাছে, তার তাগিদ আছে। তারা চোখে আর কিছু দেখ্‌তে পেলে না। সাম্‌নে গাছপালা, ক্ষেত-খামার কিছু নেই—কেবল ধোঁয়া! অবসন্নতায় উঠানের আব্‌হাওয়া যেন এলিয়ে পড়্‌ল। মুখে কথা নেই কারও। এই নিঃশব্দতার মাঝে, কর্ত্তার হুঁকা-টানার শব্দ হচ্ছিল—ফুড়ুক্, ফুড়ুক্, ফুড়ুক্।

(২)

দু' বছর পরের কথা। পাটের দর একেবারেই পড়ে' গেছে। মাঠ ফাট্‌ছে রোদে। কিষাণ মজুর যারা ছিল, তারা সব পালিয়েছে, আসামের জঙ্গলে। সতীশ চক্রবর্ত্তী কিন্তু ভেবেছিল, পাটের দর থাক্‌বে আগের মতই চড়া। ধাঙ্গড় দিয়ে দু-শ' বিঘে জমি চষে' পাট উৎপন্ন ক'রেছিল অনেক। দর শুনে তার বুক গেল ভেঙ্গে। ঘরের কড়ি এমন করে' বেরিয়ে যাওয়া তার জীবনে কখন ঘটে নি।

ছেলে মহকুমা থেকে ম্যাট্রিক দিয়ে কলিকাতার কলেজে গেছে পড়্‌তে। টানাটানির বাজারে মাসিক চল্লিশটা টাকা দিয়েও ছেলের কাছে চক্রবর্ত্তী রেহাই পান না। বিপদের উপর আরো বিপদ্—কোম্পানী থেকে রেজেষ্টারী করা লোন-অফিসে শরৎ উকিলের মতলবে বেশী সুদের লোভে সে জমা রেখেছিল হাজার চারেক টাকা; আর গাঁয়ের কিষাণদেরও দিয়েছিল অনেক টাকা কর্জ্জ—দু-তিন বছর সুদের টাকাতেই তার চ'লে গেছে সংসারের খরচ, এমন সুযোগ সে আর জীবনে কখন পায় নি। তার মনে হয়েছিল, টাকায় টাকা হবে। ছেলেটা পাশ করে' হাকিম হবে। স্বপ্ন তার ভেঙ্গে গেল। সুদ চুলোয় যাক, আসল নিয়েই টানাটানি!

লোন-অফিস বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খাতক যারা তারা বেমালুম দিয়েছে গা-ঢাকা। সতীশ চক্রবর্ত্তীর আর সে চেহারা নেই, রমাকান্তকে সে দিয়েছে বিদায় করে'। গোয়ালে গরুগুলো দু-আঁটী খড় চিবিয়ে হাড়-সার। সংসারে লক্ষীশ্রী আর নেই।

বাহির নাচে হাঁক পড়্‌ল, "কর্ত্তা, কর্ত্তা, বাড়ী আছেন?"

সতীশ বেরিয়ে দেখে—এনাতুল্লা। সে কেঁদে বল্‌লে—"কোথাও গিয়ে সুখ নেই। আসামের জঙ্গল কেটে আবাদ করার চেয়ে নিজের গাঁয়ে বসে' গতর খাটিয়ে খাওয়া ভাল। তাই বলছি কর্ত্তা, জমি তো পতিত আছে, শেয়ালকাঁটা আর উলুখড়ে ছেয়ে যাচ্ছে; দশ বিঘে দাও তো—ঘর সংসার করি।"

সতীশ বল্‌লে—"আমার ত আপত্তি নেই। তোরা সব গেলি পালিয়ে। গাঁয়ের লক্ষ্মী ছিলি তোরা, ফিরে আয়। পাটের দর কমুক, আউস ধান আছে, আক আছে, ভাবনা কি এনাৎ?"

এনাৎ বল্‌লে—"ভাবনা তো আমাদের কিছু নেই, ভাবনা কর্ত্তা তোমাদেরই। গতর আছে, যেখানে যাব

পেটের অন্ন করে' নেবো। ভিটের মায়া ছাড়্‌তে পারি নে, তাই ফিরে আসা। কিন্তু কর্ত্তা, এবার ফসলের আধাআধি বখরা; আর এক টাকা খোরাকী দিয়ে যে দুই টাকা নেবে সেটা হচ্ছে না—"

সতীশ চক্রবর্ত্তী অবাক্ হয়ে এনাতের মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে—"তবে কি?"

এনাৎ বল্‌লে—"জমি চষে' খাবে যে জমি পাবে সে। জমিদারের খাজনা ন্যায্য গণ্ডা দেবো।"

এ কথা এনাৎকে শেখালে কে? সতীশের মনে হ'ল—যেন তার দু'শ বিঘে জমি, গায়ের জোরে বিশ ঘর শ্রমিক কেড়ে নিচ্ছে। জমির উপর তার যে ছিল অধিকার, এ কথা কেউ আর স্বীকার করতে চায় না। সে দেখ্‌লে, জমি আজ আর উপায়ের ক্ষেত্র নয়; উপায় করছে শ্রম, কিন্তু এই শ্রমের শক্তি তার নেই—তার ভবিষ্যৎ বংশেরও যে থাক্‌বে, এ দৃষ্টিও তার ঝাপ্‌সা হয়ে গেল। এনাৎকে সে তাড়াতাড়ি বিদায় করে' দিয়ে, বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করবে, এমন সময়ে পিয়ন এসে এক পত্র দিল। তাতে লেখা আছে, পরীক্ষার ফী জমা দিতে হবে, পত্র পাঠ পঞ্চাশ টাকা পাঠাতে। সতীশ হতভম্ব হয়ে দাওয়ায় গিয়ে বসে' পড়্‌ল। গৃহিণী এসে বল্‌লে—"রাখালটা গেছে চলে', মস্থরালির মাও ধান ভান্‌তে আসে নি, গরুর গোয়াল করে কে। আর আজ ভাত-রান্নাও বন্ধ, ঘরে চাউল নেই এক ছটাকও।"

সতীশ পাগলের মত বলে' উঠ্‌ল—"গতর নিয়ে চিরদিন বসে' থাকা চলে না। ধান ভান্‌বি তুই আর গরু দেখ্‌ব আমি। পড়াশুনোয় ছাই হবে; দুশ' বিঘে জমি রোদে ফাটে, ছেলেগুলো জমি চষুক—তা' না হলে আর রক্ষে নেই।"

গৃহণী অবাক্—মনে হ'ল টাকার শোকে মিন্‌সের মাথা খারাপ হয়েছে।

(৩)

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের পথের ধারে বিঘে পাঁচেক ফালির মত জায়গা ছিল পড়ে', এনাতুল্লা বাঁশ কেটে শোন দিয়ে থাক্‌বার মত ঘর বানিয়ে নিলে—দশ টাকা বছরে খাজনা। দুই জোয়ান ছেলে, আর সে তার নিজের স্ত্রীকে নিয়ে গতর পিষে কয় বছরেই জমিতে ফলিয়ে, তুল্‌ল সোণা। পাশের জমি পড়ে' আছে সতীশের, অনাবাদী হয়ে'! দু-চার বছরের খাজনার দায়ে এবার নিলামে চড়্‌বে। কাজেই সে বিঘা প্রতি দুই টাকা নিয়েই কতক জমি দিলে বিলি করে'। এনাৎ নিলে পঞ্চাশ বিঘে। সতীশ ছোট ছেলে কৃষ্ণচন্দ্রকে আর বিধবা মেয়ে চন্দ্রাকে ডেকে বল্‌লে—"পুঁজিপাঠা গেছে চুলোয়; গতর না খাটালে আর পেটের ভাত জুট্‌বে না। একজন লাঙ্গল ধর্, আর একজন ঢেঁকি নিয়ে পড় দেখি, যদি বাঁচার উপায় হয়।" কেষ্ট কথার জবাব দিল না। চন্দ্রা মুচ্‌কে হেসে সরে' পড়্‌ল। কর্ত্তা দেখ্‌লে অকূল পাথার—নৌকাডুবি হ'তে বেশীক্ষণ নয়।

গ্রীষ্মের ছুটীতে ইয়ার-বন্ধু নিয়ে বড় ছেলে সুবল গাঁ বেড়াতে এসেছিল দু-দিনের জন্য। দুরবস্থার কথা কর্ত্তা তার কাণে দিতে পারে না, ফুরসতের অভাবে। পুকুরে মাছ-ধরা আর দিনে দুপুরে গ্রামোফোণ নিয়ে সময় কাটিয়ে সুবল যখন কলিকাতার দিকে রওনা হয়েছে, তখন সতীশ ছেলের পথ আগ্‌লে বল্‌লে, "ঘরের কথা তো কাণ দিয়ে শুন্‌বি না; কলেজে টাকা পাঠান আর হবে না। তা' কিন্তু বলে দিচ্ছি।"

সুবল পিতার মুখের দিকে কটাক্ষপাত করে' বল্‌লে, "কেন?"

"কেন কি রে? নাচ-দুয়ারে এনাতের বাড়বাড়ন্ত চোখে পড়ে না। তোর বাপের বুক চুষে ওর ওই শ্রীবৃদ্ধি। দুটো 'পাশ' করেছিস্, বিদ্যে হয়েছে। যদি ভিটে রাখ্‌তে চাস্, লাঙ্গল ধর্। কেষ্টা বয়ে গেছে, ও ছোঁড়াটা কোন কাজেই লাগ্‌বে না।"

"Horrible"—সুবল শিউরে উঠ্‌ল। স্পষ্ট জবাব দিয়েই সে বেরিয়ে পড়্‌ল বাড়ীর পগার ডিঙিয়ে পথে। বলে' গেল,—মেজাজ গেছে তার বদ্‌লে। ধূলা-কাদা আর গেঁয়ো হাওয়া তার হাড়ে আর সইবে না।"

সতীশের বুকের রক্ত শুকিয়ে গেল—তার চক্ষের সম্মুখে ফুটে উঠ্‌ল—বিন্‌কী, বিন্‌কী সর্ষে ফুল!

সন্ধ্যা তখন উৎরে গেছে। গৃহস্থের উঠানে দাঁড়িয়ে

গ্রাম্য-বধূরা শাঁক বাজান শেষ করে' হেঁসেলে গিয়ে বসেছে রাঁধ্‌তে। চারিদিকেই ঘুঁটঘুটে অন্ধকার—আর ঝিঁ-ঝিঁ পোকা ডাক্‌ছে গলা চিরে। গোয়ালাপাড়ায় হঠাৎ যেন ডাকাত পড়ার গোল উঠ্‌ল। গৃহস্থেরা সকলে ভয়ে দরজায় খিল এঁটে জড়সড়। ভাবনায়, চিন্তায় সতীশ জ্বর-গায়ে উঠানে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—"চন্দ্রা, দে তো লণ্ঠনটা জ্বেলে, গোলমাল এইদিকেই আস্‌ছে না!"

অপেক্ষা আর করতে হ'ল না। হরি, কেদার, নফর, একদল জোয়ান গোয়ালার ছেলে কাণ ধরে' কেষ্টচন্দ্রকে তার বাপের কাছে হাজির করে' বল্‌লে—"মেরেই ফেল্‌তুম্ পাজি বেটাকে, শুধু বামুন বলেই রেহাই দিলুম। ফের যদি ওমুখো হয় খুন করে' ফেল্‌ব, চক্রবর্ত্তী মশায়।"

কেষ্টচন্দ্রের রগ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে—মার খেয়েছে বেদম। গয়লার পোয়েরা বামুন বলে' একেবারে রেহাই দেয় নি। কেষ্টচন্দ্রের বড় কড়া জান্—তাই রেহাই পেয়েছে, খুনের দায় থেকে তাদেরও বাঁচিয়েছে। গৃহিণী ছিল রান্নাঘরে, ল্যাম্প হাতে কেষ্টার দিকে চেয়েই কেঁদে উঠ্‌ল চীৎকার করে'—"ওরে বাপ্‌রে, ছেলেকে যে তোরা একেবারে খুন করে' ফেলেছিস্!"

ছেলের অপরাধ যত বড়ই হউক এমন করে' চোরের মত তাকে গুঁড়া করে দিয়ে বাপের সাম্‌নে দাঁড় করান, আজ সে বড় দুরবস্থায় পড়েছে বলে'ই গোয়ালা বেটারা এমন কাজ করতে সাহস করেছে। চক্রবর্ত্তী জোরগলায় ব'লে উঠ্‌লেন—"কি করেছে তোদের কেষ্টা! এমন করে' হারভাঙ্গা মার দিয়েছিস্! মরা-হাতী লাখ টাকা—সতীশ চক্রবর্ত্তী এখনও মরে নি।"

নফর বল্‌লে—"কর্ত্তা, কেবল তোমার মুখ চেয়েই আমরা জীয়ন্ত ছেলে নিয়ে এসেছি এখানে, তা'না হলে গর্ত্ত করে' আস্ত পুঁতে ফেল্‌তুম্।"

রাগে সতীশ চক্রবর্ত্তীর সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ করে' কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। আর কেষ্টচন্দ্রকে কাছে এনে ঘটীর জলে তার কপাল ধুইয়ে মা সকলকে বল্‌লে, "ভগবান্ কর্‌বেন বিচার। বাড়ী চড়োয়া হয়ে তোরা কোন্ ভরসায় এসেছিস্, হারামজাদারা!"

কেদার বলে উঠ্‌ল, "আগে শোন তোমার ছেলের কীর্ত্তি। তারপর, মেরো আমাদের মুখে লাথি—কোন কথা বল্‌ব না।"

"কি! কি!! কি!!!?" কর্ত্তার অসহিষ্ণু কণ্ঠ কেঁপে উঠ্‌ল। "সে কথা মুখে আনা যায় না, চক্রবর্ত্তী মশায়!" হরিগোয়ালা সতীশকে একটু আড়ালে ডেকে অনুচ্চস্বরে কেষ্টচন্দ্রের অপরাধের কথাটা দিল বলে'। চক্রবর্ত্তী মশায়ের চক্ষের সম্মুখে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। রাগে তার সর্ব্বশরীর থর থর করে' তখনও কাঁপ্‌ছিল, ছেলের পানে চেয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "হাঁ রে, সত্যি!"

কেষ্টচন্দ্র মাথা নীচু করে' রইল। সতীশচন্দ্রের আর ধৈর্য্য ছিল না। "কক্ষন না, কক্ষন না, তোর ভয় নেই, সত্যি কথা বল্। এখনও সতীশ চক্রবর্ত্তী লাঠী ধরে যদি, দু'শো গোয়ালার মাথা গুঁড়ো করে' দেবো।"

কেষ্টচন্দ্রের চোখে এক ফোঁটা জল নেই। সেও রাগে ফুল্‌ছিল; মাথা তুলে বল্‌লে, "সত্যি; কিন্তু ও শালাদের কি? একদিন শোধ নেবই নোব।"

কর্ত্তা সবিস্ময়ে বল্‌লেন, "সত্যি কিরে? তুই ওই ফুলীর ঘরে কি কর্ত্তে গিয়েছিলি?"

কেষ্টচন্দ্র অধোবদন রইল। কেদার বলে' উঠ্‌ল—"বুঝছেন না, চক্রবর্ত্তী মশায়? আমাদের উপর বড় যে'রেগে গেছ্‌লেন! আপনার ছেলে আপনার কাছে দিয়ে চল্‌লুম। এবার আস্ত পেলেন; ফের যদি হয়, মরা ছেলে উঠানে ফেলে দিয়ে যাব"—এই বলে' গোয়ালারা চলে' গেল।

সতীশ কেষ্টার দিকে কঠোর দৃষ্টিপাত করে' বাড়ীর দরজার দিকে তর্জ্জনী দেখিয়ে দৃঢ় স্বরে বল্‌লেন, "যা বেরিয়ে যা, আর তোর মুখ দেখ্‌তে চাই নে।"

(৪)

কর্ত্তার জ্বর। সংসারে গৃহিণী একা। চন্দ্রা গিয়েছিল কাল সন্ধ্যার পর ঘাটে, সারারাত্রি আর ফেরে নি। কেষ্টাও সেই রাত্র থেকেই বাড়ী-ছাড়া, তার সন্ধানও পাওয়া যায় নি। চক্রবর্ত্তী মশায় চিঠি লিখেছিলেন তার বড় ছেলে সুবলকে, এই দুঃসময়ে বিষয়-সম্পদ্ রাখার পরামর্শের জন্য। কাল তার জবাব এসেছে—"তার এখন ফেরা হবে না। সে অনেক কষ্টে পেয়েছে একটা টিউসানি। খরচের টাকা

না পাঠালেও চল্‌বে।" শুধু দারিদ্র্যে নয়, কত যুগ ধরে' এই ব্রাহ্মণ-পরিবার আভিজাত্যের গৌরবে, ধনসম্পদে এই পল্লীতে জাতি-ধর্ম্মের জয়চিহ্ন হয়ে আছে, তা যে নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হবে—সতীশের চক্ষের সম্মুখে এই নৈরাশ্যের দৃশ্যই তার হৃদয় ভেঙ্গে দিচ্ছিল। ক্ষীণ আশার প্রদীপ ছিল তার বড় ছেলে সুবল। সেও যে আর বংশমর্য্যাদার দাবী-রক্ষার চেয়ে আরামকে বড় করে' নিয়েছে, এই বুঝে তাঁর চক্ষের অশ্রু গড়িয়ে পড়্‌ল।

সংসারে একা, জীবনের চির সহচরী গৃহিণী। তার চক্ষের জল সতীশের বুকে যেন শেলবিদ্ধ করছিল। পত্নীর শীর্ণ হাতখানি বুকে রেখে ভাঙ্গা গলায় এই কথা বল্‌লেন, "মরণই আমার শ্রেয়ঃ, কিন্তু কি অপরাধে তোমায় রেখে যাই এমন অসহায়া করে! ধন গেল, পুত্র কন্যা কেউ মুখ চাইলে না। আমিও আর বাঁচ্‌তে পারলুম না। তোমার কি হবে?"

সারারাত্রি মরণ-পথের যাত্রী ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর কণ্ঠে বিলাপের সহিত অশ্রুবর্ষণ করেন। আর একমাত্র পতিই যার আশ্রয় আজ সেই সাধ্বী পত্নী স্বামীর মৃত্যু-শয্যায় বসে বিদীর্ণ-প্রায় বুকখানা চেপে আর্ত্ত কণ্ঠে বলে, "ওগো, এমন কথা বলো না। এমন হ'লে আমি আর একদণ্ড বাঁচ্‌ব না।"

কিন্তু বিধাতার অমোঘ বজ্র এই কথায় রুদ্ধ রইল না।

করুণ বৈধব্য-মূর্ত্তি গৃহিণী দাঁড়িয়েছিল স্বামীর ভিটায় সন্ধ্যা প্রদীপ দিতে। প্রেতমূর্ত্তি কে যেন তার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। সন্ত্রস্ত কম্পিত হাতে প্রদীপটা তার দিকে তুলে ধরে'ই মাথাটা নেমে পড়্‌ল মাটীর দিকে। "ছিঃ ছিঃ, এমন নরকও চক্ষে পড়ে!"

এ যে চন্দ্রা! হাতে তার রূপার চুড়ী, পরণে তার ডুরে সাড়ী—একি মূর্ত্তি! সে ছিল পাশের বাড়ীতেই, এনাতের সাথে তার নিকে হয়ে গেছে। উঃ, গৃহিণীর বুকখানা ভেঙ্গে দুখানা হয়ে' গেল। সারা রাত বৃশ্চিক-দংশনে তাঁর সর্ব্বশরীর জ্ব'লে গিয়েছিল। মনে হল, আর সে বিছানা ছেড়ে উঠ্‌বে না। কিন্তু বুকে তার কে যেন সাহস জুগিয়ে দিলে—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে তাকে, যে তার স্বামীর ভিটা রক্ষা করতে হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে উঠানে "মা মা" বলে' যার কণ্ঠস্বর তার কাণে এসে পৌছিল, সে যে তারই পেটের ছেলে কৃষ্টচন্দ্র। মা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বাইরে এসে দাঁড়াল।

ক্ষীণ কম্পিতকণ্ঠে মা আশ্চর্য্য হয়ে' জিজ্ঞাসা করলে, "কে তুই, কেষ্ট?"

পরণে লুঙ্গি, গায়ে পিরান, মাথায় তুর্কী টুপী। কেষ্ট বল্‌লে—"হাঁ মা, আমি ধর্ম্ম ছেড়েছি। সমাজ খেদিয়ে দিলে আমায়। কিন্তু মা-বাপের মায়া ভুলি নি।" তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়্‌ল।

গৃহিণীর আর সহ্য হল' না। এক অব্যক্ত আর্ত্তনাদ করে' ঘরে ঢুকে খিল দিলে। উন্মাদিনীর ন্যায় ঘরের ভিতর থেকেই বল্‌তে লাগ্‌ল—"দূর হ, দূর হ নজরছাড়া হয়ে যা।"

মুখে জল দেবার আপনার জন কেউ নেই। পাড়া-প্রতিবাসী অনেকেই অনেক অনুরোধ করে' গৃহিণীকে কিন্তু একবিন্দু জলও গ্রহণ করাতে পারল না। ব্যথায় অভিমানে তার বুকের মধ্যে কি দাবানল জ্বলে' উঠেছিল, তা বাহিরের লোক কেউ বুঝ্‌ল না। বড় ছেলে শুনে মাকে দেখ্‌তে এল। বাবুর বেশ। চক্ষু দুটো কোটরে ঢুকে গিয়েছে। মাথার চুল ছোট বড় করে' ছাঁটা। মাকে এসে বল্‌লে, "চলো মা, দুটো পেটের ভাত যোগাড় হবে। গাঁয়ে থাকা ছোট লোকেরই সাজে।"

মা একবার ছেলের মুখের দিকে করুণ-দৃষ্টিতে চেয়ে দেখ্‌লে। কথা কওয়ার শক্তি তার আর ছিল না। চোখের কোণ দিয়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়্‌ল। তারপর বারকয়েক দমকা নিঃশ্বাসের পর নিস্তব্ধ হ'ল।

সুবল তাড়াতাড়ি মায়ের কাজ সেরে কলিকাতায় পালাল। এই করুণ একটী ব্রাহ্মণ-পরিবারের উৎসন্ন হওয়ার কাহিনী ক্ষীণকণ্ঠে অতি প্রাচীন পুরুষের মুখে শুনে চক্রবর্ত্তীর ভিটার দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম,—

এনাতের বংশধরেরা পরম সুখে সেখানে বাস করছে। গ্রামের পুরাতন নাম মুছে গেছে, গ্রামখানির নাম হয়েছে "এনাৎগঞ্জ।"

শিল্প-সৃষ্টি

শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

গোড়ার কথাটি হইল ভাব। শিশুকাল হইতেই আমরা অল্প-বিস্তর ভাবের ঘরের মানুষ। যাহা কিছু আমরা করি না, আমাদের সকল কর্ম্মশক্তির মূলে থাকে ভাব। মানুষের মধ্যে আবার যাঁহারা একটু ভাবপ্রবণ হন, তাঁহাদের ভিতরেই সৃষ্টিকর্ত্তার ছোঁয়াচ লাগিয়া যায়, তাহাতেই তাহা দ্বারা কোন প্রকার সৃষ্টি সম্ভব হয়।

একটু স্থির হইয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, আমাদের বালকবালিকাদের মধ্যে কেহ কেহ অনুকরণপ্রিয় হইয়া উঠে। পথে একজন হাঁকিয়া যাইতেছে শুনিয়া সে অবিকল তাহার নকল করিল, অথবা কোন একটি ব্যাপার কাহাকেও কোন বিশেষ ভঙ্গীতে প্রকাশ করিতে দেখিয়া ঠিক সেই ভাবে হাত-মুখ নাড়িয়া প্রকাশ করিল। এই ভাবে মানুষের ভাবগ্রাহিতার পরিচয় বাল্যকালে এমন কি শিশুকাল হইতেই পাওয়া যায়, কিন্তু কয়টি পিতামাতা এইরূপ সন্তানকে ঠিক পথে চালিত করিতে পারেন? আরও নানা রকমে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

বালকবালিকারা মাটি কাদা লইয়া অনেক কিছুই গড়ে উৎসাহ কাহারও কাছে না পাইলেও অনেকেরই গড়িবার প্রবৃত্তি বাড়িয়াই চলে; শেষে তাহাই উৎকর্ষের ফলে সৃষ্টিতে দাঁড়ায়। প্রথম অবস্থায় ভাবগুলি থাকে তরল, তাহার সৃষ্টিতে যাহা অভিব্যক্ত হয় তাহাও হয় তরল ভাবেরই। হয় ত কেহ তাহার মধ্যে বিশেষ কিছু ভাবের বিকাশ লক্ষ্য করিল না, কিন্তু এই অবহেলার মধ্যে গভীর সৃষ্টি-বীজ থাকে, তাহা হয়ত অনেক বিদ্বান্ পণ্ডিত ব্যক্তিও লক্ষ্য করেন না।

(২)

বাহিরের অর্থাৎ দৃষ্ট জগতের যে বিষয়টি গভীর ভাবে আমাদের অন্তর স্পর্শ করে, তাহার অভিব্যক্তিও সেই পরিমাণে গভীর হয়। আমাদের সভ্য অসভ্য সকল সমাজেই যাহা কিছু প্রকাশ, কথা বা সাহিত্য, গান অথবা চিত্র-শিল্পের মধ্যে দিয়া দেখিতে পাওয়া যায়—যাহা কিছুই আমরা প্রকাশ করি না কেন, ভিতরে গভীর ভাবে সাড়া না পড়িলে তাহার অভিব্যক্তি ভাবময় হয় না, সুতরাং তাহা সৃষ্টিও হয় না। ভগবানের প্রত্যেক বাহ্য সৃষ্টির মধ্যে যে বিশেষত্ব আমরা দেখি তাহা আমাদের অন্তরপ্রকৃতির অনুকূল ভাবের হইলেই দেখি, না হইলে, আমাদের লক্ষ্য সে দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। আমরা কি তাঁর বাহ্য-সৃষ্টির সকলটুকুই দেখি বা দেখিতে পাইয়া অন্তরে গ্রহণ করি? আমাদের তত বড় মন কোথায়? আমরা সেইটুকুই দেখি—আমরা বলিতে তাহাকেই বলিতেছি যাহার মধ্যে অনুভব-শক্তির কিছু উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে—সেই আমরা ততটুকুই দেখি যতটুকু আমাদের ধারণায় ধরিতে পারি। এ দেখা বলিতে অনুভব বুঝিতে হইবে। ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য-বস্তু গ্রহণ করিয়া আত্মসাৎ করি।

(৩)

এ ব্যাপার অনেকটাই ক্ষেত্রে বীজবপন অথবা আমাদের খাদ্যগ্রহণের মতই। ক্ষুধার্ত্ত হইলে আমরা যেটুকু গ্রহণ করি, তাহা হইতে খাদ্যসার উৎপন্ন হইয়া শরীরময় শক্তি সঞ্চার করিতে কতকটুকু সময় লাগে। আমাদের তেজোবৃদ্ধি হইলে-পর তবে কর্ম্ম শক্তির ঠিকানা হয়। তেমনই আমাদের মনোমত বাহ্য-সৃষ্টি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যস্থতায় অন্তর-ক্ষেত্রে গিয়া পরিপুষ্ট হইলে পর, তবেই আমাদের দ্বারা কিছু সৃষ্টি সম্ভব হয়। যে যে বিশিষ্ট অনুভবের প্রেরণায় আমরা বাহ্য-সৃষ্টির মধ্যে বিচরণ করি এবং গ্রহণ করি, সেই সেই বিশিষ্টতাই আমাদের সৃষ্টিতে অভিব্যক্ত হয়। এই ভাবে যৌবনের

...সের ক্ষেত্রে আমরা তাঁহার বাহ্য-সৃষ্টির মধ্য হইতে কত ...ত বিষয় গ্রহণ করিয়া আত্মসাৎ করিতেছি; সময়ে তাহা ...হিত্য, সঙ্গীত অথবা চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে আমাদের সৃষ্টি ...রিয়া তুলিতেছে। তাহাতে তাঁরই অভিপ্রায় সিদ্ধ ...ইতেছে, যদিও "আমি করিতেছি" এই জ্ঞানটি বেশ ...নটনে আছে। যন্ত্রের মত হয়ত অনর্গল করিয়াও চলিতেছি, আসলে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মতই তাঁর সৃষ্টি হইতে সমাহিত অবস্থায় আমার কোনও বিশেষ প্রিয় বস্তু আহরণ করিয়া তাঁরই নির্দ্দেশে জনসমাজের মধ্যে ছাড়িয়া দিলাম—গুণগ্রাহী মানুষ বলিল উত্তম সৃষ্টি হইয়াছে, আনন্দের জিনিষ, ধন্য ধন্য! স্রষ্টা অন্তর্য্যামী অন্তরালে থাকিয়া একটু হয়ত হাসিলেন।

অক্ষয়া তৃতীয়ার উৎসব

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র লাহিড়ি বি, এল,

"প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং। বিহিত-বহিত্র-(নৌকা) চরিত্রমখেদং। কেশবধৃত-মীন-শরীর, জয় জগদীশ হরে" —ইতি জয়দেব।

হিন্দুগণ কেন, পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বিগণই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় অনাদিকাল থেকে হইতেছে বিশ্বাস করেন। প্রলয়ান্তে পুনরায় "যথাপূর্ব্বং অকল্পয়ৎ" পূর্ব্বের ন্যায় বিশ্ব রচিত হইয়া থাকে—ইহা বেদের (ঋক্) অঘমর্ষণ মন্ত্রে ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রেও উল্লিখিত আছে। তপস্যা দ্বারাই আদি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা যুগাবসানে কল্পে কল্পে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন এবং ভগবান বিষ্ণু বা আদ্যাশক্তি ধর্ম্মের গ্লানি দৈত্যদানবাদি কর্ত্তৃক উপস্থিত হইলে তাঁহার নাশার্থ যুগে-যুগে অবতার-রূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন; যথা, ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে "ইন্দ্রারি-ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে" অথবা চণ্ডীর উত্তম চরিত্রে—

"যদা যদা হি বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরি-সংক্ষয়ম॥"

হিন্দুগণ যাঁহারা নূতন পঞ্জিকার আদি ভাগ পাঠ করেন তাঁহারাই অবগত আছেন যে, আদি এক কল্পে বৈশাখমাসে শুক্ল পক্ষে তৃতীয়া তিথিতে রবিবারে সত্যযুগোৎপত্তি হয় এবং ঐ যুগের আদি অবতার "মৎস্য" বেদরক্ষার্থ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ঐ পুণ্য দিবস চিরস্মরণীয় রাখার উদ্দেশ্যে (Anniversary) বহু হিন্দু আজ পর্য্যন্ত ঐ তৃতীয়াকে "অক্ষয়-তৃতীয়া" নামে পর্ব্বাহ (Holiday) এবং ঐ শুভদিনে যে কোন শুভকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে তাহা অক্ষয়সিদ্ধিযুক্ত হইয়া থাকে, এই বিশ্বাসে বহু দোকান অনেক খুলিয়া থাকেন এবং পূর্ব্বদিন সংযমাদি করিয়া "অক্ষয়-তৃতীয়া-ব্রত" পালন পূর্ব্বক দান-ধ্যান করেন।

সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রেরই অবিসংবাদী মত যে, সময়ে সময়ে ভগবান্ জগতের কল্যাণার্থ ("to establish Kingdom of Heaven's on Earth") অবতার ও মহাপুরুষ রূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। শ্রুতিতে, যথা "সনাতনং এনং আহুরুতদ্যদস্মাৎ পুনর্ণব"—ইনি সনাতন হইলেও সময়ে সময়ে পুনঃ নব হইয়া আসেন। এই বেদবাক্য অবলম্বন করিয়া হিন্দুগণের গীতা, চণ্ডী, ভাগবৎ, তন্ত্র, পুরাণাদিতে, অবতারের রূপ-গ্রহণ প্রধানতঃ অসুর-দমন ও সাধুর পরিত্রাণ হেতু হওয়ার উল্লেখ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধে ২৪ অধ্যায়ে এই সত্যযুগের "মৎস্য" অবতার সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে, পরম ব্রহ্ম নিজে নির্গুণ ও নিত্য, তিনি বিশ্বের মঙ্গলার্থ (অর্থাৎ গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা, বেদ, সাধু, ধর্ম্ম ও অর্থের রক্ষার্থ) সময়ে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি-নাশের ও দুষ্টের দমনের জন্য অবতারত্ব গ্রহণ করেন। তিনি বুদ্ধির গুণযোগে. বায়ুর ন্যায় যাবতীয় উৎকৃষ্ট কি নিকৃষ্ট ভূতে ভ্রমণ করিয়াও (নির্গুণত্বাৎ) স্বয়ং উৎকৃষ্ট কি নিকৃষ্ট

হয়েন না। অতীত কল্পের অবসানে পৃথিব্যাদি সমুদ্র-জলে প্লাবিত হয়। তখন নিদ্রিত ব্রহ্মার নিকট হইতে দানবেন্দ্র হয়গ্রীবাসুর বেদ হরণ করিলে (অনাচার অনুষ্ঠিত হইলে) ভগবান বিষ্ণু উহা জানিতে পারিয়া হয়গ্রীবের বিনাশার্থ ও বেদরক্ষার্থ সুবর্ণ সফরী মৎস্য-রূপ ধারণ করিয়াছিলেন এবং তদানীন্তন সূর্য্যবংশীয় রাজর্ষি সত্যব্রতকে অনুগ্রহপূর্ব্বক মন্বন্তরাধিপতি করিয়াছিলেন। তিনি বেদসমূহও তাঁহাকে উপদেশ পূর্ব্বক প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন এবং এক নৌকাতে গো, ব্রাহ্মণ, মুনি, ঋষি ও অর্থ ইত্যাদি রক্ষা করিয়াছিলেন। সত্যযুগের উৎপত্তি-সময়ে সত্যব্রতই সাধু, বেদ ও ধর্ম্মার্থ রক্ষা করার উপযুক্ত পাত্র বলিয়া ভগবৎ-কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছিলেন। সত্যব্রতের সুশাসনে ও সুনিয়মে সমস্তই সত্যব্রতধারী হইয়াছিল, কালবশে ক্রমে উহা শিথিল হইতে থাকে।

অক্ষয় তৃতীয়া ব্রতের সংকল্প-বাক্য ও ব্রতের কথা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, ঐ দিনে দান, বিশেষতঃ জল-দান ও তর্পণ অবশ্য কর্ত্তব্য। সংকল্প-বাক্য (বা Resolution ছিল) যথা "যমলোকমতিক্রম্য বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তিকামঃ যবযুক্ত-বস্ত্রাচ্ছাদিত-কুম্ভ-দান-ভোজ্য-দান-ভবিষ্যপুরাণোক্ত-বিধিনা ব্রতমহং করিষ্যে।" ব্রতকথাতে উল্লেখ আছে যে, এক দ্বিজাধমের গৃহে একদা এক তৃষ্ণার্ত্ত ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইলে ঐ দ্বিজাধম তাহাকে জল পর্য্যন্ত দেয় নাই; কিন্তু তাহার পত্নী ঐ ব্রাহ্মণকে জলপান করিতে দিয়াছিল, ঐ দিবস অক্ষয় তৃতীয়ার তিথি থাকায় তাহাতে অত্যন্ত পুণ্যসঞ্চয় হয়। কালবশে ঐ দ্বিজাধমের মৃত্যু হইলে পর, সে যমদূত কর্ত্তৃক নরকে নীত হয় এবং পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া জল চাহিলে যমদূত তাহাকে বলিয়াছিল যে, তুমি তৃষ্ণার্ত্ত ব্রাহ্মণকে জল দেও নাই, কাজেই তুমিও জল পাইবে না "ন দত্তং বারি বিপ্রেভ্যঃ কথং বা প্রাপ্স্যতে জলম্"; কিন্তু যমরাজ বলিলেন, যে উহার পত্নী ব্রাহ্মণকে জলদান করায় ঐ দ্বিজাধমও তাহার কথঞ্চিৎ ফল প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ঐ দিন যদি "স্নানং দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃ-তর্পণম্ বিষ্ণুপূজা-বিধিবর্ত্তদক্ষয়মুদাহৃদতম্।" "এবং করোতি যা নারী নরোবাপি সুসংযতঃ। ইন্দ্রলোকং সমাসাদ্য বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি" (পুরোহিতদর্পণ বা পঞ্জিকা দ্রষ্টব্য)।

উপরি উক্ত ব্রতের সংকল্প ও ব্রতকথার পাঠে বুঝা যায় যে, সংযমী স্বাবলম্বী দাতারই বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি ঘটে। "যবযুক্ত বস্ত্রাচ্ছাদিত কুম্ভ ও ভোজ্য দান"—যে নিজে ভিক্ষুক সন্ন্যাসী সে কি প্রকারে উহা দান করিবে? পরিশ্রমী ধনী ব্যক্তিই ঐ সমস্ত বস্তু আহরণ বা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ এবং তাহা দান করিলেই পরমধর্ম্ম-লাভ হইবে। বৈদিক যুগে যজ্ঞ, দান, তপস্যার অত্যন্ত সমাদর ছিল, এবং বেদের কর্ম্মকাণ্ড বা নিষ্কাম কর্ম্মের প্রশংসায় মুনি-ঋষিগণ সদা ব্যস্ত ছিলেন। কালক্রমে উহার কদর্থ (অর্থাৎ কর্ম্মে বন্ধন হয়, কর্ম্মদ্বারা মোক্ষ হয় না—জ্ঞানবাদ বা ভক্তিবাদই শ্রেষ্ঠ) প্রকাশ করিয়া দেশমধ্যে ক্রমে নিষ্কর্ম্মা অলস ভিক্ষু সন্ন্যাসীর প্রাধান্য-স্থাপনের জন্য বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের তমসাক্রান্ত জ্ঞানী ও পরবর্ত্তী শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদী মোহগ্রস্ত সন্ন্যাসী এবং অসার সংসার মায়া বলিয়া মর্কট-বৈরাগীর দল যথেষ্ট চেষ্টা করেন এবং স্থানে স্থানে "কুঁড়ে আশ্রম" স্থাপন করিয়া ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা কর্ম্ম-ত্যাগ-মার্গের প্রসার প্রতিপত্তি বজায় রাখিতেছেন। তবুও বৌদ্ধ-রাজগণের পালিত ভিক্ষু সন্ন্যাসী ও শঙ্করাচার্য্য-মঠের সন্ন্যাসীর দল বর্ত্তমান যুগের ন্যায় ব্রহ্মচর্য্যবিহীন, অসংযমী, বিলাসী, বাক্‌সর্ব্বস্ব, নিষ্কর্ম্মা, শুধু জ্ঞানবাদী ছিলেন না; তাঁহারা জগতের কল্যাণার্থ সদা কঠোর কর্ম্মে "ভূত-ভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ কর্ম্ম সংজ্ঞিতঃ" (গীতা ৩ অধ্যায়) নিয়োজিত ছিলেন। বেদের কর্ম্মকাণ্ডকে উড়াইয়া দিবার জন্য এখনও অনেক তথাকথিত গৈরিকধারী সন্ন্যাসী বা বৈরাগী গীতার জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের বুলি আওড়াইয়া বহু গৃহস্থের সর্ব্বনাশ করিতেছেন, এবং নিজেরাও ভণ্ড সাধু সাজিয়া গুরুগিরি ব্যবসা চালাইতেছেন। জ্যোতিষী সাধু, ঔষধী সাধু, গায়ক সাধু, ভেলকীবাজ সাধু, জটাধারী সাধু ইত্যাদি, নানা ভেকধারী নিষ্কর্ম্মা, পরান্নভোজী, পর-গলগ্রহী, কর্ম্মত্যাগী সাধুর দ্বারা অনেক সময়ে অনেক গৃহস্থ অযথা উৎপীড়িত হইতেছেন।

পুরুষোত্তমকে পাইতে হইলে উত্তম পুরুষ হইতে হইবে এবং অবতারগণই আমাদের উত্তম বা তমোত্তীর্ণ

আদর্শ পুরুষ, উহাদের দৃষ্টান্ত ও গুণ নিজের মধ্যে সঞ্চারিত করার চেষ্টাই কর্ত্তব্য। "কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণগুণ সকলি সঞ্চার"। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ অসক্ত কর্ম্মযোগই উত্তম মত "কর্ম্মযোগঃ বিশিষ্যতে", "কর্ম্ম জ্যায়ো হি অকর্ম্মণঃ" শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ", "উৎসীদেয়ুরিমে লোকান্ ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্", "বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি", "তস্মাদসক্ত সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচার। অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ", "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্" ইত্যাদি কহিয়াছেন। কাজেই অনাসক্ত কর্ম্মই মোক্ষ, কর্ম্মত্যাগ মোক্ষ নহে। শিবাজী মহারাজের গুরুদেব রামদাস স্বামী কহিতেন, "প্রপঞ্চ সাড়ুন পরমার্থ কেনা, তরী অন্ন মিলে না খায়েনা" অর্থাৎ প্রপঞ্চ ছাড়িয়া পরমার্থ করিল, তবু খাইতে অন্ন মিলিল না, ভিক্ষুক হইল। মহাত্মা কবীরও কহিয়াছেন, "ভক্তি ভেক বড় অন্তরা যৈছে ধরণী আকাশ ভক্তকে সুমীরে (স্মরণ করে) রামকী, ভেক জগত কি আশ"। সাজ-পরা ভক্ত বা ভেকধারী সন্ন্যাসী জাগতিক উন্নতি চাহে, তাহাও অনেকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।

যে সত্যযুগ মৎস্য অবতারের সময়ে আগত হইয়াছিল তাহা কালক্রমে কলিযুগে পরিণত হইয়া, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম, ন্যায়ের নামে অন্যায়, তামসিক ভারাক্রান্ত অসাধু সাধুর বেশে শুধু গলাবাজির ও পোষাকের জোরে দেশ মধ্যে প্রবাহিত হইয়া অত্যন্ত ক্ষতি সাধন করিতেছিল, চতুর কৌশলী যোগিগণ (অনাসক্ত কর্ম্মী) তাহা বুঝিতে পারিয়া, ভণ্ডামী-নষ্টামী দূর করিয়া পুনরায় দেশ মধ্যে যাহাতে সত্যযুগের বেদ-বাণী "যজ্ঞ-দান-তপস্যার" প্রকৃতভাবে প্রকাশ ও প্রচার হয় তার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং "History repeats itself." কালচক্রের আবর্ত্তনে পুনরায় সত্যযুগ ফিরিয়া আসিতেছে বুঝা যায়। মৌখিক কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী ভিক্ষুর প্রাধান্য ও সম্মান দিন দিন কমিয়া আসিতেছে এবং "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ। এবং ত্বয়িনান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে" অর্থাৎ কর্ম্ম করিতে থাকিয়াই সাত বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিবার ইচ্ছা করিবে এবং এইরূপ "ঈশাবাস্যং" বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলে সেই কর্ম্ম তোমার বন্ধন হইবে না—ইহা ব্যতীত (উক্ত বন্ধন-মুক্তির জন্য) অন্য মার্গ নাই অর্থাৎ বিষয়-কর্ম্মে বন্ধন ও অনাসক্ত ঈশ্বর-কর্ম্মে বন্ধন নাই বরং মুক্তি। কাজেই "সংযমী স্বাবলম্বীর দান ও জীব-সেবাই প্রকৃত ধর্ম্ম ও কর্ম্ম, তাহাতে বন্ধন নাই, অবশ্যম্ভাবী মুক্তি এবং তাহাতে জীবন্মুক্তি। সৎপথে নিজের উপার্জ্জিত অর্থ-দান সৎপাত্রে করিলেই শান্তি। বেদের ও গীতার কর্ম্মকাণ্ডের প্রকৃত মর্ম্ম ও ধর্ম্ম দেশ মধ্যে যাহাতে পুনরায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তদুদ্দেশ্যেই "প্রবর্ত্তক সংঙ্ঘের" কর্ম্মকর্ত্তৃগণ স্থানে স্থানে নিস্পৃহ জ্ঞানী, প্রেমিক, কর্ম্মিবৃন্দের সাহায্যে আশ্রম (অর্থাৎ আ সম্যক্, শ্রম) স্থাপন পূর্ব্বক, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, সেবা ও ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ এক সঙ্গে চালাইবার ব্যবস্থা করিয়া অক্ষয়া তৃতীয়ার দানের সংকল্প-বাক্যের যথার্থ উদ্দেশ্য (যবযুক্ত-বস্ত্র কুম্ভ-ভোজ্যদান)-সিদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। যদি স্বাবলম্বী, সংযমী, উৎসাহী কর্ম্মিবৃন্দ এই-ভাবে জীবসেবা ও দেশসেবা করিয়া অক্ষয় তৃতীয়ার প্রকৃত উৎসবের ধারা স্থির রাখিতে পারেন, তবেই "প্রবর্ত্তকের" এই উৎসব সার্থক হইবে। ইতি "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ, জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় ভারতায় নমোনমঃ বা ভারতহিতায় জগতে নমঃ।"

মৃত্যু ও কীর্ত্তি

শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃত্যু হাঁকে—"বন্দী বিশ্ব মোর বাহু-বলে,
শৃঙ্খলিত নমে সবে রাজ-পদ-তলে!"

কীর্ত্তি কহে—"কিন্তু বন্ধু ভেবে দেখ ধীরে,
দীপ্ত আমি স্বর্ণচূড়া শীর্ণ তব শিরে!"

ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণ্য-লাভের তপস্যা

(পৌরাণিক গল্প)

বৈজ্ঞানিকের চক্ষে পৃথিবীকে যত অল্পায়ুঃ বলিয়া মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। এ পৃথিবী বহুদিনের পৃথিবী, আর ভারতেরই প্রাচীন সভ্যতা আদর্শের ইতিহাস খুঁজিয়া পাওয়া দুঃসাধ্য; কেন না, সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই ভারত উন্নতির পথে উল্কা-বেগে ছুটিয়াছে।

প্রাচীন ভারতে আজিকার ন্যায় বর্ণাশ্রম ছিল না। জাতি-বিচার ছিল না। নিখিল জীব-জগতের স্রষ্টা একই পুরুষ। মানবজাতির মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ হইলেন, ঈশ্বর-স্মরণ পৃথিবীর ভোগে যাহাদের মলিন হইল না, তাঁহারাই দেবতা নামে খ্যাতি পাইলেন। আর যাঁহারা ভোগরত, দম্ভ দ্বেষ আশ্রয় করিয়া আত্মসুখপরায়ণ হইলেন তাঁহারাই অসুর। এই ভেদ দেবাসুর-সংগ্রামের ইতিহাসে প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। এইরূপ সংঘর্ষের মধ্য দিয়াই ধর্ম্ম-রক্ষায় উদ্যত বীরপুরুষগণ ক্ষত্র নামে অভিহিত হইলেন। কথিত আছে, মহারাজ রথীতরের বংশ ধর্ম্ম ও ভাগবৎপরায়ণ হওয়ায়, তাহারা ব্রাহ্মণ-পদ প্রাপ্ত হন। তারপর বহু যুগ পরে শৌনক চাতুর্ব্বর্ণ্য-প্রবর্ত্তনের প্রয়াস করেন। তাঁহার এই প্রয়াস ঋষি ভার্গভূমি কার্য্যে পরিণত করেন। এই সময় হইতে ভারতে চাতুর্ব্বর্ণ্য নীতি প্রচলিত হয়।

যে গুণ, যে আচার মানুষের নিখিল স্বভাব-রূপে প্রকাশ পাইলে মানুষের মধ্যে ভাগবৎ স্বভাব বিকশিত হয় এই চাতুর্ব্বর্ণ্য-সৃজনে সেই গুণের বিশ্লেষণই হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যও শূদ্রের গুণ ও স্বভাব মানুষকে ভেদ করিয়া স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্রভাবে পরিস্ফুট করা হইয়াছিল।

কিন্তু ভারতে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম শ্রেণী-বিশেষের মধ্যে এমন বিপুল ও পরম শক্তি জাগ্রত করিয়া তুলিল, যে ভবিষ্যতের সকল বর্ণ-ধর্ম্মীই এই ব্রাহ্মণত্বলাভের আকাঙ্ক্ষায় কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিল। স্ব-স্ব ধর্ম্মে নিষ্ঠা রাখা সম্ভব না হওয়ার [illegible]-সভ্যতার পরিপূর্ণ গুণ, কোন মানুষ-বিশেষে ইহার একটী গুণ লইয়া কেহ শান্তি ও তৃপ্তি পাইতে পারে না।

ক্ষত্রিয়ের এইরূপ ব্রাহ্মণত্ব-লাভের একটী অতি করুণ উৎকট তপস্যার কথাই বলিব।

চন্দ্রের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র পুরূরবা। পুরূরবার পুত্র অমাবসু। তাঁহার পুত্র ভীম। ভীমের পুত্র কাঞ্চন। কাঞ্চনের পুত্র জহ্নু। এই জহ্নুই সমুদয় গঙ্গাকে আত্মাতে সমারোপণ পূর্ব্বক নিঃশেষে পান করিয়াছিলেন। জহ্নুর পুত্র সুজহ্নু। ইহা হইতেই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-ভেদ প্রাচীন-যুগে কিরূপ ছিল তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য নহে। জহ্নুমুনির পৌত্র অজ, তাঁহার মহাক্ষাত্রবীর্য্যসম্পন্ন বলাকাশ্ব নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বলাকাশ্বের পুত্র কুশ, কুশের পুত্র কুশাশ্ব। "আমার ইন্দ্রতুল্য পুত্র হউক" এই সঙ্কল্প করিয়া ক্ষত্রবীর কুশাশ্ব কঠোর তপস্যা করেন। ইন্দ্রের আসন টলিল, তিনি স্বয়ং এই তপস্বীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। মহারাজ কুশিক ক্ষত্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও "আমার বংশে ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করুক" এইরূপ আকাঙ্ক্ষায় কঠোর তপঃপরায়ণ হইলেন।

এই সময়ে ভার্গব-বংশের মহর্ষি চ্যবন ব্রহ্মধ্যানে অনাগত ভবিষ্যৎ দর্শন করিয়া বিচলিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, কুশিক-বংশ হইতেই তাঁহার বংশে ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের সঞ্চার হইবে। ব্রাহ্মণত্বের গর্ব্ব তখন এমনই প্রবল হইয়াছিল, যে তিনি ইহা অনুধাবন করিয়া ভাবিলেন— তাঁহার বংশে ক্ষত্রিয়ত্ব-সঞ্চার হইলে যে সমস্ত গুণ দোষ ও বলাবল, উপস্থিত হইবে তাহাতে ব্রাহ্মণত্বের দুর্লভ্য মহিমা ক্ষুন্ন হইতে পারে; তিনি তাই বিধাতার বিধান নাকচ করিবার জন্য কুশিকের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

মহারাজ কুশিক চ্যবন ঋষিকে দেখিয়া স্বর্ণ-ভৃঙ্গার-নিঃসৃত সলিল দ্বারা তাঁহার পদ-প্রক্ষালন, যথাবিধানে মধুপর্ক দান ও আসন প্রদান করিয়া তাঁহার আগমনের

উদ্দেশ্য জানিতে চাহিলেন। চ্যবন কহিলেন "তোমার সহিত একত্র অবস্থান করিতে আসিয়াছি"। এইরূপ অসদৃশ কথা শুনিয়া মহারাজ কুশিক ভাবিলেন, পত্নীই পতির সহিত নিরন্তর বাস করিতে পারে; মহর্ষির এইরূপ অভিলাষ ধর্ম্মানুমোদিত নহে। কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রভাব এই যুগে এমনই প্রবল হইয়াছিল—সামন্য ত্রুটি অভিশাপের কারণ হইতে পারে, এই ভয়ে রাজা আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। তিনি করজোড়ে কহিলেন, করিলে, তিনি পরিতোষ সহকারে ঐ সকল ভোজন করিয়া রমণীয় শয্যায় শয়নান্তর হৃষ্টান্তঃকরণে উভয়কে বলিলেন, "আমার চরণ সংবাহন কর। কদাচ আমাকে জাগরিত করিও না।" সে কি গাঢ়তম নিদ্রা! রজনী প্রভাত হইল, পুনঃ সূর্য্যাস্ত হইয়া গেল। এক দিন, দুই দিন, এইরূপ একবিংশতি দিন অতিবাহিত হইয়া যায়—রাজা ও রাণী মহর্ষির অভিশাপ-ভয়ে অক্লান্ত পরিশ্রমে, অনাহারে পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ মহর্ষি শয্যাত্যাগ

রাজা ও রাণী ঋষির রথ টানিতেছেন

'আমিও আমার মহিষী আপনার একান্ত অধীন হইলাম। এই রাজপ্রাসাদ, রাজ্য, ধর্ম্মাসন, সকলই আপনার, আপনি আমাদের আশ্রয় হইলেন।" মহর্ষি চ্যবন কহিলেন, "ধন, ধেনু, দেশ, এ সকল আমার অভীষ্ট নয়। আমি একটী নিয়মানুষ্ঠান করিব, তোমরা আমার পরিচর্য্যা কর।" অতঃপর মহর্ষি চ্যবন নানাপ্রসঙ্গে নৃপতি-গৃহে সারাদিন কাটাইয়া, যখন সূর্য্যদেব অস্তচূড়াবলম্বী হইলেন তখন বলিলেন, "আমার জন্য অন্নপান প্রস্তুত কর।" নরপতি কুশিক যথাবিধানে অন্নপান তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া রাজপ্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রাজদম্পতি তাঁহার অনুসরণ করিলেন। কিন্তু অর্দ্ধপথে মহর্ষি অন্তর্হিত হইলেন। রাজা কুশিক ও তাঁহার ভার্য্যা যে কি করিবেন, কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না।

পরিশেষে ক্ষুণ্ণ মনে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, মহর্ষি পূর্ব্ববৎ নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহারা ভয়ে পুনরায় তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপে পুনরায় একবিংশতি দিবস অতিবাহিত হইল। তাঁহারা উভয়েই উপবাসী ছিলেন। হঠাৎ মহর্ষি চ্যবন

শয্যাত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন 'আমি স্নান করিব, আমার সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন কর।" একান্ত ক্ষুধার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত রাজদম্পতি শতপাক বিশুদ্ধ, সুবাসিত, মহামূল্য তৈল তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিয়া দিলেন। অতঃপর স্নানান্তে তিনি আহার প্রস্তুত করার আদেশ দিলেন। রাজা-রাণী সত্বর সিদ্ধান্ন, সুস্বাদু মাংস, শাক, রসাল পিষ্টক, বহুবিধ রস এবং মোদক ও রাশি রাশি ফল আহরণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। মহিষী ব্যজন হস্তে ঋষির সম্মুখে উপবেশন করিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ যাবতীয় গৃহ-সামগ্রী ও ঐ সকল ভোজ্য দ্রব্য একত্র করিয়া মহর্ষি তৎসমুদায়ে অগ্নি প্রদান করিলেন। মহারাজ কুশিক ও তাঁহার মহিষী ধৈর্য্যহীন হইলেন না। মহর্ষি চ্যবন রাজপ্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রতিদিন আবার আসেন এবং পূর্ব্ববৎ আচরণ করেন। এইরূপে উনপঞ্চাশৎ দিবস অতিক্রান্ত হইল।

পঞ্চাশৎ দিবসে মহর্ষি আসিয়া বলিলেন, "শীঘ্র এক রথে আমাকে আরোহণ করাইয়া তোমরা দুইজনে আমাকে বহন কর।" মহারাজ কুশিক বলিলেন, "আমার ক্রীড়া রথ ও সাংগ্রামিক রথ আছে; কোন রথ যোজনা করিব?"

ঋষি বলিলেন, "যাও শীঘ্র বিবিধায়ুধ-সম্পন্ন, কনক-যষ্টিসমন্বিত, তোরণ-সুশোভিত, কিঙ্কিনীজাল-জড়িত সাংগ্রামিক রথ আনয়ন কর।"

তাহাই হইল।

সে কি নিষ্ঠুর দৃশ্য! পথি-মধ্যে রথারোহণে চ্যবন ঋষি, হস্তে তাঁহার তীক্ষ্ণাগ্র প্রতোদ, রথ বহন করিতেছেন রাজ-দম্পতি। প্রতোদ-প্রহারে তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যাইতেছে। কলেবর রুধিরাক্ত, পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় উঁহাদের শোভা হইল। পৌরবর্গ, অমাত্যগণ সকলের কণ্ঠেই হাহাকার উঠিল। কিন্তু মহর্ষির বিরক্তি উৎপাদন-ভয়ে রাজ-দম্পতির এইরূপ দুর্দ্দশা-দর্শনে তাহাদের চক্ষে অশ্রুই বহিল, কণ্ঠে বাক্‌-নিঃসরণ হইল না। রাজকোষে যত অর্থ ছিল, মণি-মাণিক্য-সুবর্ণাদি ছিল, মহর্ষি চ্যবন তাহা দুই হাতে বিলাইয়া দিলেন। কিন্তু এই রাজদম্পতির কিছুতেই মন ক্ষুণ্ণ হইল না। রথ তখন রাজপথ অতিক্রম করিয়া নগরপ্রান্তে পবিত্র রমণীয় গঙ্গাতীরে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। ঋষি রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক, সেই দম্পতিকে মুক্ত করিয়া, তাঁহাদের অঙ্গে স্নেহভরে অমৃত-কর-বিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "বড় প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে বর প্রার্থনা কর, আমার অদেয় কিছুই নাই।"

নরপতি কহিলেন "আপনার সেবা করিয়া ধন্য

চ্যবন ঋষি রাজদম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন

হইয়াছি। আপনার পবিত্র করস্পর্শে সকল ক্লান্তি দূর হইয়াছে। আমরা কিছুরই প্রার্থী নহি।"

চ্যবন হাস্য করিয়া বলিলেন—"কাল আসিও। এই পুণ্যতীর্থ ভাগীরথীতীরে আমি এক ব্রতানুষ্ঠান করিব। তোমাদের সৌভাগ্য-যোগ উপস্থিত।" মহারাজ কুশিক মহর্ষিকে অভিবাদনপূর্ব্বক অমাত্য, পুরোহিত, সৈনিক পুরুষ, বন্দী, বারবিলাসিনী ও প্রজাবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া ইন্দ্রের ন্যায় নগর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। স্নান-ভোজন সমাপন পূর্ব্বক যামিনীযোগে ভার্য্যার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়া উভয়েই অনুভব করিলেন, জরা বিহীন অমরের ন্যায় শ্রী ও যৌবনে তাহাদের সর্ব্বশরীর পরিপূর্ণ হইয়াছে। চিত্ত আজ পরমাহ্লাদে নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে।

*　　*　　*　　*

পরদিন প্রভাতে গঙ্গাতীরস্থিত কাননে প্রবেশ করিয়া রাজা কুশিক বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, বালুতট-সংযুক্ত বনানীকুঞ্জের সে রমণীয় দৃশ্যের পরিবর্ত্তে স্বুবর্ণ-মণি-বিজড়িত স্তম্ভ সুশোভিত; সেখানে গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় বিপুল প্রাসাদ শোভা পাইতেছে। কোথাও রজত-শিখর-সমন্বিত পর্ব্বত। কোথাও বা কমলদল-সমলঙ্কৃত সরোবর। সুনির্ম্মিত রাজবর্ত্মের ধারে ধারে বিবিধগৃহ, তোরণাদি, মাঝে মাঝে হরিদ্বর্ণ-তৃণশোভিত ভূমিখণ্ড, কাঞ্চনময় কুট্টিমের ঔজ্জ্বল্যে নয়ন ঝলসিয়া যায়। নব-মুকুলিত সহকার, কেতক, অশোক, চম্পক, আমলক, পলাশাদি তরুরাজি-বিরাজিত উদ্যানের রমণীয় শোভা; বৃক্ষে বৃক্ষে পদ্ম প্রস্ফুটিত, সুশীতল জলের ঝরণা ঝরিতেছে। কোথাও বা উষ্ণজলের প্রস্রবণ। বাণীবাদ, শুকশারী, ভৃঙ্গরাজ, কোকিল, হংস, সারস কলরব করিতেছে। অপ্সরা গন্ধর্ব্ব বিহার করিতেছে। দূরে দূরে অধ্যাপন-ধ্বনিও ঋষি-কণ্ঠে উচ্চারিত হইতেছিল। রাজ-দম্পতির চিত্ত-বিভ্রম হইল। তাঁহারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে মণিময়-স্তম্ভ-সমলঙ্কৃত, সুবর্ণ-নির্ম্মিত এক গৃহ-মধ্যে ভৃগুনন্দন চ্যবনকে বিচিত্র শয্যায় শয়ান দেখিতে পাইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, চকিতে কোথায় গেল সে অমরাপুরী, অপ্সরা-গন্ধর্ব্বের লীলাভূমি, বৃক্ষলতাপূর্ণ সেই রমণীয় উপবন, বিহঙ্গ-কাকলী-পরিপূরিত সেই নন্দন-কানন। তাঁহারা দেখিলেন, মহর্ষি চ্যবন ধ্যানপরায়ণ, কুশাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। গঙ্গার উপকূল কুশভূমিষ্ঠ, বল্মীক-লাঞ্ছিত ও নিঃশব্দ। মহারাজ কুশিক মনে মনে ভাবিলেন, এ সকলই তপোবল, বিশ্বরাজ্যলাভের অপেক্ষা ইহাই শ্রেয়ঃ, এ পৃথিবীতে ব্রাহ্মণই গরীয়ান্। রাজ্যলাভ সুলভ; কিন্তু ব্রাহ্মণ্যমহিমা, ব্রাহ্মণের পবিত্র বাণী, পবিত্র বুদ্ধি, পবিত্র কর্ম্মানুষ্ঠান তপঃ-সাধ্য, সন্দেহ নাই।

ভৃগুনন্দন রাজার মনোভাব বুঝিয়া কহিলেন, "আজ তোমার তপোনুষ্ঠান ও ধর্ম্মের বল জাগাইবার জন্যই বিচিত্র সৃষ্টি প্রদর্শন করিয়াছি। ইন্দ্রত্ব-লাভ তৃণতুল্য বোধ করিয়াছ। ব্রাহ্মণ্য-লাভের বাসনা জাগিয়াছে, অবগত হইয়াছি। আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। তুমি স্বয়ং ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে না। ব্রাহ্মণের তেজঃপ্রভাবে তোমার পৌত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে। আর কাল-বিলম্ব করিও না। যদি অন্য প্রার্থনা থাকে বল। আমি শীঘ্রই তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইব।" কুশিক বলিলেন, "ব্রাহ্মণ্যলাভের পর ঋষিত্ব, ঋষিত্বের পর তপস্বিত্ব-লাভ। সে কি সুকঠিন ধর্ম্ম! আমি আর কিছুই চাহি না। আমার বংশীয় ব্যক্তিগণই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করুক, ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।"

ঋষির কণ্ঠে মেঘমন্দ্রে উচ্চারিত হইল "তথাস্তু"।

*　　*　　*

কুশিকের পুত্র গাধি। গাধির ঔরসজাত পুত্র বিশ্বামিত্র। ক্ষত্রিয় হইয়াও ইনি ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম লাভ করিয়া ত্রি-জগতে যশস্বী হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান হুগলী

(২)

কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় এম্, এল্, সি

গত মাসের "প্রবর্ত্তকে" হুগলী জেলার গৌরব, সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর উল্লেখ করিয়াছি। হুগলী জেলায় আরও বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক আছেন, তাঁহাদের
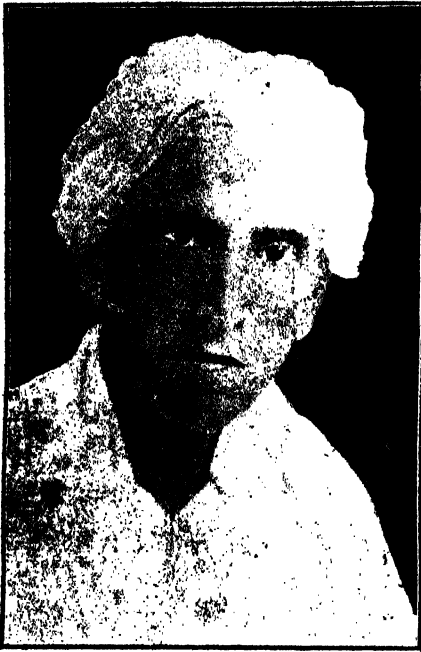
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পরিচয় দিতে গেলে প্রবন্ধ বাড়িয়া যায়, আর সংক্ষেপ করিতে গেলে কাহার নাম বাদ দিয়া কাহার নাম দিব, এই সমস্যা আসিয়া পড়ে। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় হুগলী জেলার সাহিত্যিকদের যে পরিচয়-সংগ্রহে ব্রতী আছেন তাহার অধিক পরিচয় লেখকের জানা নাই—আশা করি, হরিহর বাবু একটী পৃথক্ প্রবন্ধে তাহা প্রকাশ করিবেন। হুগলী জেলা হইতে পূর্ব্বে অনেকগুলি সুপ্রসিদ্ধ মাসিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত। স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সম্পাদিত "নবজীবন" এবং "সাধারণী", স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদিত "এডুকেশন গেজেট" ও বাঁশবেড়িয়া হইতে প্রকাশিত "পূর্ণিমা" মাসিক পত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। "এডুকেশন গেজেট" ভিন্ন আর সবগুলিই বিলুপ্ত হইয়াছে। "এডুকেশন গেজেট" এখন আর চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত হয় না, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। ভূদেববাবুর পৌত্রী শ্রীমতী অনুরূপা দেবী সম্প্রতি "এডুকেশন গেজেট" সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। "প্রবর্ত্তকে"র উল্লেখ

শ্রীযুক্ত কানাইলাল গোস্বামী

পূর্ব্বেই করিয়াছি। তা' ছাড়া ১৩০০ সালের শ্রাবণ মাস হইতে "চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ" নামে সাপ্তাহিক ৪১ বৎসর কাল প্রকাশিত হইতেছে। হুগলী জেলার মনীষিগণের ধারাবাহিক পরিচয় এবং ইতিহাস-সঙ্কলন "চুঁচুড়া বার্ত্তাবহে"র বিশেষত্ব। বর্ত্তমান সম্পাদক হইতেছেন শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। চুঁচুড়া হইতে গত তিন বৎসর কাল "সমাচার" নামক একখানি পাক্ষিক পত্র যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে। বর্ত্তমান সম্পাদক হইতেছেন শ্রীমান্ সুবোধ রায়। যুবকদের প্রচেষ্টায় ভদ্রকালী হইতে "তরুণ" নামক একখানি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইতেছে। তা' ছাড়া, চুঁচুড়া দেশবন্ধু মেমোরিয়াল স্কুল হইতে একখানি ইংরাজী-বাংলা সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে। চন্দননগর

হইতে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের আর একখানি মুখপত্র পাক্ষিক "নব-সঙ্ঘে"র উল্লেখ গতবারে করিয়াছি। বৈদ্যবাটী হইতে "তরুণ হুগলী' মাসিক পত্র প্রকাশিত হইত, সম্ভবতঃ তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।
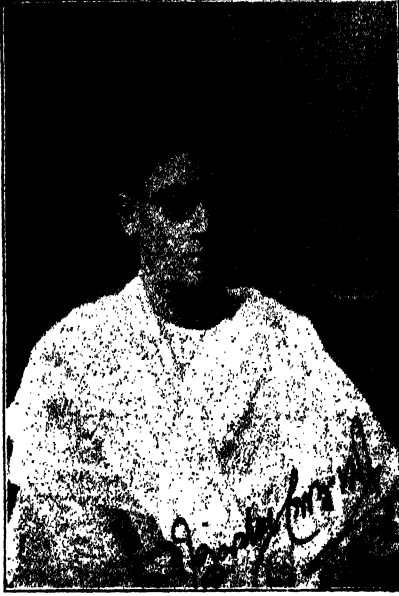
শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী

সর্ব্বসাধারণের মধ্যে অজ্ঞতা বিদূরণ মানসে ১৯২৫ সালের মে মাসে বাংলা দেশে এই জেলায় লেখকের বাসগ্রাম বাঁশবেড়িয়ায় লাইব্রেরী আন্দোলন প্রথম আরব্ধ হয়। এই আন্দোলনের ফলে, এই জেলার গ্রন্থাগারগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার এবং পরস্পর সহযোগিতায় কার্য্য-পরিচালনার প্রচেষ্টা চলিতেছে। "হুগলী জেলা গ্রন্থালয় সমিতির" সহিত ৭৫টী গ্রন্থাগার সংযুক্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে কয়েকটীর উল্লেখ করিতেছি:—উত্তরপাড়া সাধারণ পাঠাগার, স্থাপিত ১৮৫৯—পুস্তক-সংখ্যা ৩০,০০০। উত্তর-পাড়া সারস্বত সম্মিলন (১৯০৯), ভদ্রকালী সাহিত্য সমিতি (স্থাপিত ১৯২৬, সভ্য ৬৭, পুস্তক-সংখ্যা ৬৫০), কোন্নগর সাধারণ পাঠাগার (স্থাপিত ১৮৫৮, সভ্য ১০৩, পুস্তক-সংখ্যা ৫৩০৪, গৃহ-নির্ম্মাণ-ব্যয় ৮০০০৲), রিষড়া ফ্রেণ্ডস্ সোসাইটী (স্থাপিত ১৯০৭, সভ্য-সংখ্যা ৬৫, পুস্তক-সংখ্যা ২,১০০), মাহেশ সাধারণ পাঠাগার (স্থাপিত ১৯০৪), শ্রীরামপুর সাধারণ পাঠাগার (স্থাপিত ১৮৭১, পুস্তক-সংখ্যা ১২০৭০), শ্রীরামপুর যতীন্দ্র পাঠাগার (স্থাপিত ১৯২৪), বৈদ্যবাটী যুবক সমিতি (স্থাপিত ১৯০৮, পুস্তক-সংখ্যা ৬,৪৪৪, গৃহনির্ম্মাণ-ব্যয় ৩০০০৲), ভদ্রেশ্বর সাধারণ পাঠাগার (স্থাপিত ১৯১০), দশভূজা সাহিত্যমন্দির, মানকুণ্ডু (স্থাপিত ১৯২২, পুস্তক-সংখ্যা ৩,৭৫০ গৃহ-নির্ম্মাণ-ব্যয় ৩০০০৲), অন্নপূর্ণা লাইব্রেরী, তেলিনীপাড়া (স্থাপিত ১৯১২, গৃহ নির্ম্মাণ-ব্যয় ৫০০০৲), চন্দননগর পুস্তকাগার (স্থাপিত ১৮৭৩, গৃহ-নির্ম্মাণ-ব্যয় প্রায় এক লক্ষ, সভ্য-সংখ্যা ৫৮৭, পুস্তক-সংখ্যা ১৭,৬১৪), প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ গ্রন্থাগার (স্থাপিত ১৯৩০, সভ্য-সংখ্যা ৪০০, গৃহ-নির্ম্মাণ-ব্যয় ২০০০৲, পুস্তক-সংখ্যা ৪০৮৯), শিবশঙ্কর পাঠাগার চন্দননগর (স্থাপিত ১৯১৯), হুগলী সাধারণ পাঠাগার, চুঁচুড়া (স্থাপিত ১৯১৪), হুগলী সেণ্ট্রাল এসোসিয়েশন, বাবুগঞ্জ (স্থাপিত ১৯০৩, সভ্য-সংখ্যা ৬২, পুস্তক-সংখ্যা ১০০), নিউ রিডিং ক্লাব (স্থাপিত ১৯১৮, গৃহ-নির্ম্মাণ-

শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায়

ব্যয় ৩০০০৲), হুগলী ফ্রেণ্ডস্ লাইব্রেরী (স্থাপিত ১৯১৫), বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগার (স্থাপিত ১৮৯১, সভ্য সংখ্যা ১০০, পুস্তক-সংখ্যা ৬০০০, গৃহ-নির্ম্মাণ-ব্যয় ৭,০০০ টাকা) ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি (স্থাপিত ১৯১৯, সভ্য-সংখ্যা ৬৭,

পুস্তক-সংখ্যা ৬৬০) এবং আরামবাগ লাইব্রেরী। এইগুলি সব মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত স্থানে অবস্থিত।

পল্লী-লাইব্রেরীর মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য :—শ্রীপুর বেনেভোলেণ্ট এসোসিয়েশন (স্থাপিত ১৮৯১, সভ্য-সংখ্যা
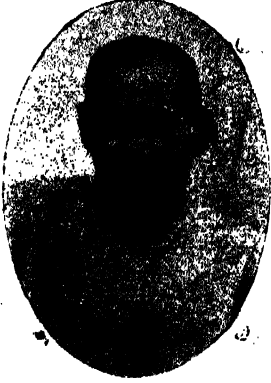
শ্রীযুক্ত রামবল্লভ নন্দন

৪৫, পুস্তক-সংখ্যা ৫২২), শরৎচন্দ্র পল্লীপাঠাগার, দেবানন্দপুর (স্থাপিত ১৯২২, পুস্তক-সংখ্যা ৭২৭); আশুতোষ স্মৃতি-মন্দির, জিরাট (স্থাপিত ১৯২৮, সভ্য-সংখ্যা ২৫, পুস্তক-সংখ্যা ৭৮৫); এই লাইব্রেরীর ব্যবহারের জন্য ৺সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহাদের পৈতৃক ভবন ছাড়িয়া দিয়াছেন। ভাণ্ডারহাটী তিলক লাইব্রেরী (স্থাপিত ১৯২৩, সভ্য-সংখ্যা ২০, পুস্তক-সংখ্যা ৯৪৩); গোপালনগর সারস্বত পাঠাগার (স্থাপিত ১৯১৩,সভ্য-সংখ্যা ৪৬, পুস্তক-সংখ্যা১৬০০); জাঙ্গিপাড়া কৃষ্ণনগর সাধারণ পাঠাগার (স্থাপিত ১৯২৬, সভ্য-সংখ্যা ১৫, পুস্তক-সংখ্যা ৭৮৭); চণ্ডীপুর তরুণ সঙ্ঘ (স্থাপিত ১৯৩০, সভ্য-সংখ্যা ১৫৮, পুস্তক-সংখ্যা ৪০৮); হেমচন্দ্র পাঠাগার, রাজবলহাট (স্থাপিত ১৯২৩, সভ্য-সংখ্যা ১২০, পুস্তক-সংখ্যা ১,৭৫২) ; কৈলাসচন্দ্র লাইব্রেরী, হরিপাল ; পল্লী পাঠাগার, বন্দীপুর (স্থাপিত ১৯১৭) ; প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী স্মৃতি পাঠাগার (স্থাপিত ১৯২৪) ; রমাপ্রসাদ সাধারণ পাঠাগার, কৃষ্ণনগর (স্থাপিত ১৯২৪) ; গোঘাট বিবেকানন্দ লাইব্রেরী (স্থাপিত ১৯৩৩, পুস্তক-সংখ্যা ২০০) ; বলাগড় সাধারণ পাঠাগার (স্থাপিত ১৯২৪) ; বীণাপাণি লাইব্রেরী, বাজরা (স্থাপিত ১৯২৪) ; দশঘরা ফ্রেণ্ডস্ ক্লাব (স্থাপিত ১৯১৭) ; গিরিশ লাইব্রেরী, আকনা (স্থাপিত ১৯২৪) ; সাধনা সাহিত্য-কুটীর, দীঘস্থই (স্থাপিত ১৯১৬) ; তেঘড়া সাধারণ পাঠাগার (স্থাপিত ১৯২৫) ; রাজহাটী, পাঠাগার (স্থাপিত ১৯৩৩)। হুগলী জেলায় আর যে সব লাইব্রেরী আছে তাহাদের বিবরণ এপর্য্যন্ত না পাওয়ায় উল্লিখিত হইল না। শ্রীরামপুর সাধারণ পাঠাগারের কার্য্য-প্রসারের জন্য সম্প্রতি অতিরিক্ত গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্রীরামপুর

রামবল্লভ নন্দন দাতব্য চিকিৎসালয়—বাঁশবেড়িয়া

মিউনিসিপ্যালিটীর সুযোগ্য চেয়ারম্যান শ্রীযুত কানাইলাল গোস্বামী মহাশয় মিউনিসিপ্যালিটীর তরফ হইতে গৃহ-নির্ম্মাণের সাহায্য-কল্পে এক হাজার টাকা দান করায় সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

১৮টী গ্রন্থাগারের নিজস্ব গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। স্বর্গীয়

জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বদান্যতায় উত্তরপাড়ার সাধারণ পাঠাগার, জননেতা সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের বদান্যতায় শ্রীরামপুর পাঠাগার এবং দানবীর হরিহর শেঠ মহাশয়ের বদান্যতায় চন্দননগরের "নৃত্যগোপাল স্মৃতি-মন্দির" নির্ম্মিত হইয়াছে। তা'ছাড়া কোন্নগর, মাহেশ, বৈদ্যবাটী, মানকুণ্ডু, তেলিনীপাড়া চন্দননগর প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের গ্রন্থাগার, হুগলী সেণ্ট্রাল এসোসিয়েশানের পাঠাগার, হুগলী নিউ রিডিং ক্লাব—হুগলী ফ্রেণ্ডস্ লাইব্রেরী, বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগার, আরামবাগ পাঠাগার, কৃষ্ণনগর রমাপ্রসাদ লাইব্রেরী, রাধানগর প্রসন্নকুমার লাইব্রেরী, হরিপাল, দশঘরা, রাজবলহাট প্রভৃতি লাইব্রেরীর নিজস্ব গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ত্রিবেণী এবং আরও কয়েকটী স্থানে নিজগৃহ-নির্ম্মাণের প্রচেষ্টা চলিতেছে।

গ্রন্থাগারগুলিকে জেলা বোর্ড ও ইউনিয়ান বোর্ড পূর্ব্বে সাহায্য করিতে পারিতেন না; আইনগত বাধা ছিল—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সংশোধনী বিল পেশ করিয়া আইন সংশোধন করান হইয়াছে। হুগলী জেলা বোর্ড সম্প্রতি এই সংশোধিত আইনের বলে গ্রন্থাগারের সাহায্য-কল্পে ৫০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। হুগলী জেলা বোর্ডের অক্লান্ত কর্ম্মী চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এজন্য বিশেষ ধন্যবাদার্হ। গোঘাট প্রভৃতি ইউনিয়ান বোর্ডও তাঁহাদের এলেকার মধ্যে স্থাপিত লাইব্রেরীতে সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ বিষয়ে হুগলী জেলাই প্রথম পথপ্রদর্শক। গত "নিখিল ভারত গ্রন্থালয় সম্মিলনের" প্রতিনিধিবর্গকে হুগলী জেলা বোর্ড, শ্রীরামপুর, চন্দননগর ও বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটীর পক্ষ হইতে মানপত্র-প্রদান একটি স্মরণীয় ঘটনা।

গ্রন্থাগারগুলিকে কেন্দ্র করিয়া নিরক্ষরতা-বিদূরণ এবং গণশিক্ষা-বিস্তারের প্রচেষ্টা চলিতেছে। গ্রন্থাগারের মত জ্ঞানপ্রচারের এমন সহজ উপায় আর দ্বিতীয় নাই। গ্রন্থাগারগুলি সকল ধর্ম্মালম্বীর, সকল সম্প্রদায়ের, সকল জাতির এবং সকল শ্রেণীর লোকের মিলন-ক্ষেত্র।

পূর্ব্বে এ জেলায় শিশুদের জন্য গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা ছিল না। গত পূর্ব্ব অক্টোবর মাসে বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগার একটী শিশুবিভাগ খুলিয়াছেন; তাহাতে শিশুদের পাঠস্পৃহা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ গ্রন্থাগারেও শিশুবিভাগ খোলা হইয়াছে এবং শিশু সভ্য ইতিমধ্যেই হইয়াছে। আরও কয়েকটী লাইব্রেরী শিশুবিভাগ খুলিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। জাতির মত জাতি গঠন করিতে হইলে গোড়ার পত্তন ভাল করা চাই। শিশুই তো ভবিষ্যৎ নাগরিক—দেশের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা। তাহাদের মানুষ করিয়া তুলিতে হইলে যাহাতে তাহাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় তদনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়াছে। ধরা-বাঁধা নিয়মে কড়া শাসনের অধীনে থাকিয়া ছেলেদের স্কুলে শিক্ষা পাইতে হয়। আর শিশু-লাইব্রেরীর স্বাধীন আব্‌হাওয়ার মধ্যে যদৃচ্ছামত চিত্তাকর্ষক অথচ শিক্ষণীয় পুস্তক-পাঠ অশেষ কল্যাণকর হইবে—মনুষ্যত্ব-বিকাশের সহায়ক হইবে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র

বৈদ্যবাটী যুবক-সমিতি পাঠাগার

'প্রতি হুগলী জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলনের সহিত গ্রন্থাগার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা থাকায় গ্রন্থাগার আন্দোলন ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের মধ্যে এই অভিনব প্রদর্শনী প্রথমে বাঁশবেড়িয়ায় অনুষ্ঠিত হয়—তাহার পর উত্তরপাড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুর ও পুনরায় বাঁশবেড়িয়ায় এইরূপ প্রদর্শনী হয়। কয়েক বারই জগতের নানা স্থান ও বরোদা-রাজ্য হইতে বহু মনোজ্ঞ দর্শনীয় দ্রব্য প্রেরিত হইয়াছিল। হুগলী জেলা গ্রন্থাগার সমিতির

দশভুজা সাহিত্য-মন্দির পাঠাগার—মানকুণ্ডু

উদ্যোগে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং সমগ্র বঙ্গদেশে ক্রমশঃ তাহার প্রভাব বিস্তৃত হইতেছে।

"কোন্নগর পাঠচক্রে"র উদ্যোগে—বিগত ২রা পৌষ কোন্নগরে হুগলী জেলায় প্রথম সাহিত্য-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। কর্ম্মসচিব শ্রীমান্ কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ স্থানীয় উদ্যোক্তৃগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে প্রথম সম্মেলনের কার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল।

হুগলী জেলার ইতিহাস-সঙ্কলনের মালমশলা-সংগ্রহের ১৯২৫ সালের ২রা আগষ্ট তারিখে "হুগলী জেলা ঐতিহাসিক সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়েক বৎসর ধরিয়া সমিতির উদ্যোগে বহু ঐতিহাসিক উপকরণ সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়। লেখকের উপর ঐ সমিতির কার্য্য ন্যস্ত থাকে। অবকাশাভাবে সম্প্রতি সমিতির কার্য্য স্থগিত থাকে; তাই চুঁচুড়ায় জন-কয়েক সাহিত্যিকের প্রচেষ্টায় বিগত ইষ্টারের বন্ধে ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধানের ও সাহিত্যালোচনার জন্য চুঁচুড়ায় 'হুগলী জেলায় ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধান ও সাহিত্য সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই অর্থনৈতিক দুর্দ্দিনে জমীদারদের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইতেছে; তাই সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে কার্য্য করিবার জন্য বিগত ১৯৩১ সালের ২১শে জুন "হুগলী জেলা ল্যাণ্ড-হোল্ডার্স এসোসিয়েশান" নামে একটী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার সভাপতি হইতেছেন জননেতা শ্রীযুত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় আর সম্পাদক হইতেছেন মাথালপুরের আদর্শ কৃষিক্ষেত্রের পরিচালক ও জমীদার শ্রীযুত মনোমোহন সিংহ রায়।
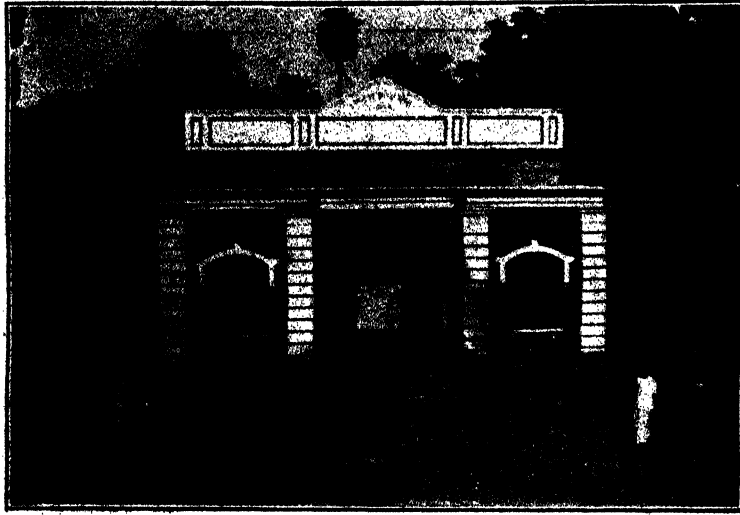
গৃহের বাহিরে আর্ত্তের সেবা এবং রোগীর শুশ্রূষা জগতের মধ্যে বোধ হয় বৌদ্ধ আমলে প্রথম আরব্ধ হয়—ভারতে সম্রাট্ অশোকের এবং সিংহলে সম্রাট্ পরাক্রম-বাহুর রাজত্ব-কালে আরোগ্যনিকেতন বা হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রাচুর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়—এমন কি, পশু-চিকিৎসার জন্যও ব্যবস্থা ছিল। হুগলী জেলায় হাঁসপাতালের ও দাতব্য চিকিৎসার সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে—সদর মহকুমায় ইমামবাড়া হাঁসপাতাল, শ্রীরামপুর মহকুমায় ওয়ালস্ হাঁসপাতাল এবং আরামবাগ সরকারী হাঁসপাতাল ছাড়া সাধারণের এবং জেলাবোর্ডের সাহায্যে এরূপ প্রতিষ্ঠান ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্ত্তমান সংখ্যা ৭৮টী; তন্মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্ভুক্ত ১৬টী এবং জেলা-বোর্ডের অধীনে ৬২টী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। তা'

ছাড়া কালাজ্বর চিকিৎসা-কেন্দ্রের সংখ্যা আটটী—সরকারী দুইটী এবং জেলা-বোর্ডের অধীনে ছয়টী। সমগ্র জেলায় ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক সমিতির সংখ্যা ১৪২টী; তন্মধ্যে মিউনিসিপ্যাল এলাকায় কেবলমাত্র তিনটী সমিতি আছে, বাকী সব পল্লীগ্রামে। হাঁসপাতাল বা দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনকল্পে জেলাবোর্ডের হাতে যে-সব দাতৃগণ অর্থ ন্যস্ত করিয়াছেন তাঁহাদের নাম এখানে উল্লেখ করিতেছি:—

বিলশোবা দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ ঘোষ চৌষট্টি হাজার একশত টাকা কোম্পানীর কাগজ, হরিপালের দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী দাসী পঁচিশ হাজার টাকা, জঙ্গীপাড়া ভাণ্ডারহাটীর দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পাঁচ হাজার টাকা, দশঘরার মিঃ টি, কে, রায় পাঁচ হাজার টাকা, ধনিয়াখালি ভাণ্ডারহাটীর শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় দুই হাজার টাকা, জগৎনগর ইউনিয়ান বোর্ড দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য শ্রীমতী রাধারাণী দাসী ছয় হাজার টাকা, কুমরুলের শ্রীমনোহর দে ও শ্রীবিহারীলাল কুণ্ডু তিন হাজার টাকা, রামনগরে শ্রীনেপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দশ হাজার টাকা, আনিয়ার ৬কৃষ্ণধন গাঙ্গুলী পাঁচ হাজার টাকা, চণ্ডীতলার সুপ্রসিদ্ধ কণ্ট্রাক্টর মিঃ পি, সি, কুমার কুড়ী হাজার টাকা, সিঙ্গুর হাঁসপাতালের জন্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক পনের হাজার টাকা, মেরিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয় জন্য শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র পাল এগার হাজার সাতশত টাকা এবং সুগন্ধা ইউনিয়ন বোর্ড ডিস্‌পেন্‌সরী জন্য শ্রীমতী বিশ্বেশ্বরী দাসী ছয় হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ গচ্ছিত রাখিয়াছেন। এই গচ্ছিত টাকা ছাড়াও অনেক দাতা চিকিৎসালয়ের গৃহ-নির্ম্মাণ-ব্যয় বহন করিয়াছেন। হাঁসপাতালের জন্য যে সব দাতা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম বাঙ্গালী চেয়ারম্যান, বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ও বিলাতে সেক্রেটারী-অব-ষ্টেটের কাউন্সিলের ভূতপূর্ব্ব সদস্য শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক সি, আই, ই, মহাশয় সিঙ্গুর "রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক হাঁসপাতালের" সুদৃশ্য গৃহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর স্যার ষ্টান্‌লী জ্যাক্‌সন ইহার দ্বারোদ্ঘাটন করেন। সিঙ্গুর হাঁসপাতালে একটী কালাজ্বর-কেন্দ্রও আছে।

হুগলী সেণ্ট্রাল এসোসিয়েশান পাঠাগার

মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত বহু স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত আছে; তাহার জন্য বহু দাতার নিকট সাধারণে ঋণী। বৈঁচীর জমীদার স্বর্গীয় বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় তাঁহার জমীদারী গবর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত করেন; তাহার আয় হইতে বৈঁচী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও বাঁশ-বেড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটীর অধীনে ত্রিবেণীতে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। অল্পদিন পূর্ব্বে সেখানে ৪টী রোগী থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে; স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটী তাহার ব্যয়ের জন্য বার্ষিক তিনশত টাকা দিয়া থাকেন। বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটীর অধীনে বাঁশবেড়িয়ায় আর একটী দাতব্য চিকিৎসালয় ও মাতৃসদন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনর শ্রীযুক্ত রামবল্লভ নন্দন মহাশয় এই

চিকিৎসালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহার ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে পঞ্চাশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ ন্যস্ত করিয়াছেন। দাতার নামে এই চিকিৎসালয়টীর নামকরণ হইয়াছে "রামবল্লভ নন্দন দাতব্য চিকিৎসালয়"। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটী এই চিকিৎসালয়ের সাহায্যকল্পে এবং ২টী রোগী থাকিবার ব্যবস্থার জন্য বার্ষিক তিনশত টাকা সাহায্য করিয়া থাকেন।

বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগার

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন ডাক্তার মার্শম্যান। ১৮৭০ সাল হইতে শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটী ইহার পরিচালনভার গ্রহণ এবং বিভাগীয় কমিশনর ওয়ালস্ সাহেবের নামে ইহার নামকরণ করেন। এই হাঁসপাতালে ৪২ জন রোগী থাকিবার ব্যবস্থা আছে। হুগলী ইমামবাড়া হাঁসপাতালের ব্যয় প্রধানতঃ মহশীন ফণ্ড হইতে নির্ব্বাহিত হয়। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে সিভিল সার্জ্জন ডাক্তার ওয়াইজের উদ্যোগে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই হাঁসপাতালে ৪০টী রোগী থাকিবার ব্যবস্থা আছে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে এই হাঁসপাতালের সহিত একটী পৃথক্ মেয়ে-হাঁসপাতাল স্থাপিত হয়। উত্তরপাড়া দাতব্য চিকিৎসালয় ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। এখানে ২০ জন রোগী থাকিবার ব্যবস্থা আছে। উত্তরপাড়ার জমীদার মুখোপাধ্যায়-বংশের দান ও সরকারের সাহায্যে এটী পরিচালিত হইয়া থাকে। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে উত্তরপাড়ার স্বর্গীয় রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় দ্বারবাসিনীতে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। প্রধানতঃ তাঁহার দান ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও সরকারের সাহায্যে এটী পরিচালিত হয়। বৈঁচীর বেহারীলাল দাতব্য চিকিৎসালয়ে ছয়টী রোগী থাকিবার ব্যবস্থা আছে; বৈঁচীর জমীদার স্বর্গীয় বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় এই চিকিৎসালয় ও স্কুল পরিচালনের জন্য দেড় লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত করেন। ডাক্তার ভোলানাথবাবুর দানে ১৮৯৩ সাল হইতে মোগুলাই গ্রামে এবং শ্রীনারায়ণ কুণ্ডুর ইটেচুণার দাতব্য চিকিৎসালয় চলিতেছে। ভদ্রেশ্বর দাতব্য চিকিৎসালয় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ও খানাকুল দাতব্য চিকিৎসালয় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে এবং বলাগড় দাতব্য চিকিৎসালয় ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে চলিয়া আসিতেছে। তারকেশ্বর ষ্টেট তারকেশ্বর দাতব্য চিকিৎসালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। রঘুনাথপুরের দাতব্য চিকিৎসালয় স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায়ের বংশধর হরিমোহন রায়ের বিধবা পত্নী শ্রীমতী গোলাপসুন্দরী দেবী ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; তাহার সম্পূর্ণ ব্যয় তাঁহার প্রদত্ত সম্পত্তির আয় হইতে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। চিকিৎসালয়ের সুন্দর বাড়ীটি লেখক সম্প্রতি দেখিয়া আসিয়াছেন। তা' ছাড়া তালিকাভুক্ত নহে, ব্যক্তিবিশেষের প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয় জেলার মধ্যে অনেকগুলি আছে। গত বারে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পৈতৃক বাসভবনে প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়ের উল্লেখ করিয়াছি। রাধানগরে রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতি-সৌধে একজন ডাক্তার বাস করেন। সেখান হইতেও রোগীকে ঔষধ দেওয়া হয়। হুগলীর জমীদার শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রলাল চৌধুরী স্বীয় পিতৃদেব ডাক্তার বদনচন্দ্র চৌধুরীর নামে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। চুঁচুড়ায় ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের স্থাপিত আয়ুর্ব্বেদীয় ও হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ও আছে। স্বাস্থ্যোন্নতি-

অন্য আর একটী অত্যাবশ্যকীয় কাজ হইতেছে সুপেয় পানীয় জলের ব্যবস্থা। সে সম্বন্ধে সুব্যবস্থা হইয়াছে মিউনিসিপ্যাল এলেকার মধ্যে উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, চন্দননগর, হুগলী, চুঁচুড়া ও বাঁশবেড়িয়ায় কলের জলের ব্যবস্থা আছে—অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটীতেও গ্রামে গ্রামে টিউব ওয়েল দেওয়া হইয়াছে; জেলা বোর্ডের অধীনে এমন গ্রাম নাই যেখানে টিউবওয়েলের ব্যবস্থা হয় নাই। জেলা বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান রায় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের আমলে গবর্ণমেণ্টের নিকট কর্জ্জ লইয়া অধিকাংশ টিউব ওয়েল বসান হইয়াছিল। বর্ত্তমান চেয়ারম্যান শ্রীযুত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আমলে টিউব ওয়েলর সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি সুসংস্কৃত অবস্থায় রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ভাল রাস্তার অভাব সর্ব্ববিধ উন্নতির অন্তরায়। হুগলী জেলা-বোর্ডের অধীনে ১০৫ মাইল পাকা রাস্তা ও ৪৮৪ মাইল কাঁচা রাস্তা ও লোক্যাল বোর্ডের অধীনে ৫৫৭ মাইল রাস্তা আছে। পুলের সংখ্যা ১৬৫টী। হুগলী জেলার মধ্যে আরামবাগ মহকুমায় রাস্তার বড় অভাব ছিল। যেসব রাস্তা পূর্ব্বে ছিল, দামোদর বন্যায় তাহা নষ্ট হইয়া যায়। আরামবাগ যাতায়াত দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। তারকবাবুর আন্তরিক চেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আরামবাগের যাতায়াত সহজসাধ্য হইতেছে। তাই গত বৎসরে এই নূতন রাস্তা দিয়া আরামবাগ ইউনিয়ন বোর্ড সম্মেলনে যাওয়া জেলা বোর্ডের সভ্যগণের পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছিল। মায়াপুর হইতে খানাকুল কৃষ্ণনগর যাইবার রাস্তাটী নির্ম্মিত হইতেছে। তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে "রাজা রামমোহন রোড"। সম্প্রতি এই রাস্তা দিয়া রাধানগরে রাজা রামমোহন রায়ের শতবার্ষিকী স্মৃতি-তর্পণ করিতে যাওয়া শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বসু এবং লেখকের পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছিল। এই সব দুর্গম রাস্তা সুগম করার জন্য জেলাবাসিগণ তারকবাবুর নিকট অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ। মিউনিসিপ্যাল এলাকায় উত্তরপাড়া হইতে বাঁশবেড়িয়া পর্য্যন্ত রাস্তার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। গৌরহাটী এবং চন্দননগর বাদে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড আধুনিক প্রথম শ্রেণীর রাস্তায় পরিণত হইয়াছে। রোড বোর্ড হইতে বর্দ্ধমান আরামবাগ রোডের নির্ম্মাণ-কার্য্যের ব্যবস্থা হইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশন

শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু (ভূতপূর্ব্ব মেয়র)

শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু মেয়রের কার্য্যকাল পরে যে নির্ব্বাচন হয় তাহাতে মিঃ এ, কে, ফজলুল হক মেয়র ও অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচিত হন। মাসাধিক কাল এই নির্ব্বাচন ব্যাপার লইয়া গোলযোগ চলে। সম্প্রতি সরকার কর্ত্তৃক বর্ত্তমান নির্ব্বাচন নাকচ করা হইয়াছে।
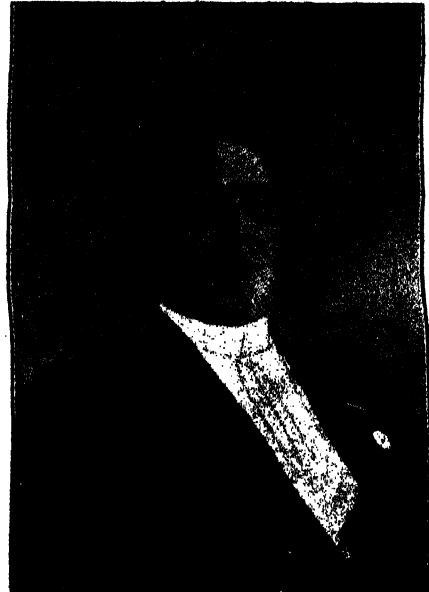
মিঃ এ, কে, ফজলুল হক

— মত ও পথ —

— ধর্ম্ম —

হিন্দু বলিয়া বাঙ্গালায় যে জাতির সংখ্যা এখনও ২ কোটী ২২ লক্ষেরও অধিক, সেই জাতিটাকে যদি বাঁচাইতে হয়, তাহা হইলে যাহারা আত্মকলহে বিব্রত, তাহাদের ছাড়িয়া দিয়াই একদল নিঃস্বার্থ সর্ব্বত্যাগী নারীপুরুষের অভ্যুত্থান-কামনা আমরা চিরদিনই করিয়া আসিতেছি। হিন্দুধর্ম্ম দুই দশ হাজার বৎসরের ধর্ম্ম নহে, অনাদি-যুগের ধর্ম্ম। এই হেতু ইহার যথার্থ মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে হইলে কেবলমাত্র একটী পথ আছে—উহা হইতেছে, ইহার জন্য সর্ব্বস্ব-পণ করা। পিতা থাকিবে না, আত্মীয়স্বজন থাকিবে না, ধনদৌলত থাকিবে না, থাকিবে ধর্ম্মকে আবিষ্কার করার অগ্নিময়ী আকাঙ্ক্ষা। ইহাতে অসমর্থ বলিয়া যাঁহারা বলেন শাস্ত্র অনুসরণ করিলেই ধর্ম্মরক্ষা হইবে, তাঁহাদের এই কথা স্মরণ থাকে না, যে অন্ধমতই মহাপাপ। দেশের ধর্ম্ম যায়, এ অবস্থায় ধর্ম্মের অভ্যুত্থানকল্পে যখন আত্মদানের কৃপণতা আছে, তখন শাস্ত্রার্থ এইরূপ কলুষিত চিত্তে কোন দিন যথার্থ মূর্ত্তি লইতে পারে না।

ধর্ম্ম বলিতে যে কোন শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ হইতে অজস্র বাণী উদ্ধৃত করিয়া হিন্দুশাস্ত্রে পরিপূর্ণ অনভিজ্ঞ লোকের সম্মুখে উপস্থাপিত করা আদৌ তপস্যা অথবা পাণ্ডিত্যের পরিচয় নয়। যদি হিন্দুজাতিকে রক্ষা করার বিজয় মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বতোভাবে শ্রীভগবানের চরণে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াই তাহা সিদ্ধ করিতে হইবে।

অনেকে মনে করেন—কলিযুগ, অতএব এই যুগে অধর্ম্মই প্রবল হইবে। আমরা ইহা সর্ব্বতোভাবে অস্বীকার করি। কেন না, পাপের সহিত সংগ্রামের ইতিহাস কৃত-যুগেও বিরল ছিল না। কাম ও অহঙ্কারের সহিত ঘোরতর সংগ্রামের কাহিনী আমরা বেদ, পুরাণে কম পাই না। ব্রাহ্মণ, ঋষি অভিমানবগণকেও আমরা ব্যাভিচারপরায়ণ হইতে দেখি। ভারতে যখন চতুষ্পাদ ধর্ম্ম ছিল, তখনও গুরু-পত্নী-হরণের কুৎসিৎ চিত্র আঁকিয়া উঠিতে দেখি—এই হেতু কলিযুগকে অতীতের অপেক্ষা অধিক আপরাধী বলিয়া কেমন করিয়া স্বীকার করিয়া লইব? কলিযুগে ধর্ম্ম ও সত্যরক্ষার জন্য সংঘর্ষ বরং ভারতে অধিক পরিমাণে দেখা যায়। বিগত পাঁচহাজার বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখ, দেখিবে, এরূপ ঘন ঘন ধর্ম্মান্দোলন কোন যুগে, কোন দেশে, কোন জাতির মধ্যে ঘটিয়াছে বলিয়া খুঁজিয়া পাইবে না।

বিগত পাঁচ হাজার বৎসর আমরা রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, শিক্ষা, সমাজ সব কিছুর প্রতি উদাসীন হইয়া মানব-জীবনের ঋতময় লক্ষ্যের দিকে সর্ব্বত্যাগী হইয়া ছুটিয়াছি। সত্যবতীকে দেখিয়া পরাশরের কামোদয়, মেনকাকে দেখিয়া বিশ্বামিত্রের রেতঃপাত, এমন ঘটনা ভাগবৎ বিধান বলিয়া অতীতের জ্ঞানগর্ব্ব বর্ত্তমানকে যতই ধাঁধাঁ লাগাইয়া দিক, কুরুক্ষেত্র-সংগ্রামের পর ভারতের আকাশবাতাসে ত্যাগ-বৈরাগ্যের অনল-শিখা যেভাবে উদ্ভাসিত হইয়াছে, যেরূপ মহাপ্রাণ মানবের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে, তাহা অতীতের তুলনায় নগণ্য নহে। ভবিষ্যৎ বংশকে বরং সমধিক উচ্চস্তরে উন্নীত করার আয়োজন কলিযুগেই অধিক হইয়াছে। শঙ্কর, বুদ্ধের কথা ছাড়িয়া দিই, মদনমনোমোহন কষিতকাঞ্চন শ্রীগৌরাঙ্গের চরিতচিত্র কামানলদগ্ধ কত নারীপুরুষের অন্তরে পবিত্রতার হোমশিখা জ্বালাইয়া দেয়। কামকাঞ্চন-পরিত্যাগী অগ্নিমূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণের নাম স্মরণে কত কামনা-দগ্ধ জীবের হৃদয় অমৃতে অভিষিক্ত হয়। আর বীরেন্দ্রকেশরী নরেন্দ্রনাথের বিদ্যুন্মূর্ত্তি কত তরুণের বুকে যে আশা সঞ্চারণ করে তাহা আর বলিবার নহে।

আনুষ্ঠানিক জীবনপর্ব্ব আজ বিকৃতশবের ন্যায় সমাজের নাকে পূতিগন্ধ সঞ্চার করে। স্বাস্থ্যপূর্ণ বিশুদ্ধ

নিশ্বাস পর্য্যন্ত লইতে পারা যায় না। আজ চাই নিছক ভাগবৎ জীবন। সে জীবন লাভ করিতে হইলে, চাই মানুষের তনুমনোপ্রাণ দিয়া ভগবানের আরাধনা। এই যে আজ ব্রাহ্মণ বলিয়া হিন্দুর মধ্যে এক শ্রেণীর লোক গর্ব্বান্ধ, তাঁহারা কি জানেন না, নাভির পুত্র ঋষভ ও ঋষভের পুত্রগণই ভাগবৎ ধর্ম্মপ্রচার করিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন? যদি হিন্দুজাতির প্রতি ভগবানের করুণা জাগ্রত হইয়া থাকে, তবে আজি হিন্দুসমাজ রক্ষার জন্য পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়িয়া মতবাদের কুহকে আপনাদের বিভক্ত বিচ্ছিন্ন করার আন্দোলন পরিত্যাগ করিয়া জগতের মধ্যে ভগবত বিশ্বাসই জাগাইয়া তুলিতে হইবে। মানুষের কণ্ঠ যদি উদাত্তস্বরে কোন বাণী উচ্চারণ করে, তবে সে বাণী কোন সাম্প্রদায়িক সিদ্ধির অনুকূল করিয়া লইলে উহাতে দাম্ভিকতাই প্রকাশ পায়। সংসারতাপদগ্ধ মানবকে আহ্বান করিয়া আনিতে হইবে মুক্তি-বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায়। গর্ভ-জন্ম-জরা প্রভৃতি দুঃখকে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া হিন্দুজাতি যাহাতে ভারতকে ভাগবৎতীর্থে পরিণত করিতে পারে, তাহার জন্য ভগবৎপ্রাপ্তির পরম ঔষধ যে ঈশ্বরবিশ্বাস তাহারই অগ্নিকাণ্ড সৃষ্টি করিতে হইবে। ঈশ্বরভক্তির ঝরণাধারায় ভারতের নরনারীকে অভিষিক্ত করিতে না পারিলে এ জাতি রক্ষা পাইবে না।

এই কাজ শাস্ত্রব্যবসায়ীর নহে। এই কাজ সংসারচক্রে ভ্রাম্যমান, আত্মীয় পরিজনের মোহে ভ্রান্ত পণ্ডিতের পক্ষে সম্ভব নহে। আরও চীৎকার করিয়া বলি, এই কাজ বৃত্তিভোগী প্রচারকের সাধ্যেও কুলাইবে না। জাগো বাংলার তরুণ, জাগো বাংলার তরুণী—অস্বীকার করুক তোমাদের নিখিল বিশ্ববাসী, যদি পাইয়া থাক অন্তরে ভগবানের সাড়া, এস! ঐ আকাশ হউক তোমার চন্দ্রাতপ, ধরিত্রীর উলঙ্গ কোল হউক তোমার বিশ্রামনিকেতন। কেবল জীবনধারণের ব্যবস্থাটুকু রাখিয়া আর লজ্জানিবারণের জন্য একখণ্ড বস্ত্র কটিতটে জড়াইয়া, সকল প্রয়োজন বিসর্জ্জন দিয়া জয়-রবে স্বার্থপর জগতের ধূর্ত্ততার আবরণ বিদীর্ণ করিয়া দাও।

মনে রাখিও, ঈশ্বরবিশ্বাস আর ঈশ্বরভক্তি তোমার বীর্য্য; মনে রাখিও কর্ম্ম, জ্ঞান ভগবৎপ্রাপ্তিরই হেতু। মনে রাখিও, আগম ও বিবেক হইতেই তুমি ভগবানকে সর্ব্বতোভাবে অবগত হইবে। আগম বেদ। তাই বেদে বিশ্বাস ঈশ্বরলাভের ভিত্তি এবং বিবেকের দ্বারা ব্যাপ্য ও ব্যাপকরূপ যে নিত্য পুরুষোত্তম-মূর্ত্তি তাঁহারই সন্ধান পাইবে। কর্ম্ম ও জ্ঞান সংযুক্ত হইলেই নিজের মধ্যে সমগ্র ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য বিরাজিত হইয়া জীবনকে ধন্য করে। আজ সকল আন্দোলন উপেক্ষা করিয়া, বৈরাগ্যের গৈরিক নিশান উড়াইয়া জাতিকে ভগবৎপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় উন্মাদ করিয়া তুলিবার জন্য এই নবজাগ্রত দলকে অভিযান করিতে হইবে। হে উদীয়মান তরুণজাতি, শাস্ত্রবাণী আজ তোমার নিয়ামক নয়। বিবেকের কশাঘাতে হৃদয়-যন্ত্রে যে শিবের বিষাণ গর্জ্জিয়া উঠে, তাহাতে কর্ণপাত কর। বল ওঁ হরি ওঁ।

— সমাজ —

আমরা "প্রবর্ত্তকে" বহুবার বলিয়াছি—হিন্দুজাতি বলিয়া যে আখ্যা আমাদের হইয়াছে, তাহা বিদেশীর হাতের দুরপনেয় কলঙ্কবিশেষ। কিন্তু ইহার প্রতিবাদ আমরা করি নাই। প্রতিবাদ করার শক্তি নাই। যদিও ভারতে হিন্দুজাতি সংখ্যায় গরিষ্ঠ, কিন্তু হইলে কি হইবে, তাহাদের অখণ্ডত্বের অনুভূতি নাই। শিক্ষিত হিন্দু যেদিন ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ধ্বজা ধরিয়া মোহনীয় খৃষ্টান ধর্ম্মের আক্রমণ হইতে হিন্দুজাতিকে রক্ষা করিতে ছুটিয়াছিল, সেদিনের প্রয়োজন যদি চিরদিনের গর্ব্বের কারণ হইয়া থাকিত, শিখজাতির মতই বাংলায় এক উপধর্ম্মের অস্তিত্ব হিন্দুজাতির সংখ্যা হ্রাস করিত। সুখের বিষয়, যাঁহারা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মী তাঁহারা আজ নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। কিন্তু ইহা হইলেই সবখানি হইল না। ভারতে হিন্দুর মধ্যে শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত, এ সকল তো আছেই, ইহা ব্যতীত সনাতনী, অসনাতনী ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ এই সকল পার্থক্যের সহিত স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য এমন অসংখ্য প্রকার ভেদ হিন্দুজাতিকে ছন্নছাড়া করিয়াছে। 'হিন্দু' বলিতে অখণ্ড-ভাবে আমাদের কোন দাবী করার একপ্রকার অধিকার নাই

বলিলেও চলে। আমরা যে কি এবং কোথায় চলিয়াছি সেদিকে দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য। সেদিন কাণ্ডজ্ঞান-হীনতার এক বীভৎস দৃশ্য চক্ষে পড়ে দেওঘরে মহাত্মা গান্ধীর উপর সনাতনীদের আক্রমণে। সনাতনধর্ম্মী বলিয়া যাঁহারা দাবী করেন, এই আক্রমণকারীদের মধ্যে তাঁহারা ব্যতীত অসনাতনী যাঁহাদের বলা হয় তাঁহারা যে ছিলেন না, একথা বলাই বাহুল্য। মহাত্মাজী বলেন—"**Lathi, blows rained upon the hood of the car; ......fortunately I was siting in a corner and the pane fell just on my side That the hood was not broken to pieces was not the fault of those who wielded heavy lathis.**"

এই হিংসা, এই আক্রোশ, পরপীড়ন-প্রয়াস সনাতন-ধর্ম্মীর কেন, কোন সভ্য-জাতির চরিত্রে দেখিতে পাইবে না। সনাতনীরা বলিতে পারেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদীর সংখ্যাধিক্যবশতঃ সনাতনীদের সত্যকে অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ পশুবল-প্রয়োগে দাবাইয়া রাখা হয়। সংবাদপত্রে, বক্তৃতামঞ্চে এইরূপ গুণ্ডামী অসনাতনীদলের চিরকীর্ত্তি; অতঃপর তাঁহাদের পন্থা ধরিয়াই কাঁটা দিয়া কাঁটা বাহির করিবার মত এই উপায় সনাতনীদের লইতে হইয়াছে। যদিও প্রকাশ্য সভায় এই কর্ম্ম সনাতনীদের নহে বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে; তবুও আমাদের জিজ্ঞাস্য, এই অপকীর্ত্তি যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহাদের পরিচয় কি? কোন সনাতনী সভায় সনাতনীদলের কার্য্যে ইঁহারা কি যোগদান করেন নাই ও ইঁহারা কি হরিজন না কংগ্রেস-দলের লোক? অথবা অহিন্দু? আমাদের বিশ্বাস, একদিন যেমন সনাতনী বলিয়া যাঁহারা প্রখ্যাত তাঁহারা কোন প্রকাশ্য সভায় কোন মতবাদ প্রকাশ করিতে বিপরীত-পন্থীদের নিকট এই প্রকার বাধা পাইয়া বিমুখ হইতেন, সেই একই পন্থা আত্মদল-পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সনাতনীরাও আশ্রয় করিয়াছেন। ইহাতে সনাতনী যাঁহারা তাঁহাদের গৌরব নাই। একই প্রকৃতি নামভেদে বিভিন্ন-মূর্ত্তি লইয়া সমাজের পাপপঙ্ক ঘোলাইয়া তুলিতেছে মাত্র। অনেকে বলেন, মহাত্মা গান্ধী হরিজন আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া এই দুর্নীতি-সংঘটনের কারণ হইলেন। কিন্তু ইহা উপলক্ষ মাত্র। হিন্দু-সমাজে ভিন্নমতবাদীর প্রতি এইরূপ ঘৃণা ও বিদ্বেষ নূতন নহে। যদি কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির মত অন্যে অস্বীকার করে, অতি বিজ্ঞ জনকর্ত্তৃকও তাহাকে অকারণ দোষভাগী করা হয়। এবং তাহাকে ঘৃণ্য ও হেয় প্রতিপাদন করিবার জন্য অনেক বিজ্ঞজনকেও মিথ্যায় আশ্রয় লইতে দেখিয়াছি। ইহা মনুষ্যস্বভাব।

ব্রাহ্মণ মানবজাতির আদর্শ। ব্রাহ্মণের চরিত্র সর্ব্বপ্রাণীর হিতসাধনে সতত সমুদ্যত বলিয়াই দিব্য ও অনিন্দ্য। ব্রাহ্মণ কখনও কাহারও অনিষ্ট করিবেন না।

"মৈত্রী সমস্তভূতেষু ব্রাহ্মণস্যোত্তমধনম্"—সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি মৈত্রীই ব্রাহ্মণের উত্তম ধন। হিন্দু-সমাজের এই উৎকৃষ্ট আদর্শ ব্রাহ্মণ আজ রাখিতে পারে নাই বলিয়াই হিন্দু-সমাজ, হিন্দু-ধর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায়। নিখিল হিন্দুজাতি ব্রাহ্মণকে জাতির আদর্শ রক্ষার অধিকার সর্ব্বতোভাবে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। কিন্তু আজ পরপ্রত্যাশীর পরিণাম অধিক শোচনীয়। তাই কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি শুধু নহে, কোন শ্রেণীবিশেষের প্রতিও দেশ ও সমাজের কল্যাণ সাধনার আস্থা আজ হিন্দু-জাতি হারাইতে বাধ্য হইয়াছে। হিন্দু সমাজের গোড়ায় মরণ-ঘুণ ধরিয়াছে। তাহা নিরাকৃত করার বুঝি আর উপায় নাই। হিন্দু-সমাজকে নূতন ভিত্তি রচনা করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইবে। নাম হিন্দুই হউক, সনাতনীই হউক, অসনাতনীই হউক, অথবা নূতনীই বলিয়া কিছুকে কেহ উপহাস করিলেও, সত্যাশ্রয়ী যে জাতি ভাগবৎ-বিশ্বাস বুকে জ্বালাইয়া বাংলায় নূতন প্রাণ আনয়ন করিবে, সেই জাতি ভারতের অনাদিযুগের বেদের পুনরুদ্ধার করিবে। বেদের মতই আমাদের এই বাণী অভ্রান্ত।

আজ সকল সমস্যা ছোট হইয়া গিয়াছে। সব-চেয়ে অর্থ-সমস্যাই বড় হইয়া উঠিয়াছে। শুধু বাংলায় নয়, সমগ্র জগতে। মানুষের অভাব এইরূপ নিষ্ঠুর মূর্ত্তি লইয়া একদিন যে আসিবে, ইহা দূরদর্শী যাঁহারা তাঁহারা জানিতেন। অনেকে মনে করেন, বিগত মহাসংগ্রামের ফলে অর্থ-সমস্যা বড় হইয়া উঠিল; তাঁহারা এখনও

অর্ব্বাচীন যুগের সভ্যতার মূলে যে ভয়ঙ্কর অন্ধতা আছে, তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না। ভারতের অর্থ-সমস্যার প্রতিকারোদ্দেশ্যে দিল্লীতে যে অর্থ-সমস্যা-সমাধানের সরকারী সভা বসিয়াছিল, তাহাতে স্যার জর্জ্জ সুস্টার এইরূপ অর্থ-সঙ্কটের দুইটী কারণ দেখাইয়াছেন, তাহার মধ্যে প্রথম কারণটী আমাদের প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—"... ..The process of production had been so enormously improved, both in industry and agriculture, that far less human labour was required to turn out goods necessary for the worlds consumption. This had created a state of affiairs which had the appearance of over-production, but which really in essence was much more truly a case of under-consumption due to failure in the distribution of purchasing power."—যন্ত্র-যুগের খ্যাতি যাঁহাদের মুখে ধরে না তাঁহাদের চক্ষের সম্মুখে এই সত্যটা ভুল-ভাঙ্গার পক্ষে যথেষ্ট হইলে, আমরা সুখী হইব।

মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মানুষের শ্রমজাত হওয়ার সনাতন বিধান পরিবর্ত্তিত হওয়ার ফলে, জগতে বেকার-সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। মোহগ্রস্ত মানুষ যন্ত্র-যুগের আড়ম্বরে আত্মঘাতী হইয়াও এখনও বুঝিতেছে না, যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে তার জীবনের প্রয়োজন সিদ্ধ করার যে ভগবদ্দত্ত শক্তি জন্মগত অধিকার রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে,—তাহার অনুশীলন না করিলে মানুষের পরিপূর্ণ তত্ত্বই অনাবিষ্কৃত থাকিয়া যায়। আমরা এইজন্য মানুষকে কেবল কবি ও দার্শনিক রূপেই দেখিতে চাহি না, শিল্পী ও স্রষ্টার আসনে বসাইয়া পূজা দিতে চাই। ভবিষ্য-যুগের জন্য পূর্ণ মানবত্বকে লাভ করার ইহা আমাদের তপস্যা হওয়া উচিত।

রুশ ও ইটালীর অভ্যুত্থানের মূলে এইরূপ একটা খণ্ড সত্য নিহিত থাকায় এবং লেনিন, ষ্টালিন, মুসোলিনীর আবির্ভাবে জাতীয় অর্থ-সমস্যা দূর করার নব প্রেরণা কার্য্যতঃ প্রবর্ত্তিত হওয়ায় নিখিল জগতের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, রাষ্ট্রে, ধর্ম্মে, সমাজে দীর্ঘদিন ধরিয়া যে ভুয়া চালবাজী চলিতেছিল অর্থ-সমস্যার কশাঘাতে তাহা নিরসিত হইয়া সর্ব্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আসিবে। রুশের যন্ত্রশালা বন্ধ করিতে হইবে অচিরে; সকল স্বাধীন দেশেই গৃহ-শিল্পের উন্নতিসাধনার প্রয়াসই জাতিকে সার্থক করিবে। কি শিল্প-জাত, কি কৃষিজাত সকল দ্রব্যই যন্ত্রসাহায্যে প্রচুর উৎপন্ন করিলে তাহার চাহিদা আর মিলিবে না—ইহা ক্রমশঃ সকল জাতিই উপলব্ধি করিতেছে। স্বদেশজাত শিল্প, বাণিজ্য স্বদেশবাসীর মধ্যেই চালাইয়া সকল স্বাধীন দেশেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী করিয়া তোলার আয়োজন হইতেছে। সেদিন ছিল যেদিন ম্যান্‌চেষ্টার ভারতের ত্রিশকোটী লোকের বস্ত্রাদি যোগাইয়া, ভারতের চরকা ও তাঁতকে উঠাইয়া সম্পৎশালী হইয়াছে, কিন্তু আজ বম্বে, আমেদাবাদ ম্যান্‌চেষ্টারের প্রতিদ্বন্দ্বী। ম্যান্‌চেষ্টারকে বাঁচিতে হইলে একদিন যেমন চরকা, তকলী ভারতবাসীর হাত হইতে কাড়িয়া লইতে হইয়াছিল সেইরূপ ভারতের কাপড়ের কলগুলিকেও ভাঙ্গিয়া চূরিয়া নিশ্চিহ্ন করিতে হইবে। কিন্তু সে যুগ আর এ যুগ আকাশ-পাতালের ন্যায় পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে; সে যুগে যাহা সম্ভব হইয়াছিল, এ যুগে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব জল্পনা-কল্পনা, যুক্তি-চুক্তি যতই আশ্রয় করা হউক, সেদিন আর ফিরিয়া আসিবে বলিয়া মনে হয় না। ম্যান্‌চেষ্টারের সুবৃহৎ যন্ত্রশালা গুটাইয়া শীঘ্রই ক্ষুদ্রাকারে পরিণত হইবে। এইখানে এই কথাও বলিয়া রাখি, যে মানুষের প্রাণ যেদিন জাগিবে, বুদ্ধির বিলাস ছাড়িয়া মানুষ যেদিন শ্রমের কদর বুঝিবে, সেদিন দেশ ও জাতি বিশেষের জন্য একটীও যন্ত্রশালার প্রয়োজন হইবে না। ইউরোপ যাহা ছাড়িতে ব্যগ্র, ভারত তাহা গ্রহণে উদ্যত—পরানুকরণের পাপ ভবিষ্যতে নিষ্ঠুর প্রায়শ্চিত্ত-দ্বারা ক্ষালন করিতে হইবে। চিন্তা-বিলাসী মনে করিয়াছিল, যন্ত্র সাহায্যে মানুষের প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে, মানুষ শ্রম ও সময় অধিক পাইবে; ইহা দিয়া সে সূক্ষ্মতর আধ্যাত্ম আলোচনায় অতিমানুষ হওয়ার সুযোগ পাইবে—কিন্তু ভগবানের চাওয়া অসাধারণ জীবন প্রাপ্তির উপায়, "কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ" হওয়া; সে নীতি লঙ্ঘন করিলে, মানুষের অহঙ্কার বড় হইয়া উঠে, ভ্রান্তির পর ভ্রান্তি এমন বিপ্লব সৃষ্টি করে, যখন মানুষকে

নাকে খৎ দিয়া আবার সেই সনাতন কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিতে হয়।

বৃটিশ-শাসিত বাঙ্গালায় ৫০১১৪০০২ অধিবাসী আছে, ইহার মধ্যে ১৪৪১৪৯২২ লোক মাত্র খাটিয়া খায়—অবশিষ্ট সাড়ে তিন কোটী লোকেরও অধিক নরনারী একপ্রকার বেকার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—তাহারা ইহাদের ঘাড়ে চাপিয়া বৎসরের পর বৎসর জীবনযাপন করে। যন্ত্র-যুগের প্রভাবে কত শিল্প যে উঠিয়া গিয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। মহাত্মার কৃপায় খাদি প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, সহস্র সহস্র নরনারী তবুও একটা শ্রমের ক্ষেত্র পাইয়াছে। ঘরে ঘরে যদি এই শ্রমের আদর বাড়ে, পাঁচ কোটী বাঙ্গালীর বস্ত্র-সমস্যা, খাদ্য-সমস্যা আসিতেই পারে না। আর ইহার জন্য যন্ত্রপাতির সালসাও পাইতে হইবে না। বাঙ্গালায় তূলা উৎপন্ন করিতে বিশেষ শ্রম দিতে হয় না। সর্ব্বত্রই তূলা-বীজ রোপণ করিলে প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে তূলা পাওয়া যায়। চট্টল ও ত্রিপুরার পার্ব্বত্য-প্রদেশে স্বভাবতঃই যে তূলা উৎপন্ন হয়, তাহাতে বাঙ্গালীর পরিধেয় বস্ত্রের অভাব হইতে পারে না।

কাপড়ের মত ভারতের বাহির হইতে খাদ্যদ্রব্য কম আসে না। ভারতের উপকণ্ঠে যাভাদেশে সেদিন পর্য্যন্ত ত্রিশ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। আজ পাঁচ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন করিলেও, উহার কাট্‌তি নাই। কেননা, ভারতে চিনি তৈয়ারী হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের ঘরে ঘরে একদিন ইক্ষু ও খর্জ্জুরের রস হইতে চিটাগুড়, তালপাটালি, মিশ্রি পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইত। শ্রমের মূল্য বুঝিতে শিখিলে এই কার্য্যে আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা নিয়োজিত হইতে পারে; পাঁচ কোটী অধিবাসীর মধ্যে যে দেশে সাড়ে-তিন কোটীর অধিক বেকার বসিয়া খায়, সেখানে জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য ব্যবহার্য্য বস্তু সৃষ্টি করিয়া লওয়া কিছু অসম্ভব কথা নহে। রুশ বাঁচিতে চায়; সে যন্ত্রপাতির সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীতে অসংখ্যপ্রকার নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্য মাটীর মূল্যে ছড়াইয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প। জাপান যন্ত্রপাতির সাহায্যে মাটীর দরে জিনিষপত্র বিক্রয় করে। কিন্তু প্রত্যেক জাতির মধ্যে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তার যে আগুন ধরিয়াছে তাহাতে এই সুবিধা অধিকদিন কোন জাতিই পাইবে না, সকলের শীঘ্রই হাত গুটাইয়া আসিবে। রুশ আজ যন্ত্র-সাহায্যে প্রচুর গম সৃষ্টি করে—খাইবে কে? কোন দেশের মাটী তার সন্তানদের ভরণ-পোষণে অক্ষম? বিশেষতঃ ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ—দ্রব্যাদি উৎপন্ন করার পথ তাহার কাছে মুক্ত আছে; সুতরাং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সে যদি সুযোগ, সুবিধা পায়—রুশ কেন, কোন দেশই এই ক্ষেত্রে জয়ী হইবে না। আসল কথা, জাতীয় চৈতন্য উদ্বুদ্ধ হইলে কোন জাতিই কোন জাতিকে নিঙ্‌ড়াইয়া আত্মপুষ্টির সুবিধা পাইবে না। প্রত্যেক জাতিই স্বদেশ ও স্বজাতির মধ্যে স্বাবলম্বনের সাধনায় সিদ্ধ হইয়া মাথা তুলিতে চাহিলে, অর্থ-সমস্যার জটিলতা দূর হইবে। ভারতের লোকবল, জমির উর্ব্বরতা, নির্ম্মাণ-চাতুর্য্য অতুলনীয়। জজ্জসুস্টার ভারতের অর্থনীতির সমস্যা সম্বন্ধে আর একটা কথা বলিয়াছেন—"All possible energy should be devoted to the developing of the internal market and improving the standard of living in India." কিন্তু কথা হইতেছে, ভারতের প্রাণশক্তি নিঙ্‌ড়াইয়া কেবল ইংলণ্ড যদি বাঁচিবার পণমাত্র রাখিত, তাহাতেও ভারতের এইরূপ দৈন্যমূর্ত্তি হইত না। অবাধ বাণিজ্যনীতি ইংলণ্ডকেও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে পরাস্ত করিয়াছে; ইংলণ্ডকে এই অবস্থায় বাঁচিতে হইলে, ভারতের সহিত তাহার একটা বাণিজ্য-সম্পর্কিত চুক্তি চাই। "অটোয়া কন্‌ফারেন্স ইহারই অভিব্যক্তি। ভারতকে বাঁচাইতে না পারিলে ইংলণ্ডের প্রাণরক্ষা হইবে না, বৃটেন তাহা বুঝিয়াছে। আমরা বলি, ভরণ করার শক্তি আছে বলিয়াই এদেশের নাম ভারত। কিন্তু এই ভরণশক্তির পথ তাহার ক্রমেই রুদ্ধ হইতেছে। অটোয়ার চুক্তি এই পথ মুক্ত করিবে না; বরং তাহাকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন করার পথই প্রশস্ত করিবে। ভারতকে বাঁচিতে হইলে, ভারতের অখণ্ড জাতীয়তার অনুভূতি সর্ব্বাগ্রে জাগ্রত হওয়া চাই। রাজ্যশাসনসৌকর্য্যে সে পথ বন্ধ হইয়া আসিতেছে। যন্ত্রশালার প্রভাব ইহার পশ্চাতে আছে। আর আছে, সরকারী মোটা বেতনের প্রলোভন। স্বার্থের বন্ধন জাতীয়তা-রক্ষার উত্তম উপাদান নহে। স্বার্থপরতন্ত্রতাতেই বাংলার সহিত বোম্বাইয়ের বিহারের বিরোধ, ইহা চাপিয়া রাখা আর সম্ভব নহে। বাঙ্গালী যদি জীবনসমস্যা বাংলার স্তন্যক্ষীরেই নিরাকরণ করিতে পারে, ভারতের কোন প্রদেশের উৎপন্ন খাদ্যশস্য ও বস্ত্রাদি বাংলার বাজারে বিকাইবে না। বাংলা সর্ব্বজাতির সর্ব্ব-প্রদেশের কামধেনু হইয়া সকলকে পুষ্ট করিয়াছে, আজ তাহাকে সংযত হইতে হইবে। ইহা ব্যতীত অন্য উপায়ে নিখিল ভারতের চৈতন্য সঞ্চার করা সম্ভব নহে। আজ মাদ্রাজে পাঁচলক্ষ টন চাউল ব্রহ্মদেশ হইতে আমদানী হওয়ায় এবং জাপান হইতে প্রচুর পরিমাণে আলু আসিয়া বাজার ছাইয়া দেওয়ায়, মাদ্রাজবাসীর চাঞ্চল্যের সীমা নাই। আর বাংলায় চতুর্দ্দিক্ হইতে, নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য হইতে নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির আমদানী হইতেছে; অথচ বাংলায় বেকারসমস্যার অবধি নাই, সেদিকে বাঙ্গালীর দৃষ্টি নাই। অতঃপর দৃষ্টি দিতে হইবে।

বাংলার শ্রমশিল্পের পথও একপ্রকার বন্ধ; কামারের কাজ বাঙ্গালীর হাতছাড়া হইবার উপক্রম হইয়াছে। বাংলায় কম্বল প্রস্তুত আর হয় না। এনামেল, এলুমিনিয়ামের ব্যবহার করায় পিতল, কাঁসার কাজও কমিয়া আসিতেছে। চটকলের দৌলতে, বাংলায় যে চট বুনান হইত তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পল্লীতে কাগজ প্রস্তুত করার কারখানা সকল উঠিয়া গিয়াছে। জাপানী অনুকৃত সিল্কের আমদানী হওয়ায় বীরভূমের একটী বড় শিল্প নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর উপায়ের পথ সবই প্রায় বন্ধ, এই অবস্থায় আজ তাহাকে ঘর সাম্‌লাইয়া, আর্থিকক্ষেত্রে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইবে। বাঙ্গালী শ্রমের তপস্যায় মনোযোগ দিক্। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, পাঁচকোটী বাংলার অধিবাসীর মধ্যে তিনলক্ষ, তিরানব্বই হাজার লোক মাত্র বেতনভোগী। অতএব কৃষি বাণিজ্য-শ্রমশিল্পে বাংলার প্রাণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে না পারিলে, বাঙ্গালী যে বাঁচিবে না, এ বিষয় নিঃসংশয়!

— স্বাস্থ্য —

আমাদের বাংলাদেশে ১৯২১ হইতে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ১,৩২,৫৫,৩৬৯ জন জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহার মধ্যে ৬৮,৯৬,৪৮৬ জন পুরুষ এবং ৬৩,৫৯,৮৮৯ জন স্ত্রীলোক! এই সময়ের মধ্যে ১,৬৮,৪৭,১০৯ জন লোক কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। ৮৩,৮৮,০৯৫ জন পুরুষ, ৮৪,৫৯,০১৪ নারী। বাংলায় পুরুষের অপেক্ষা নারীর জন্মসংখ্যা কম, মৃত্যুসংখ্যা অধিক। বাঙ্গালী মেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে জাতিকে সজাগ হইতে হইবে।

২৮শে এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলেরা ও বসন্তের প্রকোপ অধিক দেখা যায়। মেদিনীপুর, হাওড়া ও চব্বিশ পরগণা, বাখরগঞ্জে বিসূচিকারোগে মৃত্যু-সংখ্যা অধিক হইয়াছে। বর্দ্ধমানে বসন্তে মৃত্যুসংখ্যা অধিক দেখা যায়। কলিকাতাতেও কলেরা ও বসন্তের আক্রমণ বাড়িয়াছে। যক্ষ্মারোগে মৃত্যু বাংলায় দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

বাঁচিবার উপায় কি! দুর্দ্দিন যতই হউক, টিকিয়া থাকিতে পারিলে, একদিন যে সুপ্রভাত হইবে, এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। ময়মনসিংহ হইতে আমার এক আশ্রমবাসী লিখিয়াছেন,—"আশ্রমনির্ম্মাণে বিলম্ব হওয়ার কারণ এখানকার লোকজনের কুঁড়েমী। লোকগুলিকে ঠেলিলেও নড়িতে চাহে না। কেবল তামাক খায় আর গল্প করে। ঘাড়ে চেপে থেকে কাজ করাতে হয়।" কথাগুলি যে মর্ম্মান্তিক সত্য, তাহা বাংলায় শ্রমিকের পরিচয় যাঁহারা রাখেন, তাঁহারা বুঝিবেন। মরণের এই অলক্ষণ সর্ব্বাগ্রে দূর করিতে হইবে। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ"। এই নীতি আজ সমাজের আদর্শপুরুষ যাঁহারা, তাঁহাদের পালন করিতে হইবে; গীতায় এই কথারও সার্থকতা আমাদের আজ উপলব্ধিগম্য করিতে হইবে। "যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ"—এই দিক্ দিয়াও প্রত্যেক মহাপুরুষের শ্রমশীলতা সকলকে শ্রমে উৎসাহ দিবে। অলসতা যে কত বড় পাপ এবং নিরলস জীবন যে কত বড় সুকৃতি, জীবনে তাহার চূড়ান্ত অনুভূতি-লাভ হইয়াছে। জাতিকে দীর্ঘজীবী করিবার ইহা একটী পথ।

দ্বিতীয় উপায়, নিয়ম ও সংযম। অসাধারণ জীবনের জন্য নহে, সমাজের প্রত্যেককেই কেবল বাঁচিবার জন্যই এই ব্রতে দীক্ষা দিতে হইবে। নিয়মিত নিদ্রা, নিয়মিত পান-ভোজন, নিয়মিত শ্রম, নিয়মিত বাক্যালাপ—জীবনের সমস্ত প্রয়োজন নিয়মিত করিতে পারিলে সংযমের সহিত ব্রহ্মচর্য্য অবধারিত রক্ষিত হইবে। কেবল ব্রহ্মচারীর পক্ষেই যে ব্রহ্মচর্য্য পালনীয় তাহা নহে, পরন্তু গৃহীর পক্ষেই ইহার সমধিক অনুশীলন বাঞ্ছনীয়। কেননা, গৃহিজীবনের ভিত্তির উপরেই বাংলার ভবিষ্যৎ সমাজস্থিতি নির্ভর করে।

তৃতীয় উপায়, বিশুদ্ধ জলবায়ুর ব্যবহার, বিশুদ্ধ খাদ্য-দ্রব্যাদি গ্রহণ। প্রতিদিন ভুক্ত বস্তুর অসার ভাগ মলমূত্রে ও ঘর্ম্মে পরিত্যাগ করার দিকে লক্ষ্য রাখা।

সর্ব্বপ্রধান স্বাস্থ্যরক্ষার নীতি সত্যবাক্যকথন ও ক্রোধ হিংসাবর্জ্জন। এই সাধনের জন্য একমাত্র কৌশল, যথানিয়মে ত্রিসন্ধ্যা-যজন।

বাঁচিবার এই উত্তম নীতি জীবননীতির সহিত সংগ্রথিত করিয়া দিলেও, মরণের আকর্ষণ এত অধিক, যে ইহা বর্জ্জন করিতে পারিলেই যেন মানুষ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে।

অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ স্বাস্থ্যরক্ষার পরম নীতি। এবং মুক্ত আকাশের নীচে মেরুদণ্ড সোজা করিয়া শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রমালার উদ্গানে শরীরে যে চেতনার সঞ্চার হয়, তাহা অমৃততুল্য। আশ্রমে এই নীতি স্বভাবগত করিতে আমার প্রায় দ্বাদশবর্ষ কাল অতিবাহিত হইয়াছে। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে যে কোন প্রকার স্থির আসনে উপবিষ্ট হইয়া ঋজু-ভাবে নিশ্চল থাকা। স্বভাবতঃ ইহাতে শ্বাস ও প্রশ্বাস ধীরমন্থরগতি প্রাপ্ত হয়। এইরূপ উপাসনানীতি মানুষকে কোনমতে অল্পায়ুঃ করে না। কিন্তু অধঃপতিত জাতি ধর্ম্মের জন্য জীবন অথবা জীবনের জন্য ধর্ম্মকে এক করিয়া লইবে; কি? বাঙ্গালী যদি বাঁচিতে চায়, এই পথে তাহাকে অগ্রসর হইতে হইবে। বাংলার তরুণকে আমরা এই পথেই আহ্বান করি।

— নিষ্কর্ষ —

বাঙ্গালীর বিবেকানন্দ—

বাঙ্গালীর জাগরণের মূলে যে সব অধ্যাত্মবীর, চিন্তাবীর ও কর্ম্মবীরের অবদান আছে—তাঁদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ নিশ্চয়ই শুধু অন্যতম নহেন, একজন প্রধান পুরুষ। এই বিবেকানন্দের পরিচয় মনীষী বিনয় কুমার সরকার তাঁর আলবার্ট হলের বক্তৃতায় একটু নূতন করে' তাঁর স্বভাব-সুলভ সোজা তেজাল ভাষায় শুনিয়েছেন। বিবেকানন্দকে কখনও তিনি নেপোলিয়ানের জুড়িদার, কখনও নীট্শের সঙ্গে তুলনীয় বলে' ভাব্তে ভালবাসেন; কখনও বীরপূজক কার্লাইল, কখনও বা স্বয়ং যৌবন-বীর হিট্লারের সমকক্ষ বলে'ও তাঁকে মনে করেন—বিবেকানন্দ-সাহিত্য তাঁর ভাষায় এক বিপুল বিশ্বকোষ বা একখানা মহাভারত বল্লেও চলে।

শ্রীযুত সরকার দেখিয়েছেন, বিবেকানন্দ বাঙ্গালীকে ঘা মেরে জাগিয়েছেন—চাবুকের ঘা, জুতার ঘাই বল্তে হয়; তবু বাঙ্গালী তাতে রুষ্ট হয় নি।

"বিবেকানন্দের কপাল ভাল। বিবেকানন্দ মুখ-ঝাড়া ছাড়া আর কিছু জানে না। তার বচন মাত্রই তাঁর কশাঘাত, প্রতি মুহূর্ত্তে দেশের লোককে গাল দেওয়া, তিরস্কার করা, চাবুক লাগান আর জুতাইয়া লম্বা করা, এই ছিল বিবেকানন্দের দস্তুর। মজার কথা, দেশের লোক বিবেকানন্দের জুতা যত খাইয়াছে, ততই তাঁহাকে আরও বেশী সম্মান করিয়াছে, ভালবাসিয়াছে, পূজা করিয়াছে। মারিয়াছে জুতা আর খাইয়াছে পূজা—এই হইল বাঙ্গালী-মুখো বিবেকানন্দের চরিত-কথা।"

এ কথাগুলির মধ্যে সত্য আছে। জাগাবার কাজ, বাঁচাবার কাজ আজও শেষ হয় নি—এ মরা জাতকে চেতিয়ে তুল্তে হ'লে, আজও দরকার বিবেকানন্দের মতই এমনই একজন পুরুষ-সিংহ—যাঁর—

"কথাগুলায় যে কোনও মানুষেরই প্রাণ চ্যাক করিয়া উঠে। যে শুইয়া আছে সে উঠিয়া বসে, যে বসিয়া আছে সে খাড়া হইয়া উঠে, যে খাড়া আছে সে চলিতে থাকে, আর যে চলিতেছে সে দৌড়াইতে লাগিয়া যায়। ঠিক যেন ছোকরারা যোয়ান হয়, আর যোয়ানরা পালোয়ান হয়।"

অর্থাৎ এক কথায়, এমন একজন নেতা, যিনি বাঙ্গালীর—

"প্রতিদিনকার আটপৌরে জীবনে উৎসাহদাতা, মন্ত্র-দাতা, শক্তি-দাতা—প্রত্যেক গৃহস্থের, প্রত্যেক নরনারীর।"

শ্রীযুক্ত সরকার বলেছেন—

"এইরূপ শক্তিদাতাই বিবেকানন্দের মুখ-ঝাড়া।......বাংলার নরনারী কর্ম্মযোগী বিবেকানন্দের জুতা খাইয়া প্রতি মুহূর্ত্তের ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য-নিষ্ঠায় চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে।"

সত্যই কি দেশবাসী চাঙ্গা হয়েছে? এই সঙ্গে এইটুকুও বলা দরকার যে, "অহঙ্কারের দম্বলে" বিবেকানন্দের যে আধ্যাত্মিকতা, তার গঠনের মূলে জীবন্ত নরদেবতার চরণে তাঁর নির্ব্বিশেষ আত্মোৎসর্গের অবদান ও মহত্ত্ব কতখানি, সে দিক্‌টাও বিনয়বাবুর মুখে বিবেকানন্দের এই পরিচয়-ভাষণে শুন্তে পেলে, পরিচয়টা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলে'ই আমরা মনে কর্তে পার্তাম ও আরও সুখী হ'তাম। কেন না, বিবেকানন্দের মুখের কথার চেয়ে তাঁর জীবনের শিক্ষার দাম আরও ঢের বেশী বলে'ই আমরা মনে করি। আর সেই জীবনখানি ছিল না কি উৎসর্গের মন্ত্রপূত, লেলিহান অগ্নিশিখা—"মানুষী তনুমাশ্রিতের"ই প্রতি অহেতুক প্রেম ও চির আত্মদানের প্রত্যক্ষ প্রতীকস্বরূপ? মুখের কথার সঙ্গে এই নীরব কিন্তু জলন্ত জীবন-দৃষ্টান্তও তিনি সমগ্র বাঙ্গালী জাতির জন্যই রেখে গেছেন।

ব্যক্তিত্ব ও উৎসর্গ—

এই প্রসঙ্গে ব্যক্তিত্ব-বাদের যে একটা ঝড় দেশের বুকের উপর দিয়ে ঝাপ্টা দিয়ে বয়ে চলেছে, সেটা একটু আলোচনার মধ্যে এসে পড়ে। তরুণের কাছে আজ এই 'ফিলজফি'ই খুব বড় 'ফিলজফি'—কেন না, এটা যুগের ঢেউ-রূপেই আমাদের আক্রমণ কর্ছে, অধিকার কর্ছে। এ সময়ে, উৎসর্গের বা আত্মসমর্পণের কথা তোলা—অনেকের কাণে বীভৎসতা বা বিভীষিকারই সৃষ্টি করে। এই রে, আবার ধর্ম্ম বা গুরুবাদেরই প্রচার চলেছে! মে-মাসের ইংরাজী "প্রবুদ্ধ ভারতে" এ সম্বন্ধে "The lure of individuality" নামে একটী সম্পাদকীয় আলোচনা সময়োপযোগী হয়েছে। সম্পাদক যুগের চিন্তাধারা স্পর্শ করে'ই বলেছেন—

"People are now-a-days very eager to preserve and assert their individuality. The ideal man according to the modern conception is he, who has got individuality."

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও তিনি দুঃখের সহিত ভাল করে লক্ষ্য করেছেন ও সেই কারণে স্পষ্ট করে' বল্তে পেরেছেন—

"*Unfortunately, it will be found that when people* talk of the freedom of thought and action, they are moved more by gross tendencies than any laudable

purpose. In the name of individuality, they become only selfish and egoistic, and a sad cause of dissension and disruption in their fields of activity. Why is there so many parties in every country? Why do organisations break up? Why are there different bodies even of one religious institution? On clear analysis, it will be found that the main cause is the existence of some individuals, who are given more to self-aggrandisement than to the collective interest, who are actuated more by love of power than by that of service."

এগুলি ভুক্তভোগীর কথা; আর এ দেশ ও জাতের সম্বন্ধে বিশেষ-ভাবে খাটে। ব্যাধির মূল যে এখানেই, এ তিক্ত তীব্র সত্য আজ তরুণ সম্প্রদায়ের বুঝা দরকার ও বুঝান দরকার।

খাঁটী ব্যক্তিত্বের কথা মানুষ জানে না, তাই আধুনিক ব্যক্তিত্ববাদীর সঙ্গে ধর্ম্ম ও ত্যাগ-যজ্ঞের বিবাদের অন্ত নেই। লেখকেরই কথায়—

"The world says 'Live for yourself'; religion says, 'Live for others.' The world says, 'Always exert your own will'; religion says, 'Try to lose your own will in the will of God. The world asks man to be self-assertive; religion advises man to be self-sacrificing."

বাংলার ভবিষ্যৎ প্রথমের কথা উপেক্ষা ও দ্বিতীয়ের উপদেশই প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করবে—কেন না, আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়েই সত্য ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা—নরে নারায়ণের উপলব্ধি সিদ্ধ হওয়ার একমাত্র উপায়। সিংহগ্রীব বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব-বীজ এইরূপেই ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রেমে নূতন জন্ম ও জীবন পেয়ে শতদল-রূপে ফুটে উঠেছিল।

পুরাণের প্রমাণ—

ভারতের পুরাণ এতদিন ছিল 'myth"—স্রেফ মিথ্যার আবর্জ্জনাস্তূপ—হেয়, অশ্রদ্ধেয়। কিন্তু ক্রমে নূতন চোখ বুঝি ফুট্‌ছে—বিজ্ঞান ও ইতিহাসে নূতন গবেষণার দুয়ার খুলছে—ইউরোপীয় মনীষীদেরই অনুসন্ধানে; অতএব এসব স্বীকারোক্তি আর উপেক্ষা করা যায় না।

প্রফেসর "হেল্‌মট ডি টেরা" ইয়েলের প্রাকৃতিক ইতিহাস-সম্বন্ধীয় মিউজিয়মের গবেষণাসমিতি-কর্ত্তৃক নিয়োজিত হয়ে সদল-বলে যে উত্তর-ভারতাভিযান করেন, তার অনুসন্ধানের ফলে যে সব অস্থিকঙ্কালাদি আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে আদি-যুগের মানবজাতির অনেক রহস্যই উদ্ঘাটিত হবে। একটু উদ্ধৃত করি—

"Investigation of the anthropoid fossils brought back from India by the Yale expedition reveals the presence of a new species belonging to a new genus and three new genera.........One of the new genera was given the name 'Ramapithecus' after Rama, the hero of the Sanskrit epic, 'Ramayana', and the other 'Sugrivapithecus' after Sugriva, the king of the monkeys in this saga."

তবে কি,

"সীতা নাড়ে হাত, বানরে নাড়ে মাথা।
বুঝিতে নারিনু আমি নর-বানরের কথা॥"

—আর অবিশ্বাস্য রহস্য নয়, পরন্তু ঐতিহাসিক কঠোর সত্যরূপেই এ যুগের সভ্য বৈজ্ঞানিক জাতির কাছেও রামায়ণ মহাভারতের তথ্যগুলি বরণীয় হতে চলেছে?

ডাঃ জি, বসু সেদিন "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে" তাঁর পুরাণ-সম্বন্ধীয় বক্তৃতায় এই সব কথাই গভীর শ্রদ্ধা ও পাণ্ডিত্য সহকারে আলোচনা করেছেন। তাঁর কথা অপ্রামাণ্য কল্পনামাত্র নয়, ইহা তিনি সুবিচারপূর্ব্বক বেশ প্রাঞ্জল করে'ই বুঝিয়েছেন। বিস্তারিত-ভাবে উদ্ধৃত করার স্থান নেই—তাঁর এই কথাগুলি অন্ততঃ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—

"সাধারণের ধারণা, যে প্রাচীন হিন্দুজাতির কোনই ঐতিহাসিক বোধ ছিল না। গভীর-ভাবে পুরাণগুলি আলোচনা করিলে, এই ধারণা যে অমূলক তাহা প্রমাণিত হয়। পুরাণের তথাকথিত অতিরঞ্জনোক্তি ও অসম্ভব তথ্যগুলি কতকগুলি বিশিষ্ট বিধানের অনুসরণ করে ও সেগুলি বিশিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়াই উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সেই বিধানানুযায়ী ব্যাখ্যা করিলে, পুরাণের কথা সত্য ঐতিহাসিক প্রমাণোক্তি বলিয়াই স্পষ্ট বুঝা যায়।"

সমালোচনা

সরস্বতী—১ম খণ্ড—"দেব তত্ত্ব গ্রন্থমালার" ইহা প্রথম গ্রন্থ। শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য ৮৲ টাকা। শ্যামবাজার, ৩১ তেলিপাড়া লেন হইতে শ্রীশচীন্দ্র কুমার ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বাংলায় মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন সুপণ্ডিত আছেন, যাঁহাদের বিশ্বকৌষিক (Encyclopaedic) জ্ঞানের আধার বলা যাইতে পারে, তাঁহাদের মধ্যে পণ্ডিত শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিঃসন্দেহে অন্যতম। কিন্তু এত বড় পাণ্ডিত্যের জাহাজ হইয়াও, বঙ্গ-সাহিত্য তাঁহার নিকট যাহা প্রত্যাশা করে, তাহার তুলনায় তিনি প্রকাশিত-গ্রন্থরাজিরূপে অবদান দিয়াছেন খুবই কম, এ অভিমান আমরা করিতে পারি। তাই অনেকদিন পরে তাঁহার এই সুপরিকল্পিত 'দেব-তত্ত্ব-গ্রন্থমালার' প্রথম গ্রন্থের প্রথম খণ্ডখানি পাইয়া আমরা সত্যই পুলকিত ও আশান্বিত হইয়াছি। পরিকল্পনাটি সুবৃহৎ, ইহার সম্পূরণ হইলে বাংলা সাহিত্যে একটী কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

আলোচ্য গ্রন্থখানিও বৃহৎ; সঙ্কলয়িতার অসাধারণ সংগ্রহশক্তি ও তাহা লইয়া গবেষণার সুগভীরত্বের পরিচয় দেয়। সেই সঙ্গে তাঁহার ভাষা ও সন্নিবেশগুণে এমন একটী বিশেষজ্ঞের বিষয়ও সর্ব্বসাধারণেরও পক্ষে এমন প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য হইয়াছে, যাহার জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। বিশেষজ্ঞের পক্ষেও, আমাদের ধারণা, গ্রন্থকারের সংগৃহীত অনেক তথ্য নূতন ও নিগূঢ় অর্থের সঙ্কেত বহন করিবে। যাহা আগে পূর্ণিমায় হইত, কেমন করিয়া শ্রীপঞ্চমীতে লক্ষ্মীপূজার স্থলে সেই সরস্বতী পূজা প্রবর্ত্তিত হইল, তাহার বিবরণ কৌতূহলজনক। স্ত্রীদেবী সরস্বতীর অঞ্জলীপ্রদানে বাংলায় স্ত্রীলোকের অধিকার ছিল না, আজকাল বাঙ্গালীর সে ভয় কাটিয়াছে, বাংলার বালিকাকুল শিক্ষার অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে দেবী ভারতীর অঞ্জলীপ্রদানেরও অধিকার পাইয়াছে। বৈদিক আপ্রীসূক্তের দেবীত্রয়—ঈড়া, ভারতী, সরস্বতী, যাহা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রাণ, অপান, ব্যান, এইরূপে উল্লিখিত, তাহা হইতেই তো তান্ত্রিক ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না বা সরস্বতীর উদ্ভব হয় নাই, গ্রন্থকারই আমাদের এ অনুমান ঠিক কি না, ভাল বলিতে পারিবেন। জৈন, বৌদ্ধ ও জাপানী সরস্বতীর বিবরণ অত্যন্ত কৌতূহল তর্পণ করে—বিশেষতঃ জৈনদের "শ্রুতিস্কন্ধ সারস্বত যন্ত্রে" ভারতের মানচিত্রে ভারত-ভারতীর প্রাচীন পরিকল্পনাটী অভিনব ব্যঞ্জনাপূর্ণ, ইহা নিঃসন্দেহ।

'পঞ্চজন', 'পঞ্চজাত' বা "পঞ্চ কৃষ্টি"—শব্দ ঋগ্বেদের একটী রহস্য-কুঞ্চিকা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সায়নাচার্য্য ইহার নানা অর্থ দিয়াছেন, কাজেই সায়নের নিকট ইহার সুমীমাংসা পাওয়া যায় না। অমরকোষে "মনুষ্যাঃ, মানুষাঃ, মানবাঃ, পঞ্চজনাঃ" এই প্রতিশব্দগুলি পাওয়া যায়। 'মনু ইতি' "শব্দ-রত্নাবলী" বলেন। "মানুষ" নামক দেশ আছে, ইহা ঋগ্বেদের ৭ম।১৮ সূ। ৯ঋকে পাওয়া যায়। জন্‌ ধাতু হইতে জন ও জাত উভয় শব্দই উৎপত্তি-ক্ষেত্র বা দেশবাচক ধরা যাইতে পারে। ৬ম।৬১ সূ।১২ ঋকে "ত্রিষধস্থা সপ্ত ধাতুঃ পঞ্চজাতা বর্ধয়ন্তি বাজে বাজে হব্যাভূৎ"—হইতে ইহাও মনে করা যাইতে পারে, যে এই পঞ্চজন বা পঞ্চজাত দেশ সরস্বতী-পারে অবস্থিত ছিল এবং ইহার অধিবাসীরাও উক্ত নামে পরিচিত ছিল।

তার পর, সপ্ত সরস্বতীর কথা। জনৈক বিশেষজ্ঞ এ সম্বন্ধে আমাদের পত্রে লিখিয়াছেন:—"মানভূম জেলার প্রান্তবর্ত্তী বরাহভূমে এক সরস্বতী আছে। সাঁওতাল পরগণার এই সরস্বতীর নাম ব্রহ্মাণী, নদীয়ায় বাগ্দেবী, হুগলীতে সরস্বতীই। তিনটাই একার্থবাচক শব্দ বা নাম। ইনি প্রথমা সরস্বতী। সিন্ধুনদের এক শাখার নাম সরস্বতী ছিল। Ferista'র ইতিহাসে ইঁহার নাম 'নীলার'—নীলা সরস্বতী। ইহা হইতেই পঞ্জাবের নামান্তর 'সারস্বত' হইয়াছে। ইনি দ্বিতীয়া। 'Vedic India'য় অথর্ব্ব-বেদোক্ত যে তিনটী সরস্বতীর উল্লেখ আছে, তাহাতে আফগানিস্থানের "হেলমণ্ড" নদীকে হরস্বৈতী বা সরস্বতী সাব্যস্ত করা হইয়াছে। ইনি তৃতীয়া। শ্রীমদ্ভাগবতে এক পশ্চিম-বাহিনী সরস্বতীর কথাও আছে। এশিয়ামাইনরের Quarahisar Hermes নদীর নামটী Sarasisat Harabat'এর সম্পর্কযুক্ত—ইহা সেই পশ্চিমবাহিনী সরস্বতীই ধরা যাইতে পারে। ইনি চতুর্থী। মহাভারত ভীষ্ম পর্ব্বে ৯ম অধ্যায়ে 'নীলা' নদীর নাম পাওয়া যায়—ও অধ্যায়েই 'পঞ্চমী' নদীর নামও আছে। ইহা দ্বিতীয়া সরস্বতীর দৌহিত্রী-কন্যা পঞ্চমী সরস্বতী—ইজিপ্তের নাইল নদী। ইউরোপের Danube নদী (স্কন্দের শক্তি ষষ্ঠীর নামান্তর দেবসেনা—দানবহা), হিরোদোটস যাহাকে Ister বা ষষ্ঠী নাম দিয়াছিলেন, তাহাই ষষ্ঠ সরস্বতী। Dr. Hall বলেন, Ister নদীর পারে Skudra গণের বসতি ছিল। মহাভারতে নকুলের দিগ্বিজয়ে পাই, "শূদ্রাভীরগণাশ্চৈব যে চাশ্রিত্য সরস্বতীম্"—Dr Halls'এর এই Skudra বা Scythianগণই শূদ্র বা আভীর জাতি। অভিধানে 'মহাশূদ্র' ও 'আভীর' এক পর্য্যায়ভুক্ত।"

সপ্তম সরস্বতীর উল্লেখ এই উক্তির মধ্যে নাই, বোধ হয় ইহাই প্রয়াগ ও বারানসীর মধ্যবর্ত্তী সরস্বতীই তাঁহার অভিপ্রেত। তবে এই বিবৃতিটীর দিকে পণ্ডিত বিদ্যাভূষণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া রাখিলাম।

আলোচ্য গ্রন্থের সূচনায় পণ্ডিতজী লিখিয়াছেন—"হিন্দুধর্ম্ম সম্প্রসারিত আর্য্যধর্ম্ম। ইহা অনার্য্যমিশ্রিত আর্য্যধর্ম্ম নহে"—কথাটী আরও একটু বিশদ করিয়া বুঝাইবার যোগ্য।

গ্রন্থখানির সুদৃশ্য চিত্রগুলি শুধু সৌষ্ঠব ও গৌরব বৃদ্ধি করে নাই প্রত্যেক পাঠক পাঠিকারই অভিজ্ঞতা পুষ্ট করিবে। ছাপা, বাঁধা সুন্দর—বইখানি সর্ব্বাঙ্গমনোহর হইয়াছে।

সরল জ্যোতিষ—শ্রীজ্যোতিঃ বাচস্পতি কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ২৲ টাকা। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

অদৃষ্ট-জিজ্ঞাসু মানুষ জ্যোতিষ-শাস্ত্রে স্বতঃই আকৃষ্ট হয়। এ যুগে, উক্ত শাস্ত্রকে বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা ও প্রকাশ করার প্রয়োজন আছে। তাহা ছাড়া, সর্ব্বসাধারণের উপযোগী করিতে হইলে উহা আবার সরল ও প্রাঞ্জল করিয়া লিখিতে হইবে। শ্রীজ্যোতিঃ-বাচস্পতি মহাশয় এই দিক্ দিয়াই দীর্ঘ দিন ধরিয়া শ্রম দিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহার এই শ্রমের ফলে, বর্ত্তমান শিক্ষিত মহলে এ সম্বন্ধে বেশ একটা কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা জাগিয়াছে, মনে হয়। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁহারই এই প্রকার চেষ্টার আর একটি নিদর্শন স্বরূপ। এই গ্রন্থ-পাঠে জিজ্ঞাসু ও বিশেষজ্ঞ উভয় শ্রেণীর পাঠক উপকৃত হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। নির্ভুল-ভাবে কোষ্ঠী প্রস্তুত করার সরল নিয়মগুলির সকলেই প্রয়োগাভ্যাস করিতে পারেন ও ঘরে বসিয়া নিজের ও পারিবারিক প্রয়োজনীয় কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন। গ্রন্থকারের একটী বিশেষ গুণ তিনি সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি মুক্ত—তাই গ্রহস্ফুট ও ভাবস্ফুটের পাশ্চাত্য সহজ নিয়মগুলি সুবিচারে গ্রহণ করিতে তাঁর কুণ্ঠা হয় নাই।

বইখানি সাধারণের ব্যবহারোযোগী হইয়াছে বলিয়া সকলের নিকট আদরণীয় হইবে, আশা করি।

আশ্রম-সংবাদ

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ অক্ষয়তৃতীয়া উৎসব

দ্বাদশ বর্ষ, ১৩৪১ সাল

উদ্বোধন

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি, পাটনা হাই-কোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি সহৃদয় দেশপ্রাণ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাশ মহাশয় বার-এট-ল অনুগ্রহপূর্ব্বক মেলা ও প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিতে সম্মত হইয়াছেন।

উৎসব-সূচি

উৎসবের যে দৈনিক কার্য্য-সূচি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে যথাক্রমে প্রকাশিত হইল ঃ—

২রা জ্যৈষ্ঠ (১৬ই মে) বুধবার—উষাসংকীর্ত্তন, সমবেত উপাসনা, সপ্তশতী হোম ও পূর্ণাহুতি, উদ্বোধন-বাণী—শ্রীমতিলাল রায়।

অপরাহ্ণে—প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন—পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাশ।
ঐক্যতান বাদন—"সুরেন্দ্র স্মৃতি সমিতি"
সঙ্গীত। মেলার পরিচয়—শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত।
দ্বাদশবর্ষের বাণী—শ্রীমতিলাল রায়।
সভাপতির অভিভাষণ।

৩রা জ্যৈষ্ঠ (১৭ই মে) বৃহস্পতিবার—নামকীর্ত্তন ও কথকতা—প্রভুপাদ জিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী, ভাগবৎ-ভূষণ। বক্তৃতা—পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (বিষয়—তন্ত্র ও বৈষ্ণব সংঘর্ষ)।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ (১৮ই মে) শুক্রবার—নামকীর্ত্তন ও কথকতা—প্রভুপাদ জিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী, ভাগবৎভূষণ।
শ্রীযুক্ত কাণুপ্রিয় গোস্বামী কর্ত্তৃক "বিপদ ও স্বপদ" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৫ই জ্যৈষ্ঠ (১৯শে মে) শনিবার—নামকীর্ত্তন ও কথকতা—প্রভুপাদ জিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী, ভাগবৎ-ভূষণ।
শ্রীযুক্ত অমিয়মাধব সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধান সঙ্গীত-মজলিস।

৬ই জ্যৈষ্ঠ (২০শে মে) রবিবার—সাংবাদিক সম্মেলন—সভাপতি—শ্রীযুক্ত জে·সি-গুপ্ত বার-এট্-ল।

৭ই জ্যৈষ্ঠ (২১শে মে) সোমবার—খাদিদিবস ও হরিজন সভা—সভাপতি—শ্রীযুক্ত সাতকড়িপতি রায়।

৮ই জ্যৈষ্ঠ (২২শে মে) মঙ্গলবার—স্থানীয় ব্যায়াম-প্রদর্শনী। সভাপতি, চন্দননগরের এড্‌মিনিষ্ট্রেটর মঁসিয়ে ব্যার্থে।

৯ই জ্যৈষ্ঠ (২৩শে মে) বুধবার—শ্রীযুক্ত ডি, সি, দাস কর্ত্তৃক ছায়াচিত্রযোগে "যক্ষ্মা" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

১০ই জ্যৈষ্ঠ (২৪শে মে) বৃহস্পতিবার—বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরৎলাল বিশ্বাস কর্ত্তৃক ছায়াচিত্র সহযোগে "ভূমিকম্পের কথা" সম্বন্ধে বক্তৃতা। পরে প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থিভবনের ছাত্রবৃন্দ কর্ত্তৃক 'গুরুগোবিন্দ' অভিনয়।

১১ই জ্যৈষ্ঠ (২৫শে মে) শুক্রবার—মহিলাদিবস। সভানেত্রী—শ্রীযুক্তা কিরণময়ী বসু। প্রবর্ত্তক নারী-মন্দির কর্ত্তৃক "বিরাজ-বৌ" অভিনয়। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং উপস্থিত থাকিবেন।

১২ই (২৬শে মে) শনিবার—বক্তৃতা—ডাঃ ডি, এন, মৈত্রেয়। বিষয়—আমাদের সমস্যা ও কর্ত্তব্য। সন্ধ্যা ৭টায় শরৎ-সম্বর্দ্ধনা।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ (২৭শে মে) রবিবার—ব্যায়াম কৌশল—শ্রীযুক্ত জে, কে, শীল।

১৪ই (২৮শে মে) সোমবার সমাপ্তিদিবস। সভাপতি—চন্দননগরের মেয়র শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বসু।

—সম্পাদক "১২শ বর্ষ মেলা ও প্রদর্শনী",
চন্দননগর।

প্রফেসর নাইডুর ব্যায়াম-শিক্ষা

গত ৮ই এপ্রিল "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ পল্লীসংস্কার সমিতির" আমন্ত্রণে প্রফেসর মোহন সি আর নাইডু "যোগ ও ব্রহ্মবিদ্যা মন্দিরের" প্রাঙ্গনে বক্তৃতাসহ তাঁহার উদ্ভাবিত সহজ ও সুন্দর ব্যায়াম-প্রণালী প্রদর্শন করেন।

প্রফেসর নাইডু আরও কয়েকদিন আশ্রমে থাকিয়া বিশেষভাবে আশ্রমবাসীকে তাঁহার ব্যায়াম-পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষাদান করেন। শেষদিনের বিদায়সভায় আশ্রমের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত মতিবাবু প্রফেসর নাইডুকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

ভৌগোলিক বক্তৃতা

ঐ দিন চন্দননগরের মেয়র শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বসু দীপচিত্র সহযোগে ভূগোলের গণিত ও প্রাকৃতিক অধ্যায়ন সম্বন্ধে একটী চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দান করিয়াছিলে

সঙ্ঘ-পরিদর্শনে মিঃ বটম্‌লী

গত ৪ঠা মে শুক্রবার প্রাতে বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের সর্ব্বপ্রধান পরিচালক মিঃ বটম্‌লী তাঁহার সহকারী শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ চন্দের সমভিব্যাহারে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের বিদ্যালয়-পরিদর্শনে শুভাগমন করেন। তাঁহার সহিত শ্রীযুক্ত মতিবাবুর দীর্ঘ আলাপ শেষ হইলে, মিঃ বটম্‌লী বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস ঘুরিয়া যথাযোগ্য পরিদর্শন করেন। অতঃপর মন্দির, গ্রন্থাগার, আশ্রম, নারীমন্দির ও সঙ্ঘের অন্যান্য স্থানীয় কর্ম্মক্ষেত্র দেখিয়া বেলা ১১টার সময়ে তাঁহারা বিদায়গ্রহণ করেন।

মতিবাবু, মিঃ বটম্‌লী, শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ চন্দ

যাত্রা কালে তিনি এই কথা কয়টী সঙ্ঘের খাতায় লিখিয়া দিয়াছেন।

"I came to-day with Mr. Chanda to see at first hand the work which Sj. Matilall Roy is doing in his school and Ashram. It was all very interesting and provocative of thought."

Sd. Bottomley.

মাস-

সাধারণতঃ বৈশাখ মাসে যে সমস্ত বীজ বপন করা যায় তাহার অধিকাংশই জ্যৈষ্ঠ মাসেও বপন চলে। জল বায়ু ও মৃত্তিকার তারতম্যে বীজ লাগাবার সময়ে বাংলা এবং আসামের বিভিন্ন স্থানে কিছু বিভিন্ন রকম হইয়া থাকে।

বর্ষার উপযুক্ত জলদি ফুলকপির (পাটনাই, বেনারসি প্রভৃতি) চারা লাগাইবার ইহাই সময়। আঁখের চারা লাগান কার্য্যও এই মাসের মধ্যেই শেষ করা উচিত। আমন ধান্যের জমি এখন থেকেই পাইট করিতে হয়। খরিপ ফসলের বীজ যেমন শণ, নীল, তুলা, বরবটী, চিনাবাদাম, জুয়ার, কাঁওন, শ্যামা প্রভৃতির বপন কার্য্য জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যেই শেষ করা কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন এরারুট, গোলমরিচ, চই, ধঞ্চে, পিঁপুল, মুগ, মেস্তা, রেড়ী, তিউলি, গুঁজি, আদা, হলুদ, তামাক ইত্যাদিও লাগানর ইহাই উপযুক্ত সময়।

সাময়িকী—

গত ২রা বৈশাখ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভবনে স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের পৌরহিত্যে "বঙ্গীয় সাহিত্য ও সঙ্গীত সঙ্ঘ" নামক একটী সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই উপলক্ষে সভাপতি বলেন, সঙ্গীত ও সাহিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিশিষ্ট হওয়ায়, উভয়ের সংযুক্ত ভাবে উৎকর্ষ-সাধন কর্ত্তব্য। নবীন ও প্রবীণের এই সম্মিলিত উদ্যমকে তিনি হৃদয়ের সহিত আশীর্ব্বাদ করেন। স্যার সর্ব্বাধিকারী এই সঙ্ঘের স্থায়ী সভাপতি ও শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সাহিত্য ও সঙ্গীত উভয় ক্ষেত্রে সুপরিচিত বহু বিখ্যাত পুরুষ ও মহিলা এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন।

...jee M. A.—Prabartak Publishing House, 61, Bowbazar St., Calcutta.

গৌরী-শঙ্কর

শিল্পী— শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়]
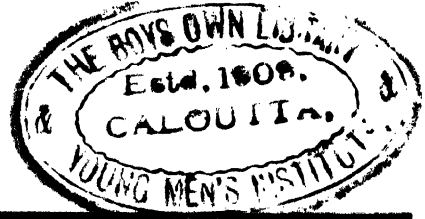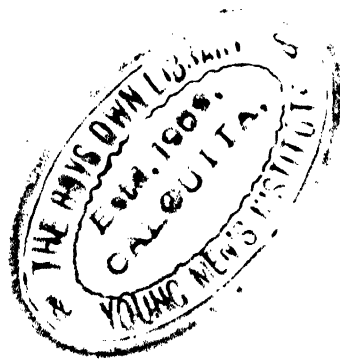
১৯শ বর্ষ, | আষাঢ়, ১৩৪১ | ৩ য়সংখ্যা

পথের সঙ্কেত

বাংলার হিন্দুজাতি শনৈঃ শনৈঃ মুছে যাওয়ার উপক্রম করছে। কোন শিক্ষিত ব্যক্তি তা' আর অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু আশ্চর্য্য কথা, এই মরণের পথ থেকে ফিরে দাঁড়াবার যে আকাঙ্ক্ষা তা'ও আমাদের নেই। সকলের কণ্ঠেই হাহাকার উঠেছে। চাষী মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। শ্রমিক অভাবের তাড়নায় উন্মাদ। দেশের ধনী জমিদার—তাদের সামনেও অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। তরুণের মন নৈরাশ্যময়। নারীসমাজে বিপ্লবের সাড়া। রাজশক্তি প্রতিকারপরায়ণ হ'তে গিয়ে অসন্তোষের আগুন আরও জালিয়ে তুলছেন। পথ হারিয়ে রাজা প্রজা, জ্ঞানী মূর্খ, নারী পুরুষ লক্ষ্যহারা; অন্ধকারে চল্‌তে গিয়ে পরস্পরের সহিত পরস্পর সংঘর্ষ-সৃষ্টি করছে। ব্যর্থতার আর্ত্তনাদে যেন কর্ণপটহ ছিন্ন হয়ে যায়।

শিক্ষার অভাব, অর্থের অভাব, চরিত্রের অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব—অভাবের তাড়নায় কেহই স্থির নহে। আমাদের সম্মুখে যে জটিল সমস্যা এসে উপস্থিত হয়েছে তার সমাধানের জন্য যে কেহই কিছু করুক না, তা'র মধ্যে ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত, সম্প্রদায়গত, জাতিগত অভাব-পূরণের স্বার্থ এসে, সমগ্র হিন্দুজাতির যে বিপদ্, তা' থেকে মুক্তির পথ বাহির হয় না। নিষ্কামচিত্ত কোন ব্যষ্টি অথবা সমষ্টি জাতির এই দুঃসময়ে প্রতিকারে অগ্রসর হ'লেও, সংশয়-বিষ-জর্জ্জরিত হিন্দুসমাজ ইহাও ভাল চক্ষে দেখে না। দেশের অনেক কল্যাণপ্রচেষ্টাও এইজন্য ব্যর্থ হচ্ছে। বাঁচার পথ আর নাই। মুমূর্ষু-মানবের বিকার-লক্ষণ যেমন প্রকাশ পায়, হিন্দুসমাজের সর্ব্বত্রই সেইরূপ বিকৃতি দেখা দিয়েছে। অঙ্ক কষে'

বাঙ্গালী হিন্দুজাতি যে মরছে, তা দেখাবার প্রয়োজন নেই। মরণযন্ত্রণাকাতর জাতির জীবনের লক্ষণ শিক্ষায়, সমাজে, ধর্ম্মে সর্ব্বত্রই বড় বীভৎস চিত্র নিয়ে ফুটে উঠ্ছে। এই বিশাল জাতিটার পতনে:একটা জাতির নিশ্চিহ্ন হওয়াই যদি শেষ কথা হ'ত, এত কথা ভাবার প্রয়োজন ছিল না। মানুষ মরে, একটা জাতি না হয় মর্বে। কিন্তু এই জাতিটার মৃত্যুদৃশ্য যে কি উৎকট ও ভীষণ, তা' যখন অনুধাবন করা যায়, আর এই জাতির পতনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জগতের যে অকল্যাণ-সম্ভাবনা অনুভূত হয়, তাতে সর্ব্বজনহিতরত, ঈশ্বরপরায়ণ কোন ব্যক্তি অথবা সমষ্টি এই দুর্ঘটনা লক্ষ্য করে' নিশ্চেষ্ট থাক্তে পারে না। এই হেতু দেখা যায়, যারা এতদিন নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মসাধনরত ছিলেন, তাঁরাও চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এই সকল সাধু-প্রেরণা প্রবল মৃত্যুপ্রবাহ রোধ করে' জাতিকে কেমন করে' জীবনের পথে প্রবর্ত্তিত কর্বে তা' খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই জন্য এই ক্ষেত্রেও দেখি, ব্যথিতের চাঞ্চল্য হা-হুতাশেই পরিণত হয়, কার্য্যতঃ কিছুই ঘটে' উঠে না। যদি কোথাও বা কর্ম্মপ্রেরণা জাগ্রত হয়, তা' এমনই অযৌক্তিক, এমনই অবৈজ্ঞানিক, একটা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার রূপে ফুটে উঠে, যে তার উপর আস্থা করাও সমীচিন বলে' মনে হয় না।

আমরা জীবনের সন্ধান দেওয়ার চিরদিন চেষ্টা করে' এসেছি। যা' ভেবেছি, পথ বলে' মনে করেছি, নিজেদের জীবনে, একটা সমষ্টির জীবনে তা' কার্য্যকরী কি না সে পরীক্ষা শেষ করে', তবে সে পথের সন্ধান দেশের সম্মুখে উপস্থিত করেছি। আমরা নিঃসংশয়ে বল্তে পারি, পথ অতি দুর্গম। একটা মৃতপ্রায় জাতিকে যে জীবনের পথে ফিরিয়ে আনা কঠোর তপঃসাধ্য, সে বিষয়ে একবিন্দুও সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা একথাও ভাব্তে পারি না, যে এত বড় বিপদের হাত থেকে মুক্তি পেতে হ'লে, সহজ জীবন-যাত্রার মধ্য দিয়ে ইহা সার্থক হতে পারে। যদি শুধু এই জাতিটারই জীবনের দরদ বুকে জাগ্ত, তা'হলে বুঝি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধ্য অসাধারণ জীবন-যাত্রার পথে এসে দাঁড়াবার ভরসা হ'ত না, ধৈর্য্য থাক্ত না। এই বাঁচার সাধনায় জগতের হিত নিহিত আছে বলে' এই জাতিটাকে মরণের পথ থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার দুর্জ্জয় প্রেরণা কোন বারণ মান্তে চায় না। তিলে তিলে ধমনীর সবখানি রক্ত জীবন-সাধনার যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার উৎসাহ ও আনন্দই অসাধারণ জীবনের পথে প্রতি পদে শক্তি সঞ্চার করে।

যারা মরণোন্মুখী জাতিকে ভাঙ্গনের, ধ্বংসের আবর্ত্ত হ'তে রক্ষা কর্তে চান্, তাঁদের মানবসুলভ অন্তরের কমনীয়বৃত্তি দয়া ও করুণার প্রস্রবণটুকু উৎসৃত হ'লেই চল্বে না। সংস্কারমূলক আন্দোলনে, সাধু কথার প্রচারে, হিতবাণী শুনিয়ে এ দুর্দ্দিন আর দূর হবার নয়। যেমন প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ দিয়ে নির্ব্বাপিত প্রদীপ জালিয়ে তুলতে হয়, তেমনি জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়েই প্রাণহীন এই জাতিকে জীবনের সন্ধান দিতে হবে। এই জন্য যাঁরা এই জাতির ও সমাজের প্রাণরক্ষা-বিধানে উন্মুখ, তাঁদের সর্ব্বাগ্রে কেবলমাত্র আত্ম-জীবনের নিত্যতা সম্বন্ধে বিশ্বাস রাখ্লেই চল্বে না, পরন্তু অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অনুভব করে' নিতে হবে, যে জাতির জীবনও নিত্য, সনাতন। কাজেই এই জীবনের লক্ষ্য লয় নয়, মোক্ষ নয়, নির্ব্বাণ নয়। এই আস্থা দৃঢ়ীভূত হওয়ার পর জীবন দিব্য ভাগবৎ সঙ্কল্প-সিদ্ধির ব্রহ্মাস্ত্র, ঈশ্বরের হাতেরই সিদ্ধ-যন্ত্র, এই আত্মোপলব্ধি দৃঢ় করে' নিতে হবে। নিজের ভিতর থেকে জীবনের অহঙ্কার, জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার, অভ্যাস, কামনা বিসর্জ্জন দিয়েই ভগবানে এইরূপ নূতন জন্ম নিতে হয়। আত্মসমর্পণযোগ আশ্রয় করে'ই- নিজেকে এই ভাবে পাওয়া যায়। এই নবজন্ম নিজের জন্য নয়, ভগবানের জন্যই এ জন্মলাভ। এমন মানুষই হয় ভগবানের মানুষ। তারপর মমতাহীন এই উন্মত্ত প্রাণ নিয়ে হাড়াই পণ্ডিতের ছেলে কুবেরের মত মনের মানুষ খুঁজে নিতে অবধূত নিত্যানন্দের বেশে গ্রাম, নগর ফিরে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সংযুক্ত হতে হবে। নূতন যুগের মানুষকে সর্ব্বদাই মনে রাখ্তে হবে, যে আত্মচৈতন্য প্রবুদ্ধ হ'লেই এ যুগের কর্ম্ম সিদ্ধ হবে না, নূতন দেশে, নূতন ক্ষেত্রে—যেখানে চৈতন্য জেগেছে সেই ক্ষেত্রই নূতন ক্ষেত্র—সেই 'নবদ্বীপে' গিয়েই দুটী প্রাণের মিলনে সঙ্ঘ-বীজ সৃজন করে' নিতে

হবে। আর সেই সঙ্ঘ-বীজের শক্তি দিয়েই এই মরা-জাতির কাণে প্রেমের মন্ত্র দিয়ে, বাঁচার সাধনা প্রবুদ্ধ করে' তুল্‌তে হবে।

এ যুগে ব্যষ্টিচৈতন্য শ্রীভগবানের চাওয়া নয়, তাই নিত্যানন্দময় সমষ্টি-চৈতন্যের আবির্ভাব-সূত্র ধরে' গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, নিষ্কলুষ, নিষ্কাম, নিঃসঙ্গ, নিরলস, ত্যাগ ও বৈরাগ্যে প্রদীপ্ত সঙ্ঘ গড়ে' তুল্‌তে হবে। আর শাস্ত্রগ্রন্থ, বক্তৃতা-উপদেশ, খোল-করতাল, এই সব অতীতের উপকরণ ফেলে দিয়ে নূতন ভাবে দেশের দুয়ারে দুয়ারে প্রেম যেচে দিতে হবে। সেবক-রূপে, ভৃত্য হয়ে বল্‌তে হবে 'বিনা বেতনের দাস আমি, সেবা দিয়ে তোমায় আমি নিরাময় করে' তুল্‌ব। তোমার আঙ্গিনায় সোনার কমল ব্রজেন্দ্রনন্দনের নৃত্যলীলা ফুটিয়ে তুল্‌ব। তোমার রন্ধনশালায় অন্নপূর্ণার আসন পেতে দেব। ক্ষেত্রে সোণার ফসল ফলাব। আহার, নিদ্রা, সম্ভোগ, বিলাস কিছুই তোমায় ছাড়্‌তে হবে না, শুধু নিও ত্রিসন্ধ্যা ভগবানের নাম। এই অকিঞ্চিৎকর কড়ি দিয়ে আমায় বেঁধে রেখো তোমার দুয়ারে। আমি আজ প্রভুর দায়ে জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে, এই শূদ্র-ধর্ম্ম বরণ করে' নিয়েছি। ওগো গৃহী! জাগো তুমি ভগবানের নামে! জাগাও তোমার পত্নীকে, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়স্বজনকে—ভগবানের নামে। আমি তোমার বিনা বেতনের দাস; এই ভিক্ষা দিয়ে আমার সেবা নাও।'

জীবনের এই সঙ্কেত হেঁয়ালী বলে' কেউ উড়িয়ে দিও না। হিন্দু-জাতিকে বাঁচাবার এই ভাগবৎ-চেতনারূপ মহামৃত ছাড়া আর কিছু নাই। যাদের কেহ নাই, কিছু নাই, আপনার বল্‌তে কেবল আছেন শ্রীভগবান, আজ তাদেরই সমষ্টিচৈতন্যে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে; আর এইরূপ সঙ্ঘে সঙ্ঘে সম্বন্ধ-সূত্রে মহাসঙ্ঘ গড়ে' তুল্‌তে হবে। এই সংহতি-শক্তির উপরেই জাতির পুনরুত্থান নির্ভর করে।

এই দিব্য সঙ্ঘের ভোগ নাই, ত্যাগ নাই। বাম ও দক্ষিণ পথ ছেড়ে মধ্য পথ সুষুম্নার তোরণদ্বার দিয়ে, তারা ভগবানের পথেরই যাত্রী। তাদের তনুমনোপ্রাণ-বুদ্ধি ভগবানের হাতের যন্ত্র। তাদের জ্ঞানপ্রকাশে নূতন বেদধ্বনি, তাদের প্রেমপ্রকাশে জাতি-রক্ষার সঞ্জীবনী, তাদের শক্তিপ্রকাশে ঐশ্বর্য্যলক্ষ্মী, তাদের মূর্ত্তি-প্রকাশে ধর্ম্ম-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। একটা জাতির পরিপূর্ণ সিদ্ধি নির্ভর করে তাদেরই আবির্ভাবের উপরে। এই যুগের মানুষ আজ এসেছে বলে'ই, প্রচলিত ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, সমাজ আন্দোলনে আমরা আর কোন আস্থা রাখি না। জাগো ভগবানের মানুষ। জাগো ভাগবৎ-সঙ্ঘ! মানবাত্মাকে জাগাও জ্ঞানে, প্রেমে, শক্তিতে। আশ্রয়-ক্ষেত্র রক্ত-মাংসে গড়া তনুখানি অমৃতময় করে' তোল তোমার সবখানিকে ভগবানে তুলে দিয়ে। এ জাতির জীবনপথের সূচনাসঙ্গীত গেয়ে যাই। যদি প্রত্যয় কর, এই সিদ্ধ পথের সঙ্কেতে—তবে পথের নিদর্শন ও লক্ষণের কথা ধীরে ধীরে মর্ম্ম-বীণায় ঝঙ্কার দিয়ে তোমাদের শোনাব। তোমরা এই অভিনব পথের যাত্রী হবে কি!

পথ অতি দুর্গম। মানুষকে ভগবানে নূতন জন্ম নিতে হবে। এ যে কি কঠোর সাধনা, হিমালয়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে তা বুঝা যায় না। মনে রেখো—অসাধারণ জীবন পেতে হ'লে, অসাধারণ তপস্যা করতে হবে।

চিত্তকে উপরে উঠিয়ে রাখার নিয়ত অভ্যাসের সঙ্গে বুদ্ধিতে সকল সময়ে ইষ্টের ধ্যান-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা চাই। ইহা যেন কোনও কারণে প্রাকৃত না হয়, পরম ও দিব্য রূপেই সর্ব্বদা এই অনুধ্যান বাঞ্ছনীয়। এইরূপ যুক্ততম অবস্থাই ভগবানে অবগাহিত হয়ে থাকার উত্তম লক্ষণ।

কিছুতে অন্তরকে অবসন্ন করো না। উৎসাহ ও আনন্দ হোক তোমার স্বভাব। পৃথিবীতে প্রলয়-ঝঞ্ঝা বয়ে যাক, যোগী তুমি, তোমার তাতে কিছু আসে যায় না। যে নিত্য, স্থির, অচল সনাতনে আশ্রয় নিয়েছে, তার প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে চাঞ্চল্য আসা কোনও কারণেই উচিত নয়।

* * * * *

প্রত্যেকে ভগবানের মানুষ হও। পুরুষ-নারী নির্ব্বিশেষে এক দল ভগবানের মানুষ ভবিষ্যৎ-যুগে পৃথিবী শাসন করবে। শাস্ত্রযুক্তি, আদর্শবাদ এই জীবনের স্ব-ভাব নয়, অপ্রাকৃত তত্ত্বকে সবখানি দিয়ে বরণ করাই দিব্য-সংহতির স্ব-ধর্ম্ম।

সব চেয়ে বড় কাজ—আপনাকে নিঃস্বার্থভাবে দিয়ে যাওয়া। যেখানে দেওয়ার কুণ্ঠা সেইখানে পৌঁছেই মনে অভিমান বাজে, আর মানুষ পড়ে ছিট্‌কে। যারা তত্ত্বের মানুষ, তারা তত্ত্ব-বস্তুকে কেন্দ্র করে'ই সংগ্রাম করবে —তত্ত্বময় হ'তে। মিলনের বীজ—এই তত্ত্বেই।

ত্যাগ ও ভোগ, এই দুয়ের গর্ব্ব ও আসক্তই ব্যর্থ হওয়ার কারণ। এই দুই নিয়ে বিচার নয়; বিচার—তত্ত্ব-বস্তুতে কতখানি অবগাহিত হয়েছ তাহাই। ডুবে যাও একেবারে—অহঙ্কার যদি গলে' যায়, এই মানুষই দিব্য হবে; আর দিব্য মানুষের সংহতিই তো দেব-সঙ্ঘ।

* * * * *

শিক্ষক, গুরু, ইষ্ট—সবই পর পর একই তত্ত্ব-বস্তুতে প্রকাশ পেতে পারে। তত্ত্বই আমি—সকল পর্য্যায় অতিক্রম করে' পরিশেষে এই তত্ত্ব-রূপেই আমার অবস্থান। যে তত্ত্বে বিশ্বাস করে, তার আত্মবিশ্বাসও ক্রমে অটল হয়।

যারা বলে, মন চঞ্চল হয়, চিত্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়ে, তাদের বলি—ইষ্ট-বাণী স্মরণ রেখো। সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য নিয়মিত কাল স্থির থাকার অভ্যাস কর; তার পর সর্ব্বসময়ে আত্ম-সংগ্রামের শক্তি-বীজ নিয়ে ইষ্টে মনোপ্রাণ তুলে দাও। নিয়ত অভ্যাস ও তপস্যায় জীবনের সবখানি দিয়েই ইষ্ট-প্রাপ্তির সাধনা পেতে হয়। তীব্র সংবেগ চাই। যে একান্ত চিত্তে অধ্যাত্ম-জীবন চায়, ভাগবত চরিত্র চায়, তার চিত্ত অন্যগামী হয় না। নিরক্ষরা নারীও ইহা পারে,

তাই পুরুষের পক্ষে ইহা অসম্ভব হবে কেন? কিন্তু চাই দৃঢ়তা, চাই বীর্য্য—অনন্যচিত্ত হওয়াই এই দৃঢ়তা ও বীরত্বের লক্ষণ।

যারা বলে, কৃপা হ'লে হয়, তাদের বলি, কৃপা পাওয়ারও তো যোগ্য হ'তে হবে—অনন্যচিত্ত হয়ে। মান অভিমান, অহঙ্কার কামনা যত ক্ষণ চিত্তকে চঞ্চল করে, তত ক্ষণ ইষ্টের প্রেমাভিসারী হবে কেমন করে'? ইষ্টকে ভালবাস্‌তে হয়—'চেতসা নান্যগামিনা'। সব ঘর ঘুরে' তবেই এই ঘরের ঠাকুর মিলে।

এ যোগ সামান্য নয়, অসামান্য। আশ্রয় পাওয়াই কত বড় কৃতার্থতা তা' যারা বুঝে না, তারা দম্ভ করে' ভাবে, সঙ্ঘকে বা ভগবানকে কৃতার্থ, ধন্য করেছে। এমন আত্মম্ভরী মানুষের মুক্তি নাই। সর্ব্বদা বিনয়ী হও। সেবার অধিকার যে পায় সেই ধন্য হয়। যে দেয় সে পরম দয়ালু—ভাগবত তত্ত্ব।

সংবৎসর কাল দেহ-মনের কোনও ইন্ধন না যুগিয়ে একনিষ্ঠ চিত্তে অতিবাহন করা—ইহাই সর্ব্বপ্রথম সাধনা। দ্বিতীয় বৎসর, আপনার সবখানি সর্ব্বদা ইষ্টে তুলে ধরার জন্য আত্মপ্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করা। তৃতীয় বৎসর, চিত্ত কোন দিকে যায়, কত ক্ষণ ইষ্টে স্থির থাকে সে বিষয়ে সাক্ষী স্বরূপ পর্য্যবেক্ষণ করা। অতঃপর, দিব্য জ্যোতির্ম্ময় ভগবানে নিয়ত যুক্তি ও অবস্থানই সাধনার চতুর্থ পর্য্যায়। নবীন সাধক মাত্রেই এইরূপ চারি বৎসর ধৈর্য্য ধারণ করে' অগ্রসর হ'লে অভীষ্ট লাভ কর্‌তে পারে। কাজ শুধু সঙ্কল্পের গ্রহণ ও রক্ষণ—অবশিষ্ট কাজ ভগবানের। এই সোজা কথা মনে রেখো।

*　　*　　*　　*　　*

সাধকের আত্ম-সাধনার পরিণতির উপরেই তাহার ব্রাহ্মী-স্থিতি নির্ভর করে। ভগবানে সর্ব্বদা অবস্থিতির জন্য চাই নিজের অহমিকাকে সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলা। যত ক্ষণ থাকবে অভিযোগ, অবস্থা ও ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি, তত ক্ষণ জান্‌তে হবে, অনন্যচিত্তে ভগবানকে আশ্রয় করা হয় নি।

যোগ-সিদ্ধ হ'তে হ'লে চাই তন্ময়তা—জাগ্রত সমাধি। তোমার মনের মধ্যে জাগে যদি নানা চিন্তা, কেবল বুদ্ধি দিয়ে আশ্রয়-তত্ত্ব সিদ্ধ হবে না। এইজন্য যোগের কথাই হচ্ছে—'মর্য্যপিত-মনোবুদ্ধিঃ'—মন ও বুদ্ধি দুইই ভগবানে তুলে' দিতে হবে।

যে-যোগ কুরুক্ষেত্রের পার্থও সম্যক্ রূপে অবধারণ কর্‌তে পারেন নি, তা' যে কঠিন ও তপঃসাধ্য, এ কথা বলাই বাহুল্য। গোড়াতেই তাই বলা আছে, যে বীর, যে সাহসী, যে অসাধারণ ধৈর্য্যশীল তার পক্ষেই এ পথ শ্রেয়ঃ।

মরণ-পণ যার তারই যোগের পথে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হওয়া সম্ভব। কোনও ব্যক্তির জন্য, কোনও অবস্থার জন্য যোগ-পথ অন্তরায়-যুক্ত হয় না। চিত্ত বাসনাযুক্ত হওয়াই আসল অন্তরায়।

এই যে কর্ম্মক্ষেত্র, ইহা কুরুক্ষেত্র। ধর্ম্ম-জীবন প্রতিষ্ঠার জন্যই ইহা অনুষ্ঠিত। এই সংগ্রামে যে উদ্যত সেই যোগযুক্ত। অন্য চিন্তা ও বাসনা বিসর্জ্জন দাও। যুদ্ধ কর। ইহাই ইষ্ট-নির্দ্দেশ।

*　　*　　*　　*　　*

আর কেমন করে' বল্‌তে হয়, জানি না। সে অকপট শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা মানুষের হবে কি? এ 'সুসুখং ধর্ম্মং' যে পায়, সেই ভাগবত-চরিত্র লাভ করে। তাই উদাত্ত কণ্ঠেই বলি—

'সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাম্ যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ'

—এইটুকু সাধনা যদি না পার, সর্ব্বত্যাগে হবে কি? জ্ঞান-যজ্ঞে, তপোযজ্ঞে, মন্ত্রযজ্ঞে হবে কি? মনে রেখো, এ সবই আয়াস-সাধ্য। কিন্তু 'যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্'—এর চেয়ে সুখ পৃথিবীতে আর নাই। ইহা সত্য-মুক্তির অপূর্ব্ব সঙ্কেত। ইহাই যে ভবিষ্য ভারতের সার্ব্বজনীন কৃষ্টি। এমনই সুসুখ ধর্ম্মের আচরণে আত্মারাম হওয়ার সুযোগ যে অহঙ্কারে প্রত্যাখ্যান করে, সে সত্য সত্যই বঞ্চিত হয়। এক বিন্দু ভাগবৎ সংবিৎ তোমায় ভগবানের প্রেমে অভিষিক্ত কর্‌বে। সে প্রেমের অমৃতাস্বাদে যদি অধিকারী হতে চাও, তন্ময় হও।

মুক্তি

শ্রীপাপিয়া বসু

সুদূরের ঐ সীমা হতে বজ্রস্বরে এসেছে আহ্বান,
"ছুটিয়া চলিতে হবে ;
ত্যজিতে হইবে মোর বন্ধনের তিক্ত নাগপাশ।"
তাই আজি বাঁধিয়াছি মনে।
পিছনের রোষদীপ্ত, কষায়িত আঁখির লালিমা ;
প্রচণ্ড বহ্নির সম তেজোদীপ্ত শাসনের ভয়,
জরাজীর্ণ শত ছিন্ন কঙ্কালের প্রায়
এই তুচ্ছ সমাজের রক্তচক্ষু
নারিবে রোধিতে মোরে।
কিম্বা এই গৃহ-কোণে আত্মীয় বান্ধব,—
একান্তে বেড়িয়া আছে যারা,
যাহাদের স্নেহনীর আশৈশব করিয়াছি পান,
তিলে তিলে পলে পলে হয়েছি স্ফুরিত,
তাদেরও অনুরোধে টলাবে না মোরে।
অথবা সে প্রেমগুঞ্জরণে ; সোহাগ-মাখান,
কিম্বা সিক্ত আঁখি-জলে,
পলে পলে যে আমাকে দানিয়াছে তৃপ্তির নিশ্বাস ;
দু'বাহু জড়ায়ে কণ্ঠে যে খুলেছে প্রেমের ভাণ্ডার ;
বুক-ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাসে, যে পেয়েছে তৃপ্তির আশ্বাস
এই বক্ষতলে ;
মায়াপাশে বেঁধে মোরে করেছে মায়াবী
মমতার সুদৃঢ় বন্ধনে ;
তাকেও ত্যজিতে হবে।
সংসারের খুঁটিনাটি, ছোটখাট যা' কিছু বন্ধন—
সুদৃঢ় শৃঙ্খল সম, বেড়িয়াছে চৌদিকে আমার ;
উন্নতির পথে যাহা তীব্র বিভীষিকা, প্রচণ্ড তাণ্ডব ;
সহস্র বাসুকি সম মেলিয়াছে ফণা উগ্র বিষধর,
নয়নে ঠিকরে যার লেলিহান শিখা খদ্যোতের প্রায় ;
দু'বাহু প্রসারি' তারে তুচ্ছ গুল্ম সম
টানিয়া ছিঁড়িতে হবে।

ছুটীতে হইবে সেথা,—
সংসার-অরণ্যে যেথা, জীর্ণ শীর্ণ বীভৎস এ শত আবিলতা।
হিংসা-দ্বেষ-পরিপূর্ণ স্বার্থান্বেষী মানবের দল
জিঘাংসার কুৎসিত দাহনে,
বাসনার পায়ে সব দিয়ে বলি অকুণ্ঠিত চিতে
পৈশাচিক অভিনয় করে দিন রাতি
অট্টহাস্য রবে !
কভু যেথা স্বার্থপর সমাজের ঈর্ষ্যার বন্ধন
রচিছে দুর্ভেদ্য দ্বার ;
হীনতার কুশ্রিতার দৃষ্টান্ত অপার !
পরাজিত হয়ে বার বার বন্ধ্যাক্রোশে ফুঁসিছে মানব,
ব্যর্থতার বেদনায় পুঞ্জীভূত হিয়া।
বুভুক্ষুর অন্তহীন অসহ্য বিলাপে নাহি কর্ণপাত ;
দীর্ণ করে শুধু এই ধরণীর বুক।
ধরাপৃষ্ঠ হ'তে এই কলঙ্ক-কালিমা
মুছিয়া ফেলিতে হবে ;
ধুয়ে দিতে হবে এই কুৎসিৎ গ্লানিমা
ঘৃণ্য ব্যাভিচার !
ভ্রাতৃত্বের স্নেহের বন্ধনে, বাঁধিতে হইবে সবে,
তুলে দিতে হবে কর অপরের করে।
হাসিবে শ্যামল হাস্যে এই বসুন্ধরা ;
ঊর্দ্ধ নভে হাসিবে দেবতা,
জয় হবে মানবের শুভ আশীর্ব্বাদে !
তাই আজ এত আয়োজন, এতটা উল্লাস,
পেয়েছি মুক্তির আলো হৃদয়ের মাঝে,
মুক্ত হবে বিশ্ব চরাচর।
পেয়েছি সন্ধান, আহ্বান পেয়েছি তার ঐ দূর হ'তে।
ভঙ্গুর এ দেহ-কণা বিলাইয়া দিব তার পায় !
যে আমারে দেখায়েছে অন্তহীন
মৃত্যুহীন আলোকের হাসি ;
অমৃতের সুস্নিগ্ধ নির্ঝর !

মজুর-শক্তি ও আর্থিক উন্নতি

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

"মজুর" আর "গরীব লোক" একার্থক নয়

মজুর বলিলে আমাদের দেশে সাধারণতঃ গরীব লোক বুঝায়। কিন্তু এইরূপ বুঝা ঠিক নয়। বাঙ্গালা দেশের পাটের কলে, চা-বাগানে, খনিতে যে-সব মজুর কাজ করে তাহাদের বেতন অনেকেরই মাসে বিশ, পঁচিশ, ত্রিশ, পঁয়ত্রিশ টাকা—ইহাদের চেয়ে বেশীও কেহ কেহ রোজগার করে। আবার কম বেতনও কেহ কেহ পায়। বোম্বাই অঞ্চলের তুলার কুলীরাও বেতন মাসে প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ টাকা। বুঝা যাইতেছে যে, বিশ, পঁচিশ, ত্রিশ, পঁয়ত্রিশ টাকা বেতনের লোক আমাদের দেশে একমাত্র মজুর নয়। আমরা—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তথাকথিত ভদ্রলোক সমাজের অনেকেই,—মাসে বিশ, পঁচিশ, ত্রিশ টাকার বেশী রোজগার করি না। অবশ্য মাসে বিশ-পঁচিশ টাকা আয়—বিশেষ কোন সচ্ছলতার লক্ষণ নয়। এই আয়ের লোককে গরীব বলিতেই হইবে। কেননা, মানুষের মত জীবনধারণ করিতে হইলে যে সকল জিনিষের দরকার তাহার অনেক জিনিষই এই আয়ে সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় না। কাজেই পঁচিশ ত্রিশ টাকা মাহিনার লোককে সহজে এক কথায় গরীব সমঝিয়া রাখা সম্ভব। কিন্তু মজুর শব্দ ব্যবহার করিবামাত্র একটা গরীব সম্প্রদায়ের কথা বলা হইতেছে, এইরূপ ভাবা উচিত নহে। বাংলা দেশের অথবা গোটা ভারতের নরনারীর আয়ের পরিমাণ এত কম যে, মজুরদেরকে একটা গরীব সম্প্রদায় ধরিয়া লইলে, সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত বলিলে যাহা বুঝায় সেই সম্প্রদায়ের লোককেও ঠিক সেইরূপ গরীব সমঝিয়া রাখা উচিত। তাহা হইলে, মজুর-শ্রেণীকে বিশেষভাবে একটা গরীব শ্রেণী বুঝিয়া রাখা ঠিক নয়।

আমার বিবেচনায় আমাদের দেশে অথবা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই যত লোক খাটিয়া খায় সকলেই মজুর। কেহ-বা হাতে পায়ে খাটিয়া খায়, কেহ-বা কলম পিষিয়া খাটিয়া খায়, কেহ-বা যৎকিঞ্চিৎ মগজ খাটাইয়া খাটিয়া খায়, কেহ-বা আর কিছু খাটাইয়া খায়। শেষ পর্য্যন্ত সকলকেই মেহনৎ করিয়া জীবনধারণ করিতে হয়। কাজেই যে সকল লোক খাতে, মাঠে, কারখানায় অথবা আর কোথাও হাতে পায়ে খাটিয়া ভাত কাপড় জুটাইয়া থাকে তাহাদিগকে বিশেষ ভাবে মজুর বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। কেরাণী, স্কুলমাষ্টার, ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, কারখানার এঞ্জিনীয়ার, গভর্ণমেন্টের কর্ম্মচারী, মায় লাট সাহেব পর্য্যন্ত সকলেই মেহনৎ করিয়া খায়। সকলেই অপর কোনও মনিবের অথবা উপর-ওয়ালার নিকট হইতে তঙ্খা পাইয়া জীবনধারণ করে অর্থাৎ সকলেই মজুর।

বিদেশী ভাষায় ইয়োরোমেরিকায় একটা কথা আছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, সংসারে গোলাম দুই শ্রেণীর অন্তর্গত। এক শ্রেণীর গোলাম ধোয়া শার্ট পরে আর তাদের কলার থাকে সাদা অর্থাৎ তাহারা ময়লা না ঘাঁটিয়া কাজ চালাইতে পারে; যথা, গভর্ণমেন্টের কর্ম্মচারী, ব্যাঙ্কের কেরাণী, স্কুলমাষ্টার ইত্যাদি। সোজা কথায়, ইহাদের নাম "হোয়াইট্ কলার্ড শ্লেভ"—সাদা কলার-পরা গোলাম। আর অপর শ্রেণী হইতেছে এমন লোক যাহারা হাতের তালুতে লোহা-লক্কড়, কাঠ-মাটি-কয়লা ধাতু ইত্যাদি বস্তু সংক্রান্ত কাজ করিতে বাধ্য; কাজেই তাহাদের জামাটা—কর্ম্মক্ষেত্রে অন্ততঃ—ময়লা থাকে, আর তাহারা সাধারণতঃ কাজের সময়ে কলার পরে না অথবা কলারটা যদিও পরে সেটা ময়লা দেখা যায়।

মজুরী করা অন্যতম পেশাবিশেষ

যাহা হউক, আমার বিবেচনায় "মজুর", "মজুরী" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিতে যাইয়া কি বাহিরের দুনিয়ার লোক, কি ভারতের লোক সাধারণতঃ একটা ভুল ধারণা পুষিয়া চলিতেছে। এই ভুলটা রাখা উচিত নয়। আমি

অন্ততঃ সেই ভুলটা চালাইতে রাজী নই। পরিশ্রম করে দুনিয়ার সব লোক। বেতনের উপর নির্ভর করে দুনিয়ার প্রায় সব লোকই। বিনা মেহনতে অথবা বিনা বেতনে বাঁচিয়া আছে এমন লোকের সংখ্যা নেহাৎ অল্প। তাহাদের কথা সংসারের আর্থিক অবস্থা বুঝিবার সময়ে বাদ দিয়া চলিলেও ক্ষতি হয় না। সাধারণতঃ যাহাদের মজুর বলা হইয়া থাকে তাহারা তাহা হইলে কিরূপ জীব! আর্থিক হিসাবে তাহাদের কোন শ্রেণীর অন্তর্গত করা চলিবে?

আমার বিচার অতি সোজা। চাষ করা একটা ব্যবসা অথবা পেশা। বীমা আফিসে কেরাণীগিরি করা একটা ব্যবসা অথবা পেশা। স্কুল মাষ্টারী করা একটা ব্যবসা অথবা পেশা। আদালতে জজিয়তি করা একটা ব্যবসা অথবা পেশা। ওকালতী করা, ডাক্তারী করা, গভর্ণমেণ্টের চাকুরী করা, ব্যাঙ্কের ম্যানেজারী করা ইত্যাদিও কতকগুলি ব্যবসা অথবা পেশা। ঠিক সেই ধরণেরই একটা পেশা বা ব্যবসা হইল খাতে, কারখানায়, চা-বাগানে, তুলার কলে মজুরী করা। আমার চিন্তায়, সংসারে যত প্রকার আর্থিক জীবন-ঘটিত কাজ থাকিতে পারে সবগুলিই ব্যবসা বা পেশা বিশেষ। অতএব মজুর-শ্রেণী আমার কাছে সংসারের অন্যান্য হাজার ব্যবসায়ী অথবা পেশাদার শ্রেণীর মত অন্যতম শ্রেণী ছাড়া আর কিছু নয়।

দারিদ্র্য, সচ্ছলতা, ঐশ্বর্য্য, কষ্টের সংসার, সুখের সংসার ইত্যাদি বস্তু সম্বন্ধে তর্ক না তুলিয়াও আমি মজুর, মজুর-জীবন, মজুরী, মজুরের স্ত্রী-পুত্র, মজুরের স্বাস্থ্যোন্নতি, মজুরের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে অভ্যস্ত। বুঝা যাইতেছে যে, মজুর-সমস্যা নামক একটা সৃষ্টিছাড়া স্বতন্ত্র সমস্যা আমার মাথায় নাই। পৃথিবীর অন্যান্য লোকের সম্বন্ধে যদি কোন সমস্যা থাকে, তাহা হইলে সেই সমস্যাই আমি তথাকথিত মজুরদের সম্বন্ধেও স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। আমার জিজ্ঞাস্য, চাষীদের কোন সমস্যা আছে কি না, কেরাণীদের কোন সমস্যা আছে কি না; স্কুল-মাষ্টারদের কোন সমস্যা আছে কি না, সরকারী চাকুরেদের কোন সমস্যা আছে কি না? যদি থাকে, তাহা হইলে আমি আলবৎ বলিব যে, মজুরদেরও সমস্যা আছে। আমার বিবেচনায় সমস্যা আছে প্রত্যেক পেশাতে, প্রত্যেক আর্থিক কাজ-কর্ম্মে, প্রত্যেক শ্রেণীতে। কেরাণীদেরও সমস্যা আছে, চাষীদেরও সমস্যা আছে, সরকারী চাকুরেদেরও সমস্যা আছে। ঠিক সেই হিসাবে খাতের কুলি, কারখানার মজুর, জাহাজের খালাসী, ট্রামের কণ্ডাক্টার, আমদানী-রপ্তানী আফিসের দরোয়ান, হোটেলের বাবুর্চ্চি, আর পরিবারের খানসামা ইত্যাদি তথাকথিত মজুরদেরও সমস্যা আছে।

মজুর-শ্রেণীর তিন সমস্যা

সমস্যাগুলি কি? জবাব অতি সোজা। আমরা যে যেখানেই কাজ করি না কেন, সকলেই অন্ন-বস্ত্রের জন্য গতর খাটাইয়া থাকি, একথা সত্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও সত্য যে, আমরা সর্ব্বদাই মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে চাই। কি চাষী, কি কেরাণী, কি সরকারী চাকুরে, কি খালাসী—সকলের প্রধান সমস্যা মজুরীর হার। যতখানি খাটিতেছি, ঠিক সেই মাপে তঙ্খা পাইতেছি কি না, ইহাই প্রথম ভাবিবার কথা। অথবা যে পরিমাণ বেতন পাইতেছি সেই বেতনে আমার মাস চলিতেছে কি না। এখানে 'আমার' শব্দে বুঝিতে হইবে, আমার পরিবারস্থ আরও দুই একজনেরও অন্নবস্ত্র। বলা বাহুল্য, মজুরীর হার-সমস্যা—ফিন্‌ফিনে চাদরওয়ালা বাবু-জাতীয় গোলামদের জীবনে যতটা দেখা যায়, তার চেয়ে কম দেখা যায় না কুলী, খালাসী, বরকন্দাজদের জীবনে।

দ্বিতীয় সমস্যা হইতেছে, কাজের ঘণ্টা-সম্পর্কিত। রোজ কত ক্ষণ করিয়া খাটা যাইতে পারে? বার ঘণ্টা রোজ ঠিক থাকা উচিত কি দশ ঘণ্টা, রোজ ধার্য্য হওয়া উচিত, কি আট ঘণ্টা কি ছয় ঘণ্টা—এ সব প্রশ্ন কেরাণী-জীবনের একটা বড় কথা, সন্দেহ নাই। ফ্যাক্টরীর মজুরদের বেলায়ও সেই প্রশ্নগুলি উপস্থিত হয়। এই সময়ের কথা ভাবিতে গেলে ছুটীর কথা ভাবিতে হয়। সপ্তাহে কত দিন অথবা মাসে কত ঘণ্টা বা সপ্তাহে কত ঘণ্টা ও মাসে কত দিন অথবা বৎসরে কত সপ্তাহ কাজের কামাই চলিতে পারে, আর এই কামাই-এর সময়ে বেতন

পাওয়া যাইবে কি না অথবা কামাই-এর বেতন যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে বৎসরের যে কয় দিন কাজ করা যাইবে সেই কয়দিনের বেতনের হার কত হওয়া উচিত, এই সবও ভাবিবার কথা। তাহা ছাড়া কাজটা শুরু করা উচিত কখন—একদম সকালে না আটটার সময়ে, না দশটার সময়ে? দুপুর বেলা কাজ বন্ধ থাকা উচিত কি না, থাকিলে কত ক্ষণ? সন্ধ্যার সময়ে অথবা রাত্রিকালে কত ক্ষণ পর্য্যন্ত কাজ চালান যুক্তিসঙ্গত, এই সব প্রশ্ন একমাত্র বাবু-মজুদের জীবনের বেলায় উঠিতে পারে এইরূপ ভাবা যুক্তিসঙ্গত নয়। অন্যান্য মজুরদের বেলায়ও এই সকল সমস্যা উঠিতে বাধ্য।

তৃতীয় সমস্যা হইতেছে—কার্য্যক্ষেত্রের আব্‌হাওয়ার বিষয়ে। আব্‌হাওয়া বলিলে একমাত্র জল-হাওয়ার কথা হইবে এরূপ নয়। যে সকল লোক-জনের সঙ্গে কাজ করা যাইতেছে তাহাদের ধরণ-ধারণ, তাহাদের মেজাজ, তাহাদের সঙ্গে মেলমেশ ইত্যাদিও বুঝিতে হইবে। আমি যখন কেরাণী হিসাবে কোনও আপিসে চাকুরী করিতে যাই, তখন আমি দেখি যে, যে ঘরটায় আমাকে কাজ করিতে দেওয়া হইল সেই ঘরটা স্যাঁৎস্তেতে, না শুকনো, সেই ঘরটায় আলো আসে কি না, সেই ঘরে গরমের সময়ে হাওয়া পাওয়া যায় কি না ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, আমি যদি কাপড়ের কলে নোকরী ঢুঁড়িতে যাই, তখনও আমাকে এই সকল কথা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। কোনও না কোনও রকমে চাকুরী পাওয়া আমার জীবনের পক্ষে, আমার পরিবারের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। কর্ম্ম-কেন্দ্রের আওতায় শীঘ্রই আমার স্বাস্থ্যের, আমার কর্ম্ম-দক্ষতার ক্ষতি হইবে কি না তাহার কথা প্রথমেই ভাবিয়া দেখিতে হয়।

সেই সঙ্গে সঙ্গে আর একটী কথায় প্রত্যেক মজুর—সে বাবু-মজুরই হউক অথবা তথাকথিত হাত পা'র মজুরই হউক—খতাইয়া দেখিতে বাধ্য। আমি যেখানে চাকুরী করিতেছি সেখানে আমার উপরওয়ালা বাবুর মেজাজ কি রকম। কথায় কথায় সে ব্যক্তি আমার উপর জুলুম চালায় কি-না। তাহার মেজাজ তোয়াজ করিয়া চলা আমার পক্ষে সম্ভবপর কি না। অথবা আমাকে তাহার বাড়ীর জন্যও কিছু কিছু গতর খাটাইয়া লওয়া আইনতঃ অথবা বে-আইনী ভাবে আশা করা হইতেছে কি না। এই সকল প্রশ্ন প্রত্যেক কেরাণীকে, প্রত্যেক স্কুল-মাষ্টারকে সর্ব্বদাই নিজ নিজ জীবনে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হয়। কেন-না, চাকুরী করিতে হইলে উপরওয়ালা থাকেই থাকে। কেবলমাত্র উপরওয়ালা নয়, কয়েক জন সহযোগী, সমান পদস্থ লোকও থাকে। তাহা ছাড়া কয়েক জন নিম্নপদস্থ লোকও কর্ম্মক্ষেত্রের আব্‌হাওয়ায় থাকিতে বাধ্য। এই সকল লোকের চরিত্র, তাহাদের ব্যবহার ইত্যাদি আমার জীবনের উপর, বিশেষতঃ আমার কর্ম্মক্ষেত্রের কাজ-কর্ম্মের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। তাহা ভুলিয়া আমার পক্ষে কাজ করা সম্ভবপর হয় না। একথা বাবু-মজুর মাত্রেই অতি সহজে বুঝিবে। অন্যান্য মজুর সম্বন্ধেও ঠিক এ কথাই বোধ হয় আরও জোরের সহিত বুঝিয়া রাখিলে মজুর-জীবনের তৃতীয় সমস্যাটী বস্তুনিষ্ঠ ভাবে ধরিতে পারা যাইবে।

মজুর আমার "পূজা স্থান" কেন?

এত ক্ষণ পর্য্যন্ত আমি মজুরকে পৃথিবীর অন্যান্য আর্থিক পেশার মত অন্যতম পেশার প্রতিনিধি-রূপে বিবৃত করিলাম। এবার মজুর সম্বন্ধে একটা গভীরতর কথা বলিব। মজুরকে আমি বর্ত্তমান যুগের, বর্ত্তমান জগতের অন্যতম প্রতিনিধি বিবেচনা করি। বর্ত্তমান জগৎ বলিলে বুঝিতে হইবে, যন্ত্রপাতি-নিয়ন্ত্রিত, কল-কারখানা-শাসিত আধুনিক ব্যাঙ্ক-বীমা-বহুল স্বরাজশীল ডেমক্রাটিক নর নারীর দুনিয়া। এই দুনিয়াটা সৃষ্টি করিয়াছে কাহারা? নিশ্চয়ই তাহারা যাহারা মাথা খাটাইয়া বাষ্প-যন্ত্র আর বাষ্প-যন্ত্রের সন্তানস্বরূপ অসংখ্য কলকারখানা উদ্ভাবন করিয়াছে। অর্থাৎ টেক্‌নলজী আর টেক্‌নলজী-বিদ্যা সংক্রান্ত এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক ইত্যাদি লোক হইতেছে বর্ত্তমান জগতের জন্মদাতা। কিন্তু একমাত্র উদ্ভাবনার সাহায্যে, একমাত্র আবিষ্কারের ফলে এই সব নয়া নয়া যন্ত্রপাতি সংসারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে কি? না। তাহার জন্য দরকার হইয়াছে হাজার হাজার শিল্পনিপুণ মিস্ত্রী, কারিগর, যন্ত্রনিষ্ঠ মজুর। লক্ষ লক্ষ মজুর হাত-পা

লাগাইয়া টেক্‌নলজীতে পোক্ত না হইয়া উঠিলে, কি ইয়োরোপে, কি আমেরিকায়, কি এশিয়ায়, কি আমাদের বাংলাদেশে—কলও চলিত না, রেলওয়ে চলিত না, ষ্টীমারও চলিত না, কারখানাও চলিত না, খাতও চলিত না। যন্ত্রপাতির উদ্ভাবক, এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার প্রবর্ত্তক, নামজাদা বিজ্ঞানবীরেরা যদি আমার পূজাস্থান হন, তাহা হইলে এই সকল বিজ্ঞানবীরের সহায়ক, এই সকল এঞ্জিনিয়ারিং-সহযোগী কর্ম্মবীর মিস্ত্রী, কর্ম্মবীর মজুর ইত্যাদিও আমার নিকট পূজাস্থান। তথাকথিত মজুরই বর্ত্তমান জগতের স্রষ্টা। তাহারাই নূতন নূতন কলকব্জা সমাজের ভিতর পল্লীতে পল্লীতে ছড়াইয়া দিয়াছে। টেক্‌নলজী জিনিষটা যে পৃথিবীর সকল দেশে, অলিতে-গলিতে সার্ব্বজনীন, ডেমক্রেটাইজড্‌ হইতে পারিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ এই সকল মজুরবীরদের কৃতিত্ব। মজুরদের একটা যে-সে পেশার প্রতিনিধি বিবেচনা করি না। মজুরেরা আমার নিকট বর্ত্তমান জগৎ-স্রষ্টা বীরদের অন্যতম। এই ত গেল মজুরদের আসল কৃতিত্ব সম্বন্ধে প্রথম কথা।

এই সঙ্গে আর একটা কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। মজুরদেরকে আমি মস্তিষ্কজীবী হিসাবেও বড় বিবেচনা করিয়া থাকি। সাধারণ লোকের বিশ্বাস—যাহারা কলম পিষিয়া খায় তাহারা মস্তিষ্কজীবী, যাহারা খবরের কাগজ লেখে, যাহারা স্কুল-মাষ্টারী করে, যাহারা সরকারী চাকুরে, যাহারা সভা-সমিতিতে গলাবাজী করে—এক কথায় সেই সব লোককেই মস্তিষ্কজীবী বলা হইয়া থাকে। এই ধারণার ভিতর অনেক ভুল আছে। বস্তুতঃ মাথা খাটায় না এমন লোক পৃথিবীতে আছে কি না সন্দেহ। এমন কি, অতি নিরক্ষর চাষীও প্রতি মুহূর্ত্তে মাথা খাটাইয়া তাহার আবাদ চালাইয়া থাকে। কাজেই একমাত্র বাবু-সমাজকে, অর্থাৎ সাদা-কলার-ওয়ালা গোলাম জাতিকে আমি মস্তিষ্কজীবী বিবেচনা করিতে পারি না। মিস্ত্রীদের কথাই বলিতেছি। অন্যান্য দেশের মিস্ত্রীরা অবশ্য আজ কাল লিখিতে পড়িতে পারে, আর আমাদের দেশের মিস্ত্রীদের অনেকেই নিরক্ষর। প্রশ্ন এই—অন্যান্য দেশের মিস্ত্রীরা তাহাদের সমাজের তথাকথিত উচ্চতর শ্রেণীর লোক হইতে মাথা খাটান হিসাবে কম কি? আর আমাদের সমাজেই বা কি দেখিতে পাই? নিরক্ষর মিস্ত্রী যন্ত্রপাতি দিয়া কাজ করিবার সময়ে যে ধরণের মাথা খাটায়, তাহার চেয়ে কি বেশী মাথা খাটায় তাহারা যাহারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কলম পিষিয়া নকল করিয়া যাইতেছে অথবা স্কুল-কলেজে বসিয়া কতকগুলি বইয়ের লেখা বকিয়া যাইতেছে? মজুরদের আমি কেরাণী স্কুল-মাষ্টারের চেয়ে কোনও হিসাবে কম মস্তিষ্কশালী বিবেচনা করি না। বরং আর একটা বিশেষ কথাই বলিব। মজুরেরা আধুনিক মস্তিষ্কের মালিক। একশ' দেড়শ' বছর আগে মজুরেরা যে ধরণের মাথা খাটাইয়া জীবন ধারণ করিত, আজ কাল তাহারা সেই ধরণের মাথা খাটাইয়া জীবন ধারণ করিতে সমর্থ নয়। তাহাদিগকে বিগত শ', পঁচাত্তর, পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া নূতন নূতন যন্ত্রপাতি ঘাঁটিতে হইতেছে। এই জন্য তাহাদের চোখ, তাহাদের কাণ, তাহাদের মাংসপেশী, তাহাদের হাতের তালু, তাহাদের পায়ের ঢং, তাহাদের আঙ্গুল—সবই অনেক পরিমাণে বদলাইয়া রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মগজটাতেও কিছু কিছু নূতন ঢং-এর ঘী আসিয়া নামিয়াছে। আধুনিক মাথা, আধুনিক চিন্তা-শক্তি, আধুনিক চিন্তাপ্রণালী ইত্যাদি বলিলে যাহা কিছু বুঝি, তাহার অনেক কিছুই মজুরদের মস্তিষ্কে মজুত আছে। এই কারণেই তথাকথিত মজুরেরা আমার নিকট বিশেষভাবে অন্যতম "পূজার স্থান"। মজুরদিগকে অন্যান্য কারণেও আমি বিশেষ-রূপেই আদরের সামগ্রী বিবেচনা করি।

এইবার বলিব নৈতিক জীবনের কথা। পৃথিবীর যেখানে যেখানে আধুনিক কল-কারখানার প্রবর্ত্তন হইয়াছে, অর্থাৎ যেখানে যেখানে আধুনিক প্রণালীতে মাথা খাটাইয়া মজুরেরা ভাত কাপড় জুটাইতেছে সেই সকল স্থানে এক একটা নতুন কর্ত্তব্য জ্ঞান, নতুন দায়িত্ব-বোধ, নতুন চরিত্রবত্তা দেখা গিয়াছে। বর্ত্তমান জগতের নব্য নৈতিক জীবনের প্রধান স্তম্ভ হইতেছে মজুর। তাহার বিপুল প্রমাণ—মজুরদের সঙ্ঘগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন। এই সঙ্ঘ-জীবনে যে ধরণের দায়িত্ব-বোধ, যে ধরণের সামঞ্জস্য-জ্ঞান, যে ধরণের পরস্পর সাপেক্ষতা, যে ধরণের

ভ্রাতৃত্ব বিকাশ লাভ করে সেই ধরণের সদ্‌গুণ মানবজীবনে পৃথিবীর অন্যান্য যুগে এক প্রকার ছিলই না। ট্রেড ইউনিয়ন বর্ত্তমান জগতের এক অপূর্ব্ব আবিষ্কার। আর এই সঙ্ঘ-জীবনের ভিতর যে নৈতিক চরিত্র বিরাজ করিতেছে তাহাও মানবজাতির ইতিহাসে এক সম্পূর্ণ নূতন চরিত্রবত্তার পরিচায়ক। এই নব্য নীতির প্রতিনিধি হিসাবে মজুর শ্রেণী সকল দেশে ও সমাজে যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছে। আর্থিক জীবনের সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই পৃথিবীর উন্নততর দেশ-সমূহে মজুরদের এই নৈতিক চরিত্র অনেক উৎকর্ষ আনিয়া ছাড়িয়াছে। ভারতবর্ষেও আমরা মজুরদের সঙ্ঘবদ্ধতার কিছু কিছু সুফল পাইয়াছি। এই সঙ্ঘবদ্ধতার পরিমাণ যতই বাড়িয়া যাইবে ততই আমরা অন্যান্য দেশের মতই মজুর-সমাজ হইতে আরও অনেক কিছু উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিব।

এইবার বলিব রাষ্ট্রীয় জীবনে মজুরদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে একটা মাত্র কথা। যে নব্য নীতি মজুরেরা আর্থিক জীবনে আনিয়াছে, সেই নব্য নীতির প্রভাবে পৃথিবীর সকল দেশে কিছু না কিছু স্বরাজ, আত্মকর্তৃত্ব, স্বায়ত্তশাসন, আত্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা আসিয়াছে। মজুর আর মজুরদের সঙ্ঘ না থাকিলে ইয়োরোমেরিকার ডেমক্রেসি, আত্মশাসন বা স্বরাজ ইত্যাদির যতটুকু দেখিতে পাই তাহা পাইতাম না। বর্ত্তমান যুগের ডেমক্রেসির আসল প্রবর্ত্তক হইতেছে মজুর-শ্রেণী। কাজেই মজুর আমার নিকট আরও বিশেষ ভাবে প্রণম্য।

এই চার তরফ হইতে আধুনিকতার কর্ম্মকৌশলে, মস্তিষ্কচালনায়, আর্থিক সঙ্ঘগঠনে আর রাষ্ট্রিক স্বরাজে—এই চার দফায়ই মজুরেরা আমার চিন্তায় বর্ত্তমান যুগের ধুরন্ধর। মজুরদিগকে বাদ দিলে বর্ত্তমান জগতের এই চারিটা উৎকর্ষ প্রায় ষোল আনা কাণা হইয়া যাইবে। এই সকল কথা সাধারণ লিখিয়ে-পড়িয়ে লোক বোধ হয় মানিতে চাহেন না, পয়সা-ওয়ালা লোকেরা মজুরদের এই কৃতিত্বের কথা কখনও সজাগ ভাবে চিন্তা করিয়াছেন কি না সন্দেহ। আমার কাছে আধুনিক যুগান্তরগুলার আসল ভগীরথ হইতেছে মজুর-সমাজ। দুনিয়ায় চাই মজুর, চাই আরও মজুর, বেশী মজুর।

চাষী-সমবায়, বণিক্-ভবন ও মজুর-সঙ্ঘ

বর্ত্তমান জগতের একমাত্র প্রতিনিধি—মজুর নয়, ইহাও বলা বাহুল্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক ইত্যাদি বিজ্ঞানবীরেরা বর্ত্তমান যুগের অন্যতম চালক। তবে মজুরদের কথা ভাবিবার সময়ে সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, মানুষের সমাজে ইহাদের দল অতি উঁচু শ্রেণীর অন্তর্গত। সভ্যতার সৃষ্টি-কার্য্যে মজুরদের কৃতিত্ব অগ্রাহ্য করিবার জিনিষ নয়। খোলাখুলি যদি আমরা একালের আর্থিক জীবনটা বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, বর্ত্তমানে তিনটা বড় বড় প্রতিষ্ঠান ধন-দৌলতের উৎপাদন ও বিতরণের কাজে নিযুক্ত আছে। প্রথম প্রতিষ্ঠানকে বলিতে পারি চাষীদের সমবায় বা কো-অপারেটিভ আন্দোলন। দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানকে বলিব পুঁজিপতিদের মিলনকেন্দ্র—এক কথায় তাহাকে বলিতে পারি বণিক্-ভবন বা চেম্বার অব কমার্স। আর তৃতীয় প্রতিষ্ঠান হইতেছে মজুর-সঙ্ঘ বা ট্রেড ইউনিয়ন। এই তিনটার ভিতর কোনটা বড়, কোনটা ছোট, ইহা লইয়া তর্কাতর্কি উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু আমি এই বড় ছোট'র মামলায় সময় দিতে প্রলুব্ধ হইব না। আমার কাছে মজুরদের শক্তিযোগ, মজুরের কৃতিত্ব অন্যতম প্রাথমিক স্বীকার্য্য।

আমার দেশ বড় হইতেছে কি না, আধুনিক আধ্যাত্মিকতায় ভারতসন্তান উন্নত হইতেছে কি না, বাংলার নরনারী বর্ত্তমান জগতের উপযুক্ত কর্ম্মনিষ্ঠায় পাকিয়া উঠিতেছে কি না, এই সকল কথা চিন্তা করিবার সময়ে আমি অন্যান্য অনেক কিছু কথাই ভাবিয়া থাকি বটে, আমাদের সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক জীবনের অলি-গলি, খুঁটি-নাটি সব জরীপ করিয়া থাকি, সন্দেহ নাই। কিন্তু সর্ব্বদাই আমি গুণিয়া থাকি আমাদের মজুরের সংখ্যা। মজুরেরা গুণ্‌তিতে বাড়িল কি না, মজুরেরা নতুন নতুন কর্ম্মপ্রণালী শিখিল কি না, নতুন নতুন আকার প্রকারের মজুরশ্রেণী বাংলাদেশে দেখা দিল কি না, ইত্যাদি প্রশ্ন সর্ব্বদাই আমার মাথায় বিরাজ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের মজুর-সঙ্ঘ আজ কি অবস্থায় আছে, মজুরসঙ্ঘগুলি গুণ্‌তিতে বাড়িল কি না, মজুর-সঙ্ঘ নতুন নতুন দায়িত্ব-

পূর্ণ কার্য্য গ্রহণ করিতে ঝুঁকিতেছে কি না, এই সকল কথা আলোচনা না করিলে আমি বর্ত্তমান ভারতের উন্নতি অবনতির সঠিক প্রমাণ পাই না। দুনিয়ার সভ্যতা জরীপ করিবার পক্ষে একটা বিপুল যন্ত্রই হইতেছে আমার নিকট মজুর-সঙ্ঘ। মজুর-সঙ্ঘের মাপে ভারত কোথায়? বিশ্বদৌলতের ভিতর মজুরের সৃষ্টি, মজুরের দেওয়া ধন সম্পদ্ কতখানি, দুনিয়ার মাপে ভারতের মজুর-সমাজ কি অবস্থায় রহিয়াছে; এই সকল প্রশ্নই আমার কাছে বর্ত্তমান জগতের আধ্যাত্মিকতা, বর্ত্তমান জগতের উন্নতিনিষ্ঠা ইত্যাদি সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রধান প্রশ্ন।

ভারতবর্ষের কারখানার সংখ্যা হাজার পনর। নেহাৎ ছোট কারখানাও এই সংখ্যার ভিতর ধরা হইয়াছে। আর এক মাপে কারখানার সংখ্যা ৬৪০০। এই হিসাবে একমাত্র সেই সকল প্রতিষ্ঠান ধরা হয়, যাহাতে কমসে-কম বিশ জন লোক কাজ করে। এই ধরণের কারখানায় সর্ব্ব-সমেত মজুর-সংখ্যা পনর লাখ। কিন্তু যদি ছোট ছোট কারখানাগুলিও ধরি, তাহা হইলে পনর হাজার কারবারে মোটের উপর পঁচিশ লক্ষ মজুর বহাল আছে। এই হইল ভারতের মজুরশক্তি। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ কোটী নরনারীর দেশে পনর লক্ষ বা পঁচিশ লক্ষ মজুর মুষ্টিমেয়। আমার মতে, ভারতবাসীর আধুনিক আধ্যাত্মিকতা, আধুনিক চরিত্রবত্তা, আধুনিক শিল্প-নৈপুণ্য, আধুনিক শক্তিযোগ, আধুনিক মস্তিষ্কশক্তি—সবই নেহাৎ সামান্য মাত্র। বর্ত্তমান জগতের ভিতর ভারতের নরনারী অনেক নীচের ধাপে অবস্থিত। কত নীচে তাহা আঁকজোকের সাহায্যে মাপিয়া বলাও সম্ভব।

প্রথমেই বলিয়া রাখা উচিত যে, ভারতের মজুর-সংখ্যা পনর লক্ষই হউক, কি পঁচিশ লক্ষই হউক, ইহাদের অনেকেই সঙ্ঘবদ্ধ নয়। সঙ্ঘবদ্ধ মজুরের সংখ্যা ভারতে খুব কম। অন্যান্য দেশেও সকল মজুরই সঙ্ঘবদ্ধ নয়। অন্যান্য দেশেও সঙ্ঘের বাহিরে অনেক মজুর তাহাদের জীবন চালাইয়া থাকে। মজুরদের ইউনিয়ন অর্থাৎ মজুরসঙ্ঘগুলিকে বর্ত্তমান জগতের শক্তিযোগের খুঁটা বিবেচনা করি। কাজেই ভারতে যখন মজুরসঙ্ঘের অল্পতা লক্ষ্য করিতেছি, তখন ভারতবাসীকে শক্তিযোগে নেহাৎ অবনত বিবেচনা করা আমার পক্ষে অতি স্বাভাবিক।

কথায় কথায় আমরা বলিয়া থাকি, ভারতবাসীরা গুণ্‌তিতে দুনিয়াবাসীর পাঁচ ভাগের বা ছয় ভাগের এক ভাগ। তাহা হইলে মজুর-সঙ্ঘ আর সঙ্ঘবদ্ধ মজুরের সংখ্যাও বাস্তবিক পক্ষে দুনিয়ার ভিতর আমাদের ছয় ভাগের এক ভাগ হওয়া স্বাভাবিক। তাহা হইলে বুঝিতাম যে, বাস্তবিক ভারতবাসী জগতের মাপে বর্ত্তমান-নিষ্ঠ, আধুনিক যুগেও ভারতীয় জীবন কর্ম্মঠ-ভাবে চালাইতেছে। কিন্তু কি দেখিতে পাই? সমস্ত পৃথিবীতে আজকাল সঙ্ঘ-বদ্ধ মজুরের সংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটী। ইহা হইতেছে ১৯৩০ সনের গুণ্‌তির ফল। ১৯২৫ সনে ছিল প্রায় সাড়ে চার কোটী। বুঝিতে হইবে, দুনিয়ায় সঙ্ঘবদ্ধ মজুরের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে অর্থাৎ জগতের নরনারী আধুনিক যন্ত্রনিষ্ঠায়, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে, আধুনিক স্বরাজ-যোগে কম্‌সে-কম গুণ্‌তিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। ভারতবর্ষেও মজুরসঙ্ঘ হিসাবে খানিকটা বাড়িয়া চলিয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ১৯২০ সনের পূর্ব্বে আমাদের দেশে মজুরসঙ্ঘ একপ্রকার ছিলই না। বিগত বার বৎসরে ভারতীয় মজুরেরা নানাবিধ সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিয়াছে। আর সঙ্ঘ-বদ্ধতাও ক্রমে ক্রমে ভারতীয় মজুরসমাজের অন্যতম লক্ষণ দাঁড়াইয়া যাইতেছে। এই সকল কথা স্বীকার করিয়া লইলেও, আবার স্বীকার করিতে হয় যে, আজও গুণ্‌তিতে আমাদের মজুর-সঙ্ঘগুলি যারপর নাই নগণ্য। আজ যদি ভারতে অন্ততঃ পঁচাত্তর আশী লক্ষ মজুর সঙ্ঘ-বদ্ধরূপে থাকিত তাহা হইলে বুঝিতাম যে, ভারতবর্ষ একটা দেশ বটে। কিন্তু প্রথমেই বলিয়াছি, আমাদের ভারতে মজুর-সংখ্যা মোটের উপর পনর লক্ষ হইতে পঁচিশ লক্ষ মাত্র। আর সঙ্ঘবদ্ধ মজুরের সংখ্যা ইহারও অনেক কম। ভারতবর্ষ আজকাল সঙ্ঘবদ্ধ মজুর গুণ্‌তিতে কত কম তাহা যথার্থরূপে বলা খুবই কঠিন। কেননা, আমাদের সঙ্ঘগুলির জীবন অতি মাত্রায় পরিবর্ত্তনশীল। কোন সঙ্ঘটা চলিতেছে, কোন সঙ্ঘটা গেল, এই সব খবর পাওয়া যায় না। অনেক

গুলির অবস্থাও অনেক সময়ে বেশ কিছু কাহিল। তাহার উপর তিন চার বৎসর ধরিয়া ভারতীয় মজুর-মহলে, একে দলাদলি তাহার উপর আর্থিক দুর্দ্দৈব ইত্যাদি লাগিয়াই আছে। কাজেই সঙ্ঘবদ্ধ মজুরের সংখ্যা বর্ত্তমানে খুব কম। ১৯২৭ সনের বৃত্তান্ত বলিতে পারি। তখন ছিল লাখ চারেক মাত্র সঙ্ঘবদ্ধ মজুর অর্থাৎ যে সময়ে দুনিয়ায় প্রায় পাঁচ কোটী মজুর সঙ্ঘবদ্ধ, সেই সময়ে ভারতে সঙ্ঘবদ্ধ মাত্র শত-করা একজনেরও কম। আগেই বলিয়াছি, আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ মজুর যদি দুনিয়ার সঙ্ঘবদ্ধ মজুরের পাঁচ ভাগের বা ছয় ভাগের এক ভাগ হইত, অর্থাৎ যদি শত-করা যোল বা বিশও হইত, তাহা হইলেও মানুষ হিসাবে ভারতবাসীর ইজ্জৎ-রক্ষা হইত। কোথায় হওয়া উচিত ছিল শত-করা পনর হইতে বিশ, আর কোথায় একজনেরও কম। এখানেই ভারতীয় মজুর-সমাজের দুর্ব্বলতা আর এখানেই বর্ত্তমান ভারতেরও আর্থিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক অক্ষমতা হাতে হাতে ধরা পড়িতেছে।

সঙ্ঘ-বদ্ধ মজুর-দুনিয়া

এইবার দুনিয়ার নানাদেশে একটু পায়চারি করিয়া দেখা যাউক, কোথায় মজুর-সঙ্ঘ কত। ১৯২৭ সনের মাপেই সব কিছু বলা যাইতেছে।

দেশের নাম	সঙ্ঘবদ্ধ মজুর-সংখ্যা	লোক-সংখ্যা
রুশিয়া	৮,৩০৩,০০০	১৩৯,৭৬০,৫০০
জার্ম্মাণী	৮,১৯৬,০৩৫	৬৩,৩৩৮,৭৫৩
গ্রেট বৃটেন	৪,৫০১,০০০	৪২,৭৬৯,১৯৬
যুক্ত-রাষ্ট্র	৩,০৫১,৬১৮	১০৫,৭১০,৬২০

ইত্যাদি

এই ধরণের প্রায় পঁয়ত্রিশ কি চল্লিশটী দেশের সংখ্যা ঝাড়া যাইতে পারে। সকলগুলি এখানে জাহির করিবার প্রয়োজন নাই। দেখিতেছি, আশী লক্ষের বেশী সঙ্ঘবদ্ধ মজুর আছে জার্ম্মাণীতে আর রুশিয়ায়, তার পরেই হইতেছে বিলাতের ঠাঁই। এখানে সঙ্ঘবদ্ধ মজুরের সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ লক্ষ। সঙ্ঘবদ্ধ মজুরের গুণ্‌তিতে ভারতবর্ষ কোথায়? এইবার কয়েকটী সংখ্যা আবার ঝাড়িতেছি—

দেশের নাম	সঙ্ঘবদ্ধ মজুরসংখ্যা	লোকসংখ্যা
সুইডেন	৪৭৭,৪৬৯	৫,৯০৪,৪৮৯
স্পেন	৪৫৯,০৯৩	২১,৬৮৯,৮৪২
ভারত	৪০৭,০৩৭	৩১৯,১৩০,০৫৫
আইরিশ ফ্রি ষ্টেট্	৩৮৩,৪৫৪	৩,১৬০,০০০
ডেনমার্ক	৩০৮,৮৩৪	৩,৩৮৬,২৭৪
হাঙ্গারী	২৬৭,৮৮৫	৭,৯৮০,১৪৩
কানাডা	২৬০,৬৪৩	৮,৭৭৮,৪৮৩
জাপান	২২৫,৭৭০	৫৯,৭৩৬,৭০৪

দেখিতেছি, ভারতের সঙ্ঘবদ্ধ মজুরের সংখ্যা সেই সকল দেশের সঙ্ঘবদ্ধ মজুরের সমান যে সকল দেশের লোকসংখ্যা খুবই কম। অর্থাৎ লোকসংখ্যার অনুপাতে ভারতের সঙ্ঘবদ্ধ মজুরের সংখ্যা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। অন্যান্য দেশের নাম সম্প্রতি করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এইবার বিষয়টা আরও কিছু তলাইয়া দেখা আবশ্যক। লাখ চারেক সঙ্ঘবদ্ধ মজুর ভারতে আছে, আবার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আইরিশ ফ্রী ষ্টেটেও তদ্রূপ দেখিতেছি। একত্রিশ বত্রিশ কোটী নরনারীর বিপুল মহাদেশে মজুরেরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে যতখানি শক্তি দেখাইতেছে একত্রিশ বত্রিশ লক্ষ নরনারীর আইরিশ ফ্রি ষ্টেটেও প্রায় ততখানিই দেখাইতেছে।

প্রতি দশ হাজারে সঙ্ঘবদ্ধ মজুরের সংখ্যা জিনিষটা বুঝিবার জন্য সমগ্র লোকসংখ্যার অনুপাতে সঙ্ঘবদ্ধ মজুরের সংখ্যা যাচাই করিয়া দেখা আবশ্যক। এই সম্বন্ধে কিছু পুরান খবর দিব। ১৯২০ সনের প্রত্যেক দশ হাজার নরনারীর ভিতর তখন কত জন মজুর সঙ্ঘবদ্ধ ছিল তাহাই দেখাইব—

	দেশের নাম	প্রতি দশ হাজারে সঙ্ঘবদ্ধ মজুর
১।	জার্ম্মাণী	২,১৭২
২।	গ্রেট বৃটেন	১,৮৭০
৩।	যেকো-শ্লোভাকিয়া	১,৪৭১
৪।	অষ্ট্রীয়া	১,২৭৭
৫।	অষ্ট্রেলিয়া	১,২৫৮
৬।	ডেনমার্ক	১,২৩১
৭।	বেলজিয়াম	১,২২৬
৮।	হল্যাণ্ড	৯৯৫
৯।	ইতালি	৭৯৫

ইত্যাদি, ইত্যাদি। দেখিতে পাই যে, প্রতি দশ হাজারে দুই হাজার অথবা দুই হাজারের বেশী মজুর আছে মাত্র এক দেশে, তাহার নাম জার্ম্মাণী। গ্রেট বৃটেন এই হিসাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। তবে জার্ম্মাণীর খুব কাছাকাছি বটে। যেকোশ্লোভাকিয়া, অষ্ট্রীয়া, ডেনমার্ক ও বেলজিয়াম এই চার দেশে সঙ্ঘবদ্ধ মজুরের সংখ্যা গোটা লোকসংখ্যার কি দশ হাজারে এক হাজারের বেশী ও দুই হাজারের কম।

এইবার কতকগুলি দেশের নাম করিব, যেখানে জন-সংখ্যার ফি দশ হাজারে সঙ্ঘ-বদ্ধ মজুরের সংখ্যা একশতেরও কম :—

দেশের নাম	ফি দশ হাজারে সঙ্ঘবদ্ধ মজুরের সংখ্যা
দক্ষিণ আফ্রিকা	৮৬
বুলগেরিয়া	৭৫
রুমানিয়া	৫৩
সার্ব্বিয়া	৫০
জাপান	৪৩
ভারত	১৬

আমি মোটের উপর ত্রিশটা দেশের সংখ্যা লইয়া মাপ-জোক চালাইয়াছি। তাহাতে দেখিতেছি, ভারত আসিতেছে একেবারে সকলের নীচে।

এইবার সংখ্যাগুলিকে সামাজিক জীবনের কাঠামে ফেলিয়া যাচাই করা হউক। দশ হাজার নরনারীর ভিতর দুই হাজার সঙ্ঘবদ্ধ মজুর,—এ কথাটার মানে কি? ধরা যাউক, যেন মজুরের পরিবারে তিন কিম্বা চার জন লোক আছে। তাহা হইলে বলিব, জার্ম্মাণীর ফি দশ হাজার নরনারীর ভিতর প্রায় আট হাজার সাত শ', আর গ্রেট বৃটেন প্রায় সাত হাজার পাঁচ শ' লোক প্রকারান্তরে সঙ্ঘের আওতায় জীবন ধারণ করে। সঙ্ঘ-ধর্ম্ম, সঙ্ঘশক্তি, সঙ্ঘ-চরিত্র, সঙ্ঘ-জীবনের আধ্যাত্মিকতা, সঙ্ঘ-যোগের স্বরাজ-শক্তি, সবই কি দশ হাজার নরনারীর ভিতর আট হাজার সাত শ' আর সাত হাজার পাঁচ শ' লোককে অনুপ্রাণিত করিতেছে। ইহাকে বলে, বর্ত্তমান যুগের ডেমক্রেশী বা আত্মকর্ত্তৃত্বশীল সমাজ-ব্যবস্থা। যে দেশের দশ হাজার লোকের ভিতর আট হাজার সাত শ' লোকই প্রতিদিন প্রত্যেক উঠা-বসায় নিজ হাতে গড়া সঙ্ঘের বিধানানুসারে জীবন চালাইতে অভ্যস্ত তাহারা ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে স্বভাবতই অধিকারী। আর তাহার ফলে কি শাসনপ্রণালী, কি বিচারপ্রণালী, কি ধনিসমাজ, কি কারখানাপতি সকলেই জনগণকে সম্মান করিয়া চলিতে অভ্যস্ত থাকে। বলিয়া রাখা ভাল, জার্ম্মাণী আর বিলাত এই হিসাবে শীর্ষ-স্থানীয়। বর্ত্তমান জগতের সঙ্ঘ-শক্তি, টেক্‌নিক্যাল কর্ম্ম প্রচেষ্টা, সমাজ-তন্ত্র বা সমাজ-নিষ্ঠা, সোশ্যালিজম, স্বরাজ ইত্যাদির চরম আমরা জার্ম্মাণ আর বিলাতী সমাজে দেখিতে পাই। এই সব জিনিষ কল্পনা করা পর্য্যন্ত বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, সার্ব্বিয়া, জাপান, আর তাহাদের সমগোত্রভুক্ত ভারতের পক্ষে অসম্ভব। ডেমক্রেশী আর সোশ্যালিজিম যদি কেহ পৃথিবীতে বুঝে তবে তাহা একমাত্র জার্ম্মাণ আর ইংরেজ নরনারীই বুঝে। আজ আমরা ভারতে মজুরসঙ্ঘগঠনে যে অবস্থায় রহিয়াছি সেই অবস্থায় দাঁড়াইয়া জার্ম্মাণীর মজুর-সংগঠন, বিলাতের মজুর আন্দোলন ইত্যাদি আলোচনা করিতে যাওয়া অথবা তাহাদের দৃষ্টান্তে নিজের কর্ম্ম সুরু করিতে বসা আমাদের পক্ষে অতি মাত্রায় বাতুলতা। আসমানের চাঁদ ধরিতে হাত আগাইয়া দেওয়া যেরূপ, জার্ম্মাণ মজুর আন্দোলন, ইংরেজ মজুর আন্দোলন ইত্যাদির আদর্শ আমাদের চোখের সম্মুখে রাখিয়া চলাও ঠিক সেইরূপ। কি ব্যাঙ্ক-যোগে, কি কারখানা-যোগে, কি বহির্ব্বাণিজ্য-যোগে, কি যানবাহন-যোগে—আর্থিক জীবনের অন্যান্য অসংখ্য কর্ম্মক্ষেত্রে ভারতবাসী যেমন ইংরেজ ও জার্ম্মাণকে কোন মতেই বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ নয়, ঠিক সেইরূপই এই মজুর-যোগে, মজুরের শক্তিযোগে সঙ্ঘবদ্ধতার কর্ম্মক্ষেত্রে ভারতীয় নরনারী জার্ম্মাণ-সমাজকে আর ইংরেজ-সমাজকে কোনমতেই যথার্থরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না।

চৈত্য

শীলানন্দ ব্রহ্মচারী

বৌদ্ধদের পূজার বস্তু স্তূপ ইত্যাদিকে চৈত্য বা চেতিয় বলে। চৈত্য বৌদ্ধদের কাছে অতি পবিত্র। তাহারা দেশদেশান্তর হইতে আসিয়া শ্রদ্ধানত শিরে চৈত্য-বন্দনা করে। বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত সেই চৈত্য দেখিয়া তাহাদের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ যুগ-যুগান্তর-রচিত বনগহনের মধ্য হইতে চৈত্য আবিষ্কার করিয়া আপনার কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন। চৈত্য-দর্শনে ভাবুকের মন ভাবমগ্ন হয় এবং কবির কল্পনার উৎস খুলিয়া যায়।

বাস্তবিক চৈত্যসমূহ ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের চরমোন্নতির নিদর্শন এবং ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের প্রধান সামগ্রী। অর্থ-কথা-রচয়িতার রচনায় আমরা চারি প্রকার চৈত্যের উল্লেখ দেখিতে পাই যথা—'শারীরিক', 'পারিভোগিক', 'উদ্দেসিক' ও 'ধর্ম্মচেতিয়',। পরিষ্কার করিয়া বলিতে গেলে, বুদ্ধের দেহাবশেষের উপর যে স্তূপসমূহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেইগুলিই শারীরিক চেতিয়; পারিভোগিক চেতিয় তাঁহারই ব্যবহার্য্য-দ্রব্য-রক্ষণের জন্য নির্ম্মিত মন্দির; তাঁহার মূর্ত্তি ইত্যাদি উদ্দেসিক চেতিয় এবং ত্রিপিটক গর্ভ-স্তূপই ধর্ম্ম-চেতিয়।

তাহা ছাড়া বুদ্ধ ঘোষের বিনয় ও মধ্যম নিকায়ের অর্থকথায় আর একপ্রকার চৈত্যের উল্লেখ আছে, যাহা পদ-চৈত্য বলিয়া কথিত হয়। সেই পদ-চৈত্য-বন্দনায় বৌদ্ধ মন্দিরে নিম্নলিখিত গাথা উচ্চারিত হইয়া থাকে—

> "যং নম্মদায় নদিয়া পুলিনে চ তীরে
> যং সচ্চবন্ধগিরিকে সুমণাচলগ্গে
> যং চাপি যোনক পুরে মুনিনো চ পাদং
> তং পাদলঞ্ছনমহং সিরসা নমামি।"

বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর তাঁহার দেহাবশিষ্ট লইয়া অজাতশত্রু প্রভৃতি রাজগণের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম হইবার উপক্রম হইল। তখন ব্রাহ্মণাচার্য্য দ্রোণ তাহা আট ভাগে বিভক্ত করিয়া তাঁহাদের বিবাদ মিটাইয়া দিলেন।

তাঁহারা স্ব স্ব রাজ্যে ফিরিয়া লব্ধ ধাতুর উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়া পূজা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে যে যে স্থানে তথাগতের ধাতু-স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই স্থানগুলির নাম এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি :—

বুদ্ধদেব
সারনাথে "ধর্ম্মচক্র" প্রচার করিতেছেন

১ রাজগৃহ	৫ রামগ্রাম
২ বৈশালী	৬ বৌদীপ
৩ কপিলবস্তু	৭ পাবা
৪ অল্লকপ্প	৮ কুশীন নগর

ইহাদের স্তূপ সম্বন্ধে বিস্তৃত ঐতিহাসিক বিবরণ এখন দুর্লভ। প্রবাদ বাক্যের অনুসরণ করিয়া ইহাও বলা

আবশ্যক, বুদ্ধের দশন ধাতু চতুষ্টয় স্বর্গ, গান্ধারপুর, দন্তপুর (কলিঙ্গপুর) ও নাগপুরে পূজিত হইত। তাঁহার ৪০টি সমদন্ত, কেশ, লোম ইত্যাদির প্রত্যেকটি প্রত্যেক চক্রবালে নীত হইয়াছিল।

কলিঙ্গপুর বা দন্তপুরের দন্ত ধাতুর বিবরণ দাঠাবংশে বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে তাহা পুনঃ সিংহলের অনুরাধাপুরে স্থাপিত হইয়াছিল। তাহার একশত বৎসর পরেও চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়াং তথায় তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন। গান্ধারপুরের

বুদ্ধের দন্ত

দন্ত ধাতুর ইতিহাস অত্যন্ত বিশৃঙ্খল। ফা-হিয়াং-এর বিবরণে এইমাত্র জানিতে পারা যায়, যে তিনি নাগরায় এক দন্ত ধাতুর স্তূপ দেখিয়াছিলেন। বামিয়ান, নববিহার প্রভৃতি স্থানেও তাঁহার দন্ত-ধাতু-দর্শনের উল্লেখ আছে। হিদ্দনগরের এক স্তূপে তথাগতের তথাকথিত উষ্ণীষ ধাতু (মাথার খুলি) নিহিত ছিল। তথায় আরও দুইটী মন্দিরে উষ্ণীষ ধাতুর অংশ ও চক্ষুতারা পূজিত হইত।

দক্ষিণ-দেশবাসী বৌদ্ধদের কাছে বুদ্ধধাতু যে কম ছিল, তাহা নহে। দন্ত ধাতু ছাড়া বুদ্ধের অন্যান্য ধাতুও সিংহলে নীত হইয়াছিল। প্রবাদ আছে, তথাকার স্বর্ণমালী চৈত্যে ১ * দ্রোণ বুদ্ধধাতু নিহিত। অশোকের সময়ে তরুণ শ্রমণ সুমণ বুদ্ধের দক্ষিণ কণ্ঠাস্থি সিংহলে লইয়া গিয়াছিলেন। তাহার উপর তিষ্য মহারাম চৈত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বুদ্ধের প্রধান শিষ্যগণের শরীরাবশেষেও অতি সম্মানের সহিত স্তূপে নিহিত হইত। ফা-হিয়াং বৈশালীর অনতিদূরে আনন্দ স্থবিরের অর্দ্ধ-শরীরাবশেষের স্তূপ দেখিয়াছিলেন। তখন তাঁহার অপরার্দ্ধ শরীরাবশেষটী মগধে পূজিত হইত। শারীপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন, রাহুল ও উপালি প্রভৃতি স্থবিরগণের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের জন্য মথুরায় তাঁহাদের দেহাবশেষের উপর বৃহৎ বৃহৎ স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু সঙ্ঘ-স্থবির

অশোকের ধামক স্তূপ

মহাকাশ্যপের দেহাবশেষ কুক্কুটপাদ বলিয়া কল্পিত পর্ব্বত কন্দরেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বুদ্ধের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে তাঁহার ব্যবহার্য্য দ্রব্যসমূহ কোথায় কি ভাবে রক্ষিত ছিল, তাহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। চৈনিক পরিব্রাজকগণের ভারত-ভ্রমণের সময়েই তাঁহাদের পরিদৃষ্ট পারিভোগিক চেতিয়ের আভাস মাত্র পাই। ফা-হিয়াং নাগরার কাছে বুদ্ধের ১৬।১৭ হাত দীর্ঘ চন্দনযষ্টি দেখিয়াছিলেন। তৎসন্নিহিত এক মন্দিরে বুদ্ধের সংঘাটি নিহিত ছিল। হুয়েন সাং তাহাতে সংঘাটি ও কাষায় দুইটিই লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

---

* দ্রোণ পরিমাণ বিশেষ। ৪ গণ্ডুষে ১ পল, ৪ পলে ১ আলহক, ৪ আলহকে ১ দ্রোণ বা দোণ।

ফাহিয়াং-এর সময়ে তথাগতের পাত্র পেশোয়ারে রক্ষিত ছিল। সেই পাত্র-পূজার জন্য দলে দলে ভক্তবৃন্দের সমাগম হইত। দুই শতাব্দী পরে তাহা পারস্যরাজের হস্তগত হইয়াছিল। দীপবংশ নামক গ্রন্থে নানা প্রকার পারিভোগিক চেতিয়ের উল্লেখ আছে, যথা—ককুসন্ধের পানীয়পাত্র, কোণাগমণের কায়বন্ধন, কাশ্যপের স্নান-বসন ও গৌতমের কটিবন্ধন। এইগুলি কায়বন্ধন স্তূপেই নিহিত। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে দক্ষিণভারতের এক বৌদ্ধমঠে কুমার সিদ্ধার্থের উষ্ণীষ রাখা হইয়াছিল। তাহা প্রত্যেক উপোসথদিনে দেখান হইত।

যাহার ছায়ায় বুদ্ধের বুদ্ধত্বের বিকাশ হইয়াছিল, সেই সুপ্রসিদ্ধ বোধিতরুও পারিভোগিক চৈত্য বলিয়া পরিগণিত। বৌদ্ধদের বোধিতরুর পূজা অতি পুরাতন। বোধগয়ায় অশোকের একাধিক বার তীর্থযাত্রাই ইহার প্রমাণ। বরহুতের ভাস্কর্য্যে ছয় জন বুদ্ধের ছয়টি বোধিবৃক্ষ দেখা যায়। বোধিবৃক্ষ-সমূহের জন্মস্থান গয়া, কারণ বৌদ্ধদের মতে ইহা বুদ্ধগণের জন্মভূমি ও পৃথিবীর কেন্দ্র। মহাবংশে কথিত আছে, মৌর্য্যযুগে অশোকের কন্যা সংমিত্রা বোধিতরুর দক্ষিণ শাখা সিংহলে লইয়া গিয়া মহামেঘবনারামে রোপণ করিয়াছিলেন। তাহারই বীজ নানা স্থানে অঙ্কুরিত হওয়ায় সিংহলের সর্ব্বত্র বোধি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

তারা-মূর্ত্তি

বোধগয়ার বোধিদ্রুম
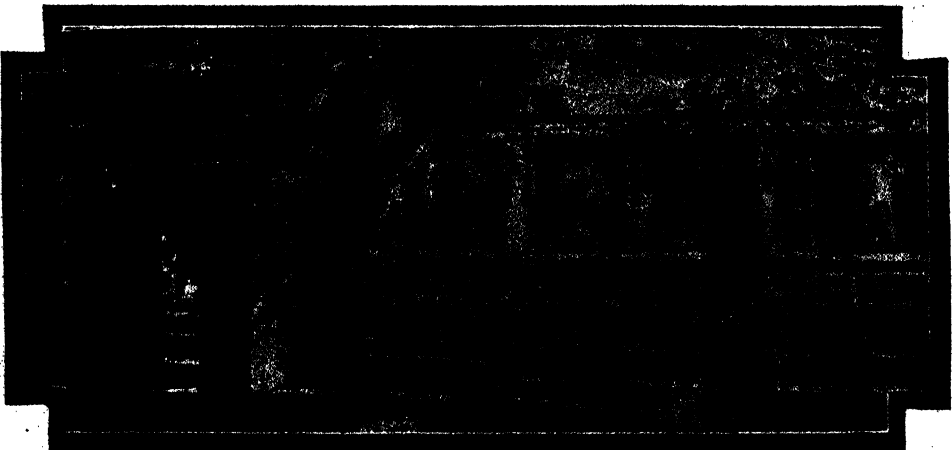
ধ্যানী বুদ্ধ
(ভূমিস্পর্শ মুদ্রা)

আগে বুদ্ধের প্রতিমা গড়িয়া তাঁহার পূজা করার প্রথা প্রচলিত ছিল না। এমন কি বরহুত ও সাঞ্চির ভাস্কর্য্যেও তাহার আভাস পাওয়া যায় না। শুধু কোন কোন স্থলে চিহ্ন, পদচিহ্ন ও চক্রের দ্বারা বুদ্ধ-রূপের সূচনা হইত।

বরহুতের একস্থানে দেখা যায়, মহারাজ অজাতশত্রু বুদ্ধের পদচিহ্নের সম্মুখে নতজানু হইয়া আছেন। অতএব আরও নানা কারণে ইহা প্রমাণিত হয় যে, বুদ্ধপ্রতিমূর্ত্তি-নির্ম্মাণ অশোকের পরবর্ত্তী যুগেই হইয়াছিল। প্রতিমা-পূজার আরম্ভ সম্বন্ধে প্রবাদ-বাক্যের অভাব নাই। কিন্তু যাচাই করিয়া তাহাদের সত্যতা নিরূপণ করা সহজসাধ্য নয়। যদি মথুরার বুদ্ধ ও মহাবীরের মূর্ত্তি শিলালিপি অনুসারে শকাব্দের বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে প্রতিমাপূজার আরম্ভ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই বলিতে হইবে। যাহাই হউক না কেন, ঐতিহাসিকগণ ইহা স্বীকার করেন যে, খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে অথবা তাহার অনতি কাল পরেই বুদ্ধমূর্ত্তি-নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছিল।

পরিব্রাজক ফাহিয়াং সাঙ্কাশ্যে দশ হাত উচ্চতাবিশিষ্ট এক বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। তাহা হুয়েন্ সাংএরও দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি পেশোয়ারে কণিষ্কের স্তূপের অনতিদূরে ১৮ হাত উচ্চ মর্ম্মরগঠিত আর এক বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দে আপ্লুত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, তাহা রাত্রিতে স্থান ত্যাগ করিয়া স্তূপের চারিদিকে ভ্রমণ করিত। বেনারসের সারনাথেও ধর্ম্মচক্রদেশনা-রত বুদ্ধের এক পিত্তল-প্রতিমা বিরাজমান ছিল। পরিনির্ব্বাণ-শয্যায় শায়িত অবস্থায় নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তির একাধিকবার উল্লেখ আছে। বামিয়ানে সেই অবস্থার এক প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্ত্তি ছিল। তাহার দৈর্ঘ্য প্রায় এক হাজার ফুট। কুশীন-

জেতবনারাম বা অভয়গিরি স্তূপ
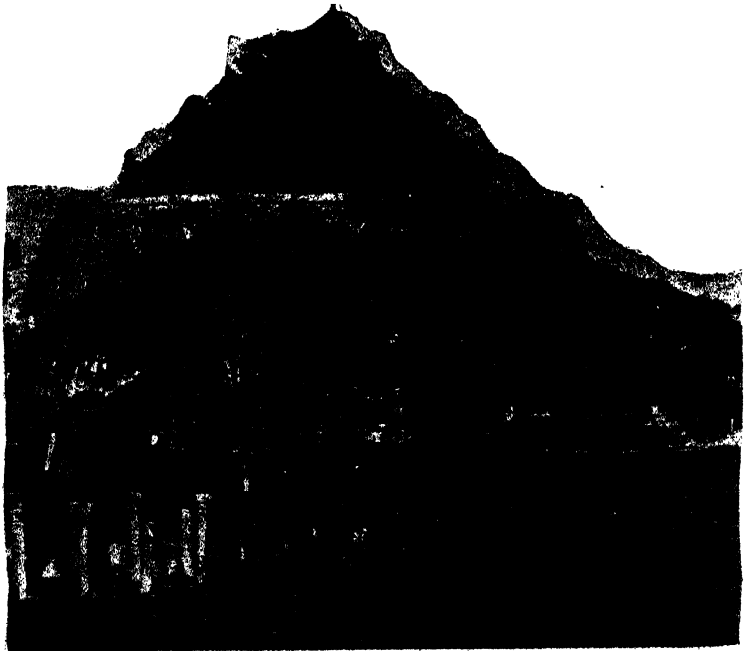
নগরের শালবন-মধ্যে এই অবস্থার আর একটি মূর্ত্তি হুয়েন সাং-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধগণের প্রতিমূর্ত্তিও নির্ম্মিত হইত। অনেক স্থলে গৌতম বুদ্ধ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছেন। অতীত বুদ্ধ অপেক্ষা ভবিষ্যৎ বুদ্ধ মৈত্রেয়ের পূজা সৎকার অনেক বেশী। তাঁহার এক সুবৃহৎ সুবর্ণ-বর্ণ-মূর্ত্তি উদ্যাননগরে বিরাজমান ছিল। ইহার উচ্চতা ৯০ হাত। প্রবাদ আছে, এই মূর্ত্তিগঠনের আগে শিল্পী এক অরহৎ শ্রমণের ঋদ্ধি-সাহায্যে স্বর্গে পৌঁছিয়া মৈত্রেয়ের দেহাবয়ব দেখিয়া আসিয়াছিলেন। এই প্রতিমার পূজার জন্য নানা দেশীয় রাজগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা চলিত।

উত্তর দেশীয় বৌদ্ধগণের বোধিসত্ত্ব, মঞ্জুশ্রী ও অবলোকিতেশ্বরের সম্মান মৈত্রেয়ের অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। ফা-হিয়াং-এর বিবরণে জানা যায়, তাঁহার ভারত-ভ্রমণের সময়ে মথুরায় প্রজ্ঞাপারমিতা, মঞ্জুশ্রী ও অবলোকিতেশ্বরের পূজা প্রচলিত ছিল। দুই শত বৎসর পরে অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তির সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এখন ও কপিশা, উদ্যান, কাশ্মীর, কনৌজ প্রভৃতি স্থানে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মঞ্জুশ্রীর আধুনিক মূর্ত্তি চারি হস্ত-বিশিষ্ট। তাঁহার আর একটি মূর্ত্তি যবদ্বীপে ১২৬৫ শকাব্দে আদিত্যবর্ম্মন্ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহা এখনও অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান। ধ্যানী বুদ্ধগণের দেবত্বারোপের পর হইতেই তাঁহাদের তারা ও পুত্রগণের মূর্ত্তিগঠন আরম্ভ হয়। ধ্যানী বুদ্ধগণের আকার প্রায় বুদ্ধের মত। তাঁহাদের পদ্মাসন নানা বাহনবিশিষ্ট। এই মূর্ত্তিসমূহ বহুল-ভাবে দাঁড়ান অবস্থায় নির্ম্মিত।

ধর্ম্মচেতিয়ের বিশেষ কোন বিবরণ নাই। শুধু মথুরায় কয়েকটি ধর্ম্মচেতিয় ছিল। বলা বাহুল্য, সেইগুলিতে ত্রিপিটক নিহিত ছিল।

পালি গ্রন্থে কেবল চারিটি পদ-চৈত্যের উল্লেখ আছে। সেইগুলি যথাক্রমে নর্ম্মদা-তীর, সত্যবদ্ধ পর্ব্বত, সুমন পর্ব্বত ও যবনপুরে প্রতিষ্ঠিত। পদচৈত্য-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যে প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

বুদ্ধের দন্ত-মন্দির
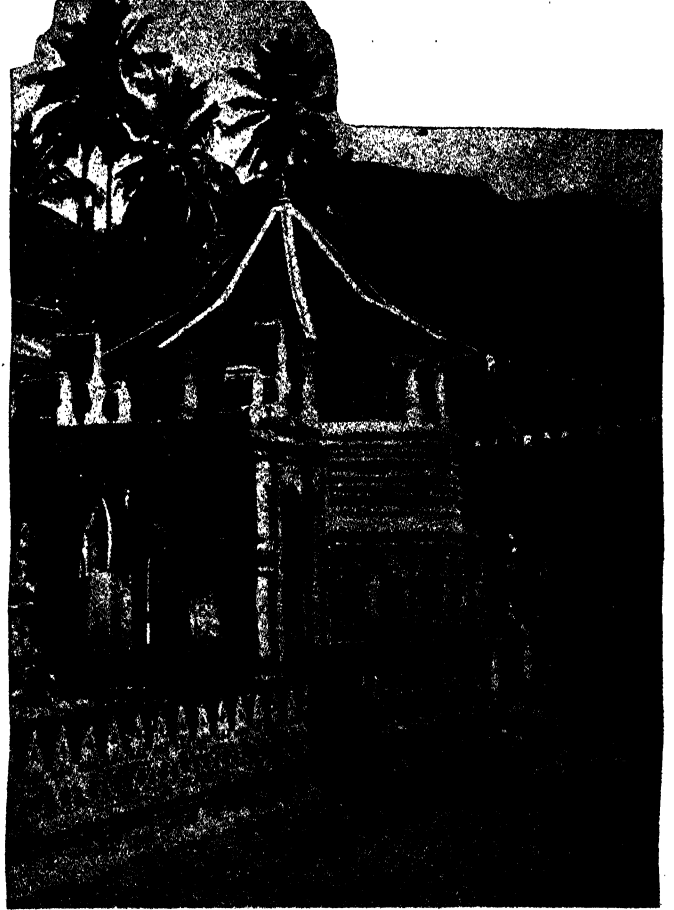
এক সময়ে সুপ্পারক পত্তনের বণিক্-সম্প্রদায় পদচেতিয় এক মনোরম চন্দন-বেদী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বুদ্ধ নিমন্ত্রিত হইয়া সেই বেদীগ্রহণের জন্য তথায় উপনীত হইলেন। তথা হইতে ফিরিবার সময়ে তিনি নর্ম্মদার তীরে স্নিগ্ধ তরুচ্ছায়ায় বিশ্রাম করিলেন। তখন নর্ম্মদা-বাসী নাগ নর্ম্মদার বিস্তীর্ণ বারিবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া জল-

কল্লোলে নদীসৈকত প্লাবিত করিয়া তথাগতের চরণে লুটাইয়া পড়িল। করুণাময় তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহারই অনুরোধে নর্ম্মদাতীরে আপনার পদাঙ্ক রাখিয়া গেলেন। সেই হইতেই তাহা নরনাগের পূজার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল।

সত্যবদ্ধ স্থবিরের অনুরোধেই সত্যবদ্ধ পর্ব্বতশিখরে বুদ্ধের পদচিহ্ন চিহ্নিত হইয়াছিল।

তথাগত সিংহলে নাগরাজ মণি অক্ষিকের বাসভবনে আপনার আহার গ্রহণ করিয়া তথাকার সুমণ-পর্ব্বতশৃঙ্গে (বর্ত্তমান এ্যাডম্‌স্ পিক্) পদচৈত্য চিত্রিত করিয়াছিলেন সুমণ পর্ব্বত এখন সাধারণের মহাপুণ্যতীর্থ। তীর্থযাত্রীগণের আনন্দধ্বনিতে তাহার দেহ নিরন্তর মুখরিত। এই পদচিহ্ন লইয়া এক বিষম সমস্যা দাঁড়াইয়াছে। ইহা শৈবদের শিব পদাঙ্ক, বৌদ্ধদের শ্রীপাদ ও মুসলমানগণের আদম্‌-পদচিত্র-রূপে নানা ধর্ম্মাবলম্বীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৫ ফুট ও প্রস্থ ২½ ফুট।

থুপারাম চৈত্য

আশ্চর্য্যের বিষয়, যবনপুরের পদচৈত্যের বিশেষ কোন কাল্পনিক কিংবা ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না। পালি গ্রন্থে উক্ত পদচৈত্য ছাড়াও অন্যান্য পদচৈত্যের বিবরণ দুর্ল্লভ নহে। ঋষিপত্তনে (সারনাথে) গৌতমের পূর্ব্ববর্ত্তী চারি জন বুদ্ধের পদচিহ্ন বিদ্যমান ছিল। হুয়েন সাং স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, সেই পদাঙ্কের দৈর্ঘ্য ৫০০ ফুট ও গভীরতা ৭ ফুট। ইহার তুলনায় যাহা তিনি পাটলিপুত্রের সমীপবর্ত্তী স্থানে দেখিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। উদ্যান প্রভৃতি স্থানেও অনেক পদচৈত্য তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। নেপালীদের মঞ্জুশ্রী পাদুকা ও পদচৈত্য অভিন্ন।

বাস্তবিক পদচৈত্যের উৎপত্তির ইতিহাস জানিবার কোন উপায় নাই। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন, বৌদ্ধদের পদচৈত্য-পূজা বিষ্ণুপাদের পূজার সহিত সংশ্লিষ্ট।

চৈনিক পরিব্রাজকগণের তীর্থ-পর্য্যটনের সময়ে সমগ্র দেশ চৈত্যময় ছিল। এখনও তাহাদের ধ্বংসাবশেষ আংশিকভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। হুয়েন সাং একাধিক বার ভারতের চৈত্য ও বিহার-সমূহের ধ্বংসলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। পেশোয়ারের স্তূপ তাঁহার ভারতভ্রমণের পূর্ব্বে তিন বার দগ্ধ হইয়াছিল। ইহার উচ্চতা ৪০০ হাতেরও অধিক। কণিষ্কের রাজত্ব-কালে এই স্তূপের ভিত্তিস্থাপন হয়। মানিকিয়ালার স্তূপও প্রায় ইহার সমসাময়িক। জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া ইহাও বলা আবশ্যক, পুষ্কলাবতীর সন্নিহিত স্তূপদ্বয় অশোক নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তথায় আরও দুইটি স্তূপ ছিল। তাহাদের ধ্বংসাবশেষ হুয়েন সাং-এর দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের উভয় শাখায় প্রবাদ আছে যে, ভারতে অশোকের ব্যয়ে নির্ম্মিত ৮৪০০০ স্তূপ ছিল। পরিব্রাজকগণ আরও বলেন, তথাগতের পরিনির্ব্বাণের অব্যবহিত পরে নির্ম্মিত ধাতুস্তূপগুলি খুলিয়া ধাতুসমূহ অশোক উক্ত ৮৪০০০ স্তূপে নিধান করিয়াছিলেন। কেবল রামগ্রামের স্তূপই অনুন্মুক্ত ছিল।

বেনারসের সমীপবর্ত্তী সারনাথে কতকগুলি স্তূপ ও বিহার ছিল। সেইগুলি সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। এখনও তাহাদের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কপিলবস্তুতেও কয়েকটি স্তূপ ছিল। মধ্য যুগে মগধ স্তূপময় ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

সিংহলের স্তূপসমূহের মধ্যে মহাস্তূপই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম। লঙ্কেশ্বর দুষ্টগামনীর রাজত্বকালে অনুরাধাপুরে এই স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ফা-হিয়াং-এর উক্তিমতে ইহার উচ্চতা ৩০০ হাত। তাহারই পার্শ্বে সিংহলের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অভয়গিরি বিহার বিরাজমান ছিল। তথায় যূপরাম, জেতবনারাম প্রভৃতি আরও অনেক চৈত্য এখনও তাহাদের পুরাতন সৌন্দর্য্যের চিহ্ন লইয়া দর্শককে বিস্ময়বিমুগ্ধ করিতেছে।

চৈত্যপূজার প্রাচুর্য্যে ভারতীয় ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের কতই যে উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। চৈত্যপূজা ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু চৈত্যপূজার ভিতর দিয়া ভারতের যে শিল্প-গৌরব অর্জ্জিত হইয়াছিল তাহা চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

মানুষ ও দেবতা

শ্রীদেবেন্দ্রমোহন কর

মানুষেরে হীন করি দেবতার পূজার আসন
প্রতিষ্ঠিত ঘরে ঘরে। ঘৃণাভরে ফিরায় আনন
মানুষ স্বজন হেরি। তুচ্ছ জ্ঞানে করে অনাদর
ঘৃণা অসম্মান; স্বজাতির প্রতি নাহি সমাদর।
দেবতা লভিছে পূজা প্রেমপূত শ্রদ্ধার অঞ্জলি—
মানুষ লভিছে ক্ষতি, বঞ্চনার অনাদৃত ডালি।
দেবতার তরে পূজা, উপচার, ব্রত, অনুষ্ঠান
দেবতা গড়িল যারা তাহাদের হ'ল অপমান।

যোগী ধ্যান-নিমগন অরূপের অব্যক্তের ধ্যানে
ত্যজি' লোকালয় লভিল আশ্রয় নিবিড় গহনে।
শুধু লভিল বঞ্চনা; তপোলব্ধ দুর্জ্ঞেয় প্রজ্ঞান—
অজানা হ'ল না জানা, দেবতার হ'ল না সন্ধান।
মনগড়া দেবতার অরূপের গড়ি প্রতিরূপ
প্রচ্ছন্ন অজ্ঞান-মোহে দেবতার পূজে অপরূপ।
কঠিন নিগড়ে বন্দী মন্দিরে দেবতা বিশ্বনাথ—
দেবতা মানুষে হ'ল না মিলন, হ'ল না তো সাক্ষাৎ।

কোথায় দেবতা নরনারায়ণ ভাগ্যনিয়ামক—
মানুষে মানুষে মিলাও প্রথমে ওগো প্রবর্ত্তক।

নবনূর

(উপন্যাস)

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আজ দুদিন হল রণজিৎ বন্ধুর সঙ্গে বোম্বাই এসেছে। আন্ধেরীতে সমুদ্রতীরে তৈয়ব আলি শেঠের বাড়ীতে রয়েছে। শেঠজী কাজে বেরিয়ে গেছেন। দুই বন্ধু পশ্চিমের বারান্দায় সমুদ্রের দিকে মুখ ক'রে লম্বা আরাম কেদারায় শুয়ে গল্প করছে। আহমদ জিজ্ঞাসা করলে "রণজিৎ, আজ এ দেশের অনেকের সঙ্গে আলাপ হল ত! কি রকম বুঝছ?"

রণজিৎ হতাশভাবে উত্তর দিলে, "না ভাই, ভাল কিছুই বুঝছি না। তোমার পুণার মারাঠা বন্ধু দুজন মুখে খুব 'ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান' করলেন। কিন্তু তাঁদের যথার্থ মনের কথা বুঝতে কিছুই কষ্ট হল না। তাঁদের লক্ষ্য ভারতে হিন্দু-প্রাধান্য, শুধু হিন্দু-প্রাধান্য নয়, মরাঠা-প্রাধান্য, শুধু মরাঠা-প্রাধান্য নয়, সম্ভব হয় ত ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য। বাঙ্গলা দেশে বরং একটু রক্ষা আছে। ভবেশের ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ বুলি লোকে হেসে উড়িয়ে দেয়। বাকী বাঙ্গালী, হিন্দুই বল, মুসলমানই বল, মেরুদণ্ডহীন, নড়বড় করছে। তাঁদের লড়াই শুধু চাকরীর জন্য। একটু চাপ পড়লেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তোমার মরাঠাদের কিন্তু তা মনে হল না।"

"আচ্ছা, ওরা না হয় মরাঠা-সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখছে। যেমন মুসলমান আলমগীরের স্বপ্নে মশগুল, শিখ খালসার ধ্যানে পাগল। কিন্তু আমাদের গুজরাতীদের কেমন দেখলে?"

"খুব পাকা লোক মনে হল। আমাদের কলকাতার মারবাড়ীদের মত কেবল পয়সার খেয়ালে মত্ত নয়। সারা দেশটার ভবিষ্যতের উপর শ্যেনদৃষ্টি আছে।"

"সেটা হয় ত গান্ধীজির আবির্ভাবের পর এসেছে। কিন্তু একটা জিনিষ বেশ করে বুঝে রেখো, রণজিৎ। যথার্থ রাইয়ৎ-শাহী এদেশে আসতে দেবে না এরা। এই গুজরাতের শেঠ আর বাঙ্গলার জমীদার এরাই রাইয়তের হকের প্রধান দুশমন। অবশ্য গুজরাতের শেঠ বলতে পার্শী, খোজা, বোহরা, হিন্দু, সব রকম বেণেকেই বোঝায়।"

"আচ্ছা, এই নানা জাতের বেণেদের মধ্যে ভাব কি রকম?"

"বেশ সদ্ভাব আছে। সেইজন্যেই ত কাউন্সিলে পার্সীরা নিজেদের আলাদা প্রতিনিধি চায় না। যদি অন্য এলাকার মুসলমানেরা এত লম্ফ-ঝম্প না করত তাহলে আমাদের মুসলমানেরাও এ বিষয়ে পরোয়া করত না। একটা মজার কথা জান ত? গুজরাতে অনেক মুসলমান সম্প্রদায় আছে, যারা আজও হিন্দুর প্রাচীন মিতাক্ষরা আইন মেনে চলে।"

এই রকম কথাবার্ত্তা হচ্ছে, এমন সময়ে তৈয়ব আলি শেঠ এলেন। দুই বন্ধু দাঁড়িয়ে উঠে সেলাম করলে। শেঠ বললেন, "সেলাম আলেকুম, বস দুজনে, একটু আলাপ করা যাক্। রণজিৎ ভাই, কি গল্প হচ্ছিল তোমাদের?"

"শেঠজী, আমার মাথার ভেতর ঐ একই কথা ঘুরছে দিবারাত্র। হিন্দু মুসলমানের পরস্পর রেষারেষি যে রকম দিন দিন বেড়ে চলেছে, আর কি দেশের উন্নতির কোনও আশা আছে!"

তৈয়ব আলি হেসে বললেন, "একটা পাগলামী দুই সম্প্রদায়ের মাথাতেই ঢুকেছে বটে। কিন্তু এর জন্য বিচলিত হওয়ার কোন কারণ নাই। মুসলমানেরা বহুদিন এই হিন্দে বাদশাহী করেছে, সে কথা তারা সহজে ভুলতে পারে না। আর হিন্দুরা ইংরেজের আমলে

নিজেদের যতটা সুবিধা করে নিয়েছে তাও তারা ছাড়তে পারে না। দু'জনেই মানুষ ত! মানুষের কাছে আর কতটা উদারতা স্বার্থত্যাগের আশা করা যেতে পারে? তবে, এ অবস্থা বেশী দিন থাকতে পারে না। কাঁধের উপর রাজ্য-চালনার জোয়াল চাপলে ঠাণ্ডা হতেই হবে। শয়তান কুঁড়ে লোকের মাথাতেই ভর করে।"

"আমি একটা বিষয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, আপনি নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করবেন। আহমদ আমার নিতান্ত আপনার লোক, অন্তরঙ্গ বন্ধু, তার আর আমার মাঝে হিন্দু-মুসলমানের ভেদজ্ঞান আসতে পারে না। কিন্তু আমি গোঁড়া হিন্দু নই, আর আহমদও গোঁড়া মুসলমান নয়। ভবিষ্যৎ-যুগের হিন্দু মুসলমান কি আমাদের মতন luke-warm, আগ্রহহীন, হয়ে যাবে? নইলে কি সদ্ভাবের আশা নেই!"

"আহমদের ধর্ম্মবিশ্বাসের কথা আমি কোন দিন জিজ্ঞাসা করি নাই! কিন্তু আমি জানি যে, আমি একজন যথার্থ সুন্নী মুসলমান। অথচ আমি আজ চল্লিশ বছর কংগ্রেস-পন্থী। এই চল্লিশ বছরে আমার রাষ্ট্রীয় আদর্শ একটুও খর্ব্ব হয় নেই। আমার আজকের রাষ্ট্রীয় নেতা একজন হিন্দু, কিন্তু তবুও তিনি আমার চোখে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ।"

"তাহলে আপনার মতে সারা ভারতের ধর্ম্ম এক হওয়ার দরকার নেই?"

"রণজিৎ, আমি মুসলমান। সবাই মুসলমান হলে আমি সুখী হব বই কি, ধর্ম্মের দিক্ থেকে। কিন্তু আমি কংগ্রেস-পন্থী, রাষ্ট্রগঠনের জন্য হিন্দে এক ধর্ম্ম হওয়ার কিছুমাত্র দরকার নেই, এ আমার স্থির বিশ্বাস। আমার স্বধর্ম্মী কেউ কেউ আমাকে সর্ব্বদা বলেন যে, হিন্দু কোন দিন অহিন্দুকে নেতা বলে মানবে না। আমি একথা মানি না। হিন্দু স্বর্গীয় দাদাভাইকে যে সম্মান, যে পূজা, দিয়েছিল, তা আমি ভুলতে পারি না। তারপর, একবার বোম্বাই এলাকার আমরা সবাই মিলে জিনা সাহেবকে কলকাতায় আমাদের প্রতিনিধি করে কলকাতার বড় কাউন্সিলে পাঠিয়েছিলাম। আজ হয়ত এতটা সম্ভব নয়। কেননা একটা দূষিত হাওয়া বাইরে থেকে এসে আমাদের মধ্যেও ঢুকছে। তবু একটা কথা বলি রণজিৎ, ব্যবসা-বাণিজ্যে আজও আমরা ধর্ম্মভেদকে মোটে আমল দিই না। দিলে দোকান-পাট সব তুলে দিতে হত। ধর, তোমার বাঙ্গলা দেশের কোন বাক্যবাগীশ মুসলমান নেতা এসে আমার সঙ্গে ধারে একটা বড় সওদা করতে চাইলেন। আর আমার চেনা কোন আহমদাবাদের বেণেও সেই সওদা করতে প্রস্তুত। কার সঙ্গে আমি সওদা করব, স্বধর্ম্মীর সঙ্গে?"

আহমদ বললে, "বাবা, এ সব বুঝতে ত আমাদের কোন কষ্ট হবে না। বরং গোঁড়া লোকেরাই বুঝতে পারবে না। কিন্তু আর একটা কথা বার বার আমার মনে হয় এই যে, এত শতাব্দী ধ'রে পীর ও ভক্তেরা হিন্দু মুসলমান ধর্ম্মের সমন্বয় করতে চেষ্টা করে এসেছেন, তার কি কোন মূল্য নেই? এখন সে চেষ্টা করলে কি সফল হবে না, তাতে কি দেশের মঙ্গল হবে না!"

"সে বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ আছে, আহমদ ভাই। এই দেখ না, একেশ্বর-বাদী শিখ ও আর্য্য-সমাজ সম্প্রদায়, (বাঙ্গলার ব্রাহ্মদের কথা ধরি না, কারণ তাঁরা মুষ্টিমেয় আর সবাই এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর,) যাঁদের সব চেয়ে উদার হওয়ার কথা, তাঁদের সঙ্গেই মুসলমানদের বেশী রেষারেষি। তাঁদের জাত নেই, তাঁরা মূর্ত্তিপূজা করেন না, অথচ তাঁদের সঙ্গে মুসলমানদের বনে কি? আমি কারও দোষ গুণের বিচার করছি না। ক'রে কোন ফলও নেই। কিন্তু আমার মনে হয় না আহমদ, যে আধুনিক রাষ্ট্রস্থাপনের জন্য সব জাত ধর্ম্মের ভেদ উড়িয়ে দেওয়া দরকার। বরং সেই ভেদের মধ্যে যে অভেদ আছে সেইটে ধরতে পারাই যথার্থ বড় জিনিস।"

রণজিৎ বললে, "শেঠজী, আমি নিজে কতকগুলো বিষয়ে মনে বড় দাগা পেয়েছি। তাই আহমদ আমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। আপনার মতন জ্ঞানী লোকের কাছে সে কথাগুলো বলতে পারলে আমার কষ্ট অনেকটা কম হবে।"

তৈয়ব আলি রণজিতের পিঠে হাত রেখে স্নেহের সুরে বললেন, "তা বল বাবা। আমি যথাসাধ্য তোমাকে উপদেশ দেব।"

রণজিৎ বললে, "আমার দাদা একজন বড় জমীদার। আগে আমরা রাজাই ছিলাম। আমাদের অনেক মুসলমান প্রজা। রাজ্যের একটা সাবেক নিয়ম যে, নূতন রাজাকে অভিষেকের পর পীরের দরগায় গিয়ে সেলাম করে আসতে হয়। আর একটা পুরাণো প্রথা যে, মহরমের সময়ে রাজা নিজে তাজিয়া বের করে মিছিলের আগে আগে ঘুরে আসেন। আমার দাদা দুটো প্রথাই ত্যাগ করেছেন। তিনি বলেন যে, মুসলমানেরাও আর আমাদের দুর্গা পূজায় আসে না, আমরাই বা কেন তাদের উৎসবে যোগ দেব? আমি রাজ্যের কোন খবরই রাখতাম না। কলকাতায় বাস করেছিলাম, নিজের পড়াশুনো নিয়ে থাকতাম। কিন্তু চারিদিকের আবহাওয়া দেখে আর স্থির থাকতে পারছি না। আমার তালুক মুলুক দাদাকে বেচে দিয়ে এসেছি। কিন্তু তবুও শান্তি পাচ্ছি না। কোন কাজে লেগে যেতে চাই। জাতে জাতে যে এই বিদ্বেষ, এ খতম করে দিতে চাই।"

"রণজিৎ, সব কথাটা ভাল করে ভেবে দেখ। ভেদ আর বিদ্বেষ দুটো আলাদা জিনিস। মুসলমান যতদিন মুসলমান থাকবে, তার দুর্গা পূজা দেখতে যাওয়াও পাপ। হিন্দুরও মহরমে তাজিয়া বের করা অর্থহীন। এগুলো গেছে বলে আক্ষেপের কোন কারণ নেই। কিন্তু তুমি যদি কাজ করতে চাও, ত কোমর বেঁধে কংগ্রেসে নেমে পড়। সমগ্র দেশের সেবাতে লেগে যাও। হিন্দু হিন্দু-সভা করুক, মুসলমান মুসলীম লীগ করুক, তুমি অখণ্ড হিন্দু রাষ্ট্রের প্রজা। তোমার ত্রিবর্ণ ঝাণ্ডা তুমি খুব উঁচু করে তুলে ধরে থাক, একদিন সবাই সেই ঝাণ্ডার তলায় এসে দাঁড়াবে।"

দু' ফোঁটা চোখের জল বৃদ্ধের গাল বেয়ে পড়ল। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাত আহমদ ও রণজিতের মাথায় রেখে আস্তে আস্তে বললেন, "আল্লা হো আকবর, হিন্দুস্তান!"

দু'দিন বাদে দুই বন্ধু তীর্থ-ভ্রমণে বের হল। আহমদ রণজিৎকে প্রথমে নিয়ে গেল সিন্ধে। এই ক্ষুদ্র প্রদেশটার চিরদিনই একটা বিশেষত্ব আছে। মুসলমানেরা সংখ্যায় খুব বেশী, কিন্তু তারা গোঁড়া ইসলামপন্থী নয়। সবাই পীরপরস্ত বা পীর-পূজক। কত বড় বড় পীরই যে হয়ে গেছেন এই সিন্ধে! তাঁদের শিক্ষায় আজ সামান্য চাষী পর্য্যন্ত একটা আশ্চর্য্য অন্তর্দৃষ্টি পেয়েছে। এই নিরক্ষর কৃষাণদের বাঁধা কাফী গানগুলি যখন কেউ একত্র করে ছাপাবেন, তখন জগৎ বুঝবে যে অদ্বৈতজ্ঞান শুধু উচ্চবর্ণের একচেটে নয়।

এখানকার হিন্দুরাও মামূলী ধরণের মূর্ত্তিপূজক নয়। দেবমন্দির সিন্ধে নেই বললেই হয়। অধিকাংশই নানক-পন্থী। অল্পসংখ্যক বৈষ্ণব আছেন, তাঁরা সম্ভবতঃ কচ্ছ থেকে এসেছেন। ছোট বড় অনেক হিন্দুই পীরভক্ত, পীরের মন্ত্র-শিষ্য।

দুজনে প্রথমে গেল রোহরী শহরে। সেখানে আলি আকবর শাহ বলে এক সাধুপুরুষ থাকেন। তিনি যে শুধু ধার্ম্মিক লোক তা নয়, মস্ত বড় যোগী সাধক। এরা যখন তাঁর কাছে গেল, তখন কত বড় বড় বিদ্বান্ লোক তাঁকে ঘিরে বসে আছে, তাঁর মুখের অমৃতময় কথা শুনছে। ইনি সুফী পন্থায় যোগ-সাধনা করেন, কিন্তু বেদান্তেও ভার জ্ঞান। ভগবদ্গীতার ফারসী তরজমা করেছেন। দুই বন্ধু সেলাম করে বসলে পর পীর সাহেব তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন এসেছ?"

তারা উত্তর দিলে, "আমরা দুই বন্ধু— হিন্দু-মুসলমানের ভেদ দেখে বড় ব্যথা পেয়েছি। এই ভেদ কি করলে চলে যায়, আপনার কাছে সেই বিষয়ে উপদেশ প্রার্থনা করতে এসেছি।"

পীর সাহেব কথা কাণেই তুললেন না। অন্য শিষ্যদের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, "ভেদের কথা বলতে এসেছে এই ছোকরারা! ভেদ কোথায়? তোরাও ত হিন্দু মুসলমান, তোদের মধ্যে কি কোন ভেদ আছে? সবাই আমার মুরীদ (শিষ্য)। মুরীদ সব ভাই ভাই। ভেদ আসলে নেই। ভেদ শুধু পাপিষ্ঠদের মনে আছে।"

মুরশিদ (গুরু) আর কিছু বললেন না। ঘণ্টাখানেক বাদে রণজিৎ একটু হতাশ হয়ে উঠে পড়ল। পথে যেতে যেতে বন্ধুকে বললে, "ভাই, উনি ত কিছু বললেন না!"

আহমদ উত্তর দিলে, "বললেন না কি, রণজিৎ? সবই ত বললেন। ভেদ আছে শুধু পাপিষ্ঠদের মনে।"

"সে ত বুঝ্‌লাম, বন্ধু। কিন্তু কি করে সে ভেদ উড়িয়ে দিতে পারি, তাই আমি জানতে চাই। আমাদিকে ত পীর পাপিষ্ঠ বললেন, কিন্তু তোমার আমার মনেও কি ঐ ভেদজ্ঞান আছে?"

"হ্যাঁ, আমি বুঝেছি। তোমার আমার আলি আকবর শাহের মন্ত্র নিয়ে ব'সে থেকে কোন ফল নেই। তুমি চাও সারা দেশে মৈত্রী মন্ত্র প্রচার করতে! আচ্ছা, চল দোস্ত, আর এক জায়গায় তোমাকে নিয়ে যাই। সেখানে কেউ জীয়ন্ত পীর নেই, বটে। কিন্তু এক মহাপুরুষের আত্মা আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। দেখি, সেখানে কি প্রেরণা পাওয়া যায়।"

পরদিন দুজনে গেল সিন্ধুতীরে প্রাচীন শিবস্থান নগরে। এখনকার নাম সেঃওয়ান। এখানে পুরানো এক কেল্লা আছে, যাতে এক কালে ভুবনবিজয়ী সেকন্দর বাস করেছিলেন। সে সব কথা লোকে ভুলে গেছে। কিন্তু দুর্গ হতে অদূরে যে মন্দির আছে তার থেকেই সেঃওয়ানের বর্ত্তমান খ্যাতি। এই মন্দির খোরাসানী সাধক লাল শাহবাজের সমাধি স্থান। প্রতি বছর নানা জাতের হাজার হাজার যাত্রী আসে কত দূর দেশ থেকে এই পুণ্যক্ষেত্রে। আহমদ আগে কখনও আসে নাই, কিন্তু বাপের কাছে এই তীর্থস্থানের মাহাত্ম্যের কথা অনেক শুনেছিল। তাই সে রণজিৎকে এখানে এনেছে। দুই বন্ধু যখন সেই বিশাল সমাধিমন্দিরের সামনে পৌঁছল, তাদের মাথা আপনা হতেই শ্রদ্ধায় নত হয়ে গেল। চারিদিকে কেমন একটা শান্ত, গম্ভীর ভাব! সদর দরজার কাছেই বাঁধা এক প্রকাণ্ড কাফ্রী দেশের সিংহ। সে তার কেশর নেড়ে, গর্জ্জন করে প্রত্যেক যাত্রীদলকে স্বাগত করছে। মন্দিরে ঢোকবার পথে একজন ফকীর যাত্রীদের গলায় কালো রেশমের মঙ্গলসূত্র পরিয়ে দিচ্ছেন। ভেতরে ঠিক মাঝখানে গম্বুজের নীচে পীর সাহেবের সমাধি। রণজিৎ ও আহমদ প্রায় পঁচিশজন হিন্দু মুসলমান যাত্রীর সঙ্গে নিঃশব্দে তিনবার সমাধি প্রদক্ষিণ করে বেরিয়ে এল। বুদ্ধিসর্ব্বস্ব, কূট-তার্কিক, অতি-আধুনিক এই দুই বন্ধু। কিন্তু দুজনারই বুকের ভেতরটা কি রকম আশ্চর্য্য হাল্‌কা বোধ হতে লাগল! মোহমুগ্ধের মত, চুপ করে দুজনে পাশাপাশি উঠানে বসে পড়ল, মুখে কথা সরল না। অনেকক্ষণ পরে তাদের সাড় ফিরে এল। উঠে আস্তে আস্তে সিংহদরজা দিয়ে বের হয়ে ডেরার দিকে রওয়ানা হল। তখন সূর্য্য ডুবেছে। আধ-আলো, আধ-অন্ধকার। চারিদিক্ নিস্তব্ধ। কেবল মাঝে মাঝে দূর হতে দরগার ফকীরদের গুরুগম্ভীর ডাক কানে আসছে, "হো মস্ত কলন্দর!"

আহমদ বললে, "কি আশ্চর্য্য হাওয়া, রণজিৎ! কোথায় গেল সব ভাবনা চিন্তা! কোথায় গেল মনের কালিমা!"

রণজিৎ বিষণ্ণ স্বরে জবাব দিলে, "হ্যাঁ বন্ধু। মনের গভীরতম কন্দর পর্য্যন্ত যেন আলোয় ভরে গেছে। কিন্তু ভাই, কতক্ষণের জন্য! অনাদিকাল হতে যুগে যুগে ত এই সব মহাপুরুষেরা আসছেন, কিন্তু স্থায়ী কিছু করতে পেরেছেন কি এঁরা? এঁদের উপদেশ, এঁদের প্রভাব বালু-চরের উপর পদচিহ্নের মতন। এক এক দমকা হাওয়াতে মুছে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। নইলে কবীর, নানক, চৈতন্য, মীরাবাঈয়ের দেশের এ দুর্দ্দশা আজ কেন?"

"মুছে গেছে কি, রণজিৎ? তা'হলে আমরা দুজনে কি খুঁজতে বেরিয়েছি আজ? না বন্ধু, এঁদের পায়ের দাগ মুছে নষ্ট হওয়ার জিনিস নয়।"

"মুছে না গেলেও আমরা ত দেখতে পাই না! যারা পথের ধূলির মাঝে এঁদের পদরজঃ খুঁজে পায়, তারা সুখী। আমাদের সে দৃষ্টি নেই। সত্যি বলব, আহমদ? আমাদের ব্যাধি দুরারোগ্য। আর সে ব্যাধি কি তা জান, বন্ধু? অভিমান, বুদ্ধির অভিমান, শিক্ষার অভিমান! আমরা যে বিংশ শতকের intiliegentsia, বিশ্বামিত্রের অবতার, নূতন জগৎ সৃষ্টি করতে চাই নিজের বলে। আমাদের কি কোনও গতি আছে?"

"সাবাস রণজিৎ! কেবল ভাবি, এই কি আমার সেই প্রশান্ত সদানন্দ বন্ধু!"

"তোমার সে বন্ধু মরেছে, ভাই। তার দেহটাকে ভর করেছে এক কর্ম্ম-পাগল দানব।"

"আচ্ছা বন্ধু, কর্ম্ম তুমি কোরো। তার আগে আর একটা জায়গায় তোমাকে প্রেমের মাহাত্ম্য দেখিয়ে নিয়ে যাব।"

তিন দিন পরে দুই বন্ধু পৌছল আহমদাবাদে। রণজিতের বড় ইচ্ছা হচ্ছিল, একবার নিবেদিতা ও তার গুরুদেবকে দেখে আসে। আহমদকে বললে সে কথা, কিন্তু সে রাজী হল না, "ভাই এ যাত্রা আমি তোমার পাণ্ডা। আমি তোমাকে আমার মনোমত তীর্থস্থানে নিয়ে বেড়াব। আজ তোমার দরকার Sedative, stimulant নয়। তোমার মনে শান্তি আনতে হবে, উত্তেজনা নয়।"

"কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে?"

আহমদ বললে, "এখান থেকে কিছু দূরে পীরানা নামে এক গ্রাম আছে। সেখানে এক সেকেলে পীরের সমাধি আছে। এই মহাপুরুষ নিজের বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেন হজ্বে যাওয়ার জন্য। মাঝ-পথে ব্যারাম হয়ে পড়লেন। যে গ্রামে আশ্রয় নিলেন, সেখানকার লোক তাঁর অনেক সেবা করলে, কিন্তু কোন ফল হল না। যখন শেষ দিন এল, তিনি অনেক কষ্টে উঠে বসে হাত জোড় করে বললেন, 'রসুল, তোমার গুলামের মনের সাধ পুরালে না? কাবা শরীফ চোখে দেখে যেতে পেলাম না?' বলে কাঁদতে কাঁদতে চোখ বুজে আবার শুয়ে পড়লেন।

একটু পরেই স্বপনে তাঁকে এক ফেরেস্তা দেখা দিয়ে বললে, 'হজরৎ, তুমি ধন্য। খোদাতালার হুকুম, যে আজ থেকে এই পীরানা গ্রাম হজ বলে গণ্য হবে। দেশ-বিদেশ থেকে সকল ধর্ম্মের লোক হাজারে হাজারে পুণ্য সঞ্চয় করবার অভিপ্রায়ে এখানে আসবে।'

পীর শশব্যস্ত হয়ে চোখ খুললেন, কিন্তু ফেরেস্তাকে দেখতে পেলেন না। গ্রামের লোক যারা উপস্থিত ছিল তাদিকে স্বপনের কথা বললেন। তারা শুনে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। অল্পক্ষণ পরে পীর সাহেবের অমর আত্মা বেহেস্তে চলে গেল। হিন্দু মুসলমান সকলে মিলে দেহের সৎকার করলে।"

রণজিৎ জিজ্ঞাসা করলে, "সে পীরস্থানকে কি তোমরা হজ্বের মত মান?"

"চল না, নিজের চোখেই দেখবে?"

গেল তার পর দিন দুজনে পীরানাতে। দরগার বাইরে দেখলে লোকজন, ঘোড়া, গাড়ী, ভীড় করে রয়েছে। জিজ্ঞাসা করে জানলে সেদিন শাহ সাহেবের উরুস্। দুজনে ভেতরে ঢুকল। সমাধির কাছ বরাবর গিয়ে দেখলে যাত্রীতে দরগা ভরে গেছে, ধনী নির্ধন, বুড়ো ছেলে, মুসলমান হিন্দু। সমাধির কাছে দাঁড়িয়ে একজন সৈয়দ আর একজন ব্রাহ্মণ সমস্বরে ভক্তিভরে কল্‌মা পাঠ করছে। রণজিৎ আনন্দে মশগুল হয়ে গেল। আহমদকে বুকে চেপে ধরে বললে, "ভাই, এমন জায়গা আজও হিন্দুস্থানে আছে? এ যে স্বর্গের তুল্য স্থান!"

আহমদ ভারী গলায় উত্তর দিলে, "হ্যাঁ রণজিৎ, এই বেহেস্ত। আর বেহেস্ত কোথায়?"

রণজিৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বুক ফুলিয়ে বললে, "চল দোস্ত, সারা হিন্দুস্থানকে এই রকম বেহেস্ত করে তুলব। তুমি ঠিক বলেছিলে। মুছে যায় নেই, সাত্ত্বিক ভকতের পায়ের দাগ আজও মুছে যায় নেই!"

দুজনে ব্রাহ্মণ পূজারীকে জিজ্ঞাসা করলে, "মহারাজ! তুমি কলমা পড়লে যে! তোমার জাত যাবে না?"

ব্রাহ্মণ হাসিমুখে উত্তর দিলেন, "রোজই ত পড়ি। জাত যাবে কেন? যেদিন হজরৎ স্বর্গবাসী হলেন, সেই দিন থেকেই এই নিয়ম চলে আসছে। গ্রামের লোকে নিজেরাই এই নিয়ম বেঁধে দিয়েছে।"

সৈয়দ বললেন, "জনাব, এ পীরানায় কারও জাত যায় না। হিন্দু যাত্রী এখানে বহুত আসে ফুল চড়াতে। তারা পূজারী মহারাজকে দেখে বড় খুশী হয়।"

দুই বন্ধু ভক্তিভরে সেলাম করে বেরিয়ে এল। রণজিৎ আহমদের হাত ধরে বললে, "চল দোস্ত, ফিরে যাই। আর সময় নষ্ট করব না। কাজ খুঁজে পেয়েছি। চল, পীরানার এই উজ্জ্বল আলো সারা দেশময় জ্বালি গিয়ে।"

আহমদ উৎসাহে সাড়া দিলে, "চল ভাই, আমি তৈয়ার। আর তোমাকে টেনে রাখবার সাধ্য আমার নেই, ইচ্ছাও নেই। বাবার ভাষায় একবার বলি—আল্লা হো আকবার, হিন্দুস্থান!"

আহমদাবাদ ষ্টেশনে দুজনে ডাকগাড়ীর জন্য অপেক্ষা করছে, এমন সময়ে একটী মেয়ে এসে রণজিতের পায়ের ধূলো নিলে। মেয়েটীর পরনে মোটা সাদা খদ্দরের সাড়ী। সে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "দাদা, আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি নিবেদিতা।"

রণজিতের বড় লজ্জা হল। তাড়াতাড়ি ঠাকুরদার মতন মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে বললে, "বেঁচে থাক। কিছু মনে কোরো না, বোন। আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম।"

"না, এতে মনে করবার কি আছে, দাদা? আমাকে আপনি একবার দেখেছেন বই ত নয়।"

"নিবেদিতা, তুমি কি জানতে, যে আজ আমরা এই সময়ে ষ্টেশনে আসব?"

"আজ্ঞে না, আমি আমাদের আশ্রমের একটী মেয়েকে গাড়ীতে তুলে দিতে এসেছি। হঠাৎ দেখলাম, আপনারা দাঁড়িয়ে রয়েছেন।"

"এঁকে নমস্কার কর, বোন। ইনি আমার বন্ধু আহমদ ভাই। নরেনকে খুব চেনেন।"

নিবেদিতা আহমদেরও পায়ের ধূলা নিলে। তার পর বললে, "ভাইসাহেব, আপনিও আমার দাদা। তৈয়ব আলি শেঠ আমাদের গুরুস্থানীয়। নরেন আপনার কথা কত কি লিখেছে। আমার কপালগুণে আপনার দর্শন পেলাম।"

আহমদ জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি কি আমার বোন রোশনারাকে চেনেন?"

নিবেদিতা ঈষৎ হেসে উত্তর দিলে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব চিনি। সেও ত এক রকম আমাদের আশ্রম-বাসিনী। প্রায়ই ছুটীর সময়ে এসে আমাদের কাছে থাকে। আমাকে বহিন ব'লে ডাকে।" তার পর রণজিতের দিকে ফিরে বললে, "দাদা, আজকের দিনটা এখানে থেকে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করে যাবেন না?"

রণজিৎ হতাশভাবে মাথা নাড়লে, "অত বড় লোকের চরণে কি নিয়ে যাব, নিবেদিতা? শুধু হাতে যে দেব-দর্শনে যেতে নেই।"

নিবেদিতা সলজ্জভাবে বললে, "কেন? আপনি আপনার ঐ সুন্দর মন নিয়ে যাবেন!"

"এ মন যদি সুন্দর হত, বোন, ত নিয়ে গিয়ে তাঁর পায়ে উৎসর্গ করতাম, কিন্তু অকেজো, অসুন্দর, অবিনীত এই পদার্থটাকে অন্তরালে লুকিয়ে রাখাই ভাল।"

"আমি যে আপনার কথা অনেক বলেছি গুরুদেবকে! তিনি যে আপনাকে দেখবার জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছেন!"

"বুঝেছি, বোন। তুমি তোমার দাদার একটা মন-গড়া ছবি এই মহাপুরুষের চোখের সামনে তুলে ধরেছ। কাজটা ভাল কর নেই। আমার এখনও তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। যদি নিজেকে সে সৌভাগ্যের অধিকারী কোন দিন মনে করি, ত তখনই যাব।"

"আমার সাধ পূর্ণ করবেন না! আহমদ ভাই, আপনি একবার বুঝিয়ে বলুন।"

"বহিন, আমরা একটা বিষম সমস্যার মাঝ দিয়ে চলেছি। নানা অকাজে জীবন কাটিয়ে, এখন এত দিনে মনে হচ্ছে, যেন একটু একটু আলো দেখতে পাচ্ছি। এ অবস্থায় বড় সঙ্কোচ হয় কোন মহাপুরুষের সম্মুখে যেতে।"

"নরেন লিখেছে, আপনারা তীর্থ-ভ্রমণে বেরিয়েছেন। কোথায় কোথায় গেছলেন?"

"এই প্রদেশের দুটো বিখ্যাত পীরস্থানে তোমার দাদাকে নিয়ে গেছলাম।"

"পীরানায় গেছলেন?"

"তুমি পীরানা জান?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, পীরানা জানি বই কি! অনেকবার গেছি আমার গুরুদেবের সঙ্গে। তিনি বড় ভালবাসেন ওখানে যেতে। বলেন, বড় শান্তি পাই।"

রণজিৎ উত্তেজিত হয়ে বললে, "তা ত বলবেনই অত বড় মহাপুরুষ! তোমার কি মনে হয় না, নিবেদিতা, যে পীরানার আলো ভারতময় জ্বালান আমাদের প্রধান কাজ!"

নিবেদিতা মাথা নত করে উত্তর দিলে, "কোনটা প্রধান কাজ, তা ঠিক করার মত বুদ্ধি আমার নেই। তবে ওটাও যে মস্ত কাজ তাতে আর সন্দেহ কি! আমার একটা প্রার্থনা আছে, দাদা, আপনাদের চরণে। যখন তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছেন, তখন দুই একটা আমাদের হিন্দুর তীর্থও চোখে দেখে যান। হয় ত তাতে কাজ আরম্ভ করার সুবিধা হবে।"

রণজিৎ কিছু বললে না। আহমদ বললে, "তোমার উপদেশ খুব ভাল, বহিন। যাব আমরা হিন্দু-তীর্থে।"

ট্রেণের ঘণ্টা বাজল। নিবেদিতা দুজনকে প্রণাম করে তার আশ্রমবাসিনীদের কাছে চলে গেল।

দুই বন্ধু বোম্বাই ফিরলে তৈয়ব আলি সাহেব তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রণজিৎ ভাই, আহমদ কি দেখালে তোমাকে? তোমার সমস্যার সমাধান কিছু হল?"

রণজিৎ হাসি-মুখে উত্তর দিলে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার সমস্যার সমাধান হয়েছে। এইবার সম্মুখে একটা কর্ম্মের পথ দেখতে পেয়েছি। আমরা সেংওয়ান ও পীরানার সমাধি-মন্দির দেখে এলাম। দুজনে মন স্থির করেছি যে, পীরানার উজ্জ্বল আলো ভারতময় জ্বালাব।"

বৃদ্ধ শেঠজী রণজিতের দিকে করুণ নয়নে চাইলেন। তার পর আপন মনে বলতে লাগলেন, "পীরানার আলো জ্বালাবে! সে ত কবীর নানকের মত কত সাধকই জ্বেলেছিলেন। রইল কি? নিবে যাবে, দু দিনে নিবে যাবে। আর একটা নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হবে মাত্র। হিন্দুস্তান আমার যে অন্ধকার, সেই অন্ধকারেই থাকবে।"

একটু চুপ করে থেকে রণজিৎকে বললেন, "বৃদ্ধের গজ-গজানি শুনে ক্ষুণ্ণ হয়ো না, বৎস! বয়স হয়েছে কি না, আর যৌবনের সে সাহস নেই। আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের চেষ্টা সফল হোক।"

এই রকম কথাবার্ত্তা হচ্ছে, এমন সময়ে একটি বছর কুড়িকের মেয়ে ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। দেখতে ছোট্টটী, কচি মুখ, কিন্তু কি চোখ দুটী, যেন জ্বলন্ত অঙ্গার! খদ্দরের ঘাগরা পিরান ও ওড়না পরা, বুকে কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ ব্যাজ্। সবাইকে সেলাম করে বসল। আহমদ জিজ্ঞাসা করলে, "রোশনারা, কবে এলি?"

"কাল এসেছি, ভাই সাহেব। তুমি কি পীরানায় গেছলে?"

"হ্যাঁ বহিন, আমার দোস্ত রণজিৎ বাবুকে দেখাতে নিয়ে গেছলাম। রণজিৎ ভাই, এই আমার বহিন রোশনারা বিবি।"

রোশনারা দাঁড়িয়ে উঠে আবার সেলাম করলে। তার পর একটু উত্তেজিত হয়ে বললে, "আপনি নিবেদিতার দাদা। তার কথা শুনে বড় ইচ্ছা হয়েছিল আপনাকে দেখতে। যথার্থই আপনি তেজস্বী লোক। চোখ দেখেই বুঝতে পারছি। গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন? তিনি ত আপনার মত লোকই চান। ঠিক নয়, বাবা?"

তৈয়ব আলি শেঠ হেসে বললেন, "রণজিৎ, মেয়েটা আমার দেশ-পাগলী। আমাকে যত সহজে বুঝিয়েছে, ওকে পারবে না।"

রোশনারা উঠে রণজিতের কাছে গিয়ে বললে, "ভাই সাহেব, আমিও আপনার বহিন। আমার কথায় বিরক্ত হবেন না। কিন্তু আপনি বাবার কাছে কি সব 'ধর্ম্ম ধর্ম্ম' করে গেছেন। ধর্ম্মের নামে হিন্দুস্তান এক হবে না। আমাকে ত পাবেনই না। আমি কোন সম্প্রদায়ের ধার ধারি না। আল্লাকে মানি, আর মানি এক অখণ্ড হিন্দুস্তান রাষ্ট্র।"

বাপ বললেন, "কি পাগলের মত বকছিস্, রোশনারা! লোকে শুনলে বলবে কি?"

"লোকে শুনবে, বাবা। একদিন শুনতেই হবে আমার মতন মুসলমানের বক্তব্য। শুনতেই-হবে। কিন্তু রণজিৎ ভাই, আপনাকে ছাড়ব না, দাদাকেও ছাড়ব না। আপনাদের থাকতেই হবে আমাদের কংগ্রেসে। কংগ্রেসের বাহিরে কোনও দেশের কাজ নেই।" একে স্ত্রীলোক, তায় অল্পবয়স্কা; উত্তেজনায় যেন চোখ দিয়ে আগুন ছুটতে লাগল।

আহমদ উত্তর দিলে, "আসব একদিন রোশনারা। হিন্দু মুসলমান সবাইকে ধরে নিয়ে আসব। যে দিন দুই ধর্ম্মের ভেদ ঘোচাতে পারব, সেই দিন সবাইকে আনব।"

ভগ্নী মুখ বেঁকিয়ে বললে, "তোমরা এই বয়সে যদি তসবী জপ করতে আরম্ভ করবে, তো দেশের সেবা কে করবে? কি ছেলে মানুষ তোমরা!"

রণজিৎ শেঠজীকে বললে, "সাহেব, নিবেদিতা আমাদের বলে দিয়েছে যেন কাজ আরম্ভ করার আগে দুই একটা হিন্দুর ধর্ম্মস্থানও দেখে যাই।"

বৃদ্ধ উত্তর দিলেন, "হিন্দু মন্দিরে আহমদকে ঢুকতে দেবে কেন? তবে, তুমিও ত মুসলমানের মসজিদে যাও নেই। সুফী পীরের সমাধি দেখেছ মাত্র। এক কাজ করতে পার। আহমদকে দুই একটা সাধু-সন্তের আস্তানা দেখাতে পার।"

"আমি মনে করেছি, প্রথমে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে যাব। শুনেছি, সেখানে জতিভেদ নেই। তার পর না হয় দুই একজন সাধু ফকীরের সন্ধান করব।"

"দেখ বৎস, যা ভাল বোঝ কর। কিন্তু আমার কাছে ফিরে আসতেই হবে এক দিন। আমি অখণ্ড হিন্দুস্থানের ঝাণ্ডা তুলে তোমাদের পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকব।"

বাপ ও মেয়ে বেরিয়ে গেল। যাবার সময়ে একবার ফিরে রোশনারা বলে গেল, "ছি, রণজিৎ ভাই, আপনার মত শের বেদ-পুরাণ আর হদিশ-কোরানের কচ-কচি নিয়ে সময় কাটাবে, আর দেশের লোক না খেতে পেয়ে মরবে! অন্য কিছু না করতে যান, চলুন না দুজনে আহমদাবাদে গিয়ে মজুর সংগঠন করি। হিন্দু মুসলমান মজুর সহজেই এক করা যাবে।"

রোসনারা বেরিয়ে গেলে রণজিৎ বললে, 'আহমদ, বোনটী তোর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ; ঢাকা দিয়ে রাখিস, নইলে সারা লঙ্কা পোড়াবে।"

আহমদ হেসে উত্তর দিলে, "ভাই, বাবাও ঐ রকম। দুজনে কোন প্রভেদ নাই। তফাৎ যেটুকু, তা বয়সের জন্য। তবে কি জানিস ভাই, এই রোসনারাই হয় ত বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে বসে মুসলিম জগতের ধ্যান করবে। কত জনেরই ত এই দশা দেখলাম!"

রণজিৎ দাঁড়িয়ে উঠল। বললে "না আহমদ, আর সময় নষ্ট করা কিছু নয়। নূতন আলো, নূতন সুর, ভারতের ঘরে ঘরে জ্বালাতে হবে। হিন্দু মুসলমানে কোন ভেদ নাই, এই মন্ত্র সবাইকে দেব। চল, একবার জগন্নাথ মন্দির ঘুরে যাওয়া যাক্। সেখানে কিছু উদ্দীপনা শক্তি আছে কি না, দেখি।"

(ক্রমশঃ)

'সেই কবি প্রিয় পৃথিবীর'

শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত

নির্জ্জনে অখ্যাত হয়ে আপনার মনে আঁকে ছবি,
সে কবির নাম নাই তবু, বার বার তারে বলি কবি।
দীনতার মাঝে অবগাহি দেহ তার দিনে দিনে ক্ষয়,
মলিন যদিও মুখ তার সব চেয়ে সেই ভাব-ময়।
দুখ জ্বালা যে কবি বুঝেছে, ক্ষণ তরে হেরি সুখ মুখ,
অশান্তির বহ্নিদাহে আপনারে করে অপরূপ।

আকাশের নীলিমা হেরিয়া নীরবেতে বাসিয়াছি ভালো,
বাণীর মন্দির মাঝে ম্লান যদি হয়ে থাকে আলো।
কোন জন না শুনিয়া থাকে দূর হতে তার ক্ষীণ গান,
সেই কবি আপনার মনে, নীরবেতে ক'রে যায় দান—
সত্য যাহা, প্রাণময়ী কবিতার প্রতি ছন্দ মাঝে
ব্যথীর বেদনাস্রোত ক্ষণে ক্ষণে প্রাণে আসি বাজে।

সেই কবি সত্যকার, সেই কবি শ্যাম প্রকৃতির,
উন্মাদনা চিত্তে যার করিয়াছে কেবল অধীর—
অসীম সৌন্দর্য্য লাগি, চলিয়াছে উদাস পথিক,
পিছনে বিরাট্ রথ তার; নিয়ে কোথা নাহি চলে ঠিক—
আপনার ভাবের আবেশে, সেই কবি প্রিয় পৃথিবীর,
কোলাহল দূরে রাখি আপনারে রাখিয়াছে থির।

শিক্ষা

শ্রীহরিহর শেঠ

মানব-হৃদয়ের শ্রেষ্ঠতম বৃত্তিগুলি ফুটাইয়া তোলা, তত্ত্ব ও জ্ঞান-বিজ্ঞানকে, পরম সত্যকে জীবনরূপে পাওয়াই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। শিক্ষার দ্বারা চিত্তবৃত্তির উন্মেষ ঘটিয়া মানুষকে মানসিক শক্তিসম্পন্ন করিয়া তুলে, তদ্দ্বারা হিতাহিত বোধ জন্মে এবং সুবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়াই সে স্বীয় কর্ত্তব্যপথের অনুসন্ধান জন্য সঙ্কল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট হয়। সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, চরিত্রের বল, বুদ্ধির স্থৈর্য্য, এসব আনিয়া মানুষের পূর্ণতা সাধন করে শিক্ষা। এই সকল ব্যক্তিগত উৎকর্ষ হইতে জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষবিধান হইয়া থাকে। মানুষকে সর্ব্ব-প্রকারে মানসিক, শারীরিক ও নৈতিক সামর্থ্যবান্ করিয়া তোলাই শিক্ষার গুণ। এই ত্রিবিধ পরিপুষ্টিলাভ ব্যতিরেকে কেহ জীবনে উন্নতিলাভ করিতে পারে না। মানবের জীবনপথ বহু ক্ষেত্রেই বেশ কুসুমসমাকীর্ণ নহে। নানা বাধাবিপত্তি ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়াই সাধারণতঃ এই পথ দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। তখন অবস্থার পীড়নে বিভ্রান্ত হইয়া মানুষ একেবারে দিশাহারা হইয়া উঠে এবং এই অবস্থায় ক্রমে মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশুত্বের আয়ত্তে আসিয়া পড়িতেও দেখা যায়। এই আক্রমণের হাত হইতে উদ্ধারের জন্য যে শক্তির আবশ্যক, তাহা পাওয়া যাইতে পারে একমাত্র শিক্ষার দ্বারা। উহাই বহু বিপৎসঙ্কুল পথের একমাত্র অবলম্বন।

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য বলিতে সুধীগণ ইহাই বলিয়া থাকেন। এ বিষয়ে কাহারও সহিত মতভেদ থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। সর্ব্বত্র সকল মনীষিগণই ইহা বিদিত আছেন; কিন্তু কি দুর্দ্দৈব, দিনের পর দিন যাইতেছে শিক্ষাকেন্দ্রগুলির মধ্যে যে ত্রুটি রহিয়াছে তাহার সংশোধনের জন্য আমাদের যথোচিত যত্ন নাই, এ বিষয়ে আমরা সম-ভাবেই উদাসীন। ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীর উপর ছাড়িয়া দিয়াই আমরা নিশ্চিন্ত আছি। শিক্ষকমণ্ডলী বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্ত্তিত পথ ধরিয়া তৎপ্রবর্ত্তিত বিধি ব্যবস্থা মানিয়া শিক্ষা দিয়া যাইতেছেন। পূর্ব্বের তুলনায় আজকাল প্রায় সকল বিষয়েই সুন্দর সুন্দর শিক্ষাপ্রদ বহু পাঠ্য পুস্তক হইয়াছে। শিক্ষকমহাশয়দের মনোযোগিতায় ও চেষ্টায় ছাত্রছাত্রীগণ উহা পাঠ করিয়া শিক্ষালাভ করিতেছে ও পরীক্ষায় সফলকাম হইতেছে, আর এই সাফল্যের সহিত বিদ্যালয়ের সুনাম বৰ্দ্ধিত হইতেছে। তাহারা রাণা প্রতাপ সিংহের স্বদেশ-প্রেমের কথা পড়িতেছে, রাজপুতানার ও শিখ বীরদের গৌরব কাহিনী আবৃত্তি করিতেছে, একলব্য ও আরুণী উতঙ্কের গুরুভক্তির কথা বিদিত আছে, অতি সামান্য অবস্থা হইতে কি করিয়া ওয়াশিংটন্ আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অধিনায়ক হইয়াছিলেন তাহার কথা, নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর ওয়াসিংটন্ বুকারের সাধনা ও অধ্যবসায় সমস্তই জ্ঞাত আছে; এসব ভাল করিয়াই আয়ত্ত করিতেছে, কিন্তু তাহাতে হইতেছে কি? সে গুরুভক্তি, সে দেশাত্মবোধের সাধনা, আত্মসংযম ও অধ্যবসায় কোথায়? আর প্রকৃত কথা বলিতে কি, সাধারণ শিক্ষার হিসাবেও প্যারীচরণ সরকারের First Book & Second Book of Reading এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বোধোদয়, কথামালার যুগের ছাত্রদের মত সাধারণ জ্ঞানই বা কোথায়? বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারীর পক্ষেও এই একই কথা। আচার্য্যপ্রবর প্রফুল্লচন্দ্র এ কথা বহুবার বলিয়াছেন, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সলার মনীষিবর ভূপেন্দ্রনাথ বসু বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিলাভের জন্য ছাত্রদের ব্যগ্রতার প্রতি কটাক্ষ করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। এসব মন্তব্য কি নিরর্থক? শিক্ষক-সম্মিলনের সভাপতিরূপে ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও বর্ত্তমান শিক্ষার অনেক ত্রুটির কথা বলিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়া-ছিলেন, এখনকার শিক্ষায় মানসিক বৃত্তিনিচয়ের সম্পূর্ণ উন্মেষ হয় না।

বর্ত্তমান শিক্ষায় একদিকে সকল বিষয়ে সাধারণ

জ্ঞানার্জ্জনের পক্ষে যেমন অপূর্ণতা, অন্যদিকে চরিত্রবত্তার সবিশেষ পরিপুষ্টিসাধনের এবং পারিপার্শ্বিকতার বিরুদ্ধ অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিবার সামর্থ্যের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। অথচ উদরান্নের সংস্থান পর্য্যন্ত আর সাধারণ শিক্ষার দ্বারা হইতেছে না। চরিত্রের বিনিময়ে দারিদ্র্য, ইহাও না হয় মানিয়া লওয়া যায়; চরিত্রের বিকাশও হইবে না, দারিদ্র্যও ঘুচিবে না অথচ সময়, সামর্থ্য ও অর্থব্যয় যথেষ্টই করিতে হইবে, ইহাতে স্বতঃই মনে হয়, এ শিক্ষার সার্থকতা কি?

মানুষের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের সৃষ্টি কত প্রাচীন তাহা নিরাকৃত না হইলেও ইহা ঠিক, যে মানব-সভ্যতা-বৃদ্ধির সহিত ইহা বহু বহু যুগ পরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিদ্যামন্দির মানব-শিক্ষার স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান নয়, ইহা শিক্ষালাভের একটা কৃত্রিম ক্রিয়াসাধক মাত্র। ভাষাজ্ঞান ও বাক্‌শক্তি—যাহা মানবতার একটি প্রধানতম অঙ্গ, তাহার প্রথম শিক্ষার স্থান মাতাপিতা ও পরিজনপূর্ণ পারিবারিক আবেষ্টনের মধ্যে। কোন শিশু বাক্‌শক্তি স্ফুরিত হইবার পূর্ব্বে হইতেই যদি ভিন্ন ভাষাভাষী পরিবারের মধ্যে প্রতিপালিত হয়, তবে মাতৃভাষা কখন তাহার ভাষা হইবে না, এমন কি বন্য পশুর সাহচার্য্যে পালিত মানবশিশুর পশুর হাবভাবপ্রাপ্তির কথাও কখন কখন সংবাদ-পত্রপাঠে জানা গিয়াছে। গৃহই মানুষের স্বাভাবিক শিক্ষামন্দির, আক্ষরিক বিদ্যা প্রথম শিক্ষার বিষয় নয়। বাক্‌শক্তি ও ভাষাকে অবলম্বন করা ব্যতিরেকে এই বিদ্যালাভ করা সম্ভব হয় না। পুস্তকগত বিদ্যার মূল্য যে কম তাহা নহে, তবে তাহাতে যাহা পাওয়া যায় তাহার আবশ্যকতা পরে। মানবশিশুর জীবনরক্ষা ও উহার উৎকর্ষসাধনার্থ যাহা কিছু শিক্ষার আবশ্যক, বাঁচিবার জন্য যে কিছু অভিজ্ঞতা দরকার, তাহা লভ্য হয় স্নেহময়ী জননীর অঙ্কে, পিতার মমতায়, সহোদর সহোদরার প্রীতিপূর্ণ সাহচর্য্যে। ঠিক পরবর্ত্তী জীবনেও শিশুরা আমাদের প্রণালীবদ্ধ সামাজিক আবেষ্টনের মধ্যে নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে যে সব অমূল্য শিক্ষা পায়, তাহা বিদ্যালয়ে কেন, অন্যত্র কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। তখন তাহারা নিজের অলক্ষ্যে তাহা জীবনের সঙ্গে অঙ্গীভূত করিয়াই গ্রহণ করে। তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। এই স্থানেই, এই ক্ষণ হইতেই ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য অনেক কিছু সংগৃহীত হয়, শিক্ষার মূলতত্ত্ব এইখানেই নিহিত রহিয়াছে। যে মাতৃভাষা এই অসহায় অবস্থার একমাত্র অবলম্বন, বিদ্যালয়ের সহায়তায় প্রথম তাহার শিক্ষার উন্নতি করাই আবশ্যক। তাহার অবহেলায় অন্য কোন বৈদেশিক ভাষা কখন সে স্থান পূরণ করিতে পারে না।

আরও এক কথা, জাতীয় জীবনগঠন ও তাহার তাহার উৎকর্ষসাধনার্থ অর্থাৎ স্বকীয় জাতীয়তা-লাভের জন্য জাতীয় ভাষার প্রয়োজনীয়তা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। শিক্ষা সকল জাতির ঠিক এক নহে। ইউরোপে সকলেই নিজ নিজ জাতীয়তায় মহীয়ান্, সেখানে আবার বিশ্ব-জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত করিবার এক প্রচেষ্টা হইতেছে। কিন্তু সেখানেও জার্ম্মাণ, ফরাসী, ইংরাজ প্রভৃতির শিক্ষা, culture, নীতি প্রভৃতিও এক নহে, পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন। ফ্রান্সে আত্মহত্যা পাপ বা অপরাধ বলিয়া গণ্য নহে, সোভিয়েট্‌ রাশিয়ায় শিথিল বৈবাহিক বন্ধননীতি বা কোন কোন দুষ্কৃতি দোষমূলক নহে; আবার জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, রাশিয়ায় কোন কোন অস্বাভাবিক বিধি যাহা গ্রহণীয় নহে, ইংলণ্ডে তাহা সমর্থিত। তথায় সকলেরই জাতীয় চরিত্রগঠনের এক একটী বিশিষ্টতা দেখা যায়। তাহাদের আত্মমর্য্যাদা বা আত্মপ্রতিষ্ঠা জ্ঞানও সকল ক্ষেত্রে এক নহে। আমাদেরও নৈতিক ব্যবস্থায় অনেক পার্থক্য আছে; আমাদেরও নিজস্ব জাতীয়তা থাকা আবশ্যক। সেজন্যও শিক্ষাকে দেশমুখী করা প্রয়োজন। বিজাতীয় শিক্ষায় আমাদের জাতীয় প্রগতি বাধাপ্রাপ্তই হইতেছে। দেশ-বিদেশের জ্ঞান বিজ্ঞান আহরণ করিবার জন্য, অর্থোপার্জ্জনের জন্য, বিদেশীয় ভাষাশিক্ষার অনুশীলন আবশ্যক, একথা কেহই অস্বীকার করেন না; কিন্তু তাহা হইলেও প্রথমে জাতীয় ভাষা-শিক্ষায় মনোযোগী হওয়া দরকার। শৈশবই শিক্ষার উৎকৃষ্ট সময়, সুতরাং এ সময়ে ছেলেদের জাতীয় ভাষা-শিক্ষায় অবহেলা করিলে পরে আর প্রায় সুযোগ পাওয়া যায় না।

তারপর, শিক্ষার বিষয় ও ব্যবস্থার কথা। বিষয়—এ সম্বন্ধে আমি এখন কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নির্দ্ধারিত পাঠ্যপুস্তকের আধিক্য বা বিষয়ের নির্ব্বাচন ও আধিক্য সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের পক্ষে অনেক সময়েই অবাঞ্ছনীয়, একথা অনেক মনীষী বলিয়া থাকেন। পাঠ্য পুস্তকগুলির মধ্যে উপযোগিতার অভাব যে বহু ক্ষেত্রে আছে তাহা আমার মনে হয় না। তাহা হইলেও বিষয় দুইটী বিবেচনাসাপেক্ষ! আর ব্যবস্থার কথা,—যে সকল ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহা হয়ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত, কিন্তু তাহার ফল যে ভাল হইতেছে না, তাহাতে শিক্ষা বহুলরূপে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইতেছে, একথা চিন্তাশীল মনীষী মাত্রেই বলিয়া থাকেন। একটু ভাবিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, যে বর্ত্তমানে যে ভাবে ছেলেরা শিক্ষা পাইতেছে তাহাতে যেন শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতে ক্রমেই বিচ্যুতি ঘটিতেছে। একটা ত্রুটি সর্ব্বোপরি ফুটিয়া উঠে, যে সব ছেলেরা নির্দ্ধারিত শিক্ষায় অর্থাৎ পঠিতব্য পুস্তকাদিতে বরাবর ভালরূপ পারদর্শী হইতেছে, তাহারাও উত্তরকালে সাংসারিক বা সামাজিক জীবনে সফলতা পাইতেছে না, কার্য্যক্ষেত্রে ঠিক উপযোগী হইয়া উঠিতেছে না। যে সাহস, যে স্বাধীন মন, যে প্রয়োগবিধি, যে কর্ত্তব্যবুদ্ধি থাকিলে মানবত্বার পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হইতে পারা যায়, তাহার একান্ত অভাব পরিদৃষ্ট হইতেছে। মানুষ মাত্রেরই নিজের প্রতি, সংসারের প্রতি, আত্মীয়জনের প্রতি, দেশবাসীর প্রতি, এমন কি বিশ্ব-মানবের প্রতি যে একটা কর্ত্তব্য আছে, দেখা যায়, একথা অনেক উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিও মনে আনিতে পারেন না।

আমাদের এখন আবশ্যক হইয়াছে সৃষ্টি-সামর্থ্য, দিকে দিকে সংগঠনের যজ্ঞানুষ্ঠান। বাঙ্গালী জাতিকে বাঁচিতে হইলে তাহাকে রক্ষা করিতে হইলে ইহা চাই-ই। এখানকার শিক্ষায় এ শক্তি আনিয়া দেয় না। বাঙ্গালার শ্মশানসম পল্লীগুলির সংগঠন বিনা উপায় নাই। পল্লীর সংস্কার দ্বারা পল্লীর শ্রী ফিরাইয়া আনিবার জন্য অবহিত হইতে হইবে। আমাদের মধ্যে প্রাণের দীপ্তি ও পৌরুষ না ফুটাইতে পারিলে, কুসংস্কারমুক্ত আত্মনির্ভরশীল বুদ্ধিমান্ নাগরিকরূপে নিজেদের প্রতিপন্ন করিতে না পারিলে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, সাধনায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে না পারিলে, বসনে ভূষণে, আহারে বিহারে, শিক্ষায় দীক্ষায়, ভাবে চিন্তায় পূর্ণ স্বদেশী হইতে না পারিলে, আমাদের কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, স্বরাজের স্বপ্ন সবই বৃথা। এক কথায় আত্মচেষ্টায় আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। এজন্য যাহা কিছু সংস্কার, তাহা আমাদের স্বভাবকর্ম্ম, আমাদের নিজস্ব ভাবধারার সঙ্গে মিলাইয়া করিতে হইবে। এক জাতির সংস্কার অপর জাতির আদর্শে অনেক সময়েই সুফলপ্রসূ হয় না। অপরের যাহা ভাল, যাহা গ্রহণীয় তাহা লইয়া নিজেদের সমৃদ্ধ করা দোষের নয়; কিন্তু অন্ধ অনুকরণ জাতির হীনতা ও পরাজয়েরই চিহ্ন। এই যে বর্ত্তমানের সভ্যতা ও বিলাসের প্রতি হৃদয়হীন মমত্ববোধ এ আমাদের দেহ ও মনের পক্ষে মারাত্মক ব্যাধি-বিশেষ।

ছাত্রদের এইসব কথা শিক্ষা দিবে কে? বিদ্যালয়-গুলির উপরই তাহা নির্ভর করিতেছে। পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠায় পর পর এই সব কথা লেখা থাকে না। আর লেখা থাকিলেই যে তাহা পাঠে ছাত্রদের সকল জ্ঞান ফুটিয়া উঠিবে সে সম্ভাবনা নাই। সেখানে উদাহরণ আছে, উপদেশ আছে, বহু প্রসঙ্গের আলোচনা আছে। বুঝাইবার শিখাইবার ভার, চরিত্রগঠনের ভার শিক্ষকের। তাঁহাদের দায়িত্ব অনেক। এ কার্য্য করিতে হইবে শুধু মুখের উপদেশে নয়, নিজ জীবনের কার্য্যাবলীর উদাহরণে আপনার স্নেহশক্তি হৃদয় লইয়া সুশিক্ষার আলোক বাতাসে শিক্ষার্থীর মধ্যে সুশিক্ষার ক্ষুদ্রবীজকে শৈশবেই উপ্ত করিতে হইবে, তাহাদের মনে প্রাণে গাঁথিয়া দিতে হইবে। এজন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে একটা নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। ধর্ম্মহীন শিক্ষা আমাদের দেশের ধাতুগত নহে, ধর্ম্মাশ্রিত শিক্ষাই আবশ্যক।

দৈহিক উন্নতির দিকেও আমাদের লক্ষ্য বড় কম। নৈতিক উন্নতির সহিত শারীরিক উন্নতি যাহাতে হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যথাকর্ত্তব্য করার ভারও শিক্ষকের। শিশুদের শিক্ষাদান কার্য্য অতীব কঠিন। তাহাদের বিনাবাধায় যেমন বর্দ্ধিত হইতে দিতে হইবে, তেমনই মানসিক স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বুদ্ধি ও প্রতিভা

বিকাশ হইবার সুযোগ দেওয়া এবং প্রথম হইতেই উহাদের আত্মনির্ভরশীলতা শিক্ষা দেওয়া উচিত। স্বাবলম্বী হওয়া সকলেরই আবশ্যক। বর্ত্তমান শিক্ষার যাঁহারা প্রবর্ত্তক তাঁহারা আদিতে যে উদ্দেশ্য লইয়াই আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া থাকুন এবং আমরাও এতদিন যে মোহেই ভুলিয়া থাকি, সময়ের সহিত অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সুতরাং সে মোহ কাটান এখন সহজ হইয়াছে। আমাদের যাহা দরকার, বিদ্যার যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহা পূরা মাত্রা পাইবার জন্যই চেষ্টা করিতে হইবে। আমার এ কথার তাৎপর্য্য এই নয়, যে আমাদের বর্ত্তমান অর্থসমস্যার অন্নসমস্যার কথা ভাবিতে হইবে না। সে সমসস্যা-মাধানের যোগ্যতাও শিক্ষামন্দির হইতেই পাইতে হইবে, তবে মনুষ্যত্ব-লাভের জন্য যে শিক্ষা তাহাকে সরাইয়া নহে।

শিক্ষক মহাশয়দের ছেলেদের যাহার যেদিকে স্বাভাবিক প্রবণতা তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া তাহাদের মানুষ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করাই উচিত। অতিবুদ্ধিসম্পন্ন মহামানব, এমন কি নূতন প্রতিভা কেহ স্বষ্টি করিতে পারেন বলিয়া বিশ্বাস করি না, উহা মানুষের ভগবৎপ্রদত্ত সম্পদ্। এ সকল কথা বিজ্ঞ শিক্ষক মহাশয়েরা সকলেই জানেন, তাহাদের কাছে ইহার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। আমি এই সভায় প্রসঙ্গতঃ শিক্ষার ত্রুটি এবং শিক্ষার বিশেষ দিক্ যাহা হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে হয়, এ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম তাহার এক বর্ণও নূতন নহে; মনীষিবর্গের কথার পুনরালোচনা মাত্র। উপদেষ্টার আসন লইয়া আমি কোন কথা বলি নাই, যাহা সর্ব্বদা মনে হয়, অন্যত্রও যাহা বলিয়া থাকি তাহাই বলিলাম।

ছাত্রদের সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। তাহারাই দেশের সম্পদ্, ভবিষ্যৎ আশা ও ভরসার স্থল। তাহারা শিক্ষালাভ দ্বারা দৈহিক মানসিক সর্ব্বপ্রকার উন্নতিসম্পন্ন হউক। আজ দেশের মধ্যে যে নবজাগরণের সাড়া ও নবযুগের অভ্যুদয়ের সূচনা হইয়াছে, ইহা জাতির পক্ষে শুভ-লক্ষণ। স্বদেশপ্রীতি, জন্মভূমির প্রতি প্রীতি ও মমত্ববোধ ইহা মানবমাত্রের পক্ষেই বরণীয়। পৃথিবীর সকল দেশের মানবেরই ইহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যে বিদ্যামন্দিরে এ ধর্ম্ম রক্ষা করা বাধাসঙ্কুল তাহা নিকৃষ্ট শ্রেণীর, একথা নিঃসঙ্কোচেই বলা বলা যায়। কিন্তু তাহা হইলেও ছাত্রদের সকল কার্য্যেই আন্তরিকতা ও সংযমের আবশ্যক, ঔদ্ধত্য বা উচ্ছৃঙ্খলতা কোন ক্ষেত্রেই শোভন নয়, ইহা মনে রাখিতে হইবে। কর্ত্তব্যানুরোধে সামর্থ্যানুযায়ী দেশের সেবায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে, কিন্তু সেটা গড্ডলিকা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া নহে, অথবা দুর্ব্বিনীত ও যথেচ্ছাচারী হইয়া নহে। দেশের সেবায় আত্মপ্রসাদে তাহাদের হৃদয় ভরিয়া উঠুক, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু সে জন্য অহমিকায় অন্ধ করিয়া যেন না ফেলে। *

* (শ্রীরামপুর "বল্লভপুর মধ্য ইংরাজি স্কুলের" পারিতোষিক-বিতরণ সভায় সভাপতির অভিভাষণের সারাংশ)।

ভক্ত ও কীর্ত্তনীয়া

শ্রীআনন্দগোপাল গোস্বামী

কীর্ত্তনের অবসানে রস কীর্ত্তনীয়া
সবিনয়ে এক ভক্তে কহিল ডাকিয়া,

"কীর্ত্তন শুনিয়া সবে ধন্য ধন্য কহে,
তোমার রসনা শুধু নির্ব্বিকার রহে।
তবে কি আমার গীতে তৃপ্ত তুমি নও,
হে সাধু, আমারে এবে প্রকাশি' তা' কও।"

ভক্ত কহে, "মুগ্ধ আমি তোমার সঙ্গীতে,
অবসর নাহি ছিল ধন্যবাদ দিতে।
আমি শুধু এক চিত্তে লীলামৃত গান,
প্রাণ ভরি' সব ভুলি' করেছিনু পান।"

শেষ অঙ্ক

(গল্প)

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

এ বৎসর শীতের যেন ীর উপর মমতা পড়িয়া গিয়াছিল—ছাড়িয়া যাইতে আর মন সরিতেছিল না। ফাল্গুনের মাঝামাঝি, কিন্তু মাঘ মাসের মতো দুরন্ত শীত।

সূর্য্যোদয়ের তখনও অনেক বিলম্ব আছে। তাহার উপর এমন কুয়াশা করিয়াছে যে, দশ হাত দূরের লোককে চেনা যায় না। এত ভোরেই ভদ্রলোক তাঁহার দক্ষিণ-দ্বারী বৈঠকখানার বারান্দায় একটা খুঁটিতে পাটের গোছা বাঁধিয়া মোড়ায় বসিয়া পাটের দড়ি কাটিতেছেন। পাশেই দেওয়ালে হুঁকাটা ঠেসান রহিয়াছে। কিন্তু দড়ি কাটার তাড়া এত বেশী যে, সেটা টানিবার পর্য্যন্ত ফুরসৎ নাই।

আপনারা বাহিরের লোক, ইঁহাকে চিনিবেন না। কৃষ্ণকমল মিত্রের নামও আপনারা শোনেন নাই। এবং যদি বলি যে, ইনিই আপনাদের সুপরিচিত এবং স্বনাম-খ্যাত নন্দকুমার মিত্রের পিতা, তাহা হইলে হয় তো কথাটা হাসিয়াই উড়াইয়া দিবেন। মনে করিবেন, আমি বোধ হয় আপনাদের সঙ্গে রসিকতা করিতেছি।

আপনাদের দোষ নাই। কারণ কলিকাতা হাইকোর্টের উদীয়মান উকীল মিঃ এন, কে, মিত্রের পিতার সম্বন্ধে মানুষ যেরূপ আশা করে তাহার কিছুই ইঁহার মধ্যে পাইবেন না। অন্ততঃ তাঁহার পিতা যে এত ভোরে হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া মোড়ায় বসিয়া পাটের দড়ি কাটেন, ইহা নন্দকুমারের মতো ফিট্‌ফাট্ বাবু মানুষকে যে দেখিয়াছে সে কি করিয়া বিশ্বাস করিবে?

নন্দকুমার লম্বা, ছিপছিপে, গৌরবর্ণ। মাথার ঘন-কৃষ্ণ কেশরাশি সর্ব্বদা সুবিন্যস্ত। পোষাক-পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন। বাহিরের কোন লোক তাঁহাকে কখনও খোলা গায়ে দেখে নাই। নন্দকুমার খেলো হুঁকায়, এমন কি গড়গড়াতেও তামাক খান না—দামী চুরুট ব্যবহার করেন। এক কথায়, সহুরে ভদ্রলোক বলিতে যা বোঝায় তাই। পক্ষান্তরে, কৃষ্ণকমলবাবু সহর কখনও চক্ষে দেখেন নাই। নিজের গ্রাম ছাড়িয়া কোথাও যাইবার কথা উঠিলেই দুশ্চিন্তায় তাঁহার মাথা ধরিয়া ওঠে। পাড়ার মধ্যে এবং বাড়ীতে তিনি খোলা গায়ে এবং খালি পায়েই বেড়ান। ভিন্ন পাড়ায় যাইতে হইলে কখনও একটি বেনিয়ান, কখনও বা শুধু মাত্র একখানি চাদর কাঁধে ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়েন। ক্যাম্বিসের এক জোড়া জুতাও তখন পায়ে ওঠে। আর চুলের কথা যদি বলেন, তো সে বালাই তাঁহার নাই। সম্মুখের দিক্‌টায় প্রকাণ্ড বড় একটা টাক চক্ চক্ করিতেছে। তাহার উপর গলায় তিন কণ্ঠী তুলসীর মালা থাকায় রূপই বদলাইয়া গিয়াছে।

সে যাহাই হউক, দক্ষিণদ্বারী বৈঠকখানায় অত ভোরে বসিয়া যিনি পাটের দড়ি কাটিতেছিলেন তিনি মিঃ এন, কে, মিত্রের পিতা কৃষ্ণকমলবাবু, এইটুকু বলিলে আপনাদের অর্থাৎ বাহিরের লোকের বুঝিতে আর কষ্ট হইবে না। অবশ্য নন্দকুমার যদি শুধুই হাইকোর্টের একজন উদীয়মান উকিল হইতেন, তাহা হইলে কেই বা তাঁহাকে চিনিত! কিন্তু তিনি যে আবার সামাজিক ও রাজনৈতিক ছোট বড় অন্ততঃ বিশটি প্রতিষ্ঠানের কাহারও সম্পাদক, কাহারও বা সহকারী সম্পাদক। খবরের কাগজে কোন না কোন উপলক্ষে দৈনিক একবার করিয়া তাঁহার নাম ওঠেই। আপনারা খবরের কাগজের নিয়মিত পাঠক। সুতরাং তাঁহার নাম নিশ্চয়ই জানেন।

কিন্তু আমাদের এদিকে খবরের কাগজের অভ্যাগম কদাচিৎ ঘটে। নন্দকুমারও গ্রামে কচিৎ আসেন। সে জন্য তাঁহাকে বড় একটা কেহ চেনে না। এদিকে মিত্র মহাশয় বলিলে কৃষ্ণকমলবাবুকেই বোঝায়। এবং নন্দ-কুমারের নামও কেহ জানে না। বলে, মিত্র মহাশয়ের ছেলে। কিন্তু আমার এই লেখা তো এদিকের কাহারও চোখে পড়িবে না। শুধু আপনাদের জন্যই মিত্র মহাশয়ের

এত পরিচয় দেওয়ার　　ন হইল। নহিলে এদিকে তিনি স্বনামধন্য পুরুষ।

মিত্র মহাশয় ভোরে উঠিয়া পাট কাটিতেছিলেন।

যদু শাঁখারী গাড়ুটা নামাইয়া প্রাতঃপ্রণাম জানাইল। মিত্র মহাশয় অপাঙ্গে একবার তাহাকে দেখিয়া পুনরায় দড়ি কাটায় মনোনিবেশ করিলেন। মুখে বলিলেন—তামাক খা।

ঘরের ভিতরে একটা কাঠের হরপিতে তামাক, টিকা, দেশলাই প্রভৃতি তামাক সাজার সরঞ্জাম থাকিত। যদু তামাক সাজিয়া, টিকা ধরাইয়া, কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিল—এত সকালেই দড়ি কাট্‌তে বসেছেন যে!

যদু, মিত্র মহাশয়ের ছেলেবেলার খেলার সাথী। এক সঙ্গে গাছে উঠিয়াছে, সাঁতার কাটিয়াছে, পাখীর ছানা পাড়িয়াছে, এক হুঁকায় তামাক খাইয়াছে, মারামারি খেলাধূলা করিয়াছে এবং আরও কত কি করিয়াছে। তারপরে কৃষ্ণকমল বড় হইয়া জমিদারী, বিষয়সম্পত্তি দেখিতে লাগিলেন এবং বুড়া হইয়া মিত্র মহাশয়ে পরিণত হইলেন; কিন্তু যদু শাঁখারী যদু শাঁখারীই রহিয়া গেল। সমস্ত দিন পাড়ায়-পাড়ায় গ্রামে-গ্রামে শাঁখা বিক্রী করিয়া বেড়ায়। সন্ধ্যা হইলেই ছেলেদের ছোট কাপড় একখানা পড়িয়া হুঁকাটি হাতে করিয়া মৃদুমন্দ কাশিতে কাশিতে মিত্র মহাশয়ের বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হয়। শুধু সে নয়, আরও অনেকেই থাকে।

তারপর:

—হাঁ হে মাহান্ত, তোমার কাচিপানায় গোগাল প'ড়ে জল যে সব বেরিয়ে গেল। মাঠে বেরোও, না বেরোয় না?

—যাক্ গে মশায়, আর পারি না। ছোঁড়া দুটো খাচ্ছে দাচ্ছে আর মোষের মতন চেহারা করছে। আমি দুদিন জ্বরে প'ড়ে। হাঁয়ে হাঁয়ে বলছি, যা রে, একবার মাঠ দিয়ে যা। জমিগুলোর কি হচ্ছে না হচ্ছে, একবার দেখে আয়। তা শালার ছেলেরা দিনরাত কেবল জল দিয়ে টেরিই বাগাচ্ছে—টেরিই বাগাচ্ছে। যাবে কখন? যা হবার তা হোক, মশায়, আপনি বাঁচ্‌লে বাপের নাম।

বলিয়া নিদারুণ ক্ষোভে মহান্ত নদাই মণ্ডলের হাত হইতে কলিকাটা এক প্রকার কাড়িয়া লইয়াই শোঁ-শোঁ করিয়া টানিতে লাগে।

কিংবা—

—যে যা বলে বলুক বাপু, কিন্তু মিত্তি মশায়ের টিপেল-গ'ড়ের বাকুড়ির হার এবার সব্বাই। দক্ষিণ মাঠে অমন ফলন্ এবার আর কোন জমিতে হতে হয় না। যেমন ধান, তেমনি খড়।

—তা বিঘে পেছু তেরো-চোদ্দ পণ বিড়ে তো হবেই।

মিত্র মশায়ের ঠোঁটের ফাঁকে তৃপ্তির হাসি ফুটিয়া ওঠে। তিনি হাসিয়া বলেন—আরে, সার কি রকম দিয়েছি তার হিসেবটা একবার কর্। শুধু বাকুড়ি কেন, ঐ পুকুরের নামোতে যে বেকীখানা আছে তার আখটা দেখেছিস্?

সকলেই গালে হাত দিয়া বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ, আখ বটে!

—এখুনি আমার মাথাভোর হয়েছে। আর দু'দিন পরেই ওর মেড়া বাঁধতে হবে। নইলে লতিয়ে যাবে।

—লক্ষ্মী-আশ্চয় পুরুষ। যা লাগান তাই সোণা ফলে।

আবার কোন দিন বা রামায়ণ, মহাভারত পড়া হয়। মিত্র মহাশয় নাকের ডগায় চশমা লাগাইয়া সুর করিয়া পড়েন, শ্রোতাদের চোখের জলে বুক ভাসিয়া যায়। গাছের পাতা পর্য্যন্ত নড়ে না। মনে হয়, তাহারা পর্য্যন্ত যেন স্থির হইয়া শুনিতেছে। কে বা তামাক সাজে, কে বা আগুন তোলে! মিনিটে-মিনিটে যাহাদের তামাক চাই, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহারা সমস্ত ভুলিয়া শ্রীরামচন্দ্রের চরিত-কথা শ্রবণ করে। বেঁকী জমি না, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন না, ধান-চাল-আখ না, কোন কথাই তখন আর ইহাদের খেয়াল থাকে না। মিত্র মহাশয় এবং তাঁহার মত আর দুই একজন ছাড়া ইহাদের কাহারও অক্ষর-পরিচয় পর্য্যন্ত হয় নাই। রামায়ণ-মহাভারতের সকল কথার অর্থও বোধ হয় ইহারা জানে না। অথচ ওই বেঁকী জমি এবং স্ত্রী-পুত্র-পরিজন, যাহাদের জন্য এই বৃদ্ধ বয়সেও খাটিয়া খাটিয়া দেহপাত করিতেছে, তাহাদের ছাড়িয়া মন যে

কোন্ কল্পলোকে চলিয়া যায় তাহা হয়তো তাহারা নিজেরাই বলিতে পারিবে না।

ইহারা সত্যবাদী নয়, জিতেন্দ্রিয় নয়, অতিশয় যে ধর্ম্মপরায়ণ এমনও বলিতে পারি না। গভীর রাত্রের অন্ধকারে পরের আড়া হইতে অবলীলাক্রমে ইহারা মাছ চুরি করিয়া আনে। লুকাইয়া পরের জমির জল কাটিয়া নিজের জমি ভর্ত্তি করা তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সের কয়েক আলু কিম্বা এক জোড়া চটি জুতা লইয়া আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যও দেয়। আবার মিত্র মহাশয়ের বৈঠকখানায় রামায়ণ অথবা মহাভারত শুনিতে শুনিতে কাঁদিয়া বুকও ভাসায়। কোথাও কথকতা হইতেছে শুনিলে সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হয় এবং ভাল মন্দ বিবিধ প্রকারে সংগৃহীত আজীবনের সঞ্চয় তীর্থভ্রমণে ব্যয় করিতেও দ্বিধা করে না। এমনই ইহারা।

যদু শাঁখারী কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিল—এত ভোরেই দড়ি কাটতে ব'সেছেন যে!

মিত্র মহাশয় হাসিয়া বলিলেন—তবে আর কাল বল্‌লাম কি? বারটার গাড়ীতে আমার দাদুভাইরা এসেছেন যে। উঠ্‌লো বলে। তখন কি আর আমাকে নিশ্বাস ফেল্‌তে দেবে নাকি? তাই ভাব্‌লাম, ভদ্রা গাইটার দড়িগাছা কে চুরি ক'রে নিয়েছে, ওরা উঠ্‌তে উঠ্‌তে দড়ি একগাছা পাকিয়ে ফেলি। হবে না?

যদু কলিকাটা মিত্র মহাশয়ের হুঁকায় বসাইয়া দিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—খুব হবে। কত ক্ষণকারই বা।

একটু থামিয়া যদু হাসিয়া বলিল—বাবা, বাঁচ্‌লাম।

—কি হ'ল?

—আজ্ঞে ভাব্‌তাম, শুধু বুঝি আমাদেরই গরুর দড়ি চুরি যায়। দেখ্‌ছি, আপনারও…

বাধা দিয়া মিত্র মহাশয় বলিলেন—আর বলিস্‌ নে, যদু। দড়ি চুরি ক'রে ক'রে ভুষ্টি-নাশ ক'রে দিলে। গোয়ালে দড়ি ফেলে রাখার উপায় নেই। কিন্তু যে দিন চোখে পড়বে…

—আর চোখে পড়েছে! শালা-শালীরা এমন হাত-সাফাই যে এত তক্কে-তক্কে থেকেও ধর্‌তে পার্‌লাম না। শুধু কি দড়ি মশায়? খড়ের পালা থেকে নিত্যি দু' আঁটি চার আঁটি খড় চুরি হয়ই। কি করি বলুন তো?

বলিতে পারিলে তো মিত্র মহাশয় নিজেই সে পন্থা অবলম্বন করিতেন। খড় কি আর তাঁহারই চুরি যায় না? তথাপি তিনি কি যেন একটা বলিতে যাইতে-ছিলেন। কিন্তু সে কথা আর বলা হইল না। গাড়ু হাতে করিয়া নন্দকুমার বাহিরে আসিলেন। তখন সকাল হইয়া গিয়াছে।

নন্দকুমারের আবির্ভাবে মিত্র মহাশয় যেন বিব্রত হইয়া উঠিলেন। তাড়াতাড়ি যদুকে ডাকিয়া বলিলেন—নে রে বাপু, তুই কাট্‌ছিলি, কাট। আমার আজকাল আর হাত সরে না।

বলিয়া কুকার্য্যপরায়ণ ছোট ছেলে যেমন আবদারের ভঙ্গীতে হাসে তেমনি করিয়া হাসিলেন।

যদু ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারিল না। নন্দকুমারকে সম্বোধন করিয়া কহিল—কি বাবা, ভাল তো সব?

নন্দকুমার উদ্ধত নয়, অবিনয়ীও নয়। কিন্তু সে ছেলে বেলা হইতেই স্বল্পভাষী। চলিয়া যাইতে যাইতে শুধু একবার ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—হ্যাঁ, ভাল।

নন্দকুমার চলিয়া গেলে মিত্র মহাশয় পাটের গোছা খুলিতে খুলিতে বলিলেন—ব্যাটার বাপ হওয়া যে কত ঝঞ্ঝাট সে তুই বুঝবি নে, যদু। কাল থেকে যে কী ভয়ে-ভয়ে আছি সে আমিই জানি। দড়ি কাট্‌তে পাব না, গোয়াল পরিষ্কার করতে পাব না, পাঁচীল কোথাও ভেঙ্গে গেলে নিজে যে দু'পাট মাটি চাপিয়ে দোব তার উপায় নেই। তুই না হয় বাবাকে সিংহাসনে বসিয়ে রাখ্‌তে চাস্‌, কিন্তু বাবার দিন কাটে কেমন ক'রে বল্‌ তো?

পুত্রের উদ্দেশে এই কয়টি কথা বলিয়া মিত্র মহাশয় যদুর মুখ পানে চাহিয়া হাসিলেন। সে হাসি বিষাদের কি তৃপ্তির, তাহা বোঝা গেল না।

পাটের গোছা ঘরের ভিতর ভাল করিয়া সামলাইয়া রাখিয়া আসিয়া মিত্র মহাশয় তাঁহার দড়ির মোড়াটির

উপর ভাল করিয়া বসিলেন। এবং যদুকে সম্বোধন করিয়া পুত্রের উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন—

—চিরটা কাল তুই বাইরে-বাইরে কাটালি, পাড়া-গায়ের হাল তো জানিস্ নে। পাটের দড়ি যদি কাউকে কাট্‌তে দোব, বেমালুম তার থেকে দু'গুছি সরিয়ে ফেলবে। জমির ধান ভাগীদার জমি থেকেই সরিয়ে ফেলে। নিজে না দেখ্‌লে চলে? মাইনে দিয়ে রাখাল রেখে তার হাতে গরু দিয়ে বিশ্বাস নেই। নিজের হাতে যেদিন খেতে দোব না, সেইদিনই দেখ্‌ব তাদের পেট প'ড়ে আছে। আমার কি ব'সে থাক্‌লে চলে? ওরে, নিমগাছটা থেকে দাঁতনের জন্যে একটা ডাল পেড়ে দে' তো।

লোকটা গাছে উঠিল। কিন্তু যদু, মিত্র মহাশয়ের দন্তহীন মুখের দিকে চাহিল।

মিত্র মহাশয় হাসিয়া বলিলেন—আমার জন্যে নয় রে, নন্দ'র জন্যে। ছেলেটা নিমের দাঁতন কর্‌তে বড় ভালবাসে। সেখানে পয়সা দিয়েও এমনটি তো পায় না!

যদু উঠিতেছিল। কিন্তু মিত্র মহাশয় তাহাকে বসাইয়া বলিলেন—আরে বোস্ বোস্। একবার তামাক খা দেখি।

যদু তামাক সাজিতে সাজিতে বলিল—একবার বাগদী পাড়ায় যেতে হবে মুনিষ দেখতে।

মিত্র তাড়াতাড়ি বলিলেন—ভালই হ'ল। বাপু, জন কয়েক জেলে ডেকে দিবি তো। দিদিমণিদের দিই ক'দিন মাছ খাইয়ে। বরফ-দেওয়া মাছই তো খায়। একবার টাট্‌কা মাছের স্বাদটা দেখুক। কি বলিস্?

বলিয়া মিত্র মহাশয় হা-হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

—আর একটি আজব চীজ আমার দিদিমণিকে আর দাদু ভাইকে খাওয়াব। দেখি, বুড়ী কেমন চিন্‌তে পারে!

বলিয়া মিত্র মহাশয় লঘু-কৌতুকভরে হাসিলেন।

—বাঁশের কোঁড়ার তরকারী। খেয়েছিস্ কখনও? খাসনি? আচ্ছা, তোরও আজকে নেমন্তন্ন রইল। তোর বৌ-ঠাকরুণের হাতের রান্না, খেলে আর ভুল্‌তে পার্‌বি নে।

যদু সকাল বেলাতেই একটি ভাল সওদা করিয়া পরিতৃপ্তির সঙ্গে হাসিল।

মিত্র মহাশয় বলিতে লাগিলেন—সেখানে না পায় খাঁটি দুধ, না পায় কিছু। শুধু রং-বেরঙের পোষাক প'রে আর হরলিক-না-কি খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে ওঠে। ছেলে মেয়ে দুটোর চেহারা দেখ্‌লে তোর চোখে জল আস্‌বে। আমার ঘরে দুধ দই খাবার লোক নেই, আর সেখানে বাছারা দুধের অভাবে শুকোচ্ছে।

শিশু দুইটি সত্যই বড় রুগ্ন। দিদিমণির বয়স বছর ছয়েক। ক্রমেই লম্বা হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু শরীরে মাংস কোথাও নাই। ধারালো ইস্পাতের মত চক্‌-চকে রং। হলুদের আভামাত্র নাই। বড় বড় ড্যাব্‌ডেবে চোখ। তাহাতেও রক্তের কণামাত্র নাই। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল।

দিদিমণি কাছে আসিয়া ডাকিল,—দাদু ভাই!

অনেক দিন পরে দেখা। বেচারা লজ্জায় চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিতেছে না। দিদিমণির কথা বড় মিষ্ট। মিত্র মহাশয় শশব্যস্তে তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কোলে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার দুই উরুর উপর ছোট্ট দু'খানি পা তুলিয়া দিয়া দিদিমণি যেন আনন্দে এলাইয়া পড়িল। ঠিক সেই সময়ে নন্দকুমার গাড়ু হাতে ফিরিয়া আসিলেন। এবং কন্যার এই প্রকার অশিষ্টতা লক্ষ্য করিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—খুকু, পা নামিয়ে বোসো।

খুকু ভয়ে ভয়ে পা নামাইয়া বসিল।

—আমার দাদু-ভাইকে দেখ্‌ছি নে যে! সে কোথায়?

নন্দকুমার তখন ভিতরে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু খুকুর তথাপি ভয় যায় নাই। চুপি চুপি অস্ফুটস্বরে বলিল—তার যে জ্বর দাদু ভাই।

তারপর বুড়ী মেয়ে ঠোঁটের এবং চোখের বহুবিধ ভঙ্গী করিয়া বলিতে লাগিল—খোকাটা ভারী রোগা, দাদু-ভাই। প্রায়ই ওর জ্বর হয়। বাবা বলেন, ও বাঁচ্‌বে না।

মিত্র মহাশয় তাড়াতাড়ি জিভ্‌ কাটিয়া, শিউরিয়া

উঠিয়া বলিলেন—ছিঃ দিদিমণি, বল্‌তে নেই। ভাল হ'য়ে যাবে বৈ কি! এখানে থাক্‌লেই ভাল হ'য়ে যাবে।

একটা টিকটিকি টিক্ টিক্ করিয়া উঠিল। মিত্র মহাশয় দেওয়ালে তিনটা টোকা দিয়া আঙ্গুলটা কপালে ঠেকাইলেন।

খোকাভাইকে দেখিয়া মিত্র মহাশয়ের বুকের ভিতরটা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। সেই ছেলের এ কী রূপ! তিন বছরের ছেলে, বিছানার সঙ্গে একেবারে মিশিয়া গিয়াছে। কেবল চাদরের অন্তরালে বুকটা কামারের জাঁতার মত থাকিয়া থাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। মিত্র মহাশয়কে দেখিয়াই খোকা যেন কী রকম করিয়া উঠিল। কয়েক বার ভেদ-বমি করিয়াই সে দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে। উঠিবার শক্তি নাই। একটা কথাও কহিতে পারিতেছে না। কেবল চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে। মিত্র মহাশয়ের মনে হইল, সেই নিস্তব্ধ কক্ষে যেন একটি অতি সূক্ষ্ম, শীর্ণ অশরীরী বাণী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতেছে,—দাদু গো, বাঁচাও, বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।

মিত্র মহাশয় হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। নন্দকুমার বিরক্তভাবে তাঁহার পানে চাহিতে, তিনি মুখে কাপড় দিয়া চুপ করিলেন। কিন্তু অবরুদ্ধ যন্ত্রণায় তাঁহার চোখ ফাটিয়া দর-দর-ধারে জল পড়িতে লাগিল।

ভেদ আর বমি। এক একবার বমি করিতে ছেলের মুখ নীল হইয়া উঠিতেছে। চোখ কপালে উঠিতেছে। আশঙ্কা হইতেছে, এখনই বুঝি তাহার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইবে।

একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার দিন দুই দেখিলেন। কোন ফল পাওয়া গেল না। এলোপ্যাথিক ঔষধ মুখে দেওয়া মাত্র বমি হইয়া যায়। চিকিৎসকের পর চিকিৎসক আসেন। কিন্তু ফল কিছু হয় বলিয়া মনে হয় না। রোগীর আর কোন সাড়াশব্দ নাই। কেবল অত্যন্ত মৃদু ভাঙা গলায় মাঝে মাঝে কিসের জন্য চেঁচায়। তৃষ্ণা পাইলে পাখীর মত হাঁ করে।

মিত্র মহাশয় ঘরে বাহিরে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আর মিত্র-গৃহিণী সেই যে রোগীর শিয়রে মুখ ঢাকিয়া বসিয়াছেন, আর উঠেনও নাই, আহারও গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছে, এইবারে বুঝি সুখের সংসারে আগুন লাগিল। ছেলে-পুলে, নাতি-নাতিনী রাখিয়া যাওয়া বুঝি আর হয় না। তাঁহার হাত-পা অবশ হইয়া যেন পেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। মনে মনে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া কেবলই বলিতেছেন, মুখ রাখো ঠাকুর, মুখ রাখো। এই যে মুখ ঢাকিলাম, যদি কোন দিন মুখ রাখ, তবেই এ মুখ লোকসমাজে খুলিব, নহিলে এই শেষ। ঠাকুর, ঠাকুর, যদি কখনও কোন অপরাধ করিয়াই থাকি, এমন করিয়া তাহার তাহার শাস্তি দিও না। এমন করিয়া অতি বড় অপরাধেরও শাস্তি দিতে নাই।

নন্দকুমার কি যেন ভীষণ পরিণামের প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হইয়া গিয়াছেন। মুখে কথা নাই। স্নান করিতে ডাকিলে স্নান করিতে যান, আহারের ডাক পড়িলে আহারে বসেন। বাকী সময়টা কখনও রোগীর শিয়রে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া থাকেন, কখনও আপন মনে উঠানে পায়চারী করিতে থাকেন।

কেবল বেচারী শোভা যেন ইহাদের গোষ্ঠীর বাহিরে। দুইটি সন্তানের জননী হইলে কি হয়, তাহার বয়স নিতান্তই অল্প, কুড়ির বেশী হইবে না, এবং বুদ্ধি আরও অল্প। এতগুলি লোক যে একটি ছেলের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা যেন সে বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না। জীবনে কখনও কোন মানুষকে চোখের সম্মুখে মরিতে দেখে নাই; মৃত্যুর সম্ভাবনা তাই তাহার মনে ওঠে না। শোভা দিব্য রাঁধে বাড়ে, খাওয়ায় দাওয়ায় এবং সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর শয্যা গ্রহণ করিলেই অঘোরে ঘুমাইয়া পড়ে। ছেলের জন্য তাহার চিন্তা হয়, রোগ যন্ত্রণা দেখিয়া বুক ফাটিয়াও যায়। কিন্তু ছেলের মৃত্যুর আশঙ্কা বুকে জাগে না বলিয়া আহার-নিদ্রার কোন ব্যাঘাত হয় না।

এই নিতান্ত সরলা বধূটির পানে চাহিয়া মিত্র মহাশয়ের বুক আরও হাহাকার করিয়া ওঠে।

ছোটগিন্নী, পদ্মঠাকরুণ এবং বিনোদিনী মা'শায় (ইনি গ্রামের মহাশয়দের বাড়ীর দুহিতা। আর একজন বিনোদিনী থাকায় ইঁহাকে বিনোদিনী মা'শায় বলিয়া অভিহিত করা হয়।) পাড়ার মধ্যে মেয়ে-মহলে মুরব্বি বলিতে এই তিন জনই অবশিষ্ট আছেন। ছোট গিন্নির বয়স নব্বুই পার হইয়া গিয়াছে। কোমর বাঁকিয়া যাওয়ায় উল্‌টা "এল্ ফিগার" করিয়া হাঁটেন। তবে এখনও লাঠী আশ্রয় করিতে হয় নাই। চোখের জ্যোতিঃও বিশেষ ক্ষুন্ন হয় নাই। এতাবৎ কাল পাড়ার বিপদে আপদে সর্ব্বাগ্রে হাজির হইতেছিলেন। কিন্তু গত কয়েক বৎসর হইতে কোমরের অশক্ততার জন্য আর পাড়া বেড়াইতে পারেন না। সেই জন্য মিত্র মহাশয়ের পৌত্রের অসুখের সংবাদ যথাসময়ে পৌঁছিলেও, যথাসময়ে হাজির হইতে পারেন নাই।

এতদিন পরে তিনি খোকাকে দেখিতে আসিলেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে খোকার মুখচোখ ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া মিত্র-গৃহিণীর প্রতি চাহিলেন। আশ্চর্য্য এই যে, যাহা এতদিনের মধ্যে কাহারও চোখে পড়ে নাই, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা তাঁহার চোখে ধরা পড়িয়া গেল :

—ও কি বউ! মুখ ঢেকে ব'সেছ কেন? খোকার কি হ'য়েছে কি? মুখ খোলো, মুখ খোলো। ও কিছুই নয়,—উচ্ছিঙ্গে।

তারপরে গাঢ়কণ্ঠে কহিলেন,—আমার নীলমাধব যখন গেল, ভেবেছিলাম, এ-জীবনে মানুষকে আর মুখ দেখাব না। খাওয়া শুদ্ধ ত্যাগ ক'রেছিলাম। হায় রে! কালে-কালে পুত্রশোকও সহ্য হ'ল! ভেবেছিলাম, একটা দিনও বাঁচ্‌ব না। কিন্তু পরমায়ুটা একবার দেখ! চার কুড়ি পার ক'রেছি। আরও ক' কুড়ি বাঁচ্‌ব তাই বা কে জানে! যম হয় তো ভুলেই গেছে। নইলে মানুষও আবার এতদিন বাঁচে!

ছোটগিন্নী জোর করিয়া মিত্রজায়ার মুখের ঢাকা খুলিয়া দিয়া আবার বলিলেন,—আমি বল্‌ছি বউ, ও কিছুই নয়,—উচ্ছিঙ্গে!

মিত্র মহাশয় সবিস্ময়ে বলিলেন—উচ্ছিঙ্গে!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। থেকে থেকে বমি কর্‌ছে তো? তবেই উচ্ছিঙ্গে। পাতা-ঝরার সময় অমন হয়। কিছু না, একটি উচ্চিঙ্গে ধ'রে তাই ধুইয়ে দু' ফোঁটা জল ছেলেকে খাইয়ে দাও, দিয়ে মাদুলীর মতন ক'রে গলায় বেঁধে দাও। তিন দিনে ছেলে ভাল হ'য়ে উঠবে। জ্বর নেই, জ্বালা নেই, ও উচ্ছিঙ্গে। ডাক্তারে নাড়ী দেখে পাবে কি?

ছোট গিন্নী উঠিয়া যাইতেই নন্দকুমার পিতার চিন্তিত মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—গলায় বেঁধে দিতে হয় দিন, কিন্তু ধোয়া-জলটল খাওয়ান চল্‌বে না।

সন্ধ্যা হইলে মিত্র মহাশয় একটি হারিকেন লইয়া গোয়াল-ঘরে গেলেন। একটা কোণে গোবর স্তূপ করা ছিল। আলো দেখিয়া কতকগুলা উচ্চিঙ্গা লাফাইয়া উঠিল। মিত্র মহাশয় খপ্ করিয়া একটা উচ্চিঙ্গা হাতের মুঠায় ধরিয়া বাহিরে আসিলেন। ইচ্ছা ছিল, উচ্চিঙ্গা-ধোয়া জল ছেলেটার মুখে দু' ফোঁটা দেন। কিন্তু নন্দ-কুমারের ভয়ে তাহা পারিলেন না। শুধু একটা সুতায় বাঁধিয়া গলায় ঝুলাইয়া দিলেন।

সে রাত্রি কাটিল। কিন্তু পরদিন সকালেও কিছুমাত্র উপকার দেখা গেল না। ছোট গিন্নী তিন দিনের কথা বলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তিন দিন একটি মাত্র উচ্চিঙ্গার ভরসায় ছেলেকে ফেলিয়া রাখিতে কোন আত্মীয়েরই ভরসা হয় না।

ইত্যবসরে পদ্মপিসী আসিয়া এমন একটি ঔষধ বাৎলাইয়া গেলেন যে, মনের ঈদৃশ অবস্থাতেও নন্দকুমার মুখ টিপিয়া হাসিলেন। রোগটা উচ্ছিঙ্গে কি না তাহা পিসী সঠিক বলিতে পারিলেন না। তবে ইহা যে 'গরম' সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ নাই। এবং পাতা ঝরার সময়ে ছেলেদের এই প্রকার রোগ হয়। তাঁহার একটি ভ্রাতুষ্পুত্রের এই প্রকার যায়-যায় অবস্থা হইয়াছিল। কেবল কাল মুরগীর একটি মাত্র ডিম মাথায় প্রলেপ দেওয়ায় সারিয়া গিয়াছিল।

যাওয়ার সময় পদ্মপিসী বলিয়া গেলেন—তুমি কারও কথা শুনো না বউ, একটি কাল মুরগীর ডিম ভেঙ্গে তার হলদেটা মাথায় প্রলেপ দিয়ে দাও, কালকের মধ্যে 'গরম' কেটে যাবে।

পদ্মপিসী চলিয়া গেলেন। নন্দকুমার হাসিয়া বলিলেন —আমাদের এখানে ডাক্তারের অভাব নেই। সবাই এক একজন অবধূত ডাক্তার!

নন্দকুমার হাসিলেন বটে, কিন্তু মিত্র মহাশয়ের তখন হাসিবার অবস্থা নয়। তাঁহাকে যদি কেহ বলিত, তিনি মাথাটা নীচু করিয়া পা দুটা আকাশের দিকে তুলিয়া মধ্যাহ্ন বেলায় উঠানে ঘণ্টাকয়েক দাঁড়াইয়া থাকিলে খোকা সুস্থ হইবে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাই করিতে স্বীকৃত হইতেন।

ঘণ্টাখানেক পরেই তিনি ঠুক্ ঠুক্ করিতে করিতে মুসলমান-পাড়ায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

—বাপু, কাল মুরগীর ডিম একটি চাই। দাম যা লাগে আমি দোব, কিন্তু ডিমটি মিশ্‌কাল মুরগীর হওয়া চাই। আমার খোকা ভাই-এর মাথায় প্রলেপ দিতে হবে।

রমজান মিঞা মহাসমাদরে তাঁহাকে বাহিরে বসাইয়া ভিতর হইতে একটি ডিম আনিয়া দিল। কাল মুরগীর ডিম কি না ভগবান জানেন, কিন্তু দাম লাগিল দুই আনা।

মিত্র মহাশয়ের গলায় তুলসীর মালা। বৈষ্ণব অনেক আছে, কিন্তু তাঁহার মত গোঁড়া বৈষ্ণব ক্বচিৎ চোখে পড়ে। কিন্তু সে কথা বোধ হয় তিনি নিজেই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। নহিলে নিজে হাতে মুরগীর ডিম বহিয়া আনিতে তিনি প্রাণান্তেও পারিতেন না। শুধু বহিয়া আনা নয়, ডিমটি ভাঙ্গিয়া স্বহস্তে তিনি পৌত্রের মাথায় প্রলেপ লাগাইয়া দিলেন। একটা স্নান, কিম্বা মাথায় একবার গঙ্গাজল ছিটাইয়া লওয়ারও প্রয়োজন বোধ করিলেন না।

কিন্তু ডিমটা কাল মুরগীর নয় বলিয়াই হউক, অথবা যে কোনো কারণেই হউক, খোকার অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। রাত্রিটা কোন রকমে কাটিল বটে, কিন্তু সকালটা আর পার হইবে বলিয়া মনে হইল না। সকালে বিনোদিনী মা'শায় আসিয়া পদ্মপিসীর ঔষধের অব্যর্থতা সম্বন্ধে অনেক নজির উপস্থিত করিলেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কেন যে রোগের উপশম হইতেছে না, তাহারও কারণ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, ডিমের প্রলেপটা যেমন আছে থাক। তাহার উপরেই ছাগলের দুধের সঙ্গে জিরা মরিচ বাঁটিয়া আর একটা প্রলেপ লাগাইয়া দেওয়া হোক।

জিরামরিচ ঘরেই আছে। নূতন পুকুরের পাড়ে কতকগুলি ছাগলকেও প্রায়ই বিচরণ করিতে দেখা যায়। সময় নাই। এক একটি মুহূর্ত্ত এক একটি মণির মতো খোকা ভাই-এর পরমায়ুর মণিহার হইতে খসিয়া পড়িতেছে। যে কোন মুহূর্ত্তেই শেষ মণিটি খসিয়া পড়িতে পারে।

সময় নাই। এই বয়সে তাঁহার মত সম্মানী প্রবীণ লোকের যে মাঠে মাঠে ছাগলের পিছনে ছুটাছুটি করা অশোভন তাহা ভাবিবারও সময় নাই। জীবনের শেষ অঙ্কে আসিয়া আর বুঝি নয়নের আনন্দ, স্নেহের পুত্তলী বংশধরকে ধরিয়া রাখা চলিল না! ঘাটের কাছে আসিয়া এইবার বুঝি জীবনের তরী বাণ্‌চাল হইল!

সময় নাই! মিত্র মহাশয় উঠিলেন। বাড়ীর পিছনেই নূতন পুকুর। ও-পাড়ে সাদা-কাল কয়টি ছাগল চরিতেছে বটে। দুগ্ধবতী কি না কে জানে। মিত্র মহাশয় ছুটিলেন। তাঁহাকে ছুটিতে দেখিয়া ছাগলও ছোটে। তাঁহার কাছা খুলিয়া গিয়াছে। কাপড়ের যে অংশ কোমরের কাছে বেড় দেওয়া ছিল তাহাও পিছনে লোটাইতেছে। বহু কষ্টে একটা ছাগল যখন ধরিলেন, তখন দুগ্ধ দোহন করিতে গিয়া খেয়াল হইল দোহনের জন্য পাত্র তো আনা হয় নাই!

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়-ভাবে একবার- বাড়ীর দিকে চাহিলেন। বাড়ী দূরে নয়। পুষ্করিণীর অপর পাড়েই ওদিকের ঘাটে পাড়ারই কয়েকটি বধূ বাসন মাজিতে আসিয়া অবাক্ হইয়া তাঁহার কাণ্ড দেখিতেছে। অত দূরে নজর চলে না। কিন্তু যেই হউক, অপরিচিতাও কেহ নয়, অনাত্মীয়াও নয়। মিত্র মহাশয়ের মনে হইল, উহাদেরই ডাকিয়া একটা বাটি আনিতে বলেন।

অকস্মাৎ তাঁহার মনে হইল, তাঁহাদেরই বাড়ীতে কে যেন ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মনে হইল, কাণে যেন শুনিতে পান নাই। শুধু মনে হইল, হাঁ, কান্নাই বটে। দেখিতে দেখিতে বহু কণ্ঠের বুক-ফাটা কান্নায় আকাশ

যেন চৌচির হইয়া গেল। ঘাটে যে কয়টি বধূ এতক্ষণ তাঁহার দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়াছিল তাহারা যেন একবার কাণ খাড়া করিয়া সে চীৎকার শুনিয়াই হাতের বাসন ঘাটে ফেলিয়া তাঁহাদেরই বাড়ীর দিকে শশব্যস্তে ছুটিয়া গেল।

হাঁা, কান্নাই বটে! ছাগলটা হাতছাড়া হইয়া একদিকে পালাইয়া গেল। মিত্র মহাশয় সেইখানে উপুড় হইয়া পড়িয়া শুধু একবার বলিলেন—দাদুভাই গো!

মাঠের কয়েকজন চাষী তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বাড়ীতে লইয়া আসিল। জ্ঞান হইলে, তিনি একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। মৃত পৌত্রের দেহ বাহিরে তুলসীতলায় নামানো হইয়াছে। আর তাহাকেই ঘিরিয়া সমস্ত পরিজন আছাড়ি-পিছাড়ি করিতেছে। মিত্র মহাশয় নিঃশব্দে বাহিরে আসিয়া তাঁহার চিরাভ্যস্ত আসনটিতে আসিয়া বসিলেন। অভ্যাসবশে উর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলেন, পাটের গোছা খুঁটিতে বাঁধা নাই। সম্মুখে ঠাকুরঘরে দৃষ্টি পড়িতে দেখা গেল, হনুমানে লাফ দিয়া দিয়া চালের খানিকটা স্থান গর্ত্ত করিয়া দিয়াছে। আপন মনেই মিত্র মহাশয় বলিলেন, কাল ওখানটা মেরামত করিতে হইবে।

কবে ?

শ্রীইন্দুবালা রায়

সেই যে পরিচয় তোমার সনে মোর
তাহারি স্মৃতি আসি ঝরায় আঁখি-লোর!
বেদনা বাজে বুকে জানি না কেন হেন!
বেপথু হিয়াখানি বাঁধিতে নারি যেন।
কি যেন ধরি-ধরি—পারি না একি হ'ল!
এমন ক'রে দিন কেমনে কাটে বল?
সেদিন হোতে মোর সবি যে তোমাময়!
তোমার সাথে ওগো, সেই যে পরিচয়!

এ মোর পঙ্কিল কামনা-সরোবরে
ফুটিল উৎপল তোমারি রবি করে!
মুগ্ধ মন মম আমি যে দিশেহারা!
উজলি এ আঁধার কে দিল শশী-তারা?
তাহারি আলোকেতে বসিয়া বাতায়নে
মৌন মুখে সেই—সে কথা ভাবি মনে!

তখনো রাঙা রবি বসে নি ছায়াপাটে,
আসে নি বধূগুলি জল সে নিতে ঘাটে!
রঙীন ওড়নাতে ঝুলায়ে রাঙা ফুল
আসে নি দিক্‌বালা দুলায়ে লাল দুল!
তখনি—তখনি গো, সেই সে বৈকালে—
সে দেখা ভুলিব না কখনো কোনোকালে!
সেই যে পরিচয় তোমার সনে মোর
তাহারি স্মৃতি আসি ঝরায় আঁখি-লোর।

মাদল বাজে আজি আকাশে গুরু-গুরু
তোমারি তরে হিয়া হয় যে উড়ু উড়ু!
চপল অপ্সরী মেঘের ফাঁকে হাসে
আমি যে ব'সে আছি তোমারি শুধু আশে!
নীরব স্বর-হীন প্রাণের তারে তারে
তোমারি স্মৃতি আসি আজি যে ঝঙ্কারে!
গুমরি ওঠে বুক গভীর হাহা-রবে
আবার কবে সে-ই—ওগো, সে দেখা হবে?

বৰ্ত্তমান হুগলী

(৩)

কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় এম্‌, এল, সি

বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ। বাঙ্গালী ভদ্রলোকের দুর্নাম আছে—তাঁহারা নিরক্ষর কৃষকদের হস্তে চাষ-বাস ছাড়িয়া দিয়া চাকুরীর জন্য লালায়িত। কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নহে। অতীব সুখের বিষয়, হুগলী জেলার কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক এই দুর্নাম ঘুচাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। চুঁচড়ায় সরকারের একটী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র
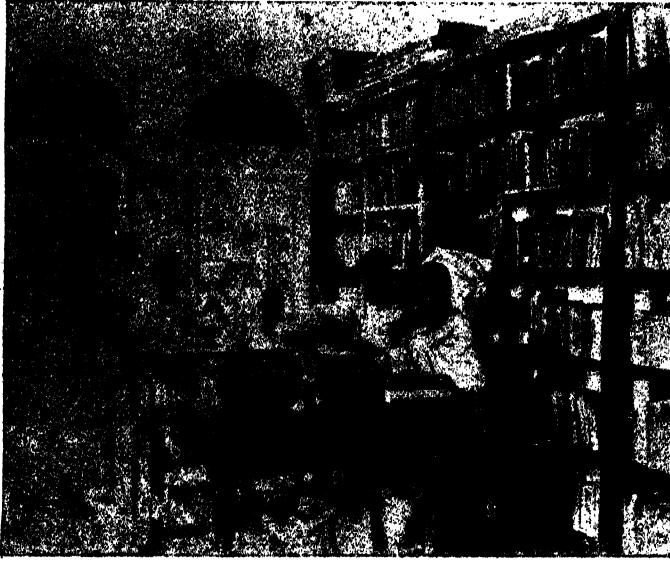
প্রবর্ত্তক-পাঠাগার—চন্দননগর

আছে, তাহাতে কৃষিসংক্রান্ত নানারূপ পরীক্ষা হইয়া থাকে। এই সব সরকারী কৃষিক্ষেত্রে ব্যয় অত্যধিক হইয়া থাকে, উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য হিসাবে লোকসান দাঁড়াইয়া যায়; সে জন্য উহা জনপ্রিয় হইতে পারিতেছে না। লোকে লাভ-লোকসান খতাইয়া যখন দেখে, লোকসানের তঙ্কা বাড়িয়া যাইতেছে, তখন আর এদিকে ঘেঁষিতে চায় না। বে-সরকারী কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে কয়েকটীর উল্লেখ করিতেছি। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ স্যারদাচরণ মিত্রের প্রতিষ্ঠিত পানিসোয়ালা গ্রামের কৃষিক্ষেত্র। এখন তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুত বসন্তকুমার মিত্র মহাশয় যোগ্যতার সহিত এই ক্ষেত্র পরিচালনা করিয়া থাকেন। ইটেচনা গ্রামে ৺রায় বিজয়নারায়ণ কুণ্ডু বাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত একটী কৃষি-ক্ষেত্র আছে। মাখালপুরের জমীদার শ্রীযুত মনোমোহন সিংহরায়-প্রতিষ্ঠিত কৃষিক্ষেত্র হুগলী জেলার মধ্যে আদর্শ-স্থানীয়। তারকেশ্বর ষ্টেটের কৃষিক্ষেত্র, ৺নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত বাকুলিয়া ক্ষেত্র, রুক্মিণীতে দুটী কৃষিক্ষেত্র—একটী এককড়ি মুখোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত আর একটী সত্যদয়াল বসুর প্রতিষ্ঠিত। সুরেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের খামার-গাছী কৃষিক্ষেত্র, সতীশচন্দ্র ঘোষের খাদনী কৃষিক্ষেত্র এবং হরিপালের জমীদার শ্রীযুত জানকীনাথ সিংহ রায়ের প্রতিষ্ঠিত হরিপাল এবং ভাণ্ডারহাটী কৃষিক্ষেত্র এবং সপ্তগ্রামে শ্রীযুত অমূল্যধন আঢ্যের কৃষিক্ষেত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সব কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে মাখালপুরের মনোমোহনবাবুর কৃষিক্ষেত্র বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য; তাই একটু বিশদভাবে তাহার পরিচয় দিতেছি। মাখালপুর হাওড়া বৰ্দ্ধমান কর্ড রেলের বেলমুড়ী ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত। গত বর্ষে এই কৃষিক্ষেত্রের জমীর পরিমাণ ছিল কেবলমাত্র ৬০ বিঘা, তাহার মধ্যে ১ বিঘা ১৫ কাঠায় পাট, ১৫ কাঠায় চার্ণক আউস ধান, ১২ কাঠায় নৈনিতাল ও তিন কাঠায় বঙ্গঝাড়া দেশী আলু, ৪২ বিঘা ১০ কাঠায় আমন ধান রোপণ করা হয়। আমন ধান বপন করা হয়—১২ রকমের চার্ণক, দাদ-খানি, বেনাফুল, মহিশলোট, কাটারিভোগ, রাঁধুনি-পাগল

মিহিনাগ্‌রা, ঝিঙ্গে-শাল, ২নং চুঁচুড়া, শরৎ-মৌল, কনক-চূড়া ও তিলককচুরী। ইক্ষু দেওয়া হয় ১ বিঘা ৭ কাঠা জমীতে, মুসুর কলাই ও সরিষা দেওয়া হয় এক বিঘায়। তরিতরকারীর মধ্যে বেগুন পাঁচ কাঠায় আর বাকী জমীতে কাবুলি ও বিলাতী মটর, বিলাতি বেগুন, মূলা, বীট, গাজোড়, ফুলকপি ও বাঁধাকপি দেওয়া হয়। তা' ছাড়া ফলের চাষও হয়—সিঙ্গাপুরী, চীনা ও সিংহলী আনারস এবং নানাবিধ পেঁপে ও কলাগাছ বপন করা হয়। আর পশু-খাদ্য জোয়ার ও নেপিয়ার ঘাসের চাষ দেওয়া হয়। একবিঘা পনের কাঠা পাটক্ষেত্রে ফসল উৎপন্ন হয় ১১॥০ মণ অর্থাৎ প্রতি বিঘায় ছয় মন বাইশ সের। তাহা ৩॥০ দরে বিক্রীত হয় ৩৯৲ টাকায়—খরচা পড়ে ৩২।১০, মুনফা থাকে ৬॥৶১০ অর্থাৎ প্রতি বিঘায় ৩৸৴১০। নয় কাঠা জমীতে আউস ধান উৎপন্ন হয় তেত্রিশ সের মূল্য ১।০ মণ হিসাবে ১৶১০ খড় আড়াই পণ ৩৲ হিঃ ।৶১০ মোট আয় হয় ১॥০; কিন্তু খরচা পড়ে ৩৵৫, লোকসান দাঁড়ায় ১॥৵১৫। বার কাঠায় নৈনিতাল আলু আটাশ মণ জন্মে, ২৲ হিসাবে তাহার মূল্য হয় ৫৬৲; তিন কাঠায় দেশী আলু জন্মে ৭ মণ, ১৸০ হিসাবে তাহার মূল্য হয় ১২।০; আলুর আয় মোট ৬৮।০, ব্যয় হয় ৪৫৴০ মুনফা থাকে ২৩৵০। গড়ে প্রতি বিঘায় ৪৭৴০ আলু জন্মিয়াছিল। বেয়াল্লিশ বিঘা দশ কাঠা জমীতে আমন ধান জন্মে ২৫৫৴০, তাহার মূল্য হয় ৪১৭৵১০ আর খড় জন্মে ৩০ কাহন ৪৲ হিসাবে তাহার মূল্য ১২০৲। মোট আয় হয় ৫৩৭৵১০ আর ব্যয় হয় ২১৫৴১০, মুনফা থাকে ৩২২৴০। তিন রকম ইক্ষুর চাষ হয় ১ বিঘা ৭ কাঠায় ইক্ষু হয় ৩১৪৴০, তাহা হইতে ইক্ষু-রস পাওয়া যায় ১৬৫॥০ মণ আর গুড় জন্মে ২৮॥৮ অর্থাৎ গড়ে বিঘা প্রতি ২০৴০। ৪৲ হিঃ গুড়ের মূল্য জমা হয় ১১৪॥০ আর বপন জন্য ১৬,৯৮০ খণ্ড ইক্ষু বিক্রয় হয় ৭৩৸৫, মোট আয় ১৮৮।৫ ব্যয় ১১৪।৵০ মুনফা থাকে ৭৩৸৵৫। এক বিঘায় মুসুর, কলাই ও সরিষা ক্ষেত্রে আয় হয় ৭৴০, ব্যয় হয় ৬।০, মুনফা থাকে ৸৴০। পাঁচ কাঠা বেগুনক্ষেত্রে বেগুন হয় ৭৴০, ২॥০ হিঃ মূল্য হয় ১৭॥০, ব্যয় হয় ১১॥৴০, মুনফা থাকে ৬৲। মটর, বিলাতি বেগুন, কপি ইত্যাদির এবং ফলেরও কোন হিসাব রাখা হয় নাই—মালিক গৃহে ব্যবহার জন্য তাহা গ্রহণ করেন। মোট ৪৮৴৭ কাঠা জমীর চাষের হিসাব রাখা হয় আউসের লোকসান বাদ দিয়া মোট মুনফা দাঁড়ায় ৪৩১৲। মনোমোহনবাবুর ক্ষেত্রে যে মজুর লাগে—তাহাদের মজুরী চাষের জন্য প্রাতে ।৴০ হিসাবে ও বৈকাল ৶০ হিসাবে দিয়াছেন। আর সব কাজে জনপ্রতি দৈনিক মজুরী দিয়াছেন ।৴০ হিসাবে। মনোমোহনবাবু প্রতি তারিখে প্রত্যেক চাষের যেরূপ পৃথক্ হিসাব বিশদভাবে রাখিয়াছেন তাহা বস্তুতঃই প্রশংসার যোগ্য। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কি কি সার দিয়াছেন তাহারও বিবরণ তিনি দিয়াছেন। মনোমোহনব
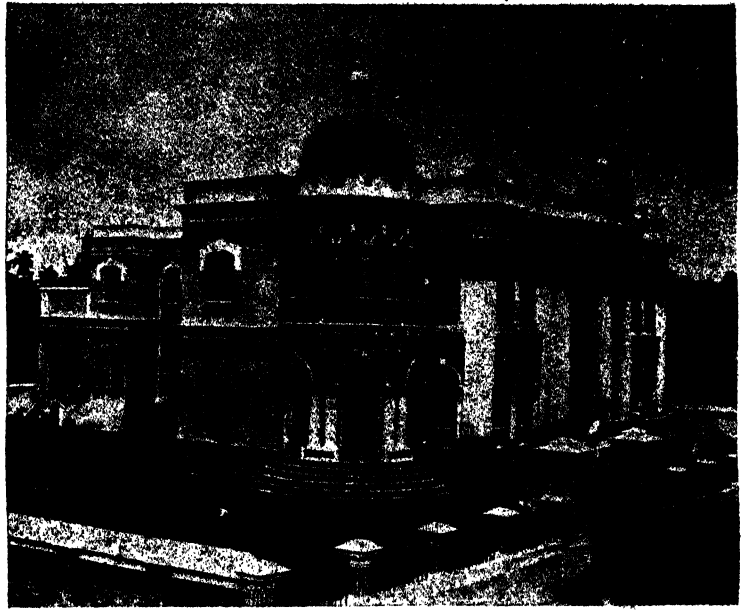
নৃত্যগোপাল স্মৃতি-মন্দির—চন্দননগর

হুগলীজেলা কৃষি-সমিতির সহকারী সভাপতিরূপে অধিষ্ঠিত আছেন। লিংলিথো কমিশনে তিনি কৃষি সম্বন্ধে গবেষণা-পূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। মনোমোহনবাবুর প্রদত্ত হিসাব হইতে দেখা যায়, কেবল চাষের উপর নির্ভর অপেক্ষা তাহার সহিত শ্রমশিল্পেরও ব্যবস্থা থাকিলে সাধারণতঃ লোকে অবস্থা সচ্ছল করিয়া লইতে পারে।

হুগলী জেলায় পূর্ব্বে নানাবিধ কুটীর-শিল্প ছিল। কলের প্রতিযোগিতায় অনেক শিল্পই লোপ পাইয়াছে; যাহা আছে তাহাও বেশ ভালরূপ চলিতেছে না। বস্ত্রবয়ন শিল্প বিলাতের সহিত প্রতিযোগিতায় একেবারে নষ্ট হইতে হইতে বসিয়াছিল; স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে স্রোতঃ অনুকূল পথেই চলিয়াছে। সদর মহকুমায় ধনিয়াখালি, তাঁতিবাজার ও খন্যান; শ্রীরামপুর মহকুমায় শ্রীরামপুর, হরিপাল, দ্বারহাট্টা, কৈকালা, জয়নগর, খরসারাই, আঁতপুর এবং রাজবলহাট; এবং আরামবাগ মহকুমায়—কল্মে, খানাকুল, কৃষ্ণনগর এবং মায়াপুর এবং ফরাসী চন্দননগরে বস্ত্রবয়নশিল্পের প্রসিদ্ধি এখনও কতক কতক বজায় আছে। শ্রীরামপুরের ফ্লাই শাট্‌ল তাঁত এখন বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। বিলাতে জন কে (John Kay) সাহেব ইহা প্রথম আবিষ্কার করেন। হুগলী জেলার মধ্যে চন্দননগরে ইহার প্রথম আমদানী হয়, চন্দননগর হইতে শ্রীরামপুরে ইহা প্রবর্ত্তিত হয়। গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেবের চেষ্টায় এই তাঁত জনপ্রিয় হয়। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে উন্নত প্রণালীতে তাঁতের কাজ শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীরামপুর উইভিং স্কুল স্থাপিত হয়।

কোন্নগর সাধারণ পাঠাগার

কোম্পানীর আমলে রেশম বয়ন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসা ছিল। কোম্পানী রেশম বয়ন ত্যাগ করার পর, রবার্ট ওয়াটসন কোম্পানী কিছুদিন রেশমের ব্যবসা চালাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাদের উদ্যম বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। দামোদরের তীরে তুঁত গাছের আধিক্য ছিল—দামোদরের বন্যায় তুঁত গাছ নষ্ট হওয়ায় ব্যবসা মন্দা পড়িয়া যায়—শ্রীরামপুর ও বালী-দেওয়ানগঞ্জ ভিন্ন আর সব স্থানের রেশম শিল্প ক্রমে লুপ্ত হয়। স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে তসরের বস্ত্রবয়ন ব্যবসা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। দামোদর, রূপনারায়ণ এবং দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে যে সব তুঁতগাছ আছে, তাহাতে গুটী পোকা জন্মে, আবার ছোট নাগপুর হইতে আমদানীও হয়; সেই গুটীর আঁশ হইতে তসর সূতা বাহির করা হয়। লেখক গত বর্ষে যখন বদনগঞ্জে যান, তখন সেখানকার মেয়েদের গুটী হইতে সূতা বাহির করিতে এবং পুরুষদের তসর বুনিতে দেখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি বদনগঞ্জে চণ্ডীচরণ দালালের নিকট হইতে যে তসর বস্ত্র ও তসরের জামার কাপড় ক্রয় করিয়াছিলেন তাহা এখনও ব্যবহার করিতেছেন। আরামবাগ মহকুমার বালী-দেওয়ানগঞ্জ, উদয়রাজপুর এবং অন্যান্য গ্রামে রেশম, তসর ও তুলা

মিশ্রিত সূতায় একরূপ বস্ত্র তৈয়ার হইয়া থাকে তাহার নাম "রঙ্গিলা"। পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এই বস্ত্রের চাহিদা বেশী। মোগল-রাজত্বকাল হইতে এই রঙ্গিলা বস্ত্র ব্যবসা চলিয়া আসিতেছে। পাট এবং শণ হইতে খনশিনি, নবগ্রাম, চাতরা, শঙ্করপুর, বেলকুলি ও উত্তরপাড়ায় দড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে। কালুঘাটে চট তৈয়ার হয়।

এলুমিনিয়ামের বাসন আমদানীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পিতল কাঁসার বাসন এই জেলায় নানা স্থানে বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হইত। জার্ম্মাণী হইতে পিতলের পাতের আমদানী বেশী পরিমাণে হইয়া থাকে; তাহাতেই এই সব বাসন তৈয়ার হইত। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময়ে পিতলের পাতের আমদানী বন্ধ হওয়ায় এই কারবারের বহু ক্ষতি হইয়াছে; তবে একেবারে লোপ পায় নাই। হুগলী সদর মহকুমার মধ্যে বাঁশবেড়িয়া, খামারপাড়া, বৈঁচী, মরারহাট, শ্রীরামপুর মহকুমায় জনাই এবং চাঁপাডাঙ্গা এবং আরামবাগ মহকুমার মধ্যে গোঘাট থানায় বালী ও কুমারগঞ্জে এখনও পিতল কাঁশার দ্রব্য তৈয়ার হইয়া থাকে। বাঁশবেড়িয়া রেকাবী, বোকনো, গাড়ু এবং খেলনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বোকনোর বেশী রকম চাহিদা ছিল সুমাত্রা, যবদ্বীপ এবং তাহার নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জে। এখন খেলনার চাহিদা চলিয়াছে। ঘোলসাঁড়া লোটা, জনাই মৎস্য ধরিবার রীল এবং চাঁপাডাঙ্গা পানদান তৈয়ারীর জন্য প্রসিদ্ধ।

হুগলী জেলায় ইক্ষু গুড়, খেজুর গুড় ও দেলো চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। তালের গুড় ও তালের মিছরীও প্রস্তুত হইয়া থাকে। সম্প্রতি শ্রীরামপুর বল্লভপুরে স্থানীয় লোকের চেষ্টায় একটী ছোট চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে। পীয়ালা, মহানাদ, কোলশা, সাঁতগাঁ ও দেওয়ানগঞ্জে দেশী কাগজ প্রস্তুত হইত; এখন কলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কাগজ তৈয়ারী একরূপ বন্ধই হইয়াছে। কাগজ তৈয়ার করিতে পারে; এরূপ ২।৪ জন লোক এখনও জীবিত আছে; আবশ্যক হইলে তাহারাও কাগজ তৈয়ারী করিয়া দিতে পারে, তবে খরচা বেশী পড়ে বলিয়া চাহিদা মোটেই নাই। কাঠের আসবাব তৈয়ারীর জন্য কেওটা, চুঁচুড়া, চন্দননগর প্রসিদ্ধ ছিল। এখন চন্দননগরের প্রসিদ্ধি বজায় আছে। চন্দননগরে "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের" আসবাবের একটী বড় কারখানা আছে। তাঁহাদের বহুবাজারের দোকানে নানাবিধ নিত্য ব্যবহার্য্য ভাল ভাল আসবাব কিনিতে পাওয়া যায়। গোঘাট-থানায় কামারপুকুর, শ্রীপুর, বদনগঞ্জ এবং কয়াপাত আবলুষ কাঠের হুকার নলিচা প্রস্তুত জন্য প্রসিদ্ধ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থান কামারপুকুর তীর্থ দর্শনে গিয়া লেখক সেখানকার আবলুষ কাঠে সুদৃশ্য নলিচা তৈয়ার করিতে দেখিয়া আসিয়াছেন। বাবনান, ধনিয়াখালি ও চণ্ডীতলায় মুসলমান মহিলাদের প্রস্তুত চিকণের কাজো আমেরিকা,
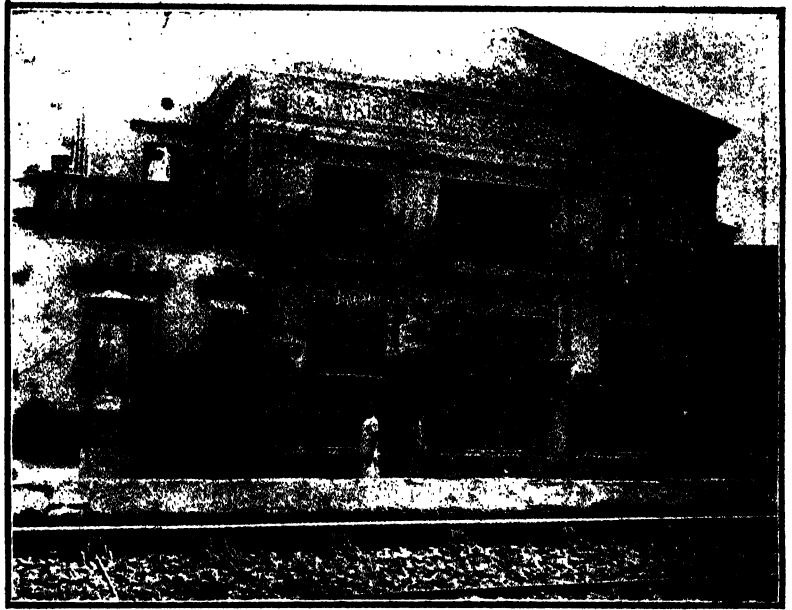
শ্রীরামপুর সাধারণ পাঠাগার (রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী হল)

দক্ষিণ আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় এখনও খুব চাহিদা আছে। মায়াপুর, বন্দীপুর ও মগরায় নানাবিধ সুদৃশ্য ঝুড়ি ও চুপড়ী প্রস্তত হয়। শ্রীরামপুর, বন্দীপুর, বোরাই এবং আরামবাগ মহকুমার কয়েক স্থানে মাদুর এবং নানারকম বেতের দ্রব্য তৈয়ার হইয়া থাকে। মৃৎ-শিল্পের জন্য সুগন্ধ্যা এবং বদনগঞ্জ প্রসিদ্ধ। রং-ছাপা কাজে শ্রীরামপুর প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, এখানকার ছাপা রুমালো রেঙ্গুন, মান্দ্রাজ এবং মুরিশাশ দ্বীপে চাহিদা আছে। উত্তরপাড়ায় চীনামাটীর বাসন প্রস্তত হইয়া থাকে। হুগলী জেলা-বোর্ডে হুগলী জেলার শিল্পদ্রব্যের নমুনা-সংরক্ষণের জন্য একটী শ্রমশিল্প-মিউজিয়াম গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে।
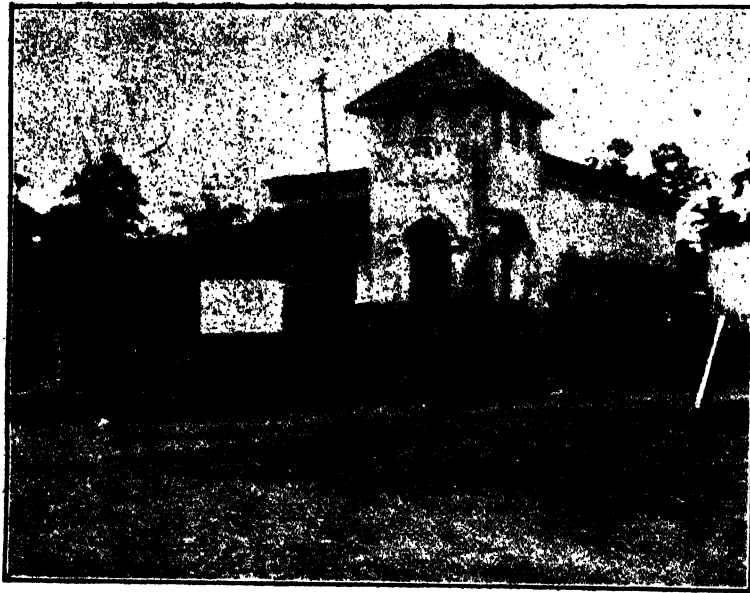
মাহেশ সাধারণ পাঠাগার

ত্রিবেণী হইতে আরম্ভ করিয়া কোতরং পর্য্যন্ত গঙ্গার ধারে অনেক স্থলে পগ্ মিলের ইট ও টালী প্রস্তত হইয়া থাকে। সুরকী মিলও অনেকগুলি হইয়াছে। গঙ্গার ধারে পাটের কলের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। হুগলী সদরে বাঁশবেড়িয়া গ্যাঞ্জেস ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোম্পানী (Ganges Manufacturing Co. Ltd.) (১৯২২), খামারপাড়ায় আমেরিকান ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর (১৯২১) (American Manufacturing Co.) পাটের কল আছে। শ্রীরামপুর মহকুমায় পাটের কলের সংখ্যা সব চেয়ে বেশী। রিষড়ায় ওয়েলিংটান জুট মিল সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন পাটের কল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে ইণ্ডিয়া জুট মিল স্থাপিত হয়, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে চাঁপদানী পাট কল, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ভিক্টোরিয়া এবং হেষ্টিংস মিল স্থাপিত হয়। গরুটী য়্যাংগাস (Angus Jute mill) মিল, তেলিনী-পাড়ায় ভদ্রেশ্বর প্রভৃতি স্থানে গঙ্গার ধারে ধারে সব পাটের কল স্থাপিত হইয়াছে। এই সব পাটের কল ইউরোপীয় কোম্পানীর প্রতিষ্ঠিত—বাঙ্গালীর একটীও নহে।

শ্রীরামপুর মহকুমায় দেশীয় লোকের স্থাপিত কয়েকটী কাপড়ের কল আছে; তন্মধ্যে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। মাহেশের রামপুরিয়া কটন মিলের মালিক এখন একজন মাড়োয়ারী। তাহার পাশে হুগলী কটন মিল ও বঙ্গেশ্বরী কটন মিল সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে। কোন্নগরে শ্রীদুর্গা কটন মিল নামে একটী কাপড়ের কল নির্ম্মিত হইতেছে। কোন্নগরে ডি, ওয়ালডি কোম্পানীর ভিক্টোরিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কসের Acid, নানারূপ লবণ, Sulphate, সার ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তত হইয়া থাকে। সম্প্রতি জেকোস্লোভাকিয়ার বাটা কোম্পানী কোন্নগরে জুতা তৈয়ারীর একটা বড় কারখানা তৈয়ার করিয়াছেন।

হুগলী জেলায় দুইটী কো-অপারেটিভ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক আছে; একটী হুগলী সদরে, তাহাতে ৭,৭৮,২৩৭৲ টাকা খাটিতেছে। এই ব্যাঙ্কের সাফল্য ইহার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত জগদীশপ্রসাদ বসু এবং সহকারী সভাপতি শ্রীযুত যোগীন্দ্রলাল চৌধুরী ও শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কার্য্যকুশলতার পরিচায়ক। আরামবাগ মহকুমার সেণ্ট্রাল

ব্যাঙ্কটীতে ৭৫,০৫২৲ টাকা খাটিতেছে। হুগলী জেলার কৃষি-সমবায়-সমিতির সংখ্যা ২৫৯; তন্মধ্যে হুগলী সদর মহকুমায় ১১৭টী, আরামবাগ ৪০ ও শ্রীরামপুরে ৪৮টী। হুগলী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সহিত ২২৮টী এবং আরামবাগ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সহিত ৩৭টী সমবায় সমিতি সংযুক্ত আছে। ২৫৯টী কৃষি-সমবায় সমিতির সভ্য-সংখ্যা ৭,৭৫২, তাহাতে গত বর্ষে কর্জ্জ-দাদন হইয়াছিল ১,৭৬,৫৬৬৲, আদায় হইয়াছিল ১,৩৫,২৮০৲, কারবারে খাটান হইয়াছিল ৬,৮৯,০৬৫৲, লাভ হইয়াছিল ২১,৪৮৩৲। রিজার্ভ-ফণ্ডে ছিল ৭১,২৮৭৲; ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছিল শতকরা ৬।০ হইতে ৯৮০। আমানতের সুদের হার হইল ৮।।০ হইতে ১০।।০ আর কর্জ্জ দাদনের সুদের হার ছিল ১২।।০ হইতে ১৫৮০। হুগলী জেলায় লিমিটেড ক্রেডিট ব্যাঙ্ক ২১টী, তাহাদের সভ্য-সংখ্যা ১২,২৫৮। গত বর্ষে ব্যক্তিগত কর্জ্জ দাদনের পরিমাণ ছিল—৪,২৬,৫৮৬৲। ব্যাঙ্ক এবং সোসাইটীতে কর্জ্জ দাদন ৪০২,০৫৪৲ টাকা, আদায় হইয়াছিল ব্যক্তিগত হিসাবে ৪,৭৭,৬৭১৲। ব্যাঙ্ক এবং সোসাইটী হইতে আদায় হয় ৭,০৩,৬৯৫৲। মূলধন ছিল ৩,০৩,৫৬২৲ টাকা। রিজার্ভ ফণ্ড ১,৮৯,৬৩৭৲। সমগ্র কারবারে খাটান হইয়াছিল ১৯,৭৭,৯৭৮৲ টাকা। লাভ হইয়াছিল ৯২,৯০১৲। ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছিল ৫৲ টাকা হইতে ১২।।০; আমানতি সুদের হার ২।।০ হইতে ১০।।০। কর্জ্জদাদন ও সুদের হার ছিল ৮৲ হইতে ১৫৲। সমবায়-স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত সমিতির (Antimalarial and public health) ১১৭, সভ্য-সংখ্যা ২,৩৮৭; সমবায়-রিলিফ-সমিতির সংখ্যা ১, সভ্য-সংখ্যা ৯২; সমবায়-ইলেক্‌ট্রিক-সোসাইটী সংখ্যা ১, সভ্যসংখ্যা ১৭।

জেলায় প্রায় প্রতি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামেই সমবায় সমিতি আছে, তাহাতে তেজারতির কাজই বেশী রকম হইয়া থাকে। তা' ছাড়া ক্রয় বিক্রয় ও ব্যবসার জন্যও সমিতি আছে; তন্মধ্যে তারকেশ্বর 'সমবায় সেল ও সাপ্লাই সোসাইটী'র কার্য্য উল্লেখযোগ্য। এই সমিতির ডিরেক্টরদের চেয়ারম্যান হইতেছেন সিঙ্গুর-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ সুরেন্দ্র নাথ মল্লিক সি, আই, ই মহাশয়।

স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার-কল্পে চুঁচুড়ার এড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র দত্তের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য থাকা কালে সরকার কর্ত্তৃক প্রতি জেলার সদরে মেয়েদের জন্য উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে প্রস্তাব পাশ করাইয়া লন; কিন্তু সরকার এ পর্য্যন্ত তাহা কার্য্যে পরিণত করেন নাই। গত বারে চুঁচুড়া বালিকা বাণীমন্দির নামক মেয়েদের মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। সম্প্রতি তাহা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

উত্তরপাড়া সাধারণ পাঠাগার

যত দূর সম্ভব সংক্ষেপে বর্ত্তমান কালের হুগলী জেলার পরিচয় এই প্রবন্ধে দেওয়া হইল। অবকাশের অভাবে প্রবন্ধটীর উপযোগী মালমশলা সংগৃহীত হইতে পারে নাই।

সেজন্য অনেক ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে। হুগলী জেলা জ্ঞান-চর্চ্চায় বহু পূর্ব্বকাল হইতেই প্রসিদ্ধ ছিল, বর্ত্তমানকালেও সেই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হয় নাই; তবে পূর্ব্ব স্বাস্থ্য-সম্পদ

শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র দত্ত

আর নাই। সরকারের ঔদাসীন্যে নদ-নদী খাল, বিল, জলাশয়াদি শুখাইয়া যাওয়ায় এবং বন্যা-নিরোধক কৃত্রিম বাধা-সৃষ্টি হওয়ায় সমগ্র জেলা ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের আকর হইয়াছে। অধিবাসীদের চেষ্টা ও বদান্যতায় রোগ-চিকিৎসার সুব্যবস্থা হইয়াছে বটে; কিন্তু মূলে গলদ থাকায় স্থায়ী উপকার কিছু হইতেছে না। পূর্ব্ব-স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিতে হইলে বিপুল অর্থের আবশ্যক; সরকারের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহা সম্ভবপর নহে। তাহার উপর অর্থ-নৈতিক দুরবস্থার একশেষ হইয়াছে। দামোদরের বন্যার জল আসা বন্ধ করায় জমীর উর্ব্বরতা শক্তি একেবারে কমিয়া গিয়াছে। কৃষির উন্নতির জন্য যে সামান্য প্রচেষ্টা চলিয়াছে তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। শ্রম-শিল্পের অবস্থাও শোচনীয়; যে কয়টী শিল্প এখনও জীবিত আছে বা একেবারে লোপ পায় নাই তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। সরকার যদি নদনদী, খাল বিল ও জলাশয়াদির সংস্কারে অবহিত হন—সমবায়-সমিতিগুলি যদি জীবন্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়, লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস, হুগলী জেলা আবার ধনধান্যে পূর্ণ হইবে—স্বাস্থ্য সম্পদ্ ফিরিয়া আসিবে, জ্ঞান-গৌরবে শীর্ষস্থান অধিকার করিবে এবং ধর্ম্ম-কর্ম্মে মহীয়ান্ হইয়া উঠিবে। রাজা রামমোহন রায় ও পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব জন্মগ্রহণ করিয়া যে জেলাকে ধন্য করিয়াছেন সে জেলা পরম পুণ্যময় স্থান। সেই পুণ্যের জ্যোতিতে কেবল ভারতবর্ষ কেন, সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক।

মহামিলনের শ্রীক্ষেত্র

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

এই পথে সখা পেয়েছি তোমায় মন্দাকিনীর পুণ্যকূলে,
চরণের দাগ সোনা হ'য়ে রয় নবদ্বীপের বক্ষমূলে।
প্রেমের ফসল ক'রে গেছ দেশে মধুর ভাবের মূর্ত্ত কবি,
প্রাণের রক্তে আঁকিয়াছ তুমি বঙ্গভালেতে শ্যামের ছবি।
পাষাণ-হৃদয়ে বৃন্দাবনের মুঞ্জরে তরু তুলসী-দল
তোমার নামের কত গুণ সখা, শুষ্ক শাখায় ধরেছে ফল।

সোণার বিহগ বনে বনে গায় শিখানো তোমার কৃষ্ণনাম,
বঙ্গভূমিরে করে গেছ তুমি মর্ত্ত্য-লোকের স্বর্গধাম।
কীর্ত্তনে আলো কী রঙে রাঙালে! নিঠুর শমন দূরেতে যায়,
তোমার গানের মঞ্জরী মেখে কুণ্ডলী জেগে শীর্ষে ধায়।
সহস্রদলের পাঁপ্ড়িগুলিতে গুঞ্জরে অলি রাত্রিদিন,
নিমাই আমার! এস ফিরে এস, বঙ্গমাতার কাঁদিছে বীণ।

মহামিলনের শ্রীক্ষেত্রে তুমি জীবন-সাগরে সিনান করি,
গৌরবরণ মিশালে তোমার জগন্নাথের অঙ্গোপরি।
আমরা তোমার রূপের কাঙাল, অরূপ হয়েছ কেন গো ভাই?
তুমি যে ভূমায় নৃত্য-বিভোল হেরিব ধেয়ানে শক্তি নাই।

সভাপতির অভিভাষণ *

শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন দাশ বার-এট-ল

সমাগত ভ্রাতৃমণ্ডলী ও ভগিনীবৃন্দ! আজ আমি যে কার্য্যের গুরুভার লইয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি, আমি সে কার্য্যের ভার বহন করিতে মোটেই সমর্থ নহি এবং সেই জন্যই যখন আপনাদের সঙ্ঘের আহ্বান আমার নিকট পৌঁছিয়াছিল যে, আমাকে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের বার্ষিকোৎসবের উদ্বোধনক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইবে তখন আমি পাশ কাটাইবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু মনের গোপন কোণে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের উৎসবে যোগ দেওয়ার একটা দুর্নিবার ইচ্ছাও লুক্কায়িত ছিল, তাই বুঝি এড়াইতে না পারিয়া আজ আপনাদের নিকট আসিতে বাধ্য হইয়াছি। যে উৎসবের হোতার কার্য্য কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্তের মত লোক করিয়াছেন, যে সঙ্ঘের অনুষ্ঠানের ও আদর্শের সহিত দেশের সকল সাচ্চা সেবকদের পূর্ণ সহমর্ম্মিতা রহিয়াছে, যে অনুষ্ঠানের অনাড়ম্বর কল্যাণ-কর্ম্মধারারসহিত পরিচিত হইবার জন্য দেশের নেতৃবৃন্দ, এমন কি স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী চন্দননগরে শুভাগমন করিয়াছেন, যাহার গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতির সহিত দেশোদ্ধার-ব্রতী সকল কর্ম্মীর প্রাণের সংযোগ রহিয়াছে, সেই প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের উৎসবের হোতৃকার্য্য আমার দ্বারা সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে, সে কথা আমি বেশ জানি; কেননা ব্যবহার জীবীর জীবনে স্বদেশ ও স্বদেশবাসিদিগকে সেবা করিবার যে কর্ত্তব্য ন্যস্ত হইয়াছে তাহাতে ভাঙ্গাচুরি করিবার যথেষ্ট ক্ষেত্র আছে—কিন্তু গঠনমূলক কার্য্যপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া কিছু গঠন করিবার সময় ও সুযোগ বড় কম। বিশেষতঃ আপনারা স্থূল ছাড়িয়া, সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া "প্রবর্ত্তক" নাম ধারণ করিয়াছেন, এ অবস্থায় আপনাদিগকে উপদেষ্টা রূপে কিছু শুনাইবার অধিকার সাধক ও সিদ্ধ ব্যতীত অপরের থাকিতে পারে না। সে হিসাবেও আমি আপনাদিগকে কিছু বলিতে পারি না; কেন না, আমি সিদ্ধও নই, সাধকও নহি। তথাপি যেহেতু আমি বাংলার প্রেমধর্ম্মে দীক্ষিত এবং আমিও একজন "প্রবর্ত্তক", এবং যেহেতু আপনাদের সাধনার মূলে একই "মানুষ-তত্ত্ব" অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, কাজেই আজ এই প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে সেই তত্ত্বের আলোচনা নিরর্থক হইবে না বিবেচনায় তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা অতি সংক্ষেপে বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

প্রেমসাধনার সিদ্ধ সাধক, বাংলার প্রেমধর্ম্মের আদিগুরু চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, "শুন রে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" চণ্ডীদাসের এই কথার গূঢ় অভিপ্রায় এই যে, সাধনার বহু ক্রম ও প্রণালী নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে সত্য, এবং সাধ্য বা ইষ্টতত্ত্ব প্রণালী অনুসারে ভিন্ন ভিন্নরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু সব তত্ত্বের উপরের তত্ত্ব এই মানুষ; এবং সব চেয়ে বড় সত্য এই যে "মানুষই ভজনীয়, মানুষই সেব্য, মানুষই আরাধ্য।" চণ্ডীদাসের এই কথায় পাছে মানুষ ভগবানকে ভুলিয়া যায়, মানুষকে ভগবান করিয়া লইয়া একটা উপধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া মানুষ অধঃপাতে যায়, এই বহু শঙ্কা নিরাশ করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান মানুষরূপে চণ্ডীদাসের সাধনাপূত এই সোণার বাংলার বুকে "গৌরহরি" নামে অবতীর্ণ হইলেন এবং চণ্ডীদাসের উক্ত বাক্য পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিলেন; শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়া আমাদিগকে বলিলেন, জীবের উপাস্য জীব হইতে পারে না,—উপাস্য ভগবানই বটেন, কিন্তু এই "নরতনুই ভজনের মূল" এবং "কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ।" সুতরাং যদি ভগবান পাইতে চাও, তবে মানুষের ভিতরই মানুষরূপে তাঁহাকে পাইতে হইবে; যেহেতু নরবপুই তাঁহার স্বরূপ। সুতরাং

* প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবের ১২শ অধিবেশনের উদ্বোধন-সভায় পঠিত।

তাঁহার স্বরূপকে অবহেলা করিয়া, মানুষকে ঘৃণা করিয়া, মানুষকে দূরে রাখিয়া, মানুষে মানুষে গণ্ডী রচনা করিয়া, মানুষকে মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করিয়া যে নর-রূপ ভগবানেরই শ্রেষ্ঠস্বরূপ সেই নররূপধারী ব্যক্তিকে কল্পিত নাম দিয়া "অস্পৃশ্য" বিবেচনা করিয়া তুমি প্রতি পলে ও প্রতি পদে প্রেমের ঠাকুরকে অবমাননা করিতেছ, তুমি জন্মের সুযোগে বুদ্ধিজীবীর শ্রেণীভুক্ত হইয়া, শ্রমজীবীকে "ছোটলোক" বলিয়া নাসা কুঞ্চন করিতেছ এবং কৃষিকার্য্য ছোট লোকের কাজ, শরীর খাটাইয়া খাওয়া ছোটলোকের কাজ, মস্তিষ্ক ব্যতীত অপর কোনও অঙ্গপরিচালনায় জীবিকানির্ব্বাহ ছোটলোকের কাজ,—এই মিথ্যা অভিমানের ভস্ম গায়ে মাখিয়া, আভিজাত্যের উচ্চ মঞ্চে বসিয়া ভগবানকে পাইবার চেষ্টা করিতেছ; কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই, যে যিনি ব্রাহ্মণের ভগবান, তিনিই ডোম মেথরেও ভগবান; যিনি রাজার ঠাকুর, ঠিক তিনিই রাজ্যের কাঙ্গাল হইতে কাঙ্গাল যে প্রজা তাহারও ঠাকুর —বরং ভাড়াটীয়া পূজারী ব্রাহ্মণের পেশাদারী নিবেদন তিনি অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন, কিন্তু চামারের সন্তান রুইদাসের নিবেদিত অতি দীন নৈবেদ্য তিনি অগ্রাহ্য করেন না। ভারতের এক বিশাল সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক মহাত্মা কবীর জোলার ছেলে, দাদুপন্থী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ভক্তরাজ দাদুজীও চামারের সন্তান। আমরা ভুলিয়া যাই যে, যাহারা গতর খাটাইয়া খায়, বনে জঙ্গলে গো মহিষ চরাইয়া বেড়ায়, তাহাদেরই ভিতর জন্মিয়াছিলেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। আমরা উচ্চকুল-সম্ভূত ব্যক্তিগণ ভগবানকে ভদ্রলোক সাজাইয়া এক চেটিয়া করিয়া পাইতে চাই, কিন্তু আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া পতিতপাবন, অধমতারণ রূপে "ধুলোয় এসেছে নেমে হীন পতিতের ভগবান।" Labour'এর dignity বুঝাইবার জন্য যিনি বৃন্দাবনলীলায় 'তৃণচরানুগ' হইয়া, গোপুচ্ছ ধরিয়া কণ্টকাকীর্ণ বনপথে সারাদিন গোচারণ করিতেন, সেই তিনি এবার নদীয়া নগরে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া চণ্ডাল যবনকেও পরমার্থের শ্রেষ্ঠ অধিকারী করিয়া, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে মানবমাত্রকেই ভগবানের সেবার অধিকার দিয়া, স্বরূপতঃ জীবমাত্রেই ভগবানের নিত্য সেবক, এই মহাবার্ত্তা প্রচার করিয়া, মানুষের জাতিকুল নিরর্থক, এই তত্ত্ব প্রচার করিয়া গেলেন। ভগবানের এই বাণী আমরা শুনিয়াও শুনি নাই। প্রতি মনুষ্যের তো বটেই, প্রতি জীবের ভিতর যে একটী কৃষ্ণদাস-মূর্ত্তি লুকায়িত আছে এবং সেই মূর্ত্তিতে যবন, চণ্ডাল ও তথাকথিত 'অস্পৃশ্য' সকলেরই যে তাঁহার সেবা করিবার অধিকার রহিয়াছে, এ শিক্ষা মহাপ্রভু দিলেও তো আমরা তাহা গ্রহণ করি নাই! তাহার কি বিষময় ফল হইয়াছে—সে কথা হিন্দুজাতির প্রকৃত কল্যাণকামী প্রত্যেক সেবকই প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছেন ও করিতেছেন। রাজা রামমোহন রায় আমাদের এই সমাজব্যাধিকে আরোগ্য করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ এই মানবতার আদর্শে দেশ ও জাতিকে তুলিয়া দিতে বহু চেষ্টা করিয়াছেন। বর্ত্তমানযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবও ভারতবর্ষে প্রতি হিন্দুর হৃদয়ে এই দিব্য মানবতার আদর্শে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। আপনারাও এই দিব্য মানবতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলকে এই সঙ্ঘে ডাকিয়া লইয়া, শ্রম-বিমুখতাকে দেশ দূর করিবার সংকল্পে সর্ব্বপ্রকার শিল্প-শিক্ষার দ্বারা দেশের নর ও নারীমাত্রকে যে মস্তিষ্কের সঙ্গে সঙ্গে হস্তপদ চালনা করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন—তজ্জন্য আপনাদের সঙ্ঘ দেশবাসী মাত্রেই আন্তরিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে।

কিন্তু কেবল কতকগুলি শিল্পী, কৃষক বা ব্যবসায়ী লোক সৃষ্টি করিলেই যে প্রবর্ত্তকের ব্রত উদ্যাপিত হইবে তাহা নহে। আমি দেখিতে চাই যে, যাহারা প্রবর্ত্তকের জীবন-সঙ্ঘে জীবনকে জুড়িয়া দিবে তাহারা যেন অচিরে নিজের স্বরূপ বুঝিতে পারে অর্থাৎ "জীব নিত্য কৃষ্ণদাস" এই স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া, জীবনের সকল কর্ম্মেই প্রিয়তমের সেবা-সুখ উপলব্ধি করিয়া পরমানন্দে কর্ম্ম করিয়া যাইতে পারে। নতুবা কর্ম্ম তাহাদের মুক্তির কারণ না হইয়া বন্ধনেরই কারণ হইবে এবং এক কর্ম্ম-বীজ হইতে সহস্র কর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া তাহাদিগকে নাগপাশে বাঁধিয়া ফেলিবে। অজ্ঞানতঃ কর্ম্ম করিবার

এমনই চোরাবালি বটে। প্রবর্ত্তক একটা দেবতার জাতি গড়িয়া তুলিতে চান, এটা আমরা জানি; মহাপ্রভুও বাঙ্গালীর মানবতার ভিতর এই দিব্যভাব প্রতিষ্ঠা করিতে আসিয়াছিলেন; প্রেম-ধর্ম্মের আর এক শ্রেষ্ঠ আচার্য্য প্রভু জগদ্বন্ধুও বাঙ্গালীর জাতিত্বের এই দিব্যভাব প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া আশা দিয়াছেন—প্রবর্ত্তকও সেই মহান্ আদর্শকে লাভ করিতে ব্রতী হইয়াছেন। আশাকরি, প্রবর্ত্তক তাহার কর্ম্মের সাধনায় কর্ম্মক্ষয়ের যে কৌশল যুগধর্ম্মদাতা শ্রীগৌরাঙ্গ আমাদিগকে দিয়াছেন—তাহা বিস্মৃত হইবেন না। শুধু ব্যক্তির জীবনেই নহে, সঙ্ঘের জীবনে এই যুগধর্ম্মের আদেশ আরও কার্য্যকর হইবে এবং অস্পৃশ্যতা-ব্যাধিকে হৃদয় হইতে দূর করিতে হইলে প্রতি জীবের হৃদয়ে প্রাণারাধ্য প্রিয়তম প্রাণের দেবতা প্রাণকৃষ্ণের অধিষ্ঠান জ্ঞান করিতে হইবে এবং যে মুহূর্ত্তে এই জ্ঞান জীবনে সহজ হইয়া উঠিবে সেই মুহূর্ত্তে আর মানুষ মানুষকে অচ্ছুৎ বা অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করিবে না। এ অস্পৃশ্যতা-জ্ঞান একটা মানসিক বিকার; ইহার প্রতিকার ভিতর হইতেই হওয়া সম্ভব, বাহির হইতে আইন পাশ করিয়া এই মনোবৃত্তি দূর করিবার চেষ্টা কখনও সফল হইতে পারে না। আমি আর বেশী কিছু বলিয়া আপনাদের মহোৎসবের মূল্যবান্ সময় নষ্ট করিতে চাই না। উপসংহারে, আমি শুধু এইটুকুই আপনাদিগকে বলিতে চাই যে, এই বাংলাদেশের মানুষ-সাধনা সাধনার জগতে অদ্বিতীয় ও অতুলন বটে। এই বাংলার সাধকই শব-সাধনায়ও সিদ্ধি সঞ্চয় করিয়া, জগতের অনেক দুঃখ দৈন্য মোচন করিয়া সাধনায় অসীম শক্তি দেখাইয়া গিয়াছেন। আমি জানি, 'প্রবর্ত্তক' সে শব-সাধনার পথকেও অগ্রাহ্য করেন নাই। শাক্ত ও বৈষ্ণবের মহীয়সী সাধনার অপূর্ব্ব সমন্বয় আমরা প্রবর্ত্তকের প্রাণে সঞ্চারিত হইতে দেখিতেছি। আমি আশাকরি, দেশের ও সমাজের মঙ্গলের জন্য, বাঙ্গালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার জন্য যাহা কিছু করিবার দরকার, প্রবর্ত্তক ধ্যানস্থ হইয়া বাঙ্গালীর প্রাণের ঠাকুরের কৃপায় তাহার সকল উপায়েরই সন্ধান পাইবেন। আমি চাই, বাংলায় মানুষ গড়িয়া উঠুক, যে মানুষের নিকট দেবতারাও প্রেমভক্তি শিখিবার জন্য, ত্যাগ-বৈরাগ্য শিখিবার জন্য, ভগবানের সেবা পাইবার জন্য প্রার্থী হইয়া মর্ত্ত্যে ছুটিয়া আসিবে। এই বাংলারই তথাগত বুদ্ধের নিকট ও প্রেমসিন্ধু গৌরাঙ্গের নিকট দেবতারাও নির্ব্বাণসুখ ও অকৈতব প্রেম লাভ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। আবার সেই দিন আসুক, প্রবর্ত্তক যে সাধনা আরম্ভ করিয়াছেন সেই সাধনায় বাংলার তথা ভারতের এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিশ্বের সেই শুভযুগ উদিত হউক। বাংলায় ভগবানের আবির্ভাব সার্থক হউক!

ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!! ওঁ শান্তি!!!

গোপন দেবতা

শ্রীমানসকুমার হালদার

মনের আসন পাতিয়া রেখেছি
　　বিজন প্রাণের মাঝে
এসো-এসো ওগো গোপন দেবতা,
　　এসো সুন্দর-সাজে।
এসো মনোরম, এসো প্রিয়তম মম,
এসো অনুপম, এসো অন্তরতম,
এসো উৎসুক বিরহী আমার,
　　গোপন হিয়ার মাঝে,—
এসো-এসো ওগো প্রাণের দেবতা,
　　এসো সুন্দর-সাজে।

ধরণী-প্রান্তে এসছি ছুটিয়া
　　আমি তব অনুরাগী,
অসীম শূন্যে পেতেছি আসন
　　দেবতা, তোমারি লাগি'।
হাসি ও অশ্রু মিশে গেছে একাকারে,
তনু-তন্ত্রীতে বাজে বীণা বারে-বারে,
প্রাণের সাগরে ফোটে শতদল
　　রাগ-রক্তিম লাজে।
এসো-এসো ওগো গোপন দেবতা,
　　এসো সুন্দর-সাজে।

রুদ্রের খেলা

(গল্প)

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য

গোবরার মাকে গ্রামের সকলেই চিনিত; মানে, তাহার দুইটি বিভিন্ন-মুখী বৈশিষ্টাই তাহাকে গ্রামের লোকের নিকট পরিচয় করাইয়া দিত।

পিতৃ-পিতামহ তুলিয়া গাল দিয়া, অযথা অভিসম্পাত করিয়া, লোককে সদ্য যমের বাড়ী পাঠাইতে একদিকে সে যেরূপ অদ্বিতীয়া, অপরদিকে তাহা সংশোধন করিয়া লইবার গুণও তাহার ছিল।

তরীতরকারীর ব্যবসা করিয়া গোবরার মা সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে—রৌদ্রের প্রচণ্ড তেজে সমস্ত দিন নানা গ্রামে ঘুরিয়া দিবসের শেষে যৎসামান্য যাহা কিছু পায় তাহা লইয়া নিজের কুঁড়েটিতে ফিরিয়া আসে। হাট-বারে তো সমস্ত দিন কিছু আহারই হয় না। পরিশ্রান্ত দেহটি দাওয়ার উপর এলাইয়া দিয়া দেওয়ালের গায়ে খড়ির দাগ কাটিতে কাটিতে সে পাওনার হিসাব করে।..

সমস্ত দিনের পরিশ্রমে মেজাজ তাহার বড়ই তীক্ষ্ণ থাকে—তাগাদার সময়ে তাই নাকি সে আর নিজেকে সামলাইতে পারে না, প্রতিবেশীদের ছলনা এবং ফাঁকি দিবার প্রবৃত্তি তাহাকে কঠিন করিয়া তোলে—সে তাই অযথা অভিসম্পাত করিয়া বসে।…

গোবরার মার বাহিরে কাঠিন্য থাকিলেও, অন্তরে তাহার নাকি ফল্গু-প্রবাহের ন্যায় দয়া-মায়াও আছে। লোকের দায়ে বিদায়ে সে অর্থ এবং প্রাণ দিয়া সাহায্য করে। তখন তাহার সেই কাঠিন্য কোথায় চলিয়া যায়! নিজে অভুক্ত থাকিয়াও সে তাহার যা কিছু সঞ্চিত অর্থ সবই দান করিয়া বসে—নিঃস্ব লোকের অসুখের সময়ে পথ্য চিকিৎসার ব্যয় সব কিছুই সে হাসি-মুখে বহন করিয়া থাকে, আবার রাগিয়া উঠিয়া পর মুহূর্ত্তেই তাহাকে যমের বাড়ী পাঠাইতেও দ্বিধা বোধ করে না—এমনি তাহার স্বভাব!…

পাড়া প্রতিবেশীরা বিপদের কথা ভাবিয়াই গোবরার মাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। অন্তরে কিন্তু সকলেই তাহার প্রতি রুষ্ট। স্বার্থের জন্য সে ভাব গোপন রাখিতে হয়।

সংসার বলিতে গোবরার মা নিজে একা—আর কেহই তাহার আপন জন নাই। কিন্তু এক সময়ে নাকি তাহারও সব ছিল। স্বামী, পুত্র, কন্যা—পরিপূর্ণ একটি সংসার আনন্দ-গুঞ্জরণে মুখরিত ছিল।

সময় আবার চিরদিন সমান যায় না; তাই বোধহয় গোবরার মারও গেল না। হঠাৎ এক প্রচণ্ড ঢেউ আসিয়া সবই ওলট্-পালট্ করিয়া দিয়া গেল। গোবরার মা তাহার বংশের কুলপ্রদীপ গোবরা, স্বামী, কন্যা সবই হারাইয়া রিক্ততার বেদনা বুকে লইয়া বাঁচিয়া রহিল—এই বিশাল বিশ্বের অঙ্গনে একাকী নিতান্ত নিঃসহায় হইয়া। লোকে কিন্তু গোবরার মার দুঃখে সহানুভূতি জানায় না। বলে—বেশ হয়েছে…হবে না, মাগীর গুমর কি, আর মুখই বা কি—যেন শাঁখের করাত!…

প্রথমে শোকের আঘাত গোবরার মার বুকে খুব তীক্ষ্ণ ভাবেই লাগিয়াছিল এবং সেই আঘাতের বন্যায় সে ভাসিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুতও হইয়াছিল, কিন্তু তাহা বোধ হয় হইবার নয়। এ সংসারে যাহার বাঁচিবার কোন সার্থকতা নাই, তাহাকেও বাঁচিয়া থাকিয়া সংসারের শত জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়—অতীতের কথা ভাবিয়া দু'ফোঁটা চোখের জলও ফেলিতে হয়! শত জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করিতে করিতে সংসার-সংগ্রামে ক্লান্ত হইয়া নিয়ত মৃত্যু কামনা করিতে হয়! সুতরাং গোবরার মাকেও বাঁচিতে হইল এবং জীবন ধারণ করিবার জন্য তরী-তরকারীর ব্যবসাও করিতে হইল।…

সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর কর্ম্মক্লান্ত দেহে গোবরার মা বাড়ীর উঠানে পা দিতেই যে দৃশ্য দেখিল তাহাতে সে একেবারে ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিল। রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। দেখিল, হরিশের ছেলে ক্যাবলা তাহার উঠানের দরজা খুলিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে শসা গাছ হইতে শসা তুলিয়া পরমানন্দে চর্ব্বণ করিতেছে, —কলার সমস্ত কাঁদিগুলি কাটিয়া একত্র জড় করিয়াছে লইয়া যাইবার জন্য—আবার সময় বুঝিয়া গরু ছাগল ঢুকিয়া সব কয়টি গাছই প্রায় নির্ম্মূল করিয়া দিয়াছে। আলুর ক্ষেত, বেগুন গাছগুলি, লাউ কুমড়ার চারা, পুঁই শাকের মাচা—সমস্তই ছিঁড়িয়া, চটকাইয়া, তচ-নচ করিয়া দিয়াছে। গোবরার মা আর স্থির থাকিতে পারিল না। তরকারীর ঝুড়ি ফেলিয়া দিয়া প্রচণ্ড বেগে ক্যাবলার দিকে ছুটিয়া চলিল। বালক ক্যাবলা তাহার রণমূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে ছুটিতে লাগিল, গোবরার মা হাতের কাছে একটা কাঠের খুঁটি পাইয়া ঘুরাইয়া ক্যাবলাকে লক্ষ্য করিয়া সজোরে তাহার দিকে নিক্ষেপ করিল। ক্যাবলা 'মাগো' বলিয়া সেইখানেই পড়িয়া গেল। কপাল কাটিয়া দরদর-ধারায় রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল। গোবরার মার তখনও চেতনা ফিরিয়া আসে নাই—সে তখনও ক্যাবলাকে উদ্দেশ করিয়া অবিশ্রান্ত গালি বর্ষণ করিতে সুরু করিয়াছে—হারামজাদা, যমের বাড়ী যা, আজ রাত্তিরেই তোর মুখ দিয়ে রক্ত উঠুক; তে রাত্তিরও যেন না কাটে—ভাগাড়ে যা, ভাগাড়ে যা!···

গোবরার মার চীৎকার এবং ক্যাবলার ক্রন্দনে পাড়ার লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিশ আসিয়া ছেলে লইয়া চলিয়া গেল।

পাড়ার লোকেরা বলিতে লাগিল—'অমন খুনে মাগীকে পুলিশে দেওয়া উচিত। ছেলে-মানুষ কোথায় দু'টো শসা খেয়েছে, তা'বলে তাকে এমনি করে' মার আর গালাগালি! ক'টা পয়সাই বা ওর দাম হবে? রাক্ষুসী নিজে সব খেয়ে বসে আছে, এখন পাড়া শুদ্ধু খেয়ে তবে ছাড়্‌বে। আহা, মা-মরা ছেলেকে কি এমনি নির্ম্মম ভাবে মারে?'

কথাগুলি গোবরার মার বুকে শেলের মত বিঁধিল। মা-মরা ছেলে—কথাটি তাহার লুপ্ত চেতনা ফিরাইয়া আনিল। ক্যাবলা আঘাতের যন্ত্রনায় কাঁদিতেছে—সুকুমার কপালখানি রক্তলিপ্ত—একি করিয়াছে সে!...

অন্য দিন হইলে হয়ত পাড়ার লোকের সে শ্রাদ্ধের চাল চড়াইত; আজ কিন্তু সে নীরবে সব সহ্য করিয়া গেল—একটি কথারও প্রতিবাদ না করিয়া, ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। অনেক দিন পরে আজ আবার নূতন করিয়া বিগত শোক আসিয়া তাহাকে আঘাতের পর আঘাত করিতে লাগিল। এতদিনকার পুঞ্জীভূত অশ্রুরাশি বিছানার উপাধানকে সিক্ত করিয়া তুলিল!...

নিজের উপর প্রচণ্ড রাগ হইল—কেন সে ছেলেটিকে অমন নির্ম্মম-ভাবে শাস্তি দিল! অবোধ বালক—বোধশক্তি থাকিলে সে কখনও ঐরূপ করিত না। আহা, মা-হারা ছেলে! সে তাহার মা হইলে কি এমন নির্দ্দয়-ভাবে শাস্তি দিতে পারিত?···

ক্ষুদ্র অবোধ বালিকার ন্যায় নিজের উপর অভিমান করিয়া সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল—কিন্তু তবুও শান্তি সে পায় না—হৃদয়ের এই গভীর ব্যথা হাল্‌কা হইতে চাহে না—এ অশ্রুর যেন আর বিরাম নাই; বিশাল অসীম সমুদ্রের মত মনকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে।

দূরে কাহাদের বাড়ীর ঘড়ি হইতে ঢং-ঢং করিয়া বারটা বাজিয়া যায়—থম্‌থমে রাত্রির নির্জ্জনতা-ভঙ্গ করিয়া একটি অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি—অসহায় সন্তানের একটি প্রাণ-আকুল করা মাতৃ-সম্ভাষণ তাহার স্নেহবক্ষকে উদ্বেলিত করিয়া তোলে। চোখে তাহার ঘুম নাই—অন্তরেও প্রবল ঝড় বহিতেছে—চারিদিকেই যেন শোকের করুণ ছবি—একটির পর একটি করিয়া অতীত স্মৃতি আসিয়া তাহাকে নব নব ধরণে ব্যথিত করিয়া তোলে···রাত্রি গভীরতর হয়।

চারিদিক্ নিস্তব্ধ। গ্রামখানি সুপ্তির কোলে—কোথাও কোন সাড়া শব্দ নাই; কিন্তু তবুও এই ভীষণ নিস্তব্ধতার মধ্যে একটি করুণ সুর রণিয়া রণিয়া গোবরার মার অন্তরে বাজিয়া ওঠে। গোবরার মার নিকট এ সুর অতি পরিচিত। সে আর শুইয়া থাকিতে পারিল না।

হঠাৎ কিসের এক তীব্র আকর্ষণে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। বাড়ীর বাহির হইয়া সেই নির্জ্জন রাত্রে সে একাকী সটান হরিশের জীর্ণশীর্ণ পড়ো গৃহটির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। চুপি চুপি জানালা দিয়া দেখিল—নিস্তব্ধ কক্ষ; স্যাঁৎসেঁতে ঘরটিতে মিট্‌ মিট্‌ করিয়া একটি কেরাসিনের ডিবা জ্বলিতেছে—আর হরিশ পুত্রের শিয়রে বসিয়া উপরের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে! তাহারাই কাছে ক্যাবলা অচেতনের মত শুইয়া আছে। চতুর্দ্দিকে ভয়াবহ দৃশ্য! ক্যাবলার পাণ্ডুর ক্ষত মুখখানির উপর মেঘের ফাঁকে অস্ফুট চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। একি মর্ম্মান্তিক দৃশ্য!...

ধীরে ধীরে ক্ষীণ স্তিমিত চাঁদের আলোটুকুও ঘন মেঘের অন্তরালে চাপা পড়িয়া যায়। গোবরার মার প্রাণে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। প্রকৃতির এ দুর্য্যোগ যেন তাহারই মনের প্রতিচ্ছবি!

দেখিতে দেখিতে গোবরার মার চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠে—মনে পড়িয়া যায় গোবরার মৃত্যুর দিন—সেই বিভীষিকাময়ী রাত্রির কথা! সেদিনও আকাশের বুকে এমনি জমাট-বাঁধা কালো মেঘ—তাহার অন্তরালে পাণ্ডুর ম্লান চাঁদ—চারিদিকে বিজলীর তীব্র কটাক্ষ—ঠিক আজিকার রাত্রের মতই!...

গোবরার মা ধীরে ধীরে আগাইয়া যায়, কিন্তু বাধা পায় প্রাচীরের মত দরজার কাছে। নিজের হাতে যে কবাট সে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে তাহার আগল খুলিয়া দিবে কে? বুকটা তাহার ছাঁৎ করিয়া উঠে—মাতালের মত টলিতে টলিতে সে চলিতে লাগিল বুড়ো-শিব-তলায়, ক্যাবলার প্রাণ-ভিক্ষা করিবার জন্য—যেমন করিয়া গিয়াছিল জীবনের শেষ সম্বল গোবরার অসুখের সময়ে। শিব সে-বার তাহার প্রার্থনা শোনেন নাই—পাষাণ-দেবতার সে-বার দয়া হয় নাই, তাই সে গোবরাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না; কিন্তু তাই বলিয়া কি এ বারও সে যাইবে না?

কিন্তু সে মন্দির কি এখানে?...

বনের পর বন, মাঠের পর মাঠ অতিক্রম করিয়া সুদূর-বিলীন ধূ ধূ প্রান্তরের বুক চিরিয়া গোবরার মা চলিতে লাগিল বহুকালের জাগ্রত দেবতা বুড়ো-শিব-তলায়।...

নিবিড় কাশের বন—চারিদিকে জমাট-বাঁধা অন্ধকার—দৃষ্টিকে কেবল ভীত করিয়াই তোলে। এতটুকু আলোর লেশমাত্র নাই! পথের কাঁটায় দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইতেছে—আগাছার আঘাতে বার বার পড়িয়া যাইতেছে। বিভীষিকার প্রচণ্ড দুর্য্যোগ তাহাকে ব্যাপিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতে সুরু করিয়াছে—নিঃশ্বাসটি পর্য্যন্ত পড়িতে চাহে না—তবুও গোবরার মার সেদিকে লক্ষ্য নাই—খেয়াল নাই—কিসের এক প্রবল প্রেরণায় সে উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটিয়া চলে!...

এতক্ষণ পরে প্রকৃতির বিরাট্‌ স্তব্ধতা যেন একটু কমিয়া যায়—জমাট-বাঁধা মেঘের গভীরতা যেন একটু তরল হয়। আকাশের বুক ফাটিয়া অশ্রু-জল ঝম্‌-ঝম্‌ করিয়া নামিয়া আসে—আকাশে বাতাসে কান্নার সুর, ওপরে মেঘের ডাক—ঝড়ের তীব্র সাঁ-সাঁ ধ্বনি—দিগন্তকে কাঁপাইয়া তোলে।...

কড়্‌-কড়্‌ শব্দে প্রান্তর কাঁপাইয়া রুদ্রের এক প্রচণ্ড নিনাদে গোবরার মা ভয়ে আত্মহারা হইয়া থম্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে—মাথার'পর আকাশ যেন ভাঙিয়া পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে বিজলীর তীব্র এক ঝলক অগ্নিশিক্ষা তাহার চোখ মুখ ঝলসাইয়া দিয়া নারিকেল গাছের মাথার উপর দিয়া দিগন্তের পরপারে কোন অনন্তের কোলে গিয়া মিশিয়া যায়। গোবরার মার চলিবার শক্তি রহিত হইয়া যায়, কিয়ৎক্ষণ স্থানুর মত চুপ করিয়া সে দাঁড়াইয়া থাকে।

তারপর, আবার ঝম্‌-ঝম্‌ করিয়া বৃষ্টি আরও জোরে নামিয়া আসে—সঙ্গে সঙ্গে ঝড়!

শূন্য প্রান্তর দিয়া শোঁ-শোঁ করিয়া প্রবল বেগে ঝড় বহিতে থাকে। প্রকৃতির এই রুদ্র রূপ দেখিয়া গোবরার মা বিহ্বল হইয়া উঠিল। গভীর অন্ধকার যেন ঝড় বৃষ্টির সঙ্গে মিশিয়া এক দুর্দ্দান্ত রূপ লইয়া পৃথিবীটাকে চাপিয়া মারিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে—তাহার সম্মুখে যেন আজ সাক্ষাৎ রুদ্র আবির্ভূত হইয়াছে! কেন? তাহাকে বাধা দিবার জন্য? কি করিয়াছে সে?...

নিবিড় ঘন অন্ধকারের বুকে রক্ত-লিপ্ত বালক

ক্যাবলার প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া ওঠে—গোবরার মার সারা দেহে শিহরণ বহিয়া যায়। হরিশের কুটীরখানি চোখের সামনে ভাসিয়া বেড়ায়—তাহার ভিতর ক্যাবলা যন্ত্রণায় অস্ফুট চীৎকার করিতেছে—সে কাতর চীৎকার যেন স্পষ্ট—অতি স্পষ্ট হইয়া গোবরার মার কাণে আসিয়া বাজে!—সে চমকাইয়া ওঠে। হাঁ সে তো অপরাধ করিয়াছে—গুরুতর অপরাধ!...

কয়েকটা কলার কাঁদি, শসা আর গাছ?—সে তো আজিকার এই দুর্য্যোগে কোথায় চলিয়া যাইতই; তবে কেন সে ক্যাবলাকে ওমন-ভাবে আঘাত করিল?...

এ সেই পূবের মাঠ--গোবরার মা অন্ধকারেই অনুমান করিয়া লইল। এ মাঠ পার হইয়া আরো কিছু দূর গেলে তবে তো বুড়ো-শিব-তলা। দুর্য্যোগপূর্ণ পথের কথা ও সঙ্গে সঙ্গে ক্যাবলার সেই সঙ্কটাবস্থা তাহাকে অধীর করিয়া তুলিল।

গোবরার মার মনে হইল, তাহার মনের প্রার্থনা, অনুরোধ সব কিছু দিয়া সে এই রুদ্র দেবতার কৃপা ভিক্ষা করে—ঝড় জল একটু ধরিয়া রাখিতে। সে যে আর চলিতে পারিতেছে না—পথ আজ একেবারে হারাইয়া গেছে। সারা দেহ তার শ্রান্ত, শক্তিহীন—এমনি হয়ত একটা ঝড়ের দমকে তাহার শিথিল পদ স্খলিত হইয়া পড়িবে উন্মূলিত লতার মত। সে সারা দেহের ভর দিয়া পা দুটিকে যেন ভূমির উপর ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করে।...

সেই আঁধারের মধ্য দিয়া গোবরার মা দৃষ্টি ভেদ করিবার প্রয়াস পায়; কিন্তু নিষ্ফলতাই তাহাতে প্রকাশ পায় অধিক ভাবে। সে মাথার উপর আকাশের পানে তাকাইল, সেখানেও দৃষ্টি চলে না। সে আপনাকেই দেখিতে পাইল না; দূরের কথা তো স্বতন্ত্র। এই ঘন-গভীর অন্ধকার যেন যুগ যুগ ধরিয়া বিরাট্ শূন্যে সঞ্চিত ছিল, আজ সুবিধা বুঝিয়া সেই পুঞ্জীভূত জমাট অন্ধকার পৃথিবীর বুকের উপর নামিয়া আসিয়াছে—ঠিক তাহার মনের সুগভীর দুর্য্যোগময় আঁধার বিহ্বলতার মত!

গোবরার মার মনে হইল, যেন সে এই অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে—অস্তিত্বশূন্য, তমসাবৃত।...ঘন-গম্ভীর মেঘের ডাকে বুকটা দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠে, স্পন্দনও দ্রুত হয়। —না এখনও সে আছে, তাহার অস্তিত্ব এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।...

হঠাৎ অনেক দূর আলো করিয়া একটা অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল—কিন্তু সে ক্ষণেকের জন্য। বিজলীর সে চকিত আলোকোচ্ছ্বাস যেন মৃদু হাসিয়া তাহাকে একটি তীব্র ব্যঙ্গ করিয়া গেল।...

এই দুর্য্যোগময়ী নিশার মধ্যে গোবরার মা সে মাঠ অতিক্রম করিয়া অনেকখানি আগাইয়া আসিয়াছে। বিদ্যুতের আলোয় সে দেখিল, দূরে নদী। ঝড় বৃষ্টির সহিত তাহার এই প্রাণপণ সংগ্রামের ক্লেশ সে নিমেষে ভুলিয়া গেল। মন্দিরের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে সে—নদীর ধার দিয়া শ্মশানের সম্মুখ দিয়া যে পথ গিয়াছে সেই পথে চলিলেই বুড়ো-শিবতলা।

এই ভীষণ দুর্য্যোগ ঠেলিয়া যখন সে এত দূর আসিয়া পড়িয়াছে, তখন আর ভাবনা কি? —ওটুকু পথ তো এখনি পার হইয়া যাইবে। ভগবান্ মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, ক্যাবলা নিশ্চয়ই সারিয়া উঠিবে। অজ্ঞাত একটা ভক্তি ও শ্রদ্ধার আধিক্য গোবরার মার অন্তরকে পূর্ণ করিয়া তুলিল। সে কপালে হাত দুটি ঠেকাইল—জয় বাবা বুড়ো-শিব—তোমার করুণা অপার ঠাকুর···

গোবরার মা পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিল।

জমির উপর জল জমিয়াছিল; ক্ষণিক আলোক তাহাতে প্রতিফলিত হইয়া মরু-মায়ার মত দৃষ্টি বিভ্রম ঘটাইয়াছিল। দূর হইতে গোবরার মা ভাবিল, নদীর তীরে আসিয়া পড়িয়াছে। প্রকৃত পক্ষে নদী তখনও অনেক দূরে।

চলিয়া চলিয়াও যখন সে নদীর চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পাইল না, তখন সে বুঝিল যে পথ হারাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে আশার যে ক্ষীণ আলোটুকু জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, এক নিমেষে তাহা নিভিয়া গেল; আবার সেই অন্ধকার···সেই ভীষণ দুর্য্যোগ···উৎকণ্ঠা...ভয়!

গোবরার মা দিশেহারা হইয়া গেল; কি যে করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না; ইচ্ছা হইল, প্রাণ ভরিয়া একবার কাঁদে; কিন্তু সে তাহা পারিল না।···

মনে এখনও আশা—ধৈর্য্যশূন্য না হইলে পথ খুঁজিয়া পাইতেও পারে। বুড়ো-শিব কি এতই নিষ্ঠুর হইবেন?...

রাত কত হইয়াছিল, আন্দাজ করা যায় না। তবে ঘণ্টা দুই ধরিয়া এই ঝড় বৃষ্টি অবিরাম চলিয়াছে। এখন ঝড়ের বেগ কমিয়া আসিয়াছিল। বৃষ্টিও প্রায় ধরিয়া আসিয়াছে।···

পথের মাঝে আসিয়া এরূপ বিপদে গোবরার মা কখনও পড়ে নাই। একবার ভাবিল, বাড়ী ফিরিয়া যাইবে —কিন্তু কোথায় পথ?···পাল-ছেঁড়া নৌকার মত তরঙ্গ-চঞ্চল সমুদ্রের মধ্যস্থলে আসিয়া দিক্‌ভ্রষ্ট হইয়া পড়ার মত সে পথ-হারা হইয়া গিয়াছে যে! আর যাহার জন্য আসিয়াছে তাহা কি অসমাপ্তই থাকিয়া যাইবে?··· না, না, তা হইতেই পারে না। সহসা হরিশের ছেলের রোগপাণ্ডুর রক্তলিপ্ত মুখখানার কথা মনে পড়িয়া যায়; মনে পড়িয়া যায় কিসের আকর্ষণে, কাহার প্রেরণায় সে এই বৃষ্টি-মেঘ-সমাচ্ছন্ন নিশীথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে অগ্র-পশ্চাৎ না বিবেচনা করিয়া।

কিন্তু গোবরার মার দৃঢ় বিশ্বাস, সে শিবতলা হইতে দুটো বেলপাতা ও চরণামৃত আনিয়া ক্যাবলাকে খাওয়াইতে পারিলেই সে এ যাত্রা বাঁচিয়া যাইবে; জাগ্রত ঠাকুর ওখানকার, কোনরূপ পৌঁছাইতে পারিলেই হয়।···

দূরে একটি অগ্নিশিখা দেখা গেল—আবার পরক্ষণেই তাহা মিলাইয়া গেল। গোবরার মার মনে হইল—ওই তো শ্মশান—হ্যাঁ···এই তো! ওই দুই একটা তারাও দেখা যায় যে!···আকাশ তবে পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে!···

শ্মশান যখন দেখা গিয়াছে তখন নিশ্চয়ই নদীও মিলিবে—আর নদীর ধার দিয়া গেলে সে তার গন্তব্যস্থলে গিয়া পৌঁছিবে; না হয় একটু ঘুর হইবে।···কিন্তু না, দরকার নাই ঘুর পথে গিয়া, সামনে, পশ্চিম দিকে, শ্মশান তো, এখন উত্তর মুখের পথ ধরিয়া চলিলেই সে শীঘ্র গিয়া পৌঁছিবে। ক্যাবলার ঐ সঙ্কটাবস্থা দেখিয়া আসিয়াছে, অথচ এই দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া তাহার এরূপ বিলম্ব হইয়া গেল। সুদীর্ঘ বিলম্বের জন্য সে মুহূর্মুহু প্রতি অঙ্গে যেন শত বৃশ্চিকের তীব্র দংশন অনুভব করিতেছিল।···

সেই ঘনঘটাচ্ছন্ন রজনী; গাঢ় অন্ধকারে আকাশ ধরা সমাচ্ছন্ন। সমগ্র স্থানটা নির্ব্বাত—নিষ্কম্প, স্তব্ধ। স্থানে স্থানে ঝোপের মাঝে মাঝে জোনাকীর পাঁতি মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল, নিভিতেছিল। কখনও কখনও দু-একটি শৃগাল তাহাদের জলপ্লাবিত অন্ধকার-বিবর হইতে বাহির হইয়া অদ্ভুত রব করিয়া এ-ধার ও-ধার ছুটাছুটি করিতেছিল।...

ভীমা রজনীর এই প্রগাঢ় তমসাচ্ছন্ন মূর্ত্তি গোবরার মার মনে ভীতি সঞ্চার করিলেও, সে প্রায় একপ্রকার ছুটিয়া গিয়াছিল তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা ভুলিয়া গিয়া।·· একি চলার নেশা!···শ্রান্তির ক্লেশ নাই, ক্লান্তির ভ্রূক্ষেপ নাই—শুধু চলা!···

কিন্তু এবারও সে পথ ভুল করিয়াছে!···ঘন বনের মাঝে পথ হারাইলে বাধা পাওয়া সম্ভব;—কিন্তু এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরের বুকে অবাধ, আত্মবিস্মৃত গতিকে বাধা দিবে কে?···

মৌন সাঁজে

[শিল্পী—শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব সেনগুপ্ত]
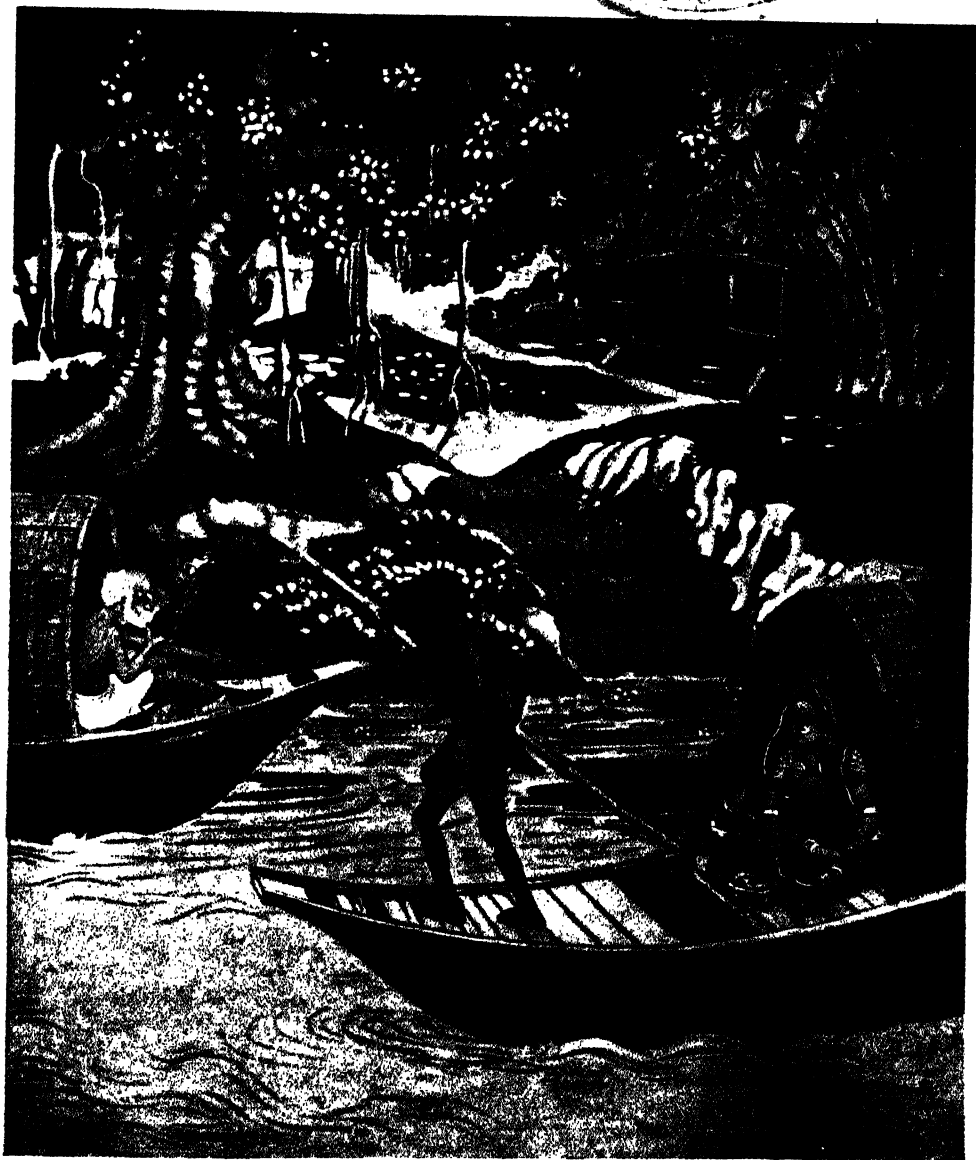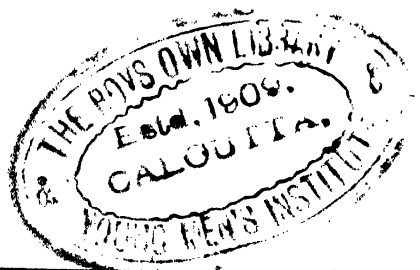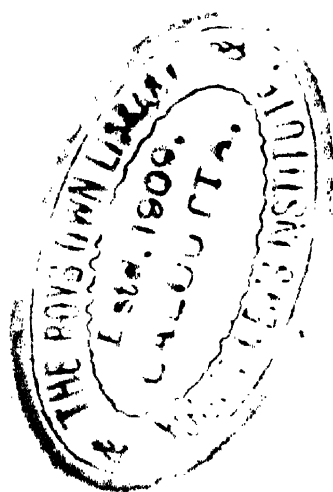
প্রাচ্য-প্রতীচ্যে শিক্ষার ধারা

শ্রীকিরণময়ী বসু

আমার গত দুইবৎসরব্যাপী ইউরোপ প্রবাসের ফলে আমি কয়েকটা দেশে শিক্ষার যে সব প্রসার দেখবার সুযোগ পেয়েছি, সেই সম্বন্ধে আমার যতটা অনুভূতি হয়েছে তাই আপনাদের বলবার চেষ্টা করবো। কতটা সফল হবো তা বল্‌তে পারি না।

Stockholmএ আন্তর্জাতিক মহিলা-পরিষদের (International Council of Womens Conference) সদস্য নির্ব্বাচিত হলে আমাকে Geneva থেকে Sweden'এ যেতে হয়। যাবার পথে প্রথমতঃ আমি Stuttgartএর Waldorf School দেখার সুযোগ পাই। সাধারণ স্কুল থেকে এই স্কুলটীর যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ১৯১৯ সালে একজন বাণিজ্যসচিব (Councillor of Commerce) এই স্কুলটি স্থাপিত করেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে Dr Rudoff Steminroই এর প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা, Waldorf Astorm ফ্যাক্টারির কর্ম্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্যেই স্কুলটা স্থাপিত হয়। কিন্তু এখন স্কুলের আয় থেকে ব্যয় সঙ্কুলান হয় বলে' আর ফ্যাক্টরির সাথে এর বিশেষ কোন সম্বন্ধ নেই। স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা এক হাজারেরও বেশী। এখানে শিক্ষণীয় সাধারণ বিষয় ব্যতীত পদার্থ-বিদ্যা (Physics), রসায়ন-শাস্ত্র (Chemistry), সঙ্গীত বিদ্যা, ও বই-বাঁধান প্রভৃতি হাতের কাজও শিক্ষা দেওয়া হয়। স্কুলের একটি লাইব্রেরী ও ক্রীড়াগারও আছে।

শ্রীকিরণময়ী বসু

Dr Stener শিক্ষার্থী শিশুর জীবন চারভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথম ভাগে শিশুর শারীরিক গঠন ও বুদ্ধির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হবে। সাত বছর বয়স পর্য্যন্ত যদি শিশুর স্বাস্থ্য উপর্য্যুপরি অবহেলিত হয়ে আসে, তবে সে শিশুর দ্বারা ভবিষ্যতে বিশেষ কিছু হবার সম্ভাবনা বড়ই কম। এ সময়ে তাকে নৈতিক উপদেশ দিলে কিংবা তার বিবেচনা-শক্তি উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করলে কোনই ফল হয় না। এই বয়সে তার অনুকরণপ্রবৃত্তি বড়ই প্রবল হয়, ইন্দ্রিয় দ্বারা সে যা কিছু গ্রহণ করে তাই তার উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে' ফেলে। এই সময়ে যাতে সে সৎ-দৃষ্টান্ত, সৎ-সঙ্গ প্রভৃতির সংস্পর্শে আস্‌তে পারে সে দিকে দৃষ্টি রাখা শিক্ষকের একান্ত কর্ত্তব্য। পিতামাতা ও শিক্ষকদের দায়িত্ব এই সময়ে বড় বেশী। শিশু এখন যা দেখে, যা শেখে, তার পরবর্ত্তী জীবনে সে এ সমস্তের প্রভাব যথেষ্ট উপলব্ধি করে।

প্রথম অবস্থায় শিশু চতুস্পর্শে যা' দেখে তাই অনুকরণ করে। পরে সে এই সব জিনিষের বিষয়ে অস্পষ্টভাবে স্বপ্ন দেখে ও মনে মনে ছবি আঁকে। সেই জন্যে এই সময়ে তাকে ছবির ভিতর দিয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত এই ছবির ভিতর দিয়ে ভাষা ও অঙ্কও শেখান যায় এই সময়ে শিশুকে রং দিয়ে ছবি আঁক্‌তে দেওয়া উচিত। এই ছবি আঁকা থেকে সে আস্তে আস্তে চিত্র-বিদ্যা শিখে

নেয় এবং এই চিত্রবিদ্যা থেকে তার লেখা ও পড়ার প্রতি আকর্ষণ জন্মে। শিশুগুলিও ছন্দের ভিতর দিয়ে যা শেখে, তা স্থায়িভাবে তার মনে থেকে যায়। এই Waldorf স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা আবৃত্তি ও সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে শিক্ষা দেওয়াই শিক্ষাদানের শ্রেষ্ঠ উপায় বলে মনে করেন।

শিশুকে শিক্ষা দিবার বেলায় লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে যে তার কাছে কতকগুলি নীতিসূত্র আওড়ালে কোনই ফল হয় না। শিশুশিক্ষায় নীতিসূত্রের কোনই মূল্য নাই। শিশু যাতে বুঝতে পারে তার যত কিছু সমস্যা সমস্তই তার শিক্ষক সমাধান করতে পারেন, সে যাতে জানে যে, তার শিক্ষকই তার আদর্শ-স্থানীয়, তাই করতে হবে।

প্রায় বার বছর বয়সের সময়ে শিশু জিনিষের কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ বুঝ্‌বার শক্তি লাভ করে। এই সময় থেকেই শিশু যা কিছু শেখে তার বিষয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে আরম্ভ করে। Dr Stenier বলেন যে, শিশুকে অল্প বয়সে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শিখালে তার যত ক্ষতি হয়, তত আর কিছুতে হয় না।

Waldorf স্কুলে প্রায় ৫০ জন শিক্ষক আছেন। এঁরা জার্ম্মাণি, অষ্ট্রিয়া ও বাল্টিক প্রদেশ থেকে এসেছেন Dr Stenier এঁদের নির্ব্বাচনের জন্য দায়ী! তাঁরই আহ্বানে এঁরা ভাল চাকরী ও ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা ত্যাগ করে' শিক্ষকতা গ্রহণ করে' জাতি-গঠন-কার্য্যে ব্রতী হয়েছেন। এঁরা যে মহৎ সে কথা সকলকেই এক বাক্যে স্বীকার করতে হবে।

Stuttgart থেকে আমার রাইস প্রদেশে যাবার সুযোগ ঘটে। এখানে আমরা ওডেন ওয়ালডস্ স্কুলে (Oden Walds chule) নামক স্কুলটি দেখতে যাই। স্কুলটি জার্ম্মণীর একটা সুন্দর স্থানে অবস্থিত। নগরের কোলাহল থেকে বহুদূরে অবস্থিত হ'লেও, Heidelberg, Darenstadfs, Man hein প্রভৃতি সভ্যতার কেন্দ্র-গুলির সাথে এর সম্বন্ধ আছে। স্কুলটির আরম্ভ অতি সামান্যভাবেই একটি গ্রাম্য সরাইয়ে হয়েছিল। কিন্তু আজ Geothe, Heder, Fitche, Schiller, Humbolt, Plato ও Pestalozgi প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত মনীষিগণের নামানুসারে সাতটি অট্টালিকায় এই স্কুলের কার্য্য সম্পন্ন হয়। স্কুলটি প্রকৃতির অতি সুরম্য স্থানে অবস্থিত। এর একদিকে চষা ক্ষেত, আর একদিকে শ্যামল বনানী বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। তিন থেকে একুশ বছর বয়সের ১৫০টি ছাত্র ছাত্রী এই স্কুলে আছে। প্রত্যেক বাড়ীতে বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের মিশিয়ে থাকতে দেওয়া হয়। সাধারণ নিয়ম এই, তবে Pestalozgi Building-এ শিশুরা এবং Plato House-এ বয়স্কেরা থাকে। যারা এই সমস্ত স্কুল বাড়ীর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত, তাদের "Orduer" বলে। প্রত্যেক স্কুল বাড়ীতে ২৫ থেকে ৩০টি ছেলেমেয়ে ৫জন 'Orduer' এর অধীনে থাকে। বাড়ীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলার জন্যে 'Orduer-রাই দায়ী। ভিন্ন ভিন্ন Orduer-এর ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্য আছে। এ থেকে সহজেই অনুমিত হয় যে, বিশেষ কাণ্ডজ্ঞান না থাকলে কেহ এই Orduer-এর কাজ করতে পারে না। এখানে ছেলেমেয়েরা একই রকমের স্বাধীনতা ও সুযোগ উপভোগ করে। সপ্তাহে একবার করে' গৃহকর্ত্তা বা Orduerরা মিলিত হয়ে তাদের ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা আলোচনা করেন।

স্কুলের ভিতর স্বায়ত্তশাসনপ্রণালী অবস্থিত। শিক্ষক এবং ছাত্রদের নিয়ে School Council গঠিত হয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীদের ভোট দিবার অধিকার আছে। বিভিন্ন দলের স্বার্থ নিয়ে কোন নীচ দলাদলি নাই। প্রত্যেকে স্কুলের উন্নতির জন্য প্রাণপণে কাজ করেন। এই স্কুলে কোন ধরা বাঁধা ক্লাস নাই, প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীই তার পরীক্ষার জন্য যে কোন Course নিতে পারে; কতকগুলি শিক্ষণীয় বিষয় ছাত্র ছাত্রীদের পড়তে বাধ্য না করে' তাদের বিষয় নেবার স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

ছেলে-মেয়েরা নিজেরাই স্কুলে শৃঙ্খলা রাখে। তাদের নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট আত্মীয়তার ভাব আছে। শিক্ষার স্বাধীনতা পেয়ে তাদের মন সঙ্কীর্ণ না হয়ে যথেষ্ট উদার হবার সুযোগ পেয়েছে। তারা পড়াশুনা করে পিতামাতার তাড়নায় নয়, আত্মপ্রসাদ লাভ করবার জন্যে; এখানে শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তিগুলি যাতে বিকাশ লাভ করে,

সে জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়। পড়াশুনার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিলেও ছাত্র ছাত্রীরা খেলা ধুলা, শিল্প, সঙ্গীত ইত্যাদির প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করে না। যাতে প্রত্যেক ছেলেমেয়ের শরীর মন সবল হয়ে ওঠে ও সুস্থ থাকে, সে বিষয়ে যথেষ্ট লক্ষ্য রাখা হয়। যে Co-Education বা সহ-শিক্ষা নামে আমাদের আতঙ্ক উপস্থিত হয়, সেই সহ-শিক্ষা যে এখানে কিরূপ সুচারুরূপে সম্পন্ন হচ্ছে, তা চোখে না দেখ্‌লে বলে' বুঝান যায় না। পূর্ব্বেই বলেছি, আমাকে Stockholmএর আন্তর্জাতিক মহিলাপরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হয়ে Sweeden যেতে হয়। এখানে ও ওখানে যাবার পথে আমি যে কয়েকটা স্কুল দেখ্‌বার সুযোগ পেয়েছিলাম তার মধ্যে Demnarkএর Folk High School ও Stockholm'এর জড় প্রকৃতির ছেলেমেয়েদের স্কুলের নামও উল্লেখ করা যেতে পারে। Folk High Schoolটি কৃষক সম্প্রদায়ের জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা Grundtvig ধর্ম্মযাজক, কবি ও বিখ্যাত শিক্ষাসংস্কারক ছিলেন। দেশীয় যুবকদিগকে তাঁর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এনে তাদের জাতীয় বোধ উদ্বুদ্ধ করবার জন্যেই তিনি এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত করেন। স্কুলটি অনেকটা বাড়ীর আদর্শে গঠিত। ইহা গ্রীষ্মকালে মেয়েদের জন্যে চার মাস ও শীতকালে ছেলেদের জন্যে পাঁচ মাস খোলা থাকে, ছাত্রছাত্রীদের হাতের কাজ ও পৃথিবীতে কোন্ দেশে কি ঘটছে জানাবার জন্যে সাধারণ ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। পরকালের ভাবনার চেয়ে ইহকালের ভাবনা ভাবাই যে বেশী বুদ্ধিমানের কাজ, স্কুলে কর্ত্তৃপক্ষ তা বুঝেই সেই অনুসারে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এই আদর্শে প্রতিষ্ঠিত আরও অনেক স্কুল Denmark'এ আছে।

এই স্কুলগুলি Denmark'এর কৃষক সম্প্রদায়ের অন্তর্নিহিত গুণাবলী বিকশিত করবার এত দূর সাহায্য করেছে যে, তা দেখে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। পূর্ব্বে এ দেশের কৃষকেরা অনুন্নত, বিষন্ন ও সন্দিগ্ধ-প্রকৃতির ছিল। তারা দশজনে মিলিত হয়ে সমবেত শক্তির সাহায্যে কোন কাজ চালাতে পার্‌ত না। কিন্তু আত্মবিশ্বাসী। Folk High School তাদের মনে অনুপ্রেরণা ও বাহুতে শক্তি দিয়ে তাদের অধিক কার্য্যক্ষম ও জ্ঞানান্বেষী করে' তুলেছে।

Stockholm-এর গ্রাম্যমহিলা সমিতি অধিবেশনান্তে আমরা জড় প্রকৃতির বালকবালিকাদের বিদ্যালয় দেখ্‌তে গিয়েছিলাম। ছয় হ'তে আরম্ভ করে' বিভিন্ন বয়সের প্রায় ১৩৮টী ছেলেমেয়ে এখানে আছে। শিক্ষাকাল ৮ বৎসর-ব্যাপী। কখন কখন শিক্ষার জন্যে kindergaten প্রথাটার ব্যবস্থা আছে। তাদের হাতের কাজ, বাগান, পুতুল তৈয়ারী, বইয়ের মলাট তৈয়ারী প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গে পড়াশুনা করে বটে, তবে ওদের থাকা ও ঘুমোবার বন্দোবস্ত আলাদা। এখানে ১২জন শিক্ষক ও ৯ জন শুশ্রূষাকারিণী আছেন। এক একজন শুশ্রূষাকারিণীর তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন বয়সের ত্রিশটি করে ছেলেমেয়ে থাকে। অবাধ্য ছেলেমেয়েদের আশ্রমের একজন বিশেষজ্ঞ সপ্তাহে একবার স্কুলটি পরিদর্শন করে' যান। বালকদিগকে হাতের কাজ শিক্ষা দিবার জন্যে এই স্কুলটির একটি শাখা আছে। এখানে যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাঠের টুল, সাবানের বাক্স, আলনা প্রভৃতি তৈয়ারী করা ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয়। মেয়েরা সীবন, বুনন প্রভৃতি সাধারণ কাজ শিখে এবং এত ক্ষিপ্রতার সাথে পোষাকের সরঞ্জাম প্রভৃতি তৈয়ার করে যে দেখ্‌লে আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে যেতে হয়। যে সব কাজে অর্থাগম হয়, সেই দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখা হয়ে থাকে। প্রতি বৎসর একবার করে' ছেলেমেয়েদের হাতের কাজের একটি প্রদর্শনী হয়ে থাকে। এই প্রদর্শনীতে সর্ব্ব-সাধারণকে তাদের তৈরী জিনিষপত্র দেখান হয় বলে' বালকবালিকারা প্রভূত উৎসাহ লাভ করে।

এইত গেল বিদেশের শিক্ষার কথা। এর সাথে আমাদের শিক্ষার তুলনা কর্‌লে আনন্দ করবার কিছুই থাকে না। আমাদের দেশে স্কুলও আছে, শিক্ষাও দেওয়া হয়; কিন্তু সেই গতানুগতিকভাবে। আমরা আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রাণহীন যন্ত্র করে' তুলেছি। তার না আছে নতুনত্ব, না আছে বিশেষত্ব। সেই থোড়-বড়ি-

(Conservative people)—নতুনের হাওয়া গায় লাগ্‌লে আমাদের অসুখ করে। ইউরোপে জমি চাষ কর্‌বার কত রকম উপায় উদ্ভাবিত হচ্ছে, আর আমরা সেই সৃষ্টির আদি যুগে জনক ঋষি যে লাঙ্গল গরু দেখিয়ে দিয়ে গেছেন তাই আঁকড়ে বসে' আছি। তবে আশার কথা এই যে, আজ আমাদের কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙ্গ্‌তে বসেছে—আজ আমরা আমাদের মধ্যে একদল কর্ম্মী যুবক-যুবতী দেখতে পাচ্ছি। এরা রক্ষণশীলতার পক্ষপাতী নয়। এঁরা মঙ্গলের পক্ষপাতী। এঁরা বুঝতে পেরেছেন যে, জাতির শিক্ষাসম্পদ্‌ ভাবসম্পদ্‌ বাড়াতে হ'লে বিদেশীদের সংস্পর্শে আস্‌তে হবে। পরের সঙ্গে তুলনা না করলে, নিজের দোষগুণ বোঝা যায় না। ব্যাং তার কুয়োকে পৃথিবী মনে করে' অহমিকার পরিচয় দেয়, কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় দেয় না। এইজন্য জাতিকে নতুন করে' গড়্‌তে হ'লে ইউরোপীয় ও অন্যান্য অভ্যুন্নত জাতির সাথে মিলে মিশে হৃদয়ের সংকীর্ণতা ত্যাগ করে' তাদের গুণ গ্রহণ ও নিজেদের দোষ দর্শন কর্‌তে শিখ্‌তে হবে। এই জায়গায় একটা কথা বলে' আমি শেষ কর্‌বো। ইউরোপের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান কর্‌তে হবে বলে', ইউরোপীয়দের অনুকরণ কর্‌তে হবে না। আজকাল আমাদের মধ্যে অনুকরণপ্রবৃত্তিটি প্রবল হয়ে উঠেছে বলে'ই এ কথাটি বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছেন, যাঁরা নিজেদের বৈশিষ্ট্য ভুলে' বিদেশীদের অনুকরণ গৌরবের বিষয় মনে করেন। তাঁরা ভুলে যান যে, ভারত ও ইউরোপের মধ্যে পার্থক্য অনেক। ইউরোপের ধাতে যা সয় ভারতের ধাতে তা সয় না। টেমস্‌ নদীর ধার থেকে একটা বড় Oak গাছ উপ্‌ড়ে এনে গঙ্গার ধারে লাগিয়ে দিলে ওক্‌ গাছ বাঁচ্‌বেই না, মাঝ থেকে পরিশ্রম মাত্র সার হবে। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে যে সভ্যতার উৎপত্তি হয়েছে তা সর্ব্বতোভাবে বহির্ম্মুখ, তার বাহ্যিক আড়ম্বর, আস্ফালন ও ঐশ্বর্য্য অত্যন্ত নয়নমুগ্ধকর কিন্তু হৃদয়হীন। ভারতের বৈশিষ্ট্য আড়ম্বরহীনতা। ভারত যদি ইউরোপীয় সভ্যতার সংঘর্ষে এসে তার গুণ গ্রহণ করে' নিজের অন্তরাত্মার পবিত্রতা অটুট রাখ্‌তে পারে, তবেই ভারতের সাধনা সিদ্ধিলাভ কর্‌বে, নতুবা নহে। *

* প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের দ্বাদশবর্ষের অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবের মহিলা-দিবসের সভানেত্রীর অভিভাষণ।

— সুখ-সেবা —

জীবন আমার সখের নয়, পেয়েছি চাকুরী, দিনরাতের চাকর আমি। ছুটী নাই। ইহাই তপস্যার ন্যায় পরিদৃষ্ট হয়।

প্রহরী আমার বিবেক। দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করায়। শরীরের আরাম নাই, ঘড়ি খুলে খাটিয়ে নেয়, চাকর আমি আপত্তি করতে পারি না, কেবল খেটে যাই—আমি স্বাধীন নই, একান্ত পরাধীন।

মাহিনা পাই শুধু পেটের খোরাক, তাতে হয় না, প্রাণে পাই তৃপ্তি, অন্তরে পাই শান্তি, আর মাথা ভরা জ্ঞান—ভগবানের দেওয়া বেতনেই আমি পূর্ণ। আমার সাধন ভজন নাই, জ্ঞানার্জ্জনের জন্য কোন আয়োজন অনুষ্ঠান নাই; চাকরী করি, বিনিময়ে পাই তার এই আশীর্ব্বাদ।

এর চেয়ে আর বড় চাকুরী নেই—তাই কোন দুরাশার ছলনায় আমার মনিবের সেবা জীবনে আর ছাড়তে হলো না, সমস্ত জীবন এই এক মনিবের সেবা করেই কাটে। এই একনিষ্ঠ চাকর আমি, মুখ বুজে প্রভুর কাজ করে' যাই।

খাই প্রভুর হুকুমে, বিছানায় শয়ন করি প্রভুর হুকুমে, আমোদ করি, কথা কই, মাঠে ছুটি প্রভুর হুকুম ছাড়া নয়। ইচ্ছা হলো খেলুম, ইচ্ছা হলো শুলুম, এমন সব আমার হয় না, হওয়ার উপায় নাই, বিবেক আছে দাঁড়িয়ে, সে আমায় খাটিয়ে নেয়। স্বভাব হয়ে গেছে প্রভুর সেবায় অসাধারণ রকমের। আমি যে পরাধীন, কেন না, চাকরের জীবন ইহা ছাড়া আর কি! আর দেহ-মন-প্রাণ যখন প্রভুর বেতনে সর্ব্বতোভাবে পুষ্টি পায়, তখন আর অসন্তুষ্টি কেমন করে' থাকবে।

প্রভুর কাজ অনেক, চাকুরী খালি প্রতিদিন হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য এমন সুখের চাকর কেউ হ'তে চায় না। মানুষ রজত-মুদ্রার বিনিময়ে নিয়মের চাকর হয়, আর প্রেমামৃতে বুকখানি অভিষিক্ত হয় যে চাকুরীতে তাতে সবাই বিমুখ। তোমরা আমার মত চাকর হবে কি?

— বৈচিত্র্য —

গুহাবাসীর বিচিত্র বস্তি—

জুসলিবল স্পেন দেশের একটি বস্তি। সেখানে সকলেই পাতালপ্রবাসী।

স্পেনের এব্রো নদীর বিপুলপ্রসার সমতল ভূমি উত্তর-দক্ষিণে যেখানে মালভূমির সঙ্গে গিয়া মিশেছে তারই উত্তরে পাহাড়ের সানুদেশে এই গ্রামটী অবস্থিত। বৃক্ষলতাহীন প্রান্তরে সবুজের লেশমাত্র নাই—কেবল রুক্ষ মরুর ধু-ধু আর খাঁ-খাঁ। নির্জ্জন শ্মশানের নীরবতা কাঁপিয়ে মাঝে মাঝে নির্জল বাতাসের শন্-শন্ কাতর কাতরাণি। এর বাইরের কর্কশ রূপ, নীরস আব্হাওয়া, চারিদিকের নিথর নির্ম্মমতা অজ্ঞাত পথহারার প্রাণে অজানা শঙ্কারই উদ্রেক করে। মাঝে মাঝে কঙ্করময় মাটির ঢিবি, ঘর-বাড়ী নাই অথচ হেথা হোথা চিমনি,

এই বৃদ্ধ দম্পতী সত্তর বছর যাবৎ গুহায় বাস করছে
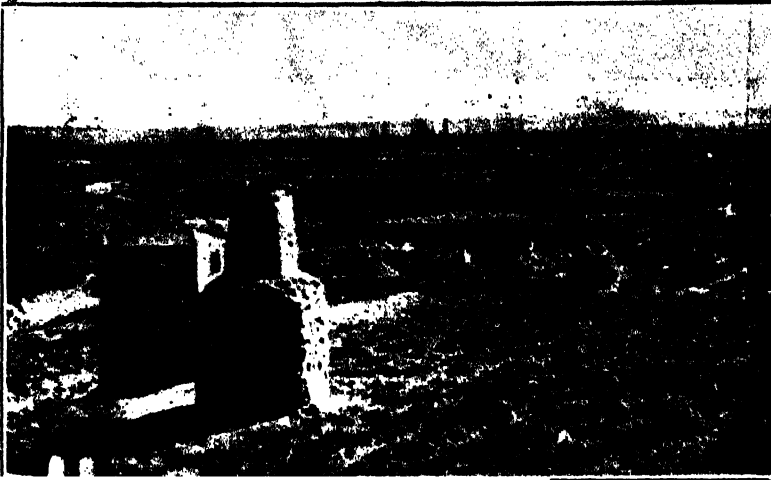
জুসলিবলের বহির্দৃশ্য : উপরিভাগে চিমনি দেখা যাচ্ছে

মনে হয় যেন রিপ-ভ্যান উইঙ্কিল বা পিয়ার গিন্টের দেশ। কিছু দূরেই শ্যামল গিরিশ্রেণী, অপর-দিকে শস্যপূর্ণ মনোরম ময়দান; মধ্যস্থলে অশরীরী ভৌতিক স্বপ্নের দেশ—যেন স্নিগ্ধ চাঁদের বুকে কলঙ্ক-কালিমা।

কিন্তু এই নিদ্রিত পুরীর নিম্নভূমে নিশ্চিন্ত জন-মুখরিত চির-স্বাধীন মানুষের আবাসভূমি মরুর মাঝে মরূদ্যানের মতই বিরাজিত।

এই জুসলিবল বস্তির অধিবাসীরা বাসভূমের জন্য

পাশে পাশে তার ছায়া। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চিমনির মুখ থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে অলস অবসাদে ধূম উদ্গীর্ণ হয়ে জনহীন কান্তারে ছড়িয়ে পড়ে। ধূমস্তররাজ্য

কাকেও কোন কর দেয় না—টাকা পয়সারও বেশী ধার ধারে না। সাদাসিদে বসবাস—কোন জাঁকজমক নাই। অভাব কম, তাই কেহ অনর্থক চিন্তা-ভারাক্রান্ত
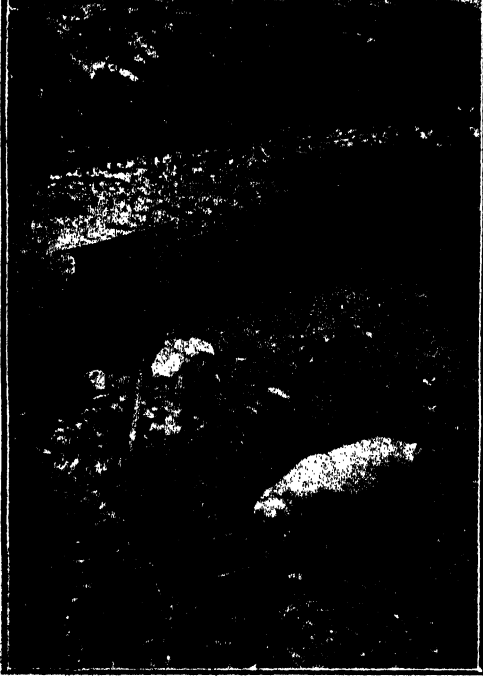
গুহাবাসীদের ঘরকন্না: গৃহপালিত শূকরছানা খেলা করছে

আঁধারপুরীর একটি গৃহ-চিত্র: ঘরের ছাদে শস্যের ডগা ঝুলান

একটি অতি আধুনিক গুহার বহির্ভাগ

ঘর বাঁধ্‌তে হ'লে ইট-কাঠ-বাঁশ প্রভৃতি মালমশলার দরকার। এতে টাকার সমস্যা এসে পড়ে। কোথায় পায়? সে অনেক হাঙ্গামা। তাই এরা মাটির নীচে, পাহাড়ের গর্ত্তে নিজেদের ঘর বাঁধে—যে জায়গা বিশ্বের কারও প্রয়োজনে আসে না। এজন্য আর কেই বা তাদের উপর কড়ির দাবী কর্‌বে? কেহই করে না।

ভূগর্ভে পাথর-মাটি কুঁদে বসত-বাড়ী তৈরী করাও অত সহজ নহে। দীর্ঘদিন লাগে, বহুশ্রমসাধ্যও বটে। এ জন্য একে অন্যেকে সাহায্য করে। একবার বাড়ী বাঁধ্‌লে আর বছর বছর খরচের প্রয়োজন বেশী হয় না। তারা নিজেরাই ও কারিগরের কাজ করে। এই সকল গুহাবাসীদের বস্তির সুবিধা এই যে, উহা নয়। বাইরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্বল্প বলেই নিত্য নূতন সমস্যা-পীড়িত হতে হয় না। নীরোগ স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহ খাটিয়ে

জুসলিবল বস্তির একাংশ

গ্রামটীতে 'খাই-খাই নাই-নাই' নাই—যেন শান্তি ও সুখের একখানা ছবি!

এই পাতালের অধিবাসীদের জীবনেও নিত্য-নৈমিত্তিক উৎসব আছে। আঙ্গুর-সংগ্রহের সময়ে এরা আঙ্গুর দ্বারা মদ তৈরী করে ও সেই সময়ে ঘরে ঘরে আনন্দোৎসবের ধুম পড়ে যায়। ওরা সাধারণতঃ কৃষির দ্বারা জীবিকার্জ্জন করে। এ জন্য ভূমির উপরিভাগে সকলেরই অল্পাধিক কিছু কিছু জায়গা-জমি আছে। সেখানে তারা আঙ্গুর, পিয়াঁজ প্রভৃতি নানারূপ শস্যোৎপাদন করে, ভেড়া শূকর প্রভৃতি গৃহপাল্য পশুও পোষে। যা গতর খাটিয়ে উৎপন্ন করা সম্ভব নয়, এমন যৎকিঞ্চিৎ অনিবার্য্য প্রয়োজনের জন্য সময়ে সময়ে এরা মজুরের কার্য্যও করে।

পর্ব্বতগাত্র বা ভূগর্ভ কুঁদে বাড়ী করা বলে' একজনের বাড়ীর ছাদের উপর হয়তো আর একজনের বাড়ী; একটু ঘুরান পথ। বস্তির রাস্তা-গুলি পাহাড়ের গা-কাটা রাস্তার মত আঁকা-বাঁকা। বুঝি, শিলং, কামিক্ষ্যা বা কয়লার খনির রাস্তার সঙ্গে অনেক সৌসাদৃশ্য আছে।

এদের মধ্যেও দীর্ঘজীবীও অনেকেই হয়। একাধিক ক্রমে এই গুহায় বাস করে'ও সত্তর আশী বছরের বৃদ্ধ দেখা যায়। জুসলিবল-বাসীদের মাঝে একটা স্বাধীন আব্‌হাওয়া থাক্‌লেও সত্য সত্যই এরা সকল দৈন্য দারিদ্র্য থেকে মুক্ত নয়।

টিপরা, কুকী, নাগা প্রভৃতি বাংলা ও আসমের পার্ব্বত্য জাতি ও স্পেনের এই গুহাবাসীদের জীবনভঙ্গীর মাঝে অনেক মিল আছে। কিন্তু একটা পার্থক্য খুব বড়

একটি গুহাবাসী পরিবারের বিশ্রামাগার

হয়েই চোখে বিঁধে—সেটা হচ্ছে ছন্দোবদ্ধ জীবনের পরিচয়ে, যা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সাধারণ ব্যবধানই বলা যায়। এতদ্দেশের সুদূর অরণ্য-নিবাসীদের গতানুগতিক জীবন-

যাপনের প্রণালীকে, তাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে আলোক-প্রাপ্ত সভ্য সমাজের উন্নত স্তরে সমুন্নীত করে' ধরার কোন সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা লক্ষিত হয় না; পাশ্চাত্যদেশের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই আঁধারে-রাজ্যের ছেলে-মেয়েরা নিয়মিত স্কুল গির্জায় যোগদান করে। তারই ফলে জুসলিবলের পাতালপুরীতেও দিনের পর দিন

বিজলী বাতি সমন্বিত একটি গুহা-গৃহ

অভিজ্ঞতা ঠিক ইহার বিপরীত। যেখানে মানুষ আছে সেখানেই জ্ঞান বিজ্ঞানের আলো ধরার একটা মনুষ্যোচিত উদ্যম দৃষ্ট হয়। জুসলিবলের গুহা-বাসীর জন্য ভূমির উপরিভাগে একটা আধুনিক স্কুলের ও সুদৃশ্য গির্জার আধুনিকতার ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেখানকার মিট্‌মিটে দ্বীপ ও নগণ্য আসবাবের স্থান আজ অধিকৃত হচ্ছে বিজলী বাতি ও বর্ত্তমানের বিলাস বৈভবের দ্বারা। স্বল্পকালের মধ্যেই এই গুহাপুরীর নূতন শ্রী অনিবার্য্য।

'সাহিত্য'

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত

রসময় রসিক শেখর সুধারসে ভরা
প্রভুর প্রেম সুধারসে পূর্ণ বসুন্ধরা।

সে বিশুদ্ধ রসতত্ত্ব ব্যাখ্যা যাহে রয়
বিদ্বজ্জন-মুখে শুনি সাহিত্য তাই হয়

— আলোচনা —

অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ও অস্পৃশ্যের মন্দিরপ্রবেশ দোষের নয়

শ্রীজীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতিরত্ন

বর্ত্তমান সময়ে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন লইয়া সমস্ত ভারতে, এক অভাবনীয় আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু শাস্ত্রীয় বচনাদি পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, এই অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন মহামানব গান্ধীর আদেশে নব-ভাবে মূর্ত্তিমান্ হইয়াছে, তাহা নহে। ইহার বহুপূর্ব্ব হইতেই আবশ্যক-মত বর্জ্জন হইয়া আসিতেছে, যথা স্মৃতি-শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

তীর্থে-বিবাহে-যাত্রায়াং-সংগ্রামে-দেশবিপ্লবে।
নগরগ্রামদাহে চ স্পৃষ্টাস্পৃষ্টি র্ন দুষ্যতি॥
আপদ্যপিচ কষ্টায়াং রুগ্ ভয়ে পীড়নে তথা।
মাতাপিত্রোর্গুরোশ্চৈব নির্দ্দেশে বর্ত্তনাত্তথা॥
উৎসবে বাসুদেবস্য স্নায়াদ্ যোঽশুচিশঙ্কয়া।
তাদৃশং কল্মষং দৃষ্টা সচেলো জলমাবিশেৎ॥

এই সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ বিশেষ-ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে বোধহয়, এই সমস্ত প্রমাণ কত দূর স্বার্থ-বিজড়িত তাহা ভাবিলে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য কি, তাহা স্থির করা যায় না। তীর্থে অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন চাই—সেখানে যদি অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন না করা হয়, এবং কেবল যদি ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদির দান ও পূজা গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে অর্থোপার্জ্জনের যথেষ্টই অসুবিধা, অথচ সকল ব্রাহ্মণই অর্থের লোভে জাতি-নির্ব্বিশেষে দান গ্রহণাদি করিতেছেন, বিবাহ-স্থলেও বহু লোকের ও নানা জাতির আবশ্যক—কাজে কাজেই সে স্থলে অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন না করিলে উপায় নাই। এবং বাসুদেবের উৎসব, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা, স্নানযাত্রা ও একটী বৃহদাকার কাঞ্চননির্ম্মিত রথকে সজ্জিত করিয়া, যখন গ্রামের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যাইতে হইবে তখন অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন দরকার; তাহা না হইলে, রথের উপর উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণের বাসুদেব-মূর্ত্তি বা নারায়ণ শিলামূর্ত্তি আছেন বলিয়া, সে সময়ে যদি কেবল স্পৃশ্য জাতি গ্রহণ করা হয় বা কেবল ব্রাহ্মণেই রথটী টানিবে এইরূপ নিয়ম করা যায়, তাহা হইলে গ্রাম ও গ্রামান্তর হইতে রথটী টানিবার জন্য ব্রাহ্মণ-সমূহ অন্বেষণ করিতে হয়; তাহাতে আবার যদি উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণের ঠাকুর হয় ও তাহাতে অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণের স্পর্শে যদি পুনরায় স্পর্শ-দোষ ঘটে, তাহা হইলে ত একদল-ভুক্ত ব্রাহ্মণেরই আবশ্যক হইয়া পড়ে, সুতরাং উক্ত স্থলে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনই আবশ্যক। আর যদি অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন না করা হয়, তাহা হইলে রথযাত্রা উৎসবটী এক প্রকার বন্ধ হইয়া পড়ে বা রথযাত্রার পূর্ব্ব হইতে নানা গ্রামান্তর হইতে এক জাতীয় ব্রাহ্মণের অন্বেষণে বহুবেগ ধারণ করিতে হয়। কিংবা দুই-পাঁচ জনে টানিতে পারে এমন একটী রথ প্রস্তুত করাইতে হয়। আজকাল দু'পাঁচজনে টানিতে পারে, এমন একটী রথ টানিতেও দেখা যায় যে, তাহাতেও অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করা হয় এবং রথযাত্রার পর পুরোহিত, যাজক, ব্রাহ্মণের আদেশানুসারে অস্পৃশ্য জাতিতে রথ স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া দেবতার শুদ্ধি আনিবার জন্য পঞ্চগব্যের দ্বারা উক্ষণ প্রোক্ষণাদি করান হয়। তাহা হইলেই বুঝা যায় যে, পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রবচনানুসারে যে স্থলে মানবের দোষ আসে না, সে স্থলে যে শালগ্রাম সর্ব্বদাই পবিত্র, তাঁহার আবার পঞ্চগব্যের দ্বারা শুদ্ধি, এ যেন ভ্রমাত্মক বলিয়াই মনে হয়, এবং 'সচেলো জলমাবিশেৎ' এই প্রমাণটীও অনর্থক হইয়া পড়ে। অতএব অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন যে নূতন, তাহা নহে, আবশ্যক হইলে, কার্য্যবিশেষে এইরূপ বর্জ্জন যে হইয়া আসিতেছে, তাহা প্রমাণিত হয়। তাই আজ বর্ত্তমান সময়ে দেশবিপ্লব-রূপ আপৎকাল উপস্থিত ভাবিয়া, অদ্বৈতের ন্যায়, ভগবানের অগ্রদূত মহামানব গান্ধী সমাজের

অন্তর্ভাব অবলোকন করিয়া, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিতে মত প্রচার করিয়াছেন। তিনি হইলেন আমাদের একজন আদর্শ হিন্দু, তিনি যদি এই নিয়ম প্রতিপালন করেন, তাহা হইলে মহানির্ব্বাণতন্ত্রের এই বচনানুসারে—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠা স্তত্তদেবেতরোজনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে, লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

দেশের মঙ্গলের জন্য সাধারণের এই নিয়ম প্রতিপালন করা কি কর্ত্তব্য নয়?

যদি তিনি অন্যায় কার্য্যের অনুশীলন করেন, তাহা হইলেও মনে হয় যে, আমাদের এই সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম লুপ্ত হইবার নয়। যখনই লুপ্ত হইবার আশঙ্কা হয় ও ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখনই (গীতায় উক্ত হইয়াছে।)

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সংভবামি যুগে যুগে॥

তিনি মানব-রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া বার বার এই সনাতন হিন্দু ধর্ম্মকে পুনঃ সংস্থাপন করিয়া আমাদিগকে স্ব-স্ব ধর্ম্মে পরিচালিত করান। তাই আজ মহাত্মা সত্য-নারায়ণের ব্রত-কথার—

(যবনাদি জাতি-ভেদ না থাকিবে আর।
আজি কত অনীতি হইল উপস্থিত।
ব্রহ্ম ক্ষাত্র বৈশ্য শূদ্র স্বধর্ম্মবর্জ্জিত॥)

সার্থকতা-সম্পাদন ও ভগবানের আগমনের জন্য অদ্বৈতের ন্যায় হুহুঙ্কার ছাড়িয়া অভয়বাণী প্রদান করিতেছেন। অতএব আমাদের উক্ত আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া প্রতিপালন করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমাদের আছে কি? যিনি ব্রাহ্মণ-সমাজের শাসক, তিনি কি নিজের ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছেন? তিনি পালন করিতেছেন বটে, কি ভাবে? না, এইরূপ যথা—'বেশ্যাভিলাষী হবিষ্যান্নভোজী। হরামি হেমং, ন তৃণং স্পৃশামি, দদামি নিত্যং কৃতচৌর্য্যবৃত্তি, নষ্টস্য কাপট্য বলং প্রধানং॥'

অতএব সমাজশাসক ব্রাহ্মণই যদি শঠতা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা, অভোজ্য-ভোজন প্রভৃতি নিন্দিত কর্ম্ম করিতেছেন, যে-গুলি সত্বগুণের নয়, অথচ লোকচক্ষে ধূলি দিয়া, বলিতেছেন, আমি পবিত্র ব্রাহ্মণ, আমি একজনের কথা বিশ্বাস করিয়া, শাস্ত্রের অবমাননা করিয়া, চাণ্ডালাদি পতিত জাতিকে স্পর্শ করিয়া নিজের কুলগৌরব হারাইব? আমি কি পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা! দেখুন দেখি, আমার মুখের কথা গলার ফাঁস হইয়াছে কি না? আমি যদি স্বয়ংই পতিত, অন্যকে উদ্ধার করিবার ক্ষমতা যদি আমার নাই, অথচ আমি যদি পবিত্র বলিয়া গর্ব্ব করি, আমার ঐ গর্ব্ব থাকে কোথায়? তাই প্রার্থনা এই যে, কত দিনে নিজে উন্নত হইব। আমাদের উন্নতের মধ্যেও কি অনুন্নত নাই? কোন নিয়মই প্রতিপালন করি না, অথচ বেশভূষা করিয়া লোকের নিকট উন্নত সাজিয়া বেড়াইতেছি। যদি বেশভূষাই উন্নতের চিহ্ন হয়, তাহা হইলে অনেক অস্পৃশ্য জাতি ভাল-রূপে বেশভূষা করিয়া ও সচ্চরিত্র হইয়া থাকে, তবে তাহারা সমাজে হেয় হইয়া থাকে কেন? তাহাদের সহিত মিশিতে দোষ কি? অতএব আমরা যেমন হস্তাদিতে অস্পৃশ্য স্পর্শ ঘটিলে ঐ হস্তাদির শুদ্ধির জন্য, গোময়, মৃত্তিকা, সাবান প্রভৃতি শুদ্ধিসূচক দ্রব্যের দ্বারা শুদ্ধি করিয়া, পুনরায় উক্ত হস্তে দেব-পূজা ও আহারাদি করিয়া থাকি, সেইরূপ উন্নতমনাঃ ব্যক্তির কর্ত্তব্য অনুন্নতদিগকে সদা সদনুশীলনে প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহাদের শুদ্ধি আনয়ন করা। তাই আজ মহামানব গান্ধী বুদ্ধদেবের ন্যায় জ্ঞান ও ভক্তি এবং চৈতন্য দেবের ন্যায় সর্ব্বজীবে দয়া বিতরণ করিবার জন্য ভারতে অবতীর্ণ হইয়া ভারতবাসীর দুঃখমোচনে কৃতসঙ্কল্প। ধন্য উন্নতের জীবন, ধন্য উন্নতের আত্মদান। অলমতি-বিস্তরেণ।

— নিষ্কর্ষ —

বাঙ্গালীর পোষাক—

জ্যৈষ্ঠের "বিচিত্রায়" শ্রীসুশীলকুমার দেব বাঙ্গালী জাতির পোষাক সম্পর্কে আলোচনা তুলেছেন—প্রাচীন আর্য্যদের কিরূপ পোষাক ছিল ?

দেব মহাশয় বলিতেছেন—

"ভারতীয় আর্য্যদের মধ্যে সাধারণ পোষাক ছিল ধুতি ও চাদর। এই ধুতি-চাদর রোমক ও গ্রীকেরাও পরিধান করতেন—ধুতি লম্বা-চওড়া, চাদর তার চেয়ে ছোট। চাদরখানাই রোমকদের কাছে চোগায় পরিণত হয়েছে, যা থেকে আমরা করে' নিয়েছি চোগা-চাপকানের চোগা। ইরাণ জয় করে' আলেকজান্দার বনেদী ধুতি-চাদর ত্যাগ করে' ট্রাউজার পরতে সুরু করেন। সেই থেকেই কোট ট্রাউজারের ফ্যাসান চল্‌তি হ'য়ে দাঁড়াল।"

আজ ধুতি-চাদর প্রধানতঃ বাঙ্গালীরই বিশেষত্ব—সেই মৌলিক ধরণটীরই ইতস্ততঃ বৈচিত্র্য গুজরাটী, হিন্দুস্থানী, মাদ্রাজীর পরিধেয়ে দেখা যায়। গ্রীক ও রোমক সভ্যতার মধ্যেও কি বাঙ্গালীর ধুতি ও চাদর একদিন প্রভাব বিস্তার করেছিল ? আর্য্যজাতির পোষাকের এই মৌলিকত্বই যদি থাকে, তবে বাঙ্গালীই আদি মৌলিক আর্য্যজাতি ছিল, একথা ভাবা অসঙ্গত হয় না।

লেখক বলেন—

"বাঙ্গালীর কাছে পরিচ্ছদ ললিতকলায় আত্মপ্রকাশের একটা উপায়।"

তবে 'ইউটিলিটি'র দিক্‌টা তিনি একেবারে উপেক্ষা করতে পারেন নি। তাই কলকারখানার মজুর বা ক্ষেতের চাষীদের পক্ষে ধুতি বা এমন কি কোট ও পূরা হাতার শার্ট অনুপযোগী বিবেচনায়, তা বাতিল করে' তিনি আজানু-লম্বিত প্যাণ্ট ও আ-কনুই লম্বিত-হাতার শার্ট পছন্দ করে' দিয়েছেন—

"টেক-সই হেতু খরচও বেশী নয়। এরূপ জাঙ্গিয়া ও ফতুয়ার সঙ্গে এক জোড়া জুতা হ'লে মধ্যবিত্ত ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার বা মার্চেণ্টকেও বেমানন হবে না। কর্ম্মী মধ্যবিত্তের পক্ষে আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী জাঙ্গিয়া ও ফতুয়ার সঙ্গে উপ্‌রি পুলোভার বা কোর্ত্তা অধিকন্তু হ'লেও ন দোষায় হবে।"

দেখা যাচ্ছে, শ্রমের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর ধুতি-চাদর অচল। কিন্তু পোষাকের প্রগতি-সূচক আইনের প্রস্তাবনা কত দূর রুচি-শিল্পী বাঙ্গালীর বরদাস্ত হবে, সেটা বিবেচ্য।

বাঙ্গালী মেয়ের শালীনতা—

কিন্তু এই সম্পর্কে উক্ত সংখ্যাতেই শ্রীহৃষীকেশ মৌলিকের মেয়েদের পোষাক সম্বন্ধীয় কথাগুলি আরও কৌতূহলজনক এবং সেই সঙ্গে প্রণিধানযোগ্য।

ইউরোপের সঙ্গে তুলনায়, লেখক বলেন—ও দেশের মেয়েদের স্নানের, সাঁতারের পোষাক যতই সমালোচ্য হউক—

"তবু ত শিথিল, প্রতি মুহূর্ত্তে খসে' খসে' যাওয়া শাড়ীর বদলে ওদের মেয়েদের গায়ে একটা আঁটা সার্ট পোষাক থাকে, পোষাক বদলাবার জন্য থাকে একটা তাঁবু।"

কিন্তু—

"আমাদের দেশে গঙ্গার ঘাটে ঘাটে, তীর্থে, স্নানযাত্রা উপলক্ষে এই লজ্জাহীনতার কতটুকু ফাঁক থাকে ? ফাঁক ত নেইই, লজ্জাহীনতা আরও নীরেট হ'য়ে ওঠে উন্মুক্ত দিবালোকে, সহস্র পুরুষের চোখের সামনে, তাদের গা ঘেঁষে গা মাথা মুছে বস্ত্র-পরিবর্ত্তনে।"

লেখকের এই কথাগুলিও প্রত্যক্ষ ও খাঁটি সত্য—

"ট্রেণে ষ্টীমারে, এঁদের দেখ্‌তে পাবেন, প্রায় সমস্ত বক্ষ উন্মুক্ত ক'রে ছেলেদের এঁরা স্তন্যপান করাচ্ছেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত পুরুষের পাশ ঘেঁষে বিস্রস্ত কাপড়-চোপর ও বিশ্রী অঙ্গভঙ্গী করে' (অজ্ঞানতঃই) গভীর নিদ্রা যাচ্ছেন। পিষিয়ে মথিত করে' দেওয়া ভীড়েও দেবতার দর্শনের জন্য মন্দিরে ঢুকছেন।"

"হাট বাজারে লজ্জাহীন—ঘরে কুঁড়ি ফুল"

—ঘরের শ্বশুর শাশুড়ী, ননদ ভাসুরাদি আত্মীয়-স্বজনের কাছে জোর করে' নিরুদ্ধ লজ্জাহীনতা বাড়ীর বাইরে পা দিয়েই এমন করে' সুদে আসলে পুষিয়ে নিতে ছাড়ে না। সত্যই !

শুধু অশিক্ষিতা সাধারণ সম্বন্ধে নয়, আধুনিক শিক্ষিতা নারী সম্বন্ধেও হৃষীকেশবাবুর কথাগুলি শোনা উচিত—

"না বলে' পারছি না, তাঁদের বুকের কাপড় দু-দিক্ থেকে সরে' ক্রমশঃ মধ্যস্থলে এসে সঙ্কুচিত হচ্ছে। ব্লাউজের 'V'টা আয়তনে বাড়ছে এবং তার কোণ দ্রুতগতিতে নীচের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। খেলাধূলায় আজকাল মেয়েদের আগ্রহ দেখা যাচ্ছে খুব। অবশ্যি দৈনিক গৃহকর্ম্মের 'ড্রাজারী' থেকে শিক্ষিতা মেয়েরা নিজেদের মুক্ত রাখ্‌লে শরীরটাকে বলিষ্ঠ রাখ্‌বার জন্য একটু আধটু খেলা ধূলার প্রয়োজন আছে বৈ কি ! কিন্তু এর প্রকাশ্য পরিচয়টা কিশোরীদের পর্য্যন্ত আবদ্ধ থাক্‌লেই বোধ হয় ভাল হয়। হাফ-প্যাণ্ট পরে' তরুণীরা বেড়াবাজী দৌড়োচ্ছে, দিচ্ছে লম্বা লাফ, উঁচু লাফ—কষ্টিউম পরে' প্রকাশ্যে সাঁতরাচ্ছে—আমাদের চক্ষে কতটা সহনীয় হবে বলা যায় না।...মনে হয়, নতুন অনভ্যস্ত স্বাধীনতায় এঁদের অনেকেরই মাথার ঠিক নেই।"

মাথার ঠিক থাক আর নাই থাক—কথাগুলি বর্ত্তমান শিক্ষিত নারীরাও ভেবে দেখ্‌লে ক্ষতি নেই।

সমালোচনা

ভারত কি সভ্য?—স্যার জন উড্রফের "Is India Civilised?"—গ্রন্থের মর্ম্মানুবাদ। অনুবাদক শ্রীকালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী। মূল্য ২৲ টাকা। স্যার জন উড্রফ সৌভাগ্যবান্ বিদেশীয় মনীষী। তিনি ভারতীয় শীল ও সাধনায় শ্রদ্ধাবান্ আর শ্রদ্ধাবান্ বলিয়াই ভারতের সভ্যতার গভীর মর্ম্ম স্পর্শ করিতে অনেকখানি সমর্থ হইয়াছেন। এই ভারতীর মন্ত্রশিষ্যের নিকট আজ আত্মভোলা ভারতবাসীরও যথেষ্ট শিখিবার ও জানিবার আছে। দুর্দ্দিনের আত্মবিস্মৃতি-ঘোরে মোহান্ধ শিক্ষিত ভারতকে সম্বোধন করিয়া তাঁর সতর্কতা-বাণী এই যুগেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রণিধানযোগ্য। আমরা কালীশঙ্করবাবুর অনুবাদ-গ্রন্থ হইতেই কথাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি—"যিনি খাঁটি আত্মত্যাগী তাঁহার অন্য কোন অস্ত্রের প্রয়োজন নাই; কিন্তু যে সংসারে বাস করে, তাহাকে আত্মরক্ষার কার্য্য করিতেই হইবে। যাহারা পূর্ব্বপুরুষদের ধারা হইতে অধঃপতিত হয় তাহারা উৎসন্নই যাইবে। বাঁচিতে হইলে, তাহাদের সকলেরই কর্ত্তব্য—পূর্ব্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত যাহা কিছু মূল্যবান্ তাহা সযত্নে রক্ষা করা।" আর "ধর্ম্মের দোষ নহে, স্বধর্ম্মের অপালনই হিন্দুর অধঃপতনের কারণ।" ইংরাজ মনীষীর মর্ম্ম-কথা আত্মবিস্মৃত জাতির চেতনা সঞ্চার করিলে উপকার হইবে--এই উদ্দেশ্যেই লেখক বঙ্গভাষায় স্যার জনের বিখ্যাত বইখানি অনূদিত করিয়াছেন। অনুবাদ যতখানি প্রাঞ্জল করা সম্ভব, কালীবাবু তাহা করিতে যত্ন ও শ্রমের ত্রুটি করেন নাই। আমরা আশা করি, বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকার নিকট বইখানি একটী প্রয়োজনীয় চিন্তার খোরাক বলিয়া সমাদৃত হইবে।

ফরাসী-বিপ্লব—রেজাউল করীম বি-এ প্রণীত। প্রকাশক—বর্দ্ধন পাব্লিশিং হাউস, ২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা। বইখানি ঐতিহাসিক কাহিনী হইলেও, সরস এবং সুপাঠ্য।

রোগ ও পথ্য—কবিরাজ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায় কবিশেখর এম-এস-সি প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা। ধন্বন্তরী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। দরিদ্র বাঙ্গালীর ঘরে রোগের অভাব নাই, কিন্তু রোগ ও তৎপ্রতিকার সম্বন্ধীয় জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব। রোগের চিকিৎসার পর পথ্যের আবশ্যক হয়—অনেক সময়ে সুবিবেচিত পথ্যগুণেই বহু রোগ সহজে আরাম হয়। এই গ্রন্থে অভিজ্ঞ কবিরাজ মহাশয় সরল প্রাঞ্জল ভাষায় এই পথ্য-তত্ত্ব সবিস্তারে লিখিয়াছেন। সকল গৃহস্থেরই ইহা উপকারে লাগিবে।

বিন্দু-সাধন—শ্রীমদনমোহন সাহা বি-এল প্রণীত। মূল্য ১৷৹ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বিন্দু-সাধন আশ্রম, ঢাকা। যৌন বিজ্ঞান লইয়া ভারতীয় পদ্ধতিতে আলোচনার দিন দিন নানাপ্রকার সূচনা দেখিয়া আশা হয়, এ জাতির আত্মচেতনা ক্রমশঃ ফিরিয়া আসিতেছে। আলোচ্য গ্রন্থে, এই বিদ্যার শুধু প্রয়োজনীয়তা দেখান হয় নাই, বিন্দুর শোধন ও সংরক্ষণের কয়েকটী নির্দ্দেশও দেওয়া হইয়াছে। এই নির্দ্দেশগুলি প্রধানতঃ সুপরীক্ষিত আর্য্য-শাস্ত্র—হঠযোগের আসন, মুদ্রা, প্রাণায়ামের ভিত্তির উপর সংস্থাপিত—তবে গ্রন্থকার সেগুলির একটী সংক্ষিপ্ত-সার সঙ্কলিত করিয়া, উহাকে 'বিন্দু-সাধন' প্রণালী নামে অভিহিত করিয়াছেন ও তাহাই এই গ্রন্থে প্রচার করিয়াছেন। প্রণালীটী সহজ-সাধ্য; ইহার ফল অপ্রাকৃত শৃঙ্গার—গ্রন্থকার ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন এবং তাঁহার বলিবার গুণে বিষয়টী জটিল রহস্য-কুহেলিকার স্তর হইতে অনেকটা আলোর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। বাংলার তন্ত্র ও সহজিয়ার সাধক-মণ্ডলে এই অপ্রাকৃত শৃঙ্গারের সাধনপ্রণালী যুগপরম্পরাক্রমে গুপ্তভাবে প্রচলিত

হইয়া আসিতেছে—এতৎ সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও সিদ্ধান্ত খুবই প্রয়োজন। আমাদের বিশ্বাস, ভারতীয় যৌন-বিজ্ঞানের যথার্থ প্রণালী পুনরাবিষ্কৃত হইলে, পাশ্চাত্যের উৎকট আসুরিক যান্ত্রিক পদ্ধতিগুলির চেয়ে উহা সর্ব্বাংশে স্বাস্থ্যকর ও কল্যাণপ্রদ হইবে। এই গ্রন্থের লেখক এই দিক্ দিয়া একটা প্রয়াস করিতেছেন, বুঝা যায়—কিন্তু একখানি পুস্তকে তাঁহার সকল কথা বোধ হয় সম্যক্ পরিস্ফুট হয় নাই। সমালোচনায় সকল কথা নিঃশেষে তোলা যায় না; আশা করি, লেখকের এসম্বন্ধীয় অধিক অভিজ্ঞতা থাকিলে তাহার বিজ্ঞানানুগত বিবৃতি দিয়া ভারতীয় যৌন-বিদ্যার পরিপুষ্টি ও বিস্তৃত প্রচারে তিনি সহায়তা করিবেন।

নমস্কার-ব্যায়াম—শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। এন, সি, ঘোষ কর্ত্তৃক টাউন আর্ট প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

আলোচ্য পুস্তিকখানিতে যে ব্যায়ামপ্রণালী দেখান হইয়াছে তাহা ভারতীয় শাস্ত্র-স্বাস্থ্য-আব্‌হাওয়ার অনুগত করিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কোনরূপ যন্ত্রপাতি বা ব্যয়সাধ্য উপকরণের প্রয়োজন হয় না বলিয়া সকল অবস্থার মানুষের পক্ষেই ইহা উপযোগী। ব্যায়ামগুলি অন্তর-বাহিরের পরিপুষ্টি সাধন করিবে বলিয়াই বিশ্বাস। বইখানি সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইবার পর আমাদেরই একজন সহকর্ম্মী এই ব্যায়ামগুলির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া উহা অভ্যাস করিতে চেষ্টা করে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সন্তোষজনক ফল পায়। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতেই স্বাস্থ্যকামী দেশবাসীর দৃষ্টি নমস্কার-ব্যায়ামের প্রতি আকর্ষণ করি। বইখানি ও উহার ছবি দেখিয়া যে কেহ ব্যায়ামগুলি অভ্যাস করিতে পারিবেন। পুস্তকের শেষে খাদ্য সম্বন্ধেও বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে।

মণি-মালা—বর্দ্ধমান কুমারী প্রেস হইতে প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম-এ বি-এল, এডভোকেট্—বর্দ্ধমান। মূল্য ৷৹

মণি-মালা কবিতার বই। মোট ৬৭টি কবিতার রচয়িত্রী শ্রীমতী শৈলবালা দেবী ও তাঁর তিন কনিষ্ঠা সহোদরা শ্রীমতী ষোড়শীবালা দেবী, শ্রীমতী শশিবালা দেবী ও শ্রীমতী ইন্দুবালা দেবী।

বিচিত্র অবস্থায়, জীবনের বিভিন্ন মুহূর্ত্তের নারী-হৃদয়ের এই সহজ অভিব্যক্তি সহজ-ভাবেই মর্ম্ম স্পর্শ করে ও সহানুভূতি জাগায়।

ময়ূরপঙ্খী রাজকন্যা—শ্রীহেমদা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীবসুদাকান্ত বন্দোপাধ্যায় বি-এ, ১৯৯নং বৌ-বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম আট আনা।

সচিত্র ছেলেদের বই। চারিটী গল্প আছে। প্রথম গল্পটীর নামে বইখানির নামকরণ করা হইয়াছে। শিল্পী লেখকের সুদূরপ্রসারী কল্পনার রং প্রাঞ্জল ভাষা ও সহজ গদ্য-ছন্দে বন্দী হইয়া রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ছেলেরা পড়িয়া নির্ম্মল কৌতুক ও তৃপ্তি পাইবে। শিশু-সাহিত্যে লেখকের প্রাথমিক প্রয়াস হইলেও, সফল হইয়াছে। লেখার মধ্যে তাঁহার যে আন্তরিক দরদ তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁরই "আমার কথা"য়—

"জীয়ন কাঠির পরশ দেবে নিদেল আঁখির পাতে
কত যুগের ঘুমের মোহ ছুট্‌বে তারই সাথে

* * *

এই নেশাটি থাকবে সাথে যখন হবে বড়
দেশের তরে খাট্‌তে তখন সবাই হবে জড়॥"

প্রচ্ছদপটের ছবিখানি বইখানির নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। কাগজ-ছাপা-বাঁধাই ভাল।

মোহন বেণু—সচিত্র মাসিক, প্রথম বর্ষ, বার্ষিক মূল্য—৩৲, ছাত্রদের জন্য ২৷৹। সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

বৈশাখ হইতে বছর আরম্ভ। মোহন বেণুর মোহন বেশ যেন শেষ পর্য্যন্ত বজায় থাকিয়া ছাত্রছাত্রীদের মনোমোহন করে, এই প্রার্থনা করি।

কথিকা—সম্পাদক—শ্রীহরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বার্ষিক মূল্য—২৷৵৹।

মাসিক জগতের এই নূতন অতিথিকে অভিনন্দিত করি। পত্রিকার উদ্দেশ্য সার্থক হউক।

"ব্রহ্মবিদ্যা-মন্দির"

অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবের ইহা দ্বাদশ বর্ষ। দ্বাদশ বর্ষ পূর্ব্বে এই মন্দিরে যে প্রণব প্রতিষ্ঠা হয় তাহাকে কেন্দ্র করে'ই প্রতি বৎসর এই উৎসবের সূচনা। ইহার পিছনে একটা অলৌকিক রহস্য আছে—যা সর্ব্বসাধারণের নিকট বিশ্বাসের বস্তু না হ'লেও, অতীন্দ্রিয় জগতের যে প্রেরণার বলে আমি এখানে প্রতীক প্রতিষ্ঠা করেছিলুম, এবং এই দ্বাদশ বর্ষ এই মন্দিরকে আশ্রয় করে' আমার জীবনের উপর যেমন বিপর্য্যয় ঘটে গিয়েছে তা' আমার নিকট এত প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত, যে সেই সকল অলৌকিক প্রেরণা আমি আজ আর অস্বীকার করতে পারি না, উহাদের সম্বন্ধে দ্বাদশ বর্ষের ব্রত উদ্‌যাপন করার দিন ব্যক্ত না করলে মন্দিরের ইতিহাস ভবিষ্যজাতির নিকট অজ্ঞাতই রয়ে যাবে।

দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে নরসিংহদাস বাবাজীর যত্নে ও আগ্রহাতিশয্যে এই মন্দির-সেবার ভার আমার উপর অর্পিত হয়। শাক্ত ও বৈষ্ণবের সংঘর্ষের ফলে এই মন্দিরস্থিত প্রতীক বহুদিন পূর্ব্বে চূর্ণ বিচূর্ণ করে' নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত করা হয়েছিল। এই মন্দিরকে রক্ষা করার মত প্রাণের অভাব জাতির মধ্যে লক্ষ্য করলুম। মন্দির দেবতারই আবাসভূমি। মানুষের মাঝে অন্তর্য্যামীকে জাগ্রত করার আশ্রয় একমাত্র মন্দির। কিন্তু মন্দিরের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি আজ হিন্দুর কোথায়? হিন্দুর প্রাণের চেয়েও যদি তার দেবতা অধিকতর প্রিয় বস্তু হ'ত, তা'হলে মন্দিরবিগ্রহের ধ্বংস হ'লেও তার মধ্যে চেতনার সঞ্চার হয় না কেন? সে এমন একটা অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, যে মন্দিরের আবশ্যকতা তার জীবনে অনুভূত হয় না। সে এমনিই মোহাচ্ছন্ন, যে অন্তরের নারায়ণকে জাগ্রত করার যে ক্ষেত্র তার দিকে তার আদৌ লক্ষ্য নাই। এই অবস্থায় কে আজ হিন্দু-মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষা করবে? কে অবহেলিত, প্রাণহীন মন্দিরকে শুচিময় ও সচেতন করে' তুলবে? আমি অনুভব করলুম—দেশের মধ্যে যদি ধর্ম্মপ্লাবন আন্‌ত হয়, তা'হলে মন্দিরকে উপেক্ষা করলে আত্মদ্রোহী হব, ধর্ম্মভ্রষ্ট হ'য়ে পড়্‌ব। আর এই মন্দিরকে রক্ষা করার অধিকার একমাত্র সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীরই আছে। যে মানুষ পৃথিবীর সকল আকর্ষণ ভুলে' গেছে, ঈশ্বরই যার একমাত্র প্রিয় বস্তু; তাঁর দিকে দৃষ্টি রেখে যে সকল অহং ও কামনা বিসর্জ্জন দিতে সমর্থ হয়েছে—সেইরূপ রিক্ত সন্ন্যাসীই এই শ্রী-ঐশ্বর্য্যবিহীন মন্দিরকে স্বীয় ত্যাগ-তপস্যার বলে আবার দেবতার ক্ষেত্র-রূপে রূপান্তরিত করতে পারবে। তখন এই মন্দিরেই হাঁটু গেড়ে ভগবানের চরণে উপবেশন করে মানুষ আবার তৃপ্তি পাবে; তাদের হৃদয় আনন্দে ও প্রেমে ভরে' উঠ্‌বে; মানুষের মাঝে নারায়ণ জাগ্রত হবেন।

প্রথম বৎসরে এই মন্দিরের নিম্ন প্রকোষ্ঠে ত্রিতল বেদীর উপর রৌপ্যনির্ম্মিত ঘটের বুকে সুবর্ণ ওঁকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। অসাম্প্রদায়িক মন্দিররূপে—জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে এই মন্দিরে পূজার অধিকার দেওয়ার জন্যই এই বৈদিক প্রণব প্রতিষ্ঠা করি। অনুভূতির কোঠায় সাড়া দিল—সন্ন্যাসীই এই মন্দির রক্ষা করবে। আমি ঘোষণা করি, পঞ্চ সন্ন্যাসী ইহার জন্য প্রয়োজন—যারা ত্যাগের ও পবিত্রতার হোমশিখা জ্বালিয়ে নিত্যকাল এই মন্দির-দেবতার সেবায় আপনাদের অর্ঘ্য প্রদান করবে। সঙ্ঘের কোন মানুষ সন্ন্যাস নেবে, কে সন্ন্যাস দিবে, তখন এ সকল কিছুই চিন্তায় ছিল না। কয়েকটী সাধক ইহাতে অগ্রণী হ'ল—তারা সন্ন্যাসের দাবী জানা'ল। উত্তরে বল্লুম—আমার স্ত্রী বর্ত্তমান, আমি গৃহী, তোমাদের সন্ন্যাস দেওয়ার অধিকার আমার নেই; সুতরাং অন্য কোথাও সন্ন্যাসীগুরুর কাছ থেকে তোমরা সন্ন্যাসের দীক্ষা গ্রহণ করতে পার। সন্ন্যাসগ্রহণের আকুলতা নিয়ে দুটী সাধক ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করে' শেষে হরিদ্বারে মহাত্মা ভোলানন্দ গিরির কাছে উপনীত হ'লে তিনি তাদের এক একটী রুদ্রাক্ষের মালা প্রদান করে' বল্‌লেন—'তোমরা ফিরে যাও, তোমাদের সদ্‌গুরু আছেন, তিনিই একমাত্র তোমাদের সন্ন্যাস দেবার অধিকারী; তাঁর কাছ থেকেই তোমরা শ্রেয়োবস্তু লাভ করবে।' ফিরে এসে তারা আবার আমায় দাবী জানা'ল। ইহা ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের কথা। আমি ভাবতে লাগ্‌লুম, আমার সহধর্ম্মিণী যতদিন এই পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাক্‌বেন, আমার সন্ন্যাস দেবার অধিকার কোথায়? কিন্তু খাঁটি উৎসর্গের দাবী কখনও ব্যর্থ হতে পারে না। তাই ভগবানের বিধানকেই মাথা পেতে নিয়ে আমি জীবন-সংগ্রামে চলেছি। তাঁর (সহধর্ম্মিণীর) ছিল সবল সুস্থ দেহ। এই উৎসবক্ষেত্রে কি আনন্দের সহিত সকল দিক দেখে ঘুরে বেড়াতেন, এখানে যে সকল মহিলা দর্শক এসে থাকেন তাদের অনেকেই তাঁকে লক্ষ্য করে' থাক্‌বেন। তিনি সবখানি দিয়ে উৎসব-যজ্ঞকে সার্থক করার জন্য কি ব্যাকুলই না ছিলেন! কোন দিকে ত্রুটি না থাকে, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখ্‌তেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন। এমন সুস্থ সবল দেহ, সতেজ মনোপ্রাণ যাঁর তিনিও যখন সহসা ব্যাধিপীড়িত হয়ে পড়্‌লেন, তখন আমি স্পষ্টই উপলব্ধি করলুম, ভগবান তাঁর পার্থিব দেহকে অপসরণ করার জন্যই এই আয়োজন করেছেন। ভগবান চাইছেন, আমার ভিতর দিয়ে উৎসর্গীকৃত আত্মার আকুল ক্রন্দন সার্থক করে' তুলতে। আমার পার্থিব ক্ষেত্রে যেটুকু বাহিরের বন্ধন বলে' মনে হ'ত, সেটাও তিনি নিঃশেষে লয় করতে চান। আমার বলতে পৃথিবীতে আর কিছু

ছিল না, একমাত্র তিনিই আমার সম্মুখে পরিপূর্ণ প্রেমের মূর্ত্তি রূপে আমার হৃদয়কে অধিকার করে' ছিলেন। ভগবানের অভিপ্রায় যখন আমি অন্তর দিয়ে অনুভব করলুম, তখন তাঁর বাঁচার আশা পরিত্যাগ করে'ই তাঁকে কলিকাতায় চিকিৎসার্থ নিয়ে যাওয়া হ'ল; সেখানে সকল মানুষী প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে' এক মাসের মধ্যেই তিনি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করলেন। আমি হলুম একেবারে উলঙ্গ সন্ন্যাসী, আর কিছু বাঁধন আমার রইল না। সঙ্ঘসাধকদিগের দাবী পূরণ করার অধিকারী করে' তোলার জন্যই ভগবান আমায় এই অবস্থায় নিয়ে এলেন। পঞ্চ সন্ন্যাসীর কথা ঘোষণা করেছিলুম; কিন্তু সে সকল মানুষ তখনও আমার চক্ষে ধরা পড়ে নি। এই সময়ে চারিজন আমার কাছে তাদের সন্ন্যাস-জীবনের দাবী জানালে, পঞ্চম জন নির্দ্দিষ্ট হল আপনাদের পরিচিত 'নির্ম্মলচন্দ্র'। সঙ্ঘের একজন প্রবীণ পুরুষ চিরদিন ত্যাগ-তপস্যাকে বরণ করে' জীবনাতিবাহিত করে চলেছেন, আকুমার ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী, জীর্ণ দেহ নিয়ে সঙ্ঘের সেবায় অক্লান্তভাবে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। যখন তার কাছে ব্যক্ত করলুম, 'তোমায় সন্ন্যাস নিতে হবে; পঞ্চ সন্ন্যাসীর মধ্যে তোমার স্থান বিদ্যমান রয়েছে।' তখনিই শুভ্র-বস্ত্র পরিত্যাগ করে' উলঙ্গ হয়ে চিরসন্ন্যাসের বহিশ্চিহ্ন পবিত্র গৈরিক বস্ত্র গ্রহণ করলেন। আপনারা জানবেন—সন্ন্যাসজীবন অতি বড় দায়িত্বপূর্ণ। সন্ন্যাস অর্থে - eternal seed of renunciatian. যে আজ ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী, অথবা কৌমার্য্যব্রত নিয়ে চলেছে, সে ইচ্ছা করলে যুক্তজীবন অর্থাৎ দাম্পত্যজীবন গ্রহণ করতে পারে—এ জীবনে না হোক, পরবর্ত্তী জীবনেও সে তা করতে পারবে। কিন্তু যে একবার সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে জন্মজন্মান্তরের জন্য সে স্ত্রীগ্রহণে বঞ্চিত হ'ল। তার প্রকৃতিকে বাহিরে প্রকাশরূপে দেখতে পাওয়ার অধিকার তার নেই। ভগবানের ইচ্ছাটীকে ধারণ করতে গিয়েই তার এ জীবন। ত্যাগবৈরাগ্যের মূর্ত্ত প্রতীক সন্ন্যাস—জগতের সকল ভোগবাসনা তার নিঃশেষ হয়ে যাবে, প্রাকৃত আকর্ষণ তার আর কিছু নেই। এই ত্যাগমন্ত্রে আমি পাঁচ জনকে দীক্ষা দিলুম। এই পবিত্র গৈরিক চিহ্ন আজ তা'দিগকে নিত্য স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, 'এ মন্দিরে আর কেহ নেই, শুধু তুমি আর আমি।' এমনি করে' পরিপূর্ণ-ভাবে নিঃসঙ্গ না হ'লে ঈশ্বরের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ যুক্তির আস্বাদ পাওয়া যায় না। অনন্ত জীবনের জন্য এই ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত ঈশ্বরের সন্তান দ্বারাই ভারতের ধর্ম্ম-জীবনের কেন্দ্র এই সকল মন্দির রক্ষা পাবে। মন্দির-দেবতার তৃপ্তির জন্য আমায় আজ সকল বস্তুর আকর্ষণ থেকে ভগবান মুক্ত করেছেন। পূর্ব্বে শুনেছিলুম, 'T. S. M.' অর্থাৎ 'True Spiritual Movement' আনতে হবে—সেটা কি ভাবে হবে ধারণায় ছিল না; শুধু একটা প্রেরণা এসেছিল। এই মন্দির প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমি ভাবলুম, একটা মন্দিরের মধ্যে প্রাণ ঢালার করার জন্য যদি কতকগুলি আত্মা আপনাদের সর্ব্বস্ব-বিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হয়, তা'হ'লে এই নীতি অনুসরণ করে'ই আমার জাতির সকল তীর্থ ও মন্দির পবিত্র ও মহীয়ান্ হয়ে উঠবে। হাঁড়ীতে একটা চাল সিদ্ধ হ'লেই যেমন ভাত সিদ্ধ হ'ল কি না বুঝা যায়, তেমনি সমস্ত জীবনব্যাপী কঠোর ত্যাগ-তপস্যার ভিতর দিয়ে যদি একটি মন্দিরেরও নব-রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারা যায়, ইহাকে আশ্রয় করে'ই ভবিষ্যজাতি ভারতে ধর্ম্ম-প্লাবন আনতে সমর্থ হবে—এই বিশ্বাস আমার আছে। তাই আন্দোলন উত্তেজনার বাহিরে দাঁড়িয়ে দ্বাদশ বর্ষ এই মন্দিরে ঋক্-ধ্বনি তোলার চেষ্টা করেছি। এইখানেই উপাসনামন্দিরের উদ্গান উঠছে। প্রতিবেশী ইহার মর্ম্ম প্রথমে উপলব্ধি করতে পারে নি, তারা বিদ্রূপ উপহাস করেছে—এরা ই-ব্রা-হি-ম-ধর্ম্মী অর্থাৎ কোন ধর্ম্মীই নয়, ইংরাজ, ব্রাহ্ম, হিন্দু এবং মুসলমানের মত আজানও গায় ইত্যাদি। এরূপ নানা মন্তব্য শুনা গিয়াছে। আমরা ধর্ম্মচ্যুত বলে'ই হিন্দুত্বের যে মহিমা তা হারিয়েছি। প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম থেকেই ইসলাম তার স্বধর্ম্মকে প্রবুদ্ধ করেছে। বেদের ঋক্-ধ্বনিই জেরুজালেমে খৃষ্টের কণ্ঠেও প্রতিধ্বনি তুলেছিল। হিন্দুর সভ্যতা শাশ্বত সনাতন—কত যুগ থেকে সে সভ্যতা চলে' আসছে! অপর ধর্ম্মের অনুকরণ সে করবে কেন! তার কিসের অভাব আছে? ভারতের বেদ, উপনিষদ, ষড়দর্শন, তন্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি অসংখ্য শাস্ত্রগ্রন্থ অসীম জ্ঞানের ভাণ্ডার। সে অফুরন্ত জ্ঞান-খনির শেষ নেই; উহাদের অতিক্রম করে' নূতন কিছু পাওয়ার বস্তু নেই। আমরা যদি হিন্দুত্বের প্রতি শ্রদ্ধালু, বিশ্বাসবান্ হ'য়ে সেই তত্ত্বকে জীবনে গ্রহণ করি, তবেই আমাদের হিন্দু বলে' আত্মপরিচয় দেওয়ার অধিকার ও সার্থকতা আছে; নতুবা অপরাপর শক্তির চাপে ধরাপৃষ্ঠ হতে আমাদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে।

আমার সমস্ত জীবন দিয়ে মানুষের প্রাণে ধর্ম্মভাবকে জাগ্রত করার চেষ্টাই করে' আসছি। আজ বার্দ্ধক্যের সীমায় এসে দাঁড়িয়েছি। এ পথ 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিত দুরত্যয়া' হ'লেও, যদি এ পথে চলার ইচ্ছা জাগ্রত করা যায়, সত্যই অপার্থিব আনন্দে জীবন ভরে' উঠে। হে তরুণ, তোমরা ভবিষ্যতের আশা, জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ, তোমাদের মাঝে যদি এই ঈশ্বরবিশ্বাসকে জাগ্রত করতে পার, শুধু তোমরা নিজেদের জীবন সার্থক করবে না, একটা পতিত জাতির মুক্তি-পথের আলোর স্বরূপ হবে। এর জন্য আমি যে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর কথা বলেছি, তা' তোমাদের সকলকে হ'তে হবে না। তোমরা তোমাদের সংসারকেই পবিত্র বিশুদ্ধ করে' গড়ে' তোল—ভগবানের নামে, সেবায়। গৃহস্থ তার পরিবারের মধ্যে ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও দিব্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করুক। তার সন্তান হবে বাল-গোপাল, সংসার হবে শ্রীভগবানের লীলানিকেতন। এ পৃথিবীতে শুধু 'আমার' 'আমার' করতে জন্ম পরিগ্রহ করা নয়, 'তুঁহু' 'তুঁহু' অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছাকেই ধরতে হবে, তাকে রূপ দেওয়াই জীবনের প্রকৃত সার্থকতা। গার্হস্থ্য-ধর্ম্মী হয়েও, নিত্য ঈশ্বরের অনুগত হয়ে, তাঁতে সমর্পিত-চিত্ত হয়ে বাস করতে হবে। মানুষ মন নিয়ে সংসারে বাস করে, মন যা চায় তাই-ই আপন ধর্ম্ম বলে' গ্রহণ করে; মনকে তৃপ্তি ও

সুখ দিতেই তার সকল ধর্ম্ম-কর্ম্ম। কিন্তু মনের পশ্চাতে যে মন, প্রাণের উপরে যে প্রাণ, সেই বিরাট্ পুরুষোত্তমকেই প্রতি মানুষ উপলব্ধি করবে। মন চায় না ঈশ্বরের পথে চল্‌তে। সেখানে তোমার ইচ্ছাশক্তিকে জাগ্রত করতে হবে, মনের বিপরীত পথে আপনাকে এগিয়ে দিতে হবে। যত ক্ষণ মনোধর্ম্ম বিদ্যমান থাকে, আমরা তত ক্ষণ পরম পুরুষের সঙ্কেত ধরে অগ্রসর হতে পারি না; প্রতি মুহূর্ত্ত তাতে আবদ্ধ হ'য়ে পড়ি। তাই আমার তরুণ বন্ধুদের বলি—মনের চাওয়া ফেলে দিয়ে একটা নূতন জীবন গ্রহণ কর। প্রতি সংসার হোক দেবতার আবাসস্থল। যিনি আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস দান করছেন, যিনি জীবনধারণে শক্তিপ্রদান করছেন, যাঁর কৃপায় এই সংসারে জন্মগ্রহণ করেছি, সেই অন্তর্য্যামীকে দিনান্তে একবারও কেন স্মরণ করব না? তাঁর উদ্দেশ্যে হাঁটু গেড়ে' কেন সংসারের ভাই-বোন, পিতামাতা উপবেশন করতে কুণ্ঠিত হবে? তাঁর প্রেমের চেয়ে আর কি মহত্তর ভালবাসা পৃথিবীতে আছে? তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নেব না অর্থকড়ি, সন্তানের আরোগ্যকামনা; শুধু প্রার্থনা জানাব—প্রভু তুমি হৃদয়ে নিত্য বিরাজ কর; সংসারের সকল ঘটনায় তোমায় যেন স্মরণ রাখ্‌তে পারি, দুঃখে ব্যথায়ও যেন তোমার অমৃতশীতল স্পর্শ অনুভূত হয়, সম্পদে ঐশ্বর্য্যেও যেন তোমায় বিস্মৃত না হই। এই অহেতুক প্রেমই ধর্ম্মের মূলমন্ত্র। ধর্ম্ম অর্থে সন্তানের রোগারোগ্য-কামনায় সন্ন্যাসী ঠাকুরের পা'য়ে অর্ঘ্য-দান নয়, বোড়াইচণ্ডীর কাছে পাঁঠা মানৎ নয়—এ সব মানুষকে হীন করে, ঈশ্বরের প্রেম থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে। তাই সকল উপধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ কর। তাঁর কাছে আত্মনিবেদন জানাও। আপনার অহঙ্কার ও কামনার লয় কর। ইহা ভিন্ন তাঁর সঙ্গে যুক্তির অন্য পথ নেই। মানুষ বলে, ঈশ্বরোপাসনার জন্য মন্দির নির্দ্দিষ্ট করলে ধর্ম্মকে সীমাবদ্ধ করে' ফেলা হয়; ভগবান তো সর্ব্বত্রই বিরাজমান, সুতরাং যে কোন স্থানে তাঁকে ডাক্‌লেই হয়। ইহা ভুয়া কথা। তোমার আহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে; শয়নগৃহ স্বতন্ত্র রয়েছে, পাঠগৃহও অস্বতন্ত্র নয়—কেবল ভগবানকে ডাকার জন্য নির্দ্দিষ্ট গৃহ রাখ্‌লেই কি যত গোলমাল! ইহা মানুষের কিছু না করার ফাঁকি। প্রত্যেক কাজেরই নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্র রয়েছে, সেই ক্ষেত্রে গিয়ে যথাযথ তা' অনুষ্ঠান করতে হবে।

এই মন্দিরের সঙ্গে আমার জীবনের যে সংযোগ তা' কিছু কিছু ব্যক্ত করলুম। সকল কথা আপনাদের বিশ্বাসযোগ্য নাও হতে পারে, কিন্তু আমার দিক্ থেকে অভিব্যক্তি দিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করায় কথাগুলি আপনাদের বল্‌তে হল। *

* দ্বাদশ বর্ষের প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবের উদ্বোধন-দিবসে শ্রীমতিলাল রায় প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্মাংশ।

দিব্য-বাণী

অপরের সমালোচনায় যে রসনা ক্ষয় হয়, সে রসনায় নাম করতে পার ভগবানের! সময়ও ব্যয় কর আলোচনায়, তা অনায়াসে পৃথিবীর বুকে একটা উপকারী বৃক্ষ রোপণ করেও ধরণীর পূজা দিতে পার। জান, তোমার এই দেহ শৃগাল কুকুরের ভোজ্য, সেবা দিয়ে তাকে দিব্য করার বিধানে অবজ্ঞা যদি কর, এর পরিণাম ইহার অপেক্ষা অধিক নয়। সেবা দাও কৈ?

অহঙ্কার সেবার অধিকার দেয় না; সেবা—অকপট সেবা জীবের, ভগবানের নয়। তিনি সেবার প্রার্থী নন, সেবা তাঁর প্রয়োজন নেই। আর তাঁর সেবা করে' কোন লাভও হয় না, নির্ব্বিকারের সেবায় কোন ফলই দেয় না। সেবা কর জীবের, পতিতের, অজ্ঞানীর—অন্ধকে পথ দেখাও, আর্ত্তকে সান্ত্বনা দাও, দরিদ্রকে পুষ্টি দাও—সেবার অধিকার অর্জ্জন কর।

আষাঢ়ের গ্রহ

শ্রীজ্যোতিঃ বাচস্পতি

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের ফলাফল যাহা লিখিত হইয়াছিল তাহা অনেকাংশে সফল হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটা ব্যাপার দেখা যাইতেছে যে, অমাস্তের ফল অনেক সময়ে অমাস্তটীর পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হইতেছে। বৈশাখের শেষে যে অমাস্ত হইয়াছিল তাহার একটি প্রধান ফল ধনী ও শ্রমিকের মধ্যে বিবাদ এবং শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট। সে ফলটী বৈশাখ মাসের মধ্য হইতে পাওয়া গিয়াছে, অতএব অমাস্তের দুইটী আরম্ভ লইয়াই বিচার করিতে হইবে। তাহা ছাড়া আষাঢ় মাসের ফলাফল দেখিতে হইলে আর একটি বিষয় দেখা দরকার। ৭ই আষাঢ় (২১শে জুন) রবি কর্কট ক্রান্তিতে উপস্থিত হইবে, সেই সময়ে গ্রহ-সংস্থান ৭ই আষাঢ় হইতে ৭ই আশ্বিন পর্য্যন্ত এই তিন মাসের ফলাফল নির্দ্দেশ করিবে।

৭ই আষাঢ় বেলা ৮।১৭ মি ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়ে রবি কর্কট ক্রান্তিতে উপস্থিত হইতেছে। ঐ সময়ে গ্রহ সংস্থাপন এইরূপঃ—র ২।৭।৪ ; চ ৫।২৮।৫১ ; ম ১।২০।৪৬ ; বু ২।২৯।৩৯ ; বৃ ৫।২০।৩২ ; শু ০।২৯।৩৫ ; শ ১০।৫।৬। বং ; রা ৯।১৯ ।৩১ ; প্র ০।৭।৪১ ; ব ৪।১৬।৫৭ ; রু ৩।০।৪৪।

কলিকাতা ও দিল্লীর ভাবস্ফুট নিম্ন লিখিত-রূপ হইবে—

কলিকাতা—

১০ম ০।১৮।২১ ; ১১শ ১।২০।৩২ ; ১২শ ২।২২।১২ ; লগ্ন ৩।২১।২৮ ; ২য় ৪।১৭।৩১ ; তৃয় ৫।১৭।১।

১০ম ০।৬।৪৪ ; ১১শ ১।১০।৪৪ ; ১২শ ২।২২।১২ লগ্ন ৩।১২।৫৬ ২য় ৪।৬।৪৪ ; তৃয় ৫।৪।৪৪।

দেশের রাজনৈতিক আব্‌হাওয়া দিল্লীর গ্রহ-সংস্থান হইতে বোঝা যাইবে। দিল্লীর রাশিচক্রটী দেখিলে প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে ১০মস্থ প্রজাপতির উপর, প্রজাপতির সহিত রবি ও শনির ঘনিষ্ঠ মিত্র প্রেক্ষা রহিয়াছে, ইহার ফলে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ শক্তি-বৃদ্ধি সূচনা করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট জনপ্রিয় হইতেও পারেন, নাও হইতে পারেন; কিন্তু অপ্রত্যাশিত সাফল্য অবশ্যম্ভাবী; গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠাবৃদ্ধিও নিশ্চয় হইবে।

বিরোধী দলের উপর কৌশল দ্বারা অথবা নিজ পক্ষের বলবৃদ্ধি দ্বারা গবর্ণমেণ্ট জয়লাভ করিবেন। যে সকল বিষয়ে গত কয়েক মাস গবর্ণমেণ্টকে বিব্রত হইতে হইয়াছিল তাহার একটা সুমীমাংসা হইয়া যাইবে। আগামী তিন মাসের মধ্যে জেল, হাসপাতাল, দাতব্য প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের দ্বারা কোন সংস্কার-মূলক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা আছে। তাহা ছাড়া শক্তিশালী গবর্ণমেণ্ট নিজপক্ষের সুবিধাজনক কতকগুলি সংস্কার ও ব্যবস্থা নির্ব্বিঘ্নে অবলম্বন করিতে সমর্থ হইবেন। উচ্চ-পদস্থ রাজকর্ম্মচারী, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতিদের পক্ষে এই তিনটী মাস শুভ, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা সম্মানিত হইবে। গবর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থা ভাল না হইলেও আর্থিক সঙ্কট ঋণগ্রহণের দ্বারা দূরীভূত হইবে; মোটের উপর, এই তিন মাস গবর্ণমেণ্ট শক্তি সঞ্চয় করিবেন ও তাঁহার বহু অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

প্রজা-সাধারণের পক্ষে এই মাস তিনটি অপেক্ষাকৃত শুভ হইলেও, খুব শুভ নহে। প্রজা-সাধারণের মধ্যে বেকার-সমস্যা, অর্থাভাব ও অন্নাভাব কম বেশী দেখা যাইবে। রাজনীতি-ক্ষেত্রেও জনসাধারণের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, যদিও তাহাদের মধ্যে বহ্বাড়ম্বর ও বাগ্‌বিতণ্ডা চলিবে, তাহা হইলেও তাহাদের দ্বারা বিশেষ কোন কাজ হইবে না। বিদেশে ভারতের বিরুদ্ধে বহু নিন্দা প্রচারিত হইতে পারে এবং ইংলণ্ডে ভারতের বিপক্ষ দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হইয়া শ্বেত-পত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবে। বিদেশে সর্ব্বত্র ভারতের গ্লানিমূলক পুস্তিকার বহুল প্রচার হইবে।

এই মাসে গবর্ণমেণ্টের সুবিধা হইলেও, দেশের সাধারণ আর্থিক অবস্থা খুব সন্তোষজনক হইবে না। বাজারের অবস্থা একটু গোলমেলে যাইবে, শেয়ার কোম্পানীর কাগজ, ব্যাঙ্কের হার প্রভৃতির উঠা পড়ার জন্য

অনেককে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে, কোন একটী বড় কোম্পানী ফেল হইয়াও অনেকের ক্ষতির আশঙ্কা আছে, তাহা ছাড়া লিমিটেড্ কোম্পানীর ব্যপারে অনেক জুয়া-চুরি ও ফন্দি-বাজী প্রকাশ পাইতে পারে, যাহা লইয়া বাজারে কম-বেশী সাড়া পড়িয়া যাইবে। রেলওয়ে, পোষ্ট-অফিস ইত্যাদি সংক্রান্ত ব্যাপারে দেশের মধ্যে নানারূপ আন্দোলন উপস্থিত হইবে এবং ঐ সকল বিভাগের কর্ম্মচারী ও শ্রমিকদের অনেক অভাব অভিযোগ সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, শিক্ষাবিভাগে কোন কোন ব্যাপার লইয়া কাগজে লেখালেখি চলিবে, শিক্ষা ও শিক্ষার্থী উভয়েরই অনেক অভিযোগ লইয়া অনেক আন্দোলন হইবে। সাধারণ শিক্ষালয়গুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে, এতৎসত্বেও দার্শনিক বৈজ্ঞানিক উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির কম-বেশী উন্নতির সম্ভাবনা আছে। ধর্ম্ম ব্যাপার লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইবে, এবং অনেক ক্ষেত্রে ইহা লইয়া দলাদলি উপস্থিত হইতে পারে; কিন্তু শেষে বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে একটা আপোষ বা রফা হইয়া যাইবে। সাধারণ স্বাস্থ্যের ব্যাপার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে এবং ইহার সম্বন্ধে কোন নূতন বন্দোবস্ত করিবার জন্য অনেক লেখালেখি হইবে। বয়স্ক ব্যক্তির মধ্যে মৃত্যুর হার বর্দ্ধিত হইবে, এবং দুই একজন প্রসিদ্ধ ধনীর মৃত্যুর আশঙ্কা আছে। এই কয় মাসে অন্যান্য বিষয়ে অনেক অসুবিধা গেলেও থিয়েটার, সিনেমা প্রভৃতির সংক্রান্ত ব্যাপার বিশেষ কার্য্যকারিতার প্রকাশ পাইবে এবং উহার সংক্রান্ত ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কোন কোন ব্যক্তির বিশেষ প্রতিষ্ঠা, প্রশংসা ও সম্মান লাভের আশা আছে। সাধারণ ভাবে ৭ই আষাঢ় হইতে ৭ই আশ্বিন এই ফলগুলি সূচিত হইতেছে এবং আষাঢ় মাসের অমান্ত পর্য্যন্ত অর্থাৎ ২৭শে আষাঢ় পর্য্যন্ত এই ফলগুলি বলবৎ থাকিবে। মোটের উপর, আষাঢ় মাসে উপরোক্ত ফলগুলি বিশেষভাবে ঘটিবার সম্ভাবনা।

বিদেশে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব

।নেগ্রী

বিশ্ব-বিশ্রুত নৃত্যবীর বাংলার গৌরব উদয়শঙ্কর ও তাঁহার দল অপূর্ব্ব প্রাচ্য-নৃত্যের মহিমা-ব্যঞ্জনায় প্রতীচীর বিমুগ্ধ প্রশংসার্জ্জন করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি মার্কিণে নৃত্য-কৌশল দেখাইয়া যে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন তাহা উদয়শঙ্করের প্রতি সেখানকার খ্যাতনামা সিনেমা-অভিনেত্রী পোলা নেগ্রীর যে উচ্চ সুপ্রশংস বাণী তাহা হইতেই বুঝা যায়।

তিনি শঙ্করের নৃত্যে বিমুগ্ধা হইয়া সবিস্ময়ে বলেন,—"এনা প্যাভলোভার মৃত্যুর পর নৃত্য-শিল্পের একরূপ চরমোৎকর্ষ আমি বহুদিন উপভোগ করি নাই।"

বিশেষ করিয়া উদয়-শঙ্করের "তাণ্ডব নৃত্য" দেখিয়া মিস নেগ্রী এত দুর হৃষ্টা, উৎফুল্লা ও উত্তেজিতা হন, যে দর্শকের মঞ্চ হইতেই সাশ্চার্য্য চীৎকার করিয়া উঠেন—"অতি উৎকৃষ্ট। বস্তুতঃ তাঁর সমস্ত নৃত্যের সকল ভঙ্গিমা ও ব্যঞ্জনা স্বর্গীয়। শঙ্কর দিব্য! আমি ইহার বেশী কি কম বলিতে পারি না। শঙ্কর সত্যই দিব্য!"

শঙ্কর এই বিস্ময়-বিমূঢ় বাণী অবনত মস্তকে অভিনন্দিত করেন।

ভ্রান্তি-বিভ্রাট

(উপন্যাস)

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অনেক চেষ্টা করে'ও প্রিয়রঞ্জন আর জ্যোৎস্নাকে তেমন করে' ফিরে পেলে না। কথায় কথায় জ্যোৎস্না এমন আঘাত দিয়া বসে, প্রিয়রঞ্জন তা সহ্য করতে পারে না। সে দূরে দূরেই থাকতে চায় আবার জ্যোৎস্নাই তাকে নিয়ে আসে নিকটে টেনে, কিন্তু সেটা আরও বড় আঘাত দিতে। জ্যোৎস্নাও নিরুপায়। ভাঙ্গা মনকে জোড়া দেওয়ার চেষ্টার তার কসুর নাই। কিন্তু রঞ্জনের ভাবে ভঙ্গীতে, কারণে অকারণে এমন সংশয়-সৃষ্টি হয়, যে সে আর স্থির থাকতে পারে না, একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আঘাত দিয়ে বসে। একদিন রঞ্জন বসেছিল ভাতের থালা সাম্‌নে নিয়ে; জ্যোৎস্না আগের মতই স্নেহ-ভরা বুকে তার সাম্‌নে পাখা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, এমন সময়ে কাদু এসে একখানা মোড়া খাম তার হাতে দিয়ে বল্‌ল "দাদাবাবুর চিঠি, বেয়ারা দাঁড়িয়ে আছে বাইরে, জবাব নিয়ে যাবে।" প্রিয়রঞ্জন ভাতে হাত না দিয়েই চিঠিখানা চাইলে জ্যোৎস্নার কাছ থেকে। জ্যোৎস্না ভ্রূ-ভঙ্গী করে' বল্‌ল—"থাক এখন চিঠি। আগে খাও।" রঞ্জন বলে' উঠ্‌ল একটু কড়া সুরেই—"শাসনের সময় আছে, জ্যোৎস্না। যদি জরুরী চিঠি হয়, জবাবটা আগে দিই।" জ্যোৎস্না উত্তর দিল—"তোমায় শাসন করি আমি কোথায়! যা তা বলে' আমায় জ্বালিয়ে মার কেন! কি তোমার অধিকার আছে?" প্রিয়রঞ্জন একটু অপ্রস্তুত হয়েই বল্‌ল, "শাসনের কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে হঠাৎ"—জ্যোৎস্না রুক্ষ কণ্ঠেই জবাব দিলে, "হঠাৎ বেরোয় নি; এ কয়দিন সন্ধ্যার পর বাড়ী ছেড়ে বেরোতে পার নি, সেইটেই হয়েছে তোমার আসল রাগ। আমায় যদি তোমার বাঁধন বলে'ই মনে হয়—ইচ্ছা করলেই ছুটী নিতে পার অনায়াসে। মন গুম্‌রে থাকার চেয়ে, খোলা-খুলি তোমার যা ভাল লাগে সেই ভাল।"

রঞ্জনের কণ্ঠ কিছু বিকৃত হয়ে' উঠ্‌ল, সে বল্‌ল—"থাক তোমার ফিলজপি—কি হয়েছ তুমি! কথায় কথায় ঝাঁজ দেখাও, মন যেন বিষিয়ে উঠেছে—কেন বল দেখি?" "অবশ্য কারণ আছে"—এই বলে' চিঠিখানা রঞ্জনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে জ্যোৎস্না বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। চিঠি খুলে' রঞ্জন দেখ্‌লে টুনু লিখেছে—তার দাদা সুকুমারের চাকরী হয়েছে পাটনায়, আজ রাত্রে ভোজের নিমন্ত্রণ। অনেকদিন তার দেখা পাওয়া যায় নি; যদি আসার বাধা থাকে, পত্র-বাহককে দিয়ে যেন জানিয়ে দেওয়া হয়।

জ্যোৎস্না বাহিরে গিয়েও স্থির থাকতে পারল না তার মনে হ'ল—স্বামীর উপর সে অত্যাচারই করছে। রঞ্জন চিরদিনই উদাসীন; বসিয়ে যদি তাকে খাওয়ান না যায়, আধ-খাওয়া করে'ই সে উঠে যাবে—কি পাপ-মন তার! সে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে' আবার পাখা নিয়ে বস্‌ল রঞ্জনের সাম্‌নে। বল্‌লে—"চিঠি পড়া হয়েছে তো—এখন খাও। রাগি তোমার ভাল'র জন্যে; কিছুদিন ধরে' এমন হয়েছে, যেন সব বিষয়েই উড়ু-উড়ু, খাওয়া-দাওয়া তো একেবারেই গেছে। আর্শী দিয়ে মুখখানাও কি দেখ না? চোখের কোল গেছে ঢুকে'—এক হাত কণ্ঠাও বার হয়ে পড়েছে—এ সব আমাকেই জ্বালাতন করা!" রঞ্জন বল্‌লে—"লেখার প্যাড্‌টা আর ঐ অটমেটিক পেন্‌টা একবার এনে দাও। জবাবটা দিয়ে দিই। বেয়ারা দাঁড়িয়ে আছে।" ..."থাক্ দাঁড়িয়ে। আমি বল্‌ছি, আগে খেয়ে নাও।"

"সকল বিষয়েই তোমার জিদ্! এক ছত্র লিখে দিতে আর কত সময় যাবে?" জ্যোৎস্না টেবিলের উপর থেকে একখানা চিঠির কাগজ আর কলমটা রঞ্জনের হাতে দিয়ে বল্‌লে—"এমন কি জরুরী চিঠি তোমার এল—নাওয়া খাওয়ার সময় থাকে না!" চিঠিখানা খোলাই পড়েছিল; মেঝের উপর থেকে জ্যোৎস্না তা' কুড়িয়ে নিয়ে শিউরে উঠ্‌ল, নিঃশব্দে লেখাটুকু পড়ে নিয়ে, পাথরের মত নিস্তব্ধ হ'য়ে সেইখানেই বসে' পড়্‌ল। মুখ দিয়ে তার কথা বাহির হ'ল না। প্রিয়রঞ্জন চিঠির উত্তর লিখে' কাদুকে

দিয়ে তা' পাঠিয়ে দিলে বেয়ারার কাছে। তারপর আধ-খাওয়ার পর লক্ষ্য পড়্‌ল জ্যোৎস্নার দিকে; সে বসে' আছে অচল স্থির হয়ে। ভাতে মাছি এসে বস্‌ছে, সে দিকে তার লক্ষ্য নেই—পাখা পড়ে' আছে তার পাশেই; জ্যোৎস্না প্রাণহীন জড়ের ন্যায় নিস্পন্দ!

কয়েক মাস ধরে'ই এই ভাব সে দেখে' আস্‌ছে। জ্যোৎস্নার পবির্ত্তন আজ নূতন নয়। সে আর কোন কথা উত্থাপন না করে'ই উঠে পড়্‌ল আসন ছেড়ে', জ্যোৎস্না অস্বাভাবিক কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"খেলে না যে পেট ভরে'—কে তোমার দাসী বাঁদী আছে বল তো, সোহাগ করে' বসিয়ে বসিয়ে রোজ খাওয়াবে?"

রঞ্জন এ কথার আর কোন উত্তর দিল না—সে নীরবেই ঘর ছেড়ে' বেরিয়ে গেল।

দিন রাত কেটে গেছে। রঞ্জন বাড়ী ফেরে নি। জ্যোৎস্না সেই যে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়েছে রঞ্জন চলে' যাওয়ার পর, সেও ভূমি ছেড়ে' ওঠে নি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে কিছু গোলযোগ বেধেছে, একথা ঝি-চাকরেরও বুঝ্‌তে বাকী নেই। বেলা হ'ল, জ্যোৎস্না ঘর ছেড়ে বাহির হয় নি—মায়ের কাণে গিয়ে এ কথা পৌছল। কাদু এসে বল্‌ল—"বৌদি, মা ঠাকুরুণ ডাক্‌ছেন—শীঘ্র উঠে' আসুন।"

জ্যোৎস্না শূন্য গৃহের চতুর্দ্দিকে একবার চেয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে খানিক কেঁদে নিল। তার শূন্য হৃদয় হাহাকার কর্‌ছিল; মনে হচ্ছিল, উৰ্দ্ধশ্বাসে সে কোথাও পালিয়ে যায়। কিন্তু শ্বশ্রূঠাকুরাণীর অসম্মান করার মত মন তার ছিল না। যদি কোথাও কিছু সান্ত্বনা পাওয়া যায়, এই স্নেহময়ী জননীর বুক থেকেই পাওয়া যাবে, এই ধারণা তাহার ছিল। সে সাশ্রুনয়নে নতমুখে শ্বাশুড়ীর চরণপ্রান্তে গিয়ে বসে' পড়্‌ল। তিনি বল্‌লেন—"কি হয়েছে তোমাদের, বল ত? রঞ্জন নাকি কাল বাড়ী আসে নি! সে তো এমন ছিল না, ঝগড়া করেছ বুঝি?"

জ্যোৎস্না ইহার কি উত্তর দেবে; নীরব হ'য়ে রইল।

মা আবার বল্‌লেন—"দেখ, রঞ্জনকে আমার বুকের ক্ষীর দিয়ে এতখানি করে' তোমার হাতে তুলে' দিয়েছি—তার ভাল-মন্দের দায়িত্ব এখন আর আমার উপর নির্ভর করে না—তোমার বিশ্বাস-ভক্তি, তোমার সেবা-সান্ত্বনা তার এখন স্বাস্থ্য, আয়ুঃ, সৌন্দর্য্য। এই ধর্ম্ম যদি না রাখ, রঞ্জনের সর্ব্বনাশ হবে। তোমার সে যে কত বড় বিপদ্, ছেলে-মানুষ এখন হয় তো বুঝ্‌তে পার্‌বে না। আমি রঞ্জনের কোন দোষ দেব না। আগে তুমি খুঁজে দেখ—হয় তো কোথাও সেবা তোমার ক্ষুণ্ণ হয়েছে, কোথাও ভক্তির ত্রুটি করেছ, কোথাও সান্ত্বনা না দিয়ে কটু কথা বলেছ। বিশ্বাস যেখানে স্বামীকে দুর্জ্জয় করে, সংশয়ে হয় তো তাকে সেখানে অবনত করেছ। স্ত্রীর পাপে স্বামীর অধঃপতন—রঞ্জনের জন্য তোমাকেই আমি দায়ী কর্‌ব, বৌমা।"

এই কথাগুলির নির্ঘাত উত্তর দেওয়ার জন্য জ্যোৎস্নার অধর স্ফুরিত হ'য়ে উঠ্‌ছিল। তার মনে হচ্ছিল, যেখানে স্বামী অবলার অকপট বিশ্বাসের বুকে ছুরি দেয়, সেখানে বিশ্বাসের প্রস্তর-বেদীও যে ভেসে যায়। সেবা-ভক্তি দিয়ে স্বামীর মন যখন খুঁজে পাওয়া যায় না', তখন অন্তঃকরণ যে মরুভূমি হ'য়ে যায়। পূজনীয়া শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীকে কেমন করে' সে উত্তর দিবে? কাজেই সে চুপ করে' রইল। মা কাদুকে ডেকে বল্‌লেন, "মাথার চুলটা আঁচড়ে দিয়ে, সকাল সকাল তেল মাখিয়ে নাইয়ে দে। কাল থেকেই যে খায় নি, মুখ দেখে' বুঝ্‌ছি। রঞ্জন যেখানেই যাক, সে মায়ের গণ্ডী ছাড়্‌তে পারবে না—কাজ শেষ হ'লেই সে ফিরে' আস্‌বে মায়ের দুয়ারে। তুমি বৌমা, আমার কথা ঠেল না। খেয়ে দেয়ে হাসি-মুখে থেকো। মনে রেখো—পুরুষের মন নারীর বিষণ্ণতায় যত বিরক্ত হয়, এমন আর কিছুতে নয়। হাজার দুঃখ পাও, হাসি-মুখ ঢাকা দিও না অন্ধকারে। তা' হ'লেই আকাশে যত মেঘই ঘনিয়ে থাক, সব কেটে যাবে এক নিমিষে।" শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী এই বলে' ঢুকে' গেলেন ঠাকুর-ঘরে। এক প্রহর রাত্রির পর মায়ের ঘরের দিকে রঞ্জনের গলা পাওয়া গেল। রঞ্জন চাপা গলায় কথা বল্‌ছে, স্পষ্ট শোনা যায় না; মার কথাগুলি খুব ধারাল এবং স্পষ্ট। জ্যোৎস্না কাণ পেতে মায়ের কথাগুলি শুনে'

বুঝে নিল, রঞ্জন চাইছে—মায়ের ঘরেই বিছানা পেতে শুতে, মায়ের আশ্রয় সে যেন ছাড়তে চায় না—মা ছেলেকে শাসিয়ে তার নিজের শয়ন-গৃহে ফিরে' যেতে হুকুম দিচ্ছেন।

জ্যোৎস্না সারাদিনই চোখের জল ফেলেছে। টেবিলের ওপর টুনুর চিঠিখানা, এখনও পড়ে' আছে; সে অন্ততঃ দশ বার সেখানা পড়েছে। প্রত্যেক অক্ষরটী বিষাক্ত কীটের মত তার বুকে জ্বালা সৃষ্টি করেছে। কেঁদে কেঁদে সন্ধ্যা বেলায় বুকের উপর যে জগদ্দল পাথরটা চেপে বসেছিল, সেটা একেবারে না সরে' গেলেও, যেন মনে হচ্ছিল, হাল্কা হয়ে গেছে। সন্ধ্যার সময়ে উঠে' সে মায়ের কথামত পরিপাটী বেশে স্বামীর প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় ঘরের মধ্যে ছট্‌ফট্‌ করছিল বন্দিনীর মত। সংশয় ঘৃণা, সব কিছু চেপে রেখে আজ সে স্থির করেছিল, রঞ্জনের পায়ে লুটিয়ে পড়বে; কেননা, অবলা নারীর স্বামী ভিন্ন কি আর গতি আছে! কিন্তু মায়ের কাছে রঞ্জনের যে অনুযোগ শোনা গেল, তাতে স্পষ্টই মনে হ'ল —রঞ্জন চাইছে, তার সংসর্গ থেকে দূরে থাকতে। অভিমানে তার বুকের এক একখানা হাড় যেন খসে' পড়ার উপক্রম করল। রুদ্ধ নিঃশ্বাস তাকে বিদীর্ণ করে' দিতে চায়, ব্যথার বৃশ্চিক-দংশনে সর্ব্ব-শরীর জ্বলে' উঠে। এ প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়াই শ্রেয়ঃ। নারী যে আত্মহত্যা করে কত দুঃখে, নারী ভিন্ন আর কেউ তো বুঝে না! তার স্বামী তার মুখ যদি না চায়, নিরাশ্রয়া নারীকে তবুও স্বামীর মুখ চেয়ে থাকতে হবে! টুনুও নারী, নিশ্চয়ই সে একদিন আশা করেছিল—রঞ্জন তাকে বুকে তুলে' নেবে, সেই আশার সুরই সে এখনও ধরে' আছে, নারীর স্বভাবেই ইহা সম্ভব হয়। পুরুষ মনে করে—তার মনের টুক্‌রো টুক্‌রো দিয়ে অনেক নারীকে বেঁধে রাখবে; নারী শেখে নাই এমন জুয়াচুরী—তার মন যদি ভাঙ্গে, শুধু ভাঙ্গা মন নিয়ে বেঁচে' থাকাই তার দায় নয়, সে যে তার কি সর্ব্বনাশ নারী ভিন্ন অপরে তা বুঝবে না। এই দিক্‌ দিয়ে টুনু তো অপরাধিনী নয়। পুরুষের এই উচ্ছৃঙ্খল বাহাদুরী নারীর আর সহ্য করা উচিত নয়! কিন্তু কি করবে সে! অসহায়া অবলা লতার মত কোমল নমনীয়; গর্ব্বে যদি তাকে উন্নত হ'তে হয়, তবে যে তাকে আশ্রয় করতেই হবে একটা কঠিন ঋজুমূর্ত্তি পুরুষকে। সে পুরুষ একটী মাত্র লতার আশ্রয় যদি নাই হয়, নারীর সে বিচারের অধিকার নাই—তার চাই আশ্রয়।

মা বলেছেন—স্ত্রীর ভক্তি, বিশ্বাস, হাসি-মুখ পুরুষের আয়ুঃ, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য। গুরুজন তিনি, মন যাহাই বলুক না—তাঁর কথা সত্য বলে' মেনে নিতে হবে। ভাবতে ভাবতে জ্যোৎস্নার অমল মুখশ্রী রক্তের রেখায় বিচিত্র হ'য়ে উঠল। ললাটের শিরা স্ফীত, অধরোষ্ঠ স্থির, নীলাভ, স্নায়ু-নিচয় ঘন ঘন কম্পিত হ'তে লাগল। রঞ্জন গৃহমধ্যে প্রবেশ করল, সে যে মায়ের তাড়নায়—জ্যোৎস্না তা' জেনেই ঠিক অভিনয়ের ভাবে উচ্ছ্বাসে তার হাত ধরে' কাছে নিয়ে বলল—"আমি শুনেছি তোমার সব কথা—আমি সাপের মত ভয়ের কারণ হয়েছি তোমার; অপরাধিনী আমায় ক্ষমা কর।"

রঞ্জন অপরাধীর মত জ্যোৎস্নার মুখের দিকে চেয়ে শুষ্ক কণ্ঠে বলল—"বড্ড ভয় করছিল, জ্যোৎস্না। হঠাৎ চলে' গেলুম, তোমার উপর রাগ করে'। ইচ্ছা করে'ই অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত কাটিয়ে দিলুম বাজে কথায়। তারপর কত ব্যথা নিয়ে রাত কাটালুম সুকুমারের বাড়ীতে, তা' তোমায় বলতে পারি না—সারাদিন বুকের মধ্যে কত যে যন্ত্রণা তুমি সে বুঝবে না, জ্যোৎস্না। এত ব্যথা তোমার রূঢ় কথায় যদি হ'ত, তোমার কাছ থেকে দূরে থাকাই তো তার প্রতিকার—কিন্তু না, সারাদিন তোমারই বিষণ্ন মূর্ত্তি আমার হৃদয় আঁধার করে' রেখেছে। সে অন্ধকার ক্রমেই দুর্ভেদ্য হয়ে উঠছে, বুঝি আলো আর ফুটবে না। তাই ভয়ে ভয়ে বাড়ী ফেরা। এই অন্ধকারের ভয়ে মায়ের কাছে আশ্রয় চাওয়া। অতিশয় ভয়ে তোমার কাছে এসেছি। আমি নিরুপায়, জ্যোৎস্না। তুমি আপনি হেসে কথা কয়েছ, কাছে এসে দাঁড়িয়েছ; তাই কিছু নির্ভয় হয়েছি—তা' না হ'লে আবার বুক-ভরা অন্ধকার নিয়ে আমায় ফিরে' যেতে হ'ত।"

জ্যোৎস্নার মনে হ'ল, মায়ের কথাই সত্যি। পুরুষগুলো সত্যই নারীর হাতের যন্ত্র। নারী যদি হাসে, পুরুষের বুকের অন্ধকার ঘুচে যায়; নারীর সোহাগে পুরুষ হয়

আপনহারা। কিন্তু—তবুও একটা কিন্তু বুকের মাঝে সংশয়ের লক্ষণ জাগায়। এ কি চায় আমারই মুখের হাসি, আর আমারই বেদনার আঘাতে হৃদয়-বীণা কি এর নীরব হয়ে যায়! তা' যদি হয়, নারীর এর চেয়ে মহিমা এ পৃথিবীতে আর কি আছে! নারীর সকল সার্থকতা পুরুষের এই একনিষ্ঠ প্রেমেই তো সম্ভব। ব্যথার আঘাতে জ্ঞানের ঝরণা বুঝি ঝরে; তাই জ্যোৎস্নার চিন্তাধারায় ফুটে' উঠ্‌ল—নারীত্বের বিচিত্র সমস্যা। যে নারী পতিহারা, যে নারী আশ্রয়হীনা, পুরুষের সকল সংসর্গে বঞ্চিতা, তার মুখের হাসি কার প্রাণে মাধুরী লালিমা ঢেলে দেবে? তার অভিমানের অশ্রু কার প্রাণে তুল্‌বে বিপ্লবের ঝড়—নারীর লাস্য সেখানে কি কেবলই ব্যর্থতাময় নয়! নারী তবে অসহায়া, তার সকল জীবনের ছন্দোভঙ্গী একান্ত তার জন্যেই নয়; তার সবখানি গড়ে' উঠেছে, পুরুষের পূজার অর্ঘ্যরূপে, সে আত্ম-নিবেদনের পবিত্র নির্ম্মালা—পুরুষের চরণেই ঢেলে' দিয়েই তার তৃপ্তি। কিন্তু টুনুর কে আছে! সেও যদি আত্মদানের অর্ঘ্য নিয়ে', এই চরণেই ডালি দিতে চায় আপনাকে—নারী সে, সে ব্যথা যে নারীকেই বুঝ্‌তে হবে, অনুভব কর্‌তে হবে, সয়ে নিতে হবে! না-না-না—বিদ্রোহের প্রবল ঝড়ে স্নিগ্ধ ভাব-নির্ঝর উল্টে-পাল্টে গেল এক মুহূর্ত্তে। নীরেট নিষ্ঠুর-মূর্ত্তি জ্যোৎস্নার মুখ দিয়ে' কর্কশবাণী বাহির হয়-হয়,—"যাও তুমি আমার কাছ থেকে—যার আর কিছু আছে তার আমি কিছু নই, কেহ নই—আমি একলা—এই পৃথিবীতে আমি ভয়ঙ্করী হয়ে' থাক্‌ব।" কিন্তু সে নিজেকে এক নিমিষে সাম্‌লে নিয়ে হেসে' বল্‌ল—"পুরুষেরা দেখ্‌তেই একটা কড়া লোহার মত নীরেট শক্ত—এত কোমল, এত নমনীয় তোমরা! আচ্ছা, সত্যি বল্‌ছ, সারাদিনে যত কেঁদেছি, যত ব্যথা পেয়েছি, এই সব ভেবেই কি তুমি ব্যথিত হয়ে' উঠেছিল? আমার কথা কি তোমার মনে ছিল?"

"সত্যি বল্‌ছি, জ্যোৎস্না—তোমার একটা কটু কথা কত ক্ষণ মনকে ব্যথিয়ে রাখ্‌তে পারে? তোমার ব্যথার মূর্ত্তিই তো আমার সবখানিকে মোচড় দেয় রাত্রিদিন। বল না, জ্যোৎস্না—কেন তুমি এমন হ'লে?"

আশ্চর্য্য—জ্যোৎস্নার হৃদয়-তন্ত্রীর মীড়ে মীড়ে কা' ধ্বনি তুল্‌ল—আশ্চর্য্য। টেবিলের দিকে একবার বক্র দৃষ্টিপাত করে' মনে হ'ল, নাকের ডগায় সেটা ধরে' বলে—রাত্রিদিন কার সোহাগে কাটিয়ে এলে? কি প্রবঞ্চনা, কি শঠতা! শাস্ত্র বলে—পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতির বৈচিত্র্য; কিন্তু মিথ্যা কথা! নারীর নৈকট্যে পুরুষের অনেক বিকৃতি দেখা দেয়। দৃষ্টি যে সীমাবদ্ধ, তা' না হ'লে,—উঃ, সারারাত্রি এমনই মিষ্টি-মিষ্টি কথায় টুনুরও মন ভুলিয়ে এসেছে এই পুরুষ! জ্যোৎস্নার গা জ্বলে' যেতে লাগ্‌ল রঞ্জনের কথায়; কিন্তু তার বুকে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে—বিপরীত কথা বলার শক্তি নিয়ে'। সে বল্‌ল, "কাল সারা রাত, আজ সারা দিন খাওয়া হয় নি, ভাল করে' ঘুমোও নি নিশ্চয় কাল রাতে। টুনু একা পেয়ে গান শুনিয়েছে, হেসেছে, বাধ্য হয়ে, কষ্ট করে'ই সব সয়ে' নিয়েছ—কানুকে ডাকি, ঠাকুরকে বলুক, গরম গরম কয়েকখানা লুচি ভেজে দিতে। আজ কিন্তু মাথার দিব্যি দিয়ে বল্‌ছি, আর রাঙা মুখ দেখ্‌লে ভুলব না। টুনু মুনু যেই হোক, চিঠি পেলেই যে দৌড়বে, সেটী আর হচ্ছে না!"

"না কিছুতেই না। সুকুমার পাটনায় চলে যাচ্ছে, প্রফেসারী পেয়েছে। টুনুও গেল। তাদের গাড়ীতে চড়িয়ে দিয়ে এলুম। সত্যি বল্‌ছি—সেই পুরীর সমুদ্র-তটে যেমন করে' তোমায় পেয়েছিলাম, তেমন করে' যদি ভরিয়ে রাখ, জ্যোৎস্না তোমায় আর চোখের আড় করব না।" জ্যোৎস্নার সকল দুঃখের অবসান বুঝি হ'ল এই কথায়। কুটিল চক্ষু স্বামীর মুখের দিকে চেয়েই নত প্রসন্ন হ'য়ে উঠ্‌ল। না, না, মিথ্যা সংশয়—এ যে তাহারই!

নবম পরিচ্ছেদ

কয়েক মাস বেশ নির্ব্বিবাদেই কেটে' গেল জ্যোৎস্নার। প্রিয়রঞ্জন তাকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য উঠে' পড়ে' লেগেছিল। জ্যোৎস্নার প্রতিভা ছিল, সে মাস ছয়েকের মধ্যেই খান-তিনেক ইংরাজী বই শেষ করে' ফেল্‌ল। উভয়েরই উৎসাহের সীমা নেই। রঞ্জন বলে, "আর

বছরখানেক পরেই তোমায় ম্যাট্রিক দিয়ে দেব।” জ্যোৎস্নাও বলে—“ধ্যুৎ, তাও নাকি হয়? দশ বছরের পড়া দেড় বছরে হবে, কোন দেশী কথা তোমার?” প্রিয়রঞ্জন পণ্ডিতের মতই ভারী গলায় উত্তর দেয়, “যে একটা ভাষা ভাল করে' শেখে, তার কোন ভাষাই আয়ত্ত করতে বেশী দেরী লাগে না। তা' ছাড়া তোমার এমন পরিষ্কার মাথা—বছর কাটবে না, তুমি নিজেই দেখ্‌বে কোন ম্যাট্রিক ক্লাসের ছাত্রীর চেয়ে তোমার কম বিদ্যে হয় নি।” জ্যোৎস্নার হৃদয়খানি ভরে' উঠে কৃতজ্ঞতায়; গৌরবে মুখখানি লাল হয়ে' যায়। প্রিয়রঞ্জনের মনে রূপের তুফান খেলে; দুজনের দিন কেটে যায় সুখে, আনন্দে, এক নিমিষে।

হঠাৎ মায়ের হ'ল এক কঠিন ব্যারাম। রঞ্জন একটু ব্যতিব্যস্ত হয়ে' পড়্‌ল মাকে নিয়ে'; লেখাপড়ার পথে এই বাধা জ্যোৎস্না আমলে আন্‌ল না। তার ঝোঁক হয়েছিল ম্যাট্রিক তাকে দিতেই হবে, একটু ইংরাজী না জানলে এযুগে মাথা তুলে' দাঁড়ান যায় না। স্বামীর সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলাও সম্ভব নয়। যেটুকু সুযোগ তার হাতে ছিল, পড়াশুনায় সবখানি নিয়োগ করে' অতি দ্রুত ছুটে চলেছিল পাশ করার সঙ্কল্প নিয়ে। মা'ও উৎসাহ দেখিয়ে বল্‌লেন, “বুড়ো হয়েছি, অসুখ হবেই। তোমরা ব্যস্ত হয়ো না। এই আমার মরণের ডাক। আমি যত ক্ষণ বেঁচে আছি, রঞ্জন আছে পাহাড়ের আড়ালে। মরে' গেলে ওর আর ফুরসৎ থাকবে না। এই বেলা কাজ সেরে নাও, লেখাপড়া শিখ্‌লে রঞ্জনের কাজেও সাহায্য করতে পারবে প্রাণ দিয়ে।”

জ্যোৎস্নার ধ্যান, জ্ঞান—অধ্যয়ন। রঞ্জন একদিকে মায়ের জন্য যেমন ব্যস্ত, কবিরাজ ডেকে নিয়ে আসা, ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখা, মায়ের কাছে গিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া; আর অন্য দিকে তেমনই সময়ে অসময়ে জ্যোৎস্নাকে পড়া বলে' দেওয়া —এই দুই কাজে তার আর সময় নেই অন্য কিছু ভাব্‌বার। প্রিয়রঞ্জন সময়ের সদ্ব্যবহার এমন ভাবে কোন দিন করে নাই। মায়ের ব্যারামে তার দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না বটে; কিন্তু পৃথিবীতে মায়ের মত বস্তু, তাঁর সেবায় যেমন করে' সে বুঝ্‌তে পেরেছে, তাতে যেন সে ধন্যই হয়েছে। আর পত্নীর প্রতি ইহাপেক্ষা বড় কর্ত্তব্য কি থাকতে পারে, তা' সে ভেবেও ঠিক করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে সে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। সাফল্যের অনুভূতি জীবনে নূতন আশা, নূতন আলো দেয়। প্রিয়রঞ্জনের সেই শুভমুহূর্ত্তই যেন জীবনে আজ ফুটে' উঠেছে।

কয়েক মাস পরে প্রিয়রঞ্জনের সেবায় ও যত্নে মা উঠ্‌লেন কিছু সুস্থ হয়ে। কিন্তু কবিরাজ বল্‌লেন—পূর্ব্বের মত তাঁর আর বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে মাথা ঘামালে চল্‌বে না। বয়েস বাড়্‌ছে, অসুখ তো কিছু নয়—ভগবানের ডাক। রঞ্জন যখন যোগ্য হয়ে' উঠেছে, তখন বিষয়-রক্ষার ভার তাকেই বুঝে' নিতে হবে।

মায়ের ইচ্ছাও ছিল তাই। কর্ত্তার পরলোক-গমনের পর থেকে তিনি বিষয়-রক্ষার ভার সর্ব্বতোভাবে বহন করে' এসেছেন। ব্যাধির আক্রমণে তিনিও ভেবে দেখ্‌লেন, সময় থাকতে থাকতে রঞ্জনকে সব বুঝিয়ে না দিয়ে গেলে ভবিষ্যতে সে পদে-পদেই ঠক্‌বে। মা অসুস্থ হয়ে না পড়্‌লে, এ কাজে প্রিয়রঞ্জন মাথা দিতে চাইত না। মায়ের পাণ্ডুর শীর্ণ মুখখানি দেখে' তার কেবলই মনে হয়—মা থাকুন বসে' শান্তি ও আনন্দে, তাঁকে আর কোন কাজে হাত দিতে দিবে না। প্রিয়রঞ্জন মায়ের সাম্‌নে বসে' সরকার গোমস্তার সাহায্যে নিয়মিত ভাবে কাগজপত্র ঘাঁটকাতে সুরু করে' দিলে। জ্যোৎস্না বাংলা থেকে দশ পাতা ইংরাজী অনুবাদ করে' বারান্দায় এসে দাঁড়ায়; কখনও বা মায়ের ঘরের দোরে উঁকি মেরে' দেখে। রঞ্জনের হুঁস নেই, খাতাটা একবার দেখে দিয়ে গেলে সে নিশ্চিন্ত হয়। ঠিক হ'ল কি না, না জান্‌তে পারলে, অঙ্ক কষ্‌তেও প্রবৃত্তি যায় না। হঠাৎ যদি দোরের ফাঁক দিয়ে রঞ্জনের দৃষ্টি পড়্‌ল জ্যোৎস্নার দিকে, সে উঠে এসে' বল্‌ল একান্ত উদাসীন-ভাবেই “খাতাখানা আমায় দাও, দেখে' রাখব। তুমি থিয়োরেম কটা কষে ফেলগে।” কথাটা জ্যোৎস্নার তেমন ভাল লাগে না। কাছে বসে' ভুলগুলো ধরে' ধরে' দশের মধ্যে ছয় নম্বর দিলেও সে হাত চেপে অভিমান করে' বল্‌বে কটা ভুল হয়েছে যে চার নম্বর কাটছ?” প্রিয়রঞ্জন দু-চার বার জিদ করে' ছয়ের গায়ে' হাফ'

বসিয়ে নিস্তার পাবে ; তবেই তো পড়ায় উৎসাহ থাকে! জ্যোৎস্না মুখ ভার করে' ঘরে গিয়ে বসে। থিয়োরেম-গুলো আর কষা হয় না। প্রিয়রঞ্জন যখন সেগুলো চেয়ে বসে, তখন ঠোঁট ফুলিয়ে সে বলে "এমন করে' আবার পড়া হয় নাকি ? যেন মাষ্টার মশায় হয়েছে! কাছে বসে' পড়াও তো পড়ি। না হয়, ও ছাই লেখাপড়া আমার দরকার নেই।" রঞ্জন বলে—"আমি সাধ করে' কি তোমার কাছে থাকি না ? মাকে আর খাটুতে দেওয়া উচিত নয়। তুমি কি বল!" জ্যোৎস্না অপ্রস্তুত হয়ে' বলে—"পড়ার ঝোঁকে তোমায় কি না বলি! আর পড়ায় কাজ নেই—আমাকেও তো সংসার গুছিয়ে নিতে হবে। মায়ের মাথায় শুধু তো বিষয়-সম্পত্তি-রক্ষার ভার চেপে নেই—সংসারের দুর্ভাবনাও আছে।" রঞ্জন তাড়াতাড়ি বলে' ওঠে—"না, না, সংসারের দুর্ভাবনায় তোমায় মাথা দিতে হবে না। অনেকটা এগিয়েছ—আমার ফুরসৎ না হয়, একটা ভাল মাষ্টার রেখে দি।"

"তা' হ'লেই হয়েছে! তুমি কি মনে কর, পড়ার ঝোঁকে আমার মাথা খারাপ হয়েছে ? একজন পুরুষ-মানুষ এসে আমায় পড়াবে, আমার মুখপানে চেয়ে থাকবে, চোখ তুলে' তার পানে চেয়ে পড়া জিজ্ঞাসা করব—ওমা কি ঘেন্না! সত্যি বল্‌ছি, পথ চলি মাটীর দিকে চোখ রেখে—চোখ তুলে চাই তোমার সাড়া যদি পাই, অন্য পুরুষের পানে চাইলে আমার গা যেন কেমন করে' উঠে—তুমি বল কি না মাষ্টারের কাছে পড়্‌তে!" "তুমি একেবারে পাড়াগেঁয়ে"—কথাটা বলে'ই রঞ্জন সাম্‌লে নিল ; কেননা এই কয় বৎসরে সে জ্যোৎস্নাকে বুঝে নিয়েছিল, যে তার মত অভিমানিনী দুটী নাই—যে কথা তার অপ্রিয় তা' কাণে পৌছানমাত্র তার মুখ চোখ রাগে রাঙ্গা হয়ে' উঠ্‌ত। জ্যোৎস্না এই এক ছত্র কথা শুনে'ই রঞ্জনের দিকে কঠোর কটাক্ষপাতে ক্রটি করে নি ; রঞ্জন যতই কথা উল্টে নিক এই বলে' যে "এখনকার মেয়েরা শুধু আর বেথুন কলেজে পড়ে না, পুরুষ অধ্যাপকের সাম্‌নে বেমালুম বসে—শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা মেয়েদের মধ্যে খুবই জেগে উঠেছে, আমার সময় নেই বলে' মাষ্টারের কথা বলেছি—তোমার আপত্তি থাকে, একটী ভাল টিউট্রেসের সন্ধান করব।" "ছাই পড়বে" এই বলে' জ্যোৎস্না ঘরে গিয়ে প্রবেশ কর্‌ল।

সন্ধ্যা হয়-হয়—মা ডেকে' পাঠালেন জ্যোৎস্নাকে। ঘরে গিয়ে জ্যোৎস্না দেখ্‌ল, মায়ের কাছে বসে' আছে এক আগন্তুক। জ্যোৎস্নাকে দেখেই মা বল্‌লেন—"তুই আসিস্ নে অনেকদিন; বৌমাকে এই নূতন দেখ্‌লি, নয়?" জ্যোৎস্না ঘোমটা টেনে জড়-সড় হয়ে ঘরের একপাশে দাঁড়িয়েছিল। পুরুষটী উঠে' জ্যোৎস্নার পায়ের কাছে মাথা নামিয়ে বল্‌ল—"নমস্কার, বৌদিদি। আমায় লজ্জা করা চল্‌বে না—রামের পাশে আজ লক্ষ্মণ এসে হাজির! মা বল্‌লেন—"এ আমার বোন-পো, নাম তিনকড়ি। রঞ্জনের সঙ্গে অনেকদিন এ বাড়ীতেই মানুষ হয়েছে। বি-এ পাশ করে' চাকরী করতে গেছ্‌ল হাজারীবাগে; বি, টি, পড়তে কলকাতায় এসেছে। তিনুকে পর মনে করো না—ও তোমার দেবর হয়।" তিনুও হেসে বল্‌ল—"হাঁ বৌদি, আমি একটু দুরন্ত গোচের আছি। মাস ছয় উপদ্রব তো করবই ; তারপর কি হয়, ভগবান জানেন।" জ্যোৎস্না শাশুড়ীর পানে চাইতেই তিনি বল্‌লেন—"তোমার কাজ থাকে যাও। তিনু তোমায় দেখে নি, তাই ডাকলুম তাড়াতাড়ি।" তারপর তিনুকে লক্ষ্য করে' বল্‌লেন—"আর শুনেছিস্, তিনু—রঞ্জন এই বছরেই বৌমাকে ম্যাট্রিক দেওয়াবে।"

"তাই নাকি ? দাদার চেয়ে ইংরেজী জ্ঞান আমার অনেক বেশী, বৌদি; আর যদি এডিশেন্যেল সংস্কৃত থাকে, তাতেও তোমায় সাহায্য করতে পারি প্রচুর।" মা হেসে বল্‌লেন—"বৌমা যা সংস্কৃত জানে, তাতে তোকে শেখাতে পারে জানিস্? বৌমা টোলে দু-একটা পাশ দিয়ে এসেছে।" "টুলো পণ্ডিতের বিদ্যে তো ? ইউনিভার্সিটিতে ও বিদ্যে চল্‌ছে না!" মায়ের সঙ্গে তিনকড়ির কথা হ'তে লাগ্‌ল—জ্যোৎস্নার সর্ব্বাঙ্গ ঘেমে উঠেছিল, সে ছুটে' নিজের ঘরে এসে পাখা খুলে' দিল।

তার পরদিনই তিনকড়িকে সঙ্গে নিয়ে প্রিয়রঞ্জন ঘরে এসে হাজির। জ্যোৎস্না লজ্জায় সরে' গিয়ে দাঁড়াল

একপাশে। রঞ্জনের মুখ দিয়ে পাড়াগেঁয়ে কথাটা আবার বেড়িয়ে পড়্‌ত, যদি তিনকড়ি না আগে কথা কইত। সে বলে' উঠ্‌ল—"দোহাই বৌদিদি, আমিই হাঁফিয়ে উঠ্‌ছি, তুমি ঘোমটা খোল। এ বাড়ীতে এসে তোমার মুখে কথা যদি না শুনি, দুদিন টিক্‌তে পার্‌ব না।"

প্রিয়রঞ্জনের কাজ ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌ছে। জ্যোৎস্নার পড়া-শুনার ঝোঁক সে আর সামাল দিতে পারে না। কাজেই, তিনকড়িকে তাকে পড়াবার ব্যবস্থার কথা প্রতিদিনই উত্থাপন করে। জ্যোৎস্নার ঘোরতর আপত্তি, সে বলে—"যদি পড়া নাও হয়, সেও ভাল; আমি কারও কাছে পড়্‌তে বস্‌ব না।" তিনকড়ি কিন্তু ছাড়্‌বার পাত্র নয়; সে সময়ে অসময়ে জ্যোৎস্নার ঘরে ঢুকে' অঙ্কের খাতা উল্টে' পাল্টে' দেখে—ইংরাজী অনুবাদ দেখে' বলে—"দাদা ইডিয়মেটিক ইংরাজীর ধার দিয়েও যায় না—যদি ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাশ কর্‌তে চাও বৌদি—আমার কাছে একঘণ্টাও পড়।" জ্যোৎস্না ঘোমটা দিয়ে নীরবেই বসে' থাকে।

পড়ার আব্দার যত বাড়ে, রঞ্জন তিনকড়ির নাম ততই করে। জ্যোৎস্না রেগে কথা কয় না। কিন্তু পাশ করার সময়ও যত আসন্ন হয়ে আসে, মুখে পড়ার আপত্তি যতই থাক্‌, অন্তরের জিদ ক্রমেই বেড়ে' উঠে। সে একদিন রঞ্জনকে ধরে' বস্‌ল, যে বাকী এই কটা মাস তাকে পড়াতেই হবে, অন্ততঃপক্ষে তিন চারটী ঘণ্টা; তা' না হ'লে একটা অনর্থ বাধ্‌বে। "তিনকড়ির কাছে পড়ার আপত্তি নেই; কেন না, সে আপনার জন, নিজের ভায়ের চেয়েও আপন। কয় বৎসর সে বাড়ী-ছাড়া—তাকে পরের মত দেখাই তার মনে দুঃখ দেওয়া।" রঞ্জন এই কথাই বলে।

"দেবর ভাসুরের সঙ্গে কেমন ব্যবহার কর্‌তে হয়, হিন্দুর ঘরে সে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে—কিন্তু আমি তোমার স্ত্রী হ'য়ে এই সংসারে যে গৌরব ও সম্মানবোধ জন্মেছে, তাতে তুমি ছাড়া আর কারও কাছে মাথা নীচু করে' সে ভুল ত্রুটি দেখাবে আমি মেনে নেব তা' পারব না। তোমার কাছে আমার হাজার গলদ প্রকাশ পায়, লজ্জা নেই। অন্য যে কেউ হোক, তার কাছে আমার একবিন্দু মূর্খতা-প্রকাশ হ'লে মাথা কাটা যায়—তা' কি বোঝ না? আপনার লোক, তার মত ব্যবহার আমি কর্‌ব। কিন্তু আমায় শিক্ষা দেবে তুমি ছাড়া আর কেউ—এ অধীনতা কারও কাছে স্বীকার করে' নেব না।" প্রিয়রঞ্জন আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখ্‌লে—এ নারীর আত্মসম্মান-বোধ এক অসাধারণ চরিত্রের উপর ভিত্তি নিয়েছে। এ গর্ব্ব, এ অভিমান তার একার নয়, তার স্বামীকেই অতি বড় করে' দেখার পরিণাম। মুগ্ধচিত্তে সে পত্নীর দিকে চেয়ে সস্নেহে বল্‌লে—"আজ থেকে তিন চার ঘণ্টা নয় জ্যোৎস্না, যতখানি সময় দিলে তুমি ভাল ক'রে পাশ কর্‌তে পার, আমি তার ত্রুটি কর্‌ব না।"

তিনকড়ি বৌদিদির সঙ্গে কোনমতেই আসর জমাতে পার্‌ল না। আগে প্রিয়রঞ্জন খেতে বস্‌ত জ্যোৎস্নাকে সাম্‌নে রেখে; তিনকড়ি আসার পর, দুই ভায়ে খেতে বসে এক সঙ্গে। জ্যোৎস্নাকে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হয় দূরে। তিনকড়ি যত আব্দার ধরে—এটা দাও, সেটা দাও বলে', রাগে জ্যোৎস্নার সর্ব্বশরীর জ্বলে' যায়। সে দাঁড়িয়ে দেখে, স্বামীর পাতে মাছি উড়ে বস্‌ছে, পাখা কর্‌তে পারে না—পাতে ভাত পড়ে' থাকে, উঠে যায়, হাত ধরে' তাকে বসিয়ে রাখ্‌তে পারে না—তার এই অধিকারে বাদ সাধ্‌তে কে এল' আপনার জন হয়ে?

তিনকড়ি যত আত্মীয়তা দেখায়, জ্যোৎস্না ততই বিরক্ত হয়। তিনকড়িরও জিদ ততই বাড়ে। সে যে কোন অছিলায় জ্যোৎস্নার সঙ্গে একটা না একটা প্রয়োজন রাখ্‌বেই, কথা কইবেই, ক্রমেই বিরক্তির ভিতর দিয়েই তিনকড়ি অতি কৌশলে পরিচয় করে' নিলে জ্যোৎস্নার সঙ্গে। অবাধ কথোপকথনে আর বাধে না। দুই ভাইয়ে যখন ভাত খেতে' বসে, জ্যোৎস্না পাখা করে জোরে, দুজনেরই পাতে মাছি না বসে; আর রঞ্জনকে পেট ভরে' খাওয়াবার তাগিদে তিনকড়িকেও বল্‌তে হয়, এটা খাও, সেটা খাও। তিনকড়ির ইচ্ছে, বৌদির সঙ্গে সম্পর্কটা আরও একটু ঘনিষ্ঠ করে' তুলে। পড়াবার সুযোগ পেলে, তা' অনায়াস সিদ্ধ হয়; কিন্তু সে বুঝে নিয়েছিল, বৌদি বড় লাজুক, এ লজ্জা ভাঙ্গ্‌তে তার কিছু দেরী আছে।

. ডিসেম্বর মাস প্রায় শেষ হয়—বড়দিনের ধূম লেগেছে কলিকাতার রাজপথে, ময়দানে-মার্কেটে। তিনকড়ি পাঁচরঙ্গা কাগজ নিয়ে সার্কাসের কৃতিত্বের কথা জানায় আর বলে, "বৌদি, চল না, একদিন সার্কাস দেখে' আসি। দাদার সময় নেই; আমি আছি তোমার ভৃত্য—আমায় লজ্জা কি তোমার, বৌদি?" জ্যোৎস্না হেসে' বলে—"সার্কেস দেখার সময় কই ভাই; মাথা আমার ঘুর্‌ছে পড়ার তাগিদে। আর কটা মাসই বা সাম্‌নে আছে!" তিনকড়ি উত্তর দেয়—"তাও তো পড় না, বৌদি আমার কাছে। পরের মতই দেখ, তা' না হ'লে এই তিনমাসেই দেখিয়ে দিতে পারি, কেমন করে' পাশ কর্‌তে হয়।" কথার সঙ্গে তিনকড়ির করুণ চাহনী যেন অর্থপূর্ণ, জ্যোৎস্না তাকে আরও এইজন্য দূরে রাখ্‌তে চায়।

হঠাৎ বাজ পড়্‌লে মানুষ এমন করে' চম্‌কে উঠে না—জ্যোৎস্না হতভম্ব হয়ে বসে' পড়্‌ল বিছানার উপর। এতদিন পরে টুনুর এক জরুরী তার নিয়ে রঞ্জন এসে' উপস্থিত তার সাম্‌নে। টুনু, লিখেছে "সুকুমারের ভারী ব্যারাম; অসহায় সে, শীঘ্র এস।" জ্যোৎস্না এক মুহূর্ত্তে প্রকৃতিস্থ হয়ে বলে' উঠ্‌ল, "আমি নিশ্চয়ই বল্‌ছি, তোমায় যেতে দেব না। কিছুতেই না—কে তুমি তার, এত দাবী করে?"

"সে কি কথা? কেউ না হোক, এক অপরিচিত বিপন্নজনও যদি হ'ত—এ যে মানুষের কাজ, জ্যোৎস্না! আমায় মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতে বল?"

"ওগো, বিশ্বাস কর—আমি তোমায় ছোট হ'তে দেব না। তুমি বড় হও, সে যে আমার গৌরব। কিন্তু এই টেলিগ্রামের কথা বিশ্বাস করো না—এ আর কিছু নয়, চাতুরী, ছলনা।"

"তুমি জান না জ্যোৎস্না—টুনুর প্রকৃতি এমন নয়। সে নারীজগতে একটী দুর্লভ রত্ন। অতি বিপদ্ না হ'লে আমায় সে লিখ্‌ত না। আমি আজই যাই—গিয়েই তার কর্‌ব। ভাল দেখি, কালই চলে' আস্‌ব।"

"তুমি যাবে?"

"হাঁ, যেতে হবে। এখানে কারও কথা শুন্‌ব না। সুকুমার আমার বন্ধু। টুনু আমার আপন বোনের চেয়েও বড়। যদি তাও না হ'ত, আর কেউ যদি আমায় ডাক্‌ত, আমি এমনি করে'ই ছুট্‌তুম।"

"আচ্ছা, যাও। কিন্তু মনে রেখো, জ্যোৎস্নাকে আর ফিরে পাবে না। টুনুই তোমার সর্ব্বস্ব।" জ্যোৎস্না ছুটে' ঘর থেকে বাহির হ'য়ে গেল। তার এই আচরণ রঞ্জনের কাছে একেবারেই দুর্বোধ্য। ইহার পর কি যে কর্‌বার আছে, তার ভাব্‌বারও সময় ছিল না। সে একটা ভৃত্য নিয়ে, মাকে প্রণাম করে' বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়্‌ল পাটনার অভিমুখে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্না কাঁদ্‌ছিল। যেন আজ তার প্রাণ-পাখী সত্যই উড়ে' গেল—কাণে মরণ শিঙা বেজে উঠ্‌ল—ভোঁ, ভোঁ, ভোঁ।

রঞ্জনের মোটর ছুট্‌ল যেন বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে। সে কতক্ষণ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেখানে, কে জানে! রাত্রি কিন্তু অনেকখানি হয়েছে। বাড়ী নিস্তব্ধ। নিশুত রাত্রি। হঠাৎ তিনকড়ি এসে' বল্‌লে—"বৌদি, ঘুমোও নি?" মাথার অবগুণ্ঠন অর্দ্ধেকখানি খসে' পড়েছিল। বিস্ফারিত নেত্র তার মুখের দিকে নিক্ষেপ করে' জ্যোৎস্না কপট অনুনয়ের সুরে বলে' উঠ্‌ল—"ঠাকুর পো, তুমি আমায় পড়াবে?"

(ক্রমশঃ)

অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবে মৃন্মূর্ত্তি-বিভাগ

(পরিদর্শকের পত্র)

অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব উপলক্ষে তৃতীয়া হইতে পূর্ণিমা তিথি পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ-দিনব্যাপী যে প্রদর্শনী ও মেলার অনুষ্ঠান হয়, তাহা যাঁহারা দেখেন নাই, তাঁহারা বুঝিবেন না, মেলা ও প্রদর্শনীর নাম লইয়া কি অপূর্ব্ব জ্ঞানযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বিগত দ্বাদশ বর্ষের যে সকল

কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম

শিক্ষাপ্রদ চিত্র, লেখা, মৃন্ময়মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, 'প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ' যদি তাহা রক্ষা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে বাংলাদেশের ইহা একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থায়ী শিক্ষা-প্রদর্শনী রূপে প্রতিষ্ঠা পাইত। ইহাতে কেবল শিক্ষিত জন-বর্গেরই মনে নব নব ভাব ও অনুসন্ধিৎসু-স্পৃহা জাগ্রত হইত না; দেশের মূর্খ, নিরক্ষর নারীপুরুষ অশেষবিধ জ্ঞানার্জ্জন করিবার সুবিধা পাইত।

এই প্রস্তাব সঙ্ঘের কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট উপস্থিত করিলে, তাঁহারা যে উত্তর দিলেন তাহা নূতন কথা নহে। প্রত্যেক সদনুষ্ঠানে যে অর্থ ও সামর্থ্যের প্রয়োজন ইঁহাদের মধ্যে তাহার একটী আছে অর্থাৎ সামর্থ্য, অর্থের অভাব বশতঃই ইহা ঘটিয়া উঠে না। অবশ্য অন্যত্র এই বৃহৎ ব্যাপার সুসিদ্ধ করিতে হইলে যতখানি অর্থের প্রয়োজন হইত 'প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে'র কর্ম্মীরা কায়িক শক্তি নিয়োগ করার ফলে তাহার এক-চতুর্থাংশ অর্থের দ্বারা প্রতি বৎসর ইহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই কর্ম্ম 'প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে'র পক্ষেই সম্ভব হইয়াছে। অর্থাভাব বশতঃই স্থায়ী প্রদর্শনী-সৃষ্টির পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হয় না।

আমি এই বৎসরের মৃন্ময়-মূর্ত্তি-বিভাগের কয়েকখানি চিত্র প্রদর্শন করিয়া, "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ" ভারতের কৃষ্টি-রক্ষার দিক্‌টী যে ভাবে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

প্রদর্শনীর শিল্পশালা অতিক্রম করিয়া বিরাট্ নবচূড় মন্দিরের পাদদেশে উপস্থিত হইলেই বামে ও দক্ষিণে মৃন্মূর্ত্তি-বিভাগের সুশোভিত অলিন্দ চক্ষে পড়ে। এক দিকে ধর্ম্ম ও অন্য দিকে সমাজচিত্র মৃন্ময়-মূর্ত্তিতে এবং ভাষার সাহায্যে বিবৃত করা হইয়াছে। দক্ষিণ দিকের চিত্রগৃহে হিন্দুর করুণ সমাজ-দৃশ্য প্রকটিত হইয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের "প্রবর্ত্তকে" 'এনাৎগঞ্জ' নামে যে ছোট্ট গল্পটী বাহির হইয়াছিল, ইহা তাহারই মূর্ত্ত রূপ। হিন্দুসমাজ সঙ্কীর্ণতাদোষে শ্রমকাতর, শিক্ষার অভাবে কি ভাবে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে, এই মূর্ত্তিগুলি তাহার এমনই জীবন্ত দৃশ্য, যে প্রত্যেক দরদী হিন্দু ইহা দেখিয়া চক্ষের জল নিবারণ করিতে পারিবেন না। অতঃপর আমি অন্য বিভাগের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

"প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ" বিশ্বাস করেন, অর্ব্বাচীন যুগের ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণার দ্বারা এই পৃথিবীর যে

আয়ুর্নির্ণয় করা হইয়াছে তাহা সত্য নহে। জাগতিক পরিবর্ত্তন এমন ঘটিয়াছে যাহা মানুষের কল্পনাতীত। কিন্তু জগতের অস্তিত্ব কোটী কোটী বৎসরের। মূর্ত্তি-গৃহের প্রবেশদ্বার অতিক্রম করিলেই দৃষ্টিতে পড়ে

শ্রীকৃষ্ণের অভিনব ধর্ম্ম-প্রচার—ধরিত্রীর পূজা

চতুর্যুগের বিচিত্র দৃশ্য। ইহা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—ঐ চতুর্যুগের একটী দিব্যযুগ, যাহার পরিমাণ কাল ৪৩,২০,০০০ বৎসর। পৃথিবীর বুকের উপর দিয়া এমন অনেক দিব্য যুগ বহিয়া গিয়াছে। সত্যযুগের ঋষির কণ্ঠে সামবেদের ধ্বনি উঠিয়াছে—ইহা অক্ষর-ব্রহ্মনাম-সাধনার মহাযুগ। যুগচক্র আবর্ত্তিত হওয়ায় ত্রেতাযুগের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঋগ্বেদাধিকারী দানধর্ম্মরত নিত্যতপস্যার মূর্ত্তি এই যুগের পরিচয়স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। সত্যযুগের ধ্যানমূর্ত্তি নামিয়াছে নৈমিষারণ্য-তীর্থে যজ্ঞ-রূপে। যুগচক্র আবার ঘুরিয়া গিয়াছে—প্রকাশ হইয়াছে দ্বাপর-যুগ। এই ক্ষেত্রে মানুষের কণ্ঠে অর্চ্চনার উদ্গান উঠিয়াছে, যেন যাহা ছিল তুরীয় তাহা জীবনযজ্ঞের ভিতর দিয়া মূর্ত্তি লইয়া ফুটিয়া উঠিতে চাহে; ঋষির কণ্ঠে অর্চ্চনার সঙ্গীতধ্বনি তাই মূর্চ্ছনা তুলিয়াছে—"ধাম্না স্বেন নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।" তার পর, প্রবল কলিযুগ। "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ" এই যুগকে বীভৎস দৃশ্যে কলঙ্কিত করেন নাই; বিগত যুগত্রয়ের পরিণতি ঘটাইয়াছেন ভগবানেরই অবতরণ-মূর্ত্তিতে। ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চ্চনা এখানে রক্ত-মাংসের শরীর লইয়া অবতীর্ণ। আত্মহারা মহাপ্রভুর অমল বদনকমল, প্রেমবিগলিত নয়নের দৃষ্টি, স্ফুরিত অধরে যেন সত্যই উচ্চারিত হইতেছে—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম
রাম রাম হরে হরে॥"

তারপর, দ্বিতীয় দৃশ্য—ভারতের নবকৃষ্টি-প্রচারের আদিগুরু পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-সূচনা। কারাগার-মধ্যে দেবকী ও বাসুদেব শৃঙ্খলাবদ্ধ, শূন্যে জ্যোতির্ম্ময় বিষ্ণুমূর্ত্তি। রক্তাক্ষরে এই শ্লোকটী লিখিয়া রাখা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ ও ইন্দ্র

"স্তুতোঽহং যৎ ত্বয়া পূর্ব্বম্ পুত্রার্থিন্যা তদদ্য তে।
সফলং দেবি সঞ্জাতম্ জাতোঽহং যৎত্বোদরাৎ।"

যাহা ধ্যানে, যজ্ঞে, অর্চ্চনায় নিহিত ছিল, সেই ধর্ম্ম-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ-রূপে আবির্ভূত হইলেন। 'প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ' এইখানে

শ্রীকৃষ্ণ ও বিরুদ্ধ রাজন্যবৃন্দ

বলিয়াছেন—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগের ভাব ও ভাষা কলিযুগেই সিদ্ধ হইল মূর্ত্তি লইয়া।

তৃতীয় দৃশ্য—ব্রজপুরী। দূরে উন্নতশির গোবর্দ্ধন পর্ব্বত—সমতল ক্ষেত্রে নন্দ, যশোদা, গোপগণ নানা-বিধ পূজাপ্রকরণ লইয়া উপস্থিত, রাখালগণ ক্রীড়ারত—গো-যূথ তৃণ চর্ব্বণ করিতেছে, গোপবালাগণের হস্তে দধিভাণ্ড, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কিশোর-মূর্ত্তি অতি রমণীয়। তিনি লোকাচার-প্রবর্ত্তিত ইন্দ্র-পূজার উৎসব বন্ধ করিয়া গোবর্দ্ধনের পূজায় ব্রজবাসীদের উদ্বুদ্ধ করিয়া বলিতেছেন, "ঐ গাভী ও গিরিমালাই আমাদের দেবতা, বৈদিক অতীন্দ্রিয় দেবতার উপাসনা ছাড়িয়া ধরিত্রীর পূজা করিতে প্রবৃত্ত হও।" বড় বড় অক্ষরে এই শ্লোকটী দর্শকের চিত্তে লোকাচার বিরুদ্ধে কৃষ্ণচন্দ্রের বিদ্রোহ-কণ্ঠে বেশ একটী অভিনব ভাব ও আদর্শ ফুটাইয়া তুলে—

"গিরিযজ্ঞস্ত্বয়ং তস্মাৎ গোযজ্ঞশ্চ প্রবর্ত্ত্যতাম্।
কিমস্মাকং মহেন্দ্রেণ গাবঃ
শৈলাশ্চ দেবতাঃ॥"

ব্রজবাসী এই বালকের অসাধারণত্বে বিশ্বাস করিতেন, গোকুলে ইন্দ্রপূজা রহিত হইল। ধরিত্রীর পূজা প্রবর্ত্তিত করিয়া তিনি গোকুলবাসীকে জীবনের মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন।

চতুর্থ দৃশ্য—ইন্দ্র ও কৃষ্ণ। নব-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রথম বাধা অধ্যাত্ম জগতের। ইন্দ্রশক্তির বিরুদ্ধতায় গোকুলবাসী সন্ত্রাসিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি দৈব বিপদ্ হইতে তাহাদের মুক্তি দিলেন, স্বমহিমায় গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়া; জীবনের গৌরবে দেবতাও বশীভূত হইলেন। ইন্দ্র বুঝিলেন, যিনি সর্ব্বভূত-মহেশ্বর, তিনিই নরদেহে কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত

পৌণ্ড্ররাজ ও

হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রধান সহায়-রূপে পার্থের জন্মবৃত্তান্ত তিনি উল্লেখ করিলেন। সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে বলিলেন—

"জানামি ভারতে বংশে
জাতং পার্থং তবাত্মজং ;"

তারপরেই, পঞ্চম দৃশ্য। জীবনধর্ম্মের পথে ভারতের অতীত আদর্শ ও সভ্যতার দুর্গরক্ষাকারী রাজন্য-বর্গের বিরুদ্ধতা। জগৎ ও ব্রহ্ম—এই দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য-দর্শন ভারতের মায়াবাদ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের লক্ষণ। কৃষ্ণচন্দ্র গোকুলে গোবর্দ্ধন-পূজার প্রবর্ত্তন করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—

"যথৈতদখিলং বিষ্ণোর্জগন্ন ব্যতিরিচ্যতে।"

কিন্তু এই জীবনবাদের বিরুদ্ধে কংস, কাশীরাজ, জরাসন্ধ প্রভৃতি পথের অন্তরায় হইয়াছিলেন। এই গৃহবিবাদ-যুগে ভারতের পশ্চিমপ্রান্তরাজ্য হইতে কাল-যবনের দলও তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে। এই সকল বাধাকে অতিক্রম করার জন্য অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত শ্রীকৃষ্ণের বীরবেশ হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করে।

পাঞ্চাল ও পাণ্ডব শক্তির সহায়তা লাভ

যুগে যুগে সত্যের ছদ্মবেশে মিথ্যার আবির্ভাব—ষষ্ঠ দৃশ্যে পৌণ্ড্রাজ স্বয়ং বাসুদেবের অবতার বলিয়া নিজেকে জাহির করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে তিনি নিহত হইলেন। পরবর্ত্তী দৃশ্যে, দক্ষিণ পাঞ্চাল-রাজকন্যা দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করার সংবাদ পাইয়া পার্থের সহিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পরিচয়-দৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদিন পরে নব-ধর্ম্ম-প্রচারের ব্রহ্মাস্ত্র তিনি সংগ্রহ করিলেন। একদিকে বিরুদ্ধশক্তি সংহতিবদ্ধ হইয়া মাথা তুলিতে লাগিল; অন্যদিকে কৃষ্ণচন্দ্র পাণ্ডবদের সাহায্যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন।

[illegible] মন্ত্রে দীক্ষা

অষ্টম দৃশ্যে শ্বেত-তুরঙ্গম-সংযোজিত কপিধ্বজ যুদ্ধরথের পার্শ্বে সারথিবেশে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, চরণপ্রান্তে শ্রীঅর্জ্জুন নূতন মন্ত্রে দীক্ষা লইতেছেন

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

প্রজ্জলিত প্রদীপ দিয়াই নির্ব্বাপিত প্রদীপ জ্বালিতে হয়। ধ্যান-ধারণায়, হোমে, পূজায় আকাশকুসুমের ন্যায় ধর্ম্ম চিরযুগই দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। ধর্ম্ম জীবন্ত হইয়া উঠিল—শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্যে।

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্"

মহাপ্রস্থান

মানুষ মাটী, পাথর, ধাতুমূর্ত্তির চরণে মাথা নত করে, কিন্তু মূঢ়তা-বশতঃই নর-রূপী নারায়ণকে স্বীকার করে না। অর্জ্জুন মানুষ-পূজার সন্ধান পাইয়া দিব্য-জীবনের পথে অগ্রসর হইলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-রূপে জগতে মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া মানুষের মুক্তির পথ প্রশস্ত করিলেন।

তারপর, নবম দৃশ্য। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডব-পক্ষ জয়ী হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ব্যর্থ হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরের বিলাপ, মোক্ষ-প্রার্থনা কোন সান্ত্বনায় বারণ মানিল না। শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রশিষ্য পার্থও জীবনের মন্ত্র সিদ্ধ করার শক্তি হারাইলেন। মহাপ্রস্থানের করুণ দৃশ্য যুগের ব্যর্থতাই প্রতিপাদন করে। অন্তর্দ্দর্শী নারায়ণ পাণ্ডবদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া আত্মবংশ যদুদের প্রতি যেটুকু আস্থা রাখিয়াছিলেন, তাহাদের আচরণ দেখিয়া তাহাতেও তাঁহার মনোভঙ্গ ঘটিল। শাম্ব প্রভৃতি তাঁহার আত্মজগণ ভোগবিলাস-পরায়ণ, ধর্ম্মজীবন-লাভের তপস্যায় তাহারা পরাঙ্মুখ। একদিকে যুধিষ্ঠির প্রমুখ পাণ্ডবগণ শোকদুঃখাদি দ্বন্দ্বসহনে অসমর্থ হইয়া ত্যাগমার্গই শ্রেয়ঃ করিলেন; অন্যদিকে যদুকুল জীবনমন্ত্র ভুলিল ভোগবিলাসব্যসনে—যুগের ঋষি নিরাশ হইলেন।

দশম দৃশ্য রুধিরাক্তকলেবরে কৃষ্ণচন্দ্রের অন্তিম কাল প্রকট করা হইয়াছে। শোণিতাক্ষরেই যুগদেবতা জাতির মুক্তিমন্ত্র লিখিয়া যাইতেছেন—

অন্তিমে

"মন্মনাঃ ভব মদ্ভক্তঃ মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।"

চিত্রগৃহের দেওয়ালে আরও কয়েকটী কথা লিখিত আছে—"কয়েক সহস্র বৎসর পরে চণ্ডীদাসের কণ্ঠেও প্রতিধ্বনি উঠিয়াছিল, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' ভক্ত নরোত্তম গাহিয়াছিলেন—

'গুরুকে মানুষ জ্ঞান করে যেই জন
দারুণ নরকে তার হয় নিপাতন' —ইত্যাদি।

—নরের মধ্যে নারায়ণ-দর্শনের সাধনা জীবনেরই সাধনা। জীবন ভাগবত হয়, ভাগবত পুরুষের কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণে। যে সাধনা বিগত পাঁচ হাজার বৎসর ধরিয়া অব্যাহত, অতীতে তাহা সিদ্ধ না হইলেও, ভবিষ্যতে ইহা সিদ্ধ হইবেই"—"প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ" মানুষের প্রাণে এই বিশ্বাসের বাণী ধ্বনিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন।

প্রতি দৃশ্যের সহিত ভাষার মালা গাঁথিয়া একখানি উপাদেয় গ্রন্থস্বরূপ প্রতি দর্শকের নয়নের উপর এইরূপ একটি জীবনপ্রদ ভাব ও আদর্শের পরিকল্পনা ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে—ইহাতে মানুষের মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু জীবনবেদের মন্ত্র এমন সুকৌশলে লোকচক্ষুর সম্মুখে ধরার আয়োজন সত্যই অপরূপ ও অভিনব। ইহা "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে"র পক্ষেই সম্ভব হইয়াছে; তাহার কারণ এই ভাবকে সঙ্ঘ ভাষা দিয়াছে শুধু মুখের কথায় নহে, জীবনের সাধনায়। তাই অতি বিরুদ্ধ-বাদীকেও ইহাতে আকৃষ্ট হইতে হয়; আর উদীয়মান তরুণ আনন্দে উৎসাহে নূতন জীবনের সন্ধান পাইয়া পুলকিত হইয়া উঠে। মৃন্মূর্ত্তিবিভাগ ছুইটী প্রদর্শনী-ক্ষেত্রের অপরূপ সম্পদ্-স্বরূপ হইয়াছিল, এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

ব্যর্থ

শ্রীঅবনীনাথ গুপ্ত

জীবন-সাগর তীরে,—
রচিয়াছি নিতি কত খেলাঘর
কল্পনা-বালু ঘিরে।
কত যতনে সাজায়েছি তায়
কত না স্বপন, কত না মায়ায়;
কালের প্রবাহ নাশিয়া হেলায়
চলে গেছে ধীরে ধীরে,
জীবন-সাগর তীরে।

তামসী অতল-পারে
কত না জ্ঞানের পসরা লইয়া
যাত্রী আসিল দ্বারে।
ডাক দিয়ে যায়, আয় ওরে আয়
ছাড়িয়া স্বপন মিথ্যা খেলায়,
বিফলে সে ধ্বনি বাজে বেদনায়
মরমের তারে তারে।
তামসী অতল-পারে

জীবন-জলধি-তীরে
চলিয়াছি ওগো একেলা পথিক
সাথে লয়ে ভ্রান্তিরে।
আশার ছলনা শুধুই পাথেয়,
জনহীন পথ, সাথী নাই কেহ;
হে চির-শরণ, লহ মোর গেহ—
লহ মোর শ্রান্তিরে।
জীবন-জলধি-তীরে

অশেষ কামনা ওরে,
ভোগাতুর এই আবেগমত্ত
জীবন-পাত্র ভ'রে,
সুধা বলি বিষ করাইল পান,
পারিল না দিতে জীবন মহান্;
জীবনের মাঝে সত্যের দান
কোথা আজি সঙ্করে!

শিল্প-সমাজের নাড়ী-স্পন্দন

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

মানুষের ইতিহাসে, দেশে দেশে, যুগে যুগে, এই কথারই পরিচয় পাওয়া যায় যে, যখন কোনও জাতির জীবনে নব-জাগরণের হিল্লোল আসে, তখন তাহার অনুক্রিয়া জীবনের সমস্ত দিকেই ফুটে উঠে, বীণার সপ্ত তন্ত্রীই মুখরিত, ঝঙ্কৃত হয়ে, নানা রাগিণীতে বেজে উঠে। মানুষের মন যখন সত্য সত্যই জেগে উঠে, দেহের সকল অঙ্গেই তাহার জাগরণের পরিচয় পাই। এমনটা প্রায় হয় না যে, জাগ্রত মানুষের একটা অবয়বেরই ক্রিয়া, ও সঞ্চালনা হ'তে লাগল, অন্য অঙ্গগুলি পঙ্গু হয়ে নিশ্চল হয়ে পড়ে' রহিল। মানুষের মনের খাতে যখন জোয়ারের ঢেউ লাগে, তখন সকল কূলই প্লাবিত হয়, কোন দিক্‌টাই শূন্য থাকে না, সকল দিকেরই শুষ্কতা, রুক্ষতা, জলের প্লাবনে রস সিক্ত হয়ে উঠে, সমস্ত গহ্বর, সমস্ত শূন্যতাই ভরে' উঠে, পূর্ণ হয়ে উঠে কূল-প্লাবিনীর মধুর-সঙ্গীতের কুলু-কুলু-ধ্বনিতে। বসন্তের সমীরণ সমস্ত বৃক্ষেই নূতন পাতা জাগায়, সমস্ত ফুলের গাছেই বর্ণ-গন্ধের সমারোহ এনে দেয়, সমস্ত কোকিলের কণ্ঠেই পঞ্চম স্বরের কুহুতান ফুটিয়ে তোলে। কোনও শীতের সন্ধ্যায়, কোনও আকস্মিক কারণে, গৃহ-পিঞ্জরের কোকিল হয়ত একবার চেঁচিয়ে উঠে, তাহার আকস্মিক ধ্বনিতে বসন্তের আগমন সূচনা করে না।

এমনটা প্রায়ই ঘটে না যে, একটা নবজাগরণের যুগে, মানুষ কেবল ধর্ম্ম-সাধনায় একাগ্র হয়ে উঠ্‌ল, অথচ তাহার সমাজ-বুদ্ধি রহিল পঙ্গু হয়ে, পশ্চাতে পড়ে', তাহার সাহিত্যের লেখনী রহিল স্তব্ধ হয়ে, তাহার শিল্পের তুলিকা রহিল নিশ্চল হয়ে। মানুষ যখন সত্য সত্য জাগে তখন তাহার সকল শক্তিই জাগ্রত, মুখরিত, সচল, ও সক্রিয় হয়ে উঠে। মানুষের ইতিহাসে এই কথার নানা প্রমাণ ও পরিচয় আছে।

ইউরোপের খৃষ্টীয়-সাধনার "গথিক"-যুগ (১১৫০-১৫৫০ খৃঃ অঃ), কেবল মাত্র "ধর্ম্ম-সাধনার যুগ" নহে, এই যুগে ধর্ম্ম-বুদ্ধি সকল ক্ষেত্রেই প্রেরণার সঞ্চার করে' জীবনকে সর্ব্বতোভাবে শক্তিমান্ ও উজ্জ্বল করে' তুলেছিল। এই শক্তি, এই প্রেরণা, কেবল অসংখ্য গির্জ্জা ও আরাধনা-গৃহের গগন-স্পর্শী শিখর তুলে দিয়েই ক্ষান্ত হয় নাই, এই শক্তি জীবনের সকল ক্ষেত্রকে শত ধারায় প্লাবিত করে' আত্মপ্রকাশ করেছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, সমাজের নানা হিত-চেষ্টায়, নানা কল্যাণ-সঙ্ঘে, পৌর-সভা ও সমিতিতে (civic communes), সংসারযাত্রার নানা উপকরণে (Furniture), শ্রম-জাত দ্রব্য-সম্ভারে (Industrial Art), কলা-শিল্পে (Fine Arts), সাহিত্যে (Literature), পুঁথী-লেখা ও পুঁথী-প্রচারের নানা প্রচেষ্টায় (Book-Production), বেশ-ভূষার নানা কৌশল ও নানা ভাব-ভঙ্গীতে, ধর্ম্ম-সঙ্গীতের ভজন-গীতি ও স্তোত্রমালায়, মানুষের সাধনার সকল দিক্ মধুর, উজ্জ্বল, ও মহিমান্বিত করে তুলেছিল। সারত্রেস্ (Chartres), নোতর দাম্ (Notre Dame), রাবেণ (Rouen), র‍্যাম্ (Reims), আমীয়েন (Amiens) প্রভৃতি অসংখ্য মন্দিরে এক নূতন রীতির স্থাপত্য-শিল্প মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল, যাহার পরিকল্পনা, রচনা-রীতি ও অলৌকিক সৌন্দর্য্য জগতে অদ্বিতীয়। এই সমস্ত খৃষ্টান মন্দিরের বক্ষঃ ও কটিদেশ, অদ্বিতীয় প্রতিমাকারক শিল্পি-বৃন্দের রচিত নানা দেব-দেবী, সাধু-সন্ন্যাসী ও যতিগণের অপূর্ব্ব প্রস্তর-প্রতিমায় ভূষিত ও অলঙ্কৃত হয়ে উঠেছিল। গথিক-গির্জ্জার ভাস্কর্য্য—রূপে, গুণে, ভাবে, রসে অতুলনীয়। ভারতবর্ষের মন্দির-ভাস্কর্য্য ব্যতীত আর কোনও দেশে ইহার তুলনা নাই। গথিক-গির্জ্জাগুলি জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সঙ্গীত ও কলাবিদ্যার অপূর্ব্ব কেন্দ্র-স্থল ছিল। গির্জ্জার ধর্ম্মযাজক, পুরোহিত ও যতিগণ কেবল যে ধর্ম্মের চির-কুমার ব্রতে, পূজা, পাঠ ও সংযম-সাধনায়

আত্মনিয়োগ করতেন এমন নহে,—জ্ঞানের নানা দিকের আলোচনা, পুস্তক-প্রণয়ন, পুস্তক-লিখন ও প্রচারও তাঁহাদের জীবনের অন্যতম কর্ত্তব্য ছিল। প্রত্যেক গির্জ্জায় একটী লেখনী-শালা এবং প্রকাণ্ড গ্রন্থাগার ছিল। এই লেখনী-শালায় (Scriptorium) অনেক পণ্ডিত ও মনীষী, পুরোহিত ও যতি দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, অক্লান্ত পরিশ্রমে, অন্তর দিয়ে, ভক্তি দিয়ে, তাঁদের লেখনীর অপূর্ব্ব কলা-কৌশল দিয়ে, নানা ধর্ম্ম-গ্রন্থ, বিজ্ঞান ও দর্শনের গ্রন্থ নিজের হাতে লিখ্তেন। এক একখানি গ্রন্থ লিখ্তে কাহারও ১০ বৎসর, কাহারও বা জীবনব্যাপী পরিশ্রম হ'ত। উৎকৃষ্ট গ্রন্থের নানা প্রতিলিপি বা নকল করে' শিক্ষানবীশ নবীন সন্ন্যাসীরা এই পুঁথী-লেখা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠ্তেন। ধর্ম্মের পুস্তক, যিশুর বাণী, (Gospels), নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতি (Book of Hours), ভজনের পুঁথী (Missal), কেবল সুন্দর অক্ষরে লিপিবদ্ধ করে'ই তৃপ্তি হ'ত না। গ্রন্থগুলি নানা বর্ণে উজ্জ্বল ও উজ্জীবিত (illuminated) করে', নানা চিত্রে সুশোভিত ও অলঙ্কৃত করে' (illustration, decoration), নানা বহু মূল্য কারুকার্য্যময় ও রত্ন-খচিত মলাটে (Binding) গ্রথিত করে', নানা বাহ্য সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করে' গ্রন্থমালার অন্তরের সৌন্দর্য্যের মর্য্যাদা রক্ষা করা হত। 'গথিক'-যুগের হস্ত-লিখিত সচিত্র পুঁথী—লিখন ও চিত্র-বিদ্যার অলৌকিক নিদর্শন। এই গির্জ্জার লিপি-শালা ও গ্রন্থাগারই ছিল মধ্য যুগের বিশ্ব-বিদ্যালয়। এই লিপিশালায় লিখিত নানা পুঁথী নানা স্থানে বিকীর্ণ ও প্রচারিত হ'ত। এই সব পুঁথী সংগ্রহ করতে ধনী ও পৌরজনদের মধ্যে প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্ব হ'ত। ব্যাভেরিয়ার এক মেয়র তাঁহার সমগ্র সহরের বিনিময়ে একটী পুঁথী সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন! খৃষ্টান মন্দিরের ভজন-গীতি ও অর্গান-সঙ্গীত সঙ্গীত-কলার নানা পরিণতির ও উন্নতির শ্রেষ্ঠ সহায়ক ছিল। অনেক প্রাচীন ভজন-গীতির (Missal) 'গথিক' হস্ত-লিখিত পুঁথীতে সঙ্গীতের "রূপক" বা "সারগম্" লিখিত আছে। এই 'রূপক' অবলম্বন করে' প্রাচীন ধর্ম্ম-গীতির (Choir-singing) ধারা অবিচ্ছিন্ন [illegible] আজও জীবিত আছে।

গৃহ-সজ্জার নানা সাজ-পাট-উপকরণে, ঘটে, থালায়, জল-পাত্রে, রন্ধন-শালার আস্‌বাব-পত্রে, বাক্স-পেটরা, নানা আসন-পীঠিকায়, নানা কারুকার্য্যময়, সুন্দর পরি-কল্পনায় ভোগী জীবনের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও প্রেমিক হৃদয়ের নানা পরিচয় পাওয়া যায়। জীবন যখন এক মহৎ চিন্তা ও উচ্চ-সাধনার সহায়ক রূপে উজ্জীবিত হয়ে উঠে, জীবন-যাত্রার অতি তুচ্ছ উপকরণাদিও নূতন মহিমায় মণ্ডিত হয়ে উঠে। জীবনের কোনও খুঁটীনাটী বর্জ্জনীয় নহে, সকল তুচ্ছতাই উচ্চতার আদর্শে নির্ম্মিত হয়, জীবনের সর্ব্বতোমুখী একাগ্র সাধনায়, যাহা কিছু ক্ষুদ্র, যাহা কিছু তুচ্ছ, সমস্তই মহৎ ও মহীয়ান্ হয়ে উঠে। 'গথিক' যুগের এক একটি ক্ষুদ্র জলাধারে (Cup) ঐ যুগের জীবনের ঐকান্তিকতার ছবি তাহার রূপে, তাহার নক্সায়, তাহার কলাকৌশলে, তাহার গঠন-শিল্পে আজও জীবন্ত হয়ে ফুটে রয়েছে; 'গথিক' যুগের ধর্ম্ম-সাধনার ভাব ও ভাবনার প্রতীক-রূপে নানা সংগ্রহ-শালায় আজও বিরাজ করছে। তাহাদের সংস্পর্শে, আমরা আজও ক্ষণ-কালের জন্যও, 'গথিক'-যুগের মহিমায় ও মহত্ত্বে অনায়াসে ফিরে যেতে পারি। 'গথিক'-যুগের অতি তুচ্ছ আস্‌বাব-খণ্ডও সেই যুগ-সাধনার 'স্বপ্ন' আমাদের সম্মুখে 'সত্য' করে' তোলে।

'গথিক'-যুগের সাধনা সমাজের নানা রূপে মূর্ত্তি পেয়েছিল। এই স্থানে তাহার দুই একটীর উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে। প্রথমতঃ, 'সঙ্ঘ চক্রে' (Communes) বা গোষ্ঠী বা পৌর-সভায় (Civic groups)—জাতির শ্রেষ্ঠ মনীষী ও কর্ম্মীদের সাধনা ও চিন্তা মূর্ত্তিগ্রহণ করে' ফুটে উঠিছিল। এই 'সঙ্ঘ-চক্র' সমাজের জীবনের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল। 'গথিক'-যুগের পৌর-সভা (Council-chamber) ও নাগরিক সম্মেলনাগার (Town-Hall) পৃথিবীর সমস্ত আধুনিক মিউনিসিপালিটীর আদিপুরুষ। এই যুগে নগর-সভ্যতার (Civics) নানা দিকে, নানা পরিণতি, নানা পরিবর্ত্তন ঘটেছিল। পণ্য-বাণিজ্যাদির উৎসাহের জন্য নগর-প্রদর্শনীর (City-Fairs) ব্যবস্থা ছিল। উপরন্তু, বিশেষ বিশেষ শ্রম-জাত-শিল্পের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা ছিল।

তাহার একটী ব্যবস্থা ছিল—"বস্ত্রাগার" (Cloth-Hall)। ...ের শতকে নির্ম্মিত ইপ্রে সহরের সুবিখ্যাত Cloth-Hall, এই শ্রেণীর প্রচেষ্টার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। এই সমস্ত 'বস্ত্রাগারে' বয়ন-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সংগৃহীত ও প্রদর্শিত হ'ত, তাহাদের মূল্য নির্দ্ধারিত হ'ত এবং সাধারণতঃ বস্ত্রশিল্পীদের সংরক্ষণ ও উন্নতির চেষ্টা সহযোগ-নীতির অনুসরণ করে' অনুষ্ঠিত হত। এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ শিল্প-বিদ্যার ও কলাশিল্পের ধর্ম্ম-সমবায় (Guild) প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সমস্ত Guild'এর উদ্দেশ্য শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব ও আদর্শ রক্ষা করা, শিল্পীদের উপযুক্ত, বৃত্তি বা পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা, উৎপন্ন শিল্পের যথাযোগ্য মূল্য নিরাকরণ ইত্যাদি। এই Guild-সমূহের নিরূপিত আইন কানুন অনুসারে, নিকৃষ্ট শ্রেণীর শিল্প উৎপন্ন হওয়ার কোনও সুযোগই থাকৃত না। শিল্পী তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান ব্যতীত, হীন শ্রেণীর শিল্প হাটে বাজারে আন্‌তে পার্‌তেন না। সমাজ শিল্পীর নিকট তাহার শ্রেষ্ঠ রচনার, তাঁহার শ্রেষ্ঠ দানের দাবী করিত; শিল্পী কায়-মনো-বাক্যে, অন্তরের সহিত, প্রেমের সহিত সেই দাবীর পুরণ করা জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ "কর্ম্ম", সর্ব্বশ্রেষ্ঠ "ধর্ম্ম" বলে' মনে কর্‌তেন। সমাজের এক এক অঙ্গ বা কর্ম্মি-গোষ্ঠী জীবনের এক একটী বিভাগের ভার লইতেন। ঐ বিভাগের কর্ম্ম-সম্পাদন ও ভার বহন করা তাঁহাদের জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য বা "ধর্ম্ম" বলে' গৃহীত ও আচরিত হ'ত। ঐ ধর্ম্ম-পালনের যে পারিশ্রমিক নির্দ্ধারিত হ'ত তাহা ঐ দানের বা পরিশ্রমের "পণ্য" বলিয়া গ্রাহ্য হইত না, কারণ তাঁহারা যে দান দিতেন তাহা অন্তরের দান, জীবনের দান, আধ্যাত্মিকতার দান, তাহা অমূল্য, মূল্য দিয়া ক্রয় করা যায় না। জীবনযাত্রার এইরূপ আধ্যাত্মিক-সামাজিকতার (Spiritual Socialism) নির্দ্দেশ ও নিয়ম অনুসারে, সমাজের প্রত্যেক বিভাগের কর্ত্তব্য-পালক-সমষ্টির নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য-পালনের "ধর্ম্ম" নিরূপিত ছিল। যিনি বৈদ্য, সমাজের ব্যাধি-গ্রস্তের আরোগ্য-সাধনাই তাঁহার জীবনের ব্রত ও "ধর্ম্ম"। কেবল দর্শনী হস্ত-গত করে'ই তাঁহার কর্ত্তব্যের শেষ হ'ত না। দর্শনীটা অবান্তর কথা, রোগীকে তাঁহার বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার শ্রেষ্ঠ উপদেশ-দানই তাঁহার "ব্যবসায়ের" অবশ্য কর্ত্তব্য "ধর্ম্ম"। যিনি শিল্পী—তাঁহার শিল্প-বুদ্ধি, তাঁহার সৌন্দর্য্য—উপাসনার শ্রেষ্ঠ দান সমাজকে উপহার দেওয়া, তাঁহার অবশ্যপালনীয় "ধর্ম্ম"। তাঁহার বৃত্তির "মূল্য" বা পারিশ্রমিক তাঁহার রচিত শিল্পকলার বিনিময় নহে। কারণ শিল্পীর দান হৃদয়ের দান, আধ্যাত্মিকতার দান, তাঁহার শ্রেষ্ঠ চিন্তা, ভাবনা ও সাধনার দান, মূল্য দিয়া তাহা ক্রয় করা যায় না—তাহা বাণিজ্যের পণ্য হ'তে পারে না। দেবতার সেবা, সমাজের সৌন্দর্য্য-পিপাসার সুধা যোগান শিল্পীর "ধর্ম্ম" এবং "কর্ম্ম"। শিল্পী সমাজের অত্যাবশ্যক সহায়ক, সেবক এবং অচ্ছেদ্য অঙ্গ। শিল্পীকে বাদ দিয়া জীবন-সাধনার কোনও ব্যাপারই সিদ্ধ হয় না। যে সমাজে শিল্পীর উপর দাবী নাই, শিল্পীকে বাদ দিয়া যে সমাজ চল্‌তে চায়, সে সমাজ ব্যাধি গ্রস্ত, সে সমাজ মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ-আদর্শ-বর্জ্জিত যন্ত্রের সমাজ, পশুর সমাজ।

এই দিক্ দিয়ে বিচার করে' বলা যায় যে, যে সমাজে শিল্পীর আদর নাই, শিল্পীর কর্ত্তব্য নাই, শিল্পীর উপর দাবী নাই, সে সমাজ জাগ্রত নহে, জরা-ব্যাধিগ্রস্ত অথবা মৃত। শিল্পই সমাজের স্বাস্থ্যের নাড়ী-স্পন্দন। একটা যুগের সাধারণ ও তুচ্ছ শ্রম-শিল্পজাত দ্রব্য (industrial art) দেখে' অনায়াসে বলা যায়, যে সমাজ জীবন্ত না মৃত। সমাজের অন্তরের অধ্যাত্মজীবন স্থাপত্যে, চিত্রে, পটে, আসনে, বসনে, বাসনে স্পষ্টরূপে আত্ম-প্রকাশ করে। যেখানে যথার্থ ধর্ম্মের প্রেরণা আছে, আত্মা যেখানে সত্যই জেগেছে—শিল্পের দর্পণে, ব্যবহারিক জীবনের প্রত্যেক তুচ্ছ সামগ্রীতে, সেই ধর্ম্ম-বুদ্ধির, সেই জাগ্রত আত্মার সঠিক প্রতিকৃতি বা প্রতিমা স্বচ্ছ রূপে আত্ম-প্রকাশ করে।

যদি একবার চোখ মেলে' দেখা যায়—সহস্র-মুকুর-খচিত আমাদের আধুনিক জীবনের মলিন "শীশ-মহলে" আমাদের অধ্যাত্ম-সাধনার কি ছবি ফুটে' উঠেছে—আমাদের নিত্য-জীবনের আস্‌বাবপত্রে, স্থাপত্য-রীতিতে, আসন-বসনের উৎকট বর্ণ-সমাবেশ ও ভঙ্গীতে, আমাদের গৃহের ভিত্তি-লগ্ন চিত্রাদিতে, আমাদের পণ্যশালার

কুৎসিং ফলকে, আমাদের জনপ্রিয় সঙ্গীতে, রেডিও'র বিকট-নিনাদে, একটা কথাই উচ্চৈঃস্বরে ঘোষিত হচ্ছে—যে, আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধি এখনও সুষুপ্ত, আমাদের আধ্যাত্মিক চেতনা এখনও নিদ্রিত, আমাদের সামাজিক বিবেক-বুদ্ধি এখনও সমাধিস্থ। একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে হবে—যে বহু সাধক, বহু সন্ন্যাসী, বহু কর্ম্মবীর, বহু শিল্পী, বহু ভাবুক, বহু কবি, বহু বৈজ্ঞানিক—আমাদের জীবনের সুপ্ত চৈতন্যকে জাগিয়ে তুলতে মহাসমারোহে অকাল-বোধনের অক্লান্ত উদ্যোগ ও আয়োজন করছেন। কিন্তু কুলকুণ্ডলিনী কি জেগেছেন?

শোকাঞ্জলী

বাংলার চারণ "মুকুন্দ দাস"

বিগত ১৮ই মে সন্ধ্যার প্রাক্কালে কলিকাতা ১৯ নং গোপাল নীয়োগী লেনে অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া বাংলার জাতীয় চারণ, স্বনামধন্য কবি ও স্বদেশী যাত্রাওয়ালা,

৺"মুকুন্দ দাস"

দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সেবক, বাংলা মায়ের সুসন্তান ও গৌরব শ্রীযুক্ত "মুকুন্দ দাস" ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময়ে তাঁর বয়স হইয়াছিল ৫৮ বৎসর। এই মর্ম্মন্তুদ অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদে দেশবাসী মাত্রেই মর্ম্মাহত হইয়াছেন।

বাংলার ঘরে ঘরে অবালবৃদ্ধবণিতার নিকট "মুকুন্দ দাসের" নাম সুবিদিত। তাঁকে বাংলার যুবশক্তির প্রতীক বলিলেও বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। তিনি ছিলেন স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্তের মন্ত্র-শিষ্য। তাঁর পূর্ব্ব নাম ছিল শ্রীযজ্ঞেশ্বর দে, তাঁর গুরুর প্রদত্ত নাম "মুকুন্দ দাস" নামেই তিনি পরবর্ত্তী কালে পরিচিত। তাঁর প্রগাঢ় স্বদেশ-প্রেম, নিষ্ঠা ও স্বধর্ম্ম-প্রিয়তা অনুকরণীয়। দেশের, দশের ও সমাজের সেবায় "মুকুন্দ দাসের" জীবন ছিল উৎসর্গীকৃত। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় হইতে জাতিকে স্বপ্রতিষ্ঠ করিবার জন্য তিনি অনাড়ম্বড় যাত্রা ও সহজ কথকতার অভিনব ভঙ্গীর মধ্য দিয়া স্বদেশ-মন্ত্র প্রচার ও সমাজসংস্কার করিতে আরম্ভ করেন। এজন্য তিনি নিজেই বহু নাট্য-গ্রন্থ রচনা করেন।

তাঁর রচিত 'মাতৃ-পূজা,' "সমাজ", "আদর্শ" "কর্ম্মক্ষেত্র", "পথ" "ব্রহ্মচারী" প্রভৃতি নাটক জাতির অসাড় ধমনীতে অভিনব শক্তির সাড়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিল। এজন্য তাঁকে কারাদণ্ড প্রভৃতি বহু নির্য্যাতনও সহ্য করিতে হইয়াছিল।

তাঁর মৃত্যুতে একজন একনিষ্ঠ এবং অকৃত্রিম দেশভক্ত ও সমাজসেবীর অপূরণীয় অভাব ঘটিল। শ্রীযুক্ত "মুকুন্দ দাসের" পরলোকগত আত্মার শান্তি ও কল্যাণ কামনা করি ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের অশ্রুর সঙ্গে অশ্রু মিশাইয়া সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

ডাক-ঘর

কুতুবদিয়া হইতে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের কর্ম্মী শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কর আমাদিগকে পত্রে জানিয়েছেন—

"এখানে হরিজনদের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে দেখি, কয়েকজন মুসলমান ইহা সাম্প্রদায়িক আন্দোলন বলে' কাজে বাধা-সৃষ্টি করেন। বিশেষ কোন মুসলমান অফিসার এলে এঁরা তাঁকে আমাদের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেন এবং সর্ব্বসময়েই আমাদের কাজে যাঁরা সাহায্য করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে অনেক মামলা-মোকদ্দমা সাজিয়ে একটা গোলযোগ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। যদিও এরূপ বাধা অল্পবিস্তর গোড়া থেকেই পেয়ে আসছি, কিন্তু সম্প্রতি যেন বিশেষ-ভাবেই বাধা বড় হয়ে উঠছে। ভগবানের কাজ বাধায় বন্ধ হবে না, এই বিশ্বাস আছে।

এখানকার খাসমহলের বর্ত্তমান বড় কর্ত্তা একজন মুসলমান। সম্ভবতঃ তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আমার বিরুদ্ধে S. P কে এক পত্র লেখা হয়েছিল, যে আমার জন্য এখানে অফিসারেরা দুধ খেতে পান না। আমি গোয়ালাদের দুধ দিতে নিষেধ করেছি, আর. আমি খাজনা আদায় করার কাজেও বাধা দিই। এই দুইটা কাজই আমাদের বিরুদ্ধধর্ম্ম, সম্প্রতি ইন্‌স্‌পেক্টর এসে তদন্ত করে' গেছেন এবং এই সকল অভিযোগ মিথ্যা বলে' রিপোর্ট দিয়েছেন।"

সঙ্ঘের নির্ম্মাণ-কার্য্যে মুসলান-সম্প্রদায়ের এই অন্ধতা-প্রসূত বাধা নূতন নহে। কুতুবদিয়া ও চট্টগ্রামে হিন্দু মুসলমান জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের খাদি-শিল্পের মধ্য দিয়ে প্রাণ পেয়েছে, দুই বেলা অন্নমুষ্টির সংস্থান করতে সমর্থ হয়েছে। এ কথা তারা জানে। এদেরই মনে সাম্প্রদায়িকতা-বুদ্ধির আমদানী করছেন যাঁরা তাঁরা বাহির থেকেই সে বিষ-বীজ সরবরাহ করছেন বলে' আমাদের দৃঢ়-বিশ্বাস। তাঁরা মিথ্যার আশ্রয় নিতেও কুণ্ঠিত নহেন। তদন্তের ফলে সত্যপ্রকাশ হ'লেও, কি তাদের এই দুশ্চেষ্টা অতঃপর নিরস্ত হবে না?

অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবে নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাশ মহাশয় উপস্থিত হ'তে না পারায় তাঁর অভিভাষণ পাঠাবার সঙ্গে পাটনার এড্‌ভোকেট্ শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র ঘোষ শ্রীযুক্ত মতিবাবুকে লিখেন—

"আমি পূজনীয় প্রফুল্লরঞ্জন দাশ মহাশয়ের পরমার্থগোষ্ঠীয় একজন আত্মীয়। সেই হিসাবে তিনি আমাকে তাঁহার অভিভাষণ লইয়া আপনাদের সঙ্গে পৌঁছাইয়া দিতে আদেশ করিয়া টেলিগ্রাম করিয়াছেন। টেলিগ্রামটী রাত্রি দশটার পর আমার হস্তগত হইয়াছে। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, যে দাস মহাশয় আসিবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন—এমন কি তাঁহার অভিভাষণ প্রস্তুতও করিয়াছেন। কিন্তু, হাথোয়া রাজসরকারের কোন গুরুতর সমস্যায় তাঁহাকে সঙ্গে পৌঁছিতে দিতেছে না। ইহা যে মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিয়াছেন তম্মুহূর্ত্তেই তিনি আমার নিকট টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন। ...অত্যন্তই অপ্রত্যাশিত ভাবে দাশ মহাশয় অদ্যকার উৎসবে যোগ দিতে পারিলেন না, তজ্জন্য তাঁহার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।"

মিঃ পি, আর, দাশ মহাশয় সভায় প্রত্যক্ষভাবে যোগদানে অসমর্থ হওয়ার কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক ১৮ই মে তারিখের পত্রে, বেইলী রোড, পাটনা থেকে স্বয়ং লিখছেন—

"My dear Sir,

I feel that I owe you a word of apology for not being able to attend your function. When you have heard me out, you will find that I am not to blame in the matter.

I had arranged all my work so as to leave me time to attend your function ; but suddenly I was called to Hathwa by the Maharaja Bahadur to meet an extra-ordinary situation that had arisen there. I had to leave for Hathwa last Friday night, having been assured by the Maharaja Bahadur that the work would not take more than a day. I found an extra-ordinary situation there.........However, I had to stay there from day to day. The Maharaja Bahadur would not let me come away. I had made all arrangements to leave for Calcutta ; I had even prepared my speech for the occasion. But it was quite impossible for me to leave Hathwa and to desert the Maharaja at a supreme crisis of his life. I would not leave him,

if I could. To do that would have been a sin. But even if I wanted to come away, I would not have been able to do so, because the Maharaja Bahadur was relying solely upon me.

This is the whole position. I hope, that you will appreciate that I was not a free agent in the matter at all. Please forgive me, because I know that I must have caused you great difficulties But I am sure you will understand the position and forgive me.

Yours sincerely,
(Sd.) P. R. DAS."

ইহার মর্ম্মার্থ :

"প্রীতি পুরঃসর—

আপনাদের অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হওয়ায়, আমার ক্ষমা-প্রার্থনা-সূচক কয়েকটী কথা বলা উচিত মনে করি। আপনি আমার কথাগুলি শুনিলে নিশ্চয়ই বুঝিবেন, যে এ বিষয়ে আমাকেই ঠিক দোষ দেওয়া যায় না।

যথাসময়ে আপনাদের অনুষ্ঠানে যোগ দিব মনে করিয়াই আমার সমস্ত কাজগুলি গুছাইয়া লইয়াছিলাম; কিন্তু সহসা আমি হাথোয়ার মহারাজা বাহাদুর কর্ত্তৃক আহূত হইলাম—সেখানে যে একটী নূতন ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল তাহারই প্রতিকারের জন্য। আমায় গত শুক্রবার রাত্রে হাথোয়ায় রওনা হইতে হয়; কেন না, মহারাজা বাহাদুর আমায় আশ্বাস দিয়াছিলেন, যে একটী দিনের বেশী তাঁহার কাজের জন্য আমার লাগিবে না। আমি সেখানে গিয়া যাহা দেখিলাম তাহা সাধারণ অবস্থা নহে।······যাহা হউক, আমার সেখানে থাকিতে হইল দিনের পর দিন। মহারাজা বাহাদুর আমাকে চলিয়া আসিতে কিছুতেই দিলেন না।

আমি কলিকাতায় রওনা হইবার জন্য সবই গুছাইয়া রাখিয়াছিলাম; এমন কি, সভার জন্য আমার অভিভাষণটীও প্রস্তুত করিয়াছিলাম। কিন্তু হাথোয়া পরিত্যাগ করা ও মহারাজা বাহাদুরকে তাঁহার জীবনের একটী পরম সঙ্কট-মুহূর্ত্তে একা ছাড়িয়া যাওয়া আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হইল। আমি রওনা হইতে পারিলেও তাহা করিতাম না। সেরূপ করিলে, উহা আমার পক্ষে পাপ হইত; কিন্তু আমি আসিতে চাহিলেও, আসিতে পারিতাম না; কেন না, মহারাজা বাহাদুর নির্ভর করিতেছিলেন একমাত্র আমারই উপর।

সমস্ত অবস্থাটাই বলিলাম। আমি আশা করি, আপনি এইবার প্রত্যয় করিবেন, যে এই বিষয়ে আমি একেবারেই স্বাধীন মানুষ ছিলাম না। আমি জানি, আমি আপনাদের বিস্তর অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছি—তজ্জন্য অনুগ্রহপূর্ব্বক আমায় ক্ষমা করিবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি আমার অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিশ্চয়ই ক্ষমা করিবেন।

ইতি—অকপটে আপনার,
(স্বাঃ) পি, আর, দাশ।"

নারী ও পুরুষ

(বিভিন্ন প্রতীচ্য-মনীষীর অভিমত)

ভগবানে বিশ্বাস যদি থাকে এবং জীবনের ভঙ্গী যদি হয় নিঃস্বার্থ তবে দু'জনের নিরাপদ মিলনের মাঝে অন্য কোন বিবেচনা আসিতে পারে না।—রেভারেণ্ড এ, ডি, বেলডেন

* * *

মনে-প্রাণে যদি মিল হয় তবে তরুণ-তরুণীর ইচ্ছা হইলে বিবাহ হওয়া উচিৎ। বেকার বলিয়া যে বাধা তাহা বর্ত্তমান সভ্যতার অভিশাপ।—মিসেস হেডেন গেষ্ট

* * *

উভয় পক্ষেরই যদি দায়িত্ব জ্ঞান জন্মিয়া থাকে ও সন্তানসন্ততি পালনের সঙ্গতি থাকে তবে অল্প বয়সে বিবাহে কোন বাধা নাই।

অদূরদর্শিতার ফলে যে মিলন তার ভাবীফল বিষময়ই হয়।

—অনারেবল মিসেস সেন্ট জ্যাবিন

উভয়ের মাঝে যদি থাকে মিল ও সামঞ্জস্য তবে ধন-সম্পদের স্থায়িত্বের চেয়েও সে মিলন হয় সুখকর। সংসারের ঝঞ্ঝাট পোহান যেমন দম্পতীর পক্ষে সহজ তেমন এককের পক্ষে নয়।

—এস, পি, বি, মেস

* * *

নারীর কলা জ্ঞান বেশী আর-পুরুষের প্রতিভা বেশী। নারী দেখে, পুরুষ বিচার করে।—রুশো

* * *

নারীরা হৃদয় দিয়েই তর্ক-বিতর্ক করে, মন দিয়ে নয়।—মেথু আরনল্ড

নারীর হৃদয়ে একবার যে দাগ বসে তা মুছে ফেলা সহজ নয়।

—থ্যাকারে

"নদের নিমাই"

বৌদ্ধ-যুগের প্লাবনে বাংলাদেশ যেমন করিয়া ভাসিয়াছিল, ডুবিয়াছিল, এমন করিয়া কোন দেশ বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিল কি না বলিতে পারি না। সেই বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বাংলায় স্থান পাইল না; তাহার কারণ, বাঙ্গালী জাতির স্বভাব ও স্বধর্ম্মের পথে অনুকূল হইয়াছিল বাংলার তন্ত্র ও সহজিয়া ধর্ম্ম। তন্ত্র সহজিয়া বলিতে কেহ যেন রিরংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করার সুগম-পন্থা মনে করিবেন না। আগমে যাহা বাণী, নিগমে তাহা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। সহজিয়ায় বাঙ্গালী পাইতে চাহিয়াছে দিব্য স্বভাবটীকে। এই সহজিয়া সাধনার নীতি সত্যই বেদ-গোপ্য বস্তু। জ্ঞানের আবরণে যে জলধর-কান্তি, শ্যামঘন প্রেম লুকাইয়া থাকে, সহজিয়ায় তাহাই উপলব্ধিগম্য হয়। এই সকল প্রসঙ্গ বক্ষ্যমান প্রবন্ধের বিষয় নহে। এ সকল কথা "প্রবর্ত্তকে" বিশদভাবে পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে।

চারি শত বৎসর পূর্ব্বে চণ্ডীদাসের ধ্যানমূর্ত্তি শ্রীনবদ্বীপে যখন রূপঘন হইয়া দেখা দিল, তখন বাঙ্গালীর বস্তুপ্রাপ্তির পথ দুর্গম রহিল না; সহজ-সাধনার শ্রীমূর্ত্তিকে এই চর্ম্মচক্ষে দেখিয়া বাঙ্গালী-জাতি কৃতার্থ হইল। বাংলার অভিনব ধর্ম্ম-সাধন-নীতি বিশ্লেষণ করিতে গিয়া সমালোচনার তীক্ষ্ণ ছুরি শ্রদ্ধাবশেই অকারণে অনেককে আঘাত দিয়াছে। অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে এ ত্রুটি খুবই স্বাভাবিক। বহুদিন পূর্ব্বে "প্রবর্ত্তকে" শ্রীগৌরাঙ্গচরিত আলোচনা করিতে গিয়া মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে খুব অস্পষ্ট করিয়াই দেখিতে পাইয়াছি। বিচার করিয়াছি, তাঁর অন্তর্লীলা ধরিয়া। গুরুবস্তুর বিচার নাই; কিন্তু বিচার যখন আসে, তাহাকে তথাকথিত বৈধীভক্তির আগল দিয়া বারণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তবে বিচার যেখানে শ্রদ্ধার মূলে আঘাত দেয়, তাহা বিচার নহে, উহা কু-মনের আচার। বিচার-

নিমাই, গঙ্গাদাস, শচী (গঙ্গাদাস পণ্ডিতের মোহমুক্তি)

তাহা হস্তগত হয়, এই বিশ্বাস আমার আছে এবং এইজন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ সম্বন্ধে যথাকালেই সে সত্য আমি উপলব্ধি করিয়াছি, তাহা বলিবার জন্য এইটুকু গৌরচন্দ্রিকা করিতে হইল।

বিখ্যাত "হাওড়া-সমাজের" "নদের নিমাই" অভিনয় অনেকের নিকট খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ঘটনাচক্রে এবার আমাদের উৎসবক্ষেত্রে "হাওড়া-সমাজ" অনুগ্রহ করিয়া অভিনয় করিতে আসিয়াছিলেন। অভিনয়টী শত লইয়া এত রসসৃষ্টি হইতে পারে, ইহা না দেখিলে বুঝা যায় না। অভিনয়ের কোনই আড়ম্বর নাই; কিন্তু ইহাকে অভিনয় না বলিলেও চলে না। সাজসজ্জা, হাস্যকৌতুক, সঙ্গীত, বক্তৃতা কিছুরই অভাব নাই; কিন্তু আশ্চর্য্য, একটী অখণ্ড ছন্দের মধ্যে অশেষ বৈচিত্র্য অবধৃত হইয়া বাংলার যুগধর্ম্মকে মহিমামণ্ডিত রূপে দর্শকের সম্মুখে ধরা হইয়াছে—ইহা অভিনয়-দর্শনের তরল উপভোগ নহে, যুগসাধনার চিত্র অবলোকন করিয়া হৃদয়ে দিব্য রসই

গোবর্দ্ধন, সনাতন, চণ্ডাল, চণ্ডাল-কন্যা (ভগবানের যদি জাত নাই, তোদের কেন জাতের বালাই)

রাত্রির অধিক নানাস্থানে অভিনীত হইয়াছে। সুতরাং প্রত্যেক ভূমিকা আশাতিরিক্ত সৌকর্য্যের সহিত প্রত্যেকেই অভিনয় করিয়াছেন। এক্ষেত্রে কাহাকেও বাদ দিয়া কাহারও প্রশংসা চলে না। আসলে, অভিনীত বিষয়টী লইয়াই আমি কথা কহিতেছি; নাটকখানি এমন সুকৌশলে সুরচিত হইয়াছে যে, কয়েকটী দৃশ্যেই দর্শকের সম্মুখে 'নদীয়ার নিমাই' পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তাহার অতিরিক্ত অথবা তাহা হইতে ন্যূন কোন দৃশ্যের সংযোগ-বিয়োগ ঘটিলে হয়তো এ[illegible] না। নিছক তত্ত্ব-বস্তু উৎসৃত হয়—অভিনেতৃদের ইহা বড় কম গৌরবের কথা নহে।

চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বাংলার এমন দশাই ঘটিয়াছিল—তরুণের উদ্‌ভ্রান্তচিত্তের পরিচয় ঠাকুর বৃন্দাবন দাস দিয়াছেন—

রমা-দৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে।
ব্যর্থকাল যায় মাত্র ব্যবহার-দোষে।

গভীর অধ্যাত্মরসের উৎস যখন শুকাইয়া যায়, মানুষের অন্তরানুভূতির যন্ত্রে যখন মরিচা ধরে, তখন একদিকে

প্রাণহীন প্রাচীন আচার-ধর্ম্মকে মানুষ আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়, অন্যদিকে ধর্ম্মকর্ম্ম মনের দুর্ব্বলতা বলিয়া লোকে উপেক্ষা করে; সংসার, সমাজ প্রেমশূন্য, বিশ্বাসহীন, নীরস জড়ের ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়ে। সেদিন মানুষ গঙ্গাঘাটে স্নান করিতে ছুটিত—পুণ্যসঞ্চয়ের সংস্কারে; সরস্বতীর আরাধনা করিত পাণ্ডিত্যের গর্ব্ব জাহির করিতে। রাত্রি জাগিয়া পাড়ায়-পাড়ায় মঙ্গলচণ্ডীর গান হইত। 'বিষহরি' পূজায় পল্লীবাসী মাতিয়া উঠিত। বিগ্রহ-পূজনে মহাধন-

যখন ভগবান যুগধর্ম্মরক্ষায় অবতীর্ণ হন কোন পুণ্য-ক্ষেত্রে, তাঁর চিহ্নিত সাঙ্গোপাঙ্গগণ দূরদূরান্তর হইতে আসিয়া মিলনচক্র গড়িয়া তুলেন,—

কারও জন্ম নবদ্বীপে, কারও চাটিগ্রামে।
কেহ রাঢ়ে, উড্রদেশে, শ্রীহট্টে, পশ্চিমে॥

রাঢ়ে একচক্র নাম গ্রামে শ্রীনিত্যানন্দ অবতীর্ণ হন। পিতা হাড়াই পণ্ডিত ছিলেন শুদ্ধ বিপ্র—তাঁহার ঔরসে পদ্মাবতী-গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 'নদের
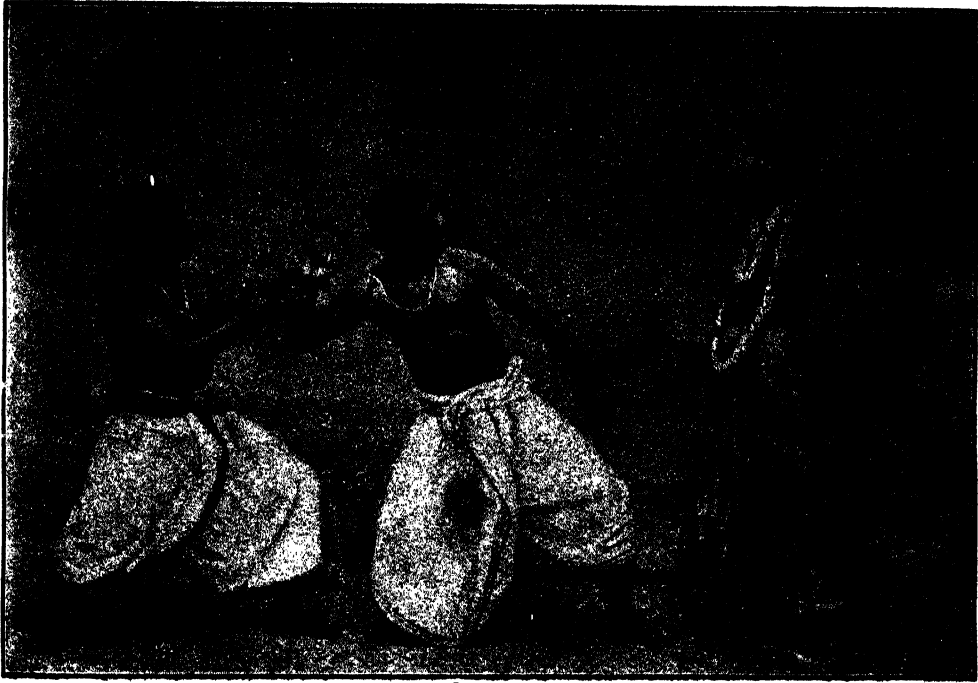
নিতাই, জগাই, মাধাই (মেরেছ আগর মার, একবার হরি বল)

ব্যয় করিত; পুত্রকন্যার বিবাহে ঘটার সীমা থাকিত না। শাস্ত্র-চর্চ্চা করিয়াও অনেক ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, মিশ্র শাস্ত্রানুভূতির ধার ধারিতেন না, পরনিন্দা, পরচর্চ্চায় দিন কাটাইয়া দিতেন। অতি বড় বিরক্ত তপস্বীও অভিমানে আত্মঘাতী হইতেন। এমন সময়ে শাস্ত্র-সাগর মন্থন করিয়া, মত্তমাতঙ্গের ন্যায় ধর্ম্ম-সুধা লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব। অতি সংক্ষেপে শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্বাভাষ দিয়া অভিনয়টীকে আগাগোড়া অর্থপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন—'নদের নিমাইয়ের' গ্রন্থকর্ত্তা।

নিমাই'য়ের পূর্ব্বাভাষে নিত্যানন্দের গোড়ার চরিত্রটুকু দর্শকের চিত্তে আঁকিয়া, অনন্তশক্তির বিভূতি অবধূত-বেশে এই নিত্যানন্দের নবদ্বীপে প্রবেশ-দৃশ্য যেমনই চিত্তাকর্ষক তেমনই মাধুর্য্য-মণ্ডিত। পূর্ব্বাভাষ-স্বরূপ আর একটী দৃশ্যের অবতারণা করা হইয়াছে;—

"অদ্বৈত'র কারণে চৈতন্য-অবতার"—এই বৈষ্ণব-বচন বুঝি এই দৃশ্যের অভাবে এমন করিয়া পরিস্ফুট হইত না। ঋষি-যুগের ঋক্-ধ্বনি যেমন ত্রিদিব মথিয়া পৃথিবীতে ভগবানকে মূর্ত্ত করার আয়োজন করিয়াছিল—

অনাদিযুগ হইতে এমন ডাকার মত ডাক উঠিয়াছিল বলিয়াই ভারতের মত আর কোন দেশে এত অধিক অতিমানবের জন্মলাভ ঘটে নাই। অনাচারে, অধর্ম্মে, ঈশ্বরবিশ্বাসের অভাবে বাঙলার সমাজ যখন উৎসন্নপ্রায়, তখন ব্যথায় অভিমানে আচার্য্য অদ্বৈত কখনও উপবাস কখনও দীর্ঘশ্বাস, কখনও নৃত্য কখনও বা কীর্ত্তনে আকুল মনে উদাত্তকণ্ঠে জানাইতেন "করাইব কৃষ্ণ সর্ব্বনয়ন-গোচর"। তাঁহার সহকারী ছিলেন শ্রীনিবাস প্রমুখ চারি ভ্রাতা। ভগবদ্ভক্তির অভাব-জনিত নরনারীর কদর্য্যচরিত্র ঘুচাইয়া প্রেমভক্তির জাহ্নবী-ধারায় সমাজকে পুণ্য-পূত করার জন্য ইঁহারা নিরবধি একচিত্ত হইয়া কঠোর তপস্যা করিতেন। পূর্ব্বভাবে এই দৃশ্যটী পরিস্ফুট না হইলে বুঝি 'নদের নিমাই' এমন করিয়া জমিত না। তারপর, নায়গ্রাপ্রপাতের মত ঘটনার পর ঘটনায় দর্শক-মণ্ডলীকে চিত্রাপিত করিয়া রাখে। উদয়শঙ্করের ভারতীয় নৃত্যকলা চক্ষে দেখি নাই—চিত্রে দেখিয়াছি। দিব্য ভাবাবেশে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পুলক-শিহরণ যে অপার্থিব মুদ্রাদি অভিব্যক্তি করে তাহা অভিনয়ের আবেশে নিত্যানন্দের ভিতর অতি সহজ ভাবেই বারম্বার প্রকাশ হইয়া পড়িতে দেখিয়াছি। ইহা শুধু অভিনয়ের কৌতুক নহে—ভাবপ্রচারের সঙ্কল্প না থাকিলে এইরূপ পবিত্র অভিব্যক্তি সম্ভব হয় না। শ্রীচৈতন্যের ভঙ্গীও উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করে যবন হরিদাসের বৈষ্ণব-জনোচিত বিনয় ও আচার। অভিনয় দেখিতে দেখিতে 'নবদ্বীপ-চন্দ্রের' যুগচিত্র এমন জীবন্ত হইয়া উঠে তাহা বলিবার ভাষা নাই; ইহা অভিনেতৃদের অপূর্ব্ব কৃতি বলিতে হইবে। জগাই মাধাইয়ের চরিত্র-চিত্রণ দর্শকের চিত্তে চিরদিন আঁকা থাকিবে।

পাষণ্ড দলনে নিমাইয়ের সুদর্শনকে আহ্বান

নিত্যানন্দ আনিয়াছিলেন বুকভরা প্রেম আর করুণা। সরস মূর্ত্তিমন্ত এই উলঙ্গ সন্ন্যাসী জীবোদ্ধারের বেদনাভার শ্রীচৈতন্যের চরণতলে অর্ঘ্য দিলেন। তিনি আপনার পরাণ বাঁটিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গে চন্দনের ন্যায় লেপিয়া দিলেন —যতদিন যায়, যত প্রাণ, যত শক্তি, যত সংবেগ সব উজাড় করিয়া শ্রীচৈতন্যের মধ্যে নিজেকে ঢালিয়া নিঃশেষ

হইলেন। যেন উল্কার মত আসিয়াছিলেন তিনি, আপনাকে লয় করিয়া দিতে প্রভুর চরণে। এমন উৎসর্গের সুনির্ম্মল শতদল আমরা যে আর কোথাও দেখি নাই। অভিনয়ের ভিতর দিয়া মহাপ্রভু নিত্যানন্দের অকপট আত্মদানের যে প্রবাহ-সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা আর কারও চক্ষে পড়িয়াছিল কিনা জানি না; তবে তাঁর পরিস্ফুট, যাহা অনুধাবন করিলে অনায়াসেই বুঝা যায়, যে নিরবধি নিত্যানন্দের লীলা ও চরিত্র কীর্ত্তনে কি কারণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া বৈষ্ণবেরা বর্ণন করিয়াছেন। ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন যদি হয় প্রেম, সে শব্দমাত্র উচ্চারণ করিয়া কে কোথায় বস্তুলাভ করিয়াছে? তাই প্রেমমূর্ত্তি শ্রীনিত্যানন্দের পুণ্যস্মৃতি বাঙ্গালী
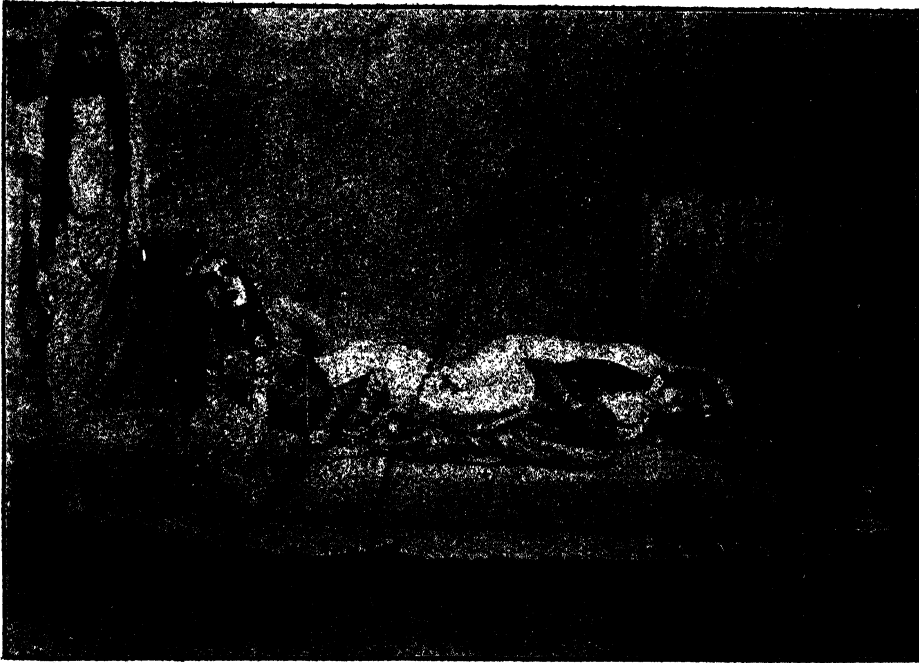
নিমাই, বিষ্ণুপ্রিয়া, যোগমায়া (মোহন মুরলী ঐ ডাকিছে আমায়)

নবদ্বীপে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে গৌরচন্দ্রের প্রভাব কলায় কলায় বর্দ্ধিত হইয়া, পরিশেষে যে সূর্য্যকরোজ্জ্বল ত্যাগ-বৈরাগ্যের প্রদীপ্তি তাঁহাকে অসাধারণ কান্তিময় করিয়া তুলিল, তাহা কাহারও অবিদিত থাকিতে পারে না। রঙ্গমঞ্চে নিত্যানন্দের প্রবেশ মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় উদ্দাম; কিন্তু ভীমপ্রচণ্ড নৃত্যলাস্যে শক্তির সে উচ্ছ্বাস শ্রীচৈতন্যের পূর্ণবৈরাগ্যপ্রকাশে স্তিমিত দীপশিখার ন্যায় ক্রমে অনুজ্জ্বল হইয়া পড়িল। পরিপূর্ণ আত্মদানের পর এই ম্লান-মূর্ত্তি খুবই স্বাভাবিক। নবজীবনলাভের সঙ্কেত তাঁর জীবনে এমনই ভুলিতে পারে না—ভুলিলে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কৃপালাভের আশ্রয় হারাইয়া যায়। আমরা নিত্যানন্দ-লীলা ভবিষ্যতে স্বতন্ত্র ভাবে আরও বিশদ করিয়া আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। জীবের মুক্তি-পথের কাণ্ডারী ভক্ত; ভগবান নহেন। এই ভক্তের বিগ্রহ 'নদের নিমাই'য়ে বড় প্রকট হইয়াছিল বলিয়াই, নবদ্বীপ-লীলার রসাস্বাদনে চরিতার্থ হইলাম। 'হাওড়া-সমাজের' এই প্রেমধর্ম্ম-প্রচারে শ্রীভগবান সহায় হউন—আমি এই প্রার্থনা করি। অভিনয়ের চেয়ে প্রেমধর্ম্মের প্রচার-সঙ্কল্পই ইহাদের বড় হউক।

— মত ও পথ —

— ধর্ম্ম —

ভারতবর্ষ ধর্ম্মক্ষেত্র—কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তির ত্রিবেণী তীর্থ—স্বর্গ ও অপবর্গ লাভের সাধনভূমি। হিন্দুশাস্ত্রে যাঁহাদের ব্যুৎপত্তি আছে তাঁহারা এই কথা অস্বীকার করিবেন না। তবু যে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম লইয়া ভারতের সমস্যার সৃষ্টি, তাহা আমাদের নিছক অন্ধতা। এই অন্ধতা ধর্ম্মসাধনার অভাবেই জন্মিয়া থাকে। ধর্ম্মসাধন সবখানি জীবন লইয়া—ইহা মস্তিষ্কবৃত্তির আলোচনা নহে, মনোবৃত্তির তর্পণ অথবা আত্মস্বার্থ-চরিতার্থতার হেতু নহে। সবখানি জীবন দিয়া ধর্ম্ম—উৎসর্গীকৃত নরনারীই এই ধর্ম্মের অনুভূতি লাভ করে। ধর্ম্মের যে শক্তি নাই, ভোগ নাই তাহা নহে; বরং ধর্ম্মই আয়ুঃ, যশঃ এবং ঐশ্বর্য্যের মূল।

যদি এই ধর্ম্ম আমরা জীবন দিয়া পালন করি, তাহা হইলে এমন বন্ধন, এমন দুর্দ্দশা আমাদের হইল কেন? ধর্ম্মসাধন করিয়া জ্ঞানে, অজ্ঞানে মিথ্যাবাক্য মুখ দিয়া উচ্চারিত হয় কেন? মিথ্যা ধারণা জন্মে কেন? নিজের মনের মত কাহাকেও না দেখিলে তাহার প্রতি অসূয়াপরবশ অন্যায় করি কেন? সামান্য দৃষ্টি থাকিলেও আত্মবিচার দ্বারা সহজেই বুঝা যায়, পরবাদ ছাড়া রসনা আমাদের তৃপ্তি পায় না। দোষ বিনা কাহারও গুণ-প্রশংসা সহ্য করিতে পারি না। শাস্ত্র, যুক্তি, অনুভূতি, এই সকল যদি সহায় হইত, এ জাতির এরূপ অধঃপতন হইবে কেন? অহঙ্কার-বল-দর্প-কাম-ক্রোধাদিসংযুক্ত জীবন যতদিন, ততদিন আমাদের বুঝা উচিত—ধর্ম্মাশ্রয়ী এখনও হইতে পারি নাই। এই অবস্থায় ধর্ম্মের গৌরব আমাদের থাকিতে পারে না।

আমরা ধর্ম্মজীবন যেদিন চাহিব, ধর্ম্মের উপর আমাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে, এই বিশ্বাস যেদিন করিব, সেদিন হইতেই বুঝিতে হইবে, বর্ত্তমান গতানুগতিক জীবনধারা হইতে আমাদিগকে অপসৃত করিয়া লইতে হইবে; নতুবা ধর্ম্মামৃত-লাভ হইবে না। আসক্তির ক্ষেত্র হইতে দূরে আসিয়াও দেখা যায়, ধর্ম্মজীবনপথের প্রধান অন্তরায় বাহির অপেক্ষা নিজেদের অন্তরের কামনাই—এই কামনার উচ্ছেদে যদি আমরা সমুদ্ধ না হই, ত্যাগবৈরাগ্যের আগুনে নিজেদের পুড়াইয়া ছাই করিতে না পারি, তাহা হইলে ধর্ম্মলাভের লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে না। কত দীর্ঘদিন চলিয়া যায়, অশেষ বারিধি-দর্শনে যাত্রা করিয়া আজও বেলাভূমি অতিক্রম করা গেল না। ধর্ম্ম যদি হয় জীবনের আশ্রয়, আর ইহা যদি তনুমনোপ্রাণ দিয়া স্বীকার করিয়াও আমরা ইহা না পাই, তাহা হইলেও ইহা ব্যতীত আর কিছু করার নাই। অতীতের দিকে আর মুখ ফিরাইতেও পারিব না; কেবল আপনাকেই তাহাতে অপমান ও অস্বীকার করা হয়। তাই ক্রমাগতই ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিকে আগাইয়াই চলিতে হয়; এ পথে আর কেহ থাকে না—থাকে শুধু স্বীকৃত সত্য। এই পথে মানুষ যত আগায় ততই গন্তব্য লক্ষ্য আরও আগাইয়া যায়; তাই মনে হয় ধর্ম্মপথে যাত্রা—অনন্ত যাত্রারই নামান্তর। ভারতের প্রাণ যদি ধর্ম্ম হয়, তবে ভারতবাসীকে এই অনন্ত পথের যাত্রী হইতে হইবে। সেখানে যে তনু, সেখানে যে বাক্য, সেখানে যে মন—তাহাদের স্বভাব কপট, ইন্দ্রিয়পরায়ণ হয় না এবং সেখানে মানুষের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ থাকিতে পারে না, সেখানে মানুষকে ব্যথা দেওয়া সম্ভব নয়। শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে উপেক্ষা করা, মানুষের প্রতি অপ্রিয় আচরণ, চাঞ্চল্য অথবা স্বেচ্ছাচার সে ক্ষেত্রে নাই—আছে মনোপ্রসাদ, সৌম্যত্ব, শৌচাদি সদ্‌গুণের অনুশীলন। যদি ধর্ম্মজীবনের এই সব লক্ষণ কেহ অধঃপতনের কারণ বলিয়া মনে করে, সে এপথে আসে নাই, এ-পথের মর্ম্ম অবগত নহে। যাহারা ধর্ম্মপথের পথিক, তাহাদের শিষ্টতা, তাহাদের প্রিয় ব্যবহার, সত্যমধুর বাক্য, জগতের ধূলিকণাকেও স্বর্ণরেণুতে পরিণত

করে। তাহাদের সংস্পর্শে মানুষ নব জন্মলাভ করে। আর আমরা ধর্ম্মের নামে করিতেছি কি? আত্মবিচার করিয়া যদি দেখি, তবে দেখিব, আমরা মুখে বলিতেছি যাহা, কাজে তাহা করিতে পারি না; অথচ আভিজাত্যের দায়ে, আদর্শের দায়ে ধার্ম্মিকতার অভিমানে গলা ফাঁড়িয়া চীৎকার করি। জীবন লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন; তাই শূন্যগর্ভ, অর্থহীন প্রলাপবাক্য বড় শ্রুতিকটু, কর্ণপটহ শুধু যেন বিদীর্ণ করিয়া দেয়।

ব্রহ্মপথের পথিক—ব্রহ্মে অবস্থিতি যদি তোমার লক্ষ্যে থাকে, তাহা হইলে আত্মার প্রসন্নতা যাহাতে ক্ষুণ্ণ হয়, এমন কার্য্যে উদ্যত হইও না। প্রিয়জনবিরহে কাতর হইয়া যদি পড়, তবে বুঝিও, আসক্তির বাঁধন গলায় জড়াইয়া এ-পথে পা বাড়াইয়াছ। যদি কামনার পূর্ত্তি না হইয়া থাকে, যদি ক্রোধে তোমার স্মৃতিভ্রংশ ঘটে, যদি প্রতিশ্রুতি-রক্ষায় বিমুখ হইয়া মুখ ফিরাও—তোমার মুখে ধর্ম্মবাণী ভাল শুনাইবে না। এই পথের যাত্রী যে তুমি, তুমিই তাহা প্রত্যয় করিতে পারিবে না। ঈশ্বর-শরণ যে সর্ব্বতোভাবে লইতে চাহে, ঈশ্বরপ্রসাদই তার পরম শান্তি, ঈশ্বরধামই তাহার পরমধাম। সে সকলের প্রতি সমদৃষ্টি-পরায়ণ হইবে। সে ভগবানে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণপূর্ব্বক তাঁহাতেই চিত্তসমাহিত করিয়া থাকিবে—সকল দুর্গতির অবসান তার এইখানেই। ধর্ম্মজীবন স্বতঃস্ফূরিত অনলের ন্যায়ই উজ্জ্বল এবং প্রচণ্ড উত্তাপময়। আত্মরক্ষার শক্তি ও পরম গতির সহায় এই ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

চাই আজ ধর্ম্মজীবনের সাধনক্ষেত্র, পরম আশ্রয়, বাংলার মধ্যে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান—যেখানে আর কেহ থাকিবে না; অন্য কিছু রাখা চলিবে না। ধর্ম্ম-মন্ত্রের সাধন করিতে হইবে—সে মন্ত্র "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" এই দীক্ষা সার্থক হইতে পারে না, যদি মানুষের চিত্ত খ্যাতি অখ্যাতি, ব্যর্থতা সাফল্য প্রভৃতি দ্বন্দ্বকে আশ্রয় দেয়। প্রতিকূল বাক্যে ক্রুদ্ধ হইলে, বুঝিতে হইবে, শরণ তাহার সবখানি দিয়া হয় নাই। যদি সে প্রলুব্ধ হয় অন্য কিছুর সম্মোহনে, তবে সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একের আশ্রয় লওয়া হয় নাই। বাংলার একনিষ্ঠ, একাশ্রয়ী অপবর্গের সাধনসিদ্ধ ঈশ্বর-কোটীর মানুষকেই ধর্ম্মহীন প্রাণহীন দেশকে ঈশ্বরমন্ত্রে দীক্ষা দিবার জন্য মাথা তুলিতে হইবে। এবার ধর্ম্ম-রক্ষায় ভগবানের অবতরণ নয়, ভক্তের অভ্যুত্থান সাধিত করিতে হইবে। ঈশ্বর-বিশ্বাসের, ঈশ্বরভক্তির, আত্মসমর্পণের জয়ডঙ্কা বাজাইতে না পারিলে, এদেশের আর পরিত্রাণ নাই। তাই ধর্ম্ম-জীবনের সমষ্টি-মূর্ত্তিকেই আমরা আহ্বান করি! একটা সমষ্টি-দিব্যজীবন-গঠনের প্রভাবেই অধর্ম্মের উচ্ছেদ, ধর্ম্মের অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী মনে হয়। অতীতের অনুকরণ-লাঞ্ছিত সর্ব্ববিধ আন্দোলন তাই একে একে ভূয়া হইয়া যাইতেছে। চাই জীবন, চাই ধর্ম্মে একান্ত আশ্রয় করিয়া একটা সমষ্টি-চেতনার নবজন্ম। এই লক্ষ্যে জাতির আন্দোলন যদি নিয়ন্ত্রিত হয়, তবেই বলিব, দেশের গঠনব্রত দৈববাণীর ন্যায় যে প্রেরণা দিয়াছে তাহা সিদ্ধ হইবে।

— সমাজ —

জৈষ্ঠ্যমাসের "এনাৎগঞ্জ' গল্পটী মৃন্ময়-মূর্ত্তি-সহযোগে অক্ষয়তৃতীয়া-উৎসবের সমাজদৃশ্যে পরিদর্শিত হইয়াছিল। ষষ্ঠ দৃশ্যে এইরূপ লেখা ছিল—"কেষ্টা ভালবেসে ফেলেছে এক গয়লার মেয়েকে। সমাজে আর তার নাই স্থান। বাপও দিলে তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে। গয়লার মেয়েও পার পেলে না। পাঁচ-চুলো করে' সমাজ দিয়েছে খেদিয়ে। মোল্লার দুয়ারে দু'জনে উপস্থিত, হিন্দু-সমাজে এও এক সমস্যা।"

এই দৃশ্যটী দেখিয়া এক ভদ্রলোক ঘোরতর আপত্তি করেন—"গোয়ালার মেয়ে" এই কথাটীর স্থানে, তাঁতী কিম্বা অন্য জাতির নাম বসাইয়া দিবার জন্য তিনি অনুযোগ করেন। উৎসব-শেষে কয়েকজন ভদ্রলোক আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত—তাঁহাদের অভিযোগ, আমরা জাতিবিদ্বেষ প্রচার করিতেছি। কেন না, 'গোয়ালার মেয়ে' এই শব্দ প্রয়োগ করিয়া ভারতের এক-পঞ্চমাংশ লোকসংখ্যার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, দৃশ্যাবলী যাঁরা নিরপেক্ষভাবে দেখিয়াছেন, তাঁহারা স্বীকার করিবেন, হিন্দুসমাজে জাতিভেদ-প্রথা যে গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে তাহার সমাধান না হইলে জাতি অবাধে উৎসন্ন হওয়ারই পথে চলিবে।

বাংলার মনীষী, কথা-সাহিত্যের সম্রাট্ স্বয়ং শরৎচন্দ্রও এই দৃশ্যগুলি দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। জাতি-বিদ্বেষ-প্রথা তিনি ইহার মধ্যে দেখেন নাই ; দেখিয়াছিলেন, হিন্দু-সমাজ কত দিক্ দিয়া অধঃপতনের চরমে গিয়া পৌঁছিতেছে। আমরা অভিযোগকারী বন্ধুদের এই কথা বুঝাইয়া বলিলাম। হিন্দুজাতির সম্পূর্ণ কল্যাণসাধনের পথ হইতে আংশিক জাতিসংস্কারের পথে পড়িলে অন্য জাতির প্রতি আর মমতা থাকে না। গোয়ালার মেয়ের স্থানে তাঁতীর মেয়ে বসাইলে তাঁহাদের অন্তরে আঘাত বাজিবে না—এই কথা বলিতে তাই তাঁহাদের বাধে না। জাতিভেদ-প্রথার দোষদর্শন করাইতে কাহিনীর মধ্যে কোন না কোন জাতির নামোল্লেখ করিতেই হইবে। এই ক্ষেত্রে অভিযোগ শুনিয়া মনে হইল, ঘরের মট্‌কায় যাহার আগুন ধরিয়াছে, আগুন নিভাইবার মাথা ব্যথা তাহারই সবখানি, অন্য প্রতিবেশীর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। আমরা এমনই স্বার্থপর, সঙ্কীর্ণদৃষ্টিপরায়ণ হইয়া পড়িতেছি! ইহা অভ্যুত্থানের লক্ষণ নহে—অধঃপতনেরই পরিচয়।

জাতিভেদ দূর না হইলে সমাজের কল্যাণ নাই—এই জন্য বাংলার হিন্দুসমাজ-সম্মিলনীর কলিকাতা অধিবেশনে প্রস্তাব উঠিয়াছিল, যে সকল হিন্দুই আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিবে। সনাতনী-হিন্দুদের আপত্তি লঙ্ঘন করিয়া এই সভায় এই প্রস্তাব সমর্থিতও হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্যসমাজ জাতিভেদ তুলিয়া দেওয়ায় চিরদিন যত্নবান্। অধুনা হিন্দুসভা, হিন্দুমিশন এই কার্য্যে অগ্রণী হইয়াছেন। কিন্তু জাতি-সংস্কার হিন্দুর হৃদয়ে এমন গভীর শিকড় গাড়িয়াছে, যাহা নিরাকৃত করা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। বাংলার ২,২২,১২০০০ হিন্দুর মধ্যে ২৯,০০০ লোক কোন বিশেষ জাতির অন্তর্গত বলিয়া গণিত হয় নাই। সত্যই, ইহাদের মধ্যে অনেকের জাতি নাই ; জাতিবোধ জন্মে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হিন্দুজাতির মধ্যে যে অভ্যুত্থানের প্রেরণা জাগিয়াছে, তাহা আত্মিক উন্নতির প্রেরণাস্বরূপ নহে, খুবই বহিরঙ্গ এবং আভিমানিক। বাগ্দী যদি বলে—আমরা ব্যাঘ্র-ক্ষত্রিয়, আর হাড়ী যদি বলে তাহাদিগকে হৈহৈ ক্ষত্রিয় বলিতে হইবে—তাহা হইলেই সে বাগ্দী ও হাড়ী সমাজের শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিবে তাহার কোন হেতু নাই। জাতিবাচক শব্দগুলি দোষের কারণ হইয়াছে—তাহার মূলে আছে সংস্কৃতির অভাব। হিন্দুজাতির মধ্যে ৪৪টা জাতি তাহাদের পরিচায়ক সংজ্ঞার পরিবর্ত্তন চাহেন, তাহার কারণ আর কিছু নহে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই তিনটী বিশিষ্ট জাতির শিক্ষা-সভ্যতার আদর্শ সর্ব্বতোভাবে বরণীয় হইয়াছে। ব্রাহ্মণ বলিয়া যদি এইরূপ একটা জাতি হইত, যে জাতির মধ্যে শিষ্টাচার নাই, উচ্চ আদর্শের অনুশীলন নাই, জ্ঞানপ্রতিভার পরিচয় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ; আর হাড়ীজাতি বলিতে এমন একটা জাতি, যে জাতির প্রত্যেকেই শান্ত, দান্ত, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, বেদবিৎ—তাহা হইলে অনেক জাতিই আপনাদের হাড়ীজাতি বলিয়া গণ্য করাইতে লালায়িত হইত। দেখা যাইতেছে, শিক্ষা সভ্যতার অনুশীলনেই জাতি বড় হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের সে অনুশীলন ছিল। এই ত্রিবর্ণ ব্যতীত জাতির জ্ঞানচর্চ্চার সুবিধা ছিল না অথবা তাহাদিগকে ইহা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় বিধাতার আশীর্ব্বাদ অথবা অভিসম্পাতই হউক, ভারতের সর্ব্বজাতি জ্ঞানচর্চ্চার সুবিধা পাইয়াছে। নাম লইয়া অভিমানের কান্না অপেক্ষা আত্মার উন্নতিমূলক শিক্ষায় ও সাধনায় সকলের উদ্বুদ্ধ হওয়া উচিত। জ্ঞানোদ্ভাসিত কোন ব্যষ্টি অথবা সমষ্টি সমাজে কখনও চিরদিন অবজ্ঞাত হইয়া থাকে না, থাকিতে পারে না। আমাকে "রাম" বলিলে যদি সকলেই চেনে, শ্যামের নাম লইয়া নামের সংস্কার-প্রার্থী হওয়ার চেয়ে আত্মচৈতন্যে নিজেকে সমৃদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ। আজ "গোপজাতি" চাহিতেছেন—'যাদব' নামে অভিহিত হইতে। আমাদের তাহাতে আপত্তি কিছুই নাই। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সহিত এই 'যাদব' নাম সংশ্লিষ্ট। সুতরাং ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী এই ক্ষেত্রে উত্থাপিত হইয়াছে। আমাদের অনুনয়—শুধু কোন এক বিশেষ জাতির প্রতি নহে, হিন্দুর সর্ব্বজাতিকেই বলি—আমরা যতই এরূপ জাতি-আন্দোলনে আমাদের শক্তি ও সময় নিয়োগ করিব, ততই আমরা নিখিল হিন্দুজাতির অভ্যুত্থানের কাল বিলম্বিত করার কারণ হইব। এ জাতিকে বাঁচিতে

হইলে এইরূপ খণ্ডচেতনার মোহে অভিমানকেই বড় করা যুক্তিযুক্ত নহে—আসলে গর্ব্ব জাগাইয়া তুলিতে হইবে হিন্দুত্বের। উচ্চকণ্ঠে বলিতে হইবে—'আমি হিন্দু।' হিন্দুর দেশ এই ভারতবর্ষ, ভারতে যত তীর্থ তাহা আমার হিন্দুত্বেরই মহিমা। হিন্দুশাস্ত্রে, হিন্দুর মন্দিরে, হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসে আমার পুরাপুরি অধিকার আছে। একটা জাতির মৌলিক চেতনা, যদি অংশতঃও কোথাও জাগিয়া উঠে, জানিও, জাতিভেদের গণ্ডী তাহাকে আড়াল করিয়া রাখিবে না। হিন্দুজাতিকে আজ মনে রাখিতে হইবে—"নাল্পে সুখমস্তি" আর তারা "অমৃতস্য পুত্রাঃ"। আমায় হাড়ী বল, ডোম বল, ক্যাওট্ বল, মুচি বল, মুর্দ্দফরাস বল—আমার তাহাতে অপমান নাই। তুমি আমায় যে নাম বলিয়াই ডাক, তোমার সে রুচি আমি উল্টাইয়া দিতে চাহি না। আমি হিন্দু—হিন্দুত্বের সকল অধিকারে আজ আমার দাবী—যদি ইহা কোথাও উপেক্ষিত হয়, সেখানে আমি বজ্রহস্তে প্রলয়-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিব—ইহাই হিন্দু-জাগরণের মূলমন্ত্র! হিন্দু বাঁচিলে, আমরা সকলে বাঁচিব।

— আত্ম-নিবেদন —

হিসাব কর্‌তে বললেই আঁৎকে উঠ্‌তে হয়! সত্যই আমার কি হ'ল? যেখানে আমার যা গর্ব্বের বস্তু ছিল সব সে কেড়ে নিয়েছে। যদি আজ গর্ব্বের কিছু থাকে, তবে তার মাঝে আমার কি? সবই তো তাঁর মহিমা! আমায় শেষ করে' কেবল তাঁর সৌরভটুকুই ছড়িয়ে পড়ে। বুদ্ধি গেল, হৃদয় গেল, দেহ গেল, স্বাস্থ্য গেল, আরাম গেল—আমায় কাঙাল করেও তাঁর তৃপ্তি নেই। নিরন্তর জ্বালার, ব্যথার যেখানে যতটুকু তা' পুড়িয়ে ছাই করার দৃষ্টিটুকু আমায় পাগল করে' দেয়। তাই কাঙাল সেজে একেবারে উলঙ্গ হ'য়ে সর্ব্বদাই বল্‌তে হয়—'নে, আর কি আছে নে, আর কি জ্বালা দেবার আছে, দে, তুই আমায় নাকের জলে চোখের জলে সারা কর, তবু তোরে ছাড়্‌ছি না, তবু আমার প্রেম ফুরিয়ে যাবার নয়।' এই রোখটুকু যেমন ফুটে উঠা, অমনি তাঁর মুখে ভুবনমোহন হাসি, বুঝি সে এই তেজই চায়, এই সর্ব্বস্বহারার আকুলতাটুকুই ভালবাসে। ভগবানের পথ কি সোজা!

যত তাঁর প্রেম-মূর্ত্তির সঙ্গে এক হয়ে যাবো, ততই আমার বল্‌তে যা সব পুড়ে ছাই হবে। একেবারে নিঃস্বার্থ না হলে মিলনের আনন্দ সম্ভোগ হয় না।

* * * *

আমার কুল নাও, বংশ নাও, আত্মমর্য্যাদা নাও, অতীত নাও, ভবিষ্যৎ নাও। দেহ-প্রাণ-মন-ধর্ম্ম—আমি তিলে তিলে দিব, কেবল তোমার কাজের ভার আমায় দাও; তোমার কাজের সেবায় এ জীবন উৎসর্গ করি।

তোমার কাজের ভারে এ অক্ষম দেহ হয়তো ঝুঁকে পড়্‌বে, মেরুদণ্ড ন্যুব্জ হবে কিন্তু তবুও সে ভার বহনের জন্য আমায় প্রস্তুত করে' তোল, অহঙ্কার ও বাসনার বোঝা থেকে মুক্তি দাও।

আমার প্রতি নিঃশ্বাসে আমায় স্মরণ দাও, আমার প্রতি হৃদয়-স্পন্দনে আমায় চেতনা দাও, আমার প্রতি কর্ম্মে সতর্কতা দাও যেন তোমার কাজে এ জীবন উৎসর্গ করেছি—না ভুলি, না বিস্মরণ হই।

আমায় জাগিয়ে রাখ তোমার চেতনায়, আমায় ভুলিয়ে দাও তোমার প্রেমে, আমায় মাতিয়ে তোল তোমার শক্তি দিয়ে, আমার হৃদয় পূর্ণ হোক, সান্ত্বনায় ভরে' উঠুক। আমি কাজ পেয়েছি, প্রভুর ডাকে জেগেছি, প্রভুর হাওয়ায় পাগল হয়েছি। লোক-সম্মান, আত্মপ্রসাদ, জীবনের হিসাব পায়ের তলায় কেঁদে গড়াগড়ি যায়। অনন্ত যুগের জন্য বিকিয়ে গেছি প্রভুর কাছে—এই গর্ব্বে জীবন আমার বীর্য্যময় হোক।

আশ্রম-সংবাদ

আশ্রমি-লিখিত

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব

মেলা ও প্রদর্শনী

দ্বাদশ বর্ষ—১৩৪১

উদ্বোধন

গত ২রা জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, অপরাহ্ণে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবের যোগ্যভাবে দ্বাদশ বার্ষিক উদ্বোধন সম্পন্ন হইয়াছে। প্রভাতে সঙ্ঘের নরনারী কর্ত্তৃক ঘটস্থাপন, চণ্ডীপাঠ ও হোমযজ্ঞাদি মাঙ্গলিক ক্রিয়ায় এই উৎসবের অধ্যাত্মভাব ও সুগম্ভীর মাধুর্য্য সকলের হৃদয়ে পবিত্রতা সঞ্চার ও একটা ব্যাপক পুণ্যপ্রভাব ও আবহাওয়ায় উৎসব-প্রাঙ্গন পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল।

অপরাহ্ণে "মেলা ও প্রদর্শনী"র দ্বারোদ্ঘাটন সম্পন্ন হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে, সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাশ বার-এট্-ল মহাশয় হাথোয়া-রাজের কোনও গুরুতর মকদ্দমা উপলক্ষে সহসা তথা হইতে আসিতে না পারায় পূর্ব্ব-সন্ধ্যায় টেলিগ্রামযোগে তাহা শ্রীযুক্ত মতিবাবুকে জ্ঞাপন করেন ও তাহাতেও নিশ্চিন্ত না হইয়া একজন পত্রবাহকের হাতে সভার জন্য তাঁহার সুলিখিত অভিভাষণটী পাঠাইয়া দেন। ইনি সভারম্ভের ঠিক পূর্ব্বমুহূর্ত্তেই উপস্থিত হন। অতঃপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। সভায় মেয়র শ্রীকালীপ্রসন্ন বসু, ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত কানাইলাল গোস্বামী প্রভৃতি স্থানীয় ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী নগরের বহু গণ্যমান্য পুরুষ ও মহিলাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় "শ্রীং কনসার্টপার্টি" কর্ত্তৃক সুললিত ঐক্যতান যন্ত্রবাদন হইবার পর, "প্রবর্ত্তক-মন্দির" কর্ত্তৃক একটী উদ্বোধন-সঙ্গীত হয় এবং তৎপরে একটী প্রশস্তি-পাঠান্তে যথারীতি সভারম্ভ হয়। সভাপতির আদেশে, সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র দত্ত "মেলার পরিচয়" প্রদান করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

মেলার পরিকল্পনা

"এই পরিকল্পনার কেন্দ্ররূপে এবার গ্রহণ করিয়াছি আমাদের জাতীয় জীবনেতিহাসের সেই মধ্যমণি—

শ্রীযুক্ত পি, আর, দাশ

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে। আমরা শাস্ত্র উদ্ধৃত করিয়াই দেখাইয়াছি—কত জন্মজন্মান্তরব্যাপী সংযম ও ইন্দ্রিয়-শাসনের ফলে একদিন এই ভারতের এক পবিত্র দম্পতী তাঁহাদের কোল-আলো করা ভাগবত সন্ততি নিষ্কাম প্রেমের পুরস্কার রূপে লাভ করিয়াছিলেন। সেই বসুদেব-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভাগবত জন্ম ও কর্ম্মের মধ্যে

ভারতের নিগূঢ় চাবীকাটী—তাঁর আসল উদ্দেশ্য ও 'মিশন' নিহিত, ইহা আমরা পর পর দৃশ্যাবলীযোগে দেখাইয়াছি। কুরুক্ষেত্রের সেই ধর্ম্মরাজ্যপ্রতিষ্ঠার মহাস্বপ্ন, মহাভারত গড়িয়া তুলিবার সুবর্ণ সুযোগ আমরা ব্যর্থ করিয়াছি—একদিকে ত্যাগ ও নির্ব্বাণের ডাকে, অন্যদিকে ভোগের মাদকতায় সর্ব্বাঙ্গ ঢালিয়া—ভগবানের মুখনিঃসৃত অমোঘ অমৃত-বাণী উপেক্ষা করিয়া মরণের পথই আমরা বাছিয়া লইয়াছি—যদুবংশধ্বংস ও পাণ্ডবশক্তির হিমাচলে মহাপ্রস্থান, এই উভয়ই তাহার অকাট্য প্রমাণ। ফলে কাঁদিয়া মরিয়াছি শুধু আমরাই নহি, আমরা কাঁদাইয়াছি—কাঁদিয়া ফিরিয়াছেন—ভগবান—নহিলে রক্তের লেখায় চরণপদ্ম লাঞ্ছিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ "the Soul of India"—ভারতের ধর্ম্ম-সিংহাসনের চিরারাধ্য মহাদেবতাকে জীবন সাধনার সিদ্ধি-বঞ্চিত হইয়া সেদিন অভিশপ্ত লীলাক্ষেত্র হইতে সাশ্রুনয়নে বিদায় গ্রহন করিতে হয়।

অন্য দৃশ্যাবলীতে আমরা দেখাইয়াছি—শিক্ষিত হিন্দু বাঙ্গালীর জীবন আজ মেরুদণ্ডহীন হওয়ায় একেবারে উৎসন্নপ্রায়। যুগের শিক্ষা তাহাদের বাঁচিবার প্রতিভা, গায়ে, হাতে, পায়ে বাঁচিবার শক্তি ও প্রয়াস জাগায় না। বাঙ্গালী হিন্দু মরিতেছে—হতাশ, শ্রমকাতর, নির্ব্বীর্য্য হইয়া—এই কথাই আমরা একটী কাহিনী রচনা করিয়া মঞ্চে দেখাইয়াছি। এই দুর্ভোগের স্রোতঃ ফিরাইতে হইলে বাঙ্গালী হিন্দুর যে আত্মচেতনা জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন তাহা চক্ষে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইবার আমাদের এ একটী ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। যে মাটীতে ইসলামধর্ম্মী প্রাণ পায়, মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, হিন্দুর জাগ্রত জীবন যদি না উদ্বুদ্ধ হয়, আক্রোশ ও বিদ্বেষ কেবল সংঘর্ষই সৃষ্টি করিবে। হিন্দু-মুসলমানের মিলন-রহস্য আছে উভয় জাতির স্বচ্ছ প্রাণ জাগিয়া উঠার ভিতর। হিন্দুকে এই দিকে লক্ষ্য দিতে হইবে।

তারপর, **"বাংলার পরিচয়ে"**—চিত্রে ও লিপিযোগে, সংখ্যা ও তথ্য উদ্ধৃত করিয়া আমরা বাঙ্গালীর জীবনচিত্র বাঙ্গালীরই সম্মুখে দর্পণের ন্যায় স্পষ্ট করিয়া ধরিয়াছি।

"ধর্ম্মের কুসংস্কারে"—রেখায়, চিত্রে, লেখায় আমরা যে প্রাণহীন ধর্ম্মের ছলনায় জীবনের শক্তি-বীর্য্যে বঞ্চিত হইয়া, অনায়াসেই মরণ-স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি, তাহা একটী একটী করিয়া দৃষ্টান্ত ফুটাইয়া রূপস্থ করিয়া তুলিয়াছি। হিন্দু বুঝুক—কোথায় তার সাধনা আজ মর্ম্মহারা হইয়া পড়িয়াছে—কেন পূজা, উপাসনা, ভোগ-রাগ, দ্বিজ-ভক্তি, মানৎ সব ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে—নরে নারায়ণকে উপেক্ষা করিয়া স্বার্থের দায়ে যে অনুষ্ঠান সে তো ধর্ম্ম নয়, আত্ম-প্রবঞ্চনা—দেবতার নামে পুরোহিত, পাণ্ডা, ভণ্ড সন্ন্যাসী বাবাজীর স্বার্থ-পুষ্টি ভক্তি নয়, অন্ধতা ও জুয়াচুরিরই প্রশ্রয়—বড় নির্ম্মম হইয়াই এই তিক্ত সত্য-গুলি আজ জাতির সম্মুখে চিরিয়া চিরিয়া খুলিয়া ধরিতে হইতেছে। ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মহারা জাতিকে আজ নিষ্ঠুর কণ্ঠেই বুঝাইয়া দিতে হইবে—ধর্ম্মকে এমন করিয়া পাওয়া যায় না। ধর্ম্মকে জীবন দিয়াই পাইতে হয়—উদয়াস্ত ভাগবৎ-যুক্তির সুরে সমস্ত জীবনখানি যেদিন এ জাতি বাঁধিয়া তুলিতে পারিবে, সেই দিনই "অমৃতস্য পুত্রাঃ"রূপে তারা জগতে আদর্শস্থানীয় হইবে—সত্যই হিন্দু আবার জগজ্জয় করিবে।

স্বাস্থ্যহীন প্রাণ টিকিয়া থাকার চেয়ে ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিঃশেষ হওয়াই অধিক শ্রেয়ঃ। বাঙ্গালীকে বাঁচিতে হইলে, তাহাদের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইবে। এ স্বাস্থ্য-রক্ষার সঙ্কেত দিবার ব্যবস্থাও এবার করা হইয়াছে। অন্যদিকে চেষ্টা করিয়াছি, স্বদেশীয় শিল্প-সাধনাকে উৎসাহিত করিয়া, সর্ব্ববিধ দেশীয় পণ্যের ব্যাপক প্রচারের সহায়তা করা। বাংলার শিল্প-শক্তি মাথা তুলিতেছে, ইহা যদি সুগঠিত ও সুপরিচালিত হয়, একদিন দরিদ্র, পরমুখাপেক্ষী অর্থনীতিতে অনভিজ্ঞ বলিয়া তাহার যে কুখ্যাতি সে কলঙ্ক দূর হইয়া যাইবে, বাঙ্গালী আবার স্বাধীন স্বাবলম্বী হইয়া স্বদেশীয় শিল্পসম্ভারে রাজৈশ্বর্য্যে বঙ্গজননীকে রাজরাণী-বেশে সাজাইয়া কৃতার্থ হইবে।

তারপর, সঙ্ঘপ্রাণ শ্রীমতিলাল রায় একটী দীর্ঘ বক্তৃতায় ওজস্বিনী ভাষায় দ্বাদশ বর্ষের উৎসবের মর্ম্মকথা ব্যক্ত করেন। তাঁহার সেই মর্ম্মস্পর্শ কথাগুলি আমরা অন্যত্র প্রকাশ করিয়াছি। তাঁহার এই জীবন-বেদ শ্রবণ করিয়া সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী বিমুগ্ধ ও প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রকৃত

মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য কি তাহা সকলেরই হৃদয়ে স্পষ্টভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল।

অতঃপর সভাপতির অনুরোধে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ শ্রীযুক্ত পি, আর, দাস মহাশয়ের প্রেরিত অভিভাষণটী পাঠ করেন। তাঁহার এই সুচিন্তাপূর্ণ দীর্ঘ অভিভাষণ-বাণীও আমরা স্থানান্তরে প্রকাশ করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে সঙ্ঘের সাধ্য ও সাধনাকে তিনি যে ভাবে অভিনন্দিত করেন ও সেই সম্বন্ধে যে মহতী শুভেচ্ছা পোষণ করেন তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের গভীর সহানুভূতি ও স্বচ্ছ অনুপ্রেরণারই স্পন্দন অনুভব করা যায়।

২য় দিবস

মেলার দ্বিতীয় দিবসে, অদ্বৈত বংশাবতংস প্রভুপাদ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী ভাগবত-ভূষণ "রাসলীলা" সম্বন্ধে মধুর কথা ও নাম কীর্ত্তন করেন। তৎপরে পণ্ডিত শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ "তন্ত্র ও বৈষ্ণব সাধনার সংঘর্ষ" সম্বন্ধে একটী প্রগাঢ় গবেষণাপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায় শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করেন। তাঁহার কথাগুলি বারান্তরে "প্রবর্ত্তকে" প্রকাশ করার আমাদের ইচ্ছা আছে।

৩য় দিবস

শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয় এই দিনও "রাসলীলা" সম্বন্ধে সুমধুর আলোচনা করেন। অতঃপর, কবিরাজ শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী "বিপদ ও স্বপদ" সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা করেন।

৪র্থ দিবস

অদ্য "রাসলীলা" সম্বন্ধে তৃতীয় পর্য্যায়ের বক্তৃতা সমাপ্ত হয়। এই দিন নিদারুণ ঝটিকাবর্ত্তে কলিকাতা হইতে সঙ্গীতজ্ঞ পুরুষগণ আসিতে বাধা পাওয়ায়, সঙ্গীত-মজলিস হইতে পারে নাই। প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই দিন উৎসব-মন্দিরে অপ্রত্যাশিত-ভাবে শুভাগমন করিয়া সকলকে বিস্মিত ও ধন্য করিয়াছিলেন। তিনি আশ্রমে দুই রাত্রি বাস করিয়া সঙ্ঘবাসীদের হৃদয়ে পরম প্রীতি ও আনন্দের সুধা সঞ্চার করেন। মতিবাবুর সহিত তাঁহার দীর্ঘ ও অন্তরঙ্গ সদালাপও সত্যই উপভোগ্য।

৫ম দিবস

সাংবাদিক-সম্মেলন

এইদিন কলিকাতার উৎসবের সভামণ্ডপে সাংবাদিক-সঙ্ঘের একটী বিরাট্ সম্মেলন হইয়াছিল। প্রথিতনামা সংবাদ পত্রসেবিগণ পূর্ব্বাহ্ন হইতেই চন্দননগরে আগমন-পূর্ব্বক সঙ্ঘের আতিথ্য স্বীকার করেন। "প্রবাসী" সম্পাদক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সাংবাদিক-সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীমৃণাল কান্তি বসু, "অমৃতবাজার পত্রিকা"র সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, "আনন্দবাজার পত্রিকা"র সম্পাদক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার ও অন্যান্য সহযোগিগণ, "বসুমতীর" সম্পাদক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, "এ্যাডভান্সের" শ্রীপ্রমোদকুমার সেন ও শ্রীশচীন্দ্রলাল ঘোষ, "জীবন বীমার" শ্রীভূপতিমোহন সেন, "অনওয়ার্ডের" শ্রীসত্যনাথ মজুমদার, "পঞ্চায়েতের" ডি, এন, রায়, "ইন্সিওরেন্স ও ফাইনান্স রিভিউর" সম্পাদক এস, সি, রায়, "রূপম"-সম্পাদক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রায় সকল প্রসিদ্ধ সাংবাদিক সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সম্মেলনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন—বাঁশবেড়িয়ার কুমার শ্রীমুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয়। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল—"বর্ত্তমান সংবাদপত্রের প্রগতি।" সম্মেলনের প্রারম্ভে সঙ্ঘের পক্ষ হইতে শ্রীমতিলাল রায় সমাগত সাংবাদিকগণকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন—দেশের সাংবাদিকমণ্ডলী সহস্র দুর্য্যোগের মধ্যেও জাতীয়তার আলো জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের উপর রাষ্ট্র-সাধনার সঙ্গে জাতির গঠন-যজ্ঞেরও গুরু-দায়িত্ব অনেকখানি ন্যস্ত রহিয়াছে। এই গঠন বলিতে শুধু পল্লী-সংস্কার নয়, ম্যালেরিয়া দূর করা নয়, সমাজ-সেবা নয়; আসল গঠন হইতেছে—চরিত্র-গঠন। যাঁহারা জীবন ঢালিয়া এই কাজ করিতেছেন, অবিকৃত সত্য প্রকাশে তাঁহাদের কার্য্যে আনুকূল্য করা সংবাদপত্র সেবকের অন্যতম কর্ত্তব্য। রাষ্ট্রসাধনায় মত-ভেদ, দলভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু এই অন্তর-দ্বন্দ্বে দেশের কল্যাণ-পথটীকে উপেক্ষা করা বা ধামা-চাপা দেওয়া সত্যাশ্রয়ীর উপযুক্ত নহে। বাঙ্গালী হিন্দুর এই ঘোরতর দুর্দ্দিনে, সত্যাশ্রয়ী সাংবাদিকমণ্ডলীর

সহযোগিতা না পাইলে, জাতির প্রকৃত সংগঠন-যজ্ঞ কোনও ক্রমেই সুসিদ্ধ হইতে পারে না। তাই তাঁহার আন্তরিক নিবেদন—যেমন কুরুক্ষেত্রেই পার্থসারথির মুখে গীতার মন্ত্র-বাণী প্রচারিত হইয়াছিল, তেমনি জাতির এই সঙ্কট-যুগেই যুগের পূজারীগণকে তারস্বরে সত্য মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে—উদীয়মান তরুণ জাতির চরিত্র-ভিত্তি গড়িয়া তুলিতে হইলে চাই সর্ব্বাগ্রে এই সত্যাশ্রয়ী হওয়া।

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেন, কি ভারতীয় সাংবাদিক, কি মাসিক-পত্রের সম্পাদনা আজ রাজবিধানের কারণ দুঃসহ দায়িত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সম্পাদক ও চোরের তুলনায়, বরং চোরের অবস্থা কতক ভাল—কেন না, চোরকেও সম্পাদকের মত অন্যায় করার পূর্ব্বে নাম রেজিষ্টারী ও জামিন দাখিল কর্‌তে হয় না। গভর্ণমেণ্টের চক্ষে সাংবাদিকমণ্ডলী "a criminal tribe" পাপীর গোষ্ঠী। এই সকল কারণে আদর্শ সংবাদপত্র-সেবা এ দেশে আজ প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। শুধু রাজনৈতিক অন্তরায় নহে, সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ব্যাপারেও আজকাল সংবাদপত্রসেবিগণের স্বাধীনতা খুব কমই আছে। এমন কি মহাত্মার "ইয়ং ইণ্ডিয়ার" মত পত্রও একটা আন্দোলনের যুগেই এরূপ আদর্শানুযায়ী পরিচালনা করা কতকটা সম্ভব হইলেও, তাঁহার বর্ত্তমান "হরিজন" পত্র আর সেরূপ কাটিতেছে বলিয়া মনে হয় না। কাজেই দেশের স্বাভাবিক অবস্থায় শ্রীযুক্ত মতিবাবুর আশানুযায়ী আদর্শ সংবাদপত্র পরিচালনা যে কতদূর সম্ভবপর তাহা বলা যায় না।

অতঃপর, বিলাতী সাংবাদিকমণ্ডলীর ভারত সম্বন্ধীয় অপরিবর্ত্তনীয় সত্যনিষ্ঠার সরহস্য উল্লেখ করিয়া, তিনি আদর্শের পথে সাধ্যানুযায়ী প্রয়াস করিতে সাংবাদিকগণকে অনুরোধ করেন।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার রহস্যপূর্ব্বক বলেন—সাংবাদিকের গুপ্তমন্ত্র (ট্রেড-সিক্রেট) ব্যক্ত করা উচিত নয়, নতুবা তিনি বুঝাইতে পারিতেন, শ্রীযুক্ত মতিবাবুর আদর্শমত সংবাদপত্র-চালনা কেন সম্ভব নহে। একই সংবাদ বিভিন্ন পত্রে বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত হইয়া দেখা দেয়—তার মূলে থাকিতে পারে ব্যক্তিগত খাতির, দলের স্বার্থ অথবা অন্য কিছু। রাজকীয় কঠোর বিধি-নিষেধের আগ্নেয়াস্ত্র মাথায় করিয়া চলাও যে আজ কি দুরূহ তাহা সাংবাদিকমাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু মূলতঃ দেশ ও জাতির কল্যাণেচ্ছা লইয়াই সাংবাদিকমণ্ডলী যথাসাধ্য কার্য্য করিয়া চলিয়াছেন, এইটুকু তিনি অনায়াসেই বলিতে পারেন—ইহা ছাড়া তাঁহাদের উপায়ন্তরও নাই।

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু ব্যথার কণ্ঠে বলেন, পূর্ব্বে সংবাদপত্র-সেবা স্বদেশিকতারই নামান্তর বলিয়া পরিগণ্য হইত ; কিন্তু ক্রমশঃ সাংবাদিকগণ যেন নিছক ব্যবসাদার হইয়া পড়িতেছেন। এই তিক্ত সত্য কথা আজ আর অস্বীকার করা যায় না। এইরূপ ব্যবসাদারী ভাব যতদিন বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন সত্য ও স্বাদেশিকতাকে বলি দিয়াই ব্যবসার প্রসার করার চেষ্টা চলিবেই। সুতরাং বর্ত্তমান সাংবাদিক প্রগতি লক্ষ্য করিয়া তিনি বিশেষ আশা পোষণ করার ভরসা পান না। ব্যবসায়ের ভাব হইতেই গ্লানি ও মিথ্যা প্রবিষ্ট হইতেছে—শুদ্ধ-সৎভাবের অনুপ্রেরণায় সংবাদপত্র-পরিচালনা কার্য্যতঃ ক্রমেই দুঃসাধ্য হইয়া পড়িতেছে। কাগজের পাতা যতই বাড়িতেছে, ততই সত্য যেন ধামা-চাপাই পড়িতেছে। এ অবস্থার একমাত্র প্রতীকার, যদি সাংবাদিকমণ্ডলী সম্মিলিতভাবে মিথ্যার বিরুদ্ধে অভিযান করিতে উদ্যত হন এবং দেশের লোক-মতের মধ্যেও একটা স্বাস্থ্যকর পরিবর্ত্তন আনিতে পারেন।

অতঃপর, সভাপতি কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় উপরোক্ত বিবিধ সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া বলেন—এত অসংখ্য বাধাবিঘ্ন, অবস্থাসঙ্কট, রাজকীয় আইনের কঠোরতার মধ্য দিয়াও যেভাবে সাংবাদিকগণ দেশ ও দশের সেবায় সমর্থ হইতেছেন, তজ্জন্য তাঁহারা সত্যই সকলের আন্তরিক ধন্যবাদার্হ।

(ক্রমশঃ)

সঙ্ঘে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

বিগত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার সঙ্ঘের একনিষ্ঠ সেবক, সাধক ও কর্ম্মী শ্রীমান্ দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরীর পিতৃবিয়োগ উপলক্ষে সঙ্ঘে তদাদ্যশ্রাদ্ধ বাসর অনুষ্ঠিত হয়। পিতার

দেহান্তরের সংবাদ পাইয়া দেবেন্দ্রনাথ সঙ্ঘ-গুরুর নির্দ্দেশানুসারে দশ দিন অটুট শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠাসহকারে হবিষ্যান্ন গ্রহণ ও কালাশৌচ নিয়মিত প্রতিপালন করেন। রবিবার প্রাতঃ আট ঘটিকায় গুরুর নির্দ্দেশক্রমে সঙ্ঘ-গোষ্ঠীর সমবেত সভায় মৃতাত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদান ও কল্যাণ কামনা করা হয়।

দেবেন্দ্রনাথের পরলোকগত পিতৃদেবের আত্মার আবাহন ও শ্রাদ্ধাধিবেশনের উদ্বোধন সম্পাদিত হয় নারী-মন্দিরের সঙ্ঘ-ভগ্নিগণের সময়োপচিত করুণ উদ্গানে।

অতঃপর স্বামী অমৃতানন্দজী কর্ত্তৃক কঠোপনিষদ্ উদ্গীত ও পণ্ডিত বিজয়চন্দ্র সাংখ্য কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক স্বস্তি-মন্ত্র উচ্চারিত হয়।

নিখিল সঙ্ঘের পক্ষ হইতে সঙ্ঘ-সম্পাদক শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত স্বর্গীয় আত্মার শান্তি ও কল্যাণ প্রার্থনা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "সঙ্ঘ-সত্তার সৃষ্টিমূলে যে সকল ব্যক্তির জীবনের উৎসর্গ উপাদানীভূত হইয়া এই বৃহৎ মহাপ্রাণের উদ্ভব করিয়াছে, তাহারই কোষাণু-স্বরূপ একজন বিশিষ্ট সাধকের জীবন—এই জীবন যে উৎস-মূল হইতে তার পার্থিব দেহ প্রাপ্ত হইয়াছে, আজ গোত্রান্তরিত নব চেতনার পর্য্যায় হইতেও সেই পিতৃ-বীর্য্য, সেই মাতৃ-কুক্ষিকে যোগ্য মর্য্যাদা না দিয়া আমরা থাকিতে পারি না। দেবেন্দ্রনাথের পিতাকে হয়ত আমরা সকলে জানি না, চিনি না; তিনি জীবনে কি গুণ, কি দোষের অধিকারী ছিলেন তাহা আমরা জানি না—কিন্তু এইটুকু আমাদের পক্ষে জানাই যথেষ্ট, যে তিনি জ্ঞানে অজ্ঞানে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় একজন সঙ্ঘ-সাধকের জীবন এই উৎসর্গের মহাযজ্ঞে আহুতি দিয়া গেলেন—এই অবদানটুকুই যে অমূল্য—তাই তাঁর মরণান্তে সমগ্র সঙ্ঘ তাঁর অশরীরী আত্মার উদ্দেশ্যে হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে—সঙ্ঘের প্রতিভূরূপে এই আন্তরিক কল্যাণ কামনাই আমি করি।"

তারপর দেবেন্দ্রনাথ লোকান্তরিত পিতৃদেবের আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন প্রসঙ্গে ভাব ও ভক্তি-গদগদচিত্তে বলেন—"সত্যিই শোকের অবসর আমার আজ নাই। হৃদয় আমার আনন্দে উদ্বেলিত। আমি দিব্যচক্ষে দেখ্ছি, আমার পূজনীয় পিতার অমর আত্মা আজ আনন্দোৎফুল্ল। জীবনের দুঃখ-দৈন্য সকল গ্লানি মুছে গিয়ে আজ তিনি আশীর্ব্বাদের হস্তই প্রসারিত করে ধরেছেন। পাঞ্চভৌতিক বন্ধনমুক্ত তান্মাত্রিক সত্তা তাঁর সন্তানের গৌরবে গৌরবান্বিত। আমি এই শুভ সন্ধিক্ষণে তাঁর কাছে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করছি যেন আমার এ ভগবানের পথের অভিযান জয়যুক্ত হইয়া আমার সকল উর্দ্ধ ও অধস্তন বংশকে ও সারা জাতিকে ধন্য করে। সঙ্ঘের ভাই-বোনের এই সমবেত শ্রদ্ধাঞ্জলী তাঁর আত্মাকে কল্যাণ প্রদান করুক।"

সর্ব্বশেষে, সঙ্ঘ-গুরু এই অনুষ্ঠানোৎসবে হিন্দু-শ্রাদ্ধের নিগূঢ় বিজ্ঞান-সমন্বিত যে অমৃত বর্ষণ করেন তার মর্ম্মাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"হিন্দুর শাস্ত্র-বর্ণিত কোন উৎসব-অনুষ্ঠানই নিরর্থক নয়। সব কিছুর পশ্চাতেই মানব-জীবনের সৃষ্টির গভীর রহস্য নিহিত আছে। কালের গতির সঙ্গে মানুষের লক্ষ্যের বাইরে গিয়ে যখন উহা পড়ে, তখন সমাজ গতানুগতিক-ভাবে আচার-অনুষ্ঠানের প্রাণহীন কাঠামোখানা আঁকড়েই চলে। সকল শাস্ত্রীয় বিধি ব্যবস্থার অন্তরালের যে মূল সত্য তা' ধরবার মত আত্ম-চেতনা যে ব্যষ্টি বা গোষ্ঠির মধ্যে আশ্রয় পায় তারাই হয় সেই জাতির অধ্যাত্ম প্রতিভূ, যাজক বা ব্রাহ্মণ। কিন্তু জাতির জীবনে ব্যাপকভাবে যে সময়ে এই চেতনার অভাব পরিলক্ষিত হয়, তখনই সেই জাতি মরে। অতীতের সত্য তখন আর প্রেরণা দেয় না, জীবনের সৌরভ বিতরণ করে না—মরা চেতনা-হারা সমাজ বিগতকে নিঃসত্ত্ব-নির্জ্জীব অন্ধ শ্রদ্ধা দিয়েই তৃপ্তি পায়। কিন্তু সে আচার-অনুষ্ঠানের গড্ডলিকা-প্রবাহের মাঝে জীবনের পরম সত্য-সন্ধান মিলে না।

দুই রকম উপায়ে এই সংগোপিত সত্য-বস্তুর ছোঁয়া পাওয়া সম্ভব হ'তে পারে। এক তত্ত্বদর্শী ঋষি-প্রবর্ত্তিত অনুষ্ঠান-আয়োজনের নিখুঁত ও সজ্ঞান প্রতিপালনের দ্বারা। ইহা বাহির থেকে ভিতরে প্রবেশ করার মত। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে এই সকল বিধি-ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা চাই। এ জন্য—এই ছন্দকে সময়ের তালে বেঁধে দিবার জন্য অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ভাগবৎ পুরুষের আবির্ভাবের প্রয়োজন আছে—যাঁরা স্থিতিশীলতার বিদ্রোহ

প্রশমিত করে' সমাজ-জীবনের তারে সে সুর সংযোজিত করে' যেতে সমর্থ হবেন—জাতির অচৈতন্যকে ধাক্কা দিয়ে সজাগ করে' তুল্‌তে পার্‌বেন।

আর এক উপায় ভিতর থেকে বাইরে আসা—অন্তরের সত্য দর্শনকে বাহিরের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া। আমার এ দর্শনের সঙ্গে শাস্ত্র যেখানে না মিল্‌বে আমি সেখানে শাস্ত্র পরিত্যাগ করব। সত্য-দর্শন যেখানে, মিলন-অবিরোধ সেখানে অবশ্যম্ভাবী। সহস্র সহস্র বছর ধরে' যে শাস্ত্র গড়ে' উঠেছে আপ্ত-বাক্য ছাড়াও বহু প্রক্ষিপ্তাংশ তাতে থাক্‌তে পারে, কাল-বশে বহু সংযোগ-বিয়োগ সংঘটিত হয়ে থাক্‌তে পারে। ইহা অস্বীকার করা নিছক গোঁড়ামী। শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ নির্ণয় করা এক অন্তর দর্শন ছাড়া আর অন্য কোন উপায়ে সম্ভব নয়। বিশ্ব যদি আমাকে উপেক্ষা করে, অবিশ্বাস করে, তা' আমি শুনব কেন—আমি আমার নিজেকে তো অবিশ্বাস কর্‌তে পারি না! যেমন তোমাকে দেখ্‌ছি, কথা বল্‌ছি—তেমনি আমি দেখ্‌তে পাই সত্যকে, চোখের পাতা বুজে চোখটা ঘুরিয়ে ভিতরের দিকে তাকিয়ে দেখি হৃদয়পিণ্ড, পাকস্থলী, প্রত্যেকটী স্নায়ু-শিরা-উপশিরা, মাংস, বিদ্যুতের মত প্রতি রক্তকণিকার খেলা, এমন কি অভুক্ত খাদ্যদ্রব্য কোথায় আট্‌কে' আছে তা' পর্য্যন্ত। তোমরাই হয়তো বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছ না। কোন যাদু নয়, বাজী নয়—ইহা হিন্দুর বিজ্ঞান-সম্মত। হিন্দুর এই যে শ্রাদ্ধের বিধি-ব্যবস্থা, ইহার সুরু আমি জ্ঞান-দৃষ্টিতে দেখ্‌ছি, ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিক্ষণে। বেদে ইহার যে উল্লেখ আছে, তা' যতদিন আমি আমার দর্শনের মধ্যে না পাচ্ছি ততদিন একপাশেই রেখে' দেব। কে জানে, পরবর্ত্তীকালে ইহা সংযোজিত হয়েছে কি না। এই শ্রাদ্ধ-তত্ত্ব পুরাণ বর্ণিত হ'লেও মস্ত বড় একটা সূক্ষ্ম সৃষ্টি-তত্ত্ব উহার সঙ্গে বিজড়িত। ধরিত্রী লয় পেয়েছে। সৃজনের আবার পুনঃসূচনা। কল্প-বিধৃত যতদিন আছে, ততদিন বিশ্বসৃষ্টি একেবারে লয় পায় না। জম্বুদ্বীপ যখন লয় পেয়েছে, তখন হয়তো প্লক্ষদ্বীপ জেগে আছে—লীলা সেখানে চল্‌ছে। এমনি সপ্তদ্বীপা ধরণীর একটি দ্বীপ যখন লয়প্রাপ্ত হয়েছে, তখনই সৃষ্টির প্রেরণা বুকে নিয়ে বৈশ্বদেবগণের আবির্ভাব। লয়ের পূর্ব্ব-লক্ষণস্বরূপ সৃষ্টির বীজভূত কারণ পিতৃপুরুষগণ চন্দ্রকলার কামাসক্তিতে অভিভূত হয়ে জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন—উপলখণ্ডের ন্যায় কোকা-নির্ঝরণীর মাঝে। উৎসমাঝে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হ'য়ে প্রবাহে চলেছে ক্ষয়প্রাপ্ত হ'তে হ'তে। এই পিতৃ-পুরুষগণের জাগরণ সম্ভব না হ'লে সৃষ্টি সম্ভব হয় না দেখে' বৈশ্বদেবগণ সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট স্তবস্তুতি সুরু কর্‌লেন। পাঞ্চতান্মাত্রিক দেহকে পাঞ্চভৌতিক দেহে পরিণত কর্‌তে স্বয়ং তিনি বরাহ-মূর্ত্তি ধারণ করে' এই শ্রাদ্ধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর্‌লেন। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের প্রতীক হ'ল কুশ, পুষ্প, তিল, যব ও গন্ধাদি দ্রব্য। এই যজ্ঞের দ্বারা আজও বিদেহী আত্মার দেহাশ্রয় ও পূর্ত্তি সংঘটিত হয়। এ তত্ত্বের মাঝে যে কত আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক বা ভূতত্ত্বের স্থূল সৃষ্টির বিজ্ঞান নিহিত আছে তা' বল্‌বার সময় ইহা নয়। সূক্ষ্ম ও স্থূলের একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ-রহস্য যখনই মানুষের জ্ঞান-দৃষ্টিতে ভেসে' উঠে, তখনই সে হয় নিঃসংশয়, পূর্ব্বতন ঋষিকল্প সমাজ-পুরুষ ও তাঁদের সত্য দর্শনের প্রতি হয় সত্যই শ্রদ্ধাবান্।

এখন কথা প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের বাহ্যাচরণ নিয়ে। অতীত বিগত বা অনাগতের প্রতি শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধার কোন কথা নেই। জগতে একটা মাত্র সত্যের অস্তিত্ব আমার উপলব্ধিতে পেয়েছি এবং তাহাই আমি স্বীকার করি। সে সত্য—গতি। ইহার অভাব যেখানে সেইখানেই মৃত্যু, জড়ত্ব। গতিশীল জীবন কোনও সীমার বাধায় বারণ মান্‌বে না—যেখানে প্রয়োজন অতীতের দর্শনকে অতিক্রম করে'ও উদ্দামগতিতে সম্মুখে এগিয়ে চল্‌বে। অনন্ত গতি—থামা তার নেই। যত বড় সত্যের ইঙ্গিতই শাস্ত্র দিক্ না কেন—"ততঃ কিম্" হবে প্রাণের এষণা। আমি একদল এমন আত্মদর্শী মানুষ চাই—যুগে যুগে অনাহত ছন্দঃ-পরম্পরায় যারা লোক-সংগ্রহার্থে তাদের সত্য দর্শন ও অনুভূতির দ্বারা সৃষ্টি-রহস্যের অন্তরালের এই অলৌকিক সত্য বিজ্ঞানকে মানুষের সম্মুখে ধর্‌বে।

জীবের মৃত্যু হয় কেমন করে' জান? প্রবল প্রাণ বায়ুর দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে ধীরে ধীরে শরীরের উষ্মা

প্রকোপিত হয়, পরে ইহা দীপ্যমান হ'য়ে উঠে। এই সময় দাহ্য বস্তুর অভাবে এই দীপ্ত অগ্নি মর্ম্মস্থানগুলি বিদীর্ণ করে, বিচ্ছিন্ন করে—সকল গ্রন্থী ছিন্ন হয়ে যায়। বাঁধনহীন উদান বায়ু উর্দ্ধগামী হ'য়ে ভুক্তবস্তুর অধোগতি রোধ করে' দেয়। দেহী তখন অতিক্লেশে দেহত্যাগ করে। রক্ত-মাংস-অস্থি-মজ্জা প্রভৃতি চর্ম্মচক্ষুর গোচরীভূত অবস্থায় পৃথিবীতে পড়ে' থাকে; আর তাম্মাত্রিক দেহটা সূক্ষ্ম বৃত্তি ও বাসনাসমষ্টি নিয়ে বায়বীয় আকার প্রাপ্ত হয়। জীবাত্মার দেহ-সংস্কার তখনও যায় না। সে মনে করে, বুঝি তার স্থূল দেহ তেমনই আছে। সমস্ত পূর্ব্ব সংস্কার, আসক্তি ও আবেগে মোহাবিষ্ট হয়ে' সে আত্মীয়-প্রিয়জনকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ কর্‌তে উদ্বেলিত হয়ে' উঠে—তাদের ছুঁতে গিয়ে বায়ুর সঙ্গে দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হ'য়ে বিরহীর বুকে শোকাবেগ সৃষ্টি করে। জীবাত্মা যতক্ষণ অনাশ্রয়ী থাকে, পাঞ্চ-ভৌতিক দেহ লাভ না করে, ততক্ষণ সে উদগ্র দেহ-লালসায় ব্যাকুল হয়ে' উঠে। সংস্কার-মুক্ত আত্মার কথা স্বতন্ত্র—দেহ-বন্ধন মুক্ত হয়ে' সে অনাবিল আনন্দ ও মুক্তির আস্বাদে বিভোর হয়। এদের জন্মগ্রহণ স্বেচ্ছায়। এই বিদেহী সংস্কারযুক্ত আত্মার পারলৌকিক সদ্গতির জন্যই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান।

দেবেন্দ্রের মৃত পিতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কথা আমি পূর্ব্বে কিছু ভাবি নাই। ভগবানের হাতের যন্ত্র আমি। সহজ ভাবে যা' আমার মধ্যে এসেছে, সেই নির্দ্দেশই আমি দিয়েছি। আমার এত কাজ যে পাঁচ মিনিটের বেশী এ-সব বিষয়ে সময় দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। আজ শ্রাদ্ধের দিন ধার্য্য ছিল; কিন্তু কিভাবে তা' অনুষ্ঠিত হবে সে বিষয়ে আমি পূর্ব্বে কোনও ভাবনা-চিন্তার অবসর পাই নি। আজ সকালে উঠে' পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কার্য্যক্রম স্থির হয়ে' গেল।

আজ এই শ্রাদ্ধ-বাসরে দেবেন্দ্রের পিতার বায়বীয় দেহ আমি প্রত্যক্ষ কর্‌ছি। মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁকে আমি চাক্ষুষ দেখেছিলাম। চট্টগ্রামে গেলে অনেকের পিতাই আমার নিকট এসেছিলেন, তাঁদের দুঃখ-অভাব-অভিযোগের কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু এই জীর্ণ-শীর্ণ লোকটিকে দেখে' কেন বা আমার হৃদয় বিগলিত হ'ল। তখন বুঝি নি, এত শীঘ্র তিনি দেহ ছেড়ে' চলে' যাবেন। স্বল্প-পরিসর তাঁর পার্থিব জীবনের অনেক অভাব হয়তো বা আমি মিটাতে পারি নি। কিন্তু তাঁর পুত্রকে যে অমৃত-পথের সন্ধান দিয়েছি তাতে জীবনের পরপারে তাঁর আত্মা আজ পরিতৃপ্ত। অনন্ত জীবন-প্রবাহ—হিন্দুর এ বিশ্বাস অমূলক নহে। ক্ষণিক জীবনের এই ক্ষুদ্র গণ্ডীবদ্ধ উপভোগই জীবনের সবখানি নয়। চেতনাহারা যারা তারাই হাহাকার করে। আমার আজিকার এই যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান তার সত্যতা ও সার্থকতার সম্বন্ধে কোনও সংশয়ই এখন কারও থাক্‌তে পারে না। এ যে দেখা সত্য! এই সে-দিনের কথা। বাণীবনে এককড়ি সিংহ রায়ের বিরাট্ শ্রাদ্ধ-বাসরে আমার প্রত্যক্ষ সত্য সকলেরই প্রাণে অভিনব জাগরণ ও সাড়া তুলেছিল। দেবেন্দ্রনাথের পিতার পঞ্চতাম্মাত্রিক সত্তাকে কায়া দিতে, রূপ-রস প্রভৃতি স্থূলভূতের প্রতীকস্বরূপ এই পুষ্প, বারি, চন্দন, কুশ, আমি পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে অর্পণ কর্‌ছি। দেবেন্দ্রের পিতা আজ বায়বীয় দেহে সকলের মধ্যেই আছেন, তাই তাঁর তৃপ্ত্যর্থে মিষ্টান্ন-বিতরিত হউক। আমি তাঁর আত্মার চিরশান্তি ও কল্যাণ কামনাই করি।"

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল

প্রবর্ত্তক বিদ্যার্থিভবনের-ছাত্র শ্রীমান শান্তিভূষণ ঘোষ এবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

— মাস-পঞ্জী —

কৃষি—

জ্যৈষ্ঠ মাসে যে সকল বীজ বপন করা উচিৎ তাহা কোন কারণে ঘটিয়া না উঠিলে আষাঢ়ের প্রথম ভাগেই বপনকার্য্য শেষ করা কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত ঢেঁরশ, সীম, শাঁক আলু, দেশী শালগম প্রভৃতি উদ্যান-সব্জীর বীজ বপন কার্য্যও করা যায়। আমনধান্য, কৃষ্ণমুগ, কলাই, শ্বেত তিল, কার্পাসের বীজও এখন লাগান চলে।

রৌদ্রের উত্তাপ যদি প্রখর হয় ও সময়মত বৃষ্টি না হয় তবে গাছের গোড়ায় জলসেচন করা উচিৎ। প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকালই ইহার উপযুক্ত সময়। রৌদ্রতপ্ত জমিতে বা রৌদ্রের সময় জলসেচ অনিষ্টকর।

চীনাবাদামের চারা বসান কার্য্য আষাঢ়ের প্রথমেই শেষ করা ভাল। পলিমাটি, চুণ, ছাই প্রভৃতি শুষ্ক সারযুক্ত দোয়াস ক্ষেত্র উহার চাষের জন্য উপযুক্ত। বর্ষা ব্যতীত প্রায় যে কোন সময়েই চীনা বাদামের চাষ চলে। বিঘা প্রতি ৬।৭ সের বীজের প্রয়োজন এবং এক বিঘা জমিতে ন্যূনাধিক ২০৲ মণ ফসল হয়। কৃষির মধ্যে চীনা বাদামের চাষ বেশ লাভজনক।

শ্রীমতিলাল দাশ

সাময়িকী—

সম্প্রতি কলেজ স্কোয়ার সুইমিং ক্লাবের শ্রীযুত মতিলাল দাস হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় ক্রমাগত ৩৩ ঘণ্টা সাঁতার কাটিয়া অভূতপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ২৯শে এপ্রিল রবিবার প্রাতঃ ৯টায় তিনি জলে নামেন এবং পরের দিন সন্ধ্যা ৬ টায় তিনি অনিচ্ছায় জলত্যাগ করেন। ভারতে এইরূপ দীর্ঘকালব্যাপী হস্ত-পদ বন্ধনাবস্থায় সন্তরণের সফল প্রচেষ্টা অন্যত্র হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় না। পৃথিবীর সন্তরণ ইতিহাসেও এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

*　　　*　　　*

কুমারী সাবিত্রীরাণী খাণ্ডেলওয়ালার বয়স মাত্র আট বৎসর। এই অল্প বয়সে সাবিত্রীরাণী দীর্ঘ ১৫ ঘণ্টা ক্রমাগত সন্তরণ করিয়া অদ্ভুত ধৈর্য্য ও সামর্থের পরিচয় দিয়াছে। তার সমবয়সীর মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী সন্তরণে বোধহয় তার আর তুলনা মেলে না। ২৯শে এপ্রিল রবিবার প্রাতঃ পৌনে সাতটায় সাঁতার আরম্ভ করে এবং রাত্রি ৯-৪৬ মিঃ সময় শেষ করে। জল হইতে উঠিয়া সাবিত্রীরাণী সাহসের সহিত বলে "আমি আরও ৬ ঘণ্টা জলে থাকিতে পারিতাম।" সন্তরণের পর হেদো হইতে
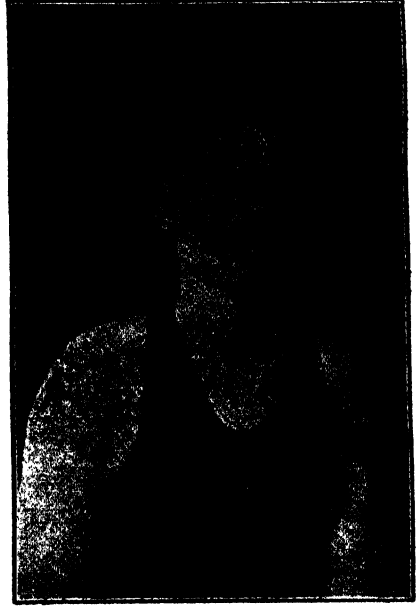
কুমারী সাবিত্রী খাণ্ডেলওয়াল।

তার সন্তরণ-শিক্ষক বিশ্ব-বিশ্রুত সন্তরণবীর শ্রীযুত প্রফুল্ল-কুমার ঘোষের বাড়ী নীত হইলে সামান্য সময় বিশ্রামের পরই সাবিত্রীরাণী তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পায় এবং সে যে খুব কম ক্লান্ত হইয়াছিল তাহা তাহার আচরণ হইতে বেশ বুঝা গিয়াছিল। গত বৎসর রেঙ্গুণে হস্ত-পদ একসঙ্গে বাঁধিয়া কয়েকঘণ্টা সন্তরণ করিতে সমর্থ হওয়ায় একটি স্বর্ণ-পদক পুরস্কারস্বরূপ লাভ করে। এই অল্প বয়সে কুমারী থাওেসওয়ালা সন্তরণে কৃতিত্ব দেখাইয়া অনেকগুলি পদক ও যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে।

* * *

চলিত বৈশাখ হইতে স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র "এডুকেশন গেজেটের" সম্পাদনের ভার লইয়াছেন শ্রীযুত কুমারদেব মুখোপাধ্যায়ের সহযোগে সুপ্রসিদ্ধা লেখিকা শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

* * *

কলিকাতা কর্পোরেশনের বিগত মেয়র নির্ব্বাচনে মৌলভী ফজলুল হক ও শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার উভয়েই মেয়র এবং অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ ও মিঃ বি, এন, চৌধুরী উভয়েই ডেপুটি মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কর্পোরেশনের দলাদলি এখনও চলিতেছে।

* * *

বাংলার প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গত ১৫ই মে পরলোকগমন করিয়াছেন। বিগত ৩৫ বৎসর যাবৎ বাংলার রঙ্গালয়ের সঙ্গে নিবিড়-ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া তিনি রঙ্গ-শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছেন। নদীয়া জিলার অন্তর্গত মহেশপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব হইতেই তাঁর সহজ প্রতিভা এই দিকেই আকৃষ্ট হয় এবং তাঁর সারা জীবন-ব্যাপী এই নাট্য-শিল্পে একনিষ্ঠ আত্মনিয়োগের সাফল্যের অবদান বাংলার মঞ্চাভিনয়ের শতাব্দির ইতিহাসে অকিঞ্চিৎকর নয়। অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জ্জুন', 'শ্রীকৃষ্ণ', 'ইরাণের রাণী', 'চণ্ডীদাস', 'অযোধ্যার বেগম', প্রভৃতি বহু নাটক-নাটিকা তাঁকে নাট্যজগতে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

* * *

২২শে মে অপরাহ্ণ সাড়ে চারিটার সময় কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি সার বিপিনবিহারী ঘোষ তাঁর বালিগঞ্জ বাসভবনে দেহরক্ষা করিয়াছেন। ইনি স্বর্গীয় সার রাসবিহারী ঘোষের ভ্রাতা ছিলেন।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশন কলিকাতায় হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এইজন্য যে অভ্যর্থনা সমিতি ও কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে তাহার সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও ডাক্তার সুরেশচন্দ্র রায় এবং উক্ত সমিতির কোষাধ্যক্ষের কার্য্য করিবেন শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হইবার চাঁদা ন্যূন পক্ষে পাঁচ টাকা। কার্য্যালয় ৪৪।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

* * *

জলধর সম্বর্দ্ধনায় শরৎচন্দ্রের নিবেদন—

শ্রীব্রজমোহন দাশ, সম্পাদক জলধর সম্বৰ্দ্ধনা সমিতি।

"কল্যাণীয়েষু—

দাদার সম্বর্দ্ধনার আয়োজন তোমরা করেচো, এ যে আমার কাছে কত বড় আনন্দের সংবাদ তা' বলে শেষ করা যায় না। দাদা বৃদ্ধ হয়েছেন, বাঙলা সাহিত্য-সেবার শেষ পুরস্কার দেশের লোকের কাছে দাবী করার তাঁর সময় হয়েছে বললে অন্যায় হবে না। মনে হয় দেশের পক্ষ থেকে এই আয়োজন আরও পূর্ব্বে হওয়াই উচিত ছিল।

যাঁরা আমার এ কথাটা স্বীকার করেন, জলধর দাদাকে যাঁরা ভালবাসেন, আন্তরিক শ্রদ্ধা করেন তাঁদের কাছে আমার নিবেদন এই যে, যেন তোমাদের এই প্রচেষ্টাকে তাঁরা সর্ব্বদিক দিয়ে সার্থক করেন। আমি নিজে তো তোমাদের মধ্যে আছিই, যে কোন ভার আমাকে দেবে সানন্দে গ্রহণ করবো। ইতি ২৯ বৈশাখ, ১৩৪১ সাল। সামতাবেড়, পাণিত্রাস, হাওড়া। তোমাদের শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

* * *

পাটনায় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং স্থির হইয়াছে যে, আগামী অক্টোবর মাসে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশন হইবে।

* * *

পাটনার কংগ্রেস সম্পর্কে ভারত সরকারের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হইবে।

Published by Krishnadhan Chatterjee M. A.—Prabartak Publishing House, 61, Bowbazar St., Calcutta.
Print[illegible] Prosad Ghosh, at Prakash Press—61, Bowbazar St. Calcutta.

মায়ার ছলনা

[শিল্পী---শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়]
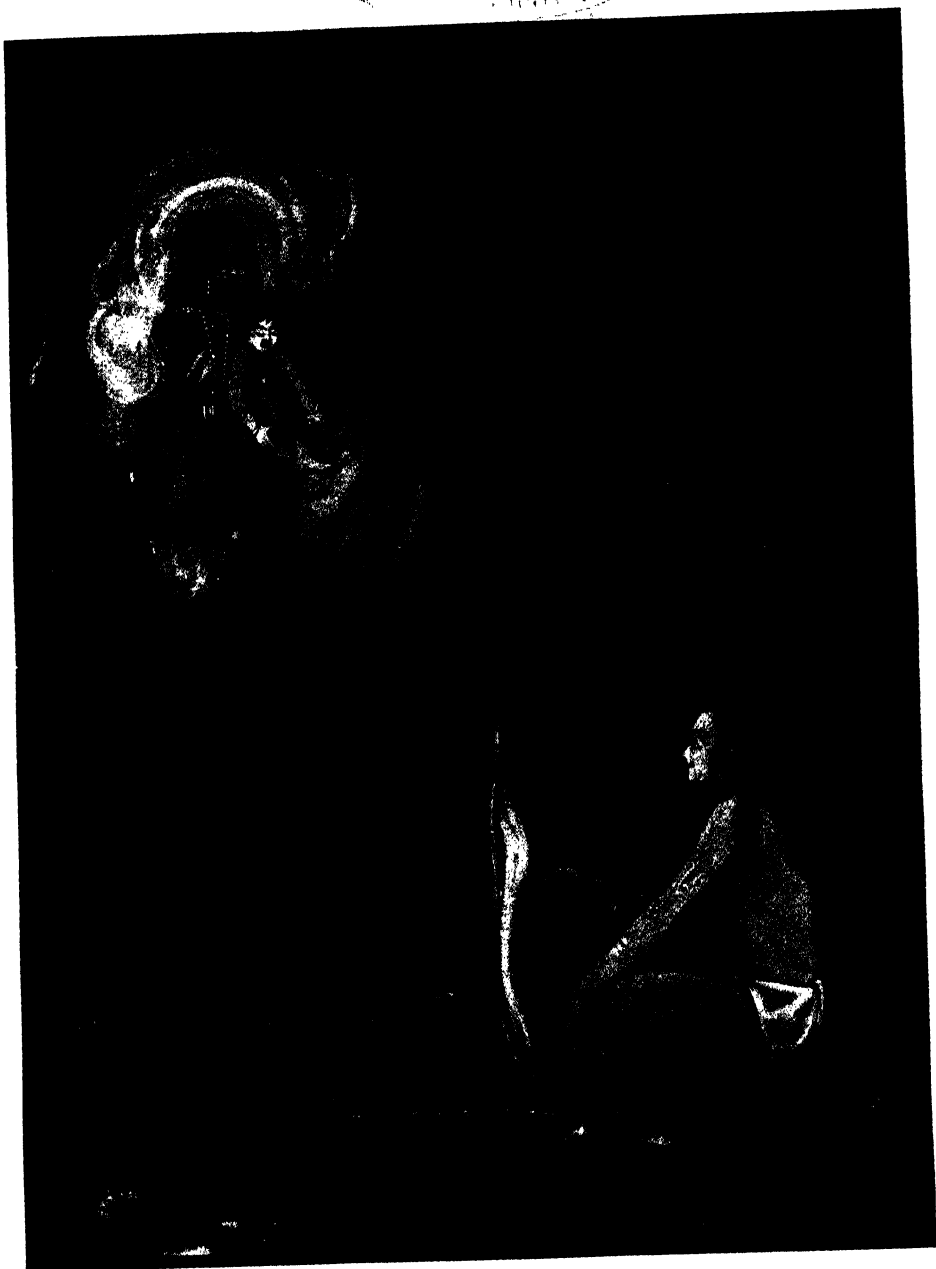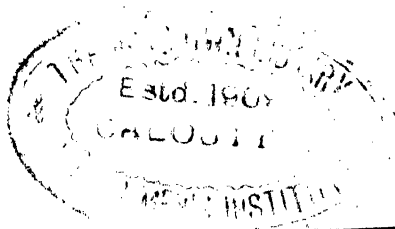
১৯শ বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৪১ ৪র্থ সংখ্যা

"প্রবর্ত্তকের" মূল-মন্ত্র

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে গঠনের মন্ত্র নিয়ে 'প্রবর্ত্তক" কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছে। তখনকার তরুণেরা, দেশকর্ম্মীরা প্রবর্ত্তকের বাণী দুর্ব্বোধ্য, হেঁয়ালী বলে' উপেক্ষা করতেন। "প্রবর্ত্তকের" মানুষ যারা তাদের ধূমমার্গী বলে' উপহাস করতেও ছাড়্তেন না। কিন্তু গঠন-বীজ ছিল যাদের অন্তরের বস্তু, তারা শুনেছিল "প্রবর্ত্তকের" বাণী মর্ম্ম দিয়ে'; তাই সেই উর্ত্তেজনার যুগেও প্রবল আন্দোলনের ঢেউ কাটিয়ে বাংলার নানা স্থান থেকে এসেছিল একদল তরুণ "প্রবর্ত্তকের" ভাষা ও ভাবকে মূর্ত্তি দিতে। এবং দুই যুগ ধরে' নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে তাদের অক্লান্ত তপস্যা আজ একেবারেই যে ব্যর্থ হয়েছে একথা আর বলা চলে না।

বিশ বৎসর পরে গঠনের মন্ত্র যখন উচ্চারিত হ'ল জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মার কণ্ঠে, তখন সমগ্র ভারতবর্ষ গঠনের প্রয়োজন স্বীকার করে' নিতে উদ্যত হ'ল। ইহাতে মনে হয়, এতদিন পরে ভারতের আত্মা অভ্যুত্থানের পথে এসে' উপস্থিত।

আজ গঠন-মন্ত্র-প্রচারের ভার আমাদেরই নয়, যোগ্যতম যন্ত্রে ভগবানের পাঞ্চজন্য ঝঙ্কার দিচ্ছে, সে বাণী আর কারও কাছে অস্বীকার্য্য হবে না। তবে গঠনের মূলে যে নিগূঢ় রহস্য নিহিত আছে, আন্দোলন ও উত্তেজনার ক্ষেত্রে তাহার অনুভূতি সম্ভব নহে। কিন্তু তা' না হ'লে, যে যোগ্যতার অভাবে দেশবাসী রাষ্ট্রক্ষেত্রে মহাত্মার ন্যায় অগ্রপুরোহিত পেয়েও বিমুখ হ'ল, সেই অক্ষমতাই আবার গঠন-যজ্ঞে দেশের সাফল্য-লাভে অন্তরায় হবে। আজও আমাদের এই অনুভূতির কথা মর্ম্ম দিয়ে অনুভব করবে তারাই যারা সর্ব্ববিধ আশা ও কামনা থেকে দূরে দাঁড়িয়ে, উত্তেজনাময় কর্ম্মক্ষেত্রের বাহিরে, অসাধারণ জীবনের অগ্নিময় আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে সর্ব্বত্যাগী হ'তে কুণ্ঠাহীন। "প্রবর্ত্তকের" কয়েক পৃষ্ঠায় তাদের জন্যই এই মর্ম্ম-গীতির এখনও প্রয়োজন আছে বলে' মনে হয়।

কথাপ্রসঙ্গে অবান্তর হ'লেও, আমাদের পুরাতন পাঠকদের যে অনুযোগ কাণে এসে পৌঁছেছে, তার উত্তর দিয়ে রাখা ভাল। "প্রবর্ত্তক" কেবল প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক প্রভৃতি কৃতী পুরুষগণের বাণী বহন করার জন্য জন্মায় নি, "প্রবর্ত্তক" জীবনের সন্ধান দিতেই ঈশ্বর-প্রেরণা আশ্রয় করে' কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছিল।

পথ চল্‌তে চল্‌তে পথিকের উভয় পার্শ্বে যেমন কখনও মনোহর নগর-শোভা পরিদৃষ্ট হয়, কখনও বা অরণ্য,পর্ব্বত, তড়াগাদি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ফুটে' উঠে, গতির সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্য-পটের এইরূপ পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক। "প্রবর্ত্তক"ও চলেছে তার সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যপথে, ফুটে' উঠেছে গতির সাম্‌নে যে শোভা ও সৌন্দর্য্য, জীবনের দায়েই তা' সে অস্বীকার করতে পারে নি; কিন্তু গতির সন্ধান তার অন্তর-বীণায় আজও বাজ্‌ছে, দরদী ও মরমীকে তা' একটু নিবিড়-ভাবে কাণ পেতে' শুন্‌তে বলি। গভীর কোলাহলের মাঝে আপনার প্রিয়জনের কণ্ঠধ্বনি প্রেমিকের কাছে হারিয়ে যায় না, শ্রুত হয়; প্রবর্ত্তকের বাণী তাই চির অনুরাগী বন্ধুদের কাছে অশ্রুত থাক্‌বে না বলে'ই বিশ্বাস করি।

বল্‌ছি, গঠনের মর্ম্মকথা।

আমাদের দৃষ্টি হয়ে পড়েছে স্থূল বহির্ম্মুখী, আমরা হারিয়েছি প্রতিভা, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান; আজ এই পথে এসে' দাঁড়িয়েছে যে দেশ ও জাতি তাদেরও কাছে চাই "প্রবর্ত্তকের" পরিচয়। তাই সকল সুর-বৈচিত্র্যের পেছনে "প্রবর্ত্তকের" যে অনাহত মুরলীধ্বনি, নানা সুরের ভিতর দিয়ে একদিন উহা তাদের কাছেও এসে' পৌছাবে। বাংলার তরুণ কতদিন বহির্ম্মুখী প্রবৃত্তির তাড়নায় তার অন্তরের বীণায় যে ডাক নিরন্তর উঠ্‌ছে, তার প্রতি উদাসীন থাকবে! দীর্ঘদিন অন্তরতম সত্যকে কোন্ আকর্ষণে, কোন্ প্রলোভনে সে উপেক্ষা করবে? তরুণ আজ চায় না বটে জাতীয় আন্দোলনের গভীরে নিগূঢ় ফল্গুধারা রূপে যে প্রবাহ বয়ে চলেছে, তাতে অভিষিক্ত হ'তে, চাইলেও অনুভূতির যন্ত্র এমনই বিকল হয়ে গেছে, যে যদি কোথাও বাংলার তীর্থে, মন্দিরে, আশ্রমে সে পবিত্র প্রবাহ বয়ে যায়, সুখ আর পায় না তাতে অবগাহিত হ'য়ে। তাই বলে' কি এই অনাহত প্রবাহ রুদ্ধ হবে? এ বাণী নীরব হ'বে? যে সুরে জীবন-যন্ত্র বেঁধে নিলে প্রেম ও ঐক্যের মন্ত্র সিদ্ধ হয়, সে মন্ত্র-শক্তি কি ম্লান হ'তে পারে? বাংলার উদীয়মান জাতিকে আজ এই বৈচিত্র্যের বহির্দৃশ্য দেখার তন্ময়তা থেকে মুখ ফিরিয়ে আন্‌তেই হ'বে অন্তরের দিকে। তার মণিকোটায় যে দেবতা চির জাগ্রত, তাঁরই চরণে আত্ম-নিবেদন করে' তাকে সিদ্ধ হ্‌তে হ'বে—কোটিকণ্ঠে তুল্‌তে হ'বে আবার শিবের বিষাণ বিশ্বকে মুখরিত করে'।

বল্‌ছি, গঠনেরই মর্ম্মকথা। কি গড়্‌তে হ'বে, কাকে গড়্‌তে হবে, কি দিয়ে গঠন হবে? এই সমস্যার সমাধানে যদি বুদ্ধি ধৈর্য্যহীন হয়, তবে গঠনের নামে, গঠনের আকাঙ্ক্ষায় প্রশ্রয় পা'বে আবার চাঞ্চল্য, আবার উত্তেজনা; উত্তেজিত প্রাণশক্তি ব্যর্থ হয়ে ফিরে' আস্‌বে অধিকতর অপচয়ে অবসন্ন হয়ে। আমরা রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্ম্মে দীর্ঘদিন ধরে' এই লীলাই দেখ্‌ছি; অত গভীরে, নিবিড়ে, নিগূঢ়ে যাওয়ার প্রয়োজন নাই বলে' অগভীর বুদ্ধির স্বভাবকে প্রশ্রয় দিলে আর চল্‌বে না।

গঠনের মর্ম্মকথা কাণ দিয়ে শুন্‌তে হ'বে, মর্ম্ম দিয়ে গ্রহণ কর্‌তে হ'বে, বুদ্ধিকে করতে হ'বে স্থির, শীতল, সুস্থ। কর্ম্ম আরম্ভ করার পূর্ব্বে কর্ম্মী যদি না হয় প্রকৃতিস্থ, না হয় কর্ম্মের ভাব ও আদর্শে অনুপ্রাণিত, তত্ত্বে ও অধ্যাত্ম রহস্যে অভিষিক্ত, কর্ম্মই শুধু ব্যর্থ হ'বে না, অসংখ্য জীবনকে ব্যর্থ করে' দেবে, দেশ ও জাতি ব্যর্থ হ'বে; আবার দীর্ঘদিন ধরে' দেশের প্রাণে জাগরণের সাড়া উঠ্‌বে না।

গঠন করতে হ'বে না আগে সমাজ, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র; পরন্তু এই সকলের পশ্চাতে যে সত্য আছে, যে প্রাণ আছে, যে আত্মা আছে, তাকেই সর্ব্বাগ্রে গড়ে' নিতে হ'বে! গড়ে' নিতে হ'বে তাকেও, যে ইহা অনুভব কর্‌বে আপনার সবখানি দিয়ে, অথবা গঠনের মন্ত্র অবধারণ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে' তুল্‌তে হ'বে অধিকারী রূপে।

নির্ম্মাণের পশ্চাতে যে অনির্দ্দেশ্য সত্য আছে, তাকে গড়া অর্থে তাকে জীবন দিয়ে পাওয়া, মূর্ত্তি দেওয়া। ইহার জন্যও নিজেকে অধিকারী হয়ে উঠ্‌তে হ'বে, ইহাই আত্ম গঠনের মূল কথা। আর এই গঠনের জন্য যে বস্তুর প্রয়োজন, সেই বস্তুর সম্যক্ জ্ঞান ও তাহার প্রাপ্তির সাধনার প্রতি অবজ্ঞা কর্‌লেও চল্‌বে না। যদি গঠনকামী এইগুলিতে অবহিত হয়, তবে গঠন-যজ্ঞের ঋত্বিকের সংখ্যা অঙ্গুলী-পর্ব্বে গণনা করার বিষয় হ'লেও, সেই অল্প-সংখ্যক গঠন-ব্রতীর দ্বারাই সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল হ'বে।

পেতে হ'বে গঠনের মূলে যে সত্য তত্ত্ব, পেতে হ'বে সেই চরিত্র যাহার উপর উহা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়, আর লাভ করতে হ'বে সেই অমৃত যাহাতে অভিষিক্ত হলে নিঃসংশয়ে চীৎকার করে' বলা যায়,—"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।"

জগতে গড়ে' উঠেছে রাজ্য, গড়ে' উঠেছে বাণিজ্য, সমাজ, গড়ে' উঠেছে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান, ধর্ম্ম-শিক্ষা-সাধনার তীর্থ; সে সব গড়ে' উঠেছে কি প্রাণ নিয়ে, গড়ার পশ্চাতে আছে কি রহস্য, কি তত্ত্ব, তাহা যদি অবধারণ না করি, গড়ব কি? আজ আবার যা গড়তে চলেছি তারও সন্ধান পাব কোথা! যে বস্তু আমার জীবন দিয়ে গড়ে' উঠবে, তাহার সত্য অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে, তদনুযায়ী চরিত্রও আমাকে গড়ে তুলতে হবে; আর চরিত্রগঠনের যে রসায়ণ তাহাও আমার করতলগত হওয়া চাই। এগুলি যদি অপ্রাপ্ত হয়, তবে এই যে আজ গঠনের কোলাহল উঠেছে ইহাকে সম্মোহন ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। অন্ধকে অধিকতর গভীর গর্ত্তে নিক্ষেপ করে' দুষ্ট যেমন কৌতুক করে, প্রকৃতির তেমনি ছলনায় এই গঠনের পথে আমরা অধিকতর বিপন্ন হ'ব। মায়া করতালি দিয়ে বিকট কৌতুক-হাস্যে আমাদের মর্ম্ম দগ্ধ করবে।

গঠনের অমৃতময় রসায়ণ—প্রেম। প্রেমের সাধন ধৈর্য্যহীনের পক্ষে সম্ভব নয়। আজ সংগঠনের যে সৈনিক গঠনের 'ক্রীড্' মাত্র মাথায় নিয়ে অগ্রসর হয়, সে দিয়ে যা'বে পুনরায় ব্যর্থতারই অভিজ্ঞতা; কিন্তু যে প্রেমসিদ্ধ সে যে পথে চলে' যাবে অস্পষ্ট পদচিহ্ন রেখেও, ভবিষ্যতের কাছে গঠনের তাহাই হ'বে অমোঘ সঙ্কেত।

প্রাচীন সাধনায় এই প্রেমপ্রাপ্তির উপায়—"বিতর্ক-বাধনে প্রতিপক্ষভাবনা," এইরূপ কথিত হইয়াছে; কিন্তু এই সাধনায় আমরা সিদ্ধ হই নাই। যুগে যুগে বিতর্ক-বাধনরূপ বিদ্বেষ, কলহ ও ভেদ ঘুচা'তে গিয়ে আমরা প্রতিপক্ষ-ভাবনা "প্রেম, ঐক্য ও শান্তি" অনুধাবন করেছি; স্বার্থ, অহংকার, কামনা, বিসর্জন দিতে গিয়ে আমরা প্রতিপক্ষে নিঃস্বার্থ, বিনীত ও নির্লোভ হ'তে চেয়েছি; কিন্তু পরীক্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই করে' দেখা যায়, এই কাঁটা দিয়ে কাঁটা উপড়া'বার সাধনায় রোগ দূর করার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে, আমরা রোগীকেই বিসর্জ্জন দিয়েছি—আর ইহার অন্যথায় ক্ষতই বেড়েছে জীবনে অধিক করে'। দৃষ্টান্ত দিয়ে অপ্রিয় ঘটনার আর অবতারণা করব না।

ইহা সত্য, আত্মগঠনের জন্য চাই মানবতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ—অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, শৌচ,সন্তোষ, তপস্যা ও ঈশ্বর-প্রণিধান প্রভৃতি। আমাদের চরিত্রে এইগুলির বিপরীত ধর্ম্ম যা' আশ্রয় করে' আছে তা' দূর করার জন্য মনে মনে প্রতিপক্ষ-চিন্তা কার্য্যকারী হয় না; সদ্গুণ-সমুদ্রে ডুব দিয়ে অভিষিক্ত হ'তে হয়, শুচি হ'তে হয়। চিন্তার সাধনক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ভারতের তপস্যা লাট খেয়ে আজ বস্তুতন্ত্র জীবন আশ্রয় করতে চায়; এইজন্য আত্মগঠনের প্রয়োজনে প্রেমরূপ অমৃতকে লাভ করতে হ'লে, এমন কোনও জীবন যদি কোথাও মিলে, যাহা অমৃতেরই রসমূর্ত্তি সেইখানেই ডুব দিতে হ'বে মানুষকে অকাতরে। এখানে বিচার নাই, মরণের ভয় নাই, ব্যক্তিত্বের অহমিকা নাই—যদি চাই সৃষ্টি, যদি চাই অমৃতময় জীবন, যদি চাই প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ন্যায় প্রদীপ্ত প্রাণ, তবে কোথাও যদি শাশ্বত আত্মার বিগ্রহ-মূর্ত্তি চক্ষে পড়ে, বিশ্বাসের প্রদীপশিখায় যদি এমন শ্রীমূর্ত্তি কোথাও উদ্ভাসিত হয়—আশ্রয় মিলে, তবে আর শ্রুতি-পুরাণ-তন্ত্র, বিচার-বিজ্ঞান-তর্ক কিছুর প্রতীক্ষা নাই। এইখানেই তলিয়ে দিতে হ'বে নিজেকে নিঃশেষে। এই আদর্শের ছাঁচে আপনাকে ঢালাই করে' গড়ে' নিতে হ'বে গঠনের যোগ্য করে'; তবেই দেশে আজ যে গঠন-মন্ত্র হুঙ্কার দিচ্ছে আসমুদ্র-হিমাচলে প্রতিধ্বনি তুলে', সে মন্ত্র ব্যর্থ হ'বে না।

আমাদের মনে রাখতে হবে, শুধু 'প্রতিপক্ষ-ভাবনার' সাধনায় আমরা সিদ্ধ হ'ব না। আর মর্ত্ত্যক্ষেত্র চির অসিদ্ধ বলে' যারা চায় মোক্ষ, মুক্তি, লয়, তারাও নির্ম্মাণের অধিকারী নয়। বিশ্বাস করে' নিতে হবে দৃশ্যমান বিগ্রহকে অনির্দ্দেশ্য-তত্ত্বের আশ্রয় বলে', ভৌতিক দেহকে সনাতন শাশ্বতের আধার বলে', দেখতে হবে বিষয়ের অন্তঃস্থল, চিনে নিতে হ'বে দৃশ্যের অভ্যন্তরে যে পরম তত্ত্ব তাকেই। তাই ভারতের গঠন-মন্ত্রের কবি ও ঋষির কণ্ঠে সগর্ব্বে এই বাণী ঝঙ্কার তুলেছিল—

যো বেত্তি ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
স সর্ব্বস্মাদ্বহিষ্কার্য্যঃ শ্রৌতস্মার্ত্তবিধানত

—ইহার মর্ম্মার্থ, পরমাত্মা-রূপী আমার দেবতা কৃষ্ণ-বিগ্রহের দেহকে যে ভৌতিক মনে করে, শ্রৌত-স্মার্ত্ত-মতে তাহাকে সর্ব্ব অধিকার হ'তে বঞ্চিত করে' দাও।

দেহের জন্ম-মৃত্যু ঘটে; এইহেতু সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা প্রভুর দেহাশ্রয়ে বিদ্যমান থাকা যে অসম্ভব মনে করে, সে মূঢ় ব্যক্তির দিব্য কর্ম্মে অধিকার নাই। বস্তুকে উপলব্ধি কর্‌তে হ'বে তত্ত্ব-দৃষ্টি দ্বারা। পরম ভাব নরদেহে যদি প্রতিষ্ঠা না পায়, এ পৃথিবীর ধ্বংসই শ্রেয়ঃ। কিন্তু তাহা নহে—আমাদের জন্ম-জরা-মরণশীল এই দেহেই অব্যক্ত, অচিন্ত্য, পরম তত্ত্ব নিহিত আছে। তাহাকে উদ্বুদ্ধ করার একমাত্র উপায়, আমার স্বভাব-মন নবজন্মের আকাঙ্ক্ষায় যেখানে অকাট্য শ্রদ্ধায় নত হয়ে পড়ে, সেইখানেই অকপটে আত্মদান কর্‌তে হবে। পার্থের মতই বল্‌তে হবে উদাত্ত কণ্ঠে—

"পশ্যামি দেব তব দেবদেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্"

এই অসাধারণস্বভাব ও সাধনসিদ্ধ নরনারীর উপর ভিত্তি করে'ই ভারতের নির্ম্মাণ-যজ্ঞ সাফল্যমণ্ডিত হ'তে পারে। এই উৎসর্গ-মন্ত্রে দীক্ষিত নরনারীর অভাবে পূত গঠন-ব্রত কেবল কোলাহল বাড়াবে, উত্তেজনাই সৃজন কর্‌বে, জাতি যে তিমিরে সে তিমিরেই থেকে যা'বে। আমরা তাই বলি, বাংলায় কি এমন এক সহস্র নারীপুরুষ নাই, যাহারা ভগবানের জীবনে নবজন্ম লাভ করে', সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে অমৃতের ধারা-সঞ্চারে সবই অভিনব ও সুন্দর করে' তুল্‌বে—ভারত হ'বে স্বর্গের সুষমায় সুমণ্ডিত, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মধু-বৃন্দাবন!

গড়ার লক্ষ্য যদি স্থির না হয়, অসাধারণ জন্মলাভের জন্য এই আত্মোৎসর্গের আগুন কোথায়ও জ্বলে' উঠে না। যদি গড়্‌তে চাও মর্ত্ত্যকে, ভারতকে জাগ্রত ভগবানের লীলাক্ষেত্র-রূপে, তবে হে জীবনের সাধক, দিব্যজীবনের সাধনায় উদ্বুদ্ধ হও; গঠনের মূল মন্ত্র ইহা ব্যতীত আর কিছু নয়।

সৃজনের বেদনা

ব্যথা যদি জীবনের সুর হয়, তবে সেখানে যে সৃষ্টি গড়ে' উঠে তা' বেদনা দিয়েই গড়া,—সেখানে সুখ কোথা, তৃপ্তি কোথা? একটা নিরন্তর তপস্যাই হয় তার মূর্ত্তি। ভারতের জীবন যেন এই বেদনারই শীর্ণ মূর্ত্তি; ব্যথা দিয়েই সে যুগে যুগে গড়ে' উঠেছে—সে ব্যথার রাগিণী আজিও শুদ্ধ হয় নি!

বুদ্ধ যেদিন ভিক্ষাপাত্র হাতে পথে এসে' দাঁড়ালেন, কি বেদনার সুর বিশ্বে সেদিন বেজে' উঠ্‌ল—একবার অনুভব কর দেখি! এত বড় জীবনের সৃষ্টির মূলে এই বেদনার মহিমাময় মূর্ত্তিই ছিল। শঙ্কর, চৈতন্য অশ্রু দিয়েই গড়া। যে সন্ন্যাসী জগতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সেদিন ভারতের মর্ম্মকথা গেয়ে গেলেন—হাতে ত্যাগ-বৈরাগ্যের দণ্ডকমণ্ডলু—বৈরাগ্যের উত্তরীয় উড়িয়ে—এই বেদনার গানই কি তাঁর কণ্ঠে ঝঙ্কার দিল না!

ত্যাগ-তপস্যার যুগ ছেড়ে' দিলেও, ভগবান শ্রীকৃষ্ণর একটা নূতন সৃজন করার সে করুণ প্রয়াস বেদনার ছাড়া তো আর কিছুই নয়! অযোধ্যায় যে রাম-রাজ্য গড়ে' উঠার স্বপ্ন দেখি তাও এই ব্যথার সুর দিয়েই গড়া। ভারতের ব্যথা আজও জীবন ছেয়ে' দেয়। ভারতকে যে গড়্‌তে চায়, ব্যথার ভার তার মাথায় পড়ে। ভারতের ব্রত—সে বড় করুণ, বড় বেদনাময়!

যদি ভারত তোমাদের জীবন হয়, ধর্ম্ম হয়, সত্য হয়, তবে সুখের স্বপ্ন দেখো না, অশ্রু জীবনের ঐশ্বর্য্য কর; বেদনার সুরে গান ধর, ব্যথার শিহরণ অন্তরে তোল। দীন-কাঙাল তুমি, বেদনা দূর হওয়া—বেদনার ব্যথা বয়ে' যদি প্রতীকার হয়, তবেই সম্ভব।

যে অভাবের কান্না বুদ্ধ-শঙ্কর-চৈতন্যের—সে অভাব হৃদয় মোচড় দিয়ে' যদি উঠে, তবেই ভারতের মর্ম্ম উপলব্ধ হবে। সে অনাহত ব্যথার সৃষ্টি আজও শেষ হয় নি। তাই সুখের কথা নয়—দুঃখ আমাদের জীবনের রস, দুঃখ আমাদের বীর্য্য হোক্। দারিদ্র্য মাথার মুকুট করে'ই জীবনের রাজা হয়ে' বিশ্বের দুয়ারে দাঁড়াতে হবে। ভারতের ধর্ম্ম বহন করার শক্ত মেরুদণ্ড ক্রমেই নুয়ে' পড়ছে, তোমরা ভারতের তপস্যায় শক্ত হও, ভারতের এই বেদনার বোঝা মাথায় নিয়ে অতীতের অসমাপ্ত কার্য্য সিদ্ধ কর।
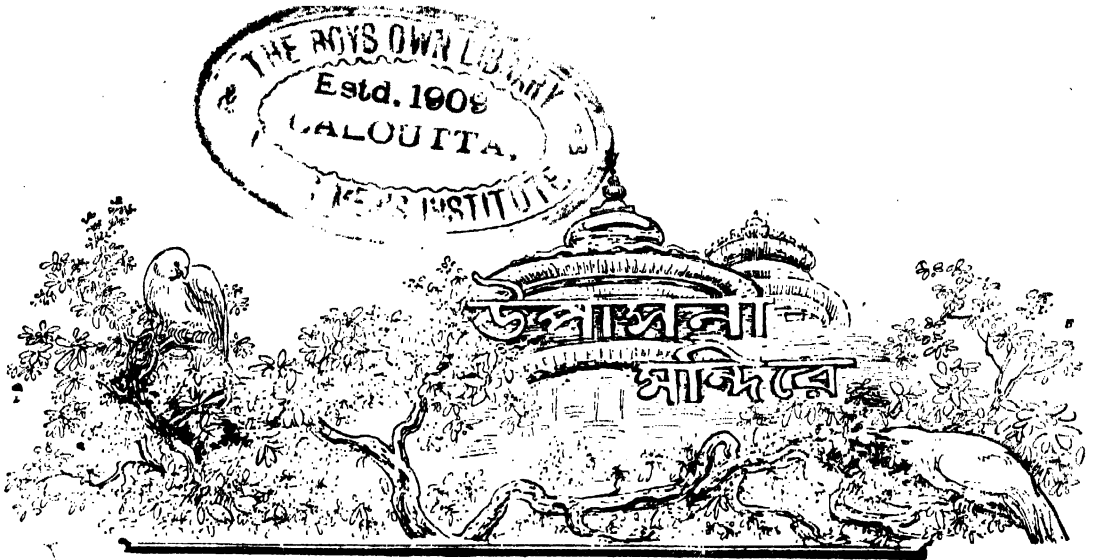
সে একদিন ছিল যখন সর্ব্ব বিষয় নিয়ে একজনের কাছে দাঁড়াতে ; এখন বিষয়-বিভাগ হয়েছে, তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হ'বে আর বিষয় নিয়ে নয়, অমিশ্র সম্বন্ধ নিয়ে। সে যখন সকল বিষয়ের বাহিরে, তখন তোমার কোন বিষয়ের দাবী আর তার কাছে নয়।

জানাতে হ'বে সব কিছু তাকেই, পেতে হ'বে সব কিছু তারই কাছ থেকে ; কিন্তু সে যখন আপনাকে ভাগ করে' ইন্দ্রকে বল্‌ল সৃষ্টির শৃঙ্খলা রাখ্‌তে, পবনকে বল্‌ল বাতাস আর বরুণকে জল দিতে, অগ্নিকে উত্তাপ আর কুবেরকে ধনের অধিকারী করে' সে দিল, তখন জলের জন্য পবন গিয়ে দাঁড়াল বরুণের কাছে, ধনের জন্য কুবেরের দরজায় সকলেই গিয়ে হাত পেতে বস্‌ল। যারা এই বিধান মেনে নিল না তাদের স্বর্গরাজ্য থেকে বিদায় নিতে হ'ল। ঈশ্বরবিধানের বিরুদ্ধে গড়ে' উঠ্‌ল এই দিন থেকে আর একটা জাতি—তারাই অসুর। দেবতাদের প্রতি এদের চিরদিন ঈর্ষ্যা।

ভগবানের অব্যর্থ বিধানের নকল করে'ই এদেরও জীবন-নীতি চলে ; কিন্তু এরা মনে করে, সে সৃষ্টি তাদের মৌলিক, তাদের নিজস্ব—আর দেবতারা জানে, সৃষ্টিবিধানের মূল ভগবান ও তারা আজ্ঞাবহ বিভূতি, ভাগবত বিজ্ঞান।

যার উপর যে কাজের ভার, তার তাতেই প্রতিষ্ঠা। যদি সে প্রতিষ্ঠা হয় আত্মকৃত, তাহা অহঙ্কৃত ; প্রতিবাদ অবশ্যই সেখানে প্রযুজ্য। কিন্তু ভাগবত অধিকারই যেখানে মূর্ত্ত হয়, সেখানে থাকে না কোন অভিমান বা অপমান। এই বিধান সৃষ্টির মাঝে প্রবর্ত্তিত হ'লেই ভগবানের ছুটী। সেই দিন থেকে তিনি হ'লেন নিঃসঙ্গ, নিস্পৃহ। দেবতারা মণ্ডল করে' সে জ্যোতির ক্ষেত্রকে রক্ষা করে। তিনি তাই নির্গুণ—কেবল আলো ও আনন্দ দিয়ে দেবতাদের উদ্ভাসিত করে' রাখেন। দেখ্‌লেই চেনা যায় এই দেব-দেবীদের। সঙ্ঘ-জীবনের আদর্শ-নীতি এরই মধ্যে খুঁজে পাবে।

যাদের যোগ আত্মকাম-সিদ্ধির জন্য নয়, ভাগবত-জীবন-লাভের আহ্বান যাদের জীবন-মন্ত্র, ভাগবত-সঙ্ঘ-গঠন যাদের কর্ম্ম ও লক্ষ্য, তাদের সংখ্যা কম হ'লেও ক্ষতি নেই ; কিন্তু এদের বুঝ্‌তে হ'বে, কত বড় যুগের ভিত্তি-স্বরূপ তাদের হ'তে হবে।

তারা হোক্ না সাধক, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী বা গৃহী, এ সব জীবনের এক একটা অবস্থা—আসলে তাদের সর্ব্বতোভাবে সবখানি উৎসর্গ করে' নূতন জন্ম নিতে হবে। কাজ সহজ নয় ; আর তার জন্য ব্যস্ততাই বা কি, বিরক্তিই বা কিসের জন্য ! যারা মোক্ষের কামনা পর্য্যন্ত বিসর্জন দেয়, সিদ্ধ হওয়ার সংবেগ পর্য্যন্ত ভগবানে তুলে' দেয়, জীবন মৃত্যু তুল্য মনে করে, তাদের অধীর হওয়ার কারণ নাই। সুবিধা অসুবিধার প্রশ্ন তাদের মনে উঠে না। আকুলতা যদি বাড়ে, সে ত মরণ-পণকে দৃঢ় করবে কেবল উৎসর্গ পূর্ণ করতেই। মন যদি কোথাও থাকে, তা' গুটিয়ে আন্‌তে হ'বে ভগবানে—'ময্যর্পিত-মনোবুদ্ধিঃ' হওয়াই তো তার একমাত্র সাধনা।

লোক-সংখ্যায় সৃষ্টি নয়, আসল উৎসর্গের সাধনা যেন মূর্ত্ত হয়ে' উঠে। কোন আদর্শ বা বিশিষ্ট আচার অনুষ্ঠানের সিদ্ধি নয়, কেবল দেখা চাই—দেহ, মনঃ, প্রাণ, বুদ্ধি আত্ম-গত করে' [illegible] কি না।

স্থূল সংসর্গ চিরদিনের জন্য নয়—ইষ্টের সঙ্গে সম্বন্ধের স্বীকৃতি শাশ্বত কালের জন্য, ইহা, যখন স্থির হয়ে যায়, তখন দূরত্বও অন্তরে অন্তরে মধু বর্ষণ করে। সাধকের জপ-মালা যেন ভগবান, তেমনি ভগবানেরও জপমালা প্রেমিক ভক্তের উৎসর্গীকৃত হৃদয়গুলি। এ সব ভাষা নয়, সাধারণ ভাব নয়, দরদী ও মরমীর আন্তরিক অনুভবের বস্তু।

* * * * *

কাণে গেল—প্রাতরুত্থানের আহ্বান, তরুণ ছাত্রদের জাগাবার জন্য। সাধু প্রচেষ্টা। দরকার অন্য কিছু নয়—একটা অভ্যাস সৃজন করা। নূতন সমাজের সদভ্যাস ঈশ্বর-বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসকে জাগ্রত ও জীবন্ত করার সাধন। অভ্যাসই তার গোড়ার কথা।

এই অভ্যাস শিক্ষা দেওয়ার মূলে আছে—প্রেম ও সহানুভূতি। জেলের কয়েদীদেরও কারারক্ষীরা একটা অভ্যাসের সাধনা করায়, তাদের শয্যা থেকে টেনে' তুলে পরুষ বাক্যে, শাসনদণ্ডে। কিন্তু ভাগবত ক্ষেত্রে সদাচারের মধ্য দিয়ে চাই প্রেম ও সম্বন্ধেরই প্রতিষ্ঠা। সে ডাক কত প্রেমের, কত দরদের, যার সাড়া শুন্‌লে জীবাত্মাকে সত্যই হেসে' প্রফুল্ল চিত্তে শয্যা ছেড়ে' উঠে' দাঁড়াতে হয়। বিরক্তি-বোধ যদি জাগে, এই প্রচেষ্টা ভবিষ্যতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে।

চাই সৎ-শিক্ষা; ইহার জন্য চাই পরিচয়, সাধু স্নেহ-বচন, মধুর ব্যবহার, হৃদয়ের সম্বন্ধ—যার আকর্ষণে অলসতা ত্যাগ করে' কিশোর প্রাণ উঠে' দাড়াবে ভগবানকে সম্মুখে রেখে'। এই সামান্য কর্ম্মটুকু কেবল প্রাতঃকালের কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য নয়, সারা দিনের ধ্যান ইহার মধ্যে নিহিত। যতগুলি মানুষকে ডাকৃতে হয়, তাদের জন্য নিরন্তর কল্যাণ-চিন্তা হৃদয়ে এমন ঘনিয়ে তুলতে হয়, যে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে সেই ঘনীভূত স্নেহ-স্পর্শ তাদের হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করবে; আর শুধু কর্ত্তব্য-বোধে যদি এই কর্ম্ম কেহ গ্রহণ করে, তার নিজেরও যেমন এ কর্ম্ম দুর্ব্বহ হবে, যাদের শয্যাত্যাগ করাবে তারাও হ'বে বিরক্ত, বিদ্বেষী। কাজ ও কথা তুচ্ছ; কিন্তু ইহার মধ্যেও প্রেম ও ঐক্যের বীজ নিহিত। এটুকুতেও অবহিত হওয়া চাই।

* * * *

অধ্যাত্মজীবনের আকাঙ্খা সর্ব্বাগ্রে ভাল; কিন্তু দীক্ষান্তে সে আকাঙ্খার লয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। গুরুশক্তি সকল প্রশ্নের একই উত্তর দেন—তুমি কি তোমার সকল ভার আমার উপর ছেড়ে' দিয়েছ? সাধক যদি বলে—'হাঁ', তখন তিনি উঠে' দাঁড়ান এই অভয়-মন্ত্র উচ্চারণ করে'—'আচ্ছা, তোমার আর কোনও চিন্তা নেই।'

কিন্তু তারপরও যদি চিন্তা থাকে, তবে সে সাধনার ব্যভিচার। আত্মসমর্পণযোগীর হয়ত মনে হ'তে পারে—একটা কিছু সাধনা করব তো! কিন্তু বিবেকের বাণী তখনই গর্জ্জে' ওঠে—'গুরুশক্তির হাতে যখন সবই ছেড়েছ, তখন আবার তোমার করার আছে কি?'' যে ইহাতেই সান্ত্বনা পায় না, সে বুঝে না—এই কিছু না করাটা যে কত বড় সাধনা। ভগবানে একান্ত নির্ভর করাটাও একটা সুকঠিন তপস্যা। অর্থাৎ ছাড়াটা এক্ষেত্রে হয় মুখে, সবখানি দিয়ে নয়—তাই আত্মসমর্পণের পরও থাকে সাধন নিয়ে দ্বন্দ্ব।

এইখানেই বিপদ্। ভালবাসা, ভক্তি সবই আছে; কিন্তু আপনাকে লয় করা হচ্ছে না। কিন্তু লয় না হ'লে নব জন্ম হয় না, দিব্য স্বভাব মিলে না।

* * * * *

সুযোগ এসেছে সিদ্ধির। ইহা একটা ধারাবাহিক তপস্যারই সিদ্ধি। ইহার অব্যর্থ পরিণতি—দিব্য জীবন, ভাগবত জন্ম।

বস্তু অভিনব। কিন্তু ইহাই যদি আমাদের মধ্যে বিগ্রহান্বিত হয় জগতে সত্যই এক অলৌকিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হ'বে। ভাষায় নয়, জীবন দিয়েই ইহা সিদ্ধ করতে হ'বে। তত্ত্ব-বস্তু জীবনে অনুবাদিত হোক্।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্মপূর্ত্তির সিদ্ধি জগৎকে পীড়িত করবে। এগুলি সব পুরাতন অবস্থারই পুনরভ্যুদয়। আমরা চেয়েছি যে অভিনবকে, তাকে এমন করে' ব্যষ্টি-জীবনে মূর্ত্ত করা যাবে না।

লয় করে' দাও তোমার অতীত ও বর্ত্তমান। বীর হও। এই অধ্যাত্মক্ষাত্রশক্তি তোমাদের জীবনে জাগ্রত হোক। আত্মজয়ের সাধনা অতি ঘোরতর সংগ্রাম; সে সংগ্রামে বীর্য্যহীন জয়ী হয় না। বীর যে সেই আত্মজ্ঞান লাভ করে। ভগবানে জন্মলাভ এমনই প্রবল আধ্যাত্ম ক্ষাত্রশক্তিপরায়ণ জাতির পক্ষেই সম্ভব।

আর আমরা ব্রাহ্মণ চাই না। উহা পুরাতন আদর্শ। আমরা চাই, ভাগবত জীবন, ভাগবত বর্ণ ও জাতি। ইহা একটা নূতন স্বপ্ন। তোমাদের সম্মুখে নূতন সৃষ্টি, নূতন বেদ। অতীতের আদর্শ ও সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে' এই অভিনব সাধনায় এ জাতি নব জন্ম লাভ করুক। ইহারই জন্য তোমরা একনিষ্ঠ তপঃ-পরায়ণ হও।
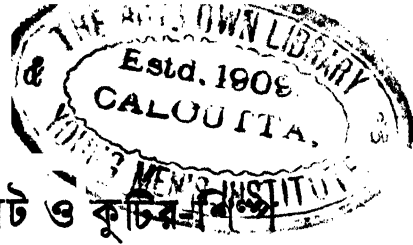
পাট ও কুটির-শিল্প

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী বি, এল্

"নিয়ে যায় মায়ের দুধ পরে দুয়ে—
রব কি উপবাসী মোরা ঘরে শুয়ে ?"

ভগবৎকৃপায় বঙ্গভূমি পাটের ন্যায় দুর্লভ একচেটিয়া বস্তু প্রসব করিয়াও আজ একতা বিহনে পৃথিবীর মধ্যে সেই দেশবাসী সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র, ইহা অদৃষ্টের পরিহাস (Irony of fate) ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? এই পাট দ্বারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যথেষ্ট স্বর্ণমুদ্রার কারবার চালাইতেছে, আর এখানে একটী তামার পয়সাও হতভাগ্য পাটচাষীদের ভাগ্যে মিলিতেছে না, তাহারা চাষের মালিক হইয়াও গ্রাসের মালিক হইতে পারিতেছে না এবং "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ, তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি" প্রবাদেরও হানি ঘটাইতেছে। কৃষকগণ রৌদ্রে পুড়িয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া, প্রায় অনাহারে অনিদ্রায় পাটের কৃষিকার্য্য শেষ করিয়া, যখন ঠাণ্ডায় ঘরে বসিয়া অবসর সময়েও পাটের দ্বারা ছালা চট, গালিচাদি (carpet) তৈয়ারী করিতে পারে, তখনি উহা ঘাড়ে ধাক্কা দিয়া (যা তা কম মূল্যে) ঘরের বাহির করিয়া দিতেছে এবং তৈয়ারী সুযোগ্য পুত্রের উপার্জ্জন হইতে বঞ্চিত বৃদ্ধের যে দুর্দ্দশা সেই দুরবস্থা ভোগ করিতেছে।

পাট আজ পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীন দেশের অমূল্য সম্পদ্ (International wealth)। ইহা দ্বারা তাহাদের যে কত টাকা ও লোক খাটিতেছে তার অন্ত নাই এবং League of nations-এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। তাহারা পাটের ন্যায় সস্তা, শক্ত আঁশযুক্ত অন্য দ্রব্য আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না এবং কত মূল্যবান্ সুন্দর পোষাকে ও কাগজে এবং আসবাবপত্রে, বিছানায়, দেওয়ালে, দরজায়, কেবিনে, রাস্তার কার্য্যে, ছাদের কার্য্যে, প্যাকিং কার্য্যে সদা ব্যবহার করিয়া অসাধারণ ফল ভোগ করিতেছে।

বিদেশী সঙ্ঘবদ্ধ বণিক্‌গণ বহু মূল্যবান্ কলকারখানা ও বহু ট্যাক্স প্রদান করিয়া ও বহু লোকজন খাটাইয়াও যথেষ্ট আয় করিতেছে এবং নানা প্রকার নিয়মবদ্ধ Association দ্বারা দৃঢ় একতা-বন্ধনে কয়েকটী মাত্র খরিদ্দার কলওয়ালা (mill-owners) অসহায় একতা-বিহীন বিক্রেতা দরিদ্র কৃষকগণের বহুপরিশ্রমলব্ধ দামী পাটের মূল্য ইচ্ছামত কমাইয়া (উৎপন্ন খরচা না দিয়াও) তাদের রক্ত মোক্ষণ পূর্ব্বক প্রচুর লাভ করিতেছে—"(The cultivators or the primary sellers are absolutely unorganised and on the other hand, there are associations of millowners, bailers, shippers and others who have trading interest, are all very well-organised, thus they had been able to purchase jute @ Rs 2-8as per md against an estimated cost of production more than Rs 5/- Vide Report of the Bengal Jute Enquiry Committee—p 84)" খরিদ্দারের আদেশ-মত বিক্রেতা কোন দেশে কোন বস্তু বিক্রয় করে কি না জানি না, তবে এদেশের সবই উল্টা ও সবই সাজে, কারণ আমরা অবোধ, দরিদ্র, সঙ্ঘবদ্ধহীন পরাধীন ও পরমুখাপেক্ষী। এই পাট যদি আমেরিকা, ইউরোপে, জাপানে জন্মিত, তবে তাহারা ইহার নিয়ন্ত্রণ কত আইনের ও association দ্বারা কত ভাবে করিত এবং দেশকে যথার্থই 'রতনে মণ্ডিত' করিত! এইরূপ অত্যাবশ্যকীয়, বঙ্গের একচেটিয়া, ভগবানের দানের ব্যবহার এখনও তাহারা যে ভাবে করিয়া লাভবান্ হইতেছে তাহা ১৯৩৪ সনে সরকারী Jute Enquiry Report-এ দ্রষ্টব্য।

আমাদের দেশের কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি পাটের চাষ-নিয়ন্ত্রণ ও তন্মূল্য-নির্দ্ধারণ বিষয়ক আইন গবর্ণমেণ্ট

দ্বারা করাইবার প্রস্তাব করিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছেন; কারণ তাহাতে বিদেশী বণিক্‌গণের স্বার্থে আঘাত লাগিতে পারে। "That the Govenment of Bengal should introduce legislation for all dealings in jute, as has been done by the Govt. of America by passing the Cotton Standards Act." অর্থ-সঙ্কট সমস্যার নিবারণ-কল্পে অনেকে নানাপ্রকার জল্পনা কল্পনা করিতেছেন এবং নিজেরা অক্ষম দুর্ব্বল মনে করিয়া পরামুখাপেক্ষী হইয়াও, অনেক সময়ে হুজুগে ও পর-বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া পাট চাষ কমান বিষয়ক আইন আবশ্যক এবং ট্যাক্সের নাগপাশ ও মুদ্রার বাট্টার Ratio প্রভৃতি অন্যায় দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দ্দশার কারণ মনে করিয়া উহাদের রদ-বদলের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু বৃহৎ-কল-চালিত factory'র over-production দ্বারা যে সমস্ত দেশবাসীরই অকল্যাণ সাধিত হইতেছে তৎসম্বন্ধে কোন কোন মনীষী ব্যক্তি ঘোষণা করিলেও, ধনিক কলের মালিক তাহাতে কর্ণপাত করিতেছেন না, কারণ তাঁহারা তাঁদের লাভ বুঝেন।

সোণার বাংলার পাটের সঙ্গে আজ বিশ্ববাসীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হওয়ায় পাট সম্বন্ধে নানাপ্রকার গবেষণামূলক লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে ও হইতেছে এবং পাটের বদলে (substitute) অন্য সস্তা বস্তুর প্রবর্ত্তনের চেষ্টায় স্বাধীন রাষ্ট্র-সমূহে কত বিজ্ঞানবিৎ কত গবেষণা ও আবিষ্কার করিতেছেন ও গভর্ণমেণ্ট কত খরচ করিতেছেন তাহা দেখিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। এতদ্দেশেও পাট-রপ্তানী ট্যাক্স ধার্য্য করিয়া প্রতি বৎসর ৪ কোটী টাকা বা মণ প্রতি ৸৶০ আদায় করা হইতেছে। ইহা ছাড়া কলিকাতা Improvement Trust ও অন্যান্য দেশও যথেষ্ট টাকা আদায় করিতেছেন।

১৯২৫-২৬ সনে পাটের দাম অত্যন্ত বৃদ্ধি (২০।২৫৲ টাকা দর) পাইয়াছিল, তৎপর হইতে ক্রমে দাম কমিতেছে; কিন্তু পাট দ্বারা তৈয়ারী শিল্প-দ্রব্যের চাহিদা (demand) ক্রমেই বাড়িতেছে। এজন্য পাটের কল (mill) ও তাঁতের (looms) সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে—"The history of the industry till recent years has been one of continuous expansion, both in the number of mills and looms. (p 78)

শুধু **বঙ্গদেশের** (অন্যান্য দেশ ছাড়া) মিলের, তাঁতের, ছালা চটের ও সূতার রপ্তানীর হিসাব নিম্নে দিলাম—

বৎসর (এপ্রিল হইতে মার্চ্চ)	ছালা (Bags)	চট (Jute cloth) গজ Hessian (হেসিয়ান)	Sacking (স্যাকিং)	সূতা twists & yarn পাউণ্ড অর্দ্ধসের
১৯২৪-২৫	৪২,৫১,৪১,০০০	১৩৯,৭৪,২২০ ০	৬,১৮,৬৬০০০	১২,৬১০০
১৯২৫-২৬	৪২,৫০,৮৩,০০০	১৪০,০০,১৭০ ০	৬,১৩'৬৪০০০	১৭,২৪০০
১৯২৮-২৯	৪৯,৭৬,৮১,০০০	১৫০,৩১,২৩০ ০	৬,৪৯,৭১০০০	৪৮০১০০
১৯২৯-৩০	৫২,২২,৯১,০০০	১১৯,৮৮,৪১,০১০	৫৭,৬৪,২০০০	৬০,০৯০০

উপরোক্ত হিসাব দেখিলেই বুঝা যায়, গড়ে প্রায় ৫০ কোটী ছালা ও ২০০ কোটী গজ চট ও ৩০ লক্ষ সের সূতা রপ্তানী হয়। ছালাতে ১৪।১৫ কোটী টাকা, চটে প্রায় ১১০ কোটী টাকা ও সূতায় ৭।৮ লক্ষ টাকা কলওয়ালারা প্রাপ্ত হইতেছেন।

বঙ্গদেশে বর্ত্তমানে ৬০,৯১৪ খানা তাঁত (looms) ও ভারতের অন্য স্থানে মাত্র ১৪৯০ খানা তাঁত, একুনে ভারতবর্ষে ৬২ হাজার ৪ শত ৪ খানা খাটিতেছে। ইহা ছাড়া, জার্ম্মেনীতে ৯৬০০ তাঁত, আমেরিকায় ২৭৫০ খানা, গ্রেট ব্রিটেনে ৮৫০০, চীন ও জাপানে ১২০০ খানা, ফ্রান্সে ৭০০০ তাঁত, অন্য স্থানে ১৮০০ তাঁত; মোট ৪৫,৫৫৫ খানা তাঁত, সর্ব্বসমেত ভারতবর্ষকে লইয়া ১,০৭৯৫৯ খানা তাঁত চলিতেছে এবং উহাতে দৈনিক লক্ষ লক্ষ কুলী মজুর খাটিতেছে।

পৃথিবী ব্যাপিয়া পাট কিরূপ লাগে (Consumption)

	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭	
ভারতীয় মিল্	৫০৮০৬৪২৬	৫৪২৯১৬৪	৫৬০০০০০	বেইল
ভারতীয় স্থানীয় পরিমাণ	৫,০০০০০	৫০০০০০	৫০০০০০	"
ইউনাটেড কিংডাম (United kingdom)	১০,০০০০০	৯৫০০০০	১০০০০০০	
আমেরিকা	৬৫০০০০	৬০০০০০	৭০০০০০	"
মহাদেশিক (Continental)	২০০০০০০	২২০০০০০	২৪০০০০০	"

১৯৩০-৩১ সনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ৬১১ হাজার বেইল ও ১৯৩১-৩২ সনে ৮৮৫ হাজার বেইল কাঁচা পাট রপ্তানী এবং অন্যান্য দেশে ছালা যথাক্রমে ৮০৯ লক্ষ ও ৮৩৯ লক্ষ বেইল রপ্তানী হয়। উপরোক্ত হিসাব দৃষ্টে বুঝা যায় যে পৃথিবীতে পাটের চাহিদা ক্রমেই বাড়িয়াছে। বেইলে ৫ মণ হয়। গড়ে প্রতি বৎসর এতদ্দেশে ২৩ কোটী মণ পাট উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে শতকরা ৬০ মণ ভারতের বিদেশী কলওয়ালাগণ লন এবং শতকরা ৪০ মণ ভারতের বাইরে অন্যান্য দেশে রপ্তানী হইয়া যাইতেছে। এর মধ্যে ময়মনসিংহ জেলাতেই প্রায় ½ অর্থাৎ ১ কোটী মণ পাট জন্মে, এই জেলায় অর্দ্ধ কোটী লোকের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০ জন কৃষক। বঙ্গদেশে মাত্র ৪ লক্ষ ব্যক্তি চাকুরীজীবী। তা'ছাড়া কিছু ব্যবসায়ী, তদ্ভিন্ন প্রায় ৭৬ জন কৃষি-ব্যবসায়ী।

পাটের নির্ম্মিত দ্রব্যের চাহিদা পৃথিবী জুড়িয়া কেন বাড়িতেছে, তৎসম্বন্ধে Jute Enquiry Committee Reportএ উল্লেখ আছে যে—"The fibre is used in manufacturing shirtings, curtains, carpets, tarpuline, rugs particularly in European countries and America. It is also blended with wool and silk and for manufacturing imitation silk fabrics as well. The coarser qualities are used in cordage (দড়ি) and papers are made of rejection. Jute furnishing fabrics are largely used for decoration of steamer cabins and house-decorations. Jute cuttings and rejections are also used in roads in Germany and America."

ইহা ছাড়া, মোটর গাড়ীতে, টেলিগ্রাফ বিভাগে, টেলিফোন বিভাগে, ইজিচেয়ার, ক্যাম্প-খাটে যে কিরূপ খরচ হইতেছে নিম্নে উহারও হিসাব সংক্ষেপে কিছু দেওয়া গেল। একখানা প্রাইভেট মোটর গাড়ীতে চট ৭ বর্গ-গজ এবং মোটর-বাসে ৫০-১০০ বর্গ গজ চট লাগে। প্রতি বৎসর প্রায় ৫০।৬০ লক্ষ মোটর গাড়ী তৈয়ারী হইতেছে। "In each motor (private) car 7 sq. yds of jute cloth are used, the world's production of private motor cars amounts to between 3 and 5 millions, for motor buses (for coaches) require 50 to 100 sq. yds according to whether they are built with single or double decks." বুঝুন, কত চট দরকার!

বৎসরে লক্ষ লক্ষ ইজি চেয়ার, ক্যাম্প-খাট ও বিছানার পাতক্ষি তৈয়ারী হইতেছে। একখানা ইজি চেয়ার ছাইতে ৬।৮ বর্গগজ চট লাগে। "Millions of such chairs are being turned out each year."

"Jute in the cable industry"—টেলিগ্রাফ-বিভাগে প্যাকিং ও ঢাকুনীর (covering) জন্য ১৯৩১ সনে ইংলণ্ডে ১৫,০০০ হাজার টন্ চট (১ টনে—২৭ মণ হয়) এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে ৫০ হাজার হইতে লক্ষ টন্ লাগিয়াছিল। টেলিফোনেও যথেষ্ট চাহিদা আছে। পাট রং করিয়া এবং উহাতে সুন্দর রং ফলে বলিয়া উহারও আদর ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে—"Fine jute yarns have a very beautiful lustre after dyeing, which is a great advantage over other materials, as cotton for example, which has to be specially mercerised in order to obtain such a sheen."

চটের দ্বারা প্যাকিং ও ছালা দ্বারা গম, চিনি, বালি, ধান ইত্যাদির সরবরাহ সর্ব্বত্র সদা সকলেরই চক্ষের উপর যথেষ্ট হইতেছে। এখনও একখানা নূতন ছালার দর ।০-।৴০ আনা ও সাধারণতঃ চট ও ১ গজ এখনও ॥৴০-॥৵০ দরে বিক্রয় হয়—সওয়া সের পাট দ্বারা ১ খানা ছালা ও আধ সের পাট দ্বারা ১ গজ সাধারণ চট তৈয়ারী হয়। তাহতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, খারাপ পাট ও মোটা সূতা দ্বারা ছালা চট বিক্রয় করিয়াই চতুর্গুণ লাভ কলওয়ালাগণ করিতেছেন। ইহা ভিন্ন চিকণ সূতা ও রং-করা দ্রব্য দ্বারা ১ মণ পাটে এখনও তাঁহারা শতগুণ লাভ করিতেছেন। চোখের উপর আলপাকা শাড়ীতে

১ পোয়া পাটের দ্বারাই তাঁরা ২।৩৲ টাকা পাইতেছেন। এই পাট এবং ইহার সহিত সংস্পৃষ্ট ব্যবসা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং ইহাতেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লোকও টাকা খাটিতেছে। আমরা বাঙ্গালী বৎসরে কাঁচা পাটের দাম এখন ১৫-১৬ কোটী টাকা (গড়ে ৩৲ টাকা মণ) পাইতেছি ; আর পৃথিবী জুড়িয়া অন্যান্য মুষ্টিমেয় ধনিক প্রায় হাজার কোটী টাকা খাটাইতেছেন ও কোটী কোটী টাকা লাভ করিতেছেন, এবং পাটের চাহিদা-বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও দাম কমাইবার উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবদ্ধ-হীন গরীব কৃষকদের সর্ব্বনাশ নানাভাবে সাধন করিতেছেন। ধনিক সম্প্রদায়ের হস্তে এখনও পৃথিবীর শাসন ও শোষণ চলায় বিশ্ববাসী শতকরা ৭৫ জনের অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। যন্ত্রযুগের ক্ষতিতে এখন ব্যষ্টির দুঃখ—উহা দূর করিতে হইলে গৃহে গৃহে হস্তচালিত তাঁত ও যন্ত্রের দ্বারা কুটীর-শিল্পের প্রবর্ত্তন আবশ্যক। জাপানের সমৃদ্ধির কারণ সেথায় ছোট ছোট যন্ত্রদ্বারা (অর্থাৎ বৃহৎ আকারের mill ও factory দ্বারা নহে) মোজা গেঞ্জি, দিয়াবাতি, সাবান, খেলনা, জুতা, নকল রেশম প্রভৃতি প্রায় ঘরে ঘরে তৈয়ারী হইতেছে ও অবকাশ সময়েও কাজ চলিতেছে ; তাই সস্তায় বিক্রয় করিয়াও লাভ করিতেছে বহু লোক। ভারতের অর্থসঙ্কটের আরও একটী কারণ, মুদ্রার Ratio (অনুপাত) ১ শিলিং ৬ পেন্স হওয়া এবং উহার জন্য কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য দ্বিগুণ হওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু তাহা না হইয়া ক্রমে ⅓ সিকিতে পৌছিয়াছে—কাজেই ভারতীয় লোকের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্ট। এতৎসম্বন্ধে Jute Enquiry Report দ্রষ্টব্য। সংক্ষেপে উহার মর্ম্ম এইরূপ, যে কৃত্রিম উপায়ে টাকার মূল্য ভারতীয় চলিত মুদ্রাবিভাগে বৃদ্ধি পাওয়াতে, অর্থ-সঙ্কট-বৃদ্ধি ও পাটের মূল্য-হ্রাস হইয়াছে। বাংলাদেশের কৃষিজাত দ্রব্যের বাজার-মূল্য ৭২ কোটী টাকা হইতে ৩২ কোটী টাকায় নামিয়াছে অথচ কৃষকদের স্থায়ী দেনার পরিমাণ ২৮ কোটী টাকা রহিয়াই গিয়াছে। এজন্য কৃষি-দ্রব্যের মূল্য দ্বিগুণ হওয়া একান্ত আবশ্যক ; কিন্তু তাহা না হইয়া ক্রমে কমিয়া কৃষকের ও অন্যান্যের এত দুর্দ্দশা! "The artificial over-valuation of the Rupee, in the ratio of 1s-6d. in the circulation of currency in India had the effect of further depressing the price level.

The fact that the value of marketable crops of the agriculturists in Bengal has dropped to about Rs. 32 crores from an average of about Rs. 72 croros, while the fixed monetary liabilities of the agriculturists continue at about Rs. 28 crores, demonstrates the *immediate necessity* of the prices of agricultural commodities being *doubled* in the interest of all sections of the people including Zemindars, Mahajans." বাঙ্গালার কৃষকদের ঋণ প্রায় ১০০ কোটি টাকা (Banking Enquiry Report)। মহাত্মা গান্ধী মুদ্রার Ratio এজন্য 1s-2d. ১শিলিং ২ পেন্স করার দাবী করেন। বাট্টায় দেশের ক্ষতি কত !

প্রতিকারের প্রস্তাব—সঙ্ঘবদ্ধতা ও আত্মশক্তি।

(ক) প্রত্যেক গ্রামের শিক্ষিত, জমিদার বা জোত-দার, মহাজন ও ধনী ব্যক্তিগণ যাহাতে কৃষকগণ কাঁচা পাট বিক্রয় না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে তদ্দ্বারা ছালা চট বুনানী করিয়া উহা বিক্রয় করে ও তাহাতে অধিক লাভ হয় তাহা বুঝাইয়া দেন এবং ছালা চট তৈয়ারী শিক্ষা গ্রামে গ্রামে প্রবর্ত্তন করিতে পারেন, তার চেষ্টা দৃঢ়ভাবে অধ্যবসায় সহকারে করিবেন।

[হুগলী জেলায় শ্রীরামপুর সরকারী বয়ন বিদ্যালয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে জানাইয়াছিলেন, যে একজন যুবক এক মাসে তথায় উহা শিখিতে পারেন এবং চরখা, তাঁত ও Heckling machine or Frame (পাট আঁচড়াবার ফ্রেম)—এই সমস্তের দাম ২৫।২৬৲ টাকা হইলেই হইতে পারে।]

(খ) প্রথমতঃ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড বা ইউনিয়ন বোর্ড দ্বারা প্রত্যেক গ্রাম হইতে বা প্রত্যেক পাঠশালা বা মোক্তব হইতে ১টী ছাত্রকে বা শিক্ষককে শ্রীরামপুরে যাইয়া উহা শিখাইয়া আনার ব্যবস্থা ও

তৎসঙ্গে ছালা চট বুনানীর তাঁত ও চরকা ১ সেট লইয়া আসার ব্যবস্থা করিয়া উহা স্কুলে স্কুলে প্রবর্ত্তনের চেষ্টা। ইহা ভিন্ন যদি কংগ্রেসওয়ালাগণ এই গঠনমূলক কার্য্যে যোগ দেন ভাল।

(গ) কলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া হস্তচালিত (Hand-loom) তাঁত আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না, এই কথা অনেকে বলিয়া থাকেন, তদুত্তরে আমার কথা এই যে, —পাটের চাষীদের **পাট কিনিতেই হইবে না,** আর কলওয়ালাদের কত টাকা **পাট খরিদ** করিতে ব্যয় হয়—তার establishment charge ও কমিশন ও গাড়ীভাড়া দিতে তাঁহারা ১ মণ পাট ৩।৪৲ টাকায় খরিদ করিলেও আনুষঙ্গিক আরও ৪৲ প্রায় অন্যভাবে ব্যয় লাগে, আর যে সব কৃষক বা জোতদার পাট পায় তাদের উহা কিছুই লাগে না—নিজের জিনিষ, ঘরে বসিয়া ছেলেমেয়ে স্ত্রী-পুরুষে প্রত্যেকে অবকাশ সময়ে খাটিয়াও কত ছালা চট বুনানী করিতে পারে—কৃষকদের সঙ্গে তাই অন্যে কেমন করিয়া **দ্রব্য মূল্য দ্বারা** খরিদ করিয়া আঁটিয়া উঠিবে, বুঝি না! কলওয়ালাগণের এক মণ পাটের দাম গড়ে প্রায় একপ্রকার ৮৲ টাকা পড়ে অর্থাৎ সের প্রতি ৵৫ আনা; কাজেই ছালা চটের সেরও তাঁহারা ৶০ আনায় কখনও দিতে পারেন না, কিন্তু কৃষক তাহা পারে।

(ঘ) অধিকাংশ কৃষক গরীব, পেটের ক্ষুধার জ্বালায় যা দাম পায় তাহাই লইতে বাধ্য হয়, বেশী দামের **অপেক্ষা** করিতে পারে না, এ অভিযোগও সত্য। ইহার প্রতিকার করার উপায় কি? কৃষকগণের মধ্যে শতকরা ৪০ জন কতক দিন পাট বিক্রয় না করিয়াও উহা ধারয়া রাখিতে পারে, এরূপ অবস্থাপন্ন আছে; কিন্তু তাহারাও ঐ "পেট-খাইকা" (needy) গরীব কৃষকদের ছটফটির জন্যই পাটের দাম উঠাইতে না পারিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। আমার বিবেচনায়, গরীব কৃষকগণ যাহাতে সংসার চালাইবার জন্য সময়ে সময়ে দুই চারি টাকা হাওলাৎ লইতে পারে ও পাট বিক্রয় না করিয়াও তাড়াতাড়ি ছালা-চট বুনানী করিয়া উহা বিক্রয় করিতে পারে তার ব্যবস্থা গ্রামের মহাজন ও ধনী কৃষকগণ করিয়া দিতে পারেন, তবেই সকলের লাভ।

(ঙ) অনেকে বলেন, ছালা-চট-বিক্রয়ের বাজার কোথায়? তদুত্তরে আমার নিবেদন, কাঁচা পাট যেমন বিদেশী বণিক্‌গণ বা মাড়োয়ারী ধনী দালালগণ (Brokers) বাজার হইতে লইয়া যায়—তেমনি ছালা-চটের চাহিদা যখন পৃথিবী জুড়িয়াই আছে, তখন কাঁচা পাট না পাইলে বাধ্য হইয়া উহারাই গৃহস্থের বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিয়া ছালা চট উচিত মূল্য দিয়া লইতে বাধ্য হইবেন—উহা তো পচা জিনিষও নহে যে চট্‌ করিয়াই নষ্ট হইয়া যাইবে। শ্রীরামপুরের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লিখিয়াছিলেন যে, ছালা চট তৈয়ারী অতি সহজ ও দৈনিক গড়ে ২।৩ খানা হইতে পারে, মায় সূতাকাটা লইয়া। তাহা হইলেও বুঝা যায়, যে যদি ৴২ সের পাট দ্বারা ১ গজ চট ও ১ খানা ছালা দৈনিক হয়, তবে উহার মূল্যে গড়ে ৮০ আনা দৈনিক উপার্জ্জন হইতে এখনও পারে। আর এখন সে স্থলে ৴২ সের পাটের দাম ৵৫—৶১০ দশ পয়সায় ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। রং-করা আসন-গালিচায় আরও বেশী লাভ হইবে। Jute-spinning-wheel দ্বারা দৈনিক ৴৫।৴৬ সের পর্য্যন্ত সূতা কাটা যাইতে পারে।

(চ) অনেকে বলেন, জমিদারের খাজনার ও মহাজনের সুদের চোটে পাট কৃষক রাখিতে পারে না—যদি ছালা চট-বুনানীর কাজ আরম্ভ করা যায়, তবে জমিদার মহাজন কেন আর বোকার মত বেশী তাগিদ দিবেন, কয় দিন অপেক্ষা করিলেই ছালা-চটের দাম দ্বারা কৃষক সহজে উহাদের দেনা শোধ করিতে পারিবে বুঝিয়া নিরস্ত থাকিবেন।

(ছ) পথহারা সর্ব্বহারা গরীব কৃষকগণ যদি এখনও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া গ্রামেও স্বার্থত্যাগী, চরিত্রবান্, কর্ম্মঠ শিক্ষিত ও ধনীদের বুদ্ধি ও টাকা দ্বারা চালিত হন, তবে এদেশ আবার সোণার কেন 'রতনের' বাংলায় পরিণত হইতে পারে। চরিত্রবান্ শ্রমিক, ধনিক ও শিক্ষিতের (Brain, labour, capital) সম্মিলিত চেষ্টা দ্বারাই কলওয়ালাদের লাভ ও প্রাধান্য নষ্ট করা যাইবে—অন্য পন্থা নাই।

অনেকের ভ্রম ধারণা আছে, যে যুদ্ধের পূর্ব্বে ও যুদ্ধ লাগিলে পাটের দর বৃদ্ধি পায়; কিন্তু তাহা বাস্তবিক সত্য নয়। কি কারণে যে পাটের দামের হ্রাস বৃদ্ধি হয় তাহা বুঝা

মুস্কিল ; তবে সঙ্ঘবদ্ধ কলওয়ালাগণ যে কয়েক বৎসর যাবৎ বেশ চতুর থাকিয়া লাভবান্ হওয়ার চেষ্টায় আছেন তাহা নিম্নলিখিত উক্তি ও হিসাব দৃষ্টে বুঝা যায়। আমি বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব বৎসর ১৯১৩ সন হইতে ১৯৩২ সন পর্য্যন্ত পাটের (মণ-করা) দাম দিলাম। ১৯১৩ সনে ১৫॥৵০ মণ, ১৯১৪ সনে যুদ্ধারম্ভে ১৫॥০ মণ, ১৯১৫ সনে ১০।৶০ আনা, ১৯১৬ সনে ১৩।৶০ আনা, ১১৯৭ সনে ১১৵০ আনা, ১৯১৮ সনে যুদ্ধ শেষে ১৪।১০ গণ্ডা, ১৯১৯ সনে ২০।৶০, ১৯২৩ সনে ১৩॥৵১০ আনা, ১৯২৫ সনে ২২।৵০ (উচ্চতম), ১৯২৮-২৯ সনে ১৪।১৫৲, ১৯৩০ সনে ১০৲ ১৯৩১-৩২ সনে ৪।৫৲ টাকা। উপরোক্ত হিসাব দৃষ্টে বুঝা যায়, যে কলওয়ালাগণ তাঁদের সুবিধা ও ইচ্ছামত দামের হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। অনেকে পাটের দাম কম হইবার কারণ পৃথিবীর অর্থসঙ্কট (world-depression) এবং বেশী উৎপাদন হওয়া (ক্ষেতে, নয় কলে) (over-production) মনে করেন, কিন্তু সেটা ঠিক নহে। কারণ অন্যান্য কৃষি-জাত দ্রব্যের মূল্যও তেমনি কমিয়া যাইতে বাধ্য হইত, বরং একচেটিয়া পাটের দাম বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক ছিল, —"Though the world-depression has been a common factor affecting prices in general, the price of jute in particular has been much more acutely depressed than the price of other agricultural staples in India, for it would have been more natural to expect a contrary result, having regard to the monopoly condition of jute." 'Though the stock of heavy goods is slightly larger at the moment (1933) than what it was in 1931, jute manufacturers (organised as they are) have been able to carry on much better than the cultivators.' ১৯৩৩ সনের (ছালা চটাদি) ১৯৩১ সনের চেয়ে বেশী stock আমানত থাকিলেও, কৃষকদের চেয়ে কলওয়ালা-গণ ঢের বেশী ভাল ভাবে ব্যবসা চালাইয়াছেন (৮৬-৮৭ পৃষ্ঠা)।

নিম্নে ভারতীয় কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য (১৯১৪ = ১০০ ধরিয়া)

	কাঁচা পাট	ছালা চটাদি	তুলা	বস্ত্রাদি	গম ভুট্টাদি (cereals)	ডাইল	চা	সরিষা
১৯৩০ সন	৬৩	৮৮	৯১	১৩৯	১০০	১১০	১১৪	১২৭
১৯৩১ সন	৪৯	৭৬	৮৩	১২৩	৭৮	৮৯	৮৬	৮২
১৯৩২ সন	৪৫	৭৫	৯২	১১৯	৬৮	৯২	৬১	৭৬

কলে stock থাকা সত্ত্বেও অবস্থা ভাল। এবং যদি লোকসানই হইত, তবে দিন দিন কলের সংখ্যা বাড়িত না এবং পাটও কেহ খরিদ করিত না। চাহিদা (demand) ও লাভের (profit) জন্যই প্রায় কোটী টাকা খরচে Mill ক্রমেই খুলিতেছে অথচ বাহিরে শুনা যায়, পাটের দরকার নাই, বহু মজুত আছে, ইহা দাম কমাইবার চেষ্টা। শুধু বঙ্গদেশেই ১৯২০ ও ১৯২১ সনে ৭২টী Mill কল ছিল ; উহা ১৯২৫-২৬ সনে ৮৫ এবং ১৯২৯ সনে ৮৭, ১৯৩০ সনে ৮৯ এবং ১৯৩৩ সনে ৯৪ হইয়াছে।

পৃথিবী জুড়িয়া পাট-শিল্পের আবশ্যক, অথচ পাট বঙ্গদেশেই শুধু হয়; হায় হায়, তথাপি বাঙ্গালী নিরন্ন—বুদ্ধি, নেতা ও একতার অভাবে! এদেশের জোলা, যুগী, তাঁতি এখনও তুলার সুতা কিনিয়াও অনেকে বাঁচিয়া আছে (টাঙ্গাইল নাগরপুরের চৈতন্য ফ্যাক্‌টারীতে এখনও আদর্শ বস্ত্র বুনানী হয়) এবং কাপালিগণ পাট খরিদ করিয়াও, ছালা বুনানী ও বিক্রয় দ্বারা এখনও অশ্বচ্ছল অবস্থায় সাটুরিয়া, মাণিকগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে বাঁচিয়া আছে। রংপুর-নীলফামারীতেও পাটের দ্বারা রং করা আসন গালিচাদি বুনানী করিয়া বহু লোক বেশ উপার্জ্জন করিতেছে। ঐ রকম দিনাজপুরেও সুতা কিনিয়া ও রং করিয়া পাতকি তৈয়ার করা হইতেছে। আর যাদের (প্রায় শতকরা ৭৫ জনের) পাট খরিদ করিতে হইবে না, তাহারা কেন সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ছালাচট বুনানী করিলে, কলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না, বুঝি না! আমার বিশ্বাস, যাদের নিজের পাট আছে, তাহারা জমিহীন কৃষক বা অন্যান্য বেকার কর্ম্মহীন লোক-দিগকে মজুরী দিয়াও ছালা-চটের বিক্রয় দ্বারা কলওয়ালাকে পরাস্ত করিতে পারিবে—কারণ কলওয়ালাদের প্রথম পাটের মূল্য, তৎপরে তাহা অন্যত্র লওয়ার খরচ, তৎপরে

establishment সরঞ্জামী খরচ, পরে টাকা খাটাবার (investmentএর) charge, তারপর কুলী ও বাবুর খরচা প্রভৃতিতেও কম টাকা লাগে না—অথচ কৃষক ঘরের জিনিষে, নিজে খাটিয়া বা অন্য বেকারকে খাটাইয়া নিশ্চয়ই লাভবান্ হইবে। পাটের কৃষকই বেকার-সমস্যা solve করিতে সমর্থ। এমন কি, পাটের সুতা খরিদ করিয়াও তাহারা বেশী লাভবান্ হইতে পারে। ছালা চটের দ্বারা পাট চাষিগণ হয়ত অনেকে ২০।২৫৲ টাকা সংগ্রহ করিয়া jute spinning-wheel (চরখা) ও jute-weaving তাঁত ও অন্যান্য আসবাব খরিদ করিতে অসমর্থ হইতে পারে; এজন্য গ্রামের ধনী মহাজন, জমিদার, তালুকদার ও শিক্ষিতে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া, লম্বা কিস্তিবন্দীতে, অল্প সুদে ঐ চরকা তাঁত কেনার সাহায্য বা কর্জ্জ দিয়া উহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেই এবং বুনানীর শিক্ষা দিলে ও গরীব গৃহস্থদের ঠেকা চালানের ব্যবস্থা করিলে এদেশ আবার হীরক-রচিত "Diamond Ind of Milton" হইতে পারে (পূর্ব্বে কুটীর-শিল্পেই ভারত ধনী ছিল)।

(জ) সঙ্ঘবদ্ধ বিদেশী কলওয়ালাগণকে পরাস্ত করিতে হইলে এদেশবাসীকেও সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। "Unity is strength", একতার জয় নিশ্চয়। বুদ্ধিমান্ অধ্যবসায়ী শ্রমিকের অন্নাভাব হইতে পারে না। কৃষকগণ একতাবিহীন ও অবোধ; তাই এত কষ্ট। তাহারা একবার সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া গ্রামে গ্রামে ফসলের মরসুমের সময়ে মণ-করা পাট /৩।/৪ এবং ধান্যাদি অন্যান্য ফসলও /২।/৩ সের গ্রামের "ধর্ম্মগোলায়" স্থাপন দ্বারা এবং সামাজিক ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া ও মাসের বা সপ্তাহের মধ্যে একদিন মৎস্য মাংসের ব্যয় কমাইয়া বা অন্যভাবে টাকা সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিতে পারে। তিল কুড়াইয়াই তাল হয়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাঁচা পাট রপ্তানী না করিয়া ছালা চট বুনানীর কাজ আরম্ভ হইলেই দেখিবেন, কলওয়ালাগণ ঐ সমুদায় গ্রাম্য organisation ভাঙ্গার জন্য কত ফন্দী করিবেন। কারণ তাঁদের যে সর্ব্বনাশ হইবে ও কোটী কোটী টাকার কল কারখানা ফেইল (fail) পড়িবে ও তাঁদের যে কত লোক বেকার হইয়া পড়িবে! আমার বিশ্বাস, ছালা চটের কাজ কৃষকগণ আরম্ভ করিলে উহা নষ্ট করিবার জন্য কলওয়ালাগণ গোয়ালার ন্যায় ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিবেন, অর্থাৎ পাট আবার ১৫৲, ১৬৲ টাকা মণ দরে খরিদ আরম্ভ করিবেন, কারণ তাঁদের তাহাতেও লোকসান হইবে না—ছালা চটের দাম চড়াইয়া লাভ করিবেন—যেমন গোয়ালা দুধ বেশী দামে খরিদ করিয়া দৈ, ঘিএর দাম চড়াইয়া লাভ করে—অর্থাৎ Rob Peter to pay Paul 'গরু মেরে, জুতা দান!' মুষ্টিমেয় ধনিক বণিকদের হাত হইতে যদি শতকরা ৮০ জন শ্রমিক কৃষকগণকে রক্ষা করিতে চাহি, তবে গ্রামে গ্রামে স্কুলেই ছালা চট তৈয়ারীর শিক্ষা-প্রবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে তো একাজ অতি সহজ; তাহা না করিলেও বেকার-সমস্যা ও অর্থ-সমস্যার সমাধানকল্পে দেশবাসীর ইহাই একমাত্র প্রশস্ত পথ। ধনিক বণিকগণ "ফাঁকি দিয়া টাকা মারেন ক'রে চালাকী" —কারণ সব দেশেই তাঁদের হাতে শাসনের ও শোষণের যন্ত্র বিদ্যমান। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে—"খাইটা মরে হাইলা চাষা, শুঁড়ীর ঘরে লক্ষ্মীর বাসা"!

কৃষক, শিল্পী হও। আমরা শুধু 'consumers of manufactured articles'—যাহা বিনা পয়সায় আয়াসমত একটু খাটিয়া তৈয়ারী করিতে পারি, তাহাই বোকার মত দশগুণ মূল্যে খরিদ করি। সেজন্যই তো ভারতের বাজার দখল করার জন্য বিদেশী বণিকদের তপস্যা ও সিদ্ধি! কাঁচা মাল সস্তায় রপ্তানী, আবার তাহাই শিল্প-দ্রব্যে দশগুণ মূল্যে আমদানীতেই ভারত আজ দরিদ্রতম। কবে আবার কুটীর-শিল্পের প্রাধান্যে ঘরে ঘরে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত নরনারীগণের আনন্দময় নৃত্যগীতে ভারত মুখরিত হইবে।
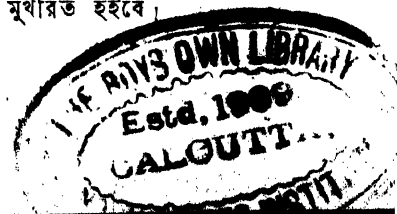
নবনুর

(উপন্যাস)

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পুরীতে পৌঁছে দুজনে ইংরেজী হোটেলে বাসা নিলে। পাণ্ডাদের কাছে খবর নিয়ে জানলে যে অহিন্দুর মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ। রণজিৎ ত চ'টেই অস্থির, "এই জগন্নাথের মাহাত্ম্য! এই নিয়ে ভবেশ আমাদের এত বড়াই করে! চল ফিরে যাই কলকাতায়।"

আহমদ বললে, "তা হতে পারে না, ভাই। মন্দির না দেখে ফিরে যাব না। নাই বা যেতে দিলে মূর্ত্তির কাছে। আমি ত আর মূর্ত্তি-পূজা করতে আসি নেই।"

পরদিন সকালবেলা স্নান করে' ধুতি পরে' দুজনে এক স্থানীয় ডেপুটী বাবুর সঙ্গে জগন্নাথ মন্দিরে গেল। সিংহ-দ্বারে কোন বাধা পেলে না। ভেতরে গিয়ে ঘুরে ফিরে চারিদিক্ দেখতে লাগ্‌ল। লোকে লোকারণ্য। চারিদিকে ভিখারীদের ঘেনর-ঘেনর, যাত্রীদের গজর গজর, ছেলে-পিলের কাঁদাকাটি। পাণ্ডারা এক একটা যাত্রীকে ধরে' টানাটানি করছে, কাকে যেমন একটা মরা ইঁদুর নিয়ে ছেঁড়া-ছেঁড়ি করে।

ঘুরে ফিরে তিনজনে যখন গরুড়স্তম্ভের কাছাকাছি এল, রণজিৎ বন্ধুকে বললে, "এইখানে বসে' মন্দিরের দরজার পানে চেয়ে চৈতন্যদেবের ভাবাবেশ হয়েছিল। আমি ত কই কোন শান্তিই পাচ্ছি না!"

আহমদ বললে, "রণজিৎ, তোমার-আমার জীবনের ট্র্যাজেডিই ঐখানে। সহজ সুখ শান্তি আমাদের নসীবে লেখা নেই। এত দিন যে কেবল লম্বা লম্বা কথা কয়েই কাটিয়েছি। আচ্ছা ভাই, ঐ যে অত লোক ওখানে রোদে বসে' রয়েছে, ওরা কারা? কাতর কণ্ঠে কি বলছে?"

রণজিৎ দেখলে, যে প্রায় শ'খানেক স্ত্রীলোক ও ছোট ছেলে মেয়ে বসে বসে চীৎকার করছে, "দ্বার খোল, বাবা! একবার জগবন্ধুকে দেখব। সকাল থেকে মুখে জল দিই নেই। দয়া কর, বাবা!"

মন্দিরের সদর দরজা বন্ধ। রণজিৎ তার সঙ্গের পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করলে, "ঠাকুরের দ্বার বন্ধ কেন?"

সে উত্তর দিলে, "বাবু, ভোগের জন্য মন্দির ধোয়া হয়েছে, তাই বন্ধ। ভোগ হয়ে গেলেই দরজা খুলে দেবে। তখন সবাই ঢুকতে পাবে।"

এরা দুই বন্ধুই বড়লোক। ইংরেজী হোটেল থেকে আসছে, সঙ্গে ডেপুটী বাবু, আগে আগে পুরীর মহারাজের সেপাই, এদের দেখে পাণ্ডা মহলে একটা সাজ-সাজ ডাক পড়ে গেছল। জগবন্ধুর দ্বারও আপনা থেকে খুলে গেল। বেশ হৃষ্টপুষ্ট একটী পাণ্ডা মহারাজ এগিয়ে এসে সম্বর্দ্ধনা করলেন, "আসুন রাজাবাবুরা, আসুন। দেব-দর্শন করবেন।"

রণজিৎ আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে, "দেবতার ভোগ হয়ে গেছে?"

পাণ্ডা বললে, "আজ্ঞে না, এখনও হয় নেই। তাতে কি আসে যায়, রাজাবাবু? আপনারা পদার্পণ করুন।"

কথা শুনে রণজিতের সমস্ত শরীরটা কি রকম করতে লাগ্‌ল। কোন রকমে নিজেকে সংযত করে' জিজ্ঞাসা করলে, 'ঐ যাত্রীদের রোদে বসিয়ে রেখেছ কেন, ঠাকুর?"

পাণ্ডা হেসে বললে, "ওরা! ওরা ত রোজই ঐ রকম বসে' থাকে ভোগ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত। জগন্নাথ ওদের ভক্তির পরীক্ষা করছেন, হুজুর।"

রণজিৎ আর ভদ্রতা রক্ষা করতে পারলে না। চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "আমাদের পদধূলি বুঝি দেবতার চক্ষে মহা পবিত্র

জিনিস! আমরা ঢুকলে তাঁর ভোগের কোন হানি হবে না!"

পাণ্ডা তখনও হাসছে। উত্তর দিলে, "কি যে বলেন, রাজাবাবু! ভোগের আগে মন্দির আবার ধোয়াব! কতক্ষণ লাগবে!"

আহমদ সঙ্কোচ করে' একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। তাকে ডেকে পাণ্ডাদের শুনিয়ে শুনিয়ে রণজিৎ বললে, "দূরে দাঁড়িয়ে কেন, ভাই? এখানে ত দেখছি সব রূপিয়ার খেল। এস, ভেতরে যাওয়া যাক।"

পাণ্ডাকে অবজ্ঞাভরে জিজ্ঞাসা করলে, "বুঝতে পারছ ত সব, পাণ্ডাজী! আহমদ সাহেবকে ভেতরে নিয়ে যেতে কত টাকা দর্শনী লাগবে?"

পাণ্ডা মহারাজ রণজিতের কাণের কাছে মুখ নিয়ে বললে, "রাজাবাবু চুপচাপ ভেতরে চ'লে যান। হাকীম সঙ্গে রয়েছেন। নাম বলাবলির দরকার কি? দুটো গিনি দিয়ে প্রণাম করবেন, তাহলেই হবে।"

রণজিৎ দুটো গিনি ঝণাৎ ক'রে পাথরের মেজের উপর ফেলে দিয়ে বললে, "এই নাও, বামুন, তোমার গিনি। প্রণাম আর জন্মে পারি ত করব।"

ডেপুটীবাবুর দিকে ফিরে বললে, "এই-ত হিন্দুর এত সাধের জগন্নাথ ক্ষেত্র, মহাশয়!"

হাকীম-বাবু cynic। একটু হেসে উত্তর দিলেন, "সব জায়গাতেই এই, মহাশয়। বরঞ্চ আমাদের পুরী ত পদে আছে। একবার গিয়ে কাশীধাম দেখে আসবেন। আমার ত কিছু জানতে বাকী নেই! পঁচিশ বছর ডেপুটিগিরি করছি।"

রণজিৎ হাসতে পারলে না। মাথা হেঁট করে' জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি বহুদর্শী লোক, বয়োজ্যেষ্ঠ, দয়া করে' আমাকে বলুন এ ধর্ম্ম থাকার কি আর কোন প্রয়োজন আছে?"

হাকীম বাবু আবার cynicএর হাসি হেসে উত্তর দিলেন, "হিন্দুর ধর্ম্ম কি এই সব তীর্থস্থানে, মহাশয়! সে পদার্থ মানুষের মনে থাকে, ভাই, বাহিরে নয়।"

রণজিৎ বললে, "সে কথা ত সকলের বেলাই খাটে, মহাশয়! ভগবান আমার মনেও আছেন, আহমদের মনেও আছেন, তফাৎ কি?"

"তফাৎ কিছুই না, মহাশয়। তাঁর ত আর জাত নেই! থাকবার বাড়ীরও দরকার নেই!"

ডেপুটী সাহেব 'গুড-বাই' করে' চলে' গেলে পর রণজিৎ বললে, "আহমদ ভাই, মনটা খারাপ হয়ে গেল। খুব বড় বুক করে তোমাকে জগন্নাথ মন্দিরে এনেছিলাম।"

আহমদ বন্ধুর পিঠে হাত রেখে বললে, "তোমার দুঃখ করবার কিছুই নেই। হাকীম সাহেব ত বললেন যে জগন্নাথের জাত নেই, ঘর বাড়ী নেই। পাণ্ডায় তার গৌরবের কি হানি করবে!"

রণজিৎ কেমন মুষড়ে পড়েছিল। হিন্দুর ধর্ম্মমন্দিরে কি এমন কিছুই নেই, যা সে বন্ধুকে দেখাতে পারে! ম্লান মুখে বললে, "বন্ধু, এখানে উদ্দীপনা কিছুই পাওয়া গেল না। চল, আমাদের কাজ আরম্ভ করা যাক।"

পুরী ষ্টেশনে এদের গাড়ীতে উঠলেন একটী বয়স্ক গেরুয়া-পরা বাবাজী। তাঁকে বিদায় দিতে প্লাটফরমে অনেকগুলি লোক এসেছিলেন। ট্রেন যেই ছাড়্ল, তিনি বার কয়েক বক দেখাবার মতন মুদ্রা করে' সবাইকে আশীর্ব্বাদ করলেন। ট্রেন একটা ষ্টেশন যেতে না যেতে বাবাজী এক পেতলের বড় কৌটা খুলে লুচী পেঁড়া ইত্যাদি বার করে' খেতে আরম্ভ করলেন। তাঁর প্রসন্ন মুখমণ্ডল আরও প্রসন্ন দেখাতে লাগ্ল। ঈষৎ হেসে আহমদকে বললেন, "তোফা পেঁড়া, মহাশয়! দুটো খাবেন?"

আহমদ ইংরেজীতে উত্তর দিলে, "না মহাশয় মাপ করবেন। এই একটু আগে খেয়ে বেরিয়েছি।" সন্ন্যাসী বোধ হয় ইংরেজী বোঝেন না, একটু অসহায় ভাবে রণজিতের পানে চাইলেন।

সে বললে, "আমার বন্ধু বোম্বাই দেশের মুসলমান। বাঙ্গালা কইতে পারেন না। বলছেন, এইমাত্র, খুব খেয়ে বেরিয়েছেন আর কিছু মুখে দেওয়ার সাধ্য নেই।"

বাবাজী একেবারে আঁৎকে উঠলেন, "কি! মুসলমান! এতক্ষণ বলতে হয়! ছি, ছি, ছি, এ গাড়ীতে কেন? আমার সব খাবার নষ্ট হয়ে গেল।" তাড়াতাড়ি কৌটার ডালাটা বন্ধ করে' ফেললেন, মুসলীম জীবাণু

(microbes) ভেতরে না ঢুকে পড়ে। লুচী পেঁড়া ফেলে কিন্তু দিতে পারিলেন না।

দুই বন্ধুতে হেসে উঠ্‌ল। রণজিৎ বললে, "বাবাজী! আমার সঙ্গেও নানা রকম উপাদেয় খাবার ছিল। বৈরাগী গাড়ীতে উঠলেন দেখে সে-গুলোর আশা ছেড়ে দিয়েছি। মুসলমান বরং চলে, কিন্তু সন্ন্যাসী বৈরাগীর সঙ্গে ছোঁয়া-ছুঁই করি কি করে, মশায়! কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে ত!"

বাবাজী একটু ক্রুদ্ধ হলেন। বললেন, "তুমি কি উপহাস করার লোক আর পাও নেই! আমি তোমার বাপের বয়সী, তা জান! কি বলব, দ্বেষ-হিংসা ত্যাগ করেছি, নইলে আজ—"

আহমদ হাত জোড় করে' হিন্দিতে বললে, "জনাব, আমাদের গোস্তাগী মাফ করবেন। আমার দোস্ত নাদান ছোকরা। জবান ঠিক রাখতে পারে না।"

সন্ন্যাসী ঠাণ্ডা হলেন।

দুই বন্ধু গাড়ীর দূরের কোণটায় গিয়ে বস্‌ল; রণজিৎ ধীরে ধীরে বললে, "আর কেন, দোস্ত? কলকাতায় ফিরে চল। হিন্দু মন্দির ও হিন্দু-ফকীর দুই তোমাকে দেখালাম। সাধ মিটেছে ত?"

আহমদ উত্তর দিলে, "আচ্ছা ভাই, চল। আমাদের কাজ সুরু করে' দেওয়া যাক্। কিন্তু পরে একবার সময়মত আমাকে বেলুড় ও পণ্ডিচেরী দেখাতে হবে। সেখানে ত জাতিভেদ নেই!"

রণজিৎ বললে, "আমি দুই আশ্রমের কথাই জানি, আহমদ। জাতি-ভেদ নেই বটে। কেন না দুই আশ্রমেই অহিন্দু অনেক আছেন। কিন্তু ওঁদের আদর্শ সম্পূর্ণ হিন্দু। দু জায়গাতেই ওঁরা হিন্দু কৃষ্টি ও হিন্দু প্রাধান্যের স্বপ্ন দেখেছেন। মুসলমান প্রভৃতি অন্য সম্প্রদায়ের কথা ভুলেও ভাবেন না। ওঁদের কাছ থেকে আমরা কিছু প্রেরণা পাব না।"

"একটা কথা, রণজিৎ। আমরা ছয় বন্ধু কিন্তু একত্র থাকা চাই। গিয়ে ওদের চারজনকে খুব ভাল করে' বোঝাতে হবে। তার পর সকলে মিলে একটা কার্য্যের ধারা স্থির করা যাবে।"

কলকাতার বাড়ী আবার গম্ গম্ করছে। রণজিৎ কাল ফিরেছে। ছয় বন্ধুতে অনেক দিন পরে আবার একত্র হয়েছেন। ভবেশ বললে, "আহমদ, এইবার ত সবাই একত্র হয়েছে। কি রকম দিগ্বিজয় ক'রে এলে, বল সকলকে।"

আহমদ কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই রণজিৎ বললে, "আজ নয়, ভাই। আজ নিছক হাল্লা করব, আনন্দ করব। সূপকারকে আদেশ দিয়েছি, বাবুরা সবাই খাবেন, খানার টেবিলে বাঙ্গলা, ইংরেজী, মোগলাই, সব রকম উপাদেয় পদার্থের সমাবেশ যেন হয়।"

ভবেশ বললে, "বড় গোস্ত অর্ডার দাও নেই ত, ভাই! গরীব ব্রাহ্মণের জাতটা মেরো না। একটু চীনে চপ্ সুয়ে ফরমায়েশ করলে না কেন? ভারী চমৎকার খেতে!"

আলিম একবার দুবার থু থু করে' বললে, "তোবা, তোবা, চীনাদের খানা মুসলমানের অখাদ্য। ও-সব আনিও না, ভাই।"

রণজিৎ খুব হেসে বললে, "না হে না, হিন্দু-মোছলমান কারোই ভয় নেই। বিশুদ্ধ ভেড়া ও পাঁটার মাংস রান্না হয়েছে। পাখী একটু আধটু আছে বটে, কিন্তু সে সম্বন্ধে ভবেশ পণ্ডিত ত অনেক দিন ব্যবস্থা দিয়েছেন।"

খুব আনন্দে ভোজ সমাধা হল। খেয়ে দেয়ে সবাই বার হল মোটরে হাওয়া খেতে। বারোটা বাজ্‌ল, তবুও রণজিৎ কাউকে ছাড়ে না। গাড়ীটা ক্রমাগত গঙ্গা কিনার, রেড রোড, ঘোড় দৌড়ের মাঠ ঘুরছে। শেষ আহমদ বললে, "রণজিৎ, এ রকম ভাবে পাগলের মতন মোটরে চক্কর দিলেই কি শান্তি পাবে? চল, আজ সব ভাল করে' ঘুমান যাক্। কাল রবিবার আছে, সকাল বেলা বসে' গল্প-স্বল্প করা যাবে।"

রণজিৎ বললে, "সেই ভাল। হরি সিং, চল, বাবুদিকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি। কাল সবাই আমার ওখানে দুপুরবেলা চারটী ভাত খেতে হবে, মনে রেখো। সকাল সকাল এসো।"

পরদিন নটার ভেতর ছয় বন্ধু চার্ণক স্কোয়ারে জমায়েৎ হলেন। টেনিস-কোর্টের পূর্ব্বদিকে গোটা দুই বড় আম

গাছ ছিল। তার ছায়াতে সবাই বসলেন। শমসুদ্দিন গরম হালুয়া আর চা এনে দিলে। তার আজ মহা ফুর্ত্তি। মনিব এত দিন পরে বাড়ী এসেছেন। সবাইকে আগ্রহ করে' জলযোগ করালে। খাওয়া হয়ে গেলে রণজিৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "আমার গোটাকয়েক কথা জানাবার আছে। সবাই ভাল করে' শোন। আমি তোমাদের পুরানো বন্ধু। আমার কোন কথা ভুল বুঝে কেউ আমার উপর বিরক্ত হয়ো না। আমি তোমাদের কাছ থেকে অনেক পেয়েছি। আশাতীত পেয়েছি। তোমাদের স্নেহ ভালবাসার প্রতিদান কখনও দিতে পারব না। দিনের পর দিন তোমরা নিজের কাজকর্ম্ম, আমোদ-আহ্লাদ ফেলে আমার বাড়ী এসেছ, সারা সন্ধ্যাটা আমার সঙ্গে কাটিয়েছ। আমি কুনো মানুষ। তোমরা না এলে আমাকে দীর্ঘ সন্ধ্যাকাল একাই ঘরে কাটাতে হত। কেন না, আমি কিছু আমোদের সন্ধানে বাহিরে যেতাম না। সে সব ত হল। কিন্তু ভাই, আমরা এতদিন করেছি কি? কিছুই না, সেরেফ্ আড্ডা দিয়েছি। আমাদের বৈঠকে মদ ভাঙ্গ, গুলি চরস খাওয়া হয় না বটে। লেখাপড়া শিল্পকলার চর্চ্চা হয়, তাও সত্যি। কিন্তু তবু আমাদের বৈঠক আড্ডা বই কিছু নয়। তোমরা, ভাই, অন্নের জন্য সারাদিন খাটাখুটি কর, তোমাদের ক্লাব করে' সন্ধ্যাটা কাটান বরং মার্জ্জনীয়। কিন্তু আমি চব্বিশ ঘণ্টাই আলস্যে কাটাই, আমার তরফে ত বলবার কিছুই নেই।"

ভবেশ বললে, "আমি বুঝতে পারছি না, রণজিৎ, তুমি কি করতে চাও। বড় ঘরের ছেলে, খেটে খাওয়ার দরকার নেই, সেইজন্য হাইকোর্টে যাও না। যেমন এক দিকে তোমার অর্থলিপ্সা নেই, তেমনি অন্য দিকে তোমার মনের অশান্তি, চঞ্চলতা নেই। সুখের ত secretই (নিগূঢ় মন্ত্র) এই!"

রণজিৎ উত্তর দিলে, "না ভবেশ, অত অধীর হলে চলবে না। আমার বক্তব্যটা সব শোন। অর্থলিপ্সা নেই বলে'ই যে আমি আদালতে যাই না, এটা ঠিক কথা নয়। আমি হাড়-কুঁড়ে মানুষ, কুনো প্রকৃতি, তাই বাড়ী বসে' থাকি। যে স্বভাবতঃ কর্ম্ম-বিমুখ, তাকে শান্ত অচঞ্চল এ-সব বড় বড় নাম দেওয়া যায় না। সে যাই হোক, ভাই যেটুকু শান্তি আমার মনে ছিল তাও একেবারে গেছে। এ নিষ্কর্ম্মার জীবন আমার আর সহ্য হচ্ছে না। এ হাওয়াতে আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমি জগতের মাঝে বেরিয়ে দাঁড়াতে চাই, কাজ করে' আমার জীবন সার্থক করতে চাই। তোমরা এস আমার সঙ্গে। কাজের প্রয়োজন নেই, এ কথা ত কেউ বলতে পারবে না! তোমরা সবাই বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ লোক, তোমাদের ভাল করে'ই জানা আছে যে স্বদেশের স্বজাতির এই হীন অবস্থায় নিঃস্বার্থ নির্ভীক কর্ম্মীর কত প্রয়োজন! কত লোকই ত কাজ করছে, প্রাণ দিয়ে কাজ করছে। আমরাই কি ল্যাজের কুণ্ডলীর উপর বসে, নাক উঁচু করে' টীকা-টিপ্পনী কাট্‌ব! আমি আর পারছি না ভাই, এ ভাবে দিন কাটাতে।"

আলিম-উজ্জমান বললে, "রণজিৎ ভাই, তুমি যা বলছ সে সব আমাদের বেলায় খাটে। কিন্তু তুমি যে নিষ্কর্ম্মা নির্ব্বিকার হয়ে বসে আছ, সে কথা ত ঠিক নয় মোটেই। তোমার পরোপকারের কথা, দানের কথা কি আমি কিছু জানি না? নরেনের কাছে, শমসুদ্দিনের কাছে অনেক শুনেছি। তবে তোমার মত মহাপ্রাণ লোকের মনে হতে পারে যে, আরও ঢের বেশী করা উচিত। আমাদের কথা আলাদা। আমি সোজাসুজি বলছি। আমরা সাংসারিক জীব, খেটে খাই, তোমার মত মানুষের সংসর্গে থাকি বলে পাঁচটা বড় কথা কই। এর বেশী আমাদের সাধ্য কোথা?"

রণজিৎ উত্তর দিলে, "আলিম ভাই, আমার মনের অবস্থা আজ এই দাঁড়িয়েছে যে, আমি যদি সর্ব্বস্ব দান করে' ফেলি, তা'হলেও আর চুপ করে' বসে' থাকতে পারব না। আমি দেশের সমস্ত বড় বড় সমস্যাগুলোকে ধরে গলা টিপে এক দিনে খতম করে' দিতে চাই। এমনই অধৈর্য্য আমার প্রাণে এসেছে। কাজে আমি লাগ্‌বই। কিন্তু তোমরা ভাই, আমায় ত্যাগ কোরো না। সবাই মিলে কাজে নামি, এসো।"

ভবেশ বললে, "সবাইকে নিয়ে কি কাজে নামবে, বন্ধু? আমাদের প্রত্যেকের মনের ধারা আলাদা। এক বিষয়ে মাত্র আমাদের ছ-জনের মতের মিল আছে, আমরা

কেউ বিপ্লব-পন্থী নই। কিন্তু এই রকম একটা negative মনের ভাবের উপর কি কোন কার্য্যক্রম স্থির করা যায়!"

রণজিৎ একটু হেসে বল্‌লে, "রাষ্ট্রনীতি শিকায় তোলা থাক্, ভবেশ। দেশের লোকের হৃদয়কে এক করা যাক্, এস। যেমন করেছিলেন একদিন মুসলমান স্ফুীরা, যেমন করেছিলেন একদিন হিন্দু ভকতরা, এস তেমনই করে' আমরা প্রেম ও ইশ্‌কের নামে ভারতকে এক করি। আহমদের বাবা আমাকে কংগ্রেসে যোগ দিতে বলছিলেন। কিন্তু আমি মুসলমানদের ছেড়ে, অস্পৃশ্যদের পেছনে ফেলে, যাব না কংগ্রেসে। ওদের ছেড়ে আমি কিছুই চাই না। সকলে মিলে যদি কাজ করতে না চাই, ত চুলোয় যাক্ হোয়াইট পেপার, চুলোয় যাক্ কাউন্সিলগুলো। সিবিল সার্ব্বিস যেমন রাজত্ব করত তেমনই আবার করুক, আমার আপত্তি নেই। আমি এই কথা খোলাখুলি বলতে চাই সবাইকে।"

ভবেশ উত্তর দিলে, "বল্‌লে তোমাকেও তোমার স্বজাতি পাগল বল্‌বে। হিন্দুর যে সর্ব্বনাশ হয়ে যাচ্ছে।"

আলিম বল্‌লে, "হিন্দুরা যে আমাদিকে ফাঁকী দিয়ে এ দেশে চিরদিন আধিপত্য করতে চায়, কে না জানে?"

আহমদ এতক্ষণ চুপ করে' ছিল। আর থাকতে পারলে না। বল্‌লে, "ছিঃ আলিম, এসব কথা মুখে এনো না। মুসলমানকে এত খাটো কোরো না। সাতশো বছর আমরা এ দেশে রাজত্ব করেছি, আমাদিকে কে দাবিয়ে রাখতে পারে? কেউ কাউকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না। ভবিষ্যৎ হিন্দুস্তান এক জাতের হবে না, সবাইয়ের হবে। যে সব হিন্দু, যে সব মুসলিম পরস্পরকে দাবিয়ে রাখার স্বপ্ন দেখছে তারা মুষ্টিমেয়। অধিকাংশ ভারতবাসী এ সব জিনিসের পরোয়া করে না। তারা সু-রাজ্য, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পেলেই খুশী। তোমার শিয়া জাত-ভায়েরা ত স্পষ্ট মত দিয়েছে যে, প্রজা-সভায় মুসলমানদের আলাদা প্রতিনিধির প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সব কথা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করে' লাভ কি? রণজিৎ কি করতে চায়, শোন। তার সঙ্গে পলিটিক্সের কোন সম্পর্ক নেই।"

রণজিৎ বল্‌লে, "তা হলে শোন, ভাই। ভবেশ যে এই মাত্র বল্‌লে যে হিন্দুর সর্ব্বনাশ হয়ে যাচ্ছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তার জন্য দায়ী ইংরেজও নয়, ইংরেজের White Paperও নয়। হিন্দু নিজের পৈতা গলায় জড়িয়ে হারিকিরি করছে আজ বহু শতাব্দী ধরে'। আজ তার নিত্য-জীবন থেকে ধর্ম্ম কত দূরে সরে' গেছে, তা ত আমরা সবাই হাড়ে হাড়ে বুঝি, ভবেশ! ভাড়া-করা পুরুত মন্দিরে পূজা করছে, আর আমরা স্বর্গে যাচ্ছি। অর্থাৎ যাব, যদি অখাদ্য কিছু না খাই, মেয়েদের মূর্খ করে' রাখতে পারি, আর অহিন্দুদের ম্লেচ্ছ বলে' নাক সেঁটকাতে পারি। বেশী কথা বলতে চাই না, ভবেশচন্দ্র। কিন্তু আমাদের মধ্যেই জাতে জাতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে বিদ্বেষ আছে, সে কি জগতের আর কোথাও আছে! শুধু মানুষের ঝগড়া কেন বলব, দেবতাদের ঝগড়া, তাঁদের পরস্পরের বল-পরীক্ষা, এ ত আমাদের পুরাণের পাতায় পাতায় রয়েছে। এ সব কি White Paperএর দোষ, ভাই? যে মূল-সত্য হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের পেছনে রয়েছে, সেইটাকে সবাই আঁকড়ে ধরতে পারলে ত এ সব গলদ চলে' যাবে!"

মুখার্জ্জী মনোযোগ দিয়ে সব কথা শুনছিল। সে এখন খুব গ্রামভারী চালে বল্‌লে, "রণজিৎ যা যা বলছে, এ সবই ত আমাদের ব্রাহ্ম নেতারা বরাবর বলে' আসছেন। এতে নূতন কিছুই নেই। সবাই যদি ব্রাহ্ম হয়ে যায়, তাহলে কোন গোলমালই থাকবে না।"

আলিম নাক উঁচু করে' বল্‌লে, "কৌঁসিলী সাহেব, ও কথা তোমার পৌত্তলিক বন্ধুদের বল গিয়ে। আমরা বহু শতাব্দী ধরে' জগৎকে একেশ্বরবাদ শিখিয়ে এসেছি। আমরা কেন তোমার এই নূতন খৃষ্টানী ঢংয়ের ধর্ম্ম নেব!"

প্রোফেসর হরিমোহন বিজ্ঞভাবে মাথা নেড়ে বল্‌লে, "ব্রাহ্ম হতে আমিও রাজী নই, ভাই আলিম। বৈদ্যের ছেলে, ব্রাহ্ম হয়ে শেষ কি-কায়েতের ঘরে মেয়ের বিয়ে দিতে যাব নাকি? রণজিতের কথা বরং বুঝতে পারি। মহাপ্রভুও ত প্রেম ক'রে যবনকে কোল দিয়েছিলেন।"

মুখার্জ্জী চটে' গেল। এত চটে' গেল, যে ভবেশের সঙ্গে political pactটাও আর স্মরণ রইল না। বল্‌লে, "ঐ সব old prejudices, সেকেলে কুসংস্কার, যদি না ছাড়তে পার ত টিকি রাখ।"

হরিমোহনের ছোট্ট একটুখানি টিকি ছিল। এত ছোট, যে কেউ তার কথা জান্‌ত না। সে মুখার্জ্জীর কথা শুনে মুখ টিপে হাস্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু বিপ্র-বীর ভবেশ চুপ করে' থাকবার ছেলে নয়। যে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "তা রাখব হে, রাখব। তোমরা ঝেড়ে খৃষ্টান হয়ে বেরিয়ে গেলেই রাখব। আজ কাল আবার মুই হেঁদু বুলি ধরেছ কি না!"

মৌলবী হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, "আজও বুঝলে না, ভবেশ, যে তোমাদের এই মহাব্যাধির একমাত্র ঔষধ ইসলাম।"

আহমদ বিরক্ত হল, "ছিঃ আলিম ভাই, এ সব ঠাট্টার কথা নয়। রণজিৎ ত কাউকেই ধর্ম্ম ত্যাগ করতে বলছে না। কেন বলবে? এত বড় যে রুষ-রাষ্ট্র, ওতে কোন্ ধর্ম্ম নেই? চীনে কি মুসলমানে বৌদ্ধে কাটাকাটি হচ্ছে? ও সব হয় এই সোণার দেশে, যেখানে ধর্ম্ম প্রাণে নেই, জিবের ডগায় নাচছে। ধর্ম্মভেদ থাকলেই কি বিদ্বেষ আসতে হবে! কেন এক হতে পারবে না হিন্দু মুসলমান? হিন্দু যাকে দুনিয়ার মালিক বলে' জানে, মুসলিমও ত তাঁকেই মানে। এই গেল হপ্তায় রণজিৎ আর আমি এক দরগায় গেছলাম। সেখানে ব্রাহ্মণ ও সৈয়দ এক সঙ্গে কলমা পড়ছে, রোজ পড়ে। সমগ্র ভারতেই বা এ দৃশ্য দেখব না কেন! আমরা ছয় বন্ধু ত বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক। আমাদের বন্ধুত্ব কি সেজন্য কিছু কম! কোথায় পাবে ছ-জন এ রকম সুহৃদ্! কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত আমাদের এই মিত্রতা? মুখে যতই ঠাট্টা করি, তর্ক করি, আমরা সবাই এক অদ্বিতীয় খোদাকে মানি। পূজা-পদ্ধতিকে আমরা বড় বলে' দেখি না। কেন না, আমরা জানি যে, আল্লাকে মাথার উপর রেখে পরস্পরকে ভাই বলে' জানাই সব চেয়ে বড় পূজা। এই ত ভারতের নূতন আলো, নব নুর! একে কেউ অশ্রদ্ধা করতে পার কি?"

রণজিতের দুটী চোখ ছল ছল করছিল। সে হাত জোড় করে' বল্‌লে, "ভাই, আমি আমাদের এই মৈত্রী-মন্ত্র, এই নব নুর ভারতে প্রচার করতে চাই। তোমরা আমাকে সাহায্য করবে না? আজ আমরা ছ-জন আছি। চেষ্টা করি এস, যাতে ছয় বৎসরে ছয় কোটি লোক এই মন্ত্র নেয়। তা'হলে দেখতে দেখতে দূরে চলে যাবে আমাদের জাতে জাতে হিংসা দ্বেষ, শেষ হয়ে যাবে আমাদের হীনতা, দীনতা, দুর্ব্বলতা।"

এতক্ষণে ভবেশ কাবু হল। সেও দুই হাত জোড় করে' মাথায় ঠেকিয়ে বললে, "ভগবানের কৃপায় তুমি পারবে, রণজিৎ। তোমাকে তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ উপাদানে গড়েছেন। ভেতরে বাহিরে তোমার তুল্য মানুষ আমি দেখি নেই। প্রেমের এই নূতন মন্ত্র প্রচারে আহমদ তোমার যোগ্য সহায়। আমরা ক্ষুদ্রপ্রাণ মানুষ। আমাদের অধিকার বুঝে যে কাজে লাগাবে তা যথাসাধ্য করব। কি বল, ভাই আলিম?"

আলিম উঠে ভবেশের হাত ধরে' তার পাশে দাঁড়াল। বললে, "ভবেশ, আমিও প্রস্তুত। মাথার উপর আল্লা, মানুষ সব ভাই, এই মহামন্ত্র প্রচারে আমি প্রাণপণে সাহায্য করব। এ যদি না পারি, ত কিসের মুসলিম আমি! আল্লা হো আকবর!"

হরিমোহন ও সত্য ভবেশের অন্য পাশে দাঁড়াল। হরিমোহন বল্‌লে, "আমার পক্ষে নবনুরের মন্ত্র নেওয়া অতি সহজ। মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মে ভেদের ঠাঁই নেই, থাকতে পারে না।"

সত্য বল্‌লে, "রণজিৎ, তুমি নামে ব্রাহ্ম না হলেও তোমার আমার ধর্ম্মবিশ্বাসে কোন ভেদ নেই। সাম্য ও মৈত্রীর প্রচার ত আমার কর্ত্তব্য।"

রণজিতের উৎসাহ আর দেখে কে! "আহমদ, আর আমাদের চিন্তা কি! যখন আমরা ছয় বন্ধু এক-মন এক-প্রাণ হয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে নামছি, তখন আমাদের বিজয় ধ্রুব।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীবুদ্ধ

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু

বালকের মন স্বভাবতঃই ক্রীড়াত্মক ও আনন্দপ্রবণ। শত বাধা বিপত্তি আসিলে খেয়াল নাই—দমিবার নয়; ঊর্দ্ধের ঐ আকাশের মত স্বচ্ছ, ক্লেদহীন, মুক্ত—মেঘ দুর্য্যোগ আসিয়া সাময়িক হাসাইয়া কাঁদাইয়া, আচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন করিয়া যাইবে; কিন্তু তাহার বক্ষে কোন ঘন গভীর রেখাপাত করিয়া যাইতে পারিবে না। দুর্য্যোগ কলুষ, মেঘ ঝঞ্ঝাবাতে সরিয়া গেলে আবার হাসিবে, আবার স্বীয় সারল্য ঔজ্জ্বল্যে আত্মস্বরূপ প্রকট করিবে। বিকৃতি, গাম্ভীর্য্যের অস্তিত্ব বালকের মনে ক্ষণিকের নিমিত্ত। আবার বালকের প্রকৃতির এই যে বৈকল্য বা বৈরূপ্য, তাহাও অন্য কিছুর জন্য ততটা নয়, যতটা তাহার ক্রীড়াসঙ্গীর অন্তর্ধান তিরোধান বা বিচ্ছেদ ব্যবধানে প্রকাশ পায়।

বালকের এই স্বতস্ফূর্ত্ত, সদানন্দ স্বভাব মনের ব্যতিক্রম বৈপরীত্য দেখি রাজকুমার সিদ্ধার্থের জীবনে। পিতা শুদ্ধোদনের এত চেষ্টা, রাজকুমারকে প্রীত প্রফুল্ল করিবার এত উদ্যোগ আয়োজন, সকলই নিষ্ফল। অর্থের অভাব নাই, পুত্রও মাত্র একটী; সেই পুত্রকে মনোমত উৎফুল্ল ও উদ্দেশ্য আদর্শানুযায়ী করিবার জন্য অমাত্যগণকে অবাধ আদেশ দিলেন—রাজকুমারের ক্রীড়ার সামগ্রী, কৌতুকোপহার অকুণ্ঠভাবে আনিয়া দেওয়া হউক। কিন্তু তাহার কোনটীতেও রাজকুমারের প্রসন্নতা উদ্রেক করিল না। তাহার কোনটীও রাজকুমারের প্রীতিরঞ্জন করিল না। তাঁহার বিষণ্ণ তত্ত্বগ্রাহীচিত্ত সংসারের সকল বস্তুর উপরই সমান উদাসীন হইয়া রহিল। খুঁজিতে লাগিল, লাভ করিতে চাহিল তাঁহার অন্তরাত্মা এমন একটা উপায় ও অবস্থা, যাহাতে সংসারের সকল আপাত-রম্য, ক্ষণিক প্রীতিপ্রদ পরিণতি হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। এই দৃশ্যমান ভঙ্গুর জীবনের অন্তরালে কোন শাশ্বত অক্ষয় চিরানন্দ জীবনের অস্তিত্ব আছে কি না? সেই প্রশ্ন ও চিন্তাই হইল তখন তাঁহার মনের প্রীতির বস্তু। তাঁহার উৎফুল্লতার প্রবাহ অধোলোকে রসদানের প্রেরণায় অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত চঞ্চল বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তাহার বাহ্যগতির উপর যেন কঠিন আবরণ আসিয়া গেল।

সংসারকে যাঁহারা নূতন রূপ, নূতন সত্য ও আলো দিতে আবির্ভূত হন, তাঁহারা জন্মের সাথে সাথেই তাঁহাদের প্রকৃতিতে লইয়া আসেন দিব্যভাব। দিব্য গুণের কোন না কোন একটীর অসাধারণত্ব বা বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হইয়া তাঁহারা সংসারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। পুরাণ, ইতিহাস একথা অস্বীকার করেন না, যে কেহ শক্তি, কেহ বুদ্ধির অতি প্রাখর্য্য, মস্তিষ্কের দীপ্তি, কেহ-বা দয়া-প্রেম-হৃদয়াবেগ প্রভৃতি সত্ত্বগুণের যে কোন একটীকে সঙ্গী করিয়া আসেন। যীশু, মহম্মদ, চৈতন্য হইতে আরম্ভ করিয়া এযুগের রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ প্রভৃতি অলৌকিক পুরুষদের বাল্যপ্রকৃতি এ দৃষ্টান্তের অন্তর্ভুক্ত। তবে কাহার কোন্ বৈশিষ্ট্য, কাহার কোন্ দিব্য প্রেরণা হইতে জীবন কোন্ বা কি রূপ লইবে, তাহা গূঢ় অন্তর্যামীর নির্দ্দেশসাপেক্ষ। কে জানিত, বাল-সুলভ ঔদ্ধত্য, বুদ্ধির অতিমাত্র দীপ্তদম্ভ হইতে কুমার বিশ্বম্ভরের (শ্রীচৈতন্য) যৌবনকাল ঢল-ঢল ভাবের, প্রেমভক্তির বন্যায় রূপান্তরিত হইবে!

বাল্যের এই সকল প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের, দৈবীভাবের এই সকল প্রকৃতিগত সদ্বৃত্তির অসদ্ভাব কুমার সিদ্ধার্থেরও জীবনে ছিল না। বরং অতিমাত্রায় ছিল—সেগুলি দিব্য প্রকৃতির অন্তরঙ্গ এবং দিব্য প্রকৃতিরই সবিশেষ লক্ষণ। দিব্য প্রকৃতির—এইজন্য যে, এই সকল প্রেরণা বা ইষণা সত্তার বিশাল অনুভূতির দ্বারা অনুপ্রাণিত। এখানে মানুষ ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়াকাঙ্খার ঘাত-প্রতিঘাতের কিম্বা ব্যষ্টিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উপলব্ধির ভূমিতে নাই। বিশ্বগত আত্মার বাহ্যপ্রকৃতির মধ্যে অনৈক্য, বিচ্ছিন্ন, অপরিপূর্ণ সংবেদনা বা অভাবের যে মর্ম্মপীড়া আছে—এখানে মানুষ আসিয়াছে তাহার বিশেষ
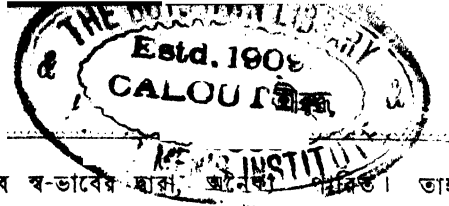
উপলব্ধির ভূমিতে। অভাব স্ব-ভাবের দ্বারা, অনৈক্য ঐক্যের দ্বারা এখানে তীব্রভাবে পূর্ণ, তৃপ্ত হইতে চাহিতেছে। এই চাওয়ার পশ্চাতে ব্যক্তিগত শান্তি, ব্যক্তিগত মুক্তির আদর্শ যদিও প্রবল, তাহাও সম্ভাবিত হইতেছে প্রকৃতির সাত্ত্বিকতার প্রভাবের দ্বারা। দয়া, প্রেম, অসাধারণ জীবপ্রীতি, 'বাসুদেবঃসর্ব্বমিতি', এই চেতনা হইতে সর্ব্বভূতাত্মার সহিত সহানুভূতি, ঐক্যবোধ একতানতা, একপ্রাণস্পন্দনতা হইতেই এই সকল ভাবের উদ্ভব। সামান্য একটা শরাহত পক্ষীর যন্ত্রণায় সিদ্ধার্থের অন্তরে যে গভীর সমবেদনা, যে অসাধারণ দরদ ও মমতার তুফান উঠিয়াছিল, তাহার দ্বারা তাঁহার অলৌকিক দিব্য গুণের স্পষ্ট প্রভাবের কথাই সুপ্রমাণিত হয়।

শুধু মুক্ত ত্রিগুণাতীত পুরুষদের জীবন নয়, জীবন মাত্রই ত্রিগুণের সমাহার—'সত্ত্বরজস্তমাংসীতি ত্রৈগুণ্যম্'; ত্রিগুণের অবিরাম সংমিশ্রণের ফল—'গুণাঃগুণেষু বর্ত্তন্তে'। সাধারণে প্রকৃতির গুণাবলীর ক্রিয়া অপরিস্ফুট, অপরিচ্ছন্ন থাকে; জীবনের বৈশিষ্ট্য, প্রভুত্ব, উদ্দেশ্য প্রকৃতির মধ্যে বিমূঢ়, বিক্রীত, বিলুপ্ত থাকে। প্রকৃতির অন্ধ আচরণের দ্বারাই সাধারণের জীবন নিয়ন্ত্রিত পরিচালিত হয়। আর অসাধারণে হয় ইহার বিপরীত। সেখানেও যে ত্রিগুণের দ্বারা আত্মা নিয়মিত ও আকৃষ্ট হয় না, তাহা নয়। নিয়মিত আকৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহা সিদ্ধ হয় সজ্ঞানে, বিবেকের উচ্চ নীতির সমর্থনের দ্বারা; তাহা সিদ্ধ হয় সাত্ত্বিকতার প্রভাবের দ্বারা, তাহা সিদ্ধ ও সম্ভব হয় দিব্য ভাবের শক্তি ও সাহচর্য্যের দ্বারা। সেখানে জীবন সাধারণ প্রকৃতির ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে বিচিত্র গুণের, বিচিত্র স্বেচ্ছাচারিতার খেয়ালে আত্মাকে ক্ষত বিক্ষত, উদ্দেশ্যহীন গড্ডলিকার মত স্রোতের উপলখণ্ড করিয়া চলে না; যখন যেরূপ প্রয়োজন, যখন যেরূপ ইচ্ছা, ঝোঁক, তদনুরূপ সুবিধার তন্ত্রেও চলে না। কর্ম্মের মধ্যে, পুরুষের চেতনার মধ্যে সেখানে থাকে একটা বিশেষ মহনীয় ভাব, বিশেষ একটা বৃত্তি, প্রেরণা, অনুভূতির প্রাধান্য—সুস্পষ্ট সুতীক্ষ্ণ একটা গতি, তটপ্লাবী একটা বিপুল প্রবাহ। নতুবা একজন আদর্শ সন্তান, আদর্শ রাজা, স্বামী, অথবা একজন আদর্শ প্রেমিক বা গৃহী হওয়াও সিদ্ধার্থের পক্ষে চলিতে পরিতৃপ্ত। তাহাও ত সাত্ত্বিকতার কোন না কোন কেন্দ্র-চৈতন্যের ক্রিয়া; সেটাও ত দুর্লভ গুণ, মানবীয়তার সু-উচ্চ শান্তি সমাধনের আদর্শ-সম্ভাবনার দ্বারা পূর্ণ। তাহারও মধ্যে ত সাত্ত্বিকতার দিব্য বিভাবের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব, সুন্দর সুষ্ঠু প্রেরণা বর্ত্তমান। তাহাকে অসমতা অশান্তি নিবারণের মধ্যপন্থারূপে গ্রহণ করিয়া, তাহাতে আপোষ রফা করিয়া জীবনে চলিবার পক্ষেও সিদ্ধার্থের কোন অসুবিধা বা শান্তিহানির কারণ ঘটিত না। কিন্তু সে সকল সুযোগ সম্ভাবনা, প্রলোভন, আদর্শ থাকা সত্ত্বেও সিদ্ধার্থের অন্তরাত্মা বিচলিত, বিক্ষুব্ধ, স্পন্দিত ও ওতঃপ্রোতঃ হইল পার্থিব জীবনের অভাব, হাহাকারের মর্ম্মন্তুদ সমবেদনায়। দৃষ্টি কাতর ও অভ্রান্ত হইল সংসারের ভঙ্গুরতা, নশ্বরতার বীভৎসরূপ দেখিয়া, তাহা হইতে চোখ ফিরাইল। তাঁহার অন্তরাত্মা, তাঁহার দৃষ্টি অনুভূতি মুক্তি-নিষ্কৃতির, শান্তি-সমতার অচিন্ত্য অভাবনীয় পথের সন্ধানে উদগ্র, উন্মুখ, অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। কোন মানবীয় যুক্তি আদর্শের স্তোকবাক্য, কোন বাঁধাধরা তৎকাল-প্রচলিত দার্শনিক সিদ্ধান্ত তখন আর তাঁহার মনোপ্রাণকে আবদ্ধ বা নিশ্চিন্ত করিয়া রাখিতে পারিল না। সাধারণের সহিত অসাধারণের তথা রাজকুমার সিদ্ধার্থের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব বা প্রভেদ এইখানেই।

কিন্তু সাত্ত্বিকতার প্রাধান্যই মুক্তি নয়। সাত্ত্বিকতার অতিবিকাশেও জীবন-জগৎ অভাব অপরিপূর্ণতা হইতে নিষ্কৃতি পায় না। প্রকৃতির অন্যান্য গুণের ন্যায় সত্ত্বেরও কাজ মানুষকে আসক্ত করা, বন্ধন করা। তবে তফাৎ এই যে, সত্ত্বের আসক্তি স্বচ্ছতর, সত্ত্বের বন্ধন বৃহত্তর; ঠিক ঠিক সত্য, আলোক, শান্তি, সমতার দিকে প্রেরণ করাই সত্ত্বের কাজ। সেই উদ্দেশ্য বা লিপ্ততার দ্বারায় সত্ত্ব মানুষকে আবদ্ধ করে—'সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞান-সঙ্গেন চ'। আবার প্রকৃতির মধ্যে নিভাজ সত্ত্বও দুর্লভ। একটী গুণ অপরটীর সহিত অবিরত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করিতেছে, মিশ্রিত রূপান্তরিত হইতেছে। সেইজন্য সাংখ্য প্রকৃতির পরিণাম স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াছেন; তাহার আর এক নাম দিয়াছেন "প্রসবধর্ম্মী"। এই কথারই প্রতিধ্বনি Horace Wilson করিয়াছেন—"This

(nature's evolution) is the spontaneous act of nature." সুতরাং সত্ত্বও স্ববিরোধী বিসদৃশ গুণাপন্ন হইতে পারে। নিছক সত্ত্বের মধ্যেও আত্ম-সত্যের অসম্পূর্ণতা, মালিন্য, বিনাশ আসিতে পারে। সত্ত্বের মধ্যে তমঃও থাকিতে পারে, রজঃও থাকিতে পারে। তমঃ থাকিলে মানুষ সাংসারকে অনিত্য, রোগ, শোক, দুঃখ, যন্ত্রণার আলয় বলিয়া অনুভব করিবে। দেখিবে, সংসারের মধ্যে এমন কোন শান্তি, আনন্দ বা সার্থকতার স্থায়ী অস্তিত্ব নাই যে, আত্মা তৃপ্ত, আকর্ষিত হইতে পারে। সত্ত্বের আকাঙ্খা, সত্ত্বের বাসনা কামনার দাবীকে, তাহার ক্ষুধার খোরাক সরবরাহ করিবার সঙ্গতি সংসারের নাই। ইহা 'অনিত্যম সুখম্ লোকম্', ইহা 'পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়ম-শাশ্বতম্'। আত্মারও এমন শক্তি সামর্থ্য নাই, যে এই সাংসারিক ঘূর্ণাবর্ত্তকে গ্রহণ করিতে পারে; অথচ উদাসীন নিরপেক্ষ নিরলম্ব হইয়া ইহার মধ্যে মাথা গুঁজিয়াও টিকিয়া থাকিতে পারে না।

আবার সত্ত্বের মধ্যে রাজসিকতার প্রেরণা প্রভাবও থাকিতে পারে। থাকিলে সংসার প্রকৃতিকে নষ্ট, দুষ্ট, পঙ্গু বলিয়া, অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলিয়াছেন 'কুকুরের লেজের মত, যত সিধা কর, হইবার নয়'—সেইরূপ মনে হইবে, নিজ প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্বের প্রত্যেক সংস্পর্শ-সহায়টী, প্রতি অনুপরমাণুটী পর্য্যন্ত সুন্দরের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ নিষ্ফল করিবার জন্য যেন সাজিয়া আয়োজন করিয়া বসিয়া আছে। তাহারই ফলে বা রূপান্তরে টাইমন্ অফ্ এথেন্সের (Timon of Athens) মত নরবিদ্বেষ ওরফে আত্মদ্রোহিতা, কিম্বা দার্শনিক-প্রবর ডাইওজিনিসের (Diogenes)* মত স্বভাব-কার্পণ্যের পরাকাষ্ঠাও দেখা দিতে পারে। তাহা হইলে, তখন নিজের প্রকৃতির উপর, সংসারের উপর আক্রোশ আসিবে। ষ্টোয়িক (stoic) সম্প্রদায়ের উপলব্ধির মত নিজের প্রকৃতির উপর বিদ্রোহ বিপ্লব আসিবে। আত্মজয়ের সুকঠোর নীতির পক্ষপাতী হইয়া মানুষ নিগ্রহ, দমনের অস্ত্র প্রয়োগ করিতে থাকিবে—আত্মার সহজ, স্বতঃসিদ্ধ, উদার ক্রমবিকাশকে, অচঞ্চল ধীর আত্মপ্রকাশকে উন্নতির পরিপন্থী, দুর্ব্বল, অসিদ্ধ মনে করিয়া রক্তাক্ত হইবে।

গীতার প্রবন্ধে সমতার নানা সম্ভাবনা দেখাইতে গিয়া শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন যে, বুদ্ধের এইরূপ ভাব সত্ত্ব-তামসিকতা হইতে উদ্ভূত। ইহা একপ্রকার উদাসীনতা—জীবনের, সংসারের প্রতি বৈরাগ্য ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ইহা বিশ্বকে সমগ্রভাবে না দেখিতে পাওয়ায়, আংশিক রূপ বা লীলা দেখিয়া ভীত ব্যথিত হওয়ার ফল। জীবনের দোষ, দুঃখ, জরা, মরণের আবর্ত্তন প্রবর্ত্তন দেখিয়া যাহারা তাহা হইতে মুখ ফিরাইতে চায়, সরিয়া থাকিতে চায়, মুক্তি পাইতে চায়, তাহাদেয় মধ্যে তখনও সে-শক্তির অভাব, যাহার দ্বারা জীবনের সর্ব্বাবস্থায় অচঞ্চল থাকা যায়। তাহার মধ্যে সে জ্ঞান নাই, যাহা জীবনের সর্ব্বপ্রকার ঘটনার মধ্যে ও স্পর্শে এক অখণ্ড উদ্দেশ্য, মাঙ্গল্যকে অনুস্যূত দেখাইতে পারে। আত্মমুক্তি বা নির্ব্বাণের সম্ভাবনা হয়ত তাহাতে পরিস্ফুট, কিন্তু অপরের মুক্তি মাঙ্গল্যের সহায় হইতে পারে, এমন কোন সম্ভাবনা তাহাতে নাই।

অবশ্য সত্ত্বের এইরূপ উদাসীনতা, জুগুপ্সাভাবের পথে আত্মার ইপ্সিত অবস্থা বা কোন শ্রেষ্ঠতার গতি লাভ হয় না—তাহা নয়। এরূপ পথের প্রয়োজন আছে, সার্থকতাও আছে। আরম্ভ হিসাবে এই পথ খুব সমর্থনযোগ্য।

* গ্রীক দার্শনিক ডাইওজিনিস্ জীবনের সর্ব্বপ্রকার স্ফূর্ত্তি, সর্ব্বপ্রকার বাহ্য প্রয়োজনানুষ্ঠানের ঘোর বিরোধী ছিলেন। সে সম্বন্ধে সুন্দর একটা গল্প আছে। তাঁহার সমসাময়িক সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক প্লেটো (Plato) কোন এক উৎসবের আয়োজনে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। নিমন্ত্রিত অন্যান্য সকলেই যথাসময়ে আসিয়া আনন্দ কলরবে প্লেটোর মিলনমন্দিরখানি মুখরিত করিয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু ডাইওজিনিস্ আসেন না। অবশেষে ডাইওজিনিস্ বিরক্তিপূর্ণ পদক্ষেপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখে ঘৃণা, বিরক্তি ও ঔদ্ধত্যের চিহ্ন। ধূলিসমাকীর্ণ পা'দুখানি মন্দিরের শ্বেত অস্তরণে মুছিয়া তিনি সতেজে প্লেটোকে বলিলেন—'প্লেটো! আমি তোমার এই অহঙ্কারকে পদদলিত করিতেছি। (Plato! I tread upon thy pride.)' প্লেটো ধীরভাবে সহাস্যে উত্তর করিলেন—'ইহা আরও কোন বড় অহঙ্কারের প্ররোচনায় বোধ হয় (with greater pride)।'

গীতাকারও এ পথকে প্রত্যাখ্যান করেন নাই, স্বীকারই করিয়াছেন—'জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তে যে'। তবে ইহার মূল প্রথমতঃ 'মামাশ্রিত্য' হওয়া চাই; দ্বিতীয়তঃ, ইহার মূলে থাকা চাই পূর্ণ আত্মজ্ঞান লাভের দৃষ্টি; তৃতীয়তঃ, নিজেকে দিব্যসার্থকতায় গড়িয়া ভরিয়া তুলিবার আস্পৃহা। সিদ্ধার্থের সাধনায় প্রথমটীর বিশেষ কিছু স্থান ছিল না। তিনি চলিয়াছিলেন আত্মসন্ধানের জন্য বিচার বিতর্কের পথে; নিজের মধ্যেই নিজেকে তোলাপড়া করিয়া ভালমন্দ নির্দ্ধারণ নির্ণয় করিবার পথে। তাহা আবার প্রবর্ত্তিত সমর্থিত হইত, প্রভাবান্বিত নিয়মিত হইত তৃতীয়টীর অর্থাৎ অন্তরাত্মার অনুভূতি, আকাঙ্ক্ষা আস্পৃহা হইতে। সেইজন্য সংসারবৈরাগ্য এবং সিদ্ধান্তে মায়াবাদ তাঁহার স্বাভাবিক ও সমধিক হইয়াছিল।

আরও কথা যে, সংসারেও অবশ্য এমন অনেক অসম, বিরোধী, অহৃদ্য, ভ্রান্তিপূর্ণ বস্তু আছে যে, নিরাপদ্ থাকিতে হইলে কিম্বা তাহার পূর্ণজ্ঞান ও জয় করিবার শক্তি লাভ করিতে হইলে, শান্তিকামী মুক্তিপ্রার্থীকে তাহা হইতে সাময়িকভাবে সরিয়া আসা ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। কারণ প্রকৃত সত্যশীলতা অচঞ্চলতামূলক, প্রকৃত সত্যও স্বতঃসিদ্ধ আপেক্ষিক নয়। তাহা লাভ করিবার জন্য বাহ্যশিক্ষা, বাহ্য ঘাত-প্রতিঘাতের অপেক্ষা রাখে না। আত্মার স্বতঃপূর্ণ সাগরে ডুব দিয়াই তাহা লাভ করিবার প্রয়োজন হয়। আর প্রকৃত সত্যও সংসারের মধ্যে বিকৃত, মলিন—নানা আবিলতাপূর্ণ, নানা আবর্ত্তনক্লিষ্ট, তাহার উদ্ধারও বহু আবর্ত্তনসাপেক্ষ। প্রকৃত সত্যাগ্রহী যে, অথচ সংসার সম্বন্ধেও যাহার যথেষ্ট দুর্ব্বলতা রহিয়াছে, আসক্তি, লালসা বা অনুরাগ না থাকুক, অন্ততঃপক্ষে মমতা, কর্ত্তব্যবোধও রহিয়াছে—তাহার পক্ষে তখন কর্ত্তব্যও সম্ভাব্য কি? তাহার পক্ষে তখন সম্ভবও নহে, কর্ত্তব্যও নহে যে সত্যের আহ্বানকে উপেক্ষা করিয়া সংসারের মধ্যকার গোঁজামিল গোলমেলে সত্যকে, অথবা তাহার অপরিপক্ক মনের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতাকে জঞ্জালগ্রস্ত করে, প্রশ্রয় দেয়; এবং তাহার সেবা করিতে গিয়া সে সত্যের প্রয়োজনকে অবজ্ঞা করে। অধিকন্তু সাংসারিক সত্যকে ধারণ গ্রহণ করিবার, ঠিক ঠিক চোখে দেখিবার এবং তাহাকে শোধন করিবার উপযোগী শক্তি-জ্ঞান তাহার তখন কোথায়? তাহার ভিতরে তখন জীবনের যে বৃহত্তর সার্থকতার দাবী আসিতেছে, কোন বাহ্য সহায়তা বা সাংসারিক গতি, আদর্শ হইতে তাহা পূরণ হয় না বলিয়াই সে দেখিতে পাইতেছে। সাংসারিক মাঙ্গল্য, সাংসারিক আদর্শ বরং তাহার পক্ষে বাধা বলিয়াই অনুভূত হইতেছে। তাহার তখন প্রাণের মধ্যে অভাব রহিয়াছে, আত্মা অসম্পূর্ণ ও বুদ্ধি অপরিণত রহিয়াছে; অর্জ্জনের নিমিত্তই তাহার অন্তরাত্মা ব্যাকুল হইয়াছে। অথচ সংসার তাহাকে কিছুই দিবে না—শতবাহু মেলিয়া দাবীই করিতেছে, তাহাকে সীমার মধ্যে, বন্ধনের মধ্যে টানিতেছে। উহারই প্রতিক্রিয়া-ক্রমে সেইজন্য আবার সংসারের স্পর্শ তাহার নিকট বিষবৎ লাগিতেছে, ভীতিরও সঞ্চার করিতেছে। সুতরাং মনকে সবল ও খাঁটী করিবার জন্য সংসার হইতে পিছাইয়া আসা, অথবা সংসার সম্বন্ধে উদাসীন ও নিস্পৃহ হওয়া তাহার পক্ষে তখন আর অন্যায় বা অশ্রেয়স্কর কিছুই না। দ্বিতীয়তঃ, সংসার হইতে তফাৎ হইবার সামর্থ্য অর্জ্জন না করিলেও, তাহার পক্ষে সংসারকে তখন জয় করিবার বা ঠিক ঠিক চোখে দেখিবার প্রাথমিক উপযুক্ততাও আসিবার নয়।

এইরূপে সংসারের সম্বন্ধে দুর্ব্বলতা এবং সমুচ্চের জন্য ব্যাকুলতা এই দুয়ের মধ্যে প্রথমটীর অপ্রয়োজনে এবং দ্বিতীয়টীর প্রয়োজনের সন্ধিক্ষণে, উভয়ের যোগাযোগের সমকালে মনের মধ্যে যে সমাহিত, স্থৈর্য্য, ধীরতার অবস্থা আসে, সেই অবস্থায় সংসারের সকল বস্তু, সকল ঘটনার পশ্চাতে তাহাদের আসল গতিভঙ্গীর সূক্ষ্ম অর্থই ফুটিয়া উঠে। অনেক ক্ষেত্রে আবার জীবনের সকল ব্যাপারের ভিতরে সাধকের স্বীয় প্রকৃতির বিশেষ চেতনার অনুরূপ প্রতিবিম্বও ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায়। বস্তুতঃ সেই দৃষ্টিই হয় তখন সাধকের প্রগতির প্ররোচক। সিদ্ধার্থের এই অবস্থা আসিয়াছিল, এই দৃষ্টি খুলিয়াছিল। তাই সিদ্ধার্থ লোলচর্ম্ম বৃদ্ধের মধ্যে, মরণযাত্রীর মধ্যে, বিশ্বের অনিত্যলীলার স্বরূপ ও রূপ প্রগাঢ়ভাবে দেখিতে পাইয়াছিলেন। নতুবা আমাদের সম্মুখেও ত বিশ্বের ধ্বংসলীলার কি বিরাট সমারোহ চলিতেছে; কত

প্রিয়তমের, আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু বিচ্ছেদ অহরহ ঘটিতেছে, কত আশার স্বপন ধূলিসাৎ হইতেছে! কই, তাহা দেখিয়া আমাদের মন ত আতঙ্কিত হয় না, অথবা জীবনের অনিত্যতা বুঝিয়া ঝুলিকাঁথা ঘাড়ে করে না, কিম্বা অন্ততঃপক্ষে স্বার্থ, দ্বেষ, হিংসার পরিমাণ কিছুমাত্রই কমায় না!

আবার পূর্ব্বোক্ত অবস্থার দ্বিতীয় ধাপে—বাহ্যবিমুখতা, সংসারের প্রতি নিস্পৃহ নিরাকাঙ্খতার প্রগাঢ়তায় আত্মার মধ্যে যে এক প্রকার শূন্যতার সৃষ্টি হয়, সেই অবস্থায় আত্মার ভিতর অতি গভীর হইতে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্যের" ডাক আসে। সিদ্ধার্থের জীবনে এই ডাক আসিয়াছিল—'অনিত্যমসুখম্ লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্'। সেই জন্য "সর্ব্ব প্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন" তিনি 'হোম-হুতাশন' জ্বালিতে পারিয়াছিলেন। এই ভাবের কাছে মানুষের আর কোন দ্বিধা বিজ্ঞতা থাকিবার নয়; যতদিন ইহা না আসে, ততদিনই বিচার বিতর্কের স্বাধীনতা। কিন্তু একবার এবং সমগ্রভাবে আসিয়া গেলে মানুষের নিজত্বকে বিসর্জ্জন দিতেই হয়। স্বকীয়তার আর কোন স্থান থাকে না। সেইজন্য "তারি লাগি রাজপুত্র পরিয়াছে জীর্ণ কন্থা, পথের ভিক্ষুক……"

সংসারেরও অবশ্য সকল অবস্থায় আত্মস্থৈর্য্য, আত্মোদ্দেশ্য অক্ষুন্ন রাখা যায়, এমন পথ ভারতের যোগীতে অসিদ্ধ হয় নাই। গীতার ন্যায় চরমজ্ঞানেরই ত সৃষ্টি মহাযুদ্ধের বিপুল উদ্বেগপূর্ণ কোলাহলের মধ্যে। গীতায় ভগবান বারম্বার বলিয়াছেন এবং গীতার ভগবান অবিসম্বাদিতভাবে সুপ্রমাণ করিয়াছেন, যে 'সুখেদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ", কিম্বা 'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহা', হইয়া আত্মার শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশে সংসারের সকল কর্ত্তব্য অনাবিল অভ্রান্তভাবে সম্পাদন করা যায়; অথচ তাহাতে বদ্ধ হইতে হয় না—যন্ত্রের মত স্বচ্ছন্দ, সহজ, সাবলীল গতিতে প্রত্যেক কর্ম্মই নিষ্পন্ন হইয়া যায়। বরং তাহাতে এই উপকার সাধন হয় যে, এইরূপ কর্ম্মীর স্পর্শে সংসারের অন্যান্য বিরোধী বস্তুগুলি দিব্যভাবের সহায়ক হইয়া উঠে; মানুষও সেই আদর্শে উন্নীত রূপান্তরিত হইতে থাকে। কিন্তু সে পথ বীরের পথ, শক্তিসাধকের পথ। সমগ্র যাঁহারা এক মহাশক্তির অংশ, আধার, বিকাশ, লীলারূপে গ্রহণ করেন, দেখিতে পারেন, তাঁহাদেরই এই পথ। এই পথ তাঁহাদের পক্ষেই প্রশস্ত। কোন খণ্ডচেতনা—জীবনের মধ্যে কোন খণ্ড অনুভূতি বা প্রেরণার দ্বারা, অথবা সাধনায় এ পথ প্রথমতঃ সিদ্ধ হয় না। এ পথ স্বীকারের পথ, বিশ্বাসের পথ, আত্মনিবেদনের পথ—'নেতি-নেতি'র পথ নয়। সিদ্ধার্থ অমূত্রের খণ্ডচেতনা লইয়াই কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন। জীবনের বাহ্যলীলায় কর্ম্ম বা প্রবৃত্তির যে সুকঠোর নিগড় রহিয়াছে, তাহাকে সিদ্ধার্থ স্বীয় আত্মার বন্ধনের বস্তু, বিরোধ, জয়ের নিজস্ব বস্তু বলিয়াই অনুভব করিয়াছিলেন। তাহা যে অনাত্মীয় বিজাতীয় কিছু হইতে পারে, তাহার মধ্যে আপনা হইতেই শুদ্ধ সিদ্ধ হইবার কোন ব্যবস্থা থাকিতে পারে, অথবা তাহাকে যে অনাহত প্রশান্ত আত্মারই প্রবর্ত্তিত কর্ম্মের কোন অনুস্যূত মহনীয় ধারাও হইতে পারে, 'ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ'—সে সমগ্রতার চেতনা ও নির্দ্দেশ সিদ্ধার্থের মধ্যে আসিবার পথ হয় নাই। তাহা হইলে, জীবনের অভাব অমঙ্গলকে আত্মশক্তির পরীক্ষা, কিম্বা প্রকৃত সত্যকে খাঁটী করিয়া গড়িয়া তুলিবার হেতু বা বন্ধু রূপে গ্রহণ করিবার কোন বাধা সিদ্ধার্থের হইবার ছিল না।

তবে সাধারণতঃ যেমন হয়, সংসার পরিত্যাগের এই ডাক সিদ্ধার্থের পক্ষে আত্মহত্যার বা সংসারকে আদৌ অস্বীকার করিবার কারণ হয় নাই। নিজের প্রকৃতির মধ্যে, জীবনের চারিভিতে যে আসক্তি, অবিদ্যা বা মারের প্রভাব রহিয়াছে, তাহাই অতিক্রম করিতে ইহা প্রাথমিক সহায়তা করিয়াছিল। সে ডাক ক্ষুদ্র মমতা-মাঙ্গল্যকে ছাড়িয়া বৃহত্তর মমতা-মাঙ্গল্যের সৌকর্য্যার্থে সাহায্য করিয়াছিল। যদিও উহা সত্ত্ব-তামসিকতা-প্রসূত, কিন্তু তাঁহার কর্ম্মের মধ্যে 'ষ্টোয়িক' সাধনার অনুরূপ কিছু সত্ত্বতামসিকতার আদর্শ ছিল বলিয়াই, (যাহার মূলে রহিয়াছে আত্মিক শক্তির প্রতিষ্ঠা এবং কর্ম্মেরও কিছু প্রবৃত্তি) তাঁহাকে কোনদিন স্বার্থপর মুমুক্ষত্বে সমাহিত করিতে পারে নাই। আবার শুধু 'ষ্টোয়িক' লক্ষ্যোপযোগী

নির্দ্দয় আত্মজয়ের উষর আনন্দেও তাঁহার অন্তরাকাঙ্ক্ষা সুতৃপ্ত হয় নাই। উভয় গুণই তাঁহার প্রকৃতিতে সংযোগ ও সমতা সাধন করায় অন্তরাত্মা তাঁহাকে সাধনায় 'মধ্য'-পন্থার নির্দ্দেশ দিয়াছিল। তারপর সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হইলেন; নির্ব্বাণের কল্যাণে তাঁহার মনের সকল অভাব, দৈন্য মুক্তির নিশ্বাস ফেলিল—তাঁহার সত্তা সত্বময় হইল। জীবনের প্রারম্ভে যে প্রেরণা ও প্রয়োজন তাঁহাকে সাধনায় প্রবুদ্ধ করিয়াছিল, তাহার রূপান্তর হইল। তাহা মহত্তর ও শুদ্ধতর শক্তি ও জ্যোতিতে উদ্বুদ্ধ ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। ত্যাগ, সংযমের অপূর্ব্ব অবদানে তাঁহার জীবন লাভ করিল চির পিপসা মিটাইবার অব্যর্থ যোগ্যতা। সেই সুপরিচিত জীবপ্রীতি, সর্ব্বভূতে আত্মবোধ—দয়া, প্রেম, সাম্য মৈত্রীর কথা, সেই আত্মজয়ের কথা হইল তাঁহার স্বপ্ন জাগরণ, নিশ্বাস প্রশ্বাসের বাণী; তাঁহার ধর্ম্ম ছিল নৈতিকতার পরাকাষ্ঠা। সংসার ছাড়িয়া, ভিক্ষুভিক্ষুণী সাজিয়া নিরাপদ্ কর্ম্মের সার্থকতার কথা, আত্মার নিরীহ নিরুদ্বিগ্ন আনন্দের কথা অর্দ্ধেক এসিয়াকে গ্রাস করিল। কিন্তু আমাদের মনে হয়, গুণের অতীতে এক অখণ্ড মহাচৈতন্যে (superconsciousness) আত্মসত্তাকে নির্ব্বাণ করিলে আধারে যে অপরিমেয় শক্তিজ্ঞান, ভগবত্তুল্য যে অভাবনীয় কর্ম্মদক্ষতা নামিয়া আসে, 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'—বুদ্ধত্বের অর্থ তাহা হইলে, শুধু এসিয়া কেন, সমগ্র বিশ্ব-মন পরিবর্ত্তিত করিতে পারিত।

মনোহর

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

শ্রাবণ মেঘের ধূসর সুনীলে,
নয়ন আমার হরিয়া কে নিলে—
করি নয়নের নিকষ কালোয়—
ভুবন ভরিলো আলোয় আলোয়;
তবুও রহিলে আঁখির আড়ালে
বিরহের ব্যথা বৃথাই বাড়ালে॥
যদি দেখা দাও তবে কি মিলন,
হ'বে মনোরম চির অতুলন?
বঞ্চিত পাবে বাঞ্ছিতের দেখা,
আঁখির-আকরে একা তুমি একা,
কিরণ-ঝরান অতুল মাণিক,
করি দেবে মোরে চির অনিমিখ,
স্তব স্তুতি আর ধ্যান আরাধনা
হবে কি সফল সকল সাধনা?

সর্ব্বহারা

(গল্প)

শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী

ওদের রোজ দেখা যেত—

দেবালয়গুলির আশে-পাশে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, রঘুনাথজী, গোবিন্দজীর মন্দিরে মন্দিরে, যখন যেথানে ঠাকুরের প্রসাদ-বিতরণ হয়, কাঙালীরা মুষ্টিভিক্ষা পায়, সেইখানেই দেখা যায়—ওদের স্বামী-স্ত্রী দু'জনকে।

স্ত্রী—তন্বী, তরুণী; নাম তার লছমী, রূপেও লছমী। অমন রূপ ছোট লোকের ঘরে কি—ভদ্রঘরেও কখনও ক্বচিৎ চোখে পড়ে।

স্বামীটীর নাম কেউ জানে না বোধ হয়, সকলে তাকে স্থরদাস বলে' ডাকে,—কারণ সে অন্ধ।

'মায়ের অনুগ্রহে' বেচারার দুটী চক্ষুই নষ্ট হয়ে গিয়েছে; শুধু তাই নয়, চেহারার স্বাভাবিক শ্রীটুকুও তার একেবারে নিশ্চিহ্ন, বিলুপ্ত।

এক সময়ে সে দেখ্‌তে হয় তো মন্দ ছিল না নেহাৎ,—কিন্তু এখন...

সেই বিকৃত-দর্শন হতশ্রী ভিক্ষুকের পাশে ভোরের ফোটা ফুলটীর মত লছমীকে দেখে' দর্শকের মনে স্বতঃই একটা সুকরুণ বেদনার অনুভূতি জাগে।

দৃশ্যটা শুধু করুণ নয়, নির্ম্মমও বটে।

অন্ধ স্বামীর হাতখানি ধরে', লছমী যখন পথে বা'র হয়, তখন পথের পথিক চোখ ফেরাতে পারে না সহজে।

যোগীয়া রংয়ের শাড়ীর জীর্ণ আঁচলটুকুতে সুঠাম তনুলতার পুষ্পিত যৌবনশ্রী তার সবখানি ঢাকা পড়ে না, এলোমেলো রুক্ষ কেশ ধূলি-ধূসর বাতাসে চঞ্চল হয়ে মুখে চোখে ছড়িয়ে পড়ে বার বার, দৃষ্টিহীনের কুণ্ঠিত বিক্ষিপ্ত চরণক্ষেপের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চল্‌তে গিয়ে তরুণীর সাবলীল চলার গতির ছন্দ কেটে যায় থেকে থেকে।

তবু সকলেই অবাক্ হয়ে দেখে,—এ যেন কৃষ্ণপ্রেমে উদাসিনী রাধারাণী!

তা'র তুলনায় স্থরদাসকে এমন অশোভন বিশ্রী ঠেকে! দ্রষ্টাদের মধ্যে অনেকেই আপশোষের আধিক্যে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে' বলে—

—আহা গো! ভগবানের একি অবিচার! অমন পদ্মফুলের মত মেয়েটী, তার কপালে কি না......

কেউ বা বিরূপ মনের ক্ষোভের জ্বালা চেপে রাখ্‌তে না পেরে সেই সুশ্রী তরুণীটীর দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে মুখের ওপর বলে' ফেলে—

—আরে কিসের কপাল? ও তো ইচ্ছে করে'ই... হুঁ, দিক না ওটীকে ছেড়ে কপাল ফিরে যাবে এখুনি!

লছমী পাশে থাকে বলে'ই বোধ হয় স্থরদাসকে কেউ বা দেখে অতি দরদের চোখে, আর কেউ বা শুধু বিদ্বেষ—যা'র যেমন মনের গতি!

কিন্তু এই অন্ধ স্থরদাস দেখ্‌তে শুন্‌তে একদিন ভালই ছিল, ওদের জাতে অমন সুষ্ঠু আকৃতি ও প্রকৃতি সচরাচর দেখা যায় না। নিজের জাত-ব্যবসা অর্থাৎ মুচির কাজ করে' লোকটা এক সময়ে বেশ দুপয়সা উপার্জ্জনও করেছে, কিন্তু মায়ের দয়ায় চক্ষু হারাবার সঙ্গে সঙ্গেই ওদের সব গিয়েছে।

বড় কষ্ট, বড় দুঃখ পেয়ে শেষে লছমী অন্ধ স্বামীকে নিয়ে চলে এসেছে শ্রীবৃন্দাবন ধামে, কাঙালের ঠাকুরের অভয় চরণে শরণ নিতে। এখানে ভিক্ষা-বৃত্তি করে'ও শান্তিতে দিন কাটে তা'র।

ওদের দয়া করে সকলেই, এক মুষ্টির জায়গায় চার মুষ্টি ভিক্ষা স্বেচ্ছায় তুলে দেয়। অভাব নেই, অভিযোগও নেই।

কেবল স্বামীর দৃষ্টিহীনতার দুঃখ—সে দুঃখ তো যাবার নয়! তবু—লছমী সাধু সন্ন্যাসী দেখ্‌লেই পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে, মন্দিরে মন্দিরে মাথা কোটে, যদি-যদিই কোনো দৈবশক্তিতে অন্ধ তা'র চোখের জ্যোতিঃ

ফিরে পায়। ঠাকুরের দয়া হ'লে অসম্ভবও সম্ভব হয় যে! পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে, জন্মান্ধ চক্ষুষ্মান্ হয়। তবে তা'র ই বা কেন……

লছমী দিনে রাতে একশো বার প্রার্থনা করে—ঠাকুর! ঠাকুর! দয়া কর—

সে একাগ্র প্রাণের আকুল প্রার্থনা ঠাকুরের পাষাণ বুকে বাজে কি না—কে জানে!

কিন্তু সরলা লছমীর মনের বিশ্বাস এক তিল টলে না।

অখণ্ড শান্তি ও সান্ত্বনা নিয়ে সে অন্ধ পতির সেবা করে' যায় ভগবদ্ভক্তের দেবসেবার মত, শুধু ভক্তি দিয়েই নয়, তদ্গত চিত্তের একনিষ্ঠ প্রেম, প্রীতি ও বুকের দরদ ঢেলে'। দৃষ্টিহীনের সকল ত্রুটি, সকল অভাব পূর্ণ করে সে অশ্রান্ত অক্লান্ত চেষ্টায়।

শুধু ঘরেই নয়, বাইরেও—

সকালের দিকে ভিক্ষার্থীরা যখন দলে দলে মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গনে জড়ো হয় এসে, তখন লছমী স্বামীকে তাদের ভীড় থেকে তফাতে গাছতলায় নিয়ে গিয়ে বসায়, তা'র গায়ে, মাথায় ধূলো কি কুটোটী পড়্‌লে তক্ষুনি ঝেড়ে দেয়, ঘাম হলে আঁচল দিয়ে বাতাস করে, মুখে মাছিটী বস্‌তে পায় না, ক্ষুদে একটী পিপ্‌ড়ে পর্য্যন্ত কাছে ঘেঁস্‌তে দেয় না, এতই সতর্কতা!

এতটুকু শ্রান্তি কি বিরক্তি নেই এ সব কাজে তা'র।

ভিক্ষালব্ধ সামগ্রীর মধ্যে ভাল জিনিষটী বেছে বেছে লছমী স্বামীর মুখে তুলে' দেয় সযত্নে।

সুরদাস বাধা দিয়ে বলে—

—তুই নিজের জন্যে রাখ্‌লি না রে?

—রেখেছি তো! আমি ঘরে গিয়ে খাব, এখানে এত লোকের মাঝখানে কি খাওয়া যায়?

লছমী হাসে, তৃপ্তির মধুর হাসি।

যাত্রীরা সেদিক থেকে যাবার সময়ে খানিক অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকে ওদের পানে সাগ্রহ, সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে; ভাবে—এ-বুঝি কোন শাপভ্রষ্ট দেবদম্পতী! পয়সা কড়ি যে যা পারে, অযাচিতেই দিয়ে যায় তারা। অন্ধের পার্শ্ববর্ত্তিনী লছমীর ঋষিকন্যার মত, শান্ত, কমনীয় রূপশ্রী তাদের চমৎকৃত করে, মুগ্ধ করে, লুব্ধ কর্‌তে পারে না। সতীর পুণ্য দীপ্তিতে কামীর লালসাময় দৃষ্টি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে আপনা-আপনি।

বিশেষ কোন কারণ হ'লে—এক একদিন ভিক্ষা পেতে অযথা দেরী হয়ে যায়। অনেক ক্ষণ বসে' বসে' সুরদাস বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে; তখন মাথাটা তা'র নিজের কাঁধে রেখে', তাকে খুসী কর্‌তে, ক্লান্তি দূর কর্‌তেই যেন ও গুন্-গুন্ করে ভজন গান করে—

"মেরে তো গিরধর্ গোপাল দুসরো না কোই।
যাকে শির মৌর মুকুট, মেরো পতি সোই,
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, কণ্ঠমাল হোই।"

গানের তন্ময়তার মধ্যে সেই অশিক্ষিতা গায়িকার মৃদু কণ্ঠের স্বাভাবিক মিষ্ট সুরটুকু কখন পঞ্চমে উঠে যায়, উচ্ছ্বসিত ভাবের আবেগে উন্নত বুকখানা তা'র দুলে দুলে ওঠে, আত্মহারায় আধ-নিমীলিত আয়ত নয়নকোণের শুভ্র প্রেমাশ্রু-ধারা নিটোল গাল দুটীতে কখন নিঃসারে গড়িয়ে পড়ে, তা সে জান্‌তেই পারে না।

সে গান দূরের মানুষকে কাছে টেনে' আনে; নিষ্পলক, নিস্পন্দ শ্রোতাদের মনে পড়ে' যায় কত কাল, কত যুগ-যুগান্তের অদেখা, যৌবনে যোগিনী, কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী রাজরাণী মীরার কথা—এ যেন তারই প্রতীক!

এক সময়ে সহসা চমক-ভাঙা হয়ে লছমী দেখে, অনেক-গুলি ভাবমুগ্ধ উৎসুক দৃষ্টি তার মুখের ওপর, অমনি গান থেমে যায়। সুরদাস জিজ্ঞাসা করে—

—কি হ'ল লছমী?

—কিছু না।

—তবে থাম্‌লি যে?

উত্তর না পেয়ে সুরদাস সস্নেহে লছমীর হাত বুলিয়ে বলে—

—ক্ষিদে পেয়েছে?

—উহুঁ—

—তা'হ'লে আর একটু……তোর এ ভজন শুনলে ক্ষিদে তেষ্টা সব হরে' যায় যেন, সত্যি এমন মিষ্টি…

লছমী ওদিকে মুখ ফিরিয়ে ধীরে ধীরে আবার গায়—

—"ভাই ছোড়া, বন্ধু ছোড়া, ছোড়া সব কোই,
মেরে তো গিরধর্ গোপাল দুসরো না কোই !"

স্বামীকে এতটুকু আরাম দিতে পারলে লছমী যেন কৃতার্থ হ'য়ে যায়। স্বামীর তৃপ্তি, স্বামীর তুষ্টিই তার জীবনের একমাত্র পরম লক্ষ্য।

লছমী একদিন শোনে, জগন্নাথ-মন্দিরে একজন সাধুবাবা এসেছেন বদরীনারায়ণ হ'তে। তিনি বড় জাগ্রত ও সিদ্ধবাক্, যাকে যা' বলেন তাই ফলে নাকি।

শুনে' লছমী তো সারা রাত ঘুমাতে পারে না। সাধুর কৃপা-লাভ ভাগ্যে যদি ঘটে, আশায় প্রবুদ্ধ হয়ে রাত পোহাতেই সুরদাসকে নিয়ে যায় সে সাধু-দর্শনে।

লছমীর বরাত ভাল, সাধু-দর্শনের জন্য বেগ পেতে হ'ল না।

মন্দিরের বাইরে, যমুনার দিকে, একটা প্রকাণ্ড ঘন-পল্লব বেল গাছের তলায় সাধুজী একলাটী বসেছিলেন, চোখ বুজিয়ে বোধ হয় তিনি ধ্যানস্থ।

ওরা একটী পাশে গিয়ে বসল অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে। খানিক পরে সাধুজী চোখ খুলতেই লছমী স্বামীকে প্রণাম করতে ইসারা করে, ভক্তিতে আনত হয়ে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করলে।

সাধুবাবা প্রসন্ন দৃষ্টিতে ওদের পানে চেয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন—জয় হোক্, ভগবান মঙ্গল করুন।

ভয়ে ভয়ে একটুকু এগিয়ে এসে' লছমী হাত দুখানি জোড় করে' করুণ কণ্ঠে, অনুনয়ের সুরে বললে—

—একটী ভিক্ষা চাই, বাবা! তোমার কাছে আজ বড় আশা করে' এসেছি।

—এ ভিখারীর কাছে কি ভিক্ষা চাস্, বেটি?

সাধুর সদয় বচনে আশ্বস্ত হয়ে লছমী স্বামীকে তা'র সাক্ষাতে এনে বলে—

—এঁ'র অন্ধ চোখে দৃষ্টির আলো; আর আমি কিছু চাই না, বাবা!

সুরদাসের দৃষ্টিহীন চোখ দুটার দিকে এক মুহূর্ত্ত নীরবে চেয়ে থেকে সাধুবাবা বললেন—

—কিন্তু আমি তো চিকিৎসক নই, মা!

—চিকিৎসা তো কতই হ'ল বাবা! গরীব মানুষ, সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গেছি, তবু কিছুতেই আরাম হয় না। সাধু সন্ন্যাসীও কত দেখালুম—

সাধুজী স্নিগ্ধ হাসি হেসে' মিষ্ট সান্ত্বনার স্বরে বললেন—

—পাগলী! সাধু সন্ন্যাসী কি করতে পারে? তা'রা তো দেবতা নয়, মানুষ, মানুষের শক্তি কতটুকু? ভগবানকে ডাকো।

—তা'কে তো ডাকছিই দিনরাত, কিন্তু আপনি···

লছমী সাধুবাবার পায়ের তলে লুটিয়ে পড়ে, সজল চক্ষে মিনতি-করুণ কণ্ঠে বলে—

—ছলনা করো না ঠাকুর! দয়া কর! আমি বড় দুঃখিনী, দেবার মত আমার কিছুই নেই আর; কিন্তু স্বামীর অন্ধ চোখে দৃষ্টিদানের জন্যে আমি প্রাণ দিতে পারি।

—প্রাণ দিতে পার?

সাধুর বিস্ময় চকিত প্রশ্নের উত্তরে লছমী মাথা তুলে' চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে ধরা-গলায় দৃঢ়তার সহিত বললে—

—হাঁ, এ আমার মুখের কথাই নয়, ঠাকুর! ভগবান জানেন, জীবন দিলেও আমার স্বামীর চক্ষু যদি··

সুরদাস এবার আহত হয়ে হেসে' বলে' উঠ্‌ল—

—লছমী!

সাধু দেখেন, সুরদাসের অন্ধ চক্ষে জল ঝরছে। আর লছমীর অশ্রুসিক্ত মুখখানিতে এ কিসের জ্যোতিঃ!

সাধুর আপাদ-মস্তক রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, ভক্তি-গদগদ গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়...

—গোবিন্দ!

তা'র ভাবমগ্ন প্রশান্ত মুখের পানে আশ্বাস-ভরে' তাকিয়ে লছমী কৃতাঞ্জলি হয়ে আবার বলে—

—দোহাই বাবা! শরণাগতকে দয়া কর, বলে' দাও কি করলে ওর চোখ আরাম হ'তে পারে?

লছমীর নিঃসহায় কাতরতা সংসারত্যাগী নির্লিপ্ত সন্ন্যাসীকেও বিচলিত করে' তোলে। কিন্তু কি বলবেন তিনি, ওকে কি বলে' যে প্রবোধ দেবেন, তা' ভেবেই পান না।

আবার সেই অনুনয়, চোখের জলে ভেজা কাতর কাকুতি!

নিরুপায় হয়ে শেষে শরণাগতাকে সান্ত্বনা দিতেই বল্‌তে হয়—কি আর করবে, মা? গোবিন্দজীকে ডাক, মানসিক করে' তাঁ'র চরণে তুলসী দিতে পার যদি নিজের হাতে, তাতেই তোমার স্বামী আরোগ্য হবেন।

লছমীর বুক থেকে যেন পাথর নেমে যায়।

ফের্‌বার পথে গাছপালার আব্‌ডালে আস্‌তেই সে উচ্ছ্বসিত পুলকাবেগে সুরদাসকে জড়িয়ে ধরে, বলে.. তা'হলে গোবিন্দজীকে আজ থেকেই তুলসী দিতে আরম্ভ করি, কেমন?

থাক্ লছমী!

লছমী থম্‌কে স্বামীর মুখপানে চায়, সে মুখে আনন্দের লেশ মাত্রও নেই। ব্যথিত হয়ে' সে বলে—

—কেন? বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার? এমন একজন মহাপুরুষ, যাকে সব দেবতা বলে' মান্‌ছে, দেবতার মতই যাকে দেখায়, তা'র মুখের বাক্য কি নিষ্ফলা হতে পারে?

—না, তাতো আমি বল্‌ছি নারে।—তবে .....

—তবে কি? তুমি আমাকে বাধা দিতে যাও কেন? অ্যা! সুরদাস ম্লান হেসে উত্তর দেয়—

—বাধা যাদের দেবার তারাই দেবে, লছমী! ঠাকুরের পায়ে তুলসী দিতে তোকে দেবে কে বল্ তো? মন্দিরের ভেতর ঢোক্‌বার অধিকারও যাদের নেই—

তাই তো!—লছমীর মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে' যায়। ভাগ্যদোষে তারা নীচকুলে জন্মেছে বলে'ই কি ওদের স্পর্শে দেবালয় অপবিত্র, দেবতা অশুচি হয়ে' যাবে,—বাস্তবিক?

কিন্তু তিনি যে কাঙালের ঠাকুর, পতিতপাবন হরি, তাঁ'র সেবা পূজায় যে উচ্চ-নীচ সকলেরই সমান অধিকার! না, লছমী যাবে, বাধা নিষেধ কারো মান্‌বে না।......দিনে না হোক্, সন্ধ্যে বেলা অন্ধকারে ভীড়ের মধ্যে কোনও ফাঁকে ঢুকে' পড়ে' চুপি চুপি গোবিন্দের শ্রীচরণে.........দীনবন্ধু ভক্তবৎসল তিনি, দীন ভক্তের প্রাণের পূজা—গ্রহণ করবেন না—এও কি কোনও কথা?

সন্ধ্যার আগেই লছমী বেরিয়ে গেছে।

সুরদাস কুটীরে একা, উৎকর্ণ হয়ে প্রতীক্ষা করছে তা'র। সে কখন্ ফির্‌বে, কি জানি!

অন্ধ অসহায় স্বামীকে লছমী এক মুহূর্ত্তেও একা ছাড়ে না, কিন্তু আজ নিতান্ত দায়ে ঠেকেই......

স্বামীর ব্যাধি-মুক্তির দৈব-কৃপালব্ধ এই শুভযোগ অবহেলা করে সে কেমন করে'?

সুরদাস নিজের মনে বেশ জানে, এ ব্যাধি তার আরোগ্যের বাইরে; তবু লছমীকে কথাটা মুখ ফুটে' বল্‌তে পারে না, বল্‌তে মায়া করে যেন।

বেচারী তা'র ভ্রান্ত আশা ও বিশ্বাস নিয়ে একটুকু শান্তিতে থাকে যদি,—থাক্ না।

সন্ধ্যার শেষ আলো ফুরিয়ে যায় কখন্।

কুটীর-কোণে লছমীর হাতের জ্বালিয়ে রাখা সন্ধ্যা-দীপটী মিটি মিটি করছে। ম্লানায়মান শিখাটুকু তা'র ঘন ঘন কাঁপে, এখনি নিভে যাবে হয়তো, এই আঁধার জগতের প্রাণীটীর চোখের পর্দ্দা ঘনতর করে' দিয়ে।

আকাশে মেঘ উঠেছে না? হ্যাঁ, ওই তো,—গুরু-গুরু করে' ডাকে—।

কে একজন পথিক—আকাশের কালো কালো ঘন ঘটার পানে তাকিয়েই বুঝি মনের উল্লাসে গান ধরেছে—

—"শ্যাম বিনা ঘটা শ্যাম নহি' ভাওয়ে।
ঘন গরজে,—গরজে হিয়া বিরহন,
নিরদয়ি পপীহা সতাওয়ে।"

বাঃ! ভারী মিষ্টি লাগে ও-গানটুকু, মনে মনে আবৃত্তি করে' অমনি করে'ই গাইতে চায়, গাইতে সে পারে না এমন নয়, কিন্তু কণ্ঠে তার গানের সুর আজ ফোটে না—কিছুতে। মনটা শুধু চঞ্চল নয়, এত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে কেন? লছমী পাশে না থাকলে তা'র......

ঢঙ্ ঢঙ্ করে আটটা বেজে গেল, কাছে কোন্ মন্দিরের ঘণ্টায়। রাত হয়ে' যায় যে, লছমী করে কি? এত দেরী হ'বার তো কথা নয়!—

কিসের একটু শব্দে সচকিত হয়ে সে আস্তে আস্তে অনভ্যস্ত হাতে দরজাটা খুলে' দিয়ে ডাকে—

—লছমী!

না, কেউ তো নেই, ও বাতাসের শব্দ। দু-এক ফোঁটা বৃষ্টিও যেন পড়্ছে টুপ্-টাপ্ করে'।

সুরদাস আর বিছানায় না ফিরে' সেই খানেই বসে' পড়ে চৌকাঠের ওপর। এত দেরী হয় কেন? কি যে হ'ল তার!—অন্ধকারে হোঁচট্ খেয়ে কোথাও পড়ে' যায় যদি, কিম্বা ওকে একা, অসহায়, পেয়ে কেউ......

রাজ্যের দুশ্চিন্তা—উদ্বেগ...স্নেহ-ব্যাকুল চিত্তকে তা'র অধীর করে' তোলে।

হায়! লছমীকে সে আজ কেন যেতে দিলে? লছমী তো—শুধু অন্ধের যষ্টীই নয়, তা'র ভাঙা কুটীরে চাঁদের আলো,—তা'র সর্ব্বস্ব! লছমীকে যদি হারাতে হয়......

উঃ!—না না,...ওরে লছমী!—

সুরদাস ছুটে' যেতে চায় তখুনি প্রিয়ার সন্ধানে,—কিন্তু অন্ধকারে অচেনা পথে সে যায় কেমন করে'?—অন্ধ, দৃষ্টিহীন,—লছমীর হাতখানি না ধরে' সে যে এক পাও কখনও চলে নি—লছমী চল্তেই দেয় নি,—কায়ার সাথে ছায়ার মত সর্ব্ব ক্ষণ কাছে কাছে থেকে ওকে একেবারেই অক্ষম নির্ভরশীল করে' রেখেছে।

নিরুপায় হ'য়ে—হাৎড়ে হাৎড়ে লাঠী-গাছটা নিয়ে সুরদাস বেরোতে যাবে, এমন সময়ে কে খপ্ করে' তা'র হাতখানা ধরে ফেলে। সে স্পর্শ সুরদাসের চিরপরিচিত, কিন্তু—এত ঠাণ্ডা কেন? কাঁপ্ছেও তো!

অধীর আগ্রহে সে বলে' উঠ্ল—

লছমী! একি?

লছমীর মুখে কথা নেই। স্বামীকে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে সে শুয়ে পড়্ল নিঃশব্দে।—

প্রদীপ নিভে গিয়েছে অনেক ক্ষণ।—

—ফিরে এসেই শুয়ে পড়্লি যে?—কি হ'ল?—

সুরদাস লছমীর শিথিল দেহখানা ব্যগ্র ব্যাকুল বাহু-বেষ্টনে জড়িয়ে ধরে, তার বেপথু হৃদয়ের অস্বাভাবিক দ্রুতস্পন্দন বুক দিয়ে অনুভব করে' শশব্যস্তে বলে—

—পড়ে' গেছ্লি নাকি?—হ্যাঁরে? ওকি কাঁদ্ছিস্? লছমী তখনও সাড়া দেয় না।

সুরদাস আরও অধীর হয়ে লছমীর হাত বুলিয়ে কাতর-ভাবে জিজ্ঞাসা করে—

—বড় লেগেছে না? আহা হা—আমি তো মানা করেছিলুম যেতে—কোথায় লাগ্ল?—বল না লছমী?

লছমী এবার স্বামীর দরদী বুকে মুখ গুঁজে' ফুপিয়ে কেঁদে' ওঠে—

—গোবিন্দজী আমার তুলসী নিলেন না গো! ওরা যে আমাকে... ..

লছমী কান্নার বেগে আর বল্তে পারে না।—

ঘটনাটা এই—

গোবিন্দজীর সন্ধ্যারতির পূর্ব্বেই স্বামীর কল্যাণার্থে মানসিক পূজোটা সেরে' নেবে মনে করে' লছমী পূজার্থীদের সঙ্গে চুপি চুপি মন্দিরে ঢুকে' পড়ে। তা'র মুখে ছিল ঘোম্টা; তার পর দীন ভিখারী সে, ওকে কেই বা জানে? প্রথমটা কেউ লক্ষ্যও করে নি, বাধাও দেয় নি। কিন্তু দালানে উঠে সে যেই বিগ্রহের সাম্নে এগিয়ে যাবে, অমনি কে বলে' উঠ্ল—

—কে রে? সুরদাসের বউ না?—

আর একজন প্রবীণা—

—ওমা!—হ্যাঁতো! একি কাণ্ড বল দেখি?—ছোট লোকের মেয়ের এত বড় আস্পর্দ্ধা... !—জেতে মুচি হয়ে একেবারে—গট্ গট্ করে' দেবতার পীঠে......

বল্তে না বল্তে হাঁ-হাঁ করে' ছুটে' আসে গোবিন্দজীর সেবাইৎরা, বাধা পেয়ে লছমী জোড় হাতে কেঁদে' বলে—তোমাদের পায়ে পড়ি বাবা! বাধা দিও না, বিগ্রহ আমি ছোঁব না। আমার স্বামীর জন্যে মানসিক করে' দূর থেকে শুধু দুটো তুলসী......

কিন্তু কে শোনে? তা'র কাতর কাকুতি জন-কোলাহলে ডুবে যায়।—

—খবরদার মাগী!—আর এক পা এগিয়েছিস্ কি...

বল্তে বল্তে একজন ষণ্ডামার্ক-গোছ লোক—তিনিই বোধ হয় প্রধান পূজারী, লছমীর গতি রোধ কর্তে ওকে এমন এক ধাক্কা দিলেন, যে সাম্লাতে না পেরে' সে হুমড়ি খেয়ে' দালানের নীচে পড়ে' যায়, এবং কত ক্ষণ উঠ্তে পারে না।

আঘাতটা শরীরে যত না হোক্, লছমীর মনে যে কতখানি লেগেছে, সুরদাস তা বেশ বুঝ্‌তে পারে। সে জানে তা'র অন্ধত্বের বেদনা তা'র চেয়েও কত বেশী অনুভব করে লছমী। বেচারী কত আশা নিয়ে'ই আজ গিয়েছিল। সুরদাসের চোখে জল এসে' পড়ে! ব্যথাহত লছমীকে নিবিড় আদরে ভরিয়ে দিয়ে সে কম্পিত গাঢ় কণ্ঠে বলে—যাক্, যা' হয়েছে তা' হয়েছে, আর কখনও অমন করে' যাস্ নি, লছমী!—

—কিন্তু—তোমার চোখ...সাধুবাবা যে বলেছিলেন···

—থাক্ গে—আমি তো বেশ আছি, আমার তো কোনো দুঃখুই নেই, মিছে কেন···

লছমী চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে অবিশ্বাসের সুরে বলে—হাঁ! দুঃখু আবার নেই নাকি? কী যে বল!—এমন করে' দৃষ্টিহীন হয়ে থাকা...

—কে বলে আমি দৃষ্টিহীন? এই তো—এই তো আমার দৃষ্টির আলো! আমার অন্ধ চোখের—

দরদী দয়িতাকে বুকে চেপে সুরদাস গদ গদ হয়ে' বলে—দৃষ্টি আমি চাই না, লছমী! তুই আমার কাছে থাক্‌লে—

—আর—আমি যদি মরে যাই? আজ সাধু-সাক্ষাতে, দেবতা-সাক্ষাতেও বলেছি, আমার প্রাণ দিলেও যদি...

—আঃ! আবার! ওই জন্যেই তো বলি—চাই-না আমি ভাল হ'তে! আমি জন্ম জন্ম অন্ধ হয়ে থাকি সেও ভাল, কিন্তু তোকে ছেড়ে···না, সে আমি পারব না, লছমী!

সুরদাস গভীর আগ্রহে লছমীকে আঁকড়ে ধরে, সে যেন সত্যি সত্যি ছেড়ে যাচ্ছে ওকে।

শেষ রাত্রে লছমী এক স্বপন দেখে, অপরূপ সে স্বপন! একটী ছেলে—ওই গোবিন্দজীর বিগ্রহের মত, অতই বড়, অমনি চমৎকার দেখ্‌তে, শ্যামল সুন্দর নবজলধর কান্তি, মাথায় মোহন চূড়া, হাতে বাঁশী, অঙ্গে অঙ্গে জ্যোতিশ্ছটা ফুটে বেরোচ্ছে, চাঁদের আলোর মত অমল স্নিগ্ধ সে জ্যোতিঃ···

স্নেহ-করুণায় টল-টল বাঁকা চোখ দুটীতে লছমীর পানে তাকিয়ে চাঁদমুখে মধুর হেসে ছেলেটী বাঁশীর মত মিষ্টি সুরে যেন বল্‌ছে—

—কাঁদিস্ কেন, লছমী? তোর পূজো তো আমি নিয়েছি! লছমীর মুখে আর কথা ফোটে না। আকুলি বিকুলি করে' উঠে, তা'র সোণার নূপুর পরা রাঙা পা দুখানিতে যেই হাত দিয়েছে, অমনি ছাঁৎ করে' ঘুমটা ভেঙ্গে' যায়।

লছমী ধড়মড়িয়ে উঠে' বসে। তখনও বুকটা ঢিপ্-ঢিপ্ করছে, গায়ে কাঁটা দিচ্ছে ঘন ঘন।

—ওঃ! এত—এত দয়া তোমার? ওগো কাঙালের ঠাকুর!

লছমী আর শুতে পারে না। কি জানি, চোখে ঘুম এসে' পড়ে—ভোরের স্বপ্ন নিষ্ফল হয়ে' যায় যদি! বুকের ওপর হাত দুখানা রেখে, চোখ বুজে সে তদ্গতচিত্তে ধ্যান করে বসে', খানিক আগে স্বপ্নে-দেখা সেই শ্যামসুন্দর মনোহর প্রেমময় রূপ—সে রূপ লছমীর মনের পটে যেন এঁকে গিয়েছে।

বল্‌বার জন্যে প্রাণটা ছট্‌ফট্ কর্‌লেও লছমী স্বামীকে বলে না—স্বপ্নটা নিষ্ফলা হ'বার ভয়ে।

কিন্তু মনে-প্রাণে যে আনন্দের বিপুল উচ্ছ্বাস উথ্‌লে ওঠে তা'র, তা চেপে রাখে সে কেমন করে'?

সুরদাসের চোখ নেই যে দেখ্‌বে—তবু লছমীর কথায় ভাবে, গলার স্বরে, দেহের স্পর্শে, এমন একটা অজানা পুলকের আভাস পায়—যাতে সে আশ্চর্য্য হয়ে ভাবে—এ কী?

এখন রোজ সকালে সুরদাস ঘুম ভেঙে' উঠ্‌লেই লছমী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে···

—একটু আলো কি দেখ্‌তে পাচ্ছ? হ্যাঁগো? ভাল করে' চাও দেখি···

—তামাসা কর্‌ছিস্, লছমী?

সুরদাসের ক্ষুব্ধ স্বরে লছমীর বুকখানা ব্যথায় ভ'রে ওঠে, আহত হয়ে সে বলে—

—না, না, তামাসা কর্ব আমি কি এমনই নিষ্ঠুর? সত্যি বল্‌ছি, এবার তুমি ভাল হবে, ভাল হতে'ই হবে যে!

—কে বল্‌লে? তোর সেই সাধুবাবা?

—উহুঁ:, তিনি তো বলে' গেছেন, এবার স্বয়ং গোবিন্দজী...বল্‌তে গিয়ে চেপে যায় লছমী, হতাশ হয় না কিছুতে।

সেদিন সকালে ঘুমে জড়ানো চোখ দুটো রগ্‌ড়ে' খুল্‌তেই সুরদাসের বোধ হ'ল—তার চোখের আবরণ একটু যেন ফিকে হয়ে' গেছে, ঈষৎ আলোর ভাব—যা' অনেক দিন দেখে নি। এমনটা রোজ তো হয় না!

ও'র চাউনীর ভঙ্গীতে আশ্চর্য্য হয়ে লছমী তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করে—

—কি গো! অমন করে চাইছ যে? কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছ?

—বুঝ্‌তে পারছি না লছমী, কি রকম একটা আলো, যা কতদিন চোখে পড়ে নি—কিন্তু ঝাপ্‌সা—

—ও ঝাপ্‌সা-ভাবও থাক্‌বে না, কেটে যাবে—দেখো।

লছমী বিস্ময়ে, পুলকে, ভক্তি-কৃতজ্ঞতায় রোমাঞ্চিত হয়ে' প্রণাম করে সেই ভক্তের ভগবান, অশরণের শরণ হরিকে। উচ্ছল আনন্দ আবেগ ছোট বুকখানাতে চেপে' রাখ্‌তে না পেরে' প্রিয়তমের গলা জড়িয়ে সে বলে···

—এইবার তুমি ভাল হয়ে যাবে নিশ্চয়! ঠাকুর আমার কামনা শুনেছেন।

সুরদাসের প্রাণটা কেমন ছ্যাঁৎ করে' ওঠে—লছমীকে সে এসে' বুকে টেনে' নেয়। মনে হয়, লছমী যেন বড্ড বেশী রোগা হয়ে গেছে, নিজের যত্ন তো সে নেয় না কোন দিন!

সুরদাস রুদ্ধকণ্ঠে বলে—

—তোর পুণ্যির জোরে ভাল যদি হয়েই যাই, তা' হ'লে আর কিছু না হোক্, তুই একটুকু আরাম পাস্, লছমী! সত্যি কি রকম রোগা হয়ে গেছিস্, আমি দেখ্‌তে পাই না বলে'ই তো?

তিন চার দিন পরে।

শুধু আলোই নয়, লছমীর চিরপরিচিত প্রিয় মুখখানিও অন্ধের দৃষ্টিপথে পড়ে—ছায়ার মত। তারপর আস্তে আস্তে প্রায় সমস্তই—স্পষ্ট নয়, ঝাপ্‌সা-ভাবে দেখ্‌তে পায় সে।

লছমীর আনন্দের সীমা পরিসীমা নেই আর।

এখন ইচ্ছা কর্‌লে সুরদাস লছমীর হাত না ধরে'ও হেঁটে যেতে পারে, কিন্তু ছাড়ে না; মনে হয়, হাত ছাড়্‌লেই লছমী তাকে ছেড়ে' যাবে!

লছমী যখন স্বার্থকতার উল্লাসে হাস্‌তে হাস্‌তে তার হাতখানা ছেড়ে' দিয়ে বলে—

—আর আমাকে ধর কেন? এখন তো তোমার চোখ হয়েছে—

সুরদাসের মুখখানা অসম্ভব গম্ভীর হয়ে ওঠে। এই অন্ধের চক্ষুষ্মান্ হওয়ার আনন্দ ওর মনে তৃপ্তি না দিয়ে এমন অস্বস্তির ভাব জাগায় যে কেন, তা' সে নিজেই বুঝে উঠ্‌তে পারে না।

স্ত্রীকে চোখের আড়াল করে না—আর—এক মুহূর্ত্ত।

লছমী মন্দিরে আর ঢোকে না, বাইরে থেকেই গোবিন্দজীর চরণে তুলসী দিয়ে আসে উদ্দেশে, প্রতি সন্ধ্যায়, একাজে একটী দিনও ভুল হয় না তা'র।

শ্রাবণের পূর্ণিমা।

মন্দিরে মন্দিরে ঝুলনের সমারোহ-পড়ে' গেছে।

দেশ-বিদেশের যাত্রী-সমাগমে দেবালয় সব গম্‌গম্ কর্‌ছে।

লছমী তা'র নিত্যকর্ম্ম সেরে', স্বামীর সাথে কুটীরে ফেরে। ঘুরে' ঘুরে' রাসলীলা দেখে' ফির্‌তে তাদের রাত হয়ে গেছে আজ।

চাঁদিনী রাত, চারিদিক্ আলোয় আলো।

আকাশ বেয়ে ঝরে' পড়ে ফুল জ্যোৎস্নার শুভ্র যুঁই ফুল রাশি-রাশি।

পথ-সংক্ষেপ হ'বে বলে' ওরা শেঠের বাগানের ধারে-ধারে যায়, স্থানটা বেশ শান্ত ও নির্জ্জন। লছমী রাস্তা

ছেড়ে দিয়ে বাগানের প্রাচীর ঘেঁসে' চলেছে স্বামীর হাত ধরে'। উৎসব-মুখর দেবালয় হ'তে গীতবাদ্যের মধুর ধ্বনি মৃদুমন্দ স্নিগ্ধ সমীরে ভেসে আসে অস্পষ্টভাবে।

মোহময়ী জ্যোৎস্না-রাত্রির বিহ্বলতা লছমীর তরুণ চিত্তকে বিচলিত করতে পারে নি এতটুকু। অন্তর তার কাণায় কাণায় পূর্ণ, কি এক অপরূপ গভীর ভাবের প্রেরণায়।

স্বপ্নালস আঁখির দৃষ্টি কৌমুদীভাসিত দূর দিগন্তে নিবদ্ধ করে', লঘু মন্থর গতিতে চল্‌তে চল্‌তে লছমী আপন মনে ধীরে ধীরে গায়—

"—মীরাকে প্রভু গহের গম্ভীরা,—
হৃদয়ে রহে না ধীরা,
আধি রাত প্রভু! দরশন দিজে
যমুনাজীকে তীরা।
মেনে চাকর রাখো জী!
হরি!—মেনে চাকর রাখো জী।"

হঠাৎ তা'র পাশে কিসের যেন শব্দ হয়, খস্ খস্ করে'। পরক্ষণে করুণ একটা আর্ত্তনাদ করে' লছমী সেইখানে বসে' পড়ে।

—কি রে? কি হ'ল লছমী?

আস্তে-ব্যস্তে লছমীকে তুল্‌তে গিয়ে সুরদাস ভয়ানক চম্‌কে চীৎকার করে' ওঠে—

—সাপ! সাপ!

লছমীর পায়ে ছোবল্ দিয়েই সাপটা ঘাসের মধ্যে পালিয়ে যায়।

সুরদাস হতভম্ব! সে যে কি করবে ভেবে পায় না। লছমীর পায়ের ক্ষত-স্থানটা চেপে ধরে' খালি কাতর কণ্ঠে বলে—

—ওগো! কেউ বাঁচাও গো!

একজন দুজন করে' সেখানে অনেক লোক আসে।

কেউ বলে—পা'টা শক্ত দড়ী দিয়ে কসে' বাঁধ, বিষটা ওপরে না উঠ্‌তে পায়।

কেউ বলে—জখমটা পুড়িয়ে ফেল, কিম্বা ছুরি দিয়ে কেটে...

কিন্তু করবার মত কিছুই করা হয় না।

কাল-ফণীর প্রাণঘাতী তীব্র গরল লছমীর প্রতি রক্ত-কণিকায় মিশে' যায় অতি দ্রুত। অসহ্য যন্ত্রণায় কম্পিত দেহ খানা তা'র অবশ হ'য়ে এলিয়ে পড়ে। মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে, দু-চোখে অন্ধকার দেখে।

—ওগো! আমি গেলুম!

বলে' সে অসীম আগ্রহে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে, কিন্তু ব্যাকুল বাহু দুখানি শ্লথ অসাড় হয়ে' পড়ে' যায়।

সোণার প্রতিমা কালি হয়ে যায় দেখ্‌তে দেখ্‌তে। সুরদাসের হাতের মুঠিতে কোমল করপল্লব তার ক্রমশঃ আড়ষ্ট ঠাণ্ডা হয়ে' আসে।

মরণাহতা প্রিয়ার বুকের পরে মাথা লুটিয়ে, মুখে মুখ রেখে, অভাগা সুরদাস বারে বারে ডাকে—

—লছমী! ও লছমী!

সে বুকফাটা ব্যাকুল আহ্বানে লছমী আর সাড়া দেয় না, তা'র কাণে তখন বিশ্বের বাণী নীরব হয়ে গেছে, উতল হয়ে বাজ্‌ছে শুধু বৃন্দাবনচন্দ্র গিরধারীর মৃদুল মধুর বংশীধ্বনি।

নিশ্চল তারকা নিষ্প্রভ আঁখি দুটীতে পূর্ণিমা-নিশির পরিপূর্ণ চন্দ্রালোক মসী-মলিন, কিন্তু অন্তর তা'র উদ্ভাসিত স্বর্গের আলোয়।

নীল-মেরে-যাওয়া ঠোঁট দুখানিতে অম্লান হয়ে আছে পরিতৃপ্তির স্নিগ্ধ মধুর হাসি।

তার পর?

সেই সোণার প্রতিমা যমুনার কালো জলে জন্মের মত বিসর্জ্জন দিয়ে বেচারা সুরদাস কুটীরে ফিরে' আসে; কিন্তু থাকতে পারে না, ছিট্‌কে বেড়িয়ে পড়ে, পথে পথে ঘুরে' বেড়ায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে। তার হাত ধরতে আজ কেউ নেই আর!

মন্দিরে মন্দিরে মাথা কুটে', চুল ছিঁড়ে' সে পাগলের মত বলে—

—আমার চোখ নাও, দৃষ্টি নাও, আমার সব নাও—শুধু লছমীকে আমায় ফিরিয়ে দাও, ঠাকুর!

কাঙালের ঠাকুর যেমন করে' লছমীর প্রাণের কামনা শুনেছিলেন, তেম্‌নি করে' যদি তা'রও শোনেন—

লছমী যদি ফেরে, এই আশায় আশ্বস্ত হয়ে সে সারাদিন পরে ধূলি-লাঞ্ছিত শ্রান্ত দেহ নিয়ে কুটীরে ফিরে' চলে, কিন্তু কই? কোথায় লছমী? লছমী রে!

শূন্য কুটীর হা-হা করে' কেঁদে ওঠে—যেন—না গো! না, সে তো আর আস্‌বে না!

দুর্ব্বিসহ মর্ম্মবেদনায় বুকখানা যখন শতধা হয়ে ফেটে' পড়্‌তে চায়, সুরদাস তখন লছমীর মত তন্ময় হয়ে' অসীম নির্ভরতায় গাইতে চেষ্টা করে সেই ভজন—

—ভাই ছোড়া, বন্ধু ছোড়া, ছোড়া সব কোই,
মেরে তো গিরিধর গোপাল, দুসরো না কোই।—"

সুর ফোটে না, মর্ম্ম-মথিত-করা ব্যথার উচ্ছ্বাসে বেপথু কণ্ঠ তার রুদ্ধ হয়ে যায়। গান হয়ে যায় কান্নার মত।

লোকে আগে বল্‌ত ওকে সুরদাস,—এখন বলে পাগল!—

কিন্তু তা' নয়,—আগে ছিল ও দৃষ্টিহারা, আর এখন—সর্ব্বহারা, রিক্ত।

শ্রাবণ সন্ধ্যায় আজ

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রাবণ সন্ধ্যায় সখি, বুঝি আজ কোনো বাতায়নে
ব্যাকুল বেদনানন্দে ব'সে একা আছ এলো-চুলে;
নবীন মেঘের ছায়া নামিয়াছে নয়নের কূলে,
বরষার ছন্দ বাজে হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনে।
সজল সমীর-শ্বাসে ক্ষুব্ধ প্রাণ কাঁদে হাহা স্বনে,
স্মরণের সরোবরে শত-কোটী ঢেউ ওঠে দুলে;
কাতর কপোতী-মন ভীরু দুটি ছোট পাখা তুলে
কুলায় সন্ধানি ফেরে অন্ধকার দূর দিগঙ্গনে।

এখানেও আজ মোর ঘনায়েছে অমনি শ্রাবণ!—
ক্লান্তিতার অবসাদে চেয়ে আছি জানালাটি ধরে';
নিবিড় নিকষ মেঘে ঢেকে গেছে সমস্ত জীবন,
আকাশ ও আঁখি হ'তে মুকুতার মালা পড়ে ঝরে'।

শ্রান্ত এ শ্রাবণ-সন্ধ্যা যেন কার স্বপ্ন-লিপি আনে;
মলিনা ক্রন্দসী জাগে নিখিলের বিরহী পরাণে॥

বর্ত্তমান ময়মনসিংহ
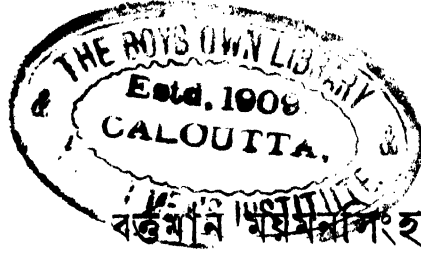
শ্রীঅনুকূলচন্দ্র রায় বি-এল

[ময়মনসিংহ জেলার ভূমির পরিমাণ মোট ৬২৩৮ বর্গ মাইল; তন্মধ্যে সহরের সংখ্যা ৯টী ও গ্রামের সংখ্যা প্রায় ৭৩৪৬। মহকুমা ৫টী—(১) সদর—১৫৫৯ বর্গ মাইল, (২) জামালপুর—১২১৭ বর্গ-মাইল, (৩) টাঙ্গাইল—১৩৩০ বর্গ মাইল, (৪) নেত্রকোণা—১১৪৯ বর্গ-মাইল, (৫) কিশোরগঞ্জ—৯৮৩ বর্গ মাইল। সমগ্র জেলার মোট জনসংখ্যা—৫১৩০২৬২। হিন্দু অধিবাসী ১১,৭৪,৩২৮ ও মুসলমান জনসংখ্যা—৩৯,২৭,৫৫২। প্রতি বর্গ মাইলে লোকসংখ্যা ৭৭৮। শতকরা শিক্ষিতের হার হিন্দুর প্রায় ১৩ এবং মুসলমানের প্রায় ৪। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা ১২৪৬, ঐগুলিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষের উপর। বিদ্যালয়ে যায় না এমন বালকবালিকাদের সংখ্যা ১০ লাখের উপর। মিউনিসিপ্যালিটি ৯ ও তাহাদের অধিবাসী সংখ্যা—(১) ময়মনসিংহ (৩০,৪৮০), (২) মুক্তাগাছা (৬১৩১), (৩) গৌরীপুর (৬৩১৯), (৪) কিশোরগঞ্জ (১৫৪৩৭), (৫) বাজিৎপুর (১১৬৫০), (৬) নেত্রকোণা (১০৯৮০), (৭) জামালপুর (২৩০৭৭), (৮) সেরপুর (১৯৫১৭), (৯) টাঙ্গাইল (১৬০৩২)। সমগ্র জেলায় ৪০ লাখ একর জমি তন্মধ্যে চাষের জমির পরিমাণ ২৩ লক্ষ একর। ময়মনসিংহ জেলা বোর্ডের বার্ষিক আয় গড়ে ১০ লক্ষ টাকা।]

স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির ইতিকথা অন্ততঃ সাধারণভাবে দেশবাসীর জ্ঞানগোচর হউক, অনেক জেলায় এরূপ প্রচেষ্টার সূত্রপাত হইতেছে, ইহা অত্যন্ত আশা ও আনন্দের বিষয়। আমাদের দৃষ্টি সাধারণতঃ বহির্ম্মুখী, ঘরের কথা অনেকেই জানি না। এই জেলার নিভৃত পল্লীতে দেশের কত কত কৃতী সন্তানের প্রতিভা নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কিঞ্চিৎ বিকশিত হইয়াই আত্মগোপন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; তাঁহাদের স্মৃতি বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহাদের পরিচয় দেওয়া সাধ্যাতীত; শুধু অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাসোলোচনা ও কতিপয় খ্যাতনামা ব্যক্তির নাম স্মরণ করিব। বর্ত্তমান অতীত হইতেই ভূমিষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমানের বৃত্তান্ত বলিতে গেলেই অতীতের দুই চারিটী কাহিনী মনকে স্বতঃই পূর্ব্ব-স্মৃতির দিকে টানিয়া লইয়া যায়। এখন, 'অসমর্থপ্রযত্নেঽপি সন্তোষং জনয়েৎ সতাং, পদে পদে প্রস্খলতো বালস্যেবাটনোদ্যমঃ' এই ভরসায় এই অযোগ্য প্রবন্ধ লিখিত হইল।
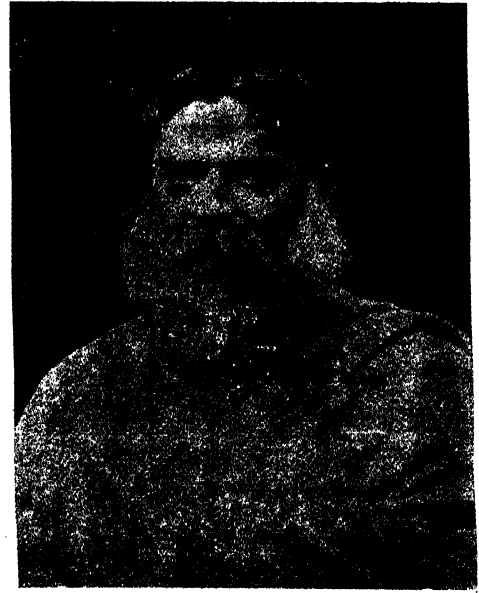
শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র

ময়মনসিংহ বাঙ্গালার সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তীর্ণ জেলা এবং এখানে অনেক ঐতিহাসিক মাল-মসলার খনি রহিয়াছে। অতি সংক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন ঐতিহাসিকদিগের লিখিত বিবরণ হইতে ময়মনসিংহ জেলার বিক্ষিপ্ত এবং অস্পষ্ট ধারাগুলিকে সমন্বিত ও সংযুক্ত করিতে প্রয়াস করিব।

থরটন্ সাহেব লিখিত বিবরণ-পাঠে দেখা যায়, হিন্দু-রাজত্বের কালে ময়মনসিংহ জেলা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর পরগণার অন্তর্গত ছিল। এই অঞ্চল অপর্য্যাপ্ত ফসলের

জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। অধ্যাপক 'অটো'র ইতিহাসে আছে বৌদ্ধযুগে ময়মনসিংহ স্বাভাবিক প্রাচুর্য্য এবং নদী-মাতৃকার জন্য বিভিন্ন বিভিন্ন বৌদ্ধ-সঙ্ঘের মিলন-তীর্থ ছিল

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ডি-এল

খৃঃ পূঃ দুই শতাব্দীতে হিতিং লামার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে জানা যায়, সনাতন ধর্ম্মসাধকদলের রক্ষণশীলতা বৌদ্ধ-প্রভাবকে তখন এ জেলায় বিশেষ খর্ব্ব করিয়াছিল। হুয়েন্‌সাঙের লিখিত বিবরণপাঠে দেখা যায়, তিনি ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকদের শিক্ষা, চরিত্র ও বীরত্বের অশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। এই প্রদেশে অতি সূক্ষ্ম একপ্রকার কাপড় তৈয়ার হইত, এ কথারও উল্লেখ আছে।

সেন-সাম্রাজ্যের বিবৃতি লিখিতে ডে ব্যারর্ ও ষ্টুয়ার্ড সাহেব ময়মনসিংহ অঞ্চলের কথা লিখিয়াছেন "প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর (বর্ত্তমান ময়মনসিংহ অঞ্চল) স্বাধীন রাজার দখলে আছে। এই প্রদেশ লক্ষ্মীশ্রীপূর্ণ—স্বাবলম্বী লোকদের লবণ ব্যতীত আর কিছুই অপর দেশ হইতে খরিদ করিতে হয় না। এখানে সোণার ভাটা লইয়া রায়তের ছেলেরা খেলা করে; লোকে ধন-রত্ন অযত্নে রাখিলেও চোর-দস্যুর উপদ্রব নাই।"

পঞ্চম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক ফা-ই-য়্যান্ লিখিয়াছেন—"এই অঞ্চলের লোকদের পরস্পরকে না-মানার একটা ভাব খুব প্রবল, একচ্ছত্র শাসকরূপে কোন রাজা বা দলাধিপতি বহুদিন টিঁকিতে পারে না। শুসঙ্গ অঞ্চলের দলাধিপতিরা সুযোগ পাইলেই বিদ্রোহ করিত। "This vast portion of the country is in a constant state of war. The different chiefs would not recognise any common leader. Political or social orders are in a state of convulsion."

মিঃ পি, কে, চক্রবর্ত্তী—সম্পাদক, এডভান্স

ইংরেজ আমলের প্রারম্ভে মারকুইস্ হেষ্টিংস্ ময়মনসিংহ জেলার ফলনশক্তি ও প্রাচুর্য্য দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হন। কৃষকদের স্বাবলম্বী ও স্বচ্ছন্দ জীবন তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জঙ্গলবাড়ীর 'জঙ্গলখাস' নামক কাপড়—যাহার গ্রীস্ ও রোমে বেশ চাহিদা ছিল—দেখিয়া স্তম্ভিত হন। কিন্তু ১৮৬০ সালে মেড্‌লিকট্ সাহেব লিখিয়াছেন—"ময়মনসিংহের কাপড়ের ব্যবসা

আজ ধ্বংসপ্রায়। কিশোরগঞ্জের প্রামাণিকদের বাড়ীর আর ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধির রূপ নাই…" ইত্যাদি।

উল্লিখিত বিক্ষিপ্ত বিবরণগুলি হইতে ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব্ব অবস্থার অনেকটা স্পষ্ট রেখাপাত হয়।

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব লুপ্ত হইলে বহু শতাব্দীর চেষ্টার ফলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম যখন পুনঃ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজ শক্তির অপব্যবহার দ্বারা শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ এবং রংপুর অঞ্চলের অন্তজ জনসঙ্ঘকে প্রাণহীন সামাজিকতার নিষ্ঠুর নিগড়ে নিষ্পেষণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সেই সময়ে বিধির বিধানে বাংলার বুকে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হইল। তাঁহার প্রেমবন্যা নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত জনগণের মনকে ঐ নিষ্পেষণ হইতে মুক্ত করিয়াছিল। এই মুক্তিযুদ্ধে ময়মনসিংহ আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিয়াছিল। ময়মনসিংহের গানে, কবিতায়, কথকতায়, ছড়ায়, পাঁচালীতে এবং ভাষায় ও মূর্চ্ছনায় একটা স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্যের রূপ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

কিরূপে পঞ্চদশ শতাব্দীতে জনৈক হিন্দুবীর (সোমেশ্বর পাঠক) নিজ অনুচর যোদ্ধবৃন্দসহ দলাধিপতি বৈশ্য গারোকে পরাজিত করিয়া ময়মনসিংহ-গৌরব 'সুসঙ্গ'-বংশের স্থাপন করেন, কিরূপে ঈশা খাঁ জঙ্গল-বাড়ীতে তাঁহার দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন, কিরূপে কিশোরগঞ্জের প্রামাণিকদিগের উত্থান পতন হয়, কিরূপে অতি প্রভাবশালী দস্যুপ্রধান কেনারাম পরিশেষে সন্যাস-জীবন গ্রহণ করেন—এই প্রকার বহু ঐতিহাসিক-কাহিনী এই ক্ষুদ্র প্রসঙ্গে বিশদভাবে বিবৃত করা অসম্ভব।

'সন্ন্যাসী'-বিদ্রোহ ময়মনসিংহের একটী স্মরণীয় ঘটনা। সে সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে যখন সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের অরাজকতাকে আশ্রয় করিয়া ময়মনসিংহ অঞ্চলের মুসলমানগণ যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছিল,
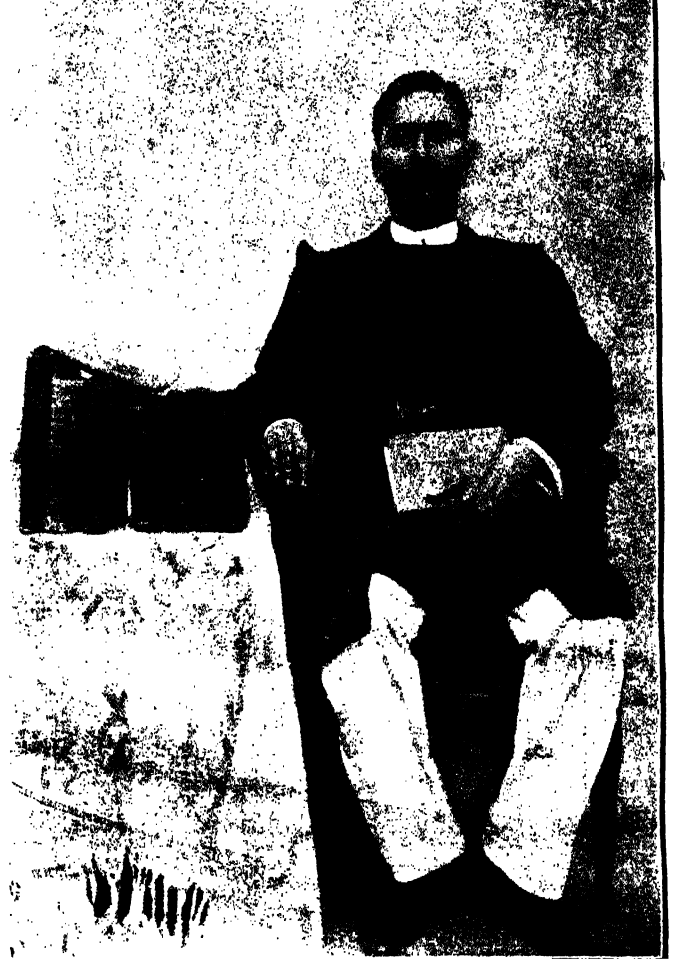
শ্রীবিপিনচন্দ্র রায় সাহিত্য-শাস্ত্রী, এম-এ, বি এল

তখন এতদ্দেশীয় প্রতিপত্তিশালী হিন্দু জমিদারগণ দিল্লীর দরবারকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীন শাসন-তন্ত্র দ্বারা আত্মরক্ষা করিয়াছিল এবং নিজেদের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়াছিল। স্বাধীন চিন্তা ও মৌলিক গবেষণা সে যুগেও এ জেলায় সম্ভব হইয়াছিল। রঘুনাথের স্মৃতি যখন সারা বাংলা অবনত মস্তকে মানিয়া লইয়াছিল, তখন ময়মন-

প্রবর্ত্তক আশ্রম, মেলান্দহ

শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার

শ্রীশশীকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, মহারাজা, ময়মনসিংহ

সিংহেরই জনৈক প্রতিভাশালী পণ্ডিত ৺কালীমোহন বিদ্যালঙ্কার স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের মত খণ্ডন পূর্ব্বক স্মৃতি-শাস্ত্রের বেদমূলক নূতন অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব রচনা করিয়া নবদ্বীপ প্রভৃতি বঙ্গদেশের স্মার্ত্তদিগের নিকট তাঁহার অভিনব মতবাদ স্থাপন করিতেছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার অকালমৃত্যুতে উক্ত কার্য্য আর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

যে জেলার গীতিকা-সাহিত্য (ময়মনসিংহ-গীতিকা) বিশ্বের আসরে প্রসার লাভ করিয়াছে এবং যেখানে নিরক্ষর চাষারাও এমনি রসজ্ঞ ছিল, যে তাহারা 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র মত উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গীত-সাহিত্য

রচনা ও চর্চ্চা করিত—সে জেলার সাহিত্য-বিভব উপেক্ষণীয় নয়। ইহা অত্যন্ত গৌরবের বিষয় যে, সেই নিরক্ষরতার যুগেও একটী মহিলা-কবি (চন্দ্রাবতী দেবী) 'ময়মনসিংহ-গীতিকার উৎকৃষ্ট অংশটী রচনা করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহ জেলার প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায়, পুরাতন কবিদিগের মধ্যে চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাস প্রভৃতির কলকণ্ঠে যখন পশ্চিম বঙ্গ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, ময়মনসিংহের সীমান্তপ্রদেশের অরণ্যভূমি চণ্ডীকাব্য-লেখক রামানন্দ গুপ্ত প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণ এই জেলায় আবির্ভূত হন। এতদ্ব্যতীত ময়মনসিংহে বহু নিরক্ষর 'সরকারের' নানাবিধ কবিগানের মনোরম কবিতা আছে, যাহা শীঘ্রই লিপিবদ্ধ না হইলে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। ময়মনসিংহের সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে মহাশয় দারুণ অর্থাভাব ও ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও, বহুবৎসর পূর্ব্বে ময়মনসিংহের চাষাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া "ময়মনসিংহ-গীতিকা"র বিলুপ্তপ্রায় সঙ্গীতগুলির উদ্ধারসাধন

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, গৌরীপুর

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, মহারাজা, সুসঙ্গ

সেই সময়ে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে নারায়ণদেবের' মনসার ভাসানে'র কোমল পদাবলীতে তরঙ্গায়িত হইতেছিল। তাহার পর চণ্ডীর অনুবাদক রূপনারায়ণ ঘোষ, ভারতী-মঙ্গল-রচয়িতা রাজা রাজসিংহ, অন্ধকবি ভবানীদাস, মহাভারত-রচয়িতা রামেশ্বর নন্দী, ক্রিয়াযোগসার-প্রণেতা অনন্ত দত্ত, কবি কৃষ্ণদাস, পদ্মপুরাণ-রচয়িতা দ্বিজ বংশীদাস, 'দারাশেকোর' বঙ্গানুবাদক সদানন্দ মুন্সি, দুর্গাপুরাণ-রচয়িতা জগন্নাথ দাস, ভাস্করপরাভব-প্রণেতা গঙ্গানারায়ণ, করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে অর্পণ করেন; এজন্য নানাদেশের সাহিত্যসেবিগণ তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্যজগতে ময়মনসিংহ জেলার কয়েকটী প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম করা যাইতে পারে। 'সঞ্জীবনী'-পত্রিকার প্রাচীন সম্পাদক ও ব্রাহ্ম-সমাজের বিশিষ্ট নেতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়, ঢাকা 'ল' কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ, সাহিত্যাচার্য্য

ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, আনন্দবাজার পত্রিকার সুলেখক সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, জীবনব্যাপী সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক, বিবিধ ঐতিহাসিক

শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী

গ্রন্থপ্রণেতা, ময়মনসিংহের মাসিক 'সৌরভ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ৺কেদারনাথ মজুমদার, এড্ভান্স ও লিবার্টি পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক মিঃ পি, কে, চক্রবর্ত্তী ও স্বর্গীয় রামপ্রাণ গুপ্ত, যিনি সম্প্রতি পল্লীগ্রামে থাকিয়া কোনও বৃহৎ পুস্তকাগারের সাহায্য ব্যতীতও তাঁহার নির্জ্জন তপস্যা দ্বারা কয়েকখানি ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করিয়া বাঙ্গালার ঐতিহাসিক-দের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুত বিপিন-চন্দ্র রায় সাহিত্য শাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল মহাশয়ের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই বিস্তীর্ণ ময়মনসিংহ জেলায় জীবনক্ষেত্রে কতিপয় কৃতী সন্তানের নাম উল্লেখ করিতে হইলেই প্রথমে মনে পড়ে কাটিহালির ঋষিপ্রতিম ৺পূর্ণানন্দ পরমহংস সরস্বতীর কথা। এরূপ প্রসিদ্ধি আছে, তিনি তপস্যায় পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সাধন বিষয়ে তিনি বহু দুরূহ-তত্ত্বপূর্ণ সংস্কৃত পুস্তকের রচয়িতা। ঐ সকল রচনা ও তাঁহার বিশদ জীবনী সম্প্রতি মুদ্রিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। আজকাল ধর্ম্মজগতে আর একটী ময়মনসিংহের সন্ন্যাসী দেশের সর্ব্বত্র পরিচিত আছেন। ইনি সাধকপ্রবর শ্রীমৎস্বামী মহাদেবানন্দজী—কয়েক বৎসর হইল ভারতপ্রসিদ্ধ ৺ভোলানন্দগিরি মহারাজের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন। মেলেন্দহ গ্রামস্থিত প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের কেন্দ্রাশ্রমও একটি বিশিষ্ট উল্লেখযোগ্য ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান। পাঠাগার-পরিচালনার দ্বারা ও নানারূপ অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার দ্বারা স্বাবলম্বী জাতীয় চরিত্রগঠনের উদ্দেশ্যে সঙ্ঘ-কর্ম্মীদের এই উদ্যম প্রশংসনীয়।

তৎপরে রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা হিসাবে এ জেলার মাত্র দুই তিনটী বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম করিব। এদিকে, ময়মনসিংহ-গৌরব, স্বদেশী অন্দোলনের একজন প্রধান নেতা, ১৮৯৮ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেসের সভাপতি, ব্রাহ্ম-সমাজের বিশিষ্ট মুখপাত্র, দেশবরেণ্য ৺আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের স্মৃতি এতদ্দেশবাসীর মনে সর্ব্বপ্রথম সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। তিনি সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় 'রেঙ্গলার'
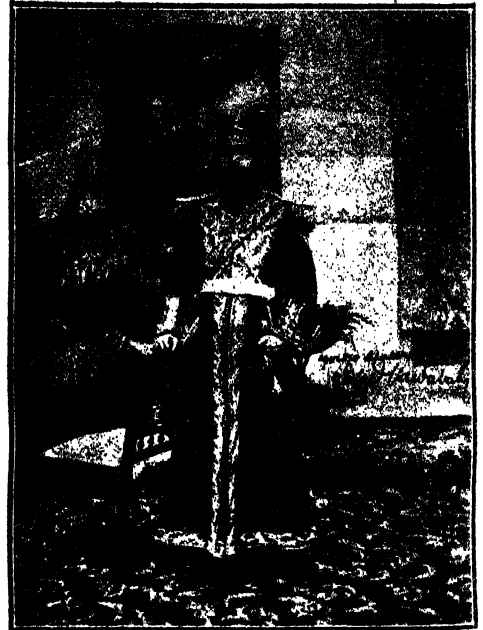
স্বর্গীয় নবার নবাব আলি চৌধুরী, খান বাহাদুর, সি, আই, ই,

(Wrangler Cambridge)। সেই সুদূর ১৮৭৪ সালে ২৪ শে মার্চ্চ ভারতবর্ষে যে সর্ব্বপ্রথম রাজনৈতিক সভা আহূত হয় তাহা বসু মহাশয় কর্ত্তৃকই প্রণোদিত হইয়াছিল। শিক্ষাপ্রচারেও তাঁহার কার্য্যকলাপ দেশবাসী কৃতজ্ঞতা

সাথে স্মরণ করিবে। কলিকাতার 'সিটি কলেজ' ও স্কুল এবং ময়মনসিংহের 'সিটি কলেজ' (যাহা পরে আনন্দমোহন কলেজরূপে পরিণত হইয়াছে) ও স্কুল তাঁহারই কীর্ত্তি। বর্ত্তমানে কলিকাতা হাইকোর্টের ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল্ (Standing Counsel) মিঃ এস, এম, বসু, এম, এল্, সি, তাঁহার কৃতী পুত্র। তাহার পর পূর্ব্ববঙ্গের রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা, ময়মনসিংহ বারের প্রধান উকীল ৺অনাথবন্ধু গুহ মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ময়মনসিংহের রাজনৈতিক আন্দোলনে ও শিক্ষাবিস্তারে তাঁহার কার্য্য উপেক্ষণীয় নয়। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের কথা প্রত্যেক সংবাদপত্রসেবীই জ্ঞাত আছেন। তাঁহার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কার্য্যকলাপের কথা অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। নিখিল ভারতীয় বণিক্-সভার সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী সভাপতি, বঙ্গীয় আইন পরিষদের ভূতপূর্ব্ব স্বরাজ্যদলের প্রধান 'হুয়িপ্' (whip), বর্ত্তমানে বঙ্গীয় বণিক্-সভার সুযোগ্য সভাপতি, বাঙ্গালার গৌরব, 'হিন্দুস্থানের' নিপুণ কর্ম্মকর্ত্তা ও নিজ জেলায় বিবিধ শিক্ষালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং কলিকাতার বর্ত্তমান মেয়র শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয় ময়মনসিংহ জেলার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। এই সম্পর্কে আমরা এ জেলার দুই একটী স্বদেশ-সেবকের কথা বলিব—বাঙ্গলার বিবিধ সৎকার্য্যে মুক্তহস্ত দাতা স্বর্গীয় মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর ও গৌরীপুরাধিপতি শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়। প্রধানতঃ তাঁহাদের বহুলক্ষ টাকা দানে কলিকাতা 'নেশেনেল্ কাউন্সিল্ অব্ এডুকেশনের বিরাট্ শিক্ষা মন্দিরটী গঠিত হইয়াছে। ৺কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থাপনকালে ব্রজেন্দ্রবাবু সর্ব্বপ্রথম লক্ষ টাকা

স্যার এ, কে, গজনভী

দান করিয়া এই মহৎ কার্য্যের পথ-প্রদর্শক হন। মহারাজা সূর্য্যকান্তের যোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত শশীকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ও তাঁর মহাপ্রাণতার জন্য বাংলায় সুনামার্জ্জন করিয়াছেন। সুপ্রাচীন সুসঙ্গ রাজবংশের বর্ত্তমান মহারাজা ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুরও তাঁর

সহৃদয়তা ও বদান্যতার জন্য ময়মনসিংহের গৌরবস্থানীয়। আজকাল স্বদেশপ্রাণ শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মহাশয়

স্যার এম, এন, চৌধুরী, নাইট অব্ সন্তোষ

পল্লীসংস্কার কার্য্যে অগ্রণী থাকিয়া বাঙ্গলার সর্ব্বত্র সুপরিচিত আছেন। ত্যাগবীর ডাক্তার সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত—যাঁহার কথা আজকাল ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে—এ জেলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্তানগণের অন্যতম। স্বদেশসেবায়, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ও সাহিত্যরচনায় তাঁহার যশঃ ময়মনসিংহ জেলাকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। তাঁহার জীবনব্যাপী নানাবিধ সংকার্য্যের মধ্যে খদ্দরপ্রচারের জন্য যথাসর্ব্বস্ব দান দেখিয়া দেশবাসী মুগ্ধ হইয়াছেন এবং বঙ্গীয় হরিজন আন্দোলনের সর্ব্বপ্রধান নেতা হিসাবে তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম বিশেষ করিয়া তাঁহাকে দেশ-বরেণ্য করিয়াছে।

সম্প্রতি রাজকীয় উচ্চপদ লাভ করিয়া যাঁহারা বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন ময়মনসিংহের এরূপ কয়েকটী নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে—কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী মহাশয়, ধনবাড়ীর ভূতপূর্ব্ব নবাব নবাবালী চৌধুরী মিনিষ্টার ও একৃসিকিউটিভ কাউন্সিলার, স্যার এ, কে, গজনবী মিনিষ্টার ও একৃসিকিউটিভ কাউন্সিলার, বেঙ্গল কাউন্সিলের সুযোগ্য প্রেসিডেন্ট সন্তোষের রাজা স্যার মন্মথনাথ চৌধুরী ও কলিকাতা হাইকোর্টের জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রভৃতি।

বন্দী

শ্রীপ্রতুল রায়

নিশীথ রজনী নীরবে ঘুমায় দীপ নেভা ঘরে ঘরে,
বাতায়নে একা জাগিছে বন্দী ব্যথাভরা অন্তরে।
নিদ্‌হারা তারা নিয়ে আসে যেন আধো স্বপনের বাণী,
ফুল ভরা লতা ইসারায় করে কী গোপন কাণাকাণি।
অদূরে কোথায় ঘন-বনছায় বহে যায় ক্ষীণ নদী
দীঘল্ নিশাসে উতলা বাতাস কেঁদে ফিরে নিরবধি।
যেন বহুদূরে আলোক-পুরীর দুয়ারে বসিয়া একা,
কাঁদে বিষাদিণী ব্যথাভারাতুরা নয়নে অশ্রু লেখা।
কভু সে আঁধারে পা দুটি ছড়ায়ে আলুথালু কেশ পাশ
কার আশা চেয়ে আলো ছায়া দিয়ে লেখে শুধু দিন-মাস।
অথবা আলসে এলায়িত দেহে চাহিয়া তারার পানে,
সুর ভোলা গান গায় কত কী যে ভাঙা রাগিণীর তানে।
সেখানে কুসুম-কুঞ্জে পড়েছে একটি কুটির ছায়া,
পাশ দিয়ে ধীরে বয়ে যায় মৃদু নদীটি স্বল্পকায়া।
ছিন্ন বীণাটি ভূমিতলে লুটে, নীরব অলির বুলি,
অনাদরে লাজে ঝরিছে ধুলায় বিবশ বকুলগুলি।
কাক-জ্যোৎস্নায় ঘুম-ভেঙ্গে জাগা সাথীহারা কোন্ পাখী,
পরপারে তার সাথীর লাগিয়া ফুকারিয়া ওঠে ডাকি।
বন্দী কাঁদিছে লৌহ-প্রাচীরে করতলে রাখি মাথা,
ভাষাহীন মূক শোনে সে প্রিয়ার দীর্ঘ বিরহ গাথা

'সযতনে ফুটিল যা, ঝরিল তা অনাদরে'
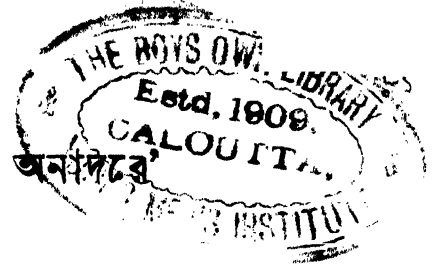
(গল্প)

শ্রীপাপিয়া বসু

শীতের রাত্রি। মাসের প্রায় শেষ, তাই একেবারে কমিয়া যাইবার পূর্ব্বে, শীতটা প্রচণ্ডভাবে পড়িয়াছে। সে জন্যেও, এবং বিশেষ একটা কারণ বশতঃও বটে সরযূ সেদিন একটু তাড়াতাড়ি কাজকর্ম্ম সারিয়া, আর বাকিটা দাসী চাকরের উপর ন্যস্ত করিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। তার পর কাপড় ইত্যাদি ছাড়া শেষ হইলে, শায়িত স্বামীর কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল, ঘুমোলে নাকি গো?

লেপের ভিতর হইতে কোন প্রকার সাড়া আসিল না। সরযূ আরেকটু সরিয়া আসিয়া স্বামীকে মৃদু নাড়া দিয়া পুনরায় কহিল,—ওগো ঘুমোচ্ছ?

লেপের নীচ হইতে সদ্য নিদ্রোত্থিতের বিরক্তিব্যঞ্জক একটু অস্ফুট শব্দ হইল—হুঁ!

—হুঁ, কিগো, এরি মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছ? বাবাঃ, শুতে না শুতেই কি ঘুম তোমার! আর বলে' এলে কিনা আমি না আস্‌তে ঘুমোবে না!

—শীতের ভিতর একা একা কতক্ষণ বসে' থাকা যায়! বল্‌লে, পনেরো মিনিটের মধ্যে আস্‌বে, তা পনেরো মিনিট ত চুলোয় যাক, দু' ঘণ্টার মধ্যেও দেখা নেই!

—হুঁঃ, তা বই কি! মুখের একটা ভঙ্গী করিয়া সরযূ বলিল—পনেরো মিনিটের মধ্যে আস্‌ব, একথা কখন বল্‌লুম তোমাকে? কি ভীষণ লোক তুমি! এত বড় একটা মিছে কথা বল্‌তে মুখে একটুও বাধ্‌ল না?

—উঁহুঃ, একটুও না! উকিলদের মিছে কথা বল্‌তে যে শিখ্‌তে হয়, তা বুঝি জান না? বলিয়া যেন মস্ত রসিকতায় বিমল হোঃ, হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সরযূও হাসিমুখে বলিল—সে সংবাদ জান্‌বার আমার মোটেই অবসর নেই! কিন্তু যা জানাতে চাচ্ছি, তাও আজ দু'দিন ভাঁড়িয়ে আসছ! আজও ত ঘুমিয়ে পড়েছিলে?

—কে বল্‌লে তোমাকে, মোটেই না!

—মিছে কথা বল্‌তে যে তোমাদের আটকায় না, সে কথা সত্যি বটে!

—কি রকম?

—না হ'লে সচ্ছন্দে ব'লে ফেল্‌লে, ঘুমোও নি?

—নাই ত! বলিয়া হঠাৎ বিমল গায়ের লেপ একদিকে সরাইয়া উঠিয়া বসিল এবং সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সরযূর অঞ্চল প্রান্ত ধরিয়া তাহার পার্শ্বে আনিয়া বসাইল। তারপর দুই হাতে তাহার মুখখানা সোজা করিয়া ধরিয়া বলিল—দেখত, ঘুমিয়েছিলাম বলে' মনে হয়?

সরযূ মুখের অপরূপ একটা ভঙ্গী করিয়া বলিল—ও আমি বুঝি নে!

বিমল হাতের আঙ্গুলে তার গাল দুইটি নাড়িয়া দিয়া কহিল—তবে বোঝ কি? আমি যে তোমায় ভালবাসি এটুকু বোঝ?—এবং তাহার বলার শেষে, আকাঙ্খিত প্রিয়-স্পর্শে সরযূ প্রভাত-রবিকর-স্পর্শে শুভ্র-পদ্মের মতই লাল হইয়া উঠিল।

কিন্তু একটু পরেই সামলাইয়া লইয়া, মাথা নাড়িয়া স্মিতহাস্যে সুন্দর মুখ আরও সুন্দর করিয়া কহিল—কিন্তু আজ আমি কিছুতেই ভুলব না। শোভার কাহিনী আজ আমাকে বল্‌তেই হবে।

—কেবল আমিই মিথ্যে বলি, না? কবে তোমাকে ভুলিয়েছি শুনি?

—কিন্তু বলও ত নি?

—বেশ বল্‌ছি, এস! কিন্তু তার আগে বাতিটা নিবিয়ে এসে শুয়ে পড়।...না কি রকম; এ শীতের মধ্যে বসে' বসে'...না, না সে আমি কিছুতেই পারব না! বলিয়াই বিমল লেপ মুড়ি দিয়া সটান শুইয়া পড়িল।

অগত্যা সরযূ আলো নিভাইয়া শয্যার একপার্শ্বে শুইয়া পড়িয়া বলিল—বল!

—বল্‌ছি! বলিয়া বিমল খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। হয়ত আগাগোড়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একবার ভাবিয়া লইল। তারপর বলিতে আরম্ভ করিল...

মাস পড়ে থাকবার পর যে বাড়ীটাতে এখন ... বাবুরা এসেছেন, সে বাড়ীতে শোভার বাবা বিজয়বাবু পশ্চিমের কোন এক সহর থেকে বদলী হয়ে এসেছিলেন। তখন তিনি সবে মাত্র নূতন মুন্সেফ! একমাত্র কন্যা শোভার বয়স পাঁচ ছ' বছরের বেশী হবে না। আমিও তখন বার তের বছরেরই ছিলুম হয়ত। আমাদের বাড়ীর পেছনে যে মাঠটা, সেটা তখন আরও প্রশস্ত ছিল। ওদিকে রমেনদের যেখানে দোতালা দালানটা, তারই ঠিক সাম্‌নে মস্ত বড় একটা পুকুরও ছিল তখন; সেটা এখন তারা ভরিয়ে দিয়েছে।

বসন্তের দিনে আস্‌ত মাঠের ফুরফুরে দক্ষিণা বাতাস, আস্‌ত শরতের চাঁদনী রাতে ঝরা শিউলী ফুলের গন্ধ! বসন্তে কোকিলের কুহুও বাদ যেত না। কিন্তু যখনকার কথা বল্‌ছি, তখন এসব দিকে নজর কতটা ছিল, তা' আজ আর ঠিক স্মরণ করতে পার্‌ছিনে! তবে আমারই মত ছোট ছোট সমবয়সীদের সাথে মাঠে লাফ-ঝাঁপ দিতে এবং কে বল করতে পারে ভাল, কার ব্যাট ধর্‌বার কায়দা দুরস্ত, এসব কথায় মস্‌গুল থাক্‌তেই যে বেশী ভালবাস্‌তুম সে কথা আজও ভুলিনি!

...কবে থেকে তা' আজ আর মনে নেই; শোভা আমার কাছে পড়্‌তে আস্‌ত, মণ্টু মিনুদের সাথে একত্র হয়ে। মণ্টুর সাথেই ওর ভাব ছিল বেশী। কারণ দু'জনেই ওরা এক-বয়েসী ছিল। মিনু ছিল ওদের চাইতে বছর দু'য়ের ছোট।

—মণ্ট আর মিনু যে আমার হাতে মার না খেত, তা' নয়! তবে শোভার উপর দিয়েই চল্‌ত বেশী। চড়টা চাপড়টা তার বাঁধাই ছিল। আর পড়া বলতে না পার্‌লে ত রক্ষেই নেই। কিন্তু কেন যে ওর উপর আমার সে ভাবটা ছিল তা' আজও আমি বুঝে উঠ্‌তে পারি নে।

সে দিনটির কথা আমার আজও বেশ মনে পড়ে। মণ্টু, মিনু, শোভা তিনজনেই পড়্‌তে বসেছিল। শোভা বল্‌লে—আমার হয়েছে বিমু-দা, পড়া নাও!

—আচ্ছা দে বই, কিন্তু না পার্‌লে দেখাব মজা! বই হাতে নিতেই শেখা হয়ে যায়!—বলে' কি একটা শব্দের বানান জিজ্ঞেস কর্‌লুম। ভুল হয়েছিল কিম্বা শুদ্ধ বলেছিল, মনে নেই, কিন্তু বইটা তার সামনে ধ'রে বল্‌লুম—এই তোর হয়েছে, দেখ দিকি কি লিখেছে বইতে!

সে একবার বই'র দিকে তাকাল, তারপর বলে' উঠ্‌ল—বাঃ, আমিত ঠিকই বলেছি!

—এই বলেছিস তুই, আমি মিছে বল্‌ছি তা' হ'লে? আর যায় কোথা, চটাস্‌ করে' এক চড় বসিয়ে দিলুম। কিন্তু অত জোরে দেবার ইচ্ছা ছিল না, হঠাৎ লেগে গেল। চারটা আঙ্গুলের দাগ লাল হয়ে পড়ে' রইল গালের উপর। শোভার চোখে জল দেখিনি কখন; চেঁচিয়ে না কাঁদ্‌লেও, সেদিন কয়েক ফোঁটা অশ্রু তার কোলের উপর ঝরে' পড়েছিল।...আজ মনে পড়ে' দুঃখ হয়, কিন্তু তখন একটুও অপ্রতিভ হইনি!

পরদিন প্রাতে আমার পড়ার কোঠায় এসে' শোভা বল্‌লে—বিমুদা, কাল মা গালের দাগ দেখে', অমন করে' কে মার্‌লে, আমায় জিজ্ঞেস করেছিল। আমি বল্‌লুম, মারে নি, মা। বিমুদা লাল রং করছিল, আমার গালে লাগিয়ে দিতে তা' জোরে লেগে গেছে। বলে' খিল-খিল করে' হেসে' উঠ্‌ল!

—সে হয়ত ভেবেছিল, আমি যে মেরেছি, একথা গোপন করাতে সুখী হয়ে উঠ্‌ব। বাস্তবিক সুখী হয়েছিলুম, কিন্তু সে ভাবটা প্রকাশ করতে কেমন বাধ-বাধ ঠেক্‌ল! বল্‌লুম—হয়েছে, হয়েছে, মিছে কথা বলে' আর বাহাদুরী কর্‌তে হবে না! মিথ্যে বল্‌তে তোকে কে বল্লে?

শোভার হাসি মুখ মুহূর্ত্তে ম্লান হয়ে গেল, চোখ দু'টো করে' উঠ্‌ল ছল-ছল! তার এতখানি আনন্দ যে আমি এমনি করে' বিফল করে' দিতে পারি, প্রথমটা সে তা' বিশ্বাস করতে পারে নি! কিন্তু ঐটুকু পর্য্যন্তই! পরক্ষণেই ধীরে সে আমার কোঠা ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

এইত একটি! অমন কতই ত ঘটেছে, তার বেশীর ভাগই আজ ভুলে গেছি। তবু আমার কাছে সে আস্‌ত যখন তখন। অথচ তার প্রতি আমার দুর্ব্যবহারেরও অন্ত ছিল না। আজ আমি অনেক ভেবে'ও এর কারণ খুঁজে পাই নে বটে, কেন তাকে অত দুঃখ দিতুম... যদিও কারণ খুঁজে' পেলে'ও এখন আর তার প্রতিকারের উপায় নেই,

তথাপি মনে হয়, আমার একটু সহৃদয়তা পেলে' হয়ত তার জীবনটা সব দিক্‌ দিয়ে এমনি করে' ব্যর্থ হয়ে যেত না। হয়ত স্নেহে প্রেমে, আনন্দের কলকোলাহলে একটি সংসারকে অন্ততঃ মহিমাময় করে' তুল্‌তে পার্‌ত। কিন্তু যে কথা বল্‌ছিলাম...

—তখন ছিল শীতকাল। ক্রিকেট খেলা শেষ হয়ে গেছে। তারই ভালমন্দ বিচার কর্‌তে বসে' গিয়েছিলাম আমরা তিন চারজনে, রমেনদের বাড়ীর সাম্‌নে যে পুকুরটার কথা বলেছি, তারই পূর্ব্ব পাড়ে। ডুবে-যাওয়া রবি-রশ্মি তখনও সে স্থানটুকুতে বিরাজ কর্‌ছিল!

আমাদের তর্ক জমে' আস্‌ছিল; ওদিকে আমরা যে রোদটুকুতে বসেছিলাম, তার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে শীতেও জমে' উঠেছিলাম গুটিসুটি হয়ে। কাজেই জৌলুস তর্কের লোভ সংবরণ করে' উঠি-উঠি কর্‌ছি, এমন সময়ে কৃষ্ণবর্ণ এক-মাথা কোঁকরান চুলের রাশ নিয়ে, শোভা আমার পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল। বল্‌লুম—এই শোভা, সন্ধ্যে হ'ল, বাড়ী যাস্‌নি যে? যা, যা শীগ্‌গীর!

শোভা হেসে বল্‌লে—যাচ্ছিলামই ত, কিন্তু হাত থেকে হঠাৎ বল্‌টা পড়ে' গেল যে! এনে' দাও না, বিমু-দা... বল্‌লুম—কোথায়? শোভা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বল্‌লে—ঐ যে ভাস্‌তে ভাসতে পুকুরের মাঝখানে চলে' গেছে। ব্যস্ত হয়ে বল্‌লুম—কি, এই শীতের মধ্যে জলে নাব্‌ব? যা, শীগগীর বাড়ী যা বল্‌ছি! করুণ স্বরে সে বল্‌লে—কিন্তু মা যে বক্‌বে!...বক্‌বে তার আমি কি কর্‌ব শুনি? এই শীতের ভেতর তোর জন্যে এখন জলে নাব্‌ব, না? যা শীগ্‌গীর বল্‌ছি!

তার কাকুতি মিনতি সমস্ত ব্যর্থ করে' দিলুম। এই দারুণ শীতে কিছুতেই বল্‌ এনে' দিতে রাজী হলুম না। পরে জেনেছিলুম মণ্টু সেদিনই বল্‌টা তাকে এনে দিয়েছিল।...অতি তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু এ জন্যই যে কতখানি আশা এবং ভরসা নিয়ে আমারই কাছে সকলের আগে সে ছুটে এসেছিল, এখন তা' আর আমার অজ্ঞাত নেই। আজ এও জানি, তার কতখানি বিশ্বাস অকাতরে সেদিন ধূলিসাৎ করে', দিয়েছিলুম; কিন্তু আশ্চর্য্য, এত অবহেলা পেয়েও আমার প্রতি কখন তাকে বিমুখ দেখি নি। অহরহই আমার কাছে আস্‌তে চাইত হৃদ্যতা কর্‌তে, এমনি করে'ই তার হৃদয় আমাকে উজাড় করে' দিয়ে গেছে, কিন্তু কখন ফিরে চায় নি।

বলিতে বলিতে বিমলের অকস্মাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। বলিল...

—তখন সেই বা কতটুকু ছিল, আর আমার বয়সই বা ছিল কত! প্রেমের তখন কিই বা বুঝ্‌তুম! কিন্তু ছেলে-বেলার অজানা মনের সেই অজ্ঞাত আকর্ষণই যৌবনে যে রূপ নিলে, সেটাই অনেক দিন পরে একদিন আমার কাছে উন্মুক্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সে পরের কথা।

তারপর, তাদের একদিন বিদায়ের দিন এল। তিন বছর পর বিজয় বাবুকে এখান থেকে বদলী করে' দিলে।.. তখন একজামিনের সময়, সন্ধ্যার পর রীতিমত পড়্‌তে বসে' গেছি। হঠাৎ পেছন থেকে কে বল্‌লে—বিমু-দা আমরা এখন যাচ্ছি। আমি ভেবেছিলুম, মিনু। কারণ সেদিন ওদের সিনেমাতে যাবার কথা ছিল, আমারও। উত্তর দিলুম—আচ্ছা যা, আমি আজ যাব না। আবার ডাক এল—বিমু-দা...। বিরক্ত হয়ে বই থেকে মুখ ফেরাতে ফেরাতে বল্‌লুম—কিরে, তুই যে? আমি মনে করে-ছিলুম বুঝি মিনু। কি চাস্‌?

শোভা বল্‌লে—আমাদের এই আটটার গাড়ীতেই যেতে হবে, তাই প্রণাম কর্‌তে এলুম। বলে' আমার পায়ের গোড়ে টিপ্‌ করে' একটা প্রণাম সেরে' উঠে' দাঁড়াল। তারপর বল্‌লে—তুমিও আমাদের সাথে ষ্টেশনে যাবে না? চল, বাবা বল্‌লেন, আর সময় নেই। বলে' আমার হাত ধরে' মৃদু আকর্ষণ কর্‌লে।

বল্‌লুম, না রে একজামিনের পড়া, আমার কিছুতেই যাবার উপায় নেই।

টেবিলের উপর থেকে খোলা বইটা ওদিকে ছুঁড়ে' ফেলে' দিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে শোভা বল্‌লে, আজ যাবার দিনে ত মারতে পারবে না; ষ্টেশনে তোমাকে যেতেই হবে। এক রাত্রে এমন কিছু এসে যাবে না।

—ইস্‌, মার্‌তে পার্‌ব না, বলে' শোভার গণ্ডে মৃদু আঘাত করে' আবার বল্‌লুম,—পাগল হয়েছিস্‌, এ এক-

জামিনের পড়া ফেলে' ষ্টেসনে যাব? আচ্ছা, কোথায় যাবি তোরা?

মুখের একটা ভঙ্গী করে' সে বল্লে, কি জানি, ও বিদ্‌ঘুটে নাম আমার মনেও থাকে না ছাই! তা' ছাড়া তোমাদের ছেড়ে যেতে আমার একটুও ইচ্ছে করে না। বলে' একটা দীর্ঘশ্বাস পড়্‌ল ওর ঐ অতটুকু বুক থেকে, একটু থেমে' আবার বল্‌লে, কিন্তু উপায়ও নেই, যেতেই হবে। বলে' আবার কিছুক্ষণ চুপ। তারপর হঠাৎ বলে' উঠ্‌ল—চল, মা আবার খুঁজবে আমাকে।

একবার ইচ্ছেও হয়েছিল যাই, কিন্তু পরীক্ষার কথা ভেবে' কিছুতেই পা উঠ্‌ল না। বল্‌লুম্, ষ্টেশনে যাব না; চল, মাসীমাকে প্রণাম করে' আসিগে।

অভিভূতের মত সে আমার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ; পরে আবার একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে', তার দু'টি চোখের ছল-ছল করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বল্‌লে—আচ্ছা, থাক তা'হলে! বলে' ছুঁড়ে-ফেলা বইটা কুড়িয়ে এনে' আবার টেবিলের উপর ঠিক করে' রাখ্‌লে এবং আমাকে পুনরায় প্রণাম করে' ধীরে ধীরে কোঠা থেকে বেরিয়ে গেল।

এমনি করে' এক সন্ধ্যার অন্ধকারে তাকে বিদায় করে' দিলুম। যে আমাকে অহর্নিশি আকুল আগ্রহে পেতে চেয়েছে, তাকে সব দিক্ দিয়ে আমি এমন করে' উপেক্ষা করে' গেছি। আজ ভাবি, কোন দিনইত তার কোন আব্দার রক্ষা করি নি, যাবার দিনের অনুরোধটিও যদি সে দিন রাখ্‌তুম্...

বিমল নীরব হইল, সরযূ বলিল—থাম্‌লে কেন, তারপর?

বিমল "বল্‌ছি" বলিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর, বলিতে লাগিল...

—এখান থেকে চলে' যাবার পর সে আমাকে দু'তিনখানা চিঠি লিখেছিল। কিন্তু আমি তার একটারও উত্তর দেই নি। বোধ হয় সেই জন্মেই, আমার এই নিষ্ঠুর নীরবতায় সেও গিয়েছিল চুপ করে'। আর লেখে নি। তারপর তাদের আর কোন সংবাদ পাই নি অনেক দিন। প্রয়োজন হয় নি, অথবা বিবেচনা করি নি। যাক্, এরপর অনেক বৎসর কেটে' গেল। ইউনিভার্সিটীর সব কয়টি ডিগ্রীই আমাকে জয়মাল্য পরিয়ে দিলে একে একে। বাবা বল্‌লেন, "ল" পড়্‌তে; পড়্‌লুম; পাশও কর্‌লুম যথাসময়ে। কিন্তু তিনি আমার এ কৃতিত্ব দেখে' যেতে পার্‌লেন না, তার আগেই এ জগৎ থেকে চির বিদায় গ্রহণ করলেন। তাঁর অবর্ত্তমানে আমিই তাঁর স্থান অধিকার করে' বস্‌লুম, সেও আজ আট ন'বছরের কথা।

"ল" পাশ কর্‌তেই মা বল্‌লেন, বিয়ে কর; একটি মেয়ে আছে, দেখে আয়। আপত্তি ছিল না, কাজেই একদিন বিকেলের দিকে বেরিয়ে পড়্‌লুম মেয়ে দেখ্‌তে। কিন্তু আশ্চর্য্য; কালের মহিমায় যাদের স্মৃতি মন থেকে নিঃশেষে মুছে' গিয়েছিল, কে জান্‌ত, আবার তাদের দ্বারে গিয়েই একদিন উপস্থিত হতে হবে।

তারা আমাকে ভোলে নি। তাই মেয়েকে একাই পাঠিয়ে দিলে আমার সাক্ষাতে। আশ্চর্য্য যে একটু হই নি, তা নয়; কিন্তু বুঝ্‌তে পার্‌লুম অন্তরালে কুতূহলী দৃষ্টির অভাব নেই। তাকে দেখে'ই মনে হ'ল, এ মুখ যেন কোথায় দেখেছি, কিন্তু স্মৃতির মন্দির থেকে যাকে সমূলে বিসর্জ্জন করে' দিয়েছি, তাকে কিছুতেই সেখানে আর প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে পার্‌লুম না।

এক মুখ হাসি নিয়েই সে প্রবেশ করেছিল। এসেই আমাকে প্রণাম কর্‌লে। পরে তারই জন্যে রাখা সাম্‌নের চেয়ারটার উপর বস্‌ল। কথাও প্রথম সেই বল্‌ল—কেমন আছ, বিমুদা? আট ন'বছর পরে দেখা না? অনেকদিন!

কথা শুনে' আমি অবাক্, কিন্তু তখনই সামলিয়ে নিলুম। চিন্‌তে যে পারি নি, এ তাকে বুঝ্‌তেই দিলুম না। সহজ ভাবে উত্তর দিলুম, ভাল আছি। আপনি··· তুমি...তোমরা কেমন আছ?

—ভাল, কিন্তু এসংবাদ নিতেই এসেছ, না এসেছ আমাকে যাচাই করে' দেখ্‌তে? পাকা জহুরী কিন্তু তুমি! তিন বছর ধরে অহর্নিশি যাকে দেখেছ, তাকে কি করে' আবার দেখ্‌তে আস্‌তে পার্‌লে, বল ত?

ততক্ষণে সবটাই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। আশ্চর্য্যও কম হই নি! ও তখনই আবার বল্‌ল, উঃ, কি নিষ্ঠুর ছিলে তুমি! বাস্তবিক এত দুঃখ কেউ কোনদিন আমাকে

হয় নি। ভুলে'ও তোমার হাসিমুখ দেখি নি কখন। অথচ চুম্বকের মত সর্ব্বদাই তোমার কাছে আমাকে টান্ত। তখন কি ছাই জান্তুম, এ জন্যেই! বলেই শোভা খিল-খিল করে' হেসে' উঠ্ল। হাসি থাম্তে আবার বল্ল—আচ্ছা বিমু-দা, এর পরেও কি তুমি আমাকে তেমনি করে'ই দুঃখ দেবে? বলেই আবার উচ্চ রবে হেসে উঠ্ল। অন্তরাল থেকেও চাপা হাসির অস্ফুট গুঞ্জন ভেসে এসে আমার কাণ দুটোকে আরক্ত করে দিলে। হঠাৎ আমার দিকে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে সে বলে উঠল, একি আমার দিকে অমন করে' চেয়ে আছ যে? আমাকে চিন্তে পার নি নাকি? আমি শোভা। কেন মাসীমা তোমাকে বলেন নি, যে আমরা এখানে এসেছি? চম্‌কে উঠ্লুম— বল্লুম, হ্যাঁ, চিনেছি! কিন্তু তিনি ত আমাকে কিছু বলেন নি; হয়ত ভুলে গেছেন।

শোভা কেমন বিমূঢ়ের মত হয়ে গিয়ে শুধু বল্ল—ও, তাই! সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস! বাড়ী ফির্তেই মা এসে জেরা সুরু করে' দিলেন—কি রে মেয়ে দেখে এলি? গম্ভীর ভাবে বল্লুম—হুঁঃ।

কিন্তু মা অত সহজেই রেহাই দিলেন না। আবার বল্লেন—কেমন দেখ্লি?

—ভালই।

—ভালই কি রে! একথায়ই সব বোঝা যায় নাকি?

—কি বল্ব তবে বল? যা জিজ্ঞেস কর্লে তাইত বল্লুম।

—বেশ, যা-হোক! রং কেমন, গান বাজনা জানে? লেখা পড়া? আর আর অন্য...বাধা দিয়ে বল্লুম—সে সবত তুমি নিজেই জান।

মা হেসে' বল্লেন—তাত জানিই, তবু তোর মতটা ত জানা চাই! বিয়েত আর আমি কর্ব না, কর্বি তুই... তা হ'লে এবার কথা দিই তাদের?

এ কথার উত্তর দিলুম না, চুপ করে' রইলুম। তাগিদ দিয়ে মা পুনরায় বল্লেন—কিরে উত্তর দিস্ না যে বড়? ধীরে ধীরে বল্লুম—না, কথা দেবার তাদের দরকার নেই।

—কেন? মা বিস্মিত হয়ে বল্লেন। আমার এরকম ভাব তিনি আশা করেন নি। না কেন, শুনি? শোভার মত মেয়ে রূপে গুণে সব দিক্ দিয়ে সমান, তাকে তুই বিয়ে করবি নে? কারণটা কি শুনি?

কারণ যে কি তাত আর মার কাছে বলা যায় না। তাই মৌন হয়েই রইলুম। মা আবার বল্লেন, এতদিন তোরা একখানে ছিলি, তা' ছাড়া সুন্দরীও ত কম নয়! দিব্বি লক্ষ্মীমন্ত। তাকে কেন যে তুই...শেষ কথাটার আর উত্তর না দিয়ে শুধু বল্লুম—তোমার ছেলের জন্যে এ রকম লক্ষ্মীমন্ত মেয়ের অভাব হবে না, মা।

এর দু' মাস পর মা তোমাকে ঘরে আন্লেন। আজ ভাবি, দোষ ত তার কিছুই ছিল না, পুরাতন পরিচয়ের জোরেই সেদিন অতগুলো কথা সে বল্তে পেরেছিল। সে ত জান্ত না, যে তাদের অমন করে' আমি ভুল্তে পেরেছি। জান্ত যদি, তা' হ'লে প্রথম থেকেই মূক হয়ে যেত। তাকে এতটুকু থেকেই জানি ত, হাস্তেও যেমন পারে সে, গম্ভীর হতেও তার মুহূর্ত্ত লাগে না। কিন্তু কি হবে আর পূর্ব্ব কথার বিশ্লেষণ করে'! শুধু বুকটাকে আর্দ্র করে' তুল্বে।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বিমল হঠাৎ পাশ ফিরিয়া শুইল। সরযূ উদ্বিগ্ন হইয়া বলিয়া উঠিল, বা রে, ফিরে' শুলে যে?

—কি করব আর?

—আরও ত কত বাকী রয়ে গেল!

—না আর কিছু নেই; ঘুম পাচ্ছে বড্ড, কথা বলো না।

—নেই কি রকম? কেমন করে' ওর এ-অবস্থা হ'ল, তাইত বল্লে না।

—সে বরং ওকেই জিজ্ঞেস করো!

—কেন, তুমি বল্তে পার না? আর সে তোমাকে বল্তেই বলেছে! লক্ষ্মীটি, বল?

বিমলের অন্তরাকাশে যে মেঘ-বিন্দুটি ধীরে ধীরে তাহার অস্তিত্ব বৃদ্ধি করিতেছিল, তাহাকে উড়াইয়া দিতেই যেন একান্তভাবে সরযূকে দুই বাহুর মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—আহা, কি সোহাগই শিখেছ! বলিয়াই তাহার ওষ্ঠপুটে নিবিড় একটি চুম্বন করিল। কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও একটি জোর নিশ্বাসকে আট্‌কাইয়া রাখিতে পারিল না, একই সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল।

কহিল—আচ্ছা, শোন

...তারপর শোভার কোথায় বিয়ে হল, কিম্বা মোটেই হয় নি, অথবা সে সুখে আছে, কিম্বা দুঃখময় তার জীবন, সে সব খোঁজ নেবার আর প্রয়োজন হয় নি! কিন্তু সেদিন যখন কাশীতে মাকে দেখ্‌তে গিয়ে ওকেই তার গৃহস্থালীর কাজ কর্‌তে দেখলুম, তখন বিস্ময়ের আর আমার অবধি রইল না। ও আমার কাছে ধরা দিতে চায় নি বটে, কিন্তু অসীম কৌতূহল নিবৃত্তি কর্‌তে একদিন আমাকেই তাকে ধর্‌তে হল। তার মুখে অনেক কথাই শুন্‌লুম। শুন্‌লুম, আমার সে প্রত্যাখ্যানে জীবনে তার কি ভাবে যুগান্তর এনে' দিয়েছে, আমার সেই অমতে ওদের বাসার সকলেই মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হয়েছিল।...সে নিজে না খেয়ে কাটিয়েছিল দু'দিন। এবং তার মাকে জানিয়েছিল, সে আর জীবনে বিয়ে কর্‌বে না। কিন্তু দু' বছর পরে তাকে মত দিতে হয়েছিল। বিধবা জননীর একান্ত অনুরোধেও বটে, আর নিজেকে এই কথা বলে' সান্ত্বনা দিয়েও যে, যে তাকে অমন করে' অপমান কর্‌তে পারে, সে তার কেউ নয়, এবং আমার সমস্ত স্মৃতি আবর্জ্জনার মত পুড়িয়ে ফেল্‌তেই যেন সানাই'র সুর এক ফাল্গুন প্রভাত উতলা করে', সন্ধ্যালগ্নে চারচোখের প্রথম দেখাটা সেরে নিল। কিন্তু চাইবার সময়ে, তার মুখ চোখের কি অবস্থা হয়েছিল, তা' সে বল্‌তে পারে নি! শুধু জানালে, মনে নেই, ভুলে গেছে!

—কিন্তু যুক্তি দিয়ে কি প্রেমাস্পদকে ভোলা যায়! ভালবাসার সৃষ্টি মনের নিভৃতে, সঙ্গোপনে! তাকে যুক্তি দিয়ে পাওয়াও যায় না, সঙ্কল্প করে' ত্যাগ করাও অসম্ভব! তাই সে তার স্বামীকে ভালবাস্‌তে পার্‌ল না। কিন্তু নীরবে সমস্ত কর্ত্তব্যই সে পালন করে' যেত। হয়ত তাতে করে' এর ভেতর দিয়েই একদিন সে তার স্বামীকে সত্যই ভালবাস্‌তে পার্‌ত, কিন্তু তার স্বামীই এপথের প্রবেশ-দ্বারে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়াল।......

শোভার স্বামীর অবস্থার লোককে ধনী না বললেও একেবারে দরিদ্র বলা যায় না। কিন্তু সে ছিল মদ্যপ; অত্যধিক মদ্যপ! এ তথ্য তারা পূর্ব্বে জানে নি, যখন জান্‌ল, তখন আর প্রতিকারের উপায় ছিল না, কেবল শোভার মিনতি ছাড়া! কিন্তু তাতে কোন ফল হ'ল না। একে ত শোভা তাকে তখনও ভালবাস্‌তে পারে নি, তার উপর স্বামীর এই স্বেচ্ছাচার, তাকে তার প্রতি আরও বিমুখ করে' দিল। তবুও সে চেষ্টার ক্রটি করে নি, তাকে সৎপথে ফিরিয়ে আন্‌তে; কিন্তু হ'ল না কিছুই, ব্যথা আর নিরাশা দিনের পর দিন বুকে তার পুঞ্জীভূত হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। এইভাবে দুঃখ ও মর্ম্ম-পীড়ার মাঝখান দিয়ে ধীরে ধীরে পাঁচটা সুদীর্ঘ বৎসর একে একে কেটে' গেল।

শোভার বিয়ের দু'বৎসর পরে তার মা মারা গেলেন। সংসারে আপনার বল্‌তে আর রইল না—বাদে কাশীতে তার এক বিধবা মাসী আর মায়ের দেওয়া হাজার কয়েক টাকা বই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের শেষ সেই, তাও সে রাখ্‌তে পার্‌লে না। স্বামীর অত্যাচারে দিতে দিতে অবশিষ্ট যা রইল, তাও স্বামীর ওষুধ পথ্যে ফুরিয়ে গেল নিঃশেষে!

কিছুরই অত্যধিক বাড়াবাড়ি সয় না, শোভার স্বামীরও সইল না। সে শয্যাশায়ী হয়ে পড়্‌ল। স্বামী যাই হোক্, কিন্তু শোভা ত বঙ্গবধূ! হাতের নোয়া-গাছি রক্ষা কর্‌তে, তার হাতে সামান্য যা পুঁজি ছিল, তাও অকুণ্ঠিত-চিত্তে ব্যয় করে' ফেল্‌ল; একটি পয়সা আর অবশিষ্ট রইল না। কিন্তু এত করে'ও সিঁথীর সিঁদুর মুছে' ফেল্‌তেই হ'ল।

একদিন থান কাপড় পরে' চলে' এল কাশীতে তার মাসীমার কাছে। তার স্বামী মৃত্যুর পূর্ব্বেই তার সব কিছু নিঃশেষ করে' গিয়েছিল। যে বাড়ীতে তারা ছিল, সেও তাদের নয়, ভাড়াটে বাড়ী! ভাড়ার টাকা জোগাতে না পার্‌লে, বাড়ীর মালিক থাক্‌তে দেবে কেন? কিন্তু এক বেলা এক মুঠো অন্নের সংস্থান যার নেই, ভাড়ার টাকা সে জোগাবে কোত্থেকে?

তাই একদিন অশ্রুমুখী মাসীমার দোর-গোড়ায় এসে দাঁড়াল, এবং একদিন দু'দিন করে' সেখানেও তার দেড়টি বছর কেটে গেল।......

...তার মাসীমার সাথে মার কেমন করে আলাপ পরিচয় হ'ল, তা' আমি জানি নে। কিন্তু দু' মাস অসুখে ভুগে', শোভার প্রাণপাত সমস্ত সেবা নিষ্ফল করে' দিয়ে

সেদিন তার মৃত্যু হ'ল, সেদিন মার হাতে শোভাকে তিনি একান্ত করে' সঁপে দিয়ে গেলেন।...

এই মেয়েটির জন্যে মার মনের কোণে নিভৃতে যেন অনেকখানি দুর্ব্বলতাই আত্মগোপন করে' ছিল; যা তিনি কোন দিন ভুল্‌তে পারেন নি! শোভার এই দুর্দ্দশার জন্যে একমাত্র তিনিই দায়ী, এই রকম একটা ব্যথাই তাকে পীড়া দিত। এবং তার প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তেই যেন মা দু'হাত বাড়িয়ে পরম স্নেহে শোভাকে বুকের মাঝখানে জড়িয়ে ধর্‌লেন।

একটী দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বিমল বলিল,—এই ত তার সংক্ষিপ্ত জীবনের ইতিহাস।

এর পর কিছুক্ষণ চুপ-চাপ। সমস্ত কোঠাখানা একটা একটানা করুণ নীরবতায় ভরিয়া রহিল। পরে বিমল ধীরে ধীরে ডাকিল, ঘুমোলে স্বরো ?

—না, কেন ?

—আমি ভাবি কি জান? ভাবি, আমাকে এত গভীরভাবে ভালবেসেও আমার কাছ থেকে তো সে কিছুই পেল না। অথচ আমি আশ্চর্য্য হই, মার এত-খানি স্নেহ সে কি করে' আকর্ষণ কর্‌তে পার্‌লে ?

—মেয়েদের এ জিনিষটা তোমরা ঠিক বুঝ্‌বে না! কিন্তু সে যাক্,—একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া সরযূ বলিল, তোমার শীগ্‌গীর কোন বন্ধ আছে ?

—কেন ?

—প্রয়োজন আছে, বল।

—আছে, আস্‌ছে শুক্রবার থেকে পাঁচ দিন গুড্-ফ্রাইডের বন্ধ!

—বেশ ভালই হ'ল! চল, এর সাথে আরো ক'দিন যোগ করে' কাশী থেকে বেড়িয়ে আস্‌ব।

—কেন ?

—মাকে অনেকদিন দেখিনি, তা ছাড়া শোভাকে দেখ্‌তেও আমার বড্ড সাধ হয়।

—বেশ, তাই হবে! বলিয়া বিমল পাশ ফিরিয়া শুইল।

* * * *

সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতেছে। গৃহ-দেবতার সম্মুখে প্রদীপ রাখিয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিতেছিল শোভা। এমন সময়ে বাহির হইতে ডাক আসিল, দিদি!

চমকিয়া, শোভা মাথা তুলিল। অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছিল, উঠানে একটি রমণী-মূর্ত্তি অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল শুধু, কিন্তু প্রথম দর্শনেই তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না, এ কে! এবং সাথে যে একটি পুরুষও রহিয়াছে, তাহাও নিসংশয়ে উপলব্ধি করিতে পারিয়া, শোভা কাপড়টা বেশ ঠিক করিয়া লইয়া তাড়া-তাড়ি অগ্রসর হইয়া আসিল। এবং আনন্দোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল,—এসেছেন আপনারা, আসুন, ভেতরে আসুন! বলিয়া সমাদরের সহিত বাহিরে দণ্ডায়মানা রমণীকে ধরিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

সরযূ বলিল,—সমস্ত ঠিক করে' কাল আর আস্‌তে পারি নি!

— আমরাও আজ ঠিক এর জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। মা আজও প্রাতে বল্‌ছিলেন, যে এ বন্ধে আপনারা হয়ত আর আস্‌বেন না। একবার নিশ্বাস নিয়া আবার কহিল, কিন্তু উনি কোথায় ?

—পাশের বাড়ীর কার সাথে যেন আলাপ কর্‌ছেন পথে। ঐ যে আসছেন।

—আপনারা কাপড় ছেড়ে' বিশ্রাম করুন। মা মন্দিরে গেছেন, এখনি আস্‌বেন। বলিয়া শোভা বাহির হইয়া গেল।......

......পরদিন গঙ্গার ধারে তাহারা পায়ে হাঁটিতে-ছিল। মাতা-পুত্র তাহাদের সাংসারিক বিষয় আলোচনা করিতে করিতে যাইতেছিল, আর তাহাদের পঁচিশ-ত্রিশ হাত আগে যাইতেছিল সরযূ আর শোভা। কিন্তু তাহারা একটি কথাও বলিতেছিল না।

আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সরযূ ডাকিল, দিদি!

চমকিয়া শোভা তাহার দিকে চাহিল, কহিল, কি ভাই ?

—আজ সারাদিন ধরে' তোমাকে একটি কথা বল্‌ব ভাব্‌ছি, কিন্তু পারিনি!...বল্‌ব ?

—কেন বল্‌বে না ভাই, নিশ্চয় বল্‌বে!

তবুও কিন্তু সরযূ বলিতে পারিল না। শুধু শোভার

।। হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া নীরবে অগ্রসর লাগিল।

াভা বুঝিল, সরযূ ইতস্ততঃ করিতেছে। তাই কই, তোমার কথা বল্‌লে না?

যূ জোর করিয়াই যেন এবার বলিয়া ফেলিল,—র সাথে কল্‌কাতা চল না, দিদি!

াভা হাসিয়া উঠিল। বলিল, এই কথা বল্‌তে ঙ্কাচ? তারপর সহসা গম্ভীর হইয়া বলিল,—কিন্তু একেবারেই অসম্ভব, বোন!

-অসম্ভব কেন? সরযূ মুখ তুলিয়া তাকাইল।

-কেন যে, সে কথা বোঝাবার মত বিদ্যে আমার ··কিন্তু সত্যি সম্ভব নয়!

-আমি মূর্খ, সে আমি নিজেও কম জানি নে। তুমি কেন যে অসম্ভব বল্‌ছ, সেও কি আমি ন, এতই বোকা?...তবে তুমিও বোধ হয় ভুল দিদি!

-না, ভুল করি নি, বোন!

যূ মাথা নাড়িয়া দৃঢ়স্বরে বলিল,—নিশ্চয় কর্‌ছ! ক যেতে বলায়, তুমি ভেবেছ, আমার এ সরলতা মীরই নামান্তর। নিজের সর্ব্বনাশ বুঝি নে! কিন্তু , দিদি। আমি আট বছর তার ঘর কর্‌ছি, আমার ভয় নেই।

-সে আমার চাইতে কেউ বেশী মর্ম্মান্তিক ভাবে না, সরযূ! সে কথা আমি ভাবি নি! আমি ক দিয়েই শুধু ভেবেছি! তুমি আর আমার জান?

-কিন্তু আমি আমার স্বামীকে জানি, সেই আমার !

-না, যথেষ্ট নয়! অনেক মুনি ঋষিরও মতিভ্রমের শানা যায়! তোমার কাছে সঙ্কোচ নেই; আমাকে ঝো না, বোন! ওঁর সম্বন্ধে আমার মন আজও হীন নয়। এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া শোভা ়তে লাগিল।

াবার কিছুদূর তাহারা অগ্রসর হইয়া আসিল ন। তারপর সরযূ বলিল, তা' সে যাই হোক্ ভালবাসার পাত্রকে যে তুমি অসংযমের মাঝে টেনে অসম্মান কর্‌তে পার্‌বে না, এ আমি নিশ্চয় করে' জানি! আর সত্যি যদি এর অন্যথা হয়, আর যাই না কেন হোক্, তারপরে তোমার ভালবাসা প্রমাণ হবে না!

—এসব কথার মধ্যে কোন বস্তু নেই, সরযূ। জানি, লালসা কথাটা শুন্‌তে মানুষ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু আবার মানুষই তার প্রিয় পাত্রকে শুধু দূর থেকে দেখে'ই তৃপ্তি পায় না। তাকে দেহে, মনে, সব দিক্ দিয়েই পেতে চায়! একথা যে অস্বীকার কর্‌বে, হয় সে ভালবাসে না, না হয় সে মিছে বলে!···কিন্তু আমার কথা তুমি ঠিক বুঝ্‌বে না! কারণ, ভগবান তোমাকে একথা উপলব্ধি করবার মত অবস্থায় ফেলেন নি! বলিয়া শোভা ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে আবার কহিল,—হয়ত তোমার অনুরোধে আমি কল্‌কাতা যেতাম; কিন্তু তুমি আমাকে দিদি বলে' ডেকেছ, এত আদর করে' অনেক দিন কেউ আমায় ডাকে নি! অন্ততঃ বড় বোনের মর্য্যাদা রাখ্‌তেও আমি যেতে পার্‌ব না!

—তোমাকে আমি ভাল করেই চিনেছি দিদি, কিন্তু কেন যে তুমি······

সরযূ শেষ করিতে পারিল না। হঠাৎ উত্তেজিত স্বরে শোভা বলিয়া উঠিল,—না, না, সরযূ, তুমি আর আমায় অনুরোধ করো না। আমি নিজেকে হয়ত আর সাম্‌লাতে পার্‌ব না তা'হ'লে! এ প্রলোভন সোজা নয়! হয়ত······

শোভার একটি হাত সরযূ তাহার মুঠার মধ্যে আনিয়া ডাকিল,—দিদি!

শোভা কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, আমি বিধবা, সরযূ! কাশীই আমার উপযুক্ত স্থান! বাসি-ফুল কি দেবতার মন্দিরে শোভা পায়, ভাই? এখানেই বেশ থাক্‌ব, মা আর আমি! তুমি সুখী হও, দুঃখিনী দিদির এই একমাত্র আশীর্ব্বাদ জেন, বোন! বলিয়া শোভা সরযূর মাথায় একটি চুম্বন করিল।

সরযূ হেঁট হইয়া তাহার পায়ের ধূলা লইয়া বলিল,—তা'হ'লে তাই হোক্ দিদি, কাশীতে থেকেই তুমি আমার দিদির আসন অধিকার করে' থাক!

ঠিক সেই সময়েই পিছন হইতে আহ্বান আসিল,—অনেক দূর এসে গেছি, এবার ফের!

গীতার যোগ

(২য় খণ্ড)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

জ্ঞান ও ভক্তি একই ভজন-প্রণালীর বিভিন্ন ধারা। পূর্ব্বোক্ত ১৪শ শ্লোকে ভক্তি-সাধনা এবং পরবর্ত্তী ১৫শ শ্লোকে জ্ঞান-সাধনার কথা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। এই উভয় পথই দৈবী প্রকৃতি অর্থাৎ ভাগবত-স্বভাব লাভ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। কীর্ত্তন, প্রণাম ও নিষ্ঠাযুক্ত ঈশ্বরোপসনা ভক্তি-সাধনারই অঙ্গ। উপাসনার কেন্দ্র 'মাম্' অর্থাৎ 'আমাকে' এই শব্দ প্রযুক্ত হওয়ায়, উপাস্য বস্তু এখানে সগুণ ভাবেই লক্ষিত হইতেছেন। নির্গুণ ব্রহ্মের কীর্ত্তন, প্রণাম ও উপাসনা অসঙ্গত। ভক্তি-শাস্ত্রে সগুণ পরমেশ্বর-তত্ত্বেরই উপাসনা-বিধি পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোর্শ্মরণং পাদসেবনং—অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যং আত্মনিবেদনং"—ভক্তির এই নবধা লক্ষণ ৩৪শ শ্লোকের মধ্যে নিহিত আছে। জীবপ্রকৃতির সম্পূর্ণ লয় না হইলে দৈবী প্রকৃতির আশ্রয় লাভ করা যায় না। সাধকের জীবনে পর পর ভক্তি-লক্ষণগুলি ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া পরিশেষে আত্মনিবেদন অর্থাৎ জীবত্বের নিঃশেষে আত্মবিসর্জ্জনে ভাগবত-স্বভাবপ্রাপ্তিই ঘটে।

পাতঞ্জল যোগ-সাধনারও এই একই লক্ষ্য। যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ-যোগ-সাধনে চিত্তবৃত্তির লয় অর্থাৎ জীব-ভাবেরই আত্ম-বিসর্জ্জন সংসিদ্ধ হয়। ইহা আত্ম-নিবেদনেরই নামান্তর। শ্রবণ, কীর্ত্তন, শরণাগতি ইষ্ট-নিষ্ঠাকেই দৃঢ় করে; পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন—ইষ্টের ধ্যানমূর্ত্তি কতখানি হৃদয়ে প্রগাঢ় হইলে ইহা সম্ভব, তাহা অনায়াসে বোধগম্য। ইহারই পরিণামে দাস্যাদি রস-সৃষ্টি। উহাই অপার্থিব সম্বন্ধ-তত্ত্ব। ভক্তিযোগের এই কীর্ত্তনাদি নয় প্রকার। প্রসিদ্ধ লক্ষণ তিনটী স্তবকে পাতঞ্জলের ধারণা, ধ্যান ও সমাধির সহিত এক-পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া মিলাইয়া লইলে, গীতার যোগ অধিকতর স্পষ্ট করিয়া হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে সুবিধা হয়।

কালের বশে যদি অক্ষুন্ন থাকে, তবে উহা সা মহাব্রত-রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উহা করিতে বিরুদ্ধ বৃত্তিগুলিকে তুলিয়া নিঃশেষে রূপান্তরিত হয়। এই যোগবিজ্ঞান অকাট্য। কিন্তু ইহা পক্ষে দুঃসাধ্য। এই জন্যই গীতার যোগের এ পতঞ্জলীর সাধ্যবস্তুর অপ্রাপ্তিবোধ তখনই ঘুচে, পূর্ব্বোক্ত যোগাঙ্গগুলি সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হয় হইতে বস্তুকে আশ্রয় করিতে না পারিলে, যে সং অভ্যাস আমাদের আচ্ছন্ন করিয়া আছে তাহা হইতে হেতু কোনও এক অনির্দ্দেশ্য অনাস্বাদিত তত্ত্বকে রাখিয়া অগ্রসর হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না; এ এই যোগ অতিশয় কৃচ্ছ্র সাধ্য। পতঞ্জলীর সং "বিতর্ক-বাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্" অর্থাৎ হিংসাদি শুদ্ধির জন্য তদ্বিরুদ্ধ প্রেমাদি ভাবের আশ্রয় গ্রহণ হয়। বিকৃত অথবা মৌলিক, যে গুণই গ্রহণ কা গুণ ভিন্ন অন্য কিছু নহে; ভক্তিযোগ প্রত্যক্ষ বস্তুকে আশ্রয় করিয়া বিকৃত স্বভাবের শোধণ-নীতি করে। ইহা আনুগত্যের সাধনা; এইজন্য দেশ-ক অন্তরায়ে ভগবদাশ্রিত জনের সাধন-ভঙ্গের সম্ভাবনা বরং এইরূপ স্বভাব-সিদ্ধ মহাব্রত অকপট নিষ্ঠায় আচরিত হইলে, প্রতিকূল দেশ, কাল বা অবস্থার প ভক্তির মহিমা সমধিক বৃদ্ধি পায়—ইহাতে জ অগ্নিশুদ্ধ কাঞ্চনের ন্যায় নির্ম্মল ও সমুজ্জ্বল হইয়া ভক্তি-সাধনার সাধ্য—শব্দ অথবা গুণ মাত্র নহে; উ পরম ঈশ্বর-বস্তু। বস্তু-নিরূপণ না হইলে, ভক্তি-এ আরম্ভই হয় না। এই ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ-ভাবনা করিয়া করিতে হয় না—ইষ্টের আকর্ষণ-জাত চিন্তাবৃত্তি পরিশেষে ত্যাগ করার দাবীও থাকে ভক্তি-শাস্ত্রে আছে—

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।

পরমেশ্বরে যাহার অচলা ভক্তি, গুরুতেও যাহার তদ্রূপ, এই সাধনার নিগূঢ় রহস্য তাহারই নিকট মহাত্মারা প্রকাশ করিয়া থাকেন। দরদী ও মরমী ভিন্ন অন্যে ইহা বুঝে না। একান্ত ভক্তির প্রভাবেই যাবতীয় অন্তরায় দূর করিয়া সাধক ঈশ্বরযুক্তি লাভ করিতে পারে। যোগ-দ্রষ্টা পতঞ্জলীও এই কথা অস্বীকার করেন না। 'ততঃ প্রত্যক্-চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ"—অর্থাৎ পরমেশ্বর-বিষয়কভাবনা ও প্রণব দ্বারা ঈশ্বরপ্রণিধান যখন জন্মে, তখনই বিঘ্নসমুদায় তিরোহিত হয়, স্বরূপ-সাক্ষাৎকার ঘটে। সকল যোগের লক্ষ্য একই। রাজযোগ ও ভক্তিযোগের লক্ষ্যও অভিন্ন। সাধন-ভেদে ইহা সুগম ও দুর্গম হইয়াছে। রাজযোগে চেষ্টা করিয়া জীবপ্রকৃতিকে লয় করিতে হয়—দিব্য-প্রকৃতি-লাভের জন্য জাতি-দেশ-কালের প্রতিকূলতায় এইজন্য রাজযোগীকে একান্ত অস্বাভাবিক জীবন নীতি গ্রহণ করিতে হয়। সাধন-বিচ্যুতির প্রতিপদে সম্ভাবনা থাকে। আর ভক্তি-সাধনে ঐকান্তিক অনুরাগ মাত্র আশ্রয় করিয়াই মূর্ত্ত ভগবানের বাণী-শ্রবণ, ঈশ্বরমহিমা-কীর্ত্তন, মনঃ, বুদ্ধি, অভিমান, দুই চরণ, দুই কর এবং শির, এই অষ্টাঙ্গ প্রণমিত করিয়া সহজেই তামসিক ও রাজসিক অহঙ্কার নাশ এবং জীব-ধর্ম্ম রূপান্তরিত হইতে পারে। এই সাধনায় জাতি-দেশ-কালের বিচার নাই। স্মৃতিও ইহার সমর্থন করিয়া বলেন,

> ন দেশ-নিয়মস্তত্র ন কাল-নিয়মস্তথা।
> নোচ্ছিষ্টাদৌনিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্ণামলুব্ধকে॥

—যাহার চিত্ত ভগবানে প্রলুব্ধ তাহার পক্ষে দেশ-কালের নিয়ম থাকে না। উচ্ছিষ্টাদি সম্বন্ধে ছুঁৎমার্গের বিধি-নিষেধও তাহার নাই।

এই ভক্তিসাধনার শ্রেষ্ঠত্ব শুধু গীতার ছত্রে ছত্রে মুখরিত নহে, ভারতের শাস্ত্র-সিন্ধু-মন্থনে সমস্ত সাধনপ্রণালীর সার-ভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক ভক্তি-সাধনার উপরেই শ্রীকৃষ্ণ গীতার যোগের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আত্মসমর্পণ যোগের মূল কেন্দ্র পরা ভক্তি বা প্রেম।

অতঃপর জ্ঞান-সাধনের স্থানও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার যোগ-বিজ্ঞানে যথাক্ষেত্রে দিতে ভুলেন নাই। ১৫শ শ্লোকে যেখানে ইহার উল্লেখ আছে, তাহাতেই ইহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন—কেহ জ্ঞান-রূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া আমার উপাসনা করেন; কেহ বা আপনাকে আমার সহিত অভেদ করিয়া এবং অন্যে স্বতন্ত্র-ভাবে বিবিধ প্রকারে আমার উপাসনা করিয়া থাকেন। ইহাতে উত্তম, মধ্যম ও মন্দ, এই তিন প্রকার জ্ঞান-সাধনার ক্রম কথিত হইল। শ্রুতিতেও পাই, 'ত্বং বা অহমস্মি ভগবতে, অহং বা ত্বমসি" অর্থাৎ 'হে ঐশ্বর্য্যশালী দেবতা, তুমি ও আমি মূলতঃ অভিন্নস্বরূপ।' এইরূপ অভেদ-জ্ঞানমূলক পরমেশ্বরোপাসনাকে অহং-গ্রাহ উপাসনা কহে। ইহাই অদ্বৈতবাদ, যাহা প্রধান ও উত্তম জ্ঞান-সাধন। অন্যে যাহারা উপাস্য-উপাসকের প্রভেদ-বুদ্ধি সহকারে সম্মুখে কোনও প্রতীক রাখিয়া ভগবদ্-বোধে তাহার উপাসনা করে তাঁহারাও জ্ঞানযোগী। ইঁহারা বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদী বা মধ্যম শ্রেণীর জ্ঞানযোগী। আবার দ্বৈতবাদী, যাঁহারা বিশ্বরূপ সর্ব্বাত্মাকে বহু-রূপে নিরীক্ষণ করিয়া বিভক্ত নাম-রূপের সাহায্যে ভগবানের উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকেও জ্ঞানসাধক বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই শ্রেণী-বিভাগ সাধনার ক্রমানুসারেই নিরূপণ করা যায়। ইহা সাধনার বিশ্লেষণ মাত্র। গীতার পাঠকদের স্মরণ রাখিতে হইবে, এই সকল বিচিত্র সাধনপ্রবাহে অবগাহন ও বিশ্লেষণ করিয়া তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ উদার সার্ব্বভৌম আত্মসমর্পণ-যোগপ্রণালীকেই সমুদ্ধার করিতে চাহিতেছেন। এই মূলসূত্র হারাইয়া গেলে, গীতার যোগের খেই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

পরবর্ত্তী চারিটী শ্লোকে সেই পরম যোগের কেন্দ্রস্বরূপ ইষ্ট-নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

> অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
> মন্ত্রোঽহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥ ১৬
>
> পিতাহমস্যজগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
> বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কারঃ ঋক্-সাম-যজুরেবচ॥ ১৭
>
> গতির্ভর্ত্তাপ্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
> প্রভবঃ প্রলয়স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ ১৮
>
> তপাম্যহং বর্ষঃ নিগৃহ্নাম্যুৎসৃজামি চ।
> অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন॥ ১৯

—আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমি হবনীয় দ্রব্য, আমিই অগ্নি এবং আমিই হোম-স্বরূপ। আমি এই জগৎসংসারের পিতা, মাতা, বিধাতা ও পিতামহ এবং আমিই জ্ঞেয় বস্তু, পবিত্র ওঙ্কার ও ঋক্, সাম, যজুর্ব্বেদ।

আমি গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, দ্রষ্টা, নিবাস, রক্ষক, সুহৃৎ, সৃষ্টি ও সংহারের উৎস, সর্ব্বাধার ও অপরিণামী বীজ।

হে অর্জ্জুন, আমি উত্তাপ প্রদান করি; সলিল আকর্ষণ করি এবং পুনরায় তাহা ভূতলে বর্ষণ করি। আমি একাধারে মৃত্যু ও অমৃতস্বরূপ। আমি সৎ। অসৎ যাহা তাহাও আমি।

ক্রতু অর্থে শ্রৌত যজ্ঞ, যজ্ঞ অর্থে স্মার্ত্ত যজ্ঞ বুঝায়। 'ঋক্-সাম-যজুরেব চ' এখানে 'চ' শব্দ প্রযুক্ত হওয়ায় অথর্ব্বাঙ্গিরসও অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। ইহা কেহ কেহ বলিয়াছেন; কিন্তু পরবর্ত্তী শ্লোকে ত্রৈবিদ্যা, ত্রয়ীধর্ম্ম প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় এইরূপে ধরা সঙ্গত হয় না। ১৮শ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে 'গতি-' স্বরূপ অভিহিত করিয়াছেন। ধর্ম্মশাস্ত্রেও গতির কথা উল্লিখিত আছে। মনু বলেন,

> ব্রহ্মাবিশ্বসৃজঃ ধর্ম্মো মহানব্যক্তমেবচ।
> উত্তমাং সাত্বিকীমেতান্ গতিমাহুর্মনীষিণঃ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মা, মরীচি প্রভৃতি ঋষি, ধর্ম্মদেবতা, মহত্তত্ত্ব এবং প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এইগুলিকে পণ্ডিতগণ উত্তম ও সাত্বিকী গতি নামে অভিহিত করেন।

কথিত আছে, সাত্বিক গতি দ্বারা মানবগণ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়; রাজসিক গতিই মনুষ্যত্ব দান করে এবং তামসিক গতিই তির্য্যক্ গতির কারণ হয়। ভগবান এই সমস্ত গতির মূল;—তিনিই পরম গতি। 'সাধনার পরিণতি' বলিলেই 'গতি' শব্দের অর্থ সুপরিস্ফুট হয়। যাহার যে সাধনা সেই তাহারই ফল প্রাপ্ত হয়। যেমন যজ্ঞের সাধক যজ্ঞ-ফল আহরণ করিবে। প্রণবোপাসনা-কারী প্রণব-তত্ত্বই উপলব্ধি করিবে। এই সকলই ঈশ্বরের আশ্রয় বা বিভূতি, কিন্তু কোনটাই পরিপূর্ণ ঈশ্বর-তত্ত্ব নহে। ভাগবত জীবন যে চায় তাহাকে ভগবানকেই সাধনার একমাত্র সাধ্যরূপে অর্থাৎ পরমগতি-স্বরূপ আশ্রয় করিতে হইবে। তিনিই 'নিবাস' অর্থাৎ ভগবানই চেতনার নিত্য বাসভূমি বলিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে। তিনিই শরণ্য ও যোগের আশ্রয়; সাধনার একমাত্র সহায় তিনি ছাড়া অন্য কেহই নহেন। জড়ে ও জীবনে, যেখানে যাহা কিছু প্রকাশিত আছে, হইতেছে ও হইবে, সকলের মূলে তাঁহাকেই অপরিণামী বীজ ও আধার রূপে অবধারণ করিয়া গীতার সাধক ইষ্ট-মূর্ত্তি দিয়াই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছাইয়া ফেলেন—ইহার সকল ক্রিয়া, সকল অভিব্যক্তি ও পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া সেই একই পরমেচ্ছার নিত্য পরিণতি লক্ষ্য করিয়া তিনি মৃত্যু ও অমৃত, সৎ ও অসৎ, এই চরম দ্বন্দ্ব হইতেও চিরমুক্তি লাভ করেন।

ইহার পরের শ্লোকগুলিতে ভগবদুপাসনায় এইরূপ পরম গতির সহিত খণ্ডোপাসনা-জনিত সসীম ও পরিচ্ছিন্ন গতির তুলনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গীতার মৌলিক সাধনাটীকেই সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

> ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপাঃ
> যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
> তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকম
> শ্নন্তি দিব্যম্ দিবি দেবভোগান্॥ ২০
> তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালম্
> ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি।
> এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্নাঃ
> গতাগতং কামকামাঃ লভন্তে॥ ২১

—অর্থাৎ বেদত্রয়োক্ত-কর্ম্মনিষ্ঠ যাঁহারা তাঁহারা বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা আমার পূজা করিয়া এবং যজ্ঞাবশিষ্ট সোম-রস-পানজনিত শোধিতপাপ হইয়া স্বর্গ কামনা করেন। তাঁহারা পুণ্যফলস্বরূপ ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া দিব্যধামে দিব্য ভোগসকল উপভোগ করেন।

তদনন্তর তাঁহারা বিপুল স্বর্গ-সুখের ভোগাবসানে, ক্ষীণ-পুণ্য হইয়া মর্ত্ত্যলোকে পুনঃ প্রবেশ করেন। এই-রূপ বেদবিহিত ধর্ম্মের অনুগত ভোগকামী ব্যক্তিরা সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করেন।

ভগবানকে প্রত্যক্ষ লক্ষ্য রূপে সম্মুখে রাখিয়া যে গীতার যোগ, তাহাতে স্বর্গাদি কোন গৌণ ফলভুক্তির কামনা

রাখিলে যে পরম গতি হইতে বিচ্যুত হইতে হয়, ইহাই এই শ্লোক দুইটীতে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপাদন করিয়াছেন। বিচ্যুতির কারণ, পরিপূর্ণ তত্ত্ব-বস্তু ভাগবত-স্বরূপকে ছাড়িয়া গুণ-ধর্ম্মের অনুসরণ। গীতার ধর্ম্ম—সাক্ষাৎ ভাগবত বস্তুর আনুগত্য ব্যতীত সুসিদ্ধ হইবার নহে। ইহা নিত্য-যুক্তির সাধনা। এই নিত্য-যুক্তি লাভ করিতে হইলে অনন্যাশ্রয়ী হইতে হয়; চিন্তায়, কামনায় আর কিছুর লেশমাত্র সংস্পর্শ থাকিলে পরিপূর্ণ ইষ্ট-নিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। যে ইষ্টযুক্তিই চায়, তাহার মনে-প্রাণে স্বর্গ-নরক, ভাল-মন্দ, এমন কি মৃত্যু বা অমৃতের প্রাপ্তি-বিচারও আর মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান পায় না। এইরূপে ভিন্নমুখী সকল আকাঙ্খা ও চেষ্টার লয় হওয়ায়, একান্ত নির্ভরশীল আত্মসমর্পণযোগী যে পরম ধৃতিময় অবস্থা লাভ করেন, তাহাই দিব্য-জীবন লাভের প্রথম পাদপীঠ বলা যাইতে পারে। এই অবস্থায় ইষ্টরূপী 'আমি' অর্থাৎ পরমেশ্বর-তত্ত্বই সাধকের সকল সাধনার দায়ভার বহন করেন। তখন ভগবানই সাধক; তিনিই শক্তিরূপে সাধকের আধারে অবতীর্ণ হইয়া তাহার যোগ-জীবনের সকল ক্রিয়া-অক্রিয়া, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি সাক্ষাদ্‌ভাবে নিয়ন্ত্রিত করেন। ইহাই পরবর্ত্তী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়াছেন—জলদমন্দ্রে আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন—

অনন্যশ্চিন্তয়ন্তো মাম্ যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ ২২

—অর্থাৎ যাহারা অনন্যচিন্ত হইয়া আমার পর্য্যুপাসনা করে, সেই সকল নিত্যযুক্ত সাধকের যোগ ও ক্ষেম আমিই বহন করিয়া থাকি।

উপরোক্ত 'পর্য্যুপাসতে' শব্দ আমরা ১২শ অধ্যায়েও পুনঃ প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিতে পাই। পরিপূর্ণ ঈশ্বর-প্রণিধান অর্থাৎ সম্যক্ ইষ্টানুগত্য—ইষ্টে একান্তচিত্তে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণই পরাভক্তি বা গীতার যোগের অসাধারণ লক্ষণ। এই যোগ যেখানে সত্যই ধৃত হইয়াছে, সেখানে অবিকৃত-ভাবে এই অসাধারণ লক্ষণ অবধারিত প্রকাশ পাইয়াছে। উপাসনানীতির এইরূপ পরিপূর্ণ মর্য্যাদা দেওয়া হয় না। যাঁহারা গুণধর্ম্ম বর্জ্জ... ঈশ্বর মাত্র আশ্রয় করেন, তাঁহাদের যাহা অপ্রা... তিনি পূরণ করেন এবং যাহা প্রাপ্ত তাহা... রক্ষা করেন অর্থাৎ এক কথায় ভগবদাশ্রিত অ... যোগীর নিজের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি বোধ আর ... —ভগবানের অনাহত ইচ্ছাশক্তি বিশুদ্ধ লীল... যখন যেমন-ভাবে তাঁহাদের নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালি... তাঁহারা অব্যাভিচারিণী ভক্তি ও নিষ্ঠা সহকা... আনন্দসহকারে বরণ করিয়া চলেন। ইঁহাদের ... অর্থাৎ যোগ-রক্ষা ও যোগের পরিণতি সংসাধন ভার নিজেদের স্কন্ধে বহন করিয়া চলিতে হয় না, তাঁহাদের জীবনে একাধারে সাধক ও সিদ্ধ... প্রকৃতি অথবা যোগময়ী লীলাশক্তিই প্রকটিত ক...

ইহার অন্যথা যেখানে, সেখানেও গীতার ধর্ম্ম... ভাবে চরিতার্থ হইতে বাধা নাই—এমন ক... একমাত্র গীতাকারের পক্ষেই সম্ভব হইয়াছে... শ্লোকগুলিতে ইহারই সঙ্কেত পাওয়া যায়।

যেঽপ্যন্যদেবতাঃ ভক্ত্যা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন মামাভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥ ২...

—কৌন্তেয়, যাহারা ভক্তি-শ্রদ্ধা-সমন্বিত হ... দেবতার অর্চ্চনা করে, তাহারা অজ্ঞানতঃ আ... করিয়া থাকে।

আমি সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও ফলদাতা... আমাকে যাহারা তত্ত্বতঃ জানে না, তাহারা ফ... বঞ্চিত হয় অর্থাৎ সম্যক্ ফল লাভ করিতে পারে...

দ্বিতীয় শ্লোকে আশ্বাসের সঙ্গে সতর্কতা... সংযুক্ত থাকায় সাধনার পথে ইহা গভীরভাবে... যোগ্য। আত্ম-সমর্পণের সাধনায় ঈশ্বর-প্রা... কিছুই করিবার নাই। সর্ব্বেন্দ্রিয়, মনোবৃত্তি অ... স্বভাবতঃ যাহাতে সংসক্ত হইয়া রমণ করে, ... ইষ্ট-রূপে আশ্রয় করা এই যোগের একমাত্র নিগূ... কিন্তু এই ইষ্ট-তত্ত্বে ভাগবত-বোধের স্ফুরণ ...

নও স্বভাব-জীবনের রূপান্তর হয় না। গোপী-কৃষ্ণে এই ভাগবত বুদ্ধি না জন্মিলে, তাহা প্রেমোদয় সম্ভব করিতে পারিত না। ভক্তি-সারদ সেই কথাই অন্য ভাবে বলিয়াছেন—পি মাহাত্ম্যজ্ঞান-বিস্মৃত্যপবাদঃ— তদ্বিহীনং এই মাহাত্ম্যজ্ঞান অর্থাৎ ভাগবত-জ্ঞানের টিলেই তাহা জার-বুদ্ধির অপবাদে কলঙ্কিত যেখানে জার-বুদ্ধি নাই, সেখানেও ভগবদ্-জ্ঞান কেন না, অহঙ্কারের লয়ই আত্ম-সমর্পণ-মূলসূত্র—আর ইষ্টে প্রাকৃত-জ্ঞান বিন্দুমাত্র থাকিতে সেখানে অহঙ্কার-ব্যাধির মূলগত সম্ভব নয়। তবে এইরূপ প্রাকৃত বস্তুতে ষ্ট-বুদ্ধি স্থাপনপূর্ব্বক একনিষ্ঠ উপাসনা করিতে একেবারে ফল নাই তাহা নহে, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়। চেতনার প্রাকৃত স্তর হইতে স্তরে অধিরোহণ করিবার পক্ষে এই প্রকার উপাসনাও অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হইতে এই জন্যই অধিকারিভেদে দেব-যক্ষাদি নানা itermediary mediums) উপাস্য বেদাদি শাস্ত্রে বিহিত আছে। শ্রীকৃষ্ণ এই সকল বৈদিক উপাসনা একেবারে নাকচ করেন নাই; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন, যে ইহাদের সাহায্যে গৌণ ও পরোক্ষ ফলই অধিগত হয়; ঈশ্বরোপাসনার যে পরমা গতি তাহা ইহা দ্বারা সম্ভব নহে। এইটুকু বুঝাইবার জন্যই ২৫শ শ্লোকে তিনি পুনরায় বলিতেছেন—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥ ২৫

—যাঁহারা বিভিন্ন দেবতার ভজন করেন, তাঁহারা সেই সেই দেবতাকে, পিতৃ-পূজকগণ পিতৃগণকে, ভুতোপাসক-গণ ভূতশক্তিকে এবং আমার প্রত্যক্ষ উপাসনাকারী আমাকেই প্রাপ্ত হন।

গীতার যোগ আর ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট করিয়া কেমন করিয়া বলিতে হয়, তাহা আমরা জানি না! শ্রীকৃষ্ণ ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছেন,—"অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ" ইত্যাদি —তত্রাপি দেব-যজ্ঞাদির ফল নিত্য নহে; কেন না, ইঁহারা ভগবানের আংশিক শক্তি, ইঁহাদের উপাসনায় তাঁহার আংশিক স্বরূপই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)
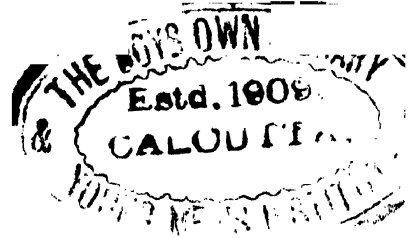
সম্মিলন

শ্রীঅমিয়নাথ চৌধুরী

মোরে চল্‌রে নিয়ে সেই সে অচিন দেশে
যেথা রূপ নিল ভাই হেসে সসীম বেশে।
বাক্য পে'ল চিন্তা যেথা,
মোরে নিয়ে চল্‌রে সেথা;
যেথায় আনন্দেতে রূপ নিল ভাই এসে
য় নিয়ে চল্‌রে মাঝি সেই সে নবীন দেশে।

দূর যে ছিল নিকট হ'ল, নিকট হ'ল দূর;
মূক সে তাহার পেলে বাণী, অসুর পেলে সুর।
ধীর যে ছিল হ'ল অধীর
অধীর হ'ল ধীর
দ্বন্দ্ব সেথা বন্ধ হ'ল দুঃখ হ'ল দূর—
চল্‌রে সেথা নিয়ে যেথা মূক পেলে তার সুর॥

বঙ্গভাষা ও মোসলেম-সাহিত্য

শ্রীপ্রিয়লাল দাস

সাহিত্য সভ্যজাতির অমূল্য সম্পদ্। যে সাহিত্য যত উন্নত, সে জাতিও তত উন্নত। তার চিরকালের বৈশিষ্ট্য, তার গুণী, জ্ঞানী, মনীষিগণের অমূল্য দান, সমস্তই স্থান পায় তার সাহিত্যে। জগৎ সত্যকার পরিচয় পায় তার সাহিত্যের ভিতর দিয়ে। জাতির এতখানি গুরুত্বের বোঝা বহন করে যে ভাষা ও সাহিত্য, তাকে যথেষ্ট সবল ও পুষ্ট করে' তোলা শুধু জাতির কর্ত্তব্য নয়, জাতির ধর্ম্ম।

পৃথিবীর উন্নত ভাষাগুলির মধ্যে আমাদের এই বাংলাভাষা একটি। অন্য কিছু না থাক্‌লেও, আমরা গৌরব করে' বলে' থাকি, আমাদের ভাষা আছে। প্রকৃতপক্ষে বাংলা বাঙ্গালী জাতিকে বিশ্ব-সভ্যতার ক্ষেত্রে অতি উচ্চ আসন দিয়েছে। কিন্তু ভাষাকে বিকৃত করে' বর্ত্তমানে মোসলেন-সাহিত্য নাম দিয়ে যে স্বতন্ত্র সাহিত্যের সৃষ্টি হচ্ছে, তার ফলে সমগ্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এতে বাংলা ভাষার অবস্থা যে কি শোচনীয় হয়ে উঠ্‌ছে, তা চিন্তা কর্‌লেই মনে আতঙ্ক আসে।

অনেকে বলে' থাকেন, ভাব ও আদর্শের দিক্ দিয়ে আমাদের এই বাঙ্গালী জাতি ইউরোপের স্বাধীন জাতিগুলা অপেক্ষাও মনে প্রাণে এক। ভারতের অন্যান্য লোকেদের সঙ্গে এর তুলনাই হয় না। কথাটা আজকাল বিশ্বাস করতে খট্‌কা লাগে। কিন্তু একদিন ইহা সত্যই ছিল। হিন্দু মুসলমানের প্রথম দেখা-সাক্ষাতের দিনে হয়ত ঝগড়াঝাটি গণ্ডগোল কিছু হয়েছে। কিন্তু তারপর বহু বৎসর ধরে' পাশাপাশি বাস করার ফলে এই দুই জাতি বহুলাংশে মিশে গিয়েছিল। সে মিলনের গভীরতা কতখানি তা সামান্য একটা ঘটনা থেকেই আমরা বেশ অনুমান করে' নিতে পারি। মুসলমান নৃপতির কর্ম্মচারী শিলাখণ্ডে লিখে গেছেন :—

শ্রীরস্তু*

শাকে পঞ্চপঞ্চা—
শদাধিক চতুর্দ্দ—
শ শতাঙ্কিতে মধৌ
শ্রীশ্রীমন্মহামুদ সা—
হ নৃপতেঃ সময়ে নৃ—
র বাজর্খান পুত্র ম—
হাপাত্রাধিপাত্র শ্রীম—
ৎ ফরাস খাঁনেন সংক্র
মোয়ং বিনির্ম্মিত ইতি।

এবং হিন্দুরাও তাদের বংশগত উপাধি ত্যাগ করে' ধারণ করেছিল খাঁ, মজুমদার ইত্যাদি মুসলমানী আখ্যা। এই-ভাবে তারা যাচ্ছিল সম্পূর্ণ এক হয়ে।

অতি কুক্ষণে দেশে আসে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা যদিও সেটা শেষ পর্য্যন্ত বাতিল হ'ল গভর্ণমেন্টের সদিচ্ছার ফলে, তবু যেন তারই একটা রেশ প্রেতাত্মার মতই উৎপাত সুরু করে' দিল বাঙ্গালীর ঘরে। লাগ্‌ল ভায়ে ভায়ে বিরোধ। দুর্নাম রট্‌ল, ভায়ে ভায়ে বাঙ্গালীর বণে না। এর থেকেই কি না জানি না, প্রবাদ চলেছে 'ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই'। ঝগড়া করে একটা লাউ গাছ নিয়ে, খরচ করে হাজার হাজার টাকা। শেষে দুজনেই হয় 'ফেল্'। ভোগ করে এসে' প্রতিবেশী ; কিন্তু এমন জিনিষ অনেক আছে যা আলো বাতাসের মত ভাগ করে' নেওয়া যায় না। সে চেষ্টায় ক্ষয় পায় শক্তি, নষ্ট হয় ভাজ্য বস্তু।

বাংলা ভাষা যে হিন্দুর একার নয়, মুসলমানেরও নয়, এ-যে সাধারণ সম্পত্তি, তা' এতে সংস্কৃত শব্দ কত ও আরবী, পারসিক শব্দ কত, তার হিসাব করে' দেখ্‌লেই

---

* প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩৯। রাজসাহীস্থিত বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির মিউজিয়াম হইতে প্রাপ্ত।

বোঝা যায়! তবুও একে নিয়ে এই যে টানাটানি এতে এর স্বাস্থ্যহানি না ঘটে'ই পারে না।

সম্প্রতি ভাগা-ভাগিটা একেবারে পাকাপাকি করে' নিয়ে বোধ হয় মাঝখানে প্রাচীর তুলে দেওয়া হ'ল। কারণ সে বছর কলকাতায় বঙ্গীয় মোছলেম সাহিত্য সম্মেলন হয়ে গেল। উভয় জাতির সাহিত্যিকগণের মধ্যে মেলা-মেশার একান্ত অভাবই এরূপ ঘট্‌বার কারণ। বহু বৎসর যাবৎ বাংলায় সাহিত্যসম্মেলন হয়ে আস্‌ছে। কিন্তু কখনও তাতে মুসলমান সাহিত্যিকগণকে যোগ দিতে দেখা গেল না। তাঁরা ইচ্ছা করে'ই আসেন না, না তাঁদের ডাকা হয় না, ঠিক জানা নাই। এত বড় "রবীন্দ্র-জয়ন্তী" হয়ে গেল, কিন্তু মুসলমান সাহিত্যিকগণ তাতে যোগ দেন নাই। "শরৎ-বন্দনা"তেও না। বছর কয়েক আগে এলবার্ট হলে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে কবি কাজী নজরুল ইসলামের সম্বর্দ্ধনা-সভা ব্যতীত অন্য কোন মুসলমান সাহিত্যিকের অভ্যর্থনা উপলক্ষে হিন্দুগণকেও যোগ দিতে দেখা যায় নাই। হিন্দু-সম্পাদিত পত্রিকা-গুলিতে মুসলমান লেখকদের নাম দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। মুসলমান-সম্পাদিত কাগজে হিন্দুর লেখাও বিরল। সমগ্র বাংলা ভাষা যেন দুটি বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হ'তে সুরু করেছে। এই দু'খাতের জল যদি এক খাতে চালা'বার ব্যবস্থা না হয়, যদি মাঝখানের প্রাচীর ভেঙে দুইকে এক করা না হয়, তা'হ'লে ভবিষ্যতে এদুটাকে যে এক সাহিত্য বলে' চেনা যাবে না, একথা সুনিশ্চিত। তাই সাহিত্য-সম্মেলনের আজ সব চেয়ে বড় কাজ হচ্ছে—হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে সকল জাতের সাহিত্যিকগণকে অবাধ মেলা-মেশার সুযোগ দেওয়া। সু-কু সাহিত্য নিয়ে মারামারি করে' বড় বড় গুরু-গম্ভীর প্রবন্ধের ভারে সম্মেলনকে প্রপীড়িত করা হয়, তার আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, একথা শরৎচন্দ্র ফরিদপুর সাহিত্যসভায় বেশ সুন্দর ভাবে বলেছিলেন।

মিলনের আশাতেই বোধ হয় গত চৈত্র মাসে কলিকাতা সাহিত্যসম্মেলনে "বঙ্গভাষা ও মোসলেম সাহিত্য" নামে একটি শাখা-সম্মেলনের ব্যবস্থা হয়েছিল। এবং তার সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন একজন মুসলমান সাহিত্যিক। উদ্দেশ্যটি প্রশংসার্হ, সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ ব্যবস্থাও ঐক্যস্থাপনের মূল নীতির বিরুদ্ধে। মোসলেম সাহিত্য-শাখা সৃষ্টি করার মানে মোসলেম সাহিত্য নামে স্বতন্ত্র সাহিত্য বজায় রেখে' চলা। তা' না করে' সাহিত্য-শাখার জন্যই একজন মুসলমান সাহিত্যিককে সভাপতি ঠিক কর্‌তে পার্‌তেন এবং সেইটেই হ'ত সব চেয়ে ভাল ব্যবস্থা।

মেলা-মেশার অভাব থেকে এসেছে সদ্ভাবের অভাব। বিভিন্ন দিকে চল্‌তে গিয়ে উভয়ের মধ্যে হয়ে পড়েছে ব্যবধানের সৃষ্টি। তারই ফলে মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দুর অতীত সাহিত্যের উপরও হয়ে পড়েছে বীতশ্রদ্ধ। তাই আজ দেখ্‌তে পাচ্ছি, মুসলমান বালককে চাণক্যের শ্লোক পড়্‌তে দেখে'ই অভিভাবক অভিভাবিকাগণ ছুটে' এসে' সেটা কেড়ে' নিয়ে ছিঁড়ে ফেল্‌ছেন, ছেলে অধঃপাতে যাবার ভয়ে! তাঁরা এমন কথাও বল্‌ছেন যে, বাংলা ভাষাকে আরবী অক্ষরে চালান ভাল। পুরাতন পহ্লবী অক্ষর উঠিয়ে দিয়ে আরবী অক্ষর প্রচলন করার ফলেই নাকি পারস্যের সমস্ত অধিবাসীরা মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন!

জাতীয় জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই আজ সাম্প্রদায়িকতা এসে' বাধার সৃষ্টি করেছে। জাতীয় সাহিত্যও যাতে এই সাম্প্রদায়িকতা-দোষে পঙ্গু না হয়ে যায়, তা' সাহিত্য-সেবী মাত্রেরই আজ দেখা কর্ত্তব্য।

— বৈচিত্র্য —

ক্যামেরার কারিকুরি—

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে ক্যামেরার যে কত দূর উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা নিম্নের ছবিখানি হইতেই বেশ বুঝা যায়। আলো-ছায়া ও অঙ্গভঙ্গীর বাহ্য সমাবেশ ও মুখ-কপোল প্রভৃতি অঙ্গে যেরূপ অভিব্যক্তি হয় তাহা পট-ভূমিতে আলো-ছায়ার সংযোগে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে।

মনুষ্যনির্ম্মিত সূর্য্য—

ক্যামেরার কারিকুরি

মনুষ্যনির্ম্মিত সূর্য্য
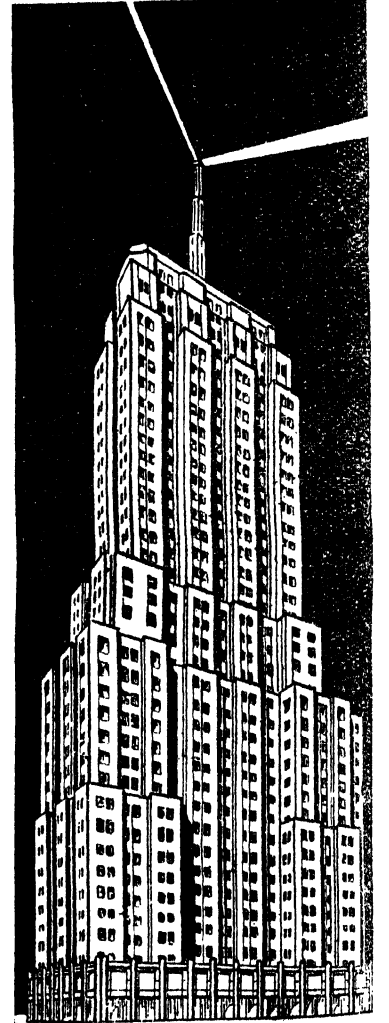
অন্তরের অভিব্যক্তি ফটো-লেন্সে আশ্চর্য্য-রকম বিস্ময়কর ও জীবন্ত ভাবে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রতিচিত্র-ের চোখ-

সত্য কিন্তু কল্পনাকেও ছাড়াইয়া যায়। লিণ্ডেনবার্গ সাঙ্কেতিক আলো পৃথিবীর মধ্যে এক অত্যাশ্চর্য্য বস্তু। এত বড় শক্তিশালী আলোর প্রতিষ্ঠা বর্ত্তমানে বা অতীতে

অন্যত্র সম্ভব হইয়াছে কিনা শুনা যায় না। পশ্চিম যুক্ত-রাষ্ট্রের মধ্যভাগে শিকাগো সহরে এই লিণ্ডেনবার্গ আলো প্যালমলিভি প্রাসাদের উপর স্থাপিত হইয়াছে। এই বাড়ীটি আধুনিক ধরণের উনচল্লিশ তালা। বিখ্যাত ব্যবসায়ী প্যালমলিভি ও কোলগেট কোম্পানী এই বিরাট্ প্রাসাদের মালিক। প্রধানতঃ বিমানপোতের চলাচলের সুবিধার জন্য এই সূর্য্য-সদৃশ আলোর স্থাপনা বলিয়া উহার নামকরণ করা হইয়াছে মার্কিণের সর্ব্বপ্রথম বীমানবীর লিণ্ডেনবার্গের নামানুসারে।

দু'শো কোটি মোমবাতি একসঙ্গে জ্বালিলে যেরূপ আলো হয়, তদ্রূপ লিণ্ডেনবার্গ আলোর শক্তি। আব্-হাওয়ার অবস্থানুসারে এক-শো হইতে দু'শো মাইল পর্য্যন্ত উহার চতুর্দ্দিক্ আলোকিত হয়। রাস্তা হইতে ৬০২ ফিট উচ্চে আলোটি অবস্থিত। এক মিনিটে উহা একবার ঘুরিয়া আসে। ইহা ছাড়াও সাড়ে এগারো মিলিয়ন মোমবাতির শক্তিসম্পন্ন আর একটী বাতি প্যালমলিভি প্রাসাদের উপর স্থাপিত হইয়াছে, যাহার আলো সর্ব্বদাই শিকাগোর মিউনিসিপ্যাল বিমান-বন্দরের দিকে স্থিরভাবে প্রতিফলিত হয়।

এই সুবিধার জন্য যে কোন অবস্থায় শিকাগো সহরে বিমানপোত-চলাচলের আর কোন অসুবিধাই হয় না। লিণ্ডেনবার্গ আলোর জন্য ১৯৩০ সালে ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠার পর হইতে মোট এক লক্ষ সত্তর হাজার একফুট লম্বা কার্ব্বন ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্যের জন্য মোট ৪৭ টন ইস্পাত লাগিয়াছে।

বৃহত্তম তাপপরিমাপক যন্ত্র—

প্যারিসের ইফেল টাউয়ারের সংযুক্ত ঘড়ি এতদিন পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম ছিল; কিন্তু সম্প্রতি যে একটী তাপ-পরিমাপক যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার তুলনাও পৃথিবীর অন্যত্র মিলে না বলিয়া অসীম গৌরবের স্থান অধিকার করিয়াছে। উহার উচ্চতা ৯৮৪ ফুট এবং ইফেল টাউয়ারের উচ্চতার চেয়ে মাত্র একফুট ন্যূন। ইংলণ্ডের যে সেন্টপল ক্যাথিড্রেলের ক্রসের উচ্চতা বিলাত-ফেরত ভারতবাসীর নিকট সুবিদিত ও প্রশংসিত তাহাও প্যারিসের এই নব-নির্ম্মিত তাপ-পরিমাপক যন্ত্রটীর তুলনায় ৬১৯ ফুট ছোট।
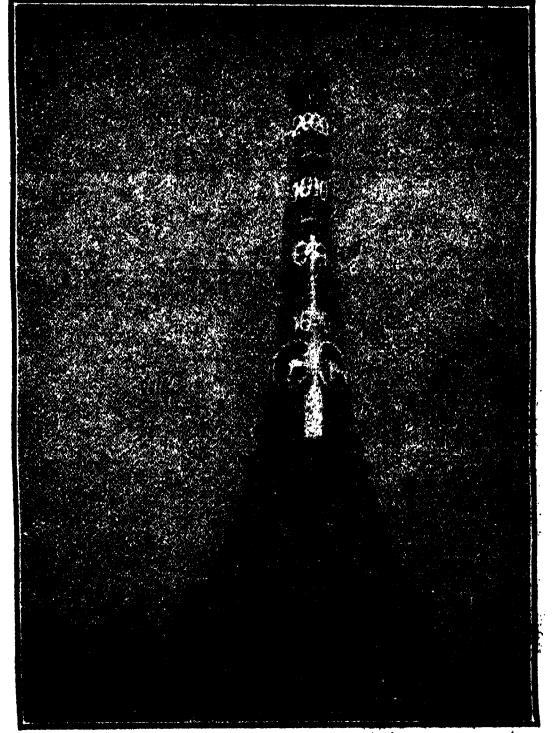
বৃহত্তম তাপপরিমাপক যন্ত্র

এই যন্ত্রটীর ৫২৫ ফুট পর্য্যন্ত তাপ-সঙ্কেত দিতে পারিবে এবং রাত্রেও ঘন ঘন এইরূপ আলোকিত করিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে যাহাতে বহুদূর হইতে প্যারিসের তাপ নির্ণীত হইতে পারে।

সৌরবিজ্ঞান-পর্য্যবেক্ষণে কৃতিত্ব—

মার্কিণের মাউণ্ট উইলসনের বৃহত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্র মানুষের অজানা জগতের অনেক বিস্ময়কর রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া মানবের জ্ঞান-রাজ্যের সীমা অনেকটা পরিবর্দ্ধিত করিতে সাহায্য করিয়াছে। সাত ঘণ্টা ক্রমাগত পর্য্যবেক্ষণের ফলে যে অদৃশ্য অজ্ঞাত সৌরজগৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেখানে গ্রহ নক্ষত্র এখনও আকার পরিগ্রহ করে

ছায়াপথ
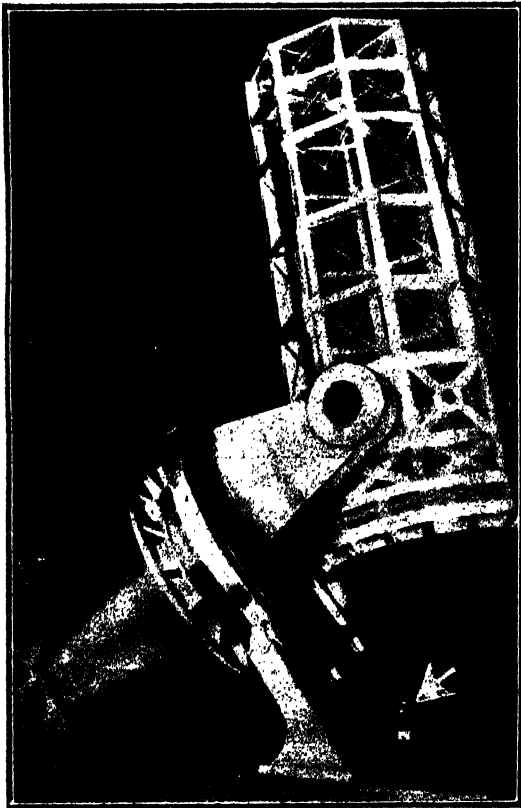
পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীক্ষণ

নাই। উহাই হয়তো ভাবী যুগের নূতন সৃষ্টির দ্যোতনা ক্ষয় ও পূরণ যে কেমন করিয়া সৃষ্টিকে অব্যাহত রাখিয়াছে তাহা ইহা হইতেই বেশ বুঝা যায়।

সম্প্রতি সৌরমণ্ডলের মানচিত্র অঙ্কনের জন্য বৈজ্ঞানিকেরা চেষ্টা করিলেও এখনও অনেক নক্ষত্রের অস্তিত্ব মানুষের জ্ঞানের মাঝে ধরা পড়ে নাই। এদের আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল হইলেও আকাশে এমন বহু তারকা আছে যাদের আলো আজও ধরণীর মাটি স্পর্শ করে নাই। এইরূপ নক্ষত্রের অস্তিত্ব এতদিন চর্ম্মচক্ষে অনাবিষ্কৃত থাকিলেও বর্ত্তমানে উৎকৃষ্ট ফটোগ্রাফীর ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে। একদিকে যেমন এই নেবুলা ক্রমবর্দ্ধনশীল আবার অন্যদিকে উহার কতকাংশ ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতেছে। জ্যোতির্ব্বিদগণ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ইহার দর্শন ও গণিতের সাহায্যে ইহার গতির হার নিরুপিত করিয়াছেন। সিংহ-নেবুলা সেকেণ্ডে ১২৫০০ মাইল হিসাবে ক্রমশঃ লোক-চক্ষু হইতে অপসারিত হইতেছে।

বিশ্ব-সৃষ্টির এই বিপুল ব্যাপকতা মানুষের জ্ঞানগম্য নহে—নিবিড়ভাবে চিন্তা করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়।

পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীক্ষণ—

পার্শ্বের যে দূরবীক্ষণের ছবি দেওয়া গেল উহা বর্ত্তমানে মাউণ্ট উইলসনে নির্ম্মিত হইতেছে এবং উহার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইলে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্র হইবে ও জ্যোতিষ-জগতে যুগান্তর আনিবে

এই দূরবীক্ষণের মুখের কাঁচ (object glass) ঢালাইয়ের জন্য কুড়ি টন কাঁচের আবশ্যক হইয়াছে। ইহা হইতেই এই যন্ত্রটীর অবয়ব অনুমিত হইতে পারে

মাতৃত্ব ও পত্নীত্ব

শ্রীস্নেহশীলা চৌধুরী
সম্পাদিকা, খুলনা মহিলা-সমিতি)

অতীতের ইতিহাসে একদিন লিখিত হয় "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"; বর্ত্তমানের ইতিহাসে নারীজাতি তাহা স্বীকার করা অপমান বোধ করেন, এবং অধিকাংশ পুরুষ জাতি তাহার প্রতিবাদ করিতে চাহেন। তাঁহারা বলিতেছেন, মাতৃত্বের আসন শ্রেষ্ঠ হইবে, তাহার অর্থ কি, পত্নীত্ব কি উচ্চ আসন পাইতে পারে না? নারীর দাবী, নারীর অধিকার তার ব্যক্তিত্বকে জগতের সম্মুখে পরিস্ফুট রূপে বিকশিত করিয়া তুলিবে, মাতৃত্বেই তার সমস্ত জীবনের পূর্ণ পরিণতি আনিবে, ইহার কোন ভিত্তি নাই। তার নিজ অধিকার লাভ করিতে হইলে, শুধু মাতৃত্ব-পদ লইয়া খুসী থাকিলে চলিবে না। জীবন-যুদ্ধে সে নিজের পূর্ণ দাবী লইয়া সমাজে দাঁড়াইবে। এই ভাব-ধারা বর্ত্তমান যুগে পুরুষ এবং নারী উভয়ের মস্তিষ্কে বহিয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান যুগে সকলে নিজের পরিচয়ে পরিচিত হইতে চায়। পিতা, মাতা, স্বামীর পরিচয়ে আত্মপরিচয় নাই; কাজেই "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" নারীর পক্ষে অপমান। তার নিজের জন্য নিজের প্রয়োজন কি কিছুই নাই? পত্নীর জন্য কি স্বামীর কোন প্রয়োজন নাই? পত্নী কি স্বামীর অধিকার স্বীকার করে পুত্রের জন্য? তবে তার জীবনের সার্থকতা কোথায়? বর্ত্তমান যুগে হিন্দু-গৃহে পত্যন্তর গ্রহণ করিবার যে প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে তাহার মূল ভিত্তি এই বিজাতীয় ভাবধারানুমোদিত। এখন আমার জিজ্ঞাস্য, এই পত্নীত্বের স্বীকারই যে মাতৃত্বের প্রথম অংশ, একথা কে অস্বীকার করিবে? বিশ্বসৃষ্টির বিরুদ্ধে যদি কোন নরনারী মাতৃত্বকে নির্ব্বাসিত করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, সৃষ্টির পরিণতি কিসে? ফুলের কার্য্য শেষ হইলেই ফলের উৎপত্তি হইবে, যে ফুল ফল না দিয়া ঝরিয়া যায় জগতে তার চিহ্ন কি থাকে? গন্ধ দান করিয়া এবং নির্দ্দিষ্ট কাল জগৎকে সৌন্দর্য্য বিলাইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গেলে তার সার্থকতা জীবনের কোন-খানটায়? তারপরের কথা—যারা পত্নীত্ব স্বীকার করিয়া, মাতৃত্ব স্বীকার করিয়া নারীজীবনের পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে, তবুও আবার নূতন করিয়া পত্নীত্ব স্বীকার যারা করিতে চায়, তারা যে পত্নীত্ব মাতৃত্ব দুটি জিনিষকেই এক-সঙ্গে অপমান করিতেছে, একথা কে অস্বীকার করিবে? যে ফুল ফল দান করে, তার সকল রস, সকল সৌন্দর্য্য সেই ফলের ভিতরেই পর্য্যবসিত হয়, নূতন করিয়া তার সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি হয় না বা হইতে পারে না। পুত্রকন্যা লাভ করিয়াও ভারতের হিন্দুনারীর পত্যন্তর গ্রহণ দেখিয়া আজ মনে হইতেছে, অতি ধীরে ধীরে যে বিষ অহরহ ভারতের প্রাণশক্তির সঙ্গে মিশ্রিত হইয়াছে, আজ সেই বিষ প্রকৃত ক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছে। আজ আমাদের ভাবিতে গেলে বক্ষ কাঁপিয়া উঠে, চোখে জল আসে, একদিন ভারতবর্ষ মাতৃত্বে শ্রেষ্ঠপদ লাভ করিয়াছিল, পত্নীত্বের একনিষ্ঠ প্রেমেও শ্রেষ্ঠপদ লাভ করিয়াছিল। একাধারে মাতৃত্ব ও পত্নীত্ব তুল্যরূপেই ছিল। হায়, আজ সেই মাতৃত্বকে অপমানিত করিয়া যাহারা পত্যন্তর গ্রহণ করে, তাহাদের রক্তধারায় কি ভারতের হিন্দু রক্তধারা প্রবাহিত হইতেছে? নারীত্বের মর্য্যাদা-রক্ষা কিসে হয়? শুধু কি বিদ্যায়, কি অর্থোপার্জ্জনে, বা বহিঃ-সমাজে অবাধ মেলামেশায়? নারীত্বের মর্য্যাদা-পূর্ণ গৌরবেই সুরক্ষিত হয়, যেদিন সে জননী হয়। বর্ত্তমান যুগে আমরা মাতৃহীন দেশেই বাস করিতেছি। যে মাতা সংযম এবং ত্যাগের আদর্শ লইয়া আনন্দময়ী রূপে সন্তানের সম্মুখে প্রসন্ন হাসি দান করিতে না পারিবে সে কখনই মাতা নহে। সে জ্বলন্ত বাসনার মূর্ত্তিমতী শিখা, সন্তানকে লজ্জা করিয়া মুখে তার আবরণ দিতে হইবে। মায়ের মুখের বাণীতে পুত্র জীবন দিতে পারে, কোন্ প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া? সেই মাতৃত্বের বিজয়ঘোষণায়। শিশুবেলায় মায়ের আদর্শই জগতে সব চেয়ে বড় আদর্শ। হায়, হতভাগ্য বঙ্গ-সমাজ, তোমার ভবিষ্যৎ বংশধরগণ কোন্ আদর্শ জীবনে

গ্রহণ করিতে শিখিবে, বল? স্বাধীনতার বিজয়কেতন যথেচ্ছাচার, স্বেচ্ছাচার নহে, অসংযম নহে, আত্মভোগে আহুতি দান নহে। সংস্কারের বন্ধন, অভ্যাসের বন্ধন অসংযমের দ্বারা, উচ্ছৃঙ্খলতার দ্বারা, ছিঁড়িয়া ফেলিয়া কোন জাতির নারী বা পুরুষ কোনদিন স্বাধীনতা ক্রয় করিতে পারিবে না।

মানুষ যখন নেশা করিতে থাকে, তখন বুঝে না, যে আপাত সুখের জন্য তার দৈহিক মানসিক সকল শান্তিই সে বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছে। বাসনা-কামনাকে যত প্রশ্রয় দিবে ততই যে চাপিয়া ধরিবে; প্রবৃত্তির পায়ে আত্মদান করিলে জীবনে তৃপ্তি বা শান্তি নাই, একথা জলন্ত সত্য। নারী কি সারা জীবন পত্নীত্ব স্বীকার করিয়া বাসনার আগুনে আহুতি দান করিবে? না তা করিবে না, সেইজন্য ত্যাগের পূর্ণ মূর্ত্তি মাতৃত্বের পূর্ণ-বিকাশ। ভারতবর্ষ পৃথিবীর ভিতরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিল মায়ের জাতির পাতিব্রত্যের আদর্শে—সতীপুত্র জগতে সব চেয়ে বড় আসন পায়। বড় দুঃখ প্রাণে জাগে, বর্ত্তমানে যে নারীদের বিকৃত দাবী জাগিয়াছে, সে দাবীটা যে কত লজ্জাকর তা অনেকের কাছে পরিস্ফুট নয়। হিন্দুনারী জানে, সুখদুঃখ ক্ষণস্থায়ী ঋতুপরিবর্ত্তনের মত, হিন্দুনারী জানে যে—'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি'—ক্ষণস্থায়ী জড়দেহ যে কোন মুহূর্ত্তে তাকে ছাড়িয়া নবদেহ ধারণ করিতে হইবে—তবে ক্ষণিকের আকাঙ্ক্ষায় তার মাতৃত্বের পবিত্র আদর্শ ধ্বংস করিয়া অসংযমের ভিতরে নিজ মর্য্যাদা কেন হারাইবে? বুঝি না, জানি না, বুঝিতে চাহি না মা, তুমি কেমন করিয়া তোমার প্রাণাধিক সন্তানের চোখের উপরে তোমার জীবনের বীভৎস কালিমা-মাখা ছবি ফুটাইয়া তুলিতে পার? হতভাগ্য সমাজ, তোমার জীর্ণ দেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক, তাতে দুঃখ নাই, কিন্তু সৃষ্টির এ বিড়ম্বনা অসহনীয়।

আত্মদান

শ্রীশিবশম্ভু সরকার

তোমার চুম্বন লাগি' হে প্রভু আমার
জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নামে হাহাকার
শ্রাবণ-বর্ষণ-ধারা। বেদনার সুর
মুগ্ধ-চিতে চেয়ে রয় বিরহী অশ্রুর
উত্তাপ মাধুরী-মায়া পিয়ে। দীর্ণ তৃষা
ধোঁয়াইয়া অঙ্গে অঙ্গে নাহি পায় দিশা—
উদ্বেল পাগল ছন্দে ক্ষিপ্ত পিপাসায়
মাটীর আগার ছাড়ি' মেঘ পানে ধায়
প্রমত্ত ব্যাকুল গানে। তোমার স্বপনে
রাতের আঁধার-পথ বাজে নি চরণে—
মৃত্যুর চারণ-স্তব্ধ গহীন গহন
নয়নে এঁকেছে যার নব বৃন্দাবন
তারি বুকে জলে প্রেম দুঃসহ-দহন—
জীবন মরণ ল'য়ে অপূর্ব্ব মিশ্রণ
গড়ে' উঠে অহরহ। সেধে রয় জাগি
নিশীথ বাঁশরী আশে অনিদ্রারে মাগি'

জানে নাকি তোমার প্রেমের জ্বালা সহে
জীবনের প্রতি পল ভস্ম হবে অনলে বিরহে।
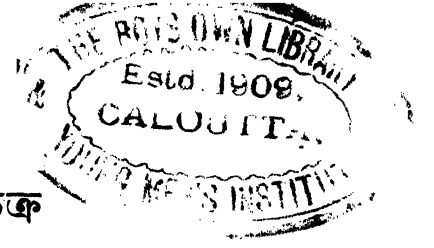
শ্রাবণ ও ভাদ্রের গ্রহচক্র

শ্রীজ্যোতিঃ বাচস্পতি

আষাঢ়ের শেষে ও শ্রাবণের শেষে যে অমান্ত দুইটি হইয়াছে, তাহাতে বিশেষত্ব কিছু নাই। গত সংখ্যায় যে ফল লেখা হইয়াছে তাহাই মোটের উপর চলিবে। আষাঢ়ের অমান্তটি ঘটিতেছে মীন লগ্নে, সুতরাং অমান্তটি পড়িতেছে চতুর্থে এবং রবির কর্কট-ক্রান্তি-সংক্রমণের দ্বাদশে। ২৭শে আষাঢ় (১১ই জুলাই) রাত্রি ১০টা ৫৯ (কলিকাতা) এই অমান্ত হইয়াছে। অমান্তের সময়ে কলিকাতার গ্রহসংস্থান এইরূপ :—

র ২।২৫।৪৬; চ ২।২৫। ৬; ম ২।৪।১৬; বু ২।২৫।২৭ এবং বৃ ৫।২১।৪৬; শু ১।২২।৪৬; শ ১০।৪।২৪ বং; রা ৯।১৮।৩০; কে ৩।১৮।৩০; প্র ০।৮।১৫; ব ৪।১৭।২২; ক ৩।১।১৪।

ভাবস্ফুট :—

১০ম ৮।১০।২৬; ১১শ ৯।৬।৪০; ১২শ ১০।৬।২১; লং ১১।৩।১৬; ২য় ০।১৮।২৯; ৩য় ১।১৬।৩৬;

এই অমান্তের ফল আষাঢ় মাসের মধ্যভাগ হইতেই লক্ষিত হইবে।

এই অমান্তের মধ্যে লক্ষ্য করিবার জিনিষ অমান্ত-চক্র হইতে তৃতীয়স্থ শুক্র ও চতুর্থস্থ রবি, চন্দ্র, বুধ। সংক্রমণ-চক্র হইতে ইহারা যথাক্রমে একাদশস্থ ও দ্বাদশস্থ।

২৫শে শ্রাবণ যে অমান্তটি হইয়াছে, কলিকাতায় তাহার গ্রহসংস্থান এইরূপ :—

র ৩।২৪।৬; চ ৩।২৪।৬; ম ২।২৪।১; বু ৩।৮।২৫
বৃ ৫।২৫।২০; শু ২।২৮।১৪; শ ১০।২।৩০ বং;
রা ৯।১৬।৫৫; কে ৩।১৬।৫৫; প্র ০।৮।৩১ বং;
ব ৪।১৮।১৬; ক ৩।২।০

ভাবস্ফুট এইরূপ :—

১০ম ৫।৩।৪২; ১১শ ৬।৪।২৯; ১২শ ৭।০।৫৯;
লং ৭।২৪।৫৯; ২য় ৮।২৫।৫৯; ৩য় ৯।২৯।৩৯;

এই চক্রে লক্ষ্য করিবার জিনিষ অমান্ত-চক্র হইতে নবমস্থ এবং সংক্রমণ-চক্রে লগ্নস্থ রবি-চন্দ্র। এই রবি-চন্দ্র অমান্ত চক্রের দশমস্থ বৃহস্পতির সহিত ঘনিষ্ঠ শুভ প্রেক্ষা করিয়াছে।

এই দুইটি অমান্ত চক্র লইয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, আষাঢ় মাসের মধ্যভাগ হইতে শ্রাবণমাস পর্য্যন্ত প্রজা-সাধারণের পক্ষে শুভ নহে। জ্যৈষ্ঠমাসের শেষে যেমন বর্ষার সূচনা এবং প্রবল বারিপাতের আরম্ভ হইয়াছিল, আষাঢ়ের মধ্যভাগ হইতে তেমনি বর্ষণের অল্পতা সূচিত হয়। ইহাতে ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। কৃষক এবং ভূম্যধিকারী উভয়ের পক্ষেই এই অমান্তটি ক্ষতিকর। পাট ও ধান এই উভয় ফসলেরই ক্ষতি হইবে; কিন্তু ফসলের যেরূপ ক্ষতি হইবে দ্রব্যের মূল্য সে অনুপাতে বৃদ্ধি পাইবে না। মোটের উপর, কৃষকদের অর্থাভাবে ও অন্নাভাবে কষ্ট পাইতে হইবে।

রাজনৈতিক ব্যাপারে নূতন কিছু বলিবার নাই। সংক্রমণ-চক্রের ফল গত মাসে যাহা লিখিত হইয়াছিল, এই মাসেও তাহা বলবৎ থাকিবে। গভর্ণমেণ্টের দিন দিন শক্তি বৃদ্ধি হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সামাজিক ব্যাপারেও এই মাসটি শুভ নহে। কোন কোন প্রতিষ্ঠাশালী বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কলঙ্ক রটনা হইতে পারে এবং আদালতে এমন কোন মামলা হইতে পারে, যাহাতে কোন প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তির অপবাদ হওয়া সম্ভব। এই সময়ে আদালতগুলিতে বিচিত্র মামলা মোকদ্দমা উপস্থিত হইবে এবং দেশমধ্যে অদ্ভুত ধরণের চুরি ডাকাতি প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। চিকিৎসক বা রাজনৈতিক মহলে কোন কোন প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তির মৃত্যুর আশঙ্কা আছে। এই দুইটি মাসে দেশে বৈপ্লবিক দলের কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হয় এবং তাহাদের দ্বারা পুনরায় গুপ্তহত্যার চেষ্টা হইতে পারে, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট বিপ্লবী দলের সকল চেষ্টা দৃঢ়হস্তে দমন করিতে সমর্থ হইবেন।

ধর্ম্মের ব্যাপারে এই দুইটি মাসে খুব বেশী আন্দোলন হইবে এবং সনাতনী দলের সহিত সংস্কারকামী দলের বিশেষ সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে। বাংলা দেশে অন্ততঃ মহাত্মা গান্ধীর অস্পৃশ্যতা-নিবারণের চেষ্টা বিশেষ বাধা-প্রাপ্ত হইবে এবং তিনি এখানে যদি তাঁহার প্রচার-কার্য্যের সংস্রবে আসেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে। সনাতনীদের দ্বারা তাঁহাকে অপদস্থ করিবার বিধিমত চেষ্টা হইবে, তাঁহার চেষ্টার বিশেষ কিছু ফলও হইবে না।

আষাঢ় মাসের অমাস্ত লক্ষ্য করিলে একটি শুভযোগ দেখা যায় এই যে, তৃতীয়ে বলবান্ শুক্র সপ্তমস্থ বৃহস্পতির সহিত শুভ প্রেক্ষায় বদ্ধ। ইহার ফলে রস সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইবে এবং বহু লেখকের উপভোগ্য ও উল্লেখযোগ্য রচনা প্রকাশিত হইবে। প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা আছে। এই যোগ নারীপ্রগতির পক্ষে শুভ। নারীপ্রগতির স্বপক্ষে সংবাদ-পত্রাদিতে বহু লেখালেখি হইবে এবং সাধারণভাবে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তারের বহু আন্দোলন ও প্রচেষ্টা হইবে।

থিয়েটার, সিনেমা প্রভৃতির ব্যাপারেও এই যোগ শুভসূচক। সাধারণভাবে আমোদ-প্রমোদের প্রতিষ্ঠান-গুলির শ্রীবৃদ্ধি হইবে এবং আরও অনেক মূলধন এই সকল ব্যবসায়ে প্রযুক্ত হইবে। অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রীর খ্যাতি হইবে এবং আমোদ-প্রমোদের সহিত সংশ্লিষ্ট সাময়িক পত্রগুলির মোটের উপর শ্রীবৃদ্ধির আশা করা যায়।

২৫ শে শ্রাবণ যে অমাস্ত হইয়াছে, তাহাতে একমাত্র লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, নবমস্থ রবি-চন্দ্র দশমস্থ বৃহস্পতির শুভ প্রেক্ষায় অনুগৃহীত। এই অমান্তে আর একটি বস্তু লক্ষ্য করিবার আছে, তাহা অষ্টমস্থ মঙ্গল ও শুক্রের সহিত দশমস্থ বৃহস্পতির অশুভ স্কোয়ার প্রেক্ষা। এই অমান্তের ফল শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি হইতেই কম-বেশী লক্ষিত হইবে।

নবমস্থ রবি-চন্দ্রের সাধারণ ফল গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা ও শক্তিবৃদ্ধি এবং বহির্বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি। সাধারণভাবে এই মাসে গভর্ণমেণ্টের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইবে এবং জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতায় প্রবৃত্ত হইবেন। এই মাসে অনেক রাজবন্দীর মুক্তি পাইবার সম্ভাবনা আছে; কেননা এই মাসে গভর্ণমেণ্ট উদারতা দ্বারা জনপ্রিয় হইবেন। আইন-আদালতের ব্যাপার এই মাসে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। বিশেষতঃ, কোন বিচারপতির সম্মান-বৃদ্ধি বা খ্যাতি ও প্রসংশা লাভ হইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তিরও এই মাসে খ্যাতি ও প্রশংসালাভের সম্ভাবনা আছে।

এই মাসে বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে শুভ এবং মাল আমদানী ও রপ্তানী দুইই বৃদ্ধি পাইবে বটে; কিন্তু এক্সচেঞ্জের অবস্থার জন্য ও দেশের মধ্যে আর্থিক অসচ্ছলতার দরুণ দেশের আর্থিক অবস্থা খুব ভাল হইবে না। বাংলা দেশে অন্তর্বাণিজ্যের ব্যাপারে নানারূপ বাধাবিঘ্ন ও অসুবিধা দেখা যাইবে। ধনিক মহলে এবং পুলিশ, সামরিক বিভাগ অথবা চিকিৎসক মহলে কাহারও মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা যায়। এই মাসে শ্লেষ্মাজনিত ব্যাধির প্রকোপ দেশের মধ্যে বৃদ্ধি পাইবে। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগে দেশে মৃত্যু-সংখ্যার আধিক্য হইতে পারে। এই মাসে দেশে ম্যালেরিয়া ও যকৃৎ জনিত পীড়ার আধিক্যও সূচিত হয়। ভাদ্রমাসটীতে নারীপ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হইবে এবং দেশে স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচারমূলক অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে।

মহাত্মা গান্ধীর অস্পৃশ্যতা-নিবারণ আন্দোলনের পক্ষে ভাদ্রমাসটি শুভ। তিনি তাঁহার আন্দোলনকে সফল করিবার বহু সুযোগ এই মাসে পাইবেন। তথাপি তাঁহার স্বাস্থ্যের পক্ষে মাসটি শুভ নহে এবং এই মাসে পুনরায় তাঁহার উপর আক্রমণ হইবার আশঙ্কা আছে।

আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে ধানের ও পাটের মূল্য কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু শ্রাবণ মাসের শেষ হইতে পুনরায় মূল্য-হ্রাস হইবার যোগ লক্ষিত হয়। ভাদ্র মাসে ফসলের অবস্থা খুব ভাল হইবে এবং চাষীদের ও শ্রমিকদের সাধারণভাবে বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হইবে।

এবারে বর্ষা প্রথমে যেমন প্রবল হইয়াছিল, আষাঢ়ের শেষার্দ্ধে ও শ্রাবণের প্রথমার্দ্ধে তেমনি বারিপাত কম হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। শ্রাবণের শেষার্দ্ধে ও ভাদ্রের প্রথমার্দ্ধে পুনরায় প্রবল বারিপাত ও স্থানে স্থানে বন্যার আশঙ্কা আছে।

অবশ্য এই সকল ফলগুলির সঙ্গে আষাঢ় সংখ্যায় সংক্রমণ-চক্রে যে সকল ফল লিখিত হইয়াছে, সেগুলিও খাটিবে। আষাঢ় সংখ্যায় লিখিত ফলগুলি ৭ই আষাঢ় হইতে ৭ই আশ্বিন পর্য্যন্ত এই তিন মাস বলবৎ থাকিবে।

তীর্থ-পথিক
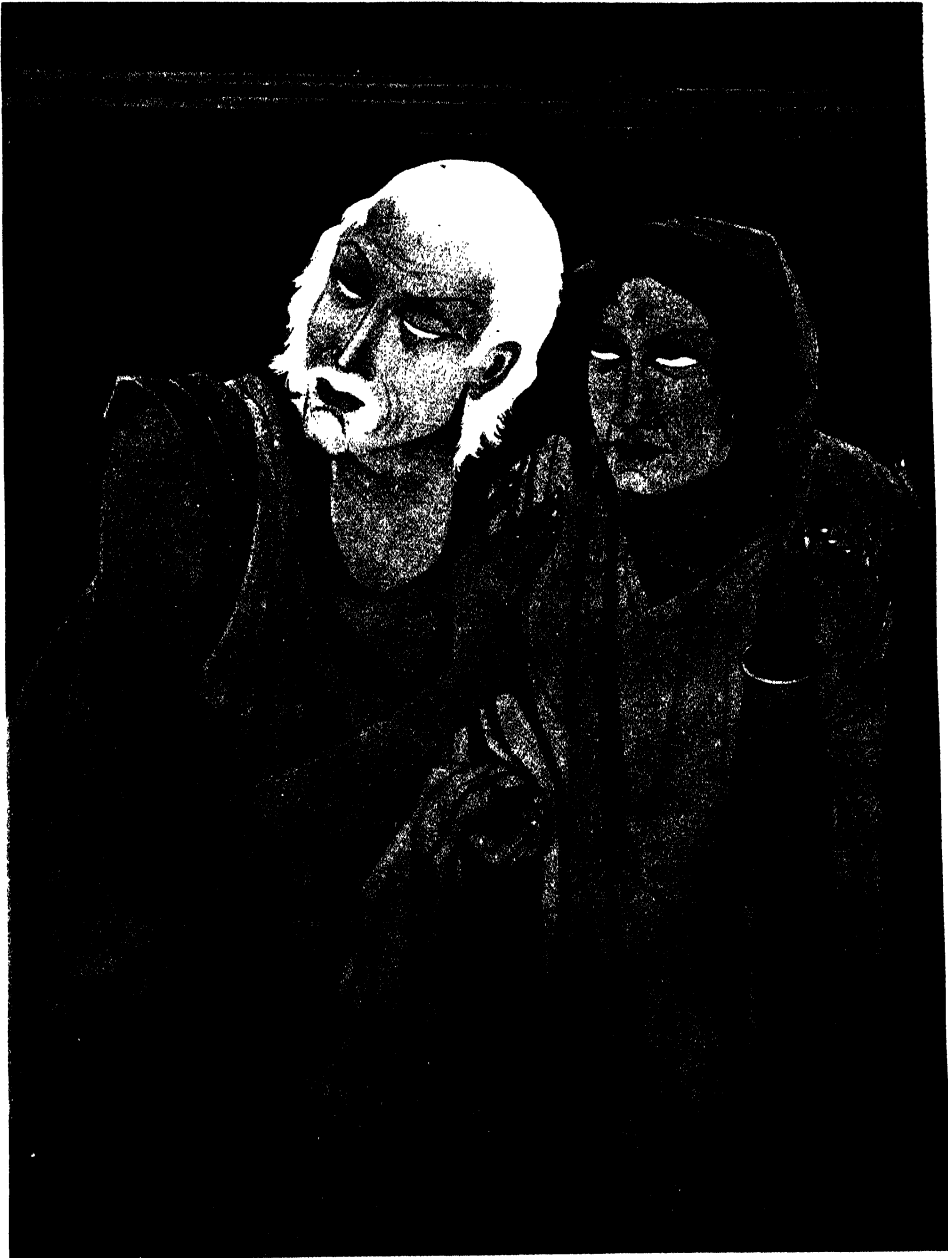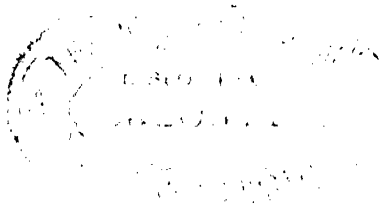
— আলোচনা —

বাঙলা সাহিত্যে আধুনিকতা

শ্রীসুদর্শন শর্ম্মা

'ধর্ম্ম', 'ন্যায়', 'সতীত্ব' ইত্যাদি কতকগুলি অর্থশূন্য কুসংস্কার এতদিন বাঙলার নরনারীর মন অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। এই ঘোর তমিস্রা দূর করিবার জন্য কয়েকটী প্রবীণ এবং অসংখ্য নবীন সাহিত্যিক জ্ঞানের বর্ত্তিকা হস্তে বাঙলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রথম দার্শনিক তত্ত্ব হইতেছে এই যে, সাহিত্যে নীতি-প্রচারের কোন প্রয়োজন নাই। উপন্যাস নীতিপুস্তক নহে। উপন্যাস বাস্তব জীবনের কেবলমাত্র একটা দিকের—অর্থাৎ অবাধ এবং অসংযত কামনার রসাল চিত্র। বন্ধনহীন কামের কতক কাল্পনিক এবং কতক বাস্তব ছবি 'বস্তুতন্ত্রের' নাম দিয়া আজ সাহিত্যের আসরে খুব চড়া দরে বিক্রীত হইতেছে। সমজদারের অভাব নাই। অপরিণতবুদ্ধি কিশোর-কিশোরীর দল এই শ্রেণীর উপন্যাসে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া থাকেন।

যে কোনও উচ্চ-প্রশংসিত আধুনিক উপন্যাসের ৩।৪ পাতা উল্টাইলেই 'চুম্বন' 'আলিঙ্গন' আদি-রসের আভাষ পাওয়া যাইবে। তবে আধুনিকতার লক্ষণ হইতেছে যে, কামরাজ্যের প্রত্যেক খুঁটিনাটি ঘটনার মধ্যে প্রায় কোনটাও বাদ যায় না। বাস্তব-সাহিত্যিকদের প্রধান ভয় এই, পাছে তাঁহাদের উপন্যাস-রত্ন অবাস্তব হইয়া পড়ে। ঔপন্যাসিক শ্লীলতার ধার ধারিবে কি জন্য? সাহিত্যের মধ্য দিয়া আজকাল যৌন-আকাঙ্ক্ষা অনেকটা পরিতৃপ্ত হইবার সুযোগ পাইয়াছে।

আধুনিক সাহিত্যের আর একটী নূতনত্ব হইতেছে, বাঙলা উপন্যাসে ইংরাজীর ভাবানুবাদ করিতে অসমর্থ হইয়া ইংরাজী উক্তি দিয়া ভর্ত্তি করা। অধিকাংশ উপন্যাসেই নায়ক নায়িকার সহিত প্রেমালাপে অথবা বন্ধুর মজলিসের কথোপকথনে ইংরাজী মিশ্রিত বাঙলা বাহির হয়। অনেক স্থলে ইংরাজীর প্রয়োগও সাধু নহে। বাঙলা উপন্যাসে ইংরাজী বুক্‌নীর প্রয়োজন কি তাহা জানি না। ইহার দুই কারণ থাকিতে পারে। এক লেখক মহাশয়ের অতি-পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেওয়া—অর্থাৎ তিনি ইংরাজী ভাষাতেও তাঁর যে অগাধ পাণ্ডিত্য তাহারই বিজ্ঞাপন দেওয়া এবং তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি মাতৃভাষাতেই সীমাবদ্ধ নহে, ইহা প্রমাণ করা। অপর কারণ হইতেছে, লেখক মহাশয় ইংরাজী শাস্ত্র ও ভাবসাগরে ডুবিয়া থাকার জন্য তাঁহার উপন্যাসের ভাব মাতৃভাষায় প্রকাশ করিবার অক্ষমতা।

কারণ যাহাই হউক, প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও ঔপন্যাসিক মহাশয়গণের স্মরণ রাখিলে ভাল হয়, যে তাঁহাদের অনেক ভাই ভগিনী ইংরাজীনবিশ না হইয়াও উপন্যাসের রসাস্বাদনে উৎসুক। তাহাদের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ বাঙলা উপন্যাসে ইংরাজী বুলি কপচান বন্ধ করিলেই ভাল হয়। তবে যদি ইংরাজীনবীশ না হইলে আধুনিক উপন্যাস পড়া নিষিদ্ধ বা নিষ্প্রয়োজন বা অহিতকর বিবেচনায় বিজ্ঞ লেখক মহোদয়গণ ঐরূপ কৌশল করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার বলিবার কিছুই নাই।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের "পুতুল ও প্রতিমা" পুস্তকের ১৪০ পৃষ্ঠা হইতে ১৪৮ পৃষ্ঠা মধ্যে লেখক মহাশয় তাঁহার ইংরাজী ভাষায় দখলের প্রভূত পরিচয় দিয়াছেন। প্রতি পাতাতেই ৪।৫ লাইন ইংরাজীতে কথোপকথন পাওয়া যায়। পুস্তকের অন্যান্য স্থলেও ইংরাজী-মিশ্রিত বাঙলার প্রয়োগ আছে। কোন স্থলেই ইংরাজীর ভাবার্থ দেওয়া নাই।

শ্রীবুদ্ধদেব বসুর 'এরা আর ওরা' পুস্তকের প্রায় এক-চতুর্থাংশ ইংরাজীতে এবং অবশিষ্ট বাঙলা ভাষায় লিখিত। তবে বইখানি বাঙলা উপন্যাস বলিয়াই বিজ্ঞাপিত হইতেছে। লেখক মহাশয়ের মাতৃভাষা অপেক্ষা ইংরাজীতে

পাণ্ডিত্য বেশী থাকায় তিনি বাঙলা লিখিতে গিয়া ইংরাজীতেই ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। অবশ্য ইহা না করিতে পারিলে, বুদ্ধদেব বসু আধুনিক বড় সাহিত্যিকের ছাপ পাইতেন কিনা সন্দেহ।

লেখিকা মহাশয়ারাও এই আধুনিকতার হাত হইতে ত্রাণ পান নাই। আধুনিকা অনেক লেখিকার গল্প বা উপন্যাসে বাঙলার মাঝে প্রচুর ইংরাজী ভাষার ব্যবহার পাওয়া যায়। ইহা হইতে মনে হয়, যে কেবলমাত্র ইংরাজীনবীশদের জন্যই আধুনিক বাঙলা উপন্যাস লিখিত হইতেছে। যদি ইহাতে উপন্যাস পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা কিছু কমে তাহা হইলে ফল ভালই বলিতে হইবে।

আর একটা আধুনিকতা হইতেছে, প্রসিদ্ধ পুস্তকের পাতা কাটা না থাকা। যে বইয়ের পাতা না কাটিয়া পড়িতে পারা যায়, তাহা বর্ত্তমান সময়ে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর গণ্য হইয়া থাকে।

স্বাভাবিক

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত

দরজাটা খুলে'
পাটিতে কি টুলে
ঠাকুরদাদা বসেন এসে বা'র-দরজার পাশে—
সীতাপতি হরদম তাঁর তামাক নিয়ে আসে;
পোড়া কল্‌কে তুলে' নিয়ে নতুন কল্‌কে বসায়…
ঐ কল্‌কেই ঠাকুরদাদা এই বৃদ্ধ দশায়
করেছেন যে সার—
চাই-ই বারম্বার।
নজর পথের দিকে…
ঠাকুর, চাকর, ঝি-কে
(কোন্ বাড়ীর যে ঝি-চাকর আর বামুন ঠাকুর তারা
জানেন নাক কিছুই, তবু নেবেন্ তাদের সাড়া)
বল্‌বেন ডেকে: "আছ ভাল?" তারা বলে: "আছি"-
ঠাকুরদাদা বলেন: "তোমরা ভাল থাক্‌লেই বাঁচি।"
তারা একটু হাসে,
কথা ভালবাসে।
আলাপী লোক হ'লে
"দাঁড়াও একটু" বলে'
দাঁড় করিয়ে ভদ্রলোককে বল্‌বেন কত কথা…
আর কুশল-বার্ত্তা
কত যে তাঁর! কিন্তু তারা রাগ করে না কেহ,
কাজের ক্ষতি করে'ও সবাই গ্রহণ করে স্নেহ…
শুনে' লোকের কুশল
হাসেন অবিরল।
নিজের কথাও বলেন:
"হরি যদি নেন
এখনই ত' রক্ষা পাই, বুড়ো হওয়াই কষ্ট,
তবে, যদ্দিন্ না হচ্ছে দেহের কলুষ নষ্ট
তদ্দিন্ ত' থাক্‌তে হবেই!" শুনে' বলেন তাঁরা:
"না না, কাকা; মরার কথা এখনই কি? যারা
উৎপাত ও শত্তুর
তারাই হোক্ দূর;
আপনি আমাদের
গুরু চিরকালের,
মুরুব্বি এ-পাড়ার; আপনার শত বর্ষ আয়ুঃ;
এখনো বেশ সুস্থ আছে আপনার দেহ স্নায়ু।"
শুনে' হাসেন ঠাকুরদাদা খুশী হয়ে যান্—
ঢেলে' সাজা কল্‌কে পেয়ে করেন ধূমপান…
নমস্কার করে'
তাঁরা যান্ সরে'।

ব্যাগ ঝুলিয়ে পাশে
পিওনটা রোজ আসে
ঐ পথেতেই ; ঠাকুরদাদার প্রশ্ন করাই চাই :
"আমাদের এ-বাড়ীর কারো চিঠি আছে ভাই ?"
থাক্‌লে চিঠি দিয়ে যায় সে ; না থাক্‌লে বলে :
"নাইক চিঠি।" কিন্তু সে এতই দ্রুত চলে,
যেন তাহার কাছে
জিম্মা করা আছে
যাবতীয় লোকের
জীবন মরণ ঢের—
বিলি কর্‌তে দেরী হলে' মরে' যাবে সবাই—
এক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে যাবার সময় তাহার নাই।

ঠাকুরদাদা এক সময়ে বল্‌লেন আমায় ডেকে' :
"ভাল ভাল কথা ভাব্‌তে শেখ' এখন থেকে'—
ঐ যে ডাক্‌-পিওন
ও নয় সামান্য জন !"
আমি বল্‌লাম : "ও যে
ঠিকানাটা খোঁজে
আর চিঠি বিলি করে কেবল !" "তা' বটে, তা' ঠিক্‌,
কিন্তু ওকে হতেই হবে মস্ত দার্শনিক"...
বলে' ঠাকুরদাদা কি ভাব্‌লেন চুপ করে'—
বল্‌লেন : "আমার কথার মর্ম্ম বুঝ্‌বি রে এ-র পরে ;
বল্‌ আমাকে দেখি
দার্শনিক মানে কি ?"
আমি বল্‌লাম : "ও-সব
জানে না এ যাদব।"
ঠাকুরদাদা বল্‌লেন : "যাদব, তুমি ছেলেমানুষ,
তবু এখন থেকেই তোমায় রাখ্‌তে হবে হুঁস্‌—
এ সংসার অনিত্য, আর বড়ই কঠিন স্থান,
শশব্যস্ত মানুষগুলো দেহে রাখ্‌তে প্রাণ—
অকাল মৃত্যু কত
ঘট্‌ছে অবিরত !...
সুখের স্বাদও আছে,
নইলে কি লোক বাঁচে !

হাস্‌ছে লোকে টাকা পেয়ে, জন্মে ছেলে মেয়ে,
অন্নপ্রাশন বিয়ে আদি কত কারণ পেয়ে
সুখী লোকে ; কিন্তু আমরা সবাইকে কি জানি !
ঐ লোকটা, ঐ পিয়নটা, দিচ্ছে আনি আনি'
কত জবর জবর
সুখ দুঃখের খবর ;
পিওনই সব জানে—
কারণ, খবর আনে...
দেখে আছাড় খাওয়া, বুকে ভূমিকম্পের দোল,
কত হাস্‌তে দেখে, শোনে কত কান্নার রোল ;
আজ যে বাড়ী কান্না ওঠে কাল্‌কে তারা হাসে—
কাল্‌কে যারা হেসেছিল আজকে তারা ভাসে
চোখের জলের বানে...
সে খবরও আনে।
তোরা বুঝি ভাবিস্‌,
নাই বেদনা বিষ
ঐ লোকটার ; শুধু বেড়ায় খবর বিলি করে',
এত দেখেও চিন্তা উহার ওঠে না বুক ভরে' !
নিশ্চয় ও চিন্তা করে এ-জগতের ব্যাপার—
এ-জগতটা সুখী দুখী, সাধু-চোর ও ক্ষ্যাপার...
কি ধরে ও মানে !
কি ভাবে কে জানে !"

বসে' যেমন রোজ
নিয়ে থাকেন খোঁজ
পাড়ার লোকের, তেম্‌নি করেই তাহার পরের দিন
বসে' আছেন ঠাকুরদাদা। এল পাড়ার নবীন—
জ্বর ছাড়ে নাই নাতিটির, তাই দুর্ভাবনা ভারী...
ঠাকুরদাদা বলে' দিলেন : "সেই সঙ্কট-হারী
ভগবানে ডেক'—
সাবধানেতে রেখ'।"
"তাই রাখ্‌ছি প্রতিদিন—"
বলে' গেল নবীন।
সীতাপতি তাজা কল্‌কে দিল আবার এনে—
ঠাকুরদাদা সুখ পেয়েছিল হুঁকো দু'টান টেনে,

এমন সময় খট্‌মটিয়ে এসে গেল পিওন—
ঘোড়ায় চেপে এল যেন, এমনি দ্রুত ধাওন...
"চিঠি নাইক" বলে'
যাচ্ছিল সে চলে'—
ঠাকুরদাদা তারে
বল্লেন: 'বারে বারে
ভেবেছি যে দু'টো কথা বল্‌ব তোমায় আজ!
একটু দাঁড়াও। জীবনে ত' করলে অনেক কাজ।
দু'টি কথা শুধাই তোমায় যদি জবাব দাও—
যদি তুমি এই বৃদ্ধের অপরাধ না নাও।"
পিওন বল্‌লে: "না না,
কথা বল্‌তে মানা
আমার সঙ্গে, এতই
বড়লোক ত' নই!
কি বল্‌বেন বলুন, বাবু, সময় আমার আছে;
আমি ভাব্‌ছি, কি জান্‌তে পাবেন আমার কাছে!
কারণ, আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি।"—শুনে' চম্‌কে উঠে'
ঠাকুরদাদা বল্‌লেন তারে: "কখ্‌খনো মুখ ফুটে'
বল্‌বে নাক অমন
কথা অকারণ;
কারণ, আমি জানি,
আত্মা অভিমানী;
আপনাকে ছোট করে' দেখে যদি লোকে
আত্মা পায় পশ্চাৎ আঘাত, আচ্ছন্ন হয় শোকে।
কাজও তোমার ক্ষুদ্র নহে, তুমিও ক্ষুদ্র নহ;
সদুপায়ে জীবিকার্জ্জন।—কাজেতে আগ্রহ
রয়েছে তোমার
অতি চমৎকার!
তুমি বার্ত্তাবহ,
দেবের অনুগ্রহ
তুমিই আন বহন করে'; তাঁহার দে'য়া বাজ
লোকের দ্বারে বহন করে' আনাও তোমার কাজ;
তোমার দে'য়া কাগজখানা পড়ে' হাসে কেহ,
কেহ নিঃশ্বাস ছাড়ে, কারো ভুঁয়ে লুটায় দেহ—
কেহ বা পায় ভয়,
মিথ্যা এ ত' নয়!
বিপর্য্যয় কত
দেখ্‌ছ অবিরত...
ভাঙা গড়া নিত্যদিনের এধার ওধারে—
তুমি দেখ্‌ছ যেমন করে' সাম্‌নে একেবারে
আমরা অত দেখি নাই ত' হয়ে মুখোমুখী
বদল ঘটে কেমন হঠাৎ, আজ সুখী, কাল দুখী!
তা-ই জিজ্ঞাসা করি,
তোমার চিত্ত ভরি'
কি চিন্তার খেলা
চলে সারা বেলা?"...
ঠাকুরদাদা চুপ করলেন খুব গম্ভীরভাবে,
যেন মহাসমস্যাটা আজই চুকে' যাবে;
চেয়ে রইলো তাহার দিকে প্রত্যাশী নয়নে...
পিওন বল্‌লে: "আমি ভাবি ভ্রমণে-শয়নে
পেটের কথাটা—
পেটের দায়েই খাটা!"

চিত্রশিল্পীদের শিল্পপ্রেরণার উৎপত্তি কোথায় ?

শ্রীহেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

সংসারে পাঁচজনকে একত্র বাস করিতে হইবে, ইহার জন্য কত সমাজনীতি, কত রাজনীতি, কত অর্থনীতি; তাহাদের কত কথা! আইন কানুনেরও অবধি নাই। থাকিয়া থাকিয়া মনে হয়, দুই পায়ে কত শৃঙ্খলের বেড়ি! দুর্বলের কত অভাব অনটন, সবলের কত অপচয়, কত অত্যাচার! পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে পারে না— যেন স্নেহ নাই, মায়া নাই, মমতা নাই। জীবনকে সহসা আর ভাল লাগে না, এমন মুহূর্ত্ত অনেক আসে। শিল্পী দেখা দেয়, বলে—আমার দু'টা গান শুনিয়া যাও, এই ছবিখানি দেখ, এমনি অনেক কথা। কত যত্ন করিয়া সে আমাদের সম্মুখে সংসারের সৌন্দর্য্যের, জীবনের আনন্দের দ্বার খুলিয়া দেয়!

গায়ক গানের তানে, বাদক বাজনার সুরে, লেখক কাব্যের রচনায়, চিত্রকর ছবির আলিপনায় স্তরে স্তরে আমাদের কাছে সুষমার ডালি সাজাইয়া ধরে—আমাদের একঘেয়ে জীবনের উপর যবনিকা পড়িয়া যায়। এমনি করিয়াই শিল্পী তাহার বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আমাদের জীবনকে বিভিন্নরূপ আনন্দ দ্বারা সরস করিয়া রাখে। কিন্তু এই প্রবৃত্তির উৎস কোথায়, ইহার পশ্চাতে কতটা সাধনা ফল্গুর মত সুপ্ত আছে তাহার অন্বেষণ বড় একটা হয় না।

শিল্পের সমষ্টিগত আলোচনা না করিয়া শুধু জাতিগত আলোচনার মাত্র একটা দিকের গোড়ার কথা অন্বেষণ করিয়া দেখি। চিত্র-শিল্পীদের শিল্পপ্রেরণার উৎপত্তি কোথায় এসম্বন্ধে অনেকেরই একটা স্থূলগত ধারণামাত্র আছে যাহা সত্য নয়—সত্যটুকু খুঁজিয়া দেখিতে হইবে।

অনেকে বলিয়া থাকেন—আমাদের চোখ আছে, চোখ দ্বারা দর্শন করি; হাত আছে হস্তদ্বারা অঙ্কন করি। কিন্তু চোখ বা হাত বিচ্ছিন্ন-ভাবে কিম্বা মিলিত-ভাবে কোন শিল্পরচনায় সমর্থ হয় কি না তাহাই বিচার্য্য। পৃথিবীতে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি চোখদ্বারা দর্শন করেন; কিন্তু প্রত্যেকেই শিল্পী হইতে পারেন না। যাঁহাদের হাত আছে তাঁহারা হস্তদ্বারা ধরিতে পারেন, লিখিতে পারেন বটে; কিন্তু প্রত্যেকেই চিত্রাঙ্কনে সমর্থ নন। যাঁহাদের চোখ ও হস্ত উভয়ই কার্য্যক্ষম, তাঁহাদের মধ্যেও সহস্রে একটি চিত্রকর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কাজেই প্রতীয়মান হইতেছে, যে শুধু চোখ বা হাত থাকিলেই শিল্পী হওয়া যায় না।

অনেকে বলিয়া থাকেন, অমুকের ছবি আঁকিবার চমৎকার হাত আছে কিম্বা অমুকের ছবি আঁকিবার চোখ নাই। কথাটা ভুল। চোখ বা হাতের দোষ গুণ ইহার জন্য এতটুকু দায়ী নয়। এখানে আরেকটা তৃতীয় শক্তি আছে, যাহার সাহায্যে চোখ শিল্পীর আবশ্যকীয় বিশেষত্বটুকু বিষয়-বস্তু হইতে চয়ন করিতে সমর্থ হয়, যাহার সাহায্যে হস্ত সঠিক রেখাপাতে অধিকারী হয়। এই তৃতীয় বস্তুটিই চিত্রশিল্পীদের শিল্পপ্রেরণার উৎপত্তিস্থল—তাহাদের গোড়ার কথা—তাহাদের ভিত্তি।

এই তৃতীয় বস্তুটী হইল প্রেরণা (instinct)। প্রেরণা মনের উপর প্রভুত্ব করে, মন চোখের উপর এবং চোখ হাতের উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকে। আমরা প্রত্যক্ষভাবে যাহা দেখিতে পাই তাহাই গ্রহণ করি, পরোক্ষভাবে কোথায় কোন্ প্রেরণার প্ররোচনায় হাত চলিতেছে তাহা ভাবিয়া দেখি না; তাই বলি, অমুকের ছবি আঁকিবার হাত আছে!

যাঁহারা সাধনার দ্বারা এই প্রেরণাকে যত অধিক জাগ্রত করিতে পারেন, তাঁহারা ততই উঁচুদরের শিল্পী। কঠোর সাধনা ব্যতীত বড় শিল্পী হওয়া যায় না।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাফায়েল, দা-ভিঞ্চির যুগে আরেক জন ক্ষমতাশালী শিল্পী ছিলেন—তাঁর নাম আন্দ্রিয়ে-দেল-সার্ত্তে। দেল-সার্ত্তে ছিলেন অতি উগ্র-রকমের স্বাভাবিকতার উপাসক—তিনি স্বাভাবিকতায় সিদ্ধিও লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্কিত যে কোন

চিত্রে স্বাভাবিক ভঙ্গীর এতটুকু বৈষম্য থাকিত না, বিন্দু-মাত্র বিসদৃশ মনে হইত না; কিন্তু মনের উপর তাহার ছোঁয়াচ লাগিত সামান্যই।

রাফায়েল স্বাভাবিক ধারার সহিত প্রাণের সংযোগ করিয়াছিলেন এবং প্রাণের প্রেরণাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য অনেক সময়ে স্বাভাবিক ধারার দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন না। তাই রাফায়েলের সহিত দেল-সার্ত্তের মতদ্বৈধ এবং বিরোধ ছিল। কিন্তু দেল-সার্ত্তে একদিন তাঁহার গোঁড়ামীর ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন। রাফায়েলের বিশ্ববিখ্যাত মাতৃমূর্ত্তির হস্তাঙ্কনে স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিয়া দেল-সার্ত্তে যদিও বলিয়াছিলেন—হাত ভুল আছে, আমি সংশোধন করিয়া দিতে পারি। তথাপি সঙ্গে সঙ্গেই চিত্রের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে অভিভূত হইয়া তাঁহাকে ক্ষোভ প্রকাশ করিতে হইয়াছিল—

—But the inner thought
The spirit in it, is out of me, out of me—'
—Browning.

"কিন্তু এমন পরিপূর্ণ মনের বিকাশ আমার ক্ষমতার বাইরে।"

দেল-সার্ত্তে শুধু স্বাভাবিক ধারারই উপাসনা করিয়াছিলেন; তাই তাঁর চোখ হইয়া গিয়াছিল ক্যামেরার লেন্স। ক্যামেরার লেন্সে শুধু বহিঃ-প্রকৃতিই ধরা পড়ে, সেখানে অন্তরের ভাবধারা প্রকাশ পায় না। তাই দেল-সার্ত্তে বড় নয়—বড় রাফায়েল।

আবার এই প্রবৃত্তির বিপরীত দিক্‌টাও অনেক শিল্পী-দের মধ্যে দেখা যায়; অর্থাৎ আরেক দল শিল্পী আছেন যাঁহারা কেবলমাত্র প্রাণের অনুভূতি, কল্পনা ও স্বপ্ন লইয়াই থাকিতে চান, স্বাভাবিক অবস্থাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া—সুতরাং মনের ভাবকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে সমর্থ হইলেও, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের ইচ্ছাকৃত অতিবিকৃত অবস্থা দর্শকের মনকে ক্লিষ্ট করিয়া দেয়। এ দলের শিল্পী আমাদের এই আল্‌নাস্কারের দেশ ভারতবর্ষেই একটু অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়।—এ দলের শিল্পীও খুব বড় নয়, তাহারাও দেল-সার্ত্তের মতই অজ্ঞানিত থাকিয়া যায়।

কিন্তু আরেক দল শিল্পী আছেন যাঁহারা দুটা পথই গ্রহণ করিলেন—স্বাভাবিক অবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া প্রাণের সূক্ষ্ম অংশগুলির সংযোগ করিলেন। এই দলের শিল্পীই বিশ্ববরেণ্য এবং জনসাধারণের প্রিয় হইয়া উঠিলেন; যেমন—দাভিন্সি, এঞ্জেলো, রেণল্ডস্। আমাদের দেশেও এদলের শিল্পী আছেন, কিন্তু খুব বেশী নয়, যেমন যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়, পার্ব্বতী বন্দোপাধ্যায়, পূর্ণঘোষ, দেবীপ্রসাদ। আমাদের দেশে এ জাতীয় শিল্পী খুব বেশী সম্মান প্রত্যাশা করিতে পারেন না; কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের দেশ আল্‌নাস্কারের দেশ। পাশ্চাত্য খণ্ডে জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহারা প্রচুর সম্মানের অধিকারী হইতেন।

ক্যামেরার লেন্সের সহিত শিল্পীদের এই স্থানেই ব্যতি-ক্রম। দেল-সার্ত্তে ছিলেন ক্যামেরা-পন্থী শিল্পী; তাই তিনি পরাজিত। রবীন্দ্রনাথ ধরিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থা, তাই চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ ব্যর্থ। রাফায়েল, দা-ভিন্সি উভয় পথের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া রাখিলেন অক্ষয় কীর্ত্তি; যামিনী গাঙ্গুলী, দেবীপ্রসাদ পাইলেন অখণ্ড সম্মান।

যে প্রেরণা হইতে মানব শিল্পী বলিয়া পরিচিত হয় সেই প্রেরণাকে যেমন উপেক্ষা করা চলে না; তেমনি যে স্বাভাবিক ধারায় আমরা সব সময়ে পরিচিত তাহার বিকৃতিও পূর্ণতার অন্তরায়। দুটাই গোঁড়ামী, দুটাই পরিত্যাজ্য।

* * *

প্রত্যেক মানবের মধ্যেই ভগবদ্দত্ত একটা কোন স্বাভাবিক শক্তি নিহিত থাকেই—কাহারও গানের, কাহারও রচনার, কাহারও বা অঙ্কনের, নর্ত্তনের, কূটনীতির বা ভগবদ্ভক্তির প্রেরণা নানা আকারে প্রদত্ত আছে। ঠিক তারটিতে যখন আঘাত পড়ে, তৎক্ষণাৎ তাহা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। সাধকগণ অবিরত সাধনা দ্বারা সেই তারটী লইয়া ঘষামাজা করিতে থাকেন—তারের জঙ্কার যত কাটিয়া যায় ততই সুমিষ্ট ঝঙ্কার শ্রুত হইতে থাকে। সাধকের জীবন ধন্য হইয়া যায়।

কিন্তু সকলের জীবনেই কি আর ঈশ্বরদত্ত গুণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়? মনে হয়, ভগবান পক্ষপাতদুষ্ট; কিন্তু এ আমাদের স্থূলদৃষ্টির বিচার। ভগবান প্রত্যেকের মধ্যেই

তাঁহার শক্তির অংশ সমভাবেই দিয়াছেন, কিন্তু প্রকার ভেদে ; কারণ তাঁহার প্রত্যেকটি লীলাই প্রকটিত হওয়ার আবশ্যক আছে। সেই জন্যই কেহ গায়ক, কেহ নর্ত্তক, কেহ বক্তা, কেহ চিত্রকর, কেহ রাজনীতিজ্ঞ, কেহ বা ভগবদ্ভক্ত।

প্রত্যেকের মধ্যেই ঐশ্বরিক শক্তি সমভাবে থাকিলেও, প্রত্যেকেই যে তাহার নিজ পন্থা খুঁজিয়া লইতে পারিবে সেরূপ নিশ্চয়তা নাই। যে ভাল চিত্রকর হইতে পারিত, সে হয়ত ভুলপথে চালিত হইয়া সঙ্গীত-শিক্ষার প্রয়াসে প্রাণপাত করিতে থাকে—তাহার শিল্পও হয় না, সঙ্গীতও হয় না; বৃথাই ভগবানের বিচারে দোষ দেয়। যে হয়ত সমগ্র বিশ্বকে তাহার নর্ত্তন-কৌশলে মুগ্ধ করিতে পারিত, তাহাকেই হয়ত পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার প্ররোচনায় মার্চ্চেণ্ট অফিসে কেরাণীগিরি করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। ঈশ্বরপ্রদত্ত শক্তির প্রায় সম্পূর্ণ অংশটাই এভাবে ব্যর্থ হইয়া যায়—আমরা আমাদের অদৃষ্টের কথা ভাবিয়া সান্ত্বনা খুঁজি, ভগবানের বিচারে আস্থাহীন হইয়া গালাগালি করি।

ইংরেজ কবির কথা মনে পড়িয়া যায়। একটা সমাধি-ক্ষেত্র দর্শনে কবি লিখিয়াছিলেন—অযাচিতভাবে কত রত্ন এখানে বিলয় পাইয়াছে তাহা কে নির্ণয় করে! যাহারা অতি নিরীহভাবে সম্পূর্ণ অজ্ঞানিত অখ্যাত অবস্থায় এখানে চিরনিদ্রায় সমাহিত, তাহাদেরই মধ্যে হয়ত পৃথিবীতে প্রলয়-সৃজনের শক্তি নিহিত ছিল। শুধু সুযোগ এবং সুবিধার অভাবেই কত গুণী, কত জ্ঞানী শোকে দুঃখে জর্জ্জরিত অবস্থায় এখানে নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে। যে একদিন পৃথিবীতে মুক্তির বাণী শান্তির প্রতিষ্ঠা করিতে পারিত, সে হয়ত এখানে জঘন্য পাপী, ঘৃণিত কুক্কুরের মতই পরিত্যক্ত হইয়াছে।

মানবপ্রাণের বহু প্রেরণা (Instinct) বা বৃহত্তর প্রতিভা (intuition) এমনি অগোচরেই সমাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা নিজেদের পথ খুঁজিয়া পাইল না, যাহাদের শক্তির বিকাশ হইল না, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র ; কিন্তু যাহারা পথের খোঁজ পাইয়াছে, তাহাদের পূর্ণতা নির্ভর করে সাধনায়।

সকলের আগের গোড়ার কথা চাই পথ-নির্ণয়ের সফলতা ; তাহার পরের কথাই—চাই নিষ্ঠা, চাই সাধনা। যে যত বড় সাধক, সে তত বড় শিল্পী। হাতে ছবি আঁকা হয় না, চোখে ছবি আঁকা যায় না—চাই প্রেরণা থাকা এবং সেই প্রেরণার উপর সাধনার ঘষা-মাজা।

জীবন-দেবতা

শ্রী চীন্দ্রনাথ রায়

জীবনের অন্তরালে বসি' অনুক্ষণ
যে দেবতা করিতেছে চালনা আমায়—
তারি ছবি আছে মোর চিত্তে চিরন্তন,
সে জাগে আমার প্রতি কর্ম্ম-প্রেরণায়।

কল্পনার যবনিকা করি' উত্তোলন
যদিও সম্মুখে তার দাঁড়াই নি, হায়,
যদিও করি নি স্পর্শ তাহার চরণ,—
তবু মোর প্রাণ মগ্ন তাহারি পূজায়
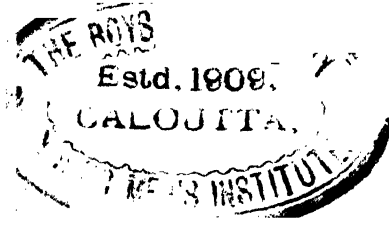
অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ

কবিরাজ নলিনীনাথ দাশগুপ্ত

কয়েক বৎসর পুর্ব্বে আমি কাশ্মীরদেশ পরিভ্রমণ করিতে যাইয়া ঐ দেশের কোন সহরে, শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীদের মঠে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলাম। তাঁহারা সকলেই গেরুয়াধারী, পরিধানে কৌপীন, বহির্ব্বাস; মস্তক মুণ্ডিত। সাধারণ লোকে যেমন যথাসময়ে স্নানাহার করে, নিদ্রা যায়, পরস্পর কথাবার্ত্তা কহে, তাঁহারাও তাহাই করেন। তা' ছাড়া, ভজন, সাধন, জপ, ধ্যান ইত্যাদি কিছুই তাহাদের ভিতর নাই।

কিছুদিন দেখিয়া একদিন মঠাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কই, আপনাদের ভিতর ভজন-সাধন কিছুই দেখি না কেন?"

আমার প্রশ্ন শুনিয়া, তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "ভজি কাকে বলুন?" "আমি ছাড়া অন্য তত্ত্ব ব্রহ্মাণ্ডে কি আছে?'

উত্তর শুনিয়া, আমি অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমার এত আশ্চর্য্য হইবার কারণ এরূপ জেঁদো অদ্বৈতবাদীদের সহিত ইতিপুর্ব্বে আর কখনও মিশি নাই। তাঁহার এ প্রকার উত্তর বেদান্ত, পঞ্চদশী ইত্যাদি গ্রন্থের অনেকস্থানে পড়িয়াছি। কিন্তু মানুষের মুখে কখনও শুনি নাই। তখন বুঝিলাম, তাঁহারা "আমিই ব্রহ্ম" এইটি স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া, "হিজলগাছে নৌকা বাঁধিয়া" বসিয়া আছেন। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া এই ভাবে জীবন কাটাইতে পারিলেই সংসার হইতে উদ্ধার পাইতে পারিবেন।

সে যাহাই হউক, সেই দিন হইতে আমার এক বিপদ্ হইল। তাঁহারা এতদিন আমাকে তাঁহাদেরই মতাবলম্বী ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু এখন বিরুদ্ধ মতের লোক স্থির করিয়া দ্বৈতবাদের উপর অর্থাৎ পাকে প্রকারে আমার উপর নানা প্রকার শ্লেষ, বিদ্রূপ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন অমরনাথ তীর্থে যাইবার সময়। সেইজন্য নানা দেশ হইতে সন্ন্যাসীরা যাইয়া মঠে সমবেত হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই একদিকে এবং আমি একদিকে। দ্বৈতবাদীদের নিরস্ত করাই তাঁহাদের পেশা—ভজন-সাধন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পরন্তু বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্বের উপর শঙ্করাচার্য্যের যে অপুর্ব্ব ভাষ্য আছে তাহারই যুক্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহারা তর্ক করিতেন। কাজেই আমি পারিয়া উঠিতাম না।

তাঁহাদের মধ্যে একটি সন্ন্যাসীর সহিত আমার অনেকটা বন্ধুত্ব হইয়াছিল। তাঁহার জন্মস্থান পুর্ব্ববঙ্গে। তিনি পুর্ব্বাশ্রমে ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট S. D. O. ছিলেন। এখন বৈরাগ্য অবলম্বন পুর্ব্বক সন্ন্যাস লইয়াছেন। তিনি একদিন আমাকে উপদেশ দিলেন—"আপনি একটা জন্ম অনর্থক নষ্ট করছেন কেন? মিছে দ্বৈতবাদ ছেড়ে দিয়ে আমাদের মতে আসুন।"

আমি আর যে কয়দিন সেখানে ছিলাম, বোবার শত্রু নাই, এই নীতিকে অবলম্বন করিয়া নীরবে তাঁহাদের বিদ্রূপবাণ সহ্য করিতাম।

অনেকদিন এই সন্ন্যাসীদের নিকটে কাটাইয়া, এবং তাঁহাদের শুষ্কজ্ঞান ও দ্বৈতবাদের উপর দোষারোপ ক্রমাগত কর্ণগোচর করিয়া আমি মনোমধ্যে বড় অশান্তি ভোগ করিতেছিলাম। দেশে ফিরিয়া আসিয়া, হৃদয়ের এই জ্বালা জুড়াইবার জন্য, একদিন আমার বাল্যবন্ধু, দ্বৈতবাদী, সুপণ্ডিত রামসুন্দর তর্কবাগীশের চতুষ্পাঠীতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। রামসুন্দর যেমন শাস্ত্রজ্ঞ, তেমনি মহাপ্রেমিক ও সাধক।

নানা কথার পর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তর্কবাগীশ, আমার মনে একটি প্রবল সন্দেহ আছে। সেই সন্দেহটি তুমি ভঞ্জন করে' দেবে?"

তিনি উত্তর করিলেন, "কি সন্দেহ? যদি আমার সাধ্য হয় ত দূর করার চেষ্টা করব।"

আমি বলিলাম, "সন্দেহ এই যে আমাদের দেশে হিন্দুদের ভিতর, দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ নামে দুইটি বিভিন্ন মত আছে। অদ্বৈতবাদ যদি সত্য হয়, তা'হ'লে ত উপাস্য উপাসক দুই উড়ে' যায়। আমিই যদি ব্রহ্ম, তাহলে আমি আবার কার উপাসনা করব? তা' হ'লে ত সেব্য সেবক ভাব, উপাসনাপ্রণালী, কিছুরই প্রয়োজন থাকে না। অদ্বৈতবাদীদের বিচার শুনে, তাদের গ্রন্থ পড়ে' মনে এই ধারণা হয়।

আবার দ্বৈতবাদীদের যুক্তি শুনলে, তাদের গ্রন্থ পড়লে, সে ধারণা কোথায় উড়ে' যায়। অদ্বৈতবাদিগণ যে বিশ্বাসকে, যে সিদ্ধান্তকে মুক্তির উপায় বলছেন দ্বৈতবাদীদের মতে তাহা অসুরের ধর্ম্ম, ভক্তিপথের সম্পূর্ণ বিরোধী—নরকের রাস্তা এবং তাদের মতকে বিশ্বাস করা দূরে থাক্, তাদের যুক্তি, বিচার শুনলেও পাপ হয়।

দ্বৈতবাদীদের সিদ্ধান্ত শুনে' অদ্বৈতবাদীগণ উপহাস করেন। তাঁরা বলেন—তোমাদের এই দ্বৈতজ্ঞান, উপাস্য-উপাসক ভাব, এই সংস্কারই বন্ধনের হেতু। এই সংস্কারকে মন থেকে দূর কর, দুই ঘুচিয়ে এক কর, তুমিই সেই ব্রহ্ম, এইটি নির্দ্ধারণ কর, তা' হ'লেই তোমার মুক্তি।

আবার এপক্ষে ভক্ত-শিরোমণি মহাত্মা তুলসীদাস, তাঁর কোন দোঁহায় অদ্বৈতবাদীদের গালাগালি দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই—

"রাম ভজন ছোড়ি যো মুরখ চাহে পদ নির্ব্বাণা।
তুলসী কহে সো পশু বিনা পুচ্ছ বিষাণা॥"

অর্থাৎ রামচন্দ্রের ভজন ত্যাগ করিয়া যে মূর্খ নির্ব্বাণ পদকে ইচ্ছা করে অর্থাৎ তাঁহার সহিত এক হ'তে চায়, তুলসীদাসের মতে সে একটি পশু, তার কেবল ল্যেজ নাই ও শৃঙ্গ নাই।

বেদান্ত বাক্যকে উভয়েই শিরোধার্য্য করুচে, কিন্তু প্রত্যেকে তার ব্যাখ্যা করুচে সম্পূর্ণ বিপরীত।"

রামসুন্দর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তুমি যে প্রসঙ্গ এনে ফেল্‌লে এক বলে অদ্বৈতবাদীর সঙ্গে দ্বৈতবাদীর তর্ক বা ঝগড়া। এ বড় বিষম ব্যাপার। এ তর্কের সামঞ্জস্য এ পর্য্যন্ত কেউ করুতে পারে নি। তবে তুমি যদি সরল অন্তঃকরণে আমার কথায় বিশ্বাস কর তা'হ'লে এর মীমাংসা আমি করে' দিতে পারি। সন্দেহ করুলে বা তর্ক করুলে পারুব না।"

তাঁর প্রস্তাবে আমি সম্মত হইলে তিনি বলিতে লাগিলেন, "দেখ, বেদান্ত কখনও মিথ্যা হ'তে পারে না। যে বেদান্তকে মিথ্যা বলে, সে বেদবাক্যকেও মিথ্যা বলে। সে হিন্দু নয় নাস্তিক। তার সঙ্গে আমাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন বিচারই চলতে পারে না। 'আমি ব্রহ্ম' এ জ্ঞান যার নাই, বা এ তত্ত্বকে যে বিশ্বাস করতে না পারে, সে অধঃপাতে যায়। তার উদ্ধার কোন জন্মেই নাই। আমিও সেই ব্রহ্ম, তবে আমি অতি ক্ষুদ্র এবং তিনি অতি বৃহৎ বা অসীম। যেমন প্রবল ও বৃহৎ অগ্নি হ'তে অতি ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ উদ্গত হয়, সেইরূপ ভগবান হ'তে জীবের উৎপত্তি। ভগবান বৃহদগ্নি, জীব তার বিস্ফুলিঙ্গ, অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র 'কণা' মাত্র। ইহাই বেদের অভিমত—

'যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সৌম্য! ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্রচৈবাপি যন্তি।"

—মুণ্ডক ২।১।১

অর্থাৎ যেমন সুদীপ্ত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র তুল্যরূপ বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ সেই অক্ষর পুরুষ (ব্রহ্ম) হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হয়, এবং কালে তাঁহাতেই বিলীন হয়।

স্ফুলিঙ্গ অগ্নি নয়, কিন্তু অগ্নির সজাতীয়। অগ্নির যে গুণ, স্তিমিত ভাবে স্ফুলিঙ্গেও তা' আছে। অগ্নির যে তেজ, গূঢ়ভাবে স্ফুলিঙ্গেও তা' বিদ্যমান আছে। অগ্নিতে বা ঈশ্বরে যে সকল মহিমা ও কল্যাণগুণ সুব্যক্ত, স্ফুলিঙ্গে বা জীবে সে সমস্ত অব্যক্ত ভাবে আছে। স্ফুলিঙ্গের বা জীবের সেই সকল অব্যক্ত মহিমা ও অব্যক্ত কল্যাণগুণ সুব্যক্ত কর্‌বার জন্য তা'কে সুদীপ্ত পাবকের বা ঈশ্বরের উপাসনা কর্‌তে হয়।

আমি তাঁর কথায় বাধা দিয়া বলিলাম—"আমার এইখানে একটু বল্‌বার আছে, এ সম্বন্ধে আমি অদ্বৈতবাদীদের বিচার শুনেছি। তাঁরা বলেন, অগ্নির বৃহৎ ক্ষুদ্র নাই। সব অগ্নিই সমান। এই প্রভেদ ঔষধ অদ্বৈতবাদ। অদ্বৈত-বেদান্ত-বাক্য নিয়ে বিচার কর্‌তে কর্‌তে সে ভুল আপনিই কেটে যায়।"

রামসুন্দর বলিলেন, "আমি ত আগেই বলে' রেখেচি যে, তুমি আমার কথায় তর্ক করলে, তোমার প্রশ্নের মীমাংসা আমার দ্বারা হবে না। তর্ক না ক'রে, স্থির হয়ে' শোন, আমার বক্তব্য আমি বল্‌চি। তর্কের দ্বারা কোন বিষয়ের মীমাংসা হয় না, প্রতিষ্ঠা হয় না। তুমি তর্কের দ্বারা কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত বা মীমাংসা করে' গেলে, কিন্তু তোমার অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ আর একজন কেউ এসে সে সিদ্ধান্তকে উড়িয়ে দিয়ে আর একটি মত স্থাপন করবে। আবার তার সিদ্ধান্ত আর একজন তার চেয়ে বুদ্ধিমান কেউ এসে অনায়াসে উড়িয়ে দেবে। তর্কের দ্বারা যদি এ কথার মীমাংসা হ'ত, তা' হ'লে এ ঝগড়া অনেক দিন মিটে যেত।

তর্কের রাজ্য ছেড়ে দিয়ে ভাবের বা অনুভূতির রাজ্যে না গেলে তোমার প্রশ্নের সমাধান আমার দ্বারা হবে না। ভক্তিশাস্ত্রে জীবের বা মনুষ্যের একটি স্বভাবগত ভাবের বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। তার নাম "নিত্যসিদ্ধভাব।" যথা—"নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা।"—ভক্তি রসামৃত সিন্ধু

সকল মানুষের ভিতরেই একটি নিত্যসিদ্ধ ভাব আছে। সেই ভাবটি হৃদয়ে পরিস্ফুট করাই মনুষ্যের সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম্ম।

এই ভাবটি কি? ইহা ভগবানের সহিত জীবের সেব্য-সেবক বা উপাস্য-উপাসক ভাব। ব্রহ্মরূপ অনন্ত সমুদ্রের আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তরঙ্গ মাত্র। তাঁর চিন্তা, উপাসনা সেবা ভিন্ন আমাদের নিস্তার নাই। ইহাই জীবের নিত্যসিদ্ধভাব।"

এই ভাবের খেলা যাঁর হৃদয়ে যত অধিক খেলিতে দেখি, আমরা তাঁকে তত অধিক শ্রদ্ধা বা পূজা করে' থাকি।

বাঙ্গালীর প্রাণের ঠাকুর গৌরাঙ্গদেবের জীবনে এই ভাবের পরাকাষ্ঠা লক্ষ্য করে, বাঙ্গালী তাঁকে অবতারের আসনে বসিয়েছে। তিনি শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যকে নিরসন পূর্ব্বক ভারতবর্ষের তদানীন্তন অদ্বৈতবাদী অদ্বিতীয় বৈদান্তিক পণ্ডিতদের কবল হ'তে ভগবানের প্রতি এই সেব্য-সেবক ভাবকে রক্ষা করে' তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়ে হিন্দুসমাজকে চমৎকৃত করে' গিয়েছেন। সেই অসাধারণ প্রেম, যার অপূর্ব্ববিকাশ তাঁর চরিত্রে চাক্ষুষ করে', মানুষ ভক্তিভরে তাঁর চরণে লুণ্ঠিত হয়ে' আছে, তাহাও এই ভাবেরই পরিপাক।

দেখ, মন যতই অদ্বৈতবাদী হউক, কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ডের হর্ত্তা, নিয়ন্তা, কর্ত্তার সহিত সেব্য-সেবক সম্বন্ধ জীব অর্থাৎ প্রাণ কিছুতেই অস্বীকার করতে পারে না। তাঁকে সেবা না করে'—উপাসনা না করে' প্রাণের কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। কারণ, এ ভাবটি তার নিত্যসিদ্ধ।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,

রামসুন্দর বলিলেন,

"হাঁ, আলাদা। তুমি সাধনার বা যোগের এই মূল কথাটি এখনও বুঝ্তে পার নি? আমাদের দেশে সাধনা সম্বন্ধে সাধকদের বিস্তর গান আছে—'মন একবার হরিবল' 'মন তোমার এ ভ্রম গেল না' ইত্যাদি ইত্যাদি তাতে তাঁরা মনকে উপদেশ দিচ্ছেন, সাধনা করতে অনুরোধ করচেন। কোন গানে বা মনকে তিরস্কার করচেন। এথেকে বেশ বুঝ্তে পারচ যে সাধক বা জীব আর তার মন, দুটি পৃথক্ বস্তু।"

"এর প্রমাণ শাস্ত্রে আছে?"

"হাঁ, আছে। উপনিষদে, তন্ত্রে অনেক যায়গায় আছে। তুমি ত গীতা পড়েছ। এই প্রাণ ও মন দুটি যে আলাদা, একথা গীতাও অনেক যায়গায় আছে। তোমার মনে নাই। এ সম্বন্ধে গীতার একটি প্রমাণ—

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মনম্ নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈবহ্যাত্মনোবন্ধুঃ আত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥"

অর্থাৎ আত্মার দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিবে, সংসারে অবসন্ন হইতে দিবে না। কেন না, আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু।

এই শ্লোকে ভগবান এক আত্মার দ্বারা আর এক আত্মাকে উদ্ধার করতে বলচেন। এর প্রথম আত্মা জীবাত্মা, আর দ্বিতীয় আত্মা অন্তরাত্মা মন। অন্তরাত্মা বা মনকে সংসার থেকে উদ্ধার করবার জন্য জীবাত্মা অর্জ্জুনকে ভগবান উপদেশ দিচ্ছেন।

মনই জীবাত্মার কর্ম্মকারী শক্তি। পাপ পুণ্য মনই করে। মনই সুখ দুঃখ ভোগ করে। মনই সংসারে বদ্ধ হয়ে আছে এবং মনই সাধনার দ্বারা সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। তবে, তাকে চেতন করা, উপদেশ দিয়ে সংসার থেকে নিবৃত্ত করা, সাধনের পথে নিয়ে আসা জীবের বা প্রাণের কার্য্য। নিজের মনকে নিজে উদ্ধার না করলে আর কেহই করবে না। নিজের উদ্ধার নিজের কাছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে অর্জ্জুনকে এই কথাই বলেছেন।

থাক্ এ কথা। এ প্রসঙ্গের এইটুকুই এখানে দরকার। এখন তোমার মূল প্রশ্ন, দ্বৈতবাদ কি অদ্বৈতবাদ? অদ্বৈতবাদীদের প্রধান পাণ্ডা শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য স্বামীকেও এই দ্বৈতবাদ বা নিত্যসিদ্ধ ভাবকে গ্রাহ্য করে', ভগবানের সঙ্গে পিতা-পুত্র সম্বন্ধ স্বীকার করতে হয়েছে। তাঁর ষট্‌পদী নামক বিখ্যাত স্তোত্রে আছে—

"সত্যপি ভেদাপগমে নাথ,
তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ, কবচন
সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥"

অর্থাৎ হে অখিলনাথ, যদিও সমুদ্র ও তরঙ্গে কিছু ভেদ নাই সত্য তথাপি লোকে সমুদ্রেরই তরঙ্গ বলে, কেহ তরঙ্গের সমুদ্র বলে না। সেইরূপ, হে নাথ, তোমাতে আমাতে কোন ভেদ না থাকিলেও, "আমি তোমারই", কিন্তু "তুমি আমার" এ কথা বল্‌তে পারি না।

এইজন্য মহাত্মাগণ তাঁর ভাবকে "তদীয়তা" নামে অভিহিত করেন।

"আমিই ব্রহ্ম, আমি আবার কাকে ভজ্‌ব?" এ-কথায় প্রাণের সন্তাপ দূর হয় না। মনুষ্য-দেহ ধারণ করে', সেই একজনকে না ভজলে প্রাণের জ্বালা, যমের ভয় যায় না। কাহাকেও না ভজে', কেবল নিজের উপাসনা নিজে করে, এই অনিত্য ও অসুখময় লোক থেকে উদ্ধার হব, এ কথা উন্মত্ত মন যতই বলুক, কিন্তু তার উপর যে প্রাণ আছে, যে, 'আমি" আছে, যে বিবেক আছে সে কথনই বলবে না।

অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসিগণ মুখে যতই বলুন, কিন্তু তাঁরাও নিজ নিজ গুরুদেবকে সন্ন্যাস-ধর্ম্মকে, সন্ন্যাসের কঠোর নিয়মকে, স্ব স্ব গুরুদত্ত-জ্ঞানকে কায়মনোবাক্যে ভজ্‌ছেন এবং সে সকল পূজা ভগবানে পঁহুচচ্ছে।

বেদে বা উপনিষদে যে ব্রহ্মবিদ্যা বর্ণিত হয়েছে, তাহাই প্রকৃত বেদান্ত। তাঁর কৃপা ভিন্ন কেবল নিজের জোরে উদ্ধার পাওয়া যায়, একথা উপনিষদে বলে না। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে—

"যস্য দেবে পরা ভক্তি যথা দেবে তথাগুরৌ।
তস্যৈতাঃ কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মনীষিণঃ॥"

অর্থাৎ যিনি ঈশ্বরে পরাভক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন এবং ঈশ্বরের ন্যায় গুরুতে পরম ভক্তিমান্, সেই মনীষী ব্যক্তিই এই উচ্চতত্ত্ব-সমূহের গ্রহণ করিতে সমর্থ।

তা'-ছাড়া বেদান্তবাক্য অপাত্রের হাতে পড়্‌লে জগতের মহা অপকার হয়। এ নিয়ে শুধু কথার শ্রাদ্ধ করে' তর্ক-বিতর্ক করিতে গিয়ে—অর্থাৎ জগৎটা কিছু নয়, মায়া—মিথ্যা—এ থাক্‌লেই বা কি, গেলেই কি বা? চাচা আপন প্রাণ বাঁচা—নিজের মুক্তি হ'লেই হ'ল—সকলে তারই চেষ্টা কর—এই অপরূপ সিদ্ধান্ত করতে গিয়ে এক সময়ে নাস্তিকতা, কঠোরতা ও আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতায় ভারতভূমি পূর্ণ হবার যোগাড় হয়েছিল। দেশের এই সঙ্কটময় অবস্থায় রামানুজাচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মতের পুনঃ প্রচার করে', ভগবানের সহিত উপাস্য-উপাসক-সম্বন্ধ, ভক্তিমিশ্রিত জ্ঞান এবং ঈশ্বরসম্পর্কিত সাধনা প্রতিষ্ঠিত করেন।

সেই অবধি অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতের সংগ্রাম অবিচ্ছিন্নভাবে চলে' আস্‌চে। উপনিষৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যা বা প্রকৃত বেদান্ত এই বিরোধ-সংঘর্ষের বহু উচ্চে অবস্থিত। সেখানে দ্বৈতাদ্বৈতের, জ্ঞান ও ভক্তির, সগুণ ও নির্গুণের অপূর্ব্ব সমন্বয় ও সামঞ্জস্য। দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী উভয়েই স্বীকার করেন যে, উপনিষদে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ, সগুণ ও নির্গুণ উভয়বিধ ব্রহ্মেরই উপদেশ আছে। তথাপি অদ্বৈতবাদীর মতে সগুণ ব্রহ্ম এবং দ্বৈতবাদীর মতে নির্গুণ ব্রহ্ম অবাস্তর কাল্পনিক বস্তু। এই মতদ্বৈধস্থলে যে শ্রুতি বা উপনিষদ্ বাক্যকে তাঁরা উভয়েই শিরোধার্য্য করছেন, তারই আলোকে আমাদের পথ বেছে নেওয়া উচিত। যদি আমরা নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সহিত সেরূপ করিবার চেষ্টা করি, তা'হ'লে অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতের আপাত প্রভেদ পরিহার করে', এতদুভয়ের মর্ম্মান্তিক ঐক্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারব॥"

পরলোকে কবিরাজ-শিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি

"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু র্ধ্রুবং জন্ম মৃত্যস্য চ"

জন্মিলেই মৃত্যু আছে—তাহাতে বিন্দু মাত্র সংশয় নাই; বিগতাত্মার প্রতি তাই শোক করিতে নাই। কিন্তু যে প্রিয়জন-বিরহ কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বা

কবিরাজ-শিরোমণি ৺শ্যামাদাস বাচস্পতি

পরিবারের ব্যথার কারণ না হইয়া সমগ্র জাতির মর্ম্মদাহ উপস্থিত করে, সেখানে এমন প্রিয়বিয়োগে দেশ-জননীর নয়নেই অশ্রুসাগর উথলিয়া উঠে। প্রাবৃটের এমনই ঘন-ঘটায় আর একদিন ধরিত্রী কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন দেশবন্ধুর তিরোধনে। আর আজ আবার আর একজন বরণীয় বাঙলার কৃতী সন্তান আসমুদ্রহিমাচল নিখিল ভারতবর্ষকে অশ্রুসাগরে ভাসাইয়া মহা প্রস্থান করিলেন। স্বর্ণমেরুর সুদৃশ্য মহিমামণ্ডিত চূড়া অকস্মাৎ ভূমিতলে খসিয়া পড়িল। এই বেদনার, এই ব্যথার হাহাকার উঠিয়াছে। বিচারপতি মন্মথনাথ সত্যই বলিয়াছেন, "আয়ুর্ব্বেদের চূড়া খসিয়া পড়িল, আপনাদের সর্ব্বনাশ হইল, দেশের সর্ব্বনাশ হইল..." এ বাণী অস্বীকার করিবার নয়।

কবিরাজ-শিরোমণি শ্যামদাস ভারতের এই বিপ্লবময় যুগে খাঁটি বাঙ্গালীর আদর্শ বিশুদ্ধ হিন্দু চরিত্র, সনাতন স্বভাব ও ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। যে চরিত্র-বলে, যে শিক্ষায় ও সাধনায় ইহা সম্ভব হইয়াছিল, তাহা আমাদের প্রণিধানযোগ্য। "যে দেশের যে রোগ তার ঔষধ সেই দেশেরই হওয়া চাই", এই বাণী শুধু আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রেই প্রযুজ্য নহে, ধর্ম্ম, নীতি, সমাজ সর্ব্বক্ষেত্রেরই ইহা বেদ-মন্ত্র। ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের আদর্শ, ভারতের
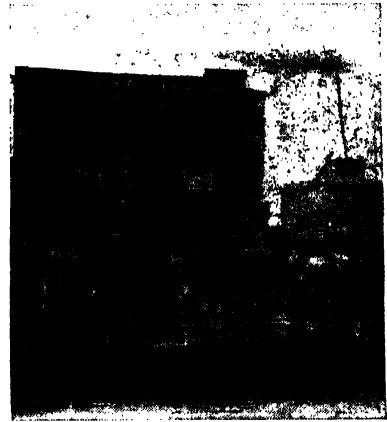
৪০নং গ্রে ষ্ট্রীটের বাড়ী
(এখানে তিনি প্রথম চিকিৎসা আরম্ভ করেন)

শিক্ষা-সভ্যতা ভারতবাসী যদি অবধারণ না করে, তাহা হইলে ধর্ম্ম-ব্যভিচারে দেশ উৎসন্ন যায়। ভারত স্বভাব ও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মরণের পথেই ছুটিয়াছে।

উচিত। পাশ্চাত্যের গৌরব ও কীর্ত্তিধ্বজা স্বরূপ মহানগরী কলিকাতার বুকে বসিয়া সদাচারী, একনিষ্ঠ, উদার, কীর্ত্তিকুশল শ্যামাদাস যে জীবনের পূত আদর্শ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অল্প তপস্যার ফল নহে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি স্বভাবতঃই তরল ও চপল স্বভাবসম্পন্ন। যেরূপ শিক্ষা ও আব্‌হাওয়ার মধ্যে ইহা গঠিত হইয়া থাকে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষের বুদ্ধি তদাকার প্রাপ্ত হয়। আজ দেশে তরুণে প্রবীণে যে সংঘর্ষ, শিক্ষাদোষে বুদ্ধিবৃত্তির বিকৃতি-বৈচিত্র্য ভিন্ন ইহা আর কিছু নহে। স্বদেশ-স্বজাতির শিক্ষা-সভ্যতার আদর্শ লইয়া আন্দোলন, আলোচনা, তর্ক-বিচারের উত্তেজনা সর্ব্বক্ষেত্রেই তাই

বৈদ্যশাস্ত্র-পীঠ
(বলরাম দে ষ্ট্রীটে ১৩২৮ সালে প্রথম সূচনা হয়)

নিষ্ফল হইবে। বিচক্ষণ, অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন বাচস্পতি মহাশয় যেন এই কথা বুঝিয়াই দেশের সর্ব্বপ্রকার আন্দোলনের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া অটল হিমাদ্রির ন্যায় ভারতের জয়-বাক্ দীর্ঘজীবন ধরিয়া উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন। সেই উদাত্ত কণ্ঠের ঋতময় মহাসঙ্গীত আজ নানা কোলাহলে আমাদের শ্রুতিগোচর হয় না, কিন্তু তাঁহার অমর জীবনের অবদান ব্যর্থ হইবে না। তনুমনোপ্রাণ দিয়া অমিশ্র বিশুদ্ধ ভারতীয় শিক্ষায় কেমন করিয়া জীবনের আদর্শ রক্ষা করিতে হয়, বাজাইয়া যাইতে হয়, কেমন করিয়া স্বার্থপরতন্ত্র মানুষের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি না করিয়া নীরবে দেশহিতব্রত সাধন
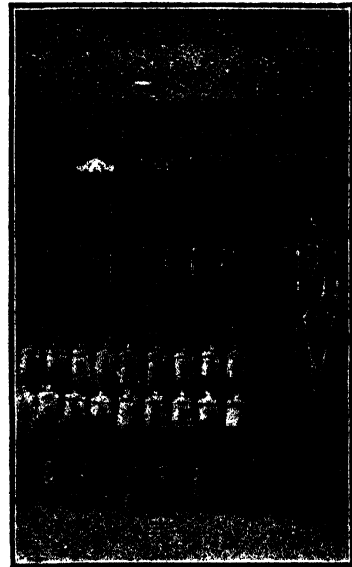
মেটিরিয়া মেডিকা মিউজিয়াম

প্যাথোলজিক্যাল মিউজিয়াম

করিতে হয়, শ্যামাদাস বাচস্পতির পূত জীবনে তাহা

এই মহাপুরুষের উদ্দেশ্য হৃদয়ের অর্ঘ্য দিতে কুণ্ঠা বোধ করিবে?

বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত চুপী গ্রামে বিখ্যাত বৈদ্যবংশে শ্যামাদাস জন্মগ্রহণ করেন। বর্দ্ধমান একদিন ছিল সনাতন ধর্ম্মের মর্ম্মস্থান। তাহারই শ্যাম-শীতল পল্লীর ক্রীড়াক্ষেত্রে তিনি তাঁহার শৈশব-জীবন যাপন করেন। তাঁর তনুমনোপ্রাণ বাঙলার জল-মাটি বাতাসে ভারতধর্ম্মের অনুকূল আধার রূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল; তাই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর মাথার মণি শ্যামাদাস নানা সদ্‌গুণশালী হইয়া দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। উত্তর কালে স্বীয় অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠ সাধনায় তিনি অবিকৃত সত্যকেই আশ্রয় দিয়া অসাধারণ চরিত্র লাভ করেন। সে চরিত্রে ছিল না একবিন্দু কলুষ, কপটতা, সঙ্কীর্ণতা। তাঁর জ্ঞানগম্ভীর মূর্ত্তি জাতির চিত্তে তাই নব প্রেরণার সঞ্চার করিত।

বৈদ্যশাস্ত্র-পীঠের শবচ্ছেদাগার

তিনি ছিলেন খাঁটি সনাতন-ধর্ম্মী; কিন্তু অন্তঃকরণে গোঁড়ামীর লেশ মাত্র ছিল না। তাই বৈদ্যশাস্ত্র-পীঠে দেখি, মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ ছিল, সেই আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার অধিকার জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে তিনি সকলকেই প্রদান করিয়াছেন। আর তাঁর বৈদ্যশাস্ত্র-পীঠে আধুনিক শবচ্ছেদ, শল্য-চিকিৎসা প্রভৃতির শিক্ষানীতি তিনি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন—প্রাচ্যেরই প্রতিসংস্কারে, পাশ্চাত্যের আনুগত্যে নহে। গোঁড়ামী-বর্জ্জিত দেশহিত-ব্রতের প্রাবল্যেই, তিনি অতীতকে এমন জীবন্ত করিয়া আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষাকে জাগ্রত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি দেশকে ভালবাসিতেন; দেশের রোগনিবারণ শক্তি আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের অনুশীলনে জাগ্রত হইবে, এই বিশ্বাসের সঙ্গে দেশজাত পণ্য-শিল্প, দেশীয় রীতি-নীতি, শিক্ষাসাধনায় দেশ উন্নীত হইবে, এই বিশ্বাসও রাখিতেন। এই হেতু তিনি খাঁটি দেশানুরাগী হইতে পারিয়াছিলেন। বাঙলার স্বদেশী যুগ হইতে উদ্যত প্রাণে দেশের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণানুষ্ঠানে তাঁহার সহানুভূতির
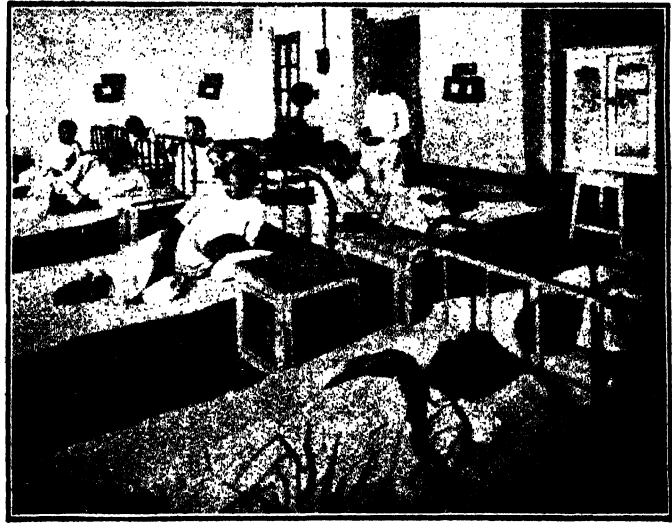
অন্তর বিভাগের একাংশ

যে কোন সদনুষ্ঠানের সঙ্কল্প লইয়া তাঁহার কাছে যে কেহ উপস্থিত হইয়াছেন, কবিরাজ-শিরোমণি মহাশয় সেখানে কৃপণতা করেন নাই। তিনি দান করিতেন মুক্তহস্তে, কিন্তু নীরবে, গোপনে; অহঙ্কারকে, খ্যাতিকে প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি একাধারে ভারতবিদিত বিখ্যাত চিকিৎসক, কবি, সাহিত্যিক, দাতা, ধর্ম্মপরায়ণ; কিন্তু তবুও জীবনে

উদ্ভিদ্ দ্রব্যশালা (Herborium)

সরকার পক্ষের মানপত্রে তাঁহার গৌরববৃদ্ধি হয় নাই। বাঙলায় যে কয়জন কৃতী পুরুষ জন্মিয়াছেন, সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য শিক্ষাবৰ্জ্জিত হইয়াও তিনি আত্মযোগ্যতায় আজ তাঁহাদের অন্যতম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গৌরব করিয়া বলিতে পারি, কাব্য-জগতে রবীন্দ্রের ন্যায়, বিজ্ঞানে স্যার জগদীশ, প্রফুল্লচন্দ্রের ন্যায়, আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে পারদর্শী বাচস্পতি মহাশয় একজন ভারত-প্রসিদ্ধ কৃতী সন্তান।

"বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ" তাঁহার কীর্ত্তি বটে; তিনি অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের পরামর্শদাতা, পৃষ্ঠপোষক, পরিচালক ছিলেন। ইহা তাঁহার মনস্বিতার পরিচয়; কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, পাইয়াছি বাচস্পতি মহোদয়কে ভারতীয় সাধনার, ভারতীয় আদর্শ-সভ্যতার বিজয়ী বিগ্রহ-রূপে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংঘর্ষে গরলাচ্ছন্ন মৃত্যু-কোলাহলের মধ্যে আমরা শুনিয়াছি

সপ্ততিতম বৎসর পরিণত বয়স বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারিতেছি না। মনে হইতেছে, ভারতীর মন্দির শূন্য করিয়া মৃত্যু-দেবতা অকাল বিসর্জ্জন করিলেন তাঁহাকে আমাদের মধ্য হইতে। আমরা যে আজ সর্ব্বহারা, দৈন্য যে আমাদের আজ মর্ম্মস্থল দগ্ধ করিতেছে! সম্পদ্, খ্যাতি এই সকলের অভাবে আমরা কাঙ্গাল হই নাই, স্বভাব-স্বধর্ম্ম হারাইয়া আমরা যে নিঃস্ব হইতেছি! এই সঙ্কটকালে যে আলো নিভিয়া গেল তাহাতে অন্ধকার ঘনাইয়া উঠে, দিগদর্শনের বিদ্যুৎ-তর্জ্জনী কে আর চক্ষের সম্মুখে ঝলসিয়া তুলিবে!

চিতানল নিভিল। নশ্বর শরীর ভস্মমুষ্টিতে পরিণত হইল, শেষ অস্থি পূত জাহ্নবী বুকে তুলিয়া লইলেন। হে মহাপুরুষ! আত্মা যদি অমর হয়, অমরত্বে যদি হিন্দুর বিশ্বাস সত্য হয়, ধ্রুব হয়, নশ্বর দেহখানি কালের হাতে তুলিয়া দিয়া তোমার সর্ব্বজয়ী পূত আকাঙ্ক্ষা কি নিঃশেষ হইবে!

বৈদ্যশাস্ত্র-পীঠের প্রস্তাবিত ভবন

দেশ যোগ্য হউক, অধিকারী হউক—আমরা অবধারিত বলিতে পারি, তাঁর অমৃতময় জীবনের মহাদান ব্যর্থ হইবে না। ভারতের আয়ুর্ব্বেদ মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠিবে, মানুষের ধন ও ধর্ম্ম রক্ষা করিবার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা তিনি

অন্তিম-শয্যায় কবিরাজ-শিরোমণি বাচস্পতি

কে করিবে তাঁর অসমাপ্ত জীবনাদর্শের পরিসমাপ্তি !

প্রশ্নোত্তর দিবে দেশবাসী, প্রশ্নোত্তর দিবে তাঁর মন্ত্রদীক্ষিত বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ, আর উত্তর দিবে যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ।

১৮ই আষাঢ় ১৩৪১ মঙ্গলবারের কালনিশা জাতির চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে—বাঙ্গালীর এই কীর্ত্তিমান্ পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য যদি সার্থকরূপে দিতে হয়, তবে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের চর্চ্চা ও চিকিৎসার সাফল্যেই তাহা সম্ভব হইবে। "আসিবে, সে দিন আসিবে"—এই দৈববাণীই কাণে বাজিতেছে; তাই তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারমণ্ডলী ও দেশবাসীকে সাদর সান্ত্বনা দিয়া বলি, এ আহুতি আমাদের ব্যর্থ হইবে না।

: শান্তিঃ

"প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের" প্রতি স্বর্গীয় কবিরাজ শিরোমণি বাচস্পতি মহাশয়ের শেষ আশীর্ব্বাণী

"তিস্রেষনীয়মভিলক্ষ্য কৃতবিধানং সম্যগ্‌দিশন্নিহ পরত্র চ ভব্যহেতুম্।
জীব্যচ্চিরং জনগণং সুগয়ন্ সুখেন ক্ষেমপ্রবর্ত্তক-প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ এষঃ।"

"* * * আয়ুর্ব্বেদে এষণাত্রয়ের কথা উল্লেখ আছে—প্রাণৈষণা, ধনৈষণা, পরলোকৈষণেতি। "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ" তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন; তাই আমাদের আশা হয়, একদিন আয়ুর্ব্বেদের প্রভাব সকলেই অনুভব করেবে। * * প্রাণ ও ধনের সাধনায় সফল হইলে, উহাতে আসক্ত না থাকিয়া পরলোক-সাধন ধর্ম্ম অর্জ্জন করা উচিত—এ বিষয়ে সঙ্ঘের দৃষ্টি বিশেষ-ভাবেই আছে। অনেকেই জানেন কি না জানি না, তাই বলিতেছি "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে" শিক্ষার্থীদিগকে অন্যান্য বিষয়েও যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, ধর্ম্মবিষয়েও তদ্রূপ শিক্ষা দেওয়া হয়। তার মন্ত্র—"ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্মঃ।" তন্ত্রাচার্য্যেরা জানেন, এই মন্ত্র কত বড় উচ্চাধিকারের! আমি এই সকল আলোচনা করিয়া "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের" একজন অভ্যুদয়কামী। শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় ইহার প্রাণ। তাঁর দীর্ঘজীবন ও অভীষ্টসিদ্ধি

ভ্রান্তি-বিভ্রাট

উপন্যাস)

দশম পরিচ্ছেদ

সারারাত্রি অনিদ্রায় কেটে গেল। ঘুম চোখের পাতায় নেমে আস্‌তেই তিনকড়ি স্বপ্ন দেখে' চম্‌কে ওঠে, যেন জ্যোৎস্না তার কাছে দাঁড়িয়ে বল্‌ছে—"বেলা হ'ল ওঠ, পড়াবে না?" কিন্তু নিছক স্বপ্নই, সে আবার পাশ ফিরে' চোখ বোজে। আকাশের কোলে অন্ধকার থাক্‌তেই সে আজ শয্যা ছেড়ে' উঠে' পড়্‌ল লাফিয়ে। যেন জীবনের আজ বড় জয় সম্মুখে এসে' উপস্থিত। তখনও সাতটা বাজে নি, তাড়াতাড়ি চা খেয়ে' প্রিয়রঞ্জনের ঘরের দুয়ারে এসে' সে দেখ্‌লে, ভিতর থেকে দুয়ার বন্ধ। ফিরে গেল আবার নিজের ঘরে। বার কয়েক পায়চারি করে' আবার এসে' দাঁড়াল, জ্যোৎস্না তার জন্য পড়ার টেবিলে বসে' হয়তো অপেক্ষা কর্‌ছে মনে করে'। কিন্তু বৃথা আশা—তিন চার বার আনাগোনা করে'ও বন্ধ দুয়ার খুল্‌ল না।

কাদু ঝির চোখে, তিনকড়ির এই টানা-পোড়েন যাওয়া-আসা লক্ষ্যে পড়েছিল, সে একবার ব'লেই ফেল্‌লে "দাদাবাবু যে তাঁত বোনাবুনি কর্‌ছেন!"

তিনকড়ি হেসে'ই জবাব দিলে—"কি বুঝ্‌বি কাদু, বৌদি ম্যাট্রিক দেবে, দাদা পড়ানর ভার ঘাড়ে চাপিয়ে গেছে।"

তিনকড়ির আর ধৈর্য্য রইল না। রুদ্ধ দুয়ারে আঘাত দিয়ে ডাক দিল—"বৌদি, বৌদি!"

সাড়া নেই।

তখন আটটা বেজে গেছে। এত বেলা পর্য্যন্ত কোন দিন তো জ্যোৎস্না বিছানায় পড়ে' থাকে না, নিশ্চয় কোন অসুখ করেছে। সে একটু ব্যাকুল হয়েই দরজায় ঘা দিতে দিতে বল্‌ল—"বৌদি, এখনও কি ঘুমোচ্ছ! পড়ার কথা মনে নেই বুঝি, পড়্‌বে না?"

ভিতর থেকে গম্ভীর-স্বরে উত্তর এল—"না।"

"সে কি? আমি কোন ভোর থেকে ঘুরে' মর্‌ছি, হঠাৎ দরজা খুলে' জ্যোৎস্না এসে' সাম্‌নে দাঁড়াল, এমন বিষণ্ণমূর্ত্তি তার সে আর কোন দিন দেখে নি! সে এসে' নত নয়নেই বল্‌ল—"মাপ কর, ঠাকুরপো, কষ্ট দিয়েছি অনেক, আমি আর পড়্‌ব না।"

এই বলে' সে মন্থর গমনে বাথ্‌-রুমের দিকে চলে' গেল। তিনকড়ির স্পষ্টই মনে হ'ল, তার নত দৃষ্টি ভারী, ভিজা, যেন অশ্রুনীরে অভিষিক্ত। ঘুমন্ত চক্ষের এ মূর্ত্তি নয়, কাল রাত্রেও সে যে বিদ্যুদ্দৃষ্টি সন্দর্শন করেছে, তার চিহ্নমাত্র আজ আর খুঁজে' পাওয়া যায় না। কাল তবে সে কি দেখেছিল—সে আকুতি, জ্যোৎস্নার সে নতি স্বপ্নের মতই মিথ্যা! তিনকড়ি বিষণ্ণ মনে নিজের ঘরে গিয়ে' ঢুকল।

মধ্যাহ্নে কাদু এসে' জ্যোৎস্নার ঘরে আসন বিছিয়ে দিচ্ছিল। জ্যোৎস্না জিজ্ঞাসা কর্‌ল—"কি হচ্ছে ও আবার?"

কাদু বিরক্ত হয়েই বল্‌ল—"ঐ তোমার দেয়র—ঠাকুর জিজ্ঞাসা কর্‌ল, বাবু নেই, আপনার ঘরে কি ভাত দিয়ে আস্‌ব—একেবারে রেগে কাঁই—ধমক্‌ দিয়ে বল্‌ল—বাবু নেই ত কি হ'য়েছে—রোজ যেখানে খাই, আজও সেখানে খাব।"

জ্যোৎস্না গম্ভীর ভাবে ধীরে ধীরে বল্‌ল—"আসন তুলে' নিয়ে যা, ঠাকুরপোকে গিয়ে বল্—আমার শরীর ভাল না, আমি বিশ্রাম কর্‌ছি।"

কাদু জয়-গর্ব্বে আসন নিয়ে বাহির হয়ে গেল।

সন্ধ্যার পর সারা দিন ধরে' বুকের মধ্যে তিলে তিলে যে অন্ধকার জমে' উঠেছিল, আকাশের কোলে আলোর রেখা মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে তার মনের সে আঁধার ঘনিয়ে এল এমন দুর্ভেদ্য হয়ে' যে তার চক্ষের দৃষ্টি যেন আর চলে না—মাথা যেন ঘুরে' পড়ে, পায়ের তলা থেকে পৃথিবী সরে' যায়—সে যেন এখনই দম আট্‌কে' ঘরের মেঝের উপর পড়ে যাবে। বিছানায় সারা দিন সে

ঘরে পায়চারি করে' সে এমনই ক্লান্ত হয়ে' পড়েছে যে দাঁড়িয়ে থাক্‌বারও সাধ্য নাই, আরাম-কেদারায় শুয়ে একটু বিশ্রাম কর্‌বে বলে' হেলান দিয়ে' বস্‌ল—কিন্তু সোয়াস্তি কিছুতে নাই। শেষে সুইচ্‌ খুলে', টেবিলের কাছে চেয়ার টেনে' একখানা ইংরেজী বই নিয়ে পড়ার চেষ্টা কর্‌ছিল; হঠাৎ তিনকড়ি এসে' বল্‌ল—"বৌদি, সারাদিন ভেবে সারা হচ্ছ—এই নাও, দাদার খবর এসেছে।"

জ্যোৎস্না অতি আগ্রহে হাত বাড়িয়ে টেলিগ্রামটা নিয়ে এক মুহূর্ত্তে আবার ফিরে দিলে তিনকড়ির হাতে। সে জিজ্ঞাস্‌ কর্‌ল—"খুব চট্‌ করে পড়্‌লে তো, বৌদি!"

জ্যোৎস্না কথার সাড়া দিল না।

টেলিগ্রামে লেখা আছে—রঞ্জনের নিরাপদে পৌছাবার কথা, এক সপ্তাহ দেরী হবে ফির্‌তে, চিঠিতে বিশেষ বিবরণ পাবে।

এক সপ্তাহ—কেন? সাংঘাতিক ব্যারাম যদি, তবে এক সপ্তাহ ধরে' তার কাজ সেখানে কি আছে? যদি ভালই থাকে, তবে সে আজই চলে' আস্‌বে না কেন? এই কথাই তো রঞ্জন যাওয়ার সময়ে তাকে বলে' গেল। ব্যথায় অভিমানে যা' তা' মুখ দিয়ে বা'র হ'লেও তার কথাগুলি স্পষ্টই কাণে গিয়ে পৌছেছিল—সে কথা কি সে বলে' নি? "ভাল যদি দেখি কালই ফির্‌ব"—ভাল নিশ্চয়ই আছে, তা' না' হলে, এক সপ্তাহ সেখানে কিসের কাজ,—ছল, টুনু ছল করে'ই তাকে টেনে নিয়ে গেল—আমি স্ত্রী, আমার এমন শক্তি নেই তাকে ধরে' রাখি! ধিক্‌ আমাকে! রাগে-দুঃখে চোখ মুখ দিয়ে যেন আগুণ বেরুতে লাগ্‌ল।

তিনকড়ি কথার উত্তর না পেয়ে, সামনের চেয়ারে জম্‌কে বসে' টেবিলের উপর থেকে বইখানা তুলে নিয়ে বল্‌ল—"এই তো পড়া সুরু করেছ বৌদি, এখন তোমার নিশ্চয়ই সময় আছে—এঁ্যা!"

জ্যোৎস্না মাটীর দিকেই দৃষ্টি নত করে' বল্‌ল—"না—ঠাকুর-পো—তুমি এখন যাও, বড় মাথা ধরেছে—শোব।"

তিনকড়ি অতিশয় নিরাশ হ'য়ে ঘর ছেড়ে' বেরিয়ে গেল।

একদিন, দুদিন, তিনদিন কেটে' গেছে; তিনকড়ি প্রতিদিন ঘরের বারন্দায় এসে দাঁড়ায়, ক্ষুধিতের মত জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে থাকে, মনে হয়—পড়ার ঝোঁক সামাল দেবে সে কেমন করে', আট্‌কালে তাকে ডাক্‌তেই হ'বে, তা' না হ'লে উপায় নেই তার! কিন্তু আশ্চর্য্য, জ্যোৎস্নাকে মাঝে মাঝে বই খু'লে বস্‌তে সে দেখে বটে; কিন্তু তার সাড়া পেলেই, সে টেবিল ছেড়ে' উঠে' যায়—পূবদিকের জানলায় গিয়ে পেছন ফিরে' দাঁড়িয়ে থাকে। তিনকড়ির মনে হয়—রূপ আছে বটে, কিন্তু মেয়েটা একেবারেই পাড়া-গেঁয়ে।

জ্যোৎস্নার মুখের হাসি শুকিয়ে গেছে, মাথার চুল অবেণীবদ্ধ, পিঠে বুকে লুটিয়ে জোট পাকিয়ে যাচ্ছে—সেদিকে খেয়াল নাই, যেন সে ভূতাবিষ্টা! শ্বাশুড়ীর ভয়ে খেতে হয়, নাইতে হয়, তা' না হ'লে হয় তো সে উপবাসী থাক্‌ত। রঞ্জন গেছে তার বন্ধুর ভারী ব্যারাম শুনে' পাটনায়, মায়ের পেটের বোনের মত টুনুর অনুরোধে বন্ধুকে দেখ্‌তে—দুদিন পরে সে ফিরে আস্‌বে, আবার হেসে' কথা কইবে, সামনে বসে' আদর করে' পড়া বলে' দেবে। তার ভালবাসার খুঁৎ কিছুতে খুঁজে' পাওয়া যায় না—তবু কিসের ব্যথা, কেন হৃদয় শূন্য মনে হয়! সংশয় মহাপাপ। কিন্তু চিঠি তো' এল' না আজও, মন তার চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল, হয় তো বা রোগীর কাছে বসে' বসে' সেও অসুস্থ হয়ে' পড়েছে। অস্থির হয়ে' সে মায়ের ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। যা' বল্‌তে এসেছিল লজ্জায় তা' মুখ দিয়ে বেরুল না—কিন্তু মা মুখপানে চেয়ে' হেসে' বল্‌লেন—"একেবারে পাগল মা তুমি, সকাল থেকে কাপড়খানাও ছাড় নি দেখ্‌ছি, আর চুলগুলো যে লুটো-লুটী হচ্ছে—রঞ্জনের আজ চিঠি এসেছে—পেয়েছ তো?"

সলজ্জস্বরে আনন্দে কেবল এই শব্দটুকু বেরিয়ে এল তার গলা' ছেড়ে' "কৈ না!"

"ওমা, সে কি কথা? কাদু—কাদু—"

কাদু পাশেই ছিল—সে বল্‌ল—"তবে তিনুবাবু চিঠিখানা চেপে' রেখেছেন। দেওর-ভাজের রঙ্গ—আমি কি বল্‌ব, মা।"

জ্যোৎস্না আর চুপ করে' থাক্‌তে পার্‌ল না, রাগে

তার সর্ব্বশরীর থর থর করে' কাঁপ্‌ছিল—মায়ের সাম্‌নে ধম্‌কে কথা বলা শোভন হ'বে না, তাই দৃঢ় কণ্ঠে চাপা গলায় সে ধীরে ধীরেই বল্‌লে—"চিঠিখানা নিয়ে এস এখুনি।"

জ্যোৎস্নার কাছে খবর এল' তিনুবাবু বাড়ী নেই—টকি দেখ্‌তে গেছে—ফিরবে ন-টার মধ্যে। জ্যোৎস্না অতিশয় বিরক্ত হয়ে বল্‌ল—"আমার চিঠি তার কাছে থাকে কিসের জন্যে? আর তুই যে তখন বল্‌লি—দেওর-ভাজের রঙ্গ—কি দেখেছিস্ বল্‌তো, রঙ্গ কর্‌তে? মুখ সাম্‌লে কথা কইবি, এমন কথা যদি মুখ দিয়ে আর বেরোয় পুরান লোক বলে' রেহাই পাবি না, এ বাড়ী ছাড়্‌তে হ'বে বলে' দিচ্ছি।"

কাদু ঝির মুখ শুকিয়ে গেল—বৌ-ঠাকুরণের কথা শুনে'। সে মনে মনে তিনকড়িকেই গালাগাল দিতে দিতে ঘর থেকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল।

রাত্রি ন-টার পর, তিনকড়ি এসে', জ্যোৎস্নার হাতে পত্র দিয়ে বল্‌ল—"ঘাট হয়েছে বৌদি, চিঠিখানা দিই দিই করে' ভুলে গেছি। কিন্তু কাদু ঝিকে দিয়ে এমন অপমান করবে তা' ভাবি নি।"

জ্যোৎস্না তিনকড়ির মুখের দিকে একবার মাত্র কটাক্ষ করে' বল্‌ল—"কাদু ঝিকে দিয়ে অপমান তো কিছু করি নি—চিঠিখানা, যেমন সরকার গমস্তা দিয়ে সব চিঠি আসে, তেমনি পাঠিয়ে দিলেই ভালো হ'ত, এখন দাও।"

তিনকড়ি নিজের দোষেই আঘাতের পর আঘাতে ম্রিয়মান হ'য়ে পড়েছিল—সে ম্লানমুখে ইজি-চেয়ারে বসে' রঞ্জনের চিঠি জ্যোৎস্নার হাতে তুলে' দিল। চিঠিখানা খোলা, তার আপাদ-মস্তক জ্বলে' গেল রাগে। একপ্রকার হুঙ্কারের মতই জ্যোৎস্নার প্রশ্নে তিনকড়ির হৃৎকম্প হ'ল। "চিঠি খুল্‌লে কে?"

জবাব নেই, নিরুপায়ের মত সে কেবল চেয়ে আছে জ্যোৎস্নার দিকে।

জ্যোৎস্নার দৃষ্টি আজ নত নয়, মাথার কাপড় সেদিন রাত্রের মতই আধখানা খুলে' পড়েছে পেছন দিকে। কিন্তু এ সে দীনমূর্ত্তি নয়, কণ্ঠের স্বর যাত্রার কান্নার কোমল ও ক্ষীণ নয়। প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার মত উত্তপ্ত সে মূর্ত্তি—ভয়ের সঞ্চার করে। তিনকড়ির মুখে উত্তর নাই দেখে' জ্যোৎস্না অতিশয় কটুস্বরে বল্‌ল—"তুমি ক্ষমার অযোগ্য ঠাকুর-পো, তুমি—তুমি আমার স্বামীর চিঠি খুলেছ কোন্ অধিকারে? যাও আর বসে' থেকো না আমার ঘরে। আমার কোন সংশ্রবে তোমায় আর যেন না দেখি, ঠাকুর-পো।"

তিনকড়ি হতভম্ব, সে যেমন বসেছিল, তেমন ভাবেই বসে' রইল সেইখানে—তার যেন নড়্‌বার শক্তি পর্য্যন্ত আর নাই।

এমন অপমান সে হয় নি কারু কাছে। কাজটা যে এতখানি গর্হিত হ'য়েছে, বোঝবার মত হুঁসও তার ছিল না, কেন না, সে কল্পনায় ধরে' নিয়েছিল জ্যোৎস্নাকে সে পেয়েছে একান্ত আপনার জনের মতই। যেন তার এইটুকু অধিকার আছে, চিঠিখানা নিয়ে সে হেসে' হেসে' জ্যোৎস্নার কাছে গিয়ে পড়ার সুযোগ পেলে, তার সমালোচনা কর্‌তেও ছাড়্‌বে না—কিন্তু জ্যোৎস্নার স্বরভঙ্গী এবং আচরণ দুই তাকে যুগপৎ বুঝিয়ে দিলে, সে এ বাড়ীর কর্ত্রী আর তিনকড়ি অনুগৃহীত দূরসম্পর্কীয় একজন আত্মীয় ভিন্ন আর কেউ নয়।

তিনকড়িকে নির্ল্লজ্জের মত বসে' থাকৃতে দেখে' জ্যোৎস্না নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ছুটে' তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে' যেন আগুন ঝরে' পড়্‌ছিল। তার মনে হচ্ছিল—এই চিঠি—আর কারু নয়—তার স্বামীর—সে চিঠি তার হাতে পৌছান উচিত ছিল প্রথমেই—মোড়া খাম খুলে' প্রথম ছত্রটী তার চোখে ফুটে উঠার যে তৃপ্তি তা' ক্ষুন্ন করে' দিল—এই হতভাগ্য কোন্ অধিকারে? মনে হ'ল, চিঠিখানা ছুঁড়ে ফেলে' দেয় সে বাহিরের অন্ধকারে। প্রথম দৃষ্টি চিঠির পাতায় পাতায় দেওয়ার যে অনুভূতি, যে আনন্দ ও পবিত্রতার আস্বাদ, যেন ইহার ভিতর থেকে আর সে পাবে না—বুক ফুলে' উঠ্‌ল, চক্ষু দিয়ে' উষ্ণ বারিধারায় দুই গণ্ড ভেসে' গেল।

সারা রাত্রি ঘরে আলো জ্বলেছে, সারারাত্রি চিঠিখানা সে বার বার পড়েছে। ছত্রের পর ছত্র—কোথায় এক ফোঁটা

কালি পড়ে' একটা অক্ষরের অর্দ্ধেকটা ঢাকা দিয়েছে, তখন সে নিশ্চয় হয়েছিল খুবই অসতর্ক—ভেবেছিল, নিশ্চয়ই আমার ব্যথা, মর্ম্মদাহের কথা—এই যে মুছে' গেছে দুটো কথা—বুঝি আমার বুক-ভাসা জলের এক কণা ছিটকে পড়েছিল তার চোখ দিয়ে'! গর্ব্ব ও আনন্দের পরিপূর্ণ অনুভূতি ক্ষুণ্ণ কর্‌ছিল, মাঝে মাঝে তিনকড়িকে মনে পড়ায়—সে এ চিঠি পড়ে' গেল কোন্ সাহসে—আমার স্বামীর চিঠি—আমার স্বামীর?

সত্যই টুনুর ভাই-এর অসুখ; হৃদয় যার আছে, সে যে সব জায়গায় ছেয়ে' যায় এমন ক'রেই। এই তো পুরুষের মহত্ত্ব, আহা! ধন্য তারা যারা তার স্বামীর বন্ধু; ধন্য টুনু, যদি সত্যই সে ভায়ের মত ভালবাসে তার স্বামীকে। কিন্তু সে কি কথা অস্ফুট স্বরে নির্জ্জনে, কোলে মাথা তুলে' নিয়ে, সে বলেছিল তার স্বামীকে? চিঠিখানা শক্ত দৃঢ় মুঠার মধ্যে চেপে' ধরে' ছুঁড়ে' ফেলে' দিল ঘরের এককোণে। শক্ত হয়ে' শুয়ে রইল সে অনেকক্ষণ—চক্ষু তার অনার্দ্র, যেন জলন্ত অঙ্গারের চেয়েও উত্তপ্ত; কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আবার উঠে' গিয়ে চিঠিখানা কুড়িয়ে নিয়ে' এল' বুকের উপর, গুটিয়ে-যাওয়া কাগজখানাকে কোমল হাতের সঞ্চালনে চোরস্ত করে' নিল।

সারা রাত কেটে গেল, চিঠি পড়ে'।

চিঠির সারমর্ম্ম:

ক্রাইসিস্ কেটে গেছে—দুদিন দেখে' ফির্‌ছি।

রঞ্জন তারপর টেনেছে একটা লম্বা ড্যাশ্, কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে তা' দুই ইঞ্চি এগিয়ে থেমে গেছে, যা জানিয়েছে বুঝি তার ভাষা নেই!

আজ রঞ্জন ফির্‌বে। দিগ্বিজয়ী বীরের প্রাসাদ-প্রবেশের মত ধূম লেগে' গেছে বাড়ীতে। যে ঘরে যা' কিছু ছিল, সকাল থেকে ভৃত্য দাসী নিয়ে' সব টেনে বা'র করেছে জ্যোৎস্না বারান্দায়—ঘরের মেঝেয় আজ আর একতিল ময়লা থাক্‌বে না, নারকেল ছোব্‌ড়া নিয়ে বসে' গেছে সকলে ঘ'ষ্‌তে। ঘর-দোর গুছাতে অপরাহ্ন হয়ে' গেল।

মা এসব দেখে' হাসেন আর বলেন—"এ কালের ছেলেগুলো মনে করে, তাদের চোখ দিয়েই বুঝি ঘরের লক্ষ্মী চেনা যায়—অলক্ষ্মীই বেছে আনে। মায়ের চোখেই ধরা পড়ে ঘরের লক্ষ্মী, মা আমার যেন কমলা—রঞ্জন আর টুঁ-হাঁ করে না।"

জ্যোৎস্না মুখে কাপড় দিয়ে হেসে' পালায়।

এবার আর তিনকড়ি নয়, কাহু দিয়ে গেল চিঠি, কেউ খোলে নি, নীল উজ্জ্বল অক্ষরে খামের উপরে স্পষ্ট-স্পষ্ট করে' লেখা—"জ্যোৎস্নাময়ী।"

বুক যেন দুরু-দুরু করে' উঠ্‌ল—আজ যখন আস্‌ছেন, আবার চিঠি কেন? সকৌতূহলে খামের মোড়ক খুলে' পা দুটো তার থর-থর করে' কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল—খুব আদর সম্ভাষণ জানিয়ে লিখেছে—"টুনু ছাড়্‌লে না, আর দুদিন থেকে যেতে হ'ল। বিপদের ভয় আর নেই, দুই বন্ধুকে একসঙ্গে ভোজ দিয়ে তবে টুনু ছাড়্‌বে, এই তার আকূতি।"

দিন পনর পরে মা নিজেই জ্যোৎস্নার ঘরে এসে' উপস্থিত হলেন। বিছানার উপর সে নিস্তব্ধ হয়ে' শুয়েছিল। চক্ষু ছিল ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে স্থির, সে অর্দ্ধমৃত, রুগ্ন, শীর্ণ মুখের দিকে মা চেয়ে' বল্‌লেন—"তুমি পাগল হয়েছ বৌমা, এই নাও রঞ্জনের চিঠি, কি করবে, ও ছেলেবেলা থেকেই এই রকম, কারু কথা এড়াতে পারে না।"

জ্যোৎস্না তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে' মেঝের উপর একখানা আসন পেতে দিল।

মা বস্‌তে-বস্‌তেই বল্‌লেন—"দুদণ্ড বস্‌বার কি আর অবকাশ আছে, আজ ভোরে ব্রহ্মচারী এসে হাজির। গুরুমহারাজের ভারী ব্যারাম, দেড়টার ট্রেণেই ছুটতে হ'বে কাশী।"

জ্যোৎস্না অবাক্ হয়ে' তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল। মা চিঠিখানা হাতে দিয়ে বল্‌লেন—"আমাদের কুলগুরু, তবে ইনি কাণে ফুঁ দিয়ে ব্যবসা করে' বেড়ান না—মন্ত্র কারুকে দিতেই চান না—তোমার শ্বশুর পেড়াপীড়ী করে' ধরায় কথা এড়াতে পারেন নি। হাঁ, গুরু বটে, তাঁর অন্তিমকালে—"

সম্ভবতঃ একফোঁটা জল চোখের কোণে এসে পড়েছিল, এক নিমিষে কাপড়ের খোঁটে তা' মুছে' নিয়ে, প্রসন্ন গম্ভীর

কণ্ঠে তিনি বল্‌লেন—"তাঁর অন্তিমকালে সাক্ষাৎ নারায়ণের মত এসে দাঁড়ালেন, এমন মৃত্যুও কখন দেখি নি। স্বামী-হারা হয়েছি, কিন্তু শোক করি নি—তিনি ভগবানেরই কাছে আমার জন্য অপেক্ষা কর্‌ছেন।"

মাথা তাঁর মাটীর দিকে নত হয়ে' পড়্‌ল।

জ্যোৎস্না তখনও সবিস্ময়ে তাঁর দিকে চেয়েছিল।

তিনি আবার বল্‌লেন—"সে সব কথা বল্‌তে আসি নি, যে কর্ত্তব্য তিনি আমায় দিয়ে গেছেন, সমাপ্ত হ'লেই তাঁর কাছে চলে' যাব। আজ সেই ইষ্টদেব পীড়িত, তাঁর নাকি আসন্নকাল উপস্থিত। অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌লুম না, বৌমা, রঞ্জনের ফিরে আসা পর্য্যন্ত। সে কাল সকালে আটটার মধ্যেই এসে পৌঁছবে। আমি বাড়ী থাক্‌ব না। হিসেব করে' চ'লো, রঞ্জনকেও ব'লো—কাগজপত্র সরকার-গমস্তাদের বুঝিয়ে দিয়ে গেলুম, সে যেন সব দেখে-শুনে' নেয়।"

তারপর আসন ছেড়ে' উঠ্‌তে-উঠ্‌তে বল্‌লেন—"একটা কথা মনে রেখো, মা—রঞ্জন যাঁ'র পুত্র, তাঁর অগৌরব যাতে হয়, সে তা' কর্‌তে পারে না। যদি কোন দিন তুমি আর এমন করে' থাক্‌বে—সে যে কোন কারণেই হোক, তাতে সংসারের অকল্যাণই হ'বে। আমি চোখে দেখে' তোমায় ঘরে এনেছি, সে সম্মান যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। রঞ্জন যেন বোঝে, মায়ের দৃষ্টি ভুল নয়।"

জ্যোৎস্না মায়ের এই কথায় কি সঙ্কেত আছে, তা' অনুভব করে' নিয়ে, মনে করেছিল নীরবেই থাক্‌বে, কিন্তু হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"আমায় ঘরে এনে' তিনি সুখী হন নি—আশীর্ব্বাদ করুন, আমি মরি—"

জ্যোৎস্নার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে' এল।

মাও বাধা দিয়ে বল্‌লেন—"ওসব কথা বল্‌তে নেই। গুরু মহারাজকে বলেছিলুম রঞ্জনকে আশ্রয় দিতে, তিনি বলেছিলেন—এখন তার সময় হয় নি, বিয়ে করুক—ধর্ম্ম আপনি হ'বে। স্কুল-কলেজে প'ড়ে গুরুতে তার বিশ্বাস নেই, আমি তাই তাকে এসব দিকে মন দিতে বলি না—কিন্তু যে তাকে গর্ভে ধরেছে, তার ভাল-মন্দের ভার সে যদি না নেয়, মায়ের কর্ত্তব্য করা হয় না। রঞ্জন চেয়েছিল, ডানা-কাটা পরী বিয়ে কর্‌তে, ঐসব টুনু, মুনু, কি সব বিদ্‌কুট নামের মেয়ের সঙ্গে। আমি তার কথা শুনি নি—রাজলক্ষ্মীকে ঘরে এনেছি।"

জ্যোৎস্নার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে' বল্‌লে—"জোর করে' আমায় নিয়ে আসায় তিনি অসুখী হয়েছেন, মা।"

"সে কি বৌমা"—দাঁড়িয়ে উঠে' হেসে' মা বল্‌লেন—"ওসব পাগলামিকে মাথায় ঠাঁই দিও না—স্বামী গুরু, নারীর দেবতা, তাকে সংশয় করো না কোন কারণে; পুরুষের মন যদি চঞ্চল হয়—নারীর নিষ্ঠা ও বিশ্বাস তা' দৃঢ় সংযত কর্‌বে। নারীর তপস্যাই পুরুষের প্রাণ—পুরুষের শক্তি, একথা ভুলো না।"

মা ঘর ছেড়ে' বেরিয়ে পড়্‌লেন বারান্দায়—তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ জ্যোৎস্না অনুসরণ করে' গেল তাঁর ঘরের দুয়ার পর্য্যন্ত। ঘরের ভিতর আসনে উপবিষ্ট এক দৃঢ়কায় তরুণকে দেখে' সে ফিরে' দাঁড়াল। মা বল্‌লেন—"উনি ব্রহ্মচারী—আমায় নিতে এসেছেন। আমার সঙ্গে কানু আর বৃদ্ধ বিপিন সরকার যাবে। রঞ্জনকে ব'লো সাবধানে থাক্‌তে, সবদিকে দৃষ্টি রেখো।"

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে—রঞ্জনের চিঠিখানা জ্যোৎস্না একবার ভাল করে' পড়ে' নিল—মাকেই লিখেছে সে—খুব অনুনয় করে' দুদিনের জন্য এসে' কেন একুশ দিন কেটে গেল। রোগের বাড়াবাড়ি, তারপর পথ্য দেখে' যাওয়ার কথা, সুকুমারের চেয়ে টুনুর কাতর অনুরোধ উপেক্ষা কর্‌তে সে পারে নি।

জ্যোৎস্না ছুঁড়ে' ফেলে' দিল চিঠিখানি ঘরের বাইরে।

দাঁড়া-আরসীর সামনে দাঁড়িয়ে সে দেখ্‌লে চক্ষু তার নিষ্প্রভ, ওষ্ঠপুট শুষ্ক ঈষৎ নীলাভ, মুখকান্তি বিবর্ণ। মাথার চুলগুলি রুক্ষ গ্রন্থীল। কানু চলে' গেছে মায়ের সঙ্গে। সে ঘর থেকেই ডাক দিল, তীব্র কণ্ঠে—"সুশীলা।"

সুশীলাও বাড়ীর একজন পুরাতন দাসী। জ্যোৎস্নার গলার ডাক শুনে' সে হাজির হ'ল তার সাম্‌নে।

চিরুণী নিয়ে' চুলের জোট ছাড়াতে তার হাতে খিল ধরে' গেল—জ্যোৎস্না দেখ্‌ল দর্পণে, তার মাথার চূর্ণ-কুন্তল চিবুকে পৃষ্ঠে বক্ষে ছড়িয়ে পড়েছে। কেশের পরিপাটী

সংস্কারে মুখশ্রীর পরিবর্ত্তন দেখে' তার নিজের ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে' উঠ্‌ল। হাস্‌তে হাস্‌তেই সুশীলাকে নিয়ে' সে বাথরুমে গেল।

সারা রাত্রি তার নিদ্রা নেই। আলমারীর মধ্যে যতগুলি বিচিত্র বসন ছিল, সেগুলি বাছাই কর্‌তে কর্‌তে অর্দ্ধেক রাত্রি কেটে' গেল। তারপর কখন ঘরের মধ্যে পায়চারী, কখনও বা ইজিচেয়ারে চিৎ হ'য়ে' পড়ে' কত চিন্তা! মনে যে ঝড় বয়ে' গেল সারারাত্রি ধরে', তার অবসাদে সে ভোর বেলা ঘুমিয়ে পড়েছিল অকাতরে। নিদ্রাভঙ্গে চেয়ে দেখ্‌ল ঘড়ির দিকে, ছ'টা বেজে গেছে অনেক ক্ষণ। তার মনে হ'ল, ষোল আনা সাধ মিটিয়ে সে ফিরে' আস্‌ছে, আর আমি উপেক্ষিতা, সে আবার আমায় ফিরে পাবে, তেমনি করে'? না—তা কিছুতেই হ'তে পারে না। অর্দ্ধরাত্রি ধরে' বাছাই-করা ফুলে-ফুলে-ছাওয়া রেশমী কাপড়খানি পড়ে', মাথার চুল আঁচড়ে', সুন্দরী জ্যোৎস্না ঘর ছেড়ে' বারান্দায় এসে' দাঁড়াল। প্রলয়-দোলে তার হৃদয়ের কোলে কোলে আছাড় খেয়ে' পড়্‌ছিল, উচ্ছ্বসিত আবেগের ভীম প্রবাহ।

সাম্‌নে সুশীলাকে দেখে' হঠাৎ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়্‌ল একান্ত অতর্কিতে—"সুশীলা, দেখ্‌ তো, ঠাকুরপো কোথায়?"

"ডেকে দোব?"

"হাঁ" এই বলে' মরাল-মন্থর-গমনে জ্যোৎস্না এসে' একখানা কেদারা টেনে' নিয়ে' পড়ার টেবিলের পাশে বসে' পড়্‌ল।

"বৌদি! আমায় ডেকেছ? দাদা আজ আস্‌ছে, নয়?

একমুখ হেসে জ্যোৎস্না বল্‌ল—"দেখ তো ঠাকুরপো—সিনোপ্‌সিস্‌টা ঠিক লিখেছি কি না"—একখানা খাতা তার সাম্‌নে এগিয়ে দিল।

তিনকড়ি খাতা না খুল্‌তে খুল্‌তে, খাতাখানা তার হাত থেকে কেড়ে' নিয়ে' বল্‌ল—"ওঃ, কি স্বার্থপর আমি—এখনও তোমার চা খাওয়া হয় নি নিশ্চয়ই?"

তিনকড়ি বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে চেয়ে রইল জ্যোৎস্নার দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে। সে বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছিল না—ঘটনাটা সত্য কি না।

কিন্তু চকিতে জ্যোৎস্না ঘর ছেড়ে' বেরিয়ে গেল—চা নিয়ে সুশীলার সঙ্গে সে ঘরে এসে', টেবিলের উপর ধরে' দিল নিম্‌কি-সিঙ্গারাদি খাদ্যদ্রব্যপূর্ণ ডিসের সঙ্গে চায়ের পেয়ালা।

তিনকড়ির চোখ দিয়ে যেন জল গড়িয়ে পড়ে, এমনই তার অবস্থা!

জ্যোৎস্না বল্‌ল—"খাও ঠাকুরপো, মনটা কদিন বড়ই খারাপ হয়েছিল, কি খেলে, না খেলে দেখ্‌তে পারি নি।"

তিনকড়ি বিশৃঙ্খল মনে উদাসীনের মত জলযোগে বসে' গেল সেইখানে। জ্যোৎস্নার চক্ষু ছিল ঘড়ির দিকে, তখনও আটটা বাজ্‌তে পনর মিনিট বাকী। সে তাড়াতাড়ি, ওয়াসিংটন্‌ আভিংয়ের বইখানা খুলে' বল্‌ল—"অনেক চেষ্টা করে'ও এর একটা গল্পেরও সাব্‌ষ্ট্যান্স ভাল করে' লিখ্‌তে পারি নি। প্যারাফ্রেজ্‌ কি ভাবে করেছি একবার দেখ তো, ঠাকুর-পো!"

তিনকড়ির সে উৎসাহ আর নেই, সে এখনও নিজেকে সাম্‌লে নিতে পারে নি। জাহ্নবীধারায় মত্ত হাতী যেমন উল্টে পাল্টে গেছ্‌ল—জ্যোৎস্নার হঠাৎ অনুগ্রহ-বর্ষণে সে এক প্রকার নাস্তা-নাবুদ হয়ে' পড়েছিল। জ্যোৎস্না কথার সঙ্গে ঘন ঘন দৃষ্টি দিচ্ছিল ঘড়ির দিকে। আটটা বাজ্‌তে আর মিনিট পাঁচেক বাকী। তিনকড়ির খাওয়া প্রায় শেষ হ'য়ে' এল' সে গ্লাসের জলে হাত মুখ ধুতে ধুতে বল্‌ল—"বৌদি, সত্যি সত্যিই পড়্‌বে?"

হো-হো-হো—কি অস্বাভাবিক হাসি!

তিনকড়ি সেই মূর্ত্তির দিকে বেশীক্ষণ চেয়ে থাকৃতেও পার্‌ল না। যেন প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হয়, কি অনর্থ বাধ্‌বে এখুনি। জ্যোৎস্না হেসে' বল্‌ল—"তুমি পড়াবে বল—এক মিনিট ফাঁক দিতে পার্‌বে না—এই যে বস্‌ছ, একেবারে উঠ্‌বে সেই বারটা বাজ্‌লে!"

সে আরও আশ্চর্য্য হ'য়ে' বলে' উঠ্‌ল—"দাদা যে আস্‌বে এখুনি—"

"আসুক, তুমি বল আমার কথা অমান্য কর্‌বে না?"

আদেশ প্রভুর মতই নির্ঘাত ও অমোঘ।

তিনকড়ি বল্‌ল—"না।"

বাইরে মোটরের সাড়া পাওয়া গেল—তিনকড়ি

আনমনা হয়, জ্যোৎস্না ধমক্ দিয়ে বলে—"পড়াচ্ছ কৈ? ক'দিন বা আছে পরীক্ষার?"

ঘরে এসে' ঢুক্‌ল, প্রসন্নমূর্ত্তি প্রিয়রঞ্জন, হেসে বল্‌ল—"কত যে সুখী হলুম তোমায় দেখে', কি আর বল্‌ব! কেমন তিনু—এই কয়দিনে তোমার বৌদিদি খুব প্রগ্রেস করেছে, কি বল?"

তিনকড়ি জবাব দিতে যাচ্ছিল—জ্যোৎস্না বাধা দিয়া বল্‌ল—"জবাব পরে দিও, এখন পড়াও।"

তিনকড়ি মন্ত্রমুগ্ধ—জ্যোৎস্নায় সাম্‌নে দুলে দুলে পড়িয়ে যেতে লাগ্‌ল নির্ব্বিকারে।

পড়া চল্‌ল এত বেশী, প্রিয়রঞ্জনের পক্ষে ধৈর্য্য-রক্ষা অসম্ভব হয়ে উঠ্‌ল। সে বল্‌ল—"বাপ্, সারা রাত ঘুমোই নি, দোহাই তোমাদের, খাওয়া দাওয়াটার জোগাড় একটু সকাল-সকাল কর। পড়াটার ক্ষতি যা' হয়, সুদ শুদ্ধ পুষিয়ে দেব আমি নিজেই।"

জ্যোৎস্না অলক্ষ্যে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখ্‌ল, এগারটা বেজে' গেছে। তারও অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল, হেসে' বল্‌লে—"ঠাকুরপো, পাস কর্‌তে পার্‌ব কেমন?"

তিনকড়ি যে কি উত্তর দিবে তার ঠিক নেই—সে কথার পিঠে কথা বলে' গেল—"হাঁ, নিশ্চয়ই।"

এইবার প্রিয়রঞ্জনের পালা, সে আশা করেছিল, পড়ার ঝোঁকে জ্যোৎস্না তার বুকে এসে' পড়ে নি—এইবার সে দীর্ঘ বিরহের অবসান কর্‌বে মধুর আলাপনে; কিন্তু সে আশ্চর্য্য হয়ে' দেখ্‌ল, বিনা কথায় সেও বেরিয়ে গেল তিনকড়ির সঙ্গে সঙ্গে।

সন্ধ্যার পর সুশীলা এসে' প্রিয়রঞ্জনকে বল্‌ল—"তিনুবাবু বল্‌লেন—বৌঠাকুরুণ যাচ্ছেন তার সঙ্গে টকি দেখ্‌তে।"

"কে যাচ্ছে?"

"বৌঠাকুরুণ"।

প্রিয়রঞ্জন স্তম্ভিত হয়ে' বাতায়ন-পথে নীলাকাশের কোলে বিকট দৈত্যের মত একটা ধূসর বর্ণের মেঘ জমেছিল—সেই দিকে চেয়ে রইল।

তার পরের দিনের কথা—সারাদিন পড়া আর পড়া, সন্ধ্যা হ'লেই মটর নিয়ে' জ্যোৎস্না বেরিয়ে যায় তিনুর সঙ্গে। কোন কথায় সে কাণ দেয় না—কিছু করার আগে সে রঞ্জনের আদেশ নেওয়ার অপেক্ষাও করে না। জ্যোৎস্না তো এমন ছিল না—এই কয়দিনে তার এ কি পরিবর্ত্তন! সেদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময়ে দুই ভাই খেতে বসেছিল—কিন্তু পূর্ব্বের মত জ্যোৎস্না আর পাখা নিয়ে' কাছে বসে নি। সে পাশের টেবিলে বসে' অঙ্ক কষ্‌ছিল।

তিনকড়ি বল্‌ল—"শুনছ দাদা—কোটী কোটী মণ চাউল নাকি জাপান থেকে রপ্তানী হয়েছে ভারতবর্ষে, এই চাউলগুলো আমার জাপানী মনে হচ্ছে।"

"দূর মূর্খ! পাটনাই চাল, জাপানী হ'বে কেন?"

"কি তার প্রমাণ?"

"তোমরা এ কী শিখেছ, কথায় কথায় প্রমাণ চেয়ে বস। কলিকাতার বাজারে জাপানী চাল আস্‌তে এখন ঢের দেরী আছে।"

জ্যোৎস্না টেবিল থেকেই বিদ্রূপ করে' বলে' উঠ্‌ল—"প্রমাণ যুক্তি চাইলেই মূর্খ বলে' গালি সহজ। চালগুলো যে জাপানী নয়—তাই বা কে বল্‌ল?"

প্রিয়রঞ্জনের বিস্ময়ের সীমা রইল না। সে এসে' পর্য্যন্ত জ্যোৎস্নাকে অন্যের সহিত হাস্‌তে দেখে, কথা কইতে দেখে; বিশেষ তিনকড়ির সঙ্গে তার কথা ও হাসি যেন ফুরায় না। তার কাছেই তার ম্লান-মূর্ত্তি—এমনই পীড়ন করে তাকে, যে মনে হয়, এ বাড়ীতে আর তার থাকা সম্ভব নয়। তিনকড়ির এই উদ্ভট কথাটা শুধু সমর্থন করার জন্যই জ্যোৎস্নার কথা নয়—সে কথার সুরে রঞ্জনকে আঘাত দেওয়ার উদ্দেশ্য যেন নিহিত আছে। মা বাড়ী নেই—রাগারাগি হ'লে যদি কোন কাণ্ড ঘটে, এই ভয়ে সে জ্যোৎস্নার অনেক অভাবনীয় আচার ব্যবহার মুখ বুজে' সয়ে' নিয়েছে—সে এ কথারও কোন উত্তর দিল না। নীরবে খেয়ে' উঠে' গেল।

সেদিন সেই যে অপরাহ্নে রঞ্জন বেরিয়ে গেছে বাহিরে, সন্ধ্যার পর আর বাড়ী ফেরে নি। জ্যোৎস্না সেজেগুজে' বারান্দার খড়খড়িতে দাঁড়িয়ে' রঞ্জনের আগমন প্রতীক্ষা কর্‌ছিল—এমন সময়ে তিনকড়ি এসে' বল্‌ল—"বৌদি, আজ এম্পায়ার থিয়েটারে উদয়শঙ্করের নৃত্য—টিকিট কিনে রেখেছি, সকাল সকাল চল বেরিয়ে পড়ি।"

কিন্তু জ্যোৎস্না ফটকের দিকে দৃষ্টি রেখে বল্‌ল—"দাদা তোমার বাড়ী নেই যে!"

"নাই বা থাকল। ঠিক সাতটায় আরম্ভ, এখন সাড়ে ছ টা, চল বেরিয়ে পড়ি।"

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে, জ্যোৎস্না বল্‌ল—"না।"

তিনকড়ি খুব কাছে ঘেঁষে' দাঁড়াল। অঞ্চলপ্রান্ত ঝুল্‌ছিল পিঠের উপর—সেটা ধরে' সে জ্যোৎস্নার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌ল—"বৌদি, আর অমন করে' 'না' ব'লো না।"

কাপড়ে টান পড়্‌তেই জ্যোৎস্না দেখ্‌ল, তিনকড়ি তার অঞ্চল-প্রান্ত নিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে আঙ্গুলে জড়াচ্ছে। তার মনে হ'ল, এই খেলা প্রশ্রয় যদি বেড়ে ওঠে, তবে আর তা' ধমক দিয়ে বারণ করা যাবে না। সেই অবস্থায় মানুষের সহিত সহজ সম্বন্ধের মাঝে আস্‌বে নিষ্ঠুর বিপ্লবময় ছেদ—সে বড় নিষ্ঠুর দুর্ঘটনা! রঞ্জনের মনে আঘাত দিতে গিয়ে সে আপনাকেই যেন হত্যা কর্‌তে বসেছে, তার গা শিউরে উঠ্‌ল! দাঁড়িয়ে হঠাৎ সে বলে' উঠ্‌ল—"আমার কাপড় নিয়ে তোমার ও কি খেলা? সরে' যাও।"

তিনকড়ির মুখের দিকে চেয়ে ভয়ে সে আঁৎকে উঠ্‌ল—যেন তার মুখে চোখে কি এক অস্বাভাবিক আকৃতি ফুটে' উঠেছে। সে আরও কাছে এসে' দাঁড়াল—জ্যোৎস্না ঠিক তার কোলের কাছে দাঁড়িয়ে—

"গায়ে এসে' পড়্‌ছ যে, সরে' যাও—মনে রেখো, আমি তোমার বড় ভাজ, মায়ের সমান।"

তিনকড়ির অন্তর অনুরাগের অনুলেপনে রঙে' উঠ্‌ছিল—এক নিমিষে সে কাপড় ছেড়ে দিয়ে জ্যোৎস্নার লম্বিত সুললিত করপুট নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে' বলে' উঠ্‌ল—"আমায় ক্ষমা কর বৌদি, আমি তোমায় মায়ের মত দেখ্‌তে পার্‌ব না।"

ভুজঙ্গিনীর ন্যায় গ্রীবা উত্তোলন করে' জ্যোৎস্না নিজের হাত সবলে ছিনিয়ে নিয়ে তিনহাত দূরে দাঁড়িয়ে ফুল্‌তে ফুল্‌তে অস্ফুট বিকট স্বরে বলে' উঠ্‌ল—"এত স্পর্দ্ধা তোমার, নারীকে মায়ের মত সম্মান দিতে পার না কোন্ সাহসে? আমার হাত ধর কোন্ ভরসায়! জান, এই মুহূর্ত্তে এই বাড়ী থেকে তোমায় বিদায় করে' দিতে পারি।"

তিনকড়ির কণ্ঠে আর অনুনয়ের উক্তি নয়, সে পৌরুষ-পূর্ণ কণ্ঠে স্পষ্ট স্পষ্ট করে' বল্‌লে—"হাঁ পার—আমি পুরুষ, সে ভয় আমার নেই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি মনে করেছ, আমি তোমার খেলার সামগ্রী? নারীর এ স্পর্দ্ধা কি বাতুলতা নয়, যে পুরুষকে ক্রীড়ার সামগ্রীরূপে দেখে? যে দিন থেকে বুঝেছি, তুমি আমায় ঘৃণা কর, আমি দূরেই সরে' ছিলাম। আদর অনুরাগ দিয়েছ ডেকে, তোমার নিজের উদ্দেশ্য যদি তার ভিতর কিছু থাকে, সে উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে'ই, তুমি কি পার পাবে মনে কর? আমি জড় মাটীর মূর্ত্তি নয়, আমারও প্রাণ আছে, হৃদয় আছে, তাদের দাবী তুমি কি উপেক্ষা কর্‌তে পার্‌বে?"

জ্যোৎস্নার তেজস্বিনী মূর্ত্তি—এ কথায় নিষ্প্রভ মলিন হয়ে' গেল। কত দূরে এসেছে সে, তার পুণ্যভূমি জাহ্নবীতট ছেড়ে', এ কোন্ নরকের প্রান্তদেশে সে এসে পড়েছে অভিমানে অহঙ্কারে। একান্ত আপনার জনকে ব্যথা দিতে গিয়ে, সে যে পড়েছে আজ দুর্জ্জয় ব্যথার সমুদ্রে। এখানে যে আর কেউ নাই—তাকে রক্ষা করে। একথা প্রকাশ করারও ভাষা নাই, যে উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে' বলে—এত স্পর্দ্ধা ঐ পরপোষ্যকে সে দিয়েছে, নিজেরই অন্ধতায়, বুঝি আর ইহার প্রতিকার নাই, প্রায়শ্চিত্ত নাই। সে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে অপমানে যন্ত্রচালিত প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় নিজের ঘরে গিয়ে ঝনাৎ করে' খিল দিল। তিনকড়ি ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায়, কয়েক বার সেইখানে পদচারণ করে' মুষ্টিবদ্ধ হস্তে—ফটকে দাঁড় করান ছিল, মটরকার, সোফারকে গিয়ে বল্‌ল—"হাঁকাও লেক্ রোড।"

(ক্রমশঃ)

ডাক-ঘর

বিহারের স্বনামধন্য জাতীয় নেতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহার প্রসিদ্ধ ভ্রাতা মহেন্দ্র প্রসাদের মহাপ্রয়াণে সহানুভূতি-জ্ঞাপনের পত্রোত্তরে যে ইংরাজী লিখিত চিঠিখানি (২৫।৬।৩৪ ইং) পাঠিয়েছেন তার বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল।

"প্রিয় মতিবাবু—

আপনার সহানুভূতিসূচক পত্রের জন্য অকৃত্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার স্বর্গীয় ভ্রাতা যে কেবলমাত্র আমাদের সংসারের উপর্জ্জনক্ষম ও অবলম্বন ছিলেন তাহাই নহে, আমার স্বদেশ-সেবার সকল কর্ম্মের পশ্চাতে ছিল তাঁরই চালনা ও প্রেরণা। সেবার তরে তারও জীবন ছিল উৎসর্গীকৃত। বিহারে এমন কোন উল্লেখযোগ্য সৎকার্য্য ছিল না যা' তাঁর অকপট সেবায় প্রবৃদ্ধ হয় নাই এবং জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে যে কোন অবস্থার লোকই হউক না কেন তাঁর কাছে প্রার্থী হইয়া কোনোদিন বিমুখ হন নাই। তাঁহার মৃত্যুতে যে বিহার প্রদেশে বহু বন্ধু-বান্ধব ও বহু প্রতিষ্ঠান শোক প্রকাশ করিবে, ইহা অস্বাভাবিক নহে।

তাঁর মৃত্যুজনিত যে আঘাত আমি পাইয়াছি তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার নয়। সদ্যজাত শিশুকে মা যেমন বুকের স্নেহ দিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তেমনি করিয়াই তিনি আমাকে প্রীতি ও প্রেমে আবরিয়া রাখিতেন। মানুষের মৃত্যু সত্য ও স্বাভাবিক জানিয়াও অভিভূত না হইয়া পারি না। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। ইতি—

রাজেন্দ্রপ্রসাদ"

বিহারের একনিষ্ঠ সেবক ও কর্ম্মী বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বত্রই সুপরিচিত; কিন্তু স্বর্গীয় মহেন্দ্রপ্রসাদ বাঙ্গালীর নিকট তত পরিচিত না হইলেও, বিহারের অন্তর্জ্জীবন-গঠনে তাঁর অবদান অকিঞ্চিৎকর নয়। রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর পরলোকগত ভ্রাতার হাতে-গড়া—এ কথাটি তিনি স্বয়ং তাঁর পত্রে স্বীকার করিয়া মহেন্দ্রপ্রসাদের আজীবন নীরব সাধনাকে মর্য্যাদা দান করিয়াছেন ও তাঁর জীবনের অজ্ঞাত অধ্যায়টি বাঙ্গালীর কাছে সুস্পষ্ট করিয়া ধরিয়াছেন।

সুলেখিকা শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী আষাঢ়ের "প্রবর্ত্তক" পড়িয়া "প্রবর্ত্তকে"র সহঃ সম্পাদক শ্রীমান্ রাধারমণ চৌধুরীকে ২৯ শে জুন তারিখের চিঠিতে জানিয়েছেন—

"আষাঢ়ের 'প্রবর্ত্তকে'র জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পত্রিকাখানির ছাপা কাগজ সৌষ্ঠব সবই নিখুঁৎ এবং রচনাগুলিও যে মনোরম ও উপভোগ্য, একথা পাঠক মাত্রেই স্বীকার করবে। বিশেষ, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয়ের লেখার মধ্যে এমন একটা গভীর উদাত্ত ভাবের প্রেরণা পাওয়া যায়, যা অন্যের লেখায় দুর্লভ। আর এই কাগজখানি যে আধুনিক সাহিত্যের অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতা বর্জ্জিত, এটাও একটা বিশেষত্ব এর।

বাস্তবিক 'প্রবর্ত্তক' পড়ে' ভারী আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করি আমি এবং এই আনন্দে এতদিন বঞ্চিত ছিলুম বলে' অপশোষও হয় মনে।

আপনাদের আশ্রমের বিবরণ পড়ে' একবার স্বচক্ষে দেখ্‌বার জন্য স্বতঃই বড় আগ্রহ ও ব্যাকুলতা জাগে, কিন্তু এ অভিলাষ কখনও পূর্ণ হ'বে কি না কে জানে!"

— সমালোচনা —

জীবন-বাণী—শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। মূল্য ২৲ টাকা।

"জীবন-বাণী"—সুস্থ, যুক্তিপূর্ণ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়া এ জাতির সমস্যাগুলিকে অভিনব আলোকে দেখিবার ও দেখাইবার একখানি অত্যুৎকৃষ্ট আদর্শ গ্রন্থ। ইহাতে ১৭টী স্বতন্ত্র নিবন্ধ আছে, কিন্তু আগাগোড়া একটী মৌলিক চিন্তার অন্তরগূঢ় ফল্গুধারা প্রবাহিত, সবগুলি একত্র উক্ত নূতন দৃষ্টি ভঙ্গীটাই পাঠকের নিকট সুস্পষ্ট করিয়া ধরে—একটা অতি প্রয়োজনীয় বস্তুতন্ত্র স্বাস্থ্যপ্রদ চিন্তার আব্‌হাওয়া তাহার অন্তরে সঞ্চারিত করে। এই প্রবীণ ও বহুদর্শী মনীষী এবং সর্ব্বজন মান্য সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় ধর্ম্মে, সমাজে, সাহিত্যে, সর্ব্বত্র একই উদার, বস্তুনিষ্ঠ, শুচিশুভ্র জীবনের বাণী বহিয়া আনিতে চাহিয়াছেন, যাহা মানুষকে নির্ভয় করে, মোহ-মুক্ত করে, সুস্থ, সবল, শক্তিমান্ করিয়া তুলে। আচার্য্য বিজয়চন্দ্র যেমন সাহিত্য-সেবককে বলিয়াছেন, আমাদের বাঙলা ভাষা এমন না হয়, "যাহার গায়ে পুরুষত্বের জোর নাই, মনুষ্যত্বের তেজ নাই, সেই কাঁটা-বাছা, হাড়-বাছা, এমন মাংসপেশীশূন্য থল-থলে জেলীফিশের মত ভাষা, যাহা কেহ চিবাইতে পারে না, কেবল দাঁত এড়াইয়া গলায় ঢুকিতে চাহে—এই কোমলতার উপাসনায় পারলৌকিক ফল যাহাই থাকুক, আমাদের ইহজগতের সাহিত্যিক ফল অতি মন্দ"; তেমনি ধর্ম্মের উপাসককেও বজ্রকণ্ঠে ডাকিয়া কহিয়াছেন —"মোক্ষ-ধর্ম্মের মুক্তি দলন করিয়া মানুষে মানুষে বন্ধন চায়।" জীবন-সাধনায় তাঁহার এই স্পষ্ট অভিজ্ঞতার বাণীও মনুষ্যত্বের গৌরবে গৌরবিত বলিয়া শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ ও প্রণিধানের যোগ্য এবং সর্ব্বত্রই তাহা প্রযুজ্য—"ছাড় রুদ্র ভীতি, যাহাতে জন্মে দাসত্বের বুদ্ধি ও পশুত্ব; ছাড় এই অসম্ভব চেষ্টা যে জীবনের দুঃখ ও কঠোরতা এড়াইয়া পাইবে কেবল নিয়ত কোমলতার ভোগ। ...মানুষের শ্রেষ্ঠ সুখ যে সে নিয়ত পরিশ্রম করিয়া অর্জ্জন করিবে ও বাধা পায়ে দলিয়া শক্তিতে বর্দ্ধিত হইবে; আর অবিশ্রান্ত পর-সেবায় রত থাকিয়া জীবনের আনন্দের ফোয়ারা খুলিয়া নিবে।" এক দিকে, আভিজাত্য-দর্পী ব্রাহ্মণকে তিনি যুক্তি সহকারে বুঝাইতেছেন—"কর্ম্মের মাহাত্ম্যে ও স্বাধীন চিন্তায় মানুষের মনুষ্যত্ব বাড়ে—একটী জাতিবদ্ধ হইয়া সেই জাতির গুণ উত্তরাধিকারে পাইয়া নয়"; অন্যদিকে, তরল-চেতা সংস্কারকামীকেও সতর্ক করিতেছেন—"গোলামী বুদ্ধিতে পরের ঘরে ছোট হইয়া একটু স্থান পাওয়া অপেক্ষা নিজেদের মন্দির নিজেরা গড়িয়া নিলেই তো চলিতে পারে! অধিকার দিলে ব্রাহ্মণের উদারতা বাড়িতে পারে, কিন্তু যাহারা অধিকার চায় তাহাদের বাড়িবে গোলামী বুদ্ধি।"

বইখানি জাতির চিন্তায় সর্ব্বদিক্ দিয়া স্বাধীনতার ভাবোদ্দীপনে সহায়তা করিবে বলিয়াই আমরা দৃঢ়-বিশ্বাস করি। আমাদের আশা, এমনই সুস্থ, সবল সংস্কারমুক্ত চিত্তই একদিন সেই মহাবীর্য্যপ্রদ শক্তি আবিষ্কৃত এবং তাহা জীবন প্রয়োগ করিয়া ধন্য হইতে পারিবে, যাহা বহির্বিজ্ঞানের সহিত অন্তর্বিজ্ঞান, ইন্দ্রিয়ের সহিত অতীন্দ্রিয়েকে যথার্থ যোগসূত্রে সম্মিলিত করিয়া তুলিবে এবং ভারতের সনাতন ধর্ম্মবিশ্বাস ও জাতীয়তাকেই অভিনব সিদ্ধরূপ প্রদান করিবে।

Bengal Vaishnavism—৺বিপিনচন্দ্র পাল প্রণীত। প্রকাশক—মডার্ণ বুক এজেন্সী; ১০ নং কলেজ স্কোয়ার। মূল্য—২৲ টাকা।

এই উপাদেয় ইংরাজী বইখানি স্বর্গীয় লেখকের উক্ত ভাষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান। বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম্ম বাঙ্গালী

প্রতিভারই নিজস্ব ও অপরূপ সৃষ্টি এবং ভারতের সাধন-জগতে ইহার বৈশিষ্ট্য অনন্যসাধারণ ও সর্ব্বজনস্বীকৃত। এ যুগে, এই বিশিষ্ট দর্শন ও সাধনার যোগ্য দ্রষ্টা ও ব্যাখ্যাকার ছিলেন বিপিন চন্দ্র—এই গ্রন্থখানিতে তাহারই সুপরিণত পরিচয় পাওয়া যায়। বৈষ্ণব দর্শন লীলাবাদের মন্ত্রে ঝঙ্কৃত। ইহা জীবন-বাদেরই নামান্তর। বৈষ্ণব সাধনা শুষ্ক বৈরাগ্য-পন্থী নহে—ইন্দ্রিয়ধর্ম্মকে শুদ্ধ ও রূপান্তরিত করিয়া উহাকেই অতীন্দ্রিয় রস-সৃষ্টির উপকরণে পরিণত করার সুমঙ্গল প্রয়াস এই বৈষ্ণব ধর্ম্মেই খুব পরিস্ফুট ভাবে দেখা যায়। হিব্রুধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম বা মহম্মদীয় ধর্ম্মে যে প্রচেষ্টার একটু আভাস বা অঙ্কুর মাত্র দেখা যায়, বৈষ্ণব ধর্ম্মে তাহা পরিণত বিশিষ্ট আকার গ্রহণ করিয়াছে। এই জন্য এই সাধনার বাণী ও মর্ম্ম বর্ত্তমান যুগ-চিত্তের বিশেষ ভাবে অনুকূল ও সহায়ক—ভবিষ্যতের মানুষ ইহার অনুপ্রেরণা হইতে বঞ্চিত হইবে না। বিপিন চন্দ্রের লেখনী অতি যোগ্যতার সহিত এই মহতী বাণী ও অনুপ্রেরণাই সভ্য জগতের নিকট বহন করিয়া দিতে পারিবে। আমরা তাই এই গ্রন্থখানির প্রকাশ যুগোপযোগী বলিয়াই মনে করি।

প্রবর্ত্তক বিজয়কৃষ্ণ—৺বিপিনচন্দ্র পাল প্রণীত। প্রকাশক—প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, ৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৷৷০ মাত্র।

উক্ত লেখকেরই ইহা আর একখানি উপাদেয় পুণ্য-গ্রন্থ—যুগগুরু বিজয়কৃষ্ণের জীবন-চরিত। গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ বিপিন চন্দ্রের দীক্ষাগুরু ছিলেন; গুরুকে যে গভীর-গাঢ় আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগের চক্ষে দেখিতে হয় তাহা তাঁহার ছিল না তাহা নয়; কিন্তু শ্রদ্ধা যে ক্ষেত্রে ভক্তকে অন্ধ করে, গুরু সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান-দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ও রহস্যাবৃত করিয়া তুলে, সে ক্ষেত্রে ভক্তির অর্ঘ্য ঢালা সম্ভব হইলেও, সত্যের জ্বলন্ত চিত্র ফুটিয়া উঠে না। বিপিনচন্দ্রের ক্ষেত্রে ঠিক এই দোষটাই ঘটে নাই বলিয়া, গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের ন্যায় ভক্তি ও প্রেমের উপাসক প্রসিদ্ধ ধর্ম্মগুরুর অসংখ্য ভক্ত শিষ্যের মধ্যে যে কয়েক জন তাঁহার পুণ্য-জীবনী লইয়া বাঙলা সাহিত্য আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বিপিনবাবুর লেখা অপূর্ব্ব সত্যোপেত ও জিজ্ঞাসুর পরম উপভোগ্য হইয়াছে। গোস্বামীর জীবনচরিত উপলক্ষ; বইখানি যুগপ্রভাবে তির্য্যক্-গামী বাঙলার জাতীয় ধর্ম্মবুদ্ধি ও চিত্ত আবার কেমন করিয়া নিজের মণিকোঠায় ফিরিয়া আসিল তাহারই একখানি সুনিপুণ আলেখ্যচিত্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যুগের সাধনা ও সিদ্ধির একটা বিশেষ দিক্ প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণের মধ্যে ফুটিয়াছিল, তাঁহার জীবনসাধনা শুধু তাঁর নিজের একার নয়, বা একটী ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের বলিয়া ধরিয়া লওয়াও ঠিক নয়, তাহা ছিল সমগ্র জাতিরই আত্ম-সাধনার পরিচয় ও পরীক্ষা-স্থল—এই হিসাবে তিনি একজন জাতি-গুরু ও যুগমানবই ছিলেন, ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। মনীষী বিপিনচন্দ্র এই জাতি ও যুগ-সাধনার প্রতীক রূপে তাঁহাকে দেখিয়া ও চিনিয়া, বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে যে যুগ ও জাতির মর্ম্মেতিহাস প্রকট করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে ভক্তের শ্রদ্ধার্ঘ্য এই চিন্তা-সাধকের অভিনব পূজাঞ্জলী দ্বারা যে অধিকতর মহিমান্বিত ও গৌরবকর হইয়া উঠিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। "প্রবর্ত্তক বিজয়কৃষ্ণ" বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার হৃদয়ে ধর্ম্মগুরুর জীবন-কথানুশীলনের সঙ্গে দেশ ও জাতির মর্ম্মানুসন্ধানের পুণ্য জিজ্ঞাসা ও আত্মচেতনা জাগাইয়া তুলিবে, ইহা লেখকেরই যোগ্যতার পরিচয়। বইখানি সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিবে, ইহা আশা করা যায়।

নিষ্কর্ষ —
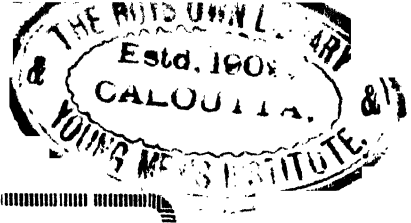
মহাত্মার মর্ম্মবাণী—

অজ্ঞাত আততায়ী কর্ত্তৃক পুণায় মহাত্মা গান্ধীর উপর অকস্মাৎ বোমা নিক্ষিপ্ত হওয়ায় ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্র-জীবনে যে কলঙ্ক লিপ্ত হইল, তাহা সত্যই দুরপনেয়। অপরাধী যেই হউক, এই শোচনীয় দুর্ঘটনায় আজ সমস্ত ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসী স্তম্ভিত, লজ্জিত, মর্ম্মাহত। জগতের শ্রেষ্ঠ মানব এই উপলক্ষে যে করুণ মর্ম্মবাণী ঘটনার অব্যবহতি পরেই প্রকাশ করেন তাহা তাঁরই উপযুক্ত। তাঁহার কথাগুলি চিরস্মরণীয় :—

"I have had so many narrow escapes in my life that this newest one dces not surprise me. God be thanked that none was fatally injured by the bomb and I hope, those who were more or less injured will be soon discharged from the hospital. I cannot believe that any sane Sanatanist could ever encourage the insane act that was perpetrated this evening. But I would like the Sanatanist friends to control the language that is being used by the speakers and writers claiming to speak on their behalf. The sorrowful incident has undoubtedly advanced the Harijan cause. It is easy to see causes prosper by martyrdom, but if it comes my way in the prosecution of what I consider to be my supreme duty in defence of the faith I hold in common with millions of Hindus, I shall have well earned it and it will be possible for the historian of the future to say that the vow that I had taken before the Harijans that I would, if need be, die in the attempt to remove untouchability was literally fulfilled. Let those who grudge me what yet remains to me of this earthly existence, know that it is the easiest thing to do away with my body. Why then put in jeopardy many innocent lives in order to take mine which they hold to be sinful? What would the world have said of us if the bomb had dropped on me and the party which included my wife and three girls, who are as dear to me as daughters and are entrusted to me by their parents? I am sure, no harm to them could have been intended by the bomb-thrower. I have nothing but deep pity for the unknown thrower of the bomb. If I had my way and if the bomb-thrower was known, I should ask for his discharge as I did in South Africa in the case of those, who successfully assulted me. Let the Reformers not be incensed against the bomb-thrower or those who may be behind them. What I should like them to do is to redouble their efforts to rid the country of the deadly evil of untouchability."

এই ঘোষণা-পত্রের সহিত, সাংবাদিকগণের প্রশ্নোত্তরে তাঁহার নিম্নলিখিত কথাগুলিও বড় করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী :—

"After all, what is happening in the case of untouchability is but a repetition of the history. No reform worth the name has ever been accomplished without the Reformer holding his or her life at stake for his or her cause and if the moloch of untouchability takes one life, it may be regarded as an easy satisfaction. Age-long evil masquerading in the name of virtue cannot be removed without an adequate measure of sacrifice. I am a believer in the all-powerfulness of God and so long as He wants me in the present body to do his cause, He will protect me against all harm and when it has no use for him, not all the protection that earthly power can give me will be of slightest avail."

এই প্রসঙ্গে তাঁহার হিংসা-পন্থা সম্বন্ধীয় সতর্ক-বাণীও গভীর-ভাবে প্রণিধান-যোগ্য :—

"When I returned to India in 1915, I had prophesied that if the Bomb found habitation in this land, it would not be restricted to that cause alone. That prophecy has more than once proved true. I would like further at this juncture to drive the truth home that if we are following violence in thought or word, it must some day or other assume a concrete form and it is not capable of being restricted to what one may call a good cause alone."

তন্ত্র-ধর্ম্ম —

শিল্পী প্রমোদকুমার সহযোগী "উত্তরায়" তন্ত্রপ্রসঙ্গে যে ধারাবাহিক সন্দর্ভ প্রকাশ করিতেছেন, তন্মধ্যে জ্যৈষ্ঠের

সংখ্যায় প্রকাশিত অংশে অনেকগুলি চিন্তনীয় তথ্য পাওয়া যায়। তন্ত্র সম্বন্ধে এগুলি খাঁটি অভিমত বলিয়াই আমরা মনে করি।

তন্ত্রের সাধনা একটা বিরাট্ সাধনা। এই সাধনার মূল-তত্ত্ব এই কথায় বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে—

"তন্ত্রমতের ধর্ম্ম জীবন দৈনন্দিন জীবনের সবটা লইয়াই। ধর্ম্ম বা অধ্যাত্ম ও কর্ম্ম পৃথক্ ব্যবহারের ব্যাপার নয়। ধর্ম্ম জীবনময়, ইহাই তন্ত্র মতের প্রকৃষ্ট অন্তর্নিহিত সত্য।"

লেখকের এই মন্তব্যটীও চিন্তার যোগ্য—

"সোভিয়েট রাষ্ট্রের জন্ম, যাহার ফলে সভ্যজগতে বিবাহব্যাপার লইয়া একটা ভয়ানক আন্দোলন, তাহা সম্প্রতিই হইয়াছে। কিন্তু নরনারীর স্বাভাবিক অধিকার এবং কল্যাণময় তন্ত্র-মতের বিবাহ-বিধি আজ কত শত যুগ পূর্ব্বে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। আমাদের বিদ্বান্ শিক্ষিত সমাজের মানুষ আধুনিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান তন্ত্র সম্বন্ধে কেহই করেন নাই। দুই চারি জন ইউরোপীয় পণ্ডিত যাহা করিয়াছেন তাহার মূল্য অন্য দিক্ দিয়াই নিরূপণ করিতে হয়; ভারতবাসী কেহ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তন্ত্র সম্বন্ধে এখনও পর্য্যন্ত কোনও অনুসন্ধান করেন নাই বলিয়াই জানি। এখনও যাহা হয় নাই, কখনও যে তাহা হইবে না তাহাও তো বলা যায় না। তবে আশায় থাকা ভাল।"

তার পর,

"পূর্ণ স্বাধীন এবং শক্তিমান্ সমাজ না হইলে তন্ত্রের মত ধর্ম্মের জন্মলাভ সম্ভব নয়।"

এ মতটীও সমীচিন।

লেখক বনচারী "অঘোরী" মহাপুরুষের কাছেই শুনিয়াছেন—

"তন্ত্র ভারতের ধর্ম্ম বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণদের নয়; আসল তন্ত্রের সাধনা ও শাস্ত্রগ্রন্থ উভয়ই এখন পাওয়া যায় না। সংস্কৃত ভাষায় আগম, নিগম, তন্ত্রসার, তারপর ৩৬৫ খানা তন্ত্রের যে বই, সে সব বেদাচারের ছাঁচে গড়া ব্যভিচারী ব্রাহ্মণদের সুবিধামত শিষ্য যজাবার জন্যে তৈরী। ভাষা দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারা যায় যে কত হাল্কা বাংলার ছাঁচে, আসলে সাংখ্য, পাতঞ্জল, উপনিষদ্, বেদান্তের ভাব সব হুবহু নকল ছাড়া আর কিছু নাই। শিব আর পার্ব্বতী, ঈশ্বর বা ঈশ্বরী, বক্তা বা শ্রোতা—ঠিক যেন মহাভারত লেখার ছাঁচ নয় কি? মহাভারতের পর আর বৈদিক ব্রাহ্মণদের গুমোর কর্‌বার মত ধর্ম্ম-সংক্রান্ত একখানিও বই রচিত হয়েছে কি? যা কিছু হয়েছে সব ঐ ছাঁচ বা নকল মাত্র।"

সঙ্কেতগুলি মূল্যবান্।

তা'-ছাড়া তন্ত্রগুরু, অনার্য্যনায়ক, রসায়ণপ্রবর্ত্তক ও মৃতসঞ্জীবনীর আবিষ্কারক এবং বিশিষ্ট যোগপদ্ধতির ঋষি ও প্রচারক "শিব" সম্বন্ধে 'অঘোরী'-মুখনিঃসৃত কথাগুলির মূলে কি সত্য নিহিত আছে, তাহাও সুধীগণের অনুসন্ধেয়।

পঞ্জিকা-সংস্কার—

এদেশীয় শাস্ত্র-ব্যবসায়ী পঞ্জিকাগণের মিথ্যা, ভ্রান্তি ও চালবাজি ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া শ্রীজ্যোতিঃ বাচস্পতি জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আষাঢ়ের "বিধিলিপিতে" তিনি এ অনর্থের যথার্থ প্রতিকার সম্বন্ধে এই প্রস্তাব করিয়াছেন—

"গ্রহণের ব্যাপার বিনা শিক্ষায় ও বিনা চেষ্টায় প্রত্যেক লোকে দেখ্‌তে পায় ও মেলাতে পারে, সেই জন্য শাস্ত্র হিসাবে গণনায় যাই আসুক, পঞ্জিকাকারকে সেই সময়েরই নির্দ্দেশ কর্‌তে হয় যা দৃক্-সিদ্ধ অর্থাৎ প্রত্যক্ষের সঙ্গে মেলে। শিক্ষার দ্বারা লোকে যখন তিথি নক্ষত্র সম্বন্ধেও এই রকম জ্ঞানলাভ কর্‌বে, তখন আর তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন হ'বে না—সকল পঞ্জিকাকে বাধ্য হয়ে দৃক্-সিদ্ধ তিথি, নক্ষত্র প্রভৃতি দিতে হ'বে। কাজেই আমরা যদি পঞ্জিকার-সংস্কার কর্‌তে চাই, তা' হ'লে সাধারণকে এ সম্বন্ধে শিক্ষিত ক'রে তোলা দরকার এবং যাতে স্কুল কলেজে এই ব্যাপারগুলি অবশ্য শিক্ষণীয় হয়ে দাঁড়ায় তার চেষ্টা করা প্রয়োজন।"

প্রস্তাবটী গ্রহণযোগ্য এবং গৃহীত হইলে, শুভ ফলই প্রসব করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

আমাদের "মত ও পথ"

আমাদের কোন এক বিশিষ্ট বন্ধু জানাইয়াছেন—"প্রবর্ত্তকের 'মত ও পথ" পূর্ব্বে উপভোগ্য ছিল, শুধু উপভোগ্য নহে, সেই সকল মতামতের উপর কাহারও কলম চালাইবার সাধ্য ছিল না। কিন্তু সহসা তাহা স্তম্ভিত হইল কেন ?"

মনে করিয়াছিলাম, "মত ও পথের" প্রবাহ ক্ষীণ-রেখায় বজায় রাখিয়াই চলিব; ইহার কারণ কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন না। কিন্তু প্রশ্ন যখন উঠিয়াছে, তখন তাহার উত্তর দিতে হইবে।

দেশের মতামত দিবার বিষয় উপস্থিত আর কি আছে? যাঁহারা জীবন-সংগ্রামে প্রবুদ্ধ তাঁহারা মতামতের কোনই প্রতীক্ষা রাখেন না; স্বভাব বশে আজ সকলেই চলিয়াছে একরোকো জন্তুর ন্যায় সবেগে, কোন কথায় কাণ দিবার অবসর কাহারও নাই, আর কেহ তাহা প্রয়োজন বলিয়াও স্বীকার করে না। বিপ্লবী যে সেও যেমন মতামতের তোয়াক্কা না রাখিয়াই ছিন্নমস্তার ন্যায় আত্মহারা; সমাজতান্ত্রিক, রাষ্ট্র-সাধক, সনাতনী সকলেই চলিয়াছেন নিজ নিজ বুদ্ধি বিবেচনার উপর ভর করিয়া স্ব-স্ব-গতিতে। দেশে যখন এইরূপ অবস্থা তখন আমরা কোন কিছুর উপর বর্ত্তমানে অভিমত প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় মনে করি না। বাংলা দেশে আজ কোন ব্যষ্টি অথবা সমষ্টি সমগ্র জাতির হিতকল্যাণ-প্রচেষ্টায় যে স্থিরচিত্ত, সে বিষয়ে আমরা নিঃসংশয় নহি। আজ আমরা স্বার্থমদে মাতাল হইয়া ছুটিয়াছি নিজের অথবা স্বদেশের পুষ্টি ও বৃদ্ধির কামনায়। এই অবস্থা স্বভাববশে আসিয়াছে, স্বভাবের প্রেরণাই পুনরায় অবস্থান্তর আনিবে। জাতির এই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র তির্য্যক্ পথে অভিযান অন্ধতা বশতঃ হইয়াছে—যে দিন ইহা রুদ্ধ হইবে, সেদিন 'কঃ পন্থা' বলিয়া সকলের কণ্ঠেই চীৎকার উঠিবে। যাহা আমরা ভাবি নাই, যে পথে চলি নাই, সেই অভাবনীয় নূতন পথের নির্দ্দেশই হয়ত সেদিন চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিবে। আজিকার যাত্রীদলের স্তম্ভিত গতি এই নূতন পথে যখন পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইবে—যে পথ সত্যই জাতির কল্যাণ ও শ্রেয়ের পথ—তখন আবার আমরা উহা লইয়া সোৎসাহে "মত ও পথের" আলোচনা করিব।

ইহার উপর প্রশ্ন উঠিতে পারে—আমরাই বা কোন্ পথে চলিয়াছি? আমরাও ত এই জাতীয় গোলযোগময় গতির যুগে অব্যর্থ পথের সন্ধান না পাইয়াও থাকিতে পারি, অন্য সকলের ন্যায় আমরাও ত সমদুর্দ্দশাগ্রস্ত! ইহার উত্তর নাই। এই ক্ষেত্রে নীরব থাকাই আমরা শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছি। তবে আমরা যে পথে চলিয়াছি, সে পথের পরিচয় দিতে আমরা কুণ্ঠা করিব না। সেই পথই যে জাতীয় মঙ্গল-সাধনের অব্যর্থ অদ্বিতীয় পথ, তাহা আমরা বলিতে চাহি না; তবে অন্য অনেকের ন্যায় আমরাও চলিয়াছি কোন এক বিশিষ্ট পথে—আমাদের মনে হয়, এই পথে কোন দিন আমাদের স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইতে হইবে না। কেন, তাহা বলিতেছি।

চলিয়াছি কোথায়, কোন্ পথে—আমাদের পরিচয় আমরাই দিতে পারি। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, অধুনা এমন অদ্ভুত আচরণ দেখা যাইতেছে, কেহ তাহার নিজের পরিচয় যদি দেয়, সে পরিচয় লোকে গ্রাহ্য করে না। একের পরিচয় অন্যের মুখ হইতে শুনিয়া তাহাই অবধারিত সত্য বলিয়া গ্রহণ করার রীতি এ যুগে প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ বিশ বৎসর ধরিয়া "প্রবর্ত্তকে" যাহা লিখিলাম, তাহা নিজেদেরই কথা, আত্মপরিচয়; কিন্তু সে কথা কেহ প্রত্যয় করিতে চাহে না—বরং তাহারই কথা আমাদের সত্য পরিচয় হয়, যাহার সহিত আমাদের আদৌ পরিচয় হয় নাই, অথবা এমন ক্ষীণ পরিচয় আছে যাহা পরিচয় বলিয়া স্বীকার করিতেও বাধে। অর্ব্বাচীন যুগের ইহা এক অভিনব আচরণ।

নিরর্থক হইলেও, আত্মপরিচয়ের সুর নীরব হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। বহিরাবরণের কঠিন স্থূলত্ব বিদীর্ণ করিয়া মর্ম্মগাথা একদিন প্রকাশিত হওয়ার আশা আছে বলিয়াই আপনার পরিচয় আপনাকে দিয়া যাইতে হইবে।

দেশে যে সকল প্রতিষ্ঠান আছে রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম্ম, শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে "প্রবর্ত্তক"-সঙ্ঘও এই-গুলির মধ্যে অন্যতম—ইহাতে সংশয় করিবার কিছু নাই। কিন্তু তাহার লক্ষ্য সম্বন্ধে অন্যের যে সংশয়, তাহা দূর করার একমাত্র উপায় আমাদের কথা আমাদের মুখ হইতে শ্রবণ করা ও আমাদের গতি ও কর্ম্মের ভঙ্গী অনুধাবন করা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? আমরা এই দীর্ঘ বিশ বর্ষ যাহা বলিয়াছি তাহা প্রাণপণে মূর্ত্ত করিয়া ধরার সাধনাও করিয়াছি—কোথাও আমাদের যত্ন ও অধ্যবসায় ব্যর্থ হইয়াছে, কোথাও সার্থক হইয়াছে; কোথাও সংশয়-চক্ষে আমাদের আকৃতি-প্রকৃতি কালিমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, কোথাও প্রত্যয়ের দৃষ্টিতে আমরা ফুটিয়া উঠিয়াছি অবিকৃত ভাস্বর মূর্ত্তিতে। এই সকল দ্বন্দ্বানুভূতি ও দৃষ্টি গতিকে ক্ষুণ্ণ করে নাই, বরং বেগ বৃদ্ধি করিয়াছে।

আমরা চলিয়াছি কোন্ পথে?

চিরকালের সেই একই কথা উচ্চারণ করিয়া বলিব—ভারতের অধ্যাত্মজীবনের ভিত্তির উপর জাতির অস্তিত্বকে উঠাইয়া লওয়ার চিরন্তন স্বপ্ন দেখিয়াই আমরা ছুটিয়া চলিয়াছি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মত ক্লান্তিহীন অবিরাম গতিতে। ভাব ও ভাষা অতিক্রম করিয়া বাস্তব কিছু করিতে যদি অক্ষম হইতাম, দেশবাসীর নিকট আমাদের লক্ষ্যের কথা বুঝাইবার প্রয়াস পণ্ডশ্রম বলিয়া মনে হইত। স্বপ্নের সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নকে জীবনে ফলাইয়া তোলার দীর্ঘ তপস্যা আমরা কোন দিন ক্ষুণ্ণ করি নাই।

অধ্যাত্মজীবনের ভিত্তি অর্থে যে অভিব্যক্তি তাহা যদি মানুষের কাছে অস্পষ্ট ও কুহেলিকাচ্ছন্ন হয়, সে দোষ আমাদের নহে। আমরা গীতা পড়ি, আমাদের দেশ গীতার দেশ, আমাদের দেবতা মূর্ত্ত মহামানব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। "অধ্যাত্ম" শব্দের অর্থ বুঝিতে যদি আমরা অসমর্থ হইয়া থাকি, তাহা দেশেরই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। আমরা নিজের শিক্ষা সভ্যতার ধারা হইতে বিচ্যুত হইয়া দারুণ অধঃপতনের সীমায় উপস্থিত; তাই নিজের ভাষা ও ভাব আমাদের নিকট দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালী বলিয়া মনে হয়, ইহা আমাদের প্রণিধান করিতে হইবে।

"স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে", স্বভাব অধ্যাত্ম শব্দে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু এই স্বভাব আমাদের বর্ত্তমান স্বভাব নহে। বর্ত্তমান স্বভাব রাক্ষসী, আসুরী, স্বার্থপরতন্ত্র ও অহঙ্কারযুক্ত। এই প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত দৈবীপ্রকৃতিতে আশ্রিত জীবাত্মাকে 'অধ্যাত্মচেতাঃ' বলা যাইতে পারে। এই অবস্থা সাধ্য; উহার সাধনা ভগবানে আত্মসমর্পণ। এই আত্মসমর্পণ-সাধনার কথা আমরা নানা ছন্দে ও ভঙ্গীতে 'প্রবর্ত্তকে' প্রচার করিয়াছি এবং একদল মানুষ সেই সাধনার পথে অগ্রসর হইয়া সাধ্যের সন্ধান পাইয়াছে। এই দুর্গম পথ অল্পকাল মধ্যে অতিবাহিত করিবার নহে, দীর্ঘ দিন ধরিয়া চলিতে হইবে। অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জীব-স্বভাব স্খলিত হইতে থাকে, দৈবপ্রকৃতির আবির্ভাব সঙ্গে সঙ্গে অনুভূত হয়। এই অধ্যাত্মক্ষেত্রের উপর যে পরিমাণে অধিকার-লাভ হইবে, সেই পরিমাণে মানুষের কার্য্য নহে, ভগবানের ইচ্ছাই কর্ম্ম রূপে বিগ্রহান্বিত হইবে। আমরা মনে করি, আমাদের অভীষ্ট কোনদিন পূর্ত্তি পাইবে না, ঈশ্বরের ইচ্ছাই জয়যুক্ত হইবে। এই ঈশ্বরেচ্ছার সন্ধান তখনই মিলে, যখন মানুষ তাহার পুরাতন স্বভাবকে পরিত্যাগ করিয়া এই 'অধ্যাত্ম' নামে দিব্য স্বভাব প্রাপ্ত হয়।

সকলেই বলেন—ভারত ধর্ম্মের দেশ, ভারতের ইষ্টমূর্ত্তি ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করিয়াই হইবে। ভারতের ধর্ম্মগ্রন্থ বেদ, উপনিষদ্, গীতা প্রভৃতি; ভারতের ধর্ম্ম ঋষি, যোগী, ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক বিধৃত—কিন্তু দুখের বিষয়, ইহা কথা মাত্র, বস্তুতঃ ইহার কোন সন্ধান কোন ক্ষেত্রে মিলে না। ধর্ম্ম কি, এই প্রশ্নের উত্তরে 'ধৃ' ধাতু 'মন্' এই বৈয়াকরণিক ধাতু-প্রত্যয় মানুষের মনকে আর প্রবোধ দেয় না। বাক্য লইয়া মানুষের আলোচনা করার দিন শেষ হইয়াছে। বস্তুর অভাবেই আসিয়াছে; নিদারুণ দৈন্য; আর সেই দারিদ্র্যের পীড়নে আমরা অবসন্ন মুমূর্ষু। ধর্ম্ম বলিতে তাই বস্তুকে আমরা আর না ব্যর্থ করি। ভাব-সাধনার ধৈর্য্য আর আমাদের নাই।

ধর্ম্ম বিগ্রহান্বিত হইয়াছে ভগবানে। ভগবান জীবের কাছে ইষ্টস্বরূপ লক্ষ্য হইয়া উপস্থিত হন। যুগে যুগে শাশ্বত ধর্ম্মকে আমরা মূর্ত্ত হইতে দেখি জীবনে, তাই

বাণীর প্রেরণা আজও বিফল হয় নাই। কিন্তু সংশয়ী মন তাহা ধরিয়া রাখে কৈ? সেই একই কথা উদ্গীত হয়

"মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্"

—সেই অজ অব্যয় ধর্ম্ম যে জীবন্ত হইয়া দেখা দেয়, মূঢ়তা বশতঃ তাহা না জানার ফলে বস্তুপ্রাপ্তির অভাব ঘুচে না, মণিহারা ফণির ন্যায় আমরা কাতর ও বঞ্চিত হই। সে সমষ্টি-প্রাণ একটা বিপুল জাতি যদিও হয়, যারা চায় ধর্ম্মের ভিত্তি, তারা ইহার অভাবে জন্ম জন্ম গতায়ুঃ হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? আজ বাংলাদেশে মানুষ অন্ততঃ সত্যানুকরণে স্থানে স্থানে এইরূপ ইষ্ট-মূর্ত্তিকে আশ্রয় করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে, আর এই জন্যই মতামতের ঢক্কা-নিনাদ কার্য্যতঃ ফলবর্ষণ করিবে না—কেন না, অজাগ্রত প্রাণ আজ মতামতের আলোচনায় কালক্ষেপ করে; জাগ্রত প্রাণশক্তি ইষ্ট-কেন্দ্রে মণ্ডল-নির্ম্মাণে সাধনারত। অভীষ্টের প্রকার-ভেদ সর্ব্বত্রই; কিন্তু অধ্যাত্মচেতনায় উন্নীত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় জাতি মণ্ডলে মণ্ডলে কেন্দ্রবদ্ধ হইতেছে।

"প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ" এইরূপ একটী কেন্দ্র-শক্তি। জাতি-সাধনার প্রান্তদেশে আসিয়া সে দেখিয়াছে, এ জাতির মুক্তি ঈশ্বরলাভ ব্যতীত অন্য কিছুতে নহে; জাতিকে সে তাই ঈশ্বরসান্নিধ্যে লইয়া আসিতে চাহে। আদর্শ ও নীতি অভিনব নহে, যুগে যুগে কোথাও কোনও ধর্ম্মক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই; কিন্তু বস্তুলাভ লইয়া যে মত ও পথের অবতারণা তাহার ব্যতিক্রম সর্ব্ব যুগেই পরিদৃষ্ট হয়।

এমন দিন ছিল, যে দিন রণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া এই ধর্ম্ম-বিজ্ঞান অস্ত্র-ঝন্‌ঝনার সহিত প্রচারিত হইত; এমন দিনও গিয়াছে, যেদিন নৈমিষ্যারণ্যে ঋষিগণ মণ্ডলীবদ্ধ হইয়া বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করিয়া ডাকিয়া আনিয়াছে যজ্ঞ-ক্ষেত্রে বেদমন্ত্র-প্রচারে। এমন দিনও আসিয়াছিল, যে দিন ভিক্ষাপাত্র হাতে ধর্ম্মের বিগ্রহ পথে পথে উন্মাদের ন্যায় ধর্ম্মের শাশ্বত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভ্রমণ করিয়াছেন।

সেদিনও দেখি, মুণ্ডিতমস্তক মহাত্মা শঙ্কর গৈরিক-ধ্বজা উড়াইয়া এই সনাতন-মন্ত্র-প্রচারে ভারতের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন; আবার জাহ্নবীর কূলে কূলে সমুচ্চ রোল তুলিয়া মহাতাপস সেই একই মহাঋক্ উচ্চারণ করিতেছেন শ্রীচৈতন্য-রূপ বিগ্রহ-মূর্ত্তি ধরিয়া—সে ধ্বনি জাতি-নির্ব্বিচারে মানুষের কাণে গিয়া পৌছিয়াছে, "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘও" শুনিয়াছে সেই শাশ্বত যুগের মহাবাণী; সেও প্রচার করিবে সেই একই বেদ-মন্ত্র সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায়—কিন্তু সেদিনের মত কুরুক্ষেত্র তাহার প্রচার-কেন্দ্র নহে। ভারতের পথের ধূলায় লুটাইয়া আর্ত্ত কণ্ঠে মর্ম্মবাণী চীৎকার করিয়া বলার তার সুযোগ নাই, অধিকার নাই। তাল-মান-লয়-ছন্দে সুমধুর সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা তুলিয়া সে বাণীপ্রচারের আদেশ সে পায় নাই—সে আজ ছুটিয়াছে কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে যেখানে মানুষ বাহ্য চেতনার তাড়নায় উদরসংস্থানের আকুলতায় বাতুলের ন্যায় হাহাকার করিতেছে; সে ছুটিয়া চলিয়াছে কৃষকের কর্ম্মক্ষেত্রে স্কন্ধে হল বহন করিয়া, সে অন্ন-সমস্যার সর্ব্ববিধ ক্ষেত্রে গিয়া সর্ব্বকর্ম্মে সহযোগীর অধিকার লইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাদের কাণে কাণে চেতনার সেই বাণী ফুকারিয়া দিতে—যে বাণী সনাতন যুগের অমৃতময় মন্ত্র, যে বাণীশ্রবণে মানুষ চীৎকার করিয়া উঠিবে—"নষ্টঃ মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা," পরিপূর্ণ শান্তিতে প্রফুল্লচিত্তে গলা ধরিয়া মর্ম্মকথা ব্যক্ত করিবে—"স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ", আর শুনাইবে—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"।

অতএব আজ আমাদের অহংকার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে হইবে, দেহ-রক্ষার জন্য যে প্রয়োজন এক মুষ্টি অন্ন আর এক খণ্ড কটিবস্ত্র তাহাই শ্রেয়ঃ করিতে হইবে। শান্ত ও প্রসন্ন চিত্তে শোক-দুঃখের সীমা ছাড়াইয়া এই অধ্যাত্মক্ষেত্রে আসিয়া আমাদের উপনীত হইতে হইবে। আকাঙ্ক্ষা রাখিলে চলিবে না, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিপরায়ণ হইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে হইবে—'হে সন্ন্যাসী ভারত! এই অমৃত-প্রসাদ, এই শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হও। সর্ব্বকর্ম্ম করিয়াও তুমি মুক্ত-বন্ধন। তোমার উপবনে পারিজাত কুসুম ফুটিয়া উঠিবে, মন্দার-মালায় কণ্ঠ তোমার বিভূষিত হইবে, স্বর্ণহার-বলয়ে এ-জাতির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমলঙ্কৃত হইবে, স্বর্ণ-প্রাসাদে বিস্তৃত রাজবর্ত্ম শোভাশালী হইবে। জাতির আশ্রয় যেখানে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, সেখানে সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও মাধুর্য্য প্রকাশ পাইবে। এই হেতু শিক্ষা ও

অর্থসংস্থানের ক্ষেত্রই বর্ত্তমান যুগের ভাগবতবাণীপ্রচারের মহাতীর্থ। এই তর্জ্জনীসঙ্কেত ভগবান স্বয়ং দেখাইয়াছেন। তাই ঈশ্বরে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ সঙ্ঘসেবকগণ ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিতেই উদ্যতপ্রাণ—তাহাদের গৃহ নাই, পুত্র কলত্র নাই, মোক্ষ মুক্তি নাই, স্বরাজ স্বাধীনতা নাই; আছে সেবা, আছে আনুগত্য, আছে কণ্ঠে অমর মহিম্ন-সঙ্গীত—জগদীশ্বরেরই ইহা জয়ঘোষণা। এই আমাদের মত, এই আমাদের পথ; আর এই "মত ও পথের" সন্ধান দিতেই "প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে"র জন্ম ও জীবন। অন্যের মতামতে বুদ্ধিভেদ সৃষ্টি করা আর যেন মনে হয় শক্তি ও সময়ের অপচয়, লঘু ও তরল মনের উহা ভোগসাধন। ঈশ্বর-পথের যাত্রী যে তার আর ইহাতে প্রয়োজন নাই। এবং এই পথে ও এই সাধনায় 'প্রত্যব্যায়ো ন বিদ্যতে; সুতরাং এ গতি বিরামহীন যাত্রা।

নূতন মেয়র

কলিকাতা কর্পোরেশনের নব-নির্ব্বাচিত মেয়র শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ও ডেপুটি মেয়র শ্রীযুক্ত বি, এন, চৌধুরীকে আমরা অভিনন্দিত করি। তাঁহারা তাঁহাদের এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যে সাফল্যমণ্ডিত হইয়া গৌরবময় কলিকাতা মহানগরীর স্বাস্থ্য-শ্রী-ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করুন—ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। আশা করি কর্পোরেশনের সকল সভ্যই অতীতের ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থ ও মতভেদ মুছিয়া ফেলিবেন এবং একযোগে সমষ্টি-কল্যাণে উদ্বুদ্ধ হইয়া বাংলার মুখোজ্জ্বল করিবেন। কলিকাতার প্রধান নাগরিকদ্বয়কে আমরা আবার আমাদের সাদর অভিনন্দন জানাইতেছি।

মেয়র—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার

ডেপুটী মেয়র—শ্রীযুক্ত বি, এন, চৌধুরী

স্বার্থের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন সকল সময়ে সম্ভব হয় না। তাই রাষ্ট্রের কল্যাণ, জাতির বৃহত্তর স্বার্থের দোহাই পাড়িয়া অগ্নি-নালিকার নিষ্ঠুর শাসন অবলম্বন করা হয়। নাজী-শাসনের বিগত দুই বৎসরের ইহুদী-ও-কমিউনিষ্ট-দলনের নৃশংসতা বাহিরের সভ্য মানব-সাধারণের নিকট বর্ব্বরোচিত বলিয়াই সর্ব্বকালে বিবেচিত হইবে। এই সেদিনকার মিউনিক ও বার্লিনের প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতা ও অমানুষিক নির্ম্মম ঘটনাবলী—তুফান-বাহিনীর নেতা ক্যাপ্টেন আর্ণেষ্ট রোয়েম, জার্ম্মাণীর ভূতপূর্ব্ব চ্যান্সেলার ভন শ্লেচার প্রভৃতির মত বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের, নিরপরাধ নর-নারীর এবং আরও বহু সৈনিকের বিচারের অভিনয় মাত্র না করিয়া জীবনাবসান ও ইহার সমর্থনার্থ সংবাদপত্রের মুখবন্ধ, রাষ্ট্র

দিনর মুসোলিনী

ক্ষমতার সুব্যবহার-অপব্যবহার ইত্যাদি স্বপক্ষ-বিপক্ষের সত্য-মিথ্যা বিচিত্র সংবাদ জার্ম্মাণীর বাহিরের জগৎকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিয়াছে। সমালোচনা মানুষ করিবেই, চিরদিন করিয়াছেও। নাজী-নেতার মুখের কথায় সবখানি বিশ্বাস না করিলেও, জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান উত্তেজনার কারণ সুস্পষ্ট—উহা খুঁজিতে কোন অনুমানের প্রয়োজন হয় না। তবে সে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড কোন মতেই নিরপেক্ষ মানবতার চক্ষে সমর্থিত হইতে পারে না। সৃষ্টির প্রথম প্রভাত হইতে মানুষের প্রতি মানুষের এ বিজিগীষা-হিংসার অভিনয় কোনদিন স্তব্ধ হয় নাই। জাতির বৃহত্তর স্বার্থের জন্যই নাজী-দলের এই সমস্ত গর্হিত আচরণ যদিও সংঘটিত হইয়া থাকে, তবুও জার্ম্মাণ-জাতির ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার ইহা শ্রেষ্ঠ পথ নহে। আর ব্যষ্টির বা দলগত দাম্ভিকতায় মোহান্ধ হইয়া যদি এ নারকীয় লীলা অভিনীত হইয়া থাকে তবে হিটলারিজম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরদিন মসীলিপ্ত হইয়াই থাকিবে। কিন্তু সে বিচার করা বৃথা। বিশুদ্ধ রাষ্ট্র-চেতনা আজ কোথায়? শাসিত-শাসক, হন্তা-হত উভয়েই হয়তো একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত। হিটলার ও তার সমধর্ম্মী জেনারেল গোয়েরিং যেমন জাতীয় স্বার্থকে নিষ্কলুষ করিবার প্রেরণা বুকে ধরিয়াই এই কলঙ্কিত কার্য্যকলাপে উৎফুল্ল ও গর্ব্বিত তেমনি ঐ একই

লেনিন
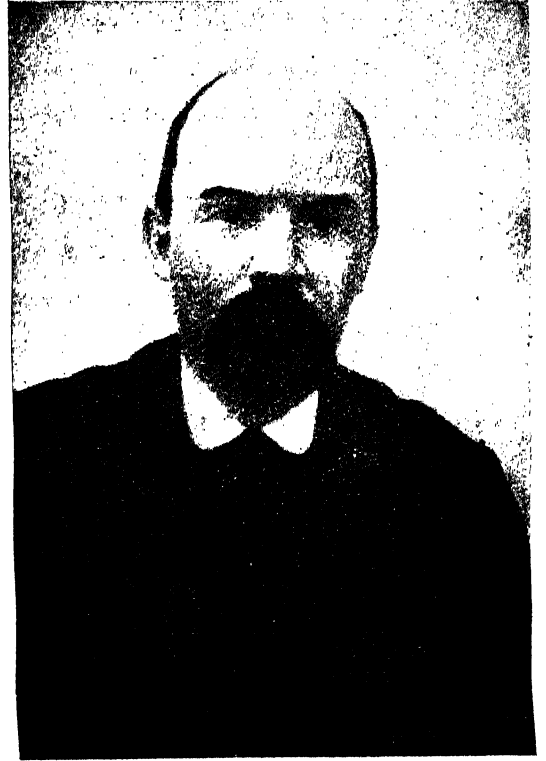
চেতনাই হয়তো নিহত শ্লেচার-রোয়েমকে মরণের মাঝেও তৃপ্তি দিয়াছে। চেতনার কম-বেশী লইয়া বিচার চলে না! জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান রাষ্ট্র-পরিস্থিতি বিবেচনায় হিটলারের কার্য্য-কলাপ কতদূর সমর্থনীয় তাহাও আজ বুঝিবার উপায় নাই। ৩০শে জুনের নারকীয় রক্তোৎসবের সম্বন্ধে হিটলারের নিজের কথা—"That a hundred mutineers and conspirators were destroyed than that tens of thousands of innocent

persons should bleed to death". শান্তির দূত খৃষ্টের প্রচারিত প্রেম ও অহিংসার উত্তরাধিকারীর সভ্যতার মনোবৃত্তি মাটি ও আব্‌হাওয়ার গুণেই বোধ হয় ইহা ছাড়া আর অন্য উপায় জানে না। তবে আত্মনীতির উপর যে নাজী-নেতার প্রগাঢ় প্রত্যয় আছে তাহা তাঁহার এই কথাগুলি হইতে বুঝা যায়, "That this movement (Hitlerism) will go on for a thousand years. They (people) will follow me wherever I go and they will continue to do so. We are not the sort of men to capitulate before any difficulties. We are all self-mademen who have grown strong in the struggle."

মেজর ফে

ভন পেপেন ও অধিকাংশ জার্ম্মাণ-জনসাধারণ হিট্‌লারকে এই ঘটনার পরেও অভিনন্দিত ও সম্বর্দ্ধিত করিয়াছে।

মার্ক্সের সমাজ নীতি হুবহু অনুসরণ না করিলেও, নাজী-বাদের মধ্যে আছে একটা সত্য সোস্যাল ডিমোক্রেটীক আদর্শবাদ—যাহা শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণীকে উত্তেজিত না করিয়া, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি মততাসম্পন্ন আভিজাত্য ও শ্রম-মর্য্যাদার মিলন-ক্ষেত্র-রচনায় উদ্বুদ্ধ। এই হিসাবে ফ্যাসিজমের চেয়েও হিটলারিজম্ উদারতর বলা যায়। বিভিন্ন উপাদানের সামঞ্জস্য-সাধনে স্থায়ী শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র-রচনা সম্ভব নয় বলিয়াই বোধহয় হিটলার সমস্ত বিজাতীয় উপাদানের অপসারণে বিশুদ্ধ রক্তগত সম-কৃষ্টির উপর ভিত্তি করিয়া চাহিয়াছিলেন নব জার্ম্মাণ-জাতিকে গড়িতে। এই লক্ষ্যেই বিগত দিনের নাজী আন্দোলনের সকল অত্যাচার উৎপীড়ন প্রশ্রয় পাইয়াছিল। হিটলারিজমের এ অভিনব পরীক্ষার সফলতা-বিফলতা এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত; হয়তো বা হিটলারের স্বকীয় রুদ্র-নীতির মাঝেই ইহার ধ্বংসের বীজও সংগোপিত আছে।

জার্ম্মাণীর বর্ত্তমানের প্রয়োজনীয়তা শেষ হইলে হিটলারিজমের অবসান অবশ্যম্ভাবী। দুনিয়ার বিচিত্র রাষ্ট্রীয় আবর্ত্তন-বিবর্ত্তনের ইতিহাসে চিরযুগ ধরিয়া ইহারই পুনরভিনয় দেখা যায়। শুধু হিটলারিজম্ কেন, সমগ্র ইউরোপের রাষ্ট্রসাধনার মাঝেই তার ধ্বংসের মৃত্যু-বাণ অলক্ষ্যে-অজ্ঞাতে সঞ্চিত হইতেছে। স্পেনের রাষ্ট্র-বিপ্লব, দলগত স্বার্থ লইয়া মারামারি কাটাকাটি যে রক্ত-বন্যা প্রবাহিত করিয়া চলিয়াছে তাহার নিরঙ্কুশ অবসান কোন দিন হয় নাই, হইবেও না। সাম্য-[illegible] প্রচারক ফ্রান্সের দলীয় শাসন রাষ্ট্র-চাঞ্চল্য [illegible] করিতে পারে নাই। বলকান রাষ্ট্র-সমস্যা মধ্য ও দ[illegible] ইউরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে কাঁটার খোঁচার মতই বিঁধিয়া আছে। অষ্ট্রিয়ার গবর্ণমেণ্টের অস্থায়িত্ব, ডলফাসের ডিক্টেটরী-আকাঙ্খা, মেজর ফে'র রাজনৈতিক কুট-চাল, পার্শ্ববর্ত্তী শক্তিশালী রাষ্ট্র-পুরুষ-সমূহের হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কারণে অষ্ট্রিয়া-রাষ্ট্র দিশাহারা, বিপর্য্যস্ত। প্রতীচ্যের এই একান্ত বহির্মুখী বৈজ্ঞানিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও জাতীয় স্বার্থসঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির চাঞ্চল্যকর অগ্রগতি ও কোলাহলের মাঝে ধ্বংসের শ্মশান-শয্যাই রচিত হইতেছে। এমন দিন আসিবে, যেদিন চরম প্রতিক্রিয়ায় গণ-চেতনার ব্যাপক উন্মেষে হয়তো সে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইবে সর্ব্বজনবাঞ্ছিত পরম কল্যাণের দিকে, নয়তো, প্রকৃতির বিপর্য্যয় অর্ব্বাচীন ইউরোপকে আবার ছিটকাইয়া দিবে বর্ব্বর যুগের গভীর-গাঢ় অন্ধকারময় অবস্থায়। 'দেবায় জন্মনে'—সৃষ্টির যে আদি

গর্ভবেদনা তাহা ধরিত্রীর বুকে আজও কোথাও সুষ্ঠু বস্তুতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করিবার আশ্রয় পায় নাই। প্রাচীন ভারতের রামায়ণ-মহাভারতীয় যুগের প্রারম্ভের যে বিপুল সমারোহ তাহার শোচনীয় বেদনাময় অবসান—সে একান্ত করুণ বিয়োগান্তক শ্মশান-চিত্র বেদনাশীল মানুষের বুকে ব্যথা-নৈরাশ্যই সৃজন করে। স্বর্গ বা মর্ত্ত্যের সকাম সাধনা যুগে যুগে মানবের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থই করিয়াছে। সত্য-শিব-সুন্দরের মাঝে নবজন্ম লাভ করিয়া মানবতার যে ঋতময় দিব্য নিষ্কাম সমাজ-সংস্থা, অতীত দুনিয়ায় তার নজীর না মিলিলেও, ভারতের সত্য-তত্ত্বের পরিকল্পনার মাঝে তার নিষ্কলুষ বীজের অব্যর্থ সন্ধান পাওয়া যায়। সত্য-যুগের ভারতীর এ মহা অবদান কোথায় কোন্ মানব-গোষ্ঠীকে আশ্রয় করিয়া সার্থক হইবে, কে জানে!

মহাত্মা গান্ধী ও নোবেল প্রাইজ—

জগতের সর্ব্বাপেক্ষা শান্তিকামীর ও শান্তিপ্রচেষ্টা-কারীর জন্য একটি 'নোবেল প্রাইজ' নির্দ্দিষ্ট আছে। "ক্রিশ্চিয়ান সেঞ্চুরী" এ বৎসরে উহা মহাত্মা গান্ধীকে দিবার জন্য মত প্রকাশ করিয়াছেন। নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষ কোন ব্যক্তিরই বোধ হয় উহাতে মতদ্বৈধ হইবে না। মহাত্মা বর্ত্তমান বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, অকপট শান্তি-সাম্য-মৈত্রী-ভ্রাতৃত্বের আদর্শপ্রচারক, অন্তরে-বাহিরে দ্বেষহীন, প্রেমমূর্ত্তি—এ কথা মনের উপর হইতে দেশ-জাতি-বর্ণের আরোপ অপসারিত করিয়া ভাবিলে কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বর্ত্তমান বিশ্বময় বিষাক্ত আবিল স্বার্থ-পরতন্ত্র রাজনৈতিক আব্‌হাওয়ার মধ্যে মানবতার কল্যাণ-যজ্ঞে মহাত্মার আত্মোৎসর্গের তুলনা মিলে না। কিন্তু তাঁকে যে এই পুরস্কার দেওয়া হইবে না, সে বিষয়ে ভারতবাসী নিঃসন্দেহ। শিকাগোর 'ইউনিটি' পত্রিকা ঠিকই লিখিয়াছেন—'নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তির তালিকায় দেখা যায়, নোবেল-শান্তি-পুরস্কারের ষ্ট্রাটীরা গান্ধী শ্রেণীর মানুষকে এখনও ঐ পুরস্কার দেন নাই; আজ পর্য্যন্ত উহা যত ডিপ্লোম্যাট ও রাজনীতিবিদ্-দিগকেই দেওয়া হইয়াছে। ডিনামাইট ও অস্ত্রের সূতিকাগারে ঐ পুরস্কারের জন্ম, তাহা হইতে আজও উহা ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে নাই।'

মহাত্মা গান্ধী

পরলোকে "রেডিয়াম" অবিষ্কারিকা মাদাম কুরি—

বৈজ্ঞানিক-জগতে মাদাম কুরির অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি আজ বিশ্ব-বিখ্যাত। মানুষের জ্ঞান-ভাণ্ডারে এই মহীয়সী নারীর অমর অবদান তাঁকে চির-পূজ্যা ও নিত্য-স্মরণীয়া করিয়া রাখিবে। এক নগণ্য পরিবারে ও অজ্ঞাত পারিপার্শ্বিকতার মাঝে জন্মিয়াও মাদাম কুরি তাঁর স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক প্রতিভা-বলে ও আজীবন রসায়ণ-শাস্ত্রের নীরব সাধনার মধ্য দিয়া বিজ্ঞান-জগতে এক যুগান্তর আনিয়া দিয়াছেন। "রেডিয়াম" আবিষ্কার তাঁর জীবনের অপূর্ব্ব সিদ্ধি। রসায়ণ-শাস্ত্রের সফল গবেষণার জন্য নির্দ্দিষ্ট "নোবেল প্রাইজ" দুইবার তাঁহাকে প্রদান করিয়া তাঁকে সম্মানিত করা হইয়াছে। বিগত ৪ঠা জুলাই তারিখে সে অনাড়ম্বর জীবনের শেষ অঙ্কের অবসান হয় ফ্রান্সের ভ্যালেন্স নামক স্থানে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হইয়াছিল ৬৭ বৎসর। তাঁর নশ্বর দেহ আর নাই; কিন্তু তাঁর কল্যাণকর কীর্ত্তি মানবের ইতিহাসে তাঁকে চিরজীবিনী করিয়া রাখিবে।
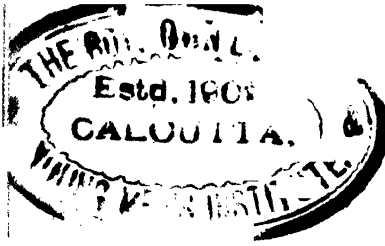
— মত ও পথ —

— আমাদের আশ্রয় কি? —

"ন চ ধর্ম্মম্ চরিষ্যন্তি মানবাঃ নির্গতে যুগে" অর্থাৎ কলিকালে কোন মনুষ্যই ধর্ম্মাচরণ করিবে না। শাস্ত্র-বাক্য বিশ্বাস করিতে হইলে, আজ হিন্দুজাতিকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, স্বধর্ম্ম, সনাতন ধর্ম্ম প্রভৃতি বাক্য উচ্চারণ করিয়া যে আন্দোলন তাহা শাস্ত্রকে অস্বীকার করা।

যুগের সকল লক্ষণের সহিত শাস্ত্র-বাক্যের মিল আছে। যেমন "ধনানি শ্লাঘনীয়ানি সতাং বৃত্তমপূজিতম্"—কলিযুগে ধনই শ্লাঘ্য হইবে, সাধুদিগের প্রশংসা থাকিবে না। যাহারা পতিত তাহাদের নিন্দা কেহ করিবে না। এইরূপ শাস্ত্র-কথিত অনেক লক্ষণ দেশের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত হুবহু মিলিয়া যায়। শাস্ত্রে বিশ্বাস রাখিতে হইলে, তাহার সবখানি মানিয়া লওয়া শ্রেয়ঃ করিতে হইবে। "শূদ্র জনেরা বক্তা হইবে, ব্রাহ্মণগণ নীচজন-সেবী হইবে।" এই সকল শাস্ত্র-বাণী যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে আমরা কালচক্রে যাহা আগত, তাহা নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইব।

কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার অন্যথা হইতেছে। আজ শূদ্র বক্তা মুণ্ডিতমস্তক গৈরিকবসনধারী হইয়া জিতেন্দ্রিয়তা প্রখ্যাপণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেছে, ইহা তো শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট লক্ষণ—ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শাস্ত্রকে অস্বীকার করিয়া হটকারিতা নহে কি?

বিচার করিয়া দেখিলে, আমাদের শাস্ত্রবাক্য এইরূপ ভাসা-ভাসা-রূপে গ্রহণ করা যে কতখানি অযুক্তিকর তাহা বুঝা যায়। কলিযুগ সমন্বয়ের যুগ। ধর্ম্ম-বৈচিত্র্য, সমাজ-বৈচিত্র্য, জাতি-বর্ণ-আশ্রম-বৈচিত্র্যাদির লয় না হইলে সমন্বয়ের সুমহান্ বিগ্রহ সৃষ্ট হয় না। দেশে বিপ্লব আসিয়াছে নিশ্চয়ই, কিন্তু এইরূপ বিপ্লব অনিবার্য্য। অতীতের সৃষ্টি পরম অভীষ্টের অনুযায়ী রূপে গড়িয়া না উঠায় উহা ভাঙ্গিতে বসিয়াছে। যে শিল্পী, সে তার স্বপ্ন-দৃষ্ট সামগ্রী যখন গড়িতে বসে আর তাহা যদি অন্তর-দর্শনের অনুরূপ না হয়, তবে সে তাহা পুনঃ পুনঃ ভাঙ্গিয়া ফেলে। তার পর পুনর্গঠনে প্রবৃত্ত হয়। এ সৃষ্টি বিশ্বশিল্পীর স্বপ্ন-চিত্র। সে চিত্র পূর্ণাঙ্গ হওয়ার প্রতিকূল যখনই হয়, তখনই ভাঙ্গনের মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়। যে স্বপ্ন সনাতন, শাশ্বত, মানুষের প্রতিভায় তাহার কতটুকু আভাস ফুটিয়াছে! যিনি "কবি, পুরাণ, অনুশাসিতা" তাঁর সৃষ্টিনৈপুণ্যের কতটুকু অনুভূতি আমাদের আছে! ভগবান যাহা করেন কোথাও তাহা অহিত নয়, তাহা অকল্যাণের কারণ হইতে পারে না। এই প্রশান্ত চিত্তই তাঁর ভাব ও সৃষ্টি-ছন্দ অবধারণ করিতে পারে। দীর্ঘ দিনের তপস্যায় ও আত্মানুশীলনে ভারতে একদল আদর্শ মানবের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল অমোঘ অব্যর্থ, তাই তাঁহাদের তর্জ্জনী-সঙ্কেতে যে নির্দ্দেশ লক্ষিত হইত, তাহা অস্বীকার করার উপায় ছিল না। কীট যেমন নিজ-সূত্রে বদ্ধ হয়, গুণ-ক্ষোভে ভারতের ব্রাহ্মণও আজ তদ্রূপ অভিমান-প্রমত্ত। ভারতের ব্রাহ্মণ শূদ্রজনোচিত শিক্ষায়, সাধনায়, কর্ম্মে আত্মনিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। ইহাও ঈশ্বরের বিধান, নতুবা সকল ভাঙ্গিয়া একাকার হইবে কেন? আমরা নীরবে নিরপেক্ষ হইয়া দেখিতেছি। ধর্ম্মরক্ষক যাঁহারা তাঁহারা শ্রীভগবানের আশ্রয়-বোধের অভাবে ধর্ম্মের নামে অহঙ্কারকেই বড় করিয়া তুলিতেছেন। মৃত্যুর সূচনা ভিন্ন ইহা অন্য কিছু নহে। আমরা মরিতে বসিয়াছি। যুগপৎ দেশ-ধর্ম্ম-কর্ম্ম-জাতি-বর্ণ সবই নিঃশেষ হইবে। আজ তাই প্রয়োজন হইয়াছে ভবিষ্য যুগের জন্য, এই প্রলয়-পয়োধি-জলে পুরুষোত্তমের শ্রীচরণ রূপ অর্ণবপোত আশ্রয় করিয়া একদল মানুষের ভাগবত জীবনযাত্রার। জ্ঞানী মোক্ষ পাইয়াছে। কর্ম্মী স্বর্গ-নরক দ্বন্দ্বে চিরদিন বন্ধনগ্রস্ত; এই কর্ম্ম-বন্ধনই বিপ্রত্ব, শূদ্রত্বাদি বর্ণ লাভ করে। আর ভক্তিরই বা পরিণাম কি? জাতিকে আজ এই সকল অবধারণ করিতে হইবে। জ্ঞান ও কর্ম্ম আজ আশ্রয়ণীয় নহে, শ্রীভগবানের

চরণ আশ্রয় করিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে "যৎ করোসি যদশ্নাসি" প্রভৃতি মন্ত্র। তবেই ভারতের যে পরম গতি তাহা প্রাপ্ত হওয়ার পথের সন্ধান মিলিবে।

— মহাত্মাজীর উপর আক্রমণ —

দার্জ্জিলিং শৈলে যে বুদ্ধিবৃত্তি ও মনোভাব লইয়া বাঙ্গালী তরুণ স্যার জন এণ্ডার্সনের উপর গুলি চালাইতে উদ্যোগ করিয়াছিল, সেই একই বুদ্ধি ও মনের ধর্ম্মে পুনরায় মহাত্মাজীর প্রাণনাশে অজ্ঞাতজনের কোন একজন বা বহু জন তাঁহার উপর বোমা বর্ষণ করিয়াছিল। আমরা বহু বার বলিয়াছি, হিংসাবৃত্তি মানুষের স্বভাব-স্বধর্ম্ম নহে, ইহা বিকৃত চরিত্রের লক্ষণ; এই হেতু বিকৃত-স্বভাবপরায়ণ যে তরুণ আজ আততায়ী বোধে মহাত্মাকেও আঘাত দিতে উদ্যত হয়, সে একদিন আপনাকেও হত্যা করিতে কুণ্ঠা করিবে না। সৎ ও সত্য যাহা তাহাই জাতির সাধ্য; অসৎ ও অসত্যকে আশ্রয় করিয়া কোন জাতি চরম সাফল্য লাভ করে না। যতদিন দেশের জাগ্রত প্রাণশক্তি ইহা অবধারণ না করে, ততদিন জাতীয় জীবন-সাধনার ক্ষেত্র বিঘ্নসঙ্কুল থাকিবে।

অনেকে মনে করিতে পারেন, কর্ম্মক্ষেত্র কোন দিন কুসুমাস্তীর্ণ হইবে না, উহা বন্ধুর ও ক্ষুরধার চিরদিনই থাকিবে। আমরা ইহা অস্বীকার করি না। জীবন-সাধনার পথে, যে স্বেচ্ছায় দৈন্য-ভার বহন করে, হৃদয় হইতে মমতার বাঁধন ছিঁড়িয়া ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পথে অগ্রসর হয়, তপস্যার আগুন জ্বালিয়া অহংকার ও বাসনাকে ক্ষয় করে, সেও দুর্গম পথের যাত্রী। এ পথও ক্ষুরধার। পথিকের চরণতল রক্তাক্ত হয়; অন্তর্যুদ্ধে অবসন্নপ্রায় হইয়া, কত বার সে মাটীর বুকে আছাড় খাইয়া পড়ে, আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ় যষ্টির-সহায়েই আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। লক্ষ্য তার ঋতময় সত্য। দলে দলে যখন জাতির অগ্রপুরোহিতবৃন্দ এই পথে অগ্রসর হইবে, সেই দিন বুঝিব, আমাদের জয়যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে।

ক্ষণিক উত্তেজনায় স্বার্থপর মানুষের প্ররোচনায়, আপাত উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে কাহাকেও অন্তরায় মনে করিয়া, তাহার প্রতি বিদ্বেষ, তাহার গ্লানিপ্রচার, পরিশেষে তাহাকে পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া দেওয়ার যে প্রচেষ্টা, তাহা কতখানি অন্ধতা ও দুর্নীতিপরায়ণতা তাহা বুঝাইয়া বলিবার ভাষা নাই। যে সত্য আত্মপ্রভাবে সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উন্নতশিরে দাঁড়াইতে অসমর্থ হয়, সে সত্য মিথ্যারই ছদ্মবেশ। মিথ্যা আত্মপ্রতিষ্ঠার লালসায় আশ্রয় করে হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, এমন কি গুপ্তহত্যার বিষাক্ত ছুরি হাতে তুলিয়া লইতেও কুণ্ঠা করে না। মিথ্যার অস্ত্র শানাইয়া যে কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা, তাহা আশার কুহকই সৃষ্টি করে, কোন দিন সিদ্ধি দান করে না। আসন্ন ফলপ্রাপ্তির কামনা মানুষের চিত্তকে ধৈর্য্যহীন করে, প্রাণ চঞ্চল হয়, বুদ্ধির স্থৈর্য্য থাকে না—মানুষের এই অবস্থা বৃহৎ কর্ম্মসিদ্ধির অনুকূল নহে। কোন যুগে সত্য প্রতিক্রিয়াপরায়ণ নহে; উহা পূত জাহ্নবী-ধারার ন্যায় অতি মন্থর, কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন গতিতে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হয়। বাধার সহিত তাহার সংগ্রাম নাই, আপনার অনিবার্য্য গতির প্রতি পরম আস্থাসম্পন্ন, তাহার যাত্রা তাই কোন কারণে রুদ্ধ হয় না। এই জাতি যদি আজ সত্যকে আশ্রয় করিয়া ভগবানের মহতী ইচ্ছা সাধন করিতে চাহে, তবে তাহাকে নিঃস্বার্থচিত্তে সব গুণাবলী আশ্রয় করিয়া নির্দ্বন্দ্ব-চিত্তে লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে হইবে। ইহাই বীরের ধর্ম্ম, বিশ্বাসীর এই পথই শ্রেয়ঃ ও সিদ্ধির পন্থা। ইহা অবধারণ করিতে পারিলেই, দেশাত্মার জাগরণ কোনমতে ব্যর্থ হইবে না।

— মহাত্মার আবার অনশন —

যিনি ভাগবৎ পথের পথিক, তিনি গীতার এই মহাবাণী সর্ব্বদাই স্মরণ রাখেন "সমোঽহম্ সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।"

তিনি সর্ব্বভূতেই সমান। তাঁহার দ্বেষ্য-প্রিয় কেহ নাই, কিছু নাই। কাজেই ঈশ্বর-পথের পথিক "মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্" এই সাধনায় সিদ্ধকাম হয়। আমরা মহাত্মাকে দীর্ঘদিন ধরিয়া, সর্ব্বক্ষেত্রে এই সাধনায় অনবহিত হইতে দেখি নাই। এই জন্যই তাঁহাকে আমরা ভাগবত-পুরুষ বলিয়া নিঃসঙ্কোচে ঘোষণা করি। যেখানে প্রিয়-সাধনে প্রসন্নতা, অপ্রিয়-বোধ চিত্তকে

অপ্রসন্ন ও বিক্ষোভিত করিয়া তুলে, সেখানে ধর্ম্ম নাই— ইহা নিঃসংশয়ে ঘোষণা করায় ভয়ও নাই। মহাত্মা অন্তর্য্যামীর নির্দ্দেশে ভারতের চারি কোটী পতিতের উদ্ধার কামনায় ভারতব্যাপী যে আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা পুণ্যধাম কাশীতে ২রা আগষ্ট শেষ করিবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আজমীরের সভাক্ষেত্রে কাশীর পণ্ডিত লালনাথের অধিনায়কত্বে যে একদল মানুষ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্ত প্রতিবাদ-স্বরূপ ছুটিতেছিল, সেই পণ্ডিত লালনাথ মহাত্মার প্রতিশ্রুতি অনুসারে আজমীঢ়ের সভায় উপস্থিত হইলে— সভায় মহাত্মাজীর পক্ষীয় স্বেচ্ছাসেবকদল বিক্ষুব্ধ হইয়া পণ্ডিত লালনাথের উপর আক্রমণ করায় মহাত্মাজী আগামী ৭ই আগষ্ট মঙ্গলবার দ্বিপ্রহর হইতে ৭ দিনের জন্য অনশন-ব্রত গ্রহণ করিবেন। ইহা পণ্ডিত লালনাথ ও তাহার মতাবলম্বী সনাতনীদের প্রতি কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কেবল নহে; তিনি বলেন, "জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আমার সহকর্ম্মিগণের বা আমার নিজের যে সকল দোষ-ত্রুটি বা ভুল-ভ্রান্তি হইয়াছে, এই অনশনে সেই সকল অপরাধের মার্জ্জনা হইয়া যাউক।" সুনীতির অবতার মহাত্মাজীর ইহা যোগ্য আচরণ। এই পতিত জাতি খুবই অনুকরণ-পরায়ণ; এই হেতু তিনি তাঁহার এই প্রায়শ্চিত্ত-নীতি আর কাহাকেও অনুসরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমরা তাঁর এই ধর্ম্ম-প্রণোদিত প্রেরণার অনুকুল আচরণ সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করি। তিনি নির্ব্বিবাদে এই কঠোর ব্রতভার বহন করিবেন এবং আরও বিশুদ্ধ মূর্ত্তিতে জাতির সম্মুখে অধিকতর উজ্জল বর্ত্তিকা ধরিয়া পতিতের উদ্ধার-সঙ্কেত দিবেন—এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

— মহাত্মাজীর বাঙলায় আগমন —

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বাঙলার বিভিন্ন জিলা-কংগ্রেসের সম্পাদকদের জানাইতেছেন, ১৯শে জুলাই মহাত্মা গান্ধী কলিকাতায় আসিবেন এবং তিন দিন অবস্থান করিবেন। প্রতি জিলা হইতে প্রতিনিধিস্থানীয় ৪ জন কর্ম্মী এক ঘরোয়া বৈঠকে তাঁহার সহিত কংগ্রেসের কর্ম্ম লইয়া আলোচনা করিবেন।

আমরা এই সংবাদে নিরতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। বাঙলাদেশের শ্রেণীবিশেষের মধ্যে মহাত্মাকে লইয়া যতই মতবিরোধ থাকুক, আমন্ত্রিত এই অতিথির যথারীতি সম্মান বাঙ্গালী অকপটে দিবে, এই আশা অনায়াসেই করিতে পারি। আমরা তাঁহাকে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

— বাঙলার স্বাস্থ্য —

১৩৩১ খৃষ্টাব্দে আদমসুমারীর বিবরণ-সাহায্যে সরকারী রিপোর্টে যাহা বাহির হইয়াছে, তাহা আমাদের নিকট নূতন না হইলেও চিন্তনীয়। বাঙলায় লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে ৩,৩,৭৮,'৮১। বিগত ১০ বৎসরের আদমসুমারীর সহিত তুলনায় এই সংখ্যাবৃদ্ধিতে আমাদের আশা করিবার কিছুই নাই। বাঙলায় অবাঙালীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে এবং ইহা ব্যতীত ১০ বৎসরে যেটুকু সংখ্যাবৃদ্ধি দেখা যায়, তাহা যে কোন দিন মড়কের হিড়িক আনিয়া আমাদের নিশ্চিহ্নপ্রায় করিয়া দিতে পারে।

যশোহর ও রাজসাহী জিলায় অধিবাসীদের সংখ্যা-হ্রাস হইয়াছে। এই সংখ্যা-হ্রাসের কারণ এই দুই ক্ষেত্রে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অধিক। পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিলে এই দুই জিলা অপেক্ষা অন্যান্য স্থানের অবস্থা ভাল বলিয়া মনে হয় না। বর্দ্ধমান, নদীয়া, দিনাজপুর প্রভৃতি জিলার কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাঙলার দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলের কিছু স্থান ব্যতীত সর্ব্বত্রই মৃত্যু-রাক্ষসী প্রলয়-নৃত্য করিতেছে। সমগ্র বাঙলায় ১৯৩০ সালে ৩,৩৬,৮৯৭ জন ম্যালেরিয়ায় মরিয়াছিল। ১৯৩১ সালে এই রোগে মারা গিয়াছে ৩,৪৯,১১১ জন। মালদহ, নদীয়া, রাজসাহী প্রভৃতি স্থানে হাজারকরা ২০ জনেরও অধিক ম্যালেরিয়া রোগে মারা গিয়াছে। বিবরণ পড়িয়া বাঙালীর জীবনের পথ মৃত্যু-দেবতা রোধ করিয়া দাঁড়াইতেছেন, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

ম্যালেরিয়ার ন্যায় কলেরাও নিত্য-সঙ্গী হইয়াছে। ১৯৩০ সালে বাঙলায় কলেরায় মৃত্যু হইয়াছিল ৫৪৯৬৩ জনের, ১৯৩১ সালে মরিয়াছে ৭৯০৭৩। ১ বৎসরে শতকরা ৩৩ জনেরও অধিক লোকের মৃত্যু-সংখ্যা বাড়িয়াছে।

পাবনা, ঢাকা ও ফরিদপুরে কলেরার প্রকোপ অধিক দেখা যায়। তারপর, শিশু-মৃত্যুর কথা। ১৯৩১ সালে ২৪১৫৫২ শিশুর অকাল মৃত্যু হইয়াছে। সহর অঞ্চল হইতে পল্লীতে শিশু-মৃত্যুর হার কম। সহরে হাজার-করা ১৮৭ জন, পল্লীতে ১৭৩·৩ জন।

কত দিন ধরিয়া আমরা মৃত্যুর প্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছি, তার ইয়ত্তা নাই। ক্রমেই বাঙলাদেশ প্রাণহীন, শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে। ইহা হিসাবের খতিয়ান না দেখিলেও, স্পষ্ট দিনের মত চক্ষে পড়ে। প্রতিকারের জন্য আমরা নিজেরা যত দুর নিশ্চেষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা তাহার সীমা ছাড়াইয়াছি। পরমুখাপেক্ষী হইয়া চীৎকার করা ছাড়া আমাদের আর অন্য দিকে লক্ষ্য নাই।

দেশ মরিতেছে দারিদ্র্যে। এবং দারিদ্র্য আসিয়াছে ঘোরতর আলস্যে। সরকারী ও সওদাগরী চাকুরীতে যে অল্পসংখ্যক লোক প্রতিপালিত হয়, তাহাদেরই তৈল-চর্চ্চিত ঈষৎ রক্তাভ বদন-কমলের শোভা সমগ্র বাঙালী জাতিকে আকৃষ্ট করিয়াছে। তারপর আছে ওকালতী, ডাক্তারী, জীবনবীমার দালালী প্রভৃতি ফাঁকা উপার্জ্জনের মোহ। গতর কেহই খাটাইতে চাহে না। যাহারা মরিতেছে তাহাদের বিবরণ যদি সংগ্রহ করা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, নামে তাহারা শ্রমজীবী অথবা কৃষক, কিন্তু কাজে মেয়েরা যাহাকে "উদর-কুঁড়ে" বলে তাহারা সেই শ্রেণীর লোক। এবং ইহাদের মৃত্যু-নিশ্বাসে দেশব্যাপী যে বিষাক্ত বাষ্প সৃষ্ট হয়, তাহাতে সংক্রামিত হইয়া বাঙলার কৃতী সন্তানও প্রাণ দিতে বাধ্য হয়।

আমরা দেশ-সেবক, দেশ ও জাতির দীন ভৃত্য। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যেখানে মাটী কাটিয়া উপার্জ্জনের ব্যবস্থা হয়, সেখানে সাঁওতাল ও মেদিনীপুরের অর্দ্ধ-বাঙালী, অর্দ্ধ উড়িয়াকে ধরিয়া আনিতে হয়। বাঙালী চাহে ফাঁকি দিয়া জীবনযাপন করিতে। কিন্তু বিধাতার চক্ষু এই দিকে খুবই সতর্ক। মৃত্যুর শাসন-পাশ বাঙালীর সঞ্চিত কর্ম্মের অভিশাপ। ইহা আমরা মুক্ত-কণ্ঠে বলিতে পারি।

বাঙালীকে যদি বাঁচাইতে হয়, বাঙালীকে যদি স্বাস্থ্য-রক্ষায়, আত্মরক্ষায় উদ্বুদ্ধ করিতে হয়, শাসক-পক্ষের কাছে ব্যর্থ চীৎকার করিয়া কোন লাভ নাই।

বাঙলার দৈন্য কি বীভৎস মূর্ত্তিতে প্রকট, অথচ বাঙলার পল্লী হইতে তুমি কাহাকেও অর্থাগমের ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিবে না। চক্ষের সম্মুখে বাঙলায় অসংখ্য অবাঙালী শ্রম-দানে স্বাস্থ্যপূর্ণ নিরাময় জীবন যাপন করিতেছে। ইহাও মিথ্যা কথা নহে।

জীবনের মন্ত্রে দীক্ষা দিবে কে? সকলেই যখন আত্মস্বার্থ চরিতার্থতার মোহে অন্ধ, তখন দেশকে এই ক্লেদ ও অভিশাপ হইতে মুক্ত করিবে কে? আমরা আর্ত্তকণ্ঠে বলি—কেবল আদর্শটুকু দেশে স্থাপন করিতে গিয়া আমরা নিঃশেষ হইতেছি। অনাগত প্রাণবন্ত সর্ব্বত্যাগীর দল, আজ মোক্ষ-মুক্তি অথবা জীবনের বিচিত্র রস-সৃষ্টি প্রভৃতি কমনীয় মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া জাতি-রক্ষায় যদি অগ্রসর না হয়, আমরা বাঁচিব না। ব্যক্তি যদি বাঁচে, যেমন তার দুর্গতি যতই হোক, সুদিন তাহার একদিন আসেই; সেইরূপ এই জাতি যদি রক্ষা পায়, আমাদের সর্ব্ববাঞ্ছা একদিন পূর্ত্তি পাইবেই। আজ তাই জীবনের দীক্ষা দিতে দেশের মহাপ্রাণ মহামানবদের অগ্রসর হইতে বলি—যাহারা মোক্ষবাদীর ন্যায় সর্ব্বত্যাগী হইয়াই শিক্ষায় জাতির মূঢ়তা অপনোদন করিবে—অর্থসাধনায় জাতির দীনতা দূর করিয়া তাহাকে নিরাময় করিয়া তুলিবে। আমরা আবার বলি, এ কাজ যাহার কিছু আছে তাহার নহে। এ কাজ বেতনভোগী স্বেচ্ছাসেবক দলের দ্বারা সম্ভব হইবে না। এ কাজ সরকারী অনুগ্রহে সিদ্ধ হইতে পারে না। এ কাজ করিতে সেই সিংহগ্রীব বীরেন্দ্র-কেশরীর কম্বুকণ্ঠে যে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা মহা-মন্ত্রের ন্যায় ঝঙ্কার তুলিয়াছিল সেই মহামন্ত্রে দীক্ষিত সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর দলকেই অগ্রসর হইতে হইবে। সেবা দিতে হইবে শিক্ষায়—সেবা দিতে হইবে রোগ-শয্যায় বসিয়া শুশ্রূষায়—সেবা দিতে হইবে মূঢ় সম্মোহিত জাতির কর্ণে জগদীশ্বরের অমৃত-মন্ত্র ফুকারিয়া, আর সেবা দিতে হইবে দৈহিক শক্তিতে শ্রমের মর্য্যাদা দিয়া। এই নব সন্ন্যাস বাঙলায় দুই সহস্র জন যদি গ্রহণ করে, স্বামীজির আহ্বান যদি বাঙালী শুনিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের

বাণী মিথ্যা হইবে না। জাতিকে বাঁচাইবার ইহা ভিন্ন দ্বিতীয় পন্থা আর নাই।

— বেকার-সমস্যা —

শিক্ষিত বাঙালী যাহারা রিক্সা টানিতে বাহির হইয়াছিল তাহারা গেল কোথায়? যাহারা জুতা বুরুশ করিতে বাহির হইয়াছিল তাহাদের সাড়া পাই না কেন?

আজ শুনিতেছি, ১৬৲টাকা বেতনে এক গ্র্যাজুয়েট কনেষ্টবল হইয়াছে। অনেকে বলিতেছেন, এইরূপ হইলে উচ্চ শিক্ষার কি লাভ হইল! আমরা বলি, উচ্চ শিক্ষা বলিতে যখন গ্র্যাজুয়েট হওয়া ছাড়া আর কিছুতেই সম্মান নাই—তখন গ্র্যাজুয়েট হইলেই যে একটা বড় চাকুরী পাইতে হইবে, এইরূপ মনোভাব অতিশয় মারাত্মক। একদিন ছিল, যে দিন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের শিক্ষা ছিল এক-চেটিয়া সম্পদ্! কাজে কাজেই অন্যান্য জাতিকে শিক্ষাহীন অবস্থায় জাতিগত পেশায় নিয়োজিত করিয়া রাখা হইত। কর্ম্মকার, তন্তুবায়, মালাকার, নাপিত, ধোপা, মুচি প্রভৃতি জন্মগত পেশায় প্রতিপালিত হইত। কিন্তু এই পেশাগুলি কেবল আত্ম-পোষণের ব্যাপার নহে, সমাজেরও কল্যাণকর। শ্রমের মর্য্যাদা না দিয়া, উহা সেবা বলিয়া অন্ত্যজের নিকট হইতে মহাজনেরা অকুণ্ঠে আদায় করিয়া আসিতেছেন দীর্ঘদিন তাহাদের চক্ষে অজ্ঞানতার কাপড় বাঁধিয়া। শিক্ষা যাহাই হউক, পাশ্চাত্যের প্রভাবে সকলের চক্ষে আলোর ঝিলিক ঝলসিয়া উঠিয়াছে। নাপিত-পুত্র দেখিয়াছে, সে অধ্যাপনা করিতে পারে। ছুতারের ছেলে জানে, সে হাকিম হইতে পারে। মুচির পুত্র ধর্ম্মপ্রচারেও অক্ষম নহে। তখন স্বভাব স্বধর্ম্মের দায়ে যেসকল স্ব-জাতিপেশা ছিল সেগুলি সকলেই পায়ে দলিয়া—আগে চল—আগে চল বলিতে বলিতে সম্মুখের দিকেই ভীড় বাড়াইয়া তুলিতেছে। এই ক্ষেত্রে প্রাণ আছে যার তারই জয়। মানুষের প্রয়োজনীয় পেশাগুলি কতক যন্ত্র-সাহায্যে, কতক এখনও নিরক্ষর আছে যাহারা তাহাদের দ্বারা মিটান হইতেছে। কিন্তু আগের দিকে ঠাসাঠাসি করিতে করিতে এই ভীড়ের মাত্রা দীর্ঘাকারে পশ্চাৎ দিকে যতই লম্বিত হইবে, ততই আমরা দেখিব, গ্র্যাজুয়েটকে পায়খানা সাফ করিতে। তবে সে গ্র্যাজুয়েট মেথরের বেশ-ভূষা হইবে উন্নত ধরণের। বিষ্ঠাবহনের ব্যবস্থাও অভিনব আকারে দেখা দিবে। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু সতীশ বাবু ইহার অংশতঃ আদর্শ আমাদের দেখাইয়াছেন।

ঢাকা জিলার অন্তর্গত গেণ্ডেরিয়ায় এক গ্র্যাজুয়েট আত্মহত্যা করিয়াছে বেকার-সমস্যার দায়ে। নিজের খোরাক যোগাড় করিতে হইলে চাকুরী করিতেই হইবে, এমন নির্দ্দিষ্ট বিধান বিধাতার দপ্তরে নাই। সমাজে শ্রমের মর্য্যাদায় এইরূপ ঔদাসীন্য আত্মঘাতী হওয়ারই কারণ হয়। ভগবান যখন হাঁটিবার শক্তি দিয়াছেন পদ-যুগলে, বাহুদ্বয়ে কর্ম্ম-শক্তি দিয়াছেন, তখন পোড়া পেটের দায়ে কলিকাতার অসংখ্য অফিসে উড়িয়া, বেহারী প্রভৃতি অবাঙালী বেহারার দল আছে, দুরবস্থার দিনে বাঙালী সেখানে অনায়াসে আসিয়াও ত দাঁড়াইতে পারে। মেসে, হোষ্টেলে, গৃহস্থের বাড়ীতে, ধনীর প্রাসাদে, বাবুর্চ্চি-খানসামা-পাচকের কর্ম্মও তো তাহারা করিতে পারে? বাঙলায় কি শ্রমের অভাব আছে? বাঙালী তবুও মরে। লেখা পড়া শিখিয়াছে, বাবুগিরি তাহাকে করিতেই হইবে। যে জাতি চাল-চলনকেই বড় করিয়া দেখে, সে জাতির মৃত্যু আসন্ন। আমরা বাঙ্গালীকে সতর্ক করিতেছি।

দুর্দ্দিনে, সম্মুখে হীনতাজনক যে উপজীবিকাই আসুক তাহা অবলম্বন করিতে যেন কুণ্ঠিত না হই। এই পুরুষকার যদি জাগ্রত হয়, আমরা এই মাটী ধরিয়াই জীবনযাত্রায় জয় লাভ করিব।

আশ্রম-সংবাদ

আশ্রমি-লিখিত

১২শ বর্ষীয় অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব

মেলা ও প্রদর্শনী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ষষ্ঠ দিবস—খাদি ও হরিজন দিবস

এই দিন অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত সাতকড়িপতি রায়ের সভাপতিত্বে একটী বিপুল সভা হয়। সভাপতি প্রাণস্পর্শী ভাষায় বুঝাইয়া দেন—চরকাকে কি জন্য স্বাধীনতার প্রতীক রূপে বলা হয় এবং চরকার মধ্য দিয়া কেমন করিয়া এই দেশ মুক্তি-পথে অগ্রসর হইতে পারে। অস্পৃশ্যতা সম্পর্কেও তিনি বলেন, যে এই অস্পৃশ্যতা মানুষের বিকৃত বুদ্ধিপ্রসূত এবং কি শাস্ত্র, কি মানবতা কোন দিক্ দিয়াই বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের অস্পৃশ্যতা-বিধান সমর্থনযোগ্য নহে।

ইহার পর, রাত্রে প্রফেসর নাইডু তাঁহার উদ্ভাবিত যৌগিক ব্যায়াম-প্রণালী সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন এবং সেই সঙ্গে সেই ব্যায়ামের ক্রীড়া নিজে অনুষ্ঠান করিয়াও প্রদর্শন করেন।

(ক্রমশঃ)

সঙ্ঘ-জননীর আবির্ভাবোৎসব

গত ৬ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের সন্তান-মণ্ডলী কর্ত্তৃক তাহাদের পরমারাধ্যা সঙ্ঘ-জননী শ্রীশ্রী৺রাধারাণী দেবীর শুভ আবির্ভাবোৎসব গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতাসহকারে অনুষ্ঠিত হয়। ধ্যান, পাঠ, উপাসনা, পুষ্পাঞ্জলী, ইষ্ট-যুক্তির মধ্য দিয়া যে নিবিড় ভাবপ্রবাহ সকলের অনুভূতির ক্ষেত্রে সঞ্চারিত হইয়া সঙ্ঘ-সাধকদের অভিষিক্ত করিয়াছিল, তাহা তাহাদের জীবন-সংগ্রামেরই উপজীব্য রস ও শক্তি। এই শক্তিরই অনুভব উৎসবের প্রাণ। পরিশেষে, সঙ্ঘ-গুরুর উদ্দীপনাময় বাণীমন্ত্রে উৎসব যথাযোগ্য পরিসমাপ্তি হয়।

ময়মনসিংহ-কেন্দ্রে মাতৃ-উৎসব

মেলান্দদহ প্রবর্ত্তক আশ্রম হইতে স্থানীয় সম্পাদক শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সেনগুপ্ত উক্ত কেন্দ্রের এই উৎসব-সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন—"আমরা উৎসব-দিনে আশ্রমক্ষেত্রে খুব নিবিড়তার মধ্যেই শ্রীশ্রী৺মায়ের চরণে তনু-মন-প্রাণ দিয়েই আত্ম-নিবেদন করিয়াছি। আমাদের জীবনের সব জটিলতা তাঁর অমর আশীষে দূরীভূত হইয়া আমাদিগকে প্রেমে, ঐক্যে ভরাট করুক, এই আকুলতায় নিজেদের সমস্ত দিন জাগ্রত রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

৫॥০টা, ১২টা, ও ৭টায় সমবেত উপাসনা, প্রাতে চণ্ডীপাঠ, মধ্যাহ্নে ভোগারতি ও শ্রদ্ধাঞ্জলী এবং নৈশ-অধিবেশন সমাপনান্তে আমাদের নবকল্পিত নৈশ-বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করা হইয়াছে।"

উত্তর বঙ্গে সঙ্ঘ-সন্ন্যাসী

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের বিশিষ্ট সন্ন্যাসী স্বামী অমৃতানন্দজী সঙ্ঘ-মিশন প্রচারার্থ বর্ত্তমানে উত্তর বঙ্গ পরিভ্রমণ করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি জলপাইগুড়ি হইতে শিলিগুড়ি পৌছিয়াছেন।

প্রবর্ত্তক চতুষ্পাঠী

প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ চতুষ্পাঠী হইতে এ বৎসর সংস্কৃত মুগ্ধবোধের আদ্য পরীক্ষায় চারিজন পরীক্ষার্থীর মধ্যে শ্রীমতী অমিয় দে ও শ্রীমান্ অমরনাথ শীল প্রথম বিভাগে এবং শ্রীমান্ সভারঞ্জন চক্রবর্ত্তী ও শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথ দত্ত দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সঙ্ঘে শ্রাদ্ধোৎসব

৩১শে আষাঢ় সোমবার সঙ্ঘ-সেবক শ্রীউমেশচন্দ্র চৌধুরীর পরলোকগত পিতৃদেবের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান আশ্রমে যথারীতি সম্পন্ন হয়। স্বর্গীয় আত্মার শান্তি কামনা করি।

সাময়িকী
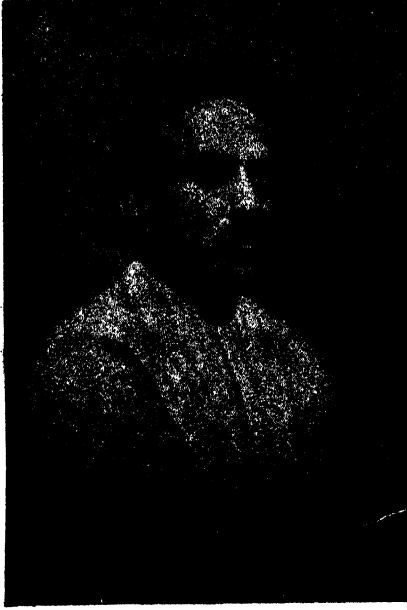
শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ

শ্রীযুক্ত সাধুচরণ মুখোপাধ্যায়

ফরাসী নাগরিকের সম্মান—

চন্দননগরের সুপ্রসিদ্ধ দানবীর ও সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ ও খ্যাতনামা আইনজ্ঞ নেতা শ্রীযুক্ত সাধুচরণ মুখোপাধ্যায় এবার ফরাসী গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক Chevalier de la Legion d'honneur উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। এই উপাধি ফ্রান্সের একটি বিশিষ্ট সম্মান। চন্দননগরের এই কৃতী সন্তানদ্বয়কে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি।

আন্তর্জাতিক নৃতত্ত্ব-কংগ্রেসে ভারতীয় প্রতিনিধি—

আগামী ৩০শে জুলাই হইতে ৪ঠা আগষ্ট পর্য্যন্ত লণ্ডনে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় আর্ল অব অনসলোর
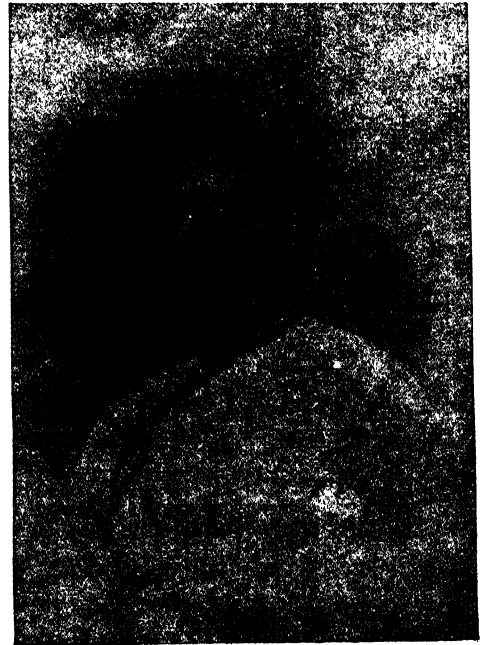
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সভাপতিত্বে পৃথিবীর নৃতত্ত্ব-বিশেষজ্ঞের যে এক আন্তর্জাতিক অধিবেশন হইবে তাহাতে ভারতের প্রতিনিধিস্বরূপ ডাঃ জে, এইচ, হাটন (আসাম গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী),

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায়, রায় বাহাদুর (দি ম্যান অফ ইণ্ডিয়ার সম্পাদক), শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা কর্পোরেশনের এডুকেশনাল অফিসার) এবং ডাঃ বি, এস, গুহ (কলিকাতা যাদুঘরের নৃতত্ত্ববিদ্ কর্মচারী)। শ্রীযুক্ত কে, পি, চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ বি, এস, গুহ ১২ই জুলাই ভিক্টোরিয়া জাহাজে লণ্ডন রওনা হইয়াছেন।

অনারেবল মিঃ কে, বি, আজিজুল হক

কলিকাতা হাইকোর্টে বাঙ্গালী চীফ্-জাষ্টিস্—

কলিকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি মিঃ বকল্যাণ্ড অসুস্থতানিবন্ধন বিদায়গ্রহণ করিলে, বিচারপতি মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় অস্থায়ীভাবে উক্ত পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার এই পদ-গৌরবে আমরা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিতেছি।

অনারেবল্ মিঃ কে, বি, আজিজুল হক—

সম্প্রতি ইনি অনারেবল্ মিঃ খাজা নাজিমউদ্দিনের স্থলে বাংলার শিক্ষা-মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন।

ফুটবল খেলায় ভারতীয়গণের স্মরণীয় বৎসর—

ভারতে ফুটবল খেলার ইতিহাসে বর্ত্তমান বৎসর চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। লীগ-খেলার সুদীর্ঘ জীবন-সাধনায় বছরের পর বছরের ভারতীয় খেলোয়াড়দের পরাজয়ের গ্লানি মুছিয়া এবার সর্ব্বপ্রথম মহামেডান স্পোর্টিং টিম অপূর্ব্ব বিজয়-সাফল্য লাভ করিয়া জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সমগ্র দেশের মুখোজ্জল করিয়াছেন। তাঁহাদের কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্য এই যে, উক্ত টিম এই বৎসরই দ্বিতীয় ডিভিসন হইতে প্রথম ডিভিসনে উঠিয়াছে। ক্রীড়া-জগতে ভারতকে এই গৌরবময় স্থান ও মান দান করিবার জন্য খেলোয়াড়গণ সমগ্র ভারতবাসীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করিয়া আমাদের অকপট অভিনন্দন জানাইতেছি।

মোহামেডান স্পোর্টিংএর সেক্রেটারীদ্বয় ও কতিপয় খেলোয়াড়

বামে—ফুটবল-সেক্রেটারী মিঃ আবদুল গফুর। ডানে—জয়েণ্ট-সেক্রেটারী মিঃ এ, কে, আজিজ মধ্যস্থলে—খেলোয়াড় ইস্মাইল, কে-খান ও শফী

মোহামেডান স্পোর্টিংএর লীগ-বিজয়ী খেলোয়াড়গণ

দণ্ডায়মান—রহমান, সাত্তার, মাসুম, হবিব (বড়), জামীর, হবিব (ছোট), জাব্বর, নূর ও মহিউদ্দীন।

চেয়ারে উপবিষ্ট—সেখ, সামাদ, গোলকে আনোয়ার (ক্যাপ্টেন) রসীদ, রহমৎ।

ভূমিতে উপবিষ্ট—জুম্মা খাঁন, সিরাজী, কাসেম।

বিঃ দ্রঃ—মিঃ পি কে চক্রবর্ত্তী বর্ত্তমানে 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার সম্পাদকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁর বিষয় ৩৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Published by Krishnadhan Chatterjee M. A.—Prabartak Publishing House, 61, Bowbazar St., Calcutta.

পদ্মাসীন কামদেব

[শিল্পী—শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর দে]
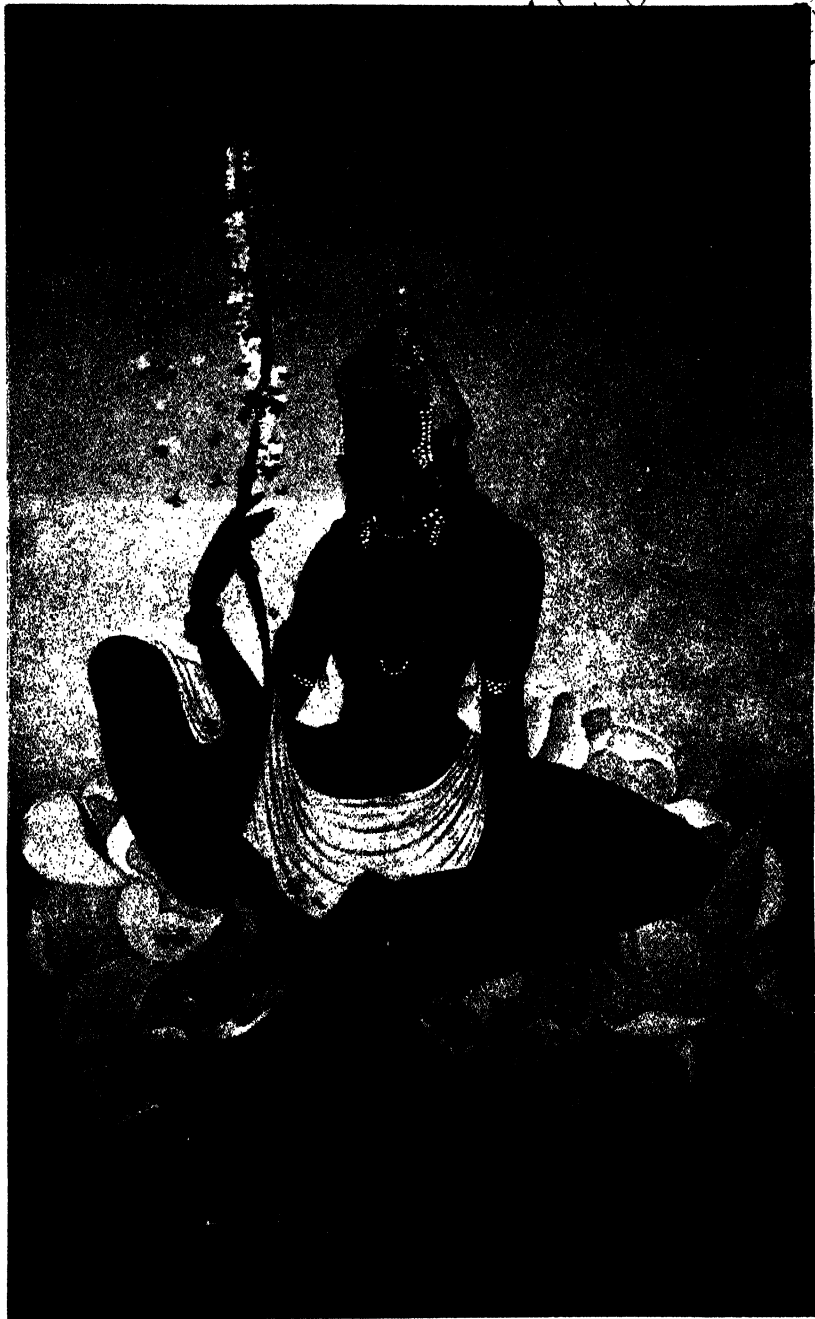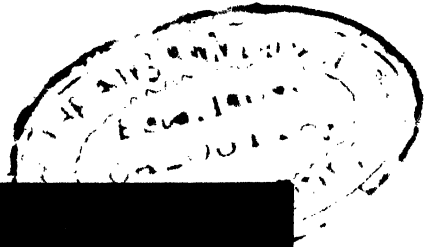
১৯শ বর্ষ, ভাদ্র, ১৩৪১ ৫ম সংখ্যা

তরুণের প্রতি

মহামতি গোখলে একদিন এই মর্ম্মে বলিয়াছিলেন যে, বাঙালী আজ যাহা ভাবে কাল সমগ্র ভারতে তাহা ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু বাঙলার বর্ত্তমান দৈন্য এমনই সর্ব্বতোমুখী যে, তাহা দেখিয়া একথা আর বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। বাঙলার দৈন্য শুধু যে অর্থে, বিদ্যায়, স্বাস্থ্যে, ধর্ম্মে তাহা নহে। দৈন্যের উলঙ্গ কঙ্কাল মূর্ত্তি আমাদের সবখানিকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে; আমরা যেন দিন দিন দৈন্যেরই প্রতিমূর্ত্তি হইয়া উঠিতেছি।

"সুজলা-সুফলা-মলয়জশীতলা-শস্যশ্যামলা" বঙ্গলক্ষ্মী আজ আমাদের নিকট শ্রীহীন। জ্ঞানপ্রদায়িনী দেবী সরস্বতীও আমাদের পরিত্যাগ করিয়াছেন। কোথায় গেল বাঙালীর বাগ্মিতা, বাঙালীর কাব্যসাহিত্য, দার্শনিকতা! যে বাঙলায় একদিন নব নব ভাব ও আদর্শের স্বপ্নে যুগে যুগে অসাধারণ পুরুষের আবির্ভাব হইত, সেই বাঙলা আজ অতি কুৎসিৎ মূর্ত্তি লইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, কাণ পাতিয়া শুনে বাহিরের বাণী, নিরাশ নয়নে যাচ্ঞা করে বাহিরের আনুকূল্য—শিক্ষা-সভ্যতার নিজস্ব আদর্শ বলিয়া যেন তার আর কিছুই নাই, সকল বিষয়েই পরমুখাপেক্ষী। বড় কাঙ্গাল দীন বেশ তার—করুণাপ্রার্থীর এই দৈন্য ও মালিন্যে সারা দেশ অবসাদাচ্ছন্ন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর কথা ছাড়িয়া দিই। জ্ঞানে, গরিমায়, আদর্শে বাঙালীর সে অভ্যুত্থান-যুগের হিরণ্ময় সূচনা না হয় বিস্মৃতির অবলেপে ঢাকিয়া দিলাম। শতাব্দীর উন্নতি-সীমার জয়চিহ্ন রামমোহনের যুগ না হয় নাই মনে করিলাম। তারপর, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মহাবাণী, বীরেন্দ্রকেশরী নরেন্দ্রনাথের কম্বুকণ্ঠে বেদান্তধ্বনি, দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্রের সমাজ-হিতৈষণা, বঙ্কিমের স্বদেশপ্রেরণা, মাইকেল, নবীনচন্দ্র,

হেমচন্দ্র প্রভৃতির অমরকাব্য সবই না হয় বিস্মৃতির সাগরে ডুবাইয়া দিলাম। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রভাতে যে জাগরণ-দৃশ্য পরিলক্ষ্য করিয়াছি, তাহা তো ভুলিতে পারিব না। উহাতো অধিক দিনের কথা নহে। আমাদের যৌবনের তরুণ চিত্তে যে আশা ও সাফল্যের ছবি চিত্রিত হইয়াছে, তাহা তো মুছিতে পারি না। অর্ব্বাচীন যুগের বাঙালীকে সে প্রেরণাপূর্ণ জাতীয় জীবনের জাগ্রত আলেখ্য আঁকিয়া দেখাইতে যে বড় সাধ যায়! আজ মনে হয়, বর্ত্তমান যুগের তরুণের সম্মুখ হইতে কে যেন কাড়িয়া লয় তাহার নিজস্ব আদর্শের সমুজ্জ্বল প্রদীপ। বাঙালী আজ পথহারা, অন্ধকারে হাতড়াইয়া চলে; যে ভাব, যে বাণী চর্ব্বিতচর্ব্বণে পূর্ব্বদিন নিঃশেষে পরিপাক করিয়াছে তাহারই পুনরুদ্গান কোন্ রুচি লইয়া সে শুনে, কে জানে? চক্ষের সম্মুখে এই স্বল্পকাল ত্রিশ বৎসরের মধ্যে বাঙালী আত্মবিস্মৃত হইল কোন পাপে, কোন অভিশাপে? পূজার বোধন বসিতে না বসিতেই তাহার মঙ্গলঘট এমন নির্দ্দয় হইয়া কে ভাঙ্গিয়া দিল রে? আমরা যে দেখিয়াছি, ঘরে ঘরে কৃত্তিবাস কাশীরামের কাব্য লইয়া আলোচনা আন্দোলন; আমরা যে শুনিয়াছি, তরুণে তরুণে কণ্ঠ মিশাইয়া, বুকের জোরে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের উচ্চারণ'; আমরা যে দেখিয়াছি, সকল স্বার্থের বাঁধন নিমিষে ঘুচাইয়া তরুণকে স্বদেশীপণ্য মাথায় লইয়া পল্লীতে পল্লীতে গ্রামে নগরে ফিরি করিতে; আমরা যে দেখিয়াছি, অভিসন্ধি-হীন অকপট হৃদয়ে, না ডাকিতে দেশের কর্ম্মক্ষেত্রে অসংখ্য তরুণকে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইতে; আমরা যে দেখিয়াছি, অন্নহীনের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে তরুণের আকুলতা, আর্ত্তের সেবায় তরুণের আত্মদান, দেবতার মন্দিরে করপুটে ভক্তির অর্ঘ্য দিতে তরুণের মহামেলা—আজ সেই প্রাণের সাড়া তেমন করিয়া পাই না কেন? তেমন উদার সরল প্রাণে তরুণে তরুণে মিলনের সভায় প্রাণে তো আর উৎসাহের আগুন জ্বলে না, পথে তো তেমন করিয়া সারি দিয়া তাহাদের শোভাযাত্রা দেখি না! পথিকের নয়নে দেশভক্তির গরিমা ঝিলিক দিয়া জ্বলিয়া উঠিত, কুলাঙ্গনার হিয়ায় হিয়ায় শ্রদ্ধা ও নতির প্লাবন বহিত! হয়তো এই সবই আছে—পথে আজি, ঝাণ্ডা তুলিয়া দেশব্রতী অভিযান করে, আজিও সেবার ক্ষেত্রে, স্বদেশী পণ্যসম্ভারের নির্ম্মাণ যজ্ঞেও তরুণের ভীড় বাড়িয়াছে; কিন্তু নয়নে সে কমনীয়তা, ওষ্ঠপুটে তৃপ্তির সে মাধুরী, সর্ব্বাঙ্গে সে পবিত্রতার নবনীত-লাবণ্য যেন উছলিয়া উঠে না! সেদিন বাঙালীর প্রাণ যাচিয়া দিবার প্রেরণায় এমন কি ছিল, যাহার মধ্যে দাবী ছিল না, অভিসন্ধির লেশমাত্র অনুভূত হইত না, নির্ব্বিচারে-নিঃসঙ্কোচে একান্ত অপরিচিত দেশকর্ম্মীকে বুকের কাছে পাইলে নিবিড় আলিঙ্গনে গলা ছাড়িয়া গান বাহির হইত—
"ভাই ভাই এক ঠাঁই; ভেদ নাই, ভেদ নাই!"

কিন্তু আজ কি দেখিতেছি?

জাগিল বাঙালীর প্রাণ আর সে প্রাণ লুট করিয়া লইল বাঙলার বাহির হইতে বর্গীর দল আসিয়া; দলে দলে বাঙালী প্রতিশ্রুতি লইল স্বদেশীবস্ত্র-পরিধানের, বাঙলার বাহির হইতে স্বদেশীর ছাপ লইয়া আসিল ম্যান্‌চেষ্টার—সরলচিত্ত বাঙালী ঘরের কড়ি দিয়া তাহাই মাথায় তুলিয়া লইল। বাঙালী প্রতিজ্ঞা করিল দেশের দেওয়া মোটা কাপড় কটিতটে জড়াইবে, সে প্রেরণা সিদ্ধ করিল অ-বাঙালী। বাঙালী শপথ করিল স্বদেশী লবণ, স্বদেশী শর্করা ছাড়া বিদেশী দ্রব্য স্পর্শ করিবে না; লিভারপুল, এডেন, মরিসস সে অভাব পূরণ করিল স্বদেশী মার্কায়। বাঙালীর রক্তে তিলে তিলে পুষ্ট হইল অ-বাঙালী। পূরণের পথ রুদ্ধ থাকায় মরণে সে ধীরে ধীরে নির্জ্জীব হইয়া পড়িল। পেটের অভাবের সঙ্গে হৃদয় শূন্য হইল; মেধা, প্রতিভা সব হারাইয়া বসিল—বাঙালী আজ যে তিমিরে সে তিমিরে। বাঙালীর এখনও প্রচেষ্টা আছে, ধৃতি নাই; বুদ্ধি আছে, বিজ্ঞান নাই; দেহ আছে, কিন্তু শক্তিহীন; হায়, বাঙালী, বুঝি তোমার আত্মদানের ফল আত্মদান ছাড়া আর কিছু নহে! বাঙালী প্রাণের আবেগে প্রাণ দিয়াই খালাস পায়। প্রাণ ফিরিয়া পাওয়ার একটি যে দিব্য বৈশ্যবৃত্তি আছে, তাহা সে শিখে নাই। রাজপুত জাতির মত সে কি সর্ব্বক্ষেত্রেই এমন করিয়া আত্মবলি দিবে?

বাঙালী শস্য উৎপন্ন করিবে, কিন্তু বিক্রয় করিবার কৌশল তাহার নাই; বাঙ্গালী যৌথ কারবার আরম্ভ করিবে, কিন্তু তাহা চালাইবার সততা নাই। বাঙালী ব্যাঙ্ক খুলিবে,

জীবনবীমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করিবে; কিন্তু তাহার এই সকল প্রযত্নের পরিণাম অবাঙালীর হাতে তুলিয়া দেওয়া।

বাঙালী এমনই আত্মহারা—সে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া মার খাইবে, সমাধানের ব্যবস্থায় তাহাকে দূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। সুফল আদায় করিবে অ-বাঙালী। বাঙালী রাষ্ট্রসাধনায় জেলে যায়, ফাঁসী-কাষ্ঠে ঝুলে, দৈন্যের পীড়নে আত্মঘাতী হয়; কিন্তু রাষ্ট্রফলের অর্জনকালে দরবারে তার সাড়া নাই, ঠাঁই নাই। কবি বাঙালীকে দেওয়ার খেলা শিখাইয়াছিলেন, দিতে দিতেই সে নিঃস্ব হইল; কিন্তু নিঃস্বের অন্তরে যদি তৃপ্তি ও শান্তি থাকিত, দেওয়ার খেলাই শ্রেয়ঃ হইত—তাহার একান্ত অভাবে ঘরে ঘরে প্রতিক্রিয়া, কেহ কাহাকেও আর প্রত্যয় করিতে প্রস্তুত নহে। অন্ধত্ব, পঙ্গুত্ব, জড়ত্ব এমনই সকলকে সঙ্কীর্ণচিত্ত করিয়া তুলিয়াছে, যে দারুণ দুর্ভিক্ষে প্রসূতি যেমন নিজের শিশুকেই উদরসাৎ করিয়া রাক্ষসী মূর্ত্তি ধরে, আমরা তেমনি গৃহ-বিপ্লবে নিজেদের মধ্যেই মারামারি-কাটাকাটি জুড়িয়া দিয়াছি। ওরে আত্মঘাতী বাঙালী! উদাহরণ দিয়া আর লেখনী কলঙ্কিত করিব না। বুঝিতে পারি না—স্বখাত সলিলে আজ আমরা ডুবিতে বসিয়াছি!

বিগত ত্রিশ বৎসর কাল বিগলিত বিদলিত বাঙলার শ্মশান-সমাজে অবহিত হইয়া যাহারা জীবনের বাণী উচ্চারণ করিয়া গেল, যাদের কণ্ঠের প্রতিধ্বনি উঠিল হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত; তাহাদের সে মাতৃ-বন্দনার সিদ্ধ ঋক্ কি এমন করিয়া ব্যর্থ হইবে? তাহাদের সে উদাত্ত আহ্বান দেবী জগদ্ধাত্রীর কি কর্ণগোচর হয় নাই? বাঙালী যে চাহিয়া আছে প্রতিদিন—নব প্রভাতের প্রতীক্ষায়। আশায়, উদ্দীপনায় সে যে কল্পনার চিত্র আঁকিয়া তুলে, উষারাগ-রঞ্জিত নির্ম্মাণ-রথে আরোহণ করিয়া দেবী ভারতী যেন তাদের জীর্ণ রিক্ত আসন পূর্ণ করিতে আগমন করিতেছেন! স্বপ্নঘোরেই তারা যে ক্ষীণ কম্পিত করে অব্যবহৃত ধূলিধূসরিত মঙ্গল-শঙ্খে জীর্ণ বক্ষপঞ্জর দুলাইয়া ক্ষীণ ফুৎকারে ধ্বনি তুলে, দেবীকে বরণ করিয়া লইতে। বাঙালীর এই শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্ত, আহ্বান-সঙ্গীতে মুখরিত কণ্ঠ নবযুগের ঘোষণাই করিল, বস্তুতঃ এ জাতি কি পড়িয়া রহিবে যে তিমিরে সেই তিমিরেই!

সূর্য্যোদয়ে হিমালয়ের শীর্ষদেশ যেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠে, ভারতাত্মার অভ্যুত্থান-যুগের বালারুণ-সম্পাতে বাঙালীও সেইরূপ বুঝি ঝলসিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বাঙলার আকাশে কি মেঘ ঘনাইয়া উঠিল, যে নব-রবিকরোজ্জ্বল আনন্দোৎসবে তার প্রাণ পুলকোচ্ছ্বাসে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল না! বাঙালীর প্রেরণা ছিল নবজন্ম-লাভের, সে বুঝি অতীতের সম্মোহনে আপনার চক্ষু ঢাকিয়া—অতীতের আসক্তিতে আবার তাই জড়াইয়া পড়িল! মানুষের নবজন্ম তাহার পুরাতন কলেবর জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় পরিত্যক্ত না হইলে যেমন সম্ভব হয় না, বাঙালী যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল তাহা সিদ্ধ করিতে হইলে, তেমনই তাহাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে অতীতের রীতি-নীতি, আচার ব্যবহার, সমাজের সঙ্কীর্ণ বিধান, শিক্ষা দীক্ষা, সাধনার বিকৃত নীতি। গীতার বাণী সমর্থন করিয়াই তাহাকে যে আজ বলিতে হইবে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য"—আর এই মন্ত্র সিদ্ধ করিতেই যে তাহার নব সাধনার সূত্রপাত, 'সু'-'কু' সকল দ্বন্দ্ব জীবনের কলুষ ও আবর্জ্জনা যাহাই কিছু আশ্রয় করিয়া থাকুক না, সব বিসর্জ্জন দিয়াই তো ভারতের স্বপ্ন সফল করিতে হয়—"দেবায় জন্মনে।"

বাঙালী জাগিয়াছিল যে লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া, বুদ্ধি-দোষে, তাহাই হইয়াছিল গৌণ। সে ভুলিয়া গিয়াছিল বঙ্গ-ভঙ্গ রোধ করার সঙ্কল্প লইয়া তাহার যে জাগরণ তাহা লক্ষ্য নহে, উপলক্ষ্য মাত্র। স্বার্থ-বিদ্বেষ-বিপ্লব, অশুদ্ধ চিত্তের জটিল আত্মপ্রকাশ, বিকট বীভৎস কোলাহলের মাঝে বাঙালীর অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি সেদিনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই; শনৈঃ শনৈঃ সে গড়িয়া তুলিতেছিল অসংখ্য প্রকার প্রতিকূল অবস্থা ও ঘটনার মধ্যেই বিজ্ঞান, সমাজ, ধর্ম্ম; উদ্ধার করিতেছিল নষ্টশিল্প, ইতিহাস, দর্শন; রচিয়া তুলিতেছিল পুরাণ, সাহিত্য, কাব্য। কিন্তু অকস্মাৎ তার উদীয়মান সেই প্রাণকে মধ্যপথে কে যেন বিপথগামী করিয়া দিল; প্রেমের দীক্ষা ব্যর্থ হইল, ঐক্য আর সিদ্ধ

হইল না! তির্য্যক্ পথে মুষিকের ন্যায় অন্ধ মৃত্তিকা-গর্ভপথে অনির্দ্দিষ্ট যাত্রায় ছুটিয়া ছুটিয়া সে পরকে আপন করার সাধন-ভ্রষ্ট হইল। অপরিচয়ে ভেদের মাত্রাই বাড়িল। অনিয়ন্ত্রিত প্রাণশক্তি হারাইয়া বাঙলায় যে গঠনের স্বপ্ন সার্থক হইয়া উঠিতেছিল তাহা ব্যর্থ হইল, বিধ্বস্ত হইল। প্রাণের অভাবেই ধন-দৌলত-বৃদ্ধির যৌথ-কারবার-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইল স্বার্থপরতায়, বিশ্বাসঘাতকতায়। বড় সাধের বঙ্গলক্ষ্মী, বেঙ্গল ন্যাশান্যাল বাঙালীর তিলে তিলে রক্ত-দেওয়া কড়ি দিয়ে গড়া বাঙলার জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি 'ফেল্' হইয়া গেল। বাঙলার দুর্নাম যেন আর মুছিবার নহে, বাঙলার গঠন-প্রেরণা যেন জুয়াচুরি। আজ সত্য প্রেরণা, সাধুপ্রয়াসই সার্থক হয় না; অন্য দেশবাসী দূরে থাক, বাঙালীই আর বাঙালীকে বিশ্বাস করিতে চাহে না।

কিন্তু বাঙালীর জাগরণ-যুগের সূচনায় যদি ঈশ্বর-প্রেরণাই থাকে, বাঙালীর নবজন্ম-লাভের ইষণা যদি সত্য হয়, তবে আজিকার এই অন্তর-বাহিরের অসংখ্য প্রতিকূল ঘটনাবলী বিদীর্ণ করিয়া, একদল নিঃস্বার্থ উলঙ্গপ্রাণ নর-নারীকে গঠন-যজ্ঞে অগ্রসর হইতেই হইবে। সকল বাধা অতিক্রম করিয়া, ভারতীর মন্দির-দুয়ারে তাহারা আসিয়া দাঁড়াইবে। তিলে তিলে প্রাণ ঢালিয়া বাঙলার গঠন-তীর্থ তাহারা জাতি-তীর্থে পরিণত করিবে। বাঙালী নিশ্চয় করিয়া উদ্বুদ্ধ কণ্ঠে বলিবে—এ জাতি মরিবে না, ভগবানের আশীর্ব্বাদ-দৃপ্ত বাঙালী অমর জাতি।

করিতে হইবে কি? আজ ত্রিশ বৎসর পরে বাঙলার সে মৌলিক গঠন-প্রেরণা সমগ্র ভারতে লীলায়িত ছন্দিত হইয়া উঠিতেছে। বিচক্ষণ মনীষী গোখেলের মহাবাণী তাই তো ব্যর্থ নহে। কিন্তু বাঙালী তো শুধু বাণীমূর্ত্তি নহে, সে শিল্পী ও স্রষ্টাও। পরানুকরণ-প্রবৃত্তির দায় ও পরাভিসন্ধির সম্মোহন হইতে মুক্ত হইয়া তাহাকে আজ সর্ব্বতোভাবে গঠন-যজ্ঞে ঋত্বিকের আসন পরিগ্রহ করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে—বাঙালীকে বাঁচাইবে বাঙালী, অন্য কেহ নহে।

এই সঙ্কট-যুগে বাঙলার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া তাহার প্রেরণা-সিদ্ধির জন্য, চাই আত্মভোলা অসংখ্য বীর্য্যসম্পন্ন নরনারী। নির্ম্মাণের খনিত্র হস্তে কল্যাণমূর্ত্তি লইয়া দলে দলে সকল জীবন-ক্ষেত্রই তাহাদের অধিকার করিয়া লইতে হইবে। অসংখ্য প্রকার বাধা, অন্তরে বাহিরে সংশয়, নৈরাশ্য, অবসাদের ঘন-কুহেলিকা ভেদ করিতে করিতেই তাহাদের ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। সম্মুখে যদি আসন্ন মুক্তির মায়া-চিত্র আঁকিয়া উঠে, মনে রাখিতে হইবে—নির্ম্মাণ সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত মুক্তির দেবতাকেও ফিরাইয়া দিতে হইবে।

এ দেশ ভারতবর্ষ—রুশ, জার্ম্মাণী, ইটালী নহে। আত্মগঠনের পরমানুভূতি জাতির অন্তরে অন্তরে মূর্ত্তি লইয়া প্রকাশিত না হইলে আমাদের মুক্তির লালসা প্রলোভন ব্যতীত আর কিছু নহে। উহাতে উপস্থিত আকৃষ্ট হইলে আমাদের মৃত্যুর পথই সুপ্রসারিত হইবে। স্মরণ রাখিও ভারতের বাণী—

"অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মম শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥"

জাতিকে ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মস্বরূপ করিয়া তুলিতে হইলে, ভারতের সনাতন ধর্ম্মকে জাগ্রত ও প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, একদল সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীই জাতির শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ও অর্থ-প্রতিষ্ঠানে আগাইয়া দাঁড়াইবে। পুরাতন চর্ম্মাধারে নূতন মদ্য সংস্থাপিত করিলে যেমন অপচয় হয়, তেমনি ভারতের বৈদ্যুতিক ধর্ম্ম বর্ত্তমানের দীর্ণ আধারে অবধৃত হইবে না। এই আত্ম-নির্ম্মাণের পথে মূল-ধন— আমাদের প্রাণ। সেই প্রাণ ভগবানে উৎসর্গ করিয়া বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। ভারতীর চিরস্থায়ী মন্দির-রচনায় সেই প্রাণেরই প্রয়োজন। দ্বেষ-হিংসা-জর্জ্জরিত প্রাণ লইয়া যদি দেবকার্য্যে অগ্রসর হও, সে প্রাণ অসুর-ভোগ্যই হইবে। তাই উপসংহারে বলি, আমরা জন্মিয়াছি সেই দেবতার জন্য, যিনি "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভূত-মহেশ্বরম্"। তাই ঈশ্বরে যোগ-যুক্ত জীবনই বাঙলার কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রবর্ত্তী হউক। দেবতার কাজে আজ দিব্যচরিত্র নরনারীরই প্রয়োজন হইয়াছে।

সাধন জম্‌তে দাও ধীরে ধীরে। "শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ।" কত যুগ খেয়েছে তোমায় বাসনায় ও অহঙ্কারে। সে ক্ষতময় দেহ হয়ে গেছে তোমার স্বাভাবিক অবস্থা। নিজের যথার্থ স্বরূপ ও গতি পাওয়া কি সহজ কথা!

ব্যস্ত হয়ো না কেউ। কেবল দেখে' যাও—তোমার আত্মার অভ্যুত্থান। ধীরে ধীরে তার উন্নীত অবস্থাই হচ্ছে।

ইষ্টের প্রতি তোমার যে অনুরাগ, তার মধ্যে যতক্ষণ স্বার্থ-গন্ধ, ততক্ষণ সে অনুরাগ সত্য রূপ নেয় নি। কিছু দিয়েও যেমন তাঁকে পাওয়া যায় না, তেমনি তাঁর কাছ থেকে কিছু পেয়েও তুমি তৃপ্তি পাবে না। ইষ্ট তোমার অমিশ্র প্রাণের অসাধারণ ও অপার্থিব নিধি। তাঁকে আশ্রয় করা নিরাশ্রয় হওয়ার নামান্তর। অবলম্বন যখন সব খসে' পড়্‌বে, তখনই তোমার আশ্রয় হবেন—স্বয়ং নারায়ণ। সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় সেই দিনই হবে তোমার অটুট ও অকাট্য।

তুমি ভালবাস তোমার সবখানি দিয়ে, তুমি চেয়ে আছ তাঁহার পানে অবহিত হয়ে, তখন তোমার অপ্রত্যয় হবে কেন ভগবানে? তোমার চেয়ে থাকাই তো ভগবানের কাছে থাকার লক্ষণ। তাঁকে মনে রাখায় তোমার কোনও বাধা নাই—মনে মনে এক হওয়াই তো আগে চাই।

যখনই সব বিসর্জ্জন দিয়ে তোমার দৃষ্টি পড়ে ভগবানে—তখনই তুমি আর ইষ্টে মিলে দু-জনে এক হয়ে যাও। যখন সব মন উজাড় করে' দাও তাঁকে, তখনই তোমার স্মরণের মাঝে তিনিই মূর্ত্ত হয়ে উঠেন। এই প্রেম ও ঐক্যের বন্ধন কি তোমার কেবল একার বস্তু? তা' নয়। তাঁর মন না পেলে তোমার মন তুলে' দিবে কোথায়? তাঁর দেখা না পেলে তোমার শূন্য দৃষ্টি যে ফিরে' যায়—তাই অদর্শনের ব্যথা সত্য নয়। স্থির থাক ভগবানে, সাধনার জয় অবশ্যম্ভাবী। অতএব ধৈর্য্যহীন হয়ো না।

* * * * *

তুমি যতটুকু ভগবানে তুলে' দিবে, ততখানি হবে অম্লানোজ্জ্বল; যেটুকু ভগবানে না পৌঁছায়, সেইখানেই থাকে বিরক্তি ও ব্যাধি। তাহা কেবল মানুষের অস্পৃশ্য নহে, ভগবানও সেইখানে বিমুখ।

অহমিকা অজ্ঞতা। উহা পদে পদে অন্ধকার সৃজন করে। বিশ্বের জ্ঞান তার কাছে ধরা দেয়, যে ভগবানে তার সবখানি তুলে' দেয়। ঈশ্বরের মানুষ যে হবে না, তার কাছে ক্রমে এসব কথা তিক্ত মনে হবে। প্রথম প্রথম হবে খুব অনুরাগ; তারপর আসবে অসূয়া। যার একটুখানি অংশও ভগবানে উপনীত, সে ইহা নিজেই বুঝে; কিন্তু কাপট্য যার সবখানি, তার এ দৃষ্টিও রুদ্ধ থাকে।

গীতার ধর্ম্ম জীবনে অনুবাদিত হওয়া—এ সাধনা তত সহজ নয়। কিন্তু ঈশ্বরে সব দিলে যেমন জ্ঞানেরও কিছু বাকী থাকে না, তেমনি ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন জীবনও পরিপূর্ণ হয়ে উঠে—জরা, মৃত্যু সেখানে কোনও দুঃখ দিতে পারে না।

সাধনার ক্রম আছে, তাই তুল্যবোধ এখানে চলে না। কেউ দিয়েছে এক ফোঁটা হৃদয়, আর কেউ দিয়েছে হৃদয়টাকে উজাড় করে'; অন্তে দিয়েছে হৃদয় প্রাণ সবখানি, কিন্তু বাঁচিয়ে রেখেছে বুদ্ধি—অপরে বা সব দিয়ে দেহটাতে আটকে আছে। এখন, এই সব মানুষ কখনও তুল্য হতে পারে? তুল্যবাদ নিছক কল্পনা। সাধক যে সে এই সব দিকে দৃষ্টি দেয় না, অবহিত চিত্তে সকল অবস্থাই বরণ করে' নেয়—উৎসর্গকে সফল করে' তুলে। সাধনায় ফাঁক থাকলেই অবান্তর আদর্শবাদ বা কল্পনা স্থান পায়। এই সব বিসর্জ্জন দিয়ে, সর্ব্বাবস্থায় উৎসর্গকে শুদ্ধ ও সিদ্ধ করে' তোল। ইহারই উপর নিরাময় জীবন সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

* * * * *

চাই একটা উজান দিব্য গতি। স্বভাবের হাতে আত্মসমর্পণ কর নি, করেছ ভগবানের হাতে—এখানে গর্ব্ব করার কিছু নেই। গর্ব্ব আসে, সাধক যে ভগবান, এই কথা যখন বিস্মরণ হও। অহঙ্কার কে রাখে, কে না রাখে, কারও বাহিরের আচরণ দেখে' তা' নিশ্চয় করে' বলা যায় না। 'অহং' থাকলে বাধা বেশী; তাই বলি 'অহং' ছাড়।

শুধু ধ্যানে, ধারণায়, স্বাধ্যায় প্রভৃতির সহায়ে 'অহং' যায় না—উহা যায় নিষ্কাম কর্ম্মে। কর্ম্মের কর্তৃত্ব, কর্ম্মফল ও কর্ম্মে আসক্তি যার যত নাই, সে তত নিরহঙ্কার। কর্ম্ম না করলে 'অহং' থেকে যায়। আবার এই কর্ম্মই হয় বন্ধন, যদি তা' যজ্ঞ-স্বরূপ না হয়। যে ভগবানের জন্য কর্ম্ম করে, সেই 'অহং'-মুক্ত হয়।

সঙ্ঘ ইহারই সিদ্ধ ক্ষেত্র। এখানে প্রয়োজন প্রেম, সম্বন্ধ, ভাগবত তত্ত্ব; আর সব গৌণ। আশ্রয়ে সব কিছু তুলে' দেওয়াই এই তীর্থের স্বধর্ম। তাই যখন কেহ নিজেকে কেন্দ্র করে' কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করে, তখন তা' ভয়ের কারণ হয়। মানুষ যে স্বভাব, মন, বুদ্ধি নিয়ে জন্মেছে, তার উৎসর্গ সম্পূর্ণ না হ'লে দিব্য মন, বুদ্ধি, স্বভাব লাভ করা যায় না। উৎসর্গের ক্ষেত্র-নিরূপণ হওয়াই জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি; তারপর, সাধন।

* * * * *

কথা হচ্ছে, জীবনের দায়িত্ব-বোধ নিয়ে। ভগবানের মানুষ-বলে' যে জ্ঞান সেটা পাকা হয় না, যদি জীবনের ক্ষেত্রে তা' স্থায়ী বৃত্তি রূপে প্রতিষ্ঠিত না হয়। যেমন গভর্ণমেণ্টের লোক বল্‌তেই তার একটা বৃত্তি ও সেই সঙ্গে গুরুতর দায়িত্ববোধের ধারণা আসে। ভগবানের মানুষ বলতে এর চেয়ে কত বড় স্থায়ী দায়িত্ববোধ মনে হওয়া উচিত তা' ভেবে' দেখো। সমগ্র জীবন-বৃত্তিই এখানে আনুগত্যের সাধন-যুক্ত। "প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং" আবার "সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ"—বিরামহীন সেবায়, নিষ্ঠায়, অনুস্মরণে ইহা সতত মহিমাময় ও গৌরবপূর্ণ।

গীতায় কর্ম্মের সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ করা হয়েছে—"ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ।" ভূত, যাহা জাত; ভাব, যাহা অব্যক্ত প্রকৃতির গর্ভস্থ কিন্তু প্রকাশমান; আর উদ্ভব, যাহা এই উভয় অবস্থার মধ্য দিয়া পরিণতির জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। এই ত্রিবিধ বিসর্গ বা creative missionই গীতোক্ত কর্ম্ম। এই কর্ম্ম সকলেই করে। যে 'না' বলে, সে অজ্ঞানী। তবে গুণাদি-ভেদে এই কর্ম্মের প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার।

মানুষকে কর্ম্মে নিয়োগ করে অন্য কেহ নয়, স্বয়ং প্রকৃতি কর্ত্তৃক তাহার কার্য্য নিয়মিত হয়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা প্রভৃতি স্বতঃই অনুষ্ঠিত হয়। যে তামসিক গুণযুক্ত, সে অস্পষ্ট, মোহাচ্ছন্ন, আলস্য-বিজড়িত; যে রাজসিক সে উদ্যত আবার কখনও কখনও অবসাদগ্রস্ত, অস্থির, দম্ভযুক্ত; আর সাত্ত্বিক সে স্থির, অনলস, ধৃতিশীল, ভগবন্নিষ্ঠাপরায়ণ। প্রকৃতি-বশেই মানুষে কর্ম্ম করে, সে কর্ম্ম এইরূপে গুণযুক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু যজ্ঞ-স্বরূপ কর্ম্মই পরম গতির কারণ হয়। এই গতিই divine motion. এই পর্য্যায়ে মানুষ আসে পর পর পর্য্যায় অতিক্রম করে'।

সঙ্ঘে তাই কর্ম্ম-ভেদ দেখা যায়। এই কর্ম্ম তোমার আমার প্রয়োজন-বোধ থেকে হয় না; স্ব-স্ব ভাব-বশেই ইহা অনুষ্ঠিত হয়। বাহিরের সংঘাতে ইহা সমষ্টি-কল্যাণের অনুপ্রেরক হয়। তামস কর্ম্ম নগণ্য, উপেক্ষণীয়; রাজস কর্ম্ম সংঘর্ষ-সৃষ্টি করে; সাত্ত্বিক কর্ম্ম লোকহিতানুষ্ঠান-তৎপর—আর ভাগবত কর্ম্ম বিরাট্, স্বয়ং প্রকাশ-স্বরূপ।

নিরহঙ্কার চিত্তে যে ভাগবত যজ্ঞে আত্মদান করে, তাহার সকল পর্য্যায়ের কর্ম্মই তাঁহাতে সমুন্নীত হয়ে বিসর্গাখ্য নিত্য কর্ম্মের স্বরূপ অনায়াসে প্রাপ্ত হয়। এই নিত্য কর্ম্ম তোমাদের জীবনে বিশুদ্ধভাবে লীলায়িত হউক, তবেই সঙ্ঘ ভাগবত শক্তির প্রতীক-রূপে ধর্ম্মের নূতন আদর্শ জগতে স্থাপন করবে।

বৈশ্বানর আত্মা

শ্রীভবানীপ্রসাদ নিয়োগী বি-এ

প্রশ্ন হইতেছে, বৈশ্বানর আত্মাই কি বিশ্বরূপ পরব্রহ্ম বা পরমেশ্বর?

বেদান্ত-সূত্রকার এই প্রশ্নের "হাঁ" এই উত্তর দিয়াছেন (১।২।২৪—৩২)। ঐ সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যে পাই—"বৈশ্বানরঃ পরমাত্মা" (১।২।২৪), "পরমেশ্বর এব বৈশ্বানরঃ (১।২।২৫)। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা এই মতের খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিব।

ছান্দোগ্যোপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের একাদশ হইতে অষ্টাদশ—এই আট খণ্ডের প্রকরণ হইতেছে "বৈশ্বানর আত্মা"। ত্রয়োদশ ও অষ্টাদশ খণ্ডে "বিশ্বরূপ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহা বৈশ্বানর আত্মার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয় নাই, সূর্য্যের বিশেষণ-স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে—ঐ কথার অর্থ নানাবিধ রূপযুক্ত। আমি "উপনিষৎসমূহের প্রতিপাদ্য" শীর্ষক প্রবন্ধে যে বিশ্বরূপের কথা বলিয়াছি তিনি সূর্য্য নহেন, তিনি হইতেছেন সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রাদির সৃষ্টিকারী পরম দেবতা। Nebula বা নীহারিকা হইতে সৃষ্ট Archæan rock বা গ্রাণাইট পাথরের আদিম বিশ্ব বা দেশ তাঁহার বিগ্রহ বা রূপ—তাই তিনি বিশ্বরূপ। ঐ দেশকে সৃষ্টি-কর্ত্তাই শ্যামবর্ণ দিয়াছিলেন, উহাকে দ্বিভুজ-বংশীধারী করিয়াছিলেন, উহার দক্ষিণ পদকে বাঁকাইয়া বাম পদের উপর স্থাপন করিয়াছিলেন—এইজন্য পরম দেবতাকে "অজ একপাদ" বলা হয়; ঐ কথার অর্থ এক পায়ের উপরে দাঁড়ান দেবতা।

পরমাত্মা এই বিগ্রহ বা প্রতিমাতে প্রবেশ করিয়া নিজেই "শ্যাম" সাজিয়াছিলেন—তাই ছান্দোগ্যোপনিষৎ তাঁহাকে "শ্যাম" আখ্যা দিয়াছেন।

আচার্য্য শঙ্কর গীতার দ্বাদশাধ্যায়ের ভাষ্যে বিশ্বরূপ কৃষ্ণকেই পরমেশ্বর এবং উপাস্য বলিয়াছেন এবং তাঁহাকে পাওয়াই যে পরম পুরুষার্থ একথা বলিয়াছেন। নিম্নলিখিত শ্লোকসমূহের শাঙ্কর ভাষ্যে পাই :—

১—"বিশ্বরূপং ত্বদীয়ং দর্শিতমুপাসনার্থমেব ত্বয়া... ।"

২—"ময়ি বিশ্বরূপে পরমেশ্বরে আবেশ্য সমাধায় মনঃ।"

৬—"বিশ্বরূপং দেবং।"

৭—"ময়ি বিশ্বরূপ আবেশিতং সমাহিতং চেতো-যেষাম্।"

৮—"ময্যেব বিশ্বরূপ ঈশ্বরে মনঃ—স্থাপয়।"

৯—"তেনাভ্যাসযোগেন মাং বিশ্বরূপমিচ্ছ প্রার্থয়-স্বাপ্তুং প্রাপ্তুম্।"

তৈত্তিরীয় উপনিষদে সেই বিশ্বরূপ কৃষ্ণকেই "ছন্দসাং ঋষভো বিশ্বরূপঃ"—বেদসমূহের প্রতিপাদ্য শ্রেষ্ঠ দেবতা, "বিষ্ণু" এবং "প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে। তৈ ১।৪ তৈ ১।১।

কঠোপনিষদে সেই বিশ্বরূপ কৃষ্ণকেই বৈদান্তিক সাধন-পথের শেষে অবস্থিত বিষ্ণুর পরম পদ বা পূজনীয় স্বরূপ (কঠ ৩।৯) এবং পরাগতি পরম পুরুষ বলা হইয়াছে। (কঠ ৩।১১)।

এই পরম পুরুষের নিষ্কাম উপাসনায় যে শোকজনক জন্ম মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, একথা মুণ্ডকোপনিষদে আছে (মু ৩।২।১)।

ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে বলা হইয়াছে, ইনি আদিম বিশ্ব ব্যাপিয়া ছিলেন। ঋগ্বেদোক্ত এই বিশাল মস্তকাদিযুক্ত বিরাট্ পুরুষকে আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের অবতার বর্ণনায় (শ্রীমদ্ভা ১।৩।১—৫) শ্রীভগবানের "পুরুষ" নামক আদিম অবতার-রূপে পাই। উহাতে বলা হইয়াছে, ঐ পুরুষা-বতার নানা অবতারের নিধান। আমরা বরাহ ও নৃসিংহকে এই মহাসমুদ্র মধ্যে শয়ান পুরুষাবতারের অঙ্গে পাই। মৎপ্রণীত "বাঙ্গালি নামের অর্থ কি?" এই গ্রন্থে

ভারতবর্ষের geological map প্রকাশিত হইয়াছে *। উহাতে এই একপা বাঁকান বিরাট্ পুরুষ এবং বরাহ ও নৃসিংহকে পাওয়া যাইবে (১২৩—১২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ঐ পুরুষ মূর্ত্তির মস্তক যে সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছে, ইহার বহু প্রমাণ ঋগ্বেদ ও পুরাণাদিতে আছে এবং আমার অপ্রকাশিত গ্রন্থসমূহ ও প্রবন্ধাদিতে আলোচিত হইয়াছে। এ স্থলে কেবল স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক উল্লিখিত ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের প্রমাণ এবং দেবীভাগবতের প্রমাণের উল্লেখ করিব।

দত্ত মহাশয়ের সানুবাদ ঋগ্বেদের ১।২২।১৬ ঋকের পাদটীকায় পাই :—"শতপথ" ব্রাহ্মণে (১৪।১।১) বিষ্ণুর সকল দেবের মধ্যে প্রাধান্যলাভের এবং তৎপরে তাঁহার মস্তক ছিন্ন হওয়ার কথা আছে এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (৫।১) ও পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে (৭।৫) এই উপাখ্যান পাওয়া যায়।"

দেবীভাগবত ১ম স্কন্ধ পঞ্চম অধ্যায়ে পাই :—"সেই সময়ে একটা ভীষণ শব্দ হইল, তাহাতে দেবগণ ভীত হইয়া উঠিলেন, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ক্ষুভিত হইল, পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল, সমুদ্র উদ্বেল হইল, উগ্র বায়ু বহিতে লাগিল, পর্ব্বত সকল কাঁপিতে লাগিল—ইত্যবসরে দেবদেব বিষ্ণুর মুকুট-কুণ্ডল-সমন্বিত মস্তক কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।" ২৩—৩০

"অনন্তর সেই ভীষণ অন্ধকার প্রশমিত হইলে ব্রহ্মা ও মহাদেব বিষ্ণুর মস্তক-হীন বিকৃত শরীর দেখিতে পাইলেন। সুরগণ বিষ্ণুর সেই কবন্ধ-মূর্ত্তি দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন।

বাসুদেবের মস্তক লবণসাগরে পতিত হইয়াছে"।

—৩৮—৮৪

* "প্রবর্ত্তক" আশ্বিন ১৩৩৬ "বাঙ্গালি ও বঙ্গদেশের প্রকৃত ইতিহাস" শীর্ষক প্রবন্ধেও এই মানচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। "প্রবর্ত্তক" কার্ত্তিক ১৩৩৬ "প্রাগৈতিহাসিক মানব ও তাহার বাসস্থান পরিবর্ত্তন" শীর্ষক প্রবন্ধে এ দেশের Geology'র মূল তত্ত্বগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ দুই প্রবন্ধের প্রতি আমি "প্রবর্ত্তকে"র পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। স্বপ্রণীত "Notes on the History of Bengal Part I (p 67—72)তেও এ দেশের Geology সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাওয়া যাইবে।

ইহা ভৌসঙ্কোচিক ব্যাপার (Geological Event)-এরই বর্ণনা, আর বিষ্ণুর ঐ কবন্ধ-মূর্ত্তি Government of India কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'Geological Map of India'তে পাওয়া গিয়াছে।

ভূতত্ত্ববিদ্গণও অনুমান করেন, উত্তর ভারতে উপরোক্ত কবন্ধাকৃতিযুক্ত দাক্ষিণাত্যের গ্রাণাইট পাথরের দেশের Continuation (বিস্তৃতি) ছিল এবং উহা পরবর্ত্তী কালে ডুবিয়া গিয়াছে :—

"It is thought there was formerly a continuous chain connecting the Rajmehal range with the remains of the Peninsular System still in existence in Assam and that their subsidence was due to the same disturbances which resulted in the elevation of the Himalays" Art Geology p [illegible] Imp. Gazetteer Vol I.

ছান্দোগ্যাপনিষদের পঞ্চমাধ্যায়ে (ছা ৫।১১—১৮) বৈশ্বানর আত্মাকে বিশ্বরূপ, বিষ্ণু, বাসুদেব, বিরাট্ হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয় নাই।

ছান্দোগ্যে ইহার সপ্ত অবয়বের কথা পাই :—

১—স্বঃ বা নক্ষত্রলোক (Starry upper heaven) ইহার মস্তক।

২—ভুবর্লোক (Planetary mid-heaven)-এ অবস্থিত সূর্য্য (মুণ্ডকের মতে সূর্য্য ও চন্দ্র) ইহার চক্ষু।

৩—বায়ু ইহার প্রাণ।

৪—আকাশ বা Ether মধ্যদেশ।

৫—জল ইহার নাভির নীচের দেশ এবং

৬ ও ৭—ভূঃ বা পৃথিবী ইহার পাদদ্বয়।

ইহারা Concentric spheres (সমকেন্দ্রিক গোলকসমূহ), এইরূপ সপ্তাবয়ব-সমন্বিত কোন মূর্ত্তির কল্পনা আমরা করিতে পারি না। মুণ্ডকে আবার—

৮—দিক্ সকল—অর্থাৎ Unlimited space বা শূন্যকে ইহার কর্ণদ্বয় বলা হইয়াছে এবং

৯—বেদসমূহকে ইহার বাক্য বা জিহ্বা বলা হইয়াছে (মু ২।১।৪)।

ইহাতে গোলযোগ আরও বাড়িয়া গেল এবং
quare root of minus one ($\sqrt{-1}$) হইল ; উহার
থা বলা যায়, কিন্তু তাহাতে মনে কোন ধারণা বা
oncept হয় না।

আর সূর্য্য ও চন্দ্রকে যদি সত্য সত্যই এই হস্তবিহীন
বরাট্ পুরুষের দক্ষিণ ও বাম চক্ষু ধরা যায় এবং পৃথিবীকে
াদদ্বয়ের সমষ্টি ধরা যায়, তবে আমরা পাই, এই পুরুষের
াম চক্ষু হইতে দক্ষিণ চক্ষু দুই কোটি ষাট লক্ষ গুণ বড়
ার ইহার বর্ত্তুলাকার পাদদ্বয় দক্ষিণ চক্ষুর চতুর্দ্দিক্ দিয়া
এবং বাম চক্ষু পাদদ্বয়ের চতুর্দ্দিক দিয়া অনবরত ঘুরিতেছে
—এই বর্ণনা হাস্যেরই উদ্রেক করে।

এই বৈশ্বানর আত্মার ছান্দোগ্যোক্ত সপ্ত অবয়বের
কলগুলিই জড়, কিন্তু আত্মা জড় নহে। ইহার কৈফিয়ৎ
এইরূপ :—

ছান্দোগ্যে পাই, কেকয়-রাজ অশ্বপতির শিষ্যগণের
ধ্যে "আত্মা কি," "ব্রহ্ম কি" এই কথা লইয়া তর্ক হইয়া-
ছিল। তাহাদের একজনের মতে ব্রহ্ম বা বৈশ্বানর আত্মা
স্বঃ বা নক্ষত্রলোক ; দ্বিতীয় জনের মতে উহা সূর্য্যের লোক
ইত্যাদি। অশ্বপতি তাহাদের তর্ক শুনিয়া বলিলেন,
"তোমরা এইরূপ জড়ে আত্ম-বুদ্ধি লইয়া সুখে বিষয়ভোগ
করিতেছিলে, যদি আমার নিকট না আসিতে তবে
তোমাদের অত্যন্ত অনিষ্ট হইত। তেজোবহুল স্বঃ বা
নক্ষত্রলোক, তেজোবহুল সূর্য্যাদি-সমন্বিত ভুবর্ল্লোক, মরুৎ-
লোক, ব্যোমলোক (Ether) অপ্ লোক ও ক্ষিতিলোককে
যথাক্রমে বৈশ্বানর আত্মার মস্তক, চক্ষু, প্রাণ, মধ্যদেশ, উদর
ও পাদদ্বয় বলা হয় বটে ; কিন্তু এটা কথার কথা—
"প্রাদেশ" যেমন একটি মান (linear measure),
উহা দ্বারা যে দূরত্ব মাপা যায়, তাহার মধ্যেকার সকল
বস্তুকেই যেমন ঐ মানের অন্তর্গত বলা যায়, তেমনি
বৈশ্বানর এই প্রপঞ্চ বা সমস্ত জড়জগতের (অভিবি) মান
(measure), তাই জড়জগতের অংশ-সমূহকে উহার
অবয়ব বলা হয়।

ইংরাজীতে এই কথাই নিম্নলিখিত রূপে বলা হয়—
"The whole of the objective world is within
the subject."

ছান্দোগ্যোপনিষৎ একথা বলেন না যে, এই বৈশ্বানর
আত্মাকে উপাসনা করিলে পরমপুরুষার্থ লাভ হয় ; সুতরাং
এই বৈশ্বানর আত্মা পরমেশ্বর বা পরব্রহ্ম হইতে
পারেন না।

ছান্দোগ্যে পাই, ইঁহাকে যে জানে (বৈশ্বানরবিৎ—
শাঙ্করভাষ্য, ছা ৫।১৮।১)—'স সর্ব্বেষু লোকেষু, সর্ব্বেষু
ভূতেষু, সর্ব্বস্বাত্মসু অন্নমত্তি'—সে কৃষ্ণকে পিতা, মাতা,
সখা প্রভৃতি যে রূপে চায় সেই রূপেই মনে মনে ভোগ
করিতে পারে (সর্ব্বেষু লোকেষু), সকল সুন্দর বস্তুকেই
কৃষ্ণসেবার উপকরণ জ্ঞানে (সর্ব্বেষু ভূতেষু) এবং সকল
জীবকেই তাঁহার সেবক জ্ঞানে (সর্ব্বস্বাত্মসু) তাঁহার সেবা
করিয়া রস ভোগ করিতে পারে (অন্নমত্তি)।

বৈশ্বানর কথার আভিধানিক অর্থ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।
ইহা 'বিশ্ব' ও 'নর' এই দুই শব্দের সংযোগে হইয়াছে।
'নর' কথা 'নৃ' ধাতু হইতে হইয়াছে ; ঐ ধাতুর অর্থ
প্রাপ্তি। মানুষকে নর বলা যায়, যেহেতু সে ইন্দ্রিয় দ্বারা
বিষয়সমূহ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ গ্রহণ করে। বিশ্ব অর্থ
সমুদয়। প্রজ্জ্বলিত অগ্নির নাম বৈশ্বানর ; যে-হেতু উহাতে
যাহা নিক্ষেপ করা যায়, সেই সকলই সে নির্ব্বিচারে গ্রহণ
ও দগ্ধ করে।

বৈশ্বানর সম্বন্ধে বিদ্যালাভে ভোগ হয়, একথা
ছান্দোগ্যে পাইলাম ; কিন্তু সেই বিদ্যা কি তাহা ছান্দোগ্যে
নাই। সেই বিদ্যা মাণ্ডুক্যোপনিষদে পাওয়া গিয়াছে।

জীব-হৃদয়-স্থিত ভোক্তা বা জীবাত্মা, ভোগ্য বা
পরমাত্মা শ্যামসুন্দর এবং প্রেরয়িতা অন্তরাত্মা বা অব্যক্ত
নির্গুণ ব্রহ্মসংজ্ঞিত হৃষীকেশ—এই তিন আত্মার যৌথ নাম
"সর্ব্বং"। মাণ্ডুক্যোপনিষদে পাই, এই "সর্ব্বং"-সংজ্ঞিত
যৌথ আত্মার জাগ্রদবস্থার নাম "বৈশ্বানর," স্বপ্নাবস্থার
নাম "তৈজস" এবং সুষুপ্তাবস্থায় যখন ঐ তিন আত্মার
একীভাব হয় তখন উহার নাম "প্রাজ্ঞ"। এই তিনটি
নাম, এই তিন অবস্থার নিন্দা ও প্রশংসা এবং ইহাদের
সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে বৈদান্তিক সাধন-তত্ত্ব এবং সাধনের
ফল অতি সংক্ষেপে ও সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।
গীতার সাধন-তত্ত্বও যাহা, পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের সাধন-
তত্ত্বও তাহাই ; উপনিষৎসমূহের সাধনতত্ত্বও তাহাই :—

নিষ্কাম কর্ম্মযোগে নির্গুণ অব্যক্ত ব্রহ্ম বা হৃষীকেশের প্রেরণা অনুসারে হৃদিস্থিত ব্যক্ত ব্রহ্ম শ্যামসুন্দরের সেবা দ্বারা ভোগ, ধ্যানযোগে চিত্তবৃত্তির আংশিক নিরোধ করিয়া শ্যামসুন্দরের আন্তরিক ভোগ বা সবিকল্প সমাধি, এবং চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিতে তাঁহার সগুণ অর্থাৎ পরমানন্দ-পূর্ণ শ্যামসুন্দর বা শিবস্বরূপ উপলব্ধি এবং তাহাতে আনন্দ ভোগ এবং ইহার ফলে মরিয়া সেই সগুণ ব্রহ্ম অর্থাৎ শ্যামসুন্দর বা শিবে বিলীন হইয়া অনন্ত কালের জন্য পরমানন্দ ভোগ।

মাণ্ডুক্যে উপরোক্ত যৌথ আত্মা (পরমাত্মা-অন্তরাত্মা-জীবাত্মা বা শ্যামসুন্দর-হৃষীকেশ-জীবাত্মা)-র জাগ্রদবস্থার বর্ণনা এইরূপ :—

জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ, সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুগ্ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ। মা ৩

এই বৈশ্বানর আত্মার সপ্তাঙ্গ বা পরিমাপের বিষয় যে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, বোমাত্মক জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয়-সমূহ বা objective world তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই যৌথ আত্মার একোনবিংশতি মুখ হইতেছে—জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ, কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ, প্রাণাপানাদি পাঁচটি বায়ু, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং চিত্ত (মাণ্ডুক্যোপনিষদের শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

বেদান্ত-সূত্র (১।২।২৪—৩২)—স্মৃতি, জৈমিনি, আশ্মরথ্য, বাদরি প্রভৃতির উক্তি দ্বারা স্থাপন করিতে চাহেন—বৈশ্বানর আত্মাই পরমাত্মা বা পরমেশ্বর। কিন্তু পরমাত্মার ইন্দ্রিয় নাই, তিনি প্রাণ অপান প্রভৃতি দ্বারা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য করেন না, তিনি চেতোমুখ (মা ৫) অর্থাৎ তাঁহার মুখ ১৯টি নহে একটি; সেটি হইতেছে চেতনা। সুতরাং বেদান্তসূত্রের কথা টিকিল না; বৈশ্বানর আত্মা পরমাত্মা বা পরমেশ্বর নহেন।

অদ্বৈতবাদী মায়াবাদ অবলম্বন করিয়া বলেন, "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।"

এই বৈশ্বানর কি অদ্বিতীয়বাদী এক এবং অদ্বিতীয়-তত্ত্ব নির্গুণ ব্রহ্ম? না, তাহাও নহে—নির্গুণ ব্রহ্মের সাতটি অবয়ব এবং ১৯টি মুখ কোথা হইতে আসিবে? অদ্বৈতবাদে নক্ষত্রলোক, সূর্য্যচন্দ্রাদি গ্রহের লোক, মরুৎ, ব্যোম, অপ্ এবং ক্ষিতি, এই সমস্তই মিথ্যা; ইহারা নির্গুণ ব্রহ্মের অবয়ব হইলে নির্গুণ ব্রহ্মও মিথ্যা হয়েন। কিন্তু ইহারা বৈশ্বানরের সপ্ত অঙ্গ। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণবায়ু, মন, বুদ্ধি, অহংকার, এমন কি চেতনাও নির্গুণ ব্রহ্মের নাই—তিনি সন্মাত্র, তিনি কূটস্থ অর্থাৎ হিঁয়ালি দ্বারা আবৃত অচিন্ত্য ও অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" বৈশ্বানর সম্বন্ধে আমরা চিন্তাও করিতেছি, কথাও কহিতেছি। সুতরাং বৈশ্বানর মায়াবাদীর অদ্বয় তত্ত্ব, নির্গুণ সন্মাত্র ব্রহ্মও নহেন।

এই বৈশ্বানর নামক যৌথ আত্মার একটি বিশেষণ "বহিঃপ্রজ্ঞ," অসাধক পক্ষে ইহা নিন্দা—সে objective world-এরই কথা চিন্তা করে, subjective world বা অধ্যাত্ম জগৎ সম্বন্ধে তাহার কোন জ্ঞান নাই। সাধক পক্ষে "বহিঃপ্রজ্ঞ" কথা প্রশংসা—সে Nebula হইতে সৃষ্ট আদিম বিশ্ব বা ভূমিকে (ভূবি) তাহার হৃদয়াকাশ-রূপ ব্রহ্ম-পুরে অবস্থিত সর্ব্বজ্ঞ এবং চেতোমুখ, অতএব সর্ব্ববিৎ পরমাত্মা বা শ্যামসুন্দরের মহিমা অর্থাৎ পূজনীয়া প্রতিমা বলিয়া জানে (মু ২।২।৭), ইহা "প্রজ্ঞা" অর্থাৎ প্রকৃষ্ট জ্ঞান বটে। সে বহির্জ্জগতে যাহা কিছু নশ্বর বস্তু দেখে সেই সমস্তকেই শ্যামসুন্দরের সেবার উপকরণ বলিয়া জানে এবং তাঁহার সেবায় লাগায় (ঈশ ১-২)। ইহাও প্রজ্ঞা অর্থাৎ প্রকৃষ্ট জ্ঞানেরই কথা। অসাধকের "বহিঃপ্রজ্ঞ" বলিয়া নিন্দার মধ্যে সাধকের প্রতি "অন্তঃপ্রজ্ঞ" হইবার অর্থাৎ ভোগ্য পরমাত্মাকে এবং প্রেরয়িতা অন্তর্য্যামীকে জানিবার প্রেরণাও আছে।

বৈশ্বানর আত্মার অপর বিশেষণ "স্থূলভুক্"। অসাধক পক্ষে ইহা নিন্দা—প্রজ্জলিত অগ্নি যেমন নির্ব্বিচারে সকল বস্তুই গ্রহণ করে, অসাধকও তেমনি নির্ব্বিচারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সদসৎ সকল বিষয়ই গ্রহণ করে। সাধক পক্ষে "স্থূলভুক্" কথার মধ্যে প্রশংসা আছে। "স্থূল" কথা স্থূল্ ধাতু হইতে হইয়াছে, উহার অর্থ বৃংহণ, বৃদ্ধি। বৃংহণ কথা যে বৃদ্ধ্যর্থক বৃন্‌হ ধাতু হইতে হইয়াছে, ব্রহ্ম কথাও সেই বৃদ্ধ্যর্থক বৃন্‌হ ধাতু হইতে হইয়াছে; সুতরাং স্থূল কথার অর্থ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদ্বস্তু বা ব্রহ্মও হয়। তবেই "স্থূলভুক্"

অর্থ যে পরব্রহ্ম শ্যামসুন্দরকে হৃদয়ে রাখিয়া ভোগ করে। অসাধকের "স্থূলভুক্" বলিয়া নিন্দার মধ্যে সাধকের প্রতি প্রেরণা আছে 'তুমি "প্রবিবিক্ত"-ভুক্ হও'। (মা ৪)। (বিবিক্ত কথার অর্থ পৃথক্-কৃত। প্রবিবিক্ত কথার অর্থ শুভ, পবিত্র)। এই প্রেরণার অর্থ তোমার ১৯টি মুখের দ্বারা তুমি কৃষ্ণের প্রীতিকর বিষয়-সমূহই গ্রহণ করিতে থাক—তাহারাই "পবিত্র", তাহারাই তোমার "শুভ" করিবে। ইহা নিষ্কাম কর্ম্মযোগের প্রেরণা। ইহারই নাম কৃষ্ণে সর্ব্ব-কর্ম্ম-সমর্পণ, অর্থাৎ ঐহিক, পারত্রিক সকল কর্ম্মই কৃষ্ণের প্রীত্যর্থে করণ।

ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি যাহা বাহির হইতে ইন্ধন সংগ্রহ করে না, যে ইন্ধন হইতে তাহার জন্ম সেই ইন্ধনকেই ভোগ করে, তাহার নাম "তৈজস"। মাণ্ডুক্যে এই তৈজস অগ্নির সহিত তুলিত অসাধক পক্ষে স্বপ্নাবস্থায় অবস্থিত এবং সাধকপক্ষে ধ্যানযোগে সবিকল্প সমাধিতে অবস্থিত যৌথ আত্মার এই রূপ বর্ণনা আছে :—

স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতি-মুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ। মা ৪

স্বপ্ন-কালে সাধারণ মানুষের objective world সম্বন্ধে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলেও সে একটি অলীক objective world বা বহির্জ্জগৎ সৃষ্টি করে এবং তাহার দশ ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি অহংকার ও চিত্তও কার্য্য করিতে থাকে—তাই সে তখনও একোনবিংশতিমুখ; কিন্তু তাহার ভোগ যাহা হয় তাহা পৃথক্ রূপের—অর্থাৎ অলীক ভোগ, তাই এই ভোগকেও "প্রবিবিক্ত" বলা যায়। "সর্ব্বং"-সংজ্ঞিত যৌথ আত্মারও সবিকল্প-সমাধি-কালে চিত্তবৃত্তির বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধে নিরোধ হয়; কিন্তু সে কোন অলীক objective world সৃষ্টি করে না। তাহার objective world এক মাত্র তাহার উপাস্য পরমাত্মা অর্থাৎ চিদানন্দঘন পুরুষাকৃতি-যুক্ত শ্যামসুন্দর বা মহাকাল, যাহাকে মাণ্ডুক্যো-পনিষৎ "শিব" আখ্যা দেন এবং তাহার সহিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদসূত্রে যুক্ত অব্যক্ত বা গুরু-ব্রহ্ম অর্থাৎ হৃষীকেশ। সে তাঁহার হৃদিস্থিত উপাসক আত্মা, গুরুরূপী অব্যক্ত অন্তরাত্মা এবং উপাস্য পরমাত্মা, এই তিন আত্মা যে সৃষ্টির পূর্ব্বেকার পুরুষাকৃতি-যুক্ত চিদানন্দঘন অদ্বিতীয় পরমাত্মায় সুপ্রতিষ্ঠিত, একথা জানে (তস্মিংস্ত্বয়ং সুপ্রতিষ্ঠা……৮) এবং এই চারি আত্মার মধ্যে পার্থক্য এবং সম্বন্ধ জানে (অত্রান্তরং……বিদিত্বা—শ্বে ১।৭); তাই সে অন্তঃপ্রজ্ঞ (one who has full knowledge of the complex "subject"); অন্তর্জ্জগৎ বা অধ্যাত্ম জগৎ সম্বন্ধে এই জ্ঞানকে "প্রজ্ঞা" নিশ্চয়ই বলা যায়।

এই অবস্থায় সাধকের দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহংকার চিত্ত দ্বারা যে ভোগ হয় তাহা শুভ ও পবিত্র—সে যাহা হইতে জন্মিয়াছে সেই শ্যামসুন্দরকেই ভোগ করে এবং ইহাতে আনন্দ লাভ করে। সুতরাং তাহাকে প্রবিবিক্তভুক্ বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

সমর্পণ

কুমারী রাণু চট্টোপাধ্যায়

বর্ষাস্নাত গগন প্রান্তে
ম্লান হেসে শশী অস্ত যায়—
ধরণী তাহারে প্রেম-প্রীতি ডোরে
দুহাতে আঁকড়ি রাখিতে চায়

চুপে তার কাণে বলে' যায় চাঁদ
শেষ চুম্বন আঁকিয়া ভালে—
"সবটুকু আজ দিয়ে গেনু, সখি
তোরি হাতে আজ বিদায় কালে"

নবনুর

(উপন্যাস)

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যথাসময় নবনুর পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বার হল। সম্পাদক দুজন—রণজিৎ রায় ও আহমদ বিন তৈয়ব। প্রথম প্রবন্ধে নবনুর মজলিসের সভ্য ছয়জন তাঁদের উদ্দেশ্য বাঙ্গলার জন-সাধারণকে বুঝিয়েছেন। আগের পরিচ্ছেদে এই ছয় বন্ধুর যে দীর্ঘ didactic কথোপকথন দিয়েছি, এ প্রবন্ধও কতকটা সেই ছাঁদের। সার কথা হচ্ছে এই—হিন্দু-ধর্ম্ম ও ইসলাম-ধর্ম্মের মূলতঃ কোন ভেদ নেই—ভেদ যা দেখা যায়, তা আবার ব্যবহারের—আমরা ধর্ম্মের চেয়ে আচারকে বড় বলে' দেখতে শিখেছি, তাই দুই সম্প্রদায়ের অনৈক্য, ইত্যাদি। দুই ধর্ম্মের এই অভিন্নতা প্রতিপন্ন করা পত্রিকার মুখ্য কাজ। কবীর, চৈতন্য, নানক থেকে আরম্ভ করে' নানা যুগে নানা প্রদেশে যে সব পীর ভকত সাধুসন্ত জন্মেছেন, তাঁদের জীবনী ও উপদেশের নিয়মিত আলোচনা নবনুরের দ্বিতীয় কাজ। যে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে সকল হিন্দু যুগাবতার ভেবে শ্রদ্ধা করে, তিনি বার বার বলে' গেছেন যে সকল ধর্ম্মই এক ও অভিন্ন। নানা প্রবন্ধে এই সমস্ত কথা বিশদভাবে বিচার করা হয়েছে।

এই সংখ্যায় নিবেদিতার গুরুদেব কয়েক ছত্র আশীর্ব্বচনের মতন লিখে দিয়েছেন। যদি চ তাঁর বিশ্বাস যে জন-সেবাই অনৈক্যনাশের প্রকৃষ্ট উপায়, তবু তিনি স্বীকার করেছেন, যে দুই ধর্ম্মের অভেদ প্রচারেরও একটা সার্থকতা আছে।

আহমদের বোন রোশনারা সম্পাদকদ্বয়কে যে প্রতিবাদ-পত্র লিখেছে তাও প্রথম সংখ্যায় ছাপান হয়েছে। রোশনারা বিবির বক্তব্য—ভেদ যখন রয়েছেই, তখন তাকে অস্বীকার করে' ফল কি? জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা এক বই দুই নয়, কিন্তু তাই বলে' কি তাঁর জগতে রাষ্ট্র-ভেদ, জাতি-ভেদ, যুদ্ধ-দ্বন্দ্ব, সব উঠে গেছে! এই সব আধ্যাত্মিক ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়ে ফল কি! তার চেয়ে বরং আপনারা অশিক্ষিত দেশবাসীকে বোঝান—তোমার ধর্ম্ম যাই হোক না, তোমার ধর্ম্মমূলক আচার যাই হোক না, স্বরাজ্য না হলে, শিক্ষা স্বাস্থ্য অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা না হলে, সংসার চলবে না। অতএব সকল সম্প্রদায়ের লোক এগিয়ে এস, এই পথ ধরে' দেশের উন্নতি করবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হও। ধর্ম্ম তখন আপনা হতে আসবে। এই বিংশ শতাব্দীতে ঘণ্টা নেড়ে, কি তসবী জপ করে' ধর্ম্ম আসে না।

পত্রের নীচে সম্পাদকদ্বয় লিখেছেন—আমাদের ভগ্নীর সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ এক মত। তবে ধর্ম্ম-ভেদের জন্য যে আজ দেশে সব কাজ পণ্ড হয়ে যাচ্ছে, এর প্রতি-বিধানের জন্যই ত নবনুরের উদয়। নতুবা, আমরা ঘণ্টা নাড়া কি তসবী জপ কোনটারই ধার ধারি না।

নবনুরের জন্মে দেশে হুলুস্থুল পড়ে গেল। হিন্দু-সভা ও মুসলীম লীগ্, দুই দলই কোমর বেঁধে আসরে নেমে পড়লেন এই নব-জাত শিশুটীকে সূতিকাগারেই খতম করার মতলবে। একে বড় হতে দিলে যে অনেক লোকের অন্ন মারা যাবে! শিকায় তোলা রইল সব পুরানো ঝগড়া, মসজিদের সামনে বাদ্য বাজান, প্রকাশ্য স্থানে কোরবানি, চাকরী নিয়ে কামড়া-কামড়ি। দুই তরফ হতে এঁরা গোলা-বর্ষণ করতে লাগলেন নূতন শত্রুর উপর।

ভাগ্য-বিধাতা হাসতে লাগলেন। এ জাতের জন্য কি কারও কান্না আসে!

মাসখানেক না যেতে যেতে রাজা সমরজিৎ ভাইকে পত্র লিখলেন, "এতদিন ঘরে বসে যা জটলা করছিলে তাতে নিজের বই আর কারও কোন নোকসান হচ্ছিল না। এখন তোমার এ কি মতিচ্ছন্ন ধরল, যে পৈত্রিক পয়সা ঢেলে স্বধর্ম্মের সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হলে!"

রাণীরও একখানা ছোট পত্র এল, "ভাই ঠাকুরপো, আঁতুড়ঘরে শুয়ে শুয়ে চিঠি লিখছি। তুমি আবার এ কি নূতন কাণ্ড বাধালে! উনি আজ ভয়ানক রাগ করছিলেন। বলছিলেন—হয়েছে ত এইবার! বড় যে ঠাকুরপো-ঠাকুরপো কর! ছেলেকে মোছলমানের হাতে তুলে দিতে পারবে?

ঠাকুরপো, লক্ষ্মীটী, তুমি একবার এখানে এস। খোকা ভারী সুন্দর হয়েছে। দেখে যাও।"

রণজিৎ দাদার চিঠির কোন উত্তর দিলে না। বৌদিকে লিখলে, "তুমি ব্যস্ত হয়ো না। দাদাকে দেওয়ানজী ঠাকুর যা তা বুঝিয়ে দিয়েছেন! একবার আমার সঙ্গে দেখা হলেই সব কথা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমি একটু সময় পেলেই খোকাবাবুকে দেখতে যাব। আপাততঃ নাইতে খেতে সময় পাই না। মুসলমান হচ্ছি না, তোমার ভয় নেই।"

আহমদ, আলিম, এঁরা মুসলীম ও খেলাফৎ সঙ্ঘের কাছ থেকে বেনামী চিঠি পেলেন, যে তাঁরা বেওকুফের মতন আপন স্বধর্ম্মীদের কাফেরের হাতে তুলে' দিচ্ছেন কেন? তাঁদের কি এতটুকু আক্কেল নেই, হিন্দুদের এই নূতন ফন্দী ধরতে পারছেন না! বুত-পরস্ত (পৌত্তলিক) না-পাক হিন্দুর ধর্ম্ম, আর পাক ইসলাম ধর্ম্ম এক, এ কথা লিখতে তাঁদের হাত খসে' পড়ল না! যদি তাঁরা যথার্থ মুসলমান পিতার ছেলে হন, ত যত শীঘ্র সম্ভব বেইমানীর রাস্তা ত্যাগ করুন।

এ ত হল উড়ো চিঠি। মুসলীম খবরের কাগজগুলো খোলাখুলি লিখলে, যে সত্য যদি আহমদ ও আলিম নামে দুজন মুসলমান থাকে, ত তারা বেইমান, ঘুষখোর, হিন্দুর ভাড়াটে চাকর। মজহবী ইমানদার মুসলীমের নজরে বুত-পরস্ত শয়তানের আওলাদ (বংশজ)।

আহমদ এই সব গালাগালি পড়ে' কিছু বললে না। কিন্তু আলিম নাক সিঁটকে বললে, "এ সব সুন্নীদের কারসাজী। আমরা কি কম নিগ্রহ সহ্য করেছি ওদের হাতে!" রণজিৎ তার মুখ চেপে ধরে' বললে, "এ কথা বোলো না, আলিম। আমরা নবযুগী। আমাদের চোখে হিন্দু, মুসলমান, শিয়া সুন্নী, বৈষ্ণব শাক্ত, সবাই সমান। নিগ্রহ সহ্য করতে ত আমরা সবাই প্রস্তুত। কি বল, আহমদ?"

আহমদ ধীরে ধীরে ধীরে উত্তর দিলে, "শহীদের রক্ত না হলে কোন নূতন ইমারৎই খাড়া হয় না। সুভান আল্লাহ!"

ভবেশচন্দ্র তাঁর হিন্দু-সভা থেকে এক কড়া তাকীদ পেলেন—যদি তুমি এক মাসের মধ্যে নবযুগের সম্পর্ক না ছাড়, ত আমাদের সভ্যের তালিকা হতে তোমার নাম কেটে দেওয়া হবে। মূর্খ! এইটুকু তুমি বোঝ না যে গো-রক্ষক ও গো-ভক্ষকের ধর্ম্ম কখনও এক হতে পারে না। মন্দিরে পূজা করা তোমার ধর্ম্ম, আর মন্দির চূর্ণ করা মুসলমানের ধর্ম্ম। সুতরাং মিলনের সম্ভাবনা কোথায়!

একখানা উড়ো চিঠিও ভবেশ পেলে, "আমরা সন্ধান নিয়ে জানতে পেরেছি, যে তুমি রণজিৎ রায়ের বাড়ীতে নিয়মিত যবনান্ন ভোজন কর। এই বেলা তুমি সাবধান না হলে এ সংবাদ আমরা প্রকাশ করে' দেব, তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণ করিয়ে ছাড়ব।"

হরিমোহন ও মুখার্জ্জী এই পত্র নিয়ে ভবেশকে অনেক ঠাট্টা তামাসা করলে। কিন্তু ভবেশ একটুও বিচলিত হল না, "আমাকে একঘরে কে করে, দেখে নেব। গোটা কয়েক টিকিওয়ালা ফোঁটা-কাটা নিরামিষ-খেকো খোট্টা মান্দ্রাজী বামুনের হুকুম আমার জাতের লোক শুনবে কেন! আর যদিই বা শোনে, তবু আমি দৃক্‌পাত করি না। আহমদকে রণজিৎকে আমি ছাড়ব না।"

হরিমোহন ত হিন্দু-সভার লোক ছিল না। তাই তার কোন শাসনের ভয় ছিল না। সে বললে, "তোমাদের বামুনদের কোনদিন উন্নতি হবে না। বড্ড backward! আমাদের তাই অত জাতের কুসংস্কার নেই।"

ভবেশ একটু ঝাঁঝাল সুরে বললে, "বামুন না হলে কারোই চলে না হে! তোমার চৈতন্যদেবও বামুন ছিলেন, মুখার্জ্জীর রামমোহনও বামুন ছিলেন।"

মুখার্জ্জী একটু মুখ টিপে হেসে উত্তর দিলে, "কেন, এই ত রণজিতের বিনা বামুনেই বেশ চলে যাচ্ছে! মগ বাবুর্চ্চিই সব কাজ করছে।"

সাহেব বচন ত ঝাড়লেন বেশ, কিন্তু উনিও এই নবসুর নিয়ে বেশ এক চোট বকুনি খেয়ে এসেছেন। ওঁর সমাজের বড় কর্ত্তা ওঁকে ডেকে সেদিন বলেছেন, "তুমি নিতান্ত বালক! এইটুকু বোঝ না যে ব্রাহ্ম-সমাজই নবসুর, নূতন জ্যোতিঃ! এই রকম একটা agitation আমাদের সমাজের নামে যদি লাগিয়ে দিতে পারতে ত আমাদের ইজ্জৎ কতটা বেড়ে যেত বল দেখি! যাক্ গে, যা হবার হয়ে গেছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তোমার এই বন্ধুদের সব সমাজের চৌহদ্দীর ভেতর টেনে আনা চাই। একটা কিছু হুজুগ না তুল্‌তে পারলে সমাজ যে গেল!" মুখার্জ্জীর তরফে কিন্তু কবুল করতে হয়, যে তার মনে নবসুরের প্রতি কোন বেইমানী ছিল না। সে কর্ত্তার বকুনি শুনে বাহিরে বেরিয়ে মুখ বেঁকিয়ে বলেছিল, "Old fool!"

নবসুরের পরিচালকেরা কি রকম ভাবপ্রবণ তা পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। একটা সুন্দর মন-মাতান আদর্শ গড়ে নিয়ে তাঁরা কাজে নেমেছেন। সমালোচনা কি চোখ রাঙ্গানির পরোয়া তাঁরা কেন করবেন! জগৎকে আমরা যতই স্বার্থপর মনে করি না কেন, সুন্দর আদর্শের একটা মোহ চিরদিনই আছে। নইলে যুগে যুগে এক একজন পাগলা এসে' কি করে' জগৎকে বুঝিয়ে দেয়, যে ভোগের চেয়ে ত্যাগ শ্রেষ্ঠ? রণজিতের পাগলামি সেই রকম দিন কয়েক লোককে পেয়ে বসল।

মতলবী লোকের কথা আলাদা। পেশাদার কুঁদুলে, ঝগড়া বাধিয়ে যাদের দিন গুজরান, তাদের বিষয় আমি বলছি না। তবে সাধারণ গৃহস্থ মানুষ ভাবলে, নবসুরের শিক্ষা ত সুন্দর শিক্ষা, দেবতার নামে, ধর্ম্মের নামে কলহ করার মত মহাপাপ আর কি আছে! তখন সেই মাতামাতির দিনে কারও মনে এল না, যে নবসুরের আলো আলেয়া বই কিছু নয়, বাস্তব জগতে তার অস্তিত্ব নেই। তাই লোকে দলে দলে নবসুর-সঙ্ঘে নাম লেখাতে লাগল।

হিন্দু-সভা কি মুসলীম লীগ কিছুতেই এই ভাবের বন্যা রোধ করতে পারলেন না। পাণ্ডারা চিন্তাকুল হলেন। এ রকম কিছুদিন চললে তাঁদের অন্ন উঠল! তবে ভগবানের দয়ার উপর এঁদের অসীম নির্ভর। যে ভগবান একদিন বাবেলের বুরুজ ধ্বংস করে' দিয়েছিলেন, গয়াসুরের স্বর্গের সিঁড়ি ভেঙ্গে দিয়েছিলেন, তিনি আজ এতই নিদয় হবেন! এই দুই প্রাচীন বনেদী ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করবেন! এ কখনই সম্ভব নয়। জোনাকী ত কত উঠছে কত মরেছে, কিন্তু জগৎকে আলো দিচ্ছে সেই পুরানো সূর্য্য আর চাঁদ!

নবসুরের কেন্দ্র কলকাতা। পত্রিকা এখান থেকেই বেরোয়। সভাসমিতিও বেশীর ভাগ এইখানেই জমে। তবে মফস্বলেও অনেকগুলো ছোট ছোট শাখা-সঙ্ঘ গড়ে' উঠেছে। একটা কথা উল্লেখ্-যোগ্য। নবসুরের ব্রতীদের অধিকাংশই ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দু ও ব্রাহ্ম। শিক্ষিত মুসলমান যে কয় জন যোগ দিয়েছেন, তাঁরা কংগ্রেস-পন্থী। তাঁদের গোড়া মুসলমান বলা শক্ত। তৈয়ব আলি শেঠ দূরে দূরেই রয়েছেন। তাঁর মতে দেশের বর্ত্তমান আব্‌হাওয়াতে ধর্ম্মসমন্বয়ের চেষ্টা টিকতে পারে না। তবু তাঁর অনুমতি নিয়ে আহমদ পশ্চিম ভারতে চাষাভূষোদের ভেতর একটা রীতিমত আন্দোলন সুরু করে' দিয়েছে। এ কাজে তার প্রধান সহায় হচ্ছেন পীরানা গ্রামের দরগার হিন্দু মুসলমান পুরোহিতেরা। তাঁরা চিরদিন একসঙ্গে কলমা পড়ে' আসছেন, নবসুরের নীতি তাঁদের চোখে সহজেই ধরা পড়েছিল।

বাঙ্গালা দেশের দূর পাড়াগাঁ থেকেও অল্প সংখ্যক মুসলমান কৃষাণ এসে সঙ্ঘে নাম লিখিয়েছিল। তাদের সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলেন দু চারজন ফকীর আউলিয়া। এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ফকীরকোটের দরগার পীর কুতুব আলম সাহেব। শামসুদ্দিন নিজে দেশে গিয়ে তাঁকে ধরে' এনেছে। তিনি প্রথম সভাতেই ঘোষণা করেছিলেন, যে তাঁর চক্ষে সম্প্রদায়ভেদ থাকতে পারে না, কারণ তাঁর অজস্র হিন্দু শিষ্য। শক্তিকোটের ব্রাহ্মণ রাজবংশ পর্য্যন্ত চিরদিন তাঁহার মুরীদ। পীর সাহেবের সঙ্গে শামসুদ্দিনের ছেলে কমরু ও আরও কয়েকজন ফকীরকোটের প্রজা এসেছে। তারা রণজিতের সঙ্গে প্রত্যেক সভায় দল বেঁধে

যায়। হিন্দু গৃহস্থমণ্ডলী তাদের দেখে যে একটু বিচলিত না হন, তা নয়।

বড় বড় সভাগুলোর কার্য্যক্রম মোটামুটি এই রকম ছিল—প্রথমে সেকালের কোন ভকতের কবিতার ব্যাখ্যা হত, তার পর ধর্ম্মসমন্বয় সম্বন্ধে বক্তৃতাদি, আর সব শেষে গান। এই গান গাইত বাঙ্গলার নানা স্থান থেকে আগত আউল, বাউল, গোঁসাই, দরবেশরা। সারা শহর ভেঙ্গে পড়ত তাদের মধুর গান শোনবার জন্য।

মাস-ছয়েক এই নূতন ধর্ম্ম-সমন্বয়-প্রচারের কাজ বেশ জোরে চলল। প্রবল বন্যার মুখে বাধা-বিপত্তি সব ভেসে' গেল। কিন্তু কত দিন! নবনূরের নূতনত্ব, তার চটক, যত কমে যেতে লাগল, ততই লোকের উৎসাহে ভাটার টান ধরল। প্রবীণ ধর্ম্মধ্বজীরা এতদিন কোটরে লুকিয়ে বসেছিলেন। সময় বুঝে তাঁরা আবার ফণা তুললেন। নবনূরের সভাগুলোতে যে একটা শান্ত গাম্ভীর্য্য ছিল, তা আর রইল না। কলেজ-স্কোয়ারে দুই একটা সভায় ভাড়াটে গুণ্ডারা এত গোলযোগ করলে যে সভা ভেঙ্গে দিতে হল। একদিন ফেরবার পথে মেছোবাজার অঞ্চলে ভবেশ ও আলিম খুব মার খেলে।

এতে শামসুদ্দিনরা ভয়ানক চটে গেল। তারা রণজিতের কাছে দল বেঁধে এসে বললে, "হুজুর, আমাদের দুশমনরা যখন ভদ্র ব্যবহার জানে না, তখন আমরাও এখন হতে লাঠি নিয়ে সভায় যাব। আপনি কি আহমদ সাহেব মানা করবেন না। করলেও আমরা শুনব না। আর হুজুর, আপনার গায়ে যদি কেউ কোনদিন হাত তোলে, ত আমরা তার কাঁচা মাথাটা নেব। খোদার কসম, সে হিঁদুই হোক আর মোছলমানই হোক।"

সন্ধ্যাবেলা রণজিৎ আহমদকে বললে, "ভাই, শামসুদ্দিনের পাঠান রক্ত গরম হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমি মারামারি হতে দেব না। যদি মারামারি সুরু হয় ত আমি নিশ্চয় দেশ ছেড়ে কোথাও চলে যাব।"

আহমদ হেসে উত্তর দিলে, "রণজিৎ, পালাও ত আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেও। আমি জেহাদ করতে গররাজী। ইসলামের জন্যও করব না, নবনূরের জন্যও না। ভবেশ, আলিম, দুজনে ভীষণ চটে গেছে। বোধ হয় ওরাই শামসুদ্দিনকে উস্‌ক দিয়েছে।"

রণজিৎ বললে, "দেখি একবার পীরসাহেবকে বলে', কিছু হয় কি না।"

পীরসাহেবের বকাবকিতে শামসুদ্দিন কেবল এইটুকু কবুল করলে, যে কর্ত্তাদের হুকুম না হলে সে লাঠি তুলবে না। কিন্তু খালি হাতে আর সভায় যেতে কিছুতেই রাজী হল না। ফলে রণজিৎ হপ্তা দুই তিন সভা ডাকলেই না।

মুখার্জ্জী একদিন প্রস্তাব করলে, "দুই একটা ফৌজদারী কেস করা যাক। তাহলেই ওরা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

রণজিৎ বললে, "ছিঃ সত্য, পুলিশের সাহায্যে নবনূর প্রচার করব! তার চেয়ে মার খাওয়া যে শতগুণে ভাল।"

"আঃ, সত্যি কি আর মোকদ্দমা করব! একটু ভয় দেখাবার ইচ্ছা হচ্ছে।"

"ভয় দেখিয়ে আমাদের কাজ তো হবে না, ভাই। লোকের মন না পেলে সবই বৃথা।"

ভবেশ সেইখানেই বসে' ছিল। শুনে বললে, "কার মন পাবে রণজিৎ? ভাড়াটে গুণ্ডার ত আর হৃদয় নেই!"

"হৃদয় আছে বই কি, ভবেশ। নইলে হাজার হাজার লোক আমাদের এই কাজে যোগ দেবে কেন? আজ আমাদের কাজে একটু বাধা এসেছে বলে' কি আমরাও দলাদলির প্রশ্রয় দেব?"

এই কথাবার্ত্তা হওয়ার দু চারদিন পরে রণজিৎ হিন্দু-সভার তরফ থেকে এক আমন্ত্রণ-পত্র পেলে। টাউনহলে মান্দ্রাজের পণ্ডিত সীতারাম আয়ার সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করবেন। সেই সভায় তিনি নবনূর-সঙ্ঘকে তর্কে আহ্বান করেছেন।

রণজিৎরা সবাই টাউনহলের সভায় গেল। বৃদ্ধ পণ্ডিতজী বৈদিক যুগ হতে আজ অবধি সনাতন ধর্ম্মের ক্রমোন্নতির ইতিহাস ধীরে ধীরে বিবৃত করলেন, তারপর রণজিতের দিকে ফিরে বললেন, "খৃষ্টানকে মুসলমানকে আমার জিজ্ঞাস্য বা বক্তব্য কিছুই নেই। তারা নিজের ধর্ম্মের অনুশাসন-মত কাজ করুক, আপন কাম্য লোক

অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। কিন্তু যে হিন্দু তাকে আমি জিজ্ঞাসা করব, মুসলমানের খাতিরে তুমি তোমার পন্থা ত্যাগ কর কেন? নবযুগ-সঙ্ঘের আদেশ, হিন্দু তার পূজা-পদ্ধতি, তার বর্ণাশ্রম, ত্যাগ করে' মুসলমানের সঙ্গে মিটমাট করবে? একে কি মিটমাট বলে? হিন্দু সব ছাড়বে, কিন্তু মুসলমান খৃষ্টান গো-বধ পর্য্যন্ত বন্ধ করবে না। অর্থাৎ হিন্দু তার ধর্ম্মটাকে গলিয়ে মুসলমানী ছাঁচে ঢালাই করে' নিলে, তবে মুসলমানেরা অনুগ্রহ করে' সন্ধি করবেন। আমরা সে সর্ত্তে সন্ধি চাই না। নবযুগীদের মত যথেচ্ছাচারী হিন্দুর পক্ষে এটা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু সাধারণ হিন্দু গৃহস্থ তার দেবদেবীকেও ভাসিয়ে দিতে প্রস্তুত নয়, যবনান্ন ভোজন করতেও প্রস্তুত নয়। এর চেয়ে সোজা বললেই হয় সারা ভারত মুসলমান হয়ে যাক। It will be more honest.

নবযুগের হিন্দু দলপতিরা কি বলেন, শোনবার জন্য আমরা উৎসুক হয়ে আছি।"

ভবেশ উঠল প্রতিবাদ করতে। কিন্তু যবনান্ন-ভোজন, মুসলমান-ধর্ম্ম-পরিগ্রহ, এই সব কথা শুনে' সে রাগে ঠক্ ঠক্ করে' কাঁপছিল। ভাল করে' মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছিল না। চীৎকার করে' বললে, "আয়ার মহাশয় কি মনে করেন যে তাঁর মত লম্বা টিকি না রাখলে, ফোঁটা না কাটলে, নিরামিষ না খেলে, মানুষ হিন্দু হয় না। তাঁর ইচ্ছা হয় তিনি মুসলমান হয়ে যান, আমাদের দুঃখ নেই।"

এই কথা বলবামাত্র সনাতনী শ্রোতৃমণ্ডলী চেঁচিয়ে উঠল, "ঢের বক্তৃতা করেছ, বাবা!" "বসে পড় না!" এইসব চীৎকার শুনে' ভবেশের বক্তৃতা আরও গুলিয়ে যেতে লাগল।

তখন তাকে টেনে বসিয়ে দিয়ে রণজিৎ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। উত্তেজনায় তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। চোখ দুটো যেন জ্বলছে। সে প্রথমেই বজ্র-গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনারা কি নবযুগের বক্তব্য শুনতে চান? না গোলমাল করবেন বলে' প্রস্তুত হয়ে এসেছেন? শুনতে না চান, ত আমার বক্তব্য আমি অন্যত্র বলতে পারি।"

দু চারজন চেঁচিয়ে উঠল, "শুনব শুনব, অবশ্য শুনব, বলুন।" তখন রণজিৎ ধীরে ধীরে বলতে আরম্ভ করলে, "ইংরেজীতে একটা কথা আছে—কুকুরটাকে আগে বদনাম দাও, তার পর ফাঁসীকাঠে ঝোলাও। আয়ার মহোদয় নবযুগকে বধ করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে এসেছেন বলে'ই নবযুগের কুৎসা-রটনায় তাঁর এত আগ্রহ!

সভাজন, আপনারা বিচার করুন, আমাদের অপরাধ কি? আমরা ত নূতন কথা কিছু বলতে আসি নেই। যে সমস্ত পরমপূজ্য মহাপুরুষ সনাতন ধর্ম্মের পঙ্কোদ্ধার করার জন্য যুগে যুগে ভারতে অবতীর্ণ হয়েছেন, আমরা তাঁদের উপদেশেরই সামান্য প্রতিধ্বনি তুলছি মাত্র। তাঁদেরই পদানুসরণ করে' আমরা ঘোষণা করছি যে, লোকাচার লোকাচার-মাত্র, ধর্ম্ম নয়। খাদ্যাখাদ্য স্পৃশ্যা-স্পৃশ্যের বিচার ধর্ম্মের অঙ্গ নয়। ধর্ম্ম তার চেয়ে অনেক বড় জিনিস। আয়ার মহাশয় হিন্দুর পূজাপদ্ধতির কথা বলেছেন। কিন্তু বৈদিকযুগের বড় বড় যাগ-যজ্ঞের তুলনায় আজকের কলিযুগের পূজাপদ্ধতি অতি অকিঞ্চিৎ-কর ক্রিয়াকলাপ। সেই শ্রুতিজাত যজ্ঞবিধির নিন্দা করবার জন্য গৌতম বুদ্ধ জগতে এসেছিলেন। তাঁর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে ভারত বহু শতাব্দী যাগ-যজ্ঞ ও বর্ণাশ্রম বর্জ্জন করেছিল। আয়ার পণ্ডিতজী ভুলবেন না, যে সেই যজ্ঞের ও বর্ণভেদের উচ্ছেদকারী বুদ্ধদেব বিষ্ণুর অবতার ছিলেন। 'কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে!'

তার পর ধরুন, মুসলমান আমলের ভক্তমণ্ডলী—হিন্দু-গগনের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক—নানক, কবীর ও চৈতন্য, তাঁরা কি ভারতকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম শেখাতে এসেছিলেন?

আমরা এই সব মহাপুরুষের অতি হীন নগণ্য ভক্ত মাত্র। নূতন কিছু আমরা শেখাব কোথা হতে? আমাদের স্থির বিশ্বাস যে, সনাতন ধর্ম্মের দিব্য জ্যোতিঃ আজ অর্থহীন বিধি-নিষেধ ও অন্ধ লোকাচারের কুয়াশায় ঢাকা পড়ে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। যে দিন আর্য্য-ধর্ম্মের পূর্ণ-স্বরূপ আমরা ফিরিয়ে আনতে পারব, সে দিন তার সঙ্গে ইসলামের একেশ্বরবাদের কোন দ্বন্দ্ব থাকবে না। এই নবযুগের আদর্শ, এই নবযুগের লক্ষ্য।

পণ্ডিতজী হয়ত আমাকে স্মরণ করে' যথেচ্ছাচারী হিন্দু বাক্যের প্রয়োগ করেছেন। তারও যথাসাধ্য উত্তর দিচ্ছি। আপনাদের সমক্ষে আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি, যে আমি মূর্ত্তিপূজা ও বর্ণাশ্রম মানি না। কিন্তু তাই বলে' আমি হিন্দুত্বে আপনাদের কারও চেয়ে খাটো নই। আমার হিন্দুধর্ম্ম বিরাট্ বিশ্বজনীন ধর্ম্ম। সে ধর্ম্মের পন্থা অগণন, কিন্তু লক্ষ্য এক। তাতে এতটুকু ক্ষুদ্রত্বের, ছোটপনার স্থান নেই।

যদি এ কথা কেউ না মানেন, ত আমি তর্ক বিচার করতে প্রস্তুত। যদি কেউ যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রমাণ করে' দিতে পারেন, যে প্রত্যেক হিন্দুকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে বিশ্বাস করতেই হবে, নইলে সে হিন্দু হতে পারে না, তাহলে আমারও সমস্যা মিটে যাবে। আমি দ্বিধাহীন হয়ে ঘোষণা করব, যে আজ হতে আমি ভেদবিলাসী পৌত্তলিক হিন্দু নই, আমি ইসলাম-পন্থী। কিন্তু সেদিনও আমি নবন্নুর ছাড়ব না। কেন না, সারা ভারতকে একপ্রাণ করা আমার জীবনের ব্রত।"

এই কথা বলতেই সভাস্থলে একটা ভীষণ "মার, মার", কলরব উঠল। বৃদ্ধ শামসুদ্দিন আর তার ছেলে কমরুদ্দিন লাঠি তুলে রণজিতের দু ধারে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার ছাড়লে, "এস, কে বাপের বেটা আছ, মার ত!"

আহমদ লাফিয়ে এসে তাদের দু জনকে জোর করে' বসিয়ে দিলে। দিয়ে বললে, "আপনাদের ভয় নেই, আমরা লাঠি ধরব না। চলে' আসুন, আয়ার সাহেব, মারুন আমাদের। আজ আমরা মার খেয়ে নবন্নুরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করব। জয়, নবন্নুরের জয়।"

পণ্ডিতজী দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "ভাই সব, তোমরা সংযত হও। মুসলমানের সঙ্গে আমাদের কোন ঝগড়া নেই। নবন্নুর-সঙ্ঘ হিন্দুরও যেমন শত্রু, মুসলমানেরও তেমনি শত্রু। আমি আজ দূর মাদ্রাজ থেকে এসেছি কেবল হিন্দু-সমাজকে সাবধান করে' দিতে। মনে রেখো হিন্দু! রাবণের প্রধান দুশমন ছিল তার ভাই বিভীষণ। এই স্বজাতিদ্রোহীকে সহায় না পেলে স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রও রাবণের কিছু করতে পারতেন না। তাই তোমাদের বলছি, যে এই বিভীষণের দলকে কদাচ প্রশ্রয় দিও না।

রণজিৎবাবু ধর্ম্মত্যাগ করবেন বলে' ভয় দেখাচ্ছেন। আমি হিন্দুর তরফ হতে তাঁকে মুক্তকণ্ঠে অনুমতি দিচ্ছি, আজই তিনি কলমা পড়ে মুসলমান হয়ে যান। আমাদের আপত্তি নেই। তখন তাঁর নবন্নুর-সঙ্ঘে থাকা সম্বন্ধে ব্যবস্থা মুসলমানেরা করবেন।"

আবার কলরব উঠল, "বিভীষণ! বিভীষণ! মার ঘরের শত্রুকে।" রণজিৎ হাসিমুখে দাঁড়িয়ে উঠল, কিন্তু আলিম, আহমদ, পীরসাহেব ও কয়েকজন মুসলমান চাষী তাঁকে ধরে' নিয়ে সভা থেকে বেরিয়ে গেলেন। শমসুদ্দিনের চোখ দিয়ে যেন আগুন ছুটেছে। কেউ কাছে আসতে সাহস পেলে না।

ভবেশ বোধ হয় তার টিকিওয়ালা সম্প্রদায়ের হাতে দু' চার ঘা খেয়ে থাকবে। কেন না, যখন সে চার্ব্বক স্কোয়ারে এসে পৌঁছল, তখন রাগে ফুলছে, কাপড়-চোপড়ও এক আধটু ছিঁড়ে গেছে, চুল উস্কো-খুস্কো। রণজিৎকে বললে, "তুমি ত মুসলমান হয়ে যাবে, ভয় দেখিয়ে পালিয়ে এলে! বেটাদের যত তাল পড়ল আমার মাথায়। সত্যি বিভীষণ গেল বেরিয়ে, ঝাল ঝাড়লে এই গরীবের উপর! বেশ ব্যবস্থা তোমাদের!"

রণজিৎ তখন চিন্তায় মগ্ন, কোন উত্তর দিলে না। আলিম একটু উত্তেজিত হয়েই বললে, "বিভীষণ নামটা ত রণজিতকে সাজে না, ভাই ভবেশ। ও যে কোন দিনই রাবণের দলে ছিল না। ওকে বচন শুনিয়ে লাভ কি? তোমার প্রাণে ভয় থাকে ত বল।"

বৃদ্ধ পীর কুতুবসাহেব ভবেশের পিঠে হাত রেখে বললেন, "মহারাজ, রণজিতের বাপ-দাদারা আমার দরগার ভক্ত মুরীদ। উনি কি পরোয়া করেন সীতারাম পণ্ডিতের!"

রণজিৎ একটু আনমনা হয়ে বললে, "শুধু তাই নয়, ভবেশ! আমার পূর্ব্ব-পুরুষ মহতাব রায়—যাক্, ও কথা আজ বলবার কোন সার্থকতা নেই। আমরা সবাই নবন্নুরের দীক্ষা নিয়েছি, আমরা ভাই ভাই। তোমাকে টাউনহলে ফেলে আসায় আমাদের অপরাধ হয়েছে। ক্ষমা কোরো।"

আহমদ ভবেশের হাত ধরে' বললে, "আমরা একশো-

বার অপরাধী ভবেশ। কিন্তু তখন ভাববার সময় ছিল না। রণজিৎ একটা মুখের কথা খসালে শামসুদ্দিন তুমুল কাণ্ড করত। খুনোখুনি হয়ে যেত। আমার দাঁড়িয়ে মার খাওয়ার প্রস্তাব কেউ শুনত না।"

ভবেশ বোধ হয় তখনকার মতন শান্ত হল। কেন না, হেসে উত্তর দিলে, "আমিও আয়ারকে ডরাই না। ওসব দুধ-কলা-খেকো টিকিওয়ালা মেড়ো কি বলে, তাতে কি এসে যায় ভদ্রলোকের! কিন্তু আমাদের হরিমোহনের কাণ্ড ত দেখলে না। শামসুদ্দিন হুঙ্কার ছাড়তেই সে এমন বৈষ্ণবজনোচিত পরিপাটি চম্পট দিলে যে কি বলব!

হরিমোহন আর মুখার্জ্জী ইতিমধ্যে কখন এসে ঢুকেছে, তা কারও নজরে পড়ে নেই। ভবেশের উপহাস শুনে' সে মুখ বেঁকিয়ে বললে, "বাড়ী এসে যে খুব বাহাদুরী ফলাচ্ছ, ভবেশ! তোমার ক্ষত-চিহ্নগুলো বক্ষে না পৃষ্ঠ-দেশে, তা এখনও পরীক্ষা করা হয় নেই। আমি ত বৈষ্ণব বটেই। বৈষ্ণব বলেই নবসুরে যোগ দিয়েছি। গুণ্ডার দলেও নাম লেখাই নেই, মুসলমান হতেও চাই না।"

বাক্‌যুদ্ধে হটবার পাত্র ত ভবেশ নয়। সে উত্তর দিলে, "হ্যাঁ, মস্ত বৈষ্ণব তুমি তাতে আর সন্দেহ কি! চৈতন্যদেব যে আদেশ দিয়ে গেছেন, চিড়িয়াখানার সব জানোয়ারগুলোকে মেরে খেতে!"

প্রফেসার উলটো টিটকারী দিলে, "মুরগী সহযোগে যবনান্ন সেবন, এ ত ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিক আহার! তা'হলেই হল। তুমি আয়ারের দেশে গিয়ে এই আহার-বিধিটা প্রচার কর।"

আহমদ দুজনকে থামিয়ে দিলে। বললে, "তোমরা রাগ কোরো না, ভাই। হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না বটে। কিন্তু নবসুরের সঙ্গে ছুঁৎমার্গের কোন সম্পর্ক নেই, এটা নিশ্চিত। আর এটাও আমি বুঝি না যে কোন, যথার্থ ধর্ম্মের সঙ্গে বাবুর্চ্চি-খানার ব্যাপারের কি সম্বন্ধ থাকতে পারে। রণজিৎ তুমি একদিন বলছিলে না, যে স্বামী বিবেকানন্দ Kitchen Hinduism নিয়ে কত ঠাট্টা তামাসা করতেন!"

মুখার্জ্জী বললে, "আহমদ ভাই, নবসুর সম্বন্ধে তুমি হয় ত ঠিক কথাই বলছ। কিন্তু ভোজাভোজ্য বিষয়ে মুসলমানের কি কোন কুসংস্কার নেই? আমি কোন ধর্ম্মের কুসংস্কারকেই প্রশ্রয় দিতে পারি না, তাই ব্রাহ্ম হয়েছি।"

মুসলমানের কুসংস্কার কথাটায় আলিম চটে' উঠল। সে বললে, "সাহেব, তোমাদের ত কুসংস্কার, সুসংস্কার, কোন সংস্কারেরই বালাই নেই। ধর্ম্মের বালাই আছে ত? না, তাও নেই?"

এই সব বাক্‌বিতণ্ডা শুনে রণজিৎ হতাশ হয়ে যাচ্ছিল। সে কাতর স্বরে বললে, "এই কি নবসুরের শিক্ষা! এক বছরও গেল না। এরই মধ্যে নিজেরা সাম্প্রদায়িক ঝগড়ায় মেতে উঠেছি! কত বার আমরা অন্যের সামনে আউড়েছি, যে ধর্ম্ম ও আচার দুটো আলাদা জিনিস!"

এই সময় পীর সাহেব ভেতরে এলেন। তাকে সেলাম করে' রণজিৎ বললে, "শাহ সাহেব, এদের বুঝিয়ে দেন যে, কে কি খায়, কার সঙ্গে খায়, তাতে ধর্ম্মের কিছু এসে যায় না।"

বৃদ্ধ পীর সাহেব হাত আকাশের দিকে বাড়িয়ে বললেন, "বন্ধুগণ, মাথার উপর এক অদ্বিতীয় আল্লাহ, তাঁর পায়ের তলায় সব মানুষ ভাই ভাই, এই একমাত্র ধর্ম্ম। এই আমাদের নবসুর! একদিন এই সুর দুনিয়ার সব অন্ধকার দূর করে দেবে।"

তখনকার মতন তর্কবিতর্ক থামল, কিন্তু সেদিন বাড়ী যাওয়ার আগে ভবেশ চুপি-চুপি রণজিৎকে জিজ্ঞাসা করলে, "ভাই, তুমি সত্যি মুসলমান হয়ে যাবে না ত!"

রণজিৎ হেসে' বললে, "ও কথা কেন জিজ্ঞাসা করছ? আমি হিন্দু হই, মুসলমান হই, আমি নবসুরী। আহমদ, আলিম কি মুসলমান বলে' নবসুরী নয়?"

ভবেশ কিছু উত্তর দিলে না। মাথা হেঁট করে' চিন্তিত মনে বেরিয়ে গেল। মাথার উপর ভগবান, তাঁর পায়ের তলায় সব মানুষ সমান, এ সব ত ইসলামের কথা!

রণজিতের টাউন-হলের বক্তৃতার খবর যথাসময়ে শক্তি-কোটে পৌঁছিল। শঙ্কর চক্রবর্ত্তী একখানা "অমৃতবাজার

পত্রিকা" হাতে করে' মহারাজের আপিস কামরায় ঢুকলেন। সমরজিৎ কি লিখছিলেন। মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি খবর, দেওয়ানজী?"

দেওয়ানজী তাঁর দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করে' কপালে ঠেকিয়ে বললেন, "গুড মর্ণিং, স্যার। আজকের কাগজখানা পড়েছেন?"

রাজা ভুরু কুঁচকে বললেন, "হ্যাঁ পড়েছি। ছোকরার মতিচ্ছন্ন ধরেছে।"

"মহারাজ, আর ত চুপ করে' বসে' থাকলে চলবে না। একবার কুমার বাহাদুরকে এখানে ডেকে পাঠালে হয় না?"

"না, ডেকে পাঠান হবে না। আমি তার মুখ দেখতে চাই না। মুসলমান হতে চায়, হোকগে। কিন্তু আমি ঐ পীর ব্যাটাকে জব্দ করছি। কলকাতায় গেছে হতভাগা রণজিৎকে নাচাতে! এই হুকুমখানা পড়ে' দেখুন ত!"

শঙ্কর পড়ে দেখলেন। রাজা হুকুম করেছেন—ফকীরকোট দরগার যত ক্ষেত জমী আছে, সমুদায় এই বৎসর হইতে সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হউক। দরগার পীর কুতুম আলম সাহেব এই সকল জমীর সালিয়ানা রাইয়ৎ মাত্র, ততোধিক কোনরূপ স্বত্ব তাঁহার নাই। শামসুদ্দিন খাঁ পাঠান ও তাহার পুত্র কমরুদ্দিন খাঁর নাম খারিজ করিয়া, তাহাদের অধিকারে যে আবাদ জমী আছে, তাহা হিন্দু চাষীদিগকে বিলি করা হউক। ফকীরকোট তালুকের অন্য মুসলমান প্রজা যাহারা গ্রামে উপস্থিত নাই, তাহাদের কড়া তাকীদ দেওয়া হউক, যেন তাহারা সাত দিনের মধ্যে সদর কাছারীতে হাজির হয়।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় মনে মনে খুব খুসী হলেন। এই ত চান তিনি। এইবার দেখে-শুনে কয়েক ঘর ভাল হিন্দু লাঠিয়াল ফকীরকোটে বসাতে পারলে, কাজ অনেকটা এগিয়ে গেল। তবু একটু আমতা আমতা করে' বললেন, "মহারাজ, এ হুকুম জারী হলে অসন্তোষ বড্ড বেড়ে যাবে মুসলমান প্রজাদের ভেতর। একটু রয়ে বসে বুঝে সুঝে কাজগুলো করা যেতে পারত, হুজুরের মরজী হলে।"

রাজা কিন্তু একটুও টললেন না। "অসন্তোষ বাড়ে বাড়ুক, মহাশয়। আমি দেখতে চাই, যে আমার ভাই যাই বলুক, যাই করুক, আমি হিন্দু ধর্ম্মের অপমান বরদাস্ত করব না। আপনি জনাকয়েক ভাল ভোজপুরী দারোয়ান মোতায়েন করুন। এখন তা হলে উঠি, দেওয়ানজী! এই নিন্, হুকুমে সই হয়েছে, শীল মোহর করে' নেবেন," বলে' বেরিয়ে গেলেন।

আপিস হতে সমর অন্দর মহলে গেলেন। দোতলার বারান্দায় খোকা দোলনায় ঘুমোচ্ছে, আর রাণী পাশে এক কৌচে বসে একটা লাল টকটকে, মোজা না গেঞ্জি, কি বুনছেন। রাজাকে দেখে লাফিয়ে উঠলেন, "দেখ, এই রঙ্গ খোকাকে খুব মানাবে, না?"

রাজা একটুও হাসলেন না। "রণজিৎ ছোট্টবেলায় এই লাল রঙ্গ বড় ভালবাসত," বলে' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

"হ্যাঁ গা, তোমার কি হয়েছে? মুখ অমন করে' রয়েছ কেন? ঠাকুরপো ভাল আছেন ত?"

"হ্যাঁ রাণী, তোমার ঠাকুরপো ভাল আছেন, শারীরিক বেশ ভাল আছেন। তবে তাঁর পাগলামি এইবার চরমে উঠেছে, কলকাতার এক সভায় বলেছেন, যে মুসলমান হবেন। এই দেখ না আজকের কাগজে সভার বিবরণ!"

দু'জনে বসলেন। রাণী কাগজখানা পড়ে' হেসে বললেন, "কই, ঠাকুরপো ত ওরকম কথা কিছু বলেন নেই। হয়ত ঐ মাদ্রাজী পণ্ডিতকে ঠাট্টা করেছেন মাত্র।"

সমর মুখ গম্ভীর করে' উত্তর দিলেন, "রাণী, এ সব বিষয়ে ঠাট্টা চলে না। আর বলবে কি? হিন্দুর ছেলে হয়ে কবুল করেছে যে মূর্ত্তিপূজা মানে না, জাত মানে না। যদি কেউ তাকে জোর করে' বলে যে মানতেই হবে, তাহলে সে মুসলমান হয়ে যাবে।"

"হ্যাঁ গা, তা খাওয়া-দাওয়া নিয়ে জাত আর আজকাল কে মানছে? তুমি কি জাত মেনে চলো, না আমি চলি, না আমার ভাইয়েরা চলে? সবাই যা করছি, ঠাকুরপো সেইটে মুখে বলেছে, এই ত কথা!"

"জাত ত শুধু খাওয়া-দাওয়া নিয়ে নয়। বিয়ের বেলা জাত মানাই আসল জিনিস। তোমার ঠাকুরপো যদি একটা মুসলমানী কনে বিয়ে করে' আনে, ত তুমি বরণ করে' ঘরে তুলবে কি?"

"তা ত আর সত্যি সত্যি করে নেই, গো! যখন করবে তখন তাকে একঘরে কোরো। এখন থেকে রাগারাগি কেন? আমি ঠাকুরপোকে একবার এখানে আসতে বলি। এলে খুব না হয় বকে দেব।"

"না রাণী, আসতে বলে কাজ নেই। খোকাকে আমি আর নির্ভয়ে তার হাতে তুলে দিতে পারব না।"

"তা নাই বা দিলে! আমি সোজাসুজি বলব—ভাই, তুমি যখন মুসলমান ধর্ম্মের দিকে এমন ঝুঁকে পড়েছ, তখন তুমি আর হিন্দুর ছেলেকে কি করে' মানুষ করবে!"

"আচ্ছা, ঐ কথাই একবার তাকে লিখে দেখ, কি জবাব দেয়।"

সেই দিনই রাণী এক পত্র লিখলেন রণজিৎকে:

"ভাই ঠাকুরপো, তুমি আবার কি লেকচার দিয়েছ, তাই পড়ে' উনি ভয়ানক রেগে গেছেন। একবার তুমি এসে ওঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে যাও। এটা ত বুঝছ ভাই, যে যদি তুমি সত্যই মোছলমান হওয়ার দিকে ঝুঁকে পড়, ত খোকাকে কি করে' মানুষ করবে? তাকে ত একদিন হিন্দু-রাজ্যের রাজা হতে হবে! যাই হোক, তুমি একবার এসে কদিন বেড়িয়ে যাও। খোকাকে ত আজও দেখতে এলে না!"

তিন দিনে জবাব এল, "ভাই বৌদি, আমার লেকচারটা তুমি নিজে পড়ে' দেখো। আমি ত বলি নেই যে, আমি মুসলমান হব। আমার বিশ্বাস, যে আমি হিন্দু থেকেও নিজের কর্ত্তব্য পালন করতে পারব। তবে আমার উপর লোকে জোর জবরদস্তি করলে কি হবে জানি না। আমার স্বভাব ত জান!

যাই হোক, খোকাকে আমি মানুষ করতে পাব না কেন? দাদাকে বোলো একবার সিন্দুক খুলে তোমাকে মহারাজ মহতাব রায়ের দলিলখানা দেখাতে। তা'হলেই হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে অনেক কথা পরিষ্কার হয়ে যাবে। শক্তিকোটের ভবিষ্যৎ রাজাকে মুসলমানে মানুষ করলেও দোষ হয় না। আমি এর বেশী কিছু বলব না। দাদাকে জিজ্ঞাসা কোরো।"

দেবরের চিঠি রাণী সমরকে দেখালেন। তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে' থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "রণজিৎ কি তোমাকে দলিলের কথা কিছু বলেছে?"

"না, আমাকে কিছু বলেন নেই। আমি কিছুই জানি না।"

"জেনে কাজ নেই। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা কি করেছেন, না করেছেন, তার হিসেব আমি আজ করতে চাই না। পাঁচ-শো বছর আমরা সদ্-ব্রাহ্মণের মত জীবন কাটিয়েছি। যদি তার আগের কোন কলঙ্ক থাকে, ত সে অনেকদিন ধুয়ে-মুছে গেছে। আবার মুসলমান সংস্পর্শে এসে নূতন কলঙ্ক অর্জ্জন করতে আমি গররাজী। তুমি রণজিৎকে কথায় কথায় লিখে দিও যে, শক্তিকোটের রাজকুমারকে যে মানুষ করবে, তার সদ্-ব্রাহ্মণ হওয়া চাই। এ বিষয়ে আমার মতের নড়চড় কখন হবে না।"

কিছুদিন পরে রাণী এই মর্ম্মে দেবরকে এক চিঠি লিখলেন। ইতিমধ্যে কলকাতায় আর এক কাণ্ড বেধে গেছে।

(ক্রমশঃ)

কে বড়?

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

হঠাৎ সেদিন ছুটে এসে খোকা সুধায় মাকে—
"মোদের মধ্যে বড় কেবা বল মা আমাকে";

"আমা হতেই তুই যে এলি" মা কয় খোকায় ডেকে,
খোকা বলে, "মা তুই হলি আমার জন্ম থেকে।"

ভিক্ষু-সঙ্ঘ-সংগঠন

অনাগারিক শ্রীশীলানন্দ সূত্রবিশারদ্

'অমত দুন্দুভি' বাজাইয়া ধর্ম্ম-চক্র-প্রবর্ত্তনের জন্য শাক্যমুনি যেইদিন কাশীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, সেইদিন ভারতে নূতন যুগের সূচনা হইয়াছিল; ভাবের নূতন উৎস খুলিয়াছিল; কর্ম্মের নূতন প্রবাহ ছুটিয়াছিল। সেই মঙ্গলময় দিবস সুদূর অতীতের বুকে মিশিয়াছে, কিন্তু তাহার স্মৃতি মানব-সভ্যতার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ভারতেতিহাসের পৃষ্ঠা গৌরবোজ্জ্বল করিয়া রাখিবে।

বুদ্ধদেবের সেই দিনের অপূর্ব্ব ধর্ম্ম-চক্রদেশনা পঞ্চ-ব্রাহ্মণের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিল। সত্যের আলোকে তাঁহাদের মোহ-নিশার অবসান হইল। জাগরণের প্রভাতে বুদ্ধ তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

'ভিক্ষুগণ! এসো, ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হও, সত্যের দ্বার তোমাদের জন্য উন্মুক্ত।'

এই বাণীই ছিল পঞ্চ-ব্রাহ্মণের দীক্ষামন্ত্র এবং সঙ্ঘ-সংগঠনের মূল ভিত্তি। নব-দীক্ষিত পঞ্চ ভিক্ষু লইয়া প্রথম সঙ্ঘ রচিত হইল। দিন কয়েক পরে বারাণসী শ্রেষ্ঠীর একমাত্র সন্তান যশ ও তাঁহার বন্ধুগণ বুদ্ধের * 'এহি' মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া সঙ্ঘের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। তিন মাসের মধ্যে সঙ্ঘের ভিক্ষু-সংখ্যা ষাটে দাঁড়াইল। বর্ষা কাটিয়া গেল। শরৎ নূতন সুর লইয়া দেখা দিল। পাখীর কলতানে ও কৃষকের আনন্দগানে মাঠের শ্যামলিমা উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিল। বুদ্ধদেব যেন শরতের সুরে সুর মিলাইয়া ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিলেন—

"চরথ ভিক্খবে চারিকং বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়, লোকানুকম্পায় অত্থায় হিতায় সুখায় দেবমনুস্সানাং দেসেথ ভিক্খবে ধম্মং আদি কল্যাণং মজ্ঝে কল্যাণং পরিযোসান কল্যাণং সাত্থং সব্যঞ্জনং কেবল পরিপুন্নং পরিশুদ্ধং ব্রহ্মচরিযং পকাসেথ।"

শ্রীবুদ্ধের ধর্ম্ম-চক্র-প্রবর্ত্তন

অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ, সর্ব্বজীবের মঙ্গল-বিধানের জন্য দেশ-দেশান্তর বিচরণ করিয়া কল্যাণময় বাণীর প্রচার কর, নির্ম্মল পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা-কীর্ত্তনে রত হও।

এই বাণীকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভিক্ষুগণ 'জন-হিতায়' 'জন-সুখায়' দেশ দেশান্তরে ছুটিলেন। বুদ্ধ স্বয়ং উরুবেলাভিমুখে চলিলেন। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া তিনি এক বনে তরুচ্ছায়ায় বিশ্রাম লইলেন। বনভূমি

* সঙ্ঘ সংস্থাপনের প্রারম্ভে বুদ্ধদেব 'এ হি' অর্থাৎ 'এসো' বলিয়া প্রার্থীকে সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতেন। তখন সঙ্ঘ প্রবেশের অন্য কোন মন্ত্র উচ্চারিত হইত না।

মধ্যাহ্নের কোলে গভীর সুষুপ্তিমগ্ন। তরুলতা সূর্য্য-কিরণ-স্নাত হইয়া বিচিত্র সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। মাথার উপরে শরতের শুভ্র মেঘ স্তব্ধ হইয়া আছে। হঠাৎ দূরশ্রুত আলাপধ্বনি বনের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বুদ্ধের কাণে পৌঁছিল। তিনি উঠিয়া বসিলেন। ত্রিশ জন ভদ্রবর্গীয় তরুণ তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের ব্যগ্রতাপূর্ণ মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া তথাগত স্নেহ-সরল বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বৎসগণ! তোমরা কি চাও?"

তাহারা কহিল—"প্রভো, আমরা এক বারবিলাসিনীর সহিত এই বনে আসিয়াছি, সে আমাদের অজ্ঞাতসারে আভরণ লইয়া পলায়ন করিয়াছে, আমরা তাহারই সন্ধান করিতেছি।"

তাহাদের উত্তর শুনিয়া তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন—"বৎসগণ, এই বিশাল সংসারারণ্যে তোমরা নিজের সন্ধান না করিয়া পরের সন্ধান করিতেছ কেন?"

তরুণের দল এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। চিত্রার্পিতের মত তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। ভগবানের আরও বিচিত্র উপদেশ শুনিয়া তাহারা আত্ম-সন্ধানের জন্য আকুল হইয়া তাঁহারই আশ্রয়-ভিক্ষা চাহিল। তিনি তাহাদিগকে 'এ হি' মন্ত্রে বরণ করিয়া লইলেন। এইবার সঙ্ঘের সদস্য-সংখ্যা ষাট পার হইয়া নব্বই হইল।

ভগবান তথা হইতে পদব্রজে উরুবেলায় পৌঁছিলেন। তাপস-সঙ্ঘে তাঁহার আগমনে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। সঙ্ঘ-নায়ক কাশ্যপ নিজেই অতিথি-সেবার ভার লইলেন। অভ্যাগতের বাক্যে ও ব্যবহারে সঙ্ঘ-নায়কের হৃদয় জুড়াইয়া গেল। সঙ্ঘ-নায়ক ভাবমুগ্ধ হইয়া তাঁহার বাণী শুনিতেন। এইরূপে কয়েকদিন কাটিয়া গেল। অবশেষে কাশ্যপ আপনার শিষ্যদের লইয়া সঙ্ঘে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সহোদর গয়াকশ্যপ ও নদীকশ্যপ সশিষ্যে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। তখন সঙ্ঘে ভিক্ষু-সংখ্যা সহস্রাধিক হইল। ভগবান তাঁহার নববিনীত শিষ্যবৃন্দে পরিবৃত হইয়া রাজগৃহে আসিলেন। সেই গিরি-প্রাচীর-পরিবেষ্টিত রাজগৃহ আজ বুদ্ধের নূতন বলিয়া বোধ হইল। সত্যের সন্ধানে রাজগৃহে আসিয়া যেইদিন বিম্বিসারের সহিত তাঁহার প্রথম আলাপ পরিচয় হইয়াছিল, সেইদিনের রাজগৃহ আর আজিকার রাজগৃহ যেন এক নয়—তাঁহার আগমনে সেইদিনের রাজগৃহ কৌতূহলপূর্ণ, আর আজিকার রাজগৃহ জনতার আনন্দধ্বনি-প্লাবিত।

"চরথ ভিক্খবে চারিকং"

ভগবান তাঁহার নববাণী প্রচার করিয়া রাজগৃহবাসীর প্রাণ উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। বিম্বিসার প্রমুখ বহু লোক তাঁহার গৃহী-শিষ্যশ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন। আবার অনেকে সঙ্ঘে প্রবেশ করিলেন। সেই হইতে তিনি ও তাঁহার শিষ্যগণ ভারতের গ্রাম নিগম রাজধানী ভ্রমণ করিয়া কল্যাণময় বাণীর প্রচার আরম্ভ করিলেন। যতই তাঁহারা অগ্রসর হইলেন, ততই সঙ্ঘের কলেবর বৃদ্ধি পাইল। ভগবানের বাণী ভাবের এমন উন্মাদনা বহিয়া আনিল যে, যাহারা শুনিল তাহাদের অনেকেই জনক-জননীর স্নেহকাতর বুক শূন্য করিয়া, পতিপ্রাণা পত্নীর হৃদয়ে চিরবিরহের বহ্নি জ্বালাইয়া, সন্তানকে পিতৃ-স্নেহে বঞ্চিত করিয়া ভিক্ষু-সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তখন ঘরে ঘরে নিদারুণ কান্নার রোল পড়িয়া গেল।

কেহ পুত্রশোকে কাঁদিল, কেহ ভ্রাতৃশোকে কাতর হইল; পতি-বিরহে কাহারও মুখ নিদাঘতপ্ত ছিন্ন ফুলের মত শুকাইয়া গেল। মহাশ্রমণের অত্যাচার লোকের আর সহ্য হইল না। তাহারা মুণ্ডিত-মস্তক দেখিয়া ভয় পাইতে লাগিল। কখনও কখনও রক্তবর্ণা গাভীর মূর্ত্তিও তাহাদের দেহ কণ্টকিত করিয়া দিত। তাহারা প্রকাশ্যে বলিতে লাগিল—"অপুত্তকতায় পটিপন্নো সমণো গোতমো,

'এহি' মন্ত্রে বরণ করিয়া লইলেন

বেধব্যায় পটিপন্নো সমনো সোতমো।" অর্থাৎ 'শ্রবণ গৌতম লোকের বংশলোপের জন্য, নারীদের অকাল-বিধবা সাজাইবার জন্য এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন।' তখন বুদ্ধের নাম শুনিলে লোকের শরীর কাঁটা দিয়া উঠিত। তাঁহার প্রতি লোকের দ্বেষ ও ভয়ের অবধি রহিল না। তথাপি সঙ্ঘের সদস্য-সংখ্যা বাড়িয়াই চলিল। বৌদ্ধদের কল্পিত সমগ্র মধ্যদেশ শ্রমণের পীতবাসের আভায় যেন পীতাভ হইয়া উঠিল। এইরূপে বুদ্ধদেব নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া 'সঙ্ঘ-সংগঠন করিয়া লইলেন।

ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, তরুণ-বৃদ্ধ সকলেই সঙ্ঘে সমানাধিকার পাইয়াছিল। নানা নদী যেমন সমুদ্রকে পাইয়া তাহাতে বিলীন হয় এবং তাহাদের নাম রূপ সমস্ত বিলুপ্ত হইয়া সমুদ্র নামে কথিত হইয়া থাকে, সেইরূপ নানা কুলাগত শ্রমণগণও সঙ্ঘের অঙ্গীভূত হইয়া আপনাদের নাম গোত্র বিসর্জ্জন দিয়া সক্যপুত্তিয় সঙ্ঘ নামেই অভিহিত হইতেন। তাঁহারা গৃহি-জীবনের উচ্চ-নীচতা ভুলিয়া পরস্পরের সহিত ভ্রাতৃ-সম্বন্ধ-স্থাপন করিতেন। তাঁহাদের জ্যেষ্ঠতার বিচার বর্ণ, বিদ্যা কিম্বা সাধনা লইয়া নয়, সঙ্ঘ-প্রবেশের তারিখ লইয়াই। আনন্দ, ভদ্দিয় প্রভৃতি শাক্যকুমারগণ যখন তাঁহাদের নাপিত উপালিকে লইয়া ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করিতে আসিয়াছিলেন, তখন বুদ্ধ তাঁহাদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য প্রথমেই উপালিকে দীক্ষাদান করিলেন। শাক্যকুমারগণ সঙ্ঘের মহিমামুগ্ধ হইয়া আভিজাত্যাভিমান ত্যাগ করিয়া উপালির চরণে প্রণত হইলেন। সেই অবধি তাঁহারা উপালিকে জ্যেষ্ঠ ভাবিয়া সম্মান-প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সঙ্ঘ জ্যেষ্ঠতর সদস্য কনিষ্ঠকে স্নেহপূর্ণ 'আবুসো' সম্বোধন করিতেন এবং কনিষ্ঠ আপনার জ্যেষ্ঠকে 'ভন্তে' অথবা 'আযস্মা' সম্বোধন করিতেন।

সঙ্ঘপরিচালনার জন্যই বিনয়ের নিয়মগুলি সুসংবদ্ধ হইয়াছিল। যৌনসম্মিলন, গুরুতর চুরি, নরহত্যা ও আপনার অদ্ভুত সিদ্ধির পরিচয় এই চারি গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইলে ভিক্ষুসঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত হয় এবং পুনঃ সঙ্ঘ-প্রবেশের অধিকার হারাইয়া ফেলে। কতক গুরু নিয়ম লঙ্ঘন করিলে ভিক্ষুকে দণ্ডিত হইতে হয়; আবার কতক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুর নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া দোষ-মুক্ত হয়। এই সব ছাড়া আরও অনেক রকমের বিনয় ও কর্ম্ম তাঁহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। বুদ্ধকেই তাঁহারা নেতা মানিয়া চলিতেন। বুদ্ধের আদেশ তাঁহাদের অলঙ্ঘনীয়। নিম্নোক্ত শ্লোকই তাহার প্রমাণ—

পাতিমোবখং বিসোধেন্তো অপ্পেব জীবিতং চজে
পঞ্ঞত্তং লোকনাথেন—ন ভিন্দে সীলসংবরং।

'অর্থাৎ দেহে প্রাণ থাকিতে বুদ্ধ নিয়ন্ত্রিত শীল-সংবর ভঙ্গ করিবে না।' বুদ্ধদেব তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে তাঁহার প্রচারিত বাণীকেই সঙ্ঘের নেতৃপদ প্রদান করিয়াছিলেন—"যো বো আনন্দ ময়া ধম্মো চ বিনয়ো চ দেসিতো পঞ্ঞত্তো সো বো মমচ্চযেন সত্থা।" অর্থাৎ 'আনন্দ! আমার অবর্ত্তমানে আমার প্রচারিত ধর্ম্ম বিনয়কেই তোমরা তোমাদের গুরু বলিয়া জানিবে।' সুতরাং তাঁহার পরিনির্ব্বাণের পর ধর্ম্মবিনয় সঙ্ঘের নেতৃপদে বৃত হইল।

আপনার আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনই ছিল সঙ্ঘের প্রধান লক্ষ্য। পরোপকার-ব্রত সঙ্ঘের লক্ষ্য-বহির্ভূত ছিল না। আপনার উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া জনসাধারণের নৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা সঙ্ঘের কর্ম্ম-জীবনের অন্যতম অধ্যায়। তাই সঙ্ঘ রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ভারতে সঙ্ঘের দান অপরিমেয়। তাহা আমরা স্বীকার করি বা না করি, কিন্তু সত্য তাহা অস্বীকার করিতে পারিবে না।

বলা বাহুল্য, বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে এমন সুশৃঙ্খলাবদ্ধ সঙ্ঘ-সংগঠনের প্রথা কোথাও প্রচলিত ছিল না। বুদ্ধের সঙ্ঘসংগঠনের প্রণালী ভারতের তথা জগতের ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম। সেই আদর্শেরই অনুকরণে সেই যুগেও নানা সঙ্ঘে সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছিল। এখনও সেই অনুকরণ-যোগ্য আদর্শ বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়া যায় নাই, তাহা যুগে যুগে নব নব ভাবে সঙ্ঘসংস্থাপকদিগকে অনুপ্রাণিত করিবে।

দেশে দারিদ্র্য-সাধনে যানের প্রভাব

শ্রীগণপতি সরকার

দেশের ধনসম্পদ্ কতদিক্ দিয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে তাহা ভাবিলে অন্ধকারই দেখা যায়, আলোর রেখাপাতও পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে বিদেশের অর্থ আনিবার একমাত্র উপায় কাঁচা মাল; কিন্তু সেই কাঁচা মালই বিদেশ হইতে রূপান্তরিত ভাবে আসিয়া কতগুণ অর্থ যে বিদেশে চালান দেয় তাহা দেখিতে গেলে দেশের আর্থিক অবস্থার পরিণাম অতি শোচনীয়ই মনে হয়। এক যানবাহন হইতেই দেশের কত অর্থ যে বিদেশে যাইতেছে তাহা দেখিলে আতঙ্কই বৃদ্ধি হয়, অথচ নিবারণের কোন উপায় দেখা যায় না। আর এই যানবাহনই যে বর্ত্তমান অর্থকৃচ্ছ্রতার একটি বড় সহায়ক তাহা অস্বীকার করা চলিবে না।

পূর্ব্বে দেশে ঘোড়ার গাড়ীই ছিল প্রধান যান। ধনীরা ঘোড়ার গাড়ী রাখিতেন। কেহ একখানি, কেহ দুইখানি, কেহ পাঁচখানি, যার যেমন আবশ্যক বা সখ তেমন রাখিতেন। তারপর ছিল ভাড়াটে গাড়ী। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়ী প্রচুর ছিল। বহু লোকের ইহাই ছিল জীবিকা। এখন ভাড়াটে গাড়ী একরূপ উঠিয়াই গিয়াছে, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়াটিয়া গাড়ী তো কদাচিৎ দেখা যায়। কেবল ফিটং নামধারী প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়াটে গাড়ী চৌরঙ্গীর দিকে দেখা যায়; তাহার সংখ্যাও খুব কমিয়া গিয়াছে। ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ী এখন প্রায় দুষ্প্রাপ্য। যা' দু' দশখানা আছে তা'ও অতি কষ্টে আছে, কেননা এখন ইহার ভাড়া পূর্ব্বাপেক্ষা খুব বেড়ে গেছে, সেইজন্য সাধারণ লোকে ঐগুলির ব্যবহার সর্ব্বদা করিতে পারে না। ঘরের গাড়ী বলিয়া পরিচিত ধনী লোকদের যে ঘোড়ার গাড়ী ছিল তাহা তো পোনেরো আনা তিন পয়সা তিন গণ্ডা উঠিয়া

গিয়াছে। এখন সকলেই তাহার স্থানে মটর রাখিয়াছে। বাসের ও ট্যাক্সির সহিত প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়া ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ী প্রায়ই উঠিয়া গিয়াছে; আর মটরকারের দৌলতে ধনী প্রভৃতির বাড়ী হইতে ঘরের ঘোড়ার গাড়ীর অন্তর্দ্ধান ঘটিয়াছে। এখন কচিৎ কেহ ঘোড়ার গাড়ী রাখে। বর্ত্তমানে ছোট ছোট লরীর আবির্ভাব হইতেছে, এইবার হয়তো শীঘ্রই মহিষের গাড়ী ও গরুর গাড়ীর অস্তিত্ব লোপ পাইতে বসিবে। কলিকাতার যে অবস্থা হইয়াছে তাহাই বলিলাম।

ঘোড়ার গাড়ী থাকায় দেশের লাভ ছিল; দেশের বহু অর্থ দেশেই থাকিত; দেশের বহু লোক প্রতিপালিত হইত। ঘোড়া প্রায়শঃ এই দেশের; সুতরাং ঘোড়া কেনার দরুণ যে অর্থ ব্যয় হইত তাহা দেশে থাকিত। তারপর ঘোড়ার খোরাক দানা যব যই ঘাস, খড়, ছাতু প্রভৃতি এ সকল দেশেই জন্মায়; সুতরাং এইগুলির উৎপাদন হইতে খরিদ বিক্রয় প্রভৃতি সমস্তই দেশের লোক করিত, তাহাতে দেশের বহু লোকের উপজীবিকা হইত এবং দেশের টাকা দেশেই থাকিত। তারপর যে ঘোড়ার গাড়ী ব্যবহৃত হইত, তাহা এই দেশেই প্রস্তুত হইত, একমাত্র তসলা বিদেশ হইতে আসিত। ইদানীং রবার টায়ার হওয়ায় ঐ টায়ার ও টায়ারের জন্য চালান বিদেশ হইতে আসিত, আর সব এ দেশেই হইত। গাড়ীর রং বিদেশী ছিল। ঘোড়ার গাড়ী উঠিয়া যাওয়ায় যাহারা ঘোড়া ও ঘোড়ার সাজ সরঞ্জাম, দানা ও ঘাষ প্রভৃতির ব্যবসা করিত, তাহাদের ব্যবসা নষ্ট হইয়াছে, ইহাতে বহুলোকের অন্নসংস্থান গিয়াছে। এই ঘোড়ার গাড়ীর মেরামত এই দেশেই হইত, মেরামতের প্রায় সমস্ত দ্রব্যই এদেশ হইতেই সরবরাহ হইত। যে সকল মিস্ত্রী ঘোড়ার গাড়ী তৈয়ারী করিত ও উহার দ্রব্যাদি নির্ম্মাণে নিযুক্ত ছিল সকলেরই ঐ কাজ গিয়াছে, সকলেই অন্নবস্ত্রের সংস্থান হারাইয়াছে। এ কাজের অতি সামান্য দ্রব্য বিদেশ হইতে আসিত; সুতরাং সামান্য অর্থ বিদেশে যাইত, কিন্তু দেশের বহুলোক ইহার দ্বারা প্রতিপালিত হইত, বরং ইহার দরুণ যে অর্থব্যয় হইত তাহার প্রায় সমুদায় অর্থই দেশে থাকিত।

মটরকারের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ীর বিষম বিপদ্ ঘটিয়াছে, তাহার বংশ একরূপ ধ্বংস-প্রায়।

মটরকার এদেশে আসিয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ বিদেশী। ইহার কোন অংশই দেশী নয়। ঘোড়ার গাড়ী অপেক্ষা ইহার দামও বহুগুণ বেশী। খুব ভাল ঘোড়ার গাড়ী, অবশ্য ঘরের সৌখীন গাড়ী, এক হাজার বা দেড়হাজারে হইত, কদাচিৎ ইহা অপেক্ষা বেশী হইত। এখন সব চেয়ে কম দামী মটরগাড়ী ২৫০০৲ আড়াই হাজার হইতে ৩০০০৲ তিন হাজারের কম মেলে না। অবশ্য ইহা নূতন মটরকারের দাম। তারপর ঘোড়ার গাড়ী মেরামত করিয়া পুরুষানুক্রমে ব্যবহার করা চলিত। মটরের তা' হয় না, কমদামী মটরকার তো ৫।৭ বৎসরের মধ্যেই অব্যবহার্য্য হয়। দামীগুলি ১০।২০ বৎসর চলে। কিন্তু মেরামত খরচায় ঢাক সমেত ঢাকী বিকাইয়া যায়। মটরের কল কব্জা যা' ভাঙ্গিয়া যায় বা কম-জোরী হইলে বদলাইতে হয়; তাহাও এ দেশে তৈরী হয় না, বিদেশ হইতে কিনিতে হয়। মটরের পেটরল, মবিল অয়েল প্রভৃতি যা কিছু চাই সব বিদেশ হইতে আমদানী। মোটকথা, মটরের ব্যবহার্য্য যা' কিছু সবই বিদেশী। ইহার জন্য যা' কিছু খরচ হয় সমস্তই বিদেশে চলিয়া যায়। দেখা যাইতেছে যে, মটরকারের আবির্ভাবে যে সকল লোক ঘোড়ার গাড়ীর জন্য করিয়া খাইত তাহাদের অন্ন গিয়াছে এবং ঘোড়ার গাড়ীর জন্য যে অর্থব্যয় হইত, তাহার অনেকগুণ অর্থ মটরকারের দৌলতে বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। এমন ভাবে ঐ অর্থ যাইতেছে তাহা আমরা যেন দেখিতেই পাইতেছি না। এই মটর আবার এমন বস্তু, যদি একবার ঘাড়ে চাপে তাহা হইলে আর উপায় নাই, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বিদেশীকে অর্থ সাধিয়া দিতে হইবে; কেননা, উহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গই যে বিদেশী। উহাকে চালু রাখিতে হইলে প্রতি পদক্ষেপেই বিদেশীকে অর্থ দিতে বাধ্য।

বর্ত্তমানে এক কলিকাতায় প্রায় সাড়ে ৩৭ হাজার ঘরের মটরের নম্বর দেখা যায়। এই মটরগুলি কিনিতে হইয়াছে। প্রতি মটর ২॥০ আড়াই হাজার হইতে ৫০ পঞ্চাশ হাজার দামও দিতে হইয়াছে। ইহাতে কত টাকা বাহিরে গিয়াছে! এখন এই ৩৭॥*হাজারের মধ্যে যদি

১০ দশ হাজারও অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলেও ২৭ সাতাশ হাজার গাড়ীর প্রত্যহ পেট্রল ও মবিল তৈল লাগিতেছে। তারপর আছে ইহাদের মেরামত। প্রতি গাড়ী পিছু যদি কম-সে-কম দৈনিক ২৲ দুই টাকা খরচ গড়পড়তা ধরা যায়, তাহা হইলেও ২৭০০০ × ২ = ৫৪০০০৲ হাজার টাকা রোজ খরচ হইতেছে। তাহা হইলে মাসে ৫৪০০০ × ৩০ = ১,৬,২০০০০৲ টাকা ব্যয় হইতেছে; অতএব বৎসরে ১৬,২০,০০ × ১২ = ১,৯৪,৪০,০০০৲ টাকা বেকসুর বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। একমাত্র কলিকাতার ঘরের মটরেরই এত টাকা প্রতি বর্ষে বিদেশে যায়। এর পর প্রায় দুই হাজার ট্যাক্‌সি আছে, তারপর মটরবাস আছে, আরও আছে লরী। এক কলিকাতা হইতেই বৎসরে কম-পক্ষে তিন কোটীর উপর টাকা বিদেশে যাইতেছে। সমস্ত ভারতবর্ষ ধরিলে কত যাইতেছে তাহা বিবেচনার বিষয় নয় কি? যে কয় বৎসর মটরকার এদেশে পদার্পণ করিয়াছে, তখন হইতে কত টাকা এই মটর-কার বিদেশে চালান দিতেছে, তাহা আমরা সত্যই ভাবিয়াছি কি?

দেশে ধনী লোক আছে। ব্যবসাদার লোক আছে। চেষ্টা করিলে যে, দেশেই মটরকার তৈয়ারী হয় না তাহা নয়। দেশের মটরকার দেশে ব্যবহার করিলে দেশের অর্থ বাহিরে যায় না। আমেরিকা ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে মটর তৈয়ারী হয়, তাহারা উহার যথেষ্ট ব্যবহার করে, তাহাতে তাহাদের ক্ষতি হয় না; কেন না, তাহাদের দেশের শিল্পজাত দ্রব্য তাহারা ব্যবহার করিতেছে, বরং তাহা অন্য দেশে চালান দিয়া বাহিরের অর্থ ঘরে আনিতেছে। আর আমরা তো কিছু তৈয়ারী করিয়া ব্যবহার করিতে পারিতেছি না, আমরা পরের দেশের দ্রব্য কিনিয়া ব্যবহার করিতেছি; এইরূপে ঘরের অর্থ অন্যের হাতে তুলিয়া দিতেছি। মটরকার এখানে তৈয়ারী হইলে, দেশের বহু অর্থ দেশেই থাকিয়া যায়। পেট্রলের জন্য বিদেশে যাইতে হইলেও তাহাতে তেমন আসিয়া যায় না। তবে কে বলিতে পারে যে, আমাদের দেশেই পেট্রল পাওয়া যাইবে না? অথবা অন্য কিছু আবিষ্কারও হইতে পারে, যাহা দ্বারা মটর চলিবে এবং ঐ দ্রব্য এদেশেই পাওয়া যাইবে। সম্প্রতি এক জার্ম্মান ইন্‌জিনিয়ার সমুদ্রের জল হইতে গ্যাস তৈয়ারী করিয়া এঞ্জিন চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। যদি ইহা কার্য্যকরী ভাবে চলে, তাহা হইলে আমাদের ভাবিবার কিছু নাই; সমুদ্রের জলের অভাব ভারতে কোন দিনই হইবে না। এখন দরকার শুধু চেষ্টা ও অর্থবল। দেশের লোক চেষ্টা করিলে মটর-কারের দরুণ যে ভীষণ অর্থ শোষণ হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহার প্রতিরোধ করিতে পারেন। সম্পূ[র্ণ] প্রতিরোধ করিতে না পারিলেও যে বার আনা রো[ধ] করিতে পারেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশের বর্ত্তমা[ন] অর্থকৃচ্ছ্রতার আনয়নে মটরকার আংশিক দায়ী তাহ[া] বলিতেই হয়। আমরা নিশ্চেষ্ট থাকিলে এইরূপ বিপ[দ] বাড়িতেই থাকিবে।

গান

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সেনশর্ম্মা

আজ বাদে কাল দিব পাড়ি সুদূর দেশে নূতন গাঁয়ে।
যেথায় নাচে আপন-ভোলা উজান নদীর তরী বেয়ে।
যেথায় সদা নীলাকাশে
মৃদু মৃদু তারা হাসে;
বিলায়ে দেয় সৌরভ তাহার বাতাস গন্ধ ছেয়ে।

যেথায় হতে আলো আসে
শিশির-ধোয়া নবীন ঘাসে
সুধার সাগর হয় উতলা নবীন দক্ষিণ বায়ে
গোপন প্রাণের পরশ-ভরা নিবিড় তমাল ছায়ে

কর্ণধর পালের গমন ও আগমন

(বড় গল্প)

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত

সাত-পুরুষের ভিটার মাটি এবং তার উপরকার বাস্তু-গৃহ মানুষের যে কত প্রিয় তার ঠিক নাই—বোধ হয় প্রাণের চাইতেও প্রিয়; কাজেই উহাকে ত্যাগ করিয়া চিরদিনের মত অন্যত্র চলিয়া যাওয়া হৃদয়-বিদারক ব্যাপার সন্দেহ নাই। কষ্টটা এমনি সত্য যে, সত্য কি না সন্দেহ করাই নির্ম্মমতা। কিন্তু পরম্পর শুনা গেল, এবং শুনিতে শুনিতে, এবং পরে উদ্যোগ আয়োজন দেখিয়া ক্রমশঃ সন্দেহই রহিল না যে, কর্ণধর পাল তাহাই করিতেছে। কর্ণধর পাল বর্ত্তমানে মৃত্যুশয্যায় শায়িত রহিয়াছে, অর্থাৎ অন্তরের মায়া দিয়া, আর যেন দেহের নাড়ী দিয়াও, পাকে পাকে বাঁধা, এবং সহস্র স্মৃতিমণ্ডিত গৃহকে সে মৃত্যুর ডাকে ছাড়িয়া যাইতেছে তাহা নহে। ব্যাপার অন্যরূপ—স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানে সে মাটিসহ বাড়ী বিক্রয় করিয়াছে। কাহার কাছে সে বিক্রয় করিয়াছে তাহা অবশ্য জানা গেল না, কিন্তু বিক্রয় সে করিয়াছে; এবং আরও জানা গেল যে, বাড়ীখানাকে সে বেচিয়া ত' দিয়াছেই, আরো বেচিয়া দিয়াছে তার অস্থাবর সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল সবই—এমন কি মজুত মাল পর্য্যন্ত, অর্থাৎ হাঁড়ী, কল্সী, সরা, মাল্সা, ঘট, গাম্লা, কুঁজো, কল্কে, হোলা, ঠিলে ইত্যাদি—আর চক্রখানা, যাহা কাঠিতে করিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সে ঐ সব বস্তু প্রস্তুত করিত...

লোকে আরো শুনিল, এবং কেহ কেহ চোখেও দেখিল যে, কর্ণধর পাল বাঁধন ছিঁড়িবার কষ্টে চোখের জলে পুনঃ পুনঃ স্নান করিয়া উঠিতেছে।

কর্ণধর পাল অত্যন্ত ক্ষুদ্র ব্যক্তি—

তবু ইহা না বলিয়া দিলেও চলে যে, কর্ণধর পাল ধিক্কারে আর লজ্জায় অভিভূত হইয়া এবং অশ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হইয়া ঐ অসহ্য কাণ্ড করিয়াছে, সহজে করে নাই। এ দেশে আর সে থাকিবে না, মুখ দেখাইবে না; অন্য দেশে চলিয়া যাইবে বলিয়া সে সঙ্কল্প করিয়াছে। সঙ্কল্প তার অটল বলিয়াই মনে হইল।

সন্তানাদি যার হয় নাই তার স্ত্রী-বিয়োগ যদি ঘটে তবে একা একা আর ভাল লাগে না বলিয়া বাড়ীতে কুলুপ লাগাইয়া আন্তরিক বৈরাগ্যসহ কিছুদিন তীর্থপর্য্যটনে নিরুদ্দেশ হওয়া তার পক্ষে স্বাভাবিক—বিশেষতঃ মহা-ভারত যদি তার নিত্য-পাঠ্য হয়; কিন্তু সে ধরণের বিয়োগ-বেদনা কর্ণধর পালের সংসার-স্পৃহা বিলুপ্তির হেতু নহে—

কিম্বা ঋণের দায়, কিম্বা জমিদারের অত্যাচার তাহার কারণ নহে—

কারণটি বড়ই এবং আরো কঠিন।

কর্ণধর পালের বিধবা এবং অবশ্য যুবতী কন্যা—সুন্দরী রমণী—বৎসর দেড়েক হইল বিদেশী একটী যুবকের সঙ্গে পলায়ন করিয়াছে। তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই—পুণ্যক্ষেত্র নবদ্বীপে পাওয়া যায় নাই, তীর্থশ্রেষ্ঠ কাশীধামে পাওয়া যায় নাই—রাজধানী কলিকাতায় পাওয়া যায় নাই। মেয়েটির জন্য কর্ণধর ধনে প্রাণে গেল।

কর্ণধরের এখন ঐ একটি মাত্রই সন্তান, কন্যা। আগে ও পরে আরও দু'তিনটি সন্তান জন্মিয়াছিল, কিন্তু তাহারা মনে দাগ কাটিয়া বসিবার পূর্ব্বেই, অর্থাৎ নাড়াচাড়ার সুখে এবং দেখিয়া দেখিয়া মমতা জন্মিয়া মনে চিরস্থায়ী হইয়া উঠিবার পূর্ব্বেই, পরলোক গমন করায় নগণ্য হইয়া গেছে—টিকিয়া গেছে ঐ কন্যা—সর্ব্বনাশী কন্যা। কিন্তু সর্ব্বনাশ ঘটাইবার পূর্ব্বে সে-ই ছিল একমাত্র বন্ধন…

কিন্তু বন্ধন যে ও-তরফ হইতে এমন শিথিল হইয়া আসিতেছে তাহা কে জানিত! সামান্য কয়েকটী মাস—

আট দশ মাসের বেশী নয়—স্বামীগৃহে বাস করিবার পর কন্যাটি বিধবা হইয়া ফিরিয়া আসিল—সিঁদুর পরিয়া বাহির হইয়াছিল, সিঁদুর মুছিয়া ঢুকিল। সেই নিদারুণ প্রত্যাবর্ত্তনে কর্ণধর তার গভীরতম সম্বিতেও দুঃখিত হইয়াছিল কি না তাহা ঠিক করিয়া বলিতে সে নিজেই বোধ হয় পারে না। কারণ ঐ কন্যাই যে তার একমাত্র বন্ধন। বিধবা কন্যাকে একেবারে যৌবনে মাছ মাংসে আর শাঁখা সিঁদুরে বঞ্চিত হইয়া তপস্বিনীর বেশে অহরহ সম্মুখে দেখিয়া কর্ণধরের বুক ফাটিত, কি একমাত্র সন্তান অর্থাৎ সংসারের একমাত্র অবলম্বনকে ফিরিয়া পাইয়া সে স্বস্তি পাইয়াছিল তাহা লইয়া বাহিরে বাহিরে তর্ক করিবার উপায় নাই—তাহা কর্ণধরের পরমাত্মা জানে।

তারপর দিন যায়—

তারপর দিন একাদিক্রমে আয়ো গত হইতে হইতে মেয়ের শ্বশুর-বাড়ীর দেশেরই একটি ছেলে আসিয়া স্বর্গগত জামাতার আত্মীয় পরিচয়ে দিন দুই আদরে আপ্যায়নে থাকিবার পর, এবং বিস্তর সদাশয়তার পর, মেয়েটিকে লইয়া পলায়ন করিল; কর্ণধরের, দরিদ্র, নিরীহ, ধর্ম্মভীরু, দেবদ্বিজে ও বৈষ্ণবে ভক্তিমান্ কর্ণধরের, মুখে চুণ কালি পড়িল; গ্রামে হৈ হৈ উঠিল—ধর্ম্ম গেল…

এবং আরো যাহা ঘটিল তাহার বর্ণনা দেওয়া বোধ হয়—

অপরাধ হয় কিনা তাহা পরের বিবেচ্য। কর্ণধর পাল লোকটি খুবই ভাল, নিরতিশয় গ্রাম্য; দেখিতে বেশ ছিম্‌ছাম্—সামান্য গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া আর কোমরে কাপড় বাঁধিয়া সে কাঁচা এবং পোড়ান মৃৎপাত্রের স্তূপের ভিতরে এবং চাকার সম্মুখে বসিয়া থাকে; কিন্তু মনে হয়, কর্ণধর ধুইয়া মুছিয়া নিজেকে বেশ পরিপাটি করিয়া রাখিয়াছে, যেন কোনো ভদ্রস্থানে যাইবে।…চাকা তার হাতে ঘোরে খুব, আর তার হাতের গুণে মাটি যে আকার ধরে তা' নিখুঁৎ—

ইহা ছাড়াও তার মন্দিরায় বেশ মিঠে হাত—এবং এ ছাড়াও তার আর একটা গুণ, হাতেরই গুণ, অসামান্য এক লোভনীয় গুণ, এই যে বড় মিষ্টি করিয়া সে তামাক সাজে…

ব্রাহ্মণের হুঁকা সে তিন চারিটি রাখে; তিন চারিজন ব্রাহ্মণের একসঙ্গে পদার্পণ হলেও তিন-চারিজন ব্রাহ্মণকে একসঙ্গেই সে নিযুক্ত রাখিতে পারে।

ইহা ব্যতীত কর্ণধরের মনটি সাদা, প্যাঁচ সে জানে না। অতএব গ্রামের সে প্রিয়পাত্র। তাহার, অর্থাৎ মৃদুস্বভাব সেবাপরায়ণ ভালমানুষটির কন্যার অকাল বৈধব্যে তাহার অর্থাৎ বিধবা কন্যার পিতার, বুকের বেদনার অনুকম্পন সেদিন গ্রামের বুকে বিদ্যুৎগতিতে ছড়াইয়া গিয়াছিল। যে মানুষটি বাঁচিয়া থাকিলে বিবাহিতা নারীর ভঙ্গুর দেহ হইতে অমর আত্মা পর্য্যন্ত চমৎকার রসসামগ্রীর অক্ষয় জোগান পাইতে থাকে তাহার, এক-কথায় স্বামীর, মৃত্যুতে কন্যার ছট্‌ফটানি দেখিয়া শোকাহত কর্ণধরও মাটিতে, তার চাকার ধারে, উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল…

কর্ণধরের হিতৈষীগণ, দরদীবর্গ এবং অনুরাগী সবাই, যুবা বৃদ্ধ দুই রকমই, কর্ণধরকে মাটির উপর হইতে টানিয়া তুলিতে দৌড়াইয়া আসিয়াছিল…এবং সেই অবসরে অনেকেরই, যুবা বৃদ্ধ দুই রকমেরই চোখে পড়িয়াছিল যে, কর্ণধরের কন্যা দেবী দাসী অপরূপ রূপপ্রাচুর্য্য এবং যৌবনোদ্দামতা সঞ্চয় করিয়াছে।

তারপর সূর্য্যের উদয়াস্তের নিয়মে ঘটনায় ঘটনায় সময়ের ব্যবধানের বৃদ্ধি এবং শোকের ক্ষয় হইতে হইতে দেবী দাসী কান্নাটা ভুলিয়া কেবল দু'চারি গ্রাস সুখহীন নিরামিষ ভাত লোকের কথায় মুখে তুলিতে সুরু করিয়াছে, এবং কর্ণধর তামাক সাজিয়া পূর্ব্ববৎ আন্তরিকতার সহিত ব্রাহ্মণ সৎকার করিতে লাগিয়াছে এমন সময় একদিন সকালবেলা উঠিয়া দেবী দাসীকে ঘরে কিম্বা ঘরের বাহিরে গ্রামে কোথাও পাওয়া গেল না।

কর্ণধর লোকটি অত্যন্ত সরল প্রকৃতির এবং অতিরিক্ত স্নেহপরায়ণ বলিয়া ছুটাছুটি করিল, প্রয়োজনের বেশী এবং মানুষকে জিজ্ঞাসা করিল নির্ব্বিচারে, সেই কারণে কথাটা দু'চার মিনিটেই গ্রামময় জানাজানি হইয়া গেল…

লোকে ভিড় করিয়া আসিল—

ভিড়ের ভিতর চন্দ্রশেখর দত্ত (৫৫) বলিলেন, আমাদের দিনে এ-সব ছিল না; জীবনে কথনো দেখি

নাই। বলিয়া তিনি পার্শ্ববর্ত্তী ভূপতিভূষণ রায়কে লুকাইয়া একটি নিঃশ্বাস ছাড়িলেন।

সকলেই সে-ই কথাই বলিল—অনমুমোদনের কথা...

যুবা বৃদ্ধ, দুই রকমের লোকই, সমস্বরে বলিল, ভারি কলঙ্কের কথা ইহা, যারপর নাই ঘৃণ্য কথা, একেবারে ধিক্কারজনক ব্যাপার···

শুনিয়া কর্ণধর পাল মাটির ভিতর হইতে আরো মুখ তুলিতে পারিল না।

তখন তাহাকে সকলে মিলিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন; অগ্রণী যুধিষ্ঠির গোস্বামী বলিলেন—তোর অপরাধ ত' কিছু নাই, কর্ণ; তোকে আমরা দুস্‌ছি নে; তোকে আমরা এখনো শ্রদ্ধা করি, ধার্ম্মিক আর বুদ্ধিমান বলে', কিন্তু এ-কথাও সত্যি যে, তোর একটা দায়িত্ব ছিল; সাবধান হওয়া তোর উচিত ছিল।

ত্রিপুরেশ্বর চক্রবর্ত্তী (৫৭) বলিলেন—অজ্ঞাত কুলশীলস্য বাস দেয়ঃ ন কস্যচিৎ...

শুনিয়া কথাগুলিকে ব্রাহ্মণের অভিসম্পাৎ মনে করিয়া কর্ণধর মাটির ভিতর হইতে মুখ তুলিল; এবং ভয়ে তাড়াতাড়ি করিয়া আসিয়া দর্শকগণের পায়ের উপর সর্ব্বাঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া লুটাইতে লাগিল···তখন তাহার, অর্থাৎ কুলত্যাগিনী কন্যার পিতার মর্ম্মবেদনার অনুকম্পন তাঁহাদের বুকেও প্রবাহিত হইতে লাগিল...

যুধিষ্ঠির গোস্বামী কৃপাবশতঃ এবং শুশ্রূষার ভঙ্গীতে তাহাকে তুলিয়া বসাইলেন।

কিন্তু বিশেষ কিছু করিবার নাই, বিশেষ কিছু বলিবারও নাই; ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চতর জাত্যন্তর্গত ব্যক্তিগণ কুম্ভকারকে সামাজিক ভাবে, সুতরাং অফুরন্ত করিয়া, কি বলিবেন!

সকলে চলিয়া আসিলেন—

বৃদ্ধেরা আসিয়া বসিলেন উপেন সান্যালের বৈঠকখানায়, যুবকেরা যাইয়া উঠিল শ্রীশ অধিকারীর দোকানে—

মেয়েরাও অবশ্য ব্যাপারটা শুনিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা কাহারও বৈঠকখানায় সমবেত হইলেন না, নিজের নিজের ঘরেই চম্‌কিয়া উঠিতে লাগিলেন।

কিন্তু পুরুষের স্নায়ু শক্ত বেশী, শীঘ্র চম্‌কায় না, আর গাল দেয়া ছাড়া তাঁরা আরো অনেক জানেন; সুতরাং তাঁহারা শাস্ত্র-প্রণেতা ঋষি হইতে বিদ্যাসাগর পর্য্যন্ত এবং তথা হইতে যদি আধুনিকতম কথা-সাহিত্যের গতিতে অবতরণ করিলেন...

বিস্তর বকিয়া তারপর এক সময় নিঃশব্দ হইয়া গেলেন···

কি একটা অশান্ত অভাববোধ আর তৃষ্ণার দাহ সবারই প্রাণে মূর্চ্ছিত অবস্থায় অবস্থান করিতেছিল তাহা তাঁহারা বোধ হয় জানিতেন না; কিন্তু এই সূত্রে তাহারই পীবর অথচ খিন্ন একটা চেতনা যেন অনুভব করিতে লাগিলেন...যাহার দরুণ ক্রমে সকলেরই মনে হইল উহাদের ভালবাসার কথাটা, সকলেরই মনে হইল, উহাদের ভালবাসা নিশ্চয়ই খুব গভীর; অপরাধ করিয়াছে বটে, অপরাধ অমার্জ্জনীয়ও বটে, কিন্তু কত ভালবাসে!

বৃদ্ধের দলের পীতাম্বর কবিরাজ (৫১) চুপ করিয়া থাকিতে থাকিতে বলিয়া উঠিলেন—পরিণামে কষ্ট পাবে।

এদিকে যুবাদের দলের সূর্য্য কুশারী বলিল—এ আকর্ষণ নিরোধ করা অসম্ভব।

কথাটা যুবকেরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল, স্বীকার না করিয়া তাদের উপায়ই নাই; কারণ "পঙ্কের পথে"র কবি সূর্য্য কুশারী চুল অকারণে বড় রাখিয়া কেবল কবি সাজিয়া বসিয়া নাই—"বাজারে" যথার্থই তার কবিখ্যাতি আছে, সে নিজে অবশ্য উদ্বাহু হইয়া জানায় নাই, তবু ধরা পড়িয়া গেছে যে, মানুষের গভীরতম এবং আকুলতম আকাঙ্ক্ষার সন্ধান সে রাখে। কুশারী আবার বিদ্রোহী—সে-বিদ্রোহ দূষণীয় কিছু নয়, সৃষ্টিশীল মনের আকুতি; সকলেই জানে, সে বিদ্রোহ চঞ্চল নয়, উদ্দীপ্ত নয়, অসহিষ্ণু নয়, পরন্তু পরিণত, সংযত, স্বল্পভাষ এবং গভীর। কুশারীর ভক্তেরা আরো স্বীকার করে যে, পরিপূর্ণতম বস্তুর প্রতি তার লোভ অসীম—নিজস্বকরণের লোভ নহে, বৈষ্ণব কবির মত সেই উদ্দেশে ধ্যানী হইয়া কাব্য রচনার লোভ।

সে যাহাই হউক, কুশারীর ধারণা ঐ—তাহা সে অবাধে ও অপকটে প্রকাশ করিল; এবং দেখা গেল, অথবা

সঙ্গোপনে· অন্তর্য্যামী জানিলেন, তাহার সঙ্গে মতভেদ কাহারও নাই...

ভালবাসা বাস্তবিকই দুর্লভ, অত্যন্ত দুর্লভ, আর সহজে প্রকট নয়; এবং এত লোভের জিনিষ যে, লোভ দমন করিতে না পারিয়া লোকে নাকাল হইয়া যাইতেছে। ভালবাসা পাইলে প্রত্যাখ্যান করিবার কথা ভদ্রলোকেরা যতই ভাবুন, জীবন দেবতা তাহাকে ঠেলিতে পারেন না। ধ্বনির প্রতিধ্বনি জানিবে না, অথবা বাতাস উঠিলে জলে ঢেউ উঠিবে না, ব্যবস্থা-প্রণয়ন দ্বারা যেমন তাহা ঘটান যায় না তেম্‌নি তা' অনিবার্য্য।

মোটের উপর, লক্ষণ দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে যে, দেবী দাসীর শ্বশুরবাড়ীর দেশের সেই লোকটা আসিয়া না পড়িলে, এবং তৎপূর্ব্বে ইহা জানিতে পারিলে, যে দেবী দাসী ভালবাসিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে তবে, গ্রামেই কিছু ঘটিত।

বৃদ্ধেরা জিহ্বা এবং হস্তপদাদির সাহায্যে বিস্তর আস্ফালন করিলেন; ছেলেগুলির দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন, কারণ, "দেশের হাওয়া বড়ই বিপরীত"...

উদ্দেশ্য সাধু, কথাও মূল্যবান—

কিন্তু মাঝখানে হঠাৎ একটা উল্টা কথা বলিয়া বসিলেন পুরুষোত্তম বাগ্‌চি (৬৩); তিনি বলিলেন,—আমাদের কিন্তু এস বলে' কেউ কোনোদিন ডাকে নাই। কেন কে জানে! থোর বড়ি খাড়া খাড়া বড়ি থোর বলিয়া তিনি উঠিলেন।

পুরুষোত্তমের ঐ অসংযত ও অসঙ্গত উক্তি শুনিয়া উপস্থিত সকলে প্রথমে যেন মানে না বুঝিয়াই উচ্চ-হাস্য করিলেন; তারপর হুঁস্ হইল যে, কথাটা খারাপ; তখন সকলে তাঁহাকে ধিক্কার দিলেন।

কন্যাই গেল, সুতরাং বাড়ী দিয়া কি হইবে? গাভীর দুগ্ধ কে খাইবে? বাবা বলিয়া কে ডাকিবে? বলিবে, বাবা, চান্ করো, বেলা ঢের হয়েছে। কেহ তাহা বলিবে না। তবে সংসারে আর রহিল কি? সে-ই বা রহিবে কাহার জন্য?

অতএব কর্ণধর পাল তল্পী বাঁধিল। কোথায় যাইতেছে বলিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানের কথা সে কাহাকেও বলিল না—তীর্থস্থান অতএব তাপিতের আশ্রয়, নবদ্বীপ কি কাশী কিম্বা প্রসিদ্ধ স্থান কলিকাতা—ইহার মধ্যে কোন্ স্থানে সে যাইতেছে তাহা জানা গেল না—

জিজ্ঞাসা করিলে বলিল—এ পোড়া মুখ যেখানে হোক্ গুঁজে' থাক্‌ব···গাছে হাঁড়ি টাঙাতে চল্‌লাম বলিয়া কাঁদিয়া ভাসাইল।

বিদায় কালে সে ব্রাহ্মণগণের পদধূলি লইল যত, চোখের জল ফেলিল তত; এবং চোখের জলে আর পায়ের ধূলায় মাখামাখি করিয়া এমন একটা করুণ-কঠিন হিতে বিপরীত কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল যে, সূর্য্য কুশারী সেই আব্‌হাওয়ার প্রভাবে পড়িয়া দুর্জ্জয় প্রেম সংক্রান্ত একটি অশ্রু-করুণ কবিতা তখন লিখিয়া আনিল···নিজেই আবিষ্ট হইয়া নিরতিশয় মন্ত্র-মুগ্ধের মত লেখা বলিয়া ছেলেরা অনেকে তাহা মৃদুগুঞ্জনে আবৃত্তি না করিয়া ছাড়িল না।

ত্রিপুরেশ্বর চক্রবর্ত্তী তল্পী-ঘাড়ে কর্ণধরকে সান্ত্বনা দিতে দিতে গ্রামের বাহিরে রাস্তায় তুলিয়া দিয়া আসিলেন।

কর্ণধরের বাড়ী এখন পড়ো' বাড়ী—চাল বেড়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। কর্ণধর সুদূরে অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া এই গৃহের কথা স্মরণ করিয়া বোধ হয় নিঃশ্বাস ফেলিতেছে, আর নিঃশ্বাসের সঙ্গে নীরবে অশ্রুপাতও করিতেছে, কিন্তু গ্রামের লোক তাহাকে এই অল্প দিনেই ভুলিয়া গেছে।

মরমী সূর্য্য কুশারী কথাটা—কর্ণধরের কথা নয়, তার মেয়ের কথা—তুলিয়া মাঝে মাঝে মুক্তি-ধারার বন্দনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে তার নিজস্ব গতির ঝর্ণা, স্ফূর্ত্তির ফোয়ারা আর দোলন ছন্দে···ভাবময় পারিপার্শ্বিকে তার শব্দ তরঙ্গ বাজিতে থাকে...মুক্তার মত সমুজ্জ্বল শব্দ মালা বাহির হইতে থাকে···মর্ম্মরিত ঘন নিঃশ্বাসে যবনিকা দুলিতে থাকে···

নিজের এই ব্যাখ্যা সূর্য্য কুশারী আজকা'ল করে—

তা' ছাড়া সাধারণ লোকের কর্ণধরের কথা মনে নাই, এমন সময় দেখা গেল, কর্ণধরের সেই পড়ো' বাড়ীর

সম্মুখেই ইট পড়িতেছে ; একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক মজুরের উপর কর্তৃত্ব আর কাজের বিলি-ব্যবস্থা করিতেছিল...

চিন্তামণি ভিষকৃরত্নের প্রশ্নের উত্তরে ভদ্রলোকটি পরিচয় দিলেন যে, তিনি মহাদেবগঞ্জের জমিদার শ্রীযুত সমরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরী মহাশয়ের কর্ম্মচারী ; এই বাড়ী তিনি—সমরেন্দ্রনারায়ণ প্রস্তুত করাইতেছেন—ইট তাঁরই।

মহাদেবগঞ্জ কোন্ জিলার অন্তর্গত ?

সমরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরীর কর্ম্মচারী জানাইলেন যে, মহাদেবগঞ্জ রাজসাহী জিলার পুরন্দরপুর পুলিশ ষ্টেশনের অধীন একটি বিশেষ স্থান। যে প্রাচীন জমিদারবংশ রাজসাহী জিলাকেই অলঙ্কৃত করিতেছে তাহা ঐ মহাদেবগঞ্জেরই ; জমিদারবাবু সিংহ চৌধুরী উপাধিক। মহাদেবগঞ্জেই তাঁহাদের সদর কাছারী। সমরেন্দ্রবাবু এই বাড়ী ক্রয় করিয়াছেন ; এক্ষণে ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করাইবেন।

ঐ কথায় গ্রামে একটা আন্দোলন সুরু হওয়া বিচিত্র নয়। কোথায় ক্ষুদ্র এৎমামপুর, আর কোথায় জিলা রাজসাহী, আর তার ভিতর কোথায় সেই পুরন্দরপুর পুলিশ ষ্টেশনের অধীন মহাদেবগঞ্জ ! ওরা আছে বলিয়া স্বপ্নেও কেউ জানে না।

তারিণীশঙ্কর গুপ্ত (৫৯) যতদূর সম্ভব অনুমান করিয়াও কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না...তারিণীশঙ্কর হাল ছাড়িয়া দিতেই সবাই শিথিল হইয়া গেলেন—কর্ণধর পাল কর্তৃক বাড়ী বিক্রয়ের ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল সমস্যায় দাঁড়াইয়া গেল...

তারিণীশঙ্কর তারপরও আরো খানিক্ ভাবিয়া শেষ পর্য্যন্ত ইহাই সন্দেহ করিলেন যে, কয়েক হাত ঘুরিয়া যদি মহাদেবগঞ্জের জমিদারের হাতে পড়িয়া থাকে...

তাহাই সম্ভব—

কিন্তু কর্ণধর কিছুই প্রকাশ করে নাই কেন ? যেন, গোপনে সে কাজটা করিয়াছে—কেন ? এখানে সে খরিদ্দার খোঁজে নাই কেন ? পীড়াপীড়ি করিয়া জানিতে চাহিলেও সে এড়াইয়া যাইত—কখনো কখনো হঠাৎ এমন কাশিতে সুরু করিত যে মনে হইত তার দম হইয়া আসিতেছে...

ব্যাপার আশ্চর্য্য।

অভাবনীয় কল্পনাশক্তি এবং অপরিমেয় অন্তর্দৃষ্টিসহ আজকে সুন্দর অভিমানের মালিক হইয়াও সূর্য্য কুশারীও অভ্রান্ত কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিল না।

জমিদারের কর্ম্মচারী, আশুবাবু, লোকটি অত্যন্ত অমায়িক ; লোকের অকারণ উৎসুক্যে বিরক্ত না হইয়া জানাইলেন যে, এই বাড়ী প্রস্তুত করাইবার ভার তাঁহার উপর পড়িয়াছে ; ইহা ছাড়া উদ্বেগনিবারক আর কিছু তিনি অবগত নন্ ; ক্রয়-বিক্রয় তাঁর অসাক্ষাতে কোথায় ঘটিয়াছিল জানেন না। পথের লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াই তিনি এই দূরবর্ত্তী গ্রামের এবং পতিত বাড়ীর সন্ধান পাইয়াছিল।

ইহাতেও হতাশ না হইয়া তারিণীশঙ্কর প্রভৃতি কয়েকজন কয়েকদিন ধরিয়াই আরো চেষ্টা করিতে লাগিলেন···এবং সেই অবসরে আরও ইট আসিল...মাটি খুঁড়িয়া ভিত্তি প্রস্তুত হইল—

ইষ্টকালয় উঠিতে লাগিল...

তাহার সহিত আরো যাহা উপরের দিকে উঠিতে লাগিল তাহা হইতেছে গ্রামের লোকের চোখ ; এবং সেই চোখের সম্মুখে দিন দিন বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়া উঠিতে লাগিলেন খ্যাতনামা মহাদেবগঞ্জের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার সমরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরী···

বাসব বোস্ হঠাৎ একদিন বলিল,—শুন্‌ছি, লোকটা কোটীপতি।

ক্ষুদিরাম পাঠক বলিলেন,—হ্যাঁঃ ! কোটিপতি !

কিন্তু বাসব বোস্ পিছাইল না, সে কলিকাতায় চাকরী করে ; বলিল,—ইণ্টার প্রভিন্‌শ্যাল ব্যাঙ্কের ছোট ম্যানেজার বল্‌লে তাই। ছ'টা যে রেসের ঘোড়া তার আছে তারই দাম দেড় লাখ্ করে' আঠার লাখ্।

—দেড় লাখ্ একটার দাম হ'লে ছ'টার দাম হয় বুঝি আঠার লাখ্ ! পণ্ডিত ! তিনি কোটিপতি ঐ হিসেবে নাকি ?

আর যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল সবাই হাসিয়া

কিন্তু সে হাসিতে পথ আট্‌কাইল না—কথাটা চলিতে চলিতে "লোকটা" প্রায় কোটিপতিতেই দাঁড়াইয়া গেল

শুনিয়া সূর্য্য কুশারী পুলকিত হইল; লোকটা সুশিক্ষিত নিশ্চয়ই; কবিতাও নিশ্চয়ই বোঝে; গ্রামে বাস করিয়া সুখ পাওয়া যাইবে

কাশীশ্বর বাঁড়ুর্য্যে কোথা হইতে শুনিয়া আসিলেন, লোকটা নাকি খুবই দানশীল। তার দানের হাত বন্ধ করিতে একজন জবরদস্ত সাহেব ম্যানেজার রাখিতে হইয়াছে।

রাইরমণ গুহ জানিতে চাহিলেন—কে রেখেছে?

—সেই বাবুর মা। আবার কে?

—সায়েব ত' এখানেও আস্‌বে!

হরিপদ সান্যাল বলিলেন—না-ও আস্‌তে পারে, আবার আস্‌তেও পারে।

যে সাহেবকে বাবুর দানের হাত বন্ধ করিতে নিযুক্ত করা হইয়াছে সেই সাহেব বাবুর দানের হাত বন্ধ রাখিতে এখানেও আসিতে পারে শুনিয়া কাশীশ্বর বাঁড়ুয্যে দোটানার মধ্যে পড়িয়া বিমনা হইয়া গেলেন।

মহিম মিশ্র বলিলেন,—খুব পর্দ্দানশীন পরিবার নিয়েই আস্‌বে। পাঁচিল ত' আকাশে পৌঁছিল গিয়ে!

সূর্য্য কুশারী সেখানে ছিল; বলিল—হ্যাঁ, খুবই উঁচু

বলিয়া মাঝখান হইতে সে খানিক নিরাশ হইয়া গেল।

বাড়ী প্রস্তুত নিরাপদে সমাপ্ত হইয়াছে। সাহেবী পছন্দের পর্দ্দাবিহীন অর্থাৎ বেপরোয়া বাড়ী এবং হিন্দু-পরিবারের উপযোগী পর্দ্দানশীন অর্থাৎ চোখ-লুকান বাড়ী

ই দুই রকমের বাড়ীর মাঝামাঝি কায়দায় বাড়ী অতি চমৎকারই হইল...লোকে বুঝিল, বাবু স্বয়ং বিলাতি ধরণের, উদারচরিত; কিন্তু অন্তঃপুরে যাঁরা বাস করেন তাঁরা দেশী ধাতের, আড়াল চাহেন। নীচের তলাটা দরাজ উন্মুক্ত; উপরটা আব্রুতে অন্ধকার না হইলেও এমন কৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছে যে, বাহির হইতে কিছুই লক্ষ্য করিবার উপায় নাই। সূর্য্য কুশারী সেই দিকে তাকাইয়া চুপ হইয়া গেল।

যাহা হউক, বাড়ী শেষ হইল—

দরজায়, জানালায়, কড়ি বর্গায়, রঙে, বার্ণিসে, ঘুলঘুলিতে, সাসিতে, চৌবাচ্চায়, ইঁদারায়, হেঁসেলে, গোসলখানায় তাহা দেখিতে হইল যেমন মনোরম, তাহাতে বাসের সুবিধা হইলও তেমনি...

তারিণী শঙ্কর গুপ্ত ভিতরটা দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, —বৈজ্ঞানিক বাড়ী হয়েছে। যেমন প্রচুর স্থান, তেমনি

কাশীশ্বর বাড়ুয্যে বলিলেন,—টাকায় সব হয়। বুদ্ধি খোলে আগে।

তারপর আসিল খাট, পালঙ্ক, গদি, বালিশ, আয়না, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি—সবই নূতন, সবই সুদৃশ্য, সবই মার্জ্জিত।

তারপর দেখা গেল, সুবৃহৎ একটা টেবিল হারমোনিয়ামও আসিল এবং দ্বিতলে উঠিয়া গেল।

তারিণীশঙ্কর গুপ্ত বলিলেন—ধনী পরিবারের মধ্যে নাচ-গানের খুব প্রচলন হয়েছে। এঁরাও গানটান গাহিবেন।

শিবকুমার আচার্য্য বলিলেন,—নাচের কথা বল্‌লে—নাচেরও?

—তা' হয়েছি বৈ কি।

—তোমার সব আজগুবি কথা; যত মিথ্যে খবর পাওয়া যাবে তোমার কাছে। ঘুঙুর পায়ে দেয়?

—তা' জানি নে।

—ওদিকে মানুষ আকাশে উড়ছে, এদিকে নাচ্‌ছে, গাইছে ভদ্রলোকের মেয়েরা...আমাদের তা' হ'লে বায়ু মৃত্তিকা দুই পথই বন্ধ?

—হ্যাঁ; অত না হোক্, চোখ কান বন্ধ করে' দরজা বন্ধ করে' থাক্‌তে হবে।

ওঁরা কুদৃশ্য দেখিবার এবং অশ্রাব্য শুনিবার সম্ভাবনায় চোখ কান আগে ভাগেই বন্ধ করেন নাই; সুতরাং

একদিন প্রাতঃকালেই দেখিতে পাইলেন সেই নূতন বাড়ীটার দরজার তালা খুলিয়া কাহারা যেন তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে—

আরও টের পাইলেন, সেখানে শব্দজাত সজীবতার অন্ত নাই।

যাহারা আসিয়াছে এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে সেই মানুষগুলিকে তখনই চোখে দেখা গেল না, কিন্তু মানুষগুলির নমুনাস্বরূপ যাহাকে বাহিরে, ভিতরে প্রবেশের ফটকের ধারে, দেখা গেল, এৎমামপুর অবাক্ হইয়া গেল সর্ব্বপ্রথম তাহাকে দেখিয়াই...

কাশীশ্বর বাঁড়ুয্যের কোটিপতি বাবুটির সঙ্গে দেখা করিবার আন্তরিক ইচ্ছা, প্রয়োজনই ছিল—কিন্তু এই গোট্টা দ্বারবানকে দ্বারে দেখিয়াই কাশীশ্বরের মনে হইল, বাবু দুর্গম দুর্গে বাস করিতে আসিয়াছেন। এই প্রহরীকে ঠেলিয়া বাবুর কাছাকাছি যাওয়া ত' দুরের কথা, ইহারই কাছে ঘেষা দুষ্কর...এই পর্ব্বতকে মুখের কথায় বা গায়ের জোরে টলান' এৎমামপুরের কর্ম্ম নয়।

বাস্তবিকই অতবড় মানুষ অনেকেই দেখে নাই—অতখানি লম্বা, আর অতখানি চওড়া, অতখানি ছাতি, আর অতখানি গর্দ্দান! হাঁটু দু'টাই হাতীর দুটা মাথার মত...আকারে আওয়াজে সে এক তাণ্ডব তুফান ব্যাপার!

কাশীশ্বর চম্‌কিয়া উঠিলেন; তারপর রটাইয়া দিলেন যে মহাদেবগঞ্জের জমিদার যে প্রবল প্রতাপান্বিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—যার আছে সে নির্ব্বোধ; সে যাইয়া দেখিয়া আসুক ঐ লোকটাকে...ঐরাবতের মত প্রকাণ্ড, আর বিক্রমে সিংহ ঐ লোকটাকে—

জমিদারবাবু প্রবেশদ্বারে গিরি গোবর্দ্ধন রাখিয়া দিয়াছেন—নড়ায় কার সাধ্য!

শুনিয়া তামাসা দেখিতে লোক ছুটিল; সেদিকে স্পষ্ট কেহ তাকাইল না, গোবেচারীর মত আড়চোখে তাহাকে দেখিল···ভিতরের ব্যস্ততার একটু আভাস পাইল, এবং দোতালার ঘরে মানুষের কণ্ঠস্বর অল্পস্বল্প শুনিতে পাইল... অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত সেই স্থানটা অতিক্রম করিতে হইল বলিয়া দোতালার ঘরের কণ্ঠস্বরে স্ত্রীকণ্ঠ মিশ্রিত ছিল কিনা তাহা নিঃসংশয়ে ধরা গেল না।

সূর্য্য কুশারী কবিতা কাঁদিতেছিল; সে, স্বপ্ন-দ্রষ্টা এবং ততোধিক স্বপ্ন-স্রষ্টা—উর্ব্বশীর পরিপূর্ণ সমগ্র তনুর চাইতে অদৃশ্য চরণের নূপুরনিক্কণ শুনা যাইতেছে এই কল্পনা তার ভাল লাগে···

অন্তঃপুরের একেবারে সম্মুখে ঐ সুবৃহৎ রূঢ়তা দেখিয়া তার কবিতার শেষার্দ্ধ মাটি এবং কলালক্ষ্মীর অনবদ্য প্রাতঃ-চেতনাই বৃথা হইয়া গেল...কর্কশ স্থুল আবরণ উপরে থাকে বলিয়া কুশারী-কবি নারিকেল খাওয়া ত্যাগ করিয়াছে ..ফুলের পাঁপড়িতে কবিতার বই ছাপান যায় কিনা তাহাই সে চিন্তা করে···সুতরাং অন্তঃপুরের সম্মুখে দ্বারোয়ান রাখায় বিদ্রোহ ত' সে করিবেই—এ কি গল্পের অরাজক যুগ না কি? না, এটা সেই পুরণো, পচা, ভাপ্‌সা, নেহাৎ অন্যায়, হাবসী-হারেমের যুগ? ভাবে রূপে এই দ্বন্দ্ব এখনো কি সহ্য করে লোকে? জমিদারবাবু মনে করিয়াছেন কি!

সূর্য্য কুশারী মনে মনে গর্জ্জন করিতে লাগিল—

এবং গুণাকর দে দ্বারোয়ানের নাম রাখিল গিরিরাজ।

গোধূলির প্রফুল্ল-লগ্নে সমরেন্দ্রনারায়ণ বহিঃভ্রমণে নির্গত হইলেন—সমগ্র এৎমামপুর সেই কোটিপতির দর্শন পাইল...

কিন্তু শিবের সঙ্গে ভূতের মত বাবুর সঙ্গে সেই দুরতিক্রম্য 'গিরিরাজ', হাতে তার পাঁচ হাত লম্বা বাঁশের লাঠি—তেল মুছিয়া কাঁধে ফেলিয়াছে, আর লগ্নের সঙ্গে ও প্রভুর সঙ্গে একেবারেই—কবিতার গদ্যাত্মক পদের মত আর ফাল্গুনের মেঘের মত,—বেখাপ্পা হইয়া সে পশ্চাতে চলিয়াছে...

সবাই দেখিল, বাবুর শরীর ভদ্রলোকের মত দোহারা, বর্ণ উজ্জল; পোষাকে অলৌকিক সমারোহ কিছুই নাই; বয়স আটত্রিশ হইবে—তারিণীশঙ্কর ঐরূপ অনুমান করিলেন···বাবু নিজে বিন্দুমাত্র ভয়ঙ্কর নন্, কিন্তু তাঁর পশ্চাতের ঐ দানবটা যেন প্রচণ্ড একটা ধমক্।

সমরেন্দ্রনারায়ণ যখন বাড়ীর বাহিরে রাস্তায় নামিয়াছেন তখন পল্লীবাসীগণের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়াই

বাঞ্ছনীয় না হোক্ অনিবার্য্য বটে। সমরেন্দ্রনারায়ণ নিঃশব্দে আর গম্ভীরভাবে পথ চলিতেছেন...আপামর লোকে চিনিল, ইনিই তিনি যিনি ঐ অট্টালিকার মালিক, মানুষের দুশ্‌মন ঐ দ্বারবানের প্রভু, আর মহাদেবগঞ্জ তথা রাজসাহী জিলার অলঙ্কার, যাঁর মাতা ঠাকুরাণী ছেলের সাহেব অভিভাবক রাখিয়াছেন, এবং যাঁর মনটি টাকা দান করিয়া করিয়া ফকির হইবার দিকেই প্রাণপণে ঝুঁকিয়া আছে, কিন্তু সাহেব হাত ধরিয়া আছে বলিয়া ফকির হওয়া ঘটিতেছে না।

"বাড়ীতে খবর দে গে"—বলিয়া পুরুষেরা ছেলেমেয়ের দ্বারা ভিতরে খবর পাঠাইলেন—মেয়েরা জানালা বা দরজা একটুখানি ফাঁক করিয়া তাঁহাকে দেখিলেন···

কাশীশ্বর বাঁড়ুয্যের অভিসারিকার প্রাণ-তৃপ্ত হইয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিল···

শত হস্ত দূর হইতে সূর্য্য কুশারী দুই হস্তের মাত্র আঙ্গুলগুলি ভারতীয় পদ্ধতিতে যুক্ত করিয়া অতি সুকুমার এবং অতি পরিচ্ছন্ন একটি নমস্কার নিবেদন করিল; কিন্তু কোনোদিকেই দৃষ্টি নাই বলিয়া সমরেন্দ্রের তাহা চোখে পড়িল না।

তারিণীশঙ্কর গুপ্ত অনুমান করিলেন যে, বাবুর বুদ্ধি চপল নয়।

নদীর ধারে ফাঁকা হাওয়ায় খানিক্ ভ্রমণ করিয়া সমরেন্দ্র গৃহে ফিরিলেন—পূর্ব্ববৎ নিঃশব্দে এবং গম্ভীর ভাবে এবং শাল প্রাংশু বর্ব্বরটাকে সঙ্গে লইয়া।

কেহ তাঁহার সহিত পরিচিত হইতে অগ্রসর হইলেন না; কিন্তু কাশীশ্বর প্রভৃতি সুজনবর্গ লক্ষ্য করিয়া রাখিলেন, ঐ নদীর ধারেই উঁহাকে ধরিতে হইবে।

সূর্য্য কুশারী কি অভিনব কল্পনা করিল কে জানে। তাহার দ্বিতীয় কবিতা গ্রন্থখানা "ধরণীর ধূলা" যাহা ...ইক শক্তিতে, প্রকাশের লীলায় এবং ব্যঞ্জনার বিশালতায় আরো সুন্দর হইয়াছে তাহাকে—প্রকাশকগণ ফেরৎ দেওয়া অবধি সে ব্যথিত হইয়া ছিল ..হঠাৎ সে নিখুঁৎ করিয়া চুল বাগাইল, দাড়ি আঁচড়াইল। বৈদিক ঋষিগণের অনুকরণে সে চুল দাড়ি গোঁফ বাড়াইয়া তুলিয়াছে—এদিকে ঐ; ওদিকে, সে লরেন্সের অত্যন্ত সক্ষম অনুরাগী; অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে য়ুরোপীয় আধুনিকতম চিন্তাধারার মিলন সে আকাঙ্ক্ষা করে··· সমরেন্দ্রকে তাহা স্বীয় রূপে এবং বাক্যের ভাবে বুঝিতে দিতে হইবে।

সেটা পরের কথা; আপাততঃ সেইদিনই সন্ধ্যার পর সূর্য্য কুশারীর একদিককার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল—সমরেন্দ্রের গৃহে অর্গ্যান-টিউন সুরযন্ত্রের সুরের সঙ্গে নারীকণ্ঠ মিশ্রিত হইয়া চির-সুন্দরের দিকে ধাবিত হইল...

সূর্য্য কুশারীর স্বতঃই মনে হইল, ঐ সুর যেন চঞ্চলপক্ষ চকোর—তৃষিত সে, আর সে অন্য কোনোখানের দিকে ছুটিয়াছে...

তার আরো মনে হইল, ঐ সুর একটি অশরীরী সৃষ্টি, একটা অতীন্দ্রিয় শক্তি, একটা অব্যক্ত অব্যাখ্যাত ইচ্ছা, একটি ক্লান্ত নিভৃত আত্মা...ঐ সুর কানে শুনিবার জন্য সমস্ত আকাশ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করিয়া আছে; এবং ঐ সুর শুনিতে শুনিতে নক্ষত্র সভার অশ্রান্ত হৃদয় কম্পন থামিতে চাহে না।

আরো আনন্দের কথা এই যে, সমরেন্দ্রের সঙ্গে কাশীশ্বর প্রভৃতির বাচনিক আলাপ না হইয়া গেল না—গিরিরাজকে ডিঙাইয়াই হইল।

নদীতীরে ওঁরা পূর্ব্ব হইতেই ওৎ পাতিয়াছিলেন—সমরেন্দ্র দেখা দিতেই অনেকখানি দূরত্ব রাখিয়া তাঁহারা জানাইলেন, বাবুর দর্শন পাইয়া তাঁহারা কৃতার্থ হইয়াছেন...

মুখের কথা ঐ সামান্য দু' চারিটি; কিন্তু উনি যেন কিছুতেই অন্যায় মনে না করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে কথার সঙ্গে ভঙ্গীতে যে শ্রদ্ধা মিশাইলেন তাহা যেমন প্রচুর তেমনি মধুর।

সমরেন্দ্র উত্তরে জানাইলেন, এখানকার জলবায়ু ভালই বোধ হইতেছে।

শুনিয়া সকলেই বেশ সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন...

চিন্তামণির গায়ে তখনও জ্বর ছিল—তিনি বলিলেন—স্থানের স্বাস্থ্য ভাল।

তারিণী গুপ্ত কিছু অনুমান করিলেন না; যা' অনুভব করিতেছেন বলিয়া তাঁর বিশ্বাস তাহাই প্রকাশ করিলেন; বলিলেন—নদীর জল অতি সুপেয়, এবং অম্লনাশক।

শুনিয়া বাবু সন্তোষ প্রকাশ করিলেন; বলিলেন—তা' হ'লে ত' ভালই।

শিবকুমার আচার্য্য আকাশে ব্যোমযান এবং মৃত্তিকায় নাচ গান এই দু'য়ের ভয়ে কোথায় দাঁড়াইবেন ভাবিয়া পান্ নাই...ঘুঙুর বাজাইয়া নাচ নয়, গলায় শুধু গান হইতেছে লোকের মুখে এই খবর পাইয়া তিনি নির্জ্জনে ভ্রূভঙ্গী করিয়াছিলেন...

তিনি বলিলেন—আহার্য্যও সুলভ।

সমরেন্দ্র বলিলেন—তবে ত' আরো ভাল।

পরস্পরের প্রতি সম্ভাষণ এবং প্রীতি জ্ঞাপন, সংবাদ দান আর গ্রহণ গ্রহণ, সংক্ষেপেই শেষ হইল, তবু তাহা মূল্যবান। সবাই সুখী হইলেন।

বাবু গেলেন বাড়ীতে—

পরে এঁরা হইলেন বাড়ী মুখো—

আর যে যা-ই করুক, যা-ই ভাবুক, কাশীশ্বর উহাদের পশ্চাতে ফেলিয়া আপন বেগে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন—

বলিলেন—বাবুর সঙ্গে কথা কয়ে এলাম।

ব্রাহ্মণী বলিলেন—গলায় গেঁথে আন্‌তে পারলে না বাবুকে, তাবিজ করে'? পেটে ভাত নেই, বাবু বাবু বাবু!

কিন্তু ঐ কথাগুলির কথা আরও বেশী করিয়া না বলিলেও চলে। সমরেন্দ্র ধনবান ব্যক্তি সন্দেহ নাই; আচারে আচরণে তিনি শ্রদ্ধাস্পদ, তাহাতেও সন্দেহ নাই; তাঁহাকেই পুরোভাগে রাখিয়া, অর্থাৎ তাঁহারই নামে ঐ অট্টালিকা নির্ম্মিত এবং সজ্জিত করা হইয়াছে ইহাও সত্য; কিন্তু তিনি যতই বৃহৎ হউন বৃহত্তর সত্তা থাকা কিছুই অসম্ভব নয়।

দু'দিন পরেই ঠিক্ দুপুর বেলা, গ্রামের লোক যখন খাইয়া দাইয়া শুইয়াছে ঠিক্ তখন, নিতাইয়ের পিসী (৬৩) বাছুর খুঁজিতে বাহির হইয়া একটা বৃহত্তর সত্তারই সংবাদ লইয়া অকস্মাৎ বায়ু বেগে ছুটিতে সুরু করিয়া দিল...

সাম্‌নেই পড়িল নবীন বটব্যালের বাড়ী—

নিতাইয়ের পিসী শশী বায়ুবেগে ছুটিতে ছুটিতে সেই বাড়ীতেই ঢুকিয়া পড়িল...

বটব্যাল-পত্নী উজ্জয়িনী দেবী তখন মেঝেয় পাটী বিছাইয়াছেন, আঁচল খুলিয়া পাটির উপর ফেলিয়াছেন, শুইবেন; শুইবার আগে মেয়েকে বলিতেছেন, দেখে' আয় ত' কুকু, ওবেলাকার ডাল তরকারী ঢেকেছি কি না? মুখ-পোড়াদের বেড়ালটা এসে এখুনি মুখ দেবে।...যা, দেখে আয়...

বলিতে বলিতেই, কথা শেষ না হইতেই, নিতাইয়ের পিসী শশী হুড়মুড় করিয়া ঢুকিয়া পড়িল, আর হাঁপাইয়া আসিয়া পড়িল...

নিঃশ্বাস ফুরাইয়া আসিতেছিল—তবু সে বলিল—হেই-মাগো, এ কী দেখ্‌লাম পথে আস্‌তে! সে কথা, মা, বল্‌তে নারি।

তরকারী ঢাকিতে কুকু উঠিতেছিল—

উজ্জয়িনী কাৎ হইতেছিলেন—

দু'জনাই থামিয়া গেলেন। সেই অবর্ণনীয় ব্যাপার দেখিয়া শশী, যে বিহ্বলতা লইয়া আসিয়াছে তাহাও অবর্ণনীয়; তাহাতেই উজ্জয়িনী চম্‌কিয়া উঠিলেন... তরকারী যে ঢাকা হইল না এবং তিনি যে শুইতে চান তাহাও ভুলিয়া গেলেন...

বলিলেন—মাগো, শুনে যে চম্‌কে উঠ্‌লাম। কি দেখলি, শশী?

শশী বসিয়া পড়িল; বলিল—সে কথা মা বল্‌তে নারি ..

অনুচ্চারিত ভয়ের কথা ব্যক্ত করিতে যাইয়া আরো ভয়ে তার চোখ আরো বিহ্বল হইয়া রহিল...বলিল—মাগো ঐ বাড়ীতে, ঐ যে বড় বাড়ী করেছে কোথাকার রাজারা, সেই বাড়ীতে—

—সে বাড়ীতে কি?

—সে-কথা, মা, বল্‌তে নারি।

—তবে এলি কেন ছুটতে ছুটতে?

—বলি, বলি। ঐ বাড়ীতে রয়েছে আমাদের পিলে। বলিয়া শশী খালাস হইয়াও হাল্‌কা হইল না।

—পিলে? পিলে কে?

—ভুলে' গেলে এর মধ্যেই। ঐ কর্ণপালের মেয়ে গো, যার নাম দেবীদাসী।

উজ্জয়িনী কথাটা উড়াইয়া দিলেন; বলিলেন—ধ্যুৎ।

—হ্যাঁ, মা, হ্যাঁ, পিলে। মিছে কথা যদি বলে' থাকি তবে যেন দু'টি চক্ষুর মাথা খাই। বলিয়া শশী চোখের দিকে আঙুল না তুলিয়া আঙুল তুলিয়া নিজের নাক দেখাইল।

উজ্জয়িনী বলিলেন—তোরা ত' চোখের মাথা খা'স্ কথায় কথায়। কোথায় দেখলি?

—জান্‌লায় দাঁড়িয়ে ছিল, মা, পষ্ট দেখ্‌লাম। আমাকে দেখ্‌তে পেয়েই ঝম্ করে' জান্‌লা বন্ধ করে' দিলে।

সাত আট বছরের সময় অসম্ভব প্লীহা-বৃদ্ধি ঘটায় কে একজন বলিয়াছিল, "কর্ণধর, ওটা তোর মেয়ে নয়, ওটা তোর পিলে"। সেই অবধি পিলে বলিয়াই লোকে তাহাকে ডাকিত।

কিন্তু নিতাইয়ের পিসী ভুল দেখে নাই—সত্যই তা-ই। সমরেন্দ্র এই গ্রামেরই নিরুদ্দিষ্টা মেয়ে পিলেকে অর্থাৎ কর্ণধর পালের কন্যা দেবীদাসীকে ঐ বাড়ীতেই আনিয়াছেন, অথবা দেবীদাসীই আসিয়াছে; অধিক কি, ঐ বাড়ীটাই দেবীদাসীর।

পথ ঘাট সম্পূর্ণ নির্জ্জন হইয়াছে মনে করিয়া দেবী দাসী ভরা দুপুরে জানালাটা একটু খুলিয়া নিজের গ্রামের চেহারাখানা একটু দেখিয়া লইতেছিল...

কে জানিত যে, নিতাইয়ের পিসীর বাছুর হারাইবে দুপুর বেলাতেই, বাছুর খুঁজিতে সে এই পথেই আসিবে, আর তাহাকে দেখিয়া ফেলিবে, এবং চিনিয়া ফেলিয়া "ওমা" বলিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইবে!

ইহারও আগের কথা যা' তা' সবাই জানে, অর্থাৎ দেবীদাসী যে ব্যক্তির সঙ্গে পলায়ন করিয়াছিল সে দেবী দাসীকে দুধে ভাতে অর্থাৎ পরম সুখে রাখিতে রাখিতে পরিত্যাগ করিয়াছিল—পিস্তল দেখায় নাই বা লাথি মারে নাই, অম্‌নি আর দেখা দেয় নাই...তারপর একটি নিষিদ্ধ গৃহ হইতে সমরেন্দ্র কর্ত্তৃক তার উদ্ধার সাধন এবং স্বীকরণ ঘটে...

তারপর দেবীদাসীরই ইচ্ছায় তাহার পিতা কর্ণধর পালকে গ্রাম হইতে স্থানান্তরিত করিয়া অপর একটি জনবহুল স্থানে নগদ কিছু টাকা দিয়া কায়েমী করিয়া বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে—সেখানে সে চাকা ঘুরাইতেছে...

এবং এই বাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে।

বলা বাহুল্য, সমরেন্দ্র দেবীদাসীর গার্হস্থ্য সরল চরিত্রে, মধুর ব্যবহারে, এবং অপার্থিব রূপে এবং অন্যান্য প্রশংসনীয় গুণে বিশেষ মুগ্ধ হইয়া গেছেন, আর অবিরত অনুগত হইয়া থাকেন।

এদিকে, ডাল তরকারী ঢাকা হইয়াছে কি না সে-খবর উজ্জয়িনীর লওয়া হইল না...কুকু কথা না শুনিলে অবাধ্যতার দরুণ তাহাকে তিনি মারেন; সেদিকে তাঁর ভারি লক্ষ্য; কিন্তু আজ উজ্জয়িনী তা' লক্ষ্য করিলেন না—অঞ্চল গুটাইয়া লইয়া তিনি দিবানিদ্রার পীড়ন সম্পূর্ণ দমন করিলেন...

শশীর কথায় বিশ্বাসস্থাপন করিলেন—

বলিলেন—কি সাহস! গ্রামের বুকের ওপর এসে বসেছে! বলিয়াই ক্রোধে তাঁর নাকে নিঃশ্বাসে যেন ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল। মুখপোড়াদের বিড়াল তরকারীতে মুখ দিয়া মুখ চাটিতে চাটিতে সম্মুখে দিয়া চলিয়া গেল—উজ্জয়িনী তাহা দেখিতে পাইলেন না।

শশী তাঁর প্রচণ্ড মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—টাকার মানুষ যে মা! টাকায় সব হয়, মা, সব ঢাকা পড়ে।

কিন্তু উজ্জয়িনীর কাছে টাকা অতি তুচ্ছ—

বলিলেন—তা' হোক্। অমন টাকার মুখে আগুন। এই কেলেঙ্কারী করবে ওরা এই বামুন ভদ্দরের গাঁয়ে, আর তা-ই লোকে দাঁড়িয়ে দেখ্‌বে!

কেলেঙ্কারী দেখিতে এখনও কেহ দাঁড়াইয়া যায় নাই; কিন্তু উজ্জয়িনী মনে করিয়াছেন, কোনো প্রতিবিধান না করিয়া লোকে দাঁড়াইয়া এখনই না দেখুক, দেখিতে দাঁড়াইয়া যাইবেই। অবশ্য, স্বতঃসিদ্ধভাবে কেন তিনি উহা মনে করিলেন তাহা তিনি জানেন না।

পুনরায় বলিলেন—ছি, ছি, ছি! যখন পালাল' তখন ভেবেছিলাম, গাঁয়ের কারু ঘাড়ে চাপে নি' এই ভাগ্যি!...সমস্ত গাঁ এবার উচ্ছন্নে যাবে—শশী তুই তা' দেখে নিস্। বলিয়া শশীকে প্রতিশ্রুতি দিয়াও তিনি শান্ত হইতে পারিলেন না; বলিলেন—রাগে আমার গা রি রি করছে।

শশী বলিল—মাগো, আমি ভয়ে মরছি।

উজ্জয়িনী আরো উত্তেজিতা হইয়া বলিলেন,—এখনই কি? আরো মরতে হবে।

ইত্যাদি আশঙ্কায়, আস্ফালনে, বিস্ময়ে, শিহরণে, কথা আট্‌কাইয়া, রাগে কাঁপিয়া, ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখিয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে জ্বালাতন বোধ করিয়া, ঘৃণায় কণ্টকিত এবং সংসারের আচরণে বীতস্পৃহ আর হতাশ হইয়া, গাঁয়ের পুরুষগুলিকে ইচ্ছানুরূপ গালি পাড়িয়া, অর্থাৎ নানা রঙের ইন্দ্রধনু এবং নানা পীড়ার যন্ত্রণা একই সঙ্গে সম্মুখে আগত দেখিয়া—যেন ঘূর্ণী জলে পাক খাইয়া খাইয়া সে-ই অশুভ দ্বিপ্রহরের কয়েক ঘণ্টা ওঁদের কাটিল ··

সংক্ষেপে, উজ্জয়িনী নিজেও ক্ষেপিয়া গেলেন—বেচারা শশীকেও ক্ষ্যাপাইয়া তুলিলেন। শশীর বাছুর খোঁয়াড়ে গেল।

তারপর সংবাদটা বায়ুপথে ছুটিতে এবং ছড়াইতে লাগিল...সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই জানিতে কাহারো বাকি রহিল না যে, ঐ বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতেছে, ঐ বাড়ীর কর্ত্রী, ঐ বাড়ীর মালিক, আর কেউ নয়, এখানকারই পিলে—যৎসামান্য কর্ণধর পালের যৎসামান্যা কন্যা পিলে, যার নাম দেবীদাসী!

বটে?

এৎমামপুর তড়্‌পাইয়া উঠিল—

মেয়েরা বলিতে লাগিলেন, কি ঘেন্নার কথা ..!

পুরুষেরা বলিতে লাগিলেন, কি স্পর্দ্ধার কথা...!

এবং উভয়পক্ষই—অন্তঃপুর ও বহির্ব্বাটি—চোখ লাল করিয়া রহিলেন···বহুক্ষণ চোখের লাল কাটিল না, এবং মনে হইল রাগের এ লাল কাটিবার নয়।

তারিণী গুপ্ত অনুমান করিলেন: "মহাভারতে এ-র চাইতেও অশুদ্ধ কথার উল্লেখ আছে"...

মহিম মিশ্র উষ্ণ হইয়া বলিলেন,—খবদ্দার!

পুরুষোত্তম বাগ্‌চি বলিলেন,—আমিও ত' মহাভারত পড়েছি—পাইনি' ত'!

—আছে। বলিয়া তারিণীশঙ্কর চুপ করিয়া রহিলেন।

কিন্তু মহাভারতের নিন্দাবাদ সকলের চাইতে বিদ্ধ করিল ত্রিপুরেশ্বর চক্রবর্ত্তীকে; তিনি উগ্র হইয়া বলিলেন,—অব্রাহ্মণের এ অকারণ পাণ্ডিত্য বড়ই অসহ্য হে।

তারিণী গুপ্ত বলিলেন,—আছে। আদিপর্ব্বে, অশ্বমেধপর্ব্বে, সভাপর্ব্বে, উদ্যোগপর্ব্বে, কর্ণপর্ব্বে, দ্রোণপর্ব্বে, অনুশাসনপর্ব্বে পাবে।

—তুমি নিজে দুষ্ট, অসৎ প্রকৃতির, তাই তুমি দুষ্টের প্রশ্রয়দাতা, আর দুশ্চরিত্রতার সমর্থক; আর মহাভারতের অপমানকারী তোমার সংসর্গ আমরা ত্যাগ কর্‌লাম। বলিয়া প্রথমে ত্রিপুরেশ্বর চক্রবর্ত্তী এবং তাঁর পশ্চাৎ মহিম মিশ্র, এবং তাঁর পশ্চাৎ পুরুষোত্তম বাগ্‌চি তারিণীশঙ্করকে ত্যাগ করিয়া গেলেন।

ক্রুদ্ধ জনমত কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তারিণীশঙ্কর একা বসিয়া কৌতুকটা উপভোগ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এমন সাহস কাহারও হইল না যে, একক কিম্বা দলবদ্ধ হইয়া ঐ অট্টালিকার সম্মুখে যাইয়া—দ্বারবানের সম্মুখীন হইয়া পিলে-ঘটিত ব্যাপারের প্রতিবাদ বা সমালোচনা বা কোনোপ্রকার প্রতিকার চেষ্টা বা অমত প্রকাশ করেন।

কেবল কাশীশ্বর বাঁড়ুয্যে ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হইয়া এক সময় জানিতে চাহিলেন,—এ দ্বারোয়ানজি, বাবু হিঁয়াই হ্যাঁয়, না চল্‌ গিয়া হ্যাঁয়?

হিন্দীর দরকার ছিল না, গিরিরাজ পরিষ্কার বাংলায় বলিল,—ক'ল্‌কাতা গেছেন।

—আবার আয়েগা ত'?

—হাঁ, হাঁ, ফিন্‌ আবেঙ্গে। কা কাম্‌ হ্যায়?

হিন্দীতে প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করায় প্রশ্ন বড় কঠোর মনে হইয়া কাশীশ্বর আরো ভয় পাইয়া খুব তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলেন।

সবাইকেই ক্রুদ্ধ দেখা গেল—বিমর্ষ হইয়া গেল সূর্য্য কুমারী একা। ঐ বাড়ীটার নীরব সুরের যে অতীন্দ্রিয়ত্ব সে মনে মনে সম্ভোগ করিত, আর ছন্দে তাহাকে আকার দিয়া অমর করিয়া তুলিত সেই অতীন্দ্রিয়ত্ব ঘুচিয়া গেল .. অর্থাৎ কবির সুদূরের পিয়াসার এবং অপরিচিতার মারফৎ আদিতম সৃজন-প্রয়াসের সার্থকতা হউক এই প্রার্থনার মানেই থাকিল না।

দ্বিপ্রহর তখনও উত্তীর্ণ হয় নাই-

আপদমস্তক বস্ত্রাচ্ছাদিতা দুটি রমণী যাইয়া সেই বিখ্যাত, এবং অধুনা আরো বিখ্যাত, অট্টালিকার ফটকে আসিয়া দাঁড়াইলেন...দ্বারবান ত্বরিত-পদে আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল...

রমণীদ্বয়ের একজন অত্যন্ত বিনীত কণ্ঠে বলিলেন,—আমরা ভেতরে কি যেতে পারি, বাবা? এ-বাড়ীর গিন্নী—

বলিতে যাইতেছিলেন "আমাদের আপনারই লোক"।

কিন্তু বলার দরকার হইল না; দ্বারবান সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—যান্, মাইজীর হুকুম আছে।

রমণীদ্বয় মন্থরপদে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু বুক যেন অকারণেই দুরু দুরু করিতে লাগিল...বাড়ীর চাকচিক্য তাঁদের চোখের উপর ঝক্‌ঝক্ করিতে লাগিল; আরামের আয়োজন, আর মূল্যবানতা তাঁরা অনুভব করিতে লাগিলেন···না জানি কত টাকাই না খরচ করিয়াছে ভাবিয়া দিশা না পাইয়া অবাক্ হইতে হইতে তাঁহারা সিঁড়ি ভাঙিয়া দোতলার বারান্দায় উঠিয়া গেলেন, এমন একটা ছম্‌ছম্ অস্বস্তির ভাব লইয়া, যেন চুরি করিতে আসিয়াছে, এবং ধরা পড়িবার সম্ভাবনা বিস্তর।

সকলগুলি ঘরেরই শিকল তোলা—

একটি ঘরের দরজা খোলা ছিল; উভয়ে যাইয়া সেই দরজার সম্মুখে দাঁড়াইতেই কি যে একটা অভাবনীয় জলন্ত ব্যাপার চক্ষের পলকে ঘটিয়া গেল তাহা বলা যায় না—চোখ যেন ঝল্‌সিয়া বুজিয়া আসিল ..

রূপের দিকে যে সর্ব্বদাই অসঙ্কোচে আর অকাতরে নেত্রপাত করা যায় ইহা সত্য নহে। উঁহারা দেখিলেন, সম্মুখে যাহাকে দেখা যাইতেছে সে তাঁহাদের সেই পুরাতন পিলেই বটে; কিন্তু তাহার দেহে রূপান্তর যাহা ঘটিয়াছে তাহা মানুষে এমন অকস্মাৎ চোখে দেখিবে বলিয়া প্রত্যাশা করিতে পারে না—ইহার রূপ যেন জাগতিক সকল নিয়ম আর সকল সম্ভাবনাকে পরাস্ত আর অতিক্রম করিয়া গেছে!

ঐ রূপ দেখিয়াই উঁহাদের মুখে শব্দ ফুটিল না ··

তার উপর ঐ সোনা—অঙ্গে অঙ্গে অশেষ—কর্ণে, কণ্ঠে, বাহুতে, মণিবন্ধে···অলঙ্কার যে কত প্রচুর, আর কত যে তার মূল্য তাহার ইয়ত্তা তাঁরা করিতে পারিলেন না—কেবল অনুভব করিতে লাগিলেন, দৃষ্টিতে যেন দুঃসহ হইয়া একটা নিরবচ্ছিন্ন আলোক-তরঙ্গ চোখের উপর নাচিতেছে···

পালিস্ করা সোণা ঝিক্‌মিক্ করিবেই; যাহার গায়ে সে-গুলি রহিয়াছে সে-ও চিরকালের পরিচিত মানুষ, একেবারে জানা; কিন্তু জানা মানুষটির দিকে চাহিয়া এখন উঁহাদের মনে হইল, কেবল সেই পূর্ব্ব-পরিচয়ের সূত্রে এখন উহাকে ঘনিষ্ঠ সম্ভাষণ করিবার বিরুদ্ধে যেন দুর্লঙ্ঘ্য একটা নিষেধ ঐ অপরিমেয় স্বর্ণের অতি উজ্জ্বল দীপ্তির মধ্যেই আছে।

ভুবনমোহিনী যে প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করা হইতেছে সে প্রতিমা পরিচিতই; মূর্ত্তি কথা কহিয়া উঠিলেই অচেতন রূপ যথার্থ সজীব হইয়া ওঠে ইহাও ঠিক্; কিন্তু ইহাও সত্য যে, হঠাৎ তার কণ্ঠস্বর শুনিয়া পলায়ন করিবে না এমন লোক বিরল।

ওঁদের সেই পিলে যেন তেম্‌নি আতঙ্কজনক আর অত্যন্ত পরিস্ফুট একটা সজীবতা লাভ করিয়াছে—মৃণ্ময়ী যেন চিন্ময়ী হইয়া উঠিয়াছে; তার অন্তরের অকলঙ্কিত আভিজাত্য যেন ঐ অলঙ্কারের ঘটায় ছটায় একটা অলৌকিক ভাষায় ধ্বনিত হইতেছে···

সুতরাং ওঁরা থমকিয়া রহিলেন...যত পরামর্শ বহু যত্নে করিয়াছিলেন; ভৎর্সনা করিবেন, রাগ করিবেন বলিয়া যে অনিবারণীয় সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এবং ফল-সাধক যত কথা বলিবেন বলিয়া মনে করিয়া আসিয়া-

ছিলেন; সে সমস্তই যেন বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ আঘাতে অন্ধ এবং অসাড় হইয়া গেল।

দেবীদাসী উঁহাদের পদ-শব্দ পাইয়াছিল; তার বুঝিতে কষ্ট হয় নাই যে, গ্রামের স্ত্রীলোক কেহ আসিতেছে ...গ্রামের লোককে পুনরায় দেখিবার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা তার থাকিলেও একটা লজ্জাও তার ছিল; তার ভয় না হইয়াছিল এমন নয়—

কিন্তু সাক্ষাতের প্রথম মুহূর্ত্তেই তাহাই ঘটিয়া গেল যাহা ঘটিবে বলিয়া ওঁরাও মনে করেন নাই—ওঁরাই তাহাকে নিষ্কৃতি দিলেন...উঁহাদের মনের সমীহ আর সঙ্কোচ অর্থাৎ দুর্ব্বলতা একেবারে স্পষ্ট হইয়া চোখে পড়িতেই দেবদাসীর নিজের দুর্ব্বলতা এক নিমেষেই ঘুচিয়া গেল...তা' ত' গেলই অধিকন্তু তাহার তিলমাত্র সন্দেহ রহিল না যে, উঁহারা অবিসম্বাদিতভাবে স্বীকার করিয়াছেন, এই তিনের মিলন ক্ষেত্রে তাহারই স্থান উচ্চে।

দেবী দাসী ওঁদের চোখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া অগ্রসর হইয়া গেল; বলিল,—জেঠিমা, আসুন; পিসিমা, আসুন। বলিয়া উপুড় হইয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিল।

ওঁদের একজন পূর্ব্বকথিতা উজ্জয়িনীর অত্যন্ত আপনার লোক—স্বামীর সাক্ষাৎ ভগিনী, দেবমায়া তাঁর নাম; আর একজন কাশীশ্বরের আবাল্যের সহধর্ম্মিনী ইচ্ছাময়ী।

উভয়ে সটান যাইয়া মেঝেয় বসিলেন—

দেবী দাসী ব্যস্ত হইয়া আসন দিতে চাহিলে তাহাকে নিবারণ করিলেন; বলিলেন এই খানেই বসি; দিব্যি পরিষ্কার।...বসিয়া ওঁরা চারিদিকে চোখ ফিরাইয়া বড় বড় ছবি, বড় বড় আয়না, ভাল ভাল চেয়ার, মোটা মোটা পালঙ্ক আর গদি প্রভৃতি তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন...অবাক্ দৃষ্টি মুগ্ধ হইয়া গেল।

সেই অবসরে দেবী দাসী যাইয়া ক্যাস্-বাক্স খুলিয়া, দশটি টাকা বাহির করিল; এবং ফিরিয়া আসিয়া পাঁচটি করিয়া টাকা উঁহাদের পায়ের কাছে নামাইয়া রাখিয়া গলায় আঁচল দিয়া পুনরায় এবং অধিকতর ভক্তিভরে প্রণাম করিল।

শয্যার দিকে চাহিয়া একটা অপবিত্রতার চিত্র মনে পড়িয়া এবং একটা অপবিত্রতার ছোঁয়াচ লাগিতেছে মনে করিয়া উঁহাদের মন গুটাইয়া আসিতেছিল—টাকা পাঁচটি প্রণামী পাইয়া সঙ্কুচিত মন তৎক্ষণাৎ বিস্তৃতি লাভ করিল—তা' ছাড়া বিশেষ উল্লেখযোগ্যভাবে একটা প্রফুল্লতাও লাভ করিল।

ইচ্ছাময়ী টাকা পাঁচটি ডান হাত দিয়া তুলিয়া লইয়া বাঁ হাতে করিলেন; তারপর দেবীদাসীর চিবুকে আঙুল ছুঁয়াইয়া সস্নেহে চুম্বন করিলেন, এবং ভাবিয়া রাখিলেন, দেবী দাসীর সঙ্গে যে এই ছোঁয়াছুঁয়ি হইয়া গেল সে-কথাটা কহাকেও বলা হইবে না। দেবমায়া টাকা পাঁচটি আঁচলে বাঁধিলেন, ইত্যাদি...

কিন্তু দু'জনার কেউ কথা খুঁজিয়া পাইলেন না— "আজ কি রেঁধেছিলে?" জিজ্ঞাসা করা এখানে চলিবে না।

দেবী দাসীই সুরু করিল; বলিল,—তোমাদের কাছেই আবার ফিরে এলাম, মা। পায়ে রেখ'।

ইচ্ছাময়ী বলিলেন,—সে কি বল্‌ছিস্ পিলে?

বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেন...কে কাহাকে আশ্রয় দিতে সক্ষম তাহার দিশা তিনি সত্যই পান নাই।

দেবমায়া বলিলেন,—সেই অবধি আমরা ভেবে' বাঁচি নে—না জানি পিলে কি দশায় পড়েছে!

পিলে বলিল,—দশা খুব খারাপই হ'ত, পিসিমা, যদি ইনি স্থান না দিতেন।

কর্ণধর পালের কন্যা পিলে এমন উজ্জ্বল, এমন সহজ আর সপ্রতিভ, আর মহিমান্বিত, আর ভঙ্গীর উল্লাসে এমন দুর্ণিবার আর সুষমাময়ী হইয়া উঠিতে পারে ইহা কেহ জানিত না...ডালিম ফুলের যে রং সেই রঙের সাড়ী একখানি পরিয়া এবং সোণায় গা ঢাকিয়া সম্মুখেই সে বসিয়া আছে; কিন্তু মনে হইতেছে, সে যেন দুর্ণিদেশে একটি পরীর মত আপন অঙ্গচ্ছটার চমক্ হানিয়া উপর দিয়া উড়িয়া চলিয়াছে—কোনোখানেই তার সীমা নাই...

ওঁরা হাঁ করিয়া শুনিতে লাগিলেন—

পিলে তাঁর ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের কাহিনী বলিতে লাগিল—সে লোকটা ত' আমাকে একটা খারাপ বাড়ীতে রেখে' দু'দিন বাদেই পালিয়ে গেল। সেই বাড়ীতে

ইনি মাঝে মাঝে আস্তেন। তারপর আমাকে দেখতে পান্।

পিলের ভাগ্য সম্বন্ধে এতক্ষণের উৎকণ্ঠা দূর হইয়া উভয়েই সমস্বরে বলিলেন,—ভালই হ'ল।

—ভালই হ'ল বৈ কি। খুবই ভালবাসেন; কত যে দিতে চান্ তার ঠিক্ নাই। আমিই তাঁকে থামিয়ে থামিয়ে রাখি যে, অত দিয়ে কি হবে! বলিয়া পিলে একটু সুখের হাসি হাসিল...

এমন করিয়া হাসিতে কি সে পারিত! না, শিখিত!

ইচ্ছাময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন—এ বাড়ী ত' তোমারই?

পিলেকে 'তুমি' সম্বোধন অজ্ঞাতে বাহির হইয়াছে।

পিলে বলিল—আমার নামেই করেছেন।

—সায়েব ম্যানেজার না কি আছে?

—না। ম্যানেজার বাঙালীই—আগে তিনি ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

—আয় কত হবে?

—পৌণে দু'লাখ্। বলিয়া পিলে ইচ্ছাপূর্ব্বকই থামিল না...ওঁদের চমক্ খাওয়াটা চোখে পড়িয়াছে বুঝিতে পারিলে ওঁরা অপ্রতিভ হইতে পারেন মনে করিয়া পিলে বলিতে লাগিল—কিন্তু যাকে ভালবাসেন তার পিছনে বাজে খরচ কি এত!...বলিয়া সৌভাগ্যের গৌরবে না হোক্ প্রণয়গর্ব্বে পিলে আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

চারিদিকে চাহিয়া উঁহাদেরও তাহাতে সন্দেহ রহিল না—প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবই যেন খেলা খেলা; এত বাহুল্য দ্রব্য তাঁহাদের আয়ত্তাধীনে স্বপ্নেও নাই; তাঁরা জীবনে দেখেন নাই।

দেবমায়া বলিলেন—তোমারও খরচের হাত কম নয়! বলিয়া হাসিলেন—সেটা স্তুতির প্রফুল্লতা, কৃতজ্ঞতার প্রয়োজনীয় হাসি।

পিলে বলিল—না হ'য়ে উপায় নেই। উনি বলেছেন, গ্রামের সবাই তোমাদের ভালবাসতেন। যদি কেউ কখনো দয়া করে' অভাবের কথা জানান্ তবে তোমার যা' ইচ্ছে যত ইচ্ছে দেবে—আমার অনুমতি দেয়া রইল।

"দয়া করে' অভাবের কথা জানান্"...এই কথাগুলির জন্ত উঁহারা বাবুকে অধিকতর শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন; কারণ দান করিয়া ধন্য হওয়ার প্রবৃত্তি খুব উচ্চাঙ্গের বৈষ্ণবী মানসিক উন্নতির লক্ষণ—এবং সকলের তা' হয় না।

ইচ্ছাময়ী গদগদস্বরে বলিলেন—একেবারে দেবতা মানুষ।

দেবমায়া বলিলেন—যা' বলেছ ইচ্ছে! দেবতাই।

পিলের জীবনেতিহাসের এই অংশটুকু শ্রবণ করিয়া উঁহাদের কি মনে হইল তাহা পিলে না জানিলেও আমরা জানি। অভাব অনটনের উর্দ্ধে উঠিয়া এই অপরিসীম স্বাধীনতা সম্ভোগ আর স্বাধীন সম্ভোগ জীবনের প্রধানতম কাম্য বলিয়াই উঁহাদের মনে হইল—চিরদিন স্বর্গীয় ঐ স্বপ্নই উঁহারা দেখিয়াছেন। ধুলা নয়, বালি নয়, নগদ টাকা লইয়া যথেচ্ছা ব্যবহার করার, প্রায় ছিনিমিনি খেলার মত যাহার অবস্থা এবং উন্মুক্ত স্বাধীনতা, তাহার অদৃষ্ট যে কত সুপ্রসন্ন আর ভাগ্য-বিধাতার আশীর্ব্বাদ যে তাহার প্রতি কত প্রচুর, তাহা সন্তোষজনকভাবে ধারণা করিতেই পারা যায় না।...দৈন্য আরো বাড়িবার বিরুদ্ধে অষ্টপ্রহরই যাঁদের তীক্ষ্ণ সতর্কতা, তাহাই লইয়া কলহ, তাহারই দরুণ বিচ্ছেদ, সেই দৈন্যের ফলে হয়তো অকাল মৃত্যুই ঘটিতেছে; ভিক্ষাবাবদ এক মুষ্টি চাল খরচ করিতে যাঁদের সম্বলে শিরায় টান পড়ে—এম্নি নিষ্পেষিত যাঁহাদের অবস্থা, তাঁহারা টাকার অত অবাধ আর নিঃস্পৃহ ব্যবহার দেখিয়া নিশ্চয়ই বিস্মিত হইয়া যাইবেন...সেই জীবনকে উদার বৈকুণ্ঠবাস—মর্ত্ত্যে স্বর্গের অবতরণ—মনে করিবেন বৈ কি!

বৈকুণ্ঠবাসিনীর সম্বন্ধে উপস্থিত অব্যক্ত একটা বিস্ময়ের ঘোর লইয়া উঁহারা উঠিলেন—পিলে আবার প্রণাম করিল—পুনরায় আসিতে বলিল—আরো অনুরোধ করিল, যাঁহারা দয়া করিয়া পদধূলি দিয়া কৃতার্থ করিতে সম্মত তাঁহারাও যেন আসেন...

ইচ্ছাময়ী বলিলেন—আস্বে বৈ কি...

"তুমি আমাদের বল ভরসা আশ্রয়"—এই কথাগুলি তার মুখ দিয়া বাহির না হইলেও মনের সহস্র উৎসমুখে মুহুর্মুহুঃ বাজিতে লাগিল।

সর্ব্বশেষে শুধাইলেন কর্ণধরের কথা—

দেবমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার বাবা এখন কোথায় ?

পিলে বলিল—কৃষ্ণনগরে আছেন।

—ভাল আছে ?

—খবর পেয়েছি, ভালই আছেন।

উভয়ে বলিলেন—বেশ।

একদিন অশুভ প্রাতে দেবীদাসীর পলায়ন করিবার ঘৃণ্য কথাটা কর্ণধরের স্নেহধর্ম্ম আর অবিবেচনার দরুণ যত বেগে রাষ্ট্র হইয়াছিল, তার চতুর্গুণ বেগে তাহার পুনরাগমনের সংবাদ ত' বটেই, রাজ্ঞীর পদে প্রতিষ্ঠার সংবাদ, আর উপকার করিবার অকপট অভিপ্রায়ের সংবাদও প্রচারিত হইয়া গেল—

লোকের সেদিন সুপ্রভাত !

ইচ্ছাময়ী বলিয়াছিলেন—"আস্‌বে বৈ কি—

যাঁহাদের তরফ হইতে তিনি পিলেকে ঐ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাঁহারা হীনচেতা নন্—ইচ্ছাময়ীর তরফের সত্যটা তাঁরা নির্ব্বিবাদে রক্ষা করিলেন—অর্থাৎ আসিলেন…

প্রণামী পাঁচ টাকা নগদ পাওয়া গেছে এই সংবাদটা পরবর্ত্তী সংবাদ হইয়া ধীরে সুস্থে রটিলেও, বিদ্যুৎ-চমকের পর মেঘের ডাকটাই যেমন ঘোরতর বেশী আর সাড়া জাগায় বেশী তেম্‌নি, আলোড়ন তুলিল সে-ই বেশী।

যাঁহারা পদধূলি দিতে সম্মত তাঁহারা আসিলেন—

অকাতরে পদধূলি দিলেন…

এবং দু'তিন দিনেই দেবীদাসীর দেড় শত টাকা, উড়িয়া গেল বলা যায় না, জলে পড়িল বলা যায় না, সার্থক হইয়া গেল…

সূর্য্য কুশারীর স্বপ্নও সার্থক হইল—

তার দিদি, চন্দ্রিকা (৩৩), যাইয়া দেবীদাসীর প্রণাম ও প্রতিশ্রুতি লইয়া আসিলেন যে, "ধরণীর ধূলা" ফুলের পাপড়িতে নয়, কাগজেই পুস্তকাকারে ছাপিবার সমুদয় খরচ সে দিবে ; কারণ, গুণীর গুণ সে বোঝে ; "উনিও" বোঝেন।

কিন্তু এই কি সব ! দেবীদাসীর বদান্যতা আরো ব্যাপক, তাহার প্রীতি আরো মধুর, তাহার দান আরো প্রচুর, তাহার হৃদয় আরো প্রশস্ত আকর্ষণ আরো মিলনাত্মক…

একদিন সকালবেলাই সিধে' দেওয়া আরম্ভ হইল—পিতলের একটি বাল্‌তি, তাহা পূর্ণ করিয়া সের দশেক আতপ চাল, এবং কাঁসার বাটীতে করিয়া পোয়া তিনেক গাওয়া ঘি—

যে আধার ব্রাহ্মণেরা পাইলেন—তার সঙ্গে পাইলেন দক্ষিণা দু'টাকা…

দেখিয়া তারিণী গুপ্ত বাড়ীর ভিতরে এবং বাড়ীর বাহিরেও রাগে গোঁ গোঁ করিতে লাগিলেন…বাড়ীর ভিতরে সায় এবং অনুকম্পা পাইলেন বটে, কিন্তু বাহিরে কেহ আমল দিল না…

অচ্যুত চক্রবর্ত্তীর বৈঠকখানায় তারিণী গুপ্তও ছিলেন—

অচ্যুত বলিলেন—ওর পাপ ধুয়ে মুছে' গেল।

নটবর বিদ্যাবাগীশ বলিলেন—শুধু ধুয়ে মুছে ? অমন পুণ্যাত্মা নারী আর নেই।

কাশীশ্বর বাঁড়ুয্যে বলিলেন—মনে যার ময়লা নেই সে-ই ত' ধন্য। অমন দানশীলা রমণী দেশের গৌরব।

মহাভারতের কুৎসাকারী অপবাদে ত্রিপুরেশ্বর কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এবং অব্রাহ্মণ বলিয়া দেবীদাসী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তারিণী গুপ্তের মনে বিষ সঞ্চিত হইয়াছিল ; বলিলেন—হ্যাঁ, দিলে থুলেই গৌরব। কানা পুতের নানা রোগ। তোমরা বড় উঞ্ছ-পরায়ণ !

মহিম মিশ্র হাসিয়া বলিলেন—বামুনরা চিরকালই তা-ই। রাগ কর্‌লে উপায় নেই, ভায়া।

কিন্তু ঠিক এই সময়েই আর একটা আবিষ্কার যাহা রাস্তার ধারে ঘটিতেছিল তাহাও অসামান্য, তাহাও আনন্দপ্রদ…

ত্রিপুরেশ্বর চক্রবর্ত্তী ঐ বাড়ীর সম্মুখ দিয়া আসিতেছিলেন ; কোন্ বাড়ীটা তাহা না বলিলেও চলে…ঐ বাড়ীটার সৌন্দর্য্য এবং দৃশ্যাতীত একটা অসাধারণ গুরুত্ব দাঁড়াইয়া গেছে বলিয়া বাড়ীটার দিকে তাকানই নির্ম্মল

আনন্দ লাভের অন্যতম। উপায় এবং একটা কাজের কাজ দাঁড়াইয়া গেছে। ত্রিপুরেশ্বর আনন্দপূর্ব্বক ঐ দিকেই তাকাইয়া পথ চলিতেছিলেন...হঠাৎ তাঁর চোখে পড়িল, একটি মনুষ্য মূর্ত্তি চট্ করিয়া ফটকের থাম্‌টীর আড়ালে সরিয়া গেল···

সন্দেহ হওয়ায় ত্রিপুরেশ্বর থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন—

উদ্‌গ্রীব হইয়া বলিলেন—কে, কর্ণধর নাকি?

বলিতেই কর্ণধরই আড়াল ছাড়িয়া প্রকাশ্যে আসিয়া দাঁড়াইল...

ত্রিপুরেশ্বর পুনরাগত মিত্রকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন; মিলনোল্লাসে পুলকিতকণ্ঠে কলরব করিতে লাগিলেন—এস, এস, কর্ণ।···এসছ ভালই হয়েছে—তোমায় আমরা বড় ভালবাস্‌তাম। দেখে আনন্দ হ'ল। ভাল আছ?

—আজ্ঞে। বলিয়া কর্ণধর রাস্তায় উঠিয়া আসিল।

ত্রিপুরেশ্বর কর্ণধরের কাঁধের উপর হাত তুলিয়া দিলেন, কর্ণধরকে গায়ের দিকে টানিয়া লইলেন···তারপর যেন তাঁর নিজস্ব সম্পদ্ আর পুনরাবিষ্কৃত হারানিধিকে পুনরাবিষ্কারের গৌরব সহ গ্রামের লোককে দেখাইতে চলিলেন।

(সমাপ্ত)

চাষার কৈফিয়ৎ

শ্রীকমলাকান্ত কাব্যতীর্থ

তোমরা আমায় নোঙ্‌রা বল,—ধিক্কারে দাও ভরে',—
নাইকো হানি;—'সভ্য' আমি সাজ্‌বো কেমন করে'!
ধূলিই যে মোর অঙ্গভূষা,—মা যে আমার মাটী;
মাঠের বুকেই তীর্থ আমার; ধর্ম্ম আমার খাঁটী।
ওই যে নধর দূর্ব্বাদলে বক্ষ মায়ের ঢাকা;
দর্প-কঠোর জুতার তলে যায় কি তা'রে রাখা!
ঠাকুর-ঘরের পরেই খামার,—লক্ষ্মী মায়ের পুরী,
'ভগবতী'র গোয়াল সেথা; কোথায় জুতা পরি?
জননী তা'র স্নেহের ধূলায় সাজায় আমার দেহ;
তার চেয়ে কি দামী পোষাক প'রতে পারে কেহ!

বিশ্বসেবার যে ভার আমায় দিলেন রাজার রাজা,
স্নেহের সে দান তুচ্ছ করে' যায় কি 'বাবু' সাজা!
সবাই করে, আমার 'পরে অন্নদানের দাবী;
আমার হাতেই বিপুল ধরার ভাঁড়ার ঘরের চাবী।
বিশ্বপালন মহাযাগে ব্যস্ত হোতার কাজে;
আমার কি আর প্রসাধনের বাহন হওয়া সাজে!
ঢাল্‌ব বুকের রক্তধারা, মাখ্‌বো গায়ে ধূলি;
বৃষ্টি-বাতাস-রোদের সাথে করব কোলাকুলি!
অসভ্য, অভব্য বলো,—মূর্খ বলো মোরে;
এসো না মোর মাটীর স্বপন ভাঙ্‌তে দয়া করে'!

— বৈচিত্র্য —

অগ্নিনিবারক পোষাক—

'ষোল আনা পাপ পূর্ণ হইলে অগ্নি দেবতার আবির্ভাব হয়।' আমাদের দেশের ইহাই চির-প্রচলিত প্রবাদ। অগ্নি-নিবারণের অসহায়তাই ইহা প্রমাণ করে। চোর চুরি করিলে, নৌকা ডুবিলে বা এমনি কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় গৃহস্থের যে ক্ষতি হয় তাহা সহনীয়; কিন্তু তেমন বড় রকম অগ্নিকাণ্ড যদি ঘটে, তবে আমাদের দেশে গৃহস্বামীকে পথে দাঁড়ান ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। দৈবের দোহাই দেওয়াই নিঃসহায়ের একমাত্র সান্ত্বনা। পরন্তু পাশ্চাত্য দেশে অগ্নি-নিবারণের আধুনিক বৈজ্ঞানিক নব নব উদ্ভাবনের কল্যাণে মানুষের পৌরুষ-প্রতিভা দৈবকে অনেকখানি অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রতীচীর এ গৌরবময় অবদান অনুকরণীয়। অগ্নি-নিবারক দমকল প্রভৃতি বিচিত্র যন্ত্র, জলন্ত আগুনের মধ্যে প্রবেশের জন্য হরকিছিম সাবান ইত্যাদির পোষাক এ-দেশে উদ্ভাবিত হইয়াছে। এখানে যে অগ্নিনিবারক পোষাকের ছবি দেওয়া হইল, উহাই সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক ও উৎকৃষ্ট। এই পোষাক পরিধান করিয়া যে কেহ অনায়াসে অক্ষত দেহে আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারে। সম্প্রতি ব্রাসেলস্ সহরের এক প্রদর্শনীতে উহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

(১) অগ্নিনিবারক আধুনিক পোষাক

জল-ক্রীড়া—

জল-ক্রীড়া প্রদর্শনের বিচিত্র কৌশলও আধুনিক যুগেরই আবিষ্কার। এ জন্য নানারকম যন্ত্রও আবিষ্কৃত হইয়াছে। চতুর্থ ছবিতে প্রদর্শিত প্রত্যেক পদ-সংলগ্ন পাখা দু'খানি জলের চাপে নিয়ন্ত্রিত হইয়া সঙ্কোচন ও প্রসারণের দ্বারা জলের মধ্যে অদ্ভুত অদ্ভুত ক্রীড়া দেখাইবার সাহায্য করে। উহা বাজীকরের খেলার মতই তাজ্জব ব্যাপার মনে হয়।

(২) জল-ক্রীড়ায় নূতন যন্ত্র

খেয়ালীর দেশ—

প্রতীচ্য ভূখণ্ডবাসীর অদ্ভুত খেয়ালই মানুষের অজানা রাজ্যের অনেক কিছুরই আবিষ্কারের সহায়ক হইয়াছে। বীরজাতির অত্যুগ্র প্রাণশক্তি নিশ্চিত মরণ জানিয়াও নিছক কৌতূহল-বশেই বিপদ্ বরণ করিতে কখন কুণ্ঠিত হয় না। তরুণের ভীষণ-দৃশ্য নায়গ্রা-প্রপাতে সন্তরণ, বৈজ্ঞানিকের গ্রহাভিযান ও বেলুনযোগে ষ্ট্রাটোস্ফীয়ার-ভ্রমণ, হিমালয়-লঙ্ঘন,
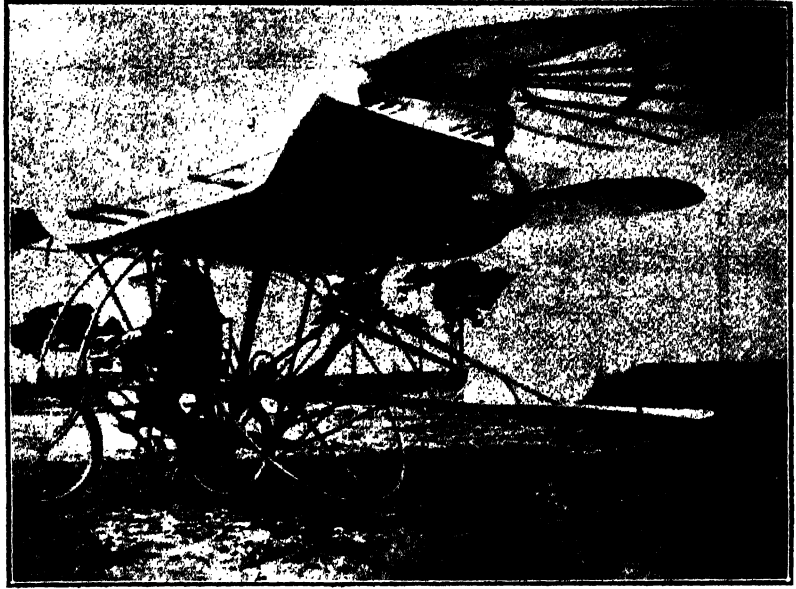
(৩) উভচর দ্বি চক্র-যান

(৪) বিচিত্র মটর-সাইকেল

নাঙ্গা পর্ব্বতারোহণের প্রয়াস ইত্যাদি বিস্ময়কর কাহিনী ঘরমুখো কল্পনাবিলাসীর নিকট রূপকথার চেয়েও রোমাঞ্চকর। কিছুদিন হইল, ইউরোপের মন ভাবিতেছিল এমন যানের কথা যাহা, আকাশে ভূমণ্ডলে সমানভাবে কার্য্যকরী হইতে পারে। শুধু কল্পনার বিলাস নয়, কার্য্যতঃও উহা সম্ভব হইয়াছে; বার্লিনের এক পুলিশ-কর্ম্মচারী এইরূপ এক দ্বি-চক্র-যান-নির্ম্মাণে সমর্থ হইয়াছেন (৩ এবং ৪নং ছবি দ্রষ্টব্য)। এই উভচর যান মাটিতেও চলিতে পারিবে এবং প্রয়োজন হইলে শূন্যেও উড়িতে পারিবে। মটর-সাইকেলের মত খানিকটা চলিলেই উহার পশ্চাদ্ভাগে সংযুক্ত পাখা ঘুরিতে সুরু হইবে। প্রজাপতির মত সুদৃশ্য আচ্ছাদনটি যেমন উড়িবার সাহায্য করে, তেমনি সৌন্দর্য্যও বৃদ্ধি করিয়াছে। চতুর্থ ছবির প্রদর্শিত যন্ত্রটী উচ্চভূমিতে আরোহণের পক্ষে খুব সুবিধাজনক।

গীতার যোগ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

প্রশ্ন উঠিতে পারে, বেদোক্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে জীব যদি পরিপূর্ণভাবে ভগবৎপ্রাপ্তির অধিকারী না হয়, তাহা হইলে এইরূপ আংশিক উপাসনা প্রবর্তিত না থাকাই শ্রেয়ঃ ছিল। কিন্তু গুণাদিভেদে প্রকৃতি বিভিন্ন স্তরে জীব-জগতের বৈচিত্র্য-স্থষ্টি করিয়াছেন। অধিকারবাদ এই অবস্থায় অবশ্যস্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। কেহ অধিকারী, কেহ অধিকারী নয়, ইহার কোন বৈজ্ঞানিক হেতু না থাকিলে এই অবস্থায় ভগবানের পক্ষপাতিত্বদোষ পরিদৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। যখন তিনিই নিয়ন্তা, স্থষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্ত্তা, তখন সকলকে তুল্য অধিকারী না করা নিরপেক্ষতার পরিচয় নয়, এই কথার উত্তর তিনি পরে দিবেন; আমরা সে উত্তরে কতখানি সান্ত্বনা পাইব তাহা বিচার করিয়া দেখিব। উপরোক্ত শ্লোকে স্পষ্টই বলিয়া দেওয়া হইল, ইন্দ্রাদি দেবতা অথবা পিতৃগণের প্রীত্যর্থে যে যজ্ঞ ও ক্রতু তাহাতে দেবলোক ও পিতৃলোকের প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে; কিন্তু উহা গীতার কথিত নিত্যধাম নহে তাহা বলাই বাহুল্য। কেননা, বিশ্বের সকল দেবতা, সকল লোক নশ্বর ও অনিত্য। এই হেতু দেবলোক ও পিতৃলোক হইতে ভোগান্তে জীবকে পুনঃ মর্ত্ত্যলোকে ফিরিতে হয়; "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি", এই কথা এখানে প্রতিপাদিত হইতেছে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "অহন্ত্বনশ্বরোনিত্যঃ" আমি অবিনশ্বর ও নিত্য। এই আমাতে যে সবখানি উঠাইয়া দিয়া পূর্ণযোগ সিদ্ধ করে, সেই অবিনশ্বর ও নিত্য হয়। শ্রুতি তাই জোর করিয়া বলেন, "ন চ্যবন্তে চ মদ্ভক্তাঃ মহতঃ প্রলয়াদপি" অর্থাৎ আমার ভক্তগণ সুমহৎ প্রলয়কালেও আর পুনরাবর্ত্তিত হয় না। গীতায় যে পরম পদের কথা বার বার উল্লিখিত হইয়াছে, ইহা তাহা ভিন্ন অন্য কিছু নহে; আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, এই পুনরাবর্ত্তন না হওয়া অর্থে জন্ম পরিগ্রহ না করা তাহা নহে; কেননা, পূর্ব্বে তিনি অসংখ্যবার বলিয়াছেন—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানাম্ ঈশ্বরোঽপিসন্।
প্রকৃতিং স্বাম্ অধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥

বস্তুর উৎপত্তি আছে, পরিণতি আছে, জরা মরণ আছে; বস্তুত্বের পরিবর্ত্তন নাই, বিনাশ নাই। এইজন্যই প্রলয়কালে সেই নাশ-রহিত পরম পুরুষের সহিত যোগ-যুক্ত হইয়া ভক্তগণও নাশহীনত্ব-রূপ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য।

শুধু এই কথা বলিলেই গোল মিটে না; কেননা, মানুষের স্বভাব-প্রবৃত্তি শুধু আহার-নিদ্রাদি নৈসর্গিক-কর্ম্মতৎপর নহে—সে অসাধারণ জীবন ব্যাপারেও উদ্বুদ্ধ হয়। উপাসনা, যোগাঙ্গের অনুশীলন, হোমাদি বৈদিক কর্ম্ম, এই সকল অধ্যাত্ম অনুষ্ঠানও তাহাকে করিতে হয়। যে সাধক ইন্দ্রলোক, পিতৃলোক, ভূতলোকাদির কামনা বর্জ্জন করিয়া শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় করিতে চাহে, তাহার সাধনবিধি পরবর্ত্তী তিনটী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করিতেছেন :—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি
তদহং ভক্ত্যপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ৯।২৬ ॥
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ মদর্পণম্। ৯।২৭ ॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তোমামুপৈষ্যসি ॥ ৯২৮ ॥

অন্বয় :— যঃ মে (মহ্যম্) ভক্ত্যা (প্রীতিপূর্ব্বিকয়া) পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং প্রযচ্ছতি (প্রদদাতি) অহং প্রযতাত্মনঃ (শুদ্ধচিত্তস্য) ভক্তি-উপহৃতম্ (ভক্ত্যা সমর্পিতম্) তৎ (পত্রাদি সর্ব্বং) অশ্নামি (গৃহ্ণামি)।

যে আমাকে একান্ত ভক্তিসহকারে, পত্র, পুষ্প, ফল, জল প্রদান করে, আমি সেই বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির ভক্তিপূর্ণ উপহার গ্রহণ করিয়া থাকি।

কৌন্তেয়, যৎ করোষি (আচরষি), যৎ অশ্নাসি (খাদসি) যৎ জুহোষি (হবনং নির্বর্ত্তয়সি) যৎ দদাসি

(প্রয়চ্ছসি) যৎ তপস্যাসি (তপঃ করোষি) তৎ মদপর্ণম্ (ময়ি সমর্পণং) কুরুষ্ব ।। ২৭ ।।

হে কৌন্তেয়, যাহা কর, যাহা খাও, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যাহা তপস্যা কর তাহা আমাকেই অর্পণ কর ।। ২৭ ।।

এবং (ময়ি সর্ব্বসমর্পণং কুর্ব্বন্) শুভাশুভফলৈঃ (ইষ্টা-নিষ্ট ফলৈঃ) কর্ম্মবন্ধনৈঃ (বন্ধরূপৈঃ কর্ম্মভিঃ) মোক্ষ্যসে (মুক্তো ভবিষ্যসি) । বিমুক্ত (সন্) সন্ন্যাস-যোগ-যুক্তাত্মা (সন্ন্যাসঃ কর্ম্মনাম্ মদর্পণম্ স এব যোগঃ, তেন যুক্তম্ অন্তঃকরণম্ যস্য তথাভূতঃ) মাম্ উপৈষ্যসি (প্রাপ্স্যসি) ॥ ২৮ ॥

এইরূপ আমাতে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণে ইষ্টানিষ্ট-ফলরূপ কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে ; বিমুক্ত সন্ন্যাস-যোগ-যুক্তাত্মা যে সে আমায় পাইবে । ২৮ ॥

স্বভাবতঃ মানুষ যে সকল কর্ম্ম করে, আমরা তাহা দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি । পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহার একাংশ স্বতঃ-প্রসূত স্বভাবক্রিয়া, অন্যাংশ শাস্ত্রাদি-কথিত । এইহেতু, যজ্ঞানুষ্ঠানরূপ শাস্ত্রবিধি-প্রবর্ত্তিত কর্ম্মই কেবল শ্রীভগবানে সমর্পণীয় নহে, ফল-পুষ্প-জলাদি মন্ত্রসহযোগে শুধুই তাঁহাতে অর্চ্চনীয় নহে ; পরন্তু স্বভাব-বশে আমরা যাহা করি, যাহা খাই, শরীর-ধর্ম্মের জন্য যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, সবই ভগবৎপ্রীত্যর্থে অনুষ্ঠেয়—এই শ্লোকগুলিতে এইরূপ আভাস পাওয়া যাইতেছে । যখন জীবনের কোন অনুষ্ঠানই ক্ষুদ্র, অকিঞ্চিৎকর, অচিরস্থায়ী সুখের কামনায় না হইয়া ইষ্টের প্রীতিকামনায় হয়, তখন সেই জীবন দিয়া যাহা হয় সবই ভগবানের প্রীত্যর্থে অমৃত-নির্ঝর তাহা কি আর বলিতে হইবে ? শ্রুতির "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে', এই বচন এইরূপ অসাধারণ স্বভাবপরায়ণ জীবনেই সিদ্ধ হইতে পারে ।

সপ্তম অধ্যায়ের ১৬শ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ব্বিধ ভক্তের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী । উপস্থিত তিনি যে ভক্তি-সাধনার কথা ব্যক্ত করিতেছেন তাহা উক্ত চতুঃশ্রেণীর অন্তর্গত নহে । এই ক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে শ্রীভগবান অমিশ্র কেবলাভক্তির কথাই বলিতেছেন । সকাম ভক্তি নিকৃষ্ট । ভগবান বাঞ্ছাকল্প-তরু, আর্ত্ত-জিজ্ঞাসু প্রভৃতি ভক্তকে আপন আপন অভিলষিত বস্তু তিনি দান করিতে পারেন ; কিন্তু যে সর্ব্ব কামনা পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যেই জীবনের সবখানি নিয়ন্ত্রিত করিয়া তুলে, স্বয়ং ভগবান তাহারই প্রাপ্ত বস্তুরূপে উপনীত হন । মোক্ষ-মুক্তিও এইহেতু সহজলভ্য কিন্তু মোক্ষমুক্তিদাতা স্বয়ং ভগবানকে লাভ করা কি কঠোর সাধনসাপেক্ষ তাহা অনুমেয় । এইজন্য কর্ম্ম, জ্ঞান ও মিশ্রাভক্তির অপেক্ষা অমিশ্রা কেবলাভক্তি সুদুর্লভ ।

লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম কোন না কোন কামনা-পূর্ত্তি লক্ষ্যে রাখিয়া অনুষ্ঠিত হয় । যাহারা কেবলাভক্তির অধিকারী তাহারা আত্মা, মন, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়-ব্যাপার সমূহ, সমস্ত জীবনখানিই ভগবানে সমর্পণ করে । এই মহাযজ্ঞের কোন প্রকার আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন নাই । শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠানে বহু আয়াস আছে, উহার জন্য মহামূল্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে হয় অথচ কামনার তাড়নাতেই জীব এইরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । মানুষের চেষ্টা ও শ্রম স্বভাবজ ; কিন্তু ভক্তি অপ্রাকৃত । এই দিক্ দিয়া অনায়াসলভ্য, যদৃচ্ছালব্ধ, সাধারণ পত্র-পুষ্প-জলাঞ্জলি দিয়া ঈশ্বরে ভক্ত্যুপহার কঠিন হইয়া পড়ে । মন্ত্র ও আনুষ্ঠানিক আচার ব্যবহার আয়াসসাধ্য হইলেও তাহা মানুষের যত্নসাধ্য ; কিন্তু এই "ভক্ত্যুপহৃত" অর্থাৎ ভক্তি-সহকারে উপহার-প্রদান চেষ্টাকৃত নহে, পরন্তু স্বতঃ-প্রসূত—মানুষের এই জন্যই ইহা দুঃসাধ্য বোধ হইয়া থাকে । মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আহুতি-দান অথবা অর্ঘ্যাদি-প্রদান যথানিয়মে করিতে পারিলে উহা শাস্ত্র-সঙ্গত এবং দেবতা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়, কিন্তু ভক্তির সহিত ভগবানকে দেওয়া না হইলে তাহা ঈশ্বরে সমর্পিত হয় না । অতি সহজ যাহা এই জন্যই তাহা সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর ও সুদুর্লভ হইয়াছে ।

২৮শ শ্লোকে বাহিরের উৎসর্গ অপেক্ষা অন্তরের অবদান উৎসর্গ করার কথা উল্লিখিত হইয়াছে । সর্ব্বকর্ম্ম ভগবানে সমর্পিত হইলে উহার ইষ্টানিষ্ঠ বিষয়ে যেমন সাধকের কোন সম্বন্ধ থাকে না, কর্ম্মবন্ধনও তদ্রূপ তাহাকে পীড়ন করে না । মুক্তির সাধন অপেক্ষা সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের এইরূপ

নিষ্কাম পরিচর্য্যা বিশিষ্ট অধিকারীর পক্ষেই সম্ভব। শ্রীগোপাল তাপনী উপনিষদে এই কথা আছে—

"ভক্তিরস্য ভজনং তদ্ ইহামুত্রোপাধিনৈরাশ্যেনৈবামুষ্মিন্ মনসঃকল্পনমেতদেবচ...নৈষ্কর্ম্যম্..." অর্থাৎ এই ভক্তি ইহ-লোকেও পরলোকে ফলাভিসন্ধি-বর্জিত, অতএব ইহাতে ইষ্টানিষ্টবোধ ও বন্ধনানুভূতি সম্ভব নহে; কাজেই এইরূপ কর্ম্ম নৈষ্কর্ম্ম্যে পরিণত হয়। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ১৮শ শ্লোকে

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।

স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ।

এই শ্লোকের অর্থ সুস্পষ্ট হইল দশম অধ্যায়ের "পত্রং পুষ্পং ফলং" প্রভৃতি শ্লোকত্রয়ে। এইরূপ নিত্যকর্ম্মী নিজে কিছুই করে না, ভগবানই ইহাদের মধ্য দিয়া সকল কিছু করিয়া থাকেন। পৃথিবীতে সকল কর্ম্মেরই ফল আছে, শুভাশুভভেদ সর্ব্বক্ষেত্রেই অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু ভগবানে নিষ্কাম উৎসর্গ কোন ফলের জন্য নহে, এই হেতু ভোগেরও বন্ধন নাই, মোক্ষ-মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও এই যজ্ঞে নিহিত না থাকায় প্রত্যক্ষ ভগবানের সহিতই সাধকের যুক্তি অমোঘ হয়।

ভগবান যখন সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব তাঁহাতে বর্ত্তমান, তখন তিনি কাহাকেও অংশ, কাহাকেও আপনার সবখানি দিয়া কৃতার্থ করেন, এইরূপ পক্ষপাতিত্ব তাঁহাতে থাকিতে পারে, এই সংশয় অপনোদন করিবার জন্য এইবার পরবর্ত্তী শ্লোকের অবতারণা করা হইতেছে। আমরা ইহা বিশেষ বিচার করিয়া অবধারণ করিব।

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।

যে ভজন্তে তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥৯।২৯॥

অন্বয়ঃ—অহং সর্ব্বভূতেষু (যাবতীয় প্রাণিষু) সমঃ (তুল্যঃ) মে (মম) দ্বেষ্য (দ্বেষবিষয়ঃ) প্রিয়ঃ (প্রীতিবিষয়ঃ) ন অস্তি (বিদ্যতে) যে তু মাং ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্ব্বিকয়া) ভজন্তি (সেবন্তে) তে (ভক্ত্যা) ময়ি (ভগবতি) [বর্ত্তন্তে] অহমপি চ তে [বর্ত্তে-]

আমি সকল প্রাণিতে সমান, আমার দ্বেষ্য অথবা প্রীতির বিষয় কিছু নাই। যাহারা আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করে তাহারা আমাতে এবং আমি তাহাদিগের মধ্যে অবস্থান করিয়া থাকি।

বর্ত্তমান অধ্যায়ের ১০ম শ্লোক "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ" প্রভৃতি শ্লোকে বলা হইয়াছে—তাঁহারই অধ্যক্ষতায় ত্রিগুণাত্মিকা মায়া বিশ্বব্যাপারে নিরতা। প্রকৃতি জগৎ উৎপাদন করেন। জগতের পরিবর্ত্তনও পুনঃ পুনঃ প্রকৃতি দ্বারাই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ভগবান ইহার অধ্যক্ষ, সাক্ষী, চেতয়িতা, চৈতন্যমাত্র স্বয়ং ফলভোগী—প্রকৃতি কাহারও সুখ দুঃখের বিধান করেন না। পঞ্চম অধ্যায়ের ১৫শ শ্লোকে তাহাই আরও বিশদ করিয়া বলা হইয়াছে:—

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং নচৈবং সুকৃতং বিভুঃ।

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥

অতএব প্রকৃতির নিয়ত উর্দ্ধমুখী প্রেরণায় সৃজন হইতে পরিণত কাল পর্য্যন্ত স্তরের পর স্তর যে জীব-চৈতন্য তাহার ক্রমবিকাশমান পর্য্যায়ে বিচিত্র অধিকারবাদের সৃষ্টি হয়। ভক্তির অধিকার এই হেতু কোটী কোটী জন্মের ফল বলিতে হইবে। স্মৃতি-শাস্ত্রও বলেন—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।

সুদুর্লভঃ প্রশস্তাত্মা কোটীষ্বপি মহামুনে ॥

কোটী সিদ্ধ পুরুষের মধ্যে একজন প্রশান্তাত্মা নারায়ণ-পরায়ণ ব্যক্তি সুদুর্লভ।

চতুর্থ অধ্যায়ের ২৫শ শ্লোক হইতে—"এবং বহুবিধা যজ্ঞা" ৩২শ শ্লোক পর্য্যন্ত অধিকারিবাদের বিভিন্ন স্তর প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রকৃতি-সাধনায় এইরূপ ক্রমসিদ্ধি লাভ করিতে করিতে নবম অধ্যায়ের কথিত কেবলা-ভক্তি-সহকারে ভগবানে আত্মোৎসর্গের অধিকার মানুষ পাইয়া থাকে। ইহা যে "কোটীতে মিলয়ে গুটী", এবিষয়ে আর সংশয় কি?

শুকদেবও বলেন—

"মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্।"

মুক্তি-মোক্ষ সহজপ্রাপ্য, কিন্তু ভক্তি বড় ভাগ্য না হইলে মিলে না। এই ভাগ্য ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব দোষ-দুষ্ট বশতঃ নহে, পরন্তু "জন্মনি জন্মান্তরে বা"—সকল প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত সাধন-দুয়ার অতিক্রম করিয়া এই সিদ্ধ কোটী-জীবন-লাভের তোরণদ্বারে ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হয়। সকল সাধনার অন্ত হইয়াছে বলিয়াই সে

আর চাহে না সারূপ্য, সাযুজ্য, মুক্তি, মোক্ষ। সব পদেরই অনিত্যতা অবধারণ সে করিয়াছে বলিয়াই এই নিত্য পদের আশ্রয়ে সে আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছে। আর তাই একবার তাহার মধ্যে প্রভুকে, আর প্রভুর মধ্যে তাহাকে দেখিয়া জন্মমৃত্যুর বাঁধন তাহার বোধ হইতে চিরযুগের মত বিসর্জ্জিত হইয়াছে। শুকদেব আরও বলেন—

"ভগবান ভক্ত-ভক্তিমান্"—ভগবান স্বয়ং ভক্তের প্রতি ভক্তিযুক্ত। এমন মধুর অদ্বৈতবাদ অভেদাত্মানুভূতি প্রেমিকের পক্ষেই সম্ভব ; ভাগবৎ-তত্ত্ব লইয়া দার্শনিকতার তর্ক এখানে অর্থহীন। যে দিব্যধামের অধিবাসী হইয়াছে, যে অমৃতপানে উন্মাদ, তাহার জন্মমৃত্যু, শুভাশুভ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব চেতনার মধ্যে থাকিতে পারে না। অনাদি কাল হইতে বাসনা ও সংস্কার জীবনের ক্রমানুযায়ী 'সু' এবং 'কু' কর্ম্ম-প্রেরণা জাগায়। আর সেই কর্ম্মক্ষয়ের সাধনা, ভোগসুখাদি ও যজ্ঞ-জপাদি কর্ম্মবন্ধনে চৈতন্যকে জাগাইতে জাগাইতে প্রকৃতি জীবচৈতন্যকে এমন চতুর করিয়া দেয় যে আর সে লোকাচার-বেদাচারের বন্ধন, অস্বাভাবিক জীবনভার না বহিয়া, সহজ স্বভাব-জীবনের সকল কর্ম্ম ঠাকুরকে অর্ঘ্য-স্বরূপ অর্পণ করে—তখন এই জীবনযন্ত্র ভগবানেরই আশ্রয়তত্ত্ব-রূপে মধুময় হইয়া উঠে।

এই উৎসর্গমন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ মুখর হইয়া উঠিয়াছে। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে হাঁকিয়া বলিতেছেন—

অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতেমামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥৯।৩০॥

অন্বয় :—সুদুরাচারঃ (অতীব নিষিদ্ধক্রিয়াশীলঃ) অপি চেৎ (যদি) অনন্যভাক্ (নান্যভক্তিঃ) [সন্] মাং ভজন্তে সঃ সাধুঃ (শ্রেষ্ঠঃ) এব মন্তব্যঃ (জ্ঞাতব্যঃ) হি (যতঃ) সঃ সম্যক্-ব্যবসিতঃ (শোভনাধ্যবসায়ম্ কৃতবান্)।

একান্ত অনাচারী যে সেও যদি অনন্যচিত্তে আমাকে ভজনা করে, তাহাকেও সাধু বলিয়াই জানিও। যেহেতু সে-ই বিহিত অধ্যবসায়ী।

সুদুরাচার বিহিতাচারসম্পন্ন যে নহে তাহাকেই বলা হইয়াছে ; কেন না, অনন্যচিত্তে ঈশ্বরে শরণাগত জনকে তিনি সাধু বলিয়া জানিতে বলিয়াছেন। এখানে এই "মন্তব্য" শব্দটী "স্ব-নিদেশরূপোবিধিশ্চদর্শিতঃ" অর্থাৎ অনাচারী ব্যক্তিকে ভগবৎপরায়ণ দেখিয়াও যদি সাধুজ্ঞান না করা হয়, তাহা হইলে এই বিধি অবজ্ঞা করার প্রত্যবায়-ভাগী হইতে হইবে। অনন্যচিত্তে ভাগবৎ উপাসনাই বিহিত অধ্যবসায় ; "সম্যক্ব্যবসিতো" এই শব্দ এই হেতু প্রযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ বিহিত অধ্যবসায়শীল অতি সহজেই শাশ্বত আস্বাদ লাভ করিতে পারে, তাহাই পরবর্ত্তী শ্লোকে কৃষ্ণ বলিতেছেন—

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥৯।৩১॥

অন্বয় :—ক্ষিপ্রং (শীঘ্রং) ধর্ম্মাত্মা (ধর্ম্মানুগতচিত্তঃ) ভবতি শশ্বচ্ছান্তিং (নিত্যাঃ শান্তিং) নিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)। কৌন্তেয়, মে (মম) ভক্তঃ ন প্রণশ্যতি, প্রতিজানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু।)

পূর্ব্বোক্ত আচারবিহীন ব্যক্তিও শীঘ্র ধর্ম্মগতপ্রাণ হয়, চির শান্তি লাভ করে। অনন্যভক্ত বিনষ্ট হয় না—হে কৌন্তেয়, তুমি ইহা ঘোষণা করিতে পার।

নৈষ্ঠিক সাধনার যে নীতি ও বিধি সানুরাগা প্রেমের বিধান তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। অনন্যচিত্ত হওয়ার জন্য যে বৈধী আচার ও অনুষ্ঠান, ভাগবৎনিরূপণে সিদ্ধকাম একনিষ্ঠ সাধকের তাহার অন্যথা সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়। সুদুরাচার শব্দ পরদারনিরত প্রভৃতি দুষ্কৃতিপরায়ণতা-সূচক অর্থে ব্যাবহৃত হওয়ায় যেন মনে হয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রুতি ও স্মৃতিকে উপেক্ষা করিতেছেন ; কেননা, শ্রুতি বলেন—

নাবিরতো দুশ্চরিতাত্মা না শান্তোনাসমাহিতঃ।
না শান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈমাপ্নুয়াৎ ॥

অর্থাৎ সতত দুশ্চরিত্র, অশান্ত, অসমাহিত, অশান্তমনা প্রজ্ঞানের দ্বারা ইহাকে প্রাপ্ত হয় না।

স্মৃতিও বলেন—

নহ্যকৃতপ্রায়শ্চিত্তমেবং স্মার্ত্তাঃ সাধুং ন মন্যেঃ।

পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত না হইলে কেহ সাধু হইতে পারে না।

কিন্তু এই ক্ষেত্রে ইহার কোনটী খাটে না। কেন না, যদি অসমাহিত অশান্ত মনই হইবে, তাহা হইলে সে 'অনন্যভাক্ ভজতে' ইহা অসঙ্গত হয়। অনন্যচিত্তে

ঈশ্বরোপাসনা বিহিত ধর্ম্মাচার। কেননা, এই বিধানেই অতি শীঘ্র সাধক ইষ্টলাভ করিতে পারে এবং এইরূপ ভক্তই অমৃতের অধিকারী, একথা সমুচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিতে তিনি অর্জ্জুনকে আদেশ করিতেছেন।

তারপর, কৃষ্ণ বলিতেছেন—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপিস্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপিযান্তি পরাংগতিং ॥৩২॥

অন্বয়ঃ— হে পার্থ, যে অপি পাপযোনয়ঃ (নিকৃষ্ট-জন্মানঃ) স্যুঃ (ভবেয়ুঃ) স্ত্রিয়ঃ বৈশ্যা তথা শূদ্রাঃ তে অপি মাং ব্যপাশ্রিত্য (সংসেব্য) হি (নিশ্চিতং) পরং (শ্রেষ্ঠং) গতিং যান্তিং (প্রাপ্নুবন্তি)॥

যাহারা নিকৃষ্ট জন্মলাভ করিয়াছে, স্ত্রীগণ, বৈশ্য ও শূদ্রগণ, তাহারাও আমাকে আশ্রয় করিয়া নিশ্চয় সদ্গতি লাভ করিয়া থাকে।

অনাচারী অর্থাৎ শাস্ত্রনীতি লঙ্ঘণকারী যে, সে যদি অনন্যচিত্তে ঈশ্বরপরায়ণ হয়, লোকতঃ তাহার লাঞ্ছনার সীমা থাকে না। শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশে স্ত্রীজাতিও ঈশ্বর-লাভে অকৃতার্থা। অন্ত্যজ, বৈশ্য, শূদ্রেরও ইহাপেক্ষা উত্তম অবস্থা নহে। কিন্তু স্থান, কাল, দেশ, জাতি, ধর্ম্ম, সমাজ প্রভৃতির বাঁধনে পাবন-মূর্ত্তি ধর্ম্মকে গণ্ডীবদ্ধ করিয়া রাখা যায় না। আত্মার অভ্যুত্থান-মন্ত্র যে প্রকারে যে ক্ষেত্রেই উচ্চারিত হউক না, সেইখানেই মুক্তির তোরণ-দ্বার মুক্ত হইয়া যায়। জাতি-বিচার, সমাজিক আচার, লোক-ব্যবহার প্রভৃতি কোন বন্ধনই ভগবানের পথে স্বীকার্য্য নহে। এই শ্লোক কয়টীতে ইহাই তিনি ঘোষণা করিলেন। ভগবান—"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু" এই বাক্যের প্রমাণ করিলেন এই কয়েকটী শ্লোকে। জন্মার্জ্জিত কৃত কর্ম্মের দ্বারা কেহ এমন কোন এক চিহ্নিত অবস্থা লাভ করিবে, যাহা জগদ্বাসীকে বুঝাইয়া দিবে, যে ইহারাই ভগবানের 'চিহ্নিত ভক্ত', এমন ধরা-বাঁধা বিধান বিশ্বনিয়ন্তার নাই। বাহির হইয়া আসে হাড়ি, বাগ্দী, ডোমের পর্ণ-কুটীর হইতেও তাঁহার চিহ্নিত মানুষ; হূণ, যবন, কিরাত, ম্লেচ্ছ সকল জাতির মধ্য হইতেও মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় ঈশ্বর-প্রেমিক নূতন বেদ হুঙ্কার দিতে দিতে। প্রায়শ্চিত্ত, বিধি-নিষেধ, শমদমাদির সাধনশৃঙ্খল এই সকল সিদ্ধ কোটী মানবকে বন্দী করিতে পারে না; তাহারা ছুটিয়া যায় ঋজু পথে সবেগে পুরুষোত্তমের চরণতল লক্ষ্য করিয়া। যুগে যুগে তাই অচিন্তিত অপ্রত্যাশিত ক্ষেত্র হইতেও পরম-গতির স্ফুরণ দেখা যায়। ভগবানের করুণা যখন এইরূপ সর্ব্বক্ষেত্রেই জাহ্নবীধারা সৃষ্টি করে, তখন

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥৩৩

অন্বয়ঃ—পুণ্যা (পূতা) ব্রাহ্মণা (বিপ্রাঃ) তথা রাজর্ষয়ঃ ভক্তা [পরাম্ গতিং যান্তি] কিং পুনঃ; অনিত্যং অসুখং ক্লেশবহুলং ইমং লোকঃ (মনুষ্যলোকং) প্রাপ্য (লব্ধা) মাং ভজস্ব (সেবস্ব)।

নির্গতকলুষ ব্রাহ্মণগণ, তথাবিধ রাজর্ষিগণ ও ভক্ত-গণের সম্বন্ধে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন অর্থাৎ তাঁহারা তো পরমগতি লাভ করিয়াই থাকেন। অতএব, তুমি ক্ষণভঙ্গুর ক্লেশবহুল এই মনুষ্যদেহলাভ করিয়া আমার ভজনা কর।

বিধি ও ধর্ম্মের অনুগত আচারী ও বিচারপরায়ণ ব্রাহ্মণ, রাজর্ষি ও ভক্তগণ যে ধর্ম্মলাভ করিবেন, তাহাতে আর সংশয় কি? যখন কেহ অনন্য-চিত্তে ঈশ্বরপরায়ণ হয়, তখন বিধিহীন, মন্ত্রহীন, অতিশয় নিকৃষ্ট আচারও সাধককে উত্তম অধ্যবসায়পরায়ণ করিয়া তুলে। তন্ত্র-সাধক রাম-প্রসাদ এই ভরসায় বলিয়াছিলেন "ওরে মন বলি, ভজ কালী তোর ইচ্ছা হয় যে আচারে"। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট, ধর্ম্ম-সঙ্গত আচার উপেক্ষা করিয়াও সাধকের ইষ্টপ্রাপ্তি হয়, ইহা তাঁহারই সঙ্কেত। অতএব শাস্ত্রশাসন স্ত্রী, অন্ত্যজ, বৈশ্য শূদ্রের পক্ষে ভগবৎপ্রাপ্তির পথে অন্তরায় হইলেও, সর্ব্ব-কর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ করিয়া অনন্যচিত্ত হইতে পারিলে বিধি-নিষেধ-আচারবিহীন জন এবং শাস্ত্র-বর্ণিত অনধিকারীও অনায়াসে পরম পদ পাইতে পারে, গীতিকার এই বাণী প্রচার করিয়া গীতার ধর্ম্মকে সার্ব্বজনীন করিয়াছেন।

কিন্তু এই শ্লোকগুলির অন্য অর্থই পূর্ব্ব-ভাষ্যকারগণ করিয়া গিয়াছেন; তাহা কতটা যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত তাহা বিচার করার প্রয়োজন আছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "আমি সর্ব্বভূতে তুল্য, কিন্তু যে আমাকে ভক্তি করে আমি তাহাতে নিবাস করি।" যদিও মূল শ্লোকে "চ অপি" এই

শব্দ থাকায় অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁর অবস্থিতি বুঝায়, তত্রাপি শ্লোকের ভাবার্থ সামান্য বিশেষ পার্থক্য সুস্পষ্ট করে। এই হেতু বুঝিতে হইবে, যে তাঁহাকে ভক্তি না করে তিনি তাহাকে বিশেষ-রূপে অনুগ্রহ করেন না; ইহাতে পক্ষ-পাতিত্ব দোষের ক্ষালন হয় না। কেন না, ভক্তি-প্রেরণা জাগ্রত করার নিয়ন্তৃত্ব যখন তাঁহারই, তখন একজনের মধ্যে ভক্তির জাগৃতি, অন্যের মধ্যে তাহার সুপ্তি, এইরূপ হওয়ায় ক্ষেত্র-বিশেষে তাঁহার বিশেষ-ভাবে অনুগ্রহ-বর্ষণ হয়, স্বভাবতঃই ইহা মনে করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই হেতু সমভাবে সর্ব্বভূতে অবস্থিতির পরিচয় আমরা পরবর্ত্তী শ্লোকগুলির ব্যাখ্যায় খুঁজিয়া পাই না।

২৯শ শ্লোকের "সমোহহং" অবস্থা বুঝাইবার জন্য পরবর্ত্তী শ্লোকগুলির অবতারণা; কিন্তু প্রথমেই গোল বাধিয়াছে "সুদুরাচারঃ" শব্দের ব্যাখ্যা লইয়া। ইহার লৌকিক অর্থ "অত্যন্ত পাপিষ্ঠ"; এই হেতু এইরূপ দুষ্কৃত-জনও যদি ভগবানকে "অনন্যভাক্" হইয়া ভজনা করে, তাহাকে "সাধুরেব" মনে করিতে হইবে, এই বিধি ভগবান দিতেছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, ভাষ্যকারগণ বিল্বমঙ্গল, অজামিল প্রভৃতির কাহিনী উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে আচার্য্য বিশ্বনাথের ভাষ্য "স্বভক্তেষ্বাসক্তির্ম্ম স্বাভাবিক্যেব ভবতি", এইরূপ অর্থ হইলে ভগবানের সমভাবের অবস্থিতি প্রমাণিত হয় না। কিন্তু "আচার" শব্দের পূর্ব্বে 'দুর্' অব্যয়ের অর্থ—নিষেধ, কষ্ট, নিন্দা, অবক্ষেপণ—এই হেতু নিষিদ্ধা-চারীকেও আমরা দুরাচার বলিতে পারি। বৈদিক সাধনায় "কাম্যনিষিদ্ধবর্জ্জনপুরঃসরঃ" সাধনপথে অগ্রসর হইতে হয়, এই কথা উক্ত হইয়াছে। কাজেই যাহা নরকাদি অনিষ্ট-সাধন কর্ম্ম, সেইরূপ আচার-পরায়ণ ব্যক্তিও যখন 'অনন্যভাক্' হয় তখনই সে "সম্যক্-ব্যবসিতঃ"—এইজন্যই সে সাধু। ঠিক পরহিংসারত, পরদারপরায়ণ ব্যক্তি এইখানে দুরাচার শব্দের অর্থ করা যায় না; পরন্তু এই সকলই যে শাস্ত্র-জ্ঞান-বর্জ্জিত বলিয়া অনন্যভাক্ হইতে গিয়াও করিয়া বসে তাহাকেই উল্লেখ করা হইয়াছে; নতুবা যে পরহিংসারত, পরদারপরায়ণ, তার চিত্ত অনন্যভাক্ হইতে পারে, এ বিষয় কোন সাধনপরায়ণ ব্যক্তি স্বীকার করিবে না। "যৎ করোষি তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্", এই সাধন ক্ষেত্র-বিশেষে নিষিদ্ধ আচাররূপে পরিদৃষ্ট হয়। এরূপ দৃষ্টান্ত সাধনজগতে বিরল নহে। কিন্তু সে ঈশ্বরে একাগ্রচিত্ত বলিয়া তাহার সেই অনাচারও "শোভনাধ্যবসায়ম্ কৃতবান্" নামেই আখ্যাত হইয়াছে এবং সে এই অধ্যবসায়কে আশ্রয় করিয়া "ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা।"

পাপযোনি, স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্রও বেদাচারে অধিকারহীন হইয়াও, "মাং ব্যপাশ্রিত্য" (অনন্যভাক্ শব্দের ইহা প্রতিশব্দ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না) তাহারাও সম্যক্ অধ্যবসায় সহকারে পরম গতি প্রাপ্ত হয়।

নিষিদ্ধাচারী, বেদে অনধিকারী, শক, যবন, হূণ, ম্লেচ্ছ ভগবানের অকস্মাৎ অনুগ্রহ পাইয়া যে এইরূপ অনাচারের মধ্য দিয়াও পরমগতির পথে অগ্রসর হয়, তাহাতেও ভগবানের পক্ষপাতিত্ব-দোষ থাকিয়া যায়; কেননা, তিনি সকলকেই তো এইরূপ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেন না!

আচার্য্য শঙ্কর ২৯শ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া এই প্রশ্নের সমাধান দিয়াছেন—"যে ভজন্তি তু মাং ঈশ্বরং ভক্ত্যা, ময়ি তে স্বভাবতঃ এব ন মম রাগ-নিমিত্তং ময়ি বর্ত্তন্তে, তেষু চাপ্যহং স্বভাবতঃ এব বর্ত্তে, নেতরেষু, নৈতাবতা তেষু দ্বেষো মম।"

স্বভাব অর্থাৎ প্রকৃতি অকস্মাৎ সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণ-রূপ ভক্তির দ্বারা জীবের অন্তঃকরণ স্বচ্ছ দর্পণাদির ন্যায় সুনির্ম্মল করেন না। শ্রীভগবানের জ্যোতিঃ ও আনন্দ সর্ব্বদাই সমভাবেই বিকীর্ণ হইতেছে; প্রকৃতি জন্মজন্মান্তরের ভিতর দিয়া জীবকে আগাইয়া দিতেছেন ভগবানের পথে। এই ক্ষেত্রে বিশিষ্ট জাতি, দেশ, সমাজ প্রভৃতির বিচার নাই। বেদান্তে প্রমাতার নিদর্শন দেখাইতে গিয়া অধিকারীর নিম্নলিখিত অবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। "বিধিবৎ বেদবেদাঙ্গ অধীত সর্ব্ববেদার্থরহস্যে অভিজ্ঞ, কাম্যনিষিদ্ধবর্জ্জনপুরঃসর, নিত্যনৈমিত্তিকপ্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানে নির্গতকলুষ, নিতান্ত নির্ম্মল-স্বভাব ব্যক্তি পরম জ্ঞান-লাভের অধিকারী হয়। এই সাধন হইতে বিরত যে আমরা তাহাকে দুরাচার বলিতে পারি এবং এই সাধন যাহাদের নিকট নিষিদ্ধ তাহারা ইহার অভাবে প্রকৃতির হস্তে ক্রমবিকাশমান অবস্থাপ্রাপ্তিতে বাধা পায় না। গীতার এই কয়েকটী শ্লোকে

যুগপৎ ভগবানে উপনীত হওয়ার সার্ব্বজানীনতা ও তাঁহার সমদৃষ্টিতার পরিচয় দিয়া যাহারা সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন, বেদ-পরায়ণ ব্রাহ্মণ, রাজর্ষি এবং ভক্ত, তাহাদের স্বচ্ছ অন্তঃকরণে ভগবান যে প্রকাশ হইবেনই, সে বিষয়ে আর সংশয় কি —এই কথা বলিয়া নবম অধ্যায়ের উপসংহার করা হইল।

এই নবম অধ্যায় বিদ্যার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, এই জন্য ইহা 'রাজবিদ্যা' নামে কথিত হইয়াছে। যোগের মধ্যেও ইহা শ্রেষ্ঠ এবং অতিশয় গোপনীয়, এই হেতু ইহা রাজ-গুহ্যযোগ। গীতার সর্ব্বসার এই অধ্যায়ে নিহিত আছে। এই দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

কেবলা-ভক্তির পর, আত্মসমর্পণের দীক্ষা। আত্ম-সমর্পণযোগের শাস্ত্র নাই, সাধন নাই, আছে একটী সিদ্ধ-মন্ত্র; সে মন্ত্র গীতায় বার বার উচ্চারিত হইয়াছে। নবম অধ্যায়ের শেষে এই অমোঘ সিদ্ধ-মন্ত্র ফুকারিয়া উঠিয়াছে; আমরা যেন তাহা স্মরণ রাখিতে পারি—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—মন্মনাঃ (ময়িমনোযস্য সঃ) মদ্ভক্তঃ (ময়িভক্তির্যস্য সঃ) মদ্‌যাজী (মৎপূজনশীলঃ) ভব, মাং নমস্কুরু (প্রণামং কুরু) এবং (এতদুপায়েন) মৎপরায়ণঃ (মন্নিষ্ঠঃ) [সন্] আত্মানং [ময়ি] যুক্ত্বা (সমাধায়) মাম্ এব এষ্যসি (প্রাপ্স্যসি)।

মদ্গত চিত্ত, আমার ভক্ত, আমার উপাসক হও, আমাকে নমস্কার কর; এই উপায়ে মন্নিষ্ঠ হইয়া আত্মাকে আমাতে যুক্ত করিলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

(ক্রমশঃ)

শক্তিমান্

শ্রীপ্যারিমোহন সেনগুপ্ত

তারেই বলি মানুষ যাহার মস্ত বুকের পাটা,
যুঝ্‌তে যাহার চরণ নাহি টলে;
ক্রূর নিয়তির সকল আঘাত সইতে যেবা পারে,
আপন পায়ে দাঁড়ায় দৃঢ় বলে।

কাপুরুষ সে, হাসে যেবা, পায় না বাধা-ভয়,
জীবনে যার বিপদ নাহি ঘটে;
মানুষ যেবা দাঁড়ায় সোজা, অপরকে সে জাগায়,
অক্ষমেরা তাকিয়ে থাকে বটে।

সেই তো মানুষ আঘাতে যার রক্তঝরা মাথা,
উচ্চ রেখে দাঁড়ায় বলিয়ান,
সেই তো পারে দুঃখ-পেষণ করতে অতিক্রম;
শঙ্কাহীন সে, সেই সাফল্যবান।

আঘাত যদি সইতে পারি, পেষণ করি বরণ,
দলন করি বেদন নিরবধি,
সাম্‌লে থাকি দুখের দিনে, মিথ্যা অনুতাপে,
লাভের সুযোগ হারাই নাকো যদি,

তবেই মোরা খাটি মানুষ—এইটি প্রমাণ হবে;
বুঝ্‌বে লোকে—আমরা বলবান;
পরকে আঘাত কর্‌তে পারা নয়ক' বড় কাজ;
আঘাত সওয়া, আঘাত জেনাই প্রাণ।

"গহনা কর্ম্মণো গতিঃ"

শ্রীমৃণালিনী সেন

অনেকদিন বাঙলা লেখা ঘটনাক্রমে হইয়া উঠে নাই; তাই ভয় হয় আমাকে লেখিকা বলিয়া আজকালকার নবীন সাহিত্যসেবীরা হয়তো চিনিবেন না। আমি সেকালের লোক, অন্ততঃ তাঁহাদের কাছে।

আমার সমসাময়িক লেখক লেখিকাদের মধ্যে আজও কেহ কেহ সাহিত্য-ক্ষেত্র অলঙ্কৃত করিয়া সাহিত্যসেবায় নিরলস ভাবে তৎপর আছেন। আমি অনেক দিন দেশছাড়া ও দলছাড়া হওয়ায় দেশের সাহিত্যের সঙ্গে অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

শ্রীমৃণালিনী সেন

তাহার পর, বহু বর্ষ পরে ইয়োরোপের প্রবাস হইতে নিজবাসে আসিয়া, পাকে-চক্রে এমন কর্ম্মবন্ধনে পড়িয়া গিয়াছি, যে সাহিত্য-চর্চ্চার অবসর নাই বলিলেই হয়। এমনও একদিন ছিল, যখন চারিটী দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়ায় মনকে বিশ্ব-জগতের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে পারিতাম। খাঁচায় পাখী যতক্ষণ থাকে, তাহার মনটা নীল আকাশের মধ্যে ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতরে, দূর হইতে দূরান্তরেই উড়িতে থাকে। আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, মনের ভাষা কবিতায় বাঁধিতে তখন চেষ্টা করিতাম। আজ সে কত বৎসরের কথা হইয়া গেল!

এখন আর চারি দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয় না। এখন দেশ দেশান্তর অনেক ঘুরিয়াও আসিয়াছি। যে সব দেশ পূর্ব্বে কল্পনার বস্তু ছিল, এখন সে সকল আমার কাছে বাস্তব, কিন্তু মনের গতি আমার আজকাল মন্থর হইয়াছে। আজকাল আমার দৃষ্টিও দেশের মধ্যে, আমার সবচেয়ে যেটুকু নিজের সেই বাঙলাদেশেই কেবল আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

ইংলণ্ডে পনের ষোল বৎসর যখন ছিলাম—তখন প্রবাসী ও প্রবাসিনী যে কোন ভারতীয়ই আমার আপন জনের মত মনে হইত। সেখানে বাঙালী, বেহারী, পাঞ্জাবী, মারাঠী, হিন্দু মুসলমানের প্রভেদ জানিতাম না, ভারতবর্ষকে সেখানে অখণ্ড ভাবে ধারণা করিতে পারিয়াছিলাম; কিন্তু এখানে তাহা তেমন ভাবে পারি না। আমাদের ব্যক্তিগত নিজস্বতার মত ভারতবর্ষের প্রতি প্রদেশেরও যে একটা নিজস্বতা আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। প্রতি মানুষের যেমন বিভিন্ন সমস্যা, প্রদেশেরও সেই রকম। বাঙালী যেমন বাঙলাদেশের সমস্যা বুঝিবে, এমন অন্য প্রদেশের লোক বুঝিবে না। আমরাও আবার অন্য প্রদেশের সমস্যা ভাল বুঝিতে পারিব না। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ সমগ্র ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ।

অঙ্গগুলির প্রত্যেকের আপন আপন কর্ত্তব্য আছে। তাহারা সকলে যদি আপন আপন কর্ত্তব্য উপযুক্ত রূপে পালন করে, তবেই সমস্ত ভারতবর্ষের মঙ্গল

আমাদের প্রতি নরনারীর নিজ নিজ গার্হস্থ্য ও সামাজিক কর্ত্তব্য আছে, কিন্তু সেইখানেই আমাদের কর্ত্তব্যের শেষ নয়। দেশের প্রতি কর্ত্তব্য তাহার চেয়ে কিছু কম নয়।

রামচন্দ্র একা সেতুবন্ধন করেন নাই, ক্ষুদ্র কাঠ-বিড়ালীর সাহায্যও তাঁহার দরকার হইয়াছিল। আমাদের যাহার যতটুকু ক্ষমতা সেইটুকুই আমাদের দেশজননী আমাদের কাছে আশা করেন। তিনি নানারূপে আমাদের নিশ্চেষ্ট মনকে সজাগ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন, আমাদের হৃদয়ের দ্বারে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতেছেন; কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

আমাদের দেশে অনেক কাজ করিবার আছে, পুরুষের জন্য যেমনি, নারীদের জন্যও তেমনি। পুরুষ ও নারীর সহযোগিতা শুধু গৃহের ও সমাজের কাজে আবদ্ধ থাকিবার জন্য নয়—দেশের কাজের মধ্যেও তাহার অত্যন্ত আবশ্যকতা আছে। বাঙালীর এখন সব চেয়ে বেশী সমস্যা যাহা, তাহার সমাধানের চেষ্টা করাই আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। সে কর্ত্তব্য হইতেছে—বাঙালীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতে না দেওয়া। বাঙালী, বিশেষতঃ বাঙালী হিন্দু ক্রমশঃই হীন হইতে হীনতর, ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়িতেছে। একজন রবীন্দ্রনাথ, একজন জগদীশ বসু বা একজন প্রফুল্ল রায় কিম্বা মেঘনাদ সাহা এবং রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি লইয়া একটা সমস্ত জাতি রক্ষা করা যায় না। ইংরাজীতে যাহাকে "Top-heavy" অর্থাৎ "মাথায় ভারী" বলে, আমাদের সেই দশা হইয়াছে। আমরা সমস্ত জগতের কাছে আমাদের দেশভূষণ লোক-কয়টীর দোহাই দিয়া গর্ব্ব জারী করি; কিন্তু ভিতরের দুরবস্থার গোড়ার গলদের কথা নিজেরাও প্রায় ভুলিয়া যাই। যে জিনিষটা গড়া যায়, তাহা ভিত্তির দিক্ হইতেই গড়িতে হয়। গাছের জড় কাটিয়া আগায় জল ঢালিলে, সে গাছ বাঁচে না। "masses" বলিতে যা' বোঝায় বাঙলায় তার অর্থ জনগণ; সেই জনগণকে বাদ দিলে সমস্ত দেশটার নিরনব্বই অংশ বাদ দেওয়া হয়। জনগণই জাতি-রূপ বৃক্ষের মূল-স্বরূপ—এই মূলকে অক্ষুন্ন ও দৃঢ় না রাখিতে পারিলে, জাতীয় জীবনকেও দৃঢ় রাখা সম্ভবপর নয়। বাঙলা দেশে বাঙা জাতীয়-জীবন রক্ষা করা ক্রমে ক্রমেই দুরূহ হইয়া পড়িতেছে; তাহার প্রধান কারণ, বাঙালীর মধ্যে এখন কর্ম্মনিষ্ঠার দৈন্য এবং অধ্যবসায়ের অভাব। বাঙালী 'বাবুর জাত' হইয়া পড়িয়াছে। এখন 'বাবু' মানে যদিও ইংরাজদের কাছে কেরাণী বোঝায়, কিন্তু 'বাবুর' প্রকৃত

এই জন্যই আজ বাঙলাদেশে সকলেরই কাজ মিলে কেবল হিন্দু বাঙালীরই মেলে না। ছোট হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যবিত্ত ও উচ্চ শ্রেণীর বাঙালী হিন্দুর, সকলেরই এক দশা। প্রত্যেক বাঙালী হিন্দু নরনারীর এই বিষয়ে চিন্তা ও আলোচনা এবং ইহার প্রতিকারের উপায় করা উচিত। প্রত্যেক মাকে তাঁহার শিশু পুত্র-কন্যাকে কর্ম্মপ্রাণ হইতে শিক্ষা দিতে হইবে, তাহাদের কর্ণে শৈশবেই এই ভাবের বীজ-মন্ত্র দান করিতে হইবে। পিতা-মাতা শুধু সন্তান-সন্ততির ঐহিক ও শারীরিক মঙ্গলেরই অভিলাষী হইবেন না; কিন্তু তাহাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্যও সর্ব্বদা সবিশেষ সচেষ্ট থাকিবেন। একটী ছেলে, একটী মেয়েকে যদি আদর্শ করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারা যায়, তবে ভবিষ্যৎ বংশের অনেক আদর্শ জীবনের ভিত্তিপাত তাহা দ্বারা করা হয়। সেইরূপ আবার কু-দৃষ্টান্ত দ্বারা, কু-শিক্ষা দ্বারা, কু-পুত্র বা কু-কন্যা গড়িয়া তুলিলে বংশ-বংশান্তরে তাহার ফল ফলিতে থাকে। কোন্ বাপ, কোন্ মা চান না তাঁহাদের ছেলেমেয়ে তাঁহাদের মুখ উজ্জ্বল করুক, বংশ উজ্জ্বল করুক; অথচ কিরূপ শিক্ষা-দীক্ষার দ্বারা সেরূপ ছেলেমেয়ে পাওয়া যায় ক'জন বাপ-মা তা' ভাবেন? অন্ধ স্নেহের বশীভূত হইয়া কত মা-বাপই না তাঁহাদের পুত্রকন্যাদের ইহকাল-পরকাল নষ্ট হওয়ার সহায় হন।

আমাদের বঙ্গমাতা "শস্য-শ্যামলা সুজলা" অথচ বাঙালীর ঘরে ঘরে দুঃখ-দারিদ্র্য চির-বিরাজমান। কার দোষ? বাঙলার পল্লীগ্রামে গেলে চক্ষের জল সম্বরণ করা যায় না। এত জঙ্গল, এত অযত্নভরা জমি, এত পচা পুকুর আর কোথাও নাই।

এদিকে যে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে হাজারে হাজারে বি-এ, এম-এ, পাশ হইয়া প্রতি বৎসর বিদ্বান্ ও বিদুষীগণ

বাহির হইতেছেন, ক'জন তাহাদের মধ্যে জীবনে কৃতকার্য্য হইতেছেন? পুঁথিপড়া বিদ্যা যদি জীবনে কাজে না লাগে—সে বিদ্যা কি খানিকটা নিরর্থক হইয়া পড়ে না?

আমরা পুঁথিপড়া বিদ্যার উপরই বেশী জোর দিয়া এতদিন আসিয়াছি, তাহারই বেশী সম্মান করিয়াছি, এবং হাতে-কলমে কিছু শেখা নীচ কার্য্য মনে করিয়াছি; আজ তাই আমরা "সোণা বাইরে আঁচলে গিরে" বাঁধিয়া বসিয়া আছি। বাঙালীর মস্তিষ্ক এখনও উর্ব্বর আছে, এখনও ইচ্ছা করিলে এবং উঠিয়া পড়িয়া লাগিলে নিজের অবস্থার উন্নতি করা বাঙালীর পক্ষে অসম্ভব নয়। শুধু হা-হুতাশ করিয়া, অদৃষ্টের দোষ দিয়া পড়িয়া থাকিলে হইবে না। মানুষ হইতে চাহিলে, জগতের মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে ইচ্ছা করিলে, প্রাণপণ করিয়া খাটিতে হইবে। কোন শারীরীক পরিশ্রমকে হীন ভাবিলে চলিবে না, কোন কু-প্রথাকে পুষিয়া রাখিলে চলিবে না। যাহা করিলে দশের ও দেশের মঙ্গল হয়, তাহা নিজের পক্ষেও নিশ্চয় মঙ্গলকর; সুতরাং কোন দ্বিধা ও সঙ্কোচ না করিয়া তাহা করিতে হইবে। নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলিতে হইবে, আমাদের দৃষ্টিকে ভবিষ্যতের সহিত বাঁধিতে হইবে। বর্ত্তমান আমাদের কেবল কর্ম্মক্ষেত্র, এই কর্ম্মক্ষেত্রে সফলতা লাভ করিলেই আমরা ভবিষ্যতে আমাদের জীবন ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে পারিব।

আমাদের প্রতি জনকে এই কর্ম্মক্ষেত্রে সংগ্রামে নামিতে হইবে। নিজের মুক্তি নিজের হাতে—কেহ কাহাকেও জোর করিয়া সফলতা ও মুক্তি দিতে পারে না। গতানুগতিকের মত চলিতে আমাদের ভুলিতে হইবে। চিন্তাশক্তি দ্বারা আমাদের ভাল-মন্দ বিচার করিয়া জীবনের পথ নির্ণয় করিয়া লইতে হইবে।

কর্ম্মের দ্বারাই মানুষ আপনার পায়ে শিকল বাঁধে, আবার কর্ম্মের দ্বারাই মানুষ মুক্তিলাভ করে। কর্ম্ম না করিয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না—কর্ম্মই জীবন, কর্ম্মের অভাবই মৃত্যু। আমরা যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লই, তাহাও এক কর্ম্ম। জড়-জগৎ, প্রাণী-জগৎ, আকাশ-বাতাস আপন আপন কর্ম্মে নিযুক্ত। কিন্তু এ সকল কর্ম্ম ভাবিয়া ও বুঝিয়া তাহাদের করিতে হয় না। মানুষও কতকগুলি কাজ এইরূপ কলের মত করে। মানুষকে সে-সব ছাড়া অন্য কাজ কবার জন্য ভগবান তাহাকে বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি দিয়াছেন। মানুষকে নিজের বুদ্ধি দ্বারা নিজের জীবন-পথে অগ্রসর হইতে হয়। যে যেমন কর্ম্ম করে সে সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হয়, এ কথাটা অত্যন্ত প্রাচীন কথা এবং অক্ষুণ্ণ সত্য। কর্ম্মের দ্বারা আবার কর্ম্মফলও যে খণ্ডন করা যায়, তাহাও শাস্ত্রে লিখিত আছে এবং জীবনেও অনেকে উপলব্ধি করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় সুকর্ম্মের মাহাত্ম্য এবং কুকর্ম্মের পরিণাম বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন:—"গহনা কর্ম্মণো গতিঃ।" কর্ম্মের গতি অতি জটিল।

বাঁশীর ব্যথা

আজ কবির কথা মনে হ'ল—

"বাঁশী যদি সত্যই বাজিত বেদনায়
ফেটে গিয়ে সঙ্গীত নীরব হ'ত তার।"

বাঁশী বাজে কি বেদনায় তা' সে জানে না—বাজার যন্ত্র, বেশী কিছু জানার দরকার হয় না।

এই যন্ত্র যদি দেহ হয়, তবেই হয় দেবতার কাজ। সে কি সোজা কথা! দেহ-চেতনার এইটুকু ধর্ম্ম তার স্বধর্ম: সে যন্ত্রের কাজ করতে জন্মেছে, অতো জানতে তার অধিকার নেই—তবেই দেহ সিদ্ধ হয়, ভাগবত কর্ম্মের অধিকারী হয়। তাহা তো হয় না; দেহের আবার আত্মাভিমান জন্মায়। দেহ-চেতনায় 'আমি'র মার্কা আছে, সে বাজে আর ভাবে, এ কি বাজা, এ সঙ্গীতের মর্ম্ম কি? অমনি বাঁশী নীরব হয়, তেমন সহজ সুরে আর বাজে না, তেমন মধুর ছন্দে আর জগৎ মাতায় না।

আপনভোলা সুরে যদি বাঁশী বাজাতে পার, তবেই জীবন সার্থক হবে—দিব্য হবে।

আচার্য্য শঙ্কর ও প্রপঞ্চসারতন্ত্র

শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য (সাংখ্যতীর্থ)

কয়েক মাসের পূর্ব্বে দৈবক্রমে কলিকাতায় কোন এক ভদ্রলোকের নিকট পুণা হইতে প্রকাশিত ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের "এনালস্‌" নামক ইংরাজি পত্রিকায় প্রকাশিত "বিষ্ণুস্বামীর ধাঁধা" (Vishnushvamin's Riddle) নামক এক পুনর্মুদ্রিত প্রবন্ধ দেখিতে পাই। উক্ত প্রবন্ধের লেখক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অমরনাথ রায় বি, এ। তিনি উক্ত প্রবন্ধে প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, 'প্রপঞ্চসার' তন্ত্র শঙ্করাচার্য্যের রচিত নহে; উহার রচয়িতা বিষ্ণুস্বামী। এই কথার সমর্থক-রূপে তিনি উক্ত প্রবন্ধে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা অবগত হইয়া এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয় কি বলিয়াছেন, তাহা জানিতে কৌতূহলী হইয়া দেখিলাম যে, শাস্ত্রী মহাশয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি-স্বরূপ ইংরাজি ভাষায় এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। উক্ত প্রবন্ধ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "জুবিলি" উৎসব উপলক্ষ্যে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়—শঙ্করের উপনিষদ্‌-ভাষ্য। উক্ত প্রবন্ধে তিনি প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কতকগুলি উপনিষদ্‌-ভাষ্য, যথা—'কেন', 'শ্বেতাশ্বতর', 'মাণ্ডুক্য', 'তৈত্তিরীয়' ও 'নৃসিংহতাপনী' উপনিষদের ভাষ্য, যাহা শঙ্করের রচিত বলিয়া বিদ্বৎ-সমাজে প্রচলিত, তাহা শঙ্করের রচিত নহে। এমন কি, তিনি আরও বলিয়াছেন যে, "But in all probability, the Mandukya itself was not written before or even at the time of Sankara. (p. p. 104. Sir Ashutosh Mukherjee Silver Jubilee Volume, Sankara's Commentaries on the Upanishads.)" অর্থাৎ শঙ্করের সময়ে মাণ্ডুক্য উপনিষদের অস্তিত্বও ছিল না।

উক্ত প্রবন্ধে তিনি গৌড়পাদের 'আগমশাস্ত্র' নামক পুস্তকে শঙ্করের ভাষ্য সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিবেন বলিয়াছেন; কিন্তু সেই পুস্তকখানি আজ ১০ বৎসরের মধ্যেও প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং এক্ষেত্রে তাঁহার উপনিষদ্‌ভাষ্য সম্বন্ধে মতামতের আলোচনা করিলাম না। যদি কখনও উহা প্রকাশিত হয়, তবে সেই সময়ে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। তিনি উপনিষদ্‌-ভাষ্যের আলোচনাপ্রসঙ্গে 'প্রপঞ্চসার' তন্ত্র সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, "নৃসিংহতাপনী"র ভাষ্যকার প্রপঞ্চসার তন্ত্রের রচয়িতা—একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। কেননা, উক্ত ভাষ্যকার নিজেই বলিয়াছেন যে, আমি প্রপঞ্চসার তন্ত্রে এই বিষয়গুলি বিস্তৃত করিয়া বলিয়াছি।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয় কেবল নৃসিংহতাপনী-ভাষ্যের কতকগুলি অশুদ্ধি প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; পরন্তু ভাষ্যকারের সম্বন্ধে অতি রূঢ় ভাষারও প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, (...Yet in the depth of ignorance in grammar the commentator of the Nrisingha easily takes the first place. For not only he makes mistakes, himself, but he also fails to detect them of others, (p. p. 107 Ibid). অর্থাৎ ভাষ্যকার ব্যাকরণ সম্বন্ধে প্রথম শ্রেণীর মূর্খ। এই কথাটি পড়িবামাত্র মনে হইল, আহা! ভাষ্যকার বাঁচিয়া থাকিলে শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ পড়িয়া মূর্খতা দূর করিতে পারিতেন; অথবা ইহা কি শাস্ত্রী মহাশয়ের অজ্ঞাতসারে গ্রন্থমধ্যে প্রবেশলাভ করিয়াছে, বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, প্রপঞ্চসার যে শঙ্করের রচিত নহে, ইহা প্রমাণ করিবার

উদ্দেশ্যে তিনি কেবলমাত্র যে কতকগুলি ব্যাকরণের ভুল দেখাইয়াছেন, তাহারই আলোচনা করা যাউক।

এখন দেখা যাউক, তাঁহার প্রদর্শিত ভুলগুলি বাস্তবিকই ভুল কি না;—তিনি প্রথম পটলের ২০ শ্লোকে মন্ত্রশব্দের ক্লীবলিঙ্গে প্রয়োগ দেখিয়া **'মন্ত্রাণি'** পদটীকে অশুদ্ধ বলিয়াছেন। এস্থলে জিজ্ঞাস্য—মন্ত্রশব্দের ক্লীবলিঙ্গবিধায়ক অনুশাসন অথবা প্রয়োগ না থাকায় কি 'মন্ত্রাণি' এইরূপ প্রয়োগ অপপ্রয়োগের অন্তর্ভুক্ত হইল? লিঙ্গনির্ণয় যে কেবল অনুশাসনাধীন নহে, ইহা আমরা অনেকস্থলে দেখিতে পাই। অমরকোষে "ক্লীবে ত্রিবিষ্টপম্" এইরূপ থাকা সত্ত্বেও ত্রিবিষ্টপ শব্দ পুংলিঙ্গেও প্রযুক্ত হয়; ইহা অমরকোষের টীকাকার সর্ব্বানন্দ অমরকোষের "সর্ব্বস্বাখ্য" টীকায় বলিয়া গিয়াছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে মহাভাষ্যকারের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া লিঙ্গনির্ণয় যে কেবল অনুশাসনাধীন নহে, লোকব্যবহারাধীনও লিঙ্গনির্ণয় হয়—ইহা স্পষ্টই বলিয়াছেন। *

যদি অনুশাসনাধীন লিঙ্গনির্ণয় হইবে, ইহা শাস্ত্রী মহাশয়ের মত হয়, তবে তাঁহার মতে প্রপঞ্চসার তন্ত্রের ন্যায় বেদব্যাসের বেদান্তসূত্র, শঙ্করের বেদান্তভাষ্য, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীকেও অন্যের রচিত বলিতে হইবে। কেননা, বেদান্তদর্শনে ও তাহার ভাষ্যে ভগবান্ বেদব্যাস ও শঙ্কর এবং মহর্ষি পাণিনি "কুশা" প্রয়োগ করিয়াছেন। § কোষ এবং ব্যাকরণ হইতে জানা যায় যে, "কুশ" শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হয় না। †

যদি প্রয়োগাধীন লিঙ্গনির্ণয় হয়, তবে আমরা 'মন্ত্রাণি" পদের অসাধুতা স্বীকার করিতে পারি না। কারণ 'পরমহংসোপনিষদে'র ৩য় সংখ্যায় এবং এই স্থলের শঙ্করানন্দের 'দীপিকা'নাম্নী টীকায় এবং বহু তন্ত্রে মন্ত্র শব্দের ক্লীবলিঙ্গে ভূরি ভূরি প্রয়োগ দেখা যায় *। সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র রাঘবভট্ট 'শারদাতিলক' তন্ত্রের টীকায় মন্ত্রশব্দ যে নপুংসকলিঙ্গেও প্রযুক্ত হয়, ইহা স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন †। অমরকোষের টীকাকার রঘুনাথ চক্রবর্ত্তীও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। যদি কেবল অনুশাসনাধীন লিঙ্গনির্ণয় হয়, তবে "ওলস্জী ব্রীড়ে" এইরূপ ধাতুপাঠে ব্রীড়া শব্দের পুংলিঙ্গে প্রয়োগ এবং "ব্রীড়াদমুং দেবমদীক্ষ্যমন্যো বিন্যস্তদেহঃ স্বয়মেব কামঃ" এইরূপ কবিপ্রয়োগের সাধুতা থাকে না।

শাস্ত্রী মহাশয় ২য় পটলের প্রথম শ্লোকে **'জনিত্রীং'** পদ দেখিয়া এটাকে ভুল বলিয়াছেন। তাঁহার মতে 'জনয়িত্রীং' প্রয়োগই সাধু, 'জনিত্রীং' প্রয়োগ সাধু নহে। কিন্তু আমরা শব্দচন্দ্রিকা, শব্দরত্নাবলী, বাচস্পত্য প্রভৃতি কোষে "জননী" অর্থে 'জনিত্রী' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। কেবল ইহাই নহে, বেদে এবং নিরুক্তেও "জননী" অর্থে "জনিত্রী" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় §। অন্যান্য কোষের কথা দূরে থাকুক, সামান্য "শব্দসার" অভিধানেও জননীবাচক "জনিত্রী" শব্দ দেখিতে পাই। প্রপঞ্চসার তন্ত্রেও যে "জনিত্রী" শব্দের "জননী" অর্থই গ্রাহ্য, তাহা পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে সেই শ্লোকাংশটী উদ্ধৃত করিতেছি।

"প্রসূতিসময়ে সোঽথ জনিত্রীং ক্লেশয়ন্ মুহুঃ"।

এস্থলে আরও বিশেষ কথা এই যে, "আর্থার এভেলন্" সম্পাদিত প্রপঞ্চসার তন্ত্রে "জননীং" পাঠ আছে, "জনিত্রীং"

* শ্রীযুক্ত গণপতি শাস্ত্রী সম্পাদিত নামলিঙ্গানুশাসন ৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

§ "অতঃ কৃকমিকংসকুম্ভপাত্রকুশাকর্ণীষ্বনব্যয়স্য" (পাণিনি ৮।৩।৪৬)। "হানৌ তুপায়নশব্দশেষত্বাৎ কুশাচ্ছন্দস্তুত্যুপগানবত্তদুক্তম্"। (বেদান্তদর্শন ৩।৩।২৬)

† "দণ্ডমণ্ডথণ্ডশবসৈন্ধবপার্শ্বাকাশকুশকাশাঙ্কুশকুলিশাঃ"—সিদ্ধান্তকৌমুদী। "অস্ত্রী কুশং"—অমরকোষ। "কুশে রামসুতে দর্ভে যোক্ত্রে দ্বীপে কুশং জলে"—বিশ্বকোষ।

* "পূর্ব্বোক্তং যস্য যদ্বীজং তন্মন্ত্রং তস্য নির্ণয়ম্"। কঙ্কালমালিনী তন্ত্র, ৫ম পটল। "দশতত্ত্বযুতং মন্ত্রং তদৈব সহসা ভবেৎ।" কামধেনুতন্ত্র, ১৩ পটল। "পঞ্চদশী মহামন্ত্রং সর্ব্বকামফলপ্রদম্"। কুব্জিকাতন্ত্র ২।১১০। "সদ্যঃফলপ্রদং মন্ত্রং কথিতং ভক্তিতস্তব।"। গৌতমীয় তন্ত্র, ২৭ অধ্যায় "মন্ত্রাণাং পরমং মন্ত্রং মুদ্রিতং মৎসমাখ্যয়া।" নারদপঞ্চরাত্রসার, ৫০ অঃ। (বাহুল্যভয়ে আমরা অধিক বচন উদ্ধৃত করিলাম না।)

† অর্থার এভেলন সম্পাদিত শারদাতিলক ৬৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

§ য ইমে দ্যাবাপৃথিবী জনিত্রী—ঋগ্বেদ ৮।৬।৯।৩ 'যঃ ত্বষ্টা ইমে দ্যাবাপৃথিব্যৌ সর্ব্বেষাং ভূতানাং জনয়িত্র্যৌ'—নিরুক্ত দৈবতকাণ্ড ৮।২।১১ ঋজর্থব্যাখ্যা।

পাঠই নাই। সমালোচনার সময় এই পুস্তকখানিও দেখা উচিত ছিল না কি ?

শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে ১৭শ পটলের ৩০শ শ্লোকে **সঙ্গচ্ছেৎ** পদটী অশুদ্ধ। তাঁহার মতে এখানে গম্ ধাতুর আত্মনেপদ হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু সংস্কৃতজ্ঞ মাত্রেই জানেন যে, সম্+গম্ ধাতু অকর্ম্মক হইলেই আত্মনেপদ হয়; সকর্ম্মক হইলে পরস্মৈপদ হইয়া থাকে *। এস্থলে সম্+গম্ ধাতু সকর্ম্মক। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে সেই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিতেছি।

সুধাময়ীঞ্চ তদ্‌যোনিং নবনীতময়ং স্মরেৎ।

সঙ্গচ্ছেচ্চ শিবজ্বালালীঢ়ং তদ্‌ধুদয়াদিকম্॥

আরও ৩৩শ পটলের ৬২ শ্লোকে 'কামিজ তে' এই স্থলে **'তে'** পদটীকেও অশুদ্ধ বলিয়াছেন। সম্বোধনান্ত শব্দের পরবর্ত্তী যুষ্মদ্ ও অস্মদ্ শব্দের স্থানে ত্বামাদি আদেশ হয় না বটে, কিন্তু বিদ্যমানপূর্ব্ব সম্বোধনান্ত পদের অর্থাৎ সম্বোধনান্ত শব্দের পূর্ব্বে যদি কোন পদ থাকে, তবে উহার পরবর্ত্তী যুষ্মদ্ ও অস্মদ্ শব্দের স্থানে ত্বামাদি আদেশ হইয়া থাকে †। তাহা না হইলে—"উচিতানুচিতং রচয়ামি **দেবি তে**" (সংক্ষিপ্তসারব্যাকরণ, সুবন্তপাদ) "মা মে বুদ্ধিবিরুদ্ধা ভবতু ন চ মনো **দেবি মে** যাতু পাপম্" (তন্ত্রসার সরস্বতীস্তোত্র) ইত্যাদি প্রয়োগের সাধুতা থাকে না। এস্থলেও বিদ্যমানপূর্ব্ব সম্বোধনান্ত পদের পরবর্ত্তী যুষ্মদ্ শব্দের স্থানে 'তে' আদেশ হইয়াছে। পাঠকগণ প্রপঞ্চসারের সেই শ্লোকটী দেখিলে বুঝিতে পারিবেন।

শাস্ত্রী মহাশয় ৭ম পটলের ৬৪।৬৫ শ্লোকে **"লোণ"** শব্দটীকে প্রাকৃত বলিয়াছেন। কিন্তু আমরা সংস্কৃত-সাহিত্যে

* "সমোঽকর্ম্মগমাদেঃ"—সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ, ২।১২৩ সূত্র

† "সপূর্ব্বাত্তু স্বারেব"—সংক্ষিপ্তসারব্যাকরণ, সুবন্তপাদ ৩৮০ সূত্র

সংস্কৃতরূপে লোণ শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই এবং ইহা ব্যাকরণসিদ্ধও বটে। "কুর্য্যাল্লোণঘৃতোন্নতিং" (সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ, গোয়ীচন্দ্র টীকা, সন্ধিপাদ) এইরূপ কবিপ্রয়োগও আছে। লূঞ্ ধাতুর উত্তর 'ইণাদের্নঃ' এই সূত্রে ন প্রত্যয় করিয়া এবং বাহুল্যবশতঃ গুণ ও ণত্ব করিয়া লোণশব্দটী নিষ্পন্ন হয়*। তন্ত্রেও বহুস্থলে লোণশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। তন্ত্রশাস্ত্রে নিজস্ব কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ বা বৈশিষ্ট্য যে আছে, ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শুধু তন্ত্র কেন, ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যেক প্রস্থানেই এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। আমাদের বোধ হয়, তান্ত্রিকশিরোমণি ভগবান্ শঙ্কর স্বকৃত তন্ত্রে লোণশব্দের প্রয়োগ করিয়া তন্ত্রপ্রস্থানের বৈশিষ্ট্যই রক্ষা করিয়াছেন। আমরা দৃষ্টান্তরূপে নিম্নে কতকগুলি তন্ত্রবচন উদ্ধৃত করিতেছি :—

'তং দগ্ধ্বা নয় মে শীঘ্রমগ্রে **লোণস্য** তেজসা'।

—শারদা ২২।৯৪

অভিচারকরী চেতি **লোণ**মন্ত্রস্য শক্তয়ঃ।

লোকেশৈর্**লোণ**মন্ত্রস্য বিধানমিতি কীর্ত্তিতম্।

— রাঘবভট্টধৃত-শ্রীরামকণ্ঠবচনম্

নিত্যং শুদ্ধেন **লোণেন** হুত্বা শত্রূন্ বশং নয়েৎ।

—শারদা ২২।১২০

তন্ত্রে লবণমন্ত্র-প্রয়োগে লবণ শব্দ ও লোণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই লবণ মন্ত্রটী "লোণমন্ত্র" নামেও তন্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। সুতরাং এস্থলে লোণ শব্দ ব্যবহারে কোন দোষ হয় বলিয়া মনে হয় না।

* কিঞ্চ লূঞ্ ধাতোরিণাদেরিতি ন প্রত্যয়ে কৃতে বাহুল্যাৎ গুণে ণত্বে চ কৃতে বেণাদিবৎ লোণ ইতি। (সংক্ষিপ্তসারব্যাকরণের অভিরাম বিদ্যালঙ্কার-কৃত সন্ধিটিপ্পণী, মঙ্গলবাদ)

(আগামীবারে সমাপ্য)

ধর্ম্মের কুসংস্কার

ঘরে বসন্ত-রোগী—পত্নী মন্দিরে করুণা-ভিক্ষা করিতেছে

পশ্চাতে যে আত্মা আছে তাহাকেই জাগ্রত করা।

সর্ব্ব-জীবের মধ্যে এই একই অন্তর্য্যামীকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদের মধ্যে প্রেম ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করাই ধর্ম্মের লক্ষ্য।

কিন্তু ধর্ম্মের কু-সংস্কারে আমরা যেন আচ্ছন্ন না হই—

বসন্ত হয়,

ওলাউঠায় রোগী ছট্‌ফট্ করে—

দেবতার অনুগ্রহে বা অভিশাপে নয়—

—রোগে।

রোগ হয় অনিয়মে—

—দেহের প্রতি অত্যাচারে—

ও

মনে হিংসা ও বিদ্বেষ রাখিলে।

রোগের প্রতিকার—

সর্ব্বপ্রথমে ঔষধ ও

পথ্যের ব্যবস্থা।

ধর্ম্ম কি?

মানুষ দেহ নয়, মন নয়।

ধর্ম্ম, তাহার দেহ ও মনের

তার পর—

শরীরযাত্রায় শৃঙ্খলা ও

সর্ব্বজনহিতে মনকে উদ্যত করিয়া রাখা।

৮। কামনার পূজা

ধর্ম্ম বাসনা-কামনারও পূর্ত্তি দেয় না,
রোগ যখন আরাম হয়,
উহা ঔষধ ও পথ্যে
— অথবা —
দেহের জীবনীশক্তির প্রভাবে।
ইহার জন্য দেবতার কাছে

ছাগবলি দিতে হয় না—
বিবিধ উপচারে ঢাক-ঢোল পিটিয়া
দেবতার মন্দিরে পূজা দিবারও প্রয়োজন নাই।
দেবতার পূজা ও আরাধনা—
জ্ঞান-ভক্তি-প্রেম-লাভের জন্যই,
এ কথা যেন আমরা মনে রাখি।

ক্ষেতের শস্য ও ফল,
উপার্জ্জনের কড়ি---
ঠাকুর এসব গ্রহণ করেন না।
ঠাকুর আত্মারাম, অনন্ত
ঐশ্বর্য্যময়।
এ সকল নেয় মানুষ।
যদি দিতে হয়,
মানুষকেই দিও।
ঠাকুরের নামে নিজেও
বঞ্চিত হইও না
অন্যকেও ভণ্ডামী করিতে
শিখাইও না।

ভোগাঞ্জলী গ্রহণ করে মানুষ—দেবতা নয়

পুণ্য হয়-মনের ময়লা দূর
করিলে—
গায়ের ময়লা দূর হয়
স্নানে,
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায়।
পালে-পার্ব্বণে নদীস্নানের উৎসব
স্বাস্থ্যরক্ষার সঙ্কেত।
গঙ্গাস্নানে যদি মনের ময়লা
ছুটিত, গঙ্গাতীরবাসী
সকলেই হইত ধার্ম্মিক।
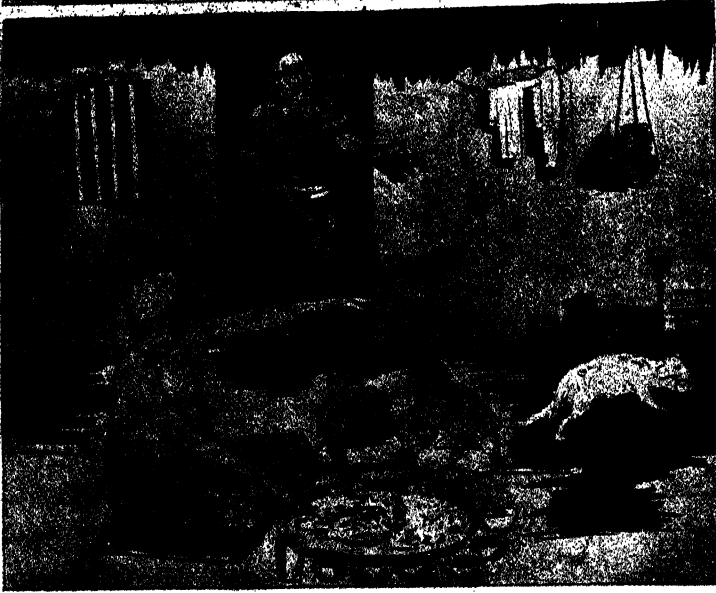
ঠাকুরের নামে—
বলির পাঁঠা,
গরুর দুধ,
পুকুরের মাছ,

ধর্ম্মের নামে যাহা সত্য নহে, তাহা মনে রাখা
ধর্ম্মকেই আড়াল দিয়া চলা।
স্নান করিও গায়ের ময়লা ছাড়াইতে—
ধর্ম্ম হয় বলিয়া প্রবঞ্চিত হইও না।

দায়ের ধর্ম্মে ভণ্ডামীই প্রশ্রয় পায়

সন্ন্যাসী যে,
ব্রাহ্মণ যে,
ধার্ম্মিক যে,
তাহারা ভগবানের সঙ্কেত দেয়।
তাহাদের পূজা কর, সেবা কর, ভক্তি কর।
তাদের আদর্শ তোমায় অনুপ্রাণিত করুক।
তাহাদের ভোগ যোগাইও না।
তাহাদের কাছে মাদুলী-ভিক্ষা করিও না।
দায়োদ্ধারের জন্য ব্রাহ্মণের দুয়ার ধরিও না।
যে ভগবানের সঙ্কেত দেয় না—
সে শ্রদ্ধার পাত্র নয়।
ধর্ম্মের নামে ঘুষ দিতে যাওয়ায়—
ভণ্ডামী করা ও ভণ্ডামী শেখান
দুই-ই হয়।

ললিত-কলায় আমাদের স্থান

শ্রীপ্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়

সৌন্দর্য্য-বোধশক্তি ও সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি মানুষের মন ও চিন্তা জগতের সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতম অনুভূতি। যেদিন হইতে মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেইদিন হইতে দিন দিন নূতন অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনের মধ্য দিয়া এই গুণটীকে সে নিজস্ব সম্পত্তি করিয়া লইয়া, পুরুষানুক্রমে ইহার তপস্যায় কাল কাটাইয়া একদিন রূপদক্ষ হইতে পারিয়াছে। সামান্য দু'একটী উদাহরণের মধ্য দিয়া তাহার অনুশীলনগুলি দেখিলে দেখিতে পাইব—একদিন অতি প্রয়োজনে বয়ন-শিল্পের আশ্রয় লইয়া ধীরে ধীরে যখন বস্ত্র সুলভ হইয়া আসিয়াছে, তখন ভাবিয়াছে ইহার উপর কারুকার্য্য করিলে ভাল হয়। গৃহ-শিল্প, অস্ত্র-শিল্প, এ সমস্তই তাহাকে আদিম যুগ হইতে প্রেরণা দিয়া বর্ত্তমানে এতখানি গুণ-সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে।

কাজেই আমরা বুঝিতে পারিতেছি, শিল্প বা ললিত কলা মানুষের সহজ-সুলভ বৃত্তি হইলেও ইহার চর্চ্চার মূলে ছিল বিবিধ প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজনই তাহার সাধনার ধারাবাহিক ইতিহাস।

যাহা হউক, প্রয়োজন বা জীবন-ধারণের জন্য যে শিল্প তাহার মূলে সূক্ষ্ম অনুভূতি, সৌন্দর্য্যের বিচার-শক্তি যতই প্রখর থাকুক, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি তাহাকে অন্য পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া—Fine arts বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহারই সম্বন্ধে সামান্য দু'একটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ললিত কলা মানুষের সূক্ষ্মতম অনুভূতি ও অপার সৌন্দর্য্য-বোধশক্তির সম্পূর্ণতম ফল। এই অনুভূতি-সম্পন্ন রস যথাক্রমে কাব্যসৃষ্টি, চিত্র-কলা ও সঙ্গীতে পর্য্যবসিত অবস্থায় আমরা দেখিতে পাই। যে রসপ্রেরণায় শিল্পী চিত্র রচনা করিয়া আত্মহারা হইলেন, ঠিক সেই রসই কবি-সৃষ্ট মহাকাব্য অপরূপ মণিমাণিক্যে খচিত করিয়াছে; আবার সেই রসই গায়কের সুললিত কণ্ঠকাকলিতে মানুষ হইতে ইতর প্রাণীকেও ঘরের বাহির করিয়া আনে। ভিন্ন প্রয়োগে ভিন্নরূপ ধারণ করিলেও, ইহার পার্থক্য কিছুই নাই।

ভারতের আদিম ইতিহাস নাই। পুরাকালকে বাদ দিলেও, এদেশে মুসলমান আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কেহই ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। অথচ সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সে সময়েও ভারত কি সভ্যতায়, কি জ্ঞানে, কি শিল্পে সব দিক্ দিয়া সর্ব্বপ্রকারে অগ্রণী ছিল।

অতীতের যে সামান্য ইতিহাস আমরা পাই, তাহা ভারতের স্থাপত্যকলা ও সামান্য কিছু তাম্রশাসন ও লিপি হইতে। আর্য্য-ভারতের শিল্পকলা, ভাস্কর্য্য ও গুহা প্রভৃতির গাত্র-চিত্র (Fresco) একদিন ধর্ম্ম-প্রচার-কল্পেই রচিত হইয়াছিল। সমগ্র পর্ব্বত বেষ্টন করিয়া, তাহারই গাত্র কাটিয়া সুরম্য গুহা-নির্ম্মাণ এবং প্রত্যেকটি কারুকার্য্য অজানা কোন্ সাধক-শিল্পীর নিপুণ হস্তের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, তাহা অনুমান করা একান্ত দুরূহ। শুধু এইটুকু অনুমান করা যায়, যে ইহার পশ্চাতে ছিল রাজার আদেশ ও বিপুল অর্থ। রাজা-রাজ্ড়াদের পশ্চাতে ছিল ধর্ম্ম। ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যে চরম উন্নতি বৌদ্ধ ভারতেই সম্ভব হইয়াছিল। বৌদ্ধ সম্রাট্গণের মধ্যে মহারাজ অশোক ও কনিষ্কই উল্লেখযোগ্য। ইলোরা, অজন্তা এবং বাঘ-গুহা প্রভৃতি পর্ব্বত-খোদিত দেবালয় কিম্বা বৌদ্ধ ভিক্ষু-গণের বিহারগুলিকে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়, কেমন করিয়া কোন্ অস্ত্রের সাহায্যে এবং কোন্ অদ্ভুত কৌশলে এই পর্ব্বতকে কাটিয়া কাটিয়া ইন্দ্রপুরী রচিত হইয়াছিল! যে সব বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনীয়ারগণ ইহার সহায়তা করিয়া পথ-প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কতখানি উচ্চ-শিক্ষিত পণ্ডিত-মণ্ডলী! যে সব শিল্পী ইহার গাত্রে দুরূহ খোদাই-কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মার্জ্জিত রসবোধ কত উচ্চ স্তরের! এই সব কারুকার্য্য কিম্বা বিহারগুলির খোদাই মূর্ত্তি প্রভৃতি প্রায় সবই symmetrical.

অন্তরের একান্ত কামনা—সাম্য ও মৈত্রী মানিয়া চলা—যাহা চক্ষুর পীড়াদায়ক, যাহাতে সহজ ও সরল চিন্তাস্রোতঃ প্রতিহত হয় তাহাকে এড়াইয়া চলা। সমতা বজায় রাখিতে গিয়া মানুষ symmetrical-এর আবর্ত্তে জড়াইয়া পড়িয়াছে! দালানের থামগুলি একটা গোল, একটী চৌকোণা, এরূপ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। গেটের দুই পার্শ্বে—একস্থানে পাতা-বাহার, অপর স্থানে পামগাছ লাগাই না। আমাদের সাধারণ বসবাসে এই সব দেখিতে পাই; কিন্তু যেখানে বাটালী চালাইয়া বিরাট্ পাথরের জড়পিণ্ডকে রূপ দিতে হয় এবং প্রত্যেক ইঞ্চি ও তদপেক্ষা সূক্ষ্ম ভাগ ও বিভাগকে বজায় রাখিয়া symmetrical ধর্ম্ম পালন করা তাহা যে কত সুকঠিন তাহা সহজেই অনুমেয়।

এই সব স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যই অতীত ভারতের কাহিনী যাহা কিছু সহজলভ্য করিয়াছে। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পতনাবস্থায় হিন্দু-ধর্ম্ম এবং তথাকথিত তান্ত্রিকতা প্রসার লাভ করে এবং ইহারই ফলে, বহু হিন্দু-মন্দির ও দেবদেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। এগুলিও সৌন্দর্য্য-হিসাবে অনুপম, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙলায় এক উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে কোন কোন স্থান ছাড়া আর কোথাও বিশেষ হিন্দু ভারতের স্থাপত্য বা ভাস্কর্য্যের নিদর্শন পাওয়া যায় না। বাঙলার এই সব স্থাপত্য ও কলা-শিল্পগুলি সর্ব্বাংশে পশ্চিম ভারতীয় শিল্পিগণের অনুরূপই; কাজেই এই সব শিল্পী বাঙলার নিজস্ব কিম্বা দেশের রাজারা তাঁহাদিগকে বাঙলায় লইয়া আসিয়াছিলেন তাহার কোনই প্রমাণ নাই।

School of Oriental art বলিতে আমাদের পূর্ব্বপ্রচলিত ধারাকে বুঝায়। প্রত্যেক জাতির একটা নিজস্ব পরিচ্ছদ যেমন তাহার দেশ ও ধর্ম্মের পরিচয় দেয়, তেমনই প্রত্যেক জাতির শিল্পকলা সেই জাতির গোত্র-কুলের পরিচয় দিয়া থাকে। জাপানী আর্ট পৃথিবীর আজ কোন জাতির আর্টের সহিত ভুল হয় না। তাহার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য এমনি প্রখর, যে দেখিলেই সেই প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম কূলের ক্ষুদ্র দ্বীপটিকে মনে পড়ে! ঠিক সেইরূপ ভারতীয়-শিল্প বা তথাকথিত Oriental art হিন্দুর ধর্ম্ম-রাষ্ট্র-শিক্ষার চাবীকাঠি বলিতে পারা যায়। হিন্দুর শিল্পের প্রধানতম অবলম্বন হইতেছে—ভাব। এই ভাব বলিতে আমরা এমন কিছু কল্পনা করিব না, যাহা ভাবিতে দুশ্চিন্তায় বিড়ম্বিত হইতে হইবে। সরল ও সহজ মনের রসানুভূতিই এই ভাব ছাড়া আর কিছু নয়। কনক-চাঁপার ন্যায় অঙ্গুলী সচরাচর দৃষ্ট হয় না বটে; কিন্তু এমন অনেক সুশ্রী-সম্পন্ন অঙ্গুলী দেখা যায়, যাহা কতকটা ঐ ধরণেরই। মৃণালের ন্যায় বাহুলতা সম্ভব না হইলেও, নিটোল বাহুর কল্পনাও কম মধুর নয়। পদ্মপলাশলোচন অস্বাভাবিক হইলেও, অপরাপর সৌন্দর্য্য-সমাবেশে তাহার কল্পনা বা প্রয়োগ বেমানান দেখায় না; বরং hard anatomical কোন figure-এ সহসা পদ্মপলাশলোচনের আবির্ভাব দেখিলে কাকের ময়ূর-পুচ্ছের মতই মনে হইবে। প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বিচ্যুত করিয়া লইয়া, সেই সম্বন্ধে মানুষের সূক্ষ্মানুভূতির চরম কল্পনা (finest conception) কি হইতে পারে, তাহারই অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা প্রত্যেকটির symbol টানিয়া বাহির করিয়াছি—যেমন তিল-ফুল-নাসা, পদ্মপলাশ-চক্ষু, মরাল-গ্রীবা, চম্পক-অঙ্গুলী প্রভৃতি। ইহা কবির কল্পনা এবং ইহাই কাব্য। মহাকাব্যের নায়ক যেমন সর্ব্ববিষয়ে পরিপুষ্ট ও গুণ-সম্পন্ন; তাহার শৌর্য্য বীর্য্যের কাছে, তাহার রূপ ঐশ্বর্য্যের কাছে যেন আর কিছুরই তুলনা হয় না—সে যেরূপ নিখুঁৎ আদর্শ, ঠিক শিল্পীর সৃষ্ট বস্তু সেইরূপ সর্ব্ববিষয়ে অতুলনীয়। ভারতবর্ষ তাহার শিল্প-জ্ঞানকে চিরদিনই আতিশয্যের প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছে—সে দেখিতে চাহিয়াছে, বাহির হইতে ভিতরের দিকটা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। সে আত্মবিকাশের সহজ পন্থা খুঁজিতে গিয়া কয়েকটা নিজস্ব ধারা স্থির করিয়া লইয়াছে। ইহাকে mode of application বলিলে বুঝিবার সুবিধা হইবে। উদাহরণ-স্বরূপ ধরা যাউক, পদ্ম ফুল। ভারতীয় চিত্র-শিল্পে কি ভাস্কর্য্যে, পদ্মফুলের বাহুল্য আমরা সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। কিন্তু এই পদ্মফুলকে আমরা সাধারণ পদ্মফুল যে ভাবে ফুটিয়া থাকে সে ভাবে খুব কম স্থানেই দেখিতে পাই। আমরা দেখিতে পাই, বৃহৎ গোলাকৃতি অবস্থায় তাহার পাপড়ি ও উপপাপড়িগুলি বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। এই ধরণের

সমতল (flat) পদ্ম আল্পনায়, পাথর খোদাই কিম্বা মাটীর গাত্রে চিত্রিত অবস্থায় দেখা যায়। এখন কথা হইতে পারে, পদ্ম-ফুলকে এই বিচিত্র ভাবে প্রকাশ করিবার কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। ইহার উত্তরে সহজ কথায় মাত্র এইটুকু বলা যায়, symmetrical decoration বজায় রাখিতে হইলে এই প্রণালী যত সুদৃশ্য এমন আর কিছুই নহে। কারণ, প্রকৃতিগত বস্তুর তার Photographic reproduction-এ rhyme নাই। উহা কঠিন বাস্তব। সাধারণ গলার স্বর ও তাল-লয়-সংযুক্ত সঙ্গীতে যে পার্থক্য, ইহাতেও ঠিক তাই। ইহা ছাড়া শিল্পী অন্তর দিয়া অনুভব করিলেন: ফুল যখন আঁকিলাম, তখন উহা কেমন করিয়া কত angle বা degree-তে হেলিয়া থাকে—Perspective-এ তাহার কোন অংশটুকু vanish হইয়া কতটুকু দেখা যায়—কোন অবস্থায় কোথায় দাঁড়াইয়া দেখিলে কেমন দেখায়—এ সব ভাবিয়া ব্যাকরণের সম্মান বজায় রাখিবার কোনই প্রয়োজন নাই—ফুল চাহিয়াছে তাহার দলগুলি সূর্য্য-কিরণে বিকসিত হইয়া যত দূর সম্ভব ছড়াইয়া পড়ুক—এইটুকুই তাহার প্রাণের গোপন কামনা—কাজেই শিল্পী আঁকিলেন তেমন এক পদ্ম—যে পদ্ম আমরা আল্পনায় ও অতীত ভাস্কর্য্যের নিদর্শনে দেখিতে পাই। ভারতীয় শিল্পের সর্ব্বত্রই এই একই নিয়ম পালিত হইয়াছে। বাস্তব জগৎ হইতে আধ্যাত্মিক জগতে তাহার টান বেশী; তাই সে যাহা কিছু করিতে গিয়াছে তাহাতেই আসিয়াছে প্রচণ্ড ভাবপ্রবণতা। তাহার সমস্ত কর্ম্মের অন্তরালে মোক্ষ-লাভের বাসনা লুকাইয়া রহিয়াছে।

বর্ত্তমানে অনেককে ভারতীয় চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য দেখিয়া বলিতে শুনিয়াছি, কিছুই "বুঝিতে পারিলাম না", এবং দৈব-দুর্ব্বিপাকে অনেক সময়ে অনেকের জেরায় পড়িয়াছি। তাঁহারা সহসা প্রশ্ন করিয়া বসেন—"বলিতে পারেন, আপনাদের এই art-টি কি? এমন লম্বা লম্বা আঙ্গুল মানুষের হয় নাকি?" আমি নিজে ভারতীয় পন্থায় শিল্প-সেবা করি না; কাজেই এ সম্বন্ধে কিছুই জানি না বলিলেই হয়—তথাপি এই সকল প্রশ্নে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারি না। আমার চোখে ভাল লাগে না বা আমি ইহার কিছুই বুঝিলাম না বলিয়া উহা কিছু নয় বা উহাতে কিছু নাই, এরূপ দুঃসাহসিক ধারণা করা যে কত বড় ভুল, সুধীজন সহজেই বুঝিতে পারেন। বহু কাল হইল—সে অতীত গৌরবময় যুগ ঘোর অন্ধকারে হারাইয়া গিয়াছে। সে শিক্ষা নাই, সে চর্চ্চা নাই—এ যেন বংশানুক্রমে আমরা মানুষের যোগ-সূত্র বজায় রাখিলেও জাতি হারাইয়াছি! তাই নিজের ভাষা যখন নিজের কাণে আসিয়া বাজে, তখন তাহার অর্থ বুঝি না; তখন প্রয়োজন হয় দোভাষিকের। ভারতীয় শিল্প-কলার ভাষা আমরা কোনদিনই বুঝিতে চেষ্টা করি নাই। অজন্তা প্রভৃতি শিল্প-সম্বন্ধীয় যতগুলি বহুমূল্য পুস্তক পাওয়া যায়, সেগুলি প্রায়ই হয় ফরাসীদেশীয় কিম্বা জার্ম্মাণীর। বিদেশীরা অনাদৃতা বীণাপাণিকে নিজের ঘরে মাথায় তুলিয়া বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় আই, সি এস, মহোদয়ের "পথে প্রবাসের" সুচিন্তিত প্রবন্ধের একটি কথা এ স্থলে আমি উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। রায় মহাশয়ের হুবহু কথাটি ঠিক বলিতে না পারিলেও, একস্থানে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার ভাবার্থ এই—ইংলণ্ড ছিল গরীব—তাই সে লক্ষ্মীর পূজা করিয়া বিশ্ব হইতে ধন-রত্ন আনিয়া ঘর ভরাইল; কিন্তু ফরাসী সংগ্রহ করিল বিশ্বের যত মহাকাব্য, শিল্প ও শিক্ষা।

কথাটা যেমন খাঁটী, তেমনই দামী। জাতিকে বড় হইতে হইলে, শুধু এক বিষয়ে ওস্তাদ হইলে ত চলিবে না, সে যেমন লক্ষ্মীর কৃপা-পাত্র হইবে, তেমনি সরস্বতীর বরপুত্র হইবে। কোন জিনিষকে কোনদিনই গুরুত্বের ভিতর দিয়া না দেখিয়া আমরা এমনি এক হাল্কা মনোবৃত্তির অধিকারী হইয়া বসিয়াছি, যে কোন জিনিষ বুঝি না বলিয়া, বুঝিবার কষ্টটুকু পর্য্যন্ত করিব না!

বর্ত্তমানে বাঙলার নিজস্ব শিল্পকলা কিছুই নাই বলিলেই হয়। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষিগণের আপ্রাণ চেষ্টায় অতীত ভারতের লুপ্ত চিত্র-শিল্পের চর্চ্চা কিছু পরিমাণে সচল হইলেও, তাহাতে বিস্তর আগাছা ইতিমধ্যে জন্মাইতে সুরু করিয়া দিয়াছে; ফলে oriental art বলিতে লোকের চিত্ত-প্রীতি অপেক্ষা

চিত্ত-পীড়া অধিক হইয়া উঠে। ইহার একমাত্র কারণ—অপটু শিল্পীর অজ্ঞতা ও দেশবাসীর বিচারবুদ্ধিহীনতা, অধুনা দেশীয় মাসিকপত্রিকাগুলি শিল্পীর merit-এর বিচারকেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। দেশের লোক ভাবেন, কাগজে যখন ছাপা হইয়াছে তখন নিশ্চয়ই কিছু মহামূল্য বস্তু হইবে। অবশ্য ভাল চিত্র যে মুদ্রিত হয় না, এরূপ নয়; তবে তার সংখ্যা খুবই কম। এমনই বিবিধ আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া কোন দিক্ দিয়া কিছুই সম্ভবপর হয় না। এ সমস্তই নিজেদের অজ্ঞতার একমাত্র ফল। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের দেশীয় পটুয়াদের হাতের যে সমস্ত মূর্ত্তি বা পট-চিত্র দেখিতে পাই, তাহাতে চিত্রের অনেক ধারা বিদ্যমান আছে দেখা যায়, যেমন রামায়ণের ছবিতে কিম্বা মহাভারতের পাত্র পাত্রীর গাত্রে মোগলাই সাজ-পোষাক ও পায়জামা, শুধু তাহাই নহে—কিছুদিন পূর্ব্বে যাত্রার সাজ-পোষাক মুসলমানী কায়দায় কল্পিত হইত।

রাজাধিপত্য কাটান খুবই সুকঠিন ব্যাপার, কাজেই হিন্দুর শ্রীকৃষ্ণ ভেলভেটের জামা পরিলেও কেহ তাহা অশোভন বোধ করেন নাই। আজ আমাদের সহসা তন্দ্রা ছুটিয়া গিয়াছে—আজ বুঝিতে শিখিয়াছি, হিন্দুর শ্রীকৃষ্ণকে দোলা ও পায়জামা পরাইয়া বাদশা না সাজাইয়া, নিটোল বিশাল বক্ষে শুধু গজমতি হার দোলাইয়া দিব—কর্ণে কুণ্ডল, হাতে বলয়, কোমরে কাঞ্চীদাম ও পীতবসনে সাজাইয়া চোখ বুজিয়া কল্পনা করিব—

মথুরার শ্রীকৃষ্ণ কি এমনই ছিলেন?

সে কথা যাউক—

এ দেশের মোগল রাজত্বে মোগল art, রাজপুত art প্রভৃতির স্রোতঃ বহিয়াছিল। বর্ত্তমানে European art সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়াছে। European art বলিতে আমরা তাহার প্রণালী বা Technique ধরিয়া লইব। কোন শ্রেণীর art ভাল বা মন্দ তাহা বিচার করা খুবই সুকঠিন। প্রয়োজন হিসাবে প্রত্যেকেরই এক একটা বিশিষ্ট মূল্য আছে। বর্ত্তমানে মানুষের চিন্তা-ধারা আবার ভিন্ন পথের সন্ধান করিয়া ultra-modern বিবিধ Technique ও Cubism Impressionism প্রভৃতির উপাসনা করিতেছে। দুর্জ্ঞেয়কে জানিবার দুর্নিবার প্রলোভন মানুষের অন্তরে চিরদিন বাঁচিয়া থাকে; তাই আজ সে চায় এমন একটা কিছু সৃষ্টি করিতে, যাহা সহজে ধরা দিবে না অথচ তাহাতে বক্তব্য অনেক কিছু থাকিবে।

এই অতি আধুনিক art-এর পরিণতি দেখিয়া মনে হয়, হয়ত মানুষ আবার পৌরাণিক যুগের ভাবপ্রবণতার অসীম সমুদ্রে গা ভাসাইয়া দিবে এবং একদিন বলিবে, হুবহু যাহা আঁক বা copy কর উহা Photography-র নামান্তর মাত্র—তাহা art নহে!

কবি-পরিচয়

শ্রীকৌশিকনন্দন ঠাকুর

'বিদায়-বাণী' গাইতে হবে,
'চিরন্তনীর' সুরে।
'শেষ প্রশ্ন' আস্‌বে সবে
অনেক দিনের পরে॥
'গৃহদাহীর' চোখের জল,
'মন্ত্রশক্তির' দৈব-বল,
'যোগাযোগে' সবই বিফল
ঘটিয়ে দেবে মেরে॥

এত সাধের 'সোণার খাঁচার'—
ছাড়্‌তে হবে মায়া—
'দেশের ডাক' আর 'পথের দাবী'
সবই তখন ভুয়া,—
'আনন্দমঠের' 'স্পর্শমণি'
'দীপনির্ব্বাণ' করান যিনি,
'শেষ খেয়াতে' তাঁর চরণে
যাবই 'পরপারে'॥

স্বদেশীযুগের প্রবর্ত্তক"

৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

শ্রীমতিলাল রায়

বাঙ্গালায় নূতন যুগের সূত্রপাত হইয়াছে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে—যদি বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের গৌরব-যুগ কোনদিন আসে, তবে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতেই বাঙ্গালীজাতিকে নূতন করিয়া বৎসর গণনা করিতে হইবে। এই ৩০ বৎসরকাল বাঙ্গালার জাগরণ-যুগ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

নবযুগের প্রথম প্রভাতে যে সকল ঋষির কণ্ঠে দেশ-বন্দনার ঋক্-ধ্বনি উঠিয়াছিল,—পরলোকগত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ তাঁহাদের অন্যতম। সুরেন্দ্রনাথ আপনার মনীষা এবং বাগ্মিতায় বাঙ্গালায় মহাযজ্ঞের আগুন যেমন সে-দিন জ্বালাইয়া রাখিতেন, দেশপ্রেমিক কাব্য-বিশারদ তেমনই স্বদেশ-যজ্ঞের একজন প্রধান উদ্গাতা ছিলেন।

পণ্ডিত ৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

স্বদেশজননীর সেবা তাঁর মুখের কথামাত্র নহে—প্রাণডালি দিয়াই তিনি তাহা সার্থক করিয়াছেন। বাঙ্গালীজাতি যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, কাব্যবিশারদের স্মৃতি ততদিন তাহাদের অন্তরে জাগরূক থাকিবে।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে আমাদের কোন এক কর্ম্মানুষ্ঠানে লইয়া আসা হইয়াছিল, সেই সময়ে তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ ঘটে। সেইদিন বুঝিয়াছিলাম, শুধু তাঁর জ্বালাময়ী লেখনী দিয়াই স্বদেশপ্রেমের অগ্নিবর্ষণ হয় না, তাঁর সঙ্গীতের অমৃতঝরণায় হৃদয় অভিষিক্ত হয় না, এবং নূতন প্রাণ জাগে না, তাঁর প্রতি কথায় ভাবভঙ্গীতে জননী জন্মভূমির প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও প্রত্যয় জাগাইয়া দেয়। সেই সৌম্যমূর্ত্তি মহাপ্রাণ কাব্যবিশারদের পূতমূর্ত্তি এখনও ভুলিতে পারি নাই—সে স্মৃতি বুঝি ভুলিবার নয়।

দেশের দুর্ভাগ্য, এমন মহাব্রতচারী মাতৃপ্রেমোন্মাদ দেশচারণকে আমরা অধিকদিন রক্ষা করিতে পারি নাই। দেশের ডাকে তাঁর আত্মাই জাগিয়া উঠিয়াছিল, তিনি স্বাস্থ্যরক্ষায় উদাসীন ছিলেন। স্বাস্থ্যের কথা তাঁহাকে বলিলে তিনি সগৌরবে উত্তর দিতেন,—দেশের জন্য যদি প্রাণবিসর্জ্জন করি, যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত বীরের মত এই সান্ত্বনাই পাইব,—"দেশের জন্য আমি প্রাণ দিলাম।" তাই তাঁর কণ্ঠে বড় মধুর এই সঙ্গীতের রোল উঠিয়াছিল,—

> "যায় যেন জীবন চলে
> জগৎমাঝে তোমার কাজে
> 'বন্দেমাতরম্' বলে'।"

কাব্যবিশারদের এই বাণী তাঁর জীবনে ব্যর্থ হয় নাই। স্বদেশীযুগের আগুন যখন ধু-ধু করিয়া জ্বলিয়াছে, সেই সময়ে অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের ন্যায় দেশময় এই দুঃসংবাদ ছড়াইয়া পড়িল—কাব্যবিশারদ আর নাই। তিনি স্বদেশীযুগের প্রবর্ত্তক, প্রচার-ভার ভবিষ্যজাতির হস্তে ন্যস্ত করিয়া চিরদিনের জন্য প্রস্থান করিয়াছেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। বাঙ্গালী সে-দিন স্বপ্নচক্ষুতে দেখিয়াছিল,—প্রশান্ত সমুদ্রবক্ষে, ঊর্দ্ধে অনন্ত নীলিমা, স্বাধীনতার সমীরণ বহিতেছে কেশরীগর্জ্জনে, এই মুক্তি-রঙ্গে কাব্যবিশারদ আপনাকে নিঃশেষে বিলাইয়া বাঙ্গালীকে অন্তিম-সঙ্গীত শুনাইতেছেন,—

> "তোমার মহিমা গাব ওগো বঙ্গভূমি!
> লাঞ্ছিত তোমার নাম
> দেখে তবু চলিলাম
> এ দীর্ঘ জীবন বৃথা দেখিলেও তুমি।
> এ দুঃখ রহিল মনে,
> তোমার সন্তানগণে
> না দেখিয়া সমাদৃত; শমন-সদনে
> যেতে হ'ল, মনসাধ রহিল মা মনে।"

শেষ নিঃশ্বাসে এই মহাসঙ্গীতের মূর্চ্ছনা আকাশে-বাতাসে ভাসিয়া বাঙ্গালীকে সেদিন কাঁদাইয়াছিল, বড় ব্যথায় এই মহানেতার অন্তর্দ্ধানে বাঙ্গালী শোকবিগলিতচিত্তে স্বদেশী-ব্রত-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। তাঁর বড় সাধের "হিতবাদী" তাঁ'র পুণ্যস্মৃতি এখনও বহন করে। "নবযুগ-প্রবর্ত্তক" কাব্যবিশারদের মন্ত্র সিদ্ধ করিতে বাঙ্গালী যদি অধিকতর উদ্বুদ্ধ হয়, তবেই এই মহাপুরুষের স্মৃতিরক্ষার অনুষ্ঠান সার্থক হইবে। ওঁ শান্তি!

("হিতবাদী" বিশেষ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)

আশ্বিনে বিষুব সংক্রমণ

শ্রীজ্যোতিঃ বাচস্পতি

আগামী ৭ই আশ্বিন (২৩শে সেপ্টেম্বর) রাত্রি ১১টা ১৪ মিঃ (ষ্টাণ্ডার্ড) সময়ে সূর্য্য বিষুব-রেখার উপরে উপস্থিত হইবেন। এই সংক্রমণের সময়কার গ্রহ-সংস্থান পরবর্ত্তী ৩ মাসের ঘটনাবলীর সূচক। ইহার এগার দিন পরে ১৮ই আশ্বিন (৪ঠা অক্টোবর) বেলা ১টা ৪৫ মিঃ ষ্টাণ্ডার্ড সময়ে শনি ও মঙ্গল পরস্পরের ঠিক বিপরীত দিকে অর্থাৎ ১৮০ অংশ অন্তরে আসিয়া উপস্থিত হইবে। এবং তাহার পর ২৪শে আশ্বিন (১০ই অক্টোবর ইংরাজি মতে ১১ই) শেষ রাত্রি ৪টা ৫৩ মিঃ সময়ে এইরূপ বৃহস্পতি ও প্রজাপতি পরস্পরের বিপরীত স্থানে আসিবে। সুখের বিষয়, এই দুইটি বিপরীত (অপোজিশন) প্রেক্ষা, আমাদের দিল্লী বা কলিকাতায় বিষুব-সংক্রমণ-চক্রের কোন কেন্দ্রে পতিত হয় নাই। নতুবা ইহার দ্বারা মহা অনর্থপাত হইত। তথাপি শনি ও মঙ্গলের পরস্পরের বিপরীতে অবস্থান কর্কট ও মকরে পতিত হওয়ায় বাঙলাদেশের পক্ষে অনর্থ সূচনা করিতেছে। যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

৭ই আশ্বিন সূর্য্যের বিষুব-সংক্রমণের সময়ে এইরূপ গ্রহ-সংস্থান হইবে।

র ৫।৭।৪ , চ ১১।১৪।৩৫ ; ম ৩।২১।১৫ ; বু ৫।২৭।৩৮ ; বৃ ৬।৩।২৪ ; শু ৪।২২।৪০ ; শ ৯।২৯।২৭ বং ; রা ৯।১৪।৩৪ ; কে ৩।১৪।৩৪ ; প্র ০।৭।৪০ বং ; ব ৪।১৯।৫২ ; রু ৩।২।৫৩

সে সময়ে কলিকাতার ভাব-সংস্থান হইবে।

১০ম ১১।৩।৭ ; ১১শ ০।৭।৭ ; ১২শ ১।১১।৭ ; লং ২।১৩।১৩ ; ২য় ৩।৭।৭ ; ৩য় ৪।৩।৭ ;

দিল্লীর ভাবস্ফুট –

১০ম ১০।২০।৫৬ ; ১১শ ১১।২৪।৫৬ ; ১২শ ১।১।৫৬ ; লং ২।৬।০ ; ২য় ২।২৮।৫৬ ; ৩য় ৩।২২।৫৬

গ্রহসংস্থানগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, যে দিল্লীর সংক্রামণ-চক্রে বরুণ ও শুক্র প্রায় চতুর্থ ভাব-বিন্দুর উপরেই পড়িয়াছে। বরুণ চতুর্থ ভাব-বিন্দুর উপরে পড়িলে, প্রায়ই দেশে গণতান্ত্রিক দলগুলির পরিপুষ্টি হইয়া থাকে এবং দেশের রাজনৈতিক আব্‌হাওয়ায় আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। বরুণের সহিত কোন অশুভ গ্রহের শত্রু-প্রেক্ষা নাই। বরঞ্চ তাহা শুক্রের সঙ্গে-যুক্ত হওয়ায় ইহা বোঝা যায়, যে আগামী তিন চার মাসের মধ্যে দেশবাসীর মনের উপর কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে এবং কংগ্রেসের নীতি প্রচার করিবার জন্য নানাস্থানে সভা-সমিতি হইবে এবং এই ব্যাপারে দেশব্যাপী একটা সাড়া পড়িয়া যাইবে। বরুণ শুক্রযুক্ত হওয়ায় কংগ্রেসকে সহযোগের নীতি অবলম্বন করিতেই হইবে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও কংগ্রেস দেশবাসীর পৃষ্ঠপোষকতা পাইবে। 'ইলেকশন্' যদিই হয়, তাহা হইলে কংগ্রেস-নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের জয় অবশ্যম্ভাবী।

এই সংক্রমণ-চক্রে চতুর্থস্থ বরুণ বিশেষ বলবান্ হইয়াছে; কেননা, ইহা ভাব-বিন্দুর নিকটতম গ্রহ। বরুণের সহিত একমাত্র প্রজাপতির সামান্য অশুভ প্রেক্ষা আছে। প্রজাপতি একাদশস্থ হওয়ায়, এই প্রেক্ষার ফলে রাজনৈতিক সংস্কারের ব্যাপারে ("হোয়াইট পেপার" লইয়া) নানারূপ বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ পাইবে, অনেকে ইহার বিপক্ষতাচরণ করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই প্রেক্ষার ফলে দেশের বিখ্যাত ব্যক্তিগণের মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইবে এবং কোন কোন দেশ-বিশ্রুত ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা-হানি হইবে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোন বিখ্যাত ব্যক্তির নিন্দা-প্রচার হইবে এবং তাহা লইয়া যথেষ্ট আন্দোলন আলোচনা হইবে।

দিল্লীর সংক্রমণ-চক্রে নবমস্থ শনি তৃতীয়স্থ মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হওয়ায়, ধর্ম্মের ব্যাপার লইয়া অথবা সাম্প্রদায়িক ব্যাপার লইয়া বিবাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি হইবে। ধর্ম্মের ব্যাপারে সংস্কারকামী ও সনাতনীদের মধ্যে বিশেষ বিবাদ উপস্থিত হইবে এবং ধর্ম্মযাজক বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-দের মধ্যে কোন প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তির মৃত্যুও অসম্ভব নহে। আইন-ব্যবসায়ীদের মধ্যেও কোন প্রতিষ্ঠাশালী

ব্যক্তির মৃত্যুর আশঙ্কা আছে। এই প্রেক্ষার ফলে দেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে নানারূপ গোলযোগ ও অশান্তির কারণ উপস্থিত হইবে এবং সাধারণতঃ বিদেশে ভারতের নিন্দা ও কুৎসা প্রচারিত করিবার জন্য কোন শক্তিশালী দল গঠিত হইবে।

পূর্ব্বে যে শনি ও মঙ্গলের বিপরীত প্রেক্ষার কথা বলা হইয়াছে, (১৮ই আশ্বিন ১৩৪১ বাং) তাহার ফলে সমুদ্রে অথবা সমুদ্রের উপকূলে প্রবল ঝড় হইবার আশঙ্কা আছে। এই প্রেক্ষায় স্থলপথে ও জলপথে যানবাহন-জনিত দুর্ঘটনা এবং তাহাতে জীবনহানি সূচনা করে। কাজেই এবার আশ্বিন মাসে প্রচণ্ড সাইক্লোন বা ঘূর্ণীবাত্যায় এবং রেলে কলিশনে বা জাহাজ কি নৌকা ডুবি হইয়া বহু প্রাণহানির আশঙ্কা আছে।

বরুণ ও শুক্র চতুর্থস্থ হওয়ায় আশ্বিন মাসের পর কৃষক ও শ্রমিকদের অবস্থা কতকটা ভাল হইবে। কৃষি-জাত দ্রব্যাদির, বিশেষতঃ চাউল, গম, পাট প্রভৃতির চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধি পাইবে।

আব্‌হাওয়ার ব্যাপারে চতুর্থস্থ শুক্র সাধারণতঃ সাম্য সূচনা করে। যদিও শনি মঙ্গলের বিরুদ্ধ প্রেক্ষার ফলে দু'চার দিনের জন্য একটা বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে, তাহা হইলেও, এই সময়টিতে আব্‌হাওয়া সাধারণতঃ সময়োপ-যোগী হইবে। বিশেষ ব্যতিক্রমের কোন আশঙ্কা নাই।

চতুর্থস্থ শুক্র খনি ও খনিজ পদার্থের ব্যবসায়গুলিরও যথাসম্ভব উন্নতি নির্দ্দেশ করে। কয়লা প্রভৃতির চাহিদা ও দর কিছু বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে হয়।

তৃতীয়স্থ মঙ্গল শনি দ্বারা পীড়িত হওয়ায় সংবাদ-পত্র, সাময়িক পত্র প্রভৃতির পক্ষে অশুভ সূচনা করে। সংবাদ-পত্রাদির পক্ষে এই সময়টা নানারূপে অসুবিধাজনক হইবে। কোন কোন সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে গুরুতর মামলা-মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার আশঙ্কা আছে। সাংবাদিক বা সাহিত্যিকের চক্ষেও এ সময়টা অশুভসূচক! সাংবাদিক বা সাহিত্যিক মহলে কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনের আশঙ্কা আছে।

উপরে সাধারণভাবে ভারতবর্ষের যে ফল লেখা হইল, তাহা বাঙলা দেশের পক্ষেও মোটের উপর খাটিবে। কিন্তু বাংলা দেশে দুই একটি বিষয়ে একটু পার্থক্য লক্ষিত হইবে।

বাঙলার সংক্রমণ-চক্রে দশমস্থ চন্দ্র শনির দ্বারা পীড়িত হওয়ায়, দেশের আর্থিক অবস্থা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে মোটেই শুভদায়ক নহে। দেশের সর্ব্বত্র অভাব ও অভিযোগের প্রবাহ বহিতে থাকিবে। দেশে বেকার ও অসমর্থের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। এবং সকল রকম ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। দেশের সঞ্চিত অর্থ নষ্ট হইবে এবং সাধারণতঃ অর্থাভাবে সারা দেশটা প্রপীড়িত হইবে। গণ-তান্ত্রিক প্রতিনিধিগণ বাঙলা দেশে বিশেষ করিয়া গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচারণ করিতে প্রস্তুত হইবে, এবং কাউন্সিলে এবং অন্যান্য সংসদ্-পরিষদে গভর্ণমেণ্টপ্রবর্ত্তিত নীতি বা প্রস্তাবগুলির বিপক্ষতা-চরণ করিবে; কিন্তু তাহাতে কোন ফল-লাভ হইবে না।

এই সংক্রমণ-চক্রে রবি চতুর্থস্থ হইয়া মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হইয়াছে। ইহা সাধারণভাবে জমির মালিকগণের পক্ষে অশুভ। এ বৎসরও তাঁহাদের দুর্ব্বৎসর। প্রজার সহিত বিরোধ এবং অনাদায় ইহার একটা অবশ্যম্ভাবী ফল।

এই সংক্রমণ-চক্রে অষ্টমপতি শনিকে মঙ্গল পীড়িত করায়, দেশে দুর্ঘটনার এবং অভাব অনশন প্রভৃতিতে মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাইবে। এবং উক্ত মঙ্গল রবিকে পীড়িত করায় বারিপাতের অভাবে কৃষিকর্ম্মের ক্ষতি সূচনা করে।

মঙ্গল ও অষ্টমপতি শনি পরস্পরকে পীড়িত করায়, এই সময়ে বিপ্লবী দলের দ্বারা গুপ্ত হত্যার চেষ্টা হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে দেশের অশান্তিরই সৃষ্টি হইবে। গভর্ণমেণ্ট এই বিপ্লবী প্রচেষ্টাসমূহ দূর করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিবেন।

সাম্প্রদায়িক সমস্যাও বাঙলা দেশে একটু গুরুতর আকার ধারণ করিবে। সাম্প্রদায়িক ব্যাপার লইয়া কোনরূপ দাঙ্গা হাঙ্গামাও অসম্ভব নহে। এই সকল ব্যাপারের পক্ষে আশ্বিন মাসটি বিশেষ অশুভ। মোট কথা, আশ্বিনের শারদীয় উৎসব বাঙলায় শনি ও মঙ্গলের বিরুদ্ধতা আশঙ্কায় ও নৈরাশ্যে ম্লান করিয়া তুলিবে।

— আলোচনা —

বেদ ও বেদান্ত

১০৮ শ্রীশ্রীস্বামী মহাদেবানন্দ গিরি

বিগত ৬ই জুলাই-এর 'হিতবাদীর" বিশেষ সংখ্যায় বেদ ও বেদান্তের চর্চ্চা হইয়াছে। তাহাতে লেখা আছে, যে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের মতবাদ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ। ইহাতে মনে হয়, লেখকের দৌড় ঐ পর্য্যন্তই, বেদে নহে। কারণ, অসৎবাদ বা শূন্যবাদের ঝঙ্কার ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে আছে, তথায় মহর্ষি উদ্দালক আরুণি স্বীয় পুত্র ও শিষ্য শ্বেতকেতুকে উপদেশ করিতে গিয়া প্রথম বলিয়াছেন, 'সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং"। পশ্চাৎ বলিয়াছেন "তদ্ধৈক আহু রসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং" তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত ।১। কুতস্তু খলু সৌম্যেবং স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়ত ইতি। সত্ত্বেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্॥২॥ অর্থ :— সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল সৎই অখণ্ডৈকরস-ভাবে ছিলেন আর দ্বিতীয় বলিয়া কিছু ছিল না। কিন্তু কোন মতবাদী বলেন, যে অসৎই একমাত্র ছিল, অন্য কিছু ছিল না এবং সেই অসৎ হইতেই সতের উৎপত্তি হইয়াছে। হে বৎস, ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? অসৎ হইতে সত্যের উৎপত্তি সম্ভবে না। কেবল সৎই এক অদ্বিতীয় ছিলেন। এই সৎই যে সর্ব্বত্র একরস, দ্বিতীয়রহিত ছিলেন তাহা ঋগ্বেদের ১০।১২৯ সূক্তের দ্বিতীয় ও চতুর্থ মন্ত্রদ্বয় হইতে পাওয়া যায়। তাহাতে সৃষ্টির অগ্রে "আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং। তস্মাদ্ধান্যন্নপরঃ কিঞ্চনাস॥" অর্থ :—এক চৈতন্য ছিল; বায়ু ছিল না অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ সূত্রাত্মাও ছিলেন না। তিনি সর্ব্বত্র একরূপ স্বজাতীয়, স্বগত, বিজাতীয় ভেদরহিত স্ব-স্বরূপে ছিলেন; তাঁহা হইতে অন্য অপর কিছু ছিল না। ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট উক্তি আর কি সম্ভবে? "কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসোরেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্। হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা॥৪॥ প্রথমে তাঁর কামনা হইল, বহু হইব, পশ্চাৎ মানসসৃষ্টি করিতেই সতের বন্ধন হইল অসতের দ্বারা, ইহা মনীষাসম্পন্ন কবিগণ শুদ্ধ হৃদয়ে বিচার দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন। ঋগ্বেদে এক আঙ্গিরস বৃহস্পতি ও এক লৌক্য বৃহস্পতি দেখা যায়। মহাভারতাদিতে লৌকায়ত বা চার্ব্বাকবাদের উল্লেখ দেখা যায়। এবং বৃহস্পতি অসুরগণের ভ্রমোৎপাদনার্থ উহার প্রচার করেন, এইরূপ মত লিখিত আছে।

ঋগ্বেদের ১০।৭১ সূক্ত আঙ্গিরস বৃহস্পতি দৃষ্ট ও ৭২ সূক্ত লৌক্য দৃষ্ট বা এই মত পাওয়া যায়। এই ৭১ সূক্তে ঋষিগণের বিশুদ্ধ চিত্তে যে বেদমন্ত্রাদি উদ্ভাসিত হইত তাহা পাই "যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্তা মন্ববিন্দং ঋষিষু প্রবিষ্টাং" ॥৩॥ এবং ৪র্থ মন্ত্রে আছে কেহ শুনিয়াও শুনিতে পারেন না এবং দেখিয়াও ভাবার্থ গ্রহণে সমর্থ হয়েন না। কেহ কেহ পুষ্পফলবিহীন অসার বাক্য অভ্যাস করে। তাহাদের যে বাক্য তাহা যেন বাস্তবিক দুগ্ধপ্রদ গাভী নহে, কাল্পনিক মায়াময় গাভীমাত্র। উক্ত আলোচ্য প্রবন্ধের বাক্যও এইরূপই বটে। এই পঞ্চম মন্ত্রে "অধেন্বা চরতি মায়য়ৈষ বাচং।" বাক্যে মায়া কীদৃশী তাহা বুঝিতে পারা যায়। ঋগ্বেদের ১০।১৭৭ সূক্তে মায়া দেবতা। পতঙ্গ বা জীবাত্মা মায়ার আক্রমণে নানা যোনি ভ্রমণ করেন ও জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মসমুদ্র পতে মুক্তিলাভ করেন। ইহাতে মায়া উপাধি অন্তর্বিশিষ্টা তাহাও পাওয়া গেল।

উক্ত ৭২ সূক্তের ২য় মন্ত্রে আছে, ব্রহ্মণস্পতি রেতাসং কর্ম্মার ইবাধমৎ দেবানাং পূর্ব্ব্যেযুগেঽসতঃ সদজায়ত॥ অর্থ :—ব্রহ্মণস্পতি কামারের ন্যায় দেবতাদিগকে নির্ম্মাণ করিলেন, দেবতাদিগের পূর্ব্বযুগে অসৎ হইতে সৎ জন্মিয়াছিল। সুতরাং লোকায়ত মত ঋগ্বেদে থাকিলেও, প্রবন্ধলেখক তাহা বৌদ্ধ যুগেরই মনে করিয়া বসিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদের "অনির্ব্বচনীয়" খ্যাতি। কারণ, তিনি তুচ্ছা মায়া সৎ কি অসৎ তাহা নির্ব্বাচনের অযোগ্যা বলিয়াছেন, এইটা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত নহে। বৌদ্ধ প্রস্থান হইতেও গৃহীত নহে। ইহা ঋগ্বেদেই পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ১০।১২৯ সূক্তের ৬।৭ মন্ত্রের ৺রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত অনুবাদে আছে কেই বা জানে, কেই বা বর্ণনা করিবে? কোথা হইতে জন্মিল? কোথা হইতে এই সকল নানা সৃষ্টি হইল? দেবতারা এই সব নানা সৃষ্টির পরে হইয়াছেন। কোথা হইতে যে হইল তাহা কেই বা জানে? ।৬।

এই নানা সৃষ্টি যে কোথা হইতে হইল, কাহা হইতে হইল, তাহা কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, কি করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন, যিনি ইহার প্রভুস্বরূপ পরমধামে আছেন। অথবা তিনিও নাও জানিতে পারেন।৭। মন্ত্র দুটী এই:—

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত
আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্ব্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জনেনাথো কো
বেদ যত আবভূব ॥৬॥

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভুব যদি বা
দধে যদি বা ন
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ত
সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥৭॥

কেই বা জানে? কেই বা বর্ণন করিবে? কোথা হইতে জন্মিল? কোথা হইতে এই নানা সৃষ্টি হইল! এই মন্ত্র কি ইঙ্গিত করে না, যে তমঃ বা অসৎ হইতে এই জগতের উৎপত্তি তাহা নির্ব্বাচন করা যায় না, সুতরাং অনির্ব্বচনীয়। তমঃ বা অসৎ হইতে যে উৎপত্তি তাহা ১০।১২৯ সূক্তের ৩।৪ মন্ত্র হইতে পাওয়া যায়। "তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদং। তুচ্ছেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকং" ॥৩॥

"কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। সতো বন্ধুমসতিনিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ॥৪॥

এখানে তৃতীয় মন্ত্রে তমাবৃত হইয়াই প্রথমজ হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি বর্ণিত। ইহাই মানস সৃষ্টি। ৪র্থ মন্ত্রে সতের অসৎ দ্বারা বন্ধন অর্থই সৃষ্টি বলা হইয়াছে। ইহাই পুরীক্ষেত্রে বলরাম সুভদ্রাদি প্রতীকে প্রকাশিত। সুভদ্রা উপহিত হইয়া, মায়ার তমঃ আবরণে আবৃত হইয়া শুভ্রবর্ণ পরপুরুষ বলরাম কৃষ্ণবর্ণ জগন্নাথ হইয়াছেন। এখানে তুচ্ছা তমঃই অসৎ। ইহাই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ। "ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপং ঈয়তে" মন্ত্র যাহা উক্ত প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে তাহাও ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৬।৪৭।১৮ মন্ত্র, উহা মধুবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা বলিতে গিয়া বৃহদারণ্যক দ্বিতীয় অধ্যায় ব্রাহ্মণে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই একেরই বহুধা হওয়া কঠ উপনিষদে—'একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একরূপ বহুধাযঃ করোতি' বাক্যে প্রকাশ। গীতার ৪র্থ অধ্যায় ৬ষ্ঠ শ্লোকে অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মাভূতানামীশ্বরোপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সংভবাম্যাত্মমায়য়া॥ ঐ ঋকেরই প্রতিধ্বনি দেখিতে পাওয়া যায়। মায়াবাদ বা অনির্ব্বচনীয়-বাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের হস্তে বিস্তার লাভ করিয়াছে সত্য; কিন্তু উহা কাল্পনিক বা অবৈদিক নহে। উহা অভ্রান্ত, অপৌরুষেয়, সর্ব্ব-বেদবাদ-সম্মত।

মানব কি দেব আজি এলো মোর ঘরে

(মহাত্মাজীর বাঙলায় আগমন উপলক্ষে রচিত)

শ্রীপ্রতিভা সেনগুপ্ত

ভাস্করস্ফুরিত তনু তেজোদীপ্ত, দিব্যকান্তি কোপীন সম্বল—
অতিথির বেশে আজি দীনের মঙ্গল-কামনায়,
দিন-শেষে দিনমণি গেলে অস্তাচলে,
লয়ে শ্রান্ত দেহভার দুরবল—
অসমাপ্ত যাত্রাপথে ক্ষণিক বিশ্রাম প্রার্থনায়,
উজ্জল করিয়া দিশি, মোর চিত্তপুরে—
মানব কি দেব এলো মোর ঘরে!

বিবেকের রুদ্ধদ্বারে সহসা বাজিল কার করধ্বনি?
নমিত করিয়া মোর চিত্ত সংশয়ী, দোলায়মান,
ন্যায়ের বাস্তব পথ দেখাইয়ে মোর হৃদি নিলে জিনি—
হে মহান্, দেখায়ে আলোক-রশ্মি কর গরীয়ান্।
পশুর হীনতা হ'তে রাখ মোরে দূরে—
দেবতা মানব-বেশে এল মোর ঘরে!

মনুষ্য হইয়ে নরে কেন ঘৃণা করি?
মানবের রুদ্ধ দ্বারে জানাইলে এ চরম বাণী—
অক্ষম আখ্যা লইয়ে কেন দূরে সরি?
তোমার আশিষ্-বাণী কাঙালেরে দেয় হাতছানি।
তবুও সংশয় জাগে অতি ক্ষীণ স্বরে—
মানব কি দেব আজি এল মোর ঘরে?

বিশ্বামিত্র-তীর্থ

(পৌরাণিক গল্প)

ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন দেশ। ইহা কত দিনের, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ নির্ণয় করিতে পারে নাই। পূর্ব্বে ভারতবর্ষ নবসংস্থানে সংস্থিত ছিল—সেদিনেও ইহার দক্ষিণে ও পূর্ব্বে মহাসমুদ্র বিরাজিত ছিল। উত্তরে ধনুগুর্ণাকার হিমবান্ পর্ব্বত বিরাজ করিত, পশ্চিমে যবনাধিকৃত বিস্তৃত জনপদ ছিল। এই ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ যথাযথ অবস্থান করিয়া যজ্ঞ, যুদ্ধ, বাণিজ্য প্রভৃতি বৃত্তিপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মত্ব, ইন্দ্রত্ব, দেবত্ব প্রভৃতি সর্ব্বোচ্চ পদলাভের সাধনায় নিরত থাকিত। দেবতাগণও চিরদিন এই অভিলাষ করেন, যখন দেবত্ব হইতে প্রচ্যুত হইব ভারতে গিয়াই মনুষ্যত্ব লাভ করিব; কেননা, ভারতবাসী যাহা করিতে পারে, কর্ম্মশৃঙ্খলাবদ্ধ ও কর্ম্মক্ষয়ে 'পতনোন্মুখ' দেব ও অসুরগণ তাহা করিতে পারে না। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভীষ্ট-ফলপ্রাপ্তির সাধনক্ষেত্র ভারতবর্ষ, তাই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—"ধন্যাস্তে ভারতে বর্ষে জায়ন্তে যে নরোত্তমাঃ।"

ভারতবাসী যেদিন বুঝিল, শুধু আহার, নিদ্রা, মৈথুনে নিরত হইয়া সুখে জীবন যাপন করাই জীবের ধর্ম্ম নহে, এই জীবনই স্বর্গপ্রদ ও মোক্ষপ্রদ সাধনার মহাতীর্থ, তখন একদল লোক বহির্বিষয় হইতে চিত্ত সংযত করিয়া জিতেন্দ্রিয় ও তপঃ-স্বাধ্যায় নিরত-হইয়া অপার্থিব অধ্যাত্ম-তত্ত্বের অনুশীলন আরম্ভ করিলেন। তাহাদের কণ্ঠে উচ্চারিত হইল 'অপৌরুষেয় ঋক্'; তাঁহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি অনিন্দ্য লাবণ্যে ও পবিত্রতায় মহিমামণ্ডিত হইয়া উঠিল; তাঁহাদের নয়নে ভাস্বর স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইল। সমগ্র দেশবাসীর তাঁহারাই হইলেন বন্দ্য ও পূজ্য। শ্রাদ্ধ, দান, বিবাহ, যজ্ঞ ও আচার্য্যের কার্য্যে দেশবাসী তাঁহাদিগকে বরণ করিয়া লইলেন। এই শ্রেণীর উন্নতমনা মানবেরা ষট্‌কর্ম্মে নিরত হইলেন। বেদজ্ঞ, ইতিহাসবেত্তা, পুরাণমর্ম্মাভিজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রার্থ-পারদর্শী, যাগশীল ও মাৎসর্য্যবিহীন এই অসাধারণ চরিত্রবান্ মানব ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হইলেন অগ্নিহোত্রব্রত, এবং অনেকে স্মার্ত্তাগ্নি-তৎপর হইয়া স্ত্রী-পুত্র-বিত্তসম্পন্ন, যজ্ঞোৎসবময় জীবন যাপন করিতে লাগিলেন; ভারতের এই জাগ্রত জীবনৈশ্বর্য্য রক্ষণ করিবার জন্য ভারতবাসীর মধ্য হইতেই আর এক শ্রেণীর মানুষ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহারাই ক্ষত্রিয়। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা অস্ত্রধারী হইলেন, এবং দেশশাসনেও প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে কর্ম্ম-বিভাগে ভারতবর্ষ চাতুর্ব্বর্ণ্যের অপূর্ব্ব লীলাক্ষেত্র-রূপে জগতে এক অভিনব সভ্যতা ও আদর্শবাদের প্রতিষ্ঠা করিল।

নূতন সভ্যতা ও আদর্শবাদের অভ্যুদয়ে মানুষের চিত্ত একাগ্র হওয়ায় প্রথমে অনুভূত হইয়াছিল—শাস্ত্রবিদের রণ-দক্ষতা, যোদ্ধার সঞ্চয় নিপুণতা, শিল্পীর সেবাপ্রবণতা সম্ভব নহে; তাই গুণভেদে সমাজভেদ অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় ভারতবর্ষে চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু কালে ইহার অন্যথা হইল। রাজন্যবর্গ ক্ষাত্রধর্ম্মপরায়ণ হইয়াও অনুভব করিলেন, ব্রাহ্মণের ব্রহ্মবিদ্যা দেশের শ্রেয়ঃ সাধন করিল বটে, কিন্তু গুণভেদে অন্তরভেদ সৃজন করিল, জাতি-ভেদের প্রাচীর তুলিয়া স্বজাতির মধ্যে চিরস্থায়ী পার্থক্য প্রতিষ্ঠা করিল। ক্ষত্রিয়েরাও ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্মের অনুশীলন আরম্ভ করিয়া দিলেন—ক্ষত্রিয়ের মধু-বিদ্যায় পারদর্শিতা ব্রাহ্মণও অস্বীকার করিতে পারিলেন না—ক্ষত্রিয়ের কণ্ঠেও বেদের ঋক্ হুঙ্কার দিয়া উঠিল—উপনিষদের অধিকাংশ মন্ত্র ক্ষত্রিয়ের রচনা। ইহাতে ক্ষাত্র-ব্রাহ্মণ-সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। অতি প্রাচীন যুগে ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের জন্ম, এবং ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণোৎপত্তিরও বাধা ছিল না, ইতিহাসে এই সকল নজীর এখনও বিদ্যমান আছে; কিন্তু কালে দেবাসুর-সংগ্রামের ন্যায় ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণের মধ্যে গুণাধিকার লইয়া তুমুল বিরোধ ভারতের

অসাধারণ কৃষ্টি-রক্ষার পক্ষে সেদিন নিদারুণ বিঘ্ন উপস্থিত করিয়াছিল। আজ এই তিন যুগ সেই অন্তর্বিরোধ অন্তহীন মূর্ত্তিতে ভারতের কৃষ্টিনাশের সঙ্গে জাতিনাশের সম্ভাবনা উপস্থিত করিয়াছে।

যাউক সে কথা।

এক প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রসিদ্ধ কাহিনী বিবৃত করিব। ক্ষাত্র-নরপতি, গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ্যশক্তি-সম্পন্ন ঋষি বশিষ্ঠের যোগৈশ্বর্য্যের সম্মুখে স্বীয় পার্থিব সম্পদ্ ও প্রভাবের হীনতা পরিদর্শন করিয়া কৃতসঙ্কল্প হইলেন, "ক্ষাত্রধর্ম্ম অপেক্ষা ব্রহ্মণ্যবীর্য্য যখন ঐহিক ও পারত্রিক জগতের শ্রেয়স্কর, তখন আমি ব্রাহ্মণ হইব।"

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে তুমুল সংঘর্ষের ইতিহাস এই ক্ষেত্রে খুবই সুস্পষ্ট; কিন্তু সে কথার বিশদ বিবৃতি এই ক্ষেত্রে অবান্তর। মানুষের কোন বিধান কোন অধিকার হইতে কাহাকেও যে বঞ্চিত করিতে পারে না, বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব-লাভের সাফল্যে তাহা প্রমাণিত হয়। তিনি ব্রাহ্মণ হইলেন। যে হস্ত অস্ত্রধারণে সুনিপুণ ছিল; তাহা স্রুক-ধারণে অসমর্থ হইল না। মানুষের অসাধ্য বিশ্বজগতে কিছু নাই, মানবত্বের এই মহাজয় বিশ্বামিত্রের অসাধারণ চরিত্রে ঘোষিত হইয়াছে। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়া প্রমাণ করিলেন, ব্রাহ্মণত্ব আর কিছু নহে, ধর্ম্মের শাশ্বত মূর্ত্তিমান্ অবস্থা। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্ব মুক্তি-মোক্ষের হেতু নহে, পরন্তু ধর্ম্মার্থেই ইহার প্রয়োজনীয়তা। এইজন্য পৃথিবীতলে একজন যদি ব্রাহ্মণত্বের অধিকার লাভ করেন, সর্ব্বোপরি তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। ধর্ম্ম জগতের প্রাণ, সেই ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণের অভ্যুত্থান। সর্ব্বজীবের সম্মুখে তিনি যে ত্রাতা, বিধাতা, মূর্ত্তিমান্ ঈশ্বর-স্বরূপ পূজ্য হইবেন—ইহাতে আর সংশয় কি? হিন্দুশাস্ত্রে ব্রাহ্মণের মহিমাগাথা তাই এমন করিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

বিশ্বামিত্র জাত-ব্রাহ্মণ না হইয়া হইলেন গুণ-ব্রাহ্মণের সমুজ্জ্বল আদর্শ। ব্রাহ্মণের ঔদার্য্য অসাধারণ। ব্রাহ্মণের অনুগ্রহ অপার্থিব। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ তুলনাহীন। আমরা তপঃ-সিদ্ধ ব্রাহ্মণের জীবনকীর্ত্তির এক অধ্যায় কীর্ত্তন করিতেছি।

ভারতের উত্তরে হিমবান্ মহাপর্ব্বত শিবময় মূর্ত্তিতে ভারতকে স্নেহবারি-সিঞ্চনে সতত অভিষিক্ত করিতেছেন—স্বাস্থ্যে, ঐশ্বর্য্যে, বীরত্বে, কবিত্বে, অধ্যাত্মবিদ্যায় ভারত মহিমাময় এই মহাদেবতারই কল্যাণে। হিমগিরি ভারতের জনক। এই বিরাট্ মহেশ্বরের জটাভারে জাহ্নবীলেখা সঙ্গোপিতা—স্তম্ভিত, অচল, মর্ম্মর-মূর্ত্তি মহাশিবের সর্ব্বাঙ্গে রসানুভূতির নিদানস্বরূপা। জগজ্জ্যোতির সুবিমল কিরণচ্ছটায় সে মনোহারিণী রসময়ী দ্রবীভূতা হইয়া যখন রুদ্রকে অভিষিক্ত করেন, তখন সে মন্দাকিনীধারা তাঁর চরণতল বাহিয়া ভারতে সঞ্চারিত হয়। ভারতের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথমে শুভ শঙ্খনিনাদে এই পবিত্রগঙ্গোত্রীধারাকে বহিয়া ভারতকে অভিষিক্ত করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ-বরিত গঙ্গোত্রী দেবগিরি-ব্রহ্মগিরি পরিবেষ্টন করিয়া দেবতীর্থ-ব্রহ্মতীর্থ-রূপে মানব-মুক্তির নিদানভূতা হইয়াছেন। গৌতমের চিরকীর্ত্তি এই গৌতমী গঙ্গা আজও কলুষনাশিনী নামে পরিকীর্ত্তিতা। আর ভারত-সম্রাট্ সগরবংশোদ্ভূত কীর্ত্তিমান্ ক্ষাত্র ভূপাল ভগীরথ গিরিবর্ত্ম হইতে সেই অমৃত-নির্ঝরিণী পতিতপাবনী সুরধুনীকে নামাইয়া আনিলেন কঠোর তপস্যায় ভারতের সমতল ক্ষেত্রে। ধন্য হইল ভারতের স্থাবর জঙ্গম, কীট-পতঙ্গ। মানবের কথা দূরে থাকুক, ধন্য হইল অমৃতহারা মহোদধি—সমুদ্র-মন্থনের পর হইতে তাহার মর্ম্মন্তুদ হাহাকার উচ্ছ্বসিত অনাহত তরঙ্গে কৃতজ্ঞতায় আজিও ভারতের চরণ চুম্বন করে। মায়াবাদী আচার্য্যের কণ্ঠেও তাই জাহ্নবী-বন্দনার উদ্গান অতিশয় মধুময় হইয়াছে।

যাউক প্রাচীন ভৌগলিক সংস্থান-রচনার নিগূঢ় ইতিহাস।

বলিতেছি, আজ ঋষি বিশ্বামিত্রের উদার হৃদয়ের অপরূপ কাহিনী। সেদিন ভারতবর্ষে প্রজাপুঞ্জের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা-রক্ষার বিধান অস্ত্র-শাসনেই সুরক্ষিত হইত না—পশ্চাতে ছিল ব্রাহ্মণের তপোবল। মণ্ডলে মণ্ডলে তপোমূর্ত্তি ঋষিগণ চারণব্রতী হইয়া রাজ্য মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ঋষি বিশ্বামিত্র একদিন এইরূপ অসংখ্য শিষ্যশিষ্যা-পরিবেষ্টিত হইয়া ব্রহ্মগিরি পর্ব্বতে উপস্থিত

হন। এই সময়ে ভয়াবহ অনাবৃষ্টি বশতঃ ব্রহ্মগিরিস্থিত জনপদে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। বিশ্বামিত্র গৌতমী-গঙ্গাতীরে সশিষ্য অবস্থান করিয়া দেখিলেন, জনপদবাসী ক্ষুধাতুর। তিনি তাহাদের ক্ষীণাঙ্গ, অবসন্ন মূর্তি দেখিয়া ব্যথিত হইলেন, কিন্তু স্থানত্যাগ করিয়া যাওয়ার তাঁর প্রবৃত্তি হইল না। দিনের পর দিন তাঁহার সংস্থায়ও শিষ্যবর্গ উপবাস আরম্ভ করিল। বিশ্বামিত্র প্রতিকার-চিন্তায় আকুল হইলেন। ব্রহ্মগিরির সমগ্র অধিবাসিবৃন্দ ঋষির সম্মুখে আসিয়া করুণ আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিয়া দিল। অসংখ্য নরনারীর কাতর-দৃষ্টিবিদ্ধ ঋষি বিশ্বামিত্র অস্থির হইয়া শিষ্যবর্গকে বলিলেন—"যাও নদীতীরে, পথিপার্শ্বে দীর্ণ কানন মধ্যে যাহা কিছু ভোজ্য-দ্রব্য পাও, আনয়ন কর; যাও, বিলম্ব করিও না।"

সম্মুখে ধূসর, রুক্ষ পর্ব্বতশ্রেণী। তটিনীগর্ভ শুষ্ক বালুময়। দীর্ঘদিন অসিক্ত, রুক্ষ, শ্রীহীন শিষ্যগণ নিরাশ হইয়া ভক্ষ্য-সংগ্রহে যাত্রা করিল। তাহারা যোজন-যোজনান্তর অন্বেষণ করিয়াও, কোনও আহার্য্য বস্তুই সংগ্রহ করিতে পারিল না। অথচ আচার্য্যের আদেশ লঙ্ঘন করিলে শাপগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কায় তাহারা চিন্তাকুল হইল। এমন সময় তাহারা দেখিল, পথিপার্শ্বে কয়েকটা শীর্ণকায় মৃত কুকুর পতিত রহিয়াছে। দ্বিধাশূন্য হইয়া তাহারা তাহাই সত্বর আচার্য্যকে আনিয়া নিবেদন করিয়া দিল। বিশ্বামিত্র হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক সুগম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—"ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে। যাও, ইহাই আমি গ্রহণ করিলাম। ইহার মাংসকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড কর, জল দিয়া ধৌত কর, সমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দাও। যথাবিধি সিদ্ধ কর, পাক কর। আমি এই মাংসেই আজ দেবতা-ঋষি-পিতৃ-অতিথি-গুরুদিগকে তর্পণ করিব। অবশিষ্ট মাংস সকলে ভোজন করিলে, আমিও সানন্দে ইহা গ্রহণ করিব।"

বিশ্বামিত্রের উদ্দীপনাময় বাক্যে এই মৃত-কুকুর-মাংসই

ঋষি-সমীপে শিষ্যগণ মৃত-কুকুর-মাংস উপনীত করিল

সকলের মনে হইল, যেন স্বর্গ হইতে অমৃত-রূপে উপস্থিত হইয়াছে। উৎসাহের আর সীমা রহিল না। মৃত কুকুর-গুলির অস্থি-মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া স্থালী পূর্ণ করা হইল। কর্দ্দমাক্ত সলিলে তাহা বিধৌত করিয়া, অগ্নি-সিদ্ধ করার জন্য পাক সুরু হইল। তখন ব্রহ্মগিরির অধিপতি ইন্দ্রের নিকট গুপ্তচর গিয়া সংবাদ দিল, "মহাপাপ-বশতঃ আজ

দেবগিরি ব্রহ্মগিরি বিদগ্ধ, উৎসন্নপ্রায়। আবার ঋষি বিশ্বামিত্র এক অকথ্য অনাচার আরম্ভ করিয়াছেন।"

দেবসভা চমকিয়া উঠিল। বিশ্বামিত্রের যশঃসৌরভ দেবলোকের অবিদিত ছিল না। তাঁহার তপঃশক্তির কাহিনী মনে পড়ায় দেবলোকেরও হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। দেবতারা সবিস্ময়ে সমুচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"বিশ্বামিত্র কি অনাচার আরম্ভ করিয়াছেন?" গুপ্তচর করিলেন। বুভুক্ষু শ্যেনপক্ষীর ন্যায় এক-দল তস্কর আসিয়া মাংস-স্থালী অপহরণ করিয়া পলায়ন করিল। ক্ষুধাতুর জনগণ হাহাকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"অকৃতবুদ্ধি দস্যু শ্যেনের ন্যায় আমাদের আহার্য্য দ্রব্য অপহরণ করিল!"

বিশ্বামিত্র ভ্রূকুটী-কটাক্ষে বুঝিলেন, "ইহা দেবকীর্ত্তি। প্রজা-রক্ষায় উদাসীন দেবরাজ আচার-রক্ষায় যত্নবান্

সভয়ে দেবরাজ বিশ্বমিত্রকে মধুপূর্ণ স্থালী নিবেদন করিলেন

বলিল—"আজ ঋষিকল্পিত কুক্কুর-মাংস ভক্ষণ করিবে অগ্নিপ্রমুখ যাবতীয় দেবতাবৃন্দও ঋষিলোক।"

ইন্দ্র সেই কথা শুনিয়া ক্রোধকম্পিত প্রচণ্ড অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"যাও ছদ্মবেশে মাংস-পূর্ণ স্থালী হরণ করিয়া লইয়া আইস। কোপনস্বভাব বিশ্বামিত্রকে প্রত্যক্ষ ভাবে এই কর্ম্মে নিবারণ করিলে একটা কাণ্ড বাধিতে পারে, কৌশলে কার্য্য সিদ্ধ করিতে হইবে।"

অগ্নি সদল-বলে বিশ্বামিত্রের সংস্থাভিমুখে যাত্রা এই রাজকীয় অনাচার সহ্য করিব না।" তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, ক্ষিপ্ত, ক্ষুধাকাতর, অসংখ্য নরনারী লইয়া উল্কার ন্যায় দেবরাজ-প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দেবদুর্গে সাজ-সাজ রব পড়িয়া গেল। তুরী-ভেরী-পণব-গোমুখ-ধ্বনিতে সমগ্র নগরী উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল। দেবরাজ রক্ষিদল সৈন্যবৃন্দকে সংহৃত করিয়া, স্বয়ং কৃতলগ্ন-বাসে বিশ্বামিত্রের সম্মুখে এক অপূর্ব্ব মধুপূর্ণ স্থালী স্থাপন করিয়া বলিলেন—"ঋষি! প্রশান্ত হউন। কুক্কুর-মাংস ব্রহ্মগিরি-বাসীর অখাদ্য।"

বিশ্বামিত্র কুপিত হইয়া বলিলেন—"রে আত্ম-সুখ-ভোগ-নিরত দেবেন্দ্র! প্রজাপুঞ্জের দুঃখকাতর অবস্থায় উদাসীন! এই অমৃতস্থালী লইয়া যাও। আমার সংগৃহীত কুক্কুর-মাংসই দান কর, নতুবা তোমায় রাজ্যচ্যুত করিব।" ইন্দ্র বিশ্বামিত্রের তপঃশক্তির মর্ম্ম অবধারণ করিয়া বিনয়-বচনে বলিলেন—"হে মহামুনি, এই অমৃত দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া পুত্রগণ সহ ইহা যথারীতি পান করুন। অমেধ্য কুক্কুর-মাংস অগ্নিহোত্রের অযোগ্য।"

বিশ্বামিত্র অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"ইন্দ্র, প্রজাসকল ক্ষুধার জ্বালায় অবসন্ন; সুতরাং আমি একাকী অমৃত ভোগ করিব না। যদি সকলকেই অমৃত পরিবেশন করিতে পার, তবে এই পবিত্র মধু পান করিতে পারি। যদি তাহা না হয়, তবে নিশ্চয় জানিও, আজ রাজভোগও কুক্কুর-মাংস ব্যতীত আর কিছু হইবে না। দেবগণ ও পিতৃগণও এই কুক্কুর-মাংস ভোজন করিবেন। পরে আমি স্বয়ং উহা গ্রহণ করিব। ইহাতে আমার কোনই পাপ হইবে না।"

সুররাজ ভীত হইলেন।

বিশ্বামিত্রের দিকে করুণ দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি কহিলেন—"দ্বাদশবর্ষ অনাবৃষ্টি, আমি নিরুপায় আপনি অতিথি-সৎকার গ্রহণ করুন।"

বিশ্বামিত্র বলিলেন—"রাজকোষ মুক্ত করিয়া দাও। দেশ-দেশান্তর হইতে শস্যসম্ভার লইয়া আইস। মৃত্তিকা-গর্ভ বিদীর্ণ করিয়া রসাতল হইতে বারি উত্তোলন কর। ব্রহ্মগিরিতে মহাযজ্ঞ আরম্ভ হউক।"

ইন্দ্র বলিলেন—"তথাস্তু।

জীবনের বাণ ডাকিল। উৎসাহে, উচ্ছ্বাসে দারিদ্র্য-কাতর নরনারীর কণ্ঠে বীণা-স্বরের মূর্চ্ছনা ফুটিল। দেশ-দেশান্তর হইতে শস্যরাশি ব্রহ্মগিরিকে পরিপূর্ণ করিয়া দিল। কূপ, তড়াগ, সরোবর, তটিনী খনিত্রের আঘাতে শিহরিয়া উঠিল; যজ্ঞধূমে বিদগ্ধ তপোবন সমাচ্ছন্ন হইল। ঋষিও ব্রাহ্মণের কণ্ঠে বেদধ্বনি মুখরিত হইয়া উঠিল। পুঞ্জে-পুঞ্জে মার্ত্তণ্ড তপ্তনীল কটাহে মেঘবৃন্দ ভাসিতে আরম্ভ করিল। প্রচণ্ড পবনে ঘনীভূত হইয়া উহারা অমৃত-বারি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। গিরি-নগরী স্নাত-স্নিগ্ধ হইয়া, অপরূপ সৌন্দর্য্য ধারণ করিল। শুষ্ক বৃক্ষ মুঞ্জরিত হইল। বিহগের কণ্ঠে কাকলি ফুটিল। প্রজাগণ তৃপ্ত হইল।

আজও বিশ্বামিত্রের এই কীর্ত্তিভূমি গৌতমী-গঙ্গাতীরে পুণ্যপ্রদ বিশ্বামিত্র-তীর্থ নামে অভিহিত হয়।

সর্ব্বজীবে দয়ার আকর প্রথিত-যশাঃ ব্রাহ্মণ দধীচি যেমন জগৎকল্যাণে একদিন আপনার অস্থি দান করিয়া অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া গিয়াছেন—সেইরূপ স্বর্গের অমৃত প্রত্যাখ্যান করিয়া ঋষি বিশ্বামিত্র প্রজাহিতে যথার্থ ব্রাহ্মণত্বেরই পরিচয় দিয়াছেন। করুণার এই অমৃত-প্রস্রবণ তাই কালান্ত পর্য্যন্ত অমর হইয়া থাকিবে।

হংস

শ্রীবিভূতিভূষণ সরকার

স্বপনের পাখা মেলি',
রূপের, রসের বরণ খেলি',
চলে মানস-হংস মম]
অসীম নীলের অন্তবিহীন মানস-সরে;

মন্দ-মধুর ছন্দোতালে,
কনকের কিরীট ভালে,
কুতূহলে, মরণ মথি', সাহস-ভরে।

ওগো মানস-হংস মম,
রূপ যে তব শুভ্রতম,
কভ্র-কথার]ব্যথার স্বপ্ন—
বার্ত্তা বহি', কোথায়, ওগো কিসের তরে?

হৃদয়ের বহ্নি-তালে,
চলেছ সাঁজ-সকালে,
বিরাম-বিহীন যাত্রী ওগো—
আদি-শেষের, প্রান্তছায়া অস্তাচলে!

— নিষ্কর্ষ —

কর্ম্মীর মুখে—

ভারতের অগ্রসাধক বাঙলার গৃহ-কলহে মহাত্মা গান্ধীর মত লোকও হতাশ হইয়া ফিরিয়াছেন—ইহা বাঙালীর পক্ষে কলঙ্কের কথা। প্রবাসী সুভাষচন্দ্রও সুদূর হইতে লিখিতেছেন—

"বাঙলা দেশে আজ আত্মকলহের ফলে যে নীচতা ও স্বার্থপরতা পুঞ্জীকৃত হইয়াছে তাহা ধৌত করিবার জন্য এক প্রবল ভাবের বন্যা চাই। এমন একজন লোককে আজ সবার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে, যিনি সকলপ্রকার দলাদলির উপরে থাকিয়া ভালবাসার দ্বারা সকলের হৃদয়কে জয় করিতে পারিবেন।

'এমন একজন লোককে যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহাকে ঘিরিয়া একদল দেশভক্ত নরনারী আসিয়া দাঁড়াইবেন, যাঁহারা নিজের সর্ব্বস্ব, নিজের জীবন বলিদান করিতে ব্রতী হইবেন; কিন্তু প্রতিদানে কিছুই চাইবেন না। আজ বাঙলার বহু কংগ্রেস-কর্ম্মীর যে শোচনীয় পরিণাম তাহার একমাত্র কারণ এই, যে তাঁহারা দেশভক্তির মূল্য-স্বরূপ পার্থিব সম্পদ্ বা পার্থিব পদ প্রার্থনা করিতেছেন। আমি বিশ্বাস করি, যে দেশবাসীর হৃদয়ে যে মুহূর্ত্তে পদের ও সম্পদের আকাঙ্খা দেখা দিবে—সেই মুহূর্ত্তে তার পতন হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এরূপ পতন ঘটিলে মানুষ আর সেবার অধিকারী থাকিতে পারে না।"

দেশকর্ম্মীদের চরিত্রশুদ্ধির উপরেই বাঙলার যৌবন ও জাতীয়তার সম্মান-রক্ষা নির্ভর করিতেছে। এ দিকে দেশসেবকগণের একান্ত অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য।

পুরাণ ও তন্ত্রের আলোচনা—

ধীরে ধীরে চিন্তাশীল যাঁহারা তাঁহাদের মনে ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র ও সাধনার উপর একটা জিজ্ঞাসু ও অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টি পড়িতেছে। ইহা শুভ লক্ষণ, সন্দেহ নাই। সমস্যা, এই যুগের দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তা-ভূমিকায় দাঁড়াইয়া আর এক বহু-দূর-গত যুগের চিন্তা ও তথ্যের রহস্য-সূত্রগুলি যথাযথ চেনা ও ধরা। এই কার্য্যে শ্রদ্ধা আবশ্যক, অভিনিবেশ আবশ্যক, সর্ব্বোপরি আবশ্যক যৌগিক অন্তর্দৃষ্টি—যাহা একান্ত সাধন-লভ্য। তবুও, এ বিষয়ে বর্ত্তমান কোনও কোনও শ্রদ্ধাশীল মনীষী যে শুভ প্রয়াস আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার জন্য সত্যই তাঁহাদের সমাদরের সহিত অভিনন্দন করি।

চিন্তাশীল শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু "পুরাণ" সম্বন্ধে এইরূপ নূতন ও মৌলিক ভাবে গবেষণা ও আলোচনা করিতেছেন। তাঁহার বক্তৃতা ও লেখাগুলি বিস্তারিতভাবে শুনিবার বা পড়িবার সুযোগ আমাদের ঘটে নাই—তবে যেটুকু সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে ধারণা হয়, তিনি একটী সূত্রের সন্ধান করিতেছেন। তাঁহার সবখানি কথা না পাওয়া পর্য্যন্ত ইহার সম্বন্ধে বিশেষ অভিমত দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে; তবে আমরা তাঁহার প্রচেষ্টায় আনন্দিত হইয়াছি।

শ্রাবণের "প্রবাসীতে" তাঁহার পুরাণ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের এই সিদ্ধান্ত-বাক্যে আমরা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করি—

"পুরাণে বহু প্রকৃত পুরাবৃত্ত ধৃত হইয়াছে। মনোযোগ সহকারে পুরাণগুলি পাঠ করিলে ভারতের প্রাচীন হিষ্টরির উদ্ধার হইবে।"

ঐ সংখ্যাতেই অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তীও ভিন্ন প্রবন্ধে তন্ত্র প্রসঙ্গে এই প্রকারই অনুসন্ধিৎসারই আবাহন করিয়াছেন—

"লক্ষ্মীধর, ভাস্করাচার্য্য প্রমুখ শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিকাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক একবাক্যে নিন্দিত বিষয়-সমূহের জন্য সমস্ত তন্ত্রশাস্ত্রকে দোষী সাব্যস্ত না করিয়া তন্ত্রের প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য তন্ত্র-সাহিত্যের বহুল প্রচার ও সুনিয়ন্ত্রিত সহানুভূতিপূর্ণ সমালোচনা হওয়া দরকার। এই সমালোচনার ফলে প্রতি গ্রন্থের প্রকৃত স্বরূপ ও সমগ্র সাহিত্যের মধ্যে ইহার আপেক্ষিক অবস্থান নির্ণীত হইবে—তন্ত্রের নিগূঢ় তথ্য প্রকাশ হইয়া পড়িবে।"

চিন্তার পরিবর্ত্তন—

যুগের হাওয়া একটু একটু করিয়া ঘুরিতেছে, ইহার নানা লক্ষণ ক্রমেই ফুটিতেছে। এ হাওয়ার মূল যে পাশ্চাত্য-শিক্ষা ও পাশ্চাত্য-সমাজ সেইখানেই দিক্-পরিবর্ত্তন সুরু

হইয়াছে, এইটাই ভরসার কথা। অতএব এ দেশের চিন্তায়-সাহিত্যে সেই ধাকা আসিবেই, ইহা অনিবার্য্য।

শ্রাবণের "বিচিত্রায়" উদ্ধৃত শ্রীঅনাথনাথ বসুর "বিদ্যালয়-সমাজ" প্রবন্ধে এই কথার পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষায় নিছক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতীচ্যে অচল হইয়া পড়িতেছে, ইহা লেখক লক্ষ্য করিয়াছেন—আমেরিকার দৃষ্টান্ত দিয়া তিনি দেখাইতেছেন,—

"সে দেশের মনীষিগণ বলিতেছেন, একটা হিসাব করিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া সমাজকে নূতন করিয়া পত্তন করিতে হইবে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মিথ্যা দাবী দ্বারা মুগ্ধ হইয়া উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে সামাজিক ক্রমবিকাশের ধারাকে ছাড়িয়া দিলে চলিবে না।"

ফলতঃ, নিছক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজ-রাষ্ট্রবাদ উভয়-বিধ চরম পন্থার সসমঞ্জস সমাধান তিনি খুঁজিয়া পাইয়াছেন—ভারতের তপোবন-যুগে, চতুরাশ্রমে। সে অতীতে আর পুরাপুরি ফেরা চলে না, চলা অসম্ভব—তাই তাঁর কথা—

'আজ আমরা তপোবন রচনা করিতে পারিব না; কিন্তু সেখানে শিক্ষার যে আদর্শ প্রচলিত ছিল সে আদর্শ গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। ......একথা আজ বলা প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে, যে বিদ্যাদানই শিক্ষায়তনগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য নহে; বরং সেটা অন্য একটা কিছুর by-product অর্থাৎ গৌণ ফল-স্বরূপ মনে করিলে বিদ্যা দান ও লাভ ব্যাপারটা সহজতর হয় এবং সে বিদ্যা জীবনে কার্য্যকরী হইয়া উঠিতে পারে। আমার মতে, আচার অর্থাৎ জীবনকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের শিক্ষায়তনগুলি গড়িয়া তুলিতে হইবে অর্থাৎ বিদ্যালয়গুলির একটা আধ্যাত্মিক সত্তা সৃষ্টি করিতে হইবে।"

চিন্তায় মৌলিকতা না থাকিলেও, কথাগুলি প্রণিধান-যোগ্য।

— সমালোচনা —

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন—(কর্ম্মজীবন ও চরিত্র-চিত্র)—শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র ধর এম-এ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—এডভান্স অফিস, ৭৪নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৩৲ টাকা।

বাঙলার পুরুষসিংহের এই বিপুল সচিত্র জীবনী-গ্রন্থখানি লিখিয়া সুরেন্দ্রবাবু জাতির ঋণ কতকটা পরিশোধ করিলেন, তজ্জন্য বাঙালী জাতির তিনি কৃতজ্ঞতাভাজন তাহাতে সন্দেহ নাই। বইখানি একাধিক দিক্ দিয়া বাঙালীর নিকট সমাদরণীয় হইবে। স্বর্গীয় যাত্রামোহনের যুগ হইতে ৺যতীন্দ্রমোহনের যুগ পর্য্যন্ত ইহা একখানি বাঙলার রাষ্ট্র-সাধনার সংক্ষিপ্ত সঙ্কেত-চিত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আর ইহা অপ্রাসঙ্গিকও হয় নাই—কেন না, যতীন্দ্রমোহনের মত দেশপ্রাণ দেশনেতা দেশ-সাধনারই অপরিহার্য্য ও অনিন্দ্যসুন্দর অভিব্যক্তি, ইহা বলাই বাহুল্য। দেশবন্ধুর পর দেশপ্রিয় বাঙলার এই মহাপ্রাণতার ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন—তারপর, ঘোর অন্ধকারে সেই ছিন্ন সূত্র আজ আর বুঝি দৃষ্টিগোচর হয় না!

দেশবন্ধুর ন্যায় দেশপ্রিয়ের আন্তরিক মর্ম্মব্যথা গুমরিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় রাষ্ট্র-সাধনার দুর্ব্বার আকর্ষণ-প্রভাবে জাতীয় চরিত্রের আমূল পুনর্গঠন-নীতি আশ্রয় করিতে পারে নাই, কিন্তু ইহাই ছিল তাঁহার গভীরতম হৃদয়-প্রেরণা—তাই তাঁহার কণ্ঠে এই মর্ম্মবাণী ফুকারিয়া উঠিয়াছিল—

"Why is it that Aurobinda has become a recluse, Chittaranjan died of a broken heart; Gandhiji retired to his Ashram at Sabarmati, while Kamal Pasha, Reza Khan and Chiang Kai Shek sit in state in the council of free nations? The answer is to be sought in our national defects."

এই জাতীয় চরিত্রের দুর্ব্বলতার পরিচয় নানা দিক্ দিয়া দেশনেতা স্বয়ং অনুভব করিয়াছিলেন, তাঁহারা

আক্রান্ত ও ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিলেন—উহার বিরুদ্ধে স্থাপন করিয়াছিলেন নিজেরই মহান্ ও খাঁটি মনুষ্যত্ব, যাহার জ্যোতিঃ ও বীর্য্য সারা দেশকে উদ্দীপিত ও আশায় উৎসাহে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল—অন্ততঃ তাঁহার জীবৎ-কাল পর্য্যন্ত। আজ মরণের নিষ্ঠুরতা সেই অবরুদ্ধ সিংহকেও দেশের বুক হইতে ছিনাইয়া লইয়া এ জাতির প্রাণ একেবারে নিঃস্ব, রিক্ত, আশা-উৎসাহ-হীন করিয়া দিয়া গিয়াছে। পুস্তকখানি পড়িলে, এই ব্যথার শিহরণেই হৃদয় তোলপাড় করিয়া উঠে, অশ্রু-প্রবাহ রোধ করা সত্যই দুঃসাধ্য হয়। সুরেন্দ্রবাবুর লেখা এই দিক্ দিয়া ধন্য ও সার্থক হইয়াছে, ইহা আমরা অকুণ্ঠ চিত্তে বলিব। যতীন্দ্র-মোহনের চরিত্র-গরিমা এমন শ্রদ্ধার আলিম্পনে নিখুঁৎ সত্যোদ্দীপ্ত করিয়া ফুটাইয়া তোলা স্বল্প কৃতিত্বের পরিচয় নয়।

প্রত্যেক মহাপুরুষই তাঁহার নিজ ক্ষেত্রে সুমহান্—এখানে ব্যক্তিগত তুলনা শোভন নহে, উচিত নহে। লেখকের দুই একটী ক্ষেত্রে এরূপ উক্তি—যেমন যাত্রা-মোহনবাবুর সহিত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ঋণশোধের তুলনা বা দেশপ্রিয়ের সহিত সুভাষচন্দ্র বা অন্যান্য কারাদণ্ডিত দেশনেতার স্বাস্থ্য-ভঙ্গের তুলনা অথবা শ্মশান-শোভা-যাত্রার ঐতিহাসিক তুলনামূলক আলোচনা—সুরুচিসম্পন্ন পাঠকের অজ্ঞাতসারে মর্ম্মপীড়াদায়ক হইতে পারে—ইহাতে স্বমহিমোজ্জ্বল চরিত্রের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাপ্রকাশ তো হয়ই না, বরঞ্চ অকলঙ্ক শ্রদ্ধা-চিত্র নিজস্ব অতুলনীয়তায় আপনি ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ পায় না। আমরা ভবিষ্য সংস্করণে এই অন্যথা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থখানি নির্দ্দোষ, সর্ব্বত্রুটিবর্জ্জিত দেখিলে সত্যই আরও সুখী হইব।

লেখকের লিপি-কৌশল ও বিষয়সন্নিবেশশৃঙ্খলা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। পরিশেষে, তাঁহার ১০।৪ এলগিন রোডের যতীন্দ্রমোহনের বাটীখানি জাতীয় সম্পত্তি রূপে গ্রহণ ও যোগ্য স্মৃতিপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা প্রস্তাব সম্বন্ধে দেশপ্রিয়ের দেশবাসী দরিদ্র জনসাধারণের সামর্থ্যে যদি না কুলায়, তাঁহার যোগ্য সহতীর্থ শ্রীযুক্ত জে, সি, গুপ্ত প্রমুখ দেশলক্ষ্মীর বরপুত্রগণ কি কিছু করিতে পারেন না—আমরা এই প্রশ্নটুকু এখানে করিয়া রাখিলাম।

জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম—শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীগোকুলানন্দ গোস্বামী ৪০নং সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১৲ টাকা। বাঁধান মূল্য—১।০।

বাঙলার বৈষ্ণব-দর্শনের অন্তরঙ্গ তত্ত্ব ও রহস্য এমন সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ও মর্ম্মস্পর্শী করিয়া প্রকাশ করা যায়, ইহাতে আমরা নবীন গ্রন্থকারের অপূর্ব্ব কৃতিত্ব-পরিচয়ে সত্যই আনন্দ লাভ করিয়াছি। সম্বন্ধ, প্রয়োজন, অভিধেয় ভেদে ত্রিবিধ প্রকরণে গোস্বামী মহাশয় এই দার্শনিক চিন্তা ও সিদ্ধান্তগুলি প্রকট করিয়াছেন—কোথাও নীরস লাগে নাই, আগাগোড়া সমস্ত বিশ্লেষণের দ্বারা একটা আন্তরিক তন্ময়তায় বিমিশ্রিত হইয়া এমন আস্বাদ্য রস-নির্ঝরে পরিণত হইয়াছে, যাহা উপভোগ করিয়া অপরিসীম তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। কঠিন তত্ত্বকে এরূপ সরস, সজীব করিয়া তোলা শুধু লিপি-কুশলতা নহে, মরমী ব্যতীত অন্যের পক্ষে সম্ভব নহে। এই মনোরম বইখানি পড়িবার পর, বৈষ্ণব দর্শন ও সাধন-রাজ্যে অনুপ্রবেশ করিবার পক্ষে অনুকূল মানসিক ভিত্তি ও চিন্তা-প্রণালী লাভে সহায়তা হইবে, ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। গ্রন্থকারের নিজের ধর্ম্মশাস্ত্রে ও সাধনায় যথার্থ বিশ্বাস আছে, ইহা এ যুগে খুব মূল্যবান্ পরিচয় এবং তাঁহার এই বিশ্বাসের প্রেরণা তাঁহার লেখনী-মুখে কেমন অনুপ্রাণনাময় হইয়া ফুটিয়াছে, তাহা পরিশিষ্টের এই কয়েকটী ছত্র হইতে অবগত হওয়া যায়—"ধর্ম্ম ও ঈশ্বর-বিরোধী আন্দোলনের যে বিষাক্ত বাষ্প ক্রমে ক্রমে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িতেছে, অচিরকাল মধ্যে তাহা ঘনীভূত হইয়া উঠিলে, শেষ পর্য্যন্ত তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য ঈশ্বরের নিকট শক্তি ভিক্ষা করিয়া এখন হইতেই সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। যদি কাহারও সহযোগ না-ও পাওয়া যায়, তবে বিশ্বাসী সৈনিকের মত একা-একাই এই কলির মরণ ও নব-যুগের জাগরণ-যুদ্ধে অবিচলিত ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া—প্রয়োজন হইলে প্রাণ পর্য্যন্ত আহুতি দিবার জন্য এখন হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে। যথার্থ ভগবদ্বিশ্বাসের পবিত্র শোণিত যখন নির্য্যাতকের হাত গড়াইয়া বসুন্ধরার উপর নিপতিত হইবে, তখনই সেই শোণিতাহুতি হইতে কোটী কোটী

শুদ্ধ ভক্তের বিকাশ ও কলিপ্রভাবের সম্পূর্ণ বিনাশ সংঘটিত হইবে। শ্রীভগবানের অকৃত্রিম সেবক যাঁহারা তাঁহাদের ভক্তি ও বিশ্বাসের পূর্ণ পরীক্ষার দিন নিকটবর্ত্তী।”

আচার্য্য জগদীশপ্রসঙ্গ—শ্রীহরিদাস মজুমদার সম্পাদিত। প্রকাশক—অমৃত সমাজ, ৬নং মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা। মূল্য লেখা নাই।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শুধু বরিশাল নয়, সারা বাঙলার গৌরবের মানুষ ছিলেন—কিন্তু তিনি ছিলেন গুপ্ত আগ্নেয়গিরির ন্যায় ধর্ম্মবহ্নির প্রচ্ছন্ন বিগ্রহ-মূর্ত্তি, তাই ৺অশ্বিনীকুমারকে বাঙালী যতখানি জানে, জগদীশচন্দ্রকে ততখানি জানে না, জানিবার সুযোগ পায় নাই। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ঠিকই বলিয়াছেন—এ যেন এক মহাসাগর—যার পুণ্য চরিত্রের সম্যক্ প্রকাশ অল্প লোকেই ঠিক জানিতে ও বুঝিতে পারে। লোক-চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া তিনি ভারতের অগণ্য সাধুসন্তের ন্যায় নীরবে, নিরাড়ম্বরেই তাঁহার লোক-পাবন প্রভাব সর্ব্বত্র বিকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের আসল জীবন-চরিত্র—‘এক দিকে জন্ম আর এক দিকে মৃত্যুরূপে মলাট, মাঝখানে সব ফাঁকা”—ইহা তো নহেই, পরন্তু সবখানিই এমন পবিত্রতার শ্বাসে ঠাস-বুনান করা যে বাহিরে তাহার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা বৃথা, উহা আগাগোড়াই নিবিড় অনুভবময়। আচার্য্য জগদীশ এই শ্রেণীরই একজন যোগীও ভক্ত মানুষ ছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথায়—তিনি ছিলেন “অরুণোদয়ের পূর্ব্বে তোলা মাখনটুকুই”—“হোমা পাখীর জাত”, “কাঁচা সোণা” সত্যই !

এ যুগের বিশেষত্ব—নিজ মুক্তি-মোক্ষ, ধর্ম্মের স্বার্থপরতা ছাড়িতে হইবে। আচার্য্য জগদীশের প্রাণেও এই সুর কেমন গভীর তন্ত্রীতে বাজিত তাহা তাঁহার এই কথা হইতে প্রতীত হইবে—“নিজের মুক্তির জন্য এত লালায়িত কেন ? তোমার চারিপার্শ্বে তোমারই মত লক্ষ লক্ষ লোক বন্ধনের যাতনায় ছটফট করিতেছি...... স্বজাতীয় এই সকল লোককে পশ্চাতে ফেলিয়া তাহাদিগকে মুক্তিপথে লইয়া যাইবার কোনও ব্যবস্থা না করিয়া, নিজের নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিবার জন্য আকাঙ্খা কেন ? নিজের চিন্তা যে পরিমাণে ছাড়িতে পারিবে, সেই পরিমাণেই নিজের মুক্তি সাধিত হইবে। তোমার প্রাণ এবং অন্যান্য সকলের প্রাণ কি আলাদা ?”

এই জাতীয় কথা কাহার প্রাণে না অনুপ্রেরণা সঞ্চার করে ?

আচার্য্য নিজে রাধাকৃষ্ণ-যুগলমূর্ত্তির উপাসক ছিলেন ; কিন্তু মেরুদণ্ডহীন জাতিকে তিনি “তোমরা এখন বাঁশীর কৃষ্ণ ছেড়ে দাও, পার্থসারথির উপাসনা কর”—এই কথাই বজ্র-গর্জ্জনে বলিয়া গিয়াছেন !

বইখানি পাঁচ ফুলের সাজি হইলেও, ভক্তিরই শ্রদ্ধাঞ্জলী ; তাই পবিত্র ও উপাদেয়। ইহা কয়েকখানি চিত্রশোভিত।

মজুমদার

প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত, বি-এ প্রভানিকেতন, তুঙ্গেশ্বর-শ্রীহট্ট, দাম বার আনা।

গান-রচনায় গ্রন্থকার পরিচিত। তাঁরই বাছা বাছা ষোলটি সঙ্গীতের সমাবেশে এই কুঞ্জ রচিত। দশজন খ্যাত-অখ্যাত স্বরলিপিকার এই কুঞ্জের সুর সংযোজনা করিলেও, সে দিক্ দিয়া অনিন্দনীয়ই হইয়াছে। সঙ্গীত-শিক্ষার্থীর ইহা যথেষ্ট সহায়তায় আসিবে।

তবে সঙ্গীতগুলির ভাষা-ছন্দ-ভাবে রাবীন্দ্রিক ছায়া ও প্রভাবের প্রাচুর্য্যের মাঝে গ্রন্থকার রাহুগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অনুকরণে সাফল্য যথেষ্ট থাকিলেও, কবিতা বা গানে নিজস্ব মৌলিকতাই কবিকে চিরজীবি করিয়া রাখে।

“বিরহী তোর আঁখিজলের
　　　নদী পথ বেয়ে,
আস্‌বে আজ বঁধুয়া তোর
　　　ফুল-সুবাসে নেয়ে।”

বস্তুহীন মোলায়েম ভাষা-ছন্দের চমৎকারিত্ব হিয়ার অনন্ত আনন্দাবকাশের সম্ভাবনীয়তার উপরে উপরে একটু-খানি ছোঁয়া দিয়া যে ফুরফুরে নেশার উদ্রেক করে তা’ একান্তই ক্ষণিক—মানুষের চির-বুভুক্ষুতা ঘুচাতে পারে না। তবে একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়, পুস্তকখানি যে উদ্দেশ্যে রচিত তা’ সিদ্ধ হইবে।

কাগজ-ছাপা-বাঁধাই মনোরম।

“শ্রী”—কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রচার-বিভাগ হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা মহানগরীর প্রত্যেকটি নাগরিককে দেহ-মনোপ্রাণে সুন্দর ও সুশ্রী করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্য লইয়া ‘শ্রী’র প্রকাশ। শুধু কলিকাতা নয়, বাঙলার প্রতি গৃহস্থেরই ইহা পঠনীয়। ‘শ্রী’র ভাষা সহজ ও স্বচ্ছ এবং ছবির দ্বারা এমন সরল ভাবে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি বুঝান হইয়াছে, যে, যাঁরা যৎসামান্য লেখাপড়া জানেন তারাই অনায়াসে ইহা পড়িয়া বুঝিতে পারিবেন ও উপকৃত হইবেন।

‘শ্রী’র বহুল প্রচার প্রার্থনীয়।

বর্ত্তমান মৈমনসিংহ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বাঙলার বৃহত্তম জেলা মৈমনসিংহ। ইহার সুষ্ঠু পরিচয় এত অল্প পরিসরের মাঝে দেওয়া সম্ভব নয়। এজন্য ত্রুটি-বিচ্যুতি, বা অত্যুক্তি-অনুক্তি হওয়াটাই স্বাভাবিক। সময়ের স্বল্পতা ও লেখকের অযোগ্যতা বিবেচনায় প্রবন্ধের অনিচ্ছাকৃত মর্য্যাদাহীনতা ক্ষমার্হ হইবে, যদি ইহার অন্তরালের সদিচ্ছাটি ছোঁয়া দিতে পারে তাঁদের অন্তরকে, যাঁদের পরস্পর অকৃত্রিম পরিচয়োদ্দেশ্যেই ক্ষুদ্র এই প্রচেষ্টাটুকু।

আমরা দেশ-বিদেশের খবর রাখি, কিন্তু নিজের ঘরের সংবাদ জানি না। এই বহির্ম্মুখী দৃষ্টি ফিরাইয়া যত দিন না নিগূঢ় অন্তর্ম্মুখী করিতে পারি, তত দিন সত্য দরদ স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর প্রতি জাগে নাই বুঝিতে হইবে। সরকারী রিপোর্ট বা আদমসুমারীর হিসাব পড়া একটা জাতির আপনাকে জানার সবখানি নয়। বাঙলার শত শত পরিচিত-অপরিচিত পল্লী ছানিয়া যে কয়েকটী নগরী গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা সদ্য চুণকাম-করা জীর্ণ প্রাসাদের মত বিদেশীকে তুষ্টি দিতে পারে, কিন্তু জাতির অন্তর-সত্তা তাহাতে সান্ত্বনা পায় না—তার সে নীরব হাহাকার, বুকফাটা কান্নার মৌন জ্বালা নিরাময় হয় না। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী বলিয়া কলিকাতার যে গৌরব ও মহিমা দুনিয়ার দরবারে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে, তাহা ভাগ্যলক্ষ্মীর বরপুত্র বিলাস-পালিত আধুনিক সহরে সভ্যতা-গর্ব্বিত জন-কয়েকের হৃদয়ে হয়তো তৃপ্তি দিতে পারে; কিন্তু বুভুক্ষিত শতকরা নিরানব্বই জন নর-নারীরই উপবাস ইহাতে নিরসিত হয় না। সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শোণিত যদি মস্তিষ্কে গিয়া জড় হয়, তবে সে বিশিষ্ট স্থানটির স্পন্দন-চাঞ্চল্য লক্ষিত হইলেও তাহা আসন্ন মৃত্যুরই সূচনা করে। বাঙলার মরাপ্রাণে যদি আবার শক্তির জোয়ার খেলাইতে হয় তবে জাতির সুপ্ত চেতনায় আত্ম-পরিচয়ের 'প্রবোধনা জাগাইতে হইবে—স্বদেশ, স্ব-সমাজ, স্বীয় ভিটা-মাটির সকল নিজস্বতার প্রতি মমত্ববোধের সৃষ্টি করিতে হইবে আপন ভাই-স্বজন-পরিজনের পরিচয় লইতে যে-চিত্তের অসীম কার্পণ্য, তার তথাকথিত উদারতা, পর-জনের শুভেচ্ছা নিছক বিলাস বৈ আর কি হইতে পারে! অখণ্ড বাঙলার ঐক্য ও সংহতি সংগঠন পরস্পরগত এই অবিমিশ্র আত্ম-পরিচয়ের মধ্য দিয়াই সম্ভব হইবে।

জানিতে হইবে, আজ আমাদের বাঙলার প্রাণবস্তু, তার সেই অবহেলিত অনালোকিত গণ-সমাজকে। বাঙলার অজ্ঞাত বিচিত্র প্রতিভাকে আজ দিতে হইবে মুক্তি সমগ্র বাঙালীর অখণ্ড পরিচয়ের মাঝে। মর্য্যাদা দিতে হইবে আজ বাঙলার দীর্ঘ-দিনের অনাদৃত, অপমানিত চির-দৈন্যপীড়িত পথের ভাইকে। "ছেড়ে পরের ঠাকুর, ঘরের কুকুর ইচ্ছে করে মাথায় নিতে"—বাঙালী কবির এ মর্ম্ম-স্বপ্নকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে পরস্পরের প্রতি প্রেম ও অসীম দরদ দিয়া। বাঙলার অজ্ঞাত-অবজ্ঞাত পল্লীর, প্রতি গৃহের ও তার খুঁটি-নাটি ঘরকন্নার, অশন-বসন-চিত্রকলা, বিস্মৃত-লুপ্তপ্রায় অতীত গ্রামের জীবন-প্রেরণা ও কৃষ্টি-কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য সব কিছুরই নিখুঁত চিত্র আজ দরদী বাঙালী মাত্রেরই চিত্তে অঙ্কিত হওয়া চাই। প্রতীচীর ব্যর্থ অনুকরণে সহরে জাতীয় সভ্যতা ও উৎকর্ষকে কেন্দ্রীকৃত করার প্রয়াস ভারতীয় ভাববৈশিষ্ট্যের বিরোধী ধর্ম্ম। বাঙলার মত কৃষিপ্রধান দেশের পল্লীই দেশের শিক্ষা-সভ্যতার আকর-ভূমি। জাতির মেরুদণ্ড-স্বরূপ গণসমাজ আজ অশেষ দুঃখ-দৈন্য-জরা-ব্যাধি-প্রপীড়িত। শত অভাব-অনটন, রোগ-শোক, পচা পুকুর-খাল-ডোবা, দুর্ব্বিসহ দারিদ্র্য পল্লী-জীবনকে কেন্দ্র করিয়া অভিশাপের মতই সেখানকার নিত্য নৈমিত্তিক জীবন-যাত্রা দুঃসহ করিয়া তুলিয়াছে। জাতির সর্ব্বাঙ্গ আজ পক্ষাঘাতগ্রস্ত; সহরের যে প্রাণ-চাঞ্চল্য তাহা জীবন-প্রদীপের অবসানকালীন প্রখরতার মতই মোহময়। দেশও জাতিকে বাঁচাইতে হইলে, পল্লীকে পুনরুজ্জীবিত

করিতে হইবে। গণদেবতা আজ দাবী করে মনীষী বাঙালীর প্রজ্ঞায় তার সত্য পরিচয়ের ও প্রয়োজনীয়তার মর্য্যাদা। সকল আয়োজন-অনুষ্ঠানের ন্যায্য প্রাপ্য অগ্রভাগ হইতে গণেশ বঞ্চিত বলিয়াই দেশে এত অকল্যাণ ও অশান্তি। ফাঁকা স্তব-স্তুতিতে তার উপবাসী উদরের জ্বালা মিটিবে না—সে চায় আজ আলো-অন্ন-জীবন। তার সঙ্গে মেঠো সুরে সুর মিলাইয়া, সপ্রেমে গলাগলি ধরিয়া, হল চালনা করিয়া, কোদাল পাড়িয়া দরদী বাঙালীর আজ দিতে হইবে সেবা, গ্রহণ করিতে হইবে তার অন্তরের পরিচয়।

সারা বাঙলার যে সমস্যা, মৈমনসিংহেরও তাই।

একদা ছিল, এখন নাই—অসহায় দেশের সারা বুক জুড়িয়া স্মৃতির এই করুণ কান্না কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত!

সেই মৈমনসিংহ! সেই ব্রহ্মপুত্র নদ!

উত্তরের গারোগিরির সবুজঘন সৌন্দর্য্য-গাম্ভীর্য্য, পাখীর গান, বৃক্ষ-লতার শ্যামলিমা, সেই প্রকৃতি, সেই রবিকিরণ-বন-উপবন-ছায়া--উপচ্ছায়া-পথ-ঘাট--মাঠ--ভূমি তেমনি আজও বিরাজিত। এখনও বায়ু বহে, বর্ষা আসে—যায়, বসন্তে পুষ্প-পাখীর মেলা বসে, বছরের পাল-পার্ব্বণ উৎসব চক্রাকারে ঘুরিয়া যায়; কিন্তু কোথায় সে সমাজ-মানুষের জীবনের সমারোহ, প্রাণের উদ্দীপনা-উৎসাহ, উৎসবের উৎফুল্ল-মুখরতা, হিয়ায় হিয়ায় সে নিশ্চিন্ত জীবনের আনন্দগীতি, গোয়াল-ভরা গরু, মরাই-ভরা ধান্য-শস্য, খাল-বিল-পুকুরের মাছ, ঘি-দুধ প্রভৃতি পুষ্টিকর ভেজালবিহীন খাদ্যোপকরণ, বাগানের সদ্য শাক-সব্জী-ফল-মূল, দীর্ঘ জীবনের সুনিশ্চয়তা! আঙ্গিনাময় আলিপনা, গৃহস্থ-বধূর সাঁজ-সকালের মঙ্গল শঙ্খধ্বনি, হাতে কাটা সূতার তাঁতে-বোনা পোষাক-পরিচ্ছদ, স্বল্পাভাবের মাঝে ভোগের প্রাচুর্য্য, সহজ-সরল-নাচ-গান-ছড়া-ভাসান-কবিতা, প্রাণের অনাড়ম্বর স্ফূর্ত্তি—জীবনের সকল রস বর্ত্তমানে ম্রিয়মাণ।

হিন্দু-মুসলমান সকল জাতি-নির্ব্বিশেষে ঐ একই অবস্থা।

প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের নীচেই অন্ধকার, বিশাল মহীরুহের আওতায় সংখ্যাহীন তরু-গুল্ম-লতা আলোকের আকুলতায় উদগ্রীব! আলো ও বৃক্ষের গর্ব্বিত শিরই যেমন দূর হইতে প্রথমে নয়নকে অভিনন্দিত করে এবং তাহাই যেমন ইহার সবখানি সত্য নয়, তেমনি শৌর্য্যে-বীর্য্যে-ঐশ্বর্য্যে-গৌরবে, শিক্ষায়-দীক্ষায়, রাষ্ট্রে-সমাজে, শিল্প-সাহিত্যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে মৈমনসিংহের যে সকল কৃতী সন্তান আজ সাফল্যবান্ তাঁহাদের জীবন-পরিচয়ই বাঙলার এই বৃহত্তম জেলার সবখানি ইতিহাস নয়। কিন্তু তবুও এই প্রাথমিক প্রচেষ্টায় বিশেষভাবে তাঁদের কথাই আংশিকভাবে কীর্ত্তন করিবার প্রয়াস করা হইয়াছে।

ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান

বুদ্ধের ধর্ম্ম-প্লাবন যখন থিতাইয়া বাঙলায় পুনঃ ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম মাথা তুলিয়া উঠে, সে-সময়ে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রভাব মৈমনসিংহ তথা পূর্ব্ব বাঙলায় বিশেষ করিয়া নিম্ন-শ্রেণীর মধ্যে ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করিতে পারে নাই। তাই বোধহয় আধুনিক বাঙলার যুগ-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনে ও প্রচারে পূর্ব্ব বাঙলার আব্‌হাওয়ায় শ্রীচৈতন্য-রামমোহন-রামপ্রসাদ-রামকৃষ্ণ-কেশবচন্দ্র-বিজয়কৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মত ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক অবতারকল্প মহাপুরুষের জন্ম সম্ভব হয় নাই। তবে নদীমাতৃক পূর্ব্ববঙ্গের প্রাণ-শক্তি বাঙলার যুগ-ধর্ম্মান্দোলনে যে পুষ্টি বিধান করিয়াছে ও করিতেছে, তাহাতে মৈমনসিংহের অবদান অকিঞ্চিৎকর নয়।

অনড় অসাড় গতানুগতিক কু-সংস্কারাচ্ছন্ন বাঙলার বুকে যে-দিন নব্যবাঙলার প্রতীক আলোকদূত রামমোহন ধর্ম্ম-সমাজ-সংস্কারমূলক তাঁর নূতন আলো, নূতন বাণীর বিদ্রোহ-বন্যা বহাইলেন, উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সে-বন্যা মৈমনসিংহের কূলেও গিয়াও পৌছিল—যাহার ফলে, সেখানে সাধারণ ও নববিধান ব্রাহ্মসমাজের দুইটি ব্রাহ্ম-মন্দির স্থাপিত হয়। তারপর, এই আন্দোলনের পরিপুষ্টি সাধন করেন ১৮৬৬ খৃঃ অঃ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম-প্রচারক ৺কেশবচন্দ্র সেন ও ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু ও শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের সমর্থনে ইহা আরও সজীব হইয়া উঠে। পরিণত জীবনে

পূর্ব্ব বাঙলায় ৺বিজয়-কৃষ্ণের ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারের ফলে এবং মৈমনসিংহের তৎকালীন রক্ষণশীল সনাতনী সমাজের প্রতিক্রিয়ায় ব্রাহ্ম ধর্ম্মান্দোলনে পুনরায় ভাঁটা সুরু হয়। ১৮৬৬ সালে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রতিরোধার্থ যে 'ধর্ম্মজ্ঞান-প্রদায়িনী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার নিয়মিত সাপ্তাহিক অধিবেশন আজ পর্য্যন্ত মৈমনসিংহের দুর্গাবাড়ীতে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

মৈমনসিংহ জেলার যে সকল ধর্ম্মপ্রাণ সু-সন্তান বর্ত্তমানে নীরব সেবা ও সাধনায় ব্যাপৃত থাকিয়া ধর্ম্মের পুষ্টি-বিধান করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে মাত্র কয়েক জনের কিঞ্চিৎ পরিচয় এখানে দেওয়া গেল।

১০৮ শ্রীমদ্ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি (মহান্ত মহারাজ)

১০৮ শ্রীমদ্ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি—(ইঁহার নাম ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।)

স্বামী মহাদেবানন্দ টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত পাথরাইল গ্রামে বরেন্দ্রশ্রেণীর লাহিড়ীবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীপরেশচন্দ্র লাহিড়ী ইঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম। ইনি মৈমনসিংহ বারের কৃতী উকীল ছিলেন এবং গার্হস্থ্যাশ্রমেও ইঁহার দান ধ্যান ও ধর্ম্মপ্রাণতার জন্য যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। সংসার-বিরাগী হইয়া তিনি হরিদ্বারের ১০৮ শ্রীভোলানন্দগিরি মহারাজের নিকট দীক্ষাগ্রহণ পূর্ব্বক বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন এবং গুরুর আশ্রমে থাকিয়া বেদ-উপনিষদ্-স্মৃতি ইত্যাদি বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। দশ বার বৎসর পূর্ব্বে সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক তিনি কঠোর সাধনা ও সারা ভারত পর্য্যটন করেন। ১৯২৯ সালে শ্রীশ্রী৺ভোলানন্দ গিরি মহারাজের মহাসমাধির পূর্ব্বে শ্রীমৎ মহাদেবানন্দগিরি মহারাজকেই সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত বিবেচনা করায় তিনি মঠাধ্যক্ষের গদীতে মনোনীত করিয়া যান। ইঁহার বর্ত্তমান বয়ঃক্রম প্রায় ৬৫ বৎসর। শ্রীশ্রী৺ভোলানন্দ-গিরি-মহারাজ-প্রতিষ্ঠিত সারা ভারতের অধ্যাত্মচক্রের ইনিই এখন মোহন্ত মহারাজ। বাঙালীর ইহা কম গৌরবের কথা নহে।

স্বামী অখিলানন্দ—ময়মনসিংহ জেলার, নেত্রকোণার মহকুমার অন্তর্গত নওপাড়া গ্রামে জন্ম। ইনি নেত্রকোণার

স্বামী অখিলানন্দ

প্রসিদ্ধ উকিল এবং রাষ্ট্রীয় নেতা শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর দ্বিতীয় পুত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি,-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি ১৯১৭ সনে শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনে যোগদান করেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মিশনের মান্দ্রাজ-কেন্দ্রে অবস্থান করেন। ১৯২৬ সনে ইনি আমেরিকায় বেদান্ত-

প্রচারার্থে শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন কর্ত্তৃক প্রেরিত হন। প্রথমে ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত লাক্রেসেণ্টা কেন্দ্রে তিনি কার্য্য করেন, পরে বোষ্টন্ সহরের বেদান্ত-কেন্দ্রে কিছুকাল কার্য্য করিয়া রোড্ আইলাণ্ড প্রদেশের অন্তর্গত প্রভিডেন্স সহরে বেদান্ত-কেন্দ্র স্থাপন করেন। ইনি প্রভিডেন্স সহরে বেদান্ত-কেন্দ্রের নিজস্ব গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং ইনিই এই কেন্দ্রের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ।

স্বামী বিবিদিষানন্দ—ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত, নওপাড়া গ্রামে ইঁহারও জন্ম। কলিকাতা

স্বামী বিবিদিষানন্দ

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯১৭ সনে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনে যোগদান করেন। প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে তিনি অবস্থান করেন এবং কিছুকাল ঐখানে থাকিয়া, "প্রবুদ্ধ ভারত" ইংরেজী মাসিক পত্রিকার সম্পাদকতা করেন। পরে তিনি কাথিয়াওয়াড় প্রদেশের রাজকোট্ সহরস্থিত মিশনের কেন্দ্রে যোগ দেন। ইনি ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় গমন করিয়া স্যানফ্রান্সিস্কো সহরের বেদান্ত-কেন্দ্রে থাকিয়া প্রচার-কার্য্য করেন ও পোর্টল্যাণ্ড্ (অরিগণ) সহরে বেদান্ত-কেন্দ্রের অধ্যক্ষ হন। বর্ত্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের ওয়াসিংটন্ সহরের বেদান্ত-কেন্দ্রের ইনি অধ্যক্ষ।

স্বামী আত্মবোধানন্দ—ময়মনসিংহ জেলার, নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত নওপাড়া গ্রামে ইঁহারও জন্মস্থান। ইনি ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনে যোগদান করেন। প্রথমে মিশনের ৺কাশী অদ্বৈত আশ্রমে অবস্থান করিয়া ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম হইতে পরিচালিত "প্রবুদ্ধ ভারত" ইংরেজী মাসিক পত্রের কর্ম্মাধ্যক্ষ-রূপে তিনি মায়াবতী গমন করেন। তিনি বহু বৎসর এই কার্য্যে এবং এই আশ্রমের পুস্তক-প্রকাশ-বিভাগের কার্য্যে থাকিয়া, পরে বেলুড়-মঠে আগমন পূর্ব্বক কার্য্যপরিচালনাসমিতির সভ্য-রূপে মঠে কার্য্য করেন। কয়েক বৎসর হইল ইনি শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের গভর্ণিং-বডির সভ্য এবং বেলুড়-মঠের ট্রাষ্টী-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন; এতদ্ব্যতীত, মিশনের কতিপয় শাখা-কেন্দ্রের পরিচালনাসমিতির সভ্যও আছেন। বর্ত্তমানে ইনি কলিকাতায় বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ এবং উদ্বোধন কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ।

স্বামী নরোত্তমানন্দ—ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মহকুমায় ইঁহার বাড়ী। ইনি বহু বৎসর যাবৎ শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের কাশী-সেবাশ্রমে কার্য্য করিয়া কিছু কাল প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার পদে ছিলেন। বর্ত্তমানে ইনি ৺কাশীতেই অবস্থান করিতেছেন।

স্বামী সচ্চিদানন্দ—ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত নেত্রকোণা মহকুমায় ইঁহার জন্ম। ইনি বহু বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের "উদ্বোধন" কার্য্যালয়ে অবস্থান করেন। বর্ত্তমানে ইনি ময়মনসিংহ সহরে মিশনের শাখা-কেন্দ্রের অধ্যক্ষ।

এই প্রসঙ্গে জামালপুর মেলান্দহ গ্রামের শ্রীসুরেশচন্দ্র নাহা, শ্রীরাজেন্দ্রকিশোর লোহ ও শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর লোহের দেশ ও ভগবানের জন্য প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘে জীবনোৎসর্গও উল্লেখযোগ্য। শ্রীসুরেশচন্দ্র নাহা বর্ত্তমানে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের চন্দননগর-কেন্দ্রে আত্মদান করিয়া আছেন এবং শেষোক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের আত্মোৎসর্গের ফলেই মেলানন্দহ প্রবর্ত্তক আশ্রম প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে।

মৈমনসিংহে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান বা তীর্থ নাই। রামকৃষ্ণ-মিশন, রামকৃষ্ণ-প্রতিষ্ঠান, মেলান্দহ প্রবর্ত্তক আশ্রম প্রভৃতি ক্ষুদ্র সংগঠন হইলেও, শিক্ষা-সেবা-সংচর্চ্চা ইত্যাদির মধ্য দিয়া বিভিন্ন-ভাবে ধর্ম্মাদর্শ টুকু বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। এখানে পল্লীর ধর্ম্মপ্রেরণা ফুটিয়া উঠে সাধারণতঃ কীর্ত্তন, কথকতা, কবি, ছড়া, মনসার ভাসান প্রভৃতির মধ্য দিয়া। পীর, ফকীর, আউল, বাউল, বৈষ্ণব প্রভৃতি আখড়ার ভিতর দিয়া পুরুষানুক্রমিক ধর্ম্মভাব সঞ্চারিত হইয়া আসিতেছে। প্রায় প্রত্যেক হিন্দু জমিদারী বা রাজবাড়ীতে ঠাকুর-সেবার বন্দোবস্ত থাকিলেও, নৈমিত্তিক পূজা-পার্ব্বণ ব্যতীত সাধারণের পক্ষে উহা সাধারণতঃ অগম্য ও অনুপভোগ্য। ধর্ম্মপ্রাণতার বীর্য্য-শক্তি-নিষ্ঠা হিন্দুর অপেক্ষা বোধহয় মুসলমানেরই অধিক। হিন্দুর পুরাতন মন্দিরে যেখানে প্রাণ ও সংস্কারাভাবে হাহাকার উঠিয়াছে, তার পার্শ্বেই স্বচ্ছধবল মুসলমানের মজসিদ সদ্য জাগরণ-চাঞ্চল্যে হাস্যময়। ইতস্ততঃ মুসলমানের সমবেত ধর্ম্মোপাসনার এই শুভ্রকেন্দ্রগুলি তাহাদের স্বধর্ম্মনিষ্ঠারই পরিচায়ক।

শিক্ষা ও শিক্ষায়তন

এই সেদিনের কথা! বিজাতীয় ভাবধারার প্রবল বন্যামুখে ভারতীয় কৃষ্টি, শিক্ষা, সাধনা ও সংস্কৃতির জলন্ত পাবক-মূর্ত্তি পরিলক্ষিত হয় মৈমনসিংহের গৌরব, বাঙলার পূজ্য, নিখিল ভারতের নমস্য স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের মধ্যে। তাঁর অপূর্ব্ব প্রতিভা, সুতীক্ষ মেধা, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য বিশ্ব-বিশ্রুত। ৺তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রতিভার অমর অবদান ভারতীর অমূল্য সম্পদ্। প্রতীচীর ম্যাক্স্‌মূলার প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁর জ্ঞান-গবেষণায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। মৈমনসিংহ জেলা তাঁর জ্ঞান-গরিমায় গৌরবদৃপ্ত।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীগোপালচন্দ্র বসু মল্লিক, ও মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্র-নাথ তর্কবেদান্ততীর্থ এবং বিদ্যাসাগর কলেজের ভূতপূর্ব্ব

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার

অধ্যক্ষ স্বর্গীয় সারদারঞ্জন রায় মহাশয়ের প্রাচ্য-প্রতীচ্য শিক্ষাধারার একটা সুষ্ঠু সামঞ্জস্য পরিদৃষ্ট হয়। ইঁহারা প্রত্যেকেই আধুনিক মৈমনসিংহের সংস্কৃত শিক্ষার দিক্‌পাল।

অন্য দিকে, স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়কে এ জেলায় প্রতীচ্য শিক্ষার অগ্রদূত বলা যায়। বিবিধ কারণে তাঁর পিতৃবাসভূমি জয়সিদ্ধি গ্রাম আজ মৈমন-সিংহের স্মরণীয় তীর্থ। র‍্যাঙ্গলার পরীক্ষার প্রথম সম্মান ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই লাভ করেন। মৈমনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ ও তৎ-সংলগ্ন স্কুল তাঁরই সমুজ্জ্বল কীর্ত্তি। ইংরাজী শিক্ষায় স্বর্গীয় বসু মহাশয়ের প্রদর্শিত পথে চলিয়া আজ মৈমনসিংহের বহু কৃতী সন্তান নিখিল বাঙালীর জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছেন। তাই বসু মহাশয়কে আধুনিক মৈমনসিংহের স্রষ্টা বলিলেও বোধহয় অত্যুক্তি হয় না।

স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসুর রাষ্ট্র-ও-শিক্ষান্দোলনের সহযোগী শ্রদ্ধেয় রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ রায় মহাশয় জেলার

শিক্ষাপ্রসারে সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী আত্মনিয়োগ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁর বর্ত্তমান বয়ক্রম প্রায় ৯৩ বৎসর। মৈমনসিংহ কলেজের প্রথম বোধন হইতে তিনি উহার

স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু

সেক্রেটারীরূপে সেবা করিয়া আসিতেছেন। মৈমনসিংহ মেডিক্যাল স্কুল ও অন্যান্য বহু সদনুষ্ঠানের সঙ্গে জেলার এই প্রাচীনতম (grand old man) ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট।

মৈমনসিংহের ভূতপূর্ব্ব খ্যাতনামা উকিল ও টাঙ্গাইলের জমিদার স্বর্গীয় অনাথবন্ধু গুহ মহাশয়ের নামও জেলার শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আধুনিক মৈমনসিংহ সৃষ্টিতে তাঁর দান যথেষ্ট। তাঁরই বদান্যতায় কাশী রামকৃষ্ণ-মিশনের একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত। মৈমনসিংহ মৃত্যুঞ্জয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও রাধাসুন্দরী মহিলা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাও তিনিই।

বাঙলার আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে মৈমনসিংহের সুযোগ্য সন্তানগণ যে কতদূর অগ্রগামী তাহা একমাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহাদের প্রাধান্য ও বিশিষ্ট পদ-মর্য্যাদা হইতেই অনুমান করা যায়। ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল।

শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—রেজিষ্ট্রার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার। তাঁর অসীম কর্ম্মদক্ষতা সর্ব্বজন-প্রশংসিত। ইনি কিশোরগঞ্জ, মাধকোলা নিবাসী।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এম-এ (টাঙ্গাইল, ভাড়্রা নিবাসী) নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র ঘোষের কৃতী পুত্র। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তিনি সকল পরীক্ষায় বৃত্তি ও প্রথম স্থান অধিকার করেন। বিখ্যাত গণিতশাস্ত্রবিৎ গৌরীশঙ্কর দের মৃত্যুর পর তাঁর স্থানে স্কটিশচার্চ্চ কলেজে কিঞ্চিদধিক তিন বৎসরকাল তিনি কার্য্য করেন এবং ঐ সময়ে তিন বারই ঐ কলেজ গণিতশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করে। তারপর স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের লেক্‌চারার করিয়া শ্রীযুক্ত ঘোষকে লইয়া আসেন এবং তদবধি তিনি এখানেই আছেন। বিভিন্ন বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া তিনি তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ১৯১৪ সন হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া এম-এ, এম-এস-সি পর্য্যন্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধীন সমস্ত পরীক্ষার একাধারে প্রশ্নপত্র-কারকের, পরীক্ষকের ও টেবিউলেটরের কার্য্য করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় (Compulsory) গণিতের প্রধান পরীক্ষক এবং ১৯২৭ সাল হইতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সভ্য (Fellow) ও কলিকাতা কর্পোরে-

শনের কাউন্সিলর আছেন। ১৯৩২ সাল হইতে কাউন্সিল অফ পোষ্ট-গ্রাজুয়েট টীচিং ইন আর্টস এণ্ড সাইন্সের সেক্রেটারী-রূপে তিনি অতি দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। ইহা ছাড়াও, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত গণিত, ভূগোল, সংস্কৃত সম্বন্ধীয় বোর্ডের সভ্য।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ

সতীশবাবুর বর্ত্তমান বয়ক্রম মাত্র ৪৪ বৎসর—এই বয়সে তাঁর অভিজ্ঞতা ও প্রতিভা অতীব প্রশংসনীয়।

শ্রীযুত নীহার রঞ্জন রায় এম-এ, পি-আর-এস (কিশোরগঞ্জ), শ্রীযুক্ত সরোজকুমার দাস এম-এ, পি-এইচ-ডি, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী এম-এ, পি-এইচ-ডি, অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ (নেত্রকোণা, নপাড়া), অধ্যাপক শ্রীরজনীকান্ত গুহ এম-এ, অধ্যাপক শ্রীকুমুদবন্ধু রায় এম-এ প্রমুখ কৃতবিদ্যগণ প্রত্যেকেই অভিজ্ঞ, খ্যাতিমান্ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্নস্বরূপ।

কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক মিঃ ডি, এম বোস, (Ghose Prof. of Physics), ডাক্তার শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ডি-এস-সি, পি-আর-এস প্রমুখ বিজ্ঞানবিদের গবেষণামূলক কৃতিকে মৈমনসিংহ কেন নিখিল বাঙলা
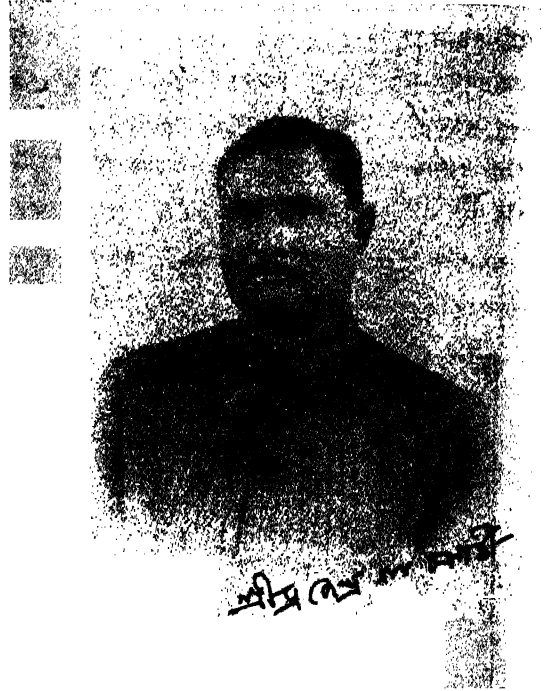
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

গৌরবান্বিত। নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত রাঘব গ্রামে ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর নিবাস। তাঁহার বিশেষত্ব এই, যে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ রমণের নিকট গবেষণায় নিযুক্ত থাকিয়া সমস্ত ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন। ১৯২১ সালে তিনি রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি ও ১৯২২ সনে ডি, এস, সি উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার বহু গবেষণার ফল ছাত্রপাঠ্য উচ্চাঙ্গের পদার্থবিজ্ঞান-বিষয়ক নানাগ্রন্থে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে।

এ ছাড়া, কলিকাতার বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন টাঙ্গাইল-নিবাসী অধ্যাপক শ্রীরজনী কান্ত গুহ (ভাইস প্রিন্সিপাল, সিটি কলেজ), অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রকিশোর চৌধুরী (বিদ্যাসাগর কলেজ), অধ্যাপক শ্রীশৈলজারঞ্জন রায় (বিদ্যাসাগর কলেজ), মহামহোপাধ্যায় শ্রীযামিনীকান্ত তর্কতীর্থ (সংস্কৃত কলেজ) ও নেত্রকোণা, নপাড়া-নিবাসী অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (প্রেসিডেন্সী কলেজ) ও শ্রীযুত বীরেন্দ্রকুমার দে এম-এ, বি-এল অধ্যাপক ল' কলেজ (নেত্রকোণা)।

মৈমনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে বর্ত্তমানে অধ্যাপনা কার্য্যে রত আছেন—

অধ্যাপক শ্রীকুমুদনাথ চক্রবর্ত্তী এম-এ, পি এইচ-ডি (সদর মহকুমা)। ইনিই বর্ত্তমানে কলেজের অধ্যক্ষ। তাঁহার কার্য্যকুশলতা, বিপুল অভিজ্ঞতা ও গভীর জ্ঞান অতীব প্রশংসার্হ।

অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী (সদর মহকুমা) উক্ত কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ। ইনি ঢাকা জগন্নাথ

ডাক্তার সুরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী,
এম-এ, পি-এইচ-ডি, এম-আর-এ-এস;

কলেজের ও তৎপর মৈমনসিংহ 'সিটি কলেজের' অধ্যক্ষ স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠ কিশোর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র। ইনি একধারে ঐতিহাসিক, অর্থনীতিশাস্ত্রবিৎ ও বিশেষ করিয়া মুদ্রাতত্ত্বাভিজ্ঞ। মুদ্রাতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনায় ইনি বাঙালীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম 'The Nelson Bronze Medal" প্রাপ্ত হন।

অধ্যাপক শ্রীগিরীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (পদার্থবিজ্ঞান)—নিবাস নেত্রকোণা, রাঘবপুর।

অধ্যাপক মোহিনীমোহন রায় এম-এ, বি-এল, বেদতীর্থ (সংস্কৃত)। ইনি সাহিত্য-শাস্ত্রী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র রায় মহাশয়ের তৃতীয় সন্তান।

অধ্যাপক শ্রীসুধেন্দ্ররঞ্জন রায় এম-এ, (কিশোরগঞ্জ)।

এতদ্ব্যতীত, বাঙলার বাহিরে এই জেলার যে সকল কৃতী সন্তান উচ্চ শিক্ষা ও জ্ঞানগর্ভ গবেষণায় ব্রতী থাকিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত (পাটনা), অধ্যাপক শ্রীনিরঞ্জন নিয়োগী (পাটনা, ইনি দেশ-সেবক শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর ভ্রাতা) ও বেনারস সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য।

বিচিত্র উৎকর্ষ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এই জেলার অবদান বাঙলার কৃষ্টির ক্ষেত্রে একটা মহনীয় স্থানাধিকার করিয়াছে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সাহার রুশিয়ায় গ্যাস-বার্ণার (Gas-burner) সম্বন্ধীয় গবেষণা বিশেষ মৌলিকত্বের পরিচায়ক। সে দেশের বিজ্ঞানবিদ্‌গণও তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রতিভার যথেষ্ট সমাদর করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে মহাশয় কয়েক বৎসর হইল কেম্ব্রিজের 'র‍্যাঙ্গলার' পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন এবং ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায়ও বেশ সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হইয়া বর্ত্তমানে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। জ্ঞানগরিমায় সেরপুর-নিবাসী স্বর্গীয় বনোয়ারীলাল চৌধুরী কীর্ত্তিমান্ পুরুষ। তিনিই সম্ভবতঃ বাঙালীর মধ্যে লণ্ডনের সর্ব্বপ্রথম ডি-এস-সি। দীর্ঘদিন যাবৎ ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের সুপারিণ্টেনডেণ্ট থাকিয়া তিনি জ্ঞান-গবেষণা করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের বোটানিক্যাল সার্ভে বিভাগের কিউরেটর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বল মহাশয়ের নামও স্মরণীয়। সদর, উস্তি গ্রামে ইঁহার বাড়ী, বিলাত হইতে ইনি উদ্ভিদ্-বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হইয়া আসেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবু অতি ধর্ম্মপ্রাণ ও মহাশয় ব্যক্তি।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র রায়, এম্-এ, বর্ত্তমানে শিক্ষা-বিভাগে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। রসায়ণশাস্ত্রের

সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় ইনি প্রথম হন। চট্টগ্রাম কলেজে সহকারী অধ্যক্ষ-রূপে কিছুকাল কার্য্য করার পর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে যোগদান করেন। তিনি কিছুদিনের জন্য অস্থায়ী এসিস্‌টেণ্ট ডিরেক্টরের পদে উন্নীত হন। বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় প্রেসিডেন্সী ডিভিসনের শিক্ষা-বিভাগের ইনস্পেক্টর।

সন্তোষের সদাশয় জমিদার কুমার শ্রীহেমেন্দ্রনাথ রায়-চৌধুরী মহাশয় কেবলমাত্র নিজেই একজন শিক্ষিত ব্যক্তি নন, পরন্তু তাঁর উৎসাহ, সহানুভূতি ও দানে অনেকেই শিক্ষালাভে কৃতার্থ হইয়াছেন। ধনীর সন্তান হইয়াও তাঁর মত উৎকর্ষ-সম্পন্ন ব্যক্তি বিরল। তিনি আই-এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়া ডাকবৃত্তি এবং বি-এ গণিতের সম্মান-স্চক পরীক্ষায় প্রথম হইয়া কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ঈশান-বৃত্তি লাভ করেন। এম্‌-এ পরীক্ষায়ও তিনি প্রথম শ্রেণীর প্রথম হন। কলিকাতায় তাঁর বাসাবাড়ীতে প্রায় বিশজন ছাত্র থাকিয়া শিক্ষালাভ করেন। তাহা ছাড়া, মৈমনসিংহ ও তাহার বাহিরে বহু অনুষ্ঠান ও বিপদাপন্ন জন তাঁহার মৌন-নিভৃত-দানে প্রবৃদ্ধ ও উপকৃত।

কিন্তু আলোর পাশে নিবিড় ঘন আঁধার আরও প্রখরতর হয়। একদিকে উৎকর্ষের এই সকল উজ্জ্বল স্তম্ভ আর একদিকে গণ-সমাজের জমাট অজ্ঞানান্ধকার। আদম-সুমারীর হিসাব-মতে অক্ষরজ্ঞ অর্থাৎ যারা নামটি কোন প্রকারে সহি করিতে পারে তাদের শিক্ষিতের হিসাবে ধরিয়া এই জিলায় শতকরা শিক্ষিতের হার হিন্দুর প্রায় ১৩ এবং মুসলমানের ৪, সমগ্র জেলায় গড়ে ৭·৪।

সাধারণ শিক্ষাপ্রচারের জন্য মৈমনসিংহের মত বিপুলকায় জনবহুল জেলায় বর্ত্তমানের যে ব্যবস্থা তাহা অতি অপ্রচুর। মৈমনসিংহ জেলায় মাত্র দুইটি কলেজ—আনন্দমোহন কলেজ (প্রথম শ্রেণী) ও সাদত কলেজ (দ্বিতীয় শ্রেণী) এবং প্রায় সত্তরটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। আনন্দমোহন কলেজের বর্ত্তমান ছাত্র-সংখ্যা নয় শত, কলেজ-প্রাঙ্গনে চারিটী বৃহৎ ছাত্রাবাস ও একটি আধুনিক ধরণের ব্যায়ামাগার আছে। সদর সহরে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছয়টী এবং প্রত্যেক মহকুমায়ই উহার সংখ্যা একাধিক। তাহা ছাড়া, প্রায় প্রতি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামেই নিম্ন-প্রাইমারী, উচ্চ প্রাইমারী, মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়, টোল, মকতব্‌ প্রভৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে জেলা বোর্ডের সাহায্যে চলিতেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা ১২৪৬ এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দেড় লক্ষের উপর। সদরে জেলা-বোর্ডের সাহায্যপ্রাপ্ত একটি বোবা-স্কুলও স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে অর্থ-সঙ্কটের জন্য প্রায় সমস্ত বিদ্যালয়গুলিরই অবস্থা শোচনীয়। কৃষিপ্রধান জেলায় চাষীর দুরবস্থার জন্য ছাত্রসংখ্যাও ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। জ্ঞানোপার্জ্জনের এই ক্ষেত্রগুলিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক কলহে কলঙ্কিত। মৈমনসিংহ জেলার উচ্চালোকপ্রাপ্ত গৌরবস্থানীয় যাঁরা তাঁরা যদি অনালোকিত মনের এ কলঙ্ক-কালিমা অপসারিত করিতে সচেষ্ট না হন, তবে শিক্ষার সুফল না ফলিয়া সারা জেলা অজ্ঞানের ঘন তিমিরেই ক্রমশঃ ডুবিয়া যাইবে।

আনন্দমোহন কলেজ—মৈমনসিংহ

(আগামীবারে সমাপ্য)

ভ্রান্তি-বিভ্রাট

(উপন্যাস)

একাদশ পরিচ্ছেদ

ফরসা হয়ে' গেছে। বিছানা ছেড়ে' ওঠার শক্তি যেন আজ আর জ্যোৎস্নার নাই। চিৎ হয়ে' নেটের মশারীর ছাঁদার ভেতর দিয়ে, সে রঙ্গীন্ বরগাগুলোর দিকে উদাসীন দৃষ্টিতে চেয়েছিল। মনে হচ্ছিল, বিছানা ছেড়ে' সে আর উঠ্‌বে না জীবনে। কি যেন এখন কিছু ঘটে' গেছে, যা আর মুছবে না কোনদিনই ; আর সেই ঘটনার কলঙ্কে তার জীবনের সবখানি শুভ্রতা চিরদিনের মতই ঢাকা পড়ে' গেছে। প্রতিদিন ঘুমভাঙ্গার পর সে তার ঘুমন্ত স্বামীর মুখখানির দিকে চেয়ে থাকে দুই চার মিনিট, সেই করুণ চাহনীর স্পর্শে রঞ্জনের আঁখি-পল্লব খুলে' যায়, চন্দ্রসুধায় সরোবরের পঙ্কজ যেমন ফুটে' উঠে ; কিন্তু রঞ্জনের পুলকে সুষমায় ধীরে ধীরে ঠিক তেমনি করেই' আঁখি আবার মুদে' যায় অতৃপ্তির অবসন্নতায়—কেননা, চার চোখের চাওয়া-চাওয়ি হ'লেই জ্যোৎস্না অকস্মাৎ মুখ ফিরিয়ে একলম্ফে বিছানা ছেড়ে' উঠে' যায়।

রঞ্জন পড়ে' থাকে বিছানায় অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ নির্জীব হয়ে। কাজের পর কাজ, দিবারাত্রি জ্যোৎস্নার আর অবকাশ হয় নাই যে রঞ্জনের সঙ্গে দুই দণ্ড হাসে, কথা কয় ; অধিকাংশ সময়ই পড়াশুনায় কেটে যায় ; সে মনে করে, তিনকড়ির সঙ্গে তার এখন খুবই ঘনিষ্ট পরিচয়, যেহেতু সন্ধ্যা হ'তে আর তর্ সয় না, জ্যোৎস্না বেরিয়ে যায় টকি দেখ্‌তে। খুব মজা। এই সব চিন্তা জ্যোৎস্না শুয়ে শুয়ে ভাব্‌ছিল ; পাশে কিন্তু আজ রঞ্জন নাই, তার উৎকণ্ঠিত মনোজগৎ তার কাছে উন্মুক্ত জাগ্রত হ'য়ে উঠেছিল।

ভাব্‌তে ভাব্‌তে তার নিজের ঠোঁটেই ঔদাস্যের হাসি ফুটে উঠ্‌ল—ভাবনার পর্দ্দা গেল আবার উল্টে'। সে কি টের পায় না—কি ব্যথায় দিন তাহার কাটে ! পুরুষ যেমন চায় নারীর সবখানি হৃদয় নিজের মুঠার মধ্যে ধরে' রাখ্‌তে, নারীরও যে সে অধিকার আছে ষোল-আনা—সে কেন তা' অস্বীকার কর্‌বে ! নারী, সেও যে সর্ব্বাগ্রে মানুষ। পুরুষের মত তারও হৃদয়বৃত্তি অজাগ্রত নয়—যেখানে তার পরিপূর্ণ অধিকার, তা' থেকে সে বঞ্চিত হবে কেন ? সে হৃদয়ের কোনখানে যদি কেউ স্থান করে নেয়, কোন দিকে হৃদয়-বস্তুটা ঝুঁকে' পড়ে, তার প্রতিকার কর্‌তে হবে সঙ্গে সঙ্গেই, তা' না হ'লে যা' হারায় তা' আর কি ফিরে' পাওয়া যায় !

কিন্তু হঠাৎ তার সর্ব্বশরীর শিউরে উঠ্‌ল ! মনে হ'ল, কাল সন্ধ্যাকালের নির্ল্লজ্জ তিনকড়ির গর্হিত আচরণের কথা। যেমন কুৎসিৎ, তেমনই বীভৎস। তার হাতখানা এখনও যেন জ্বালা কর্‌ছে, অগ্নিস্পর্শে দগ্ধ হওয়ার মত নিষ্ঠুর যন্ত্রণা ! অভিমান-বশে যে পথে সে পা বাড়িয়েছে সে পথ নিরাপদ্ নয় ; কিন্তু বুকে যে ব্যথা ধীরে ধীরে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে তা' নিরাময় করার ঔদাসীন্য যে ধৈর্য্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়—তা'ছাড়া হৃদয়ের ব্যভিচার তারও তো একটা প্রায়শ্চিত্ত আছে, শোধন আছে ! কিন্তু আবার উল্টে' গেল চিন্তার ধারা—তারই ধারণার মূলে যদি মিথ্যা আশ্রয় করে' থাকে—সে কথা ভাব্‌তে গিয়ে চোখের কোণে জল এসে' পড়্‌ল—এ অপরাধের মার্জ্জনা নাই। একান্ত নিরাশ্রয় সে, স্বামীকে ছেড়ে' তার মাটির উপর দাঁড়িয়ে থাকারও যে সাধ্য নাই। আবার মনে হ'ল, এই হাতটা তিনকড়ি একান্ত অতর্কিতে তার নিজের হাতের মধ্যে তুলে ধরেছিল, কলঙ্কিত কলুষিত এই হস্ত স্বামীর সেবার অযোগ্য হয়েছে ; যদিও ঘটনা স্বামীর অজ্ঞাত, কিন্তু সে আজ অস্পৃশ্য—চিরদিনের জন্য সেবার অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে !

উঃ—সমস্ত ভবিষ্যৎ এই কল্পিত ব্যথায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়্‌ল—তার চক্ষু ফেটে' জলধারা গড়িয়ে বিছানা ভাসিয়ে দিল—মৃতের মত সে পড়ে' রইল অনেকক্ষণ বিছানায় হতভম্ব হয়ে'।

ঘড়িতে এলার্ম দেওয়া ছিল সাড়ে ছ'টায় ; আধঘণ্টা আগেই

তিনকড়ি আস্‌বে পড়াতে, তাকে প্রস্তুত হয়ে' উঠ্‌তে হবে বই-খাতাপত্র নিয়ে এই আধঘণ্টা সময়ের মধ্যে। থরে থরে এত ক্ষণ ধরে' যে সকল দুর্ব্বলতায় তার হৃদয় আচ্ছন্ন হয়ে' উঠেছিল, জোর করে' শূন্য থেকে যেন সে এক চুমুক উৎসাহ টেনে', ধড়মরিয়ে বিছানা ছেড়ে' উঠে' প'ড়্‌ল তাড়াতাড়ি; প্রাতঃকৃত্যের জন্যে ছুট্‌ল বাথরুমের দিকে।

নিজের মনেই হাসতে হাসতে সে ফির্‌ছিল ঘরের দিকে; মনে হচ্ছিল, বিছানায় পড়ে' পড়ে' যে দুর্ভাবনায় তার হৃদয় মুয়ে' পড়েছিল কিছু আগেই, তা' একটা দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। মানুষের শরীরটা এমনই কি গ্যারাণ্টি দিয়ে' বিক্রয় করা হয়েছে কারও কাছে, যে তার এদিক ওদিক হ'লে ক্রেতার কাছে গুরুতর অপরাধী হ'তে হয়, জীবন ব্যর্থ হয় ক্ষুণ্ণতায়! দেহের সংযম, কঠোর সতর্কতা কি শুধু নারীকেই পালন কর্‌তে হবে—ভর্ত্তার অনন্য-ভোগের ক্ষেত্র-স্বরূপ? নারী কি পুরুষের ক্রীতদাসী? তার মনে হ'ল, যে শিক্ষায় সে মানুষ হয়ে' উঠেছে ছোট বেলা থেকে তারই কুফল-স্বরূপ প্রভাতের দুশ্চিন্তা। কি সঙ্কীর্ণতার শিক্ষাই পিতামাতার কাছে সে পেয়েছিল! সমাজের কুসংস্কার নারীকে কি কৃপণ হ'তেই না শিখিয়েছে! কি হয়েছে এক মুহূর্ত্তের জন্য এই হাতখানা যদি অন্য পুরুষের সংস্পর্শে আসে? সেদিন কলিকাতার প্রসিদ্ধ মিষ্টার রায়ের পত্নীকে রায়বাহাদুর রমেশ চৌধুরী টকি দেখ্‌তে নিয়ে এসেছেন পিক্‌চার-প্যালেসে! সাম্‌নের বক্সেই তাঁরা বসেছিলেন। ছবি দেখে' হেসে' দু'জনের ঢলাঢলি সে স্বচক্ষে দেখেছে। কখন বা মিসেস্ রায় রায়বাহাদুরের গায়ে ঢলে' পড়েন, আবার রায়বাহাদুর মিসেস্ রায়কে বুকের কাছে টেনে' নিয়ে' মুখের কাছে মুখ রেখে' কত কথাই না বল্‌ছিলেন! তিনকড়িই তো চিনিয়ে দিলে, মিসেস্ রায় ঐ ব্যক্তির পত্নী নয়; বন্ধুপত্নী মিসেস্ রায়কে উনি টকি দেখ্‌তে এনেছেন। তিনকড়ির সে কথা মিথ্যাও নয়; কেননা, আনন্দবাজারে মিষ্টার রায়ের ছবি সে অনেক বার দেখেছে। তিনি এলেন, তখন আধখানা পালা শেষ হয়ে' গেছে। তখনও মিসেস্ রায় রায়বাহাদুরের হাতখানা ধরে' বসে' আছেন। স্বামীর চোখে সে দৃশ্য হয়তো পড়্‌ল না, কেননা, রায়বাহাদুর মিষ্টার রায়কে দেখেই' তাড়াতাড়ি উঠে' তাঁর সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করে' পাশেই বস্‌লেন। জ্যোৎস্নার চক্ষে ইহা বড় বীভৎস কুৎসিত ব'লেই মনে হয়েছিল।

তিনকড়ি বল্‌লে, ও সব কুৎসিৎ চিন্তা সেকেলে, এ যুগে অত ছোট মন রাখ্‌তে নেই; পতি-পত্নীর সম্বন্ধ ছাড়া বন্ধুত্বের সম্বন্ধও একটা আছে—সেখানে ছুৎমার্গ রাখা অশোভন অভদ্রতা। ভাসুরের সাম্‌নে মুখ বা'র কর্‌লে মরণকালে সে মুখ নাকি পোড়ে না—এই শিক্ষা সে ভুল্‌তে পারে না, হাড়ে হাড়ে বসে' গেছে। স্বামী ভিন্ন পরপুরুষ স্পর্শ কর্‌লে, মরণের পর যমদূত জ্বলন্ত লৌহের পুরুষকে আলিঙ্গন করায়, স্বামী ভিন্ন অন্যের মুখের দিকে চাইলেও পাপ হয়, দাঁড়কাক চোখ ঠুক্‌রে খায়—তিনকড়ি হো-হো করে 'বলেছিল, এ সব যদি সত্যি হ'ত, পৃথিবী জুড়ে যমের জেলখানাই থাক্‌ত, মানুষের স্বাধীন জীবনের সন্ধান মিল্‌ত না। দেহ নিয়ে নারীর এই ছুঁৎমার্গ স্বার্থপর পুরুষেরই একটা নিষ্ঠুর বিধান, নিষ্ঠুর কার্পণ্য। নারীর উপর পুরুষের এইরূপ যুক্তিহীন অধিকার ও কর্ত্তৃত্ববাদ দেশ থেকে উঠে' গেছে বহুদিন; গেঁয়ো মেয়েদের মধ্য থেকে এ পাপ বিদেয় হ'লে নারী-জাতি পায় মুক্তি, আর সে জয় শুধু নারীর নয়, পুরুষের উদার্য্যেরও পরিচয়। বাথরুম থেকে নিজের ঘরে আস্‌তে আস্‌তে কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে গত সন্ধ্যার দুর্ঘটনা এমনি করে' জ্যোৎস্নার মন থেকে মুছে দিতে স্বভাবের স্নেহ-প্রলেপ প'ড়্‌ছিল। হঠাৎ সুশীলা এসে' সাম্‌নে দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে' যেতে যেতে বল্‌ল—"রাণী মা—এই বুঝি ঘুম থেকে উঠ্‌লে? কাল যে কি সর্ব্বনাশ ঘটেছে!"

জ্যোৎস্নার মনে কুসংস্কার-নাশের সংগ্রাম চল্‌ছিল ভীষণভাবে, অতীত মনটা নূতনের অভিযান স্বীকার করে' নিচ্ছিল না কোনমতে; আর তার হাতটার যেখানে তিনকড়ি ধরেছিল মুঠিয়ে, জ্বলে' খাক হয়ে' যাচ্ছিল তীব্র যন্ত্রণায়। কয়েক পা অন্যমনস্কভাবে এগিয়ে এসেই', তার মনে সুশীলার কথাগুলো প্রতিধ্বনিত হয়ে' উঠ্‌ল। সে ফিরে দেখল', সুশীলা চলে' যাচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে হন্-হনিয়ে নীচে।

"সুশীলা, শোন্"।

রাণীমার গলা পেয়ে সে ফিরে' দাঁড়াল হন্তেমুখী হয়ে।

"কি বল্‌ছিলি রে?"

সুশীলা হাঁপাতে হাঁপাতে চোখ দুটো কপালে তুলে, মুখখানা আধহাত ফাঁক করে বলে' উঠ্‌ল—"দাঙ্গা মা দাঙ্গা—যার তার সঙ্গে নয়, একেবারে শিখ পাঞ্জাবীর সঙ্গে!"

জ্যোৎস্না অবাক্ হয়ে' কিছু নূতন ব্যাপার শোনার উদ্‌গ্রীবতা নিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ল—"তারপর?"

"তারপর তোমার এয়োতের জোর মা, এয়োতের জোর। যদি সোঁপাট পড়্‌ত লাটীটা মাথায়, বাবুকে কি আর ফিরে পাওয়া যেত? তবুও কি কম চোট্ লেগেছে মাথায়? সদ্য সদ্য ডাক্তার বদ্যি এসে' পড়্‌ল তাই"—

জ্যোৎস্নার প্রাণের ভিতর কে যেন ডুক্‌রে কেঁদে' উঠ্‌ল—তার বুঝ্‌তে বাকী রইল না, কাল রাত্রে স্বামীর উপরই হয়ে' গেছে একটা দারুণ দুর্ঘটনা। এক নিমিষে তার মনে হ'ল, বিয়ের পর যমের ঘর থেকে স্বামীকে সে ফিরিয়ে এনেছিল; বিধাতা তার কথা শুনেছিল যে পুণ্যে, আজ সে পুণ্যবল তার হারিয়ে গেছে; মনের জোর, বুকের শক্তি যেন আর কিছু মাত্র নাই। এমন দুর্ঘটনা তার স্বামীর উপর হওয়ার কারণ কাল সন্ধ্যা-বেলারই পাপ—পরপুরুষের স্পর্শ বিধাতা সইবেন কেন?

আকুল বিস্ফারিত নয়নে সে আবার জিজ্ঞাসা কর্‌ল—"তোদের বাবু কোথায় রে? আমায় তো তোরা কিছু বলিস্ নে!"

"বল্‌ব কি মা,—মটর, পুলিশ, লোকজনে বাড়ী ছেয়ে' গেল। রক্ত ঝুঁজিয়ে পড়্‌ছে, চৌচির-ফাটা মাথা দিয়ে', তবুও কি তাঁর আগ্রহ, যেন কথা তোমার কাণে না পৌছায়! নিশুত রাত্রি তোমার ঘুম ভাঙ্গাতে তাঁর মানা, আমরা অমান্যি করি কেমন করে মা?"

জ্যোৎস্নার মনে হ'ল' হাতের দশটা আঙ্গুলে ধারাল নখ যদি থাক্‌ত, বুক চিরে' হৃৎপিণ্ডটা টেনে বার করে' সে নিশ্চিন্ত হয়! সর্ব্বশরীর থর থর করে' কাঁপ্‌ছিল। "কোথায় তিনি?"—এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সুশীলার সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে' সেও নীচে নেমে' পড়্‌ল তাড়াতাড়ি। স্বভাবতঃই তাকে কে যেন টেনে' নিয়ে' চলেছিল ফটকের পাশে, সেই হল-ঘরের দিকে।

দীর্ঘ দালানের ভিতর দিয়ে যেতে যেতেই সুশীলা বলে চল্‌ল—"ঐ ভবানীপুরের অপয়া বাড়ীটা—ভাড়া দেবার নাম নেই—বাবু গেছ্‌লেন তাগাদায় নিজেই, কথায় কথায় বচসা—তারপর এই কাণ্ড। মাগো, সে কি কাণ্ড! রক্ত দেখে' ভিরমি যেতে হয়।"

"চুপ কর্ সুশীলা", তার মনে হচ্ছিল, এই রকম নিষ্ঠুর কথা তার কাণে যদি আর যায়—সে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে' যাবে।

মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা—রঞ্জন শুয়ে আছে একখানা সোফায়। মাথার উপর পাখা ঘুর্‌ছে শোঁ-শোঁ করে'। কাছে বসে' আছে এক অপরিচিত ভদ্রলোক। জ্যোৎস্নার লজ্জা-সরম তখন ছিল না; তার চৈতন্য এসে জমেছিল চক্ষু-দুটীতে। উদাস আগ্রহ-দৃষ্টি স্বামীর মুখের দিকে পড়্‌তেই, রঞ্জন চেয়ে' দেখ্‌ল তার কাতর বিষণ্ণ মুখ; পাশেই সে অপরিচিত বন্ধুর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে'ই অপলকে জ্যোৎস্নার মুখের দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

ভদ্রলোক সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন—জ্যোৎস্নাকে তিনি একবার ভাল করে' দেখে' নিয়ে' রঞ্জনকে বল্‌লেন—"মিষ্টার রঞ্জন, তবে এখন উঠি! মিসেস্ ব্যানার্জ্জী স্বয়ং উপস্থিত, আমাদের গার্জ্জেনশিপ্ এবার ছেড়ে' দেওয়াই সঙ্গত।"

তারপর, জ্যোৎস্নার দিকে বক্র কটাক্ষপাত করে' তিনি ব'ল্‌লেন—"বড় বেঁচে গেছেন! জায়গাটা একেবারে অ-বাঙ্গালীর হয়ে' পড়েছে। একজন সার্জ্জেনের সাম্‌নে পড়েছিলেন তাই রক্ষে, তা' না হ'লে সাবাড় করে'ই দিত...গুড্‌বাই"—রঞ্জনের শিথিল হাতখানা ধরে' একটু নাড়া দিয়ে' সে ব্যক্তি প্রস্থান কর্‌লেন।

বাড়ীর দাস-দাসী সবাই ভীড় করে' দাঁড়িয়েছিল—হল-ঘরের মধ্যে। ইসারা করে' জ্যোৎস্না তাদের বিদায় করে' দিল।

জ্যোৎস্না উদ্যত অশ্রু, আরক্ত নয়ন মেলে সরল প্রাণে রঞ্জনের প্রতি চেয়ে রইল অপলকে। অচঞ্চল প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় সে দাঁড়িয়ে—আর কাতর-মূর্ত্তি রঞ্জন

সোফার উপর শুয়ে'ই জ্যোৎস্নার সুতীব্র দৃষ্টিবর্ষণে অভিষিক্ত হ'তে লাগ্‌ল। দুজনেই নির্ব্বাক্; যেন বিপদ্ ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়ে বহুদিনের আটকান অমৃতের ঝরণা-ধারা ঝরে' পড়্‌বে এখনই—এই আসন্ন তৃপ্তির কল্পনায় যেন দু'জনেই বিভোর হয়ে' পড়েছিল কয়েকটী মুহূর্ত্তের জন্য। কিন্তু রঞ্জন যখন বল্‌ল—"বস, জ্যোৎস্না", তখন জ্যোৎস্না একখানা ফ্যান্সি চেয়ার টেনে' নিয়ে' দু'হাত দূরে বসে' পড়্‌ল এমনই বিক্ষুব্ধ হতাশ হয়ে', রঞ্জন স্পষ্টই দেখ্‌ল, যে তার চোখ মুখ হঠাৎ কাল হয়ে গেছে।

রঞ্জন বল্‌ল—"এস, একটু কাছে এস"। জ্যোৎস্না বসে' বসে'ই চেয়ারখানা হড়্‌কে এক হাত আগে গিয়ে বস্‌ল রঞ্জনের নাগাল পাওয়ার বাহিরে। অনির্ব্বচনীয় ব্যথার শিহরণে সে অতিশয় ক্লান্ত হয়ে' চক্ষু মুদিত করে'ই বল্‌ল—"কি হ'ল তোমার জ্যোৎস্না, আর একটু কাছে আসাও কি মানা?"

জ্যোৎস্নার হৃদয় মোচড় দিয়ে উঠ্‌ল অব্যক্ত বেদনায়; সে কেঁদে উঠ্‌ত হাহাকার করে', কিন্তু তার আরও কাছে গিয়ে বসার উদ্দীপনায় করুণ ক্রন্দন রুদ্ধ হয়ে' গেল। রঞ্জন কোলের উপর হাতখানা রেখে' আশা করেছিল, কুসুম-পেলব জ্যোৎস্নার করপুট-স্পর্শে সে আরাম পাবে, সান্ত্বনা পাবে। কিন্তু জ্যোৎস্না বসে' আছে কাষ্ঠপুত্তলিকার মত নিথর, নিস্পন্দ।

বেণী এসে' জানাল, "ডাক্তার এসেছে, রাণীমা"—

জ্যোৎস্নার বিশীর্ণ মুখ দিয়ে' যেন বহুদূর থেকে অস্পষ্ট জড়ান বাণী বাহির হ'ল,—"ঘরে চল, লক্ষীটি ঘরে চল; সারারাত কত পর ভেবেই খবর দাও নি আমায়—"

রঞ্জনের হৃদয়ের উপর একটা কঠিন পাথর যেন চাপান ছিল, যেন তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে' যাচ্ছিল—হঠাৎ হড়্‌কে তা' সরে গেল এই একটী কথায়। অভিমান, নিছক অভিমান! হৃদয়হারা যদি সন্ধান পায় হারানিধির, বিনা আয়াসে, বুক তার ভরে' উঠে, সানন্দে, কুতুহলে এক নিমেষে। ক্ষীণস্বরে রঞ্জন বল্‌ল—"অনেক রাত তখন—ঘুমুচ্ছিলে, জাগাই নি। ডাক্তার আস্‌ছে, ব্যাণ্ডেজ হয়ে' গেলেই ঘরে যাচ্ছি, চল—"

জ্যোৎস্না চেয়ার ছেড়ে' ঘরের বাইরে খড়খড়ির পাশে এসে দাঁড়াল। ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ খুল্‌তেই রগের উপর ইঞ্চি তিনেক ক্ষত তার দৃষ্টিপথে পড়্‌ল, কপালে রক্তাক্ত অসংখ্য আঁচড়। জ্যোৎস্নার বুকে যেন বিড়াল আঁচ্‌ড়াতে লাগল। তারপর পিচ্‌কারীর জল যখন ফিণ্‌কি দিয়ে ঘায়ের উপর গিয়ে' পড়্‌ল, রঞ্জনের যন্ত্রণাক্লিষ্ট বিকৃত মুখের দিকে সে আর চাইতে পার্‌ল না; ছুটে' সে হলঘরের বারান্দা পেরিয়ে উপরে উঠার সিঁড়ির নীচে এসে দাঁড়াল।

কি সে ক'র্‌বে! স্বামীর সেবা কি দিয়ে কর্‌বে, মানুষের অব্যক্ত অনুভূতি মানুষ কি বুঝে না? এই দেহটার একটা প্রায়শ্চিত্ত আছে, এই হাত যে পিশাচ অতর্কিতে ধরে' ফেল্‌ল খপ্ করে'—নারীর পবিত্রতাকে উপেক্ষা করে'—সেও তার কি প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বে! এলো-মেলো চিন্তায় তার মাথা ঘুলিয়ে' যেতে লাগ্‌ল। বিচিত্র স্বপ্নের তন্তু নিয়ে মাকড়সা তার মাথার ভিতর তাড়াতাড়ি জাল বুনে' যেতে লাগ্‌ল। হলঘরের ঐ খড়খড়ির পাশে দাঁড়িয়েই সে একদিন দেখেছিল, টুনুর কোলে তার স্বামীকে শুয়ে' থাক্‌তে। পর-নারীর স্পর্শে পুরুষের দেহ বুঝি কলঙ্কিত হয় না? ছাই চিন্তা—ঐখানে সে কিসের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাক্‌বে—স্বামীকে উপরের ঘরে নিয়ে যাবার জন্য! তিনি ব্যাণ্ডেজ হয়ে' গেলেই তো আস্‌বেন। বিছানাটা হয় তো এখনও পরিষ্কার করে নি সুশীলা; সারা সকাল বাবুকে নিয়েই তো ব্যস্ত আছে সবাই, ঘর-দোরের কাজ সারবে কে? সেই বিবাহের সময়ে ফুলকাটা যাজিমটা শাশুড়ী দিয়েছিলেন ফুলশয্যার রাত্রে বিছানায় পেতে, সেইটা বিছিয়ে দিই-গে খাটের উপর পরিপাটী করে'। চেয়ার টেবিলগুলো এলোমেলো হয়ে ঘরময় ছড়ান আছে—আর যত অনর্থের মূল ঐ পড়া বইগুলো—উনুনে গুঁজে দিয়ে আপদ্ চুকিয়ে দিই গে। জ্যোৎস্না ঘরের দোরে এসে' দাঁড়াল।

"আজ আমি পড়্‌ব না"

রুক্ষ কর্কশ কণ্ঠ—এত বড় কাণ্ড যেন কিছুই ঘটে নাই, এমনই স্বচ্ছন্দ কণ্ঠে তিনকড়ি বল্‌ল—"দুনিয়া উল্টে' যাক্, রুটীন্ ভাঙ্গা হবে না। এস, এক ঘণ্টাও পড়্‌তে হবে।"

জ্যোৎস্না ঘরে এসে'ই তিনকড়িকে সগৌরবে শিক্ষকের আসনে অতিশয় স্বচ্ছন্দে বসে' থাকৃতে দেখে' হাড়ে হাড়ে জ্বলে' উঠেছিল। কিন্তু তার কণ্ঠে গম্ভীর দাবীর যে স্বর বেজে' উঠ্‌ল, তা' শুনে' সে কয়েক মুহূর্ত্ত স্তম্ভিত হয়ে' সেই-খানে দাঁড়িয়ে রইল। মনে হ'ল, রাম ভজন অথবা ছত্রু সিং-কে ডেকে' শুয়ারকে ঘর থেকে বা'র করে' দিবে। কিন্তু এই সময়ে এইরূপ একটা উপদ্রবের সম্ভাবনা-সৃষ্টির উদ্দীপনা, তার মনে মনেই জ্বলে' উঠে' তখনই নিভে' গেল খড়ের আগুনের মত। সে টেবিলের সাম্‌নে বসে' অতি সহজ ভাবেই বল্‌ল—"এক ঘণ্টা অনেক সময়; আধ ঘণ্টার বেশী আমার আজ পড়ার সময় হবে না—"

"কেন ?"

জ্যোৎস্না তিনকড়ির মুখের দিকে রুক্ষ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখ্‌ল—প্রভুর মত তার কণ্ঠস্বর ; মনে হ'ল, মুখে পদাঘাত করে' তার এই ছদ্মবেশ চূর্ণ করে' দেয়। কিন্তু না, আবার সাম্‌নে নিয়ে' বলল—"আধ ঘণ্টার বেশী নয়, কালকের আধ-কষা থিওরেম্ দুটো শেষ করে' দাও।"

পড়া চল্‌ল—জ্যোৎস্নার ধারণা ছিল, ব্যাণ্ডেজ হ'তে আধ ঘণ্টার উপর লাগ্‌বে। এই বেয়াদব আগন্তুক অভিভাবককে বিদায় করে' দিতে হবে সহজে, স্বভাব-বশে। কিন্তু সে ভুলে' গিয়েছিল, বিছানায় যাজিম পেতে' দেওয়ার সাধ, সাজিয়ে-রাখা ঘরে তার স্বামীকে আবাহন করে' নেবে হৃদয়ের শ্রদ্ধা দিয়ে', নতি দিয়ে' আজ আবার নূতন করে'। ভুলে গিয়েছিল উপরের মন থেকে এই অনুরাগের স্বপ্ন ; কিন্তু গভীর মনে সাধের হিল্লোল কিল্‌বিল করে' উঠ্‌ছিল অব্যক্ত যন্ত্রণায়। তার খাতায় হাতের প্রত্যেক অক্ষরটা বাহির হচ্ছিল রক্তাক্ত হয়ে, আর তিনকড়ির কথার প্রত্যেক টুক্‌রোটা কাণে বিঁধ্‌ছিল, বিষাক্ত সূঁচের মত।

তার উপর হঠাৎ তিনু বলে' উঠ্‌ল—"গাজুরি সব জায়গায় খাটে না—উনি গেছেন কেরামত কর্‌তে পাঞ্জাবীর কাছে। প্রাণ নিয়ে ফিরেছেন এই ঢের ; লাগে নি বেশী, দু'চার দিনেই সেরে' যাবে। তেমন সিরিয়াস্ যদি হ'ত, তা' হলে' পড়াতে বস্‌তুম না। এটা তুমি মনে রেখো"।

কথা জ্যোৎস্না কাণেই নিল না। তার স্বামীর কথা নিয়ে' তিনকড়ির মুখে এই উক্তিগুলি অতি অভদ্র ও অশোভন বলে'ই তার মনে হ'ল। সে মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল—আর একটা থিয়োরেম্ শেষ হ'লেই সে নিষ্কৃতি পায়, তাই সে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কর্‌ল—

সমান দ্বি-ভুজ ত্রিভুজের বিপরীত কোণদ্বয় কেমন করে সমান হ'ল ?

তিনকড়ি সে কথার উত্তর চাপা দিয়ে তার মনে যে ঔৎসুক্য চেপে ধরা সাপের ফণার মত চাগাড় দিয়ে' উঠ্‌ছিল একেবারে সেটা ব্যক্ত করে' ফেল্‌ল এই কথায়—'আচ্ছা—বৌদি, থিয়োরেম্‌টা তো এখুনি শেষ করে' ফেল্‌বে, বল তো দাদার মায়ের পেটের ভাই যদি হতুম, কাল আদর করে' তোমার হাতখানা ধরার তৃপ্তি থেকে আমায় এমন করে' বঞ্চিত কর্‌তে পার্‌তে কি ?"

জ্যোৎস্না মর্ম্মভেদী কটাক্ষে সটান তিনকড়ির মুখের দিকে চেয়ে' কি উত্তর দিতে যাচ্ছিল—দরজার সম্মুখেই রঞ্জন মাথায় ফেট্টি বেঁধে' এসে' দাঁড়াল।

তিনকড়ির দিক্ থেকে সেই কটাক্ষ নমিত হ'তে হ'তে ফিরে' দাঁড়াল রঞ্জনের মুখের দিকে গিয়ে। রঞ্জন একটু বিহ্বল হয়ে' পড়েছিল এই অবস্থায় জ্যোৎস্নাকে স্বচ্ছন্দ মনে পড়ার টেবিলে বসে' থাকৃতে দেখে—তার উপর জ্যোৎস্নার তীব্র কটাক্ষ-দৃষ্টি কেবল পড়ার প্রশ্ন নিয়েই চেয়ে ছিল না তিনকড়ির দিকে, তার দুর্ব্বল শরীরে অসুস্থ মনে এটাও যেন স্পষ্ট হয়ে' উঠ্‌ল—"থাক্-থাক্, পড়, আমি পাশের ঘরে যাচ্ছি।"

মুষ্টিপ্রহারে নিজের বুক চুরমার করে' দিতে ইচ্ছে হ'ল জ্যোৎস্নার—কিন্তু বিরক্ত কণ্ঠে সে বলে' উঠ্‌ল—একান্ত অসহায়ের মত—"কেন কেন ?"

সে স্বর শ্রুতিসুখকর হয় নি, রঞ্জন ফিরে' গেল বিমুখ হয়ে' পাশের ঘরে। জ্যোৎস্না উপুড় হয়েই পড়্‌ল থিয়োরেম কষার খাতার উপর বাণবিদ্ধা পক্ষিণীর মত আর্ত্তনাদ করে'।

তিনকড়ি বসে' রইল বাক্যহীন মূকের মত প্রস্তর-মূর্ত্তি—অনেকক্ষণ সেইখানে ; তারপর সে উঠে' গেল দারুণ দুশ্চিন্তা নিয়ে'। আজ তার মনে হ'ল, একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও এদের সাধের ঘরে ধিকি-ধিকি আগুন জ্বলে' উঠ্‌ছে, তারই ইন্ধনে।

টেবিলের উপর উপুড় হয়ে' পড়ে' ফুলে' ফুলে' সে অনেকক্ষণ কেঁদে' ঘুমিয়ে' পড়েছিল অঘোরে, হঠাৎ কার করস্পর্শে চম্‌কে' উঠে' যেমন মাথা তুলে' দেখ্‌লে, মৌনমূর্ত্তি রঞ্জন মাথার ফেট্টি বেঁধে' দাঁড়িয়ে', তার চক্ষের কোলে কোলে করুণার জ্যোৎস্না-ধারা ছড়িয়ে' প'ড়ছে, প্রসন্ন গম্ভীর মূর্ত্তি—সে সস্নেহে বল্‌ল—"জ্যোৎস্না তুমি নাকি মাসের মধ্যে অনেকদিন না খেয়ে'ই কাটিয়ে' দাও! তাই এমন শীর্ণ হয়ে' গেছ। চোখের কোলে কালি পড়েছে।"

জ্যোৎস্না স্বাভাবিক সুরে সহজভাবে উত্তর দিল—"ছাই! কে তোমায় বল্‌লে ওসব কথা?"

"যেই বলুক, সত্যি নয় কি?"

"না—নির্জ্জলা মিথ্যা, তুমি কেন মিথ্যাকে প্রশ্রয় দাও, নিষ্ঠুরের মত এমন করে'? বল, তুমি মিথ্যা ধারণা করনি?"

কথাটা অতর্কিতেই যেন মুখ দিয়ে' বেরিয়ে' গেল।

সপ্রতিভ মুখখানা তার রাঙ্গা হয়ে' উঠেছিল।

রঞ্জন জ্যোৎস্নার মাথায় হাত রেখে' বল্‌লে—"কি ধারণা, জ্যোৎস্না? তোমার উপর মিথ্যা ধারণা, তুমি কি বল্‌ছ?"

জ্যোৎস্না খেয়াল করে নি—অসুস্থ শরীরে রঞ্জন দাঁড়িয়ে' আছে তার মাথায় স্নিগ্ধ শীতল হাতখানি রেখে; সে তাড়াতাড়ি উঠে' ব'ল্‌ল—"শুয়ে' ছিলে, উঠে' এলে বুঝি আমার খাওয়ার তাগিদ্ দিতে? চল, বিছানায় চল। বিছানায় চল। স্থির হয়ে' শুয়ে' থাকবে সারাদিন, উঠ্‌তে পাবে না—বল, আমার কথা রাখ্‌বে?"

রঞ্জন মৃদু হেসে', বিছানায় এসে' শুয়ে' পড়্‌ল। হাত বাড়িয়ে', জ্যোৎস্নাকে টেনে' কাছে নিতে গিয়ে', সে দেখ্‌ল, তাকে নাগাল পাওয়া যায় না, এমনই দূরে দূরে নিজেকে সে সরিয়ে' রেখেছে যেন ইচ্ছা করে'ই।

রঞ্জনের চক্ষু আপনা হ'তেই বুজে' গেল ধীরে ধীরে।

জ্যোৎস্না তার পায়ের তলায় বসে' খুঁচিয়ে' কথা বাহির ক'র্‌ল। "আচ্ছা বল ত, তোমায় যে আমি ঘরে আস্‌তে ব'ল্‌লুম, হল-ঘর থেকে তুমি যেন বাঘ-সিংহি দেখে' চম্‌কে' মুখ ফিরিয়ে' চলে' গেলে ও-ঘরে, কেন বল দেখি?"

"তুমি যে পড়্‌ছিলে নিবিষ্ট হয়ে তিনকড়ির কাছে; পাশের পড়া ক্ষতি হয়, এই ভয়ে।"

"সত্যি বল্‌ছ?"

"তোমার মনে হচ্ছে যে, আমি মিথ্যা বল্‌ছি?"

"হাঁ, মনে হচ্ছে। তুমি ঠিক কথাটা চেপে' মিথ্যা কথায় আমায় প্রবঞ্চনা করছ। আমি তোমার কি করেছি, বলত?"

পা-দুটো রঞ্জন জ্যোৎস্নার কোলে নিজে থেকেই তুলে' দিল; তার মনে হচ্ছিল, এখুনি জ্যোৎস্নার কর-সঞ্চালনে অনুরাগের স্পর্শে তার হিয়াখানি পূর্ণ হয়ে' উঠ্‌বে পুলকে, আনন্দে। কিন্তু জ্যোৎস্নার কাছ থেকে সে কোন সাড়া না পেয়ে' পা-দুখানি আবার ধীরে ধীরে নামিয়ে' নিল বিছানায়।

হঠাৎ জ্যোৎস্না তেলে-বেগুনে জ্বলে' উঠার মত, তীব্রকণ্ঠে বলে' উঠ্‌ল—"আমি হাড়ি না বাগ্দী, পা-দুটো যে নামিয়ে নেওয়া হ'ল আমার কোল থেকে?"

রঞ্জন হাত বাড়িয়ে জ্যোৎস্নাকে কাছে নিতে উঠে' বস্‌ছিল। জ্যোৎস্না বিছানা থেকে দূরে সরে' গেল। দূর থেকে হুকুমের মত ভারী গলায় বল্‌ল—"শোও বল্‌ছি, উঠ্‌তে পাবে না। আমার কথার জবাব দিলে না যে?"

রঞ্জন বিষণ্ণ মনে বিছানার উপর ঢিপ্ করে' শুয়ে' পড়্‌ল।

"কি কথার জবাব, জ্যোৎস্না? ঘরে এসে' ফিরে' গেলুম কেন? দুর্ব্বল মনের ধর্ম্ম, অপরাধী আমি নিজেই; মনে হয়েছিল, এসে' দেখ্‌ব, তুমি দাঁড়িয়ে' আছ আমার আসার উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায়। এর চেয়ে বড় স্বার্থপরতা আর কি আছে! তোমার যে পাশের পড়া, সময়ের মূল্য তোমার মত আর কে বুঝ্‌বে, জ্যোৎস্না?"

"ঠিক ব'ল্‌ছ?" দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করে' জ্যোৎস্না বল্‌ল—"ঠিক বল্‌ছ?" নির্জ্জলা সত্য কথা নয়!"

"না, আর একটু বলার আছে। শুধু পড়্‌ছিলে, না বুঝি অন্য কথাও হচ্ছিল! তোমার উচ্চকিত চাহনীর সঙ্গে যে কথাটা মুখ দিয়ে' বাহির হ'তে যাচ্ছিল, আমি এসে' পড়ায় তা' যেন ফিরে' গেল তোমার বুকের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে'—ঠিক বলি নি?"

"আর একটু বল—তোমার পায়ে পড়ি, আমায় এমন করে' তিলে তিলে দগ্ধ ক'রো না। আর কিছু তোমার মনে হয়েছিল কি না বল। আমায় বৃথা সান্ত্বনা দিও না। আমায় সত্যি করে' বল—তোমার মনে আর কিছু হয়েছিল কি না।"

"আর কি হবে, জ্যোৎস্না? আর কি হ'তে পারে? তুমি এর চেয়ে আর কি বেশী করতে পার, সে যে আমি কল্পনাও করতে পারি না!"

তীব্রকণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়ে' জ্যোৎস্না বলে' উঠল—তার চেয়ে আর কি কল্পনা করার আছে, তুমি মনে কর! আমি কি করেছি, যার বেশী আর করা যায় না! কি দেখেছ তুমি? এত মিথ্যা, এত ছলনা, মুখ ফিরিয়ে' চলে' গেলে, আবার বল কি না—বেশী কিছু মনে হয় নি তোমার? ধূর্ত্ততা করছ কার কাছে? বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক!"

এ কি কথা! রঞ্জন অবাক্ হয়ে' তার সমুজ্জ্বল চক্ষু-দুটীর দিকে তাকিয়ে রইল—তার মনে হ'ল, এ কি সেই জ্যোৎস্না! সেই লজ্জাঘন, ব্রীড়াবনত, কোমল লতার ন্যায় সময়ে-অসময়ে তার সবখানি দিয়ে অন্তরে বাহিরে জড়িয়ে' থাকতে চাইত, সবিনয়ে একান্ত অকিঞ্চনের মত অর্থহীন কত কথা পাগলের মত বলে' যেত, প্রলাপের বান থামাতে পারত না। সারারাত্রি ধরে' তার কথার প্রবাহ ক্লান্ত হ'লেও, চক্ষু বুজার উপায় ছিল না, অভিমানে গলা ধরে' বলত—"ঘুমোলে? কথা বুঝি আমার ভাল লাগে না? ভাল বুঝি বাস না আমায় তোমার সবখানি দিয়ে'?" এই কি সেই সরল, অকপট, নির্মেঘ স্বচ্ছ নীলের মত সুষমাময়ী আমার জ্যোৎস্না? রঞ্জনের বাক্‌স্ফূর্ত্তি হ'ল না, স্তব্ধ হয়ে'ই সে শুয়ে' রইল।

চাপা আগুন এমন দপ করে' জ্বলে' উঠায়—জ্যোৎস্না নিজেই যেন অপ্রস্তুতে পড়ল, স্বর নামিয়ে' বলল—"দুঃখ দিও না, সত্যি করে' বল—আমায় তোমার সংশয় হয় নি একবিন্দু? মনে হয় নি একবারও, আমি কিছু অন্যায় করছি?

রঞ্জন শিশুর মত উত্তেজিত কণ্ঠে বলে' উঠল—"না, না, না, জ্যোৎস্না, তুমি আমায় ক্ষমা কর, তোমার পরিবর্ত্তন আমি আর সহ্য ক'রতে পারি না।"

উত্তেজনায় বোধ হয় ক্ষত-মুখে রক্ত উৎসর্পিত হয়েছিল, সাদা ব্যাণ্ডেজের উপর রক্তাভ বর্ণ ফুটে' উঠল, করুণায় জ্যোৎস্নার হৃদয় ভেসে' গেল অকস্মাৎ প্লাবনে। সে হুমড়ি খেয়ে' রঞ্জনের বুকে গিয়ে' পড়ল, যেন নিজেকে তলিয়ে দিতে, ডুবিয়ে' দিতে তার অপরিসীম অনুরাগের সমুদ্রে।

রঞ্জন তার নিস্পন্দ ঋজু দেহবল্লরী দুই বাহু দিয়ে' বুকের উপর চেপে' ধরে' বহুদিন পরে সান্ত্বনায় সমাহিত-চিত্তে বিভোর হয়ে' রইল চক্ষু মুদিত করে'। সে অনেক ক্ষণ, কত ক্ষণ দু'জনেই তা' নির্দ্ধারণ করতে পারে না, মানুষের প্রেমেও মানুষ সমাধিলাভ করে এমন করে'ই, ইহা অসঙ্গত ও অসম্ভব কথা নয়।

পরীক্ষা দেওয়ার দরখাস্তে শিক্ষকের একটা সই চাই। রঞ্জন ব'লল—"তিনুই তোমায় পড়িয়েছে তার শিক্ষকতা স্বীকার করাই তোমার সঙ্গত। আমি আর ক'দিন পড়ালুম!"

"তা বৈ কি—গোড়া-পত্তন করলে কে? ও-সব বাজে কথা শুনব না। ঠাকুর-পো যদি সই করে, তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে' রক্ত-গঙ্গা হব।"

"আস্ত পাগল! ও মনে করবে কি বল তো! কত যত্ন করে' পড়ালে, তার অধ্যক্ষতা অস্বীকার করা যে নিমকহারামি।'

"ইস্, বল কি? তত্ত্বকথা আর শেখাতে হবে না। এখন আর মূর্খটী নেই। আজ-বাদে-কাল পাশ-করা বলে' পরিচয় দেব। তোমার নাম যদি দরখাস্তে না দেখি, ও-মুখো হচ্ছি না তা' বলে' রাখছি কিন্তু—

জ্যোৎস্না ঘুরন্ত লাট্টুর মত কাতরে' ঘর থেকে বের হয়ে' গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনকড়িও ঘরে এসে' হাজির। হাতে ছিল এক তাড়া কাগজ; টেবিলের উপরে রেখে' বলল—"বি, টি, পরীক্ষা শেষ হ'ল, বাড়ী যাওয়ার আগে জ্যাঠাইমার সঙ্গে বুঝি দেখা হল' না।"

"এত তাড়াতাড়ি কেন? তোমার বৌদির এক-জামিন্ পর্য্যন্ত থেকে যাওয়া উচিত।"

তিনকড়ি বিষণ্ণমুখে বলল—"সে কর্ত্তব্যবোধ তুমি আসার পর থেকেই ছেড়েছি। এখন আমার প্রয়োজনও

শেষ হয়েছে, নেহাৎ জোর করেই পড়াই। বৌদির ইচ্ছা নয়, যে আমার কাছে পড়ে।"

"না, না, ও তোমার ভুল ধারণা।"

জ্যোৎস্না ঘরে এসে' ঢুক্‌ল। তিনকড়ি উঠে' যাচ্ছিল তাড়াতাড়ি, রঞ্জন বল্‌ল—"শুনছ, তিনু কি বলে! আমি এসেছি বলে' নাকি তুমি ওর কাছে পড়্‌তে বস না। কাজের সময় কাজী, শেষে বদনামের ভাগী হ'লে?"

জ্যোৎস্না স্বামীর দিকে কটু কটাক্ষপাত ক'রল। তিনকড়ি আভাষে বুঝে' নিল, যে সে জ্যোৎস্নার কাছে অপ্রিয়ভাজন হয়েছে; ইসারায় সে ইঙ্গিত দাদাকেও যে দেয় নি তা' নয়—বিনা-বাক্যে চেয়ার ছেড়ে' সে উঠে' গেল।

জ্যোৎস্না—"কি যে বল—তোমার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই; মানুষকে বেশী প্রশ্রয় দিলে সে তার ন্যায্য সীমা ছেড়ে', অনধিকার-চর্চ্চার সুযোগ পায়। আমি তা' পছন্দ করি না। কুটুম্বের ছেলে এসেছে, মানে-মানে বিদায় হ'লেই বাঁচি! বেশী ঘনিষ্টতা দেখান সঙ্গত নয়।"

জ্যোৎস্না কথাগুলো পুস্তকের একটা প্যারাগ্রাফ পড়ার মত সোটান বলে' গেল।

রঞ্জন কথা পাল্টে' নিয়ে' হেসে' বল্‌ল—"সত্যি বলছি জ্যোৎস্না, পাটনা থেকে ফিরে' আসা অবধি তোমার মূর্ত্তিটা যে রকম থম্‌থমে হয়ে' উঠেছিল, তাতে মনে হয়েছিল, মা এলে বাড়ী ছেড়ে' পালাতে হবে শীগ্‌গীর। পাঞ্জাবীর লাঠী শনির দশা ছাড়িয়ে দিলে। কুষ্টীটা দেখালে হয়, সম্ভবতঃ বৃহস্পতির দশায় এসে' পড়েছি।"

জ্যোৎস্না গম্ভীর হয়ে' বল্‌ল—"আচ্ছা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক বল্‌বে?"

রঞ্জনের মুখ দিয়ে' কিছু উত্তর বের হবার আগেই সে বল্‌ল "প্রতুল বোসের স্ত্রী নাকি অখিল মিত্তির—ঐ যে নাটক করে' বেড়ায়—তার সঙ্গে নাচবে! আচ্ছা, এই যে পরপুরুষের সঙ্গে ছোঁওয়া-ছুঁয়ি, তার স্বামী তাকে কিছু বল্‌বে না?"

রঞ্জন হেসে বল্‌ল—"সেকালের কুসংস্কার ধুয়ে'-মুছে' গেছে। ছোঁওয়া-ছুঁতের ধর্ম্ম এ যুগে নেই। তোমার মাথায় এখনও ঐগুলো সব কিলবিল্ করে' দেখ্‌ছি।"

"হাঁ, করে। তুমি তাই বুঝি টুনুর কোলে মাথা দিয়ে শুয়েছিলে? আর টুনুও হয় তো তোমার কোলে মাথা রেখে', দুটো হাত বাড়িয়ে গলা ধরে' চেয়ে' থাকে তোমার মুখের পানে! এযুগে ও-সবে আর দোষ হয় না, না?" কথা বলে'ই জ্যোৎস্না এক হাত জিব্ কেটে' মুচ্‌কে' হেসে' ফেল্‌ল—কিন্তু রঞ্জন তার মুখের দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে' রইল হতভম্ব হয়ে'।

জ্যোৎস্না খিল্‌খিল্ করে' হেসে' উঠ্‌ল—ব'ল্‌ল—"ঠাট্টা বোঝ না, বুঝি? অবাক্ হয়ে' চেয়ে রইলে যে? আর যদি সত্যই হয় দোষ হয়েছে কি তাতে, ছোঁওয়া-ছুঁতের বালাই এ যুগে তো ধুয়ে'-মুছে' গেছে, নিজেই বল্‌লে না?"

"কিন্তু যা সত্যি নয়, তা' কাণে শুনে' গা একটু শির্‌শির্ করে' উঠে। এ রকম কথা হঠাৎ তুমি ব'ল্‌লে, কেন বল দেখি?"

জ্যোৎস্না তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে' রইল তার মুখের দিকে চেয়ে। যেন সে সঙ্কিত, সঙ্কুচিত, সংশয়ে আড়ষ্ট হয়ে' পড়েছে না? মুখও গেছে শুখিয়ে', আঁতে ঘা পড়েছে কি না!

মানুষ যখন হাসে আনন্দ করে', তখন তার মনে হয়, দুঃখ-বিষণ্ণতা-ক্রোধ বুঝি সব পালিয়েছে তার ত্রিসীমা ছেড়ে। কিন্তু ঘটনার সংঘাতে যখন আবার ফণা ধরে' গর্জ্জে' উঠে, তখন মনে হয়, ক্লান্ত তারা, একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছিল হাসি-কৌতুকের চাদর মুড়ি দিয়ে'। জ্যোৎস্নার ক্ষতস্থান যেন দগ্‌দগিয়ে' উঠ্‌ল—কিন্তু মনের ভাব গোপন করে' বল্‌ল—"বাবারে বাবা, তামাসা কর্‌বারও যো নেই! চোখ মুখ রেঙ্গে' উঠ্‌ল—কথা শুনে'। আচ্ছা, সত্যি সেই যে পাটনা থেকে এলে, তারপর তোমার বন্ধুর খবরও তো নাও না ভুলে'? আর টুনুরও তো বিয়ের বয়স উৎরে' গেল; কাজ নেই, কর্ম্ম নেই, ভাইকে চিঠিপত্রও তো লেখে না আর! তুমি যে রকম কুঁড়ে মানুষ, আস্‌বার সময়ে ঝগড়াঝাঁটী নিশ্চয় করে' এসেছ! যেমন আমার সঙ্গে রাতদিন হচ্ছে!"

"বেশ তুমি! উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে! তোমায় সে সব কথা বলি নি। সময় বা পেলুম কখন, টুনুর কাণ্ড শুনবে!" তাড়াতাড়ি তার সুটকেশ খুলে' টুনুর দাদার একখানা লম্বা চিঠি সে জ্যোৎস্নার গায়ে ছুঁড়ে' ফেলে' দিল।

কি একটা অভাবনীয় আতঙ্কে জ্যোৎস্নার মুখখানা কালো হয়ে' উঠ্‌ল ; চিঠিটা লম্বাই বটে—ব'ল্‌ল শুষ্ক মুখে—"কি লিখেছে পড়, শুনি।"

রঞ্জন অত্যন্ত উৎসাহে পড়া জুড়ে' দিল, জ্যোৎস্নাকে শুনিয়ে' শুনিয়ে'। মর্ম্মার্থ এই, টুনুর বিবাহের সাধ গেছে ঘুচে' অনেক দিন, ব্যারিষ্টার পি, মুখার্জ্জির কত সাধাসাধি, টুনুকে তার পছন্দ হয়েছিল, বেজায় রকমের সে বিদ্রূপ করে'ই জবাব দিয়েছে, হৃদয় তার হারিয়ে গেছে কোন এক জায়গায়, খুঁজে' পাওয়া যাচ্ছে না, তল্লাস পেলে পত্রযোগে জানাবে মনের কথা। তারপর, টুনু নাকি পাটনার কোন এক গোঁসাই'র পাল্লায় কৃষ্ণপ্রেমের সাধনা নিয়েছে! সাড়ী, সেমিজ, হাল-ফেসানে যেমন সে সেজেগুজে' বেড়াত, বডী-ব্লাউজ যে ভাবে সে গায়ে এঁটে', প্রজাপতির মত ডান্সে, টেনিসে উড়্‌ত, এখন সে সব ভাব গেছে উল্টে' ; তার মুখে আর পাউডারের প্রলেপ পড়ে না, সাবান-এসেন্সের পাট সে ছেড়েছে ; খুব রোক—তীব্র বৈরাগ্যের দিকে। উড়ো পাখী, কদমফুল, মাধবীপাতা, কাঁচা রঙের ছাপ, গোলাপী রং'এর উপর বৃন্দাবনী শাড়ী তার হয়েছে প্রিয় পরিচ্ছদ। মাথার ঝুঁটী সে টেনে সাম্‌নের দিকে রাখে, সে এক অপূর্ব্ব বেশ! আর নাকে কাটে লম্বা তিলক, যাকে লোকে বলে রসকলি। গলায় তার তুলসীর মালা, হাতে একটা কুঁড়োজালি। ঠোঁট দুটো সর্ব্বদাই নড়ছে, বিড়বিড় করে' কি বলে সেই জানে। তারপর অনুনয় করে' রঞ্জনকে লিখেছে তার ভাই, যদি সে আসে একবার পাটনায়, টুনুর পাগ্‌লামী সে হয় তো ঘোচাতে পারে! নীচের ঠোঁটটা উপরের দাঁতে পিষে' জ্যোৎস্না চাপা-গলায় জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"কবে যাচ্ছ শুনি, এই রসের বোষ্টমীটির মান ভাঙ্গ্‌তে?"

রঞ্জন হো-হো করে' হেসে ব'ল্‌ল—"তোমার পরীক্ষার জন্যই তো আছি আট্‌কে', তা' না হ'লে টুনুর এ রোমান্স্‌ স্বচক্ষে দেখার আগ্রহ আমার কম নয়।"

জ্যোৎস্নার মুখ দিয়ে' আর উত্তর বা'র হ'ল না। আকাশ যেন বায়ুশূন্য হয়েছে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস তার বন্ধ, বাক্ রুদ্ধ, অন্তরে প্রচণ্ড ঝটিকাবর্ত্তের পূর্ব্বাভাষ সে অনুভব করে' সেখান থেকে উঠে' চলে' গেল বাইরে।

রঞ্জন খাতাপত্র হাঁটকাচ্ছিল কি একটা হিসাব বাহির করার জন্য। তিনকড়ি এসে' ব'ল্‌ল—"বৌদিদি জেদ ধরেছেন, আজ যাবেনই তিনি চিত্রায় চণ্ডীদাস দেখ্‌তে। তোমায় খবর দিতে বল্‌লেন।"

রঞ্জন মুখ না ফিরিয়েই ব'ল্‌ল—"সময় নেই ভাই, এখন চণ্ডীদাস দেখার। পরীক্ষার সময়ে হঠাৎ তোমার বৌদিদির এ আবার কি সখ্‌! যাও তুমি তাকে নিয়ে, আমি নাই গেলুম।"

পেছনেই দাঁড়িয়েছিল সজ্জিত-বেশে জ্যোৎস্না। চক্ষের ইশারায় তিনকড়িকে নিঃশব্দে ডেকে' নিয়ে' গেল দূরের বারান্দায়। সে আল্‌গোছে মেঝের উপর পা ফেল্‌তে ফেল্‌তে দুলে' দুলে' চল্‌ছিল এগিয়ে', তিনকড়ি তার পশ্চাতে।

একবার জ্যোৎস্না ফিরে' চেয়ে' দেখ্‌ল, তিনকড়ি আসছে তার সঙ্গে সঙ্গেই, কিন্তু দৃষ্টি তার অবনত ; সে পিঠের কাপড়খানা আর একটু নামিয়ে' অতি সন্তর্পণে বারান্দার প্রান্তে খোলা খড়খড়ির পাশে এসে' দাঁড়াল।

অপূর্ব্ব সুন্দরী—তিনকড়ি নিমিষহীন দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়েছিল!

"কি বল্‌লেন উনি? চণ্ডীদাস দেখার সময় নেই। হুঃ, আমার আছে না? ঠাকুর-পো আমায় নিয়ে যেতে পার কোথাও এমন কোন জায়গায়, যেখান থেকে আর ফেরা যায় না—কোন মতে? যেখানে তোমার দাদাও আর পৌঁছতে পার্‌বে না—শত চেষ্টায়!"

তিনকড়ির সঙ্গে আজ অপরাহ্ণেই কথা ; এমন হেসে', এমন মিষ্টি করে' বহুদিন সে তার সঙ্গে আলাপ করে নি। দুর্ভেদ্য প্রাচীরের আবেষ্টনে প্রাণ তার হাঁফিয়ে উঠেছিল। "একদিন নিয়ে চল না, ঠাকুর-পো, টকি দেখে' আসি।"

মুখের কথা খসাতে তর্ সয় নি, তখনই তিনকড়ি বক্সের টিকিট কিনে এনে হাজির।

"আজই?"

"হাঁ"—তিনকড়ি যেন এ সুযোগ আর ছাড়্‌তে পারে না। কিন্তু জ্যোৎস্নার পা থর্‌-থর্ করে কাঁপ্‌ছিল।' রাগে-অভিমানে আত্মহারা সে, এই সময়ে কেউ তাকে রক্ষা করার নাই! অধীর হয়ে সে বুকে ছুরী বসাতে যায়—কেউ তার হাতখানা খপ্‌ করে' ধরে' ফেলে না—নিবারণ করে না! কথা দিয়ে তা' আর ফেরান যায় না, তবুও সে বল্‌ল—"বল না তোমার দাদাকে সঙ্গে যেতে।"

রঞ্জন কাণে নিল না—শেষ আশা, পা হড়্‌কে' দিয়ে' করুণ দৃষ্টিতে তার সাহায্যপ্রার্থনা—সে কি আর তাতে আছে, সে কি জ্যোৎস্নার মর্ম্মব্যথার আর সন্ধান রাখে? টুনু, টুনু, টুনু! কৃষ্ণ-বিরহে উদাসিনী—বৈরাগ্য-বেশে প্রেমোন্মাদিনী টুনু! বাধা, জ্যোৎস্না, তার সরে' পড়াই ভাল। কিন্তু, অসহায়, কোথায় যাবে সে! একবার ফাঁকে

জ্বলা-মাথা, যদি ঠাণ্ডা হয়, বাহিরের হাওয়ায় একটু ঘুরেই ফিরে আস্‌বে। আর পরপুরুষের সঙ্গে এই ঘুরে' আসার ব্যাপার নিয়ে' বুকে ওর বাজ্‌বে না একবারও কি একটা হাতুড়ীর ঘা! বলুক আর নাই বলুক, সেদিন তার মুখ শুকিয়েছিল কটাক্ষের একটা লঘু সঙ্কেতে। লাগ্‌বে না বুকে, খুব লাগ্‌বে। "চল ঠাকুর-পো!" গায়ে ঢলে' পড়ার ভাব নিয়ে' সে টল্‌তে টল্‌তে নীচে দাঁড়-করান "লাক্‌সারি-কারে" গিয়ে ঝুপ করে' বসে' প'ড়্‌ল। কার ছুট্‌ল বায়ুবেগে, চৌরঙ্গীর দিকে।

ডান দিকে গভার্ণমেণ্ট্‌ হাউস্‌, ষ্ট্র্যাণ্ডে গিয়ে' পড়্‌ল নক্ষত্রবেগে জ্যোৎস্নাকে নিয়ে' ভাড়া-গাড়ী, চালকে আসনে বসে আছে স্বয়ং তিনকড়ি। সোফার নাই। ডান দিকে গঙ্গার কাল জল থিক্‌-থিক্‌ কর্‌ছে আলোর অভাবে। বাঁ-দিকে উঁচু নীচু কেল্লার ঢিপি, মৃত্তিকা-গর্ভে বাড়ীর অস্পষ্ট ছাদ, আর বেতার-যন্ত্রের সুদীর্ঘ পোষ্টগুলো অজানা জগৎ থেকে খবর আনায় উদ্‌গ্রীব হয়ে' দাঁড়িয়ে' আছে। শোঁ-শোঁ, গাড়ী গিয়ে' পৌছাল হেষ্টিংস্‌-হাউসের পাশ দিয়ে' গড়ের মাঠে। জ্যোৎস্না চম্‌কে' উঠে' বল্‌ল—"কোথা নিয়ে চলেছ, দিগ্বিদিক্‌ জ্ঞানহারার মত? পথ ভুল করেছ, পিক্‌চার-প্যালেস্‌ তো মার্কেটের কাছে।" ভবানীপুর, কালীঘাট পার হয়ে চলেছে গাড়ী ঊর্দ্ধশ্বাসে। জ্যোৎস্না চেঁচিয়ে' উঠে' বল্‌ল—"থামাও গাড়ী, তা' না হ'লে আমি লাফ দিয়ে' পড়্‌ব। কথা শোন—চেঁচাব।"

শীতের রাত্রি। পাশ দিয়ে ছুটেছে অজস্র গাড়ী। লোকের ভীড় কমে' এসেছে এই পথে। বালিগঞ্জ ছাড়িয়ে' গাড়ী এসে' পড়েছে লেক্‌রোডে। দক্ষিণে কৃত্রিম হ্রদে চাঁদের ছায়া—বাঁ-দিকে বনের ভিতর দিয়ে বিকট 'কুক্‌' দিতে দিতে মাল-বোঝাই একখানা গাড়ী রেলপথে প্রচণ্ড দৈত্যের মত ছুটেছে। জ্যোৎস্নাদের গাড়ী এসে' দাঁড়াল একটা ঝোঁপের ধারে, খেজুর গাছের তলায়। জ্যোৎস্না কি বল্‌তে যাচ্ছিল—তিনকড়ি গাড়ীর দরজা খুলে' ভিতরে এসে' বস্‌ল তার পাশেই। জ্যোৎস্না চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌ল, জনমানবশূন্য স্থান। ঝিঁঝিঁ ডাক্‌ছে কর্ণ বধির করে'। কম্পিত-কণ্ঠে করুণ অনুনয়ে সে বলে' উঠ্‌ল—"ঠাকুরপো রক্ষে কর, আমি তোমায় বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।" তার মনে হ'ল, বাঁ-দিকের অসাড় হাতখানা তিনকড়ির হাতের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। তার অস্ফুটকণ্ঠে বাক্‌স্ফুরণ হ'তে না হ'তেই সে অনুভব ক'র্‌ল, তিনকড়ি তার বাম অঙ্গ বেষ্টন করে', দক্ষিণ বাহুর উপর তার ডান হাতখানি তুলে' দিয়েছে—বিষাক্ত নিঃশ্বাসে তার সর্ব্বাঙ্গ যেন পুড়ে' যায়। সর্প-দংশনের চেয়েও অধিক জ্বালা, চেষ্টা করে'ও সে আর নিঃশ্বাস ফেল্‌তে পারে না। রুদ্ধকণ্ঠ—নাক দিয়ে'ও নিঃশ্বাস পড়ে না। মুখ দিয়ে' অব্যক্ত শব্দ উচ্চারিত হ'ল—কাণে তখনও গুন্‌-গুন্‌ করে' ভারী গলার কি যেন এলোমেলো শব্দ পৌছচ্ছিল। পাশের বিদ্যুদালোকে তিনকড়ি দেখ্‌ল, এ জ্যোৎস্না নয়, একটা মৃত-কঙ্কালময়ী প্রেতমূর্ত্তি। দৃষ্টি স্থির, চক্ষের তারা প্রায় দুই ইঞ্চি ছিটকে' বাহির হয়ে' পড়েছে, মুখ পাথরের মত সাদা, ওষ্ঠপুট নীল, আর দুই কস্‌ দিয়ে উদ্গীর্ণ ফেনপুঞ্জ বীভৎস মৃত্যু-চিহ্ন প্রকাশ কর্‌ছে—তার ভীষণ ভয় হ'ল, তাড়াতাড়ি গাড়ীর সাম্‌নে এসে', সে দ্রুত ছুটিয়ে' দিল গাড়ী চৌরঙ্গীর দিকে। মিউজিয়ম্‌ ছাড়িয়ে', একবার ফিরে' পেছন দিকে তাকিয়ে' দেখ্‌ল, জ্যোৎস্না মরেনি—মাঠের হাওয়া লেগে' সে আবার জীবন পেয়েছে ফিরে, বোধ হয়, নিঃশ্বাস নিচ্ছে ধীরে, চক্ষের তারা দু'টো আয়ত নয়নপল্লবের নীচে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে স্থিরভাবে।

গাড়ী হাঁকাতে হাঁকাতে পিক্‌চার-প্যালেসের সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াল। জ্যোৎস্না তখন প্রকৃতিস্থ, চোখ চেয়ে' দেখ্‌ল নানা রঙ্গের বাল্‌বে বিদ্যুতের আলো, আর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফুটপাতের উপর তার স্বামী; গাড়ী থাম্‌তেই সে এসে' দরজা খুলে' বল্‌ল—"এসো' ছবি অর্দ্ধেক শেষ হয়ে' গেছে, কোথায় ছিলে তোমরা এতক্ষণ—সোফারকে ছেড়ে দিয়ে?"

সোফারও ছিল তিনকড়ির নির্দ্দেশ-মত পিক্‌চার-প্যালেসের গেটে দাঁড়িয়ে'। তিনকড়িও নেমে' পড়েছিল গাড়ী থেকে, সন্ত্রস্ত অথচ স্বাভাবিক স্বরে বল্‌ল—"একটু হাওয়ায় ঘুরে' এলুম, দাদা। নামো বৌ-দিদি, দেরী হয়ে' গেছে অনেক।"

কিন্তু কি অস্বাভাবিক দৃষ্টি—উন্মাদ-মূর্ত্তি জ্যোৎস্নার! রঞ্জন কিছু না বুঝে'ই, বলে' উঠ্‌ল—"যাও বাড়ী, আর একদিন এসো সকাল সকাল। ছবি শেষ হয়ে' এসেছে। তিনকড়ি অবিলম্বে ভোঁ-ভোঁ গাড়ী ছুটিয়ে' দিল বাড়ীর দিকে, জ্যোৎস্নাকে সে বাড়ী পৌছে দিতে পার্‌লে বাঁচে। জ্যোৎস্নার কাতর দৃষ্টি স্বামীর কৌতূহল-দৃষ্টির উপর স্থির হয়েছিল—গাড়ী ছুট্‌ল; সে দেখ্‌ল, স্বামী তার স্তব্ধ হয়ে' দাঁড়িয়ে আছে সেইখানে, দৃষ্টি তার গাড়ীর দিকেই।

(ক্রমশঃ)

মহাত্মাজী-সন্নিধানে

১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষাশেষি মহাত্মাজীর সহিত যারবেদা জেলে সাক্ষাৎকারের পর ১৯৩৪ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি কলিকাতায় জীবনলালজীর ভবনে তাঁহার সহিত পুনঃ সাক্ষাৎকার ঘটিল। তিনি এবার কলিকাতায় আসিয়া তিনদিন মাত্র ছিলেন। বাঙলার কংগ্রেস-দলে যে বিরোধ ও বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সমাধানোদ্দেশ্য লইয়াই তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। একান্ত অনুগ্রহ ও স্নেহ বশতঃ তিনি শনিবার ভোরে উপাসনার পরেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুজ্ঞা দিয়াছিলেন।

অতি প্রত্যুষে অন্ততঃ দুই ঘণ্টার উপর রাত্রি থাকিতেই ৪টা ২০ মিনিটে তাঁর উপাসনা কাল। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘেও কি শীত, কি গ্রীষ্মে শয্যাত্যাগের ব্যবস্থা আছে চার ঘটিকায়। কাজেই আমার ইহাতে অসুবিধার কারণ ছিল না। ঘুমন্তপুরী চৌরঙ্গী অতিক্রম করিয়া ভবানীপুরের প্রায় নিকটবর্ত্তী স্থানে কি সুপরিচ্ছন্ন গলির মধ্যে জীবনলালজীর বিপুল ভবন! মহাত্মাজী এইখানেই অবস্থান করিতেছিলেন। পথের ধারে বেঞ্চ পাতিয়া একদল পুলিশপ্রহরী লম্বা লাঠী হাতে তখনও ঝিমাইতেছিল। আজই মহাত্মা কলিকাতা ছাড়িয়া যাইবেন। কাজেই উপাসনাক্ষেত্রে ভীড়ের অবধি ছিল না। ভাটিয়া, মাড়োয়ারী, গুজরাটী, বাঙালী বহু লোকের উপাসনাক্ষেত্রে সমাবেশ হইয়াছিল। দুই একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলা ও ইস্‌লাম ধর্ম্মীকেও এই ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতে দেখিলাম। সবেমাত্র উপাসনা শেষ হইয়াছে। পথে, প্রাঙ্গনে, হলঘরে, চতুর্দ্দিকে কোলাহল কলরব। স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী কড়া পাহারায় দ্বার রক্ষা করিতেছে। পদে পদে বাধা পাইয়া, অবশেষে শ্রদ্ধেয় বন্ধু জীবনলালজীর অনুগ্রহে স্বামী চিদানন্দজী ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়ের সহিত আমি উপরের হলঘরে উপস্থিত হইলাম। সম্মুখেই মহাত্মার প্রমাণ তৈলচিত্রখানি চির-দিনের ন্যায় আজও মর্ম্মর-প্রস্তরমণ্ডিত পিয়ার-টেবিলে সুরক্ষিত, চরণতলে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলের রাশি। মহাত্মাজীর চিরানুগত একনিষ্ঠ ভক্ত মহাদেব দেশাই সাদরে আমাদের অভিবাদন জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার স্বভাব-বিনয় ও বন্ধুবাৎসল্যের পরিচয়—তাঁহার সহিত একবার যাঁহারা মিশিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। বসিয়াই তাঁহার সহিত আলাপ হইল। সম্মুখে দুই তিনটী

মহাত্মা গান্ধী

মহিলার সঙ্গে শ্রীমতী কস্তুরীবাই গান্ধীও বসিয়া ছিলেন। তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকট গিয়া ভক্তিজ্ঞাপন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম, আমায় তিনি চিনিতে পারেন কি না! একমুখ হাসিয়া তিনি বলিলেন, খুব পারি, কেমন আছেন? সদালাপ, অকৃত্রিম স্নেহ-বর্ষণ এ সকলের ত্রুটি তাঁহার নাই। কাকা কালেলকার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাদেব দেশাই তাঁহার সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন। শ্রীযুক্ত কালেলকার প্রীতিপূর্ণ

অভিনন্দন জানাইয়া বলিলেন—"তাড়াতাড়ি আজই চলিয়া যাইতে হইতেছে; বাঙলায় যদি ফিরা হয়, আপনার আশ্রম পরিদর্শনে যাইব। এই যুগে আপনার 'Spritual Communism' অনেকবার পড়িয়াছি, 'Standard Bearer' বন্ধ করিয়া দিয়াছেন বুঝি?" আমি বলিলাম, "এই গুরুভার বহিতে পারি নাই; এখন 'The Prabartak' বাহির করিতেছি। আপনাকে পাঠাইয়া দিব।" মহাদেব দেশাই বলিলেন—"কাকা সাহেব খুব ভাল বাঙলা জানেন। আপনার 'প্রবর্ত্তক' বেশ চলিতেছে, নয়!" স্বামীজির নিকট শ্রাবণ মাসের "প্রবর্ত্তক" ছিল; তিনি বাহির করিয়া দিলেন। দেশাই বলিলেন—"কাগজ খুব বাড়াইয়া ফেলিয়াছেন দেখিতেছি—আমিও বাঙলা জানি, আপনি তো তাহা জানেন।" আমি তাঁহার নিকট 'প্রবর্ত্তক' নিয়মিত পাঠাইতে বলিলাম। এমন সময়ে ঝড়ের ন্যায় এক মধ্য-বয়সী মহিলা দেশাই'এর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—"তোমার স্বেচ্ছাসেবকদের বলিয়া দাও দুয়ার ছাড়িয়া দিতে—কাল রাত্রি ধরিয়া সম্ভ্রান্ত মহিলারা দর্শনপ্রার্থী। এরূপ হইলে আমার মুখ থাকিবে না।" মহাদেব দেশাই বলিলেন—"বাপুজী যে মরিয়া যাইতেছেন—দর্শনের ভীড় আর না বাড়ানই ভাল।"

কিন্তু তিনি ছাড়িবার পাত্রী নহেন। তাঁহার আকুতি উপেক্ষা করা গেল না।

দেশাই বলিলেন "এই মেয়েটী irresistable; ইহাকে বাধা দেওয়া যায় না।"

দেখিতে দেখিতে হলঘর মহিলাবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। প্রফুল্লমুখে পূর্ব্বোক্ত মহিলা দেশাইয়ের কাছে আসিয়া চুপি-চুপি বোধ হয় আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। দেশাই আমাকে বলিলেন—"মতিবাবু, ইনি পাঞ্জাবের শম্মোদেবী; বাপুজীর সঙ্গে সঙ্গেই আছেন।" আমার কথাও তাঁহাকে বলিলেন। তিনি সহাস্যে বলিলেন "আপনার আশ্রম একবার দেখিবার ইচ্ছা আছে, সময় করিতে পারি না। একদিন যাইব—মনে রাখিবেন।"

এত ক্ষণ মহাত্মা ছিলেন বাথ্‌রুমে। তিনি অর্দ্ধ-উলঙ্গ মূর্ত্তিতে সহাস্যে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সকলেই সমুত্থিত হইয়া তাঁহাকে সভক্তি অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। তিনি হাসিতে হাসিতেই তাঁহার আসনে বসিয়া সস্নেহে সহাস্যে বলিলেন—"আঃ মতিবাবু, কেমন আছেন?" মহাত্মাকে সুস্থ ও প্রফুল্ল দেখিলাম। স্বামীজির সহিতও মহাত্মার পূর্ব্ব-পরিচয় ছিল। তিনি বলিলেন "নির্ম্মলবাবুকে চিনিয়াছি, কেবল বেশ-পরিবর্ত্তন হইয়াছে!" কৃষ্ণধনের পরিচয় দিলাম। তিনি সহাস্যে আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিলেন। তারপরই গম্ভীর ভাবে ও বেশ ঔৎসুক্যের সহিত প্রশ্ন তুলিলেন "তোমার চোখ কেমন আছে?" এত কাজের মধ্যেও তিনি মনে রাখিয়াছেন—গত বৎসর এমনই সময়ে আমার বাম চক্ষে অস্ত্রোপচার হইয়াছিল। তাঁর স্নেহ অযাচিত অনাবিল ধারায় উৎসরিত হইয়া আমাকে মুগ্ধ করিল।

আমি বলিলাম "অস্ত্রোপচারের পর অর্দ্ধেক দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছি; দক্ষিণ চক্ষুও কাটাইব কিনা ভাবিতেছি।"

অতি সতর্ক দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে চাহিয়া অতিশয় দরদের সহিত তিনি বলিলেন "ডাক্তারের সহিত ভাল করিয়া পরামর্শ করিও—আচ্ছা, সব-কিছু দেখিতে পাইতেছ তো? পড়িতে পার, লিখিতে কষ্ট হয় না?" প্রভৃতি—এই সকল ব্যক্তিগত কথা আমার খুবই লজ্জা দিতেছিল। কেননা, সম্মুখেই শ্রীযুক্ত ঠক্কর আসিয়া বসিয়াছেন। মহাদেব দেশাই অসংখ্য Visiting Card হস্তে দণ্ডায়মান আর স্নেহমূর্ত্তি কস্তুরীবাঈ দুধের পেয়ালা হস্তে প্রতীক্ষমানা। আমি তাঁহাকে বলিলাম "প্রাতরাশ সমাপন করুন, কথা হইবে।"

তারপর, দর্শনের পালা আরম্ভ হইল—মহিলাগণ একে একে মহাত্মার চরণ স্পর্শ করিয়া কেহ স্বর্ণবলয়, চুড়ী, হার, রৌপ্যনির্ম্মিত কঙ্কণ, কেহ স্বর্ণমুদ্রা, কেহ একশত এক রৌপ্যমুদ্রা, কেহ পঞ্চাশ, কেহ পঁচিশ, কেহ বা দশ, পাঁচ দুই পর্য্যন্ত অজস্রধারায় মহাত্মার চরণে উৎসর্গ-স্বরূপ অর্ঘ্য নিবেদন করিতে লাগিল। কাহারও স্বর্ণচুড়ি-সুশোভিত করশোভা, অথচ পাঁচটী রৌপ্যমুদ্রা নিবেদন করিবামাত্র মহাত্মাজী বলিয়া উঠিলেন—"কেঁও, চুড়ি নিকালো।"

এক শ্বেতাঙ্গ-মহিলা দর্শন করিতে আসিয়াছেন, কিন্তু দর্শনী আনেন নাই। তিনি একটু অন্তরালে গিয়া ঋণ করিতেছিলেন অন্য এক মহিলার নিকট—মহাত্মার দৃষ্টি

এড়াইবার জো ছিল না। দর্শনী দিতে আসিলে তাঁহাকে বলিলেন—"এ দান তোমার নয়, It is a big fraud!" তিনি সপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "আমি উহাকে বাড়ী গিয়াই শোধ দিব।" মহাত্মাজী হাসিয়া বলিলেন "কিন্তু আমার জন্য তো কিছু আন নাই—ধার করা অর্থে ধর্ম্ম হয় না!" সকলে হাসিয়া উঠিল।

মহাত্মাজীর এই উলঙ্গ ভিক্ষাবৃত্তি স্মরণ করাইয়া দেয়—রাজগৃহ, পাটলিপুত্র, বৈশালী রাজনগরীর পথে পথে এমনই একজন ভিক্ষুক ভিক্ষাপাত্র হস্তে বাহির হইয়াছিলেন—তাঁর আহ্বানে রাজা রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়াছিল—ধনী সর্ব্বহারা হইয়াছিল—যুবতী সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-মণ্ডিত যৌবনশ্রী বিসর্জ্জন দিয়াছিল—ঘৃণ্য বারাঙ্গনা পাপের পশরা পদতলে অর্ঘ্য দিয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছিল—ভিখারিণী যাচ্ঞার করুণ বাণী শুনিয়া লজ্জা-নিবারণের বস্ত্রখানিও ছুঁড়িয়া দিয়া আত্মনিবেদন করিয়াছিল।—সেই সনাতন করুণ দৃশ্য জীবনলালের ভবনে—কলিকাতার রাজপথে, সভাক্ষেত্রে দেখিয়া বিস্মিত পুলকিত হইয়াছি। বিশ্বহিতে তাঁর কণ্ঠে মহামানবতারই আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে—"দাও, দাও, বন্ধন রাখিও না। মুক্তিলাভ কর, মুক্ত কর তোমার দেশকে, জাতিকে।"

দর্শনের ধূম প্রশমিত হইল। তিনি কথারম্ভ করিলেন। কাজের ছোটখাট কথায় অনেক সময় কাটিয়া গেল। তিনি জানিতে চাহিলেন—আমার কাজ কেমন চলিতেছে। এক নিঃশ্বাসে বলিলাম—"খাদি লইয়া খুবই চেষ্টা করিতেছি, হরিজনের কাজে সজ্যে প্রায় এগার শতের অধিক অস্পৃশ্য-পরিবার প্রতিপালিত হইতেছে। বারশতের অধিক ছাত্র ছাত্রী শিক্ষালাভ করিতেছে। প্রায় সাড়ে-সাত শত হাড়ি, মুচি, বাগ্দী, কেওড়া, মুসলমান আমাদের কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানে কাজ করিতেছে—শতাধিক বেকার নানাবিভাগে স্বাবলম্বনের শিক্ষালাভ করিতেছে। সমস্ত প্রতিষ্ঠানটীকে রক্ষা করিবার জন্য আমাদের এখনও বাৎসরিক ২৫।৩০ হাজার টাকা খরচ করিতে হয়—ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে সঙ্ঘ হইতেই উপস্থিত এই অর্থ উপার্জ্জিত হইতেছে। এইভাবে আমরা চলিয়াছি দিনের পর দিন গণিয়া—যেটুকু করিব, যাহাতে তাহা স্থায়ী হয় সেই দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া চলিয়াছি। রাজনীতিক ক্ষেত্রে আমরা নাই—কোনরূপ আন্দোলনে যোগদান করারও উৎসাহ অনুভব করি না। নিঃশব্দে অনাড়ম্বরে দেশের একদল তরুণকে লইয়া অগ্রসর হইতেছি ধীরে ধীরে সংগঠন-কর্ম্মে। ইহার উপর আপনার যদি কিছু নূতন suggestion থাকে দিলে উপকৃত হইব। তিনি গম্ভীর হইলেন, কপালে তাঁহার ত্রিবলী চিহ্ন ফুলিয়া উঠিল, কাপে চুমুক দিয়া এক ঢোঁক দুধ গলাধঃকরণ করিয়া বলিলেন—"না, তোমায় আমার কিছু বলিবার নাই—শুধু এইটুকু বলি, All that you do is good."

স্বামীজি কথা তুলিলেন—"কংগ্রেসের মিটমাট সম্বন্ধে কি হইল?" মহাত্মা ঈষৎ নৈরাশ্যব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন—"Hope against hope. কিন্তু কি হইবে, নেতাগিরি শুধু monopoly করিয়া রাখার ব্যবস্থা নয়, downright fraud. Sincerity নাই, purity নাই।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সমগ্র ভারতেরই কি এই অবস্থা!" তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন—"হাঁ, তবে বাঙলায় কিছু মাত্রাধিক্য দেখিতেছি।"

সনাতনীদেরও কথা উঠিল। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের কথা লইয়া অল্পক্ষণ আলোচনা চলিল, তাহা ব্যক্তিগত এবং যারবেদা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তর্করত্ন মহাশয় আমার প্রতি প্রসন্ন নহেন বুঝিয়া সে সকল বিষয় প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করিলাম না।

এই প্রসঙ্গ শেষ হইবামাত্র, মহাদেব দেশাইয়ের অনুনয়-পূর্ণ দৃষ্টি চক্ষে পড়িল। তিনি জোড়-করে বলিলেন—"মতিবাবু, অনেক সময় আপনি লইলেন!" একান্ত অপ্রস্তুত হইয়াই মহাত্মাজীকে প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। অসংখ্য লোক দর্শনপ্রার্থী হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। ইহা ব্যতীত, হরিজন ও কংগ্রেস সম্পর্কিত আলোচনা হওয়ার নির্দ্ধারিত সময়ের অপব্যয় হইতে পারে ভাবিয়া মহাত্মাজীর সাদর সম্ভাষণ ও আশীর্ব্বাদ লইয়া প্রস্থানোদ্যত হইলাম। দেশাই গাত্রোত্থান করিয়া একান্ত মিনতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"মনে কিছু

করিবেন না, আমি নিরুপায় এক মুহূর্ত্ত সময় উঁহাকে বিশ্রামের জন্য দিতে পারা যায় না। এমন কি ডাঃ রায় উঁহার স্বাস্থ্য-রক্ষার ভার লইয়াছেন, কিন্তু এই সুযোগ তিনিও ছাড়িতে পারেন না। একবার নিকটে বসিলে অনেক সময় আলোচনায় অতিবাহিত করেন।" আমার মনে হইল, ডাঃ রায় কেন, যে কেহ মহাত্মাজীর সান্নিধ্যে আসিবে তাঁহার অলৌকিক আকর্ষণ ও সদালাপে তাঁহাকে এমনই ভাবে আকৃষ্ট হইতেই হইবে। ঘরের বাহিরে অভয় আশ্রমের অন্নদাবাবুর সহিত এই আমার প্রথম দর্শন ঘটিল। সিঁড়ি দিয়া নামিতে গিয়াই দেখি শ্রদ্ধেয় বন্ধু সতীশবাবু Miss Slade-এর অনুরূপ দুইজন মুণ্ডিত-শীর্ষা মহিলাকে সঙ্গে লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছেন। তাঁহার প্রাণশক্তির অবধি নাই। মহাত্মার আগমনে অধিকতর উদ্বুদ্ধ—সত্যই তিনি কর্ম্মোন্মাদ!

তারপর পথে বাহির হইয়া ভাবিলাম, এই অন্ধকারময় ভারতে শিবরাত্রির সলিতার ন্যায় এই দীপটী যদি নিভিয়া যায়! সে দুর্দ্দিনের কল্পনা করা যায় না। একটা কথা বিশেষ করিয়া মর্ম্মে বিঁধিয়াছিল—সে কথাটী এখনও বলা হয় নাই—ভবিষ্যতে আমাদের আশ্রমে আসিবার কথা উত্থাপন করিলে, তিনি করুণ দৃষ্টিতে মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "মতিবাবু, বাঙলায় আমার এই শেষ আগমন!" এখনও ভাবিতেছি—এমন কথা কেন বলিলেন!

বাঙলায় আসিয়া, শুনিতে পাই, তিনি নাকি তিনদিনে ৭৫ হাজার টাকা লইয়া গিয়াছেন। সে টাকার কৈফিয়ৎও কেহ কেহ চাহিতেছেন। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য, এই ৭৫ হাজার টাকার মধ্যে বাঙালীর দান কতখানি আছে। চক্ষের সম্মুখে দেখিয়াছি অবাঙালীকেই অকাতরে অর্থ দিতে; আর সে অর্থদানের সঙ্গে কাহারও যে দাবী কিছু আছে তাহা মনে হয় নাই। মহাত্মাজীকে তনুমনোপ্রাণ দেওয়ার অক্ষমতায় অর্থদানে সান্ত্বনা লইতে সহস্র সহস্র লোকের ভীড় দেখিয়াছি, লোকের এই শ্রদ্ধার্ঘ্য মহাত্মাজীর নিজস্ব সম্পদ্ হইলেও কিছু বলিবার নাই; কিন্তু কড়িও বিনা হিসাবে গৃহীত হয় না, দেখিলাম—ঠক্করের কাগজ-পেনসিল প্রতি দানটী হিসাবগত করিয়া চলিয়াছে। যে দান মহাত্মা তুলিয়া লইলেন, সে দানের কড়ি দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণেই ব্যয়িত হইবে, ইহাতে সংশয় ক্ষত মনেরই পরিচয়।

ফরাসী চন্দননগরের কৃতী সন্তান

[হৃষী]কেশ রক্ষিত

ফরাসী চন্দননগরের শ্রীমান্ হৃষীকেশ রক্ষিত বেতার-তরঙ্গের গতিপ্রণালী সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণার জন্য এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি, এস, সি উপাধি পাইয়াছেন। এবং এই সম্মানের জন্য চন্দননগরের পুস্তকাগারের উদ্যোগে নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে সম্প্রতি চন্দননগরবাসী তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। চন্দননগরবাসীর মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই উপাধি লাভ করিলেন! তাঁহাকে আমরাও আন্তরিক অভিনন্দন জানাইয়া তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি।

— প্রবাহ —

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি, এ

অষ্ট্রো-জার্ম্মাণীর রাষ্ট্র-বিবর্ত্তন

দুনিয়ার দৃষ্টি আজ প্রাচ্যের জাপান ও প্রতীচীর জার্ম্মাণীর উপর নিবদ্ধ। ক্ষুদ্র জাপান প্রাণ-চাঞ্চল্যে সন্তাড়িত—আত্মসম্প্রসারণের অসীম আকাঙ্খায় আজ সে প্রেরণাময়। অষ্টপাশবদ্ধ জার্ম্মাণী তেমনি মুক্তির ব্যাকুলতায় উদ্দীপিত। বৈদেশিক বাণিজ্য ও রাষ্ট্র-স্বার্থ-সূত্রে বর্ত্তমান জগতের জাতিসমূহ এমনিভাবে গ্রথিত, যে কোন জাতিরই আর নিরপেক্ষ উদাসীন থাকা চলে না। আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের এই জটিলতা ক্রমশঃই পরস্পরগত ব্যবধান মুছিয়া, সকল ব্যষ্টি-রাষ্ট্রেতিহাসের বিভিন্নতা ঘুচাইয়া যেন সকলের স্বার্থ ও কল্যাণ-অকল্যাণে সংমিশ্রিত বিশ্বের এক অখণ্ড ইতিহাস রচনা করিতে চলিয়াছে। কে জানে, বর্ত্তমানের বিজ্ঞানময়ী সভ্যতার অভিযান কোন্ লক্ষ্যে? মানবতার মহামিলন-ক্ষেত্র অথবা অসুর-পিশাচের বীভৎস শ্মশান-ভূমি—তাহা একমাত্র ভাবী কালের গর্ভেই নিহিত!

মানুষের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, আজিকার সভ্যতার জন্ম অত্যাচারে—পুষ্টি তার প্রতিহিংসায়—শোণিত-রঞ্জিত তার সর্ব্বশরীর। উৎকট রক্ত-লোলুপতায় ছিন্নমস্তা সভ্যতা নিজের রক্ত নিজে পান করিয়াছে ও করিতেছে। সু-উচ্চ আকাশে সে উড়িয়াছে, সমুদ্রের অতল তলে বিচরণ করিয়াছে, বিচিত্রতার অপূর্ব্ব সমাহারে ও উজ্জ্বলতায় বাহিরের খোলস তার আলোয় ভরা; কিন্তু অন্তরের পাশবিকতার উপরে সে আজও উঠিতে পারে নাই।

ইহার উলঙ্গ নগ্ন মূর্ত্তি অষ্ট্রো-জার্ম্মাণীর কিঞ্চিদধিক একটি মাত্র মাসের ঘটনা-পরম্পরায় সুপ্রকট। চলচ্চিত্রের মত ঘটনার পর ঘটনায় সেই একই হিংসা-বিজীগিষার পুনরভিনয়। জার্ম্মাণ-নাজীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, হিটলারের প্রাণনাশের প্রচেষ্টা, জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহের রক্তোৎসব—সে উৎসব-রজনীর ভোর হইতে না হইতে, শোণিত-সিক্ত ধরণীতল শুকাইতে না শুকাইতেই আবার অষ্ট্রীয়ায় নারকীয় নাট্যের উৎকট অভিনয়ের সুরু। অষ্ট্রীয়ার রাষ্ট্র-কর্ণধার, বিপদের বন্ধু ডাক্তার ডলফাসের শোচনীয় হত্যা সত্যই বড় বেদনাময়। বিগত ২৫শে জুলাইয়ের সে এক অশুভ মুহূর্ত্ত! ভিয়েনা সহরে অষ্ট্রীয়ার মন্ত্রীসভার বৈঠক বসিয়াছে, নিরুদ্বিগ্ন আলাপ-আলোচনা চলিয়াছে। এমন সময়ে

প্রিন্স বিসমার্ক

শতাধিক বিদ্রোহী-নাজীর পুলিশের পোষাকে পার্ল্যামেণ্ট গৃহে অপ্রত্যাশিত প্রবেশ এবং চ্যান্সলার ডলফাস ও মেজর ফেকে অতর্কিতে বন্দীকরণ। একদা কৃষক-পুত্র, সেদিন অষ্ট্রীয়ার সর্ব্বময় কর্ত্তা, অষ্ট্রীয়ার ডিক্টেটরী আশা নীরবে বুকে পোষণ করিয়া ডাঃ ডলফাসের আততায়ীর হস্তে অসহায় জীবনাবসান একান্তই ভাগ্যের পরিহাস! মেজর ফেকে তাঁর পিতা-মাতা-পরিবারবর্গকে দেখিবার অন্তিম অনুমতি—তাঁর শেষ অন্ত্যেষ্টি-বাসরে পুত্রশোকাতুর অখ্যাত কৃষকদম্পতির ব্যথার নীরবাশ্রু-বিসর্জ্জন বড়ই সুকরুণ। তারপর প্রতিক্রিয়ামূলক যে বিদ্রোহ-দমন-লীলা তাহাও মানুষের প্রাণ লইয়া ছিনি-মিনি খেলারই নিষ্ঠুর পুনরাবৃত্তি। অষ্ট্রীয়ার বর্ত্তমান

চাঞ্চল্যময় রাষ্ট্র-পরিস্থিতিতে শাসক-শাসিত উভয়ের জীবনই বিপন্ন। এই দুর্য্যোগ-রজনীর কবে অবসান হইবে, ভবিতব্যই জানে।

অষ্ট্রো-জার্ম্মাণীর সেদিনকার ঘটনা অভিনব নহে। আজিকার সভ্যতার জন্মভূমি ইউরোপের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় এ অশ্রুময় আসুরিকতার পুনরাবৃত্তির দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়।

মধ্য ইউরোপের, বিশেষ করিয়া অষ্ট্রো-জার্ম্মাণীর মত পরম্পরগত রাষ্ট্র-সমাজ-বিষয়ক সম্বন্ধের জটিলতা ও সমস্যা ইউরোপের অন্যত্র অতি বিরল।

কাউন্ট ভন মলটকি

অধুনা বিস্মৃতপ্রায় মধ্য-যুগের ব্রাণ্ডেনবার্গ বহু আবর্ত্তন বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আজিকার প্রাশিয়ায় রূপান্তরিত হইয়াছে। মাত্র দু'শো বছরের কথা! অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম প্রভাতে (১৭০১) ব্রাণ্ডেনবার্গের ইলেকটর আংশিক প্রাশিয়ার রাজা বলিয়া ঘোষিত হন। তখনও প্রাশিয়া ইউরোপীয় শক্তিশালী স্বাধীন রাষ্ট্র-নিচয়ের পদমর্য্যাদায় স্বীকার্য্য ছিল না। প্রাশিয়া-রাজ্যের প্রথম বোধন হইতেই সেখানে একটা শৌর্য্য-বীর্য্যসম্পন্ন সমরপ্রিয় ক্ষাত্রশক্তি-সংগঠনের ধারাবাহিক প্রয়াস চলিয়া আসিয়াছে। বল্‌টিক সাগরের পূর্ব্ব-তীরের আদিম নিবাসী প্রাশিয়ার পূর্ব্ব-পুরুষ হিদেন ও শ্লাভের উগ্র রক্তধারা বিজয়ী সামরিক টিউটনিক নাইট্‌স ও পোলিশদের শোণিত-ধারার সঙ্গে সংমিশ্রিত হইয়া যে এক অভিনব কৃষ্টি ও রক্তগত সভ্যতার সৃষ্ট হয় তাহা আধুনিক ইউরোপের রাষ্ট্র ও সভ্যতার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থানাধিকার করিয়াছে।

মধ্য ইউরোপের অনেকগুলি ছোট-বড়-মাঝারি, দুর্ব্বল-সবল ষ্টেটের সমষ্টিই জার্ম্মাণী নামে অভিহিত। ইহাদের মধ্যে প্রাশিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও বিগত দুই শত বছর ধরিয়া জার্ম্মাণীর আভ্যন্তরীণ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছে বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ইউরোপের ধর্ম্ম-সংস্কারান্দোলনের উদ্দাম প্রবাহ থামিয়া গেলেও, উহার বিষময় পরিণাম জার্ম্মাণীতে উৎকট হইয়াই দেখা দিল। ইহার ফলে জার্ম্মাণী শতধা বিচ্ছিন্ন-বিভক্ত হইয়া পড়িল। শাসক-শাসিতের মাঝে ধর্ম্মমত লইয়া রেষারেষি ও দলাদলির সেই যে সূচনা, তাহার নিঃশেষ অবসান আজও হয় নাই। প্রজারা ছিল সাধারণতঃ প্রটেষ্টাণ্ট; কিন্তু শাসক-সম্প্রদায় ছিল অধিকাংশই ক্যাথোলিক মতাবলম্বী। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের সুশাসনে ও মেরিয়া থেরেসার অষ্ট্রীয়ার সিংহাসন লইয়া বিরোধের সুযোগে সাইলেসিয়া প্রদেশটি লাভ করায়, প্রাশিয়া শক্তি ও সম্মানে ইউরোপের অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রের সমান আসন পাইতে সমর্থ হইয়াছিল। প্রাশিয়ার অভ্যুত্থানের সব চেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল অষ্ট্রীয়া। অষ্ট্রীয়ার রাজ-পরিবারের শাসিত ও অধিকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষ্টেটগুলির সমবায়ে অষ্ট্রীয়ান সাম্রাজ্যের বনিয়াদ-পত্তন হয় এবং প্রথম চার্ল্‌সের (১৫১৬-৫৬) স্পেনের সিংহাসনাধিরোহণ করিবার পর হইতে জার্ম্মান-স্পেন-অষ্ট্রীয়ার যুক্ত সম্রাট্‌রূপে অষ্ট্রীয়ার এই রাজবংশ দীর্ঘদিন ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিপুল প্রভাব-বিস্তার করিয়াছিল। অষ্ট্রীয়ার রাজা অষ্ট্রো-জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের উপর নিরাপদে বহুদিন আধিপত্য করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু প্রথম বিদ্রোহের সুর প্রাশিয়ার কণ্ঠেই বাজিয়া উঠে।

১৬০৮ খৃষ্টাব্দে জন সিজিসমাণ্ড ব্রাণ্ডেনবার্গের ইলেকটর হইবার পর হইতে হোয়েনজোলারন রাজবংশ প্রাশিয়াতে প্রতিষ্ঠা পায় এবং সেই সময় হইতে অষ্ট্রো-জার্ম্মাণীর প্রায় তিন শত বছরের সম্বন্ধ এক কথায় হোয়েনজোর্লান ও হ্যাপস্‌বার্গ রাজবংশের নিখিল জার্ম্মাণীর প্রভুত্ব লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়া কিছু নয়।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ ইউরোপের রাষ্ট্রেতিহাসে চির-স্মরণীয়। কুঁনিজের চালে ইউরোপীয় রাজনীতি-ক্ষেত্রে যুগান্তর উপস্থিত হয়। নিখিল প্রতীচ্যে সে সময়ে দুইটি সমস্যা সব-চেয়ে বড় হইয়া দেখা দেয়—অষ্ট্রো-জার্ম্মাণীর আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্র-প্রভুত্ব লইয়া অষ্ট্রো-প্রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মাঝে বৈদেশিক স্বার্থ লইয়া সংঘর্ষ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে হাপ্‌সবার্গ-বুরবন রাজবংশের শত বর্ষের মনোমালিন্য মুছিয়া গিয়া এবং ইংলণ্ড-অষ্ট্রীয়ার চির-মিত্রতা ঘুচিয়া ভার্সাই-সন্ধির ফলে একদিকে ক্যাথলিক মতাবলম্বী ফ্রান্স ও অষ্ট্রীয়ার মিত্রতা এবং অন্যদিকে প্রোটেষ্টাণ্ট ইংলণ্ড-প্রাশিয়ার মিলন ইউরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে একটা ওলট-পালট আনিয়া দিল। ইহার পর ইউরোপে দীর্ঘ সাত-বৎসর-ব্যাপী যে রণদামামা বাজিয়া উঠিল, তাহার ফলে রুশিয়া, অষ্ট্রীয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে পোলাণ্ডের যে ভাগ-বাটোয়ারা হয় তাহাতে পোলাণ্ডের অধিকৃত প্রাশিয়ার পশ্চিমাংশ লাভ করিয়া দ্বিতীয় ফ্রেডরিক সমগ্র প্রাশিয়ার একচ্ছত্র অধিপতি হন। তারপর অষ্ট্রো-প্রাশিয়ার সুদীর্ঘ শত বর্ষের সম্বন্ধ এক কথায় জার্ম্মাণীর উপর প্রভুত্ব লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়া আর কিছু নহে। অষ্ট্রো-প্রাশিয়ার এই বিচিত্র দ্বন্দ্বপূর্ণ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হয় ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে, যাহা আজও প্রাচীন জীবন্ত মানুষের স্মৃতিতে জাগরূক। এই সব কারণে দ্বিতীয় ফ্রেডরিককে আধুনিক প্রাশিয়ার অগ্রস্রষ্টা অনায়াসেই বলা চলে।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে চতুর্থ ফ্রেডরিকের ভ্রাতা প্রথম উইলিয়মের সিংহাসনাধিরোহণের পর জার্ম্মাণেতিহাসের এক অভিনব অধ্যায়ের আরম্ভ হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নেপোলিয়ান বোনাপার্টির পতনের পর ভিয়েনায় যে কংগ্রেস বসে (১৮১৫), তাহাতে বিপর্য্যস্ত ইউরোপের আপোষ মীমাংসা হয়। সেই সময়েই জার্ম্মাণীকে বিভিন্ন ষ্টেটের সমবায়ে যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করা হয়। নামে যুক্ত-রাষ্ট্র হইলেও, বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি কাজে তাদের ব্যষ্টি-স্বতন্ত্রতা সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াই চলিত। ঠিক এই সময়ে (১৮১৫-১৮৯৮) প্রাশিয়ার ভাবী ভাগ্যা তাহারই এক অভিজাত-বংশোদ্ভূত বীর অটো ভন বিস্‌মার্কের অভ্যুত্থানে প্রাশিয়ার রাষ্ট্র-প্রগতি নূতন খাতে বহিতে সুরু করে। পিটাসবার্গ ও ফ্রান্সে প্রথমতঃ রাজদূতের কার্য্য করার পর তাঁর অসীম প্রতিভার পরিচয় পাইয়া প্রথম উলিয়ম তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। প্রাশিয়া তথা সমগ্র জার্ম্মাণীকে অষ্ট্রীয়ার রাষ্ট্র-প্রভুত্ব হইতে মুক্তি দিবার এবং প্রাশিয়ার নেতৃত্বাধীনে নিখিল জার্ম্মাণীকে সঙ্ঘবদ্ধ করার সঙ্কল্প লইয়াই তিনি গোড়া হইতে শক্তিশালী সৈন্যদল গঠন করিতে প্রবৃত্ত হন। বিনা যুদ্ধে ও রক্তপাতে ইহা সম্ভব ছিল না। এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অগ্নিময় সঙ্কল্প লইয়াই তিনি তাৎকালীন প্রাশিয়ান পার্ল্যামেণ্টের বিরোধিতা ও শত অর্থাভাব অগ্রাহ্য করিয়াও

দ্বিতীয় উইলিয়ম (কাইজার)

সৈন্যদল-গঠনে মনোনিবেশ করেন এবং কোন অছিলায় অষ্ট্রীয়ার সঙ্গে বিবাদের সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। শেল্‌সউইগ-হলষ্টেন সমস্যা লইয়া সে সুযোগ জুটিল। একদিকে প্রাশিয়া ও অষ্ট্রীয়া অপর দিকে ব্যাভেরিয়া, স্যাক্সনী ও কতকগুলি জার্ম্মাণ ষ্টেটের সহযোগিতায় অষ্ট্রীয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। শতাব্দী পূর্ব্বে প্রাশিয়ার ফ্রেডরিক দি গ্রেট ও অষ্ট্রীয়ার মেরিয়া থেরেসার মাঝে জার্ম্মাণীর প্রভুত্ব লইয়া যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুরু হইয়াছিল, এই যুদ্ধে তার নিঃশেষ অবসান হইল। অষ্ট্রীয়ার চিরোন্নত গর্ব্বিত শির বিসমার্কের ক্ষাত্র শক্তির নিকট অবনত হইল। অষ্ট্রীয়ার জার্ম্মাণীর উপর প্রভুত্বের চিরাবসান হইল। কিন্তু জার্ম্মাণীর আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন-সমস্যার সমাধান

তখনও অত সহজ ছিল না। ১৮৬৬-১৮৭০ পর্য্যন্ত জার্ম্মাণী দুইভাগে বিভক্ত ছিল। একদিকে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ উত্তর জার্ম্মাণী, দক্ষিণে দুর্ব্বল ব্যাভেরিয়া, ওয়ার্টেমবার্গ, ব্যাডেন ও হিসি স্ব-স্ব স্বতন্ত্রতা লইয়া কলহরত।

কিন্তু বিধির বিধানে অপ্রত্যাশিত ভাবেই অখণ্ড জার্ম্মাণ-রাষ্ট্র-রচনার সুযোগ ঘটিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে জার্ম্মাণীর ইতিহাসে এই সর্ব্বপ্রথম শত শত বৎসর পরে মিলিত উত্তর-দক্ষিণ জার্ম্মাণীর নিখিল রাষ্ট্রনিচয় একমাত্র পিতৃভূমির কল্যাণকামনায় শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। ১৮৭১ সালের ১৮ই জানুয়ারী জার্ম্মাণীর ইতিহাসে চির সমুজ্জ্বল। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ ফ্রান্স

ভন হিণ্ডেনবার্গ

জার্ম্মাণীকে বিপুল অর্থ (বিশ কোটি পাউণ্ড) ও আলসাস্-লোরেন প্রদেশ দিয়া মুক্তি পাইল এবং বিজয়ী প্রাশিয়ার গলায় সমবেত জার্ম্মাণ-রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় জয়মাল্য পরাইয়া দিল। বিখ্যাত ভার্সাই হলে প্রাশিয়ার রাজা সমগ্র জার্ম্মাণীর সম্রাট্ বলিয়া ঘোষিত হইলেন। সে-দিন নবীন জার্ম্মাণীর যুক্ত-রাষ্ট্র-কাঠামো নূতন করিয়া রচিত হইল। সমগ্র জার্ম্মাণীর ২৫টি স্বতন্ত্র ষ্টেটের সরকারী মনোনীত সদস্যের দ্বারা গঠিত উচ্চ পরিষৎ (বুনডেস্‌রাথ) এবং জনগণের নির্ব্বাচিত সভ্যের দ্বারা রচিত নিম্ন পরিষৎ (রীচষ্ট্যাগ) একত্রভাবে জার্ম্মাণীর আইনকানুন করার এবং প্রাশিয়ার রাজা যুক্ত জার্ম্মাণীর সম্রাট্‌রূপে তাহা কার্য্যকরী করার ক্ষমতা পাইলেন। শত শত বৎসর পরে সমবেত জার্ম্মাণী দুনিয়ার প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র-সম্মানে অভিনন্দিত হইল। এই নব্য জার্ম্মাণীর স্রষ্টা বিস্‌মার্ক। কি রণক্ষেত্রে কি মন্ত্রণা-গৃহে ভনমলট্‌কি ছিলেন তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। বিস্‌মার্ক এবং ভন মলট্‌কির বিজয়গর্ব্বে প্যারিস প্রবেশ, তাঁদের বিজয়-সেনানী, পথিপার্শ্বে তন্তুবায়-গৃহে বিস্‌মার্ক ও ফ্রান্সের সম্রাট্ তৃতীয় নেপোলিয়নের বিখ্যাত শান্তির কথা-বার্ত্তা—আজও জার্ম্মাণবাসী সগৌরবে প্রবাদবাক্যের মত কহিয়া থাকে।

এই সময়ে তাৎকালীন অষ্ট্রীয়ার রাজা ফ্রান্সিস জোসেফ আভ্যন্তরীণ লোকমত-সংগঠনের দ্বারা অষ্ট্রীয়ার লুপ্ত গৌরব পুনরায় ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি হাপ্‌সবার্গ-রাজ্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, অর্দ্ধভাগ অষ্ট্রীয়া ও অপরার্দ্ধ হাঙ্গেরী রাষ্ট্রে পরিণত করেন। বৈদেশিক রাষ্ট্র-নীতি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ব্যাপার ভিন্ন উভয় রাষ্ট্রই আভ্যন্তরীন কার্য্যকলাপে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল এবং ফ্রান্সিস জোসেফ ছিলেন উভয় রাজ্যেরই স্বতন্ত্র ভাবে রাজা। এই যুগ্ম-রাজ্য-সৃজনের দ্বারা তিনি উভয় দেশেই শান্তি-স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। মাঝে মাঝে শ্লাভদিগেরও হাঙ্গেরীর অনুরূপ দাবীর উত্থাপনা ছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে অষ্ট্রীয়া-রাজ্যে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ সন্ধিক্ষণে (১৮৯০) জার্ম্মাণ সম্রাট্ দ্বিতীয় উইলিয়মের রাজত্বের সূচনায় নব্য-জার্ম্মাণীর পিতা বিস্‌মার্কের ভাগ্য-বিপর্য্যয় বড়ই শোচনীয় ঘটনা। বৃদ্ধ বিস্‌মার্কের অনম্র প্রতাপ দ্বিতীয় উইলিয়মের অবিনীত ইচ্ছার নিকট নমিত না হওয়ায় তাঁকে পদত্যাগ করাইতে বাধ্য করান হয়। শেষ জীবনের এই ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে ও অবমাননায় তিনি ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁর বিগত-জীবনের অমরকীর্ত্তি স্বাধীন জার্ম্মাণীর ইতিহাসে চিরদিন সমুজ্জ্বল থাকিবে।

অষ্ট্রো-জার্ম্মাণীর মাঝে শান্তি-স্থাপনের পর ইউরোপের রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উল্লেখ-যোগ্য কোন চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় নাই। সমস্বার্থ ও অনুকূল অবস্থাধীন সেই সময়ে ইউরোপের আন্তর্জাতিক যে রাষ্ট্র-সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে, তাহা বিংশ শতাব্দীর মহাযুদ্ধের

পরে এবং আজ পর্য্যন্তও বাহ্যতঃ অনড়ই রহিয়াছে। অষ্ট্রো-জার্ম্মাণ-ইতালী এই ত্রি-শক্তির এবং ফ্রাঙ্কো-রাশিয়া এই দ্বিশক্তির মিত্রতা-বন্ধন এখনও অক্ষুণ্ণই আছে। প্রথমোক্ত শক্তিত্রয় রাজতন্ত্রবাদী হওয়ায় পরস্পরের মাঝে সন্দেহের কোনই অবকাশ ছিল না; কিন্তু প্রজাতন্ত্রবাদী ফ্রান্স ও অটুট রাজতন্ত্রবাদী রাশিয়ার বন্ধুত্বের মাঝে আদর্শগত অমিল উভয়কেই সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিত।

বিংশ শতাব্দীর ইউরোপে মহাকুরুক্ষেত্রের পর অষ্ট্রো-জার্ম্মাণ-ইতালীতে প্রজা-শাসনতন্ত্র-বাদী আদর্শ প্রবর্ত্তিত হওয়াতে, উক্ত শক্তিত্রয়ের আদর্শ-গত মিলনের কোন ক্ষুণ্ণতা আসে নাই, এমন কি আজিকার ডিক্টেটরী শাসন-ভঙ্গীর মধ্য দিয়াও এই তিন শক্তি প্রায় সমানে পদ সঞ্চার করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু রাজপ্রিয়তা অষ্ট্রো-জার্ম্মাণীর জন-চিত্তে ম্লান হইয়া আসিলেও, এ মজ্জাগত ভাব সহজে সমূলে বিনষ্ট হইবার নয়। রাশিয়ায় কমিউনিজমের নব অভ্যুত্থানে ইউরোপীয় রাষ্ট্রক্ষেত্রে আবার এক নূতন সমস্যার আবির্ভাব হইয়াছে। রাশিয়ার কমিউনিজম্-আদর্শবাদ আজ কোন না কোন ভঙ্গীতে ইউরোপের রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করায় সর্ব্বত্রই বিচিত্র সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। এই সব আদর্শগত বৈষম্যের জন্য ও বিগত বিখ্যাত ভার্সাই-সন্ধিতে স্বার্থান্ধ বিজয়ী মিত্রশক্তির অদূর-দর্শিতায় খণ্ডীকৃত মধ্য ইউরোপে কতগুলি নূতন স্বাধীন রাষ্ট্র-সৃজন হেতু সেখানে আজ প্রত্যেকটি রাজ্যে আভ্যন্তরীণ চাঞ্চল্য অনিবার্য্য। অষ্ট্রীয়ায় বিগত নৃশংস হত্যাকাণ্ড এই সকল রাষ্ট্রাদর্শবাদের সজ্ঘর্ষেরই বিষময় পরিণতি।

চ্যান্সলার ডলফাসের জীবনদানেও অষ্ট্রীয়ার অশান্তি নিরসিত হয় নাই। মধ্য ইউরোপের রাষ্ট্র-ভার কেন্দ্র অষ্ট্রীয়ার প্রতি বর্ত্তমানে তার পারিপার্শ্বিক সকল স্বাধীন রাষ্ট্রেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ। অষ্ট্রো-জার্ম্মাণীর মিলন বিশেষ করিয়া ইতালী-ফ্রান্সের অসহনীয়। প্রিন্স অটোর সিংহাসনারোহণ, হাপ্সবার্গের প্রত্যাবর্ত্তন ও অষ্ট্রীয়ায় রাজতন্ত্রের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা ফ্যাসিষ্ট মুসোলিনীর বরণীয় হইলেও, আশপাশের প্রজাতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রের অসহ। অষ্ট্রীয়ার বর্ত্তমান চ্যান্সলার ডাঃ সুচনীগ ও অধিকাংশ রাষ্ট্র-কর্ণধারগণ রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী হইলেও, নাজী এবং কমিউনিষ্টদের পক্ষপাতী উপাদানও অষ্ট্রীয়াতে নগণ্য নহে। অর্থ-সঙ্কট তো আছেই। বহিঃপ্রভাব ও আভ্যন্তরীণ আদর্শ বৈচিত্র্যে অষ্ট্রীয়া আজ দিশেহারা—বিপর্য্যস্ত। অষ্ট্রীয়ার ভাবী পরিণাম একান্তই অনিশ্চিত।

যুদ্ধান্তের জার্ম্মাণীতে সেখানকার ইতিহাসের একটা বিপর্য্যয় ও পুনরাবৃত্তিই দেখা যায়। সেই ভার্সাই—একদা যেখানে কাইজারের ঠাকুরদাদা ও সমগ্র জার্ম্মাণী বিজয়-সম্মানে সম্মানিত হইয়াছিলেন, আবার সে-দিন সেথাকার পাক-চক্রেই জার্ম্মাণীর পরাজয়ের গ্লানি ঘোষিত হইল। ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মাণ-সম্রাট্ দ্বিতীয় উইলিয়ম্ (কাইজার) তাঁর বড় সাধের রাজ্য হইতে একদিন যে প্রজারা তাঁরই ইঙ্গিতে মরণ-পণ করিয়াছিল তাহাদেরই দ্বারা বিতাড়িত, নির্ব্বাসিত হইলেন। বিস্মার্ক ও ভন মলট্কির মত পরাক্রমশালী হিণ্ডেনবার্গ ও লুডেন-ডর্ফের বিজয়দম্ভে প্যারিসাক্রমণ ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে চূর্ণ হইল। বিস্মার্কের মতই হিণ্ডেনবার্গ জার্ম্মাণীর রাজবংশের তিন পুরুষকে সেবার অধিকারী হইয়াছিলেন। ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের বিজয়ীবীর বিস্মার্কের মতই বিগত যুদ্ধে হিণ্ডেনবার্গ পরাক্রম ও রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন—কিন্তু একজনের ভাগ্যে অভ্যুত্থানশীল জাতির বিজয়গৌরব আর

ডাঃ ডলফাস

একজনের সম্মুখে পরাজয়ের নৈরাশ্য। বিসমার্কের সত্তা হিণ্ডেনবার্গের মাঝে নূতন করিয়া জন্ম লইয়াছিল। জার্ম্মাণজাতী তাঁর জাতীয়তার অমর অবদান কোনদিন বিস্মৃত হয় নাই।

১৯২৫ সাল হইতে হিণ্ডেনবার্গ জার্ম্মাণীর প্রেসিডেণ্ট-পদের সম্মান লাভে সমর্থ হইলেও, উদীয়মান উগ্র হিটলারিজমের আব্ছায়ায় ম্লানায়মান রাজতন্ত্রবাদী বৃদ্ধ হিণ্ডেনবার্গের শেষ জীবনাবসান বিস্মার্কের শেষ জীবনের সঙ্গে তুলনীয় হইতে পারে। আজ আবার আধুনিক দুঃস্থ জার্ম্মাণীর নব ত্রাণকর্ত্তারূপে হার হিটলার জাতির পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তিনিই বর্ত্তমানে জার্ম্মাণীর প্রেসিডেণ্ট ও চ্যান্সলার।

উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া মানুষের সভ্যতার অভিযান যে কোন আদিম যুগ হইতে সুরু হইয়াছে, তার আর অবসান হইল না। ইউরোপের রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র-পুরুষের

জীবনোচ্ছ্বাসের অন্তরালে আত্মকাম-চরিতার্থতার যে বিচিত্র ভঙ্গী তাহা জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়া মানবতার ইতিহাসকে ব্যর্থই করিয়াছে, পরন্তু সৃজনকে সার্থক করিতে পারে নাই। বিচিত্র বিশ্ব-সৃজনের একত্ব ও মমত্ব, যে প্রেমভূমির উপর মানুষে-মানুষের মহামিলন প্রতিষ্ঠিত, তাহা আজও অনাবিষ্কৃতই রহিয়া গেল। মানুষের রাষ্ট্র-চেতনা হইতে যতদিন না এই সঙ্কীর্ণ আত্ম-স্বার্থ-সম্পন্ন মনোবৃত্তি মুছিয়া যায়, ততদিন উহা মানবতার অজানাই থাকিবে।

বিদেশে ভারতের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার—

স্বার্থান্ধ মানুষের নিকট সত্যের কোন মর্য্যাদা নাই। ভারতের বিরুদ্ধে বিদেশে যে ধারাবাহিক কুৎসা প্রচার চলিয়াছে, তাহা প্রতিরোধ করিবার মত সামর্থ্য এ পরাধীন জাতির নাই। দুনিয়ার চোখে ভারতকে হেয় ও স্বাধীনতার অনুপযুক্ত প্রতিপন্ন করার জন্য সাম্রাজ্য-বাদীর সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা সম্বন্ধে প্রবাসী সুভাষচন্দ্র ভারতকে সতর্ক
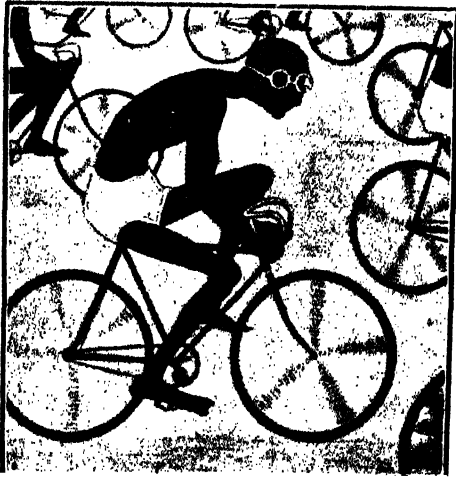
বার্লিন সিম্‌প্লিসিসিমাস্ কাগজে মহাত্মা সম্বন্ধে ব্যঙ্গ-চিত্র

করিয়াছেন। বলশেভিক রাশিয়ার বিরুদ্ধে জগতের বিরুদ্ধ মনোবৃত্তি সৃজন করার কি প্রচেষ্টাই না স্বার্থান্ধীরা করিয়াছিল কিন্তু বর্ত্তমানে সকল মিথ্যার আবরণ বিদীর্ণ করিয়া রাশিয়ার সত্য প্রকাশিত হইয়াছে। হিটলারের জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধেও তেমনি আন্দোলন চলিয়াছে। স্বাধীন জার্ম্মাণ তার প্রতিশোধ দিতে পারিবে। অসহায় ভারতের সে শক্তি কোথায়?

মিস্ মেয়ো আবার ভারতে আসিতেছেন—কি উদ্দেশ্যে বা কার হাতে যন্ত্র হইয়া, কে জানে!

জাপ-ভারত বাণিজ্য-সন্ধির ব্যাপার লইয়া জার্ম্মাণীতে মহাত্মার সত্যাগ্রহান্দোলনের ব্যর্থতা সম্বন্ধে অনেক মিথ্যারই প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। ভারতে বিদেশীবর্জ্জন-

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু
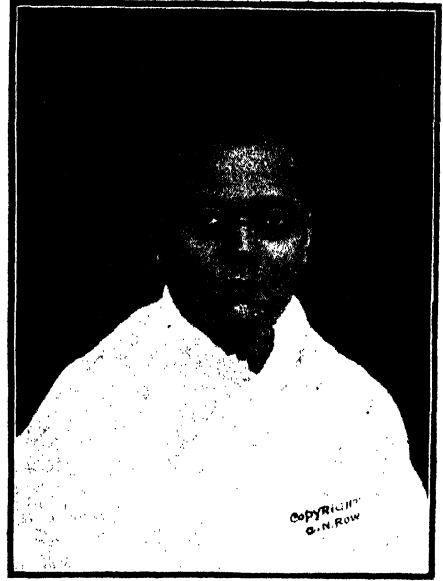
নীতি পরিত্যাগ করিয়া মহাত্মা চরকার পরিবর্ত্তে জাপানী সাইকেল আমদানী করিতেছেন ইত্যাদি মিথ্যাকে অবাধে বিদেশের কাগজে চালাইয়া দেওয়া হইতেছে। বার্লিনের সিম্‌প্লিসিসিমাস্ কাগজে এ সম্বন্ধে মহাত্মার ব্যঙ্গ-চিত্রও প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ইউনাইটেড প্রেসের মারফতে রয়টার-প্রচারিত রিপোর্টের প্রতিবাদ করিয়া যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আধুনিক সভ্যজাতির হীন মনোবৃত্তির নমুনা মিলে। রয়টারের খবরে প্রকাশ যে, বেলগ্রেডে আসিয়া সুভাষ বাবু ভারতের জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে তথাকার সংবাদ-পত্রে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বেলগ্রেডের সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে সে সুযোগ দেয় নাই। ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। সুভাষবাবু জানাইতেছেন যে, বেলগ্রেডস্থিত ব্রিটিশ দূতের বিরোধিতায় পত্রিকাসম্পাদকের ইচ্ছা সত্ত্বেও উহা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। প্রতীচীর সাম্য-মৈত্রীর বাণীতে আজ সারা জগৎ মুখরিত। অন্তরে যার এত গরল সে ফাঁকা আদর্শবাদের মধ্য দিয়া শান্তিতে থাকিতে পারিবে না।—তবু ও ভারতের এদিকে অবহিত হওয়া উচিত।

মত ও পথ

— বাঙলাদেশ ও ম্যালেরিয়া —

বাঙলার লোকসংখ্যা ৫ কোটীর কিছু অধিক; ইহার মধ্যে সবই যে বাঙালী তাহা নহে। বাঙলায় মৃত্যু-সংখ্যার অঙ্ক দেখিলে এখনও আমরা আশ্বস্ত হইতে পারি না। উদরাময় রোগে মৃত্যু-সংখ্যা যেমন বাড়িয়া চলিয়াছে, ফুস্‌ফুস্-যন্ত্রের রোগেও সেইরূপ দেখি। ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই পাঁচ বৎসরে ২৩।২৪ হাজার লোক উদরাময় রোগে মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে। কিন্তু ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে দেখা যায়, ৩৮।৩৯ হাজার লোক এই রোগে মারা গিয়াছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে শ্বাসকাশের রোগে ৩২ হাজার নরনারী মরিয়াছিল এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ৫৬ হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

অন্ত্র ও শ্বাস-যন্ত্রের পীড়ায় লোকের মৃত্যুর আধিক্য দেখিয়া মনে হয়, বাঙালীর জীবনী-শক্তির হ্রাস হইতেছে। শ্বাস-যন্ত্রের পীড়ায় রোগীকে বলকর খাদ্য দিয়া দেখা গিয়াছে, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াও সে বাঁচিয়া থাকে। প্রকৃষ্ট খাদ্য-দ্রব্যাদির অভাব-বশতঃ বাঙলার জীবনী-শক্তি যে হ্রাস পাইতেছে, একথা বলাই বাহুল্য। তারপর, জ্বর-রোগের কথা—এ দেশে এত অধিক লোক এই রোগে মরিয়া থাকে, যাহা অন্য কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। তবে আমরা ১৯২১ খৃঃ হইতে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে এই রোগে মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস হইতেছে দেখিয়া আশান্বিত হইয়াছি। তবু প্রতি বৎসর ৭।৮ লক্ষ লোকের প্রাণহানি ইহাতেই হইয়া থাকে। জ্বর রোগের মধ্যে আমরা ম্যালেরিয়াকেই প্রধান স্থান দিতে পারি। হুগলীর ভূতপূর্ব্ব সিভিল সার্জ্জন ওয়াটার সাহেব বলিয়াছিলেন, বাঙলায় জ্বরের আকৃতি-প্রকৃতি যেরূপই হউক না কেন, উহার মধ্যে ম্যালেরিয়া-বিষ অবধারিত আছে। এইজন্য সর্ব্বপ্রকার জ্বর-চিকিৎসায় তিনি অবাধে কুইনাইন ব্যবহার করিতেন। কথাটা মিথ্যা নহে। ম্যালেরিয়ায় যশোর, খুলনা প্রভৃতি জেলাগুলি লোকশূন্য হইয়া পড়িতেছে। উলার ম্যালেরিয়া বর্দ্ধমানে গিয়া যেদিন লম্ফ দিয়া পড়িল, সেইদিন হইতে বর্দ্ধমান জেলার পল্লীগুলি হইতে শ্রী-স্বাস্থ্য চিরদিনের জন্য বিদায় লইয়াছে।

সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট বর্দ্ধমান জিলার মেমারী নামক স্থানে প্রায় ১০০ শত-খানি গ্রাম লইয়া ম্যালেরিয়া-নিবারণের প্রচেষ্টা করিতেছেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে এই কার্য্য আরম্ভ হওয়ার পর একটা ম্যালেরিয়া-মরসুমকালে যে ফল পরিদৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে আমরা অনায়াসেই আশান্বিত হইতে পারি। ১৯৩৩ খৃঃ গত জুলাই মাসে ১৩টী কেন্দ্র স্থাপন করিয়া, গ্রামবাসী-দিগকে ম্যালেরিয়া হইতে পরিত্রাণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ২০,৪৫০ জন নরনারী চিকিৎসিত হওয়ায় দেখা যায়, ৯ মাসের মধ্যে যেখানে শতকরা ৫০ জন লোক ম্যালেরিয়া-পীড়িত হইয়া পড়িত সেখানে শতকরা ১৬ জন লোকমাত্র পীড়াগ্রস্ত হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, মেমারী থানার অধীন গ্রামগুলিতে ম্যালেরিয়া-নিবারণের যে প্রচেষ্টা হইয়াছে তাহা যদি বর্দ্ধমান জেলার সর্ব্বত্রে চলে, তাহা হইলে আমরা শতকরা ৬৮ জন লোককে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে দেখিব। ২১ হাজার নরনারীর মধ্যে ২০ হাজার ৪ শত ৫০ জনকে ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক ঔষধ সেবন করান কৃতিত্বের পরিচয় বলিতে হইবে। ইহার জন্য এপ্রেল মাস হইতে প্রথম তিন মাস ছায়াচিত্র-সহযোগে লোকেদের ঔষধ-গ্রহণের জন্য মন প্রস্তুত করা হইয়াছিল। কথার সঙ্গে সঙ্গে কাজ আরম্ভ হইলে যে সুফলের সম্ভাবনা থাকে, এই ক্ষেত্রে তাহা ষোলআনা সার্থক হইয়াছে। এই কর্ম্মে ৭,৫০০৲ টাকার ঔষধ খরচ হইয়াছে—৭ জন ডাক্তারকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল, চিকিৎসার ব্যবস্থায় কুইনাইনের সহিত প্লাসমোচিন ব্যবহৃত হইয়াছিল; কেননা, বিচক্ষণেরা বলেন কুইনাইন-প্রয়োগে ম্যালেরিয়া বন্ধ হয় বটে, কিন্তু ইহাতে রক্ত-কণিকায় ম্যালেরিয়ার বীজ

থাকিয়া যায়। মশক-দংশনে সেই বীজ উদ্ধৃত হইয়া পরস্পরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ার সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু প্লাসমোচিন কুইনাইনের সহিত মিশ্রিত হইয়া ব্যবহারের ফলে ম্যালেরিয়া-বীজই বিনষ্ট হইয়া যায়, ইহাতে ম্যালেরিয়া-বিষ-বাহক এনোফিলিস মশকের ধ্বংসের জন্য অনর্থক অর্থ-ব্যয়ের প্রয়োজন হয় না। অনেকের ধারণা, গভর্ণমেণ্টের এই হেতু মশক ধ্বংসের আয়োজন বন্ধ করা সঙ্গত হইবে না। কেননা, মূল উৎপাটন করাই রোগ-বিনাশের চরম বিধান। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের, ইটালীর ও পানামার দুর্নিবার ম্যালেরিয়া মশক-ধ্বংসেই বিনষ্ট হইয়াছে।

সমগ্র বঙ্গদেশে আমরা এই প্রচেষ্টা ফলবতী হইতে দেখিলে সুখী হইব; কেন না, যে জাতির স্বাস্থ্য নাই সে কোন সম্পদের অধিকারী হয় না। শ্রী, সম্পদেরই অগ্রদূত, স্বাস্থ্য তাহার মূল। বাঙলার এই মারাত্মক ব্যাধির নিবারণ-কল্পে স্বায়ত্ত-শাসন-বিভাগের সচিব স্যার বিজয়-প্রসাদের বিবৃতি পাঠ করিয়া আমরা উৎসাহিত হইয়াছি। আমাদের আশা, তিনি সমগ্র বাঙলাদেশে এই চেষ্টা যাহাতে ফলবতী হয় তাহার আয়োজন করিবেন। তিনি এই কার্য্যে উদ্যত হইলে, গভর্ণমেণ্টের সহিত প্রজাপুঞ্জ আত্মরক্ষার জন্য সহযোগিতা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। আমরা স্যার বিজয়কে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তিনি বাঙলার এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিতকর কর্ম্মে সমধিক ভাবে উদ্যত হউন।

— বাঙলার শিক্ষা —

অন্যান্য দেশের তুলনায় জনসংখ্যার অনুপাতে আমাদের দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা অল্প, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। সম্প্রতি ১৯৩২-৩৩ মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত বাঙলাদেশের শিক্ষা-বিভাগের পরিচালক যে বিবৃতি দান করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়—বাঙলাদেশে কলেজের সংখ্যা ৪৯ হইতে ৫১তে দাঁড়াইয়াছে—ইহার মধ্যে ৬টী নারীদের জন্য। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২০ হাজার ৮৬৭ জন। গত বৎসর হইতে এ বৎসরে ব্যয় ২২৩৪৯৲ টাকা কমিয়াছে। ৩৪ লক্ষ ৬৭ হাজার ২শত ৫৪ টাকা কলেজগুলির পরিচালনে ব্যয় হইয়াছে। ৪৫টী কলেজের মধ্যে ১০টী মাত্র গভর্ণমেণ্টের পরিচালনায় চলিয়া থাকে, অবশিষ্ট ৩৫টী কলেজ দেশবাসীর উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং পরিচালিত হইতেছে।

উচ্চ ইংরাজী স্কুলের সংখ্যাও বাড়িয়াছে—১০৭৬ হইতে ১১০৩-এ দাঁড়াইয়াছে। মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা-হ্রাস হওয়ায় বুঝা যায়, ইংরাজী উচ্চ বিদ্যালয়েরই দাবী বাড়িয়া চলিয়াছে। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা-বৃদ্ধির বহর দেখিয়া মনে হয়, আর্থিক আনুকূল্য পাইলে প্রত্যেক মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়টী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইতে পারে। মাধ্যমিক ও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়গুলিকে পরিচালনা করিতে ১ কোটী ২২ লক্ষ ৯৬ হাজার ১৯৩৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে গভর্ণমেণ্টের দান ২০ লক্ষ ৪৬ হাজার ৭৯৬৲ টাকা এবং জনসাধারণ দিয়াছে ১ কোটী ২ লক্ষ ৪৯ হাজার২৯৭৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনায় দেখা যায়, ১ লক্ষ ২৫ হাজার ২৫৯৲ টাকা গত বৎসর হইতে গভর্ণমেণ্ট ব্যয় সঙ্কোচ করিয়াছেন। জনসাধারণ গত বৎসর অপেক্ষা ২ লক্ষ ১৯ হাজার ৬৪৪৲ টাকা অধিক দিয়াছে। ইহা হইতেও বুঝা যায়, দেশে শিক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষা কিরূপ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। গভর্ণমেণ্টের উৎসাহ পাইলে, দেশকে অধিকতর উন্নত করিয়া তোলা প্রজার সামর্থ্যে বাধিবে না।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও যে ইহার জন্য বৃদ্ধি পাইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। অর্থ-সাহায্যও যে পরিমাণে বাড়িলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভাব দূর হয়, তাহা আশা-মত নহে। পূর্ব্ব বৎসর হইতে মোট ২৩,২৬৮৲ টাকা প্রাথমিক বিদ্যালয়-সমূহের পরিচালনে অধিক ব্যয়িত হইয়াছে—ইহাতে দেখা যায়, প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতি গড়ে ১০।৵০ করিয়া প্রতি মাসে খরচ পড়ে। ইহা দুইজন শিক্ষকের ভরণপোষণের পক্ষেও যথেষ্ট নহে। তবুও বাঙলাদেশের সর্ব্বত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রচুর বাড়ান যাইতে পারে, যদি গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ১০৲ টাকা করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন। ইংলণ্ড ও ভারত একই রাষ্ট্র-শাসনের অন্তর্গত। অভেদ দৃষ্টি যদি রাষ্ট্রনীতির আদর্শ-রূপে ইংরাজের থাকে তাহা হইলে ইংলণ্ডের মাথা প্রতি প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় ১০৲।১২৲ টাকার স্থলে ভারতে শিক্ষা-ব্যবস্থার মাথা প্রতি দুই আনার কম হওয়ায়, ইহা বড়ই অসদৃশ বোধ হওয়া অস্বাভাবিক নহে।

শিক্ষার আকাঙ্খা মেয়েদের মধ্যেও কম বাড়ে নাই। ১৮,৫৩৮টী শিক্ষালয় মেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সাড়ে পাঁচ লক্ষের অধিক ছাত্রী এই সকল ক্ষেত্রে অধ্যয়ন করে। অন্যান্য বিদ্যালয়ে যে ক্ষেত্রে ছাত্রের সঙ্গে ছাত্রীগণেরও ব্যবস্থা আছে, তাহাদের সংখ্যা লইয়া ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের শেষে ৬ লক্ষ ২ হাজার ৩৬১ জন ছাত্রী-সংখ্যা নির্ণীত হইয়াছে। উহার মধ্যে ২ লক্ষ ৫৬ হাজার ৮৭ জন হিন্দু এবং ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার ১ শত

৫ জন মুসলমান ; অবশিষ্ট সংখ্যা অন্যান্য জাতির। এই ক্ষেত্রে ইস্‌লাম-সম্প্রদায় নারীশিক্ষায় দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, ইহা লক্ষ্যের বিষয়।

মেয়েদের জন্য ৬টী কলেজ স্থাপিত হইয়াছে ; পূর্ব্ব বৎসরে ৪টী মাত্র ছিল। মোট ছাত্রীসংখ্যা ৫০৮ জন। অন্যান্য কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যে সকল ছাত্রী পড়ে তাহাদের সংখ্যা ৩৪৬ জন। মেয়েদের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৬ হইতে বাড়িয়া ৩৯ হইয়াছে ; ইহার মধ্যে ৫টী পূরাপূরি সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত হয় ; ৩০টী অর্থ-সাহায্যে পাইয়া থাকে, বাকী ৪টী জনসাধারণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। এই ক্ষেত্রে ছাত্রীসংখ্যা ১১,৪৫২ জন মাত্র। প্রাথমিক বিদ্যালয়েই ৫ লক্ষ ৬৩ হাজার ৩৫৮ জন ছাত্রী বিদ্যালাভ করিতেছে। ইহাদের পঠদ্দশা অগ্রসর হইলে দেশে মেয়েদের জন্য উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের দাবী ক্রমেই যে বাড়িয়া যাইবে, এ বিষয়ে সংশয় নাই। উপস্থিত কলেজে ৮ শতের কিছু অধিক নারী অধ্যয়ন করে। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা সাড়ে এগার হাজার। নারী-শিক্ষা সম্বন্ধে ইহা যে আরম্ভ মাত্র, ইহা অনায়াসেই বলা যায়। দেশের পুরুষদের শিক্ষিত করার বিস্তৃত ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে নারী-শিক্ষার সুব্যবস্থা তুল্য হওয়া চাই। শিক্ষা চাই—পুরুষও নারীর সমানেই, তবেই এ জাতির সার্ব্বাঙ্গীন উন্নতির আশা করা যাইতে পারে।

কিন্তু জনসাধারণের উৎসাহ থাকিলেও, শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের কৃপণতার ফলে জনসাধারণ অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাদানে উৎসাহ পায় না। শাসক ও শাসিতের মধ্যে একটা ভেদবুদ্ধি থাকিয়া যাওয়ায় এইরূপ ঘটিতে থাকে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, শিক্ষা-পরিষৎ এমন রীতি-নীতির প্রবর্ত্তন করিতে পারেন, যাহার মধ্য দিয়া বিদ্যালয়-গুলির শৃঙ্খলারক্ষার সহিত শাসক ও শাসিতের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াও ইহার জন্য বিস্তৃত ক্ষেত্র অবাধ করা যায়। এইদিকে আমরা গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
নব-নির্ব্বাচিত ভাইস্‌-চ্যান্সেলার

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নব নিযুক্ত ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নবদীক্ষাদাতা স্বনামধন্য পুরুষ-ব্যাঘ্র স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ইনি সুযোগ্য দ্বিতীয় পুত্র। ইঁহার বয়স মাত্র ৩৩ বৎসর। এত অল্প বয়সে ইতিপূর্ব্বে আর কেহই এই পদে নিযুক্ত হন নাই।

এই উপলক্ষে আমরা তাঁহাকে আমাদের সাদর অভিনন্দন জানাইতেছি।

মাস-পঞ্জী

কৃষি—

শ্রাবণ মাসের অসমাপ্ত বপনকার্য্য এই মাসের প্রথম সপ্তাহেই শেষ করা উচিত। জলদি ফসলের জন্য মূলা, শালগম ও জলদি ফুলকপির বীজ ভাদ্রের প্রথম ভাগেই লাগান কর্ত্তব্য। শাঁকালু, পেঁপে, টেপারী, পেঁয়াজ, আর্টিচোক প্রভৃতিরও বপন চলে। বেগুনের চারা তৈরী থাকিলে উহা তুলিয়া এখন লাগান চলে। শীতকালের প্রথম ভাগেই যদি ফলন পাইতে হয়, তবে পালমশাক, বাঁধাকপি, টমাটো, মটরশুঁটি প্রভৃতি এই মাসেই লাগান উচিত। তামাক, সরগুঁজা ও কৃষ্ণতৈলের বীজ ভাদ্রে লাগাইতে হয়। পিঁপুলের গেঁড় লাগাইবারও ইহাই প্রশস্ত সময়।

চামেলী, জুঁই, মল্লিকা, জবা, গোলাপ, করবী, চাঁপা প্রভৃতি ফুলগাছের ডাল এ সময়ে মাটিতে বসান হইয়া থাকে।

বিভিন্ন জায়গার জলবায়ুর তারতম্যে বপন কার্য্যও কিছু আগে পিছে হইয়া থাকে।

সাময়িকী—

শ্রীযুক্ত অপূর্ব্ব কুমার চন্দ বাঙলার শিক্ষা-বিভাগের অস্থায়ী ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁর এ যোগ্য সম্মানে আমরা তাঁকে অভিনন্দিত করিতেছি।

* * *

জলধর-সম্বর্দ্ধনার দিন পুনরায় পিছাইয়া গিয়া ১৯, ২০, ২১ আগষ্ট তারিখে ধার্য্য হইয়াছে। নিম্নলিখিত কার্য্যক্রম স্থির হইয়াছে :—

(১) প্রথম দিন—স্থান 'সেনেট হল'—বিষয়, অভিনন্দন ও মাঙ্গলিক। সময়—অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা।

(২) দ্বিতীয় দিন - শালিখা নাট্যপীঠ—সাহিত্য-সম্মেলন, প্রবন্ধপাঠ, "মহানিশা" অভিনয়। সময়—বৈকাল ৬ ঘটিকা ও রাত্রি ৯ ঘটিকা।

(৩) তৃতীয় দিন — এলবার্ট হল — প্রীতি-উৎসব, বিদায়াভিনন্দন। সময়—অপরাহ্ণ ৬৷৷০ ঘটিকা।

অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যের চাঁদা ২৲, মহিলা ও ছাত্র পক্ষে ১৲। সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

* * *

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের সভ্যবৃন্দ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্-চ্যান্সেলার স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীকে বিগত ১০ই শ্রাবণ তারিখে এক অভিনন্দন দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। এ শ্রদ্ধাঞ্জলী বীণাপাণির একনিষ্ঠ সেবক, দেশপ্রাণ মনীষী স্যার সর্ব্বাধিকারীর ন্যায্য প্রাপ্য—এই জন্য আমরা আনন্দিত।

* * *

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ

কতিপয় বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের প্রচেষ্টায় কলিকাতায় ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ নামে সম্প্রতি একটি নূতন গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দেশীয় আবহাওয়া, প্রকৃতি স্বাস্থ্য ও সম্পদের অনুকূল করিয়া প্রধানতঃ স্বদেশজাত উপাদানের সাহায্যে সর্ব্বসাধারণের উপযোগী ঔষধ-পথ্য প্রস্তুত করা এবং এই উপলক্ষে দেশের বেকার বৈজ্ঞানিকদিগের প্রতিভা-বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র সৃষ্টি করা।

অজানা-অনিশ্চিত উপাদান-সমান্বিত বৈদেশিক ঔষধাবলীর বন্যার মুখে এই প্রয়াস অভিনন্দনীয়।

উক্ত কোম্পানীর প্রস্তুত প্রতিক্রিয়াহীন, পুষ্টিকর খাদ্য-সমন্বিত "কুইনো-ভিনটন" ইত্যাদি এই ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত দেশের বিশেষ উপযোগী হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই সঙ্গে ঔষধাদির নামগুলিও দেশীয় হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

* * *

বিগত জুলাই মাসে এলবার্ট হলে শ্রীযুক্ত জে, সি, গুপ্তের সভাপতিত্বে সংবাদ-পত্র-সেবী সঙ্ঘের দ্বাদশ বার্ষিক উৎসব হয়। উক্ত সভার যুক্ত সম্পাদক শ্রীযুত কিশোরী-মোহন ব্যানার্জ্জি ১৯৩৩।৩৪ সালের বার্ষিক রিপোর্ট ও হিসাব দাখিল করেন এবং আলোচনার পর বিনাপত্তিতে উহা অনুমোদিত হয়।

সঙ্ঘের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও প্রাণস্বরূপ শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু সভাপতি এবং শ্রীযুত কিশোরীমোহন ব্যানার্জ্জি এবং বিধুভূষণ সেনগুপ্ত আগামী বর্ষের যুক্ত সম্পাদক নিযুক্ত হন। উক্ত সভায় আগামী বর্ষের জন্য সহঃ সভাপতি, সহঃ সম্পাদক, কার্য্যকরী সমিতির সভ্যগণ ও বিবিধ বিভাগের পরিচালকবৃন্দও মনোনীত হন। বিগত বর্ষের হিসাবপত্র আলোচিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

Published by Krishnadhan Chatterjee M. A.—Prabartak Publishing House, 61, Bowbazar St., Calcutta.
Printed by Krishna Prosad Ghosh, at Prakash Press—61, Bowbazar St. Calcutta.

নটরাজ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রকুমার দাস]
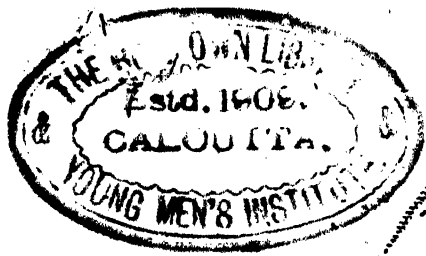
১৯শ বর্ষ, | আশ্বিন, ১৩৪১ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

জীবন-মন্ত্র

বাঙালী নিজের ইতিহাস জানিতে চাহে না। সে প্রবৃত্তিও তাহার নাই।

জগতে অন্যত্র মানুষ যখন পশুবৃত্তির গণ্ডী অতিক্রম করিতে না পারিয়া অরণ্যে পর্ব্বতে বিচরণ করিত, আম মাংসে উদর পূরণ করিয়া পশুবৎ আচরণে নিরত থাকিত, তখন প্রকৃতির লীলানিকেতন, উত্তরে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে সমুন্নত পর্ব্বত-বেষ্টিত আর দক্ষিণে নীলোর্ম্মিমালায় পরিবেষ্টিত, সুরক্ষিত এই দেশে মানব-সভ্যতার আদি-গুরু এক জাতি বাস করিত।

বিধাতার করুণায় জগতের তথাকথিত প্রাগৈতিহাসিক যুগেও এখানে উন্নত সভ্যতা ও আদর্শ জীবনের বিকাশ হইয়াছিল। সে ইতিহাসের আলোচনা এ ক্ষেত্রে করিব না। যে সকল নজীর আবিষ্কার করিতে পারিলে, ভারতের তথা সাগর-চুম্বিত বাঙলার প্রাচীন ইতিহাসে আমরা আস্থা স্থাপন করিতে পারি, সেই বিপুল ইতিহাস অনুশীলন করার সুযোগ এখনও আমাদের আসে নাই। কেবল বাঙালী জাতিকে বিশ্বাস করিতে বলি, আমরা খৃষ্ট পূর্ব্ব দুই দশ শতাব্দীর মানুষ নহি—আমরাই জগতের আদি মানব। আমাদেরই রক্তের ঝরণাধারায় নিখিল জগৎ মানবপূর্ণ। সেই জাতির মহিমা ও গৌরবের পুনরুদ্ধারে আজ উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে।

বাঙালীর অতীত জীবন-কাহিনী মৃত্তিকাগহ্বর হইতে উদ্ধার করিয়া জাতিকে সচেতন করার দুরাশাও আজ আমরা রাখিব না। বর্ত্তমানের জীবনধারার নিদর্শন পুরোভাগে ধরিয়া বলিতে চাহি, কোন্ দেশে এমন গান, এমন ঋক্ উচ্চারিত হইয়াছে, যাহা সমগ্র জগতে তুলনাহীন! এমন শ্যামশোভা, এমন বৈদূর্য্যময়ী প্রভা আকাশের কোলে, বনানীকুঞ্জে, গৃহস্থের প্রাঙ্গণে আর কোথায় ঝিলিক দিয়া উঠে? এমন রবিকরোজ্জ্বল প্রভাত এমন সুধাবিগলিত জ্যোৎস্নাধারায় জগতের কোন্ দে

বিধৌত হয়? এমন কোন্ জাতি আছে, যেখানে মানুষ পরকে আপন কথার জন্য আপনার জন পরিত্যাগ করিয়া ডোর কৌপীন ধরে? মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া খায়? দানের প্রতীক্ষা রাখে না, স্বার্থ-লুব্ধ সংসারীর অর্থ ঈশ্বর-প্রেরণা সার্থক করার পথে পাছে অন্তরায় সৃষ্টি করে, তাই ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইয়া দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষার প্রার্থী হয়? স্বর্গকেই নামাইয়া আনিতে মর্ত্ত্যের বুকে, কোন্ দেশে কোন্ জাতির মধ্যে কাতারে কাতারে এমন সর্ব্বত্যাগী প্রেমিক সন্ন্যাসীর অভ্যুদয় হয়? বাঙালী আত্ম-বিস্মৃত আত্মহারা জাতি—ভাবপ্রবণতায় চিত্ত তার উদ্বেল হইয়া উঠে। প্রেমের আহ্বানে সে রক্ত দিতে অগ্রসর—সে আপনার অস্থি দিয়াই বজ্র নির্ম্মাণ করে অন্যের হিতকামনায়। এমন নিঃস্বার্থ নিরহঙ্কার প্রকৃতি আর কোন জাতির নাই। আত্মসংবিৎ অজাগ্রত বলিয়াই সে যখন শুনে, বাঙালীর হাড়ে ঘুণ ধরিয়াছে, তাহার মেরুদণ্ড ঝুঁকিয়া পড়ে; অন্যে যখন বলে, বাঙালী ভীরু, বাঙালী স্বার্থপর, তার উন্নত শির মাটীর দিকে নত হয়। এমনই নমনীয় তার স্বভাব, এমনই অহং-লেশশূন্য তার হৃদয়।

কিন্তু আজ এই কোমল-প্রকৃতি অকপট বাঙালীর কণ্ঠে রুদ্রের বিষাণ গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে। আজ বাঙালী ধরিয়াছে তার কুসুমপেলব করে বজ্রমুষ্টিতে হলায়ুধ। সে আর চাহিতেছে না পরের কথায়, পরের প্ররোচনায় আপনহারা হইতে; সে আজ নূতন বেদ জগৎকে শুনাইবে। নূতন সৃষ্টি মেদিনী ফাড়িয়াই সে আবিষ্কার করিবে। বাঙালীর আত্মদান আজ রিক্ত ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করিয়া দেবতাকে প্রসন্ন করিয়াছে। ভগবানের পাঞ্চজন্য বাঙালীর হিয়ায় হিয়ায় বিশ্বাসের আগুন জ্বালায়, পথের সঙ্কেত দেয়, সে আজ কারও কথা শুনিবে না; কারও ডাকে সাড়া দিবে না, কারও সঙ্কেতে স্তম্ভিত হইবে না। সে যে শুনিয়াছে আপনাকে দিয়া দিয়া নিঃশেষে সর্ব্বহারা হইয়া, সর্ব্বতোভাবে আপনাকে ফুরাইয়া পুরুষোত্তমের দুয়ারে দাঁড়াইয়া—অপৌরুষেয় বেদধ্বনি! দলে দলে এ জাতি আজ নূতন অভিযানে বাহির হইবে। তারা পাইয়াছে আজ সেবার অধিকার—ভগবানের কিঙ্করী। এ গৌরব তারা গোপন রাখিবে কেমন করিয়া? বাঙালী বিশ্বকে শুনাইবে প্রেম-বিগলিত কণ্ঠে প্রেমের মূর্চ্ছনা, তবেই মীড়ে মীড়ে বাঁধিবে অমৃত-পরশে জীবের হিয়া সুনিবিড় ঐক্যের বন্ধনে; তাই খাঁটি বাঙলার জাতীয় পতাকায় আঁকিয়া উঠিয়াছে প্রেম ও ঐক্যেরই অলৌকিক নিশানা। আজ অব্যর্থ বাঙালীর অভিযান। অবাধ এই গতি; লক্ষ্য অমোঘ সুস্পষ্ট। বাঙালী জাতিকে আর কেহ সম্মোহিত করিতে পারিবে না। তার জয়যাত্রা আর নিষ্ফল হইতে পারে না।

যখন প্রাণ জাগে, তখন জাগ্রত জীবনের সম্মুখে অসংখ্য অন্তরায় হিমালয়ের ন্যায় প্রাচীর তুলিয়া দাঁড়ায়। মানুষের সাধ্যে সে বাধা দূর হয় না; কিন্তু তনুমনোপ্রাণ যার ভগবানের চরণে সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত, সে যে পাইয়াছে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের ন্যায়ই পরম গতি। জগতের জড় বাধায় সে কি আর হইতে পারে বিন্দুমাত্র বিচলিত—সে কি আর স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইতে পারে প্রকৃতির ছলনায়? তার শিরায় শিরায় যে ভগবানের ডাক ঝঙ্কার দেয়, তার হৃদয়ের স্পন্দন স্পন্দনে যে সৃজনের প্রণবঝঙ্কার বাজিয়া উঠে। তার জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্ব নাই, আশ্রয়-নিরাশ্রয় বোধ নাই--ক্লান্তিহীন, দিবারাত্রি এক করিয়া সে ছুটিয়াছে প্রচণ্ডবেগে উল্কার ন্যায় লক্ষ্যপথে—এ যাত্রা তো আর নিবারিত হইতে পারে না। এ যাত্রা নিষ্কাম, ঈশ্বরময় জীবনের মহাগতি। সত্য ও মঙ্গলের ভগীরথ-শঙ্খ-ফুৎকারে গঙ্গোত্রীধারার ন্যায় পাবনমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, উহা ছুটিয়াছে সমগ্র জগতে তার মধুময় ঋক্-মন্ত্রের প্রতিধ্বনি তুলিয়া মানবজাতিকে দীক্ষা দিতে। মুক্তি যে চাই—জ্ঞানে অজ্ঞানে মানব-কণ্ঠে আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে—কঃ পন্থাঃ!

তাহার সদুত্তর দিয়াছে—নান্নুরের চণ্ডীদাস; তাহার সদুত্তর মিলিয়াছে শ্রীগৌরাঙ্গের নূপুরনিক্কণে, হালিসহর ও দক্ষিণেশ্বরের অমিয় ঝঙ্কারে; চিকাগোর মহাসভায় বীরেন্দ্রকেশরীর কণ্ঠে জগৎ পাইয়াছে তাহারই উত্তর। বিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রভাত হইতে এই চত্বারিংশৎ বৎসর বাঙালী দেখাইয়া চলিয়াছে রাষ্ট্রে, শিক্ষায়, সাধনায়, শিল্পে, বাণিজ্যে, সাহিত্যে, দর্শনে, সর্ব্ব বিষয়ে নিগূঢ় সঙ্কেত। বাঙালী আজ উদাত্ত কণ্ঠে শুধুই প্রচার করিবে না জগদ্বাসীর সর্ব্ববিধ সমস্যার সমাধান-মন্ত্র শব্দরাশি

উদ্গিরণ করিয়া—আজ সে জীবন দিয়া বিশ্বকে দেখাইয়া দিবে—শান্তি, আলো, আনন্দের নির্ঝর-কেন্দ্র আছে প্রতি মানবেরই অন্তরে। জীবন-দৃষ্টান্তে সে প্রমাণ করিবে—বিশ্ব নশ্বর নয়, শোক-দুঃখের কারাগার নয়—উহা ভগবানেরই শ্রী-মূর্ত্তি।

বাঙলার উদীয়মান তরুণ-তরুণীকে তাই আজ উদাত্ত কণ্ঠে হাঁকিয়া বলি—ঘোরতর সম্মোহন তোমাদের সম্মুখে, আজ একবার ফিরিয়া দাঁড়াও, কাণ পাতিয়া শোন অন্তর্যামীর আহ্বান! শোন, ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে হৃদয়বীণায় কি মধুময় বাণীর উদ্গান উঠে! তুচ্ছ কর শরীরের সম্ভোগ, তুচ্ছ কর মনের বিলাস, তুচ্ছ কর বুদ্ধির চাতুর্য্য। উদ্যত হও, হে বাঙলার উলঙ্গ সন্ন্যাস, ঈশ্বরপ্রেমে সর্ব্বহারা কাঙ্গালের দল, আজ দৈন্য তোমাদের মহিমা—তপস্যাই তোমাদের পরম ঐশ্বর্য্য। এস—ঐ পথের পাশে ছিন্ন কন্থা পড়িয়া আছে—কটিতটে বেষ্টন করিয়া ভগবানের পথে—তোমাদের চরণ-চাপে বিশ্বের বুকে যে অঙ্কন ফুটিয়া উঠে, উহা প্রফুল্ল কমলশ্রী—এই অঙ্কের আলিপনায় দেশ ও জাতিকে সৌন্দর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে বিমণ্ডিত করিয়া তুলিবে।

আমরা কল্পনার জাল বুনিতেছি না। আমরা স্বপ্নের রঙ লইয়া তুলির আঁচড়ে ইন্দ্রধনু আঁকিতেছি না। প্রত্যক্ষ জীবন-যন্ত্রের আঘাতে আঘাতে যে ধ্বনি, যে কর্ম্ম রূপ লইয়া ফুটে, তাহাই শুনিতে বলি—তাহাই দেখিতে বলি। আজ বাঙলার কয়েক সহস্র নরনারী আপাত সুখের মাধুরীকুঞ্জের মোহ দূর করিয়া, রিক্ত নিঃস্ব হইয়াই নব-জীবনের মন্ত্রে দীক্ষালাভ করুক। ভগবানের মানুষ, ভাগবৎ-রাজ্যের ভিত্তি-পত্তন-যুগেই তোমাদের জয় নির্দ্ধারিত—এ জীবন ইহার জন্যই যদি উৎসর্গ করিতে না পার, পদে পদে ব্যর্থতার আঘাতে দেখিও, তুমি অবসন্ন হইয়া পড়িতেছ। অপথে-বিপথে সম্মোহিত-প্রাণ যতই ধাবিত হইতে দ্রুত তালে পদ-সঞ্চার করুক—ঈশ্বরের আহ্বান উপেক্ষা যে করে, তাহার সাফল্য কোনমতেই সম্ভব নহে। একবার সর্ব্বান্তঃকরণে সমুচ্চ কণ্ঠে হাঁকিয়া বল—আমি ভগবানের মানুষ, আর একটা ঋজু দাঁড়ি টানিয়া দাও তোমার অতীত ও বর্ত্তমান জীবনের সন্ধিক্ষেত্রে। হে ভবিষ্যতের যুগপুরুষ, যুগনারী—নবযুগের ঋত্বিক্ তোমরাই ঋষি ও কর্ম্মী, দ্রষ্টা ও স্রষ্টা; একাধারে এই অপূর্ব্ব জ্ঞান ও শক্তির সংমিশ্রণে হৃদয়ে হৃদয়ে যে অমৃত উথলিয়া উঠিবে, তাহাই তোমাদিগকে দিবে অমৃতময় জীবন। শ্রুতির "অমৃতস্য পুত্রাঃ" এই মন্ত্রের প্রথম বিগ্রহ বাঙলার ভবিষ্য জাতিই।

বাঙলাই আজ আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র। বাঙলাই আজ আমাদের মহাতীর্থ। বাঙালী জাতি—হিন্দু হউক, মুসলমান হউক অস্পৃশ্য হউক সকলেই আমরা আজ তীর্থবাসী। দেবতাকে আমরা যে নামেই আহ্বান করি না—তিনিই পুরুষোত্তম। তাঁর মন্দির-দুয়ার আগুলিয়া মহোৎসবে মাতিয়াছে বাঙালী জাতি—পুরুষোত্তম-তীর্থে কোন্ মূর্খ জাতি-বিচার করিবে? তীর্থ-মহিমা-রক্ষায় যাহার কুণ্ঠা, পুরুষোত্তমের চরণমূলে আত্মোৎসর্গে যার কৃপণতা, এই ধর্ম্মক্ষেত্রে সে ভিন্ন অস্পৃশ্য আর কাহাকেও বলিতে পারিব না, বলার প্রয়োজনও নাই। আর তীর্থমহিমায়—সে নিজেই অনাদৃত ও অপসৃত হইবে। এই হেতু বাঙলার তীর্থে, বাঙলার কুরুক্ষেত্রে জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-বৈষম্যে নবযুগের অভিযান কখনও ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না। এই সকল বৈষম্যে বাঙালীর আশা, বাঙালীর ভাষা, বাঙালীর লক্ষ্য ও সাধনা যেমন ব্যর্থ হইবার নয়, রাজ্যশাসনের কঠোর বিধানও তেমনি প্রচণ্ড ভয়ের কারণ হইতে পারে না—এই মহোৎসবে তাহা সম্ভব নহে। যেখানে হিংসা নাই, স্বার্থ নাই, পরশ্রীকাতরতা নাই, যেখানে আছে হৃদয়ের অনাবিল অবদান প্রেমামৃত, আর ঐক্যের অনির্ব্বচনীয় রসায়ন—সেখানে কোনও অন্তরায়ই এই দিব্য গঠন-যজ্ঞের সিদ্ধিপথে দাঁড়াইবে না।

আজ এই নূতন মানুষের দল দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া অভিযান করিবে। যেখানে সংশয়, যেখানে অবসাদ, যেখানে দৌর্ব্বল্য, যেখানে ব্যথা, অশ্রু, কৃপণতা, সেইখানেই জ্ঞানের ঘৃত-প্রদীপ জ্বালিয়া এক দল নারী-পুরুষকে আগুয়ান হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। আর এক দল মানুষ তাহাদের আত্মপ্রয়োজন কিছু নাই বলিয়া, দেশের সঞ্চয়-প্রবৃত্তির যমুনাধারা শুকাইয়া যায়, সেদিকে উদাসীন থাকিবে না—তাহাদের অফুরন্ত সাহস,

অসীম উৎসাহ, অক্ষত বীর্য্য তিলে তিলে ঢালিয়া দিবে নিরন্ন, নিরুৎসাহ, বিপন্ন তীর্থবাসীর প্রাণে, জ্বালাইয়া তুলিবে তাহাদের শিরায় শিরায় উৎসাহের আগুন, হিয়ায় সঞ্চারিত করিবে আশা ও আনন্দের নির্ঝর। ভগবানেরই মানুষ গিয়া দাঁড়াইবে—কৃষিক্ষেত্রে, শিল্প ও বাণিজ্যের পরিচালনায়। নীলোর্ম্মিমালা বিদীর্ণ করিয়া তাহারা অর্ণবপোত ভাসাইয়া দিবে বাণিজ্য-সম্ভারে পূর্ণ করিয়া দেশদেশান্তরে ভারতের পণ্যপ্রচারে। জীবনের যত দিক্ আছে, জীবনের যত ঐশ্বর্য্য আছে, যত বিভূতি ও বীর্য্য আছে, এই সকল ঈশ্বরকোটীর থাক নরনারী চিরিয়া চিরিয়া, মুগ্ধ, স্তম্ভিত, আত্মবিস্মৃত জাতির কাছে ধরিয়া দেখাইবে—মানবের হিয়ায় যে প্রভু, যে বিভু সতত বিদ্যমান—তিনি ভগবান—তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যের বিগ্রহ, মানুষে তাঁরই অমর স্বভাবের অভিব্যক্তি। পৃথিবীতে বঞ্চিত কেহ নহে; ঘৃণা, উপেক্ষা, লাঞ্ছনা নারায়ণ-বোধের উন্মেষে থাকিতে পারে না। ভারত আজ জগজ্জয়ে বাহির হইবে—বন্দুক, কামান, তরবারী লইয়া নহে—হিংসার গুপ্ত ছুরি বুকের মধ্যে সংগোপিত করিয়া নহে। সে সত্যই আজ নবদ্বীপচন্দ্রের দেওয়া কটিবস্ত্রটুকু লজ্জা-নিবারণের জন্য রাখিয়া, উলঙ্গ বিস্তৃত বক্ষে, প্রতিভাপ্রদীপ্ত ভাল ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া বিশ্বকে জয় করিবে প্রেম ও ঐক্যের মন্ত্রে। আমরা আজ সারি দিয়া শত কণ্ঠে সমুচ্চ রবে হাঁকিয়া বলি, "তোরা কে কে যাবি আয়!"

ঝুলন

প্রাবৃটের ঘনঘটা শেষ হয়ে এল। মেঘমালা উদ্ভিন্ন করে সূর্য্যকিরণ বর্ষণে সরসীর বুকে কমলদল বিকশিত হল। শারদ জননীর আগমন-সঙ্কেত চরণ-নূপুর হংসনাদে শ্রুতিগোচর হয়—নদী, পুলিন, বিস্তীর্ণ নীলাকাশে নয়ন উৎফুল্ল হয়ে উঠে। অলিকুলের গীতধ্বনি, শরৎ-সুন্দরীর সুমধুর সম্ভাষণ, নিখিল প্রকৃতি আজ বর্ষার ঘোমটা খুলে নূতন সাজে বিশ্বকে বরণ করে নেয়। হে মানব, তুমি কেন এখনও তন্দ্রালস, জড়তাচ্ছন্ন, বিষণ্ণ! উদ্বুদ্ধ হও,—দেবী ভগবতীর আগমনে তোমার প্রাণ আনন্দে, উৎসাহে উৎফুল্ল হয়ে উঠুক।

দেখ চঞ্চল কুমুদের চারু কুণ্ডল, রক্তাশোকের পল্লবিত শাখার অঙ্গুলি সঙ্কেত, উৎপলের রক্তবর্ণ সুষমা, বিকশিত জাতি-কুসুম, কদলীস্তম্ভের চারুশোভা, আর মেঘাবরণশূন্য পূর্ণশশীর অপূর্ব্ব শোভা, এমনি দিনে বৃন্দাবনের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে শ্যামরায়ের চিত্তে উল্লাসের প্লাবন উঠেছিল। আর মর্ত্ত্যের এই সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে ঈর্ষ্যান্বিত হয়ে পূত গোধুলীর ঘনাকাশ বিদীর্ণ করে যে গো-রাজীর জ্যোতির্ম্ময় রূপ, তা হরণ করতে এসেছিল দেবরাজ স্বয়ং বৃন্দাবনে, কৃষ্ণচন্দ্র তাতে মলিন হন নি। আপনার মহিমায়, ঐশ্বর্য্যে, যোগে, বিভূতিতে তিনি স্বয়ং দীপ্যমান। দেবরাজ লজ্জিত হয়েই ফিরিয়ে দিতে এসেছিল, শ্যামরায়ের অপহৃত সম্পদ গোধন। স্বতঃস্ফুরিত ভাগবত মাধুরীর অন্ত নাই—দানে, অপহরণে, অপচয়ে ক্ষয় নাই, ধ্বংস নাই—সে যে অমৃতেরই রূপ, অমর ঐশ্বর্য্য।

তাই সব দেবতার করতালি বেজে উঠেছিল রূপের হিন্দোলে, বিশ্ব সেদিন দুলেছিল শ্যাম-বিটপী বল্লরীর বন্ধনে, শূন্যে আকাশের কোলে শ্যাম-শোভায়—বিজলী চমকও সেদিন ম্লান হয়েছিল।

ঝুলনের ধূম ভারতের নদীতীরে, বনে, অরণ্যে, কাননে, গৃহস্থের অঙ্গনে—শ্যামরায়ের হিন্দোলে আজ ভারত মাতোয়ারা। নবশ্রীমণ্ডিত এই উৎসবে কার হৃদয় পুলকিত না হয়?

ঝুলে-ঝুলে, দুলে-দুলে, হিন্দোলে-হিন্দোলে আজ পরশানুভূতির ভেদ নাই, স্বাতন্ত্র্য নাই। এই মিলন-মেলায় কিশোর-কিশোরী, ব্রজের গোপ-গোপী আত্মহারা। এমন দিনেও যদি উৎসবের সাড়ায় তোমাদের কণ্ঠ মুখরিত না হয় তবে হেমন্তের শিশির-শীতের কুয়াসা কাটিয়ে বসন্তের উৎসবে যোগ দেবে কেমন করে? তাই বলি হিন্দোল-যাত্রায় বাহির হও। হে ভারতের নরনারী, আজ ঝুলনের মধুময় পরশে, আনন্দের প্লাবনে চিত্ত পূর্ণ কর। যাত্রা জয়েরই—বর্ষান্তে শরতের প্রখর রবিকরে অবসাদ বিদূরিত কর।

সর্ব্বাপেক্ষা ত্যাগের বস্তু ধর্ম্ম ; কেন না, ইহা বিসর্জ্জন দিতে বড় কেহ পারে না, অসাধারণ মানুষের পক্ষেই ইহা সম্ভব হয়—অত বড় বীর না হ'লে কেহ ধর্ম্ম ত্যাগ করতে পারে না। আমি অসাধারণ, আমি বীর, তাই আমার আকাঙ্ক্ষা—ধর্ম্মই বিসর্জ্জন দিব।

ধর্ম্মত্যাগ অর্থে ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ নয়, অধর্ম্ম আশ্রয় দেওয়া নয়। শরীরের ভোগ ত ত্যাগ করে মানুষ, আত্মস্বার্থ যখন খুব বড় হয়ে উঠে। শরীরের ভোগে ব্যাধি হয়, দেহের কান্তি যায়, শ্রী যায়, দেহ শক্তিহীন হয়; মানুষ তাই ভোগ ত্যাগ করে। আর ভোগের আশ্রয় কি আছে! আমরা তো একেবারেই দেহাত্মবাদী। অতএব যাহা অহিত, অকল্যাণের হেতু, তাহা বুদ্ধিমান্ মাত্রেরই অবশ্য-পরিত্যাজ্য।

কিন্তু ধর্ম্মত্যাগ সহজ নয়; ইহা স্বাস্থ্য দেয়, কীর্ত্তি দেয়, আত্মপ্রসাদ দান করে; ইহা দিব্য দৃষ্টির দ্যোতক। আমি ইহাই পরিত্যাগ করতে চাই। আমার আশ্রয় কিছু নাই, অধর্ম্মও যেমন নহে, ধর্ম্মও নয়; ভাল মন্দ, এই দুইয়ের কোন কিছুই রাখ্‌তে চাহি না—আমি হ'তে চাই একেবারে নিরালম্ব, নিরাশ্রয়।

আমার বন্ধন নাই, আমি মুক্ত। আমি সৎ ও অসতের অতীত। আমি শুধুই আমি, আমার কোন অলঙ্কার নাই, অভিধা নাই। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু যে বিসর্জ্জন দেয়, সেই এই নিঃসঙ্গ জীবনের আস্বাদ পায়—সুনাম নয়, ধন নয়, সুন্দরী রমণী নয়, রাজপ্রাসাদ নয়, মানবের শ্রেষ্ঠতর সকল বৃত্তিই আজ আমার পরিত্যাজ্য।

ধর্ম্মের অপেক্ষা বড় বন্ধন আর কিছু নেই; তাই সর্ব্বধর্ম্ম-বিসর্জ্জনের বাণী গীতায় ভগবান উচ্চারণ করেছেন। যাক্ সব—আমিই আমার আশ্রয়, আমার বলতে যাহা সত্য তাহা ব্যতীত অন্য কোন কাম্য আমার থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। আজ জীবন-রথে পুরুষোত্তমের অধিরোহণ আনন্দের মহামেলা—যাত্রা একেবারে অভিনব হোক। আজ সকলে বল "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যাজ্য"—আর যাহার শরণ নিতে হবে, সে কোন তত্ত্ব নয়, কোন আখ্যায় তাঁকে অভিহিত করা যায় না—সে সত্যই নির্ব্বিকার, অনির্ব্বচনীয়; কিন্তু তবুও সেই বস্তুই আমি, অন্য দ্বন্দ্ব আজ বিসর্জ্জিত হোক।

* * * *

তোমার সাধন শুধু তোমার জন্য নয়। মানবতার মুক্তি-দীক্ষা তুমি গ্রহণ করেছ। সাধনার গুরুভার কতখানি তা' তুমি অনুভব কর না; তার কারণ, এ দীক্ষা আত্মসমর্পণের দীক্ষা। যোগক্ষেম স্বয়ং ভগবান বহন করেন, তুমি কেবল অনন্যচিত্ত হও।

দেশ, জাতীয়তা, আদর্শবাদ সব আজ উৎসর্গীকৃত—ঐসব সিদ্ধি-রূপে ফিরে' আসার যুক্তি ও বিজ্ঞান তোমায় আজ ভুলে' যেতে হবে। এই আশা ও চিন্তা যোগসিদ্ধির অন্তরায়। যোগ সিদ্ধ কর্‌তে হবে, এই হোক তোমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

তোমার সাধ্য—এই অগ্নিময়ী আকাঙ্ক্ষা বুকের মধ্যে স্থাপন করা। তুমি এই অগ্নিহোত্র আরম্ভ করেছ; এইটুকুই সতত স্মরণ রাখ। হোতা, হবনীয়, আহুতি, সবই স্বয়ং ভগবান বিধান করবেন। এইখানেও তোমার অহঙ্কার কত বড় সংযমে ক্ষীণকায় হয়, লক্ষ্য কর। সে সূক্ষ্ম হ'তে যত সূক্ষ্ম হয়, ততই তোমার যোগশক্তি প্রকাশ পাবে। 'অহং' যখন সম্পূর্ণভাবে ইষ্টে গিয়ে লয় পায়, তখনই তোমার যোগসিদ্ধ জন্ম সত্য হয়, তুমি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানসম্পন্ন সিদ্ধ-কোটির মানুষ বলে' পরিচয় দিতে পার।

অন্তশ্চেতনায় তুমিই ব্রহ্ম, ইহাই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের অনুভূতি। বাহিরের চেতনা যখন জাগে, তখন তুমি ক্ষেত্র। আশ্রয় ও আশ্রিত বোধের এই যে দ্বৈতজ্ঞান, ইহাতে ধ্যানযোগের যে অদ্বৈতানুভূতি তাহাতে বাধে না। অন্তর ও বাহির—এই দুইয়ের অনুভূতি-বৈচিত্র্য আছে। যোগ যার বস্তুতন্ত্র, কাল্পনিক নয়, তার নিকট দ্বৈতাদ্বৈত ভেদ নাই—অন্তরে স্বরাট্ ভগবান, বাহিরে তুমি ভক্ত, ঈশ্বর-বস্তুর আশ্রয় মাত্র। এই সামঞ্জস্যানুভূতি আত্মসমর্পণ-যোগীর পক্ষেই সম্ভব। উৎসর্গ-মন্ত্রের সাধনায় ধর্ম্মক্ষেত্রে যে দ্বন্দ্ব তাহা থাকে না, অনন্ত ও সান্ত একাধারে লীলায়ত হয়ে উঠে; তাই যোগ ও ভোগের সামঞ্জস্যপূর্ণ দিব্য জীবন এই ক্ষেত্রেই সম্ভব।

* * * *

স্বর্গসুখেও তার আকাঙ্ক্ষা নাই, আর মরণেও তার ব্যথা নাই—যে পেয়েছে অমৃত। এ সুধা রসনা দিয়ে লেহন করা হয় না, আত্মায় শোষিত হয় আনন্দ-রস, আর ছড়িয়ে পড়ে তৃপ্তির নির্ঝর সর্ব্বাঙ্গে, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে। মানুষ হয় সুধাময়, সবখানি আনন্দঘন জ্ঞানঘন হয়ে উঠে।

তুমি ধ্যানে, উপাসনায়, যজ্ঞে, সমাধিতেও এ দিব্য-জীবনের সন্ধান পাবে না—এই সব উপায়ে বিশেষ বিশেষ অবস্থা মাত্রের প্রাপ্তি ঘটে। ব্যায়ামে মানুষ পায় সুদৃঢ় শরীর, সন্তরণাভ্যাসে মানুষ পায় জলে দীর্ঘকাল পড়ে' থাকার ধৈর্য্য ও স্বাস্থ্য। তুমি যা' কর, তার মত যোগ্য হয়ে উঠ্‌তে পার; কিন্তু দিব্য-জন্ম হয় না, কোন তপস্যায়, কোন অভ্যাসে।

ভগবানে আত্মসমর্পণ একমাত্র ইহার উপায়। সব চাওয়া ছাড়ার মানুষ এই পথে এগোয়। আত্মসর্পণের অধিকারী হয় ভক্তির সাধনায়। যে ভক্তির পরিণতি না দাঁড়ায় আত্মসমর্পণ-যোগে, সে ভক্তি প্রকৃতির ছলনা, দোহন করার স্বার্থ।

কিন্তু ভগবান দোহিত হন না—তিনি পরিপূর্ণ উজ্জ্বল মূর্ত্তি। তাঁর স্বভাবই পূর্ণতার নিদান। দোহনে তিনি তো ক্ষীণ হন না, তাঁর দৈন্য আসে না; তিনি সর্ব্বভূতমহেশ্বর, দেবদেব। দোহন করে যে তার যে ধারণসামর্থ্যও নেই; মরে তাই যোগক্ষেম-বহনের দায়ে অতি নিষ্ঠুর-ভাবে। তাই যারা আজ করে exploit, দুঃখ তাদের জন্যই; বড় কৃপার পাত্র তারা। হে দাবী-হারা উৎসর্গের মানুষ, ভগবানের অভেদ-মূর্ত্তি, ধন্য তোমার ভগবানকে পরিপূর্ণ করে' দেখার প্রেরণায়, আপনার অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়ে উৎসর্গ-যজ্ঞে নিরন্তর আহুতি-দান। দেওয়ার মাত্রা যেদিন পূর্ণ হবে সেই দিনই তোমার "মামেতি" মন্ত্রের সিদ্ধি। এই যোগ ভগবানের দান, যারা বরণ করে' নিল, তারাই চিহ্নিত; কেন না, তাদের যোগক্ষেম স্বয়ং ভগবানের। পৃথিবীর বুকে এমন উলঙ্গ দিব্যোন্মাদ নারী-পুরুষের আবির্ভাব-যুগ তোমাদের সম্মুখে—সর্ব্বহারার দল—মা ভৈঃ, ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ।
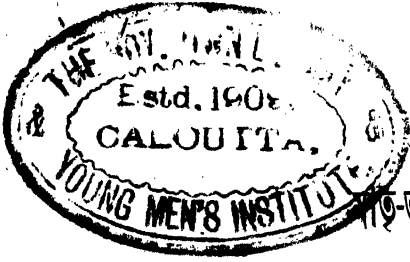
মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজ

অধ্যাপক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম. এ, পি. আর. এস্, ভাগবতরত্ন

যে সমাজ-সংগঠনের সহিত আমরা সকলে পরিচিত তাহাকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নামে অভিহিত করা হয়। পরিবারের মধ্যে পিতার অখণ্ড প্রভুত্ব—স্ত্রী, পুত্রকন্যা, দাসদাসী সকলেই পিতার অধীন এবং তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতে ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ বাধ্য। স্থাবর অস্থাবর সকল বা অধিকাংশ ধন-সম্পত্তির অধিকারী পিতা। তিনি অন্য গোত্র বা বংশ হইতে কন্যানির্ব্বাচন-পূর্ব্বক বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে স্বগৃহে আনিয়াছেন এবং স্ত্রীকে গোত্রান্তরিত করিয়া নিজ উপাধি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এমন বহু সমাজের অস্তিত্ব ছিল এবং আছে, যেখানে স্ত্রী মাতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর অনুগমন করে না—পরন্তু স্বামীই স্ত্রীগৃহে বসবাস করে; পুত্রকন্যা পিতৃনামে পরিচিত ও পিতৃগোত্রের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া মাতৃনামে পরিচিত হয়; বংশধারা পিতৃত্বের উপর নির্ভর না করিয়া মাতৃত্বের উপর করে। এরূপ সমাজকে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ নাম দেওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক সমাজের "তন্ত্র" কথাটার দ্যোতনা এক নহে। পিতৃতান্ত্রিক বলিতে আমরা পিতার প্রভুত্ব এবং সম্পত্তির উপর অখণ্ড অধিকার বুঝিয়া থাকি। মাতৃতান্ত্রিক শব্দের দ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে না যে, পরিবারের মধ্যে মাতাই সর্ব্বেসর্ব্বা—পুরুষেরা সকলে সর্ব্বতো ভাবে তাঁহার অধীন। ঐ শব্দের দ্বারা কেবলমাত্র এই ভাব প্রকাশ করা হয় যে, মাতা স্বামীর পরিবারে না যাইয়া, যে পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই পরিবারেই থাকিয়া যান। পুত্রকন্যাও তাঁহার কুলের পরিচয় দিয়া থাকে, পিতার কুলের নহে। পিতৃতান্ত্রিক শব্দের সহিত মাতৃতান্ত্রিক শব্দের ব্যঞ্জনার এই পার্থক্যের কারণ নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন। মাতৃতান্ত্রিক সমাজের উদ্ভব মানব-সভ্যতার অত্যন্ত আদিম অবস্থায় হইয়াছিল। পশু-শিকার, পশুপালন ও কৃষিকর্ম্মের তখন এরূপ উন্নতি হয় নাই যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির আবির্ভাব হইবে। মানুষ তখনও ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিতে শিখে নাই। অদূর ভবিষ্যতের জন্যও আহার সংস্থান করিয়া রাখিবার ইচ্ছা ও শক্তি তখন পরিস্ফুরণ হয় নাই। জমীতে বীজ রোপন করিয়া ধান্য উৎপাদন করিতে সে শিখিয়াছে বটে, কিন্তু জমীর উপর ব্যক্তিগত অধিকার স্থাপন করিবার মতন আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার সৃষ্টি হয় নাই। এরূপ অবস্থায় কৃত্রিম অর্থনৈতিক অধিকারের উপর নারীর প্রাধান্য স্থাপিত হইতে পারে না। তাহার প্রাধান্য জননীত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই প্রাধান্যের স্বরূপ কি, কিরূপে উহার উৎপত্তি হইল, কি কি অবস্থা-পরিবর্ত্তনের ফলে উক্ত সমাজ-সংগঠন পরিবর্ত্তিত হইল তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

সমাজের ক্রমবিকাশে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের কি পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রথমে উদ্ভব হয়, এ বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। Cunow বলেন যে, পিতৃতান্ত্রিক অবস্থা হইতে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের উদ্ভব হয়। তাঁহার মতে, প্রথমে গোষ্ঠীর মধ্যে পিতৃকুল হইতে সন্তানের পরিচয় নির্ণীত হইত। পরে যখন অসগোত্র বিবাহের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইল, তখন মাতৃকুলে বিবাহ নিষিদ্ধ হইল। কাহার কোন মাতৃকুল তাহা সহজে জানিবার জন্য পুত্রকন্যাকে মাতৃকুলের উপাধি প্রদান করা হইত। এইরূপে মাতৃকুলের দ্বারা বংশপরিচয় স্থির করিবার প্রথার উদ্ভব হয়। Cunow সাহেব অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের গোত্র-নির্ণয়-প্রণালী দেখিয়া উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। উহাদের মধ্যে পরিবারে পিতার প্রাধান্য থাকিলেও, মাতার গোত্র অনুসারে সন্তানের গোত্র-নির্ণয় হয়। অষ্ট্রেলিয়ার অবস্থার পক্ষে তাঁহার সিদ্ধান্ত

প্রযুজ্য হইলেও, সাধারণ ক্ষেত্রে এই মতবাদ স্বীকার করা যায় না। কেন না, অসগোত্র বিবাহ বলিতে কেবলমাত্র মাতৃকুলে বিবাহ নিষেধ বুঝায় না, পিতৃকুলে বিবাহও নিষিদ্ধ হয়।

Lang, Briffault প্রভৃতি অপর একদল সমাজতত্ত্ববিদের মতে মাতৃতন্ত্রই সমাজের আদিম অবস্থায় স্বাভাবিক ছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও অস্ত্রনির্ম্মাণ-কৌশলের ক্রমবিকাশের ফলে মাতৃতন্ত্র পিতৃতন্ত্রে পরিবর্ত্তিত হয়। পৃথিবীর বহুদেশে যে এরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দক্ষিণ ভারতের নায়ারজাতির মধ্যে কিছুকাল পূর্ব্বেও মাতৃতন্ত্রের পূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান্ ছিল ; কিন্তু সম্প্রতি ঐ সমাজের সংগঠন পিতৃতান্ত্রিক হইতেছে। সুদানের বেজা জাতি যে পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে মায়ের গোত্রানুসারে সন্তানের গোত্র নির্ণয় করিত এবং পুরুষেরা ভগিনীপুত্র বা দৌহিত্রকে উত্তরাধিকারী করিত, সে বিষয়ে ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। মেলানেশিয়ার কোন কোন প্রদেশে আজও মাতৃতান্ত্রিক হইতে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সংগঠন হইতেছে। কিন্তু এই মত অধিকাংশ সমাজতত্ত্ববিদ্ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন যে, মাতৃতান্ত্রিক সংগঠন আদিম সমাজে সম্ভব নয়—কেন না, সামাজিক অবস্থার কিছু উন্নতি সংসাধিত না হইলে মায়ের স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইতে পারে না। উত্তর আমেরিকার আদিম জাতিদের মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক ও পিতৃতান্ত্রিক উভয়বিধ সমাজেরই অস্তিত্ব দেখা যায়। কিন্তু ইরোকুওয়, পুইব্লো প্রভৃতি উন্নততর সকল জাতিই মাতৃতান্ত্রিক।

আমাদের মনে হয় যে আদিম মানবসমাজ কোথাও পিতৃতান্ত্রিক, কোথাও বা মাতৃতান্ত্রিক ছিল। যে সময়ে গোষ্ঠী-বিবাহ চলিত, যখন ব্যক্তিগত বিবাহ-প্রথার উদ্ভব হয় নাই, তখন সমাজ বিশেষ কোন সংগঠনের রূপই পায় নাই। তখনকার দিনে সমাজ-বন্ধন সুদৃঢ় হয় নাই। সে সময়ে সমাজ মাতৃতান্ত্রিকও ছিল না, পিতৃতান্ত্রিকও ছিল না। নরনারী তখন গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া বসবাস করিত। গোষ্ঠীর মধ্যেই নরনারী পরস্পরে উপগত হইয়া সন্তানাদি উৎপাদন করিত। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত পরিবার যখন উদ্ভূত হয় নাই, তখন সন্তান পিতার নামে কি মাতার নামে পরিচিত হইবে, এ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। কেন না, সন্তান তখন কেবলমাত্র গোষ্ঠীর পরিচয়ে পরিচিত হইত—নর বা নারীর স্বতন্ত্র পরিবার তখন ছিল না—সুতরাং স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের কথা উঠিতে পারে না। তারপর যখন অসগোত্র-বিবাহ-প্রথার প্রচলন হইল, তখন অর্থনৈতিক অবস্থাভেদে কোথাও বা পিতৃতান্ত্রিক, কোথাও বা মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা হইল এবং ঐ অবস্থার পরিবর্ত্তন-হেতু মাতৃতান্ত্রিক সংগঠন পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পরিবর্ত্তিত হইল। যেখানে পশু-শিকার মানুষের প্রধান উপজীবিকা হইল, সেখানে সমাজ পিতৃতান্ত্রিক হইল—কেন না, শিকারে নারী অপেক্ষা পুরুষের নৈপুণ্য অধিক। শারীরিক মাংসপেশী-সংস্থানের পার্থক্য-হেতু পুরুষ নারী অপেক্ষা বেশী জোরে দৌড়াইতে পারে, বেশী জোরে তীর বা বর্শা নিক্ষেপ করিতে পারে। সুস্থ থাকিলে, বার মাস সমানভাবে সে পশু শিকার করিতে পারে। কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার তিন চারি মাসে আগে ও পরে নারী শিকারে বাহির হইতে পারে না। তখন তাহাকে পুরুষের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়—যদিও সেই পুরুষ তাহার সন্তানের জন্মদাতা নাও হইতে পারে। গো, অশ্ব, মহিষ প্রভৃতি পশুকে বশ মানাইয়া নিজের কাজে লাগানও পুরুষের কর্ম্ম। সেইজন্য পশুপালন যে সমাজের প্রধান উপজীবিকা, সেখানেও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ সংগঠিত হইবার সম্ভাবনা অধিক। কিন্তু যে সমাজে কৃষি ও শিল্পের সূত্রপাত হইয়াছে, সে সমাজে নারীর পক্ষে গৃহে বা গৃহের নিকটে থাকিয়া খাদ্য সংগ্রহ করা কঠিন নহে। কৃষি-প্রধান সমাজে মাতৃতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই স্বাভাবিক।

এ স্থলে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, মানবের সমাজ এক পথে এক সূত্র ধরিয়া সকল জায়গায় ক্রমবিকাশ লাভ করে নাই। কিছুদিন পূর্ব্বেও লোকের মনে ধারণা ছিল যে, সকল জাতির পূর্ব্বপুরুষেরা বুঝি একস্থানে বসবাস করিত এবং লোকসংখ্যাবৃদ্ধি-হেতু বিভিন্ন দেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। কিন্তু নৃতত্ত্ববিদ্গণ এখন আর এ মত গ্রাহ্য করেন না। যদি সকল জাতি এক কালে এক স্থানে থাকিত, তাহা হইলে হয়তো মানব-সমাজের

ক্রমবিকাশের ধারা এক হইত। কিন্তু পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন-ভাবে, দূরে দূরে এক একটা মানব-সমাজ সংগঠিত ও বর্দ্ধিত হওয়ায়, বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংঘাতে ক্রমবিকাশের ধারা বিভিন্ন হইয়াছে। কোথাও সমাজ ধাপে ধাপে পশু-শিকার, পশু-পালন, কৃষিকর্ম্ম ও শিল্প-বাণিজ্য অবলম্বন করিয়াছে, কোথাও (যেমন ইউরোপীয় উপনিবেশ-স্থাপনের পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়ায়) পশুপালন করিতে লোকে অভ্যস্ত হয় নাই, কোথাও কৃষিকর্ম্মের কৌশল শিখিবার সুযোগ বা ক্ষমতা লাভ করে নাই, আবার কোথাও বা কৃষির উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা-হেতু শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিতে মনোনিবেশ করিতে পারে নাই। এইরূপ বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থার বিদ্যমানতা হেতু সমাজ-সংগঠন বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। আমরা উপরে মাতৃতান্ত্রিক ও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-সংগঠনের যে অর্থনৈতিক কারণ নির্দ্দেশ করিলাম তাহা যে সর্ব্বত্র সত্য হইবে, এমন আশা করা যায় না। কেন না, অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলেও কোন প্রথা বা সংস্কার জাতির মনের উপর সহসা প্রভাব হারায় না। আফ্রিকার হিরেরো জাতি পশুপালন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, কিন্তু তাহাদের নারীর অবস্থা কৃষিজীবী বাণ্টু জাতির নারীর চেয়ে হীনতর নহে। কিন্তু এরূপ বিচারের দ্বারা আমাদের মূল সিদ্ধান্ত বিচলিত হইতেছে না। ধরুন, দুইটী কৃষিজীবী জাতির মধ্যে একটি জাতি অবস্থা-বিপর্য্যয়ে কৃষিকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পশুপালনে অভ্যস্ত হইল ও অপর জাতি কৃষিকেই অবলম্বন করিয়া রহিল। এ ক্ষেত্রে পশুপালনকে উপজীবিকাস্বরূপ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে যে পূর্ব্বোক্ত জাতির নারীরা সর্ব্বপ্রকার সুবিধা ও স্বাতন্ত্র্য হারাইবে তাহা নহে। তাহারা পূর্ব্বে যে সুবিধা ভোগ করিত, তাহা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতে বহু যুগ লাগিবে। কারণ, মানুষ যত বেশী অসভ্য হইবে প্রথার দাসত্ব তাহার মধ্যে তত বেশী অধিক!

এক্ষণে বিচার করা যাউক যে, কি কি কারণে মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজ-সংগঠনের উদ্ভব হইতে পারে। সুপ্রসিদ্ধ সুইস সমাজতত্ত্ববিদ্ Bachofen অনুমান করেন যে, আদিম মানবের যৌন যথেচ্ছাচারের প্রতিবাদস্বরূপ নারীরা মাতৃতান্ত্রিক সমাজ স্থাপন করিয়াছিল। তাঁহার মতে অবাধ যৌন-মিলন, গোষ্ঠী-বিবাহ প্রভৃতি প্রথা নারীর নিকটে অত্যন্ত অপ্রীতিকর বোধ হওয়ায়, তাহারা বিদ্রোহ করিয়া পুরুষের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হয়। এই মত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না; কারণ নারীর নীতি-বোধ কখনও সামাজিক আবেষ্টনীর ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে না। যে সমাজে যেরূপ আচার-ব্যবহার প্রচলিত আছে, নারী তাহাই স্বীকার করিয়া লয় এবং তাহারা পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর রক্ষণশীল বলিয়া ঐ রীতিনীতিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করে। নীতি-জ্ঞানবৃদ্ধি-হেতু কোন সমাজ-বিশেষের সকল নারী এককালে সমবেত হইয়া পুরুষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে, ইহা সম্ভব মনে হয় না।

সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ঐতিহাসিক কারণে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-সংগঠনের উদ্ভব হইয়াছিল। মানুষের আদিম অবস্থায় যে অল্পাধিক অবাধ যৌন-মিলন চলিত সে বিষয়ে আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের মনে কোন সন্দেহ নাই। এরূপ সামাজিক অবস্থায় সন্তানের পিতৃনির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ। আবার অনেক অসভ্য জাতি যৌন-সঙ্গমের ফলেই যে পুত্র-কন্যার জন্ম হয়, ইহাও নিশ্চিত-ভাবে জানে না। তবে মাতার দেহ হইতে যে সন্তানের জন্ম হয়, ইহা প্রত্যক্ষ। সেই জন্য অসভ্য সমাজে পিতৃ-পরিচয় অপেক্ষা মাতৃপরিচয় বেশী স্বাভাবিক।

কৃষিকর্ম্মের উদ্ভাবন ও প্রচারের সহিত মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। নর—বিশেষতঃ আদিম অসভ্য নর—স্বভাবতঃ যাযাবর। এক স্থানে সর্ব্বদা থাকা তাহার প্রকৃতিও নয়, থাকিলে উদর-পূরণও হয় না। তাহাকে শিকারের অন্বেষণে দূর দূরান্তরে যাইতে হয়। কিন্তু নারীকে সন্তান-প্রতিপালনের জন্য অন্ততঃ অস্থায়ী ভাবে এক জায়গায় থাকিতে হয়। সভ্যতার যেমন ধীরে ধীরে বিকাশ হইতে লাগিল, নর-নারীর স্বভাবগত এই পার্থক্য তত বেশী সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। অগ্নির ব্যবহার শিখিবার পর গৃহে অগ্নিরক্ষা করা নারীর অন্যতম কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইল। চকমকি বা দেশলাই জাতীয় জিনিষ তখনও মানুষ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। সেই জন্য গৃহের আগুন নিভিয়া গেলে

পরিবারকে অনেক ক্লেশ পাইতে হইত। নারী কুটীরে আগুন জ্বালাইয়া রাখিত। পরে যখন কৃষিকর্ম্মের কৌশল মানুষ শিক্ষা করিল, তখনও নানা কারণে চাষ করিবার ভার পড়িল নারীর উপরে। প্রথম কারণ আদিম সমাজের নর-নারীর মধ্যে শ্রমবিভাগ-প্রণালী। নর শিকার করিয়া মাংস আনিবে, আর নারী উদ্ভিজ্জাতীয় খাদ্য জোগাড় করিবে, এই ছিল ঐ প্রণালীর মূল। নারী গাছ হইতে ফল সংগ্রহ করিত, আহারোপযোগী মূল খুঁড়িয়া বাহির করিত এবং অযত্নপরিবর্দ্ধিত শস্য কুড়াইয়া আনিত। এইরূপে ভূমি ও ভূমিজ বস্তুর সহিত নারী নর অপেক্ষা অধিকতর পরিচিত হইল। এই পরিচয়ের ফলেই সে বীজ বপন করিয়া শস্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হইল। ক্রমে ক্রমে একদিকে যেমন অনবরত শিকার করার ফলে পশুর সংখ্যা হ্রাস পাইতে লাগিল, অন্যদিকে প্রতিবৎর শস্যোৎপাদনের প্রচেষ্টার ফলে কৃষি-কৌশল নারীর আয়ত্ত হইল। মাংস অপেক্ষা শস্য ও দুগ্ধ আহার্য্যের পক্ষে বেশী সুলভ ও উপযোগী বিবেচিত হইতে লাগিল। নারী শস্য উৎপাদন করে বলিয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োজনীয়তা পুরুষ অপেক্ষা অধিক হইল। এজন্য নারীর কুল, গোষ্ঠী বা পরিবার তাহাকে ছাড়িয়া দিতে রাজী হইল না। সে যেখানে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে বা যাহাদের মধ্যে জন্মিয়াছে, সেখানেই ও সেই ব্যক্তিদের কাছেই থাকিয়া গেল। তাহার যৌন সঙ্গী তাহার নিকট বসবাস বা যাতায়াত করিতে লাগিল। এইরূপে স্ত্রীর পরিবারে স্বামীর বাস করিবার প্রথা প্রচলিত হইল। অর্থনৈতিক দিক্ দিয়া নারী পুরুষ অপেক্ষা অধিক দরকারী বলিয়াও বটে, আর নারীর সহিত তাহার সন্তানের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ বলিয়াও বটে, সন্তান নারীর গোত্র এবং পরিচয় গ্রহণ করিল।

কৃষিপ্রধান অসভ্য সমাজে নারীর প্রাধান্যের আর একটী কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। অসভ্য মানব মনে করে যে, উৎপাদিকা শক্তি নারীর একটী বৈশিষ্ট্য। সে যে কেবল সন্তান প্রসব করিতে পারে তাহা নহে, কিন্তু ইচ্ছানুসারে ভূমি ও বনানীর উর্ব্বরতা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। সে যদি জীবনীশক্তি প্রদান না করে, তাহা হইলে শস্য জন্মিতে বা গবাদির সংখ্যাবৃদ্ধি হইতে পারে না। ভূমি হইতে বেশী ফসল পাইবার কৌশল নারীই জানে বলিয়া অনেক অসভ্য মানবের ধারণা।

মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজের সংগঠনপ্রণালী কয়েকটী মাতৃ-তান্ত্রিক জাতির রীতিনীতি পর্য্যালোচনা করিয়া বর্ণনা করা যাউক। P. R. T. Gurdon Journal of the Asiatic Society of Bengal (Vol. LXXIII, Part III)-এর একটী প্রবন্ধে ও "The Khasis" নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, আসামের খাসিয়া জাতি মাতৃ-তান্ত্রিক। বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীর বাড়ীতে যাইয়া বাস করে এবং কয়েকটী সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত সেইখানেই থাকিয়া যায়। স্ত্রীই স্বামীর সম্পত্তির অধিকারিণী, তাহার নিকট হইতে কন্যারা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। সন্তান মাতার নামে পরিচিত হয়। স্বামী কেবলমাত্র সন্তানের জন্মদাতা। খাশিয়াদের প্রতিবেশী গারো ও মেগাম জাতির মধ্যেও স্ত্রীর পরিবারে যাইয়া স্বামীর বাস করার রীতি আছে। মালাবার উপকূলের নায়ারদের মাতৃ-তান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। নায়ার স্ত্রীলোকের সহিত যখন নাম্বুদ্রি বা নাম্বুরি পুরুষের বিবাহ হয় এবং সন্তান উৎপন্ন হয়, তখন পিতা সন্তানকে ছুঁইলে স্পর্শদোষ ঘটে বলিয়া শুনা যায়। এই একটী রীতি হইতেই তাহাদের মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজে পিতার অবস্থা কিরূপ তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের পূর্ণ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইরোকুওয় এবং হুরোণ জাতির নারীরা গৃহের সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্রী, জাতির নায়ক-নির্ব্বাচনে তাহারাই অধিকারী এবং গোষ্ঠী-সভায় তাহাদেরই প্রাধান্য। তাহাদের বংশ-পরিচয় এবং উত্তরাধিকার নারীর দ্বারাই নির্ণীত হয়। পুইব্লো জাতির মধ্যে গৃহ ও সম্পত্তির উপর নারীর অখণ্ড অধিকার। আমেরিকার কোন কোন আদিম জাতি পিতৃতান্ত্রিক। আবার কোথাও বা মাতৃতন্ত্র ও পিতৃতন্ত্রের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। কোয়াকিউটল জাতির পুরুষেরা বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পিতৃগোত্রের অন্তর্ভুক্ত থাকে, বিবাহের পর স্ত্রীর পিতার উপাধি গ্রহণ করে, ঐ উপাধি

পুত্রকে দেয়; কিন্তু পুত্র আবার বিবাহ করিয়া নিজের শ্বশুরের উপাধি ধারণ করে।

ব্রিটিশ গিয়ানাতে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ বর্ত্তমান আছে। মেলেনিশিয়ার বহুস্থানে মায়ের পরিচয়ে সন্তানের পরিচয় নির্ণীত হয়। কিন্তু পিতার বংশানুক্রমানুসারে নায়ক নির্ব্বাচিত হয়। সম্পত্তি কোথাও বা সন্তানে বর্ত্তে, কোথাও বা ভগিনীর সন্তানেরা পায়। মায়ের নামে সন্তানের পরিচয় হইলেও, মা তাহার স্বামীর ঘরে যাইয়া বাস করে।

আফ্রিকার বহু আদিম জাতির মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের অস্তিত্ব দেখা যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার বুশ্যান্ জাতি এখন প্রায় ধ্বংস হইয়া যাইতেছে; কিন্তু তাহাদের বংশধরদের মধ্যে প্রথা আছে যে, পুরুষ অন্যগোত্রের নারীকে বিবাহ করিয়া স্ত্রীর গৃহে বাস করে। শিকার করিয়া সে যে পশু হনন করে তাহা শ্বাশুড়ীকে দেয়। যখন তাহার শিকারে শ্বাশুড়ী খুসী হয় না, তখন তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। সে আবার অন্য এক গ্রামে যাইয়া স্ত্রী নির্ব্বাচন করিয়া বাস করিতে থাকে। লিভিং-ষ্টোন্ জাম্বেসী প্রদেশের বান্যাই জাতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "যখন কোন যুবক বিবাহ করে, তখন সে স্ত্রীর গ্রামে বাস করিতে বাধ্য হয়। তাহাকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ প্রভৃতি কয়েকটী কাজ করিতে হয়। যখন সে শ্বাশুড়ীর সম্মুখে আসে, তখন হাঁটু গাড়িয়া বসিতে হয়; কেন না, তাঁহার দিকে পা রাখা ভয়ানক অসম্মানজনক। যদি সে কখনও দাসতুল্য অবস্থায় বিরক্ত হইয়া নিজের পরিবারে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে, তখন তাহাকে ছেলে মেয়ে ফেলিয়া রাখিয়া একা যাইতে হয়। ছেলেমেয়ের উপর স্ত্রীর অধিকার (Narration of an Expedition to the Zambisi, P, 285)। পূর্ব্ব সাহারার টিব্বু প্রদেশে নারীই অর্থনৈতিক সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করে। Richardson বলেন যে, সেখানে মেয়েরাই সব এবং পুরুষেরা কিছুই নহে। পুরুষেরা আলস্যে শুইয়া বসিয়া দিন কাটায়। তাহাদের স্ত্রীরা জাতি ধ্বংস হইয়া যাইবার ভয়ে তাহাদিগকে খাওয়াইয়া, পরাইয়া, বাঁচাইয়া রাখে। (Travels in the great Sahara Vol II, P 343q). টুয়ারেগ জাতির মধ্যে স্ত্রীরাই লেখাপড়া জানে, পুরুষেরা নিরক্ষর। তাহাদের সাহিত্য ও চারুশিল্পের ধারা বজায় রাখিয়াছে মেয়েরা।

আর্য্যজাতি কোনকালে মাতৃতান্ত্রিক ছিল কি না, ইহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। একদল পণ্ডিত শব্দতত্ত্বের বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মাতৃ-তান্ত্রিক সমাজে প্রচলিত যে সকল শব্দ আর্য্য ভাষায় পাওয়া যায় সেগুলি মাতৃতান্ত্রির অনার্য্য জাতির সহিত সংমিশ্রণের ফলে উদ্ভূত। কিন্তু অন্য পণ্ডিতেরা বলেন যে, গ্রীক্ ও টিউটন্ জাতির পুরাকাহিনী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, তাঁহাদের মধ্যে এক সময়ে মাতৃতান্ত্রিক সংগঠন বর্ত্তমান ছিল। ট্যাসিটাস্ টিউটন জাতির মাতুল ও ভাগিনেয়ের মধ্যে খুব ঘনিষ্ট সম্বন্ধ দেখিতে পাইয়াছিলেন। ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই মাতৃতান্ত্রিক সমাজ আর্য্য-জাতির মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছিল।

মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-সংগঠন কিরূপে পিতৃতান্ত্রিক হইতে পারে, অনুসন্ধান করা যাউক। কৃষিকর্ম্ম প্রথমে নারীর কর্ত্তব্যরূপে বিবেচিত হইত, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যসামগ্রীর প্রাচুর্য্য দেখা যায়। ঐ প্রাচুর্য্যের জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আহার্য্যের স্বচ্ছলতার দরুণ বংশ-বৃদ্ধি হওয়া একটী প্রাকৃতিক নিয়ম। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিলে এমন এক অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়, যে খাদ্যসামগ্রীর তুলনায় লোকসংখ্যা বেশী হইয়া পড়ে। তখন শিল্প ও বাণিজ্যের প্রচলন হয়। কৃষির দ্বারা যাহাদের উদরপূরণ হয় না বা যাহারা অধিকতর উদ্যমশীল, তাহারা শিল্প কর্ম্ম অবলম্বন করে এবং দেশ-বিদেশে যাইয়া মূল্যবান্ দ্রব্যাদি বিক্রয় করে। ইহার ফলে কতকগুলি পুরুষের হাতে ধনসঞ্চয় হয়।

যখন পুরুষ নারী অপেক্ষা অর্থ-নৈতিক সম্পদে ও প্রয়োজনীয়তায় হীন, তখন নারী জন্মস্থান ও নিজ পরিবার ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে রাজী হয় না। তাহার বংশের লোকেরাও তাহাকে ছাড়িয়া দিতে চাহে না। সে সময়ে যদি কোন পুরুষ নারীর যৌন-সঙ্গ কামনা করে, তে তাহাকে শাশুড়ী প্রভৃতিকে সেবা করিতে হয়, তাহাদের

সংসারে কাজ করিয়া নিজেকে তাহাদের উপকারে লাগাইতে হয়। এরূপ অবস্থায় স্ত্রীর পরিবারে যাইয়া তাহাকে বাস করিতে হয়। কিন্তু পুরুষের হাতে যখন ধন সঞ্চিত হয়, তখন সে সেবা না করিয়া নারীর আর্থিক উপযোগিতার মূল্য প্রদান করিয়া তাহাকে স্ব-গৃহে আনিতে পারে। মূল্য পাইলে আর ইহাতে স্ত্রীর পরিবারস্থ নর-নারীর কোন আপত্তি থাকিবার কারণ থাকিতে পারে না। স্ত্রী যদি পুরুষের গৃহে আসে, তাহা হইলে সন্তানগণ পুরুষের নামেই পরিচিত হইবে—কেন না, সেখানে পুরুষই কর্ত্তা।

শিল্প-বাণিজ্যের প্রবর্ত্তন ও প্রসার হেতু যেমন মাতৃ-তান্ত্রিক সংগঠন বিলুপ্ত হইতে পারে, তেমনি অস্ত্র-শস্ত্রের উন্নতির জন্য নারীর স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইতে পারে। অস্ত্র-নির্ম্মাণ পুরুষের কার্য্য ছিল। যখন পাথর তীক্ষ্ণ করিয়া পুরুষ পশু-শিকার করিত, তখন তাহার শক্তির পরিমাণ কম ছিল। কিন্তু যখন ধাতু হইতে অস্ত্রাদির নির্ম্মাণকৌশল সে শিক্ষা করিল, তখন যুদ্ধ করিয়া অপর গোত্র হইতে নারী জয় করিয়া লইয়া আসা তাহার পক্ষে অসম্ভব রহিল না। বিজিত নারীর দল স্বতঃই গোত্রান্তরিত ও হীনতর অবস্থা প্রাপ্ত হইল। তাহারা পুরুষের সম্পত্তি-রূপে পরিগণিত হওয়ায় সন্তানেরা পুরুষের গোত্র-পরিচয় গ্রহণ করিল।

নিউজিল্যাণ্ডের মায়োরী জাতির আচার-ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, অর্থ-নৈতিক কারণেই মাতৃ-তান্ত্রিক সংগঠন পরিবর্ত্তিত হয়। মায়োরীদের মধ্যে সাধারণ লোকে স্ত্রীর গৃহে যাইয়া বাস করে—স্ত্রীর গোত্রভুক্ত হইয়া যায়। সময়ে সময়ে এমন ঘটনাও ঘটে যে, পুরুষের গোষ্ঠীর সহিত স্ত্রীর গোষ্ঠীর যুদ্ধ বাধিয়াছে এবং স্বামীকে স্ত্রীর গোষ্ঠীর পক্ষ লইয়া নিজের গোষ্ঠীর লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। কিন্তু মায়োরীদের নায়কগণ ও ধনি-সম্প্রদায় স্ত্রীর গৃহে বাস না করিয়া স্ত্রীকে নিজের বাড়ীতে লইয়া আসে। কোন সমাজে ধনীজনেরা বিশেষ কোন আচার ব্যবহার অবলম্বন করিলে, কালক্রমে গরীবেরাও সাধ্যে কুলাইলে তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে মাতৃ-তান্ত্রিক সংগঠন পিতৃ-তান্ত্রিক সমাজে পরিণত হয়।

কেন শই

শ্রীশিবশম্ভু সরকার

দীনের প্রণতি দিয়ে তোমারে করিতে অগৌরব
নাই—অভিলাষ শই! হেরি ওই, এনেছে বিভব
থরে থরে ভক্তদল পুঞ্জে পুঞ্জে তব পাদ-মূলে
শ্রদ্ধা-বিগলিত আঁখে। ভরায়ে তারার ফুলে ফুলে
মহাকাশ মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে আছে বদ্ধাঞ্জলি হ'য়ে
ধ্যান-মৌন তপস্থায়! সে পরাণে উঠিছে উজায়ে
কথনো বর্ষার ধারা! কখনো শীতের কুয়াসায়
ম্লানাচ্ছন্ন প্রাণশিখা স্নেহলীন নিস্পন্দে হারায়!

চিত্রার্পিত হ'য়ে আছে উর্দ্ধশিখ উত্তুঙ্গ পর্ব্বত
প্রেমের মদির মোহে! ক্ষণতরে তব জয়রথ
শির পাতি লবে ব'লে অপেক্ষিছে যুগ যুগ ধরি'!
তব প্রেমস্পর্শ-লোভে করে সিন্ধু নিজেরে বিস্মরি'
আপনাতে আপনি মন্থন। লতা, পাতা, পুষ্পাসব
তোমার আনন্দ-হাটে রূপে রসে বিলায় বিভব
সাজায় বিপণি-শ্রেণী! গ্রহে গ্রহে স্তব-জয় গান
ফিরিছে পবনকণ্ঠে উৎপ্লাবিয়া ভাসায়ে বিমান

অশ্রান্ত অভ্রান্ত ঋক্! দিক্-কন্যা স্তব্ধ জোড়করে!
সেথায় আমার নতি! শুধু তব অগৌরব তরে!!

নবনুর

(উপন্যাস)
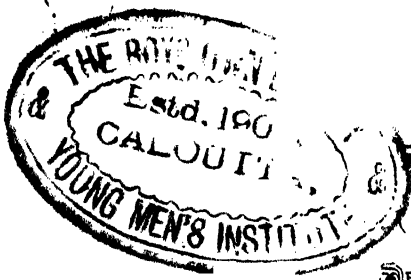
শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

টাউনহলের সেই সভার পর হতে ছয় বন্ধুর হৃদয়ের বন্ধন কেমন একটু ঢিলে হয়ে যেতে লাগল। ভবেশ মনে মনে চিরদিন রীতিমত সনাতনী ছিল। হিন্দুর ও ব্রাহ্মণের অতীত গৌরবের স্বপ্ন দেখেই সে দিন কাটাত, বর্ত্তমান কি ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামাত না। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা রকম গোঁজামিল দিয়ে নিজের মনকে বোকা বুঝিয়েছিল। যেমন করে হোক, হিন্দুযুগ আবার ফিরে আসবে, আবার ব্রাহ্মণের যজ্ঞের ধূমে ভারত-গগন ভরে যাবে, ঋষিকুলের সামগান দিকে দিকে ধ্বনিত হবে! ইতিমধ্যে অরন্ধন, ঘণ্টাকর্ণ, চর্পটী-ষষ্ঠী ইত্যাদি যে সব ব্যাপারগুলো ব্রাহ্মণ আরণ্যক উপনিষদকে কোণ-ঠাসা করে ফেলেছে, তার খবর ভবেশ বড় একটা রাখত না। সত্যি বলতে কি, তার হিঁদুয়ানীটা কতকটা পুঁথিগত, কতকটা মন-গড়া ছিল, বাস্তব জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক অতি কম। সে যে খাওয়া দাওয়াতে বিশেষ বাছবিচার করত না, এটাও তার চোখে কিছু বিসদৃশ ঠেকত না। যখন রণজিতের উৎসাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে সে নবনুরী হল, তখনও তাহার মাথার পেছনে একটা আবছায়া গোছের বিশ্বাস ছিল, যে শেষ পর্য্যন্ত তার হিন্দুত্বের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকবে।

কিন্তু যেদিন রণজিৎ প্রকাশ্য সভায় জাহির করলে, যে বরং সে মুসলমান হয়ে যাবে তবু বর্ণাশ্রম মানবে না, সেদিন ভবেশের মনে একটা বিষম আঘাত লাগল। সে তাহলে ব্রাহ্মণসন্তান হয়ে আহমদ ও রণজিতের পাল্লায় পড়ে স্বধর্ম্মের সর্ব্বনাশ করবে! আমার পণ্ডিত কি বললে? এঁরা সনাতন ধর্ম্মকে গলিয়ে মুসলমানী ছাঁচে ঢালাই করছে। সত্যি তাই করছে না কি? হবেও বা! বড় বড় নেতা সবাই মুসলমান, নয় হরিমোহন ও সত্যের মতন হিন্দু। সত্যের কি! তার ব্রাহ্মধর্ম্ম ত তৈরী হয়েছে হিন্দুয়ানীকে খৃষ্টানী ছাঁচে ঢালাই করে! না হয় আবার গলিয়ে ইসলামী ছাঁচে ঢালবে!

হরিমোহনটা তবু জাতে আছে। বৈষ্ণব হলেও ন্যাড়া-নেড়ীর দলে নাম লেখায় নেই। একবার তার সঙ্গে কথা কইতে হবে।

পরদিন রবিবার ছিল। সকালে উঠেই ভবেশ হরিমোহনের বাড়ী গেল।

তাকে দেখে প্রফেসার জিজ্ঞাসা করলে, "কি হে, কি মনে করে? আজ চার্ণক স্কোয়ারে যাবে না?"

"যাব, ভাই। এখনও সময় আছে। তোমার সঙ্গে একটু কাজের কথা ছিল।"

"কি, বল দেখি।"

"কথাটা বলা কঠিন। হয় ত রণজিতের সাক্ষাতেই উত্থাপন করা উচিত। আচ্ছা, আমাদের নবনুরের কি রকম বুঝছ?"

"কেন, বল দেখি। একটু উৎসাহের মন্দা পড়েছে না?"

"সে কথা বলছি না। উৎসাহ আবার জাগিয়ে তুলতে কতক্ষণ! কিন্তু আমার নিজেরও যেন কেমন কেমন লাগছে। শেষটা, সর্ব্বস্ব মুসলমানের হাতে তুলে দিতে যাব! রণজিৎ ত একেবারে পীর, আহমদ, আলিম-দের খর্পরে পড়েছে। সেদিন সভায় বললে কি না, জাত মানি না, ঠাকুর দেবতাও মানি না! আমি ত অত দূর যেতে প্রস্তুত নই। তুমি কি বল?"

"আমিও নই, ভবেশ! মহাপ্রভু জাত তুলে দিয়ে-ছিলেন বটে, কিন্তু এখন ত আমরা গৃহস্থ বৈষ্ণব সবাই জাতে রয়েছি। কটা লোক আর, ক্রমে পরে বোষ্টম হচ্ছে!

আর ঠাকুর দেবতার কথা বলছ, ঠাকুর দেবতা না মানলে বৈষ্ণব ধর্ম্মের আর রইল কি! তাহলে ত সত্যদের আড্ডায় নাম লেখালেই হয়। আমাদের অমিয় নিমাই হোম আছে জান ত? সেখানে এই কথাই সেদিন সবাই বললে, রণজিৎ রায় কতকগুলো মোছলমানের পাল্লায় পড়ে বড় বাড়াবাড়ি করছে।"

"বাড়াবাড়ি করছে বই কি! খাওয়া-দাওয়া বেশ-ভূষা সম্বন্ধে আমরা ত সবাই একটু ঢিলে দিয়েছি। কিন্তু বর্ণসঙ্করকে আমি বড় ডরাই। এরা শেষ পর্য্যন্ত অজ্ঞাতে বিয়ে-থাও চালাবে!"

"তাতে আমি একেবারে নারাজ, যদি চ ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য মানি না।"

"আর ব্রাহ্মণ! যদি হিন্দুয়ানী যায়, ত ব্রাহ্মণও গেল, বদ্যিও গেল সবাই গেল। একদিন সময় বুঝে রণজিৎকে বলব। এখনও মাথায় একটুখানি টিকি আছে, বাড়ীতে এক একদিন সন্ধ্যা-গায়ত্রীও করি, আমাকেই কিনা মার দিলে সেদিন মহাকাল দল।"

"সেই ভাল। তুমিই রণজিতের সঙ্গে কথা কইও। আমার ভাই সাহসে কুলোবে না। বীফ্, হ্যাম্ পর্য্যন্ত খাচ্ছি, হিন্দুয়ানীর নাম ধরতে লজ্জা করে। সেদিন আমাদের 'হোমে' গোঁসাইজীর কাছে মাছ মাংস খাওয়ার জন্ম এইসা বকুনি খেয়েছি!"

"নটা বাজে। চল হে, চার্ণাক স্কোয়ার যাওয়া যাক্।"

সেখানে পৌঁছে দেখলে আহমদের বাবা এসেছেন। তিনি ও রণজিৎ বাগানে বসে গল্পগুজব করছেন। সামনে চায়ের টেবিল। রণজিৎ দুই বন্ধুর সঙ্গে তৈয়ব আলি শেঠের পরিচয় করে দিলে। সকলে বসলে একটু এ কথা সে কথার পর শেঠজী জিজ্ঞাসা করলেন, "নবযুগ কেমন চলছে আপনাদের?"

ভবেশ উত্তর দিলে, "আর ততটা উৎসাহ নেই। গোঁড়ার দল দাঁত দেখাতে আরম্ভ করেছেন। মারধর, ইটপাটকেল ছোঁড়াও সুরু হয়েছে। টিকলে হয়!"

"টিকতে পারে না ভবেশ বাবু। আমি প্রথম থেকেই আহমদকে ও রণজিৎকে তাই বলে আসছি। একটা খুব উঁচু বৈদান্তিক কি সুফী ভাব ধরতে পারা কি সহজ কথা!"

রণজিৎ একটু বিষণ্ণভাবে বললে, "শেঠজী, সম্প্রদায়-ভেদ থাকুক না কেন? কিন্তু ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ কেন থাকবে?"

তৈয়ব আলি সাহেব উত্তর দিলেন, "রণজিত রাগ কোরো না, কিন্তু তোমার হিন্দু-ধর্ম্মটা কি। হিন্দু বললে কি কোন একটা বিশেষ ধর্ম্মমত বোঝায়? বরং, কে হিন্দু জিজ্ঞাসা করলে উত্তর পাবে, যে জাত মানে, যে মূর্ত্তিপূজা সমর্থন করে, যে গোমাংস খায় না। এটা যদি ঠিক হয়, ত যে গোখাদক, যে জাতিভেদ ও মূর্ত্তিপূজার বিরোধী, তার সঙ্গে হিন্দুর, মনের মিল দূরে থাক, একটা বোঝাপড়াও কি করে হতে পারে?"

রণজিৎ খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। এখন হতাশ-ভাবে বললে, "সাহেব, আপনিও বলেন যে হিন্দু মানে বর্ণাশ্রম ও মূর্ত্তিপূজার সমর্থক! আমি তাহলে হিন্দু নই?"

"বাবা! সে প্রশ্নের উত্তর তোমার হিন্দুরা দেবেন। আমি মুসলমান। আমি কেবল এইটুকু বলব যে তোমার সঙ্গে আমার আশ্চর্য্য—মতের মিল।"

ভবেশ হরিমোহনের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলে। রণজিৎ সেই হাসি দেখে জিজ্ঞাসা করলে, "ভবেশ, তুমি কি বল?"

"রণজিৎ, আমি মূর্ত্তিপূজক। আমি জানি, অনেক উচ্চ অধিকারের হিন্দু সাধক আছেন, যাঁরা নিরাকারের ধ্যান করেন। কিন্তু তাঁরাও মূর্ত্তি পূজার সমর্থক। আর জাত, খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে আমার বিশেষ বাছ-বিচার নেই বটে, কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে আমি জাতিভেদ মানি।"

রণজিৎ মিনিট দুই গালে হাত দিয়ে বসে রইল। তার পর কাতর স্বরে বললে, "তাহলে শেঠজী, আমার নবযুগের কোন অর্থ নেই!"

এই সময় আহমদ এসে উপস্থিত হল। রণজিতের আক্ষেপ শুনে সে উত্তর দিলে, "নবযুগের অর্থ নেই! তাহলে জগতে সত্যেরও কোন অর্থ নেই। বাবা কি বলছেন যে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কোন আশা নেই?"

তৈয়ব তালি হাসলেন, "এমন কথা আমি কি করে বলব, আহমদ? আজ চল্লিশ বৎসর যে সেই মিলন ঘটাবার কাজেই লেগে রয়েছি! তবে সে মিলনের মূলে থাকবে স্বদেশ-প্রেম, ধর্ম্মের একত্ব নয়।"

আহমদ জিজ্ঞাসা করলে, "ধর্ম্মের ঐক্য হলে কি রাষ্ট্র-প্রেম আরও সহজসাধ্য হয়ে যাবে না?"

"সহজ হয়ত হয়ে যাবে, বাবা। কিন্তু যে জিনিস যত দুষ্প্রাপ্য, তার কদর তত বেশী। নানা সম্প্রদায়, নানা ধর্ম্মকে এক রাষ্ট্রীয় সূত্রে গাঁথা যে ঢের বড় কাজ! ভারত যদি এই অতি দুরূহ সাধনায় সিদ্ধ হতে পারে ত সারা জগৎ তাকে গুরু বলে মানবে। এক ধর্ম্ম হলেই ত এক রাষ্ট্র হয় না। ইউরোপ আমেরিকা দেখ, সকলেই ত খৃষ্টান, কিন্তু তাদের পরস্পরের মধ্যে সাপে নেউলে সম্বন্ধ। আরব, ইরাণী, তুর্কী, আফগান, সবাই ত মুসলমান, কিন্তু তাদের মধ্যে ভাব কত, সে ত আমরা ভাল করেই জানি। ধর্ম্মের ভিত্তির উপর রাষ্ট্র-গঠন, এ আর এ যুগে সম্ভব নয়। বর্ত্তমান যুগের সমস্যা হচ্ছে, কি করে জাতে জাতে দেশে দেশে ঝগড়া যুদ্ধ বন্ধ হবে। ভারতে এক অখণ্ড রাষ্ট্র স্থাপিত হলে জগতের এই সমস্যা অনেকটা মিটবে।"

রণজিৎ বললে, "শেঠজী, হিন্দু মুসলমানে একবার প্রেম সম্বন্ধ স্থাপিত হলে কি সেই প্রেম সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়বে না!"

ভবেশ এতক্ষণ চুপ ছিল। এইবার ভাবলে, হিন্দুর বক্তব্যটা এই বেলা জানিয়ে রাখি। বললে, "বন্ধু, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে দেশে দেশে প্রেম খুব বড় জিনিস। কিন্তু এক পক্ষ যদি সর্ব্ব রকমে ঘাট মেনে যায়, ত একটা স্থায়ী প্রেম সম্বন্ধ কিছুতেই আসতে পারে না। আমরা হিন্দুরা মনে করি যে মানব সমাজে আমাদের বর্ণাশ্রমের মতন organisation, সংঘটন, কোথাও নেই, কখনও ছিল না। জগৎ এর থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে। তেমনি আমাদের সনাতন ধর্ম্মের মতন উদার ধর্ম্ম কোথাও নেই। নাই বা রইল এতে dogma! সকল dogmaরই এর ভেতর স্থান আছে। কোথায় কে করতে পেরেছে এমন আশ্চর্য্য ধর্ম্ম-সমন্বয়! এই জাতি-সংঘটন, এই বিরাট্ বিশ্বজনীন সনাতন ধর্ম্ম, এরই উপর একদিন গড়ে তুলতে হবে জগতের ভবিষ্যৎ। এমন সব অমূল্য সম্পদ হেলায় ফেলে দিয়ে আমরা ভারতে রাষ্ট্র গড়তে চাই না।"

আহমদ হাঁ করে ভবেশের দিকে চেয়েছিল। যেন তার কথা ভাল করে বুঝতে পারছে না। হরিমোহনকে জিজ্ঞাসা করলে, "ভাই, তুমি ত বৈষ্ণব, তোমারও এই মত?"

হরিমোহন উত্তর দিলে, "আমি বৈষ্ণব বটে। অতীতকালে শাক্ত শৈবের সঙ্গে আমাদের অনেক ঝগড়া মারামারি হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বও আমি মানি না। তবু আমি হিন্দু ত! বর্ণাশ্রম, মূর্ত্তিপূজা আমার মজ্জাগত। আমি সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়ে বিধর্ম্মীর সঙ্গে সন্ধি করতে গররাজী।"

রণজিৎ মাথা হেট করে বসে ছিল। শেঠজী সস্নেহে তার পিঠে হাত রেখে তাকে নির্ব্বাক্ সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। আহমদ কাছে এসে বললে, "ভাই, সত্য ও আলিমকে জিজ্ঞাসা করা বাকী রইল। কিন্তু আমার মনে হয়, নবযুগের অন্তিমকাল আগত প্রায়। রোশনারা বড় হাসবে। বলবে, দাদা তোমাদের সোনার স্বপন ভাঙ্গল!"

রণজিৎ কাতরভাবে মাথা নাড়লে, মুখে কিছু বললে না। শেঠজী বললেন, "বৎস, অধীর হলে চলবে না। এত সহজে সাহস হারিও না। হিন্দুস্থানের সমস্যা যে বড় জটিল!

পরদিন সকালবেলা রণজিৎ তার পশ্চিমের ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে দাড়ী কামাচ্ছে, এমন সময় তার নজর পড়ল পাশের বাড়ীর দিকে। দেখলে যে, সে বাড়ীর জানালায় একটা বছর কুড়িকের মেয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তার পানে তাকিয়ে রয়েছে। সে চেয়ে দেখতেই মেয়েটী ঈষৎ হেসে তার দিকে দু হাত বাড়িয়ে দিলে। দিব্যি সুন্দর মুখ, চাঁপা ফুলের মতন রঙ, চওড়া লাল পেড়ে গরদের সাড়ী পরা, এলো চুল, বোধ হল যেন স্নান করে উঠন্ত রৌদ্রে দাঁড়িয়েছে চুল শুকোতে। রণজিৎ তখন নবযুগের স্বপ্নে বিভোর ছিল। হঠাৎ তার চিন্তার

ধারাতে এই বাধা পড়ায় সে যেন একটু বিরক্ত হয়ে জানালা থেকে সরে গেল। কিন্তু তার মনটা কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছে। স্বপ্ন আর জমল না। তাড়াতাড়ি বেশ প্রসাধন সেরে বাগানে নেমে গেল।

দেখে, সামনেই দাঁড়িয়ে নরেন। জিজ্ঞাসা করলে, "কি হে নরেন ভায়া, কেমন আছ? অনেকদিন এদিকে আস নেই।"

পড়াশুনো নিয়ে বড় ব্যস্ত ছিলাম, দাদা। কদিন আর বেরোতে পারি নেই। আজ আমার পরীক্ষা আরম্ভ। একবার পায়ের ধূলো নিয়ে যাব। তাই এসেছি।" বলে নরেন রণজিৎকে ভক্তিভরে প্রণাম করলে।

"তোমার দিদির খবর কি? কেমন আছেন, কবে কলকাতায় আসবেন?"

"আজ তাঁর চিঠি পেয়েছি। বেশ ভালই আছেন। কিন্তু কলকাতায় আসার ত কোন কথা নেই। আপনাকে কিছু লিখেছেন না কি?"

"না আমাকে কিছু লেখেন নেই। কিন্তু এলে বড় ভাল হত। নবন্নুর সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ করবার আছে।"

"দাদা, আমাকে দিদি অনুমতি দিয়েছেন। পরীক্ষা হয়ে গেলেই আমি আপনার সঙ্গে নবন্নুরের কাজ করব।"

"নবন্নুরের বড় দুর্দ্দিন আসছে, নরেন। আমাদের অনেক বন্ধু আমাদিগকে ত্যাগ করে যাচ্ছেন। এ সময় তোমাকে পেলে আমার অনেক উপকার হয়, ভাই! কিন্তু আর না ভেবে চিন্তে কাউকে নিচ্ছি না। তুমি সমস্ত ব্যাপারটা বেশ করে বুঝে তার পর সঙ্ঘে নাম লিখিও।"

"আমার বোঝা ত খুব সোজা কথা, দাদা। আপনি যা হুকুম দেবেন, আমি তাই করব। তাহলে কোন গোলযোগই হবে না। আপনাকে বুঝি এই সবের জন্য একটু চিন্তিত, আনমনা দেখাচ্ছে?"

"তা হবে, নরেন। ভালয় ভালয় পরীক্ষা পাস হও। একটা কথা ভাই, এ বাড়ীর পশ্চিম দিকে কারা থাকে জান? তুমি ত পশ্চিমের ঘরটাতেই শুতে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি জানি। ভদ্রলোকের নাম রঘুনাথ মিত্র। পাটের দালালী করেন। অগাধ রোজগার। কিন্তু লোকে বলে, চরিত্র ভাল নয়। সব দিন রাত্রে বাড়ী ফেরেন না। কোন কোনদিন মাঝ-রাত্রে ফিরে ভয়ানক শোরগোল করেন। বোধহয় স্ত্রীকে মারধরও করেন। স্ত্রীলোকের কান্নাকাটির শব্দে এক একদিন আমার ঘুম ভেঙ্গে যেত।"

"বাড়ীতে আর কে থাকে, জান?"

"আর কেউ থাকে না। শুধু স্বামী-স্ত্রী। মা গত বছর মারা গেছেন। রাত্রে গোলমালে আপনার ঘুমের ব্যাঘাত হয়েছিল বুঝি!"

"না নরেন, আমি কিছু শুনতে পাই নেই। আমি পূর্ব্বদিকের ঘরটায় শুই, তুমি জান। আচ্ছা, তুমি এখন এস, ভাই। রোজ রোজ খবরটা পাই যেন কেমন পরীক্ষা দিচ্ছ। আমি অরি সিংকে সন্ধ্যাবেলা পাঠিয়ে দেব।"

সারা সকালটা রণজিৎ বাগানে মাটি কোপালে, গোলাপ গাছের ডাল ছাঁটলে, ফুল তুললে, ছোট ছোট চারা-গাছগুলোতে নিজে হাতে জল দিলে। অনেকটা বেলা হল আজ স্নানাহার করতে। দুপুর বেলায় নিত্য-প্রথামত আপিস কামরায় গিয়ে বসল। বসে ভাবতে লাগল নবন্নুরের ভবিষ্যৎ। নবন্নুর, হিন্দুসভা, হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুসমাজ, একে একে এই সব মাথায় ঘুরতে লাগল। হঠাৎ মনে হল পাসের বাড়ীর কথা। কি বীভৎস ব্যাপার! মাতাল স্বামীর হাতে মেয়েটা কত না নিগ্রহ সহ্য করছে! অথচ এর কোন প্রতীকার নেই। হিন্দু-ধর্ম্ম-ধ্বজীরা ত লম্বা লম্বা স্পীচ্‌ ঝাড়ছেন বই কিছু করতে পারছেন না। আজ ভবেশ আসুক্‌ না, খুব শুনিয়ে দেব। শুনিয়েই বা কি হবে? লেখাপড়া জানা ভদ্রলোক সব, ওরা কি সত্যি বোঝে না ন্যায় অন্যায়! সাধ করে কাণা হয়ে রয়েছে, দেখেও দেখবে না। নইলে সনাতন ধর্ম্ম, সনাতন ধর্ম্ম চীৎকার হয় না যে!

এমন সময় শামসুদ্দিন এক চিঠি নিয়ে এসে বললে, "হুজুর, একজন কুলী এই চিঠি দিয়ে গেল।"

পত্রখানা খুলে রণজিৎ পড়লে :—

"শ্রীযুত রণজিৎ রায় মহাশয় সমীপেষু।

আজ এতদিন পরে আমার পানে তা হলে চেয়ে দেখলেন! গেল ছয় মাস আমি প্রতিদিন সকাল বেলায়

দাঁড়িয়ে থাকি ঐ জানালায় আপনাকে দেখবার আশায়। কোনদিন দর্শন পাই, কোনদিন পাই না। আপনার সম্বন্ধে সব খবরই নিয়েছি। শুনেছি যে দীন দরিদ্র দুঃখী আতুর, কেউ আপনার কাছ থেকে খালি হাতে ফেরে না। জেনেছি যে দেশের দুর্দ্দশা মোচন করার গুরুভার আপনি মাথায় তুলে নিয়েছেন। এইসব জেনে শুনে আমি সাহায্যপ্রার্থী হয়ে আপনার দ্বারে এসেছি। আমার দুঃখের কথা শুনবেন কি ?

আমার নাম সরযূবালা মিত্র। আমার আপনার বলতে কেউ নেই। বাপ নেই, মা নেই, ভাই নেই, সন্তান নেই। স্বামী আছেন। কিন্তু তাঁকে আপনার লোক মনে করা কঠিন। পাঁচ বৎসর আগে আমার রূপের জন্য আমাকে ঘরে এনেছিলেন। টাকা দিয়ে কিনেছিলেনও বলা যায়। আমার দরিদ্রা মা পাঁচ হাজার টাকার লোভ সংবরণ করতে পারেন নেই।

আমার স্বামীর বয়স পঞ্চান্ন বৎসর। তাঁর কথা আপনাকে কি আর বলব ? আমাদের সংসারে অর্থের অভাব নেই। তবে এক অর্থ ছাড়া আর সকল জিনিষেরই একান্ত অভাব। স্নেহ, মমতা, ভক্তি, ভালবাসা এসব যে জগতে আছে, তা একরকম ভুলেই গেছি। স্বামীর অনাদর হেনস্তা, এমন কি অত্যাচার পর্য্যন্ত, নীরবে সহ্য করা হিন্দু-স্ত্রীর কর্ত্তব্য, এ কথা মায়ের কাছে, শাশুড়ীর কাছে, অনেক শুনেছি। কেতাবেও অনেক পড়েছি। কিন্তু সহ্যের একটা সীমা আছে ত! সে সীমা অনেক দিন পার হয়েছি। সমস্ত দেহও ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে।

নিতান্ত অসহায়া আমি। আশ্রয় দেন, চিরদিন চরণপূজা করে জীবন সার্থক করব। আপনার আদেশ জানাবেন। আফিঙ্গ আনিয়ে রেখেছি। তবে একবার আপনাকে না জানিয়ে খাব না স্থির করেছি। ইতি

শ্রীচরণাশ্রিতা সরযূবালা।"

একবার, দু বার, তিন বার চিঠিখানা পড়ে, রণজিৎ চোখ বুজে আরাম কেদারায় শুয়ে পড়ল। মেয়েটীকে দেখেই তার মনটা একটু বিচলিত হয়েছিল বই কি! সকাল বেলার গোলাপী রৌদ্রে দাঁড়িয়ে সরযূ যখন দু' হাত বাড়িয়ে একটু হেসে তার দিকে তাকিয়েছিল, তখন চকিতের মত তার মুখে এসেছিল, "কি সুন্দর! কি সুন্দর! কে তুমি গো?" সুন্দর মেয়ে ত রণজিৎ আগে অনেক দেখেছে, কিন্তু এ কি রকম সর্ব্বনেশে ঘর-পোড়ানি রূপ! না, না, না, তার সম্মুখে কত কাজ! সুন্দরীর রূপ ধ্যান করার সময় তার কই! সৌন্দর্য্য-চর্চ্চা আর নবযুগ এক সঙ্গে চলে না। তাই ত সে চট্ করে পলায়ন দিয়েছিল জানালা থেকে।

কিন্তু এখন ঘুরে ঘুরে চোখের সামনে আসছে সেই মুখ। ফের জোর করে ভাবতে লাগল দেশের কথা, নবযুগের কথা। সমাজ, হিন্দু সমাজ! এই দেখ না তার দুর্দ্দশা! পাষণ্ড মাতাল স্বামী অসহায়া বালিকাকে হয়ত মারে, রোজ মারে। হয়ত কেন, লিখেছেই ত, সমস্ত দেহ ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে। এর কি কোন প্রতিবিধান নেই ? আছে বই কি! আমি যদি নিয়ে এসে কাছে রাখি ? কি করতে পারে ওর হতভাগা স্বামী, দেখা যাবে।

আচ্ছা, কে কোথাকার ঠিক নেই, আমার কেন এত মাথাব্যথা ? কেন মাথাব্যথা! দুর্ব্বলকে রক্ষা করা যে সবলের ধর্ম্ম! এও যে নবযুগেরই কাজ! ভাল, এরা সব আসুক, একবার পরামর্শ করতে হবে।

আচ্ছা, যদি সরযূ প্রৌঢ়া হত, কুৎসিৎ হত, তাহলেও তাকে বাড়ীতে এনে রেখে তার স্বামীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করতাম ? অবশ্য করতাম।

ঘরে বসে বসে আর ভাল লাগল না। সেই রোদে মোটর নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। খানিকটা ঘুরে ফিরে গেল মুরগীহাটায় আহমদের আপিসে। তাকে বললে "ভাই, ডেস্ক বন্ধ করে আমার সঙ্গে চলে এস, ঝাঁ করে। আমি বড় ফাঁপরে পড়েছি। 'আমাকে উদ্ধার কর।"

"কি হয়েছে, রণজিৎ ? দেশে সব ভাল ত ? মহারাজ, মহারাণী সাহেবা, ভাল আছেন ?"

হ্যাঁ, তাঁরা সবাই ভাল আছেন। আজ চিঠি এসেছে। কিন্তু তুমি এক্ষণই এস চার্ণক স্কোয়ারে। সেখানে বলব, কি হয়েছে।"

না, চল ভাই।" বলে ডেস্ক বন্ধ করে, কেরাণীকে কাজ সম্বন্ধে তাগীদ দিয়ে আহমদ বেরিয়ে পড়ল বন্ধুর সঙ্গে।

চার্ণক স্কোয়ারে উপরের কামরায় দুজনে বসলে পর, রণজিৎ পকেট থেকে সরযূর চিঠি বার করে বললে, "ইংরাজী করে পড়ছি। মন দিয়ে শোন আহমদ। তার পর বল আমার কি করা উচিত।"

সমস্ত চিঠিখানা শুনে আহমদ জিজ্ঞাসা করলে, "কে ইনি?"

"এঁরা থাকেন আমার পাশের বাড়ীতে। সকাল-বেলায় জানালায় দাঁড়িয়ে কামাতে কামাতে আমার নজর পড়ল হঠাৎ মেয়েটীর দিকে।"

"কত বয়স হবে?"

"বছর কুড়িক।"

"খুব-সুরত?"

"হ্যাঁ ভাই, অসাধারণ সুন্দরী।"

"নিবেদিতার চেয়ে? রোশনারার চেয়ে?"

"না, না, ছি, ছি, কি যে বল আহমদ! ওদের সঙ্গে তুলনা কোরো না। এ আর এক রকমের রূপ।"

আহমদ বন্ধুর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কি করবে মনে করেছ?"

"আমার ইচ্ছা এখানে নিয়ে আসি।"

"তার পর?"

"তার পর এইখানেই থাকবেন।"

"এই বাড়ীতে? তোমার কাছে? তাহলে কিন্তু নবযুগের সর্ব্বনাশ হবে রণজিৎ।"

"সর্ব্বনাশ হবে! কেন? আমার বাড়ীতে কে থাকে, না থাকে, তাতে নবযুগের কি? এও কি আমাদের কাজ নয়, আহমদ? শক্তি থাকতে দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার হতে দেব! হাত গুটিয়ে বসে তাই দেখব!"

"রণজিৎ, তুমি নিজেই একটু বিবেচনা করে দেখো। বুঝতে চেষ্টা কোরো কেন তুমি এ কাজ করতে যাচ্ছ। এই অভিসারিকা যদি এমন সুন্দরী না হত, তাহলে কি তুমি—"

"অভিসারিকা! সরযূকে তুমি অভিসারিকা ভেবেছ আহমদ?"

"না ভাই, আমি কিছুই ভাবি নেই। তুমি নিজেই তোমার মনের অবস্থাটা একটু খুঁটিয়ে দেখো। তারপর আবার এ বিষয়ে কথা কওয়া যাবে।" একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে, "কিন্তু রণজিৎ, বন্ধু, এ কাজ তুমি করলে আমি রোশনারার কাছে, বাবার কাছে, কি করে মুখ দেখাব! আমার দোস্ত রণজিৎ রায় দেশ ভুলে, নবযুগ ভুলে, কি না—না বন্ধু, এ আমি এ সহ্য করতে পারব না।"

রণজিৎ কোন উত্তর দিলে না। টেবিলের উপর কতকগুলো বিলেতী ছবিওয়ালা সাপ্তাহিক, মাসিক, পত্রিকা ছিল। দুজনে নীরবে সেইগুলোর পাতা উলটোতে লাগল। একেলে লেখাপড়া জানা মানুষ, মেজাজ সামলে নিতে এদের বেশীক্ষণ লাগে না। খানিক বাদে দুজনে চা খেয়ে নীচে বাগানে গিয়ে বসল, নানা রকম খুচরো কথাবার্ত্তা কয়ে বেলাটা কাটিয়ে দিলে।

সন্ধ্যার আগেই ভবেশ এল। আহমদকে দেখে জিজ্ঞাসা করলে, "কি হে সওদাগর! আজ এত শীগগীর দোকান-পাট বন্ধ করে পালিয়ে এসেছ যে!"

"তিনটের সময় পালিয়ে এসেছি। রোজ কি আর আপিস ভাল লাগে!"

"সুখী তোমরা। আমাদের ত আর ও কথা বলবার জো নেই। আপিস না গেলেই হাঁড়ী চড়া বন্ধ। তা কি হচ্ছিল দুজনে সারা বিকেলটা? নবযুগের কিছু নূতন কাজ ফাঁদবার মতলব আঁটছিলে বুঝি!"

রণজিৎ একবার আহমদের মুখের দিকে চেয়ে উত্তর দিলে, "নূতন কাজ বটে, কিন্তু নবযুগের কি না, বলতে পারি না। আহমদকে জিজ্ঞাসা কর।"

আহমদ মুখ ভারী করে বললে, "আমি কিছু জানি না, ভবেশ!"

ভবেশ বললে, "হেঁয়ালী ছাড় না! কি বুদ্ধি আঁটছিলে, সত্যি?"

রণজিৎ পকেট থেকে সরযুর চিঠিখানা বার করে ভবেশের হাতে দিয়ে বললে, "পড়ে দেখ।"

ভবেশ আদ্যোপান্ত পড়লে। তারপর চোখ দুটো বড় বড় করে রণজিতের মুখের দিকে একটুক্ষণ চেয়ে রইল। রণজিৎ জিজ্ঞাসা করলে, "পড়লে, ভাই?" ভবেশ চেঁচিয়েই উত্তর দিলে, "হ্যাঁ, পড়লাম। কিন্তু কে এই পাজী স্ত্রীলোক? তোমাকে এ রকম নির্লজ্জ চিঠি লেখে কেন?"

আহমদও যা ভেবেছিল, ভবেশও তাই ভাবলে। তবে দুজনের কথা কওয়ার ধরণ আলাদা। রণজিৎ লাফিয়ে উঠল, "তোমার কোন অধিকার নেই, ভবেশ, একজন ভদ্রলোকের মেয়ের সম্বন্ধে এ ভাবে কথা কওয়ার।"

"ভদ্রলোকের মেয়ে কি না, জানি না। তবে পতিব্রতা নারী যে নয়, এটা বলতে পারি।"

"ভবেশচন্দ্র, তোমাদের সনাতনী শাস্ত্রে কি লিখেছে যে ঘরের পরিবারকে বাঁদীর মতন দেখবে, বেত মারবে?"

"শাস্ত্রের কথা জানি না, ভাই। কিন্তু এ রকম পরিবারকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে রাস্তায় বার করে দেওয়াই লোকাচার। নবযুরের কি অন্য মত?"

রণজিৎ একটু গরম হয়ে উঠল। বললে, "জাহান্নমে যাক্ সনাতনী, জাহান্নমে যাক্ নবযুর। আমি এই অসহায়া নিগৃহীতা মেয়েটীকে আমার ঘরে এনে রাখব, স্থির করেছি।"

"এ উপদেশ কি আহমদ সাহেব দিলেন! কি ভাবে ঘরে এনে রাখবে? নিকে করবে নাকি?

আহমদ ভবেশের কাঁধে হাত রেখে, ধীরে ধীরে বললে, "ও রকম রাগে অধীর হয়ে লাভ কি, ভবেশ? চীৎকার করলে কোন কাজ হবে না। বরং মাথা ঠাণ্ডা করে রণজিৎকে বোঝাও যে এই স্ত্রীলোকটীকে বাড়ীতে এনে রাখলে ওর অত্যন্ত বদনাম হবে, আর নবযুর সত্যিই জাহান্নমে যাবে।"

শান্তভাবে কথা কওয়া ত ভবেশের কোষ্ঠীতে লেখে না। সে আগের মতন চেঁচিয়েই বললে, "এ হতে পারে না, রণজিৎ। এ স্ত্রীলোকটাকে এখানে এনে রাখা হতে পারে না। তোমার বাড়ীতে তুমি একলা মানুষ থাক। এখানে একটা কুল-ত্যাগিনী স্ত্রীলোককে এনে ঢোকালে লোকে বলবে কি!" ক্রমশঃ স্বর নরম হয়ে এল, "তুমি যে আমাদের বড় সাধের বন্ধু, রণজিৎ, আমাদের গৌরব, আমাদের নবযুরের নেতা! তোমার বদনাম আমাদের সহ্য হবে না। সরযু অভিসারিকা হোন বা না হোন, তিনি এখানে এসে উঠলে ফল একই হবে। একটু স্থির হয়ে ভেবে দেখ, ভাই।"

রণজিতেরও এতক্ষণে উত্তেজনা চলে গেছে—বেশ শান্তভাবে উত্তর দিলে, "ভবেশ, আহমদ, আমি আমার আশ্রিতা স্ত্রীলোকটীকে যদি রক্ষা করতে না পারি, ত নিজের চোখে আমি অত্যন্ত খাটো, অত্যন্ত হীন হয়ে যাব। তোমরা জান, আমি লোক-নিন্দার ভয় করি না। তা যদি করতাম, ত দাদাকে চটিয়ে বৌদির মনে দুঃখ দিয়ে, নবযুর সঙ্ঘ স্থাপন করতাম না। তোমরা বিদ্বান্, উদার, সাহসী পুরুষ। সত্যি কি তোমরা আমাকে এই অসহায়ার কাতর ডাক উপেক্ষা করতে বল?"

আহমদ বললে, "আমি কথা বলব, তুমি বিরক্ত হয়ো না, রণজিৎ। যে জিনিষ তোমাকে এমন ক্ষুব্ধ, বিচলিত, অস্থির করেছে, তা সরযুর অসামান্য সৌন্দর্য্য। তাকে উদ্ধার করার ঝোঁক তোমার তত হয় নেই, যত হয়েছে তাকে কাছে পাবার। তার কথা সত্য কিনা, তাও তুমি বিচার করতে চাও না। বেশ, কোরো না। আমি এই প্রস্তাব করছি যে তুমি সরযুকে ও বাড়ী থেকে বার করে এনে আহমদাবাদ পাঠিয়ে দাও, নিবেদিতার কাছে। রাজী আছ?"

রণজিৎ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উত্তর দিলে, "না, না, তা কি করে হয়? তুমিই বলছ, কি রকম মেয়ে তার ঠিক নেই। তাকে আমি নিবেদিতার কাছে কি করে পাঠাব?"

এমন সময় সত্য মুখার্জ্জী এসে ঢুকল। "কি হে! আজ এরই মধ্যে সব উপরে এসে বসেছ, কি আলোচনা হচ্ছে তোমাদের?"

তাকে দেখে ভবেশ বলে উঠল, "আচ্ছা, আমি মধ্যস্থ

মধ্যস্থ মানতে রাজী আছি। ওকে সরযূর চিঠিটা দাও, রণজিৎ। ও পড়ে বলুক কি করা উচিত।"

চিঠি পড়ে, সব ঘটনাটা শুনে সত্য উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠল, "বাঃ, বেশ romantic ব্যাপার ত! ভাই রণজিৎ, এ ত সহজ মেয়ে নয়, যে তোমার মতন যোগীর মন টলিয়েছে! তুমি কি করতে চাও?"

"আমি ওঁকে এখানে এনে রাখতে চাই। আহমদ ও ভবেশ তাতে রাজী নয়। বলে যে এ কাজ করলে আমার দুর্নাম হবে, নবঙ্গুরের কাজ পণ্ড হবে।"

সত্য বললে, "দুর্নাম কেন হবে? you can marry the girl—ওঁকে বিয়ে করলেই চুকে গেল। তা'হলেই তোমাকে সবাই সাধু পুরুষ বলবে।"

ভবেশ হেসে উঠল, "খুব ব্যারিষ্টার তুমি! একটা স্ত্রীলোকের দুটো স্বামী হয় না কি!"

"কেন হবে না? দুজনে ব্রাহ্ম হয়ে গেলেই ব্রাহ্মমতে বিয়ে হতে পারবে।"

ভবেশ উপহাস করে বললে; "তাই বল হে! তোমার সমাজের দলবৃদ্ধি করছ!" কিন্তু রণজিৎ খুব আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, "তা কি আইন মতে হতে পারে, সত্য? কোন বিবাহিতা স্ত্রীলোক ব্রাহ্ম হলে কি তার হিন্দু-বিবাহ আইনের চোখে নাকচ হয়ে যায়? ভাল করে ভেবে বল দেখি। আমার মাথাটা ঠিক খেলছে না।"

সত্য একটু মাথা চুলকে উত্তর দিলে, "ব্রাহ্ম হওয়ার কথা আমি ঠিক বলতে পারি না, রণজিৎ। তবে এটা নিশ্চিত যে তোমরা দুজনে যদি মুসলমান হয়ে যাও, এ বিবাহের কোন বাধা থাকবে না। এ রকম বিবাহ ত দু চারটে হচ্ছে।"

রণজিৎ আবার জিজ্ঞাসা করলে, "ঠিক বলছ?"

সত্য উত্তর দিলে, "বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।"

রণজিৎ যেন কুল-কিনারা পেলে। বললে, "তাহলে ভবেশ, আমি মুসলমান হব। তুমি ত বলেইছ যে মূর্ত্তি-পূজা ও বর্ণাশ্রমে যার আস্থা নেই, সে হিন্দু নয়!"

ভবেশ কিছু বলবার আগেই আহমদ রণজিতের হাত হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "রণজিৎ, তুমি কি মান যে হজরৎ মহম্মদ আল্লার একমাত্র রসুল, যিনি আল্লার শেষ পয়গম্ (আদেশ) নিয়ে দুনিয়ার উদ্ধারের জন্য এসেছিলেন?"

"তা আমি এখনও ঠিক বুঝি নেই, আহমদ। কিন্তু শিখে নেব আস্তে আস্তে।"

"আগে শেখো, মানো, তারপর ইসলাম ধর্ম্ম নিও।"

"না আহমদ, আমি আগে ইসলাম ধর্ম্মের দীক্ষা নেব, তার পর, যা শেখার আছে শিখব।"

ঠিক সেই সময় আলিম এসে ঘরে ঢুকল। সে দৌড়ে গিয়ে রণজিৎকে বুকে চেপে ধরে বললে, "আল্লাহো আকবর!"

আহমদ খুব কঠিন স্বরে বললে, "ইসলামের এমনই দিন পড়েছে বটে! ধর্ম্ম বোঝার দরকার নেই, মেয়ে-মানুষের লোভে পড়ে তুমি মুসলমান হবে, রণজিৎ, আর আমরা তাইতে কৃতার্থ বোধ করব। আলিমভাই, এই রকম দীক্ষার প্রশ্রয় দিচ্ছ তুমি! লজ্জা-শরম কি এতটুকু নেই তোমাদের!"

একটু থেমে রণজিতের হাত চেপে বললে, "আমাকে ছেড়ে দাও, ভাই। আমি ধর্ম্ম নিয়ে খেলা করার প্রশ্রয় দেব না। নবঙ্গুরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘুচল আজ থেকে। আসি, রণজিৎ?"

আহমদ আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। কেউ তাকে কিছু বলবার সময় পেলে না। রণজিৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল একটা কোণে। ভবেশ তার কাছে গিয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, "ফিরিয়ে নিয়ে আসব আহমদকে?"

রণজিৎ মুখ তুলে বললে, "না-ভাই। কাজ নেই তাকে ডেকে। সে আমাকে হীন অপদার্থ মানুষ জেনে ছেড়ে গেছে। ভগবান—না, আল্লাহ্ তার মঙ্গল করুন। তুমি কি করবে, ভবেশ? মুসলমানের সঙ্গ ত্যাগ করতে চাও ত লজ্জা কোরো না, যাও। আমি একটুও অভিমান করব না।"

ভবেশ মনে মনে স্থির করেছিল যে শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করবে রণজিতের দীক্ষা বন্ধ করতে। তাই উত্তর দিলে, "আমার হিন্দুত্ব অত ঠুনকো নয়। আহমদ আলিমের সংসর্গে ত এতদিন কিছু হয় নেই!"

রণজিৎ বললে, তোমরা অনুমতি কর ত একখানা চিঠি লিখে নিই।"

এই চিঠি লিখলে :—সরযূ, কাল সন্ধ্যা আটটার সময় যদি তোমার খিড়কী দরজায় চুপি চুপি এসে দাঁড়াও, ত আমার এক বন্ধু তোমাকে এখানে নিয়ে আসবেন। আমার যা বক্তব্য আছে, দেখা হলে বলব। ইতি শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীরণজিৎ রায়।

"ভবেশ, চিঠিখানা পড়ে দেখ ত!"

ভবেশ পড়ে বললে, "সব ঠিক হয়েছে। শুধু স্পষ্ট লিখে দাও, আমার বন্ধু ভবেশবাবু তোমাকে এখানে নিয়ে আসবেন।"

"তুমি যাবে! ভবেশ, তুমি গিয়ে নিয়ে আসবে?"

"কেন যাব না, রণজিৎ? তুমি যখন বিয়ে করবেই স্থির করেছ, তখন তোমার পাশে দাঁড়াতেই হবে।"

সত্য বললে, "Bravo, spoken like a man! এই ত মরদের কথা! আমিও তোমার সঙ্গে যাব, ভবেশ।"

রণজিৎ ধীরে ধীরে বললে, "ভাই, তোমাদের দয়া চিরদিন মনে থাকবে। যে দিন আমার সমস্ত ইতিহাস তোমাদিকে বলতে পারব, সেদিন বুঝবে যে আমি একটা আজগুবি কিছুই করছি না। এই আমার নিয়তি। আলিম, কাল কাজী মোল্লা সব হাজির রাখার ব্যবস্থা তুমি করবে ত?"

"সে আর বলতে, দোস্ত! সমস্ত ভার আমার উপর রইল। তোমার চেয়েও যে আমার গরজ বেশী! তোমাকে আপন ভাই বলে পাব এইবার!"

রণজিৎ ভবেশের কাছে গিয়ে বললে, "ভবেশ, একটু একটু মন কেমন যে না করছে, তা নয়! কিন্তু ভয় নেই, পস্তাব না। প্রথম থেকেই অদৃষ্ট আমাকে এই পথে টেনে নিয়ে আসছে।"

(ক্রমশঃ)

শরতে

শেখ ইস্‌মাইল হোসেন

শিউলি তলায় আঁচল দোলায় শরৎ-রাণী আপন মনে,
দাঁড়িয়ে আছে সকাল সাঁঝে জগদ্‌-গুরুর বন্দনে।
শিশির-সিক্ত দূর্ব্বাদল,
তিতিয়ে দেয় গো চরণতল;
ধীর বাতাসে চামর ঝুলায় সুবাস ছড়ায় চন্দনে।

নীল আকাশে চাঁদের হাসি কুমুদিনীরঞ্জনে,
চকোরিণী আমোদিনী আঁকা-আঁকি অঞ্জনে।
সরোবরে কমল-কলি,
ফোটা ফুলে বসে অলি;
যুঁই, মালতী, বেলার বাগান মুখর মধুর গুঞ্জনে।

স্নিগ্ধ শ্যামল নিখিল ভুবন পুলক-ভরা অন্তরে,
রাঙিয়ে তুল্‌ছে দিনগুলিকে সজীবতার মন্তরে।
নাই উপমা সুষমার,
স্বর্গ-শোভা কিবা ছার;
প্রেম-রাগিণী দিচ্ছে ঝঙ্কার কান্তার, গিরি-কন্দরে।

বৈশ্বানর আত্মা

শ্রীভবানীপ্রসাদ নিয়োগী বি-এ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যোগশাস্ত্রে পাই, এই অবস্থায় বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অহংকার থাকে :—

বিতর্ক—কোনটি সৎ কোনটি অসৎ, কোনটি শুভ কোনটি অশুভ, কোনটি পবিত্র কোনটি অপবিত্র ? এই সব তর্কের নাম বিতর্ক।

বিচার—এই সব তর্কের মীমাংসার নাম বিচার। ইহা অবশ্য অবক্ত গুরু-ব্রহ্ম অর্থাৎ হৃষীকেশের সাহায্যেই করিতে হয়।

আনন্দ—সাধক এই অবস্থায় প্রকৃত ভোগ্য অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি শ্যামসুন্দরকে একান্ত (বিবিক্তে) প্রাপ্ত হয় এবং ভোগ করে ; সুতরাং তাহার আনন্দের আতিশয্য (রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দীভবতি)।

অহংকার বা অস্মিতা—অর্থ এখানে—শ্যামসুন্দর ভোগ্য আমি ভোক্তা, তিনি সেব্য আমি সেবক, এই জ্ঞান।

এই সমাধির নাম সম্প্রজ্ঞাত ; যেহেতু ইহাতে subjective world-এর সম্যক্ জ্ঞান থাকে। যোগশাস্ত্রের "অভাব"-বাদী ভাষ্যকারগণ subjective worldকে শূন্যে পরিণত করেন ; সুতরাং তাঁহাদের নিকট "সম্প্রজ্ঞাত" কথার 'সং' উপসর্গের সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ পাইবার আশা করিতে পারি না। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার "রাজ-যোগের" অষ্টমাধ্যায়ের আরম্ভে "অভাব-যোগ" এবং ব্রহ্ম-যোগ বা মহাযোগের মধ্যে পার্থক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। বেদান্তশাস্ত্রে এই মহাযোগের কথাই আছে ; শ্বেতাশ্বত-রোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইহার কথা পাওয়া যায়। ঐ অধ্যায়ের দশম শ্লোকের 'প্রযোজয়েৎ' কথার দ্বারা যোগ-সাধন উল্লিখিত হইয়াছে ঐ কথার শাঙ্করভাষ্যে এইরূপ ব্যাখ্যা পাই :—

"প্রযোজয়েৎ—প্রযুঞ্জীত চিত্তং পরমাত্মনি—চিত্তকে পরমাত্মায় সংযোজিত করিবে।"

মাণ্ডুক্যোপনিষদের প্রচলিত ব্যাখ্যায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ কল্পিত হইয়াছে ; সুতরাং শ্বেতাশ্বতর-শ্রুত্যুক্ত মহাযোগ বা ব্রহ্মযোগের স্থান উহাতে নাই। কঠশ্রুত্যুক্ত গূঢ় আত্মা অর্থাৎ অব্যক্ত গুরুব্রহ্ম বা হৃষীকেশ (কঠ ৩।১২) উহাতে স্থান পান নাই। এই ভাষ্যে "বহিঃ-প্রজ্ঞ" "অন্তঃপ্রজ্ঞ" "স্থূলভুক্" এবং "প্রবিবিক্তভুক্" কথার মধ্যে যে শ্লেষ অর্থাৎ নানাবিধ অর্থ আছে তাহাও ধরা পড়ে নাই। উহাতে "প্রাজ্ঞ" কথার অর্থ ধরা হইয়াছে দর্শন-শ্রবণাদি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-দ্বারা বিষয়-গ্রহণ। কিন্তু দর্শন-শ্রবণাদি প্রকৃষ্ট জ্ঞান বা প্রজ্ঞা নহে। দূর হইতে শুক্লবর্ণ চূর্ণ-সমষ্টি দেখিয়া চলিয়া গেলাম, সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মন ভাল করিয়া কার্য্য করিল না, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির তো কথাই নাই। ইহাতে কি আমার ঐ বস্তু সম্বন্ধে প্রজ্ঞা জন্মিল ? ঐ বস্তু সম্বন্ধে প্রজ্ঞালাভ করিতে হইলে উহা কি আহার্য্য লবণ, সোডা না বালি, তাহা জানিবার জন্য নিকটে যাইতে হইবে এবং বিচার-বুদ্ধির দ্বারা উহা ঐ তিন বস্তুর মধ্যে একটি বা ঐ তিনটি ছাড়া অন্য কোন বস্তু কি না তাহা স্থির করিতে হইবে। যদি সাধারণ-বুদ্ধি নিষ্ফল হয়, তবে "বিজ্ঞান" বা 'Science of Chemistry'র সাহায্য লইয়া উহা কি তাহা স্থির করিতে হইবে।

কঠোপনিষদে সাধন-বর্ণনায় বলা হইয়াছে, যাহার সাধারণ বুদ্ধি বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে সেই ব্যক্তিই সাধন-পথের শেষে উপস্থিত হইয়া পরমেশ্বরে মিলাইয়া যাইতে পারে—যাহার তাহা হয় নাই সে সংসার-পথে পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া আইসে। এই কথা বহির্জ্জগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ, এই উভয় সম্বন্ধেই প্রয়োগ করিতে হইবে। Objective world সম্বন্ধে যেমন বিজ্ঞান বা প্রজ্ঞালাভের প্রয়োজন, অন্তর্জ্জগৎ বা subjective world সম্বন্ধেও তেমনি বিজ্ঞান বা প্রজ্ঞালাভের প্রয়োজন ; নতুবা পথের শেষে উপস্থিত হওয়া যাইবে না (কঠ ৩।৭-৯)।

অদ্বৈতবাদী শ্রুতি প্রত্যক্ষ এবং অনুমান (deduction and induction) ইহার সকল প্রমাণকেই উড়াইয়া দিয়া গায়ের জোরে objective worldকেও মিথ্যা বলেন, subjective worldকেও মিথ্যা বলেন ; সুতরাং তাঁহার নিকট বহির্বিজ্ঞান ও অন্তর্বিজ্ঞান, এই দুইই মিথ্যা জ্ঞানে পরিণত হইয়াছে। ইহাকে সর্ব্ব-বিজ্ঞানের সংহার বা annihilation of philosophy বলা যায়।

কেকয়-রাজ অশ্বপতির বৈশ্বানরই subjective world, তিনি বহির্জ্জগৎকেও মিথ্যা বলেন নাই—তিনি বরং বলিয়াছেন, বহির্জ্জগৎ অর্থাৎ বিষয়সমূহ আছে আর বৈশ্বানর সংজ্ঞক যৌথ আত্মার কার্য্য হইতেছে, উহার অভিবিমান বা সূক্ষ্ম পরিমাপ (accurate survey) করা। ইহাও সাধনের জন্য বহিঃ প্রজ্ঞ হইবার অর্থাৎ যাহা কিছু দেখিতেছি সকলই ঈশ্বরের সেবার উপকরণ, এইরূপ নির্দ্ধারণ করিবার প্রেরণা। ঈশোপনিষদও গোড়াতে তাহাই বলেন। কঠোপনিষদে যে বলা হইয়াছে, পমম দেবতাকে পাইতে হইলে বিষয়সমূহকেই পথ করিতে হইবে (কঠ ৩।৪), ইহাও ঐরূপ বহিঃপ্রজ্ঞ হইবার প্রেরণা।

চক্ষুরাদি দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিলাম, ইহাতেই কি আমি বহিঃপ্রজ্ঞ হইলাম ? স্বপ্নে মিথ্যা একটি জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার সম্বন্ধে অলীক সংস্কার সংগ্রহ করিলাম, ইহাতে কি আমি "অন্তঃপ্রজ্ঞ" বা অন্তর্জ্জগৎ সম্বন্ধে পণ্ডিত অর্থাৎ Master of Psychology হইলাম ? আর পর-মুহূর্ত্তে গভীর নিদ্রাগত হইয়াই কি আমি "প্রজ্ঞ" অর্থাৎ Grand Master of all Sciences হইয়া যাইব ? বোধ হয়, ইহা কেহই স্বীকার করিবেন না ; অথচ মাণ্ডুক্যোপনিষদের চলিত ব্যাখ্যায় এই কথাই সাব্যস্ত করার চেষ্টা হইয়াছে।

ঐ উপনিষদের 'প্রাজ্ঞ' অবস্থার বর্ণনায় পাওয়া যাইবে, উহাতে জীবাত্মা পরমাত্মায় মিলাইয়া গিয়া প্রজ্ঞান-ঘন আনন্দময় আনন্দভুক্ হয়, এবং ঐ অবস্থায় সাধকের মৃত্যু হইলে সাধক সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ এবং অন্তর্য্যামী পরমাত্মায় মিলাইয়া গিয়া অখণ্ড পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়, তাহার আর পুনরাবর্ত্তন হয় না। মাণ্ডুক্যের প্রচলিত ব্যাখ্যায় সাধকের এই প্রাজ্ঞ, প্রজ্ঞানঘন, আনন্দময়, আনন্দভুক্ অবস্থাকে সাধারণ গভীর নিদ্রার অবস্থা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। যেহেতু ঐ অবস্থাকে "সুষুপ্ত স্থান" বলা হইয়াছে। 'সুষুপ্ত স্থান' কথাটি যে একটি ইঙ্গিত মাত্র, উহা যে "নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ" এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা ক্রমশঃ পাওয়া যাইবে।

সাধারণ সুষুপ্তি এবং যৌগিক সুষুপ্তি বা নির্ব্বিকল্প সমাধি—এই উভয়েই চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ হয় বটে —কিন্তু উভয়ের ফল একরূপ নহে। ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ের নবম খণ্ডে সাধারণ সুষুপ্তির কথা এইরূপ আছে—ইহাতে পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গাদির আত্মার ন্যায় মানুষের আত্মারও পরমাত্মাতে ক্ষণিক বিলয় হয়, আবার সুষুপ্তির অন্তে মানুষ মানুষই হয়, পশু পশুই হয়, কীট কীটই হয়, পতঙ্গ পতঙ্গই হয়। কিন্তু যৌগিক সুষুপ্তি বা নির্ব্বিকল্প সমাধির ফল অন্যরূপ। স্বামী বিবেকানন্দের "রাজযোগের" "ধ্যান ও সমাধি" নামক ৭ম অধ্যায়ে পাই :—

"মানুষ সুষুপ্তি অবস্থায় অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকে, নিদ্রা হইতে যখন উত্থিত হয় তখন সে যে মানুষ ছিল তাহা হইতে কোন অংশে তাহার বৈলক্ষণ্য হয় না ; নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে তাহার যে জ্ঞানসমষ্টি ছিল নিদ্রাভঙ্গের পরেও ঠিক তাহাই থাকে ; উহার কিছুমাত্র বৃদ্ধি হয় না, তাহার হৃদয়ে কোন নূতন তত্ত্বালোক প্রকাশিত হয় না। কিন্তু মানুষ যখন সমাধিস্থ হয়, সমাধিস্থ হইবার পূর্ব্বে যদি সে মহামূর্খ, অজ্ঞান থাকে, সমাধি-ভঙ্গের পরে সে মহাজ্ঞানী হইয়া উঠিয়া আসে।" এই কথাই মাণ্ডুক্যো-নিষদের "প্রাজ্ঞ" এই সংজ্ঞা এবং "প্রজ্ঞান-ঘন" এই বিশেষণের মধ্যে পাওয়া যাইবে। মা—৫

মাণ্ডুক্যের প্রচলিত ব্যাখ্যায় যে সাধারণ স্বপ্নাবস্থাকে "অন্তঃপ্রজ্ঞ" ও "প্রবিবিক্তভুক্" বলিয়া চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে সেই অবস্থার এইরূপ নিন্দা ছান্দোগ্যে আছে :—

"শিষ্য বলিলেন—স্বপ্নে দেখা যায় 'ইহাকে যেন কেহ বিনাশ করিতেছে, ইহার পশ্চাতে যেন কেহ ধাবিত হইতেছে, ইহা যেন দুঃখ ভোগ করিতেছে, ইহা যেন ক্রন্দন করিতেছে। ইহাকে সকল কামনার পূরণকারী

পরমাত্মা বলিয়া নির্দ্ধারণ করার মধ্যে আমি কোন কল্যাণ দেখি না—নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি।

গুরু বলিলেন—হাঁ ইহা এইরূপই—এবমেবৈষঃ। ছা ৮।১০।৪।"

এইরূপ স্বপ্নাবস্থায় অবস্থিত আত্মাকে মাণ্ডুক্যোপনিষৎ নিশ্চয়ই অন্তঃপ্রজ্ঞ ও প্রবিবিক্তভুক্ বলিয়া প্রশংসা করেন নাই।

যে সাধারণ গভীর নিদ্রাকে মাণ্ডুক্যের "প্রাজ্ঞ প্রজ্ঞানঘন" অবস্থা বলিয়া চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে, ছান্দোগ্যে তাহার এইরূপ নিন্দা আছে :—

"শিষ্য বলিলেন—সুষুপ্তি অবস্থায় ইহা নিজের অবস্থাই জানিতে পারে না যে 'ইহাই আমি" এবং ইহা ভূতসমূহকেও জানিতে পারে না—এ সময়ে ইহা যেন বিনাশ প্রাপ্তই হয়; ইহাকে পরমাত্মা বলিয়া জানাকে প্রাজ্ঞ বা বিজ্ঞান বলার মধ্যে (ছা ৮।৭।১) এবং ইহার নিকট হইতে সর্ব্বকামনা-পূরণের আশা করার মধ্যে আমি কোন কল্যাণ দেখি না।

গুরু বলিলেন—ইহা এই প্রকারেরই। ছা ৮।১১।২-৩।"

এই অবস্থায় একীভূত যৌথ আত্মাকে মাণ্ডুক্যোপনিষৎ নিশ্চয়ই প্রাজ্ঞ, প্রজ্ঞানঘন, আনন্দময়, আনন্দভুক্, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্য্যামী ইত্যাদি আখ্যা দেন নাই।

সুতরাং "তৈজস" আত্মা সম্বন্ধেও প্রচলিত লৌকিক ব্যাখ্যা ছাড়িয়া যৌগিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে হইবে এবং প্রাজ্ঞ আত্মার সম্বন্ধেও প্রচলিত লৌকিক ব্যাখ্যা ছাড়িয়া যৌগিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে হইবে।

ইহার পর মোক্ষ বা পরম পুরুষার্থ লাভের কথা। মাণ্ডুক্যের প্রচলিত ভাষ্যে পাই—

"আত্মার চারিটি পাদ আছে, জাগ্রদবস্থায় অবস্থিত আত্মা ১ম পাদ, স্বপ্নাবস্থায় অবস্থিত আত্মা দ্বিতীয় পাদ, সুষুপ্ত আত্মা তৃতীয় পাদ এবং নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, ত্রিকালাতীত আত্মা বা ব্রহ্ম চতুর্থ অর্থাৎ তুরীয় পাদ। পদ্ ধাতুর অর্থ প্রতিপত্তি বা উপলব্ধি। প্রথম তিন অবস্থাকে পাদ বলা হইয়াছে এইজন্য, যে বৈশ্বানর প্রভৃতি পাদত্রয়ের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পাদের বিলোপ-সাধন অর্থাৎ অসত্যতা-প্রতিপাদন দ্বারা তুরীয় ব্রহ্মের উপলব্ধি হইয়া থাকে—"বিশ্বাদীনাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবিলাপনেন তুরীয়স্য প্রতিপত্তিরিতি ;" ঐ তিনটি কারণ বাচ্যের পদ, আর তুরীয় আত্মাকে পাদ বলা হয়, যেহেতু উহা প্রতিপত্তি বা উপলব্ধির বিষয়, এটি কর্ম্মবাচ্যের পদ"।

উপসর্গবিহীন পদ্ ধাতুর "উপলব্ধি" এই অর্থ হয় না, কিন্তু গরজ বড় বালাই, তাই এক উপসর্গের দৌরাত্ম্যে শ্রুতি-সম্মত গীতোক্ত জ্ঞান, ধ্যান, ভক্তি ও নিষ্কাম-কর্ম্মাত্মক চতুরঙ্গ সাধন, এবং তাহা হইতে অভিন্ন শ্রুতি-সম্মত অষ্টাঙ্গ-যোগ তিরোহিত হইয়াছে। ইহা না হয় বুঝিলাম —কিন্তু একই ভাষ্যকার বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্যে যে বৈশ্বানরকে "পরমেশ্বর" ও "পরমাত্মা" সাব্যস্ত করিয়াছেন, মাণ্ডুক্যভাষ্যে আবার সেই বৈশ্বানরের বিলোপ-সাধন অর্থাৎ অসত্যতাপ্রতিপাদন কিরূপে করিলেন তাহা বুঝিলাম না।

'পাদ' শব্দ উপসর্গবিহীন 'পদ' ধাতু হইতে হইয়াছে ; ঐ ধাতুর অর্থ স্থৈর্য্য বা স্থিতি। আমরা বলিতে চাই, আলোচ্য পাদ বা অবস্থা-চতুষ্টয়ে 'সর্ব্বং'-সংজ্ঞিত যৌথ আত্মা অবস্থিত এবং শ্রুতিসম্মত গীতোক্ত সাধন ও অষ্টাঙ্গ যোগও ঐ অবস্থাচতুষ্টয়ে অবস্থিত, তাই উহারা "পাদ।"

মাণ্ডুক্যের প্রচলিত ভাষ্যের কথা সহজ ভাষায় বলিতে গেলে দাঁড়ায়—জাগ্রদবস্থার "ব্যবহারিক" সত্যজ্ঞানের বিলোপে স্বপ্নাবস্থার মিথ্যা জ্ঞান আসিবে, ঐ মিথ্যা জ্ঞানের বিলোপে সুষুপ্তাবস্থার অজ্ঞান বা প্রায় বিনাশ আসিবে ; এই দুই অবস্থায় যে কোন কল্যাণ বা ভোগ্য নাই, তাহা শ্রুতি হইতে পাইয়াছি। তারপর ? ঐ প্রায় বিনাশের বিলোপে যে পারমার্থিক নির্ব্বিশেষ তুরীয় ভাব আসিবে, তাহা কি আত্যন্তিক বিনাশ নহে ? উহাতে আপনারা কি কোন ভোগ্য বা কল্যাণ দেখিতেছেন ? আমি তো বলি 'নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি'।"

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, প্রাজ্ঞ, প্রজ্ঞান ঘন, আনন্দময়, আনন্দভুক্ অর্থাৎ সবিশেষ ব্রহ্মে বিলীন হওয়াই সাধকের অব্যয় বা মোক্ষ; ইহাতে ভোগ্যও যথেষ্ট। যে প্রাজ্ঞ, প্রজ্ঞানঘন, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, আনন্দময় ও আনন্দভুক্ পরমাত্মার সহিত একীভূত হয় তাহার জ্ঞানেরও অভাব নাই, আনন্দেরও অভাব নাই, ভোগেরও

অভাব, রাই, আর উহা অপেক্ষা অধিকতর কল্যাণই বা আর কি হইতে পারে ?

মাণ্ডুক্যোপনিষদের মতে তুরীয় অবস্থা-প্রাপ্তি মোক্ষ নহে, আর তুরীয় অবস্থাও নির্ব্বিশেষে ব্রহ্ম নহে—তাহা জীব ও জড় সৃষ্টির সংকল্পের ও কামনার পরের এবং সৃষ্টির পূর্ব্বেকার চিদানন্দ-ঘন পুরুষাকৃতি-যুক্ত পরমাত্মা (বৃ ১।৪।১), উহার কথা সুধীগণ জানেন (মন্যন্তে), আমাদিগকেও জানিতে হইবে (বিজ্ঞেয়ঃ) ; কিন্তু সাধনে তাঁহার ব্যবহার হয় না (অব্যবহার্য্যম্—মা-৭)। সাধনে ব্যবহার হয় প্রাজ্ঞ, প্রজ্ঞানঘন, আনন্দময়, আনন্দভুক্, চেতোমুখ পরমাত্মারই এবং তাঁহাতে বিলয়েই পরম পুরুষার্থ বা অখণ্ড পরমানন্দাবাপ্তি।

নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ত্রিকালাতীত, ইঁহার পৃথক্ উল্লেখ মাণ্ডুক্য শ্রুতিতে আছে (মা ১)। ইঁহার সম্বন্ধে অগ্র পশ্চাতের বিবেচনা নাই। সৃষ্টির সংকল্পের পূর্ব্বে (অগ্রে) এই সন্মাত্র ব্রহ্মই ছিলেন (আসীৎ—ছা ৬।২।১)। ইনি এখন নাই, থাকিলে "আসীৎ" না বলিয়া "অস্তি" বলা হইত। যখন তিনি সংকল্প করিলেন (তদৈক্ষত) আমি বহু হইব, জন্মাইব (ছা ৬।২।৩), তখনই তিনি সবিশেষ হইলেন।

মাণ্ডুক্য শ্রুতিতে (মা ৭) যে সৃষ্টির অব্যবহিত পূর্ব্বেকার চিদানন্দঘন, পুরুষাকৃতিযুক্ত, প্রপঞ্চাতীত অদ্বয়-তত্ত্ব শিব বা সগুণ ব্রহ্মের তুরীয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে তিনিও এখন নাই ; কারণ তিনি অজাত ছিলেন, জন্মাইয়াছেন, অর্থাৎ গ্রাণাইট পাথরের বিরাট্ বিগ্রহ সৃষ্টি করিয়া তাহাকে ক্ষীরোদ-সাগরে স্থাপন করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনি এক ছিলেন, বহু হইয়াছেন। ইনি কালদ্বারা পরিচ্ছিন্ন সুতরাং "অগ্রে" কথা দ্বারা এবং "আসীৎ" ক্রিয়া পদ দ্বারা (বৃ ১।৪।১) তাঁহার যে অবস্থা সূচিত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে পশ্চাৎকালে গায়ের জোরে কেমনে "অস্তি" বলিব ? প্রপঞ্চ যখন "অস্তি", তখন প্রপঞ্চাতীত এক এবং অদ্বিতীয় আত্মা "নাস্তি", এই কথাই বলিতে হইবে। ইহাতে আমাকে যেন কেহ নাস্তিক না বলেন। ধরুন, বিধবা মাতা সন্তান প্রসব করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সদ্যোজাত শিশু সংসারে একা ছিল—এখন সে শত বৎসরের বৃদ্ধ হইয়াছে, তাহার পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রে ঘর ভরিয়া গিয়াছে ; ইহাতেও কি আমি বলিব না, সেই অদ্বিতীয় সদ্যোজাত শিশু আর নাই ?

সাধারণ সুষুপ্তিতে 'সর্ব্বং'-সংজ্ঞিত যৌথ আত্মার একীভাব হয়—যৌগিক সুষুপ্তি বা নির্ব্বিকল্প সমাধিতেও তাহাই হয়। একীভাব কথার অর্থ, যাহা পূর্ব্বে তিনি ছিলেন (জীবাত্মা, অন্তরাত্মা বা গূঢ় আত্মা এবং পরমাত্মা) এখন তাহা এক হইয়াছে। এইখানেই সাধারণ সুষুপ্তি এবং যৌগিক সুষুপ্তি বা নির্ব্বিকল্প সমাধির মধ্যে সাদৃশ্যের শেষ। মাণ্ডুক্যোপনিষদে যৌগিক সুষুপ্তি বা নির্ব্বিকল্প সমাধির বর্ণনা এইরূপ :—

সুষুপ্ত-স্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞান-ঘন এবানন্দময়ো-হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ। মা ৫

এই নির্ব্বিকল্প সমাধিতে objective world অন্তর্হিত হয়, মন-বুদ্ধি-অহংকার অন্তর্হিত হয়, চিত্তে কেবল সংস্কার-গুলি থাকে। সকল চিত্ত-বৃত্তির বিরামের অভ্যাস দ্বারাই এইরূপ সমাধিপ্রাপ্তি হয়। ইহার কথা যোগ-শাস্ত্রে এই-রূপে বলা হইয়াছে :—

বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বসংস্কারশেষোঽন্যঃ।

যো সূ ১।১৮

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভাবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্। মা ৬

এই যৌথ আত্মার যে একীভূত প্রজ্ঞান-ঘন, আনন্দময়, আনন্দভুক্ ও চেতোমুখ অবস্থা, ইহা হইতেই জড় বিশ্বের (সর্ব্বস্য) জন্ম হইয়াছে, ইহা হইতেই জীবাত্মা সকলের উদ্ভব হইয়াছে এবং ইহা হইতেই সাধকগণ সাধনবলে বিলীন হয়েন। ইনি **সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, উপাস্য-ব্রহ্ম**, আবার ইনিই অন্তর্য্যামী বা প্রেরয়িতা অর্থাৎ **গুরুব্রহ্মা**। ইহাতে অনন্তকালের জন্য বিলীন হওয়াই পরম পুরুষার্থ।

এই সর্ব্বেশ্বরকে মহেশ্বর বা শিবরূপে মাণ্ডুক্যে পাই। যোগশাস্ত্রে ইহাকে "**ঈশ্বর**" এবং **পরমপুরুষ** (পুরুষ-বিশেষঃ) এবং **সর্ব্বজ্ঞ** ও **গুরুরূপে** পাই (যো সূ

১।২৩-২৬)। মাণ্ডুক্যেও ওঙ্কার ইঁহার বাচক ; যোগশাস্ত্রেও তাহাই (যো সূ ১।২৭)। ছান্দোগ্যে ইনিই শ্যামসুন্দর (ছা ৮।১৩) এবং সাধকের দেহ হইতে উত্থিত এবং তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ-ঘন (সম্প্রসাদঃ শরীরোত্থঃ) দ্বিভুজ মুরলীধর রূপে (স্বেন রূপেন) বিরাজমান **উত্তম পুরুষ** (ছা ৮।১২।৩)।

কঠশ্রুতিতে ইনি চরম তত্ত্ব, পরা গতি, পরম পুরুষ (কঠ ৩।১১), মুণ্ডকোপনিষৎ ও গীতায়ও ইনি একমাত্র উপাস্য এবং মুক্তিদাতা পরম পুরুষ (মু ৩।২।১, গী ৮।৮, ১০, ২২)।

এই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর ও অন্তর্য্যামী সৃষ্টি, পালন ও মোক্ষের একমাত্র কর্ত্তা ও বিধাতাকে আমরা মাণ্ডুক্যের প্রচলিত ভাষ্যের অনুরোধে লৌকিক সুষুপ্তিতে অজ্ঞানাচ্ছন্ন বিনষ্টপ্রায় জীবাত্মাতে মিলাইয়া দিতে পারিব না। এই সবিশেষ আছেন এবং সর্ব্বদা অর্থাৎ জাগ্রদাদি তিন অবস্থাতেই সকলের হৃদয়ে চিদানন্দ-ঘন, দ্বিভুজ, এক-পা-বাঁকান মূর্ত্তিতে সেবালাভের জন্য বিরাজ করিতেছেন এবং অব্যক্ত বা হংস রূপে সমগ্র জীব ও জড় জগৎকে নিয়মিত করিতেছেন ; ইঁহাকে মারিয়া, যাহা নাই সেই নির্ব্বিশেষের অনুসন্ধানে যাইতে পারিব না।

বৃহদারণ্যকে যে চিদানন্দ-ঘন, পুরুষাকৃতিযুক্ত, অদ্বিতীয় আত্মার কথা বলা হইয়াছে যে, তিনি তাঁহা ভিন্ন আর কিছু দেখিলেন না—আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ (বৃ ১।৪।১)— তিনিই তুরীয়। তাঁহারই কথা এইরূপে মাণ্ডুক্যের শেষ শ্রুতিতে (মা ১২) বলা হইয়াছে :—

অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব। ম ১২

ইনি "অমাত্র", যেহেতু উনবিংশতি-মুখ জীবাত্মা তখন ছিল না ; সুতরাং অভিবিমানকারীর তখন অভাব—আর এই প্রপঞ্চও তখন ছিল না ; সুতরাং পরিমাপের বিষয়েরও তখন অভাব ছিল। তখন ইনি মঙ্গলময়, চিদানন্দ-ঘন, পুরুষাকৃতি-যুক্ত, অতএব সবিশেষ এক এবং অদ্বিতীয় আত্মা ছিলেন (শিবঃ), অন্য কিছু তখন ছিল না—তাই ইনি অদ্বৈত। এই আত্মাও ওঙ্কার-বাচ্য।

ইঁহার কথা লইয়াই মাণ্ডুক্যোপনিষদের আরম্ভ হইয়াছে :—

ওমিত্যেতদক্ষরং, ইদং সর্ব্বংতস্যোপব্যাখ্যানং। মা ১

ওঁকার-সৃষ্টির পূর্ব্বেকার অক্ষর পুরুষেরও বাচক, এই যে জীব-হৃদয়স্থিত (ইদং) "সর্ব্বং"-সংজ্ঞিত ত্রিবিধ আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা, পরমাত্মা ও অন্তরাত্মা—ইঁহারা সেই অক্ষর পুরুষেরই বিস্পষ্ট প্রকাশ।

সাধনের দিক্ দিয়াই "বৈশ্বানর"কে প্রথম, "তৈজস"কে দ্বিতীয় এবং "প্রাজ্ঞ"কে তৃতীয় বলা হইয়াছে এবং এই সৃষ্টির পূর্ব্বেকার অক্ষর পুরুষ চতুর্থ হইয়াছিল ; প্রকৃত পক্ষে, এই অক্ষর পুরুষই প্রথম তত্ত্ব, বৈশ্বানর দ্বিতীয়, তৈজস তৃতীয় এবং প্রাজ্ঞ-সংজ্ঞক প্রজ্ঞান-ঘন, আনন্দময়, আনন্দভুক্, চেতোমুখ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, অন্তর্য্যামী, সৃষ্টি-কর্ত্তা ও মুক্তিদাতা পরমাত্মাই চতুর্থ বা চরম তত্ত্ব, সেই চরম-তত্ত্বের কথা দিয়াই উপনিষৎ শেষ করা হইয়াছে :—

সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ য এবং বেদ। মা ১২

যিনি এই উপনিষৎপ্রোক্ত-বিদ্যা লাভ করিয়াছেন (য এবং বেদ), তিনি যত্ন বা সাধন দ্বারা (আত্মনা) প্রাজ্ঞ, আনন্দময়, আনন্দভুক্ পরমাত্মাতে প্রবেশ করেন, তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না—হয় না (মা ১২)।

তিনি অনন্ত কালের জন্য পরমানন্দ ভোগ করিতে থাকেন। সাধনেও ভোগ, সাধনের ফলেও ভোগ। এই জন্যই কেকয়রাজ অশ্বপতি বলিয়াছিলেন, বৈশ্বানর-তত্ত্ববিদের সর্ব্বত্রই ভোগ।
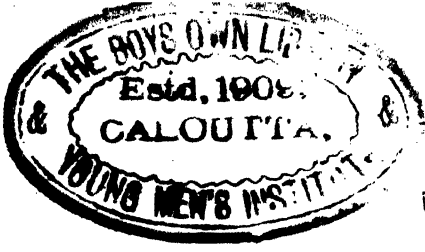
ভাগীরথী-তীরে মুর্শিদাবাদ

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ এম্-এস্-সি, বি-এল,

বাঙালাদেশের ইতিহাসে তাৎকালীন স্বচ্ছসলিলা পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর দান কিছু কম নহে। আজ স্বল্পতোয়া সেই নদীর শুষ্ক বালুকাময় তীরে দাঁড়িয়ে বাঙালীর জাতীয় জীবনের কয়েকটা ছেঁড়া-খোড়া অধ্যায় স্মৃতির পটে উদিত হল। মুর্শিদাবাদ জেলায় ভ্রমণ করতে আসা ভ্রাম্যমাণের কাছে কিছুই অপূর্ব্ব নয়; কিন্তু নিজের জাতীয় ও দেশীয় জীবনের ইতিহাসে যাঁরা অনুসন্ধিৎসু, তাঁদের কাছে এই পুরাতন যুগের সহরে বেড়াতে আসাটা যথেষ্ট মূল্যবান্। গঙ্গার কোলে রাজমহল থেকে আরম্ভ করে ভাগীরথীর কূলে কূলে ভগবানগোলা, বড়নগর, মুর্শিদাবাদ, কাশিমবাজার, বহরমপুর, হুগলী, চন্দননগর, কলিকাতা প্রভৃতি কতগুলি সহর, মধ্য বাঙলাকে ইতিহাসের পাতায় প্রসিদ্ধ করে', স্বাধীন বাঙলার শেষ স্মৃতিটুকু বহন করে' আজও ভাগীরথীর দুই তীর শোভিত করে' দাঁড়িয়ে আছে। সেদিনকার সেই পলাশীর প্রান্তর, যার বুকের উপর ভারতের রাজনৈতিক আকাশে মহাসন্ধিক্ষণ এসে' উপস্থিত হ'ল ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে জুন বৃহস্পতিবারের সকাল বেলায়, সেই পলাশী আজও পড়ে' আছে ভবিষ্যতের কাছে সাক্ষ্য দেবার জন্য। আজ তার বুকে শত শত আম্রবৃক্ষ জন্মে' তার লজ্জাকে ঢাকবার চেষ্টা করছে। সে ত বেশী দিন নয়, মাত্র দু'শ বৎসর পূর্ব্বে, যার মূল্য পৃথিবীর ইতিহাসে কতটুকু—বাঙলার রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ, লোকে সেথানে তখন শান্তিতে, সুখে ও সমৃদ্ধিতে বাস করত। তখন ভাগীরথী অমন শ্রীহীন, ম্লান ও শুষ্ক ছিল না তখন তার বক্ষ ছিল জলে টল-মল, ভরা-কূলে ঢেউয়ের খেলা। তখন এরই বুকে দক্ষিণ-হাওয়ায় পাল তুলে' আনা-গোনা করত কত বাণিজ্য-পোত, কত বণিক্-সওদাগর; কত ভূস্বামী তখন তথাকথিত ভাগীরথীর কৃপায় উন্নতিলাভ করেছে। কত নৌ-বিহার হয়েছে, কত জলকেলি হয়েছে, কত জলযুদ্ধ হয়েছে—সে সব এই নদীর কাছে এখন স্মৃতির বোঝা মাত্র। তেমনিধারা যুগবিবর্ত্তনে সেদিনকার জনকোলাহলপূর্ণ প্রধান সহর মুর্শিদাবাদ ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে আছে বাঙলার কোলাহল থেকে দূরে। এখন আর সে মুর্শিদাবাদ নাই, সে আলিবর্দ্দী, সে সিরাজও নাই, বাঙলার সে স্বাধীনতাও নাই। বাঙলার যত কিছু আন্দোলন, যত কিছু ঐশ্বর্য্য-সম্পদ্ আজ এসে' মিশেছে কলিকাতায়, ভাগীরথীর আর এক তীরে। নূতন সভ্যতার

নবাব-প্রাসাদ—মুর্শিদাবাদ

প্রভাবে, বিভিন্ন জাতির স্পর্শে এসে', সম্পূর্ণ পৃথক্ রাজশাসনে কলিকাতাই আজ বাঙলার রাজধানী। সেদিন যে ছিল জীবন্ত, আজ সে মৃত; সেদিন লোকে যাকে ভালবেসেছে আজ তাকে সে ভুলেছে। এতে হয়ত দুঃখ করবার কিছুই নেই। কিন্তু সেই বিগত দিন, যে এনেছিল শান্তি, এনেছিল সমৃদ্ধি, ভরিয়ে দিয়েছিল দেশের নরনারীকে ধনে-ধান্যে, তাকে স্মরণ না করে' থাকা যায় কি? সে তেমনটী রইল না বলে' ক্ষোভ করা মিছে; কারণ সৃষ্টির রহস্যই হ'ল এই—কিন্তু তাই বলে' তার আশীর্ব্বাদ, তার স্মৃতি ভুলব কেন? তার কাছে যা' পাওয়া গেছ্‌ল, যা আজ মাথা খুঁড়্‌লেও পাওয়া যায় না, তার জন্য

সে যুগকে নমস্কার না জানিয়ে থাকা যায় না। মিশর, গ্রীস, রোম, ব্যাবিলন, সিন্ধু একদিন জগতের কাছে মাথা তুলে' দাঁড়িয়েছিল তাদের সভ্যতা নিয়ে। সেদিন বোধ হয় "struggle for existence" বেঁচে থাকবার দ্বন্দ্বে পৃথিবীর আকাশ-বাতাস এমনতর ঘোরাল হয়ে উঠে নি। কিন্তু তারাও কালের গর্ভে মিলিয়ে গিয়েছে—কে পেরেছে তাদের বাঁচিয়ে রাখ্তে? ক্রীট্, তক্ষশীলা, রাজগীর সবকেই মানুষ পরিত্যাগ করেছে বটে; কিন্তু শ্রদ্ধা হারায় নি, ভুল্তেও পারে নি। আমরাও অতীত বাঙলার রাজধানীকে ভুল্তে পর্‌লাম না; তাই গত ইষ্টারের ছুটীতে কয়েক জন বন্ধু মিলে' তাকে দেখ্‌বার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

কাট্‌রার মসজিদ

মুর্শিদাবাদ সহরের বাঙলার রাজধানী-রূপে নব-পত্তন খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, তদানীন্তন বাঙলার সুবাদার মুর্শিদকুলী খাঁর রাজত্বে। যে সময়ে মোগল-রাজত্বের পতন সবে আরম্ভ হয়েছে এবং মহারাষ্ট্রশক্তি পুনর্ব্বার ভারতে হিন্দু-রাজত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য উত্তম-রূপে চেষ্টা করছে। বাঙলার সমুদ্রতীরে তখন বিদেশী বণিকের দল জাহাজ ভিড়িয়ে সুজলা, সুফলা, স্বর্ণপ্রসূ বাঙলার দিকে নজর দিয়ে মতলব আঁটছেন।

বাঙলা পূর্ব্বে স্বাধীন পাঠান বা হিন্দু রাজার অধীনে ছিল; তারপর সম্রাট আকবরের দিগ্বিজয়ে বাঙলা মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়েছিল। রাজকার্য্যের সুবিধার জন্য আকবর তাঁর সমস্ত সাম্রাজ্যটাকে কতকগুলি সুবায় (province) ভাগ করে' দিয়েছিলেন এবং প্রত্যেক সুবায় একটা করে' সুবাদার (Governor) নিযুক্ত করতেন। সেই সময় হ'তে বাঙলা একটী সুবা বলে' পরিচিত ছিল এবং একটী করে সুবাদার সম্রাটের representative হয়ে শাসন-কার্য্য চালাতেন। ঔরঙ্গজীবের সময়ে বাঙলার রাজধানী ছিল জাহাঙ্গীরনগর বা "ঢাকা", যেখানে মীরজুমলা সুলতান সুজার সাধের রাজমহল থেকে রাজধানী তুলে' নিয়ে আসেন। ঔরঙ্গজীবের রাজত্বের শেষ ভাগে করতলব খাঁ নামে এক বিচক্ষণ রাজকর্ম্মচারী সম্রাটের কৃপায় বাঙলার দেওয়ানী লাভ করেন। ইনি নিজের বাসের জন্য ভাগীরথীর তীরে মুখসুদাবাদ নামে একটী স্থানে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করলেন। তখন মুখসুদাবাদ সামান্য সহর ছিল।

পরে ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ করতলব খাঁকে তাঁর কার্য্যকুশলতার পরিচয় পেয়ে এবং দাক্ষিণাত্যে তাঁর সাহায্যে পরিতুষ্ট হয়ে বাঙলার সুবাদারী অর্পণ করলেন। এই করতলব খাঁই ইতিহাসে মুর্শিদকুলী খাঁ নামে পরিচিত। নবাব নাজিম মুর্শিদকুলী খাঁ ঢাকা থেকে তাঁর মুখসুদাবাদে রাজধানী তুলে' এনে' নূতন নাম দিলেন মুর্শিদাবাদ নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে। মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপনা করে' নূতন নবাব বহু প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেছিলেন; তার মধ্যে তাঁর চেহেল-সেতুন ও ট্যাঁকশাল উল্লেখযোগ্য। তারপর, নূতন রাজধানীতে ভূস্বামীরাও তাঁদের আবাস নির্ম্মাণ করলেন এবং এমনি করে' খৃষ্টাব্দ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে মুর্শিদাবাদ ক্রমশঃ প্রসিদ্ধি লাভ করতে লাগ্‌ল।

বাদশাহ্ শাহ্ আলমের রাজত্বে মোগলশক্তি ক্ষীণ হয়ে আস্‌তে মুর্শিদকুলী নিজেকে অনেকটা স্বাধীন করে' নিয়েছিলেন। বাদশাহের সহিত রাজস্ব প্রেরণ ছাড়া আর কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি নিজের নামে তাঁর সুবায় অর্থাৎ বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যায় মুদ্রার প্রচলন করেন। তাঁর রাজত্বে শৃঙ্খলা ছিল, প্রজারা সুখে এবং অতি অল্প আয়ে বেশ স্বচ্ছল-ভাবে জীবনধারণ করতে পারত। তাঁর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আইনের কঠোরতা

অত্যন্ত প্রবল ছিল, যার ফলে অনেক জমিদারেরও দুর্ভাগ্য ঘটেছিল। রাজ্যশাসনের সুবিধার জন্য তিনি বাঙলা দেশকে ১৩টী বিভাগ বা চাক্‌লায় ভাগ করে' দিয়েছিলেন।

মুর্শিদকুলী প্রায় বিশ বছর বাঙলা শাসন করেছিলেন। তাঁর নির্ম্মিত প্রাসাদ ও কীর্ত্তিকলাপের অস্তিত্ব প্রায় সমস্তই লুপ্ত হয়ে গেছে। তাঁর রাজত্বে মুর্শিদাবাদ ক্রমশঃ বহু প্রাসাদ-গৃহ-নির্ম্মাণে ও জনসংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়ে', উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিশালী হয়ে' এক মহানগরে পরিণত হয়েছিল। এখন সে সমস্ত প্রাসাদের অনেকগুলিই লুপ্ত হয়ে গেছে—তাঁর নিজস্ব নির্ম্মিত চেহেল-সেতুন, ট্যাঁকশাল সবই নষ্ট হয়ে গেছে। উপস্থিত সহরের রূপ দেখ্‌লে মনে হয়, বাস্তবিক এক কালে কি সুন্দর মূর্ত্তি ছিল এর! শোনা যায়, তখন মহানগরী বল্‌তে মুর্শিদাবাদই নাকি ছিল প্রথম। কিন্তু আজ সে নিজামত কেল্লাও নাই, সে জনসংখ্যাও নাই।

জাহানকোষা তোপ একটী অপূর্ব্ব বিস্ময়! মুর্শিদাবাদ সহরের পূর্ব্বদিকে একটী শুষ্ক নদীর তীরে এক পুরাতন বৃহৎ অশ্বত্থ-বৃক্ষের গুঁড়িতে সংলগ্ন লৌহ-নির্ম্মিত একটী বৃহদাকার তোপ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তাকেই স্থানীয় লোকেরা বলে "জগজ্জয়ী" বা "জাহানকোষা"। এই তোপটী যে বহু পুরাতন ও দেশীয় কর্ম্মকারের হস্তে প্রস্তুত, তাতে অবিশ্বাস কর্‌বার কিছু নেই। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১২।১৩ হাত, মাঝখানের বেড় প্রায় ৩ হাত। উপস্থিত গাছের গুঁড়িতে এমন আটক পড়েছে যে, গাছটী না কাট্‌লে ওকে নাড়াবার সাধ্য নেই। স্থানীয় লোকেরা, কি হিন্দু কি মুসলমান, ওই তোপটীকে পূজা করে। তোপের মুখে হিন্দু স্ত্রীলোকেরা সিঁদুর দিয়ে যে পূজা করে তার চিহ্ন দেখা গেল।

যেখানে তোপটী রয়েছে, সেখানে পূর্ব্বে নাকি নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর একটী অস্ত্রাগার ছিল এবং অস্ত্রাগারটী ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার সময়েও অস্ত্রশস্ত্র স্থানান্তরিত কর্‌বার সময়ে জাহানকোষার এইরূপ দুর্দ্দশা হওয়াতে তাকে ওইখানে ফেলে' রেখে' যেতে হয়। সেই থেকে এটা লোকের আশ্চর্য্য ব্যাপার হয়ে' পড়ে' রয়েছে।

মুর্শিদকুলী খাঁর আর এক কীর্ত্তি কাট্‌রা মসজিদ। উপস্থিত তার অবস্থা অতি শোচনীয়। জাহানকোষার নিকটেই সহরের উত্তরপূর্ব্ব কোণে ওই মস্‌জিদ্‌টী তার ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত কঙ্কালটীকে নিয়ে' উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। বাঙলার মাটীতে বলে'ই বোধ হয় এত শীঘ্র এটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে; নতুবা ওর অপেক্ষা অনেক পুরাতন মসজিদ U. P.-তে বা ভারতের অন্যান্য স্থানে এখনও অটুট অবস্থায় রয়েছে। ঐতিহাসিকদের মতে, কাট্‌রার মসজিদ নাকি স্থানীয় বাড়ীঘর, মন্দির ভেঙ্গে, তার পুরাতন ইট-কাট নিয়ে' নির্ম্মিত হয়েছিল,

জাহানকোষা তোপ

বোধ হয় সেই জন্যই এত শীঘ্র মসজিদটী ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। মসজিদটীর অবস্থা এমন হ'লেও তার পরিধি যথেষ্ট বড়, গম্বুজ ও মীনারগুলি ভাঙ্গাচুরা অবস্থায় পড়ে' থাক্‌লেও সহজেই অনুমান করা যায় যে, সে সময়ে কাট্‌রা মুর্শিদাবাদের একটী অপূর্ব্ব, সৌন্দর্য্যময় সম্পদ্ ছিল। দেয়ালের গাত্রে যে সমস্ত মূল্যবান্ কারুকার্য্য ছিল, দু'-এক স্থানে তার চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। যে বিশাল অঙ্গন এক কালে সহস্র সহস্র ধর্ম্মভীরু মুসলমান ঈশ্বরের কাছে তাদের প্রার্থনা জানিয়ে' গেছে, আজ সেখানে আগাছা জন্মে' গেছে। এখন সেখানে আর কেউ ভীড় করে না।

তাই নগরের কোলাহল থেকে দূরে স্তব্ধ এক পল্লীর প্রান্তে কালের নিষ্ঠুর পরিহাসের কাছে মাথা নীচু করে' নিতান্ত অযত্নে ও অবহেলায়, কাট্‌রা তার বিশাল রূপটী নিয়ে' ধ্বংসের পথে এগিয়ে' যাচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে' মসজিদে প্রবেশ কর্‌তেই, দেউড়ী থেকে দেখ্‌তে পাওয়া গেল, সামনের খিলানের উপর একটী পাথরের গাত্রে ফার্সীতে লেখা—"আরবের মহম্মদ উভয় জগতের গৌরব; যে লোক তার দুয়ারের ধূলা নয়, তার মাথায় ধূলার বৃষ্টি হোক।"

কাঠগোলায় আমরা কয়জন

সিঁড়ির কোলে মুর্শিদের সমাধি—বনপ্রান্তে, শান্তি ও স্তব্ধতার মধ্যে কূট বিচক্ষণ নবাবের শায়িত দেহ—নিষ্প্রাণ নির্লিপ্ত—দু' শ' বৎসর কেটেছে, আরও কত শত বৎসর কাটবে—নবাবের কিন্তু ঘুম ভাঙ্‌বে না। ভাঙ্‌লে, বোধ করি, কাট্‌রা মসজিদের এমন অবস্থা হ'ত না। আগ্‌রা, দিল্লীতে কিন্তু দেখেছি, কার্জ্জনের "Indian Monuments Preservation Act"-এ বহু মোগল-কীর্ত্তি repair করা হয়েছে কিন্তু কাট্‌রা মসজিদের প্রতি কেন যে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়ে নি বুঝ্‌তে পার্‌লাম না!

১৭২৫ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদের স্থাপয়িতা নাজিম মুর্শিদকুলীর মৃত্যু হ'লে, তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন মহম্মদ খাঁ বাঙলার মস্‌নদে বস্‌লেন। সুজাউদ্দিন খুব বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান নবাব ছিলেন, তিনি হিন্দুদের সহিত বেশ সদ্ব্যবহার কর্‌তেন—তাঁর শাসনপদ্ধতিও অতি সুন্দর ছিল। মুর্শিদকুলীর দ্বারা প্রপীড়িত জমিদারগোষ্ঠির উপর তিনিই প্রথম সুদৃষ্টি দেন এবং তাঁদের রাজস্বের পরিমাণ ঠিক করে' দেন। রাজকার্য্য-পরিচালনার সুবিধার জন্য তিনি এক মন্ত্রিসভা গঠন করেন; তার সভ্যগণের মধ্যে জগৎ শেঠ ও আলিবর্দ্দীর নাম উল্লেখযোগ্য।

সুজাউদ্দিনের কীর্ত্তির মধ্যে তাঁর নিজস্ব প্রাসাদ (চেহেল-সেতুন) নহবৎখানা, ত্রিপলিয়া তোরণ, আয়না-মহল, কাছারী বাড়ী, ফার্মান বাড়ী ও বিখ্যাত আস্তাবল। নহবৎখানা, ত্রিপলিয়া, আস্তাবল প্রভৃতি কয়েকটা এখনও মুর্শিদাবাদ সহরে ভগ্নাবস্থায় দেখ্‌তে পাওয়া যায়, বাকীগুলি সমস্ত নষ্ট হয়ে' গেছে। ওই সমস্ত 'বিল্ডিং'-এর আয়তন দেখ্‌লে সহজেই অনুমান করা যায়, অর্থের দিকে তখনকার নবাবদের কিরূপ স্বচ্ছল অবস্থা ছিল। এ ছাড়া, সুজাউদ্দিন এত সৌখীন ও বিলাসপ্রিয় নবাব ছিলেন যে, অনেক রকম বিলাস-দ্রব্য ও উদ্যানবাটী তিনি নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। গঙ্গার অপর পারে ডাহপাড়ার মসজিদটী সুজাউদ্দিন নির্ম্মাণ করেন।

নবাব সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর, ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁ নবাব হলেন; কিন্তু অন্য সমস্ত রাজ-কর্ম্মচারীর ষড়যন্ত্রের ফলে এক বৎসরে মধ্যে আলিবর্দ্দীর সহিত গিরিয়াতে এই নূতন নবাবের এক ভীষণ সংঘর্ষণ ঘটে, যার ফলে তাঁর পরাজয় ও মৃত্যু হয়। বিজয়ী আলিবর্দ্দী সরফরাজকে পরাস্ত করে' মুর্শিদাবাদে ফিরে এসে', নবাবী সিংহাসন অধিকার করে' বাঙলার শাসনভার গ্রহণ কর্‌লেন। ষড়যন্ত্র করে' ও পাপাশ্রয়ে অযোগ্য নবাব সরফরাজকে অপসৃত করে' সিংহাসন লাভ কর্‌লেও আলিবর্দ্দী খুব বিচক্ষণ, কূটবুদ্ধি ও উপযুক্ত নবাব ছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনিই প্রথম বাঙলাকে মোগল বাদশাহের অধীনতা থেকে মুক্ত করেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই মোগলশক্তি ক্ষীণ হয়ে' আস্‌তে, নবাব বাদশাহকে রাজস্ব দেওয়া এক রকম বন্ধ করেছিলেন বল্‌লেই হয়। তিনি স্বাধীনভাবে বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকার্য্য

অতি সুন্দরভাবে পরিচালিত করেছিলেন এবং তাঁর শাসন পদ্ধতি শোনা যায়, অতি উচ্চ ধরণের ছিল।

মুর্শিদাবাদে নবাবদের প্রতিপত্তি ছাড়া আর একটী বংশের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁরা হলেন বিখ্যাত শেঠবংশ,
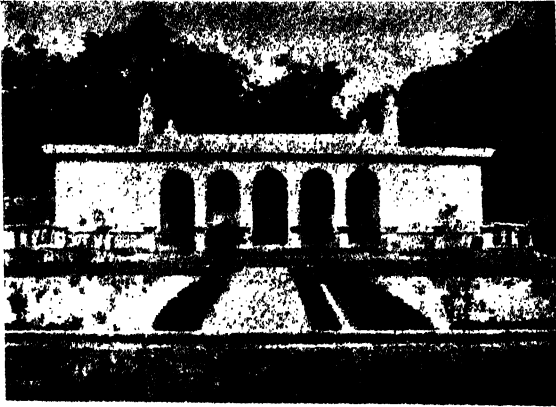
সিরাজ-সমাধি

যে বংশে জগৎ শেঠ বাঙলার ইতিহাসে বেশ খানিকটা কালী ঢেলে' দিয়ে' সাত সমুদ্রের পারে নাম করেছিলেন। এই অসাধারণ ধনি-পরিবারের বিকাশ মুর্শীদকুলীর রাজত্ব থেকে। স্বয়ং বাদশাহের সঙ্গে তাঁদের আদানপ্রদান চল্‌ত। কাঠগোলা যেতে তাঁদের প্রাসাদ আজও চোখে পড়ে। আলিবর্দ্দীকে তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে অর্থ-সাহায্য করেছিলেন; কিন্তু তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে জগৎ শেঠ অভূতপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন, যার ফলে সকলেই জানেন, সিরাজের কি পরিণাম ঘটেছিল।

যাই হোক, প্রায় ১৬ বৎসর স্বাধীনভাবে রাজত্ব করে' বৃদ্ধ আলিবর্দ্দী ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ কর্‌লেন। তখন বাঙলার মসনদ নিয়ে বড় বড় রাজকর্ম্মচারীদের ভিতর বেশ একটা ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হচ্ছিল; সেই রকম অবস্থায় সিরাজদ্দৌলা মাতামহের সিংহাসনে বস্‌লেন। মাত্র বিশ বৎসর বয়স্ক, সরলমতি, সুপুরুষ সিরাজ স্নেহপরায়ণ মাতামহের শেষ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করে,' সমস্ত বিলাস প্রমোদ পরিত্যাগ করে রাজ্যশাসনে মন দিলেন। তিনি ফিরিঙ্গী বণিক্‌দের অন্যায় অত্যাচার সহ্য না কর্‌তে পেরে কতকগুলি কঠোর আদেশ দিয়েছিলেন, যার ফলে তাঁর চরিত্রে অযথা দোষারোপ করে' ঐতিহাসিকেরা তাঁকে ইতিহাসে পর্য্যন্ত নেহাৎ অসহায় অবস্থায় স্থান দিয়ে' রেখেছেন।

এ সত্য যে, আলিবর্দ্দী দৌহিত্রকে যথেষ্ট আদর ও প্রশ্রয় দিয়েছিলেন এবং সাধারণ নবাব বা ধনি-পরিবারের যুবকেরা যা' প্রায় করে' থাকে, সিরাজও সেই রকম আমোদপ্রমোদ যথেষ্ট করেছিলেন; কিন্তু যে যুবক মাতামহের মৃত্যুশিয়রে বসে মদ্যত্যাগের শপথ করে, তাকে মানুষ হিসাবে নিতান্ত মন্দ বলা যায় না। ঐতিহাসিক পটে যা' পাওয়া যায়, তাতে সিরাজের রাজকার্য্য-পরিচালনায় সুতীক্ষ্ণ ও ভবিষ্য-

মুর্শিদাবাদের একটি বহু পুরাতন বট বৃক্ষ

দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। যা' হোক, সিরাজের রাজত্ব বা চরিত্র নিয়ে আমি এ ক্ষেত্রে কোন আলোচনা কর্‌তে চাই না, বরঞ্চ যাঁরা ও বিষয়ে কৌতূহলী তাঁরা ৺অক্ষয় মৈত্রেয় মহাশয়ের "সিরাজদ্দৌলা-খানি" আরেক বার পড়ে' নিতে পারেন।

স্বাধীন বাঙলার শেষ নবাব সিরাজের মৃত্যুর কাহিনী আমাদের মনে বড় আঘাত দিয়েছিল, সেইজন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেও একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভাগীরথী পার হয়ে' সিরাজের সমাধি দেখ্‌বার জন্য খোশবাগে উপস্থিত হই। অতি সাধারণ একটা প্রাচীর-ঘেরা খোশবাগের উদ্যানের মাঝে নবাব আলিবর্দ্দীর সমাধির পাশে নিতান্ত সাধারণ একটা প্রস্তরখণ্ডের তলায় শায়িত সিরাজের ছিন্নবিচ্ছিন্ন মৃতদেহ। হায়, হতভাগ্য সিরাজ! তোমার ভাগ্যে একটা শ্বেতপাথরও জোটে নি, যা' সবারই ভাগ্যে জুটেছে? সিরাজের সমাধির পাশে তার প্রিয়তমা বেগম লুৎফউন্নিসার

খাগড়ার বিখ্যাত পিতলের রথ

সমাধি—কি চমৎকার মিলন! দেখে' মনে পড়্‌ল, সুদূর যমুনার তীরে তাজমহলের নীচে মমতাজ ও সাজাহানের সমাধি দুটী। তাঁদের মিলনে ব্যথা ঘনিয়ে উঠেনি; কিন্তু এখানে প্রিয়তম স্বামীর দুর্দ্দশায় লুৎফউন্নিসার প্রাণ ব্যথায় জর্জ্জরিত হয়ে গেছ্‌ল।

চতুর্দ্দিকে বিরাজিত স্তব্ধতাকে অল্প একটু নাড়াচাড়া দিয়ে' আমরা সমাধিক্ষেত্রে প্রবেশ করলাম। সমাধি-কক্ষের এক কোণে একটা প্রদীপে আলো জ্বল্‌ছে চিরসুপ্ত সমাধিস্থ আত্মাগুলিকে অন্ধকারে পথ দেখাবার জন্য। ওই কক্ষের ভিতর আরও কয়েকটা সমাধি রয়েছে; কিন্তু কাহারও উপর একটি চিহ্নও জোটে নি। উদ্যানের ভিতর বৃক্ষের তলায় আরও কয়েকটা কবর পড়ে' রয়েছে অচিহ্নিত ও যত্নহীন অবস্থায়। জনমানবহীন খোশবাগ হ'তে বেরিয়ে এসে' দেখি, রাত্রি হয়ে' এসেছে—পথের উপর পড়েছে চাঁদের আলো, ওপারে লালবাগের কুটীরে কুটীরে আলো জ্বালা হয়েছে। অতএব আমরা দেরী না করে নদী পার হবার জন্য নৌকায় গিয়ে' উঠ্‌লাম।

মুর্শিদাবাদ সহরের উত্তর মুখে যেতে জাফরাগঞ্জে সিরাজের বধ্যভূমি একটা ভগ্নপ্রায় বাড়ী দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তাকে স্থানীয় অধিবাসীরা বলে "নেমকহারামী দেউড়ী"। ওইখানে নবাব-বংশের একটা বিস্তৃত সমাধিক্ষেত্র আছে—প্রায় প্রত্যেকটী শ্বেতপাথরের এবং প্রত্যেকটীতে শ্বেতপাথরের tablet-এর উপর মৃতের নাম লিখিত আছে। এই জাফরাগঞ্জে মীরজাফর বাস কর্‌তেন। তাঁর প্রাসাদের দেউড়ী ভিন্ন সবই প্রায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে।

সিরাজদ্দৌলার পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে পলাশীর যুদ্ধে বাঙলার স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হলেন। তারপর, ইংরাজদের অধীনে মীরজাফর মুর্শিদাবাদে নামে মাত্র নবাব হ'লেন। তাঁর দ্বারা মুর্শিদাবাদের বিশেষ কোন উন্নতি হয়েছিল তা শোনা যায় না। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে, এই মীরজাফরকেও ইংরাজেরা সিংহাসন থেকে সরিয়ে তাঁর জামাতা মীরকাসেমকে নবাবী পদে অধিষ্ঠিত করেছিল। তখনও পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদের খ্যাতি ছিল; কিন্তু নূতন নবাব অবশ্য ঘটনাচক্রে বাধ্য হয়ে রাজমহলে তাঁর রাজধানী তুলে' নিয়ে' গেলেন এবং সেখানে বাঙলাকে পুনর্ব্বার স্বাধীন কর্‌বার জন্য গোপনে প্রস্তুত হতে লাগ্‌লেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছিল—বক্সার যুদ্ধে, ইতিহাসে তা দেখতে পাই।

এর পর যেদিন থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ক্লাইভ্‌কে শাসনকর্ত্তা করে' কলিকাতায় নিজেদের রাজধানী গড়তে লাগ্‌ল, সেইদিন থেকে মুর্শিদাবাদ চিরতরে বাংলার ইতিহাস থেকে বিদায় নিল।

এই অপূর্ব শত বৎসরই হ'ল মুর্শিদাবাদের ইতিহাস। উপস্থিত এটা নবাবদের জমিদারীর অন্তর্গত মাত্র।

বর্ত্তমান নবাবদের অধুনা নির্ম্মিত প্রাসাদ দেখ্‌বার সৌভাগ্যও আমাদের হয়েছিল। গঙ্গার ধারে বিশাল পরিধির ভিতর একটী প্রকাণ্ড ত্রিতল প্রাসাদ, হাজারটা নাকি তার দরজা তাই লোকে বলে হাজারদোয়ারী, ইমামবাড়ী, ক্লক্‌-টাওয়ার প্রভৃতি নদীর শোভা বর্দ্ধন করে' দাঁড়িয়ে আছে। উপস্থিত সমস্ত estateটী কোর্ট অফ্‌ ওয়ার্ডসের অধীনে। আমরা দপ্তর থেকে পাস নিয়ে প্রাসাদে প্রবেশ কর্‌লাম। দ্রষ্টব্যের মধ্যে কোর্ট-হল, অস্ত্রাগার ও বহুসংখ্যক তৈলচিত্র ও ভাস্কর্য্য। তৈলচিত্রগুলি (Oil-painting)s অতি মূল্যবান্, তার মধ্যে পৃথিবীর বহুস্থানের বিখ্যাত শিল্পীর হাতের পরিচয় পাওয়া যায়। ত্রিতলের উপর সমস্ত নবাবদের চিত্র-সমাবেশ একটী সুন্দর আর্ট-গেলারী আছে, তার মধ্যে দর্শক আলিবর্দ্দী, সিরাজ ও মীরকাসেমের কয়েকটী দুষ্প্রাপ্য ছবি দেখ্‌তে পাবেন। প্রাসাদের ত্রিতলে আর একটী দ্রষ্টব্য নবাব-বংশের একটী অমূল্য গ্রন্থাগার। বহু পুরাতন ও দুর্লভ কোরাণ ও উর্দ্দু পুস্তক এখানে রয়েছে। মোটের উপর, নবাব-বাড়ীতে যে শিল্প ও সাহিত্যের বেশ 'কাল্‌চার' ছিল তা হাজারদোয়ারীটা ঘুর্‌লে বেশ বোঝা যায়। এ ছাড়া অনেক সুন্দর সুন্দর আস্‌বাব-পত্র ত আছেই; তার মধ্যে হাতীর দাঁতের পাল্কী, গাড়ী, এই সব উল্লেখযোগ্য।

সহরের পূর্ব্বদিকেও সিরাজের প্রিয় হীরাঝিল ভগ্নপ্রায় অবস্থায় পড়ে আছে! ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাসাদের কোলে ঝিল শুকিয়ে গেছে, কিন্তু নামটা এখনও যায় নি। এই হীরাঝিল মুর্শিদাবাদের শোভা বাড়াবার সিরাজের অন্যতম অবদান। সিরাজ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হ'বার সময়ে, স্নেহবৎসল মাতামহের সাহায্যে হীরাঝিলে একটী সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন এবং সেই প্রাসাদেই নিজেকে ভোগবিলাসে ডুবিয়ে রাখ্‌তেন। কিন্তু হতভাগ্য সিরাজের ভাগ্যে তা' বেশীদিন সহ্য হ'ল না। যৌবনের মাঝে বিশ বৎসর বয়সেই তাঁকে কালের নিয়তি গ্রাস করে' নিল।

মুর্শিদাবাদ থেকে বহরমপুর আস্‌তে যে পথ অনুসরণ কর্‌তে হয়, সেই পথের একধারে মহারাজ নন্দকুমারের বাটী ভগ্নপ্রায় অবস্থায় পড়ে' আছে—ভবিষ্যৎ বাঙলার কাছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবার জন্য। সে রাত্রে ফেরার পথে ওই ভগ্ন অট্টালিকার দেউড়ী থেকে প্রদীপের আলো গড্ডলিকার ভিতর আমাদের চোখে এসে লাগ্‌ল। চলন্ত গড্ডলিকার অশ্বক্ষুরের শব্দের সঙ্গে আমাদের মনে দেড়'শ' দু'শ' বৎসরের পূর্ব্বেকার কত কথাই না মনে পড়ল! ওই স্মৃতিবিজড়িত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বৃক্ষচ্ছায়ে-ঘেরা পথের উপর দিয়ে যেতে কত কথাই না মনে এল! মনে পড়্‌ল সিরাজের সেই করুণ সুন্দর মুখখানি, যখন মীরণ তাকে বন্দী করে' নিয়ে' এল, মনে পড়্‌ল লুৎফউন্নিসার সজল আঁখি, সিরাজের ক্ষিপ্ত-বিক্ষিপ্ত মৃতদেহ মুর্শিদাবাদের পথে হস্তিপৃষ্ঠে উন্মত্ত শত্রুদলের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করছে, মনে পড়্‌ল পুত্রপরিবারসহ অযোধ্যার নবাব-প্রাসাদে আশ্রিত মীরকাসেমের কথা। তারা বুঝেছেল, তারা ভবিষ্যৎকে জান্‌তে পেরেছিল, তাই তাদের এই লাঞ্ছনা!

আমাদের গাড়ী এতক্ষণে কাশিমবাজারে এসে পড়েছে। এই কাশিমবাজারে প্রথম ইংরাজরা এদেশে এসে' নীলকুঠি স্থাপন করে—সেও একটা ইতিহাসের অধ্যায়। অবান্তর না হ'লেও, যাক্ এসব কথা, আমরা খাগ্‌ড়ায় 'হোষ্টের' গৃহ-দ্বারে এসে পড়েছি।

অতিথি-সেবক সাধনবাবু জিজ্ঞেস কর্‌লেন—"কেমন দেখ্‌লেন সব?" উত্তর দিলাম "হ্যাঁ দেখ্‌লাম সব, কিন্তু দেখার চেয়ে ভাব্‌লাম বেশী।"

মনে রেখ'

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

পথের মাঝে নাম্‌লে আঁধার
হতাশ প্রাণে দাঁড়িও না।
চলার পথে আশার আলো
শেষ-সাথীরে হারিও না।

পথের শেষে আস্‌বে কি না—
রেখো না এ ভাবনা প্রাণে।
কাজের ভারই তোমার হাতে,—
ফলাফল যে ভগবানে।
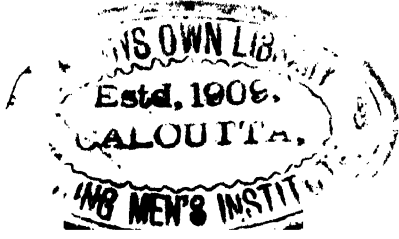
নিরাপদ্

(গল্প)

শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

হরেনের জীবনে আজ সত্যই সেদিন এল। মানুষের জীবন—অপ্রত্যাশিত ঘটনার বৈচিত্র্য তাতে কিছু অস্বাভাবিক নয়। একদিন যা থাকে স্বপ্ন সম্ভাবনার আকাশে, হঠাৎ আর একদিন তা-ই ফুটে' ওঠে সত্য-রূপে।

এই ত পাঁচ বছর আগেকার কথা। আই, এস্-সি 'পাস' করে' হরেন যখন এক মাড়োয়ারী কয়লা-ব্যবসায়ীর কল্‌কাতা আফিসে মাত্র পঁচিশটি টাকা মাইনেতে চাকরী সুরু করে' দিল, তখন পাড়ার অনেকেই অবাক্ হয়ে গেল। সকলেই জান্‌ত, ওর বাবা মৃত্যুর সময়ে যা' রেখে গেছেন, তাতে ওর জীবনে বিশেষ কোন কষ্ট হবে না। এ রকম ধারণা নিছক অমূলক নয়। হরেনের বাবা ছিলেন যেমন সদ্-বংশের ছেলে, তেমনি অধ্যবসায়ী। এক সাহেবের কয়লার খনিতে সামান্য কাজ করতে গিয়ে নিজেই একদিন কয়লার কারবার খুলে' বসেছিলেন। কিন্তু ঠিক উন্নতির মুখেই হঠাৎ তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল। তখন হরেন মাত্র আট বছরের ছেলে। তার বিধবা মা স্বামীর যথাসর্ব্বস্ব বিক্রী করে' যা' পেলেন ব্যাঙ্কে রেখে ছেলের দিকে চেয়ে দিন কাটাতে লাগ্‌লেন। লোকে যাই ভাবুক, হরেন জান্‌ত, সেই জমানো টাকা যৎসামান্য। মার সুবিবেচনায় যদিও সুখে দুঃখে তাদের এতদিন কেটে গেছে, কিন্তু সেই ক'টি টাকার ভরসায় আর পড়াশোনা করা যায় না। জীবনে আপদ্-বিপদের অন্ত নেই! বন্ধু সুবোধ এসে রাগ করে' বল্‌ল, বি, এস-সি'টা পড়্‌লে কি ক্ষতি হ'ত?

হরেন মুচ্‌কে' হেসে' জবাব দিল, বিশেষ কি লাভ হ'ত আগে শুনি?

—আর কিছু যদি লাভ নাও হয়, তবু বিদ্যের একটা মান ত' আছে। হরেন বল্‌ল, বাবার আফিসে বড় সাহেবের খাস কামরায় চাকরী পেয়েছ, তোমার মুখেই বিদ্যের জন্যে মায়াকান্না শোভা পায় বটে! মান-মান বল্‌ছ—আজকাল বিদ্যের আর মান নেই, মান আছে টাকার।

সুবোধ রুক্ষতার ভাণ করে' বল্‌ল, মাসে পঁচিশটি টাকা উপায় করে' ক' লাখ টাকার মালিক হবে শুনি?

—ঐত' হয়েছে দোষ। জীবনে রাতারাতি সোণার খনির সন্ধান কেউ কখন পায় কি? সকলকেই একদিন ছোট থেকে সুরু কর্‌তে হয়। কিন্তু সেই ছোট থেকেও চেষ্টা করলে বড় হওয়া অসম্ভব নয়।

—কি রকম?

—কেন, আমার বাবার ছিল কয়লার কারবার। ধর, আমি যদি আজ এই আফিসে কাজ করে' কয়লার ব্যবসা ভাল করে' বুঝে নিতে পারি, তা'হ'লে নিজেই ত' একদিন কাজ সুরু করে দিতে পার্‌ব। সেই আশাতেই ছুঁচ হয়ে ঢুকেছি, বুঝলে?

মাকেও হরেন এই কথাই বুঝিয়েছিল। মা সন্দেহ প্রকাশ কর্‌লে জবাব দিয়েছিল, পার্‌ব না কেন? বুকে সাহস রয়েছে, মাথায় রয়েছে বুদ্ধি, তা'ছাড়া বাবার স্মৃতি দেবে উৎসাহ। তবু পার্‌ব না কেন, শুনি? আমরা হচ্ছি কোকিলের বাচ্ছা, কাকের বাসায় মানুষ হয়ে' নিয়ে' দেখ্‌বে, ঠিক সময়ে নিজের বাসাতেই ফিরে' আস্‌ব।

মা জবাব দিয়েছিলেন, হ্যাঁরে খোকা, ব্যবসা শুধু শিখে' নিলেই বুঝি ব্যবসা করা চলে? টাকার দরকার নেই?

—টাকার আবার দরকার নেই, মা? কিন্তু ব্যবসা যদি শিখে' নিতে পারি, দেখ্‌বে তখন টাকা কত জায়গা থেকে আপনি এসে' হাজির হবে। তা' আজ আমরা হয়ত স্বপ্নেও কল্পনা কর্‌তে পার্‌ব না।

ছেলের একাগ্রতায় মার বুকে জাগে উৎসাহ। কিন্তু তবু পঁচিশটি টাকা বেতন—এই নিয়ে মনের গ্লানি আর ঘুচ্‌তে চায় না। বলেন, বরাতে এতও ছিল? শেষে তুই কি না কর্‌বি পঁচিশ টাকার চাকরী, খোকা! উনি আজ বেঁচে থাক্‌লে—।

স্মৃতির আবেগে মা কথা শেষ কর্‌তে পারেন না। হরেন সান্ত্বনার স্বরে একটু হেসে' বলে, পঁচিশটি টাকা পাব বলে'ই ত মনে আরও উৎসাহ পাচ্ছি, মা। আরামের লোভে যখনই মন অন্য কোন খেয়ালে উড়ে যাবে, তখনই মনে পড়্‌বে, আমি পঁচিশ টাকার কেরাণী। নিয়ত এই কথাই মনে ভেসে' উঠ্‌বে, যে কেরাণীগিরি যদি জীবনের শেষ সম্বল করি ত', এম্নি আয় বরাবর থেকে' যাবে। এ আমার উদ্দেশ্য নয়—বরং উদ্দেশ্য সফল করার একটা উপায় মাত্র।

তারপর, দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাঁচ বছর কেটে গেছে ঘূর্ণ্যমাণ কালের কবলে। হরেনের জীবনে ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে। বছর দুই হ'ল মা মারা গেছেন। কিন্তু হরেনের পক্ষে তার চেয়েও বড় খবর এই যে, বছর আড়াই হ'ল সে মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের কয়লার আফিস ছেড়ে' দিয়ে' এক ইংরেজ বণিকের কাজে যোগ দিয়েছে। মাইনে একেবারে চতুর্গুণ। তাদের কাজ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির। অবশ্য মার এতে মত ছিল না। মা বলেছিলেন, খোকা বেশী টাকার লোভে কয়লার আফিস ছেড়ে' দিয়ে' কাজ নেই। আর কিছুদিন মুখ বুজে' থেকে' কাজটা বেশ করে' শিখে' নিয়ে' তুই নিজেই একটা আফিস খুলে' বস্ না কেন?

হরেন জবাব দিয়েছিল, তাইত' ইচ্ছে ছিল, মা। সে আশায় আজ আড়াই বছর ধরে' হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটে কাজ শিখে নিয়েছি। মনিবের সমস্ত কাজ একা আমাকেই এখন দেখ্‌তে হয়। কিন্তু শুধু কাজ শিখে নিয়ে' কি হবে, যদি না মেলে পুঁজি? আজ ছয় মাস কত ঘোরাঘুরি কর্‌লুম, কিন্তু আমার মতন ছেলেমানুষের হাতে কেউ টাকা বিশ্বাস করে' দিতে চায় না।

মা মুচ্‌কে' হেসে' বলেছিলেন, তা' ইংরেজ বেণের বাড়ীতে কাজ করে' কি হবে, সে দেবে তোকে পুঁজি?

হরেন রুখে' দৃঢ়স্বরে বলেছিল, নিশ্চয়ই দেবে।

—সে বরং নেবে তোকে দিয়েই তোর দেশের রক্ত চুষে'।

হরেন ছল-ছল চোখে জবাব দিয়েছিল, না মা, আমি সে দিক্ থেকে বলি নি। তার কাছে যা' মাইনে পাব, ধর সেই এক শ' টাকার মধ্যে চল্লিশটি টাকা খরচ করে' মাসে মাসে যদি ষাটটি টাকা জমাতে পারি, বছর পাঁচেকের মধ্যে কয়লার কাজ সুরু করার মত যা'-হোক কিছু পুঁজি জম্‌বেই ; তারপর আমায় পায় কে!

কিন্তু টাকা বিশেষ জমে নি। নতুন আফিসে যাওয়ার পর থেকে আয়ের তুলনায় একটির পর একটি করে' খরচও অনেক বেড়ে গেছে। দুঃখের নিরুপায়তার মধ্যে থাকে অনুভূতির তাপ-বেগ। আঘাতের মধ্যে আছে জীবনের গতিশীলতা। মানুষের মন নিরন্তর চায় নিশ্চেষ্ট আরামের আলস্য। তাই অল্পমাত্র অবসর পেলেই যে আর স্থির থাকৃতে পারে না। তারপর একটির পর একটি আসে আরামের উপকরণ—দিন-দিন বেড়ে যায় বিলাসের বাসনা। দুঃখের দীর্ঘ পীড়নে ক্লান্ত হরেনের মন অল্পমাত্র আর্থিক স্বচ্ছলতার পরিবেষ্টনে অলস হয়ে' পড়েছিল। তবু আগেকার সঙ্কল্পের কথা স্বর্গীয় মায়ের অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার কথা সে ভুল্‌তে পারে নি। টাকা আর তার জমান হয় না। কিন্তু আগেকার অভ্যাস-বশে টাকা জমাবার উদ্বেগ এখনও মনের মধ্যে আছে জেগে স্তিমীয়মান প্রদীপশিখার মত।

মোটের উপর, এ ক'বছর হরেনের সুখেই কেটেছে। ঘরে নব-পরিণীতা তরুণী স্ত্রী। বছরখানেক হ'ল, বিবাহ হয়েছে। বিভা ছিল জীবনের কোন্ অজানা কোণে। হঠাৎ একদিন এল চিরপুরাতনের সম্বন্ধ নিয়ে—একেবারে হরেনের জীবনের সব-চেয়ে মধুরতম আসনটী নিল অধিকার করে'। সঙ্গে সঙ্গে হরেনের তৃষিত জীবনে নেমে' এসেছিল কামনার বন্যা। ও বিভাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে, কি নরম, তুলোফুলে তোমার শরীর! বনের মধ্যে কুঁড়ে ঘরে ছিলুম একা, তুমি নেমে' এলে কোন্ চাঁপা-বনের ভেতর থেকে অজানা দেশের রাজকন্যে। কিন্তু তোমার সঙ্গে আস্‌ত যদি অর্দ্ধেক রাজত্ব!

স্বামীর বুকের মধ্যে মাথাটাকে এলিয়ে দিয়ে বিভা বলে, বিয়ে করেছ গরীব কেরাণীর মেয়েকে, অর্দ্ধেক রাজত্ব পাবে কেমন করে' ?

হরেন বলে, তা'হোক, কেরাণীর বরাতে জুটেছে কেরাণীর মেয়ে। সেই ত' তার রাজকন্যে। কিন্তু লোকে বলে, স্ত্রীভাগ্যে ধন। দেখ্‌বে, এমন লক্ষ্মীঠাকুরুণের মতন যার রূপ, সে কি আর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীর কৃপা না নিয়ে' আস্‌তে পারে ?

বিভা একটু অভিমানের স্বরে বলে, আচ্ছা, তুমি অত টাকা টাকা কর কেন বলত ?

হরেন বিস্ময়ের স্বরে জবাব দেয়, কেন ? টাকা ছাড়া আমাদের জীবন যে জীবনই নয়, বিভা। ছেলে বয়সে বাবা যখন বেঁচেছিলেন, তিনি প্রায়ই সন্ধ্যে বেলায় সাম্‌নের মাঠে চেয়ার পেতে' আমাকে কোলে বসিয়ে' গল্প কর্‌তেন। তাঁর জীবনে সখ ছিল বিলেত থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং শিখে' আসা। কিন্তু টাকার অভাবে সামান্য কেরাণীগিরি করে'ই তাঁকে জীবন স্থরু কর্‌তে হয়েছিল। তিনি বল্‌তেন, খোকা, তুই আমার সেই স্বপ্ন সফল কর্‌বি। আর একটু বড় হ'লেই তোকে বিলেত পাঠাব। তখন ছেলেবয়েসের মুক্তকল্পনায় কত স্বপ্নই না দেখ্‌তুম! তারপর হঠাৎ একদিন বাবা যখন মারা গেলেন আর তাঁর অংশীদারেরা দেনা দেখিয়ে' নিল তাঁর খনিগুলো নিলাম করে', তখন এই টাকার অভাবেই আমার জীবনের সব আশা কেটে'-ছেঁটে' নির্ম্মূল করে' দিতে হয়েছিল, জান্‌লে বিভা!

স্মৃতির বেদনায় হরেনের স্বর গাঢ় হয়ে' আসে। একটু থেমে' ও বলে' যায়, টাকার অভাবে যখন পড়া আর হ'ল না, বাধ্য হয়ে পঁচিশ টাকার কেরাণীগিরি স্থরু কর্‌লুম। মা কেঁদে' ফেল্‌লেন ; বললেন, তাঁর একদিনের খরচ যে পঁচিশ টাকার ঢের বেশী ছিল রে! শেষে তোর অদৃষ্টে এই ছিল, খোকা ? মার চোখ মুছিয়ে' দিয়ে' বল্‌লুম, তা' হ'লই বা! সবদিন ত' আর সমান যায় না। বাবার আদর্শ রইল আমার চোখের সাম্‌নে, দেখ্‌বে এ থেকেই গড়ে' তুল্‌ব পুঁজি, বাবার খনিগুলো আবার নেব কিনে'।

বিভা সহানুভূতির স্বরে বলে, বেশ ত', এবার থেকে তাই হবে আমাদের দুজনের চেষ্টা। তোমার সে দিনের সঙ্কল্পকে আমরা ফুটিয়ে' তুল্‌ব কাজে।

হরেন বলে, না বিভা, আর নিজেকে আমি বিশ্বাস কর্‌তে পারি না। এক মাড়োয়ারীর আফিসে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে' শিখেছিলুম কয়লার কাজ। দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রায় চার বছর কেটে চল্‌ল ; কিন্তু পুঁজির অভাবে কিছুই কর্‌তে পার্‌লুম না! আজ থাক্‌ত যদি হাজার দশেক টাকা—কেরাণীগিরির এই বদ্ধ আব্‌হাওয়ায় নিজেকে আর ক্ষয় কর্‌তুম না।

বহুদিন পরে আজ হরেনের সেই স্বপ্ন সত্য হ'ল। সকালে গ্রামের পিয়ন দিয়ে গেছে একখানা টেলিগ্রাম। বাঙালীর সংসারে টেলিগ্রাম পাওয়ার মত মর্ম্মান্তিক আকস্মিকতা আর কিছুই নেই। টেলিগ্রামখানা খুল্‌তে খুল্‌তে হরেনের হাত কাঁপ্‌তে থাকে। অজানা আশঙ্কায় বুক দুড়্‌-দুড়্‌ করে' ওঠে। সম্ভব অসম্ভব নানা বিপদের ভীরু কল্পনায় মন চঞ্চল হয়ে' ওঠে। একি ? একেবারে কল্পনাতীত! হরেনের প্রথমে বিশ্বাস হয় না। কিছুদিন আগে আফিসের একজন বাবুর অনুরোধ এড়াতে না পেরে' ও কিনে' ছিল একখানা লটারীর টিকিট, নগদ চারিটি আনা দক্ষিণা দিয়ে'। ও সে কথা প্রায় ভুলে'ই গেছ্‌ল। আজ চারটি আনার পরিবর্ত্তে এসে' হাজির হয়েছে কি অপ্রত্যাশিত, অসম্ভাব্য সংবাদ! কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে হরেন আর ভাব্‌তে পারে না। ওর মাথার মধ্যে একটা ঝিন্‌ঝিনে অবসাদ—একটা অসাড় স্তব্ধতা। ও স্থির হয়ে' দাঁড়িয়ে' থাকে—কয়েকটী স্তম্ভিত, নিঃশব্দ মুহূর্ত্ত। তারপর হঠাৎ-জাগা চৈতন্যের মত চঞ্চল হয়ে' ডেকে ওঠে, বিভা, বিভা, শুনছ ? মানুষের জীবনে এও কি হয় ?

বিভা ত্রস্ত হয়ে দৌড়ে' এসে' বলে, কি, কি ? তোমার হ'ল কি ? হরেন ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করে' চেয়ে' বলে, চারটি আনার বদলে একেবারে পঁচিশ হাজার।

দিন যতই প্রখর হ'তে থাকে, ওর মাথার মধ্যে রাজ্যের চিন্তা ততই হুটোপাটি স্থরু করে' দেয়। ওর মনে পড়ে

পাঁচটি বছর আগে কেরাণী-জীবনের সেই প্রথম প্রভাতের দিনগুলি। ছোট্ট, অন্ধকার ঘরের ভিজে, ঝাপ্‌সা বাতাস, —যেন আরামে একটা নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত নেওয়া যায় না। তার মধ্যে বসে' দিনের পর দিন সকাল দশটা থেকে রাত আটটা পর্য্যন্ত এক-ঘেয়ে হিসাবের রেখাপাত। পঁচিশটি টাকার একটি পয়সা বাঁচাবার জন্যে কি উদ্বেগ—কি মায়া! হরেন জোরে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে' পরম স্বচ্ছন্দতা অনুভব কর্‌ল। আজ সে মুক্ত, স্বাধীন, স্বাবলম্বী! মাসের শেষ তারিখটির আশায় পরের দিকে চেয়ে তাকে আর থাকতে হ'বে না। আজ সে সাধারণ জীবনের অনেক বাঞ্ছিত কামনা অনায়াসে মেটাতে পারে। কিন্তু হরেনের সব-চেয়ে বড় ভাবনা—এতগুলো টাকা নিয়ে' কি কর্‌বে সে? সহরে একখানা বাড়ী কিন্‌বে, তাতে থাকবে ছোট্ট একটি ফুলের বাগান। সকাল বিকাল তার মধ্যে বসে' সে অনুভব কর্‌বে প্রকৃতির নিবিড় স্পর্শ। কল্‌কাতার উপকণ্ঠে এই ছোট গাঁয়ে থাকা ত' ভদ্রলোকের আর পোষায় না! এর বাইরের জীবনে আছে বটে একটা নাগরিক মুখোস, কিন্তু অন্তর্জীবনে এখনও সেই পল্লী-গ্রামের সঙ্কীর্ণ আব্‌হাওয়া। হাল-আমলের নূতনতম সহরের ধার-করা মুখোস নিতে গিয়ে জমা হয়ে' উঠেছে চারিদিকে শুধু অসুবিধা। ছোট্ট একখানি মটর হ'লেও হরেনের মন্দ হয় না! অন্তর্জীবনে অনেক দিন তার গতি গেছে থেমে, আজ আবার সে উপলব্ধি কর্‌বে গতির তপ্ত আনন্দ। না, না, বড়-মানুষী করার মত অত টাকা সে পায় নি। তবে? চাকরীটা ছেড়ে' দেবে? হরেন মনে মনে একটু হাস্‌ল। হেসে' ভাব্‌ল, তা' মন্দ মতলব নয়। ভদ্রলোকের চাকরী করা আর চলে না—পদে পদে আশঙ্কা, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মনোরঞ্জন, নিত্য একটানা কঠোর পরিশ্রম। তা'-ছাড়া, কারণে-অকারণে অপমান সে ত' হাতের পাঁচ। সহ্য না হয়, সোজা পথ আছে। সেদিন ত' খামাকা রিভেট সাহেব হরেনকে অনেক কথা শুনিয়ে' দিল। দোষের মধ্যে স্ত্রীর অসুখের দরুণ সমস্ত রাত জাগার জন্য দুপুরে একটু তন্দ্রার ভাব এসেছিল। হরেনের ইচ্ছা হ'ল, এখুনি একটা পদত্যাগ-পত্র লিখে' পাঠিয়ে' দেয়।

তবু হঠাৎ কোন কাজ করে' ফেলা ভাল নয়। বিশেষতঃ, মাসের শেষে অতগুলো টাকার বাঁধা আয়! হরেনের মনের মধ্যে বাস করে কেরাণীর যে অতি-সাবধানী মন—সে পিছিয়ে' পড়ে। এক কথায় এমন চাকরীটা ছেড়ে' দেব, তা' কি হয়? পরাধীন দেশের মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান, পদে পদে লাঞ্ছনা পাওয়া ত' তার নিত্য-নৈমিত্তিক। চাকরী ছেড়ে' দিয়ে' সে কর্‌বে কি? পঁচিশ হাজার টাকা সম্বল করে সে ত' আর চিরজীবনের মত নিরাপদ্ হতে পারে না! ব্যবসা? তা' বটে। হরেনের মনে পড়ে, গত দিনের বিস্মৃত আকাঙ্ক্ষার স্মৃতি। কয়লার কারবারে নেমে পড়্‌লে মন্দ হয় না। কিন্তু এত কষ্টের ধন কারবারের অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে' দিবে—কে জানে এর পরিণাম কি! নিরাপদ্ জীবনের শান্ততার মধ্যে ইচ্ছা করে' ডেকে' নিয়ে' আস্‌বে রাজ্যের আশঙ্কা—অফুরন্ত উদ্বেগ? তবু যদি পঁচিশ হাজার না হয়ে হ'ত পঞ্চাশ হাজার, না হয় একবার অদৃষ্টের সঙ্গে সোজা প্রতিযোগিতা করে' দেখা যেত। কিন্তু এত কম টাকা নিয়ে' কি আর পিচ্ছিল অদৃষ্টের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা চলে?

মনের মধ্যে হরেনের যৌবন বিদ্রোহ করে' ওঠে। নিরাপদ্, শঙ্কাহীন জীবন এ জগতে কার আছে? দুঃখ, উদ্বেগ, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সহস্র আপদের সম্ভাবনা—এই ত' মানুষের জীবন! তবু ক্ষণভঙ্গুর নিরাপদ্ শঙ্কাহীনতার জন্য মানুষের কতই না চেষ্টা, কতই না আয়োজন! হরেনের মনের মধ্যে চলে অবিরাম দুর্দ্দম দ্বন্দ্ব। সহস্রাভিমুখী চিন্তার অকুল দরিয়ায় ও যেন নিজেকে হারিয়ে' ফেলে।

দিন সাতেকের মধ্যে নানা প্রাথমিক এবং আইনগত কাজ শেষ হ'বার পর টাকাটা হরেনের হাতে এসে' পৌছল। সেদিন বিকালে সুবোধ এসে' হাজির হয়। বলে, আলাদিনের আশ্চর্য্য পিদ্দীম এ যুগেও মানুষের বরাতে মেলে!

হরেন মুখে এক ফালি হাসি নিয়ে' বলে, হ্যাঁ, আলাদিনের আশ্চর্য্য পিদ্দীমই বটে—একেবারে রাতারাতি

সোণার খনির সন্ধান! তা', তুমি দেশে এলে কবে? সব খবর ভাল ত'?

সুবোধ জবাব দেয়, কাল রাত্রে দেশে ফিরেছি। কাজকর্ম্ম বিশেষ সুবিধে নয়, তাই ভাবলুম, একবার কলকাতা ঘুরে' আসি।

সুবোধ এখন চাকরী ছেড়ে' দিয়ে' কয়লার ব্যবসায় নেমেছিল। ও বলে' যায়, বছরখানেক আগেও যা-বা বাজার ছিল, এখন আর একেবারে চলে না। তখন অতি লোভে চাকরী ছেড়ে' দিয়ে' কাজে নামলুম! ঐ বছর দুয়েক যা' কিছু করে' খেয়েছি। তারপর এখন চলেছে কেবল ঘরের পুঁজি খরচ করে' সব কিছু বজায় রাখা।

হরেন বলল, সে কি হে, দিন তিনেক হল' বাজার ত' আবার একটু চড়েছে!

—তা' চড়ুক, ওতে আমাদের বিশেষ কিছু সুবিধে হ'বে না। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের চাকরীই ভাল। মাসের শেষে নিশ্চিন্ত আরামে নিয়ে' এস নির্দ্দিষ্ট বরাদ্দ। কোন ভাবনা নেই!

হরেনের দৃষ্টি থেকে ধূমায়মান অন্ধকার যেন ঘুচে' গেল। নানা প্রলোভনের টানা-হিচড়ার মধ্যেও যেন সে আবার কূলের সন্ধান পেল। সুবোধ চলে' যা'বার জন্য উঠতেই হরেন একটু ইতস্ততঃ করে' বলে, হ্যাঁ, একটা কথা ভাবছিলুম। মনে করছি, কিছু টাকা নিয়ে কয়লার কারবারেই নামব। তোমার কি মনে হয়?

সুবোধ উৎসুক হয়ে' ওঠে। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে' বলে, যদি সত্যি ঠিক করে' থাক ত' মন্দ নয়। তোমার মতন কাজ-জানা লোক পেলে আমার কারবারই তোমায় ছেড়ে' দিতে রাজী আছি। যা' খুসী হোক, আমায় একটা অংশ দিও।

হরেন বলে, সত্যি, রাজী আছ?

—নিশ্চয়ই, তোমার মতন অংশীদার পাওয়া ত ভাগ্যের কথা হে?

হরেন শেষে একদিনের সময় নেয়; বলে, আচ্ছা কাল সন্ধ্যেবেলা তোমার বাড়ী গিয়ে' পাকা কথার আলোচনা করব। একটা দিন আমায় ভাবতে সময় দাও। কথা দিয়েই কিন্তু হরেনের মনে আবার দ্বন্দ্ব সুরু হয়। একটা কিছু যা'-হোক করে' ফেলতে পারলে ও যেন বাঁচে। কত দিন আর নানা বিপরীতমুখী বাসনার অরণ্যে পথ খুঁজে' মরা যায়! এ ক'দিনে যেন সে হাঁফিয়ে' উঠেছে। একটু শান্তিতে দু-টি মুহূর্ত্ত আরামের নিঃশ্বাস ফেলবে—তারও যেন অবসর নেই। বাড়ীতে ত' সাতদিন ধরে' উৎসব লেগেই আছে। বিভার প্রথম জীবন। মনের মত করে' সংসার সাজাবার আগ্রহে ক'দিন জলের মত সে টাকা খরচ করছে। তা'-ছাড়া, আত্মীয় স্বজন, পাড়াপড়শীর নিমন্ত্রণ ত' লেগেই আছে। ক'-দিনের মধ্যে বিভা যেন নতুন মানুষটি হয়ে' পড়েছে। ভ্রূর কোঁচের মধ্যে পড়েছে দাম্ভিকতার ছাপ্। চোখের দৃষ্টিতে জেগেছে লোককে সদাই করুণা করার ভাব। সেদিন বিভার সমবয়সী কয়েক জন বন্ধুর নেমতন্ন ছিল। তাই বিভার শুতে আসতে অনেক রাত হয়ে' গেল। বন্ধুদের কলহাস্যে ইতিপূর্ব্বেই হরেনের ঘুম ভেঙে' গেছল। বিভাকে লক্ষ্য করে' সে বলল, এ রকম জলের মতন টাকা খরচ করলে ক'-দিন আর অমন হাসি-তামাসা চালাতে পারবে?

বন্ধুদের কাছে নিজের আকস্মিক সৌভাগ্য জাহির করার গর্ব্বে বিভার মন তখন উপচে' উঠছে। ও জবাব দিল, কেন, যে ক'-দিন চলে!

হরেন শ্লেষ করে' বলল, ওঃ, রাতারাতি মেজাজ যে একেবারে তেপান্তরের রাজকন্যের মতন হয়ে' উঠেছে!

—হ'বেই ত'। ভগবান দিন দিলেই হয়। আমি দু'জন বন্ধু খাওয়াচ্ছি বলে' এত যে শ্লেষ করছ, আর তুমি নিজে যে চেষ্টা করছ, ব্যবসার নামে সর্ব্বস্ব উড়িয়ে' দেবার!

এইবার নিয়ে' সাতদিনে অন্ততঃ সত্তর বার বিভার এ অভিযোগ উচ্চারিত হয়েছে। কত বার ব্যবসাকে উপলক্ষ্য করে' স্বামীস্ত্রীতে ছোটখাটো দাম্পত্যকলহও হয়ে' গেছে। বিভার সেই এক কথা। অনিশ্চিত আলেয়ার পেছনে হাতের-পাতের সব-কিছু ঘোচাতে ও কিছুতেই দেবে না। আর কিছু চিন্তা না থাক, অন্ততঃ শীঘ্র ওদের সংসারে যে নতুন অতিথির শুভাগমন হবে তার ভবিষ্যৎ ভাবা দরকার।

হরেন রুখে' উঠে' বলল, ব্যবসা করব না ত' সারাজীবন তোমার মতন সাদা হাতী পোষবার খরচ যোগাব কোথা

থেকে? ক'দিনের মধ্যেই যে আমিরী চাল দেখিয়েছ! একে অসময়ে ঘুমভাঙা, তার ওপর ক'-দিনের নানা ভাবনা-চিন্তার বিক্ষোভে হরেনের মেজাজ মোটেই ভাল ছিল না। তার কথাগুলো খুবই রূঢ় শোনা'ল।

বিভা আর সহ্য করতে পারল না। চেঁচিয়ে উঠল, অমন চেঁচাচ্ছ কেন? মারবে নাকি? ক'-দিনের মধ্যে তোমার ত' কিছু কম নবাবী মেজাজ হয়ে' পড়ে নি!

হরেন অসহ্য রাগে খিঁচিয়ে উঠল, হ্যাঁ, যদি মারি ত, কি করতে পার তুমি?

কিন্তু কথাটা বলে'ই তার কাণে খট্‌কা লাগল। এ কি করতে চলেছে সে? সংসারে অর্থই যত অনর্থের মূল। দুঃখের মধ্যে তাদের দাম্পত্যজীবনে যে নিবিড় সম্বন্ধ ছিল, আজ কোথায় গেল তা'! এ ক'দিন নিয়ত কেন তারা এত অকারণে কামড়াকামড়ি করে' মরছে!

সকালে ঘুম ভাঙার পর সব কথা মনে পড়তেই লজ্জায় হরনের কাণ লাল হয়ে' উঠল। ওর মনে ধিক্কার এল। বিভার সঙ্গে কোন কথা না বলে'ই কলকাতার আফিসে সে বেরিয়ে' পড়ল। ক'-দিন সে ছুটি নিয়ে' ছিল। কিন্তু ছুটির অলস আরাম আর সে সহ্য করতে পারছে না। তা'-ছাড়া, বাড়ীর এই বিষাক্ত আবহাওয়া বাহিরে গিয়ে সে একবার পরিষ্কার করে' সব দিক্ ভেবে' দেখতে চায়। বাজারটা ঘুরে' একবার খবরও নিতে হবে। কারবারে হাত দেওয়ার আগে পুরান মনিবের সঙ্গেও দেখা করে' আলোচনা করা দরকার। অবশ্য বাজার যতই খারাপ থাক, তবু তার মত কাজ-জানা লোক দু-দিনে সর্ব্বদিক্ সুবিধা করে' নিতে পারবে—এ বিশ্বাস তার মনের গোপন তলে বরাবরই রয়েছে। তবু সাবধানীর মার নেই।

সন্ধ্যেবেলা স্বামীকে জল খেতে দিয়ে' বিভা আরামের একটা নিঃশ্বাস ফেলল। সমস্ত দিন অনাহারী হরেনের দুর্ভাবনায় কি করে'ই না তার কেটেছে! অভিমানের প্রথম ঝোঁকে সে মনে করেছিল, জীবনে আর স্বামীর সঙ্গে কথা বলবে না। কিন্তু ওর অতি-সাবধানী মন শেষে হার মানল। এ কি তার অভিমানের সময়? একটা মুহূর্ত্তের অসাবধানতায় কি না ঘটে' যেতে পারে? দেহরাজ্যে স্থিতির সাধনা যাদের একান্ত নিজস্ব, সংসার-জীবনে তারাই খোঁজে নিরাপদ্ ভবিষ্যৎ, নির্ব্বিঘ্ন নিশ্চিন্ততা। সমস্ত দিন ধরে' ভেবে'-ভেবে' বিভা স্থির করেছিল, তার সন্তানের, তার স্বামীর, তার সংসার-জীবনের দীর্ঘ ভবিষ্যৎ কিছুতেই সে হরেনকে জলাঞ্জলী দিতে দেবে না। বাবার সম্পত্তি উদ্ধার করা হোক না তার মায়ের শেষ কামনা। সংসারে জীবিত মানুষেরই কত কামনা ত' অতৃপ্ত থেকে' যায়! শেষ পর্য্যন্ত বিভা তার সমস্ত শক্তি দিয়ে' বাধা দেবেই দেবে এই তার দৃঢ়সঙ্কল্প।

হরেনের জলখাওয়া হয়ে গেল বিভা একটু ইতস্ততঃ করে' বলল, দেখো, মার আর ধর, যাই কর না কেন, তবু এতগুলো টাকা এক কথায় জলে ফেলে দিতে কিছুতেই দেব না। কাজ কি আমাদের আরও বড় মানুষ হয়ে'! চাকরীর আয় আছে, আর লটারীর টাকায় কোম্পানীর কাগজ কিনে' যা সুদ পাব তাতে সারাজীবন দিব্যি বড়মানষী করে' কেটে যাবে।

হরেন একটা খোলা হাসি হেসে বলল, হাঁ, যা' বলেছ। কাজ কি অত গোলোযোগে? আজ আমিও সব ঠিক করে' এসেছি, বিভা।

অপ্রত্যাশিত মন-খোলা হাসিতে বিভার অন্তঃপ্রকৃতি আশঙ্কায় চঞ্চল হয়ে' উঠল। তবে কি বাড়ী আসবার আগে সব শেষ করে' এসেছে? গভীর উদ্বেগে বিভা জিজ্ঞাসা করল, কি, কি ঠিক করে' এসেছ?

হরেন তার উদ্বেগ-কাতর মুখের দিখে চেয়ে' হাসতে হাসতে বলল, কারবারের আর দরকার নেই। সারাজীবন ত' খেটে-পেটে' মলুম। এবার আমাদের আরামের পালা। কলকাতায় একখানা বাড়ী দেখে' এসেছি। যে ক'-দিন বাঁচি, চল, সহরে গিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্তে কাটান যাবে।

গীতার যোগ

(দ্বিতীয় খণ্ড)

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

গীতার যোগ নবম অধ্যায়ে জমিয়া উঠিয়াছে। অবশিষ্টাংশ মূল কাণ্ডের শোভা ও ঐশ্বর্য্য। বস্তুকে সম্যক্-রূপে পাইতে হইলে কেবল তত্ত্বতঃ পাইলেই সবখানি পাওয়া হয় না। 'জ্ঞানবিজ্ঞানসহিতম্' পাইতে হইবে। তত্ত্বের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য এই হেতু অনুধাবনীয়। গীতার অবশিষ্টাংশ অতিশয় যত্নের সহিত প্রণিধান করিতে হইবে।

গীতার যোগ জ্ঞান নহে, কর্ম্ম নহে, ভক্তি নহে। কিন্তু একটী অন্যটীতে অন্বিত হইয়া জ্ঞান, শক্তি ও প্রেমের সমন্বয়-সাধনের দ্বারা এই ত্রিমার্গ-যোগই ভগবানে অর্পিত হইয়াছে। তাহার পর যে অভিনব সাধন-তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে উহার মধ্যে আর ত্রয়ী সাধনার চিহ্ন মাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জ্ঞান, শক্তি, প্রেম পৃথক্-রূপে অথবা ইহাদের সমন্বয়ের পরও যদি এইগুলির প্রকারান্তরে অস্তিত্ব অনুভূত হয়, তাহা হইলে এই শক্তিত্রয়ের অভিন্ন স্বরূপ-তত্ত্বকে সম্যক্-রূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। গীতায় জ্ঞান, শক্তি, প্রেমের সমন্বয় হইয়াছে, ইহা না বলিয়া ভগবানে উৎসর্গীকৃত অথবা তর্পিত হইয়াছে বলিলেই গীতার উদ্দেশ্য বিশদ হয়। ত্রিমার্গ-যোগের সম্যক্ লয়-সাধনে সম্পূর্ণ এক নূতন সাধন-তত্ত্ব গীতাকার প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। উহারই নাম আত্মসমর্পণ-যোগ।

পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ হইলে জ্ঞানমার্গীকে ভক্ত নিষ্ফল-ভক্ষক বায়স বলিয়া গালি দিবে না—জ্ঞানীও কর্ম্মীকে বন্ধনগ্রস্ত হতভাগ্য বলিয়া উপেক্ষা করিবে না। শক্তি-সাধকও জ্ঞানী ও প্রেমিককে ভ্রান্ত বলিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইবে না। আত্মসমর্পণযোগীর মধ্যেই লোকমহেশ্বরের অনন্ত বিভূতি প্রকাশিত হয়। যেমন সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈদিক ধর্ম্ম, তেমনই ত্রিমার্গ-যোগের লক্ষণও সাধকের জীবনে প্রকাশ পায়। কেবল ত্রয়ী-সাধনার সমন্বয়ে যে আত্মসমর্পণ-যোগের আবিষ্কার তাহা নহে; ভারতের প্রাচীন সকল সাধনার লয় সাধন করিয়াই এই যোগের সৃষ্টি। আত্মসমর্পণের সাধক বৈদিক ধর্ম্ম, সাংখ্যাদির সাধন যেমন আশ্রয় করে না, জ্ঞান-শক্তি-ভক্তির সাধনায়ও তেমনি সে প্রবৃত্ত হয় না। তাহার সাধন নাই। আগম, নিগম, দর্শনাদি সবই আপনাকে ভগবানে তুলিয়া দিতে দিতেই প্রকাশ পাইতে থাকে।

ভগবানে সকল ধর্ম্ম, গুণ, কর্ম্ম তর্পণ করার একটা পথ আছে, আশ্রয় আছে। সে পথ ও আশ্রয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তাঁহার "বিশ্বতোমুখ" বাণীর সার্থকতা প্রতিপাদন করা চাই। এই হেতু তিনি আত্মসমর্পণযোগীর নিকট তাহার বিশদ বর্ণনা আরম্ভ করিতেছেন।

সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছেন—

"রসোঽহমপ্সু" ইত্যাদি অর্থাৎ "জলে আমি রস-স্বরূপ—সর্ব্ব বেদে প্রণব-স্বরূপ, মনুষ্যে পৌরুষ-স্বরূপ—এইরূপ আমাকে জানিয়া 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে' তাহাদিগকেই গুণময়ী প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত করি।" আবার অষ্টম অধ্যায়ে "অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র" প্রভৃতি শ্লোকে স্থূলতঃ স্বকীয় বৈভব প্রদর্শন করিয়া, "অন্তকালে এই আমার ভাব স্মরণ করিয়া যে কলেবর পরিত্যাগ করে সে আমারই ভাব প্রাপ্ত হয়" এবং নবম অধ্যায়ে—"অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ" ইত্যাদি শ্লোকে আশ্রয়-তত্ত্ব অবধারণ করার সঙ্কেত দিয়াছেন। কিন্তু তাহাও যথেষ্ট হয় নাই, এইরূপ উপলব্ধি করিয়া অর্জ্জুনকে আশ্রয়-তত্ত্বের সঙ্কেত অধিকতর বিশদ-ভাবে দিবার জন্য শ্রীভগবান বলিতেছেন—

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া॥১॥

অন্বয়—হে মহাবাহো! ভূয়ঃ (পুনঃ) এব (অপি) মে (মম) পরমং বচঃ (বাক্যং) শৃণু (আকর্ণয়) যৎ (পরমং বচঃ) প্রীয়মাণায় (প্রীতিম্ অনুভবতে) তে

(তুভ্যং) অহং হিতকাম্যয়া (হিতেচ্ছয়া) বক্ষ্যামি (কথয়িষ্যামি)।

হে মহাবাহো! পুনরায় আমার পরম বচন শ্রবণ কর। তোমার শুভ-কামনায় ইহা আমি বলিতেছি।

'ভূয়ঃ' এবং 'এব' এই দুই শব্দের দ্বারা পূর্ব্বে বলিয়াছেন, পুনরায় তাহাই বলিতেছেন এবং ইহার আবশ্যকতাও যে আছে, ইহাই সমর্থিত হইতেছে। এই অধ্যায়ে শ্রীভগবান তাঁহার বস্তুতন্ত্র বিভূতি ও ঐশ্বর্য্যের আংশিক বিবরণই প্রদান করিবেন, কেন না ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য অসীম। ব্রহ্ম-পদার্থের তত্ত্ব ও বিভূতি যে যে ভাবে চিন্তা করিলে ভাগবত-ভাব-প্রাপ্তি হয়, তাহারই ইহা সংক্ষিপ্ত আভাস মাত্র। বিভূতি-ও-ঐশ্বর্য্য-বিষয়ক বর্ণনা শ্রবণ করিলেই সাধকের আশ্রয়-তত্ত্ব মিলে না ; কিন্তু শ্রবণের দ্বারা আবার তত্ত্বের ভাবে চিত্ত পুলকিত ও একাগ্র না হইলে, যোগ-বিভূতি সন্দর্শন করারও অধিকার পাওয়া যায় না। উক্ত শ্লোকে "প্রীয়মাণায়" এই বাক্য-প্রয়োগ হওয়ায় অনুমান করা যায়, শ্রীভগবানের বাণী শুনিয়া অর্জ্জুনের হৃদয় প্রেমে, ভক্তিতে বিগলিত হইয়াছে, শ্রদ্ধায় তাঁহার সবখানি চিত্ত আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। ভগবান এইরূপ প্রীতির ক্ষেত্রেই আপনার অনির্ব্বচনীয় ভাবের নির্ঝর-ধারা অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে তাঁহার দিব্য মূর্ত্তি সন্দর্শন করার অধিকারী করিয়া লন। দশম অধ্যায় তাহারই উদ্যোগপর্ব্ব বলা যাইতে পারে।

কেহ কেহ বলেন, ভগবানকে সোপাধিক ও নিরুপাধিক ভাবে গ্রহণ করিতে হইলে, প্রথম শ্রেণীর সাধককে বস্তু-তত্ত্বের বিভূতি ও ঐশ্বর্য্যের ধ্যান করিতে হয়। সোপাধিক ব্রহ্মজ্ঞানের বিভূতি-বিষয়ক ধ্যানই পরম সহায়। এই জন্য সোপাধিক ব্রহ্মতত্ত্বই এখানে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অর্জ্জুনের নিকট ব্যক্ত করিতেছেন। নিরুপাধিক ব্রহ্মবোধের অধিকারী যাহারা তাহাদের পক্ষে স্বরূপ-জ্ঞানই যথেষ্ট। এই সকল ভেদমূলক যুক্তি ক্রম-বিকাশমান জাতির চিত্তকে সান্ত্বনা দেয় না। বস্তুর বিচার আছে, বিশ্লেষণ আছে, দিগ্‌দর্শন আছে। এই সকল লইয়া ভগবৎ-প্রাপ্তির আকুলতাই জাগে—কিন্তু যে দীপ্তশিরাঃ হইয়া অমৃতের অন্বেষণে সর্ব্বহারা, সে এই কথায় তৃপ্তি পাইতে পারে না। বস্তুর সবখানি তাহার চাই। বস্তুপ্রাপ্তির অধিকারী যে, সে সোপাধিক নিরুপাধিক ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার আর করিবে না। অধিকারী হওয়ার পথেই প্রবর্ত্ত-সাধনায় এই সকল যুক্তির প্রয়োজন আছে।

ঈশ্বর-তত্ত্ব মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তের অতীত হইয়াও আবার যুগপৎ সান্ত ও অনন্ত। এই তত্ত্বের মর্ম্মানুভূতি যাহার হইয়াছে সেই ঈশ্বর-তত্ত্বের অধিকারী। মূর্ত্ত নারায়ণে যে অমূর্ত্তের সন্ধান পায়, অমূর্ত্ত ব্রহ্মতত্ত্বে যে মূর্ত্তিকে লীলায়িত দেখে, সে-ই ধন্য। গীতার যোগ তাহাদের জন্যই উক্ত হইয়াছে।

> ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
> অহমাদিহি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥২॥

অন্বয়—সুরগণাঃ (দেবসমূহাঃ) মে (মম) প্রভবং (উৎপত্তিং) ন বিদুঃ (জানন্তি) মহর্ষয়ঃ (ভৃগ্বাদয়ঃ অপি) ন হি (যস্মাৎ) অহং দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্ব্বশঃ (সর্ব্বৈঃ প্রকারৈঃ) আদিঃ (কারণং)।

দেবগণ ও মহর্ষিগণ আমার উৎপত্তির কথা জানেন না—কেন না, আমিই দেবগণ ও মহর্ষিগণের সর্ব্বতোভাবে আদি-কারণ।

শ্রীভগবান বলিতেছেন, 'আমার শক্তিসামর্থ্যের বিবরণ দেবগণ ও মহর্ষিগণ জানেন না'। দেবগণ সর্ব্বশক্তিমান্, মহর্ষিগণ অতীন্দ্রিয় জগতের বিষয়াবধারণে অসমর্থ নহেন ; কিন্তু "মে প্রভবং"—এখানে এই 'প্রভব' শব্দের অর্থ 'প্রভু-শক্ত্যাতিশয়ং' অথবা 'প্রভবনম্ উৎপত্তিং' এইরূপ অর্থ হইলে শ্রীভগবান জন্ম-রহিত হইয়াও দেবতা ও ঋষিগণ প্রভৃতি নানা বিভূতি-যোগে তিনি আবির্ভূত, এইরূপই স্থির করিতে হয়। এই বিভূতিকে আশ্রয় করিলেই অজ, শাশ্বত যে সনাতন তত্ত্ব, তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। কিন্তু ভগবান নিজেকে মায়াশ্রয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের কথা পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকগুলিতে একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ভূতমহেশ্বর হইয়াও যে মানবজন্ম গ্রহণ করেন, এইরূপ সঙ্কেত নবম অধ্যায়ের ১১শ শ্লোকেও দিয়াছেন—'অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ মানুষীং তনুমাশ্রিতম্'। এই হেতু 'প্রভবং প্রকৃষ্টং সর্ব্ববিলক্ষণং ভবং দেবক্যাং জন্ম' এইরূপ

অর্থ আচার্য্য বিশ্বনাথের পূর্ব্ব শ্লোকের সহিত সামঞ্জস্য রাখার পক্ষে উপাদেয় হইয়াছে।

আদি-কারণ যুগপৎ বিশ্ব-সৃজনের প্রভু ও স্বরূপ হইয়াও তিনি কি প্রকারে জন্মগ্রহণ করিবেন? ইহা মনুষ্যবুদ্ধির দুর্ব্বোধ্য। কিন্তু দেবগণ যদি সর্ব্বশক্তিমান্ হন, তাহা হইলে তাঁহার যুগপৎ কারণস্বরূপ ও জন্মস্বরূপ হওয়ায় বাধে না। এই উত্তম রহস্য উপলব্ধি করার পক্ষে বুদ্ধির শক্তি উপযোগী নহে। যাহারা সম্যক্‌রূপে সত্যপরায়ণ, যজ্ঞাদিতে অর্চ্চনারত, শান্ত-চিত্ত, জিত-ক্রোধ, সেইরূপ মানবগণই পরম তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া থাকেন। গীতা ব্যতীত পুরাণাদিতেও "বিষ্ণুরহং ব্রহ্মা শক্রশ্চপি সুরাধিপঃ" আবার "অহং নারায়ণো নাম প্রভবঃ শাশ্বতোঽব্যয়ঃ" অথবা ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে

"তদাহং সংপ্রসূয়ামি গৃহেষু পুণ্যকর্ম্মণাম্।
প্রবিষ্টো মানুষং দেহং সর্ব্বং প্রশময়াম্যহম্।"

অর্থাৎ 'আমি পুণ্যকর্ম্মাদিগের গৃহে মানুষী তনু আশ্রয় করিয়া জন্মগ্রহণ করিব এবং সর্ব্ব বাধা প্রশমিত করিয়া দিই'।

ভগবানের এই জন্ম-কর্ম্ম অতি নিগূঢ়, অপূর্ব্ব রহস্য-ময়—এমন কি, সুরগণ ও মহর্ষিগণও ইহা অবগত নহেন; কাজেই তাহার তত্ত্ব বিদিত হইতে হইলে, ভাগ্যবান সেই যে মানুষী-তনু-সমাশ্রিত স্বয়ং ভগবানের মুখ-নিঃসৃত অমিয়-নির্ঝরে অভিষিক্ত হয়। এইজন্য তাঁহার অনুগ্রহ বিনা ভাগবত-তত্ত্ব জানিবার উপায় নাই। শ্রীঅর্জ্জুনের সৌভাগ্য, যে তিনি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সম্মুখে উপনীত হইয়া ব্রহ্মবাণী শ্রবণ করিতেছেন। বর্ত্তমান যুগে মানুষ আজ সেই বাণীর প্রতিধ্বনি মাত্র শুনিতেছে, তাহাতে তাহার তৃপ্তি নাই। তাই মানুষের হিয়া চারি যুগ চাহিয়াছে ভগবানের আবির্ভাব। আর সে সিদ্ধ আবির্ভাব-তত্ত্ব তখনই মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহার কাছে, যে আপনাকে নিঃস্ব করিতে পারিয়াছে এমন একের চরণে, যাঁর কণ্ঠে উদ্গীত হইয়া উঠে নব নব বেদ-ধ্বনি। এই হেতু একান্ত নিষ্ঠাযুক্ত, শ্রদ্ধাপরায়ণ, অধিকারী শিষ্যের নিকট নরদেবের কণ্ঠে যুগে যুগেই মহাবাণীর ঝঙ্কার উঠিয়াছে। এই হেতু শ্রৌত ও স্মার্ত্তকার-গণও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন—"গুরুব্রক্তে স্থিতং ব্রহ্ম"। শ্রুতি, স্মৃতি, তন্ত্র, পুরাণ আমাদের অন্তরে ধর্ম্মপ্রেরণা জাগাইয়া দেয়; কিন্তু ধর্ম্মের জাগ্রত মূর্ত্তিমান্ নারায়ণের আবির্ভাব না হইলে সবই শশশৃঙ্গের ন্যায় নিরর্থক হয়। তত্ত্ব আদিরহিত, জন্মরহিত, সর্ব্বলোকের নিয়ন্তা; আবার তিনিই মূর্ত্তিমান্ নরদেব। বিশ্বাসীর সম্মুখে, প্রীতিমান্ সাধকের পূজাগ্রহণে তিনি নর-কর পাতিয়াই প্রেমার্থী। এই কথাই পরবর্ত্তী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩

অন্বয়—যঃ মাম্ অনাদিং (ন বিদ্যতে আদিঃ কারণং যস্য) অজম্ (জন্মশূন্যং) লোকমহেশ্বরম্ (লোকানাং মহেশ্বরঞ্চ) বেত্তি (জানাতি), স মর্ত্ত্যেষু (লোকেষু) অসংমূঢ়ঃ (সম্মোহরহিতঃ [সন্] সর্ব্বপাপৈঃ (কিল্বিষ-সমূহৈঃ) প্রমুচ্যতে (মুক্তো ভবতি)।

যিনি আমাকে আদিরহিত, জন্মপরিশূন্য, লোকমহেশ্বর-রূপে জানেন, তিনি মর্ত্ত্যলোক-মধ্যে মোহাদি-পরিশূন্য হইয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন।

দেবতা ও মহর্ষিগণ পর্য্যন্ত যে তত্ত্ব অবগত নহেন তাহা অতীব দুর্বিজ্ঞেয়, ইহা বলাই বাহুল্য। এক্ষণে এই প্রশ্ন উঠিতেছে, যিনি জন্ম-রহিত তিনি আবার দেবকীগর্ভে মনুষ্য-রূপে আবির্ভূত হইবেন, ইহা কিরূপ কথা? কিন্তু "আমি" ও "আমাকে" বার বার এই কথা বলায়, বক্তা যে পার্থ-সারথি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, ইহা নিঃসংশয়েই বুঝা যাইতেছে। অন্যান্য ভাষ্যকারগণ এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেন নাই। তাহার কারণ, বাহ্যতঃ কোন যুক্তি দিয়াই ভগবানের জন্ম-তত্ত্ব বুঝান যায় না। আচার্য্য বিশ্বনাথ গীতার কথা দিয়াই ইহা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন—"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা" ইত্যাদি শ্লোকে এবং ভাগবতে উদ্ধব-বাক্য উদ্ধৃত করিয়া এই সমস্যায় সমাধানে যত্নপর হইয়াছেন। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ রামানুজ শ্রুতির বচনই উদ্ধৃত করিয়া বলেন—

"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্ ॥"

—অর্থাৎ অংশরহিত, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য, নিরঞ্জন, অমরত্ব-প্রাপ্তির সেতু, দহনীয় পদার্থ নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া স্বয়ং দীপ্তিমান্ যে পুরুষ আমি তাঁহারই শরণাগত হই। এখানে তত্ত্বই স্বীকৃত, বস্তু নয়; তত্ত্ব বস্তুময় না হইলে জ্ঞান-বিজ্ঞান সংযুক্ত হয় না। গীতার তত্ত্ব বস্তুতন্ত্র, কিন্তু অসীমতাকে হারাইয়া নহে—ইহাই তো উত্তম রহস্য। পরবর্ত্তী শ্লোকগুলি অনুধাবন করিলে, এই প্রশ্নের সদুত্তর আমরা পাইব। এইহেতু পাঠকদের অবহিত হইয়া শ্লোকের পর শ্লোক অনুধাবন করিয়া যাইতে বলি।

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেবচ ॥ ৪
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫

অন্বয়—বুদ্ধিঃ (অন্তঃকরণস্য সূক্ষ্মাদ্যর্থাববোধনসামর্থ্যম্) জ্ঞানং (আত্মানাত্ম-সর্ব্বপদার্থাববোধঃ) অসংমোহঃ (ব্যাকুলত্বাভাবঃ) ক্ষমা (সহিষ্ণুত্বং) সত্যং (যথার্থ-ভাষণং) দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয়-সংযমঃ) শমঃ (অন্তঃকরণ-সংযমঃ) সুখং (আহ্লাদঃ) দুঃখং (সন্তাপঃ) ভবঃ (উদ্ভবঃ) অভাবঃ (নাশঃ) ভয়ং (ত্রাসঃ) অভয়ং (ভীতিশূন্যত্বং) অহিংসা (পরপীড়ানিবৃত্তিঃ) সমতা (সমচিত্ততা) তুষ্টিঃ (সন্তোষঃ) তপঃ (ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক-শরীরপীড়নম্) দানং (যথাশক্তি-সংবিভাগঃ) যশঃ (সৎকীর্ত্তিঃ) অযশঃ (দুষ্কীর্ত্তিঃ) [এতে] ভূতানাং (প্রাণিনাং) পৃথগ্বিধাঃ (নানাপ্রকারাঃ) ভাবাঃ মত্তঃ (ঈশ্বরাৎ) এব ভবন্তি।

অন্তঃকরণের সূক্ষ্মার্থ-বিবেক-নৈপুণ্য, আত্মানাত্মবোধ, অব্যাকুলতা, সহিষ্ণুতা, সত্যবাক্য, বাহ্যেন্দ্রিয়-সংযম, অন্তরেন্দ্রিয়-সংযম, আহ্লাদ, সন্তাপ, উদ্ভব, মৃত্যু, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, সন্তোষ, তপঃ, দান, খ্যাতি, অখ্যাতি—প্রাণিগণের এই সকল নানা প্রকার ভাব আমা হইতেই সঞ্জাত হইয়া থাকে।

এই শ্লোকের দ্বারা মানবের বিভিন্ন ভাব ও অবস্থা ভগবান হইতেই যে ঘটিয়া থাকে, এইরূপ বলা হইয়াছে। একজনের বুদ্ধি, জ্ঞান, ভয়াদি অন্যের হইতে অধিক বা অল্প, এরূপ প্রায় দেখা গিয়া থাকে; এই শ্লোকের দ্বারা ইহাই প্রতীত হইতেছে, শ্রীভগবানের ব্যবস্থা-ক্রমেই জীবের অবস্থাদি প্রবর্ত্তিত হয়। এইরূপ পার্থক্য ও অসামঞ্জস্য যখন ভাগবৎ বিধান, তখন মানুষ ইহার জন্য আদৌ দায়ী নহে। উক্ত চতুর্থ শ্লোকের "ভয়ঞ্চাভয়মেব চ" এই দুই চ-কার থাকায় শ্লোকোক্ত বুদ্ধি-জ্ঞানাদির সমুচ্চয়ার্থে উহা প্রযুক্ত হইয়াছে। বুদ্ধি-অবুদ্ধি, জ্ঞান-অজ্ঞান, এইরূপ অনুক্ত বিষয়ও বুঝিতে হইবে। আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন, এইরূপ স্বভাবপ্রাপ্তির তারতম্য-হেতু জীবের কর্ম্মানুসারেই হইয়া থাকে। আচার্য্য রামানুজ বলেন, "প্রবৃত্তিনিবৃত্তিহেতবো মনোবৃত্তয়ো মত্ত এব মৎ-সঙ্কল্পায়ত্তা ভবন্তি।" অর্থাৎ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-হেতু মনোবৃত্তি ভগবান হইতেই নিয়মিত হয়। শ্রীধর বলেন, "নানাবিধা ভাবাঃ প্রাণিণাম্ মত্তঃ সকাশাদেব ভবন্তি" অর্থাৎ 'প্রাণিগণের নানাবিধ ভাব আমার ঈক্ষণ হইতেই ঘটিয়া থাকে।'

আচার্য্য বলদেব বলেন, দেব-মানবাদির প্রকৃতি যে ভিন্ন ভিন্ন, ভাগবৎ সঙ্কল্পই তাহার হেতু। পূর্ব্বোক্ত ভাষ্যগুলির মধ্যে আচার্য্য শঙ্করের কথায় বুঝিতে হয়, জন্ম-কর্ম্ম-বশে জীবের ঈশিত্ব-বোধ যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ নিজ নিজ বুদ্ধি-ও-জ্ঞানানুসারে কর্ম্ম করিয়া, কর্ম্ম-বশেই তাহারা উত্তম, মধ্যম ও অধম স্বভাব প্রাপ্ত হয়। শ্রীভগবান নিয়ামক ও ব্যবস্থাপক; কিন্তু মানবগণ প্রারব্ধ-সূত্রে বদ্ধ থাকিয়াই যথোপযুক্ত ফলাফল ভোগ করিয়া থাকে। জীবের জন্মান্তরীণ কর্ম্মের ফল যদি মানুষের স্বকৃত কর্ম্মাকর্ম্মের পরিণাম হয়, তাহা হইলে মানুষই তাহার নিয়ামক হইবে। এই ক্ষেত্রে ঈশ্বর হইতে ইহার ব্যবস্থা অযৌক্তিক হইয়া পড়ে। আমরা দেখিতে পাই, বিশ্ব-ব্যাপারে কোথাও সমতা নাই, কোথাও সামঞ্জস্য নাই; সৃষ্টির মূলেই যেন থাকিয়া গিয়াছে বৈষম্য, তাই জগৎ হইয়াছে বৈচিত্র্যময়। মানবের সাধ্যে নির্ধন অবস্থা হইতে ধনপ্রাপ্তির সৌভাগ্য লাভ হয়, আবার বিনা যত্নেই আমরা রাজ্যেশ্বরকে ভিখারী হইতেও দেখি। মানুষের উচ্চাভিলাষ ও দুরাকাঙ্ক্ষা উদ্যম ও অধ্যবসায় জাগ্রত করে, এবং তাহার অভিব্যক্তি হয় কখনও সুখ, কখনও দুঃখ, কখনও ভয়, কখনও সাহস; কিন্তু পতনের অবস্থায় মানুষ হয় অসহায়।

কেহ অপবাদী করে বিধাতাকে, কেহ বা ঈশ্বর-বিধান বলিয়া নীরব থাকে। চেষ্টা করিয়াও কেহ খ্যাতি-লাভ করে না, আবার কেহ বা বিনা অধ্যবসায়েই যশোলাভ করিয়া থাকে। এই সব দেখিলে মানুষের পূর্ব্বজন্ম-কর্ম্মাদি অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ইহা স্বীকার করিয়া লইতে বাধে; কেন না, এইরূপ হইলে সবকিছু "মত্ত এব" ইহা না হইয়া কর্ম্ম-ও-জন্মপরতন্ত্র বলিতে হয়। এই হেতু পূর্ব্ব শ্লোকের সত্যকে রক্ষা করিতে হইলে, ঈশ্বরের চাওয়ায় মানুষ কোথাও হয় বুদ্ধিহীন, কোথাও হয় ভ্রান্ত, মোহগ্রস্ত, হিংসাপরায়ণ, ভীরু, আর কোথাও হয় ক্ষমাশীল সত্যপরায়ণ, দাতা প্রভৃতি—এইরূপ স্বীকার করিয়া লইতে হয়। দৃষ্টির তারতম্যের বিচার ভগবানকে পক্ষপাতী বলিয়া প্রমাণিত করে; কিন্তু যখন "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" তখন সকল ভোগেই আনন্দানুভূতি আছে এবং ইহা লোকমহেশ্বরের পক্ষেই সম্ভব। যেখানে এই পরম নিগূঢ় রহস্য প্রতিভাত, সেইখানেই বলিতে হইবে, তাহার প্রীতি ও অনুগ্রহ মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছে। আসল কথা, যেখানে যুক্তিহীনতার ঈক্ষণ সেইখানেই ম্লান জড়ত্ব, আর যেখানে যুক্তির ঈক্ষণ বিকশিত সেখানে পৌরুষ, বীরত্ব, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, প্রকটিত হয়। মানুষের ভাষায় ইহাই যোগৈশ্বর্য্য ও বিভূতি নামে খ্যাত হয়।

গুণাদির উৎপত্তি অন্তর হইতেই হইয়া থাকে, এই কথা স্বীকার করিয়া, গুণাদির অব্যক্ত আশ্রয়ক্ষেত্রের নির্ম্মাতাও যে তিনি, এই কথা পরবর্ত্তী শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

"দুঃখ দিয়েই তোমায় পেতে চাই"

শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত

দুঃখ দিয়েই তোমায় প্রভু চাই যে পেতে আমি—
সুখের পথে নয়,
তোমার পরশ মুক্ত হাওয়া পুলক আনে প্রাণে,
দুঃখের পথে রয়।

অনন্ত এ উদার আকাশ-তলে,
নিত্য তোমার রঙের খেলা চলে—
রই যে ভুলে' বিত্ত ভরে' নিত্য নিরন্তর—
সত্য ভুলে' মরুর বুকে আমার এ অন্তর।

তাই ত তোমায় নিবিড় করে' চাই যে পেতে আমি
দুঃখে বরণ করি'—
দুঃখের পথেই তোমার নূপুর বাজে রিণি-ঝিণি
মধুর সুরে ভরি'।

ঐ যে সখা নীল গগনের তলে,
নিত্য তোমার রঙের খেলা চলে—
পাই যেন তার স্পর্শটুকু নিত্য নিরন্তর,
সত্য ভুলে' রয় না যেন আমার এ অন্তর।

— বৈচিত্র্য —

মনুষ্য-সমাজে বিবর্ত্তনের বিচিত্রতা—

আজিকার সভ্য মানুষ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে তার আদি কথা জানিতে। জানা-ব্যাপারটা অবশ্য অত সহজ হয় নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না। আধুনিক মানব-সভ্যতা যাহা, তাহা লক্ষ লক্ষ বছরের ক্রমবিকাশের ফল। জীব-জগৎ যে-সুদূর অতীতকালে মনুষ্যস্তরে উন্নীত হয়, তখনও ইতিহাস লেখার মত মস্তিষ্ক-বৃত্তি তার গড়িয়া উঠে নাই। সৃষ্টির বয়স হিসাবে এই উদ্যম তার একান্তই আধুনিক। তবুও অতীতকে জানার যে কৌতূহল তাহাও মানুষের বর্ত্তমান উন্নত মস্তিষ্ক-বৃত্তিরই পরিচয়।

ভারতীয় সভ্যতার স্বর্ণ-যুগে আবিষ্কৃত হইয়াছিল বিবর্ত্তনবাদ। চেতনার ধৃত-কেন্দ্রের তারতম্যে সৃজনের বৈচিত্র্য। চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া জীব মানুষ আখ্যা পায় বলিয়া পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। আত্মচেতনার বিস্মৃতিতে মানুষের প্রত্যাবর্ত্তনের অবকাশ আছে; আবার তাহারই ক্রম-বিজৃম্ভমানে 'দেবায় জন্মনে'র সম্ভাবনাও আছে।

প্রতীচীর মনীষিরাও নৃ-তত্ত্ব লইয়া অনেক মাথা ঘামাইয়াছেন। বিপুল উদ্যমে অধুনা লুপ্ত-বিস্মৃত আদি পুরুষের শেষ চিহ্ন আবিষ্কার করিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এই কৌতূহলকে চরিতার্থ করিতে চলিয়াছেন।

ভারতের ঋষি-মনীষা বিশ্ব-সৃষ্টির অন্তরালের অখণ্ড চেতনার অনুভূতির উপর ভিত্তি করিয়া যেখানে চাহিয়াছিল প্রকাশমান সব কিছুরই বিচার করিতে, সেখানে প্রতীচীর বৈজ্ঞানিকেরা অসীম অধ্যবসায়-বলে সৃষ্টির বাহিরের দিক্‌টা বিচার করিয়া চাহিয়াছে তাহার রহস্যোদ্ঘাটনে।

নিশার শিবির: দন্যার্দ্ধ অবস্থায় বন্য-মানুষ রাত্রি কাটাইতেছে। অর্থ ও সমাজবিকাশের নিম্নস্তরের এই সকল অসভ্য জাতির আচার আচরণের নমুনা হইতে প্রাক্-মানবীয় সমাজের ধারণা করা যাইতে পারে।

ডারউইন সাহেবের লাঙ্গুলবিশিষ্ট মানুষের আদি পুরুষের কথা সত্য হউক আর নাই হউক, এ কথা ঠিক যে বৃক্ষ-শাখা-কন্দরের বসবাস পরিত্যাগ করিয়া মানুষের পূর্ব্বপুরুষ যে-দিন ভূমি-পৃষ্ঠে নীড় বাঁধিতে লাগিল, সে-সময়ে তাহার হৃদয় ও মস্তিষ্কের কিছু উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল বলা যায়। অধ্যাপক হাক্সলে বিগত ও অর্ব্বাচীন যুগের মানুষের মাথার খুলির গহ্বর পরীক্ষার দ্বারা সে-যুগ ও

আফ্রিকার সিরেঙ্গেটি জঙ্গলের দৃশ্য : ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র-জন্তু বহুল অরণ্যে মাসাই মোরাণ জাতির বাস। এরা 'বর্শা'র দ্বারা আত্মরক্ষা করে এবং ক্রমশঃ পোষ মানিয়া আসিতেছে

একজন মাসাই মোরাণ

এ-যুগের তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মতবাদের ত্রুটি ধরা পড়িল সেই দিন, যে দিন ইউরোপের পুরান পাথর-যুগের মাউজটেরিয়ানসের বিলুপ্ত পরিচিহ্ন প্রত্নতাত্ত্বিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। বিস্‌মার্কের মস্তিষ্কের পরিমাণ ছিল ১৯৬৫ কিউবিক সেন্টিমিটার; কিন্তু অধুনা আবিষ্কৃত একটি অসাধারণ মাউজটেরিয়ানের মাথার খুলির মস্তিষ্ক-ধারণের সামর্থ্য দেখা গেল ২০০০ কিউবিক সেন্টিমিটার। আসলে মস্তিকের ঘি-ই মানুষের উৎকর্ষের সবখানি নয়। তার গঠনাবয়ব ও কোষ-বৈচিত্র্যে বুদ্ধি-বৃত্তির তারতম্য হইয়া থাকে। আবার উহার বিচিত্র কসরতের উপর মস্তিষ্ক-সংগঠনও অনেকখানি নির্ভর করে।

আদিম মানুষের সমাজ-সংগঠনের ইতিহাস সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত থাকিলেও, প্রতীচীর বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ আৎকিন্সন ও আঁন্ড্রু ল্যাঙ্গের মতবাদ বেশ কারণসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। ব্যষ্টি ও সমষ্টি মানুষের মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পরস্পর চরিত্র, মন ও ইচ্ছার সামঞ্জস্য-বিধানের ও তাহারই ক্রমবিকাশমানতার ফল আজিকার সভ্য সমাজ।

প্রকৃতির প্রেরণা ও জীবনধারণের সহজাত তাগিদে মানুষে মানুষে মিলন হয় এবং তাহারই ফলে বর্ত্তমান বর্ণ, সমাজ, জাতি ও ধর্ম্ম গড়িয়া উঠিয়াছে।

এমন একদিন ছিল, যখন সতত সন্দিহান মানুষ নিছক একাকী গৃহহীন অবস্থায় বিজন বনে বনে ভ্রমণ করিত। প্রাকৃতিক যৌন-ক্ষুধা-চরিতার্থতার জন্য যে নারী-পুরুষের মিলন সংঘটিত হইত, তাহাও ক্ষণিক। বনের বানর, কুকুর, হস্তী প্রভৃতি জন্তুবিশেষকে অনেক সময়েই দলবদ্ধ হইয়া জঙ্গলে চলা-ফিরা করিতে দেখা যায়। মানুষও যদি আদিম যুগে এমনি গোষ্ঠীবদ্ধ থাকিত, তবে তার সমাজ-বিবর্ত্তনের গোড়ার ধারাটি ধরা সহজ হইত।

বৃহদাকার জানোয়ারের হাত হইতে আত্মরক্ষা, মায়ের সহজাত স্নেহ, আহার্য্য-সমস্যার দায়ে যে প্রথম মানব গোষ্ঠী রচিত হয়, তাহাতে ছিল একজন শক্তিশালী পুরুষ, জন কয়েক নারী ও অনেকগুলি শিশু। বিড়াল, ব্যাঘ্র,

লাইবেরিয়ার বন্দী নরখাদকগণ :
মানুষ খাওয়ার অপরাধে শাস্তি ভোগ করিতেছে

সিংহ প্রভৃতি হিংস্র পশুর মত সে-সময়ে পুরুষ তার শিশু-সন্তানের প্রতি বিশেষ মমতাপন্ন তো ছিলই না, বরং নৈতিক জ্ঞানের অভাবহেতু যৌবনোদগমে যৌন-ক্ষুধার তাড়নায় পিতা-পুত্রের মধ্যে নারীর একাধিপত্য সঙ্গ-লিপ্সায় বিবাদ ও প্রতিযোগিতা সৃষ্ট হইত। হনুমানের পালে যেমন এখনও দেখা যায়, একটি মাত্র বীর বা গোদা পুরুষ হনুমানের কাছে আর সকলকে নতি স্বীকার করিতে, তেমনি ছিল মানুষের আদি-পুরুষেরও। এইজন্য গোষ্ঠির মাঝে ভিতর-বাহিরের আক্রমণ ও কলহের অন্ত ছিল না। পুরুষ জানোয়ার এই জন্যই সাধারণতঃ পুং-শিশুকে হত্যা করিয়া ফেলে। প্রাক্-মানবীয় গোষ্ঠীর বর্দ্ধমান পুরুষকেও পিতৃ-পুরুষের ঈর্ষ্যা এড়াইয়া যৌন-তৃষ্ণা মিটাইতে ভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে নারীলাভের জন্য সংগ্রাম করিতে হইত। সন্তানের প্রতি মায়ের স্বাভাবিক স্নেহবশতঃ সদ্যজাত পুং-শিশুকে রক্ষা করিবার জন্যই মা তার শিশুকে লইয়া গোষ্ঠী ছাড়িয়া অনেক সময়ে নিরাপদ স্থানে গমন করিত। কিন্তু ইহাতে আহার্য্য-সংগ্রহের সমস্যার সমাধান হইত না। আসলে, পেটের ক্ষুধা ও রক্ত-মাংসের তাড়না, প্রাক্-মানবগোষ্ঠীর নিছক দেহচেতনা-জনিত বিকর্ষণ-শক্তির সামঞ্জস্য সাধন করিয়া সমাজ-সংগঠনের গোড়া পত্তন করে।

সামাজিক নিয়মনীতি, ধর্ম্মচেতনা—লক্ষ লক্ষ বছর ধরিয়া মানুষের হৃদয়-মন-মস্তিষ্কের ক্রমোন্মেষের ফল।

আন্দামান, আফ্রিকা প্রভৃতি পৃথিবীর বহু স্থানে এখনও এমন বুনো জাতি বর্ত্তমান, যারা এই অর্থ ও সমাজ-বিবর্ত্তনের বহু নিম্ন স্তরে পড়িয়া আছে। মানুষে মানুষ খায়—নেহাৎ দেহ-পোষণের চেতনা ছাড়া সভ্য মানুষের সুকুমার বৃত্তি কিছুমাত্র এদের মধ্যে জাগ্রত হয় নাই।

আধুনিক সভ্য সমাজ-মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তি যতই কর্ষিত হউক না কেন, কিন্তু পশুত্বের স্তর ছাড়াইয়া এখনও উঠিতে পারে নাই। তাহার যুদ্ধ-বিগ্রহ, পরস্বাপহরণ প্রবৃত্তি, শিকার-স্পৃহা, পাশবিক অসংযম প্রভৃতি বহু আচরণের মধ্যে সে যুগের সংস্কারের গন্ধ পাওয়া যায়। সাধারণ সমাজ-মানুষের পক্ষে এ কথা সত্য হইলেও, কদাচিৎ ব্যষ্টি-বিশেষের মাঝে মানবতার চরম ও পরম পরিণতির আভাষ পাওয়া গিয়াছে। এই মন ও মস্তিষ্কের কোঠা ছাড়াইয়া বর্ত্তমানের অ-ধরা ও অ-জানার সন্ধান যে-দিন সমষ্টি-মানুষ পাইবে ও সেই বিশুদ্ধ চেতনায় হইতে পারিবে

পশ্চিম আফ্রিকার জঙ্গলী-সমাজের একজন রাজা
তার রাজপ্রাসাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান

অবগাহিত, সেই-দিনই সৃজনের গর্ভবেদনা হইবে দিব্য ও সাফল্যবান্—মানুষের সমাজ হইবে অমৃতায়মান। জ্ঞানে অজ্ঞানে সমাজের ধারা চলিয়াছে সেই অনাগতের দিকেই।

আচার্য্য শঙ্কর ও প্রপঞ্চসারতন্ত্র

শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য সাংখ্যতীর্থ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত গ্রন্থে "প্রোক্ত্বা" ও "বীপ্সয়িত্বা" প্রয়োগ দেখিয়া এগুলিকেও অশুদ্ধ বলিয়াছেন। কিন্তু এ জাতীয় প্রয়োগও ভূরি ভূরি দেখা যায় এবং ইহার সমাধানও আছে। শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। আমি সেই বৌদ্ধগ্রন্থ "অশোকাবদান" এবং "আশ্বলায়ণ" হইতে কয়েকটী উদাহরণ দেখাইতেছি—

শাস্তারমিব সংভাষ্য **প্রণত্বৈবং** সমব্রুবন্ ॥
তদা প্রাংশুং **প্রদত্ত্বা** স জয়ঃ পাদাম্বুজে মুনেঃ।
কৃতাঞ্জলিঃ **প্রদত্ত্বৈবং** প্রণিধানং ব্যধন্ মুদা ॥
অশোকাবদান ১ম অঃ।

"**প্রত্যসিত্বা** প্রায়শ্চিত্তং জুহুয়ুঃ" আশ্বলায়ণ।

সংস্কৃত সাহিত্যে বহুস্থলে এইরূপ প্রয়োগ পাওয়া যায়। বাহুল্যভয়ে আমরা সে সমস্ত উদ্ধৃত করিলাম না।

সমাধান এই যে, উপসর্গ ও প্রাদির ভেদ আছে। যখন ক্রিয়ার সহিত প্রাদির যোগ হয়, তখন সে উপসর্গ-সংজ্ঞা লাভ করে। প্রাদির সহিত নিত্যতৎপুরুষ হয় এবং সমাস হইলেই 'ক্ত্বা' স্থানে 'যচ্' হইয়া থাকে। কিন্তু উপসর্গের সহিত এই সমাস নিত্য নহে। এই জন্যই "নিত্যং কুপ্রাদেঃ" (সংক্ষিপ্তসার, সমাস ৪৬ সূত্র) এই সূত্রে "অনুব্যচলৎ" 'প্রাবর্ষৎ' উদাহরণ প্রদর্শিত হয় নাই। উহার পরবর্ত্তী "ক্বচিদন্যত্রাপি" এই সূত্রে এই দুইটী উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। যদি উপসর্গের সহিত সমাস নিত্য হইত, তবে এই দুইটী পৃথক্ সূত্র করিবার আবশ্যকতা ছিল না। ইহা স্বীকার না করিলে—

"পততি মদনবিশিখে বিলপতি বিকলতরোঽতি"
গীতগোবিন্দ।

ইত্যাদি কবি-প্রয়োগগুলিকেও অশুদ্ধ বলিতে হয়।

শাস্ত্রী মহাশয় কয়েক স্থলে আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ ঘটিত অশুদ্ধি প্রদর্শন করিয়াছেন। আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদের ব্যভিচার শাস্ত্রে ভূরি ভূরি দেখা যায়। "আত্মনেপদ-সংপ্রাপ্তৌ পরস্মৈ কুত্রচিদ্ ভবেৎ" (সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের বৃত্তি) এইরূপ অনুশাসনও আছে। ইহা স্বীকার না করিলে—"**পরিষ্বজতি** পাঞ্চালী মধ্যমং পাণ্ডুনন্দনম্" "স এবায়ং নাগঃ **সহতি** কলভেভ্যঃ পরিভবম্" "শ্রুত্বা-নুমোদনাং কৃত্বা তথা ধ্যাতুং **সমারভন্**" অশোকাবদান, ১ম অঃ। চতুর্ব্বর্গং তথা চান্তে **লভেন্** মুক্তিঞ্চ শাশ্বতীম্—তন্ত্রসারধৃত দুর্গাশতনামস্তোত্র। "ভবস্যাষ্টসিদ্ধিং **লভেৎ** পামরোঽপি"—তন্ত্রসারধৃত ত্রিপুটাস্তোত্র। এই সমস্ত প্রয়োগগুলিকেও অশুদ্ধ বলিতে হয়।

শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে ৭ম পটলের ১৪ শ্লোকে "**লিহতাম্**" পদটী অশুদ্ধ। তিনি বলিয়াছেন—এস্থলে "লীঢ়্" বা "লীঢ়াম্" হওয়াই উচিত। কিন্তু সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে, গণপঠিত ধাতুর গণান্তরেও প্রয়োগ দেখা যায়। চণ্ডী ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে এইরূপ প্রয়োগ অনেক দেখা যায়। শাস্ত্রী মহাশয় নিশ্চয়ই ইহা অবগত আছেন। আমরা তন্ত্র হইতেও এইরূপ প্রয়োগ দেখাইতেছি—

"বাতশ্লেষ্মভবৈঃ সর্ব্বৈর্মাসান্ **মুচ্যতি** সাধকঃ।"
মালিনীবিজয়োত্তরতন্ত্র, ১৩ অঃ।

আমাদের বক্তব্য এই যে, এস্থলে "লিহতাং" পদটী ক্রিয়াপদ নহে; উহা ষষ্ঠ্যন্তপদ। আমরা সেই শ্লোকটী উদ্ধার করিয়া দিলাম। পাঠকগণ এখন বিচার করিয়া দেখুন।

"কমলোদ্ভবৌষধিরসেব চ যা পয়সা চ পঙ্কমথ সর্পিরপি।
অযুতাভিজপ্তমমুনা দিনশো লিহতাং কবির্ভবতি বৎসরতঃ ॥"

শাস্ত্রী মহাশয় ১৭শ পটলের ৩৩শ শ্লোকে একটী সন্ধির অশুদ্ধি প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'**অথোঽধো মধ্য**' স্থলে "**অথো অধো মধ্য**" এইরূপ হইবে। দুঃখের বিষয়, শাস্ত্রী মহাশয় সম্পাদকের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়াছেন। মন্ত্রশাস্ত্র সম্পাদন করিবার সময়

সম্পাদক সহজে পাঠ পরিবর্ত্তন করেন না। শ্রীরঙ্গম্ হইতে যে প্রপঞ্চসার প্রকাশিত হইয়াছে, উহাতে সম্পাদক যেরূপ পাঠ পাইয়াছিলেন, সেইরূপ পাঠই রাখিয়াছেন। শুদ্ধাশুদ্ধি অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। এইজন্য তিনি যদি স্বকপোলকল্পিত পাঠ সংযোজন না করেন, তবে ইহাতে তাঁহার কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি না। শত শত বৎসরের পূর্ব্বে লিখিত গ্রন্থের প্রতিলিপিতে যে পাঠবিকৃতি হইতে পারে, ইহা বোধ হয় শাস্ত্রী মহাশয় একবার চিন্তাও করেন নাই। যদি ধরিয়াও লওয়া যায়, অবিকৃত এইরূপ পাঠই ছিল, তাহাতেই বা দোষ কি? অনেক স্থলে ছন্দের অনুরোধে সন্ধিনিষেধ সত্ত্বেও যে সন্ধি হয়, ইহা আমরা দেখিতে পাই *।

বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, শাস্ত্রী মহাশয় যে গ্রন্থের সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়াছেন, অথচ তিনি অন্যত্র মুদ্রিত সেই গ্রন্থ দেখিবার আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই। "আর্থার এভেলন্" কর্ত্তৃক সম্পাদিত "প্রপঞ্চসার" তন্ত্রখানি একবার তাঁহার দেখা উচিত ছিল। শ্রীরঙ্গম্ হইতে যে সময়ে উক্ত তন্ত্র প্রকাশিত হয়, তাহার প্রায় সমসাময়িক কলিকাতায় এই তন্ত্রখানি প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তক দেখিলে জানা যায় যে, উক্ত শ্লোকের পাঠ অন্যরূপ এবং উহাতে প্রাগুক্ত সন্ধিদোষও নাই। আমাদের মনে হয়—সেই পাঠই সঙ্গত। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা দুইখানি পুস্তক হইতে শ্লোকাংশ দুইটী তুলিয়া দিতেছি।

"রতাবধোঽধো মধ্যোর্দ্ধক্রমেণৈবং সমাহিতঃ॥"

—আর্থার এভেলন্ সম্পাদিত প্রপঞ্চসার ১৮।৩২

"রতাবধোঽধো মধ্যোর্দ্ধক্রমেণৈবং সমাহিতম্।"

—শ্রীরঙ্গম্ প্রকাশিত প্রপঞ্চসার ১৭।৩৩

একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক যে এরূপ অবিবেচনার পরিচয় দিবেন, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। মুদ্রিত পুস্তকের ভুল নানা কারণে হইতে পারে। প্রাচীন পুস্তকের লিপিকর-প্রমাদ অবশ্যম্ভাবী। সম্প্রতি আর্থার এভেলন্ কর্ত্তৃক যে সটীক "শারদাতিলক" তন্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে টীকাকার রাঘবভট্ট আচার্য্য শঙ্করের "প্রপঞ্চসার তন্ত্র" এবং পদ্মপাদাচার্য্যের "বিবরণ" নামক টীকার যে যে পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার সহিত এই সমস্ত পুস্তকের পাঠভেদ অনেক স্থলেই দেখা যায়। আশা করা যায়, অনতিবিলম্বেই পদ্মপাদাচার্য্যের টীকা ও তট্টীকা "ক্রমদীপিকা"র সহিত প্রপঞ্চসার তন্ত্র প্রকাশিত হইবে। বর্ত্তমান যে "প্রপঞ্চসার" খানি মুদ্রিত হইতেছে, তাহাতে পূর্ব্বপ্রকাশিত গ্রন্থের পাঠ অনেক স্থলেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় এই পুস্তকখানি বা নব প্রকাশিত "শারদাতিলক" তন্ত্রখানি দেখিলে সমস্তই অবগত হইতে পারিবেন।

শাস্ত্রী মহাশয় প্রপঞ্চসার তন্ত্রে অনেক স্থলে **'হুনেৎ'** প্রয়োগ দেখিয়া বলিয়াছেন যে, 'হুনেৎ' স্থলে **'জুহুয়াৎ'** হওয়া উচিত। তন্ত্রে বহুস্থলেই "হুনেৎ" ও "জুহুয়াৎ" এই দ্বিবিধ ক্রিয়ার প্রয়োগ আছে। এই দুইটী তন্ত্রের মুদ্রাস্বরূপ। প্রত্যেক প্রস্থানেই এই বৈশিষ্ট্য বা মুদ্রা রহিয়াছে, ইহা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন। যাঁহারা শ্রদ্ধাসহকারে মনোনিবেশ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করেন, তাঁহারাই সেই বৈশিষ্ট্য অবগত হইতে পারেন। শাস্ত্রী মহাশয় অনুসন্ধান করিলে প্রায় প্রত্যেক তন্ত্রগ্রন্থেই শত শত 'হুনেৎ' ক্রিয়ার প্রয়োগ দেখিতে পাইবেন। আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য সংক্ষেপে কয়েকখানি তন্ত্র হইতে এইরূপ প্রয়োগ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"নাশয়েদ্ দাহমচিরাদমৃতাংশাংশতো **হুনেৎ**"।

—গৌতমীয় তন্ত্র ১৮ অঃ

"ঘৃতপূর্ণৈর্হুনেদ্ দেবি বাগীশত্বং প্রজায়তে"।

—জ্ঞানার্ণবতন্ত্র।

"অনেনৈব মন্ত্রেণাপামার্গসমিধং **হুনেৎ**"।

—উড্ডামরেশ্বরতন্ত্র।

যে যে গ্রন্থে প্রাসঙ্গিকরূপে তন্ত্রের বিষয় আলোচিত হইয়াছে, সেই সমস্ত গ্রন্থেও এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়।

* "লবণাদি দ্বিতীয়ান্তা দহাদ্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ"—শারদা ২২।৯৬। ছন্দোঽনুরোধাৎ সন্ধিঃ মন্ত্রে তু ন সন্ধিঃ—আর্থার এভেলন্ সম্পাদিত শারদাতিলক, পদার্থাদর্শ টীকা ৮৩৬ পৃষ্ঠা। লবণাদিদ্বিতীয়েত্যত্র আকারে পরে "এচোঽয়বায়াব" ইতি অয়ি কৃতে যকারলোপে চ ছান্দসত্বাৎ সন্ধিঃ—শারদা ৮১৪ পৃষ্ঠা। "জ্ঞাতারঃ সন্তি মেত্যুক্ত্‌।"—মনুসংহিতা।

দেবীভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে অনেক স্থলেই 'হুনেৎ' ও 'জুহুয়াৎ' ক্রিয়ার প্রয়োগ দেখিতে পাই *।

আরও কথা এই যে, ভাষার অনুবর্ত্তী ব্যাকরণ, ব্যাকরণের অনুবর্ত্তিনী ভাষা নহে। তাই শাস্ত্রকারগণ বলিয়া থাকেন—

"সর্ব্বৈরেষা প্রয়োক্তব্যা ভাষা বৃদ্ধানুসারতঃ।
বালব্যুৎপত্তিদিঙ্‌মাত্রদর্শনার্থন্তু লক্ষণম্‌॥"

শাস্ত্রী মহাশয় ২০শ পটলের ৪৪শ শ্লোকে **'সরস্বতি'** ও **'কামিনি'** শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া বলিয়াছেন যে, এস্থলে সরস্বতী এবং কামিনী এইরূপ প্রয়োগই সাধু, কিন্তু **'সরস্বতি'** ও **'কামিনি'** এইরূপ প্রয়োগ সাধু নহে। আমাদের মনে হয়, ইহা অশুদ্ধ নহে। বাহুল্যবশতঃ সংজ্ঞাবাচক শব্দ কোন কোন স্থলে হ্রস্ব হইয়া থাকে। ইহা ব্যাকরণসিদ্ধ। এস্থলে সংজ্ঞার্থই গ্রাহ্য। কারণ এই শ্লোকে কুম্ভযন্ত্রের আবরণ-দেবতার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। সংজ্ঞাবাচক শব্দ যে কোন কোন স্থলে হ্রস্ব হয়, ইহাও দেখা যায়। যথা—

সুদীর্ঘমুখিগোমুখ্যৌ দীর্ঘজীহ্বা তথৈব চ।
—শারদাতিলক ২।৩৭

স্যাদ্‌ **ভদ্রকালি**যোগিন্যৌ শঙ্খিনী গর্জ্জিনী তথা।
—শারদাতিলক ২।৪১

শারদাতিলক তন্ত্রের টীকায় রাঘব ভট্টও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন †। আর ছন্দের অনুরোধে যে কোন কোন স্থলে হ্রস্ব হয়, ইহাও পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

আরও কথা এই যে, এই প্রপঞ্চসার তন্ত্রখানি কাব্য-শাস্ত্র নহে। উহা মন্ত্রশাস্ত্র। তান্ত্রিক উপাসনায় যাদৃশ অনুষ্ঠান আবশ্যক, তাহাই এই তন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। রাশিযন্ত্রের প্রকরণে কুম্ভযন্ত্রে যে সমস্ত আবরণ-দেবতা আছেন, এই শ্লোকে তাঁহারই নাম উল্লিখিত হইয়াছে। যে শব্দদ্বারা এই নামগুলি উল্লিখিত হইয়াছে, সেই শব্দগুলি পরিবৃত্তিসহ নহে। যন্ত্রে নামগুলি সম্বোধনান্তরূপে লিখিত হইয়া থাকে। এইজন্য অনুকরণে এস্থলে হ্রস্ব হইয়াছে, ইহাও বলা যাইতে পারে।

শাস্ত্রী মহাশয় আরও বলিয়াছেন যে, "শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত" ও "স্রগ্‌ধরা" ছন্দের যতিভঙ্গ হইয়াছে। আমরা জানি, এক সম্প্রদায় আছেন, যাঁহারা যতিভঙ্গকে দোষ বলিয়াই মনে করেন না। এ কথা ছন্দোমঞ্জরীকার স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন। ভগবান্‌ শঙ্কর যে সেই সম্প্রদায়ের নহেন, ইহা কি শাস্ত্রী মহাশয় নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন? আমরা ত আচার্য্যের রচিত শ্লোকের মধ্যেও অনেক স্থলে যতিভঙ্গ দেখিতে পাই।

আমরা দেখাইয়াছি যে, শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রদর্শিত ভুলগুলি প্রকৃতপক্ষে ভুল নহে। সুতরাং এইরূপ হেতু দ্বারা প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের গ্রন্থে সন্দেহ প্রকাশ নিতান্তই নির্যুক্তিক। বাস্তবিক ভুল হইলেও ইহা সম্ভবপর যে, শত শত বৎসরের পাঠবিকৃতিতেই বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। হয় ত আচার্য্য এই সমস্ত শব্দেরই প্রয়োগ করেন নাই। নানা-প্রকার পাঠভেদই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বিশেষতঃ প্রপঞ্চসার যে শঙ্করাচার্য্যের রচিত, এ বিষয়ে সুদৃঢ় প্রমাণ রহিয়াছে। শঙ্কর-সম্প্রদায় ও তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ মহাপ্রামাণিক প্রাচীন গ্রন্থকারগণ এই গ্রন্থকে ভগবান্‌ শঙ্করের রচিত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। (১) ভামতীর টীকাকার সন্ন্যাসী অমলানন্দ সরস্বতী কল্পতরু টীকায়*, (২) সুপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক শৈব নীলকণ্ঠ দেবীভাগবতের টীকায় †, (৩) সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মহাতান্ত্রিক ভাস্কর রায় ললিতাসহস্রনামের টীকায় 'প্রপঞ্চসার' তন্ত্রকে আচার্য্যের রচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন §। সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার

* "হুনেৎ পশ্চাদ্‌ব্যাহৃতিভিঃ পুনশ্চ জুহুয়াৎ মুনে"।
অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহেতি মধ্যনেত্রে হুনেৎ ততঃ।
অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহেত্যনেনৈব হুনেৎ ততঃ॥
—দেবীভাগবত, ১২।৭।৭৫, ১০৯, ১১০।

† "সুদীর্ঘমুখিগোমুখ্যৌ ভদ্রকালিযোগিন্যৌ ইত্যত্র ঙ্যাপোঃ সংজ্ঞাচ্ছন্দসোর্বহুলমিতি বহুলগ্রহণাৎ হ্রস্বঃ। প্রয়োগে তু দীর্ঘ এব।" আর্থার এভেলন্‌ সম্পাদিত শারদাতিলক, ৭৭ পৃষ্ঠা।

* "তথাচাবোচন্নাচার্য্যাঃ প্রপঞ্চসারে—অবনিজলানলমারুতবিহায়সাম্‌" ইত্যাদি—বেদান্তদর্শন ১।৩।৩৩ সূত্র।

† "আয়ুধার্থস্তু প্রপঞ্চসারে ভুবনেশ্বরীপটলে শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদৈঃ বিস্তরেণোপপাদিত ইতি"—দেবীভাগবত ৩।৩।৪০ ইতোঽপ্যধিকো মন্ত্রার্থঃ প্রপঞ্চসারে শ্রীশঙ্করভগবৎপাদৈরুক্তো বেদিতব্যঃ।
—দেবীভাগবত ১১।১৭।১৬

§ "তদুক্তমাচার্য্যৈঃ—মূলাধারাৎ প্রথমমুদিত"—ললিতাসহস্রনাম ১৪০ শ্লোক। তদুক্তং প্রপঞ্চসারে—বিচিকীর্ষুর্ঘনীভূতা ইত্যাদি।" ললিতাসহস্রনাম ১৩২ শ্লোক।

রাঘব ভট্ট শারদাতিলকতন্ত্রের টীকায় এবং সায়ণ মাধব স্থতসংহিতার ভাষ্যে বহুস্থলে প্রপঞ্চসার তন্ত্রকে শঙ্করাচার্য্যের রচিত বলিয়াই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

আরও বিশেষ কথা এই যে, শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য পদ্মপাদাচার্য্য প্রপঞ্চসার তন্ত্রের "বিবরণ" নামক টীকা রচনা করিয়াছেন। স্থতরাং এই গ্রন্থ শঙ্করের রচিত কি না, এইরূপ সন্দেহ করিবার অবকাশই নাই।

এই প্রপঞ্চসার তন্ত্রের বহুসংখ্যক টীকা রচিত হইয়াছে। সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ রাঘব ভট্ট 'শারদাতিলক' তন্ত্রের "পদার্থাদর্শ" নামক টীকায় কেবল যে পদ্মপাদাচার্য্যের 'বিবরণের' পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা নহে। তিনি 'বিজ্ঞানচন্দ্রিকা' নামক আর একটী উপাদেয় টীকার পঙ্‌ক্তিও উদ্ধার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত স্থানান্তরে আমরা প্রপঞ্চসার তন্ত্রের নিম্নলিখিত টীকাগুলি দেখিতে পাই। (১) বিজ্ঞানচন্দ্রিকা (২) প্রপঞ্চসার-ব্যাখ্যা (৩) প্রপঞ্চসারসম্বন্ধটীকা (৪) প্রপঞ্চসার-সম্বন্ধদীপিকা (৫) প্রপঞ্চসারবিবৃতিঃ (৬) প্রপঞ্চসার-দীপঃ (৭) তত্ত্বপ্রদীপিকা (৮) বিজ্ঞানদ্যোতনী (৯) প্রপঞ্চসারপ্রয়োগবিধিঃ (১০) শারদাদীপিনী বা প্রপঞ্চসারগূঢ়ার্থদীপিকা (১১) প্রপঞ্চসারসারসংগ্রহঃ (১২) প্রপঞ্চসারগূঢ়ার্থদীপিকাসারসংগ্রহঃ (১৩) প্রপঞ্চ-সারবিবরণম্। এই সমস্ত টীকাকারগণ 'প্রপঞ্চসার' তন্ত্রকে শঙ্করের রচিত বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত সুদৃঢ় প্রমাণ উপেক্ষা করিয়া প্রপঞ্চসারতন্ত্র শঙ্করের রচিত নহে, এইরূপ কথা বলিবার বা কল্পনার সাহস আমাদের নাই। আমরা শাস্ত্রী মহাশয়কে এই বিষয়গুলি পুনর্ব্বার চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

উপসংহারে ইহাও স্মর্ত্তব্য যে—

"পদজ্ঞৈর্নাতিনিবন্ধঃ কর্ত্তব্যো মুনিভাষিতে।
অনুসরণতাৎপর্য্যান্নাদ্রিয়েত হি লক্ষণম্॥
যান্যুজ্জহার মাহেশাদ্ ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ।
তানি কিং পদরত্নানি সন্তি পাণিনি-গোষ্পদে॥"

অর্থাৎ ব্যাকরণবিদ্‌গণ মুনিপ্রোক্ত গ্রন্থে ব্যাকরণ সম্বন্ধে অত্যধিক আলোচনা করিবেন না। তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য। কেননা, মাহেশরূপ ব্যাকরণ-সমুদ্র হইতে ব্যাস যে সমস্ত পদরত্ন উদ্ধার করিয়াছেন, পাণিনিরূপ গোষ্পদে কি সেই সমস্ত পদরত্ন থাকিতে পারে?

নৃসিংহতাপনীয় উপনিষদের ভাষ্যকার ও প্রপঞ্চসার তন্ত্রের রচয়িতা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, ইহাই আমরা মনে করি এবং এখনও অধিকাংশ ব্যক্তিই এইরূপ মনে করিয়া থাকেন। এক্ষেত্রে যে পর্য্যন্ত শঙ্করাচার্য্য হইতে উক্ত ভাষ্যকার ও গ্রন্থকার পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়া অধিকাংশের নিকট গৃহীত না হন, সে পর্য্যন্ত উক্ত ভাষ্যকারকে ব্যাকরণে মহামূর্খ বলিলে উহা শঙ্করাচার্য্যকেই বলা হইল বলিয়া লোকে বুঝিবে। আর আজ হিন্দুসমাজের সমক্ষে যদি শাস্ত্রী মহাশয় শঙ্করাচার্য্যকে মহামূর্খ বলেন, তাহা হইলে তাহা এই সমস্ত লোকের মনে শাস্ত্রী মহাশয় সম্বন্ধে কিরূপ ধারণার উদ্রেক করিবে—আশা করি, শাস্ত্রী মহাশয় তাহা আর একবার চিন্তা করিবেন। হিন্দুসমাজে এবং খুব সম্ভব দার্শনিক সমাজেও শঙ্করাচার্য্যের আসনে বসাইবার মত ব্যক্তি শঙ্করাচার্য্যের পরে এখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিয়াই মনে করি।
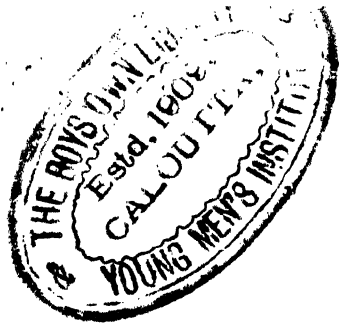
প্রেমিক সাধক জলধর

শ্রীমতিলাল রায়

স্বদেশী-যুগ আসিয়াছিল, যাহারা মনে করেন ভারতে কেবল রাষ্ট্রান্দোলনের সূত্র ধরিয়া, তাঁহার বাঙলার নব-যুগের মর্ম্ম-মন্ত্র কাণ পাতিয়া শুনিতে পান নাই, ইহা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। মানুষের প্রয়োজন জিনিষটা এত বড় যে, কোন কারণে কোনদিন আত্মায় যখন প্রেরণার সাড়া পড়ে, তখন মানুষ প্রয়োজনের তাগিদ্‌ই বড় করিয়া দেখে। রাষ্ট্রান্দোলন এইরূপ একটা পরাধীন জাতির বড় দাবী এবং প্রয়োজনের তাগিদ্ এমন প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধরিয়াছিল, যাহার প্রভাব বাঙলার জাগরণমন্ত্রে যে প্রচ্ছন্ন মন্ত্র ছিল ধর্ম্ম, শিক্ষা, সমাজ, মনুষ্যত্ব বিকাশের সাধনা তাহার অবকাশ আর দেয় নাই। এই রহস্যময় মহাযুগের সন্ধিক্ষণে জলধরের সহিত আমার পরিচয়।

এই সৌম্য শান্তমূর্ত্তি জলধর, তখনও প্রবীণ ছিলেন। আমাদের তখন তরুণ প্রাণ, শিরায় শিরায় অগ্নিশিখা জ্বলিয়াছে। আবেগে উত্তেজনায়, কোন্ পথে কোথা দিয়া ছুটিব, তাহার কোন ঠিকানা ছিল না; এই তরুণ প্রাণে তখন সান্ত্বনা দিতে জলধরকে পরম উৎসাহে উদ্যত দেখিয়াছি। স্বদেশপ্রীতির ঝরণাধারার সহিত উৎসর্গের পূত প্রবাহে তিনি আমাদের অন্তরে অমৃত-প্রলেপ মাখাইয়া, স্নেহপ্রীতির বন্ধনে বুকে তুলিয়া লইয়াছিলেন। সেই সম্বন্ধের নিবিড় বন্ধন স্মৃতি আজও ভুলিতে পারে নাই। সম্ভবতঃ ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের পর ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে, প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের সাহিত্যসভায় তাঁহাকে পুনরায় সন্দর্শন করি। এমন নিরহঙ্কার উদার মানুষ এ যুগে বড় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তিনি জীবনের গৌরব দিতে এমনই আত্মহারা হন, যে অতি স্নেহাস্পদকেও মাথায় তুলিয়া লইতে কুণ্ঠা করেন না। তাঁর কাছে সেদিন অযাচিত অনাবিল শ্রদ্ধার অবদানে কিরূপ কুণ্ঠিত হইয়াছিলাম, তাহা অন্তর্য্যামীই জানেন। জলধরকে সেদিন বুঝাইতে পারি নাই, আমি শুধু তাঁহার বয়ঃকনিষ্ঠ নহি, জ্ঞানে গরিমায় তিনি আমার পূজনীয়। কিন্তু এই অমায়িক মানুষটীর হিয়ায় যে উচ্ছ্বসিত তরঙ্গহিল্লোল আমায় ভাসাইয়া দিয়াছিল আর তাঁর কণ্ঠে সেদিন অনর্গল বাণী ঝঙ্কার তুলিয়াছিল, তাহার মূর্চ্ছনা আজও আমার অন্তরবীণায় মীড়ে মীড়ে মুখরিত হইয়া উঠে। সেদিন দেখিলাম, জলধর শুধু কবি নহেন, সাহিত্যিক নহেন, বিষয়ী নহেন, তিনি একজন প্রেমিক, ঈশ্বরভক্ত, বাঙলার অভিনব সাধনপথের পথিক। মনে হইল, সাহিত্যকুঞ্জে তাঁর পিক-কণ্ঠে যে মধুর সুর উঠিয়াছে, তাহা ছাড়া তাঁহার দিবার আর এক বস্তু আছে হৃদয়ের গোপনপুরে। বুঝি, হৃদয়বীণাখানি বাঁধিয়া সে সুরের মূর্চ্ছনা তোলার আর তাঁহার অবকাশ নাই। ভাষা তাই মূক হইয়া হৃদয়ে গুমরিয়া মরে। চক্ষের অশ্রুধারায় মরমীকে বুঝাইয়া দেয়, প্রাণের গোপন কথা এবার আর বলা হইল না।

জলধর-সম্বর্দ্ধনার বিজ্ঞাপনীতে দেখি, ইহা তাঁহার পঞ্চসপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন। কিন্তু জলধরবাবুর মুখে শুনি তিনি জন্মিয়াছেন, ১২৬০ সালের ১লা চৈত্র তারিখে। তাহা হইলে, এই উৎসব একাশীতিতম জন্মতিথি উৎসব হওয়া উচিত। দেশের সৌভাগ্য তাঁহাকে আজও আমরা জীবন্ত-বিগ্রহরূপে সম্মুখে পাইয়াছি। তাঁর সম্বর্দ্ধনার আয়োজন ইহার অনেক পূর্ব্বে হওয়া উচিত ছিল। যে জাতি যোগ্যজনের পূজা দিতে কুণ্ঠিত হয়, সে জাতির অভ্যুত্থান সুদূরপরাহত। আমরা মনে করি, জলধর-সম্বর্দ্ধনার অযথা কাল-বিলম্ব আর বাঞ্ছনীয় নহে। ইহা শুধু ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ নহে জলধরেরও আমাদের প্রতি প্রীতির অমর বন্ধন এই অশীতিতম বৃদ্ধকে আমরা সম্মুখে রাখিয়া হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিতে সুযোগ পাইয়াছি। তিনি শতায়ুঃ হউন, কিন্তু পূজা আমাদের বেলাবেলি সারিয়া রাখা ভাল।

রায়বাহাদুর জলধর সেন বঙ্গমাতার একজন কৃতী সন্তান। তিনি ধনীগৃহে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিন বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়াছেন। পরানুগ্রহে জীবনযাপনের ব্যথা বহিয়া যে জীবন মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, সে জীবনের মূলে ঈশ্বরের অপার্থিব দান আছে, এ কথা কে অস্বীকার করিতে পারে? তিনি যে মেধাবী ও প্রতিভাশালী পুরুষ, তাহা বাল্যজীবনে বৃত্তিসহ মাইনর ও প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় প্রতীয়মান হয়। আর তিনি অসাধারণ মমতাগুণে নিজের বিদ্যার্জ্জনের স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া ছোট ভাইটীকে মানুষ করিবার জন্য অর্থ-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। ঘটনার পর ঘটনার সংঘাতে অবসন্ন হইয়া জলধর আত্মীয়-স্বজনের প্রতি উদাসীন হন নাই। পত্নীবিয়োগ, মাতৃবিয়োগে শোকাতুর জলধর হিমালয় ভ্রমণ করিয়াও গার্হস্থ্যজীবনের যে মাধুরী, যে সুষমা তাহা ভুলিতে পারেন নাই। ইহা বাঙালীর হৃদয়-বস্তুর একটী মধুময় নিদর্শন। তাঁহার বৈষয়িক জীবনের অথবা তাঁহার সাহিত্যজীবনের পর্য্যালোচনা, তাঁহার সাহিত্যসুহৃদ্ ও বন্ধুগণের অনুশীলনীয়। আমি চিরদিন দূরে থাকিয়া জলধরকে দেখিয়াছি অকৃত্রিম সুহৃদের মত; আর আজ তার সম্বর্দ্ধনার বাণীর মালা গাঁথিতে বসিয়া, ভাবিতেছি তাঁহার ভাবময় স্বরূপটী। ধর্ম্মপ্রাণতার নিবিড়তা তাঁহার সবখানিকে ঘনাইয়া তুলিয়াছে কোন্ উপাদানে, কোন্ কৌশলে তিনি সংসারচক্রে নিজেকে দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়াও ফিকির বাহির করিয়াছেন হৃদয়-মন্দিরে জ্যোতির দেবতাকে

বসাইবার অনাড়ম্বরে, সকলের অগোচরে—স্নিগ্ধ, মৌন, সদা হাস্যময় মূর্ত্তিটীকে সম্মুখে রাখিয়া এই সকল কথাই ভাবিতেছি।

যাঁহাদের ধর্ম্মের গৌরব আছে, সাধনার আড়ম্বর আছে, তাঁহাদের মত অর্ব্বাচীন যুগের ধর্ম্ম-সাধনার রোশনাইয়ে চক্ষু ঝলসিয়া স্বয়ং জলধরও বলিবেন—আমি চিরজীবন অন্ধকারের উপাসক! কিন্তু আমি যেন দেখিতেছি, মানুষের চারিদিকে আজ যে অন্ধকার ঘিরিয়া ধরিয়াছে, তাহার ভিতর হইতে দিব্যালোক খুঁজিয়া বাহির করার ইহাই তো সর্ব্বোত্তম ফিকির। এই সাধনাই তো সংসারীর অবলম্বনীয়। অন্ধকার হাঁতড়াইয়া আলোর দেবতাকে আবিষ্কার করার এই লুকাচুরী যে খেলিতে শেখে নাই, তাহার সংসারজীবন সত্যই ব্যর্থ হয়। জলধর আজীবন চলিয়াছেন নির্ভয়ে, আপনার বুকে আশার আলো জ্বালিয়া অন্তরদেবতার সন্ধানে—অকপটে চলিয়াছেন লক্ষ্যের সম্মুখে জ্যোতির্ম্ময়কে স্থাপন করিয়া—তাহার সাধনা ও সিদ্ধির কথা অন্তরের ঠাকুরই বলিতে পারেন। সাধক সেখানে মৌন মূক, তার নীরবতার ভিতর দিয়াই শ্যামের মুরলীধ্বনি বুঝি ঝঙ্কার দিয়া উঠে।

আমি অকিঞ্চন—কাঙাল হরিনাথের চরণ-তলে বসিয়া যিনি জীবনের সম্পদ্ কুড়াইয়া ঋদ্ধিসিদ্ধিসম্পন্ন, তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করার ভাষা আমার নাই। আমি অন্তরের বহুযুগসঞ্চিত অবদান-ভার তাঁহার নিকট উপস্থিত করিয়া এই প্রার্থনাই করি—বাণীর মন্দির-দুয়ারে হে মঙ্গলঘট, বাঙালীর জলধর, "জীজিবিষেৎ শতং সমাঃ", তুমি শতায়ুঃ হইয়া আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর।

ওরে চল্

শ্রীহাসিরাশি দেবী

অগ্র-পথিকদল!
ওরে, চল্—ওরে চল্।
যদিও নামিছে বাদল সন্ধ্যা অন্ধ-আঁধার মাখি,
ধীরে ডুবে যায় তরুণ-তপন নিশার স্বপনে ডাকি;
তমসাঞ্চলে ঢাকি,
নিশিথিনী আসে বুক-ভরা তৃষা—চির-বুভুক্ষা লয়ে',—
চির-বঞ্চিত জীবনের বোঝা ক্লান্ত-চরণে বয়ে'।
ওরে, বহুদিন আগে ঘুমায়ে প'ড়েছে দুখহারী নারায়ণ,
পদাঘাতে তুই সে ঘুম ভাঙ্গাবি আনি নব-জাগরণ;
তুই হ'বি আজ পার্থ-সারথি জিনিবারে মহারণ,
তুই হ'বি আজ বিশ্ব-বিজয়ী শান্তনু-নন্দন;
হ'বি শঙ্কর পান করি' শত মন্থন-হলাহল।
ওরে চল্—ওরে চল্॥

অগ্র-পথিক-দল!
ওরে চল্—ওরে চল্।
তমসায় ঘেরা তীর্থ তোদের, নাই আলো, নাই দিশা,
সঙ্গিনী কয়, ভয় নাই, আমি আছি চির মহানিশা—
লয়ে' চির ভুক্-তৃষা;
বজ্রনিনাদে সে কহিছে হাঁকি'—শোন্—ওরে তোরা শোন্,—
আমি গাহি শুধু করাল কালের নবনব আবাহন।
ওরে, আমি আছি দুঃখ-দারিদ্র্য লয়ে', কঙ্কাল-কিরিটিনী,
আমি আছি লয়ে' বর্ত্তমানেরে, আমি আছি একাকিনী;
অতীতেরে ফেলি পদতলে মোর গর্ব্বোন্নত শির,—
আমারই পতাকা উড়ে পত্ পত্ সে বৈজয়ন্তীর।
ক্ষুধার তাড়নে কাঁদি' ভিখ্ মাগি' অনন্ত-কাল-তল,
ওরে চল্, ওরে চল্।

অগ্র-পথিক-দল—
ওরে চল্, ওরে চল্।
ঘর কাঁদে তোর বিয়োগ-বিধুরা, বাহির ডাকিছে আয়—
স্বার্থ কাঁদিছে বিদায়-বেদনে, বাহিরে কে গান গায়!
ওরে সঞ্চয়-বৈরাগী দল! ওরে লক্ষ্মী-হারা,—
তপন তোদের তেয়াগিয়া গেছে, আকাশে জাগিছে তারা!
ওরে নন্দন-পথ তোদের নহেক, নাই পারিজাত-মালা,
তপ্ত-মরুর পথের পথিক, সে পথ বহ্নি-ঢালা।
বেণুবন ঘিরে' বীণা কেঁদে' গেছে, বেজেছে বিষের বাঁশী,
ক্রন্দন তাই বন্ধন আজ, মুক্তি দিয়াছে হাসি।
তোর তরে আছে জড় মৃত্যুতে অমৃতময় ফল।
ওরে চল্, ওরে চল্।

পিতা ও পুত্র

(গল্প)
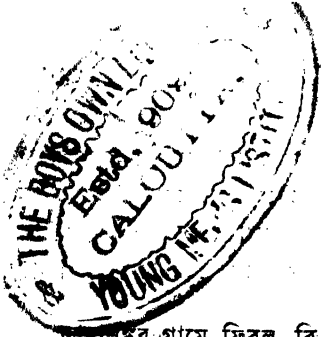
তারাশঙ্কর গ্রামে ফির্‌ল বি, এ পাশ করে'। খবর পেয়ে' ছেলে বুড়ো সবই এসে' তাকে অভিনন্দন জানিয়ে' গেল। ছেলেদের নীরব দৃষ্টি তাকে বুঝিয়ে' দিল, গ্রামের সে আজ গৌরবের বস্তু; আর বৃদ্ধ হৃদয়নাথ গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে তারাশঙ্করের পিতাকে লক্ষ্য করে' বলে' গেল—"ছেলে তো নয়, হীরের টুক্‌রো; এ আমি ঠিক বলে' যাচ্ছি, রায়-মশায় শঙ্কর তোমার ডেপুটী হবেই হবে।"

মেয়েরা কলসী কাঁকে জল আন্‌তে যায়—ঘোমটার ফাঁক দিয়ে' নীরব ভাষায় বলে যায়—এমন সন্তান যেন জন্মায় ঘরে ঘরে।

আমোদ-আহ্লাদ, খোস-নাম খ্যাতি কিছুর বাকী রইল না শঙ্করের। কিন্তু সে আর ক'দিন! উত্তেজনার যুগ দেখ্‌তে দেখ্‌তে শেষ হয়। বছর ঘুরে' গেল—শঙ্কর কিন্তু নড়ে না। ভোরে উঠে' চায়ের পেয়ালার দাবী, রেকাবী-ভরা মোহনভোগ—বৌদিদি সব দাবীই হাসি-মুখে পূরণ করেন। তারপর, বৈঠকখানায় বসে' আড্ডা বেলা বারটা অবধি। ছেলেদের নিয়ে' দীঘিতে মাতামাতি। নাইতে খেতে একপ্রহর কেটে' যায়। সন্ধ্যা আসে আকাশ ঘনিয়ে'। হাসির হর্‌রা, গ্রামোফোণের খোনা সুরে গানের ফোয়ারা আর তাস পিটে' তক্তাপোষের উপর কামান-দাগার আওয়াজ—যতক্ষণ খুসী অবাধে চলে।

তারাশঙ্করের পিতা পাস-করা ছেলেকে সমীহ করে' কিছু বল্‌তেই পারেন না—মনে ভাবেন, হৃদয়নাথের কথাটা কি মিথ্যা হবে? না, না, গ্রামের সব চেয়ে প্রাচীন লোক, বড় ধর্ম্মভীরু, ছেলে তাঁর ডেপুটী হবেই হবে।

শ্রাবণের আকাশে ভরা মেঘ। চারিদিক্ ঝাপ্‌সা। গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টিপাত হচ্ছে। পিছল পথে ভরা-কলসী কাঁকে গ্রাম্যবধূরা টাউরে' টাউরে' চলা ফেরা কর্‌ছে। মাঠে নবীন ধান্যক্ষেত্রে ঢেউ দিয়ে' চলেছে সবুজ ঢলাঢলি করে'। শঙ্কর বহুদিন পরে প্রাবৃটের এই গ্রাম্যশোভা 'হা' করে' দেখ্‌ছিল, এমন সময়ে মাইনর স্কুলের হেড-মাষ্টার তারিণী চাটুয্যে ছেঁড়া ছাতা মাথায় দিয়ে' ঘরে এসে' ঢুক্‌ল। তার হাতে ছিল একখানা দৈনিক "বন্দেমাতরম্"। উৎসাহে এক নিঃশ্বাসে সে বলে' ফেল্‌ল—"ভায়া, ঘুমন্ত গ্রামখানাকে এস তুড়ি মেরে' জাগিয়ে' দিই। এই দেখ, বাঙলার নেতারা কি জোর কলম চালিয়েছে! আমরা যদি না মাথা তুলি, কর্ত্তাদের কলম চালানই যে সার হবে!"

শঙ্কর কাগজখানা টেনে' নিয়ে' একবার চোখ বুলিয়ে'ই বল্‌ল, "ঠিক বলেছ তারিণী-দাদা! আমি রিপণ কলেজের ছাত্র, এই দেখছ না গুরুজীর সই আগে। একটা কাণ্ড কর্‌তেই হবে এই ৭ই আগষ্টে।" তারিণী উত্তেজিত হয়ে বল্‌ল—"আমি তো সেই জন্যই তাড়াতাড়ি কাগজ নিয়ে' ছুটে' আস্‌ছি। বুড়ো সুরেন বাড়ুজ্যে একা আর কত কর্‌বে? মাথা আমাদের তুলতেই হবে দু'হাত উঁচিয়ে। এখন একটা প্রোগ্রাম করে' ফেল।"

শঙ্কর কাগজ নিয়ে' বস্‌ল প্রোগ্রাম ফাঁদ্‌তে। শঙ্করের পিতা হুঁকো হাতে ঘরে ঢুকে' বল্‌লেন—"বাপ শঙ্কর, এই আস্‌ছি হৃদয়-দাদার কাছ থেকে—একটা দরখাস্ত করে' দাও তাড়াতাড়ি—শুন্‌ছি নাকি জবরদস্ত ডেপুটী দরকার কোম্পানীর, গাঁয়ে গাঁয়ে মাথা গরম করেছে ছেলেগুলো 'বন্দেমাতরম্' বলে'। পিটুনী পুলিশের পিছনে একটা করে' সর্দ্দার ডেপুটী চাই অনেকগুলি। হৃদয়-দাদা বলে, শঙ্কর এই সময়ে দরখাস্ত দিলেই কোম্পানী লুফে' নেবে তাকে এক নিমেষে…কি বল, অ্যাঁ?"

শঙ্কর পিতার বেয়াকুবি তারিণীর সাম্‌নে বসে' সহ্য করে' নেবে কেমন করে' ভেবে' ঠিক কর্‌তে পার্‌ল না। "যান, যান, এখন একটা বড় কাজ নিয়ে' ব্যস্ত হয়ে' পড়েছি" বলে' সে ঘাড় গুঁজে' বস্‌ল।

—"কাজ কি বাবা! গাঁয়ে আর কাজ কি আছে? কি বল, তারিণী? আবাদ শেষ হয়ে' গেছে; পড়ে' পড়ে' ঘুমানো। পূজো কাটুক; কাস্তে হাতে কিষাণেরা মাঠে

যখন যাবে, হুঁকো হাতে একটু তদ্বির করা—এই তো কাজ!"

তারিণী চাটুয্যে উত্তেজনায় ফুল্‌ছিল—সে বলে' উঠ্‌ল একটু গরম স্বরে উঁচু গলায়, "বলেন কি জ্যাঠামশায়! এখন কর্ম্মযুগ, খাওয়ার নাওয়ার বিশ্রাম নেই। দেখ্‌ছেন না, বাঙলায় এমন দেশ নেই, যেখানে কাজের সাড়া পড়ে নি?"

শঙ্করের পিতা ইংরাজী জান্‌তেন না। তারিণী তাঁর সাম্‌নে খবরের কাগজখানা ছড়িয়ে' ধর্‌তেই তাঁর চোখে পড়্‌ল মাঝে মাঝে ছাগলনাদির মত বড় বড় কয়েকটা অক্ষরের শ্রেণী। আর তার নীচে থাকে-থাকে পালে-পালে পিপীলিকা চলেছে। তিনি কৌতুহলী দৃষ্টিতে তারিণীকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন "কিছুই বুঝি না, বাবা। এসব কি ব্যাপার!"

তারিণী মোটা মোটা অক্ষরগুলির উপর আঙুল দিয়ে' বল্‌ল—"এই হচ্ছে ফরিদপুর, বরিশাল, এই দেখুন মাদারী-পুরে কি কাণ্ড হয়ে' গেছে! একেবারে বিলিতী নুণের দোকান লুট! আর বানরীপাড়ার দশ বছরের ছেলে লাঠীর গুঁতো খেয়ে' 'বন্দেমাতরম্' ভোলে নি। প্রহ্লাদের কথা মনে আছে তো?"

শঙ্করের পিতা বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তারিণীর দিকে চেয়ে রইলেন। তারিণী কমা, দাঁড়ি বাদ দিয়ে' সটান বলে' গেল, "জেলায় জেলায় স্বদেশী আন্দোলনের রোমাঞ্চকর ঘটনা ও কাহিনী।"

শঙ্করের পিতা শুনে' বল্‌লেন "বল কি তারিণী, ছেলেগুলো বেজায় রকমের বেল্লিক হয়ে দাঁড়িয়েছে তো? কোম্পানীর সঙ্গে ঝগড়া! পুঁটী মাছের প্রাণ এক টিপুনীতেই অক্কা পাবে!'

—"বটে!" ওষ্ঠের উপর দন্ত রেখে' তারিণী আস্ফালন করে' বলে' উঠ্‌ল, "অক্কা কে পায়, দেখা যাবে। দেখ্‌বেন, কাল ৭ই আগষ্টে গাঁয়ে কি ধুম লেগে যায়!"

এই সময়ের মধ্যে তারাশঙ্করের প্রোগ্রাম লেখা শেষ হয়েছিল। সেটা তারিণী হাতে পেয়ে'ই বলে' উঠ্‌ল—"বাঃ! বেশ আইডিয়া তোমার! আমার স্কুলের রোল-নম্বর এক শ' সতের। এই এক শ' সতেরখানা বাড়ীর দুয়ারে ঘট আর কলাগাছ তো বস্‌বেই—তারপর তুমি আছ, আমি আছি, স্কুলের মাষ্টারেরা আছে, হরি কবিরাজ আছে। আর সন্ধ্যের পর ঐ রাণীচক থেকে মায় রামদীঘি পর্য্যন্ত সড়কের দু' ধারেই সরষের পুঁটুলী বেঁধে' সারি সারি আলো জেলে' দেব। সভাটা হবে তোমারই বাড়ীর সাম্‌নে ঐ ময়দানটায়; যদি বৃষ্টি আসে, চণ্ডীমণ্ডপে উঠে' পড়া যাবে।"

তারিণী চাটুয্যে বুক চিতিয়ে' প্রোগ্রামের কাগজখানা নিয়ে' নক্ষত্রবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রায়-মশায় হতভম্ব হয়ে' পাস-করা ছেলের পানে তাকিয়ে' একবার বল্‌লেন, "বাপ্‌জী ও দাঙ্গা-হাঙ্গামায় তোমার যাওয়া হবে না কিন্তু। আজ বাদে কাল তুমি ডেপুটী হবে। কোম্পানীর সঙ্গে বাদ-বিসম্বাদ ভাল নয়।"

(২)

৭ই আগষ্ট "বন্দেমাতরমে" এক অগ্নিগর্ভ প্রবন্ধ বেরুল। ৭ই আগষ্ট বাঙালী স্বাধীনতা ঘোষণা করে' দিয়েছে। এ ঘোষণা বাঙালী আর প্রাণ থাক্‌তে রদ্ কর্‌বে না। কাগজ পড়্‌তে পড়্‌তে অনেক বার তারিণীর পা দু'টো মাটী ছাড়িয়ে আধ হাত লাফ দিয়ে' উঠ্‌ছিল। সে যে কাণ্ড আজ বাধিয়েছে, কাগজে রিপোর্ট বেরুবে নিশ্চয় প্রকাণ্ড অক্ষরে। তারিণী চাটুয্যের নামটাও কোন না জাহির হবে! কিন্তু ছেলেরা সবাই ধরেছে, আজকের সভায় শঙ্করকেই সভাপতির আসন নিতে। তারিণীর বিদ্যে তখনকার এণ্ট্রেন্স ক্লাস পর্য্যন্ত; কিন্তু শঙ্কর নিশ্চয় তারিণী বয়োজ্যেষ্ঠ বলে'ই এ পদ নিতে অস্বীকার কর্‌বে —এ আশা সম্পূর্ণ রূপে ছিল বলে'ই সে ছেলেদের সঙ্গে আর কথা কাটাকাটি করে নি। গ্রামের এত বড় অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্যের ভারটা নিজের হাতে রাখারই তার ইচ্ছা ছিল অনেকখানি। জিদ্‌ও ধরেছিল—সে শঙ্করকে গিয়ে বল্‌ল—"আজকের সভার প্রেসিডেন্ট ঠিক করে' ফেলা যাক্ এস।"

শঙ্কর কল্‌কাতায় থাকৃতে অনেক সভাসমিতি দেখেছে, যোগ দিয়েছে ; দু-চার কথা দাঁড়িয়ে' উঠে' বলারও সুযোগ সে পেয়েছিল। সে কাগজ-পেন্‌সিল নিয়ে, কয়েকটা 'আইটেম্' লিখে' তার হাতে দিল। তারিণী অবাক্। এত শীঘ্র এমন সুন্দর এজেণ্ডা বিনা চিন্তায়, বিনা পরামর্শে শঙ্কর যে লিখে' দেবে, সে তা' আশা করে নি। বিশেষ রূপেই সে বিস্মিত ও পুলকিত হয়েছিল, সভাপতির আসন তারিণীকেই দেওয়া হয়েছে দেখে' ; তবুও সে মুখটাকে কৃত্রিমভাবে কাঁচু-মাচু করে' গুঁইয়ে' গুঁইয়ে' বল্‌ল—"সভাপতি-টভাপতি আমার পোষাবে না, শঙ্কর। ওটা তোমারই পক্ষে সুবিধা হবে। আমার নামটা কেটে' দাও।"

শঙ্কর—"পাগল হয়েছ তুমি, এ সব কাজে আমার হাতে খড়ি। তুমি স্কুলের হেড্-মাষ্টার ; আমি প্রস্তাব কর্‌ব, পণ্ডিত মশায় সাপোর্ট করে' দেবেন—কি বল ? নামটা তোমাকে জিজ্ঞাসা না করে'ই তাই বসিয়ে' দিয়েছি।"

তারিণী এজেণ্ডাটা অনুচ্চস্বরে পড়ে' গেল—প্রথমেই সঙ্গীত, তারপর সভাপতি-বরণ ; সনাতন জানা, রামসুন্দর পরামাণিক, ধীরেন বাঁড়ুজ্যে, গাঁয়ের জন-কয়েক হুঁসিয়ার ছেলের বক্তৃতার পর সভাপতির অভিভাষণ। সে হেঁসে' বল্‌ল, "বেশ হয়েছে, কিন্তু ঐ সভাপতিটা তুমি হ'লেই মানাত।"

ঠিক এমনি সময়ে হাঁফাতে হাঁফাতে ন্যাড়া এসে' খবর দিল—"মষ্টারমশাই, সর্ব্বনাশ হয়েছে! মামা দুয়ারে ঘট আর কলাগাছ দেখে' লাথি মেরে' ফেলে' দিয়েছে—কি করা যায়, বলুন ?"

শঙ্কর তারিণীর মুখের দিকে নিরুপায়ের মত চেয়ে' রইল। তারিণী রক্ত-চক্ষু ঘুরিয়ে' হেঁকে' বলে' উঠ্‌ল—"ভারী স্পর্দ্ধা তো! কে জান, শঙ্কর—ঐ বুড়ো হৃদয়নাথের বড় ছেলে জানকী। ব্যাটার বিদ্যে থার্ড-ক্লাশ, কিন্তু পোষ্টমাষ্টার হয়ে' ধিঙ্গি হয়েছে!"

শঙ্কর বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে বল্‌ল,—"কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকার চাই, তারিণী-দা! তা' না হ'লে বোধন না হতেই রাক্ষসের মঙ্গলঘট ভাঙ্গা ভবিষ্যতে আমাদের সকল কাজই পণ্ড করে' দেওয়ার কারণ হবে।"

তারিণী খুড়ো লাফিয়ে' বলে' গেল, "আমার চৌদ্দ পুরুষ গাঁয়ের পুরুত, দুর্গাপূজায় ব্যাটা বামুন পায় কোথায় দেখ্‌ব। রামসুন্দর তো আমাদের দলের লোক। বামুন, ধোপা, নাপিত বন্ধ কর্‌বই। নয় তো আমার নাম তারিণী চাটুয্যে নয়।"

আকাশ নির্ম্মেঘ। স্বচ্ছ নীলের কোলে অপরাহ্নের সূর্য্য ঝিক্-মিকিয়ে' উঠেছে। প্রশস্ত ময়দানে সভার আয়োজন হয়েছিল। গাঁয়ের কেহ বাকী ছিল না, সেখানে উপস্থিত হ'তে। তরুণ, প্রবীণ, বৃদ্ধ, এমন কি উলঙ্গ গ্রাম্য-শিশুগুলোও ভীড় করে' বসেছিল ডায়েসের সাম্‌নে—স্কুলের কয়েকজন ছাত্র গোলমাল থামাচ্ছিল হিস্-হিস্ করে'। হারমোনিয়ম্ বাজিয়ে' গানের সুর উঠ্‌ল—"স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি" ইত্যাদি ছন্দে। সভা স্তব্ধ। সকলের প্রাণে উৎসাহের আগুন জ্বলে' উঠেছে। গান থাম্‌তেই বজ্র-গর্জ্জনের ন্যায় উচ্চারিত হ'ল—"বন্দেমাতরম্"।

শঙ্কর উঠে' দাঁড়িয়ে' তারিণী চাটুয্যের একমুখ প্রশংসা উদ্গিরণ করে', একগাছা মালতী ফুলের গোড়ে তার গলায় দুলিয়ে' সভাপতির আসন দিতে যাচ্ছে, আর পণ্ডিত মশায় এক টিপ নস্যি নাকে গুঁজে' সমর্থনসূচক বাণী উচ্চারণ কর্‌বেন কি, নফর কোলে সভার একপ্রান্ত থেকে হেঁকে উঠ্‌ল, "না, না, তারাশঙ্কর গাঁয়ের মাথার মণি। এ সভার সভাপতি তাঁকেই হ'তে আমরা অনুরোধ কর্‌ছি।"

তারিণী হতভম্ব, ভ্রূকুটী-কটাক্ষে দেখে' নিল—ব্যাটা সেই নফর কোলেই বটে! সরল রেখার উপর সমকোণ ত্রিভুজ আঁক্‌তে ঘেমে' নেয়ে' গিয়েছিল ; একমাস ধরে' এটা আর তার মাথায় যায় নি। রাগে সে তাকে বেতিয়ে দিয়েছিল খুবই জোরে। শোনা যায়, এখনও তার দাগ মেলায় নি। ছেলেটা হাটে মশলার দোকান করেছে—দু-দশ পয়সা বিক্রীও হয়। আজ সে তার অপমানের শোধ তুল্‌তেই প্রতিবাদের সুর তুলেছে। কে তার কথা শোনে, তারিণী চেয়ারে বস্‌তে যাবে কি—হল্লা উঠ্‌ল এত বেশী যে সভা ভেঙ্গে' যাবার উপক্রম! গাঁয়ের বামুন, কায়েৎ ও
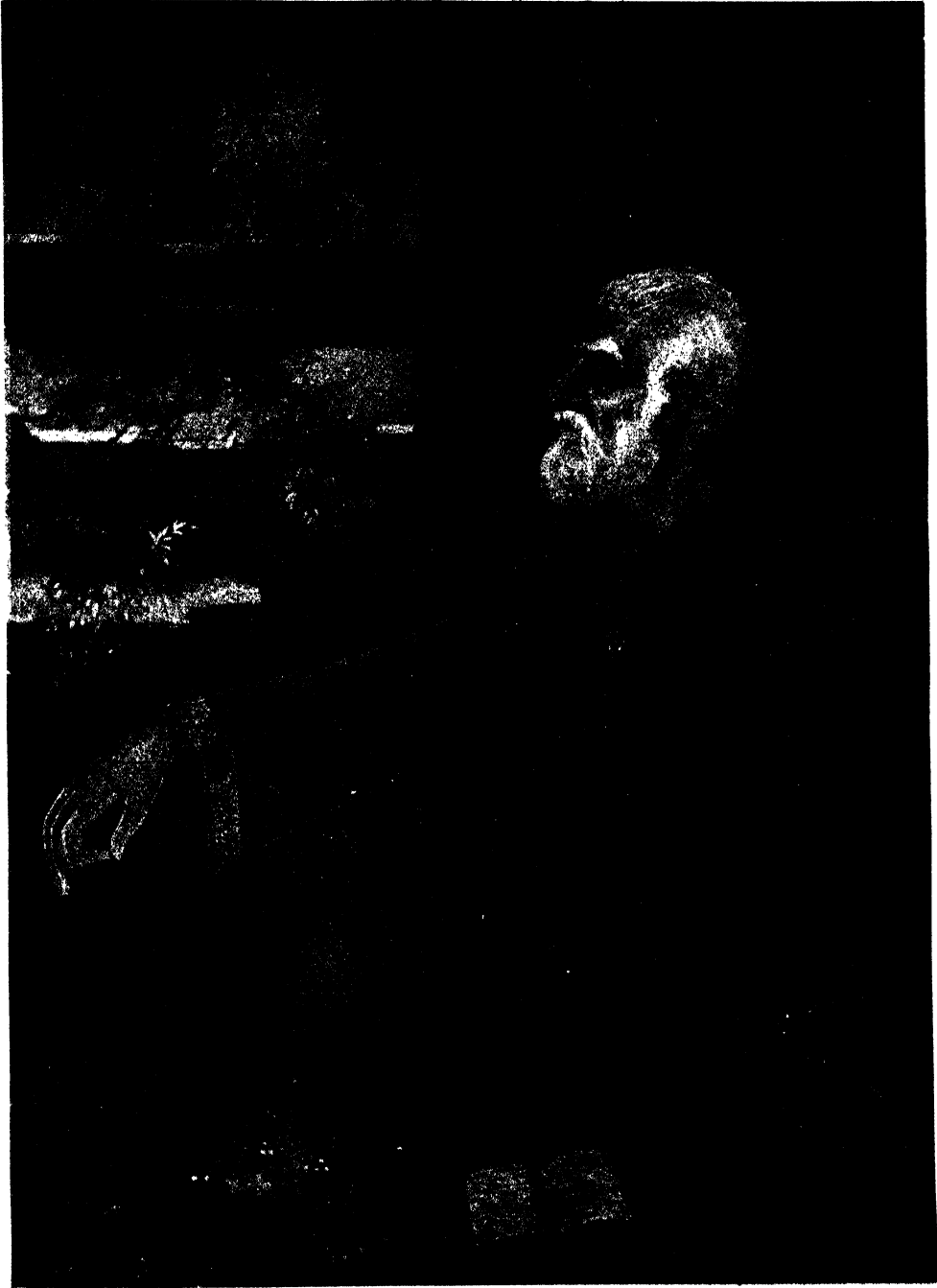
সংসার-মরীচিকা

শিল্পী—শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস]

অন্যান্য জাতির চেয়ে মাহিষ্যের সংখ্যাই অধিক। কোলে ব্যাটা কাউকে বাদ রাখে নি—চুনো-পুঁটী সবাইকে এনে' হাজির করেছে সভায়। সবাই চেঁচিয়ে' উঠেছে এক সঙ্গে। পণ্ডিতমশায় একটু 'নার্ভাস' হ'য়ে' পড়েছিলেন, তিনি হঠাৎ ব'লে' উঠ্‌লেন—"সাধু, সাধু! তারাশঙ্কর বাবাজীবনই আজ সভার আসন অলঙ্কৃত করুক—'বন্দেমাতরম্‌'!"

এবার আর নফর কোলের দল নয়, ছেলে-বুড়ো সবাই চটাপট করতালি দিয়ে' সমর্থন জানিয়ে' দিল—এ সভার সভাপতি তারাশঙ্কর ছাড়া আর কেউ নয়।

তারিণী চাটুয্যে হঠাৎ এই রকম হাওয়া বুঝে একটু পিছিয়েই দাঁড়িয়েছিল; শঙ্কর এ-দিক্‌ ও-দিক্‌ চেয়ে' দেখ্‌ল, তারিণী নেই। সভার উত্তেজনায় তার হৃদয়টাও দুরু দুরু করে' উঠ্‌ছিল উৎসাহে। সে বিনা প্রতিবাদে সভাপতির চেয়ারখানায় ঝুপ করে' বসে' পড়্‌ল। এবার আর একবার নয়, বার বার তিন বার পর্দ্দায় পর্দ্দায় চড়িয়ে' ধ্বনি উঠ্‌ল, "বন্দেমাতরম্‌! বন্দেমাতরম্‌!! বন্দেমাতরম্‌!!!"

(৩)

শরতের প্রভাত। চণ্ডীমণ্ডপের সাম্‌নে শিউলীতলা শিশির-সিক্ত ফুলে ছেয়ে' গেছে। আর সুবাস ছুটেছে সমস্ত বাড়ীখানি আমোদিত করে'। রায়-মশায় টুলে বসে' বাঁ হাতে হুঁকা আর ডান হাতে কলিকা নিয়ে' ফুঁ পাড়্‌ছিলেন গাল ফুলিয়ে'। বৃদ্ধ হৃদয়নাথ এসে' খবর দিলেন—"রায়-মশায়, ষোল কড়াই ভূয়ো, তোমার ছেলে গর্ভস্রাবেই গেছে! বামুনের মুখে মিথ্যা কথা বলা ভাল নয়—সেদিন বলে' গিয়েছি, ছেলে তোমার ডেপুটী হবে—আজ বলে' যাচ্ছি, ও-ছেলে জেলে যাবে। ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু এলেও একথার রদ হবে না।"

ভোরে উঠে'ই ব্রাহ্মণের মুখে নিষ্ঠুর অভিসম্পাতের মত এই কথায় পুত্রবৎসল পিতার হৃদয় মুচ্‌ড়ে' উঠ্‌ল করুণ বেদনায়; তিনি কিছু জবাব দিতে পার্‌লেন না। ঘন ঘন কলিকায় ফুঁ পেড়ে', কড়ি-বাঁধা হুঁকাটা টেনে' এনে' তাড়াতাড়ি হৃদয়নাথের হাতে তুলে' দিলেন। হৃদয়নাথের কথাটা বলে'ই চলে' যাওয়ার ইচ্ছা ছিল—কেন না, কাল রায়ের-পো পাড়ায় গিয়ে যা' আস্ফালন কর্‌েছে গোড়ালী ঠুকে', তাতে শুধু তার দফা ঘায়েল হয় নি; এই পরিবারের সহিত বন্ধুত্ব রাখ্‌লেও বিপদের সম্ভাবনা আছে। তাঁর ছেলে পোষ্টমাষ্টার জানকী কাল রাত্রেই পিতাকে একথা জানিয়ে' দিয়েছে। আর পথে কেদার বাগ্দীও লাঠী ঠুকে' চলেছে কোতোয়ালীতে—গাঁয়ের চৌকীদার সে—হাতে তার পঞ্চায়েতের রিপোর্ট—সেও বলে' গেল, "দা'-ঠাকুর, রায়-মশায় ছেলেটাকে ইংরাজী পড়িয়ে' ভাল করেন নি—হাতে দড়ি পড়্‌ল বলে'।"

কিন্তু তাম্রকূটের সৌগন্ধে তাঁর নাসাপুট ভরে' উঠেছিল; তৈরী তামাক সকালে ছেড়ে' যাওয়া সঙ্গত নয়। তিনি দাঁড়িয়ে'ই টান্‌তে সুরু করে' দিলেন, আর ফাঁকে ফাঁকে এই কথাগুলোও উপদেশের মত বলে' গেলেন।

"রায়-মশায়, ছেলেকে আর বাড়্‌তে দিও না। একটা কালীর আঁচড়েই ডেপুটীগিরি গেল; আর দু-চারটে যদি তার উপর আঁচড় পড়ে, মুহুরীগিরিও জুটবে না। হৃদয় বাঁড়ুয্যের বাক্য বেদবাক্যের মত অকাট্য।"

তামাকের আদ্যশ্রাদ্ধ শেষ হ'ল। হৃদয়নাথ লাঠী ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে প্রস্থান কর্‌লেন। রায়-মশায় হেঁকে' ডাক্‌লেন—"বৌমা!"

শুভ্রকান্তি, বৈধব্যমূর্ত্তি পুত্রবধূ এসে' সাম্‌নে দাঁড়াল। রায়-মহাশয় জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"শঙ্কর কোথা!"

—"ভোরে উঠে'ই বেরিয়ে' গেছেন—"

—"এলে ব'লো কাল সভা করে' যে কেলেঙ্কারী সে করেছে, নাকে খৎ দিলে তবে তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ। ছেলে পাস্‌ করেছে বলে' ভয় আমার নেই, তা' আমি বলে' দিচ্ছি। রাগ্‌লে আমার জ্ঞান থাকে না জান তো!"

পারুল এসে' বৃদ্ধের গলা জড়িয়ে' ধর্‌ল। বৃদ্ধের চক্ষে আসন্ন অশ্রু উদ্গত হওয়ার উপক্রম কর্‌ছিল। নাৎনী পারুলকে চুম্বন করে' বৃদ্ধ তা' সাম্‌লে নিলেন।

শঙ্করের অবকাশ নাই নাওয়ার-খাওয়ার। তার পরদিন নফর কোলে তাকে নিয়ে গেল চাঁপাডাঙ্গায়। সেখানকার কাজ শেষ না হ'তেই পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম থেকে ছেলেরা এসে' ধর্‌ল হাটে সভা বসাতে হবে'—তবু পৌরোহিত্য কর্‌তেই হবে শঙ্করকে। শঙ্কর ভুলে'

সে পিতার একমাত্র সন্তান, বিধবা ভ্রাতৃবধূর কথা। জ্যেষ্ঠ সহোদর মৃত্যুকালে তার দুটি হাত ধরে' বলেছিল—"দেখো ভাই, রায়-পরিবারের আভিজাত্য-মর্য্যাদা যেন রক্ষা পায়!" সে যত সভায় যায়, ততই তার মনে হয়, নেতৃহারা জাতিটা আজ কেবল আত্মচৈতন্য অজাগ্রত বলে'ই বিশ্বের কাছে লাঞ্ছনায়, উপেক্ষায় ম্রিয়মান্ হয়ে' আছে—তাকে জাগাতেই হবে দেশাত্মবোধের অগ্নিমন্ত্রে—তাকে বুঝাতেই হবে এদেশের অতীত গৌরব ও মহিমার কথা—তার জাতি চিরদিন অবনত হয়ে' থাক্‌বে না; তাকে মাথা তুল্‌তেই হবে আত্মবিশ্বাস বুকে নিয়ে'; সোজা হয়ে' দাঁড়াতে হবে স্বাবলম্বনের ভিত্তির উপর। সভায় দাঁড়িয়ে' যখন সে বলে, মনে হয় যেন কোন অজানা চেতনার স্তর থেকে নেমে' আসে আগুনের টুক্‌রার মত বাণীর পর বাণী। শ্রোতাদের ম্লান মুখে আলোর প্রলেপ পড়ে, বহুদিনের জড়তা, পঙ্গুতা ঘুচে' তাদের মেরুদণ্ড ঋজু হয়ে' উঠে, নীরব বীণা আবার বেজে' উঠে কণ্ঠনিনাদে—তুমুল গর্জ্জন উঠে সভায় সভায় "বন্দেমাতরম্।"

তারাশঙ্করের ডাক পড়্‌ল এবার কলিকাতা থেকে। স্বদেশী-প্রচারের মহাঋত্বিক্, এই খ্যাতি তার বেজে' উঠেছে দেশময়। স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথের আহ্বান, স্বদেশী-প্রচার-সংহতির নিখিল-বঙ্গ-সম্মেলনে তাকে আস্‌তেই হবে নেতার পরামর্শ ও উপদেশ দিতে—দেশকে জাগাতে হবে, মাতাতে হবে, স্বদেশীর মন্ত্রে, আর কোটি কোটি কণ্ঠে প্রতিবাদের রব তুলে' রদ কর্‌তে হবে বঙ্গচ্ছেদের রাজবিধি। শঙ্কর তাড়া-তাড়ি বাড়ী ফির্‌ল—পিতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে' কলিকাতা-যাত্রার জন্য।

"না, না, না—আমি বল্‌ছি, এসব কাজ তোমার নয়। যা' হবার হয়েছে। ডেপুটী না হও, একটা কেরাণীগিরির চেষ্টাও দেখ। একজনের শোকে বুক ছাই হয়ে' যাচ্ছে—কাটা-ঘায়ে নুনের ছিটে দিও না!"

শঙ্কর আজ উভয়-সঙ্কটে। পিতা ধনুক ভাঙ্গা পণ করে' বসেছেন—দেশসেবার যজ্ঞে সে যদি যোগ দেয়, তবে তিনি তাকে ত্যাজ্যপুত্র কর্‌বেন, ইহজীবনে আর মুখ দেখ্‌বেন না।

অনেক কথা-কাটাকাটি করে'ও শঙ্কর পিতাকে বুঝাতে পারে নাই—যে ক্ষেত্রে ঋষিতুল্য সুরেন্দ্রনাথ নেতৃত্বের নিশান উড়িয়ে' চলেছেন, দেশবরেণ্য মহাকবি রবীন্দ্রনাথ যেখানে দাঁড়িয়ে স্বস্তি-মন্ত্র উচ্চারণ কর্‌ছেন, যেখানে দেশের বরণীয় কমলার বরপুত্রগণ অশেষ দুঃখ বরণ করে' স্বদেশসেবায় তনুমন ঢেলে' দিয়েছেন, সে ক্ষেত্রে তার মত একজন নগণ্য সন্তান যদি আত্মদান করে, শুধু সে ধন্য হবে না, তার পিতৃকুল মাতৃকুল ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে চির-দীপ্তই হবে। বংশমর্য্যাদা বর্দ্ধিত হবে। জন্মভূমির সেবার ন্যায় বড় চাকুরী ভাগ্যবান্ মানব ব্যতীত সকলের ভাগ্যে ঘটে না। কিন্তু কোন কথাই পিতা তার কাণে নিলেন না। তিনি ভূনত দৃষ্টিতে চরম কথা উচ্চারণ করে' ফেল্‌লেন—"শোন আমার শেষ জবান; যদি এ সব না ছাড়, আমি তোমার আর মুখদর্শন কর্‌ব না। জেনো, যদি করি, তবে আমার জন্মের ঠিক নেই।"

আড়ালে দাঁড়িয়ে ভ্রাতৃবধূ সবিস্ময়ে করুণ নয়নে দেবরের মুখের দিকে চেয়েছিল—মনে হচ্ছিল, এই কথার উত্তরে বুঝি সর্ব্বনাশের আগুন জলে' উঠ্‌বে। স্বামি-বিয়োগের পর দুর্ভাগ্যের লক্ষণ ছাড়া তার চোখে আর কিছু দেখা দেয় নি।

বিছানায় উপুড় হয়ে' শঙ্কর কাঁদ্‌ছিল ফুঁপিয়ে' ফুঁপিয়ে'। তার হৃদয়ে তুমুল ঝটিকা—যেন সে একান্ত নিরাশ্রয়, একান্ত নিরুপায়; জীবনের কর্ত্তব্যনির্ণয়ের এই বৈপ্লবিক সন্ধিক্ষণে হয়, তাকে মর্‌তে হবে, নয় তাকে ত্যাগ কর্‌তে হবে এই সংসার—পিতৃস্নেহ, বিধবা ভ্রাতৃবধূর করুণ মমতা। সে আকুল হয়ে' কেঁদে' উঠ্‌ছিল শিশুর মত ডুক্‌রে' ডুক্‌রে'।

রন্ধনশালায় বসে' অসহায়া পারুলের মা একবার দৃঢ়-সঙ্কল্প বৃদ্ধ শ্বশুরের দিকে চেয়ে' থাকে—যেন একটা আতঙ্কের তিনি প্রতিমূর্ত্তি—আর একবার উঠে' গিয়ে' দেখে' আসে সর্পদষ্ট ব্যক্তির ন্যায় শঙ্করকে উঁকি মেরে'। রন্ধনে তার মন ছিল না আদৌ। উনুন নিবে' যাচ্ছিল বার বার,

বাটনা বাট্‌তে বসে' চোখের জলে শিল্-নোড়া ভেসে' যায়, কুট্‌নো কুট্‌তে গিয়ে' দুটো আঙ্গুল শোণিতাক্ত হয়ে' পড়ে। যত দুঃখ, যত উদ্বেগ, যত আতঙ্ক ঘিরে' ধরে' নিশ্বাস-রোধ করে' দেয়, ততই সে নিজেকে জীবিত বোধ করার জন্য কারণে অকারণে পারুলের কষা নিঙড়ে' ধরে, দেওয়ালে তার মাথা ঠুকে' দেয়; আর পারুল চীৎকার করে' কেঁদে' উঠে। কিন্তু কেউ তাকে থামায় না—সে নিজেই অবাক্ হয়ে' চুপ করে। সমস্ত সংসারটাই যেন প্রলয়ের মেঘে ছেয়ে' গিয়েছে। গোয়ালের গাভীগুলোও যেন সভয়ে থর-থরিয়ে' কেঁপে' উঠ্‌ছিল আচম্বিতে।

রায়-মশায় মধ্যাহ্নভোজনের পর অতিশয় গাম্ভীর্য্যে চণ্ডীমণ্ডপে হুঁকা নিয়ে' গিয়ে' বস্‌লেন। পারুলের মা সভয়ে শঙ্করের কাছে গিয়ে' করুণ কণ্ঠে বল্‌ল—"ঠাকুরপো, অনেক বেলা হয়েছে, কত দিন নাওয়া-খাওয়া কর নি, এমন রোগা হয়েছ, দেখ্‌লে ভয় হয়! ওঠো নাও, খাও—"

রাঙা জবা-ফুলের মত শঙ্করের চোখ দুটো কেঁদে' কেঁদে' লাল হয়ে' উঠেছিল, সে বিধবা ভ্রাতৃবধূর দিকে অতি অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে চেয়ে' বল্‌ল—"বৌদিদি, তোমার খাওয়া হয়েছে?"

—"বেশ কথা! তুমি রইলে সকাল থেকে বিছানায় পড়ে', জলটুকুও মুখে দিলে না—আমি কোন মুখে খাই বলতো!"

—"কাল তোমার একাদশী গেছে না?"

"ও কথা আবার কেন, একাদশী গেছে বলে' আমার জন্যে ভাব্‌তে হবে না! তুমি খাও ঠাকুরপো, বাবার কথা অবহেলা ক'রো না। কে আছে আর আমাদের তুমি ছাড়া—" চোখ দিয়ে জল ছিট্‌কে' বাহির হওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। হাসির অছিলায় তা' ঢাকা দেওয়া সম্ভব হ'ল না, কিন্তু ছলনা তাকে সাম্‌লে' দিল—শঙ্কর বল্‌ল, "পারুল কোথায়, বৌদি?"

পারুলের মায়ের মন থেকে সারা দিনের মিশ্-কালো মেঘখানা যেন এক মুহূর্ত্তে সরে' গেল আলোর ঝিলিক্ ফুটিয়ে'। সে তাড়াতাড়ি পারুলকে উঠান থেকে ধরে' এনে' দেবরের কাছে রেখে' বল্‌ল—"সারাদিন তুমি কথা কও নি, পারুলের ফুলে' ফুলে' সে কি কান্না!

সূর্য্যোদয় হয়েছিল যেন একটা দুর্দ্দিনের সূচনা নিয়ে'। শরতের সূর্য্যাস্তে সোণার আভায় পারুলের মায়ের মন প্রফুল্ল হয়ে' উঠ্‌ল। নিরাশ্রয় হওয়ার আতঙ্কে তার চিত্ত হয়ে' উঠেছিল অধীর উদ্‌ভ্রান্ত—সে সারা অপরাহ্ন ধরে' দেবরের সঙ্গে সংসারের ভালমন্দ কথা নিয়ে' কাটিয়ে' দিল পরমানন্দে। সন্ধ্যার প্রদীপ জেলে' আবার সে দিনান্তে রন্ধনশালায় গিয়ে' ঢুক্‌ল। আজ রাত্রে পিতা-পুত্র পাশা-পাশি বসে' ভোজন কর্‌বে, সেই আশায় সে অনেক সু-খাদ্য-রচনার উদ্যোগ করে' দিল।

কম্পিত প্রদীপশিখায় কা'র ছায়াপাত হ'ল। পারুলের মা ফিরে' দেখ্‌ল, তার দেবর দাঁড়িয়ে, সজ্জিত বেশে—আসন্ন যাত্রার জন্য সে যেন প্রস্তুত হয়ে' এসেছে। তার মুখে কথা সর্‌ল না। সর্ব্বাঙ্গ থর-থর করে' কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল। শঙ্কর ভূমিষ্ঠ হয়ে' প্রণাম কর্‌ল ভ্রাতৃ-বধূর চরণে। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ; তবু হৃদয়-ভেদী কয়েকটা শব্দ উচ্চারিত হ'ল—"কোথায় যাচ্ছ, ঠাকুরপো—"

শঙ্কর কেঁদে' ফেল্‌ল ঠিক বালকের মত। পারুলের মা আশঙ্কায় উদ্বেগে টল্‌তে টল্‌তে তার হাত-দু'খানা নিজের হাতের মধ্যে চেপে রেখে' বলে' উঠ্‌ল—'ঠাকুরপো, চলে' যাচ্ছ আমাদের ছেড়ে'—"

কাতর কণ্ঠে শঙ্কর উত্তর দিল—"হঁ।"

—"কি নিষ্ঠুর!"

—"বৌদি" বলে'ই গলা তার ধরে' গেল—আবার একটু সাম্‌লে বল্‌ল, "পার্‌লাম না, পিতার প্রতি কর্ত্তব্য, তোমার প্রতি কর্ত্তব্য, দাদার শেষ আজ্ঞা—সব ভেসে' গেল বৌদি, দেশের ডাকে, আমি চল্‌লাম।"

উন্মাদের ন্যায় নক্ষত্র-বেগে সে সরে' গেল বৌদিদির দৃষ্টি থেকে। 'পারুলের মা'র মাথায় যেন আকাশের বজ্র ভেঙ্গে' পড়্‌ল। সে আর্ত্তনাদ কর্‌তে কর্‌তে উঠানে এসে' আছাড় খেয়ে' পড়্‌ল।

চণ্ডীমণ্ডপ থেকে বৃদ্ধ রায়-মহাশয়ের কণ্ঠে গীতার মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছিল—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংস সঙ্গস্তেষূপজায়তে।"

(৪)

ছয়মাস কেটে' গেছে। রায়-মহাশয় গীতা পড়েন প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে—আর মালা জপেন স্নানাহার ও নিদ্রা ব্যতিরেকে সর্ব্বক্ষণ। আহার করেন নাম মাত্র, তাঁহার শরীর শীর্ণ ও অঙ্গ মলিন হয়ে' পড়েছে। পারুলের মা নৈরাশ্যের ছায়ায় ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মেয়েটার মায়ায় তাকে যেন বাঁচ্‌তে হবে—তাই তার অস্তিত্ব। পারুল কাঁদে, দাদুর কণ্ঠে গীতার শ্লোক সন্ধ্যায় উচ্চারিত হয়, না হয় হাতের মালা বন্ বন্ করে' ঘুরে' চলে। এমনি করে' রায়-মশায়ের সংসার আলোয় ছায়ায় স্বপ্নের ন্যায় কেটে' চলেছে দিন দিন অস্তিমের পথে।

স্নান করে' মালা ঘুরাতে ঘুরাতে রায়-মশায় চণ্ডীমণ্ডপের উঠানে যেমনই এসে দাঁড়িয়েছেন—তারিণী চাটুয্যে খবরের কাগজ খুলে' এক নিঃশ্বাসে পড়ে' গেল "তারাশঙ্কর মেদিনীপুরের হাটে যে অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা করেন তার মধ্যে সিডিশান বেরিয়েছে, আদালতের বিচারে তার হয়েছে ছয় মাস কারাদণ্ড।" বৃদ্ধ রায়-মশায় যেন সে কথা কাণেই নিলেন না, এমনি ভাব দেখিয়ে' বাড়ীর ভিতর গিয়ে' প্রবেশ করলেন। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে' পারুলের মায়ের কাণে কথা গিয়ে' পৌঁছেছিল, কিন্তু শ্বশুরের স্তব্ধ গম্ভীর মূর্ত্তি দেখে' কোন কথাই উচ্চারণ করতে পারল না। যথাবিধি ভাত বেড়ে তাঁকে আসন পেতে দিল।

রায়-মশায়ের ওষ্ঠপুট স্পন্দিত হচ্ছিল নামে, কিন্তু পারুলের মা স্পষ্টই দেখ্‌ল—মাঝে মাঝে তা' স্তব্ধ হয়ে' পড়্‌ছে। গণ্ডুষ করতে গিয়ে' তিনি তিনবার হাতে জল নিলেন, কিন্তু আচমন করা হ'ল না। ভাতে হাত দিলেন উদাসীনের মত, মুখে ভাত আর উঠে না। অন্ন-ব্যঞ্জন নিয়ে' স্থালীতে অঙ্গুলী-সঞ্চালনই হয়। বৃদ্ধ দমকে নিঃশ্বাস নিয়ে' ভাতের থালা ছেড়ে' উঠে' পড়্‌লেন। পারুলের মা ছুটে' এসে' পা জড়িয়ে' ধরে' বল্‌ল—"বাবা, অবলার মুখ রাখুন—এমন করে' ক'দিন জীবন থাক্‌বে—কি হবে বাবা, আমার!"

রায়-মশায় পিঁড়ির উপর স্থির হয়ে' দাঁড়িয়ে' রইলেন কয়েক মুহূর্ত্ত। কি বল্‌তে যাচ্ছিলেন—কিন্তু কোঠর-গহ্বরে সজল নয়ন বাষ্পসা হয়ে' উঠেছিল—বাক্যস্ফূর্ত্তি হ'ল না। বধূমাতার কাঁধের উপর হাত রেখে'ই তিনি মুমূর্ষুর ন্যায় চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে' বিছানা নিলেন। মাঘ মাসের শেষ শীতের আমেজ যায় নি—কিন্তু ঘেমে' তাঁর সর্ব্বাঙ্গ ভিজে' যাচ্ছিল। পারুলের মা বৃদ্ধের এই অবস্থা দেখে' একখানা পাখা নিয়ে' বন্ বন্ করে' বাতাস করতে করতে চেঁচিয়ে বলে' উঠ্‌ল—ওরে ও-পারুল, পাশের বাড়ী থেকে তোর মধু খুড়োকে একবার ডাক্‌তো।"

রায়-মশায় কম্পিত কর অতি ধীরে বধূমাতার মাথায় তুলে' দিয়ে' অনুচ্চ কণ্ঠে বল্‌লেন—"ভয় নেই, বুকটা কেমন করছে!"

ত্রিবেণীর ঘাট। প্রায় অপরাহ্ণ, শুক্লপক্ষের চতুর্থী পঞ্চমী হবে। ভরা জোয়ার। বৃদ্ধ রায়-মশায়কে তীরস্থ করা হয়েছে। পাড়ার দু' একজন বৃদ্ধ, যুবকও সঙ্গে আছে। পারুলের মা শিয়রে বসে' পাখা করছে—আর সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে' আছে স্তিমিত প্রদীপের নির্ব্বাণ-প্রতীক্ষায়।

বৃদ্ধ হৃদয়নাথও সঙ্গে এসেছিলেন। ইসারায় তাকে কাছে ডেকে' রায়-মশায় বল্‌লেন—"হৃদ্‌-দা সূর্য্যাস্তের বেশী দেরী নেই বুঝি, রোদ পড়ে' আস্‌ছে না?" কথাগুলি গোঁইয়ে' গোঁইয়ে' বেরিয়ে' এল শ্বাসকষ্টের মধ্যেই কণ্ঠ বিদীর্ণ করে'।

হৃদয়নাথ আর্ত্তনাদ করে' উঠলেন। বল্‌লেন—"রায়-মশায় এমন সজ্ঞানে গঙ্গালাভ আমার ভাগ্যে হবে কি? বেশ যাচ্ছ ভায়া, আমায় সঙ্গে নিও।" রায়-মশায় যেন কি বল্‌তে চেয়েছিলেন—দক্ষিণ হস্তটী তুলে' যেন কি হাতড়াচ্ছিলেন। একজন পারুলকে তাঁর কাছে বসিয়ে' দিল—হাতখানা মাটীর উপরই সার্পের মত লতিয়ে' বেড়াত লাগ্‌ল। হৃদয়নাথ বল্‌লেন—"আর কি, হরি-হরি বল—ওসব শেষ লক্ষণ!"

পারুলের মা তাড়াতাড়ি মুখের কাছে এসে' বল্‌ল—"বাবা," এক ঢোঁক জল মুখে দিতেই বৃদ্ধ একটু সচেতন হয়ে' ধীরে বল্‌লেন—"একটা কথা মা, ভয় নেই কিছু তোমার—ভগবান রইলেন। মুখে আগুন—" মুমূর্ষু বৃদ্ধের

চক্ষে অশ্রু দেখা দিল। হৃদয়নাথ বলে' উঠ্‌লেন, "কিছু ভয় নেই ভাই, অমন সতী-লক্ষ্মী পুত্রবধূ, তোমার মুখে আগুন ওই দেবে।" বৃদ্ধ অতি কষ্টে ঘাড় নেড়ে' জানালেন—"না"। হৃদয়নাথ সাগ্রহে বল্‌লেন—"সে কি কথা, বেড়া আগুনে ভাগ্যবান্ পোড়ে না। ও সব কথা তুমি ভেবো না—ভগবানকে স্মরণ কর।"

রায়-মশায় ক্ষীণ-কণ্ঠে বল্‌লেন, "মুখে আগুন দিও না।" চক্ষু বুজে' কি যেন ভেবে নিয়ে' আবার বল্‌লেন "গীতা কই?" তারিণী চাটুয্যে গীতাখানা খুলে' তাঁর চোখের সম্মুখে ধর্‌লে বৃদ্ধ বদন বিকৃত করে'ই বল্‌লেন "থাক্, থাক্। যে মুখে গীতার উচ্চারণ করেছি, সে মুখে আগুন দিও না।"

তারিণী চাটুয্যে বলে' উঠ্‌ল, "পারুলের মায়ের নামে লাট-সাহেবকে টেলিগ্রাম করা হয়েছে! তারাশঙ্করকে ছেড়ে' দিতে পারে।" বৃদ্ধের নয়ন নিমীলিত হয়ে' গেল, আর ললাটে ফুটে' উঠ্‌ল আকুলতার আকুঞ্চন।

সোনালী রঙে পশ্চিম আকাশ ছেয়ে' গেছে। নদীর বুকে হীরক-খণ্ড জ্বলেছে ঝিক্-মিক্ করে'। উর্দ্ধশ্বাসে তারাশঙ্কর পিতার মৃত্যুশয্যায় পাশে এসে' দাঁড়ালেন। একটা কলরব পড়ে' গেল ত্রিবেণীর ঘাটে। পিতা নিমীলিত চক্ষেই অনুভব কর্‌লেন, পুত্র তাঁর উপস্থিত। কিন্তু কপালে অসংখ্য সর্পরেখায় কিল্‌-বিলিয়ে' উঠ্‌ল—তাঁর সঙ্কল্পের কথা "সে তার ত্যাজ্যপুত্র!'

হৃদয়নাথ উৎসাহে উচ্চৈঃস্বরে বলে' উঠ্‌লেন, "ভাগ্যবান্ তুমি রায়-মশায়, মধুর সায়াহ্ন, ত্রিবেণীসঙ্গম পূর্ণ-গর্ভ—যোগ্য সন্তান সম্মুখে তোমার, মুখাগ্নি বিধাতাও রোধ কর্‌তে পার্‌বে না।"

দুর্ব্বল শীর্ণ কর উত্তোলন করে', সবলে হাত তুলে' রায়-মশায় বল্‌লেন—"না না, ও আমার ত্যাজ্যপুত্র!"

শঙ্করের পায়ের তলা থেকে মনে হ'ল, যেন পৃথিবী সরে' যাচ্ছে। আকুল অনুনয় তার ওষ্ঠপুটে অতি করুণ রবে বেজে' উঠ্‌ল—"বাবা! বাবা! অবাধ্য হয়ে'ই দেশের ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম—কিন্তু পিতার প্রতিও শেষ কর্ত্তব্য সন্তানের আছেই আছে—কি কর্‌তে হবে, বলুন?"

স্তিমিত নয়ন উন্মীলিত হ'ল; ধীরে ধীরে পিতা-পুত্রের দৃষ্টি-বিনিময়ে দু'জনেরই সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত হ'ল অপার্থিব আনন্দে।

পিতা ক্ষীণকণ্ঠে বল্‌লেন—"অধিকার!" পারুলের মা ঝিনুকে করে' কয়েক বিন্দু গঙ্গা-জল বৃদ্ধের মুখে ঢেলে' দিল।

বৃদ্ধ আবার বল্‌লেন—"সময় যে আর নেই, শঙ্কর! অধিকার ফিরে' পাওয়ার—"

"মৃত্যু তো আছে, বাবা।" শঙ্কর আছাড় খেয়ে' পড়্‌ল পিতার চরণে—মরণপথের যাত্রী, তাঁরও সর্ব্বশরীর যেন শিউরে' উঠ্‌ল মমতার মোচড়ে।

অতি মৃদুস্বরে পিতা বল্‌লেন, "সে অধিকার পাওয়া বড় শক্ত, বড় কঠোর—পার্‌বে কি?"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে শঙ্কর পিতার মুখের কাছে মুখ রেখে' বল্‌ল, "মর্‌তে পারি—তার চেয়ে আর কি কঠোর কর্ম্ম আছে, বাবা—যা' তোমার শঙ্কর পার্‌বে না!"

একটু স্থির থেকে বৃদ্ধের মুখে বাণী ফুট্‌ল অস্পষ্ট—"অঞ্জলীপূর্ণ গোময়-ভক্ষণ।"

লম্ফ দিয়ে উঠ্‌ল শঙ্কর উৎসাহে, সিংহ-বীর্য্যে তার প্রতি লোমকূপে পুলকের অগ্নিশিখা জ্বলে' উঠ্‌ল। সে ঝাঁপ দিয়ে পড়্‌ল ত্রিবেণীর ভরা বুকে—সিক্ত স্নাত শঙ্কর ঘাটে সঞ্চিত গোময়-স্তূপ থেকে এক অঞ্জলী পুরীষ উদ্ধৃত করে' অমৃতের ন্যায় নির্ব্বিকার মুখে ভোজন কর্‌ল—চক্ষের নিমিষে।

হঠাৎ দক্ষিণা বাতাস ফুটিয়ে' দিয়ে গেল শ্মশানের পাশে আধ-ফোটা বেল-কুঁড়িগুলিকে—মধুগন্ধে মেতে' উঠ্‌ল ত্রিবেণীর আকাশ-বাতাস। সকলে সবিস্ময়ে চেয়ে' দেখ্‌ল—রায়-মশায়ের বেদনাক্লিষ্ট মুখে মুক্তির আনন্দ, বিস্ফারিত চক্ষু স্থির—প্রাণবায়ু বহির্গত হয়ে গেছে!
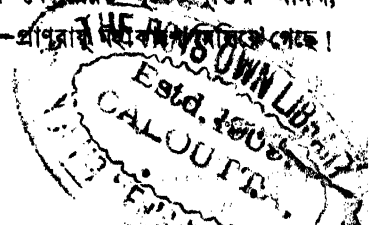
মহিলা

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

মহিলা বলিলে, আমরা সাধারণ নারী অপেক্ষা কিছু উচ্চ দরের নারী বুঝি।

কবি কুমারী কোলরিজ যীশুমাতাকে মহিলা-পদবাচ্য করিয়াছেন, যদিও তাঁর আভিজাত্য-গৌরব ছিল না।

আমার মনেও মহিলার যে আদর্শ আছে, যীশুমাতার সহিত তাহার সাদৃশ্য দেখিতে পাই। মহিলা বলিলে, শান্ত, ধীর, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, অবিচলিত ধৈর্য্যের ছবি মনে উদিত হয়। যখন দেবদূত আসিয়া যীশুর সম্ভাবনা মেরীকে জানান, তখনও তাঁহাকে বিচলিত হইতে দেখি নাই। পরে জীবনের কর্ত্তব্যে অবহিত থাকিয়া তাঁহাকে যে পরম দুঃখ বহন করিতে দেখিলাম, তাহাও এই আদর্শের অনুকূল। মহিলার কথায়, মনে পড়ে আমাদের এক নিকট আত্মীয়ের কথা। ভদ্রলোক পরমা সুন্দরী এক কিশোরীকে বিবাহ করেন। স্বামী স্ত্রী যখন সাক্ষাৎ করিতে আসেন, তখন কোনও শ্রদ্ধেয় আত্মীয় বলিয়াছিলেন বন্ধুর কিশোরী বধূ পরমা সুন্দরী; আর অপর দুইজন যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা মহিলা। আদর্শ খুঁজিতে বিদেশ-যাত্রা করিবার আবশ্যকতা নাই, তাহা স্বদেশেই দেখিতে পাইব। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, সীতা, সাবিত্রী, দয়মন্তীর উল্লেখ করা যাইতে পারে; তবে ইঁহারা পুরাণ-বর্ণিতা, ইঁহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান হইতে পারেন।

পঞ্চাশ বৎসর আগে এদেশে উচ্চ শিক্ষার সূত্রপাত হয়। সেই যুগের শিক্ষা-দীক্ষার ফল ৺কবি কামিনী রায়—জীবনে বহু দুঃখ তাঁহাকে বহন করিতে হইয়াছিল। তবুও কখনও স্বদেশের ও কর্ত্তব্যের ডাকে সাড়া না দিয়া তিনি পারেন নাই। শ্রীযুক্তা অবলা বসুকেও ঐ পর্য্যায়ে আসন দিতে হয়; কিন্তু তাঁহাকে প্রশংসাবাদ বাহুল্য, সকলেই তাঁহার দৈনিক জীবনে দৃষ্টিপাত করিলে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

এই প্রসঙ্গে কুমারী রাধারাণী লাহিড়ীর কথা মনে আসে,—তিনি ৺রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের আত্মীয়া ও আমাদের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। এই আশৈশব কুমারী ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ধারিণী আদর্শ মহিলা ছিলেন। অনেকেরই তাঁহাকে জানিবার সুযোগ হয় নাই। যত দিন স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ ছিল, তিনি বেথুন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। পরে তিনি গিরিধিতে বাস করেন, সেইখানেই জীবনান্ত হয়। তিনি চিরকালই আত্মপ্রতিষ্ঠ ও আত্মনির্ভরশীল ছিলেন।

আমাদের সময়ের পর, নারীর জীবনাদর্শের বহুল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন বি-এ, এম-এর সংখ্যা অগণ্য; তাঁহারা শুধু শিক্ষাকেই মূলমন্ত্র করেন নাই—দীক্ষা লইয়াছেন স্বাধীন ভারত গড়িয়া তুলিবেন। এজন্য চরম-পন্থীদিগের সহিত যোগ দিয়া অনেক কিছু করেন, যাহার সহিত আমাদের সহানুভূতি নাই। জীবনগঠনের মূলে ধর্ম্ম—যাহা চিরদিন আচরিত হইয়া আসিতেছে। স্বদেশকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিতে হইলে আপামর সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার প্রয়োজন—এই পথ ছাড়িয়া দিলে, কোন পথ ধরিতে হইবে তাহার ইঙ্গিত কিম্বা নির্দ্দেশ খুঁজিয়া পাই না। আজ কাল দেশের যে পরম দুর্দ্দিন, ইহার জন্যও অর্থসমস্যা পূরণ করা আবশ্যক।

পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, সকলকেই সাহায্য না করিলে জীবনযাত্রা দুরূহ ব্যাপার। এই সময়ে আমরা যদি 'ছেড়ে দিলাম পথটা, বদলে গেল মতটা'—করি, তবে পারিবারিক জীবন ভাঙ্গিয়া পড়ে—অপর পক্ষে, অনেক সময়ে রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত থাকার জন্য পিতামাতাকেও লাঞ্ছিত হইতে হয়।

যদিও এযুগে "আগে চল, আগে চল ভাই" ছাড়া উপায় নাই—প্রত্যেকের শক্তি সম্মুখ-পথে অগ্রসর হইবার জন্য যখন নিতান্ত নিয়োগ করিতে হইবে, তখন শিক্ষা, দীক্ষা, বিদ্যালয়, আশ্রমের প্রতিষ্ঠাকেই জীবনের কর্ত্তব্য বলিয়া মানিয়া লইব না বিপথে বিঘোরে ঘুরিব—সেইতো সমস্যা! এমন গুরু পাওয়া দুরূহ যিনি 'নান্যঃ পন্থাঃ অয়নায়' বলিয়া আমাদের চালনা করিতে পারেন—আর তাহা বাঞ্ছনীয়ও মনে করি না, নিজের মনে বিচার করিয়া চলিতে হইবে। শ্রোচ্চের

সীমা অতিক্রম করিয়া বার্দ্ধক্যে উপনীত, এ বয়সেও মত-পরিবর্ত্তন সহজ না হইলেও সম্ভবপর; যদি সমীচিন কারণ পাই—কিন্তু কারণ বর্ত্তমানে দেখিতেছি না। বালিকা-বয়স হইতেই বাসনা পোষণ করিয়া আসিতেছি, দেশের জন্য কিছু করিব; তাহার উন্নতি-সাধন যত বারই ভাবিয়াছি, শিক্ষাবিস্তার ভিন্ন অন্য কিছু মনে করিতে পারি নাই, আর এ শিক্ষা নীতিমূলক। কোন ধর্ম্মই শিক্ষা দেয় না, নীতিবিরুদ্ধ পথ ধর—সে কি হিন্দু, কি ইসাহি, কি মুসলমান, এই সঙ্কেতটুকুই যথেষ্ট। 'মহিলা' শব্দের সহিত সৌজন্যের একটি আদর্শ আছে, যাহা সহজাত। মনে পড়ে তখন মহাযুদ্ধ—হাসপাতাল (Hospital) ইত্যাদিতে বস্ত্র-দৈন্য, তাই আমি ও আর এক ইংরেজ মহিলাবন্ধু—স্বামী তাঁর বিশেষ উচ্চপদস্থ—আমরা দুই জনে কাপড়ের গাঁঠি লইয়া যাত্রা করিলাম। সম্মুখেই নিকটবর্ত্তী কোনও হাসপাতালে প্রথম গেলাম। মোটর-চালক সংবাদ জানাইল, আমরা কাপড় লইয়া উপস্থিত। এক শুশ্রূষাকারিণী বসিয়াছিলেন, তিনি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অগত্যা নিজেদেরই নামাইতে হইল। মহিলা-বন্ধু বলিলেন, "Ladies are born, not made"—ব্যক্তিত্ব-বিকাশের এযুগে এই সৌজন্যের অভাব দেখিতে পাই কি স্বদেশে, কি বিদেশে।

আমি জানি, আমার সহিত অধুনাতন নারীর মত-বিরোধ ঘটিবে। উপায় নাই, সত্য বলিয়া যাহা জানিয়াছি তাহাই বলিব। 'সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ'—আশা করি, অপ্রিয় সত্য বলিয়া কাহারও মনে ব্যথা দিলাম না। আমরা মধ্যপন্থী, শিক্ষাবিস্তার করাই দেশের উন্নতিসাধন করার প্রধান ও প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া ভাবি। মত ব্যক্ত করিবার জন্য যখনই অনুরুদ্ধ হইয়াছি, তখনই ইহাই করিয়াছি—কাজেই নূতন আর কি বলিব! পুরাতন কথা বার বার বলা ও শোনা শ্রান্তিকর।

কাজেই আমার কথা শেষ করিতে হয়। বাদানুবাদ উপস্থিত হইলে, আমি তর্ক-বিতর্কের মধ্যে যাইব না। অপরে আপন আপন মত প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধগৌরব বৃদ্ধি করুন—তাহাতে আমার সহানুভূতি আছে। কেবলমাত্র আমার অনুরোধ—আমার কথাগুলিও ভাবিয়া দেখিলে ভাল হয়, কেন না "বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং'। জীবন অবাধ গতি, লীলা তার বিচিত্র। যুগে যুগে আদর্শের তারতম্য যে ঘটিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। আমাদের পথে আমরা চলি; অন্যে যদি ভিন্ন পথ নির্ব্বাচন করেন, তাহাও ভাবিয়া দেখা ভাল। কুমারী কোলরিজের যে কবিতাটি উল্লেখ করিয়া এ প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছিলাম, মৎকৃত তাহারই অনুবাদ উদ্ধার করিয়া শেষ করিলাম—

দেবী যীশুমাতা

বড় মানুষের যত মেয়ে—
মহিলা যাদের নাম,
যীশুমাতা যিনি, তাঁরে করয়ে প্রণাম;
মহিলারা আজ তাঁরে বলেন মহিলা,
যীশু তবু অভিজাত কখনো না ছিলা।
দশের মতন তিনি, আছিলেন এধরণীর,
আয়োজন তাঁর লাগি আছিল না মিষ্টান্ন ননীর॥
আমাদের পথ যাহা তাহা কিন্তু নহে বিধাতার
বড় মানুষের মেয়ে, সবদেশে, তার
অর্দ্ধ পরমায়ুঃ দিত মহাভাগ্য মানি,
রাজি হ'ত কেটে দিতে হাত দুইখানি
দেবতার বাড়া পুত্রে অই মত ধরিতে জঠরে,
ভাগ্যবতী তাঁরি মত হ'ত যদি দেবতার বরে।
দেবতার মনোনীত হয় নাই রাজার ঝিয়ারী
দরিদ্র ঘরের নম্র পবিত্র কুমারী,
বাড়াবাড়ি উঁচু যাঁর ছিল না নজর,
প্রীত মনে বরিল যে দীন সূত্রধর—
গরীব বাপের মেয়ে যেমন, সে গরীব স্বামীর
ভালবেসে ঘর করে, আলো করে সকল তিমির॥
লুকান মনের তার আনন্দের সব কটি গান
গেয়েছিল খুসী-মনে খুলিয়া পরাণ—
কোনও মহিলার সাধ্য চিরদিন হ'ত না গাহিতে।
যদিও সে জানিত না পড়িতে লিখিতে।
শিক্ষাদীক্ষা ছিল না'ক, জানিত না শিল্প, কাব্য, কলা—
য়িহুদির মেয়ে মেরী সাধারণ ছিল চলা-বলা॥
আজো বাজে তাঁর গান ভবিষ্যের মনুষ্যের লাগি,
এমনি বাজিবে গান চির অনুরাগী—
করুণার কণ্ঠস্বরে তাঁর গানখানি
"দরিদ্রের নারায়ণ" বলেন বাখানি।
দরিদ্রের রহিবে না অন্ন আর বস্ত্রের ভাবনা,
ধনী যাবে রিক্ত হাতে, প্রেমহীন, দীন, শূন্যমনা॥

শক্তিচর্চ্চায় বাঙ্গালী মেয়ে

জাতির প্রাণশক্তির সর্ব্বাঙ্গীন জাগরণের উপরই একটা পরিপূর্ণ জাতীয়তা নির্ভর করে। বাঙালীর প্রতিভা ও মেধার খ্যাতি থাকিলেও, স্বাস্থ্য ও শারীরিক বলহীনতার দরুণ তার ভীরু ও কাপুরুষ অপখ্যাতি প্রবাদ-বাক্যের মধ্যেই যেন দাঁড়াইয়াছে। জাতীয়ভাবে এ দুরপনেয় কলঙ্ক দূর করা দুঃসাধ্য হইলেও, জন কয়েক ব্যায়ামবীর বাঙালীর কৃতিত্বে বিশ্বের ব্যায়ামজগতে বাঙালীর মুখোজ্জ্বল হইয়াছে। শিক্ষা-রাজনীতি-বিমানচালনা-মঞ্চশিল্প-চলচ্চিত্র প্রভৃতিতে বাঙলার মহিলা সুনামার্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু শক্তিচর্চ্চার দিক্ দিয়া বাঙালী নারী এখনও বহু পশ্চাতে। তাই কতিপয় বাঙালী কিশোরীকে এই দিকে উদ্বুদ্ধা হইতে দেখিয়া একটা আশার ক্ষীণ আলো আঁধারের কোলে কোলে ঝলকিয়া উঠে।

শ্রীমতী শান্তি পাল, কুমারী পূর্ণা ঘোষ, কুমারী বাণী ঘোষ, শ্রীমতী সুধা দেবী, শ্রীমতী মলিনা মজুমদার, কুমারী সাবিত্রী খাণ্ডেলওয়ালা, কুমারী নিরুপমা শীল (ন্যাশনাল এস, সি), কুমারী রমা সেনগুপ্ত, কুমারী ছায়ারাণী দত্ত (সেন্ট্রাল, এস, সি), কুমারী লীলা ভড় (সেন্ট্রাল এস, সি), কুমারী যুথিকা গুপ্ত (সেন্ট্রাল এস, সি), কুমারী বেলারাণী সরকার (ভবানীপুর ক্লাব), কুমারী লক্ষ্মী সেনগুপ্ত (কপিবাগান ক্লাব), কুমারী জয়ন্তী দাস (সেন্ট্রাল), কুমারী মীরা ব্যানার্জ্জি, কুমারী সেফালী, কুমারী সান্ত্বনা ঘোষ প্রভৃতির নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহারা প্রায় সকলেই অল্পবয়স্কা এবং শক্তিচর্চ্চায় বিশেষ উৎসাহিনী ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃতা হইয়াছেন। শ্রীমতী শান্তিপালের মোটর আটকাইতে কৃতিত্ব, কুমারী পূর্ণা ঘোষের দৌড়-দক্ষতা, কুমারী মীরা ব্যানার্জ্জির লোহার পাত বাঁকান ও অনেকেরই লাঠী-ছোরা-সন্তরণ-পটুত্ব বিশেষ-ভাবে আশাপ্রদ।

বাগবাজার জাতীয় সঙ্ঘের সভ্যা কুমারী বাণী ঘোষকে খেলা-ধূলায় বাঙলার মহিলাজগতে আদর্শা ও পথপ্রদর্শিকা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। বাণীর বয়স মাত্র বার বৎসর; কিন্তু ইহার মধ্যেই সে লাঠী, ছোরা, তরবারি প্রভৃতি খেলায় যে দক্ষতা দেখাইয়াছে, তাহা নারীদিগের মধ্যে তো নাই-ই, পরন্তু পুরুষের মাঝেও বিরল। গত

কুমারী বাণী ঘোষ

বৎসরের "বেঙ্গল অলিম্পিক" প্রতিযোগিতায় বাঙলার সমস্ত স্বজাতীয় নারীদের পরাস্ত করিয়া বাণী সাঁতারে "চ্যাম্পিয়ানেস" হইয়াছে। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের বিগত অক্ষয় তৃতীয়ার বিশাল মেলামণ্ডপে, বিপুল জনতার সম্মুখে, কুমারী বাণী লাঠীখেলায় অশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া দর্শকবৃন্দকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। এ ছাড়া, কলিকাতার বিভিন্ন লাঠী, ছোরা, যুযুৎসু প্রভৃতি খেলার প্রতিযোগিতায় অনেকবারই সে সাফল্য লাভ করিয়া পুরস্কৃতা

হইয়াছে। বিগত ৮ই ভাদ্র শনিবার কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে "ন্যাশান্যাল সুইমিং ক্লাবের" চতুর্থ বার্ষিক সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় কুমারী বাণী ঘোষ পুরুষদিগের ১১০ গজ বুক-সাঁতারের সাধারণ প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান ও মেয়েদের ১১০ গজ সাঁতারে প্রথম হইয়াছে। শুধু ক্রীড়াক্ষেত্রে বাণীর প্রতিভা নিঃশেষিত হয় নাই, নৃত্য, গীত, শিল্প, শিক্ষা, আবৃত্তি প্রভৃতিতেও তার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার নৈপুণ্য পরিদৃষ্ট হয়। বাণী বর্ত্তমানে কলিকাতা সাবিত্রী শিক্ষালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী এবং বিগত পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে।

বাণী ভবিষ্যতে জার্ম্মাণী ও পাশ্চাত্যপ্রদেশে ক্রীড়া-প্রদর্শন ও ইংলিশ-চ্যানেল পার হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ভবিষ্য বাঙালী জাতিকে শক্তিমান্ করিয়া তুলিবার জন্য বাঙলার মাতৃজাতির সম্মুখে শক্তি-চর্চ্চার আদর্শ স্থাপন করা বাণী স্বীয় জীবনের 'মিশন' বলিয়া মনে করে। তাহার এই মহীয়সী আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইলে বাঙালীর গৌরব-বৃদ্ধি হইবে। বাণীর শক্তি-চর্চ্চার মূলে আছে তার পিতামাতার ঐকান্তিক উৎসাহ ও সহযোগিতা। এমনটী সকল বাঙালীর ঘরে দেখা যায় না।

শেষের যাত্রা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সাহা

সন্ধ্যা আমার সম্মুখে এবে
যাত্রা করেছি সুরু।
বহু অনুতাপে হৃদয় আজিকে
কাঁপিতেছে দুরু দুরু॥

চলেছি দুঃখ দৈন্য বরিয়া
সংসার-মায়া ছাড়ি।
আজি নির্জ্জন সাগরের কূলে
সুদূরে দিলাম পাড়ি॥

মিছে মোহমায়া মিছে মেলামেশা
এ জীবন বুঝি ফাঁকি।
তোমারই জ্ঞানের মহিমা আজিকে
হৃদয় ফেলেছে ঢাকি॥

তব আহ্বানে জাগিছে পরাণ
বাজিছে মধুর গান।
তব ইঙ্গিতে যাইবে মিলায়ে
সব কিছু অভিমান॥

তোমার জীবনে লভিয়া জীবন
গাহিব তোমার জয়।
তোমার চরণে অন্তিমে যেন
লভি প্রাণ অক্ষয়॥
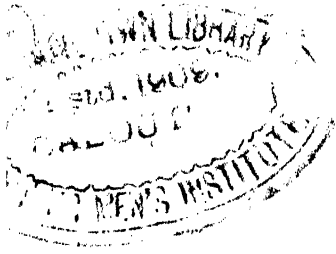
তামাক-শিল্প

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ

(১)

সে রামও নাই! সে অযোধ্যাও নাই!

সদা পরিবর্ত্তনশীল সৃষ্টির মাঝে রাগ-রাজত্ব চিরদিন থাকে না। একটা শক্তিমান্ ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিত্বের ছায়া-তলে সুখ-শান্তির স্পর্শ ক্ষণিকের তরে মানুষের হিয়ায় আনন্দের প্রলেপ দিয়া গেলেও দুঃখ-দৈন্য-অভাব মানবতার নিত্যকালের সহচর-রূপে যেমন একদিকে তার চোখে নৈরাশ্যের আঁধার ঘনাইয়া আনে, তেমনি আর একদিকে নিত্য সংগ্রামের মধ্য দিয়া তার সুপ্ত প্রাণশক্তিকে জাগাইয়া মানুষের পৌরুষের দেয় প্রতিষ্ঠা। একদা যখন নিঃসহায় একাকী মানুষকে বিজন অরণ্যে আহার্য্য আহরণ করিতে হইত, হিংস্র জন্তু ও প্রতিকূল পারিপার্শ্বকতার সঙ্গে সতত লড়িয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইত, তখন সে ছিল অসীম দৈহিক বলে বলীয়ান্, প্রাণও ছিল তার অবিনেয় হিংস্র। সে সুদূর অতীত যুগের কথা! তারপর হৃদয় ও মস্তিষ্ক-বৃত্তির ক্রমোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে যেমন তনু হইয়া পড়িল ক্ষীণ, তেমনি বুদ্ধির কৌশলে সে বনের অনম্র পশুকে মানাইল পোষ, আত্মতৃপ্তির প্রয়োজনে আকাশ-ভুবন-সাগর চুঁড়িয়া করিল একাকার। বাঁচিবার জন্য এ সংগ্রাম—জীবনের দ্যোতক, সৃজনের অনাহত অন্তঃপ্রেরণা। ইহার অবসান মৃত্যুরই নামান্তর। আজিকার এত অভাব, অনাটন, বিশ্বব্যাপী হাহাকারের মাঝেও পাশ্চাত্যের উদ্বৃত্ত প্রাণশক্তি উপচিয়া পড়িয়াছে অরণ্যে-কান্তারে-প্রান্তরে, শেষহীন গগনের কোলে কোলে, অসীম সমুদ্রের বুকে, সাগরের অতল তলে, সকল জানা-অজানা ক্ষেত্রে। প্রতীচীর এই অত্যুগ্র প্রাণের পরিচয়ের পাশে ভারতের, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীর দুরবস্থা বড়ই বেদনাময়।

সুজলা সুফলা বাঙলা—সকল দেশের সেরা, বিশ্বের ! প্রকৃতির লীলানিকেতন, সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ, প্রাচুর্য্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার এই সোণার বাঙলায় বাঙালী আজ অনাহারী। উপবাসী উদরের জ্বালায় সে করে আত্মহত্যা। দু'মুঠো উদরান্নের অভাবে শিক্ষিত বাঙালী নৈরাশ্যে মরণের মাঝে সান্ত্বনা খোঁজে। কিসের দৈন্য, কিসের অভাব তার? বাঙালীর আছে মেধা, আছে প্রতিভা; নাই বীর্য্য ও ধৈর্য্য—উত্তাপহীন তার প্রাণ। ঊষর মরুর বুক চিরিয়া অসভ্য বেদুইন, উলঙ্গ কাফ্রীও করে উদরের সংস্থান; আর শস্য-শ্যামল উর্ব্বর ভূমির কোলে বসিয়া বাঙালী হাহাকারে জীবনের অবসান করে—করে মনুষ্যত্বের অপমান। লুব্ধ দেহ, কুব্জ মেরুদণ্ড তার নুইয়া পড়ে দৈহিক কর্ম্মে, মিথ্যা মর্য্যাদার মোহে কর্ম্মবিমুখতাকে দেয় প্রশ্রয়। মনের খেদে বাঙালী গ্র্যাজুয়েটকে আত্মহত্যা করিতে শুনা যায়; কিন্তু দৈহিক পরিশ্রমের বিনিময়ে দু'গণ্ডা পয়সা রোজগার করিয়া চারটি দিন বাঁচিয়া জীবনের সম্ভাবনাকে মুক্তি দিবার যে সুযোগ তাহা তার শিক্ষা-দীক্ষার দম্ভ দিতে অসমর্থ। পৌরুষহীন বাঙালী-চিত্তের এই কার্পণ্য, অন্তরের এই মালিন্য যতদিন না মুছিয়া নির্ব্বিচারে আগাইয়া চলার গতিতে হয় সে শক্তিমান্, ততদিন বাঙলার বিস্তৃত বক্ষ বন্ধ্যা নারীর মতই থাকিবে উপেক্ষিত অফলপ্রসূ। দেশের অভাব আজ আহার্য্যের নয়, উপকরণের নয়—আসল অভাব আমাদের আত্মসম্বিতের, আত্মশক্তির নিষ্কলুষ অনুশীলনের। স্তিমিত বাঙলার অবসন্ন উদাসী প্রাণ দিনের পর দিন তপস্যার অভাবে, কায়িক শ্রম-বিমুখতায় মরণের পথে দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে। মনের মোহ, চিন্তার বিলাস, পাশ্চাত্যের চমকপ্রদ সভ্যতার যাদু-স্পর্শ তার পথের বন্ধুরতা বাড়াইয়াই তুলিতেছে। বাঙলার বুকে অফুরন্ত অমৃতের ফল্গুপ্রবাহ, স্বাভাবিক অনুকূল আব্‌হাওয়া, তার মাঠে, বাটে, অরণ্যে, প্রান্তরে অজস্র জীবনধারণোপকরণের প্রতি যদি বাঙালী অবহিত হইত, তবে তার এ দুর্য্যোগের দিন অচিরেই দূর হইতে পারিত। সহরের মোহ, চাকুরীর চমৎকারিত্ব তরুণ বাঙলার বুদ্ধি-বৃত্তিকে একান্ত মোহমুগ্ধ করিয়াছে। তাই সে এমন পীযুষ-বাহিনী বাঙলার বুকে উদরসংস্থানের সম্ভাবনার সন্ধান পায় না অথচ অ-বাঙালীর তাজা প্রাণ বাঙলার ধূলিকণার

মাঝেই স্বর্ণমুষ্টি সঞ্চয় করিয়া বছরের পর বছর আপনাকে প্রবুদ্ধ করিয়া চলিয়াছে। অনাদৃত পল্লীর আঁদাড়-পাঁদাড়, আনাচে-কণাচে সোণা ফলিত, যদি গৃহ উদাসী বাঙালীর সৃজনী প্রতিভার পরশ পাইত। স্বভাবের আশীর্ব্বাদ এখানে এমনিই যে, তার সজল সরস আব্‌হাওয়া দেয় তার চিত্ত-মনের খোরাক, সামান্য-মাত্র কায়িক শ্রম তার উদর-পূর্ত্তির করে সাহায্য। নগদ কড়ি দিয়া আত্মবিস্মৃত তরুণ জীবনের দায় মিটাইবার বিলাসকে করে বরণ, কিন্তু একটা 'কোপ্‌' ও একটি 'টিপের' ধৈর্য্য তাহার নাই। অবসর-মুহূর্ত্তের একটা 'কোপ' ও একটি 'টিপ' এবং ঝাড়-জঙ্গলের বিনা কড়ির অবজ্ঞাত আবর্জ্জনার মাচা যেখানে লাউ-শশা-কুমড়া-করলা প্রভৃতি সদ্যজাত জীবনধারণের আনুসঙ্গিক উপকরণ যোগাইতে পারে, সেখানে আমরা করি অলসতার পূজা—করি পয়সার শ্রাদ্ধ। অভ্যাসদোষে তাস-পাশা-দাবা, বাজে গল্প-গুজবে যে সময়ের আমরা অপচয় করি, সে সময়টুকু অনায়াসেই আমরা গৃহ-সংলগ্ন উদ্যানে কায়িক শ্রম দিয়া অর্থকর করিয়া তুলিতে পারি—অন্ততঃ একটা বৃক্ষ রোপণ করিয়াও নিজের ও অনাগতের সেবায় লাগাইতে পারা যায়। কৃষি কেবল উদরান্নেরই সহায়ক নয়, পরন্তু শরীর-মন-চিত্ত-চোখেরও স্বাস্থ্য দেয়। কৃষি-জাত দ্রব্যের উপর ভর করিয়া দুনিয়ার বিপুল ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেকখানি গড়িয়া উঠিয়াছে। আজিকার পাটোয়ারী দুনিয়ায় একান্ত অবস্থার দরুণই 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ, তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি' হইলেও, আসলে কৃষিই মুখ্যতঃ জাতীয় সম্পদ্‌ সৃষ্টি করে। দরিদ্র নিরক্ষর সংহতিহীন কৃষককে বঞ্চিত করিয়া মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীর যে হাত-বদলান ব্যবসা তাহা বর্ত্তমান ব্যবস্থায় ধনাগমের সহায়ক বলিয়া মুখকরী হইলেও, আসলে উহার ভিত্তি ফাঁকার উপর প্রতিষ্ঠিত। পাট, তুলা, ইক্ষু, চা প্রভৃতি কৃষি-জাত দ্রব্যকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবীব্যাপী যে বিপুল অর্থকরী শিল্প সৃষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে 'তামাক' অন্যতম। এই তামাক-শিল্পের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এই তামাক-শিল্পের পশ্চাতে অন্যান্য অভিনব আবিষ্কারের মতই এক কালে যে বিস্ময় বিজড়িত ছিল তাহা সর্ব্বসাধারণের নিত্যকার ব্যবহার্য্যের মধ্যে আসিয়া বর্ত্তমানে বিস্মৃতপ্রায়। আজ প্রায় চারশো বছরের কথা! নূতন জগৎ আমেরিকা আবিষ্কৃত হইবার পর বিলাসী ইউরোপকে তার সর্ব্বপ্রথম রোমাঞ্চকর অবদান দিল আলু,

সিগার প্রস্তুতের কারখানা

তামাক ও পাইপ। এই নবাগত অতিথি তামাককে অভিনন্দিত করিতে গিয়া সে-যুগের কবি গাহিয়াছিলেন—'Herb of immortal fame!' 'Fairy Queen'-এ কবি স্পেন্সর 'divine tobacco' আখ্যা দিয়াছেন। বাঙলা-সাহিত্যেও হুঁকা-তামাকের স্তুতিবাদের অভাব নাই। সাহিত্য-সম্রাট্‌ বঙ্কিমচন্দ্র গড়গড়া-ফুরসীর প্রশংসায়

১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে ভন হার্নাণ্ডেজ সর্ব্বপ্রথম স্পেন ও পর্টুগালে তামাক আমদানী করেন এবং তারপর ফ্রান্সের স্পেনস্থিত রাজদূত জিন নিকোে কর্ত্তৃক উহার গাছই

হউক বা বীজই হউক ফ্রান্সে নীত হয় এবং সেই অবধি উঁহারই নামানুসারে তামাক ইউরোপে নিকোতিয়ানা বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছে। ইহার বছর ত্রিশেক পরে কার্ডিনাল সাণ্টা ক্রোসি কর্ত্তৃক ইতালীতে উহা প্রচলিত হয়। ইংলণ্ডে তামাক-প্রচলনের সঠিক তারিখ নির্ণয় করা সুকঠিন; তবে ১৫৬০-৬৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জে, হাকিন্স ও ভার্জ্জিনিয়ার ইংরাজ গভর্ণর মিঃ র‍্যালফ্‌লেন প্রথম তামাকের নমুনা ইংলণ্ডে আনিলেও র‍্যালেই ইংলণ্ডে উহার সর্ব্বপ্রথম ব্যাপক প্রচার করেন। আমেরিকা হইতে শীতের ভিতর সিক্ত বসন-ভূষণ লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে র‍্যালে এই অপূর্ব্ব জিনিষের স্তুতি গাহিলেন। এমনি বিচিত্র বাধা-বিপত্তি, কত রহস্যময় ঘটনার মধ্য দিয়াই নূতন জগতের নবাগত বস্তুটীর মোহিনীশক্তি ইউরোপের নারীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে চিত্ত দখল করিয়া বসিয়াছে।

কাগজ-কলমে তামাকের বর্ণনা সর্ব্বপ্রথম বোধহয় ১:৩৫ সালে সেণ্ট ডোমিনগোর গবর্ণর গঞ্জালো ফার্ণাণ্ডিজ তাঁর পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ইতিহাস লেখার প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতেই জানা যায়,

ফ্যাক্টরীতে ডাঁটা হইতে তামাকের পাতা ছাড়ান দৃশ্য

প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সার ওয়াল্টার র‍্যালের ইংলণ্ডে ধূমপানের প্রথা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে অবাধ প্রচারের ফলে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই সমস্ত ইংলণ্ডই প্রায় ধূমপানে আসক্ত হইয়া পড়ে।

তামাক খাওয়া লইয়া সে-দেশে বেশ একটা হাসির গল্প আজ পর্য্যন্ত কথিত হইয়া থাকে। আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিবার পরই সার র‍্যালে একদিন আরাম-কেদারায় চিৎ হইয়া শুইয়া চোখ বুজিয়া তাঁর পাইপ টানিতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ তাঁর স্ত্রী সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া স্বামীর মুখে ধূয়া দেখিয়া বিস্মিতা হন এবং পেটের মধ্যে আগুন লাগিবার আশঙ্কা করিয়া বুদ্ধিমতীর মতই এক বালতি জল র‍্যালের মুখে ঢালিয়া দেন। কনকনে

ইংরাজী 'ওয়াই' আকৃতির একপ্রকার নলের সাহায্যে আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা ধূমপান করিত এবং ইহাকে তাহারা 'তুবাকো' বলিত, যার থেকে ইংরাজী নাম শেষ পর্য্যন্ত 'টুবাকো' (tobacco) ও ল্যাটিন 'নিকোতনিয়া টাবাকাম' (Nicotonia Tabacum) দাঁড়াইয়াছে। সে যাহাই হউক, এ কথা ঠিক যে দক্ষিণ আমেরিকাবাসী স্মরণাতীত যুগ থেকেই এই তুবাকোর ধূমপানে অভ্যস্ত ছিল এবং তাহাদের নিকট হইতেই এই অপূর্ব্ব, 'অমর' খোসবায়যুক্ত নেশাটি বিজয়ী সভ্য স্পানিয়ার্ডবাসী কর্ত্তৃক ১৪৯২ সালে কিউবা দ্বীপে প্রথম পদার্পণ করার পর হইতে গৃহীত হয়। বিশ্বের সর্ব্বত্রই ইহার বহুল বিস্তার হইলেও, যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জ্জিনিয়ায় এখনও তামাক-চাষের প্রাধান্য

সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষণীয়। আমেরিকার আব্‌হাওয়া ইহার চাষের যথেষ্ট অনুকূলও বটে। সুদূর পশ্চিমের আমেরিকা ইউরোপ হইতে তামাক ক্রমশঃ পূর্ব্বের তুর্কী, আরব, পারস্য, আফগানিস্থান, ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানে বিস্তার-লাভ করিয়াছে। তুর্কী, পারস্য প্রভৃতি স্থানে 'তামবেকির' ব্যবহার সুপ্রসিদ্ধ। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (১৬০৫ খৃষ্টাব্দে) পর্ত্তুগীজেরা তামাক ভারতে আমদানী করে। ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে ইহার ব্যাপক প্রচলন, তাৎকালীন সম্রাট্ জাহাঙ্গীর আইনের দ্বারা বন্ধ করিবার চেষ্টা করায় অনেকটা বাধা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু আকবরের রাজত্বকালে উহার ব্যবহার দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। সংস্কৃতে ইহার নাম তাম্র-কূট ও ধূম্রপর্ণী। বাঙলায় ইহাকে তামাক ও হিন্দীতে তামাকু কহে। একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার এই যে, বিভিন্ন দেশে ইহার বিভিন্ন নাম হইলেও, সাধারণ-ভাবে নামের মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু ইউরোপীয়ানদের চোখে দেখিতে গেলে, মনে হয়, যেন তামাক দক্ষিণ আমেরিকা হইতে পূর্ব্বমুখী হইয়া ক্রমশঃ ভারত প্রভৃতি স্থানে নীত হইয়াছে। কিন্তু এ কথাও ভাবা আদৌ অসঙ্গত নয় যে, তামাকের অনুকূল জল-মাটি-আব্‌হাওয়ায় স্বভাবতঃই বৃক্ষ-জগতের জন্মের সঙ্গে তামাক গাছেরও জন্ম সম্ভব। চীনের চায়ের আদি জন্মভূমি বলিয়া খ্যাতি আছে এবং সর্ব্বত্রই চীনদেশীয় চা-বীজ চা-চাষের জন্য বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু আসামের জঙ্গলে বন্য চায়ের গাছ এখনও বহু স্থানে দেখা যায় এবং তদ্দৃষ্টেই আসামের বিশেষ করিয়া কাছাড়-লুসাই প্রভৃতি স্থানের মাটি চা-চাষের উপযুক্ত বলিয়া নিরূপিত হয়। কাছাড়ের ভূতপূর্ব্ব পলিটিক্যাল এজেণ্ট স্বর্গীয় রায় বাহাদুর হরিচরণ শর্ম্মা ও স্বর্গীয় শ্রদ্ধেয় বৈকুণ্ঠ গুপ্ত মহাশয় ইংরাজদিগকে বোধহয় ইহার প্রথম ইঙ্গিত দেন এবং তাহার পর হইতেই শ্রীহট্ট, কাছাড় প্রভৃতি স্থানে চা-চাষ বিশেষ-ভাবে প্রসার-লাভ করে। তেমনি ঐ সব জঙ্গলে এখনও তামাকজাতীয় একরূপ গাছ অনেক সময়েই চোখে পড়ে, যাহার শুকনো পাতা টিপরা, কুকি প্রভৃতিরা চুরুটের মত ব্যবহার করে। বিশেষ-ভাবে প্রস্তুত তামাকের মত ইহা এত কড়া নয়, তবে যে নেশা হয় তাতে তামাকের কাজ চলিতে পারে। বনের ঘন-সন্নিবিষ্ট ও বদ্ধ আব্‌হাওয়ার মাঝে বাঁচিবার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বৃক্ষ-জগৎকে সদা সচেষ্ট থাকিতে হয় বলিয়া উহা অবাধ রৌদ্র ও প্রাকৃতিক আব্‌হাওয়ার মাঝে বর্দ্ধিত বৃক্ষের মত

চালানের উপযোগী করিয়া তামাকপাতাকে প্যাক করা হইতেছে

উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হইতে পারে না। এই জন্যই সাধারণতঃ জঙ্গলী আম, জাম, কাঁটাল, হরিতকী, কমলালেবু, জঙ্গলী বৃক্ষ প্রভৃতির ফল আঁটি-সার মাত্র হয়; কিন্তু উহাই ধারাবাহিকভাবে মানুষের যত্নে চেষ্টায় সুফলপ্রসূ হইতে পারে। তামাকের বেলায়ই বা কেন এই নিয়ম খাটিবে না? অনুসন্ধান করিলে কুচবিহার, মতিহারী, রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানে এইরূপ জঙ্গলী তামাকের পরিচয় যথেষ্টই মিলিবে। তবে প্রাচীন ভারতে ধূম্রপানের প্রচলন সভ্যসমাজে ছিল কি না, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বেদে, পুরাণে দেবতা ও অসুরদের মাঝে সুরাপানের ঢলাঢলি বিচিত্রভাবে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু কোন সভা-সমিতিতে গড়গড়ার ব্যবস্থার কথা শুনা যায় না। নবাব-বাদশার আমলে বহুমূল্য খাম্বিরার গোলাপী নেশা করাটা বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল।

বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তামাকের ব্যবহার নানাপ্রকার হইয়াছে। রূপ-বৈচিত্র্যের ইতিবৃত্ত ও মানুষের রুচি-বিভিন্নতা দেশ, কাল ও প্রকৃতির উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। তামাক যে-সময়ে ইউরোপ ও ইংলণ্ডে প্রথম আমদানী হইল, সে-যুগে গাছ-গাছড়া-বিক্রেতা বেণিয়ার আঁধার কোঠায় তামাকখোরদের আড্ডা ও গল্প-গুজব করার বৈঠক বসিত। রাণী এলিজাবেথের সময়েও তামাকপাতা টুকরা করিবার জন্য রূপার চাকুর ব্যবহার ছিল। ধূমপান করিবার জন্য অভিজাত-বংশেরা প্রায়ই রূপার পাইপ এবং সাধারণ লোকে ওয়ালনাট-শেলের নল ব্যবহার করিত। সে-সময়ে রূপার ওজনে তামাক বিক্রী হইত। আধুনিক কালে যেমন থিয়েটার-বায়স্কোপে ভীড় হয়, কাফে রেঁস্তরা সরগরম হয়, তেমনি তখন তামাকের আড্ডাখানাগুলিও সাধারণের নেশার স্থান হইয়া উঠিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতেও ইউরোপে কেহ কেহ বছরে এক তামাকের জন্য আট দশ হাজার টাকা ব্যয় করিত।

জাহাজে রপ্তানীর পূর্ব্বাবস্থা

অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রতীচ্যে পাইপ-তামাকের চেয়ে নস্যের প্রচলনই প্রাধান্য পায়। মেয়ে-মর্দ্দের মধ্যে 'নস্যি নাকে দেওয়া' যেন একটা ফ্যাসান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ক্রিষ্টফার কলম্বসের আমেরিকা যাত্রার একজন সহযোগী ও পর্য্যটক রোমানো পেনি এই নস্য-ব্যবহারের অভ্যাস আমেরিকা হইতে ইউরোপে আমদানী করেন। নস্যের উপকারিতা সম্বন্ধে ইউরোপবাসী অত্যধিক প্রশংসমান হইয়া উঠায় এবং পথে, বাটীতে, গির্জ্জায় ইহার লোকপ্রিয়তা এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, যে কন্টিনেণ্টের অনেক দেশেই আইন করিয়া ধর্ম্ম-মন্দিরে উহার ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছিল। চতুর্থ জর্জ্জের সময়ে গ্রেট বৃটেনে নস্য বড়লোকদের একটা মূল্যবান্ বিলাসস্বরূপ ছিল। কারুকার্য্যবিশিষ্ট দামী

নস্যের কৌটা প্রায় প্রত্যেক বিলাসীর পকেটেই থাকিত। ধনীর সখ মিটাইতে নানাপ্রকারের সুগন্ধিযুক্ত যে সকল হরকিছিম নস্যের উদ্ভব হয়, তন্মধ্যে 'স্কচ ট্যাডি' ও 'প্রিন্সেস মিক্‌সার' বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করে। বিগত একশো বছরের মধ্যে ইউরোপে নস্যের ব্যবহার একরূপ উঠিয়াই গিয়াছে। এখন কদাচিৎ যদি কেহ নস্য লয় তাকে বড় একটা কেহ ভাল চোখে দেখে না।

আসলে শীতপ্রধান দেশে বেশী হাঙ্গামা করিয়া তামাক ব্যবহার করা অসুবিধাকর। তাই শেষ পর্য্যন্ত গায়ে জামা ও হাতে দস্তানা আঁটিয়া যাহা সুবিধা সেই সিগারেট, সিগার, চুরুট, পাইপ সেখানকার নিত্য ব্যবহার্য্যে দাঁড়াইয়াছে! ভূমধ্যসাগর পার হইয়া তুর্কী, পারস্য, আফগানিস্থান, ভারত প্রভৃতি স্থানে তামাক আবার দোক্তা, সুর্ত্তি, জরদা, বিড়ি, গুড়ুক প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হইয়া মানুষের তৃপ্তি বিধান করিতেছে। গুড়ুক তামাকের প্রচলন এসব দেশে অত্যন্ত অধিক। দোক্তা তামাকের সহিত গুড় ও নানা প্রকারের মসলা মিশ্রিত করিয়া গুড়ুক প্রস্তুত হয়। বাদশা, জমিদার, রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন অনেকেই ইহা কলিকায় বা জলপূর্ণ হুঁকায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। হুঁকায় জল ভরিয়া ধূমপান-রীতি প্রধানতঃ প্রাচ্যের। তামাকের বহুরূপের ইয়ত্তা নাই। অধিকাংশই কোন না কোন রূপে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। আশী টাকা তোলার খাম্বিরা যেমন খোস্‌মেজাজী ধনী বিলাসীদের মজগুল করে, আবার ছয় আনা সেরের মাথা তামাকও শ্রমিকের শ্রান্তি দূর করে। পানের সঙ্গে সাদা, সুর্ত্তি, জরদা প্রভৃতির ব্যবহার তো আছেই, তা' ছাড়া বিড়ি, সিগারেট, বর্ম্মাই চুরুট, নস্য প্রভৃতির ব্যবহার বিশেষ করিয়া বাঙলার দৈনন্দিন আটপৌরে জীবনের অঙ্গ-স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। পোড়া তামাক (কোন কোন ক্ষেত্রে পোয়াল পোড়া ছাইয়ের সঙ্গে মিশ্রিত) বাঙালীর বিশেষ করিয়া পল্লীবালাদের দাঁতে দেওয়ার প্রচলন, পশ্চিমদেশ-বাসীদের ক্ষৌণির মতই আধুনিক কালের ফ্যাসানেরই অঙ্গীভূত। তামাকের ফুরফুরে নেশায় তৃপ্ত না হইয়া নেশাখোর জাতির, বিশেষ করিয়া শিক্ষিত সমাজের অনেককে যেমন দেশী-বিদেশী মদের আশ্রয় লইতে দেখা যায়, তেমনি সাধারণের মাঝে, বিশেষ করিয়া আসাম প্রদেশে গাঞ্জা-আফিং এবং উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানে সিদ্ধি-ভাঙ্‌ দৈনন্দিন জীবনে বিশেষ স্থানাধিকার করিয়া বসিয়াছে।

বর্ত্তমান দুনিয়ার বিভিন্নস্থানে জল, বায়ু ও মাটির তারতম্যে চল্লিশাধিক রকম তামাকের প্রকারভেদ দৃষ্ট হয়; তন্মধ্যে ধূমপানের জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়—

(১) নিকোটিনা টোবাকাম—ইহার জন্মস্থান আমেরিকা এবং সেখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। মতিহারী ও ভারতের তামাক-প্রসিদ্ধ স্থানগুলিতেও ইহার চাষ হইয়া থাকে।

(২) নিকোটিনা রাসটিকা—প্রাচ্যে সাধারণতঃ তুর্কি, লেভাণ্ট প্রভৃতি স্থানে জন্মে এবং ভারতীয়, টার্কিশ ও সিরিয়ান বলিয়াও কথিত হইয়া থাকে। মিঠে-কড়া ও সিগারেটের জন্য প্রশস্ত কিন্তু শীঘ্র পুড়িয়া ছাই হইয়া যায় বলিয়া হুঁকা বা পাইপের পক্ষে ইহা সেরূপ উপযুক্ত নয়।

(৩) নিকোটিনা পারসিকা—বেশ সুগন্ধযুক্ত এবং সিগারের জন্য উপযুক্ত না হইলেও হুঁকা, ও গুড়ুকের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

বেহার-উড়িষ্যা ও আসামের মধ্যে মতিহারীর তামাকই বিশেষ প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছে। সুর্ত্তি, জরদা, দোক্তা, পানের মসলারূপে উহা যেমন উপযুক্ত তেমনি হুঁকার তামাকের জন্যও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মতিহারী, ভেঙ্গী, হিংলী, উজানী, প্রভৃতি তামাকও কলিকায় সাজিয়া ধূমপানের প্রচলন আছে। এই সব দেশের অনেক জেলারই জল বায়ুর গুণে তামাকের পাতা সেরূপ উগ্রগন্ধ-যুক্ত ও পুরু হইতে পারে না বলিয়া রঙ্গপুর, কুচবিহার প্রভৃতি স্থানের বিশেষ করিয়া গোলপাতার দেশী তামাকের সঙ্গে মিশ্রিত করা হইয়া থাকে। রঙ্গপুর বা কুচবিহারের লম্বাকারবিশিষ্ট পান-পাতা তামাক সাধারণতঃ পানের মসলার উপযোগী। ভেঙ্গী তামাক-চুরুট-প্রস্তুতির জন্য প্রশস্ত। সুমাত্রা তামাকের পাতা পাতলা, মসৃণ ও সুন্দর সোণালী রংয়ের বলিয়া উহা দিয়া চুরুটের বহির্ভাগ মু-

আবরণী তৈয়ার হয় এবং চুরুটের ভিতরের অংশের জন্য সাধারণতঃ ম্যানিলা, মরিশস, হাভানা ও বর্ম্মার তামাকের প্রয়োজন হয়। ভার্জ্জিনিয়া, এড্ কক তামাক হইতে উত্তম সিগারেট প্রস্তত হয়।

বাঙলা, বিহার, আসাম প্রভৃতি দেশে বিড়ির ব্যবহারাধিক্য যথেষ্ট হইলেও, উহার মালমসল্লার জন্য বোম্বাই ও পশ্চিমাঞ্চলদেশীয় তামাক আমদানী করা হইয়া থাকে। নেপালী ও গুজরাটী তামাক বিড়ির জন্য বিশেষ-ভাবে উপযুক্ত। পরাধীন জাতির পঙ্গু মনোবৃত্তি নিজের দেশজাত তামাকে তুষ্ট থাকিতে পারে না; কিন্তু স্বাধীন দেশকে সাধারণতঃ তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবহারে সন্তুষ্ট থাকিতে দেখা যায়।
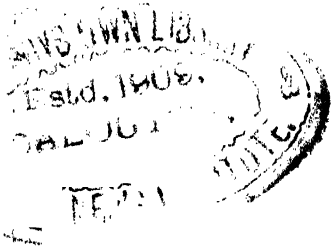
ভারত-শিল্পের মর্ম্মকথা

শ্রীমৃণালকুমার ঘোষ এম-এ,

সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে শিল্পী আছে। সৃষ্টির সেই আদিম উষা থেকে আজ অবধি দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে শিল্পের নব নব বিকাশ দেখ্‌তে পাই। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও যে শিল্প ছিল, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক তার প্রমাণ পেয়েছেন। এই ত সেদিনের কথা, পশ্চিম ইউরোপে, দক্ষিণ ফ্রান্সে ও উত্তর স্পেনে যে সব গুহাচিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, পণ্ডিতেরা বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে, সেগুলি পনের কিংবা ষোল হাজার বছর আগের আদিম মানবদের শিল্পকীর্ত্তি। সেই আদিম যুগের মানুষের চিত্রকলায় দেখ্‌তে পাই—বন্য হরিণ, শ্যামথ, পাহাড়ী ছাগল, বুনো ঘোড়া আর শিকারী মানুষ। মানুষের জীবনের যে পরিচয় সে সব গুহাচিত্রে আছে—সেটা হচ্ছে একটা অসভ্য, বর্ব্বর ব্যাধজীবনের। সেই আদিমকাল থেকে আরম্ভ করে' ব্যাবিলোনিয়া, আসিরিয়া, পারস্য, মিশর, গ্রীস, রোম এবং ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই দেখি যে, মানুষের জীবনযাত্রার, তার কৃষ্টির প্রতিবিম্ব তার শিল্পধারার ভিতর মূর্ত্ত হয়ে' আছে।

(২)

প্রাচীন ভারতের কথা ভাব্‌তে গেলে, মনে পড়ে বেদ, উপনিষদ্, গীতা, সংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত, দর্শন, জাতক, ত্রিপিটকের কথা। সূর্য্য, ইন্দ্র, বরুণ, মরুৎ, অগ্নিকে পরম লীলাময়ের অভিব্যক্তি বলে' এদেশের ঋষিরা জান্‌তেন। তপোবনে সামবেদের ঝঙ্কার উঠ্‌ত। পূর্ব্বাচলের পানে চেয়ে তাঁরা উষা-বন্দনা কর্‌তেন। রূপের ভিতর দিয়ে তাঁরা অরূপের সন্ধান পেতেন।......কালের স্রোত বয়ে' যায়, অগণিত মানবমানবীর কল্যাণের জন্য, তাদের মুক্তির জন্য রাজার ছেলের প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ল, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে', ভিক্ষু হয়ে' বেরিয়ে' গেল। সে চেয়েছিল এবং পেরেছিল মানুষের জীবনকে পূর্ণিমারাত্রির মত স্নিগ্ধ-মধুর-পবিত্র কর্‌তে।......কত যুগযুগান্তর কেটে' গেল নদীয়া থেকে প্রেমের প্লাবন এসে' সারা বাঙ্‌লা ভাসিয়ে' দিল।......আর এইত সেদিনের কথা, বৈরাগী এক বাঙালীর ছেলে সাগরপারে কি মন্ত্র উচ্চারণ করে' এল, যাতে আটলান্টিকের ওপারটা সব কেঁপে' উঠ্‌ল। আর একজনের উপনিষদ্-সিক্ত চিত্ততলে যে সুরের ঝঙ্কার উঠেছে, তার স্বপ্নমায়ায় জগৎ আজ বিভোর! এই ত হ'ল ভারতের কৃষ্টির মর্ম্মকথা—এ কথা যে বুঝ্‌বে না, সে ভারর-শিল্পের আসল রূপটি দেখ্‌তে পাবে না। আধ্যাত্মিকতাই ভারত-শিল্পের শাশ্বত প্রেরণা।

(৩)

একথা সত্য, যে ইউরোপে Italian Masters-রা যা' সৃষ্টি করেছেন, তার ভিতর আধ্যাত্মিকতার কিছু

কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। র‍্যাফেল, লিওনার্ডো-ডা-ভিন্সি, মাইকেল এঞ্জেলো, ফ্রা এঞ্জেলিকো, বোটিসেল্লী ইত্যাদির খৃষ্টধর্ম্মবিষয়ক আলেখ্য এবং 'ফ্রেস্কো'-চিত্রাবলী বাস্তবিকই সুন্দর! র‍্যাফেলের মাতৃমূর্ত্তি "ম্যাডোনা" অপরূপ! বর্ণবিন্যাসে, আলোছায়ার খেলায় এবং শারীর বিদ্যার দিক্ দিয়ে হয়ত তারা নিখুঁৎ। পেপের ভ্যাটিকেল প্রাসাদের 'ফ্রেস্কো'-চিত্রাবলী দেখ্‌লে চোখে জুড়িয়ে' যাবে, কিন্তু অজন্তা! অজন্তার তুলনা নাই! মিশরের "ফিরো"দের কবর "পিরামিড" নির্ম্মাণ হয়েছিল লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাসের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে। নিপীড়িত, শৃঙ্খলিত ক্রীতদাসের অস্থি, মাংস এবং রক্তের উপর যার ভিত্তি, হ'তে পারে সে বিরাট, কিন্তু সে মহান্ নহে। সুন্দরের সেখানে প্রবেশ-পথ নাই, কলা-লক্ষ্মী সেখানে আসন পাতেন না।

(৪)

ভগবান তথাগতবুদ্ধের ধর্ম্মমতে জাতি যখন বিভোর, তখন বৌদ্ধশিল্পীরা পাহাড় কেটে কারুকার্য্যশোভিত স্তম্ভাবলী, অপরূপ প্রকোষ্ঠ প্রাচীরগাত্রে অসংখ্য প্রতিমূর্ত্তি এবং গুহাগৃহে যে সব অনুপম আলেখ্য রচনা করেছেন, শিল্পসৃষ্টির দিক্ দিয়ে তা' চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। উত্তর থেকে ধর্ম্মমতের সঙ্গে শিল্পরীতির ঢেউ গিয়ে দক্ষিণে লেগেছিল। অনেক মূর্ত্তিতে এবং আলেখ্যে দেখ্‌তে পাই, উত্তরের ধ্যানপরায়ণতার সঙ্গে দক্ষিণের সাজসজ্জার অপূর্ব্ব মিলন। অজন্তার শিল্পকলা যে ভাবে ভাবব্যঞ্জনা করেছে তা' বাস্তবিকই অতুলনীয়। প্রাচীরগাত্রে এবং গুহাগৃহে ধ্যানী বুদ্ধের মুখের নির্ব্বিকার শান্তি—গৌতমের মহাপ্রস্থান দৃশ্য—রাজপুত্রের ভিক্ষুব্রত অবলম্বনের চিত্র—মৃত্যু-পথ-যাত্রী রাজকন্যার মুখের ব্যথাঘন ভাবব্যঞ্জনা—তথাগতের পদপ্রান্তে শ্রমণদল—অজন্তার এমনি অনেক শিল্পসৃষ্টিতে বর্ণ এবং রেখার সহজলীলার সঙ্গে ধ্যানের সৌন্দর্য্য ফুটে' উঠেছে। রসের সমঝ্‌দারেরা আজ ভাব্‌ছেন যে, অজন্তার শিল্পীরা বুদ্ধ-চরণে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ সন্ন্যাসী ছিলেন। এই শিল্পী তপস্বীরা কত দীর্ঘ যুগ ধরে' পূত দেহমন নিয়ে, অসীম ধৈর্য্যসহকারে পাষাণ কেটে' এই শিল্পোপাসনা করে' গেছেন।

(৫)

ইউরোপের ললিতকলার ভাণ্ডারে গ্রীসের অবদান অপূর্ব্ব। তার "ভীনাস-ডি-মিলা", "এপোলো বেলভেডিয়ার", "লেকুন", "এথেনা" ইত্যাদির ভিতর দিয়ে' সমগ্র জাতির সৌন্দর্য্যবোধ মূর্ত্ত হয়ে' উঠেছে। ইউরোপ সর্ব্বযুগে, সর্ব্বকালে বস্তুতান্ত্রিক; তাই হেলেনিষ্টিক শিল্পের ভিতর কোন অতীন্দ্রিয়ের, কোন অধ্যাত্মজগতের রসতত্ত্বের আভাস নাই—সেখানে আছে অপরূপ কলার রূপায়ণ। (Aesthetic Forms). হেলেনিষ্টিক শিল্পরীতির স্পর্শ গান্ধার-শিল্পে রয়েছে। গান্ধারদেশে গ্রীক-শিল্প-রীতিতে যে বুদ্ধ-মূর্ত্তি নির্ম্মিত হ'ল তা' কিন্তু প্রাণহীন—এপোলোমূর্ত্তির মত রূপপ্রধান শিল্প-সৃষ্টি হ'ল না, সেখানে ফুটে' উঠ্‌ল ভারতের শাশ্বত ধ্যানপরায়ণতা আর অপরূপ ভাবব্যঞ্জনা।

(৬)

পশ্চিমের সমালোচক, যেমন ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ, ব্ল্যাকার, পার্সি ব্রাউন এঁরা ভারত-শিল্পের মর্ম্মকথা উপলব্ধি করেন নাই; কেন না, তাঁরা ভারতের আধ্যাত্মিক আদর্শের সহিত সম্যক্ পরিচিত নহেন। এদেশের চারুকলা (art) অপেক্ষা চারুকলা (craft) তাঁরা বেশী বুঝেছেন। শিল্পী এবং মরমী সমালোচক হ্যাভেলই ভারত-শিল্পের রূপ-রস অনেকটা বুঝতে পেরেছেন। যে কোন যুগের বড় শিল্পসৃষ্টি যেমন—অজন্তা, এলোরা, উদয়গিরি, খণ্ডগিরির গুহাবলী, বুদ্ধগয়া, কাশী, কাঞ্চী, ভুবনেশ্বর, আবুপাহাড়, সাঁচি—কিংবা অনুরাধাপুরের ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি, মান্দ্রাজ মিউজিয়মের নটরাজ শিব, কোণারকের মূর্ত্তিসহ সূর্য্যমন্দির মামল্লপুরের শিল্পকলা, মথুরার বুদ্ধমূর্ত্তি, নেপালের অগণিত মূর্ত্তিসহ মন্দিরাবলী, কলিকাতা এবং সারনাথের মিউজিয়মে রক্ষিত প্রাচীন ভারতের ভাস্করশিল্প, হল্যাণ্ডের লেডেনে রক্ষিত ব্রাহ্মমূর্ত্তি কিংবা বৃহত্তর ভারতের বরভূধরের তিন মাইল-ব্যাপী মূর্ত্তিশ্রেণী সর্ব্বত্রই শিল্পীর রূপ রসের সৃজন লীলার ভিতর দিয়া ভারতের অখণ্ড, দেশকালজয়ী অধ্যাত্ম-চেতনার মর্ম্মকথা মুখরিত হয়ে' উঠেছে।

(৭)

কিন্তু দুর্ভাগা দেশ আজও তার একান্ত আপনার রূপ-তত্ত্বের বিশেষ খোঁজ রাখে না—পাশ্চাত্যের রস-শাস্ত্র (Aesthetics) তাকে মুগ্ধ করে' রেখেছে। "টিনিয়ার এপোলো" মূর্ত্তিকে কিংবা "লেওকুন"কে পাশ্চাত্যজগৎ যেরূপ বুঝতে চেষ্টা করেছে, সেভাবে কি আমরা মথুরার ধ্যানী বুদ্ধ, অনুরাধাপুরের ধ্যানীবুদ্ধ কিংবা দাক্ষিণাত্যের নটরাজ শিবের মূর্ত্তিকে বুঝ্‌তে চেষ্টা করেছি?

আমাদের ক্রোস কিংবা লেসিং নাই; আমাদের কুমার স্বামী আছেন, যার ভারত-শিল্পকলার রূপ-তত্ত্ব এবং আধ্যাত্মিক ভাব-ব্যঞ্জনা বুঝ্‌বার এবং বুঝাবার অগাধ শক্তি আছে—কিন্তু তিনিও আজ আটলান্টিকের ওপারে। লিওনার্ডো-ডা-ভিন্সিকে র‍্যাফেল পূর্ব্বযুগের রসেডিকে বুঝ্‌বার জন্য পাশ্চাত্য দেশ যে চেষ্টা করেছে, আমরা কি শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথকে বুঝ্‌বার জন্য সে চেষ্টা করেছি? এদেশে টার্ণার জন্মগ্রহণ করেন নি; কিন্তু গগনেন্দ্রনাথের নিসর্গ-দৃশ্য বুঝ্‌বার জন্য কি কোন ভারতীয় রাস্‌কিন অষ্টাদশখণ্ড "Modern Painters" লিখেছেন! তবে আশার কথা এই যে, নবযুগের তরুণ যারা, তারা পশ্চিমের রস-শাস্ত্রের মোহ প্রভাব (Aesthetic hypnotism)থেকে নিজেদের ধীরে ধীরে মুক্ত করে নিচ্ছেন। প্রাতঃস্মরণীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য ও কৃষ্টিসম্বন্ধীয় অধ্যাপনার প্রবর্ত্তনে জাতির অজ্ঞাতসারে তার অশেষ হিতসাধন করেছেন। ভারতের প্রাচীন শিল্পকলার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে। আজ আর পাশ্চাত্য মহিলা লেডী হেরিংহামের নেতৃত্বের প্রয়োজন নাই; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই ভারতের প্রাচীন শিল্প-রস-পিপাসু ছাত্রদের অজন্তার সৌন্দর্য্যালোকের রসধারায় অবগাহন কর্‌বার সুযোগ দিয়েছেন। আশা করা যায় যে, সে যুগ আস্‌ছে যখন ভারত-শিল্পের অন্তর্নিহিত অন্তহীন সৌন্দর্য্য, আর মহত্ত্বের মর্ম্মকথা জাতি আবার বুঝ্‌বে। সেই—

"নূতন উষার স্বর্ণদ্বার
খুলিতে বিলম্ব কত আর!"

স্ব-ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট জাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হয়

পৌরাণিক কাহিনী

ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে দেবাসুর সংগ্রাম, আর্য্য ও অনার্য্যদিগের মধ্যে সংঘর্ষ প্রভৃতি ভারতরাজ্য অধিকার-কল্পে এইরূপ প্রসিদ্ধ কাহিনী পুরাণাদিতেও বর্ণিত আছে। অর্ব্বাচীন যুগের ঐতিহাসিকেরা স্থির করিয়াছেন—মধ্য এশিয়া অথবা অন্য কোন স্থান হইতে কোনও এক সুসভ্য জাতি ভারতে প্রবেশকালে, অত্রস্থ প্রাচীন অধিবাসীদের সহিত সঙ্ঘর্ষ সৃষ্টি করে, ইহাই আর্য্য অনার্য্যের অথবা দেব ও দানবের যুদ্ধ নামে আখ্যাত হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতের আকার প্রকার লইয়াও নানাপ্রকার মতভেদ আছে। অধুনা কেহ কেহ বলেন—সুদূর আমেরিকা হইতে আফ্রিকা মহাদেশ পর্য্যন্ত এক অখণ্ড ক্ষেত্র মধ্যে ভারতবর্ষের অবস্থিতি ছিল। পুরাণাদিতেও দেখা যায়—লবণ সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত জম্বুনামক মহাদ্বীপের অন্তর্গত এই ভারতবর্ষ। সমুদ্রের উত্তর ও হিমালয়ের দক্ষিণ মধ্যস্থিত ভূমিখণ্ডই ভারতবর্ষ। এই ভারতবর্ষ প্রাচীনযুগে সমুদ্রবেষ্টিত নয় ভাগে বিভক্ত ছিল। ইহাদের নাম—ইন্দ্রদ্বীপ, কসেরুমান্, তাম্রবর্ণ গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্ব্ব, বারুণঃ ও সাগর সংবৃতি নবদ্বীপ। উত্তর ও দক্ষিণে সহস্রযোজন দীর্ঘ এই দেশের পূর্ব্বদিকে কিরাতগণ ও পশ্চিমে যবন রাজ্য ছিল। আমরা এই ভারতবর্ষকে অনায়াসেই আবার তিনভাগে বিভক্ত করিয়া লইতে পারি।

উত্তরদেশ—সমুচ্চ পর্ব্বতবেষ্টিত সুরম্য উপত্যকা বিশাল জনপদসমূহ কাশ্মীর, গাড়োয়াল, তিব্বত, এমন কি আফগানের উপত্যকাক্ষেত্রও গিরিরাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া মনে করিতে পারি। বেলুচির মরুকান্তার

সেদিন নীলোর্ম্মিমালার গভীর সাগরদৃশ্যই ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ এ কথা আজও অস্বীকার করেন না। তারপর মধ্যভূমি—সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-বিধৌত হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত পর্য্যন্ত। তন্নিম্নে বিন্ধ্য-সীমান্ত হইতে বর্ত্তমান ব্রহ্মদেশের সীমাদেশ পর্য্যন্ত যে দেশ তাহা লইয়া এই ত্রিখণ্ড ভূমিকেই আমরা ভারতবর্ষ নামে আখ্যা প্রদান করি।

যে প্রাচীন উপকথা আরম্ভ করিতেছি তাহাতে বুঝা যায় এই ত্রিলোকসম্মিতা ভূমি ইন্দ্রের অধিকারে ছিল। ইন্দ্র যেখানে বসিয়া রাজ্যলাভের তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই স্থানের কথাও পুরাণে বর্ণিত আছে। গৌতমী নদী হইতে পুণ্যা মঙ্গলা নদী গঙ্গার সহিত যেখানে সঙ্গতি লাভ করে, সেই পুণ্য তটে বিষ্ণুর আশীর্ব্বাদদৃপ্ত ইন্দ্র ত্রিলোকরাজ্য লাভ করেন।

ইন্দ্রেণ সংস্তুতোবিষ্ণুঃ প্রত্যক্ষোঽভূজ্জগন্ময়ঃ।
ত্রিলোকসম্মিতাং শক্রো ভূমিং লেভে জগৎপতেঃ॥

"ইন্দ্রের স্তবে তুষ্ট হইয়া জগন্ময় বিষ্ণু প্রত্যক্ষ আবির্ভূত হয়েন। ত্রিলোকসম্মিত ভূমি জগৎপতির প্রসাদে ইন্দ্র লাভ করেন।"

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় এই ইন্দ্র যিনিই হউন না—তিনি উপরোক্ত উত্তর, মধ্য ও অধোদেশ এই নিখিল ভারতবর্ষেরই একছত্র সম্রাট হইয়াছিলেন।

পুরাণাদিতে ইহাও দেখা যায় এইরূপ ভারত-সাম্রাজ্য-রক্ষায় ইন্দ্রবংশীয় রাজন্যবৃন্দ বার বার ভারতের অন্যান্য অধিবাসিগণকর্ত্তৃক বিপর্য্যস্ত হইয়াছেন। আক্রমণকারীদের কোথাও দানব, অসুর, রাক্ষস বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। আজও যেমন হিন্দু মুসলমান বিরোধ প্রকটিত হয়, কিছুকাল পূর্ব্বে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে যেরূপ সংঘর্ষের ইতিকথা আছে, তাহার পূর্ব্বেও যেমন ব্রাহ্মণ-ক্ষাত্র-বিবাদের করুণ কাহিনী পুরাণে লিপিবদ্ধ দেখা যায়, সেইরূপ প্রাচীনভারতে দেবাসুর-সংগ্রাম অনুমান করিয়া লওয়া কিছু বিচিত্র কথা নহে।

ভারতে এক-সাম্রাজ্য-স্থাপন কাহারও পক্ষে সম্ভব হইলেও ভারতরাজ্য খণ্ড খণ্ডভাবে বিভিন্ন রাজন্যবৃন্দ কর্ত্তৃক শাসিত হইত। একবার ইন্দ্রের বিরুদ্ধে অসুরেরা বিদ্রোহী হইলে প্রসিদ্ধ রঘুকুলপতি রাজা দশরথের নিকট উভয় পক্ষই মিত্রতা প্রার্থনা করেন। রাজা দশরথ ইন্দ্রপক্ষেই যোগদান করিতে প্রতিশ্রুত হন্। ইহা হইতেই অনায়াসে বুঝা যায়, ত্রৈলোক্য বলিতে ভূমি ছাড়া অন্য তুরীয় জগতের কথা বুঝায় না। এখনও দেব-প্রয়াগ, ইন্দ্রনগর, মানস সরোবর এবং সমুচ্চপর্ব্বতশৃঙ্গে উর্ব্বর উপত্যকাভূমির অধিবাসীরা নিজেদের স্বর্গবাসী বলিয়া গর্ব্ব করে।

বাইবেলে ঈশ্বর হইতে আদম ও ইভের জন্মবৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। ঈশ্বরের এই নব-দম্পতি মানসজাত, ঔরসজাত নহে। ইহা ভারতের পৌরাণিক ইতিবৃত্তেরই প্রতিধ্বনি। আদম ও ইভ্ শয়তানের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়া অভিশপ্ত হইয়াই মৈথুনবৃত্তিপরায়ণ হয়। এবং তাহা হইতেই মানবজাতির উৎপত্তি। ইহাতে নিখিল মনুষ্যজাতির গোড়ায় দারুণ অভিশাপ নিহিত আছে এইরূপ অনুভূত হয়। ভারতে সৃষ্টিতত্ত্ব এইরূপ অভিশাপগ্রস্ত নহে। প্রজাপতি মনোদ্বারা স্থাবর-জঙ্গম, দ্বিপদ-চতুষ্পদ প্রভৃতি প্রাণী সৃষ্টি করেন। এই সৃষ্টি, সঙ্কল্পে, দর্শনে ও স্পর্শনাদি ক্রিয়া দ্বারা, পূর্ব্বে সম্ভব হইয়াছিল।

"সঙ্কল্পাদ্দর্শনাৎ স্পর্শাৎ পূর্ব্বেষাং প্রোচ্যতে প্রজা।"

আদম ও ইভ্ যে ইডেন উদ্যানে বসবাস করিতেন, তাহা ভগবানের মনোদ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছিল; এ কথা পুরাণেরই কথা। কিন্তু ভারতের আদি মানব দক্ষ প্রজাপতি অভিশাপগ্রস্ত হয়েন নাই। সৃষ্টি প্রেরণায় স্বভাবতঃ মৈথুনপ্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল।

অখিল-জগৎ-স্রষ্টা ভগবান নারায়ণের নাভি-সরোজিনী-সঞ্জাত সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার আবির্ভাব—ব্রহ্মার মানসপুত্র অত্রি, অত্রির পুত্র চন্দ্র, চন্দ্র যজ্ঞপ্রভাবে সর্ব্বোৎকৃষ্ট আধিপত্য লাভ করেন। রাজ্য-দর্পান্ধ চন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতিপত্নী তারাকে অপহরণ করেন। তারার গর্ভে এক সুকান্তি পুত্রের জন্ম হয়, তিনি বুধ নামে বিখ্যাত। বুধের পুত্র পুরুরবা, পুরুরবা প্রয়াগে রাজনগরী স্থাপন করিয়া ত্রৈলোক্যজয়ী হয়েন। পুরুরবার ছয়টী সন্তান জন্মগ্রহণ করে। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম আয়ুঃ। আয়ুর

পুত্র নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ রম্ভ, রজি ও অনেনাঃ। এই বংশ হইতেই ভারতবর্ষে উত্তরকালে চাতুর্ব্বর্ণ প্রবর্ত্তিত হয়। সে কথা এখানে অবান্তর।

রজি রাজার অতুল পরাক্রমের কথা ত্রিলোক-বিখ্যাত হইয়াছিল। তাহারই রাজ্যকালে দেব ও অসুরগণের মধ্যে ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হয়। অসুরগণ রজি রাজাকে আসিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিল। রজি রাজা সর্ত্ত করিলেন, তিনি ইহাতে প্রস্তুত আছেন—সংগ্রামজয়ে তাঁহাকে যদি ত্রিলোকের আধিপত্য প্রদান করা হয়; ইন্দ্রত্বরূপ যে সম্রাটত্ব তাহাই তাঁহাকে প্রদান করিতে হইবে।

অসুরগণ বলিলেন, "ইহা হইতে পারে না। আপনার রাজ্যবিস্তার হৌক। ধন-সম্পদ যাহা চাহিবেন তাহাতে আমরা কৃপণতা করিব না। ত্রিলোকের আধিপত্য অসুরগণেরই দাবী। ইন্দ্রত্ব প্রহ্লাদ ভিন্ন আর কাহাকেও আমরা দিব না।" রজি রাজা তাহাদের ফিরাইয়া দিলেন। দেবপক্ষ তাঁহার সাহায্য প্রার্থী হইলেন—তাঁহাদিগকেও তিনি এই দাবী জানাইলেন, দেবগণ বলিলেন "আজ আমাদের আত্মরক্ষার দায়, বড় দায়, অসুরগণ বিনষ্ট হইলে আপনি আমাদের 'ইন্দ্র' হইবেন।"

রণকোলাহলে ত্রিলোক কম্পিত হইল। রজি ভীমপরাক্রমশালী পঞ্চশত পুত্র, অসংখ্য সেনাবাহিনী লইয়া অসুর নিধনে রণমত্ত হইলেন। "মার মার! কাট কাট!" পরুষ কণ্ঠে পরস্পরের হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি চলল, তুমুল আর্ত্তনাদ উঠিল ধরণীর বুকে—শত্রুপক্ষ বিনষ্ট করিয়া, রজি রাজা পঞ্চশত পুত্র সঙ্গে লইয়া, ইন্দ্রের সম্মুখীন হইলেন। ইন্দ্র মাথার মুকুট নামাইয়া তাঁহার পদদ্বয় বন্দনা করিয়া বলিলেন, "উপকার করিয়াছেন—মহাভয় হইতে আমাদের রক্ষা করিয়াছেন, সমগ্র দেবগণের কণ্ঠে আপনার খ্যাতি ও প্রশংসা মুখরিত, প্রকৃষ্ট উপাধি-ভূষণে আপনাকে অভিনন্দিত করিব—ত্রিলোকে আপনি সর্ব্বোত্তম হইলেন—কেননা ত্রিলোকেন্দ্র আমি আজ পুত্রস্বরূপ আপনার পদ-বন্দনা করিতেছি।"

রজি রাজা অন্তরে বুঝিলেন ইন্দ্রের এই চাটুবাণী প্রবঞ্চনার নামান্তরমাত্র। কপট হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, "বেশ বেশ! বৈরীপক্ষেরও প্রশংসা-প্রণতি অতিক্রম করা উচিত নহে! আপনি স্বপক্ষ, আপনার তো কথাই নাই।"

রাজা স্ব-পুরে প্রত্যাগমন করিলেন। অসুরগণ নির্বীর্য্য হইয়া পড়ায় শতক্রতুও ইন্দ্রত্ব করিতে লাগিলেন।

প্রয়াগ রাজনগরীতে, পঞ্চশত পুত্রের সহিত অমাত্য, সেনাপতি প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারিগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া, রাজা মন্ত্রণায় বসিলেন। স্থির হইল ইন্দ্র-নগর আক্রমণ করিয়া শক্রকে সিংহাসনচ্যুত করিতেই হইবে। বিশ্বাস-ঘাতকের ইহাই সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত।

মাদল বাজিল, অশ্বগণের হ্রেষারব দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিল। রণোন্মত্ত হস্তিগণের বৃংহিতনিনাদে শত্রুর হৃদয় কম্পিত হইল। বর্ষণশীল মেঘের মত রজি-রাজের সহস্র অক্ষৌহিণী সেনা দেবরাজ্য ঘিরিয়া ফেলিল। সে তুমুল আক্রমণের সম্মুখে দেব-সেনাপতি স্বয়ং পবন শুষ্ক পত্রের ন্যায় উড়িয়া গেলেন। বরুণ আসিলেন, অশ্বিনীকুমারদ্বয় গদা ঘুরাইলেন স্বয়ং অমরেন্দ্র পর্ব্বতপ্রমাণ ঐরাবতে আরোহণ করিয়া দিব্যায়ুধসকল নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু রজিরাজের প্রবল আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়া পলায়ন করা ছাড়া দেবতাবৃন্দের আর দ্বিতীয় উপায় রহিল না।

ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া রজি-পুত্রগণ ইন্দ্রত্ব অধিকার করিয়া লইলেন।

দীর্ঘদিন রাজ্যভ্রষ্ট ইন্দ্র গোপনে নানাদেশে পরিভ্রমণ করিলেন। ভ্রষ্ট রাজ্যোদ্ধারের আশা একেবারেই আর রহিল না; বিষণ্ণচিত্তে কাল অতিবাহিত হইতে লাগিল। রজির বংশধরগণ স্বর্গভূমি অধিকার করিয়া ত্রৈলোক্য-শাসন করিতে লাগিলেন। রাজ্যে অশান্তি রহিল না, ব্রাহ্মণের কণ্ঠে প্রতিদিন প্রভাতে বেদ-ধ্বনি উঠিল, যজ্ঞভূমি স্বাহা, স্বধামন্ত্রে প্রতিধ্বনি তুলিল, পূত হবির্গন্ধে দশদিক্ আমোদিত হইল। দেবগুরু বৃহস্পতি বহু অন্বেষণ করিয়া, ইন্দ্রের সন্ধান পাইলেন, বদরীপরিমিত যজ্ঞভাগ ইন্দ্রকে অর্পণ করিয়া কহিলেন, "রাজ্যভ্রষ্ট আপনি, রাজগুরু বৃহস্পতি আশ্রয়হীন, দৈন্যপীড়িত, রাজোচিত উপহার প্রদানে অক্ষম আমি—আমার আশীর্ব্বাদ স্বরূপ ইহাই গ্রহণ করুন।"

ইন্দ্র নির্বিন্নভাবে বলিলেন—'হে দেব! ইহাতে আমি আপ্যায়িত হইতে পারি না।"

বৃহস্পতি বলিলেন "বাহুবল যখন নাই তখন কৌশলে কার্য্যসিদ্ধ করিতে হইবে—আমি এই জন্যই আসিয়াছি। মনে রাখিবেন যে পক্ষে ব্রাহ্মণ, সেই পক্ষেই অবধারিত জয়—উপস্থিত আমি দ্বিবিধভাবে রাজ্য পুনর্লাভের প্রচেষ্টা করিব। অভিচারাদিক্রিয়ায় রজি পুত্রগণের মোহ উপস্থিত হইবে, অন্যদিকে হোমাদি যজ্ঞক্রিয়ায় দেবজাতির তেজোবৃদ্ধি করিব। চাই নিদারুণ মন্ত্রগুপ্তি। শত্রুর দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়াই শক্তিবৃদ্ধির আয়োজন করুন; আমি কয়েকজন ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিয়া, যাহাতে রজির পুত্রগণ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, ভেদ-নীতির প্রভাবে তাহাদের সংহতি ভঙ্গ হয় তাহারই আয়োজন করিতেছি।"

দেবরাজ্যে রজি পুত্রগণশাসিত প্রজাগণের আনন্দের অবধি নাই। স্বধর্ম্মনিরত তপঃপরায়ণ সকলেই পরম সুখে বাস করিতেছিল। তাহারা নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মে অবহেলা করিত না। নিষিদ্ধ কর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া শমদমাদি সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হইয়া দুর্জ্জয় হইয়া উঠিয়াছিল।

যেখানে প্রজাগণ হোমনিরত, সেখানে গিয়া বৃহস্পতির অনুচরগণ যুক্তিসহকারে বলিতে লাগিল "তোমরা ঘৃত সমূহ বৃথা অনলে দগ্ধ করিতেছ। এমন বালকোচিত কর্ম্ম বীরের যোগ্য নহে। ঘৃত ভোজন করিলে শরীরের বলবৃদ্ধি হইবে—তোমরা অধিকতর পরাক্রমশালী হইবে। এই যে তোমরা শ্রাদ্ধকালে বিবিধ খাদ্য-দ্রব্যাদি উৎসর্গ করিতেছ—আত্মীয় কুটুম্বগণকে ভোজন করাইতেছ, ইহাতে পরলোকগত আত্মার কি উপকার হইবে? এক ব্যক্তি ভোজন করিলে অন্য ব্যক্তি যদি পরিতৃপ্ত হয়—তবে প্রবাসে গিয়া তোমরা ভোজন

প্রবল আক্রমণে ইন্দ্রের পলায়ন

কর কেন ? গৃহে তোমাদের পুত্র কন্যাগণ তো খাদ্যাদি গ্রহণ করে।"

রজি রাজ্যের প্রজাগণ বলিল "এ সব কি নূতন কথা বলিতেছ, আমরা কি আপ্তবাক্য অস্বীকার করিব। যজ্ঞ-দ্বারা দেব-লোক, পিতৃ-লোক প্রসন্ন হন। যজ্ঞার্থে পশু-বধ পারলৌকিক হিতসাধনার উপায়—আমরা তোমাদের কথা শুনিব না।"

দ্বারা রাজ্যে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। কেহ বলিল "ইহাতে ধর্ম্ম হয়" কেহ বলিল, "না, উহা অধর্ম্মেরই কারণ" কেহ বলে, "ইহা অত্যন্ত পরমার্থ"। কেহ বলে, 'উহা পরমার্থ একেবারেই নহে।" এইরূপ বহু-প্রকার সংশয়জনক বাক্যে প্রজাসমূহ বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল। দেশে নূতন ভাবের বন্যা বহিল। একে একে অনেকেই পূর্ব্বাচার পরিত্যাগ করিল। একজন অন্যজনকে, তাহারা
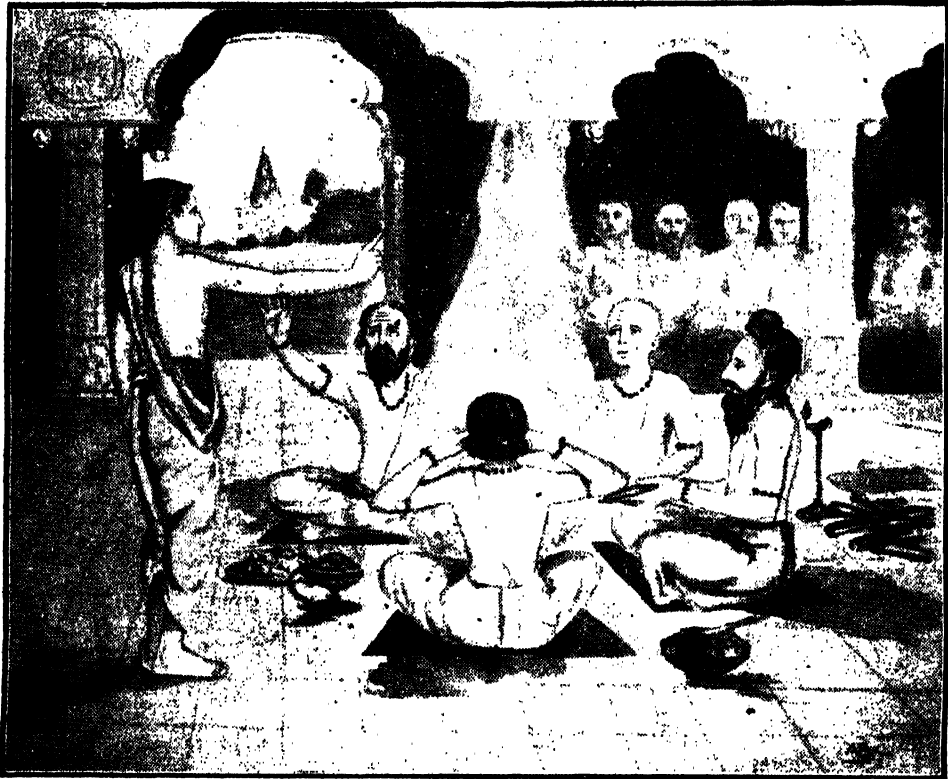
বৃহস্পতির অনুচর বুদ্ধিভেদ জন্মাইতেছে

ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণগণ বলিলেন "আপ্তবাক্য আকাশ হইতে প'ড়ে না। তোমরাই হও, আর আমরাই হই বা যে কোন ব্যক্তিই হোক, যুক্তিসঙ্গত বাক্যই গ্রহণ করা উচিত। শমী প্রভৃতি কাষ্ঠে ঘৃতাহুতি দানে যদি দেবতারা পরিতুষ্ট হন, তবে পশুরাও যে শ্রেষ্ঠ—কেন না, তাহারা সরস পত্র ভোজন করে—আর পশু-বধ যদি স্বর্গ-ফল দেয় তবে আপনার পিতাকে বধ করিলে তো পার!" এইরূপ নানাপ্রকার যুক্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বক পরিবর্দ্ধিত বাক্যসমূহের

আবার আর আর ব্যক্তিকে, আর আর ব্যক্তিগণও অন্যান্য ব্যক্তিগণকে নূতন ভাবধারা গ্রহণ করাইতে লাগিল। আগুন ধরিয়াছে দেখিয়া বৃহস্পতির অনুচরগণ প্রস্থান করিলেন। যে শিক্ষা, দীক্ষা, আচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রজিরাজ্য দুর্জ্জয় হইয়া উঠিয়াছিল, অল্পদিনের মধ্যেই স্বকীয় ধর্ম্ম ও আচার-ভ্রষ্ট হইয়া লোকসমূহ নিদারুণ পরাজয়কেই ডাকিয়া আনিল। স্বধর্ম্মরূপ কবচ পরিত্যাগ করায়, মায়া-মোহপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ায় ধর্ম্মরূপ

আবরণ আর রহিল না। তখন ভাব-তুষ্টিবশতঃ নানাভাবে ও নানা আদর্শে বিভক্ত রজি-রাজ্য শক্তিহীন হইলে গোপনে শক্তি সংগ্রহ করিয়া ইন্দ্র রজিরাজ্য আক্রমণ করিলেন। সে আক্রমণে রজিরাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া গেল। আচারভ্রষ্ট রজিপুত্রগণ বিনষ্ট হইলেন। ব্রাহ্মণের সহায়ে ইন্দ্র অপহৃতরাজ্য ফিরিয়া পাইলেন বটে, কিন্তু একের স্বার্থরক্ষায় অন্যের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবার যে বিষ ষড়যন্ত্রকারীর মানুষের হিয়ায় সঞ্চারিত করিয়াছিল, সে বিষ তরঙ্গে তরঙ্গে লীলায়ত হইয়া আজ ভারতের দেব-রাজ্যের ভিত্তি ভাঙ্গিয়াছে, অসুর রাজ্যের অস্তিত্ব বিলোপ করিয়াছে। ব্রহ্মণ্যসভ্যতার দুর্গপ্রাচীর ভূমিসাৎ করিয়াছে। নিখিল ভারত আজ স্বভাব ও স্বধর্ম্মবঞ্চিত। সেই খণ্ডস্বার্থ-চরিতার্থতার দায়ে আজ সেই সঙ্কীর্ণ—সংস্কারজর্জ্জরিত ভারতবর্ষ সংহতিশক্তিহীন, উপেক্ষিত, লাঞ্ছিত, পরপদ-দলিত, জগতের দুয়ারে অতিশয় ঘৃণ্য বলিয়াই আখ্যাত হইয়াছে।

এই জন্যই এ জাতির মুক্তি শিক্ষায় নহে, সংস্কারে নহে, আছে মরণে—সে মরণ অধ্যাত্মসাধনার সাগরে ডুবিয়া যদি সিদ্ধ হয়, তাই এ জাতির একটী পুনর্জ্জন্ম, স্বরূপ-স্বধর্ম্ম ফিরিয়া পাওয়ার ইহা ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই—নতুবা এই পাপজর্জ্জরিত পুরাতন কাঠামোয় ভারতের প্রাচীন গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব।

ধর্ম্মে পাশ্চাত্য-প্রভাব

পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

প্রায় দেড় হাজার বৎসর অতীত হইতে চলিল, বৌদ্ধ-মতবিধ্বংসের পর হইতে এদেশে বেদান্তমতেরই প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া রহিয়াছে। অধিকাংশ লোকই বেদান্তমতানুকূল ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত। তন্মধ্যে আবার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত বেদমূলক অদ্বৈতবেদান্তের মতই প্রবলভাবে প্রচলিত। পরবর্ত্তী আচার্য্য ভাস্কর, ভগবান্ রামানুজ, নিম্বার্ক, শ্রীকর, শ্রীকণ্ঠ মধ্ববল্লভপ্রভৃতি আচার্য্যগণের বেদান্তমত শঙ্করাচার্য্যের বেদান্তমতের বিরোধী। ইঁহারা সকলেই শঙ্করমতখণ্ডনে বদ্ধপরিকর হওয়ায় এবং শঙ্করসম্প্রদায় আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়ায় সকল সম্প্রদায়মধ্যে অগণিত দার্শনিক বিচারপূর্ণ গ্রন্থের আবির্ভাব হইয়াছে। ফলতঃ ইঁহারা সকলেই স্ব-স্ব-মতে নিষ্ঠাবান্ এবং ইঁহাদের পরস্পরের মতের খণ্ডনমণ্ডনের উদ্দেশ্য স্ব-স্ব মতে নিষ্ঠাবুদ্ধি। ইঁহারা সকলেই বেদপ্রামাণ্যবাদী, এবং বেদের অনুসরণ করিয়াই বিচারাচার করিয়া থাকেন, এবং স্ব-স্ব সম্প্রদায়ানুসারে জীবন-যাপন করিয়া নিঃশ্রেয়সলাভের আকাঙ্ক্ষা করেন। এজন্য ইঁহাদের পরস্পরের খণ্ডন-মণ্ডনে বা বিরোধে ধর্ম্মের বা সমাজের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে অধিকাংশ পাশ্চাত্যশিক্ষিত সংস্কৃতজ্ঞগণ প্রায়ই সংস্কৃতশিক্ষার হর্ত্তা-কর্ত্তা হইয়া পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আমাদের ধর্ম্মের ও ধর্ম্মমূলক আচারব্যবহারের এবং সেই ধর্ম্মের মূলস্বরূপ শাস্ত্রাদির সম্বন্ধে নানারূপ গবেষণাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন। ইঁহাদের গবেষণার উদ্দেশ্য—কে কাহার নিকট ঋণী, কে কোন্ সময়ে কোন্ দেশে আবির্ভূত, কে কোন্ মতের যুক্তিতর্কের প্রবর্ত্তক, আমাদের দেব দেবী, শাস্ত্র, আচার প্রভৃতি, ইজিপ্ট, রোম, গ্রীস, আরব, পারস্য, তিব্বত, চীন, তাতার প্রভৃতির নিকট হইতে কতটা
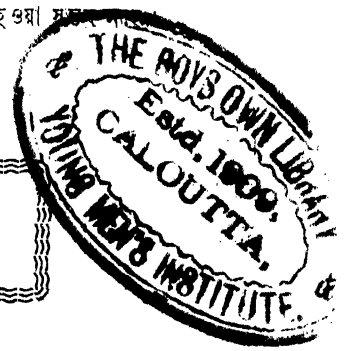
আসিয়াছে—ইত্যাদির নির্ণয়; আর তাহার ফলে "ডাক্তার" "পি, আর, এস" প্রভৃতি উপাধিভূষিত হইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বাহবা পাইয়া ক্রমে জীবিকার একটা ব্যবস্থা করিয়া ফেলা। ইঁহারা অনেকেই বিলাতাদি স্থানে গিয়া শিক্ষা সমাপন করেন, সাহেবী চালে চলেন, সাহেবী আচার-ব্যবহারে থাকেন, সাহেবের মত চিন্তা করেন, এবং তৎপরে আমাদের ধর্ম্মের মূল বেদের অপৌরুষেয়তায় বা অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করেন না, পরলোকে বিশ্বাস বা দেবদ্বিজগুরুভক্তি, অন্ধবিশ্বাসের লক্ষণ ও মূর্খতা বিবেচনা করেন, অথচ সেই বেদ-বেদান্ত অবলম্বন করিয়া কোন্ আচার্য্যের কোন্ মতবাদটী যুক্তিসহ এবং বেদ-বেদান্তানুগত—ইত্যাদি নির্ণয় করিয়া বিদ্যার্থিগণকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পিতৃপুরুষগণকেও শিক্ষা দিয়া থাকেন। আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের ধর্ম্মের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া পাশ্চাত্যাভিমানিনী দেবতা আজ এইভাবে তাঁহার মানসপুত্রগণের দ্বারা আমাদের ধর্ম্মের ধ্বংস-সাধনে প্রবৃত্ত।!!

সম্প্রতি ইঁহাদের মধ্যে একজন অতি ধুরন্ধর ব্যক্তি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া শঙ্করমতের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ইনি মহোৎসাহে বহু বেদবেদান্তবাক্য উদ্ধৃত করিয়া বিশেষ দক্ষতার সহিত অদ্বৈতমতের উপর বহু আক্ষেপ সহকারে শঙ্করাচার্য্যকে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ এবং তাঁহার যুক্তি-তর্ককে প্রৌঢ়িবাদ বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এক্ষণে কতিপয় বন্ধুর ইচ্ছানুসারে এবং সম্প্রদায়-রক্ষার অনুরোধে এই প্রবন্ধে তাহার উত্তর প্রদান করিবার চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এস্থলে তিনি উপনিষদ্ অবলম্বনে যাহা বলিয়াছেন এই প্রবন্ধে তাহাই আলোচিত হইবে।

এস্থলে স্বমতপ্রদর্শনার্থ তিনি প্রথমে কেনোপনিষৎ-খানিকে অবলম্বন করিয়াছেন। ঈশোপনিষৎ খানিকে স্পর্শ করেন নাই। তৎপরে কঠ, প্রশ্ন ও মাণ্ডুক্য উপনিষদ্‌ও তিনি গ্রহণ করেন নাই। মুণ্ডক, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও শ্বেতাশ্বর উপনিষদ্ হইতেই তিনি তাঁহার অভীষ্ট অচিন্ত্যভেদাভেদ বা অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব আমরা তাহাই কেবল আলোচনা করিব। যথা—

(১) কেনোপনিষদের "কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ" এই বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকটী বাক্যবাদ দিয়া "তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে" এই পর্য্যন্ত বাক্যাবলী উদ্ধার করিয়া ইহাদের একটা যে ভাবার্থ প্রদান করা হইয়াছে, তাহাতে ত' অদ্বৈতবাদেরই সমর্থন হয় এবং প্রবন্ধকর্ত্তার অভীষ্ট অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈতবাদের বরং প্রতিকূলতাই হয়। কারণ, অনুবাদমধ্যে বলা হইয়াছে—"তাঁহাকে আমরা জানি না, জানিতে পারি না। তাঁহার কথা আমরা কি করিয়া বলিব? তিনি জানা ও অজানার বাহিরে। চক্ষু যাহাকে দেখিতে পায় না, যিনি চক্ষুর মধ্য দিয়া দেখেন—তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, আর যাহা কিছু উপাসনা কর, তাহা ব্রহ্ম নহে।"

আচ্ছা, এখানে যদি তাঁহার এক পাদ এই জগৎ বলা হয়, তবে তাঁহাকে আমরা জানি না ও জানিতে পারিনা—বলা যায় কিরূপে? অদ্বৈতমতে শুদ্ধব্রহ্মকে জানা যায় না—বলা হয়, সুতরাং সে মতে উক্ত অনুবাদ অনুকূলই হয়, আর অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে সুতরাং প্রতিকূলই হয়।

তাহার পর উক্ত অনুবাদটীও ভুল হইয়াছে, কারণ, "যৎ চক্ষুষা ন পশ্যতি" অর্থ "চক্ষু যাহাকে দেখিতে পায় না" এরূপ নহে, কিন্তু চক্ষুর দ্বারা লোকে যাহাকে দেখিতে পায় না। আর "যেন চক্ষুংষি পশ্যতি" অর্থ "যিনি চক্ষুর মধ্য দিয়া দেখেন" এরূপ নহে, কিন্তু "লোকে যাহার দ্বারা চক্ষু সকলকে দেখে, অর্থাৎ অন্তঃকরণবৃত্তিভেদে বিভিন্ন চক্ষুবৃত্তি সকলকে দেখে", ইত্যাদি। অতএব অনুবাদটীও ভুল।

আর এই ভুল করিয়া অদ্বৈতবাদেরই অনুকূলতা ভালরূপেই করা হইয়াছে। কারণ, বলা হইয়াছে—"যিনি চক্ষুর মধ্য দিয়া দেখেন তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে" ইত্যাদি। এখন চক্ষুর মধ্য দিয়া দেখে জীবই, সেই জীবকে তাহা হইলে ব্রহ্ম বলা হইল। বস্তুতঃ অদ্বৈতমতে "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ" ইহা অতি প্রসিদ্ধ কথা। অতএব কেনোপনিষদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়া

অজ্ঞাতসারে অদ্বৈতবাদই বলা হইয়াছে। সত্য এইভাবেই প্রকাশ পায়।

অতঃপর কঠ ও প্রশ্ন উপনিষদ্‌কে বাদ দিয়া মুণ্ডক উপনিষদ্ গ্রহণ করা হইয়াছে। এদুইটী উপনিষদ্‌কে বাদ দেওয়া হইল কেন, তাহা বলা কঠিন নহে। কারণ ইহাতে তত সুবিধা হইত না। অপব্যাখ্যায় যাঁহাদের ভয় বা সংকোচবোধ নাই, তাঁহাদের মধ্যে এই উপনিষদ্ দুটীর মধ্যে অনেক স্থলই স্বমতের অনুকূল হইত সন্দেহ নাই। ইহা বোধহয় প্রৌঢ়িবাদী শঙ্করাচার্য্যের ভাগ্যের বলে প্রবন্ধকর্ত্তার লক্ষ্য বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক—

(২) মুণ্ডকোপনিষদের বিচারচ্ছলে বলা হইতেছে—"মুণ্ডক উপনিষদে বলা হইয়াছে—"ওঁ ব্রহ্ম দেবানাং প্রথমং সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।" ব্রহ্মই পৃথিবীর কর্ত্তা, তিনিই পৃথিবীর পালয়িতা" ইত্যাদি।

এখন অদ্বৈতমতে ব্রহ্মের বিশ্ব-কর্ত্তৃত্ব বা বিশ্ব-পালয়িতৃত্ব প্রভৃতি সবই মায়িক অর্থাৎ মিথ্যা; কিন্তু অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদীর মতে তাহা মায়িক নহে অর্থাৎ মিথ্যা নহে, প্রত্যুত সত্য। কিন্তু ইহার অনুকূলে যদি মুণ্ডকোপনিষদ্ হইতে প্রমাণ আবশ্যক হয়, তাহা হইলে কি করা যায়? অন্তরের দুরাগ্রহ মূর্ত্তিমান্ হইয়া উপনিষদের পাঠটাই বিকৃত করিবার পরামর্শ দান করিল। আর তাহার ফলে "ব্রহ্মার" স্থলে 'ব্রহ্ম' হইয়া গেল, 'প্রথমঃ' স্থলে 'প্রথমং' হইয়া গেল। যেহেতু মুণ্ডকে পাঠ আছে—

"ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব, বিশ্বস্য কর্ত্তা
ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাম্ অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠ-
পুত্রায় প্রাহ॥" ১।

আচ্ছা, এখানে 'ব্রহ্মা' পদটীকে 'ব্রহ্ম' করা হইল কেন? ব্রহ্ম ও ব্রহ্মা কি একার্থক? ব্রহ্ম "বিশ্ব-ভুবনরূপে আপনাকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন" এই নিজ মতের সমর্থনের জন্য কি? কারণ, শ্রুতিতে যেখানে সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্ত্তার কথা পাওয়া যায়, সেখানে শ্রুতিতে সৃষ্টিকর্ত্তৃরূপে হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বরকে বুঝাইয়া থাকে। হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বর 'কেবল ব্রহ্ম' নহেন, তিনি মায়াশক্তিযুক্ত ব্রহ্মই হন। আর তাহা হইলে "ব্রহ্মের এক অংশ বিকৃত হইয়া জগৎ হইয়াছে" এরূপ নিয়মটী আর থাকে না। অতএব ব্রহ্মকে ভুবনের কর্ত্তা ও গোপ্তা করিবার জন্য এবং ব্রহ্ম "বিশ্ব-ভুবনরূপে আপনাকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন" এই কথাটীকে দৃঢ় করিবার জন্য এখানে 'ব্রহ্মা' পদকে 'ব্রহ্ম' করাই সুবিধা। সাধারণ পাঠক কি আর অত পুস্তকের পাতা উল্টাইয়া দেখিবেন? আর তাহার ফলে অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদটী সাধারণের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু এরূপ করায় যে অথর্ব্বকে 'ব্রহ্মের' জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিতে হইবে, সেদিকে আর লক্ষ্য পড়িল না। যেহেতু উক্ত শ্রুতির পরেই আছে "সঃ * * অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ।" যাঁহারা অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের এ দেশীয় ভক্ত বা অনুরাগী বা আচার্য্যবিশেষ, তাঁহারা বোধ হয়, স্বমতস্থাপন করিতে গিয়া কখনও এরূপ হাস্যাস্পদ অবস্থায় উপনীত হন নাই। এ বুদ্ধি নিশ্চয়ই বিদেশী আমদানী বলিয়া বুঝিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

ভ্রান্তি-বি[illegible]
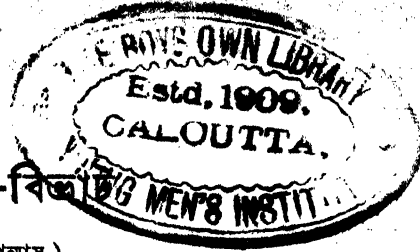
(উপন্যাস)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মা ফিরে' এসেছেন কাশী থেকে', গুরুদেবকে সঙ্গে নিয়ে'। জ্যোৎস্না সেই যে বিছানা নিয়েছে আর উঠে নি, মাথা তুলে'। দুদিন সে 'হাঁ' করে নি—এক ফোঁটা জলও তার মুখে পড়ে নি। রঞ্জন নিরুপায় হয়ে' মাকে তার করে' দিয়েছিল শীঘ্র ফিরে' আসার জন্য। ডাক্তাররা বলেন, কোন কারণে, "নার্ভাস্ শকে" জ্যোৎস্নার এই অবস্থা। মুখ না খোলে, নাক দিয়ে' রবারের নলে দুগ্ধপান করাতে হবে। কিন্তু সে উপদ্রব আর জ্যোৎস্নার প্রতি কর্‌তে হ'ল না—মায়ের স্নেহবর্ষণে সে আবার যেন নূতন করে বেঁচে উঠ্‌ল। কিন্তু সে মানুষ আর জ্যোৎস্না নয়। পড়া শুনা তো একেবারেই নাই, সংসারের কর্ত্তৃত্ব, আভিজাত্য, আত্ম-সম্মান-বোধ যেখানে, সেখান থেকেই সে সরে' দাঁড়ায়। সে ভোরে উঠে নর্দ্দমা পায়খানা পরিষ্কার করে, মায়ের পূজার আয়োজন করে দেয়। হবিষ্যান্ন রাঁধ্‌তে বল্‌লে হাত গুটিয়ে' দাঁড়ায়। বরং ঝিদের হাত থেকে লোক-জনের এঁটো বাসন নিয়ে' মাজ্‌তে বসে—তবুও কোন বড় কাজে এগোয় না।

মা জিজ্ঞাসা করেন—"এসব কি কাজ? মাথা খারাপ কর কেন—কি হয়েছে—তোমার?"

নিশ্চল দৃষ্টি, স্ফুরিত অধর, দাঁতে দাঁত চেপে যেন মর্ম্মকথা ফিরিয়ে' দিয়ে', আবেগের কান্না রোধ কর্‌তে আর পারে না। সে চেঁচিয়ে' কেঁদে' উঠে'—মা আঁচল নিয়ে' চোখ মোছাতে যান, জ্যোৎস্না ছুটে' পালায়। কানু বলে—ও আর কিছু নয়, নিশ্চয়ই মন্দ হাওয়া লেগেছে গায়ে। রোজা ডাক্‌তেই হবে, মা সে কথায় কাণ দেন না।

রঞ্জন যে কি কর্‌বে, ভেবে'ই পায় না। সে অনেক জিজ্ঞাসা করেছে জ্যোৎস্নাকে, কি তার হয়েছে,—জবাব পায় না। তিনকড়িকে ডেকে' সে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলেও সদুত্তর পায় নি। সে দিন রাত থেকেই জ্যোৎস্নার এই অবস্থা; পথে কি এমন কাণ্ড ঘট্‌তে পারে, যে জ্যোৎস্নার এমন ভূতে পাওয়ার মত অবস্থা হয়! তিনকড়ি বলে—পথে দু'একবার তার গলার আওয়াজ শুনেছিল বটে, কিন্তু লেক্‌রোডে গিয়ে' সে দেখ্‌ল—বৌদিদি তন্দ্রাচ্ছন্না, ভয়ে ভয়েই সে ফিরিয়ে' এনেছিল গাড়ী—তারপর কেন যে তার এমন অবস্থা সেও বুঝে না, ভেবে'ও স্থির কর্‌তে পারে না।

গুরুজী আসন করেছিলেন বাইরের ঘরে। কাশী থেকে এক মহাপুরুষ এসেছেন রঞ্জনের বাড়ী, একথা পাড়ার লোকের কাণে গিয়েছিল। কথা কাণে হাঁটে; আফিসের কেরাণী থেকে আদালতের উকিল-মহলেও মহাপুরুষের আগমন-বার্ত্তা রাষ্ট্র হয়ে' পড়েছিল। রঞ্জনের বাড়ী লোকসমাগমে মুখর হয়ে' উঠেছিল। ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু বড় কেহ নহে, সকলেই যেন দায়গ্রস্ত, মহাপুরুষের কৃপা হ'লেই বিপদ্ কাটে এই নতি মিনতি, হল-ঘরে নানাসুরে নানাছন্দে কলরব চলে রাত্রিদিন।

মা বল্‌লেন—হাঁরে রঞ্জন, সহর-শুদ্ধ লোক মহাপুরুষের কাছে আস্‌ছে আর তুই কি এমনই ধিঙ্গি হয়েছিস যে একবার সময় হ'ল না, ওঁর কাছে গিয়ে' একটা প্রণাম দিয়ে আস্‌তে?

রঞ্জন টিপ্ করে' মায়ের চরণে প্রণতিজ্ঞাপন করে' বল্‌ল—'জন্মে' অবধি এমন কিছু পাই নি, যা' আশ্রয় বলে' মেনে নি, বিশ্বাস করে' আস্থা রাখি। পেয়েছি মাতৃস্নেহ, আজও আছি পাহাড়ের আড়ালে—আমার আর কিছুর প্রয়োজন নেই, মা!"

মায়ের বুক ভরে' উঠেছিল রঞ্জনের কথায় মহিমায়, মর্য্যাদায়। তবুও বল্‌লেন—"এমন ছেলেও কখন দেখি নি—আজ বাদে কাল ছেলের বাপ হবি, মায়ের কোল-ছাড়া হ'তে' চাস্ না। আমি বল্‌ছি শোন্—আর কিছু না পারিস্, একটা পেন্নাম দিয়ে' আয়—তা' না হ'লে উনি মনে বড় দুঃখ কর্‌বেন।"

"বল কি, মা? সন্ন্যাসী মানুষের আমাদের মত আবার দুঃখ কষ্ট আছে নাকি?"

রঞ্জন আর একবার মায়ের চরণে মাথা ছুঁইয়ে' বলে গেল—মাথাটা এখানে যা' নুইয়েছি, মা—আর কোথাও ঘাড় হেঁট করতে ব'লো না।"

কাদু পাশে দাঁড়িয়েছিল, মা বল্লেন—"দেখ্লি কাদু, ছেলের রকম দেখ্লি? আমি ম'লে এ বাড়ীতে আর সাধু সন্ত পা দিচ্ছে না।"

"তা' না দিক্, মা—ও একটা বাজে ঝঞ্ঝাট্, ও কি ধর্ম্ম বুঝি না, মা। সারাদিন গ্যাঁট্ হয়ে' বসে' থাকা, ধম্ম কোথায় মা?"

"ওকি কথা রে? মন্দিরে মাটি পাথরের দেবতাও বসে' থায়—তাই বলে' কি ঠাকুর-দেবতাকে অমান্য করবি?"

"দেবতা খায় কোথা, মা? ও-মোড়ের কালীমন্দিরে যা' দ্রব্য সামগ্রী দেওয়া হয়, খায় তো হারু ঠাকুর। যদি হারু ঠাকুরকে দেবতা বল—কথা নেই। যা' দেখ্ছি তাই বল্ছি মা—আমরা মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, ভিতরে যদি কিছু থাকে বুঝি না।"

কাদুর পাষণ্ড বৃত্তির পরিচয় পেয়ে' মা কি বল্তে যাচ্ছিলেন—কিন্তু হঠাৎ তিনকড়ি এসে' বল্ল—মাসীমা, তোমার জন্যই পড়ে' আছি কম্বল বিছিয়ে'—বি-টি-পাশ করেছি—বল্লেই তল্পা তল্পি বাঁধি।"

"আর দুদিন থেকে যা—পূর্ণিমাতে গুরুদেব উপদেশ দেবেন। তা'ছাড়া দু'দশ জনকে নেমন্তন্নও করব। দুদিন থেকে গেলে ক্ষতি আর কি হবে?"

"ক্ষতি আর কি হবে! তবে মাসীমা, রাগ করবেন না—যদি থাকি, সে মাসীমা বল্ছেন বলে'—গুরুজীর কথা শুনতে নয়"—এই বলে' সে চলে গেল।

মা বল্লেন—"শুন্লি কাদু, তোদের কর্ত্তাবাবুও লেখা-পড়া শিখেছিলেন এদের চেয়ে কম নয়। কিন্তু সে যুগে তাঁরা চাইতেন সব কিছুকে বিশ্বাস করতে, আর এই জন্যই মন্দিরের দেবতা ছিল জাগ্রত, আর মানুষের মধ্যেও মহাপুরুষ দেখা দিতেন। এরা যে কি জিনিষ হারাচ্ছে, বুঝছে না।"

গৃহিণী বিরক্ত হবেন, তাই কাদু মুখে কিছু বল্ল না—তার মোটেই ভাল লাগ্ছিল না—একজন বসে' বসে' খাবে আর দশজন তার খিদমৎ খাট্বে। সে ঠোঁট্ উল্টে চলে গেল সেখান থেকে।

জ্যোৎস্না আড়ালে দাঁড়িয়ে কথাগুলি বোধ হয় শুন্ছিল কাণ পেতে'। সে এই প্রথম নাতিদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে' বল্ল—"মা, আমায় একবার নিয়ে চল না—গুরুজীর কাছে। আমার কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে।"

মা যেন হাতে স্বর্গ পেলেন; এই চাওয়াই তাঁর অন্তরে অন্তরে ছিল। কাশী থেকে ফিরে' এসে' তিনি সংসারে কি যেন একটা সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে, এইরূপ অনুভব করছিলেন। জ্যোৎস্নার কথা শুনে' তিনি কাদুকে ডেকে বলে' দিলেন—"দেখ্ তো কাদু, হল-ঘরে এখন কারা আছে! যদি বাইরের লোক থাকে, বল্বি,—মেয়েরা আস্ছে তাদের একটু উঠ্তে হবে।"

হল-ঘরের সোফা কৌচ বিলাতীভাবের সাজ-গোজ সবই সরিয়ে' ফেলা হয়েছে। মেঝের উপর বিস্তৃত করে' গালিচার উপর পরিষ্কার ফরাস পাতা; আর এক পাশে, পুরু গদীর উপর মৃগচর্ম্ম বিছিয়ে বসে' আছেন, গুরুজী পদ্মাসন করে'। শাশুড়ী ও বধূ, ঘরে গিয়ে' প্রবেশ করতেই গুরুদেবের প্রসন্নদৃষ্টি তাদের নীরবেই কাছে এসে' বসতে অনুজ্ঞা দিল। মা বল্লেন—"এই আমার রঞ্জনের বউ, আমি নিজের চোখে দেখে' ঘরে তুলেছি। বউমার কি জিজ্ঞাসা করার আছে—ডাক্তারেরা অনেক কথাই বলেন; কিন্তু আমার মনে হয়, রোগের প্রতিকার আপনার হাতেই আছে। তুমি ব'স বউ মা, মহাপুরুষের কাছে কিছু গোপন ক'রো না। মনে যদি কোথাও কোন ব্যথা লেগে থাকে খুলে বলো, ওঁর দয়া হ'লে, কোন কষ্ট থাকবে না।"

মা বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে তাড়া-তাড়ি। মহাপুরুষ বয়স্থ। মাথার চুলগুলি লতিয়ে' পড়েছে স্কন্ধে, চিবুকে; শ্মশ্রু গুম্ফে বদনমণ্ডল আচ্ছন্ন। শুভ্রকান্তি, দৃষ্টি সমুজ্জল। জ্যোৎস্নার মনে হ'ল—সন্ন্যাসী বলতেই আমরা ওঙের

কথাই মনে হয়, সম্ভবতঃ ইনি সে প্রকৃতির নন্। তিনি জ্যোৎস্নার মুখের দিকে চেয়ে' হেসে বল্লেন—তোমার অসুখের কথা শুনে'ই তো তাড়াতাড়ি চলে আসা। কিন্তু রোগীর কাছে তো আমি যাই না মা—রোগীই আমার কাছে আসে। তুমি ইচ্ছা করেই, মনে তিলে তিলে আঁধার জমিয়ে তুলেছ, ঔষধে ইহার প্রতিকার নাই। মনকে শক্ত কর, সংশয় রেখো না—প্রফুল্ল হও।"

জ্যোৎস্না কথা শুনে' হতভম্ব হয়ে' গেল—তার মনে হ'ল, মহাপুরুষ নিশ্চয়ই অন্তর্য্যামী। কিন্তু নিজে একটু সতর্ক হয়ে বল্ল, "আপনি কি বল্ছেন, বুঝ্তে পার্ছি না।"

"তোমাকে এখন বোঝাতেও পার্‌ব না। রাজলক্ষ্মী তুমি, কিন্তু আকাশের সূর্য্যও রাহুগ্রস্ত হয়—খুব দুঃসময় তোমার, বড় আশ্রয়ের দরকার, সে আশ্রয় স্বামী ভিন্ন আর কে হ'তে পারে?"

কথাগুলি ভাল—কিন্তু জ্যোৎস্নার মনে হ'ল, তার অবস্থার কথা যত সে গোপন করুক, যে কোন দিক্ দিয়েই হোক তা' প্রকাশ হয়ে' গেছে অনেকের কাছেই—মহাপুরুষ তারই প্রতিধ্বনি তুলেছেন। স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ নিয়ে' কেউ যে তাকে শিক্ষা দেবে, ইহা যেন তার কাছে অপমান বলেই বোধ হ'ল—সে তাড়াতাড়ি প্রণাম করে' উঠে পড়্ছিল। মহাপুরুষ বল্লেন—"আর একটু বস'—দু'চারটী কথা শুনে যাও। যে স্রোতঃ বয়েছে, যদি দৃঢ়ভাবে আশ্রয় ধরে' না থাক, বিপদের সম্ভাবনা আছে; আমি তোমাদের হিতকামী, এই সংসারের কল্যাণ কামনা করার আমার দাবী আছে। মনে ক'রো না—তাতে আমার স্বার্থ আছে, একবিন্দু। রঞ্জনের সাধু সন্ন্যাসীর উপর বিশ্বাস নেই; তোমারও না থাকা সঙ্গত; কিন্তু বুঝে দেখো, আমি যা' বল্ছি তোমার মনেরই অবস্থার কথা, তা' অসত্য বলে' অস্বীকার করতে পার না।"

জ্যোৎস্নার মন আরও বিষিয়ে' উঠ্ল। সে এই অযাচিত উপদেশ শুনতে আসে নি। আর কথাগুলি এমনই সাধারণ, লেক্-রোড থেকে' ফিরে' আসার পরে', সে [illegible] আছে, ভরসা পেলে তা' দেখে' বাড়ীর ঝি-চাকরও তাকে এমন উপদেশ দিতে পারে। কিন্তু রূঢ় আচরণ শোভন হবে না। কাজেই সে জোড়করে নিবেদন জানালে—"আপনার কাছে নারীর কর্ত্তব্য কি, এমন কিছু সদুপদেশ শুন্তে এসেছি।"

মহাপুরুষ হেসে' উঠ্লেন হো হো করে'; বল্লেন—"খুব বুদ্ধিমতী তুমি, আর ফাঁদেও পড়েছ বুদ্ধির চাতুরীতে। যাক্, সে কথা—উপদেশ শুন্বে? মনে রেখো, নারীর কর্ত্তব্য, ভর্ত্তা য'াতে শান্তি লাভ করে, সেইরূপ নীতি পালন করা। স্বামী যখন রিপু পরতন্ত্র, অগ্নিমূর্ত্তি ধরে—নারীর ধর্ম্ম, তখন তাঁকে প্লাবিত করে' দেওয়া, জাহ্নবী-ধারায় অভিষিক্ত করে'। নারী সতত পরুষবাক্য সহ্য করবে, পুরুষের মুখে না প্রতিবাদের উচ্চকণ্ঠ উঠে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে'। পতি-প্রতিকূলা নারীদের জীবনে সুখ নাই।"

জ্যোৎস্নার মনে হ'ল, কাণে আঙ্গুল দিয়ে', সে উঠে পড়ে—এসব কথা তার অজানা নয়, কিন্তু গ্রন্থমধ্যেই এই সকল বাণী নিহিত থাকাই ভাল। জীবনের তাগিদে যে আচরণ ইচ্ছা-অনিচ্ছাসত্ত্বে প্রকাশিত হয়ে পড়ে, সে কথাতো কেহ লিখে রাখে না! জ্যোৎস্নার মন ভিন্নমুখী হয়ে' পড়্লেও, মহাপুরুষ হাসেন আর বলেন—"নারীরা যেরূপ মনোভাব-পরায়ণা হয়, পতিও তাহারা তাদৃশ লাভ করে। বিবাহ-কালে নারী পত্নীস্বরূপা। কিন্তু স্বামীকে ভরিয়ে' যদি সে তুল্তে না পারে, তার স্ত্রীত্বই ব্যর্থ হয়। নারীকে পতি ভরায় বলে'ই সে ভার্য্যা। এই ভরণ হয় উভয় দিক্ থেকেই আপনাকে সার্থক করে' পরস্পর, এমন ভাবেই পতি নূতন করে' জন্ম নেয় পত্নীর মধ্যে—তাই সে জায়া। তারপর পতিপরায়ণা নারী শোক-দুঃখ-মোহাদি মুছে' দিয়ে', পতিকে যখন শিবত্বে তুলে' দেয়, তখনই সে হয় কলত্র। আমি তোমায় যোগ্যপতির যোগ্যপত্নী হ'তেই বলি।"

এক খাম্চা বিষ গায়ে ছড়িয়ে' দিলেও এত যন্ত্রণা হয় না। তার বুকে হাতুড়ীর আঘাত পড়্তে লাগ্ল দুম্-দুম্ করে'। ব্যথায় কাতর হয়ে', যেন সে চীৎকার করে' বল্তে চায়—ওগো জানি, জানি, জানি! কিন্তু যে নিরুপায়া, নারীত্বের অঙ্কুর যার অকালে ঝল্সে' গেছে রৌদ্রতাপে, তার বেদনা-বিধুর অন্তরের জন্য সান্ত্বনার কোন প্রলেপ আছে কি—মহাপুরুষের ঝুলিতে? পুরাণ সংহিতার

কথা শুন্‌তে এখানে আসি নি, এসেছি জান্‌তে—স্বেচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, নারীর অঙ্গ যদি কলুষিত হয়—ব্যভিচার-স্পর্শে—তার কি মুক্তি আছে, প্রায়শ্চিত্ত আছে?

জ্যোৎস্না একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠে বল্‌ল "শুধুই স্ত্রীর কর্ত্তব্য শুনে' শুনে' কাণ আমাদের ঝালা-পালা হয়ে' গেছে—আপনারা কি পতি-ধর্ম্ম প্রচার করেন না?"

"কিন্তু সে কথা তোমার কাছে বলা তো নিরর্থক, মা!

"কেন? নারী বলে' বুঝি? কিন্তু সর্ব্বাগ্রে আমরাও মানুষ! পুরুষের মুখে নারীর ধর্ম্ম যেমন প্রচারিত হয়, নারীর কণ্ঠে পুরুষের ধর্ম্ম প্রচারিত না হবে কেন? পুরুষ জান্‌তে পারে, নারীর ধর্ম্ম কি; আর নারী জান্‌বে না বুঝি পুরুষের ধর্ম্ম?"

মহাপুরুষ একটু অপ্রতিভ হলেন—মনে মনে, জ্যোৎস্নার প্রশংসা করে'ই বল্‌লেন—"দৃষ্টি আমার ভুল নয়, সত্যই তুমি বুদ্ধিমতী। ভর্ত্তার ধর্ম্ম স্ত্রীকে কোন অবস্থায় স্বাধীন-ভাবে অবস্থান কর্‌তে দিবে না।"

কথা শুনে'ই, জ্যোৎস্না উত্তেজিত কণ্ঠে বলে' উঠ্‌ল "কেন?"

"নারী কদাপি স্বাধীন অবস্থায় থাকার যোগ্য নয় এই জন্য পতির সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ভার্য্যাকে রক্ষা করা, এই বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র অবহেলা সন্তাপের কারণ হয়।"

জ্যোৎস্নার বুক ছিঁড়ে', একটা উষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে' এল। কিন্তু কথাটা নারীত্বের অভিমানে বেজেছিল—সে প্রশ্ন তুল্‌ল'—"কেন বলুন দেখি নারীকে পুরুষ এমন হীনচক্ষে দেখ্‌বে?"

"নারী যে স্বভাবতঃই চঞ্চলপ্রকৃতির। এইজন্য সৌন্দর্য্যের বিচার নাই—বয়স-বিশেষের বিচার নাই—স্বাধীন অবস্থায় যে সুযোগ ঘটে, নারীর চিত্ত পুরুষ-সন্দর্শন-মাত্রে ব্যভিচার করে' বসে।"

জ্যোৎস্না অস্থির হয়ে' উঠ্‌ল। তখন তার আর দিগ্বিদিক্‌ জ্ঞান রইল না। সর্পের ন্যায় উন্নতফণা তুলে' সে বল্‌ল—"কোন যুগের কথা বলছেন আপনি—সে কোন যুগ? বিধাতা তাদের স্বভাবতঃ দুর্ব্বল করে' গড়েছেন বলে' পুরুষ অবাধে অত্যাচার করেছে নারীর উপর—সেই আদিমযুগের কথা আজ আর মাথা পেতে' নেবে না নারী—পৃথিবীর দায়েই সে দুর্ব্বলা, দেহের রক্ত দিয়ে তাকে সৃজন কর্‌তে হয়, পালন কর্‌তে হয়, দেহ তার ক্ষীণ, অসহায়া সে পৃথিবীর কল্যাণে। কিন্তু দেহটাই কি তার সবখানি? নারীর কি শক্ত মন নাই, দুর্জ্জয় হৃদয় নাই, প্রখর বুদ্ধি নাই? শরীরই গড়ে' তুলেছে তার অন্তঃকরণকে, না তার অনিন্দ্য দিব্য সুন্দর অন্তঃকরণই গড়ে' তুলেছে কল্যাণময়ী মূর্ত্তি, নারীর আকারে?"

মহাপুরুষ মৃদুহাস্তে জ্যোৎস্নার দিকে, কিছুক্ষণ চেয়ে' রইলেন—তারপর স্থির হয়ে' বল্‌লেন—"একটা কথা, বউ মা—ব্যসনরত দুঃসঙ্গ-সংসর্গ, ভর্ত্তৃবিরহ, স্বেচ্ছাভ্রমণ নারীকে কলুষিত করেই করে। ভর্ত্তা যদি এই সকল ক্ষেত্রে উদাসীন হয়—নারীর পতন সেখানে অবশ্যম্ভাবী।"

উদ্‌গ্রীব দৃষ্টিতে মহাপুরুষ জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে' রইলেন।

জ্যোৎস্নার হৃদয়ে যেন এককালে, শতসহস্র বৃশ্চিকের দংশন-জ্বালা অনুভূত হ'ল। উদ্ধতগর্ব্ব প্রচণ্ড আঘাতে কে যেন অবনত করে' দিল! বিচূর্ণ ফণা সর্প-চৈতন্য, নিরুপায় হয়ে' যেমন ফুল্‌তে থাকে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে, তেমনই জ্যোৎস্নার সর্ব্বশরীর পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল, শ্বাসে, শ্বাসে, বাতাস নিয়ে'—বুক তার যেন এই মুহূর্ত্তেই ফেটে' যাবে চৌচির হয়ে'! সে হিয়াখানি শূন্য করার জন্য সুগভীর নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে' করুণকণ্ঠে বলে' উঠ্‌ল—"মার্জ্জনা কর্‌বেন—কথার উপরে কথা কইছি। সে যুগের কথা জানা নেই—পুরাণসংহিতার সে মৃত বাণীর চেয়ে জাগ্রত জীবনবেদে এই কথাই স্পষ্ট হয়ে উঠে, যে কোন স্বাধীন অবস্থায় সুযোগের ফাঁকে নারীর চিত্ত হয় তো কোথাও কোথাও দুর্ব্বল হয়ে' পড়তে পারে। কিন্তু এই অবস্থায় বুঝি একজনও পুরুষ খুঁজে' পাবেন না—যার পতনের সম্ভাবনা নাই। এখানে যুক্তি নাই, কোন উপদেশ নাই—এ যুগের ঐ সত্য, দর্শনসংহিতায় পুরাণে পুরুষ যদি সঙ্কলন করে' না যায়, নারী জগৎ উদাসীন থাকবে না এই সব-চেয়ে বড় সত্যটাকে লেখনীগত করে' যেতে।"

মহাপুরুষ তেমনই মৃদু হাস্তে বল্লেন—"আমি সন্তুষ্ট হলাম তোমার কথায়। কিন্তু সে যুগের এ যুগের কথা নয়—ঋষিবচন মিথ্যা নয়, মা; বিধাতা সৃষ্টি করেছেন নারীকে যেরূপ স্বভাব দিয়ে, তাতে সততই তাকে আশ্রয় নিতে হবে পুরুষকে আড়াল করে'। কাম, ক্রোধ, পরহিংসা, কৌটিল্য, পুরুষকেও কাপুরুষ করে—নারীর স্বৈরাচার-পরায়ণতায়—নারী নিজেও সাবধান হবে—পিতা ভর্ত্তা, পুত্রও তাকে সতত রক্ষা করবে—নানাকাজে গৃহস্থালীর পর্য্যবেক্ষণে।"

জ্যোৎস্নার চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে, উঠেছিল—অন্তর্বিপ্লবে কথা বাড়াবার আর তার ইচ্ছা হ'ল না। হাত বাড়িয়ে মহাপুরুষের চরণ-ধূলি নিতে নিতে, মৃদু-ম্লান হাসি-মুখে জিজ্ঞাসা করল—"ভর্ত্তার ব্যভিচারে পত্নী যখন স্নেহলাভে বঞ্চিতা হয়, তখন তার ব্যভিচার কোথাও যদি স্বাভাবিক না হয়ে' এমন কি মন কলুষিত না হয়ে'ও যদি দৈবক্রমে অঘটন সংঘটিত হয়, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নারী করবে—না ব্যভিচারী পুরুষকে করতে হবে? এই প্রশ্নের উত্তর আপনি দেবেন কি?"

যেন একটা গভীর রহস্যের যবনিকা সরে' গেল সন্ন্যাসীর দৃষ্টির সামনে থেকে। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বল্লেন—"দেখ মা, বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে নারীকে যে অধিকার দেওয়া হয় নি হিন্দুধর্ম্মে—তার মানেই নারী হীন, অপদার্থ। তার এই হীনতা থেকে মুক্তি—অন্ধকার মৃত্তিকা-গর্ত্ত থেকে জহরীর হাতেই হীরার যেমন আদর বাড়ে, তেমনই পুরুষই নারীকে তুলতে পারে, দৈন্য থেকে অপদার্থতা থেকে। নারীর স্বেচ্ছাকৃত, অথবা অনিচ্ছাকৃত, যে অবস্থায় হোক যদি পবিত্রতা নষ্ট হয় কোন কারণে, বিনা প্রায়শ্চিত্তে তাহার শোধন হয় না কোন কালে। প্রজ্জলিত আগুনে যে স্বেচ্ছায় অঙ্গুলি প্রদান করে আর অনিচ্ছায় যার অঙ্গুলি পড়ে, উভয়েরই হাত অগ্নি দগ্ধ করতে ছাড়ে না। পাপ-সংস্পর্শ ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তুল্য বলে'ই জেনো।"

"বেশ, এই কথাই শিরোধার্য্য করে' নিলাম"—হঠাৎ তার সমস্যার যেন অন্ত হয়ে গেল এই অবস্থায়। জ্যোৎস্নার ম্লান অবনত দৃষ্টি উত্তেজনায় প্রোজ্জ্বল হয়ে' উঠ্ল। সে দ্রুতপদে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে' গেল।

মা বসে আছেন সোফায়, ছেলে মেঝের উপর বসে' মায়ের সঙ্গে কথা কইছিল। জ্যোৎস্না সদম্ভে ঘরে এসে' ঢুক্‌ল—মা ও ছেলে দু'জনেই বিস্মিত হয়ে' গেল, জ্যোৎস্নাকে দেখে'—কেন না, এই কদিন যে মলিন সরমের প্রলেপ তাকে বিবর্ণ ও বিশীর্ণ করে' তুলেছিল, অকস্মাৎ তা যেন ধুয়ে' মুছে' গেছে; ফুটে' উঠেছে অপরিসীম দীপ্তি তার মুখে, চোখে, সর্ব্বাঙ্গে! মায়ের মন প্রফুল্ল হয়ে' উঠ্‌ল; তিনি হেসে বল্লেন—"মহাপুরুষের সঙ্গে অনেক কথাই কয়ে এসেছ, দেখ্‌ছি। আমি বল্‌ছি কি জান, বউমা মনটা তোমাদের দু'জনেরই দেখ্‌ছি ভেঙ্গে পড়েছে, যেন দু'জনেই মন-মরা হয়ে' পড়েছ, কি জানি কি কারণে—যাই হোক, রঞ্জনকে বল্‌ছি দিন কতক তোমায় নিয়ে ঘুরে' আসুক পশ্চিমে। কি বল?"

শ্বশ্রূঠাকুরাণীর কথায় সম্মতিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে' বহুদিন পরে সে বিনা-বাক্যে পালঙের তলা থেকে ফুল-ঝাঁটা বা'র করে' ঘরের এক প্রান্ত থেকে' ঝাঁট দেওয়া আরম্ভ করে' দিল। মা হেসে' বলে' গেলেন—"বেটী আমার পাগ্‌লী, তাড়াতাড়ি ঝাঁট দেওয়ার তাগিদ পড়ে' গেল!"

রঞ্জন জ্যোৎস্নার প্রফুল্ল-মূর্ত্তি দেখে' ভরসা পেয়েছিল মনে। সে উঠে' গিয়ে' জ্যোৎস্নার কব্জী ধরে' ঝাঁটা-গাছটা কেড়ে নিল জোর করে'ই, বল্লে—"খুব কাজের লোক তুমি তা' আমি জানি; পুরীর পর এই আর একটা সুযোগ পাব—শুধু তুমি আর আমি। কোথায় যাবে?"

"যমের বাড়ী!"

মেঘ কাটে নি। চকসা দেখে মা ও ছেলের মনে আশা হয়েছিল—জ্যোৎস্নার মুখ অন্ধকারময় গম্ভীর। রঞ্জন তবুও তা'র হাত ধরে' ঘরের মধ্যিখানে টেনে' আন্‌ছিল—জ্যোৎস্না খুব বিরক্ত হয়ে' বল্লে—"ছেড়ে' দাও হাত, তুমি আমায় ছুঁয়ো না—"

"কেন? কি অপরাধ করেছি আমি; কোথাও তো তোমায় বাধা দিই নি জ্যোৎস্না! আমায় সিনেমা দেখ্‌তে যেতে বলেছিলে তোমার সঙ্গে—কাজ ছিল তখন অনেক, তাই যাই নি। কিন্তু তবুও তাড়াতাড়ি ছুটেছিলাম শেষে, তুমি রাগ করবে বলে' পিক্‌চার হাউসের দোর পর্য্যন্ত, মনে আছে তোমার?

'তারপর!'—

তারপর আজ এই দশ পনের দিন, তোমার মুখে হাসি দেখি নি, কথা শুনি নি—অন্ধরের ভরা গুমোটের মত দম আট্‌কে যায়—এক ঝলক বাতাস পাই নি, বুক-ভরা নিঃশ্বাস নিতে। যাক্ সে কথা। যদি এই জন্যই তোমার রাগ হয়ে' থাকে, এমন একটা কিছু বল যা' কর্‌লে মান-ভঙ্গ হয়।"

কান্না কেমন করে' সে রোধ কর্‌বে এই অবস্থায়! স্বামীর অপরাধ—পাল্লার একদিকে চাপিয়ে' আত্মাপরাধ ওজন কর্‌তে গিয়ে সে আজ ঝুঁকে' পড়েছে মাটীর দিকে, গুরু ওজনের চাপে। কি উত্তর দিবে সে—পায়ের তলা থেকে ঘরের মেঝে যদি ভেঙ্গে' পড়ে নীচের দিকে', সে বুঝি তবু রক্ষা পায় রঞ্জনের এই করুণ অনুনয়ের হাত থেকে! সে একান্ত অস্বাভাবিক কণ্ঠে, দাঁতে-দাঁতে চেপে' বলে' উঠ্‌ল—"যাও, যাও, হয় আমায় নজর-ছাড়া করো, নয় তুমি মর, আমি মুক্তি পাই জীবনের মত।"

কই এমন কথা তো কোনদিন জ্যোৎস্নার মুখ দিয়ে' বাহির হয় নি—কি হ'ল জ্যোৎস্নার! জ্যোৎস্নাও স্পষ্ট দেখ্‌ল তার চক্ষু দিয়ে' জল গড়িয়ে' পড়্‌ছে, অজস্রধারে, সে চলে' গেল মাথা নামিয়ে', ধীর পদে, ঘর ছেড়ে'।

মধ্যরাত্রি—রঞ্জন শুয়ে' আছে, খাটের উপর, সমুন্নত বক্ষ দুলে' উঠ্‌ছে নিঃশ্বাসের তালে তালে। ঘরের কোণে অপর একটা ছোট খাটের উপর জ্যোৎস্না প্রতি রাত্রেই আশ্রয় নেয়—আজ সে উঠে' এসেছে বিকারগ্রস্থ রোগীর মত কি একটা কাণ্ড বাধাবে বলে'। সুইচ্ খুলে' দিয়ে' সে অনিমেষ নয়নে অনেকক্ষণ চেয়ে' রইল স্বামীর দিকে। রূপের তুলনা নাই—দেবতার ন্যায় কান্তিমান—যেন স্বয়ং কামদেব, রতি-কামনায় স্তিমিত-নেত্র! মৃত্যু হয় না দেখ্‌তে দেখ্‌তে! বিষ খেলে হয় না! ঐ খাটের পাশে ফ্যানের হোল্ডে, গলায় দড়ি দিয়ে ঝুল্‌লে হয় না? না—সে প্রাণহীন দেহটাকে নিয়ে' অনেক ছোঁওয়াছুঁয়ি হবে—কি জানি, হয় তো সে ঘুম ভেঙে' মৃতদেহটাকেই বুকে নিয়ে' কলঙ্কিত হবে। ভাব্‌তে ভাব্‌তে মাথার শিরাগুলি স্ফীত হয়ে' উঠ্‌ল—ঘাড়ের শিরাগুলি এমনই ব্যাথিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, যেন মনে হ'ল সে শিরোহীন কবন্ধের মত, একটা বিকট প্রেতিনী। চক্ষে আলো-শূলের মত বিদ্ধ হ'তে লাগ্‌ল; তাড়াতাড়ি সুইচ্ বন্ধ করে' দিয়ে' সে বারান্দায় এসে দেখ্‌ল, নিশুত রাত্রি, নিস্তব্ধ রাজ-নগরী। ধীর পদসঞ্চারে সে মায়ের ঘরের সাম্‌নে এসে' দাঁড়াল। তন্দ্রাতুরা পুরী। সে আরও এগিয়ে গেল—পাশেই তিনকড়ির ঘর, দুয়ার খোলা, কক্ষ অন্ধকারময়। জ্যোৎস্না ত্বরিতপদে ঘরে ঢুকে' পড়্‌ল। বীভৎস উত্তেজনায় সুইচ্ খুলে' দিতেই তিনকড়ি সবিস্ময়ে চেয়ে' দেখ্‌ল সম্মুখে বিভীষণা, উন্মাদিনী, জ্যোৎস্না—বিশৃঙ্খল কেশপাশ, নয়ন আরক্ত ঘূর্ণায়মান, স্ফুরিত অধর, এখনই যেন বাণী উচ্চারণ কর্‌বে। সত্যই তাই…

জ্যোৎস্না বল্‌ল, "ওঠ, চল।"

ধড়্‌মড়িয়ে তিনকড়ি উঠে' বস্‌ল—উত্তর দিল—"কোথায়? তুমি কেন এত রাত্রে এখানে?" তার সন্ত্রস্ত-দৃষ্টি বারান্দায় গিয়ে' পড়্‌ল—ঘরের আলো সেখানে ছড়িয়ে পড়েছে, অবাধে এলিয়ে।

"কোথায়? যমের বাড়ী। ভয় হচ্ছে, দরজার দিকে ঘন-ঘন তাকাচ্ছ যে, দরজা বন্ধ করে' দোব,—চোর, ধূর্ত্ত…"

তিনকড়ি এই অভাবনীয় ঘটনায় এক মুহূর্ত্ত বিচলিত হয়ে' পড়েছিল; হঠাৎ যেন দেখ্‌ল—বারান্দায় এক অস্পষ্ট পুরুষ মূর্ত্তি! নিশ্চয়ই দাদাও এসেছে সঙ্গে সঙ্গে। সে নিজেকে তবুও প্রকৃতিস্থ করে' বল্‌লে—"অযথা তিরস্কার কর্‌ছ, তোমার এই আচরণ কুল-বধূর নয়," যেমন করে' পড়ার টেবিলে বসে' তার মুখে শাসন-বাণী বাহির হ'ত কৃত্রিম দম্ভে, ঠিক তেমনি করে'ই এই কথাগুলো সে মাষ্টারী ঢঙে উচ্চারণ কর্‌ল।

জ্যোৎস্না হঠাৎ মৃদুহাস্যে বলে' উঠ্‌ল—"ঠাকুর-পো—ভয় নেই কিছু; আজ আমি এসেছি স্বেচ্ছায় তোমার কাছে, রূপ যেচে' দিতে নয়, বাড়ী ছেড়ে' পালাতে চাই।"

তারপর হঠাৎ তার চক্ষু ঝাপ্সা হয়ে এল—করুণ মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে, হাত দুটী জোড় করে' সে বল্‌ল—"দয়া

করে' একটা উপকার কর—আমার কোথাও নিয়ে' চল—আমি এক মুহূর্ত্ত এ বাড়ীতে তেষ্ঠাতে পার্‌ছি না।"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ—মলিনতার ছায়ামাত্র নাই—নির্ভীকতার ভাস্বর-মূর্ত্তি! কিন্তু এই নীরব রাত্রি—ঘরের আলোয় চারিদিক্ ছেয়ে' গেছে! জ্যোৎস্নার কণ্ঠে উচ্চকিত কাতর উক্তি, পাশেই মাসীমা আছেন শুয়ে'—হয় তো চক্ষের ভ্রম, কিন্তু দাদাও এ দৃশ্য দেখ্‌লে কি মনে কর্‌বে! সে এগিয়ে' গেল দরজার দিকে। জ্যোৎস্না কাতর বচনে বার বার কেবলই এই অনুনয় জানাতে লাগ্‌ল "ওগো আমায় নিয়ে চল—একবার নিয়ে' চল এ বাড়ীর ত্রিসীমানা ছাড়িয়ে'—আমার মরা দেহটাও যেন এদের চক্ষে না পড়ে—এমনই একটা উপকার কর, ভাল হবে তোমার—"

জ্যোৎস্না বুঝ্‌তে পারেনি—তিনকড়ির সঙ্গে সঙ্গে সে এসে' পড়েছে ঘরের বাইরে বারান্দায়; হঠাৎ তার চমক হলো, তিনকড়ি প্রবঞ্চনায় সে জ্যোৎস্নাকে বাহিরে এনে'ই তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে' দরজা বন্ধ করে' দিল ঝনাৎ করে'।

জ্যোৎস্না মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হ'য়ে সেখানে দাঁড়িয়ে' রইল। আবার যেন ফিরে এল তার লুপ্ত চৈতন্য—সে এ বাড়ীর কর্ত্রী না! অপদার্থ—কিসের দৈন্য তার, কি সে করেছে' কালই লাথি মেরে' সে তাড়িয়ে' দেবে এই ধূর্ত্ত প্রবঞ্চককে!

স্বপ্নের মত কি যেন হয়ে' গেল এক নিমিষে! কিন্তু স্বপ্ন নয়, সে দাঁড়িয়ে আছে তিনকড়ির শয়ন-গৃহের রুদ্ধ দুয়ারের সম্মুখে। প্রশস্ত দীর্ঘ বারান্দায়, ঘন অন্ধকার ঢেউ খেলিয়ে যাচ্ছে, অধিকতর ঘনিমায়। বাতাস মিশে' গেছে অন্ধকারে জমাট হয়ে'।

"জ্যোৎস্না"

ত্রস্ত—চকিত জ্যোৎস্না বলে' উঠ্‌ল—"কে তুমি?"

"আমি, আমি নিধু—"

আঁচলে চো-খ-দুটো ভাল করে' মুছতেই, সেই অন্ধকারে প্রেতমূর্ত্তির মত, একটী মনুষ্যমূর্ত্তি তার চোখে পড়্‌ল—"তুমি কোথায় ছিলে এতদিন?"

"কিন্তু ফিরে' যেতে হ'ল, জ্যোৎস্না। সদ্য জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম—আশ্রয় নিতে, তোমারই কাছে!"

—"এত রাত্রে!"

"দুর্ভাগ্য আমার! সে কথা আর নয়, চল্লুম—আমি পুরুষ, চোর, ফেরার আসামী, আর তুমি ব্যাভিচারিণী না? কলঙ্কিনী—বংশের কালী তোমার সংস্রবে আমার মত পাপীও লজ্জা পায়! চল্লুম।"

অন্ধকারে মিলিয়ে' গেল প্রেতের মতই সে মূর্ত্তি; কিন্তু নিঃসংশয়ে সে তার ভাই, নিধিরাম ছাড়া আর কেউ নয়। জ্যোৎস্না ধুঁকতে ধুঁকতে আবার তা'র ঘরে এসে' ঢুক্‌ল। অন্ধকারে সে হাঁফিয়ে' উঠেছিল—সুইচ্ টিপে দেখ্‌ল, বিছানা শূন্য! কিন্তু যে দুয়ার দিয়ে সে ঘরে প্রবেশ করেছিল সেই মুক্ত দ্বারেই দাঁড়িয়ে আছে ম্লান-মুখে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে' চেয়ে' তার স্বামী রঞ্জন।

(ক্রমশঃ)

"মানুষ ভায়ের লাগি"

শ্রীগোপালচন্দ্র বটব্যাল

ধরণীর সব কিছু ভালো মোর বুকে বাঁধো আজি নীড়,
নিখিলের যত প্রেম-আলো করো মোর আঁখিতলে ভীড়।
আমি চাহি বিশ্বের বায়ে মানবের অধিকার নিতে,
আমি চাহি ভাই বলে' আজ সকলারে মোর বুকে পেতে।
সকলেই একসুরে যেন গেয়ে চলি জননীর গীতি,
মানুষের চোখে যেন ভাসে তাহাদের গরবের স্মৃতি।

আকাশের তলে আর এই শ্যামলিমা মাটি যার কোলে
সকলেই হেরিয়াছে আলো, মানুষেরা কি করে' তা' ভোলে?
সকলারে 'ভাই' বলে' ভাবি, দুই চোখে তারি ঘোর লাগে,
মানুষের তরে তাই মোর ভিতরের মানুষটা জাগে।
এসো, এসো, আত্মার আলো, বিধাতার পরমার্থ মম
কূলে মোর বাঁধ তরীখানা—হেথা হ'তে করি তোমা নমঃ।

বর্ত্তমান মৈমনসিংহ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গ্রন্থাগার

শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসারের পথে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা ও প্রভাব যথেষ্ট। জন-চিত্ত এই সকল গ্রন্থাগারের মধ্য দিয়া যত শীঘ্র উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে, অন্য কিছুর দ্বারা তেমনটি সম্ভব নয়। দুনিয়ার আবহাওয়ার সঙ্গে জেলার যোগ রাখিতে হইলে, ব্যাপক-ভাবে গ্রন্থাগার-সৃষ্টির প্রয়োজন আছে। বাঙলায় গ্রন্থাগার-আন্দোলনে অগ্রণী বোধহয় হুগলী জেলা এবং কুমার শ্রীমুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় উঁহার প্রধান উদ্যোক্তা। পল্লীর আঁধার-কোণে জ্ঞানা-লোকের রেখাপাত করিতে হইলে, এই আধুনিক গ্রন্থাগার-আন্দোলন সর্ব্বথা অনুকরণীয়। মৈমনসিংহ জেলা এ বিষয়ে অনেক পশ্চাতে। ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ভাবে পুস্তক, সাময়িক, দৈনিক ইত্যাদি কাগজ অনেক স্থলে সংগৃহীত হইলেও, সঙ্ঘবদ্ধ ও সুসংহত প্রচেষ্টার একান্তই অভাব। জেলাকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিতে হইলে, গ্রন্থাগারের দৈন্য দূর করা সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন।

জেলা বোর্ডের সাহায্যপ্রাপ্ত মৈমনসিংহ পাব্‌লিক্ লাইব্রেরী সূর্য্যকান্ত টাউন্ হলের একাংশে স্থাপিত। এই নাতিবৃহৎ লাইব্রেরীটীতে প্রত্যহ নানা শ্রেণীর পাঠক সম্মিলিত হইয়া থাকেন। স্বর্গীয় মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুর কর্ত্তৃক স্থাপিত তাঁহার বাসভবনের ও সেরপুরের জমিদার স্বর্গীয় রায় বাহাদুর চারুচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাসভবনের পুস্তকাগার পুরাতন ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তথায় বহু পুরাতন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগৃহীত আছে। এতদ্ব্যতীত, গৌরীপুর, সেরপুর, মুক্তাগাছা, আঠারবাড়ী, গোলকপুর, কৃষ্ণপুর, ভবানীপুর, কালীপুর প্রভৃতি প্রত্যেক স্থানে জমিদারগণের বাড়ীতে বড় বড় পুস্তকালয় আছে এবং ঐগুলি অনেক সময়ে সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারেও আসে। রামকৃষ্ণ-মিশন, রামকৃষ্ণ-প্রতিষ্ঠান, বিবেকানন্দ-ব্যায়াম-বিদ্যালয়, "সৌরভ" কার্য্যালয় প্রভৃতিরও নিজস্ব ছোট ছোট পাব্‌লিক্ লাইব্রেরী আছে। বলা বাহুল্য, যে প্রায় প্রত্যেক হাইস্কুলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাইব্রেরী আছে এবং আয়তন ও উপযোগিতায় আনন্দমোহন কলেজের পুস্তকালয়টী বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

মহিলাপ্রগতি

মৈমনসিংহের সমাজ-সংস্থায় নারী-স্বাধীনতার প্রচুর সাক্ষ্য মিলে তার অতীতের কাব্য-ছড়া-গাথা-গীতি প্রভৃতিতে; মধ্যযুগের 'মৈমনসিংহ' গীতি-কবিতায় নায়িকার 'ইচ্ছাবর' নিরূপণ ইত্যাদিতে নারী-স্বাধীনতার একটা তেজোদৃপ্ত সমাজ-চিত্রের আভাষ যথেষ্ট পাওয়া যায়।

মৈমনসিংহ জেলার নারীর এ আদর্শ-ভঙ্গী বিভিন্ন হইলেও, কোনদিন ক্ষুণ্ন হয় নাই।

এখনও দীর্ঘদিন হয় নাই—সন্তোষের তেজস্বিনী রাণী স্বর্গীয়া জাহ্নবী চৌধুরাণীর বিক্রমের কথা আজও মৈমনসিংহের স্মৃতিতে জাগরূক্। স্বামিবিয়োগের পর তিনি অতি নিপুণতার সহিত বিপুল সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁর প্রবল প্রতাপের জন্য তিনি "জান-মারা চৌধুরাণী" বলিয়া প্রসিদ্ধা ছিলেন।

সেরপুরের জমিদার-বংশের পুণ্যশীলা নারী স্বর্গীয়া তারামণি দেবী চৌধুরাণীর নামও এই জেলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়া হইয়া আছে। এই মহীয়সী নারীর দানশীলতার পরিচয় শুধু এই জেলার মাঝে আবদ্ধ থাকে নাই, হিন্দুর তীর্থে তীর্থে সে অমর-স্মৃতি নানা ভাবে ও আকারে বিরাজমান।

আধুনিক জাগরণ-যুগেও মৈমনসিংহের মহিলাগণ জাতীয় জীবনে বিশিষ্ট স্থানাধিকার করিতে সমর্থা হইয়াছেন। সকলের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয় বলিয়া কয়েক জনের নামোল্লেখ করিয়া শ্রদ্ধার্ঘ্য দেওয়া গেল।

শ্রীযুক্তা রাজকুমারী দাস, ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষা, বেথুন কলেজ। ইনি প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত নিমাইদাসের সহধর্ম্মিণী। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙলার নারী-জগতের ইনি অন্যতম পথপ্রদর্শিকা বলিলেও বোধহয় অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীমতী তটিনী দাস—বর্ত্তমানে বেথুন কলেজের অধ্যক্ষা। ইনি অধ্যাপক শ্রীসরোজকুমার দাসের স্ত্রী। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের শিক্ষাভিজ্ঞতা ও কর্ম্মদক্ষতা তাঁর যথেষ্ট আছে। শ্রীযুক্তা দাস শিক্ষিত বাঙালীর নিকট বিশেষভাবেই সুপরিচিতা।

শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি-এ—ইনি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা এবং 'ব্যবসা ও বাণিজ্যে'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র প্রসাদ বসুর সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী। ইংরাজী ও বাঙলা উভয় ভাষাতেই ইনি সুলেখিকা। ১৯০৬-১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত তিনি 'সুপ্রভাত' মাসিক পত্রিকার পরিচালনায় যে যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা কম গৌরবের বিষয় নহে। 'বঙ্গ-লক্ষ্মী' মাসিকেরও আরম্ভকাল হইতে বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি উহার সম্পাদিকা ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার এবং কর্পোরেশনের বহুবিধ কার্য্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্টা। তাঁর বিচিত্র এবং সামাজিক কার্য্যের জন্য বাঙলার মহিলা-সমাজের নিকট তিনি চিরস্মরণীয়া হইয়া থাকিবেন। সরোজনলিনী, ভারতমহিলাসমিতি, নারী-রক্ষা সমিতি, হিন্দু অবলা আশ্রম প্রভৃতি বাঙলার প্রত্যেকটি মহিলামঙ্গলকামী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোন না কোন প্রকারে তিনি বিজড়িতা। প্রধানতঃ তাঁরই প্রচেষ্টায় ই, আই, রেলওয়ের মহিলা বুকিং-ক্লার্ক বিভাগে বাঙালী মেয়েদের প্রবেশ সম্ভব হইয়াছে।

স্বর্গীয়া কমলরাণী সিংহ এম-এ—নেত্রকোণার শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ সিংহ এম-বি মহাশয়ের পত্নী। ইনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হইয়াছিলেন।

শ্রীফজলেতোন্নেছা—নিবাস টাঙ্গাইল কারোটিয়া। ইনি শুধু মৈমনসিংহের নয়, সমগ্র বাঙলার মুসলিম্ নারী সমাজের গৌরবস্বরূপা। তিনি ১৯২৫ সালে সংস্কৃত সহ ফলিত অঙ্কশাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম হন। তারপর ষ্টেট স্কলারসিপ লইয়া বিলাতে যান ও প্রতীচ্যের শিক্ষাভিজ্ঞা হইয়া দেশে ফিরেন। বৎসরাধিক নিখিল বাঙলার মুসলিম্ স্কুল- সমূহের ইনি ইন্স্পেক্ট্রেস হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ইনিবেথুন কলেজের ফলিত অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপিকা। বাঙলার মুসলিম নারীসমাজে তিনিই সর্ব্বপ্রথম উপরি উক্ত উভয় পদগৌরব-লাভে সমর্থা হইয়াছেন।

শ্রীফজলেতোন্নেছা

'সরোজনলিনী নারীসমিতি', বহু স্কুল কমিটী প্রভৃতি সমাজ-হিতৈষী প্রতিষ্ঠানের সহিত শ্রীমতী ফজলেতেন্নেচ্ছা সংশ্লিষ্টা। ইনি সুলেখিকাও বটে।

শ্রীমতী ফজলেতোন্নেছা খান বাহাদুর আশানোল্লা সাহেবের পুত্রবধূ ও হাইকোর্টের সলিসিটর মিঃ সামসুজ্জোর সুযোগ্যা পত্নী।

শ্রীরমা বসু এম-এ—১৯৩৩ সালে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বেদান্ত দর্শন-শাস্ত্রের এম-এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থানাধিকার করেন। ইনি স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসুর পৌত্রী ও কলিকাতা হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত এস, এম, বসুর কন্যা।

মিসেস্ লীলা রায়—ইনি প্রথমে ভবানীপুর আশুতোষ কলেজের অধ্যাপিকা ছিলেন। বর্ত্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজের মহিলাবিভাগের ভারপ্রাপ্তা হইয়া অধ্যাপনা-

কার্য্যে নিযুক্তা আছেন। ইনি কিশোরগঞ্জ মসুয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কুলদা রায়ের (বিদ্যাসাগর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ স্বর্গীয় সারদারঞ্জন রায়ের ভ্রাতা) সুযোগ্যা কন্যা।

শ্রীকিরণময়ী বসু—স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসুর পুত্রবধূ। ইনি গত দুই বৎসর ইউরোপে থাকিয়া সেখানকার নানা দেশের শিক্ষার ধারা-বিষয়ক অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। ঐ সময়ে তিনি ষ্টকহলম্ আন্তর্জাতিক মহিলা-পরিষদের

শ্রীকিরণময়ী বসু

সদস্যা নির্ব্বাচিতা হইয়াছিলেন। কলিকাতায় নারী আন্দোলনের সঙ্গেও বর্ত্তমানে তিনি নানা প্রকারে সংশ্লিষ্টা।

এতদ্ভিন্ন সুকবি শ্রদ্ধেয়া মোহিনী দেবী, সেরপুরের জমিদার স্বর্গীয় বেনোয়ারীলাল চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী ও কলিকাতা সঙ্গীত-সম্মেলনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষিকা মিসেস বি, এল, চৌধুরী, শ্রীমতী তরুলতা সেন বি-এ (কিশোরগঞ্জ), শ্রীমতী স্নেহশোভনা দেবী, শ্রীমতী পূর্ণিমা প্রভা রায়, শ্রীমতী সুপ্রভা সেন (ইনি সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে উচ্চ উপাধি লাভ করিয়া আসিয়াছেন) প্রভৃতি বিদুষী ও সুলেখিকা মহিলাবৃন্দের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পুরুষের মত নারীর সমাজ, সংস্কার, শিক্ষা ও আলোর পথে এই অগ্র-অভিযান অথণ্ড বাঙলার যতই কল্যাণ সৃজন করুক না কেন, স্বীয় জেলার ঘরের কোণের আঁধার কিন্তু নিরসন করিতে সমর্থ হয় নাই। প্রাচুর্য্যের ক্ষেত্রে শিক্ষা-সংস্কারের বিলাস সহনীয়; কিন্তু উহাই যখন আদর্শ-রূপে ব্যাপকভাবে পল্লী-সমাজের অঙ্গে অঙ্গে মোহ-মরীচিকার বিভ্রান্তি সৃজন করিবে, তখন সেই উন্মার্গগামী নারী-সমাজে পুরুষের মত নিছক উদর-পূর্ত্তির সমস্যা উৎকট হইয়াই দেখা দিবে। শিক্ষার ধারা যেমনি হউক, তাহা যদি তাহার সহজ সম্বন্ধ-বিশিষ্ট সমাজ-মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণসাধনে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে উহা একান্তই গৌরব-বর্জ্জিত ও আত্মপূর্ত্তি মাত্র। মৈমনসিংহের মহিলা-জগতের এ বিপুল জ্ঞান-তপস্যা অন্ততঃ মৈমনসিংহের বহির্জগতের সম্পর্ক-বর্জ্জিতা স্বল্প বা নিরক্ষরা অধিকাংশ নারীর নিকট অজ্ঞাতই রহিয়া গেল।

স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে বিগত আদমসুমারীতে দেখা যায়, এই জেলায় লিখিতে পড়িতে পারেন, এমন স্ত্রীলোকের সংখ্যা মোট ৩১,১৭৩; তন্মধ্যে হিন্দু ১৪,৩৬০ এবং মুসলমান ১৬,৯০৩। এখানে বলা আবশ্যক, যে মৈমনসিংহে হিন্দু স্ত্রীলোকের মোট সংখ্যা ৫,৫৫,২১৪ এবং মুসলমান স্ত্রীলোকের মোট সংখ্যা ১৮,৯৩,৯৫৭। স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারে এ জেলা এখনও বহু পশ্চাতে রহিয়াছে। মৈমনসিংহ সহরে স্ত্রীশিক্ষার জন্য দুইটী উচ্চ বিদ্যালয় (বিদ্যাময়ী ও রাধাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয় এবং একটী পাঠশালা—মহাকালী পাঠশালা) আছে এবং প্রতি মহকুমায় মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় ও কোন কোন বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে নিম্ন বা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। মৈমনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে আই, এ, এবং বি, এ শ্রেণীতে প্রায় চল্লিশটী ছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছেন। এই বিশাল জেলার স্ত্রীলোকদিগের সংখ্যার অনুপাতে এখনও স্ত্রী-শিক্ষার ভাল বন্দোবস্ত হয় নাই।

১৯২৫ সনের অক্টোবর মাসে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় মৈমনসিংহ নগরে একটী মহিলা-সভা স্থাপন করেন। উক্ত সভার কর্ত্তৃপক্ষগণের উদ্যোগে একটী ক্ষুদ্র বয়ন-বিদ্যালয় ও স্থানে স্থানে কয়েকটী শাখাসমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এই শাখা-সমিতিগুলিতে মহিলাদিগের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি ও অনুশীলনের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ

চেষ্টা করিতেছেন। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গুরুসদয় দত্ত এই নগরে থাকিবার সময়ে নানাবিধ জনহিতকর কার্য্যে উৎসাহ-সঞ্চার হয়। মহিলা-সমিতির জাগরণ ও প্রসার তন্মধ্যে অন্যতম। এই প্রসঙ্গে মুক্তাগাছার জমিদার স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শিল্প-সঙ্গীত-সাহিত্য ও সংবাদপত্র

আধুনিক বাঙলার চারুশিল্প, সাহিত্য ও সংবাদপত্রে সেবায় মৈমনসিংহ জেলার অনবদ্য অবদান অতুলনীয় বলিলেও বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। কৃষি-প্রধান জেলার সরস মাটি ও সজল আব্‌হাওয়ারই স্ব-ধর্ম্মে ইহা সম্ভব হইয়াছে। কৃষকের কণ্ঠে কবিতার ছন্দ আপনিই ঝঙ্কারিয়া উঠে; প্রান্তরের শ্যামল শোভাকৃষ্ট রাখাল-বালকগণের কণ্ঠে রাগিণী সহজভাবেই লীলায়ত হয়। সকাল সন্ধ্যায় নিপকক্ষ পল্লীবালার পুরাতনী নূপুর-নিক্কণ আজিও শ্রবণে পশে! সহজ বাংলার ভাবসিদ্ধা গৃহস্থ-বধূর সনাতনী নৃত্য-ভঙ্গিমায় এখনও নিত্য-নৈমিত্তিক গ্রাম্যোৎসব মুখরিত হয়। ভাসান-ছড়া-কবি-কথকতা-কীর্ত্তন গান আজও সাধারণ জেলাবাসীর দৈনন্দিন জীবনধারা হইতে বিলুপ্ত-বিস্মৃত হয় নাই। পিঠালু ও রং-বেরংয়ের উঠান-দেওয়াল ও সিন্ধুকের গাত্র আলিপনা এবং কাপড়-কন্থার সেলাই-বৈচিত্র্য এ জেলার গৌরবময় অতীত শিল্প-প্রেরণার বেদনাময় শেষ-স্মৃতি এখনও বুকে ধরিয়া বহিতেছে। আত্মবিস্মৃত স্ব-গৌরবহারা বাঙালীর নির্ম্মম উপেক্ষায় বাংলার এই বিশিষ্ট সহজ শিল্প-সাধনা হয় তো অচিরেই বিস্মৃতির কোলে চির-সমাধি লাভ করিবে!

তথাপি নিছক ব্যর্থ হয় নাই তার এই স্বাভাবিক চারু-চিত্ত-মনের সহজ অভিব্যক্তি—রূপান্তরিত হইয়া সৃষ্টি করিয়াছে শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক যাঁরা আজ দিকে দিকে নিখিল দেশবাসীর চিত্ত-মনের খোরাক পরিবেশন করিয়া গৌরবস্থানীয়।

বাঙলা তথা ভারতের শিল্প-সাধনার ইতিহাসে স্বর্গীয় ইউ, রায়ের অবদান চিরস্মরণীয়। তিনিই সর্ব্বপ্রথম শিল্প-সাধনার বিশেষ একটা দিক্ হাফটোন-ব্লক ইত্যাদির প্রবর্ত্তন করিয়া ভারতের শিল্প-ক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন করেন। এই জেলারই স্বনামখ্যাত হেস ভ্রাতৃদ্বয়ের অমর শিল্প-সাধনা আজ বিশ্ব-বিশ্রুত। শ্রীযুক্ত ললিত হেস ইতালির শিল্প-কেন্দ্র ফ্লোরেন্সে বর্ত্তমানে বিশেষ সমাদৃত এবং তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শশী হেস কাশ্মীর করদ-রাজ্যের রাজ-শিল্পী। কিশোরগঞ্জ—গচিহাটা নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমেন মজুমদারও পাতিয়ালার রাজ-শিল্পী হিসাবে অশেষ সম্মানিত। 'ইণ্ডিয়ান একাডেমি অব্ আর্ট' ও পরে 'শিল্পী' শীর্ষক ইংরাজী পত্রিকা পরিচালনা করিয়া জাতির মনে শিল্প-প্রেরণা জাগাইবার তিনি বোধ হয় প্রথম চেষ্টা করেন। আধুনিক শিল্পকলায় বিশেষ করিয়া তৈলচিত্র, ওয়াটার-কলার প্রভৃতি ছবিতে তিনি বিশেষ প্রতিভা দেখাইয়াছেন। 'স্মৃতি', 'নিয়তি', দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন', 'বাউল' 'কর্দ্দমে কমল' ইত্যাদি তাঁর অঙ্কিত বিখ্যাত কয়েকখানি অনুপম ছবির অন্যতম।

প্রখ্যাতনামা শিল্পী শ্রীযুক্ত অতুল বসু মহাশয়ের নিবাস মৈমনসিংহ সদর মহকুমায়। ইনি 'বাংলার ব্যাঘ্র'

শ্রীঅতুল বসু

আশুতোষ মুখার্জ্জির পোরট্রেইট আঁকিয়া বিশেষ প্রশংসার্জ্জন করেন। গুরুপ্রসাদ-ষ্টেট-স্কলারশিপ পাইয়া শ্রীযুক্ত বসু বিলাতে যান এবং পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্প-কেন্দ্র রয়্যাল একাডেমিতে তৈলচিত্র, প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি অঙ্কনবিদ্যায় পারিদর্শিতা লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষরূপে কিছুদিন কার্য্য করেন। তারপর দিল্লীর নবনির্ম্মিত

আইন-পরিষদ-গৃহে, লণ্ডন রয়্যাল একাডেমিস্থিত সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর তৈলচিত্রের অনুকৃতি প্রতিস্থাপনের জন্য সরকার কর্ত্তৃক বিলাতে প্রেরিত হন। এই গুরুভার কার্য্যে তিনি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন। 'তিন ভাই', 'ধ্বংসের ডাক' প্রভৃতি ছবি তাঁর শিল্প-প্রতিভার অন্যতম অপরূপ নিদর্শন। নবপ্রতিষ্ঠিত একাডেমি অব্ ফাইন আর্টের তিনি একজন উদ্যোক্তা।

এই প্রসঙ্গে উদীয়মান তরুণ শিল্পী ও লেখক শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী, শ্রীযুক্ত সমর দে, শ্রীযুক্ত যতীন সাহা, 'হানাফীর' নির্দ্দোষ ব্যঙ্গ-চিত্রের ছদ্মবেশী চিত্রকর 'আলিফ ও জীম' প্রভৃতির নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এ জেলার বাদ্য ও গীত-বিদ্যায় যাঁরা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তন্মধ্যে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী (পূর্ব্ববাস ন' পাড়া, হাল সাকিম বহরমপুর), শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী এম-এ (এসরাজ ও সেতার বিশেষজ্ঞ), শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাকান্ত লাহিড়ী (কালিপুরের জমিদার), শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কাব্যরত্নাকর, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী (রামগোপালপুরের জমিদার, তবলা বিশেষজ্ঞ) অন্যতম।

সংস্কৃত ও বাঙ্গালার সাহিত্য-মন্দিরে অতীত মৈমনসিংহেও কোনদিনই একনিষ্ঠ পূজারীর অভাব হয় নাই। এই জেলায় নব্যন্যায়ের প্রবর্ত্তক স্বর্গীয় রাধাকান্ত ন্যায়ভূষণ, স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের তত্ত্ব-গ্রন্থের অবশিষ্টাংশের পরিপূরক 'তত্ত্বাবশিষ্ট' গ্রন্থ প্রণেতা বাংলার দ্বিতীয় রঘুনন্দন স্বর্গীয় পণ্ডিত কালীকান্ত বিদ্যালঙ্কার, 'বিশ্ববিজ্ঞান' (সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় লিখিত ভূগোল) ও 'তত্ত্বোপস্কার' (দর্শনশাস্ত্র) গ্রন্থ রচয়িতা স্বর্গীয় পণ্ডিত রঘুনাথ সার্ব্বভৌম, 'ধাতুচন্দ্রিকা' (ছন্দ-নিবদ্ধ সংস্কৃতগণমালা) গ্রন্থ-লেখক পণ্ডিত ৺কৃপানাথ তর্করত্ন, 'লৌহিত্য জ্ঞান-দীপিকা' (তীর্থরাজ ব্রহ্মপুত্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন) সঙ্কলয়িতা ৺ব্রজকান্ত স্মৃতিপঞ্চানন, পণ্ডিতপ্রবর ৺হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন প্রভৃতি পুণ্যস্মরণীয় ভারতীয়-ভাবধারার বিগ্রহমূর্ত্তি শুধু মৈমনসিংহের নয় সমগ্র জাতির নমস্য।

সেরপুরের জমিদার ৺হরচন্দ্র চৌধুরী বিদ্যাবিনোদ মহাশয় একজন খ্যাতনামা সাহিত্যসেবী ছিলেন। তিনি "সেরপুরের বিবরণ", "বংশানুচরিত", "ভারতবর্ষীয় আর্য্য জাতির কর্ম্মকাণ্ড" প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তিনিই প্রথম এ জেলায় "চারুবার্ত্তা" নামক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন; তাহার পরিণতিই বর্ত্তমানে মৈমনসিংহের "চারুমিহির" পত্রিকা। বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র রায় চারুচন্দ্র চৌধুরী বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হেমন্তচন্দ্র চৌধুরী একজন সাহিত্যিক। তিনি Milton-এর L. Allegroর পদ্যানুবাদ করিয়াছেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হীরকচন্দ্র চৌধুরী বি-এ বর্ত্তমানে উচ্চপদে (Income Tax Officer, Jalpaiguri) প্রতিষ্ঠিত আছেন।

৺মহেন্দ্রনাথ মজুমদার বি-এ। বাসস্থান, নেত্রকোণা—রায়পুর। "আশাকাব্য" "রণরাও" কাব্য প্রনয়ণ করিয়াছেন।

৺বিজয়নারায়ণ আচার্য্য ভক্তিনিধি

কবি ৺বিজয়নারায়ণ আচার্য্য ভক্তিনিধির (নিবাস নেত্রকোণা-বাজলা) তাঁহার মত কবি শুধু ময়মনসিংহ কেন পূর্ব্ববঙ্গে ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কবি

গানে, তাঁহার সরস ভক্তি রসাত্মক রচনা পাঠে শ্রোতৃ মণ্ডলী মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি "উপদেশ শতক" প্রার্থনা শতক" "গৌর গীতাবলী" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং সাময়িক পত্রিকাতে নানা বিষয়ক বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

কবি ৺রুক্মিণীকান্ত ঠাকুর (বাসস্থান, দুর্গাপুর) মৈমনসিংহের কান্তকবি নামে প্রসিদ্ধ। 'মানস-কানন' 'পদ্মমালা' প্রভৃতি কাব্য তাঁরই প্রণীত।

মুক্তাগাছার জমিদার, 'শিকার ও শিকারী' গ্রন্থ প্রণেতা ৺ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী কেবল সাহিত্য সেবী নন, পরন্ত নানা জনহিতকর কার্য্যের সঙ্গে আন্তরিকভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সম্প্রতি তাঁর মৃত্যুতে বাংলার সেবা ও সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষতি হইল।

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল (টাঙ্গাইল) হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল এবং একজন বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী। উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ও বিবিধ মাসিকপত্রে নানা বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছেন। ইনি বাঙলা দেশে "কৃষক ও শ্রমিক" আন্দোলনের প্রবর্ত্তক।

রায় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বি-এ, বাহাদুর সুসঙ্গের রাজা শ্রীযুক্ত শিবকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের পুত্র। সম্প্রতি দিনাজপুর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত আছেন। ইনি খ্যাতনামা সাহিত্যসেবী ও বিবিধ মাসিক পত্রের নানা বিষয়ক প্রবন্ধ-লেখক। "মৃগনাভি" ও "চিরন্তনী" প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁর অমর অবদান। ইঁহার খুল্লতাত রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুরও একজন খ্যাতনামা সাহিত্যসেবী ছিলেন। "গোপালন" "অশ্বতত্ব" "আম্র" "তূর্য্য তরঙ্গিনী" প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁরই রচিত। ইংরাজী, বাঙালা ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত সুসঙ্গাধিপতি মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ বি-এ বাহাদুর বিবিধ মাসিকপত্রে নানা বিষয়ে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহা একত্র করিয়া তাঁহার পুত্র বর্ত্তমান মহারাজা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বি-এ মহাশয় "কৌমুদী" নামে দুই খণ্ড গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন। নানাবিধভাবে মহারাজা ভূপেন্দ্রচন্দ্র বাণীর সেবা করিয়া সুসঙ্গ রাজবংশের সাহিত্যধারা অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন।

নবদ্বীপ ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ, রাজসাহী হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ স্মৃতি-তীর্থ ও 'সনাতন ধর্ম্ম' 'মানব-জীবন' প্রভৃতি ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ প্রণেতা এবং সুবক্তা স্বামী যোগানন্দজীর নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদান্তসাংখ্যতীর্থ সুপ্রসিদ্ধ মধুসূদন সরস্বতী কৃত 'অদ্বৈত সিদ্ধি' নামক বেদান্তগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী—লক্ষ্মী-সরস্বতীর বরপুত্র প্রমথবাবু কেবল কবি ও নাট্যকার নহেন চিন্তাশীল,

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

ভাবুক ও প্রেমিক। যেমন তাঁর উদ্দীপনাময়ী কবিতা স্বদেশীযুগের জাগরণের মূলে রস-সিঞ্চন করিয়াছিল তেমনি তাঁর ভক্তিরসাত্মক হৃদয়োচ্ছ্বাস বাঙলার বুকে অনাবিল গঙ্গোত্রীধারা সৃজন করিয়াছে। "শ্রীগৌরাঙ্গ" (বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য) 'তাজ' (ইংরাজীতে অনুবাদিত ও বহু প্রশংসিত) 'চিতোরোদ্ধার' (রঙ্গমঞ্চে বহুল অভিনীত) 'জয়-পরাজয়' 'আকেলসেলামী, প্রভৃতি মরমী প্রমথনাথকে বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে চিরজীবি করিয়া

রাখিবে। সন্তোষের রাজা সার মন্মথ রায় চৌধুরীর ইনি জ্যেষ্ঠভ্রাতা।

ইব্রাহিম খান এম-এ—টাঙ্গাইল করোটিয়া সাদত কলেজের অধ্যক্ষ—সুসাহিত্যক, প্রবন্ধ লেখক ও স্বদেশ হিতৈষী। 'আনোয়ার পাশা' 'কামাল পাশা' 'হিরকহার' প্রভৃতি নাটক রচনা করিয়া যেমন একদিকে বাঙলা সাহিত্যের ভাণ্ডার প্রবৃদ্ধ করিয়াছেন তেমনি মুসলিম ধর্ম্ম ও আদর্শকে জনসমাজের মধ্যে প্রচারিত করিতে সাহায্য করিয়াছেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (নেত্রকোণা সিমুলজানি —প্রকাশ ধীতপুর গ্রামে বিখ্যাত গাঙ্গুলীবংশে জন্ম) একজন সুসাহিত্যক ও গবেষণাপূর্ণ বিবিধ প্রবন্ধ লেখক। "বঙ্গীয় অধ্যাপক জীবনী"—তাঁর অমর কীর্ত্তি। শত দুঃখ-দৈন্য ও দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া বিগত ও বর্ত্তমান শতাব্দীর বঙ্গ-দেশীয় অধ্যাপক বৃন্দের জীবন-কাহিনী বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই গ্রন্থে লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। অর্ব্বাচীন বাঙলার অধুনা অনাদৃত এই দরিদ্র অধ্যাপকমণ্ডলী প্রবল পশ্চিমে হাওয়ার সকল অনাচার অবজ্ঞা সহিয়াও যে ভারতীয় সনাতন ভাববৈশিষ্ট্যের ক্ষীণধারা মৌন-নীরবে বুকের অসীম দরদ দিয়া প্রবাহিত রাখিয়াছেন, তাহাতেই অভিষিক্ত হইয়া ভারতীর সত্য জাগরণের একদিন সম্ভাবনা আছে। মৈমনসিংহ জেলার নব্যন্যায়ের প্রবর্ত্তক ৺রাধা-কান্ত ন্যায়ভূষণের যোগ্য প্রপৌত্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়, বাঙলার এই অবজ্ঞাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের জ্ঞান-তপস্যাকে, সাহিত্যে স্থান দিয়া অর্থের দিক্ দিয়া লাভবান্ না হইলেও, জাতিরকাছে চিরদিন ধন্যবাদার্হ থাকিবেন। মৈমনসিংহ জেলার অজ্ঞাত পল্লীবাসী সাহিত্যিকগণের জীবনী সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধাকার নানা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াও ইনি বাঙলার বিলুপ্ত রত্নোদ্ধার করিবার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য "উত্তরা খণ্ডে তীর্থ পর্য্যটন" নামক গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া এই বংশের সাহিত্যধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

মৈমনসিংহের সাহিত্যধারাকে ঐ জেলার যে সকল

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

কৃতি সন্তান প্রবুদ্ধ করিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (জামালপুর-মুড়িগ্রাম নিবাসী বর্ত্তমান রংপুর), অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ (টাঙ্গাইল-নিকলা, 'নুপুর' 'পঞ্চদল' প্রভৃতি কবিতা পুস্তক প্রণেতা) প্রভৃতি অন্যতম।

কৃষি, শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতিসাধনের জন্য প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এই জেলার তৎকালীন নেতৃবৃন্দ মৈমনসিংহ সহরে একটী 'সারস্বত সমিতি' স্থাপন করেন। প্রতি বৎসর সরস্বতী পুজার অবকাশে ইহার একটী অধিবেশন হয়। সেই সময় স্থানীয় সাহিত্যিকদিগের সম্মেলন এবং শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের একটী প্রদর্শনী হয়। সাহিত্য-সম্মেলনে আবৃত্তি, বক্তৃতা, প্রবন্ধপাঠ ও আলোচনার ব্যবস্থা আছে। প্রদর্শনীতে প্রাচীন মুদ্রা হস্তলিখিত গ্রন্থ, ঐতিহাসিক দলিল, শিলালিপি, পল্লীগীতি, বাউল সঙ্গীত, মেয়েলী সঙ্গীত, বারমাসী, সারিগান, জারিগান ইত্যাদি বহুপ্রকারে ঐতিহাসিক বিষয় প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

আধুনিক যুগকে মোটামুটি সংবাদ-পত্রের যুগও বলা চলে। এই সকল সংবাদ-পত্র ও সাময়িক পত্রিকার সম্পাদনার ভার যাঁহাদের উপর, জনমত সংগঠনে তাঁদের প্রভাব অসীম। এই সাংবাদিকের ক্ষেত্রে 'মৈমনসিংহ' জেলা বিশেষ টাঙ্গাইল যে বিশিষ্ট স্থানাধিকার করিয়াছে তাহার তুলনা অন্যত্র খুব কমই মিলে। এই বিভাগ সংশ্লিষ্ট মৈমনসিংহ জেলার যথাসম্ভব জনকয়েকের মাত্র নামোল্লেখ করা গেল।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—বিখ্যাত 'আনন্দবাজার' পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক—পূর্ব্ব নিবাস টাঙ্গাইল-ঘারিন্দা, বর্ত্তমানে জলপাইগুড়ি।

শ্রীযুক্ত পি, কে, চক্রবর্ত্তী—সম্পাদক, 'ফরওয়ার্ড'—টাঙ্গাইল-মামুদনগর।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নাগ—সম্পাদক, 'লিবার্টি'—টাঙ্গাইল।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ নিয়োগী—যুক্ত সম্পাদক, 'লিবার্টি' —সাকরাইল-টাঙ্গাইল।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাশগুপ্ত—'এডভ্যান্স'—টাঙ্গাইল-বাশীগ্রাম।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—সম্পাদক, আনন্দবাজার পত্রিকা

শ্রীযুক্ত অমল হোম—সম্পাদক, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট।

শ্রীঅমল হোম

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সেন—সম্পাদক, 'দেশ'; টাঙ্গাইল-ঘারিন্দা।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—বাণিজ্য সম্পাদক, আনন্দবাজার, কিশোরগঞ্জ—শিবপুর।

শ্রীযুক্ত নীরোদচন্দ্র চৌধুরী বি-এ—সহঃ সম্পাদক 'মডার্ণ রিভিউ', কিশোরগঞ্জ।

অধ্যাপক যতীন্দ্রকিশোর চৌধুরী—সম্পাদক, 'ল্যাণ্ড হোলডারস জারন্যাল'—সদর-চড়পাড়া।

শ্রীযতীন্দ্রকিশোর চৌধুরী এম-এ

শ্রীযুক্ত কুমুদিনী নিয়োগী—সাংবাদিক—টাঙ্গাইল।

বরোদা ব্রহ্মচারী—ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, 'আর্য্যদর্পণ'।

এই জেলা হইতে বর্ত্তমানে নিম্নলিখিত সাময়িক পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হইতেছে।

মৈমনসিংহ টাউন হইতে 'সৌরভ', 'চারুমিহির', 'মৈমনসিংহ সমাচার', 'পল্লীসেবক', 'ইকুইটি', টাঙ্গাইল হইতে 'টাঙ্গাইল হিতৈষী' ও কিশোরগঞ্জ হইতে 'প্রান্তবাসী' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকা বাহির হয়।

স্বদেশ-সেবা ও স্বায়ত্তশাসন

স্বদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে মৈমনসিংহে 'দেশবন্ধু' বা 'দেশপ্রিয়' না জন্মিলেও এ-জেলার নীরব ত্যাগ তপস্যা ও আত্মদান কাহারও অপেক্ষা কম নহে। স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু, মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী (স্বদেশীযুগের স্বনামধন্য নির্ভীক নেতা ও দানবীর) রাজা ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, সেরপুরের জমিদার-বংশ (এই বংশেরই দানশীল জমিদার শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী তিলক স্বরাজ্যফণ্ডে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন) দেশপ্রেমিক বিদ্যোৎসাহী জমিদার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকিশোর চৌধুরী প্রভৃতির নাম স্বাধীন বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে চিরসমুজ্জ্বল থাকিবে। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, শ্রীযুক্ত অনাথ গুহ, ডাক্তার বিপিনবিহারী সেন, শ্রীযুক্ত সূর্য্য সোম
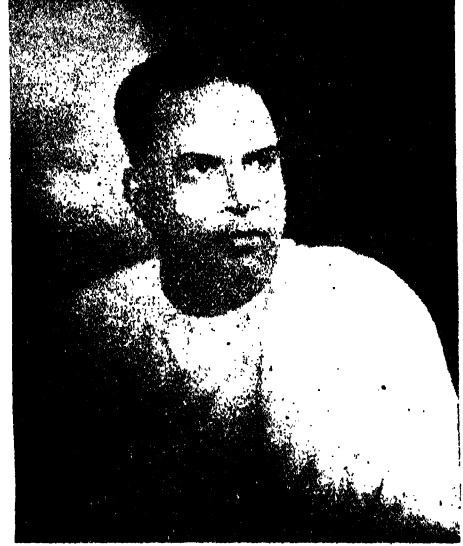
শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার

মিঃ বি, এন, চৌধুরী

(উকীল), ডাক্তার রমণী সাহা (টাঙ্গাইল), রাজেন্দ্রনাথ উকীল প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ অসহযোগ আন্দোলনে

যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। করোটিয়ার জমিদার মৌলবী ওয়াজেদ আলি খানপনি সাহেব যেমন একদিকে সাদত কলেজ, রুকিয়া হাই মাদ্রাসা ও হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া শিক্ষা প্রচারের সাহায্য করিয়াছেন তেমনি অন্য-দিকে অর্থ ও ব্যক্তিগতভাবে স্বদেশসেবায় সাহস ও ত্যাগের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লণ্ডনবাদে প্রধাননগরী কলিকাতার গৌরবময় মেয়র ও ডেপুটী মেয়রপদে অধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার (নেত্রকোণা-সাজিউরা) ও মিঃ বি, এন, চৌধুরী এই জেলারই সুসন্তান। মৈমনসিংহের পাবলিক প্রসিকিউটর খান বাহাদুর সরফউদ্দিন এ রমৎ ডি-এল বর্ত্তমানে জেলা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভাপতি। রায় বাহাদুর উমেশচন্দ্র চাকলাদার বর্ত্তমানে মৈমনসিংহ মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান।

খেলা-ধূলা

মৈমনসিংহের নিজস্ব দেশীয় যে সব খেলাধূলা তাহা এখনও নেহাৎ অজ্ঞ পল্লীবাসী সাধারণের মধ্যে দৃষ্ট

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু

হইলেও ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি বিদেশীয় খেলাও ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই ক্রীড়াজগতে এ জেলাবাসীর কৃতিত্বও কম নহে। স্বর্গীয় সারদারঞ্জন রায়কে বাংলার ক্রিকেট খেলায় অদ্বিতীয় ও অগ্রদূত বলা চলে। কিশোরগঞ্জ মহকুমান্বিত মসূয়ার এই 'রায়বংশ' ও জয়সিদ্ধির প্রসিদ্ধ 'বসুবংশ' ক্রিকেট জগতে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। মিঃ এন, রায় (ক্যাপ্টেন বেঙ্গল জিমখানা টিম), অধ্যাপক শৈলজারঞ্জন রায়, বসু ভ্রাতৃত্রয় কার্ত্তিক-গণেশ-বাপীর নাম সুবিদিত। বিগত এম, সি, সি, দলের সঙ্গে ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় এঁরা বাংলার মান রক্ষা করিয়াছিলেন। ফুটবল খেলায় এ জেলার যাঁরা নাম করিয়াছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কিশোরগঞ্জের শ্রীযুক্ত মণিভূষণ দত্ত রায় ওরফে 'ভাদু' ও মিঃ জে, দত্ত রায়। মোহন-বাগানের নামকরা খেলোয়াড় শ্রীযুক্ত অভিলাশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বর্ত্তমান মৈমনসিংহের উকীল। ইনি ১৯১১ সালের শীল্ড-বিজয়ী মোহনবাগান টিমের একজন বিশিষ্ট খেলোয়াড় ছিলেন।

যাদু ও সম্মোহন-বিদ্যা

কোন জাতি বা দেশের সম্পূর্ণতা নির্ভর করে তার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার উপর। পাশ্চাত্যদেশে যাদু, নানাপ্রকারের ম্যাজিক, সম্মোহন বিদ্যা প্রভৃতির যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে এবং উহা এক্ষণে সে দেশের সমাজ-জীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গ-স্বরূপ। বাঙলায় প্রফেসার গণপতি চক্রবর্ত্তী, রাজা বোস প্রমুখ করাঙ্গুলিতে গুণা যায় এমন দুই চারি জন অগ্রণী পুরুষের নাম বাদ দিলে এই বিশিষ্ট বিদ্যাটির দিকে জাতির যে মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই তাহা সুস্পষ্ট। তাই এই জেলারই উদীয়মান তরুণ যাদু সম্রাট প্রফেসর পি, সি, সরকারের (নিবাস, টাঙ্গাইল) নব অভ্যুত্থান শুধু মৈমনসিংহবাসীর নয় নিখিল বাঙলার নিকটই অভিনন্দিত হইবে। প্রফেসর সরকারের বয়স মাত্র ২২ বৎসর হইলেও ইতিমধ্যে তিনি জগদ্বিখ্যাত সম্মোহন কেন্দ্র প্যারিস কলেজ অব সাই-কোলজি ও লণ্ডনের যাদুকর সম্মিলনী হইতে নানাভাবে

সম্মানিত হইয়াছেন। পঞ্চসহস্রাধিক ম্যাজিক এবং 'রোপ' প্রভৃতি কয়েকটি বিস্ময়কর খেলায় তাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ। এতদ্ভিন্ন ম্যাজিক ও সম্মোহন বিদ্যা সম্বন্ধীয়

প্রফেসর পি, সি, সরকার

কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বাঙলা ভাষাভাষীর সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছেন। 'ভূতের রাজা' প্রফেসার সরকার মৈমনসিংহ জেলার সত্যই গৌরব।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে

বাংলায় ও বাঙলার বাহিরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মৈমনসিংহ জেলার যে সকল কৃতি সন্তান আপন প্রতিভা-বলে সুনাম ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন তন্মধ্যে কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার শ্রীযুত নিমাই দাস (কিশোরগঞ্জ) ও শ্রীযুক্ত অমরবন্ধু গুহ (টাঙ্গাইল, স্বর্গীয় জমিদার অনাথবন্ধু গুহের কৃতি পুত্র), এডভোকেট শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক রায় এম-এ, ডি-এল (কিশোরগঞ্জ), এডভোকেট শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র রায় (কিশোরগঞ্জ-তালজঙ্গা, ইনি কলিকাতাস্থ মৈমনসিংহ সম্মিলনীর সম্পাদক), কাঁচড়াপাড়ার মিলিটারী-বিভাগীয় একাউন্টেন্ট শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (নেত্রকোণা সুখখাই), আমেরিকাফেরত ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত মধুসূদন মজুমদার (মুক্তাগাছা), শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মজুমদার বি-ই (নেত্রকোণা, ইনি মৈমনসিংহের ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার, অসহোযোগ আন্দোলনের সময় চাকুরী ত্যাগ করিয়া কৃষি উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করেন) শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার (কিশোরগঞ্জ, আহমেদাবাদ মিলের অভিজ্ঞ কার্য্যাধ্যক্ষ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবির অধ্যাপক মোয়াজ্জেম হোসেন এম-এ, ডি, ফাইলোলজি (অক্সফোর্ড) অন্যতম।

নেত্রকোণা বারের প্রবীণ ও শ্রেষ্ঠ উকিল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বাগচী মহাশয়ের ন্যায় মেধাবী, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, সরল ও মিষ্টভাষী ব্যক্তি অতিবিরল। অমায়িক ব্যবহার, ধর্ম্মপ্রাণতা ও পরদুঃখকাতরতার জন্য তিনি ঐ অঞ্চলে বিশেষ লোকপ্রিয়। শ্রীযুক্ত বাগচী মহাশয় বহু সদনুষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাঁর সদা শান্ত, সৌম্য ও সমাহিত মূর্ত্তি অন্তরের সাধকোচিত সারল্য ভাবোদ্দীপক।

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘটক এম-এ—নিবাস টাঙ্গাইল-পাথরাইল। স্বীয় অধ্যাবসায় বলে ডিগ্রি লাভ করার পর এলাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ঘটকের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করেন। চাকুরী করিতে করিতে প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে ইনি এম-এ, পরীক্ষা দেন ও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ইহারই সুদক্ষ পরিচালনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস বিভাগ আজ একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

পূর্ব্বে এ জেলার স্বাস্থ্যসম্পদ অতি উৎকৃষ্ট ছিল। এখন ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের আক্রমণ এ জেলার সর্ব্বত্র বিশেষতঃ টাঙ্গাইল ও জামালপুর মহকুমার শোচনীয় অবস্থা ঘটাইতেছে, আর কিছুকাল এরূপ চলিলে ঐ সকল স্থান বাসের উপযোগী থাকিবে না। ব্রহ্মপুত্রনদ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীনালা ক্রমশঃ মজিয়া যাইতেছে তাহার ফলে কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদির প্রকোপ বৃদ্ধি পাইতেছে। জেলার স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগিসেবার জন্য সদর সহরে বৃহৎ

'সূর্য্যকান্ত হাঁসপাতাল' ও জেলাবোর্ডের অধীন লিটন মেডিক্যাল স্কুল' নামক একটি প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে, এতদ্ব্যতী কয়েকটি হোমিওপ্যাথিক স্কুলও আছে।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বাগচী এম-এ

প্রায় প্রতি বৎসর বর্ষাকালে এ জেলার সকল স্থানই বিশেষতঃ পূর্ব্ব ময়মনসিংহ জলপ্লাবিত হইয়া থাকে। কাজেই আষাঢ় হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত পানীয় জলের অভাব হয় না। কিন্তু যে বৎসর বারিপাত তেমন হয় না সে বৎসর খাল, বিল এবং ছোট নদীগুলির জল কৃষকগণ পাটগাছ ডুবাইয়া ও পচাইয়া একেবারে অব্যবহার্য্য করিয়া ফেলে। কার্ত্তিক মাসের পর হইতেই অতি তাড়াতাড়ি বর্ষার প্লাবনের জল সবটুকু শুকাইয়া যায় এবং পানীয় জলের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে। তখন কলেরা, আমাশয় এবং ম্যালেরিয়া গ্রামে গ্রামে দেখা দেয়। ১৮৯৭ সালের প্রবল ভূমিকম্পের পূর্ব্বে নদী, নালা, বিল দীঘি এবং পুকুর হইতেই প্রধানতঃ পানীয় জল পাওয়া যাইত কিন্তু উক্ত ভূমিকম্পের পর ঐগুলি অধিকাংশই বালিদ্বারা ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে এবং বর্ষাকাল ব্যতীত ঐগুলিতে আর পানীয় জল পাওয়া যায় না। এই জল নিবারণের জন্য জেলাবোর্ড বহুগ্রা ইন্দারা ও নলকূপের ব্যবস্থা করিয়াছেন গৌরীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় স্থাপিত 'বিশ্বেশ্বরীফণ্ড' হইতেও বহু পুকুর খনন ও পঙ্কোদ্ধার হইয়াছে এবং অন্যান্য অনেক জমিদারগণও সময় সময় জলকষ্ট নিবারণ জন্য বহু সাহায্য করিয়াছেন। ইহাতে পানীয় জলের অভাব আংশিকভাবে মিটিয়াছে। সদর সহরে পানীয় জলের অভাব দূর করিয়াছেন স্বর্গীয় মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর ১৮৯১ সালে তিনি তাঁহার স্বর্গীয়া পত্নী রাণী রাজরাজেশ্বরী দেবীর স্মৃতিরক্ষা কল্পে ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে পাণীয়জল সরবরাহের জন্য একটি বৃহৎ কল (R. N. Watar Works) স্থাপন করেন। ইহাতে ময়মনসিংহ সহরের স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল আছে। তবে সমগ্র জেলার সাধারণ আব্‌হাওয়া স্বাস্থ্যকর নহে।

মৈমনসিংহ সহরের 'সূর্য্যকান্ত হাসপাতাল'ই এ জেলার বৃহত্তম চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠান। ইহার নির্ম্মাণ ব্যয় হইয়াছিল ২,৬২,৬৫৩৲ টাকা। হাসপাতালটির প্রতিষ্ঠা ও ব্যয়ভারবহনের জন্য এই জেলার বদান্য জমিদারবৃন্দ, গবর্ণমেণ্ট, ডিঃ বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির সাহায্য বরাদ্দ আছে। এই উপলক্ষে মহারাজা শশীকান্তের এক লক্ষ টাকা দান
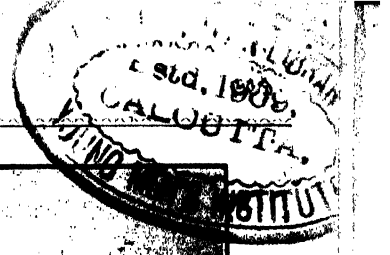
সূর্য্যকান্ত হাসপাতাল—মৈমনসিংহ

ডাঃ পি, সি, চক্রবর্ত্তী

উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্নও সদরে ১০, টাঙ্গাইলে ১৭, জামাল পুরে ৯, কিশোরগঞ্জে ৬, নেত্রকোণায় ৬টি উল্লেখযোগ্য দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

মৈমনসিংহ জেলায় অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরও দৈন্য নাই। চিকিৎসাবিভাগেও এ জেলার অনেক কৃতি সন্তানই প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। ডাঃ পি, সি, চক্রবর্ত্তী এম-বি (ক্যাল), এল-আর-সি-পি (লণ্ডন), এম-আর-সি-এস (ইংলণ্ড) ডি-এম-আর-ই (কেম্ব্রিজ) বর্ত্তমানে ঢাকা মিডফোর্ড হাসপাতালে সরকারী রেডিওলজিষ্টের পদে নিযুক্ত আছেন। ডাঃ চক্রবর্ত্তীর নিবাস নেত্রকোণা-দাসপাল গ্রামে। জার্ম্মাণীপ্রত্যাগত ডাঃ ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী এম-বি (কিশোরগঞ্জ) কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে আছেন। ইনি শিশুচিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ।

কৃষি-শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য

বাঙালার বৃহত্তম ও জনবহুল কৃষিপ্রধান এই জিলায় ধান্য ও পাটই প্রধান শস্য। বড় বড় নদী ও শাখানদীর দ্বারা বিধৌত মৈমনসিংহ জেলার অধিকাংশ স্থানই ধান্য, পাট ও রবিশস্যের উপযোগী। তামাক, ইক্ষু ও পানের চাষও হইয়া থাকে। কৃষির মধ্যে পাটই ধনাগমের প্রধান উপায়। ১৯৩৩ সালে পাট চাষ হইয়াছিল বাঙলায় মোট ২১৬৮৭০০ একর, বাংলা, বিহার-উড়িষ্যা ও আসাম মিলাইয়া মোট ২৫১৭৫০০ একর, তন্মধ্যে এই জিলার পরিমাণ ছিল ৫৬৬০০০ একর। বর্ত্তমান বৎসরেও সরকার কর্ত্তৃক যে আনুমানিক পাটচাষের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে উহাতেও যথাক্রমে ২১৮৬১০০ একর, ২৪৯১৫০০ একর ও ৫৯৬০০০ একর। বাংলার তো বটেই, বাঙলা বিহার-উড়িষ্যা, ও আসামের মোট উৎপন্ন পাটের এক চতুর্থাংশই এই জিলা হইতে উৎপন্ন হয়। মৈমনসিংহের উৎপন্ন পাটের পরিমাণ গড়ে ২৫ লক্ষ বেল অর্থাৎ সওয়া

কোটি মন ধরিলেও দেখ যায় যদি পাটের দর স্বাভাবিকই থাকে তবুও এ জেলাবাসীর অর্থসঙ্কট ভোগ করিতে হয় না। গত কয়েক বৎসর যাবৎ পাটের মূল্য অসম্ভবরূপে হ্রাস হওয়ায় ধনি-নির্ধনবিশেষে দুরবস্থা ভোগ করিতেছে।

দুঃখের বিষয় এতবড় কৃষিপ্রধান জেলায় কৃষিশিক্ষার কোন সুবন্দোবস্ত নাই। হালুয়াঘাট ও বিরিসিরি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালেয় যৎকিঞ্চিৎ কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

মৈমনসিংহের নিজস্ব কুটীর-শিল্পের পূর্ব্বগৌরব ক্রমশঃ অন্যান্য স্থানের মতই ধ্বংস পাইতেছে। এখনও বাজিত-পুর-কিশোরগঞ্জের তাঁতের কাজ, নেত্রকোণার এণ্ডি ও শীতল পাটি, ইসলামপুর (জামালপুর) এবং কাগমারীর (টাঙ্গাইল) পিতল-কাঁসার বাসন, কারগাঁও এবং বাজিত-পুরের ছুঁরি-কাঁচি ও বেতের কাজ, বাজিতপুর ও টাঙ্গাইলের সাড়ী, ইট্‌নার ধুতি প্রভৃতি সারা বাঙ্গালী একডাকে চেনে ও জানে। মেঘনা নদীতে মুক্তা সংগ্রহ করিয়া স্থানীয় মহাজনেরা কলিকাতায় চালান দেয়। কিশোরগঞ্জে উৎকৃষ্ট বিস্কুট, পাউরুটি প্রস্তুত হইয়া থাকে। চরঈশ্বরদির বেত-শিল্প ও কিশোরগঞ্জের মৃন্ময় শিল্পের খ্যাতি আছে। কিশোরগঞ্জ ও টাঙ্গাইলের তৈরী কাপড়ের সঙ্গে অনায়াসেই ফরাসডাঙ্গা, শান্তিপুর ও হাওড়ার তাঁতের কাপড়ের তুলনা হইতে পারে। পাথরাইল, কাগমারী ও বাজিতপুরের তাঁতের কাপড়ও বেশ সূক্ষ্ম ও উৎকৃষ্ট। বাজিতপুরের কাঠের কাজ প্রসিদ্ধ। ভৈরব ও মেঘনার তীরে পাট ও শোনের নৌকার গুণ ও অন্যান্য দড়ি ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হয়।

মৈমনসিংহ হইতে সাধারণতঃ পাট, চাউল, ধান্য, কাঁচা চামড়া, শুষ্ক মাছ, ঘি, বাসন-তৈজসপত্র ইত্যাদি বিদেশে চালান হইয়া থাকে। বিদেশ হইতে যে সকল জিনিষ আমদানী করা হইয়া থাকে তন্মধ্যে লবন, কেরোসিন তৈল, করগেট টিন, কাপড়, মিলের সূতা, কয়লা, চা, বাঁশ-কাঠ (সাধারণতঃ আসাম হইতে), তুলা-পান (টিপারা জেলা হইতে) ও তামাক (রঙ্গপুর হইতে) প্রধান।

'কালী কিশোর টেক্‌নিক্যাল স্কুল' উল্লেখযোগ্য শিল্প-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। নাগরপুর 'চৈতন্য ফ্যাক্টরী' হস্তচালিত তাঁতের একটি বৃহৎ কারখানা। এই ফ্যাক্টরীটি ন্যূনাধিক বিশ বাইশ হাজার অনশনক্লিষ্ট তাঁতি-জোলার অন্নসংস্থানের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া এই জিলার গৌরব ও আদর্শস্থল হইয়াছে। সদর সহরে দুইটি উল্লেখযোগ্য ছাতা তৈয়ারীর কারখানা ও একটি বৃহৎ বরফের কল স্থাপিত আছে। সম্প্রতি স্থানে স্থানে ছোট ছোট চিনির কল ও দেশলায়ের কল খোলা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের অধীন জেলার বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বাণিজ্য মূল ব্যাঙ্কের প্রসার জেলার আয়তন হিসাবে নিতান্ত অপ্রচুর।

প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রঃ—ভৈরব বাজার (মেঘনার উপর পাট, ধান, চাউল, শুকনা মাছ প্রভৃতির বৃহৎ ব্যবসা কেন্দ্র), সদর সহর, সরিষাবাড়ী (পাট-কেন্দ্র), হালুয়াঘাট (ধান্য-চাউলের কেন্দ্র), গৌরীপুর, শ্যামগঞ্জ, কালীগঞ্জ, মোহনগঞ্জ (পাট, মাছ এবং কমলা লেবুর বৃহৎ আড়ৎ), সুবর্ণখালি (যমুনার উপর, প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-কেন্দ্র), করিম-গঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নীলগঞ্জ, কিদাইদি, দত্তবাজার, কিশোর গঞ্জের ঝুলনমেলা বাজার (কুটির শিল্প-কেন্দ্র) ইত্যাদি।

শিল্প-বাণিজ্য স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের ক্ষেত্রে এ-জেলা-বাসী কৃতি পুরুষের অভাব নাই। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বাংলার বাণিজ্য-প্রতিভার বিগ্রহ-মূর্ত্তিরূপে সারা ভারতে বাঙালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল ও অন্যান্য কয়েকটি কারবারের কর্ণধার-স্বরূপে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী ব্যবসাক্ষেত্রে মহৎ দৃষ্টান্তস্থল হইয়াছেন। হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্‌সিওরেন্স লিঃ-এর অন্যতম ডিরেক্টার শ্রীযুত বীরেন্দ্র-কিশোর রায় চৌধুরী, ঢাকেশ্বরী কটন মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত অখিলবন্ধু গুহ, মৈমনসিংহ সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সভাপতি রায় বাহাদুর শশধর ঘোষ এম, এ, মৈমনসিংহ ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কোং লিমিটেডের ডিরেক্টর ও ইষ্ট বেঙ্গল কমারসিয়াল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত অঘোরবন্ধু গুহ মহোদয়-গণের মধ্যেও বিশেষ বাণিজ্য-পটুতা দৃষ্ট হয়। ইন-করপোরেটেড্ একাউণ্টেণ্ট এবং অডিটর মিঃ এন, সি,

ক্রবর্ত্তী এম. এ. এ. এস. এ. এ. (লণ্ডন), আর. এ হাশয়ের নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। : চক্রবর্ত্তীর নিবাস নেত্রকোণা-দাশপাল গ্রামে। কাতা গবর্ণমেণ্ট কমারসিয়াল ইনষ্টিটিউটের একা-ন্টেন্সি ও অডিটিং-এর তিনি লেকচারার এবং কলিকাতা

মিঃ এন, সি, চক্রবর্ত্তী

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক। লণ্ডনের একটি প্রধান একাউনটেন্সি কলেজে অধ্যাপকের চাকুরীর সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও তাহা ত্যাগ করিয়া তিনি বর্ত্তমানে কলিকাতায় স্বাধীনভাবে পাবলিক একাউনটেণ্ট ও অডিটারের কার্য্য করিতেছেন। টাঙ্গাইল সহরের নিকটবর্ত্তী শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র সরকার মহাশয়ের বিরাট সব্জী-উদ্যান দুইটি মধ্যবৃত্তি বেকার ভদ্র যুবকের আদর্শস্থানীয়।

পরিসমাপ্তি

বার্ষিক বারিপাতের গড় এখানে ৮৬″। এই জেলার মোট থানার সংখ্যা ৫১। মৈমনসিংহে ডাক-বাংলা (**rest house**) আছে—সদরে ৮, নেত্রকোণায় ৫, জামালপুরে ৫, টাঙ্গাইলে ৯টি।

জামালপুর, মেলান্দহ, সরিষাবাড়ী, মোহনগঞ্জ, দুর্গাপুর, নেত্রকোণা প্রভৃতি ৯টি থানার এলেকাভুক্ত জনসংখ্যার হ্রাসের কারণ স্থানীয় স্বাস্থ্যহীনতা ও আসাম প্রভৃতি স্থানে রায়তদিগের দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া। এতৎসত্ত্বেও সমগ্র মৈমনসিংহের লোকসংখ্যা গত দশবৎসরে শতকরা ৬·১জন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মৈমনসিংহ জমিদার-বহুল জেলা। এ জেলার উচ্চ-শ্রেণীর যাঁরা, তাঁরা সাধারণতঃ জমিদার বা তালুকদার অথবা অধিকাংশেরই কমবেশী মালিকানি সত্ত্ব আছে। জীবন ধারণের জন্য তাঁহাদিগকে প্রধানতঃ পরিশ্রম করিতে হয় না অন্ততঃ হইত না। মধ্যবৃত্তি ভদ্রশ্রেণীর উপজীবিকা, যেমন সর্ব্বত্র তেমনি এখানেও চাকুরী, আইন, চিকিৎসা, ব্যবসা ইত্যাদি। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ কৃষি ও শ্রমজীবী।

"বর্ত্তমান মৈমনসিংহ" ইতিহাসের সবচেয়ে বেদনাময় পৃষ্ঠা হইতেছে নিম্নশ্রেণী হিন্দুদের দ্রুত মরণ-বরণ। ১৯১১ সালের আদম সুমারীর রিপোর্টানুযায়ী ভূঁইমালীর সংখ্যা ছিল ১৫,৩৯৭, তিয়র ২২,৭১৫, রাজবংশী ২৩,৩৯২ এবং পাটনী ২৪,২৫৩ এবং মাত্র বিংশতি বছরের মধ্যে উহা যথাক্রমে দাঁড়াইয়াছে সাত, চৌদ্দ, নয় এবং পাঁচ হাজারেরও কম। অন্যান্য নিম্ন বর্ণেরও ঐ একই সমস্যা। মৈমনসিংহবাসীর তথা বাংলার জ্ঞান-গরিমা, ধর্ম্মগৌরব ঐ জেলার উত্তর সীমান্তের হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী গারো, হাজং, মান্দাই প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতিকেও ধর্ম্মান্তর গ্রহণ হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। এইরূপ হ্রাসের হার যদি ভাবী পঞ্চাশ বৎসর চলে তাহা হইলে ধরাপৃষ্ঠ হইতে এই আলোকহীন অসহায়ের দল একেবারে নিশ্চিহ্ন না হইলেও হিন্দুর কোল শূন্য হইবেই। বিলাসীর এ সুন্দর ভুবনে হিন্দু হইয়া বাঁচিবার অধিকার হারাইবে তারা কোন পাপে? কিসের অপরাধ? আশ্রিতের দল আশ্রয়ের প্রতি অতীতে বা বর্ত্তমানে কৃতজ্ঞতা জানাইতে তো কোন ত্রুটি করে নাই—মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, পূজা-পার্ব্বণ-উৎসব-ব্যাপারে নিঃসংকোচ সেবা দিয়া—পাল্কি বহিয়া, নূতন চর দখল করিতে প্রভুর স্বার্থের খাতিরে রক্তপাত করিতে বা জীবন বিসর্জ্জন দিতে কোন দিন তো কুণ্ঠা করে নাই! কিন্তু এই কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে বাঁচিবার অধিকারটুকু পর্য্যন্ত তারা পায় নাই—পাইয়াছে অবজ্ঞায়, অত্যাচারে, উৎকট অভাবের তাড়নায় তিলে তিলে মরণ। উপবাসী, লাঞ্ছিত আত্মার এ অলিখিত ইতিহাস মৈমনসিংসের সকল গৌরবোজ্জলতার পাশে পাশে, বিশুভ্র চন্দ্রিমার একটুখানি কলঙ্করেখার মতই লজ্জাকর।

আশ্বিনের অমান্ত

শ্রীজ্যোতিঃ বাচস্পতি

আশ্বিন মাসের ফলাফল গত সংখ্যাতেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই মাসের মধ্যে বড় গ্রহগুলির দুইটী প্রেক্ষা হইতেছে। এক, শনি ও মঙ্গলের মধ্যে অপোজিশন্ (১৮০ অংশ) প্রেক্ষা; অপর, বৃহস্পতি ও প্রজাপতির মধ্যেও ঐরূপ প্রেক্ষা হইতেছে। ইহাদের ফলে সমুদ্রে বা সমুদ্র উপকূলে প্রবল ঝড় হইবার আশঙ্কা আছে। এবং জলপথে ও স্থলপথে যান-বাহন-জনিত দুর্ঘটনা ও জীবন হানির সম্ভাবনাও লক্ষিত হয়। এ কথা পূর্ব্ব মাসেই বলা হইয়াছে। ২২শে আশ্বিন সোমবার রাত্রি ৮টা ৫৮মিঃ সময়ে কলিকাতায় যে অমান্ত হইতেছে তাহার গ্রহসংস্থান নিম্নরূপ :—

র ৫।২১।৪৩; চ ৫।২১।৪৩; ম ৪।১।২১; বু ৬।১৬।৪০; বৃ ৬।৬।৩২; শু ৫।১১।১২; শ ৯।২৮।৫০ বং; রা ৯।১৩।৪৭; প্র ০।৭।৭ বং; ব ৪।২০।২৩;

কলিকাতায় ঐ সময় লগ্নাদি এইরূপ :—

১০ম ১০।৫।৫৯; ১১শ ১১।৭।৫৯; ১২শ ০।১৩।৫৯; লগ্ন ১।১৯।২২; ২য় ২।১৩।৫৯; ৩য় ৩।৮।৫৯;

এই অমান্তে চতুর্থস্থ মঙ্গল ও বরুণ এবং নবমস্থ শনি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বস্তু। শনি রাশি হিসাবে নবমস্থ হইলেও দশম ভাব বিন্দুর সহিত সংযুক্ত। চতুর্থস্থ বরুণ বুধের শুভপ্রেক্ষা এবং বৃহস্পতি ও প্রজাপতির অশুভপ্রেক্ষা পাইতেছে। ইহার ফলে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্রবে নানারূপ আন্দোলন আলোচনা ও উত্তেজনা দৃষ্ট হইবে। রাজনীতিজ্ঞ মহলে অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন ও মতভেদ পরিলক্ষিত হইবে। সনাতনী সংস্কার-কামীদের মধ্যে কিম্বা উচ্চবর্ণ ও হরিজন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইবে। সাম্প্রদায়িক সমস্যাগুলি গুরুতর আকার ধারণ করিয়া লোকের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। রাজনৈতিক মহলে বিশেষ দলাদলি দৃষ্ট হইবে, এবং একদল অপর দলের বিরুদ্ধে নানারূপ কুৎসা ও গ্লানি প্রচার করিবে। তাঁহারা পরস্পরের উপর মিথ্যাচার, অসাধুতা, বিশ্বাস-ঘাতকতা প্রভৃতি দোষারোপ করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না। চতুর্থস্থ মঙ্গল আবহাওয়া সম্বন্ধে শুভ নহে। ইহা নানারূপ প্রাকৃতিক উৎপাতের সূচক। প্রবল ঝড়, বজ্রপাত প্রভৃতির আশঙ্কা ইহাদ্বারা বুঝা যায়। ইহা সাধারণতঃ অনাবৃষ্টি এবং কৃষিকর্ম্মের ক্ষতি সূচনা করে। ইহার ফলে দেশের মধ্যে চুরি, ডাকাতি, হত্যা প্রভৃতির সংখ্যাবৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে নানা স্থানে উত্তেজনাপূর্ণ সভা সমিতি হইবে। উচ্চবর্ণ ও হরিজনদের মধ্যে অথবা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদেরও বিশেষ আশঙ্কা আছে। এই অবস্থানের ফলে বিপ্লবীদের কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং তাহাদের দ্বারা গুপ্ত হত্যাদির চেষ্টাও হইবে কিন্তু গভর্ণমেণ্ট দৃঢ়হস্তে তাহা দমন করিবেন। এই অমান্তের ফলে উচ্চপদস্থ কোন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির মৃত্যুর আশঙ্কা আছে। দশমস্থ শনির ফলে গভর্ণমেণ্ট শক্তিলাভ করিবেন বটে কিন্তু গভর্ণমেণ্টের কাজের অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা হইবে। এই মাসে নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের এবং কৃষিজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। পাটের মূল্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব।

নিষ্কর্ষ

মহামানব—

"শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল অপরকেই উপদেশ দিতেন তাহা নহে, স্বয়ং ও তাহা সাধন করিতেন। তিনি কেবলমাত্র 'আদর্শ আওড়ান' মানুষ (theorist) ছিলেন না, তিনি ছিলেন একেবারে 'করিত-কর্ম্মা' (practical) সাধক।"

মহামানবের এই পরিচয় হিন্দুভারতকে আজ নূতন করিয়া শুনাইবার প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়াই অনেকের অন্তরে এই সকল কথা জাগিয়াছে ও তাঁহারা তাহা প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। ইহা আশার কথা। ভাদ্রের "বঙ্গশ্রী"তে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন "শ্রীকৃষ্ণের" পুণ্যস্বরূপ মহাচরিত আলোচনা প্রসঙ্গে এই দিকটা বেশ স্পষ্ট করিয়া ফুটাইয়াছেন। যিনি 'মহাভারতে কর্ম্মময়, গীতায় জ্ঞানময়, ভাগবতে প্রেমময়' সেই মহাভারতের মহানায়ক ও মহাগুরু মহামানবের জীবন-সিদ্ধ মহামন্ত্র কি যাহারা তাঁহার ভক্ত ও উপাসক বলিয়া, তাঁহার জীবন-সাধনার উত্তরাধিকারী বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিতে গর্ব্ব অনুভব করে, সেই ভারতের হিন্দুজাতি সত্যই আজ মর্ম্ম দিয়া উপলব্ধি করেন? সেই প্রশ্নই মরমী লেখকের কণ্ঠ চিরিয়া তারস্বরে ফুটিয়াছে—

'আমাদের সাচ্চা সাধনায় ও তপস্যায় কি সেই মহাগুরুকে আমরা বাঁচাইয়া রাখিয়াছি? যদি আমাদের ক্ষুদ্রতা, জড়তা ও অপরাধে তাঁহার সেই চিন্ময় আধ্যাত্মিক জীবনের অবসান হয়, তবে আমরা গুরুঘাতী। এমন নিদারুণ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি কোথাও আছে?"

সমগ্র হিন্দুজাতি ইহার কি উত্তর দিতে পার?

গীতার জীবন—

গীতার ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের জীবনই গীতার মূর্ত্তি। গীতার ধর্ম্ম—জীবনের ধর্ম্ম। ভারতের ধর্ম্মজগৎ ইহা ক্রমশঃ উপলব্ধির মধ্যে পাইতেছেন, ইহাতে আমরা উল্লসিত। শ্রাবণের 'আর্য্যদর্পণ' এ বিষয়ে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন—

"সকলেই কর্ম্মকে ত্যাগ করতে বলেছেন, কর্ম্ম জ্ঞানলাভের পথের প্রধান অন্তরায় স্বরূপ ইত্যাদি কত কি—কিন্তু গীতাকার কর্ম্মকে নিত্য সঙ্গীরূপে রেখে দিতে কেন বলছেন, কথাটী আমাদের তলিয়ে বুঝতে হবে।"

ইহার উত্তরটুকুও আমরা সম্পূর্ণ সমর্থন করি—

"কর্ম্ম যে মানুষকে বন্ধন-দশায় নিপতিত করে না, কর্ম্ম করে'ও যে দিব্যজ্ঞানকে অটুট রাখা যায়—শ্রীকৃষ্ণ তারই জলন্ত আদর্শ। ৪র্থ অধ্যায়ের সেই শ্লোকেই 'স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ!'—প্রমাণিত হয়, মধ্যযুগে এমন একটা অজ্ঞান তামসিক অবস্থা গিয়েছে, যে সময়ে কর্ম্মযোগের কৌশলের কথা সকলেই বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ মানব-মনের সেই প্রসুপ্ত জ্ঞানকে নিজের চেতনা-সহায়ে জাগিয়ে তুলেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে এই জন্যই গুরু, পথপ্রদর্শক, দিশারী মানব-জীবন সংগ্রামের সারথি বলা হয়েছে।...কর্ম্মকে ভয় করলে চলবে না—কর্ম্মকে দিব্য কর্ম্মরূপে পরিণত করতে হবে। গীতাখানি ভাল করে' পড়লে দিব্য কর্ম্মের সুষ্ঠু সঙ্কেত পাওয়া যায়।"

গীতার ধর্ম্ম যতই সত্যরূপে আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব, ততই আমরা গীতার জীবন লাভ করিব। শুধু তাই নয়—"গীতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ জগতে যে দিব্য-কর্ম্মীর দল সৃষ্টি করা" তাহাও সার্থক হইবে।

অভিশপ্ত লেখনী—

মনীষী ও ভাবুক শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাশ এম-এ-বি-এল পি-এইচ-ডি প্রাচীন আদর্শের সহিত তুলনায় আধুনিক রুচি-বিকারকে লক্ষ্য করিয়া ভাদ্রের "গন্ধ-বণিকে" এই কথাগুলি সদৃষ্টান্ত লিখিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে নবীনদের প্রণিধানযোগ্য—

"নাহং জানামি কেয়ূরে নাহং জানামি কুণ্ডলে।
নূপুরে ত্বভিজানামি নিত্যং পাদাভিবন্দনাৎ।
(রামায়ণ, বনপর্ব্ব)

—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীকে কিরূপ সম্মানের চক্ষে দেখিতে হয়, মহর্ষি বাল্মীকি তাহার যে আদর্শ চিত্রিত করিয়াছেন তাহা জগতের কোনও সাহিত্যে পাওয়া যায় না। এই উচ্চ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই হিন্দুগণ চিরকাল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীর গৌরব ও সম্মান রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

বিলাতী বা পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শে যাহারা প্রাচীন হিন্দু-সমাজকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গঠন করিতে চায়, অবশ্য তাহাদের নিকট এই পবিত্র ও উচ্চ আদর্শের আদর হইবে না। তাহারা বৌ-ঠাকুরাণীকে মাতৃ-তুল্যা মনে করিতে কুণ্ঠিত হন; কেননা তাহাদের চিত্ত কলুষপূর্ণ ও পবিত্রতাহীন। সুতরাং মহর্ষি বাল্মীকির এই উচ্চ আদর্শের সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা তাহারা কিরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে? তাহারা ঠাকুরাণীকে তাঁহার উচ্চ আসন হইতে নামাইয়া রঙ্গিণী করিয়াছে। এই সকল লেখকই তাহাদের জঘন্য ও দুর্নীতিপূর্ণ রচনার দ্বারা হিন্দু সমাজের ও হিন্দুগৃহের পবিত্রতা, সুখ, শান্তি ও সৌন্দর্য্য বিনষ্ট করিতেছে। ইহাদের এরূপ অস্পর্দ্ধা যে মহামানব মহর্ষিগণের উচ্চ আদর্শকেও ক্ষুণ্ণ করিতে কুণ্ঠিত নহে। ইহাদের লেখনীর উপর দেবতার অভিশাপ বর্ষিত হইবে।".

সমালোচনা
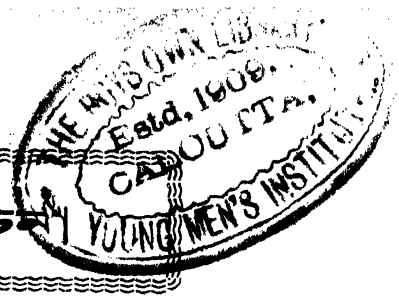
শান্তি-সোপান—বা পান্থপ্রদীপ। হজরৎ এমাম গাজ্জালী (রাহ্‌মাতুল্লাহ্‌ আল্‌.. হ) প্রণীত মেনহাজোল আবেদিন ও ছেরা জোছালেকিন নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ! অনুবাদক ও প্রকাশক খান বাহাদুর মৌলবী চৌধুরী কাজেমদ্দীন্‌ আহমদ সিদ্দিকী, জমিদার, ঢাকা মূল্য ২।০

সুন্দর উপাদেয় ধর্ম্মগ্রন্থ। ইসলামের সাধন-শাস্ত্র হইলেও, ইহা পড়িয়া যে কোনও ধর্ম্মাবলম্বী ঈশ্বরপিপাসু মাত্রেই তৃপ্তি পাইবেন। বইখানিতে আরবী শব্দ—বিশেষ্য ও ক্রিয়ার প্রয়োগ মাঝে মাঝে অনিবার্য্য হইলেও, ভাষার বন্ধন মোচন করিয়া একবার মর্ম্মে অনুপ্রবেশ করিতে পারিলে, সাধনার গূঢ় রহস্যের সন্ধানে হৃদয় বিমুগ্ধ, পুলকিত হয়। বিশ্বাসকে জীবনে নিখুঁৎভাবে অনুশীলন করাই সাধনার শ্রেষ্ঠ রহস্য; যে ধর্ম্মী, যে জাতি ইহা করে তাহারাই ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ লাভ করে। গ্রন্থকার একজন ধর্ম্মবিশ্বাসী খাঁটি মুসলমান, ইহা তাঁহার লেখার ছত্রে ছত্রে অনুভব করা যায়।

অনন্যা—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ। ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা। মূল্য ২৲ টাকা।

শিক্ষিত সমাজ নারীকে আজ যে শিক্ষা-দীক্ষা-লাভের সুযোগ ও স্বাধীনতাটুকু দিয়াছে, তাহারও মূলে আছে সাংসারিক, পারিবারিক স্বার্থ—এই স্বার্থের পেষণে নারী-হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলি নিষ্পেষিত হওয়া অসম্ভব নয়। যুগের নারীপ্রগতির ইহাও অন্যতম সমস্যার দিক্‌—অচিন্ত্য বাবু এই উপন্যাসখানিতে সেই সমস্যাটীকে অতি নিপুণ-ভাবে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। "ইন্দ্রাণীর" পর "অনন্যা"র বীথী যুগনারীরই নিখুঁৎ প্রতিমূর্ত্তি। শক্তিশালী গ্রন্থকারের ঐন্দ্রজালিক তুলিকায় চিত্র-চরিত্র প্রখর ঔজ্জ্বল্যে, যোগ্য সমারোহে ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

দেবারু—শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত প্রণীত। প্রকাশক—বরেন্দ্র লাইব্রেরী; ২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১॥০

পঙ্কে সমুৎপন্ন পঙ্কজ বিধাতার যে নিয়মে, ঢুলেনীর ছেলে দেবারুও সেই দৈবী বিধানের অপরূপ সৃষ্টি—অর্থাৎ আমাদের পাপপুণ্য, ভাল মন্দ সংজ্ঞা এখানে স্থান পায় না। প্রেমের শতদল পদ্ম—জন্ম, গোত্র, জাতির অপেক্ষা করে না। কলাকুশলী লেখক তিনটী অধ্যায়ে এই প্রেমের চরম অভিব্যক্তি স্তরে স্তরে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—পিতা স্বপ্নবীজ মাতার বিশুদ্ধ ভক্তি ক্ষেত্রে পরিস্ফুট হইয়া উঠি দেবারুর জীবনে—যাহা স্বভাব-সুন্দর প্রেমেরই সহজ-মূর্ত্তি ইহা যথার্থ মনোবিজ্ঞান-সম্মত। চারুবাবুর লেখনী এদি দিয়া বড় কৃতকার্য্যতার সহিত মনো-বিজ্ঞানের সত্য কলা-রচনার সৌন্দর্য্যে বিমণ্ডিত করিয়া উভয়কেই মহিমান্বি করিতে পারিয়াছে। আমরা তজ্জন্য তাঁহার ভূয়সী প্রশংস করি।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লেখকের সূক্ষ্মতত্ত্বে বিশ্বাস আছে; স্বপ্ন সূক্ষ্মদৃষ্টি, প্রেতাবির্ভাব, অধ্যাত্ম প্রত্যাদেশ, এ সকল অন্তর্গূঢ় সত্য অতি স্বাভাবিক প্রসঙ্গক্রমে যথা-স্থানে সন্নিবেশিত হইয়া শুধু তাঁহার উপন্যাসখানিকে নিবিড়তর উপভোগ্য করিয়া তোলে নাই, ভবিষ্য যুগের সাহিত্য-শিল্পের গভীরতর সম্ভাবনীয়তার সঙ্কেত যাঁহাদের লেখনী-তুলিকা বহন করিয়া আনিতেছে, তাঁহাদের ন্যায় জীবনকে বৃহত্তর সমন্বয়-দৃষ্টিতে দেখিবার শিক্ষা ও ভাবুকতা তাঁহার আছে, ইহ[illegible]ও পরিচয় দেয়। বিশেষতঃ, সিভিলিয়ানের মেয়ে ল[illegible]র অত্যাধুনিক স্বাধীনতা-পরায়ণতা যখন সহজিয়া প্রে[illegible] শ্রে[illegible] পরিণতি দেবারুর মধ্যে তাহার পরিপূর্ত্তি ও সা[illegible] দেখিতে পাইয়া আত্ম-বিসর্জ্জন করিল, তাহার ম[illegible] যুগপ্রগতির একটী সুগভীর প্রশ্নের মীমাংসার সন্ধান [illegible] পাওয়া যায়, এমনও নয়। সর্ব্বোপরি, দেবারু-ল[illegible] শেষ মিলন-দৃ[illegible] নিগূঢ় কৃষ্ণ-প্রেমে দীক্ষা শুধু দেবারুকে তাহার চরম ত[illegible] পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ ও সিদ্ধ করিয়া তুলে নাই, গ্রন্থকা[illegible] অন্তর্নিহিত সহজ-সুন্দর বৈষ্ণবভাব শত আবরণ ফুঁড়িয়া সুপ্রকাশিত করিয়া তুলিয়াছে। বইখানি সুন্দর, সুবেশ ও সুপাঠ্য।

মত ও পথ

— নারী-শিক্ষা —

বাঙলায় নারীশিক্ষার প্রতিষ্ঠান আছে ১৮,৫৭৫টী, প্রাথমিক শিক্ষা হইতে উচ্চ শিক্ষা পর্য্যন্ত হিন্দু-মুসলমান সকল ধর্ম্মীর ছাত্রীসংখ্যা ৫ লক্ষ ৬ হাজার ১৪ জন—সমগ্র নারীসংখ্যার তুলনায় ইহা শতকরা ২·৫২ জন মাত্র। এই হেতু নিঃসঙ্কোচেই বলা যায়, বাঙলাদেশে নারী-শিক্ষার বিস্তৃতি আরও অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষা-ব্যাপারে বাঙলাদেশে প্রতি মাসে প্রতি ছাত্র-ছাত্রীর জন্য পাঁচ সিকা খরচ হয়। তন্মধ্যে গভর্ণমেণ্ট দেন সাত আনা, ছাত্রদের বেতন পাওয়া যায় দশ আনা, আর বাকী জনসাধারণের নিকট হইতে আসিয়া থাকে। কেবল বাঙলা দেশেই দেখি, গভর্ণমেণ্টের অর্থদান অপেক্ষা ছাত্রদের মাহিনার অঙ্কই অধিক; তবুও বাঙলার দুর্ভাগ্য, শিক্ষা-ব্যাপারে বাঙালীর ভাগ্যে অর্থ-ব্যয়াধিক্য আর কোন মতেই নাকি গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কাজেই পুরুষের জন্য বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া নারীর-শিক্ষা বিস্তৃতির আশা একপ্রকার দুরাশা বলিয়াই মনে হয়। এইজন্য অনেকে মনে করেন, পুরুষের সহিত নারী যুক্তভাবে শিক্ষালাভের সুযোগ পাইলে, ২২ লক্ষের অধিক ছাত্র যে অর্থব্যয়ে লেখাপড়া শিক্ষা করিতেছে, কথঞ্চিৎ পরিমাণে ব্যয়াধিক্য বাড়াইতে পারিলে সমসংখ্যক নারীও এই সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। নারীর আকৃতি-প্রকৃতি পুরু[illegible]ইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ইহাভিন্ন নারী ও পুরুষের একত্র [illegible]নে নৈতিক অধঃপতনেরও সম্ভাবনার হেতু আ[illegible]ছ ব[illegible]া, অনেকেই এইরূপ প্রস্তাব সঙ্গত বলিয়া মনে [illegible]ন না। সম্প্রতি Inter-University Boar[illegible] এ এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়ায় কলিকাতার বিশ্ববিদ্যা[illegible] হইতে এই উত্তর দেওয়া হইয়াছে, দশ বৎসরের অধিক বয়স্কা বালিকাকে কোন মতেই [illegible] ও যুবকদের সঙ্গে একত্র অধ্যয়নের সুযোগ দেওয়া [illegible] যুক্তি-যুক্ত নহে। কলেজগুলিতেও নারী পুরুষ [illegible]ধ্যয়ন করে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ [illegible]শ্রয় মনে করেন না। যদিও কোন কোন কলেজে [illegible]মান অবস্থায় ইহার অন্যথা হইতেছে।

আপৎকাল উপস্থিত হইলে, ধর্ম্মও নাকি পরিত্যাগ করিতে হয়। জাতির অধঃপতন যখন শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে, আর তাহা হইতে পুনরুত্থানের উপায় যদি নারীকে পুরুষের সহিত তুল্যভাবে শিক্ষিত করিয়া তোলাই হয়, এবং বর্ত্তমান অবস্থায় অর্থ-সঙ্কট যখন দূর হইবার নহে, তখন শিক্ষাদানে যে সকল ব্যবস্থা আছে, তাহার মধ্যেই নারীকেও শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া হয়ত অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে। নিজেদের অক্ষমতাদোষে জাতির অর্দ্ধাঙ্গ পঙ্গু হইয়া থাকিবে, ইহা মনুষ্যত্বের পরিচয় নয়।

কিন্তু শিক্ষা-সমস্যা লইয়া চিন্তা করিবার আছে। যে শিক্ষা প্রায় শতাব্দী কাল ধরিয়া আমরা পাইয়াছি, সে শিক্ষায় শিক্ষিত বলিয়া ভুয়া চাপ্‌রাশ-ই মিলিয়াছে। নৈতিক চরিত্র এইরূপ শিক্ষায় যেমন গড়িয়া উঠে নাই, নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবার মত যোগ্যতাও আমরা অর্জ্জন করিতে পারি নাই। আমূল শিক্ষার বনিয়াদ নূতন করিয়া গড়িয়া তোলার প্রস্তাবনা স্বদেশীয় ও বিদেশীয় মনীষীদিগের মুখে অধুনা খুবই শুনা যাইতেছে। এই অবস্থায় নারীদের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রবাহে ঠেলিয়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হইবে না। ইহা ভিন্ন পুরুষ হইতে নারীর আকৃতি-প্রকৃতিই শুধু ভিন্ন নহে, পরন্তু নারীর কর্ম্মক্ষেত্রও পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শতাব্দী কাল ধরিয়া যখন আমরা পুরুষের শিক্ষানীতির আদর্শ নির্ণয় করিতে পারিলাম না, তখন একটা অভিজ্ঞতা লাভ না হইলে নারীকে কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য হইয়াছে। অথচ শিক্ষালাভের প্রেরণা আজ আর রুদ্ধ করিয়া রাখা যায় না। এই অবস্থায় যেমন করিয়াই হউক, দেশের নারী-জাতির শিক্ষালাভের প্রশস্ত ক্ষেত্র আমাদের করিয়া দিতেই হইবে।

ইহার জন্য কেবল দেশের পুরুষেরাই ব্যস্ত হইয়া পড়েন নাই, মেয়েদের মধ্যেও সাড়া উঠিয়াছে। নিখিল ভারত মহিলাসঙ্ঘের সভানেত্রী রাণী চন্দ্রাবতী নারীশিক্ষা-ব্যাপারে এখনও যে অন্ধকারে হাতড়ান হইতেছে, এ কথা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। এই অনুসন্ধান-স্পৃহা বশতঃই লণ্ডনের Whiteland College-এ এই সমিতি কতকগুলি শিক্ষয়িত্রীকে শিক্ষানীতি ও পদ্ধতি আয়ত্ত করার জন্য পাঠাইয়াছেন। এই সকল শিক্ষয়িত্রী ভারতে আসিয়া, ভারতীয় আদর্শের সহিত কতখানি সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ভারতীয় মহিলাদের শিক্ষাদানে সাফল্যলাভ করিবেন, সে বিষয়ে আমাদের খুবই সংশয় আছে।

সম্প্রতি আমাদের বরণীয়া শ্রীমতী অবলা বসু রোটারী ক্লাবে নারী-শিক্ষা সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহার মধ্যে

এই কথাটী খুবই সত্য—"In India the teaching given in schools and colleges have no relation to the peoples' every-day lives and needs" "অর্থাৎ ভারতের স্কুলে এবং কলেজে যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহার সহিত জীবনের কোনই সম্পর্ক নাই।" তিনি জাপানের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, জাপানী নারীরা শিক্ষা পায় গ্রন্থকীট হওয়ার জন্য নহে; বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে নারী যে সামাজরক্ষার ভিত্তি, তদনুকূল সকল শিক্ষাই লাভ করিয়া থাকে। ক্ষেত-খামার, পশুপালন, রন্ধন, কাপড়-কাচা, অতিথিসৎকার, দৈনন্দিন জীবনের কোন ধর্ম্মই অনুশীলনাভাবে শিক্ষার জন্য নারীত্বের অপলাপ ঘটায় না। তিনি বলেন, উপস্থিত মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থাই সর্ব্বপ্রধান হওয়া উচিত। এই হেতু, বাঙলার ৪ লক্ষ বিধবাদের মধ্যে শিক্ষয়িত্রী সৃষ্টি করাই তাঁহার লক্ষ্য হইয়াছে। বৈধব্য যদি বাঙলার হিন্দু নারীকে মানিয়া লইতে হয়, এই মহত্তর কর্ম্মে তাহাদের আত্মদান সত্যই শ্রেয়ঃ-ফল দান করিবে।

মহীশূরের এক মহিলা-সভায় শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু একটী বড় কথা বলিয়াছেন—"Women to-day needed less education and more culture" অর্থাৎ "আজ মেয়েদের দরকার হইয়াছে শিক্ষার চেয়ে সাধনাকে অধিক করিয়া ধরার।" এই সঙ্গে তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, "অর্ব্বাচীন যুগে শিক্ষার্থিনী নারী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিখিতেছে ভারতের শিক্ষা ও সভ্যতাকে ঘৃণা করিতে।" আর একটী দোষের কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, "শিক্ষাপ্রাপ্তা নারীরা চাহিতেছেন পুরুষের লেজুড় হইয়া গৃহস্থালী কর্ম্মে যেন আর থাকিতে না হয়, এই হেতু তাঁহারা নারী হইয়াও পুরুষের সমকক্ষতা-লাভ করিতে গিয়া নারীত্বকেই বিসর্জ্জন দিতেছেন।" তাই তিনি জোর করিয়া বলেন, "It was not correct to say that women's work was inferior to man's works" অর্থাৎ নারীর যে কর্ম্ম তাহা পুরুষের অপেক্ষা হেয় নহে।" তাহার এই কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য।

উপসংহারে, আমাদের বক্তব্য নারী-জাতির মধ্যে শিক্ষাপ্রেরণা যুগধর্ম্ম-রূপেই দেখা দিয়াছে। ইহার উপর দরিদ্র সমাজ দেখিয়াছে, পুত্রাপেক্ষা কন্যাকে শিক্ষিতা করিয়া তুলিতে পারিলে অধুনা সংসারের দুঃখ সহজেই দূর হয়। শিক্ষিত বেকার পুত্র উপায়ক্ষম নহে, কিন্তু শিক্ষিতা নারীর চাহিদা খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। সমাজের কন্যাদায় যেন ঘুচিয়া যাইতেছে; কেননা, কন্যা উপায়ক্ষম হওয়ায় পিতামাতা ও পরিবারমণ্ডলী স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতেছে। এইজন্য পুত্রাপেক্ষা কন্যাকে শিক্ষিত করিয়া তোলার প্রবৃত্তি ক্রমে বর্দ্ধিত হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি।

অন্ধ জাতি ভবিষ্যদ্দৃষ্টিহীন। আগামী বিশ বৎসরের মধ্যেই এ প্রবাহ যখন রুদ্ধ হইবে, তখন সর্ব্বহারা জাতি কিরূপ নিরুপায় হইবে তাহা আমরা ভাবিয়াও পাই না। নারীকে শিক্ষা দেওয়ার খরস্রোতঃ আর নিবারিত হওয়ার নহে। সমাজে ৪ লক্ষ বিধবাই ভবিষ্যৎ-রক্ষার দুর্গ নহে। নিখিল নারীসমাজ হইতে আজ এই শিক্ষাবিপ্লবের আবিল প্রবাহে অবগাহিত হইয়া একদল নারীর অভ্যুত্থান প্রয়োজন—যাহারা যথাকালে অদূরের অবসাদ-ঘোরে নারীত্বের উজ্জ্বল প্রদীপ হস্তে দেশের নারীজাতির সম্মুখে সুপথের নির্দ্দেশ দিবে। তলে তলে এইরূপ নারী-চরিত্রের অনুশীলন ও সাধনাই আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি। "প্রবর্ত্তক" এই প্রেরণাই নারী-শিক্ষাদানের মূলমন্ত্র করিয়াছে। দেশের সর্ব্বত্র এইরূপ নীরব আয়োজনই ভবিষ্যতের কল্যাণসাধনের অমোঘ উপায় বলিয়া আমরা মনে করি।

— সংস্কৃত শিক্ষা —

বাঙলার সংস্কৃত-শিক্ষা-পরিষদের সভাপতি, অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও সম্পাদক ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সংস্কৃত পরিষদের বার্ষিক সভায় যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সংস্কৃত-শিক্ষার প্রচারকল্পে উদ্যোগী যাঁহারা তাঁহাদের উহা মনোযোগসহকারে পাঠ করা উচিত।

সংস্কৃত শিক্ষাকে অনেকে মৃত-ভাষা বলিয়া উপেক্ষা করেন; কিন্তু ভাষার যে মৃত্যু হয় নাই, ইহা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। সংস্কৃতশিক্ষানুশীলনের ক্ষেত্র হইতে দূরে দাঁড়াইয়া আমরা এই কথা বলিতেছি না; বরং জোর করিয়াই বলিব, জীবনের সাধনায় কোন ব্যষ্টি বা সমষ্টি যদি একাগ্র হয়, (অবশ্য এই জীবন-সাধনা সৎ ও সত্যের উপর ভিত্তি করিয়া অনুষ্ঠিত হওয়া চাই) তাহা হইলে সংস্কৃত-শিক্ষার প্রয়োজন এই ক্ষেত্রে অনিবার্য হইয়া পড়িবে।

এইদিকে দৃষ্টি রাখিয়াই শ্রদ্ধেয় মন্মথবাবু বোধ হয় বলিয়াছেন—"If we scare away the unlucky and poverty striken students, who have come to the Sanskrit, mostly or mainly because they are unable to meet the expenses of English education, the result

will be disastrous" অর্থাৎ দারিদ্র্যবশতঃ ইংরাজী শিক্ষায় অগ্রসর হইতে না পারিয়া, দরিদ্র ও হতভাগ্য যে সকল ছাত্রগণ সংস্কৃত শিক্ষালাভে অগ্রসর হইতেছে তাহাদিগকে যদি এই ক্ষেত্র হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া যায়, তবে ইহার ফল শোচনীয় হইবে। এই বিদায় দেওয়ার কারণ, প্রথম হইতেছে পরীক্ষা-ব্যাপারে অধিক কড়াকড়ি করা; ইহাতে অল্পমেধাবিশিষ্ট ছাত্রেরা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িবে। দ্বিতীয় কারণ হইতেছে, সংস্কৃত-পরিষৎ যে পরিমাণে গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অর্থসাহায্য পাইয়া থাকেন তাহা নগণ্যবোধে সংস্কৃত-পরিষদের কর্তৃপক্ষগণ ঔদাসীন্যবশতঃ এই প্রবাহ রুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিতে পারেন।

আমরা বলি, গঙ্গাবক্ষ যদি শুকাইয়াও যায়, তাহার গভীর খাতটুকু বজায় রাখারও প্রয়োজন আছে; গঙ্গোত্রী-ধারার উচ্ছ্বসিত প্রবাহের পুনরাবির্ভাব যদি কোন দিন ঘটে, তাহা হইলে পথচিহ্নের অভাবে সে প্রবাহকে অপথে, বিপথে নিঃশেষ হইতে হইবে না। এইহেতু, এই দুদ্দিনে সংস্কৃতশিক্ষার প্রবাহটুকু রক্ষা করাও দেশের পরম কল্যাণ-সাধন করা। সংস্কৃত-পরিষদের এই কর্ম্মের প্রশংসা তাই শতমুখে করিতে হয়। যাঁরা ভারতীয় ভাবের শিক্ষা ও সাধনার অনুরাগী, প্রকৃত মরমী ও দরদী, তাঁহারা আমাদের সহিত একমত হইবেন।

এই প্রসঙ্গে সম্পাদক ডাঃ দাশগুপ্ত কয়েকটী সাংঘাতিক সত্য কথার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এই সত্য সংস্কৃত শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠানগুলি যাঁহারা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা একান্ত নিরুপায় বলিয়াই ইহা মাথা পাতিয়া লইবেন—ইহা ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

বিচারপতি মন্মথনাথের কথা—"The general body of students, who are recruited from amongst the comparatively less efficient sons of pandits, cannot be expected to show much proficiency in the different paths of Sanskrit studies." "ইহার ভাবার্থ:— অল্পমেধাযুক্ত ছেলেগুলিকেই পণ্ডিতেরা সংস্কৃত পড়ার জন্য দিয়া থাকেন। নচিকেতার পিতা যেমন যে গাভী শেষ দুধটুকু দিয়াছে, শেষ তৃণ-ভক্ষণ করিয়াছে তাহাই ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন, সেইরূপ সংস্কৃত-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদানের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এই অবস্থায় উপাধি-পরীক্ষায়ও কৃতী-ছাত্রের মেধার পরিচয় যে পাওয়া যাইবে না, ইহা অবধারিত; আর ইঁহারাই যখন আবার অধ্যাপক হইবেন, তখন ছাত্রগণের শিক্ষাদান অপেক্ষা নিজেদের জীবিকার্জ্জনের তাগিদ যে অধিক হইবে, ইহা কিছু নূতন কথা নহে।

এই সংস্কৃত-শিক্ষার উন্নতি যদি করিতে হয়, ডাঃ দাশগুপ্তের দরদপূর্ণ বাণীর সার্থকতা যদি ফলাইয়া তুলিতে হয়, আমাদের বর্ত্তমান সংস্কৃত-শিক্ষা-পদ্ধতির কিছু সংস্কার করিতে হইবে। প্রথমতঃ, বাঙলার সমস্ত টোলগুলির অর্থ-সংস্থানের হিসাব কর্তৃপক্ষগণকে করিতে হইবে। গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যথোচিত সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা যখন উপস্থিত নাই, তখন সংস্কৃত-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন বোধ হইবে, তাহা আমাদের দেশের নিকট হইতেই উদ্ধৃত করার প্রাণ জাগাইতে হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দেশ-বাসীর নিকট হইতে এইরূপ দান যথেষ্টই পাইয়া থাকে; সংস্কৃত-পরিষৎ কেন সে দিকে উদ্যোগী হইবে না? দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত শিক্ষাকে কার্য্যকরী করিতে হইলে, উপাধি পরীক্ষায় কেবল ইংরাজী পত্রের ব্যবস্থা রাখিলেই চলিবে না, উহা বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। এইরূপ হইলে, যে সকল ছাত্রেরা নিরুপায় হইয়া সংস্কৃত শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে উপস্থিত হয় তাহারা অধিকতর কৃতী হইয়া উঠিবে। যতদিন জীবনের দায় না হইয়া অর্থের দায় শিক্ষার লক্ষ্য হইয়া থাকিবে, ততদিন সংস্কৃত-শিক্ষা-পরিষৎকেই সংস্কৃত-শিক্ষাদানের প্রণালীটী রক্ষা করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে হইবে। রাষ্ট্রসাধনায় দেশের প্রাণ জাগে, সংগঠন-কর্ম্মে এই মৌলিক সাধনায় বাঙলায় কর্ম্মীর অভাব হইবে না বলিয়াই বিশ্বাস করি। জাতির প্রাণ একদিন জাগিবেই, তখন এই মজা খাতেই সংস্কৃত-শিক্ষার প্লাবন বহিবে। এই আশায় আমরা সংস্কৃত-শিক্ষানুশীলনের ব্যবস্থাটুকুকে অধিকতর যত্নে রক্ষা করা একটী বড় কাজ বলিয়া মনে করি।

— বাঙলার সন্ত্রাসবাদ —

সন্ত্রাসবাদ বাঙলার একটী বিশেষ সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জাতীয় অভ্যুত্থান-পথে ইহা যে অন্তরায়, সে বিষয়ে আমরা নিঃসংশয়, এবং এইজন্যই "প্রবর্ত্তকে" এই বিষয় লইয়া আমরা বহু আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু অরণ্যে রোদনের ন্যায় এই সকল আলোচনায় কর্তৃপক্ষ শুধু কর্ণপাত করেন না, তাহা নহে "উল্টা সমঝলি রামের" মত অনেক ক্ষেত্রে বিপরীত ফলই দেখা গিয়াছে। এইজন্য বহুদিন আমরা আর এবিষয় লইয়া আলোচন ও বিশ্লেষণ করি নাই। শুধু ভাষা ও ভাব কোন বিষয়ের বর্জ্জন ও পরিবর্ত্তন আনিতে পারে না, যতক্ষণ না তদ্বিপরীতে প্রত্যক্ষ জীবনাদর্শ সংস্থাপিত করা হয়। আমরা বাঙলার সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এই নীতিই আশ্রয় করিয়াছি। ধ্বংস-নীতির পরিবর্ত্তন সৃষ্টির বিজ্ঞানে, তাহা মুখের কথায় ও লেখনীর

মুখে সম্ভব নহে। আমরা বাঙলার তরুণদের লইয়া দীর্ঘ দিন জীবন নিঙ্‌ড়াইয়া তাই গঠনের পথই দেখাইয়া চলিয়াছি। অমোঘ আত্ম-সান্ত্বনা মিলিয়াছে; কেন না, দেখিয়াছি, দেশের মার্জ্জিতবুদ্ধি উচ্চ শ্রেণীর যুবকেরা যে প্রাণ আদর্শ-বিভ্রাটে অপচয় করিত, সে প্রাণের সার্থকতা-বিধানের সুপথ পাইয়া কৃতার্থই হইয়াছে। আমরা মনে করি, সন্ত্রাসবাদ শাসনে, পীড়নে, প্রলোভনে আমূল দূর হইতে পারে না। সন্ত্রাসবাদ দূর করিতে হইলে, আত্মদানোন্মুখ জাগ্রত প্রাণের সম্মুখে দেশ ও জাতির সেবার প্রশস্ত পথ মুক্ত করিয়া দিতে হইবে।

সম্প্রতি ঢাকায় বাঙলার অস্থায়ী গভর্ণর পুলিশ প্যারেডে সত্যই বলিয়াছেন, "We must not delude ourselves into believing that the efforts of official agencies alone can eradicate the evil of terrorism." ইহার ভাবার্থ :—আমাদের এইরূপ বুদ্ধি-ভ্রান্ত হইলে চলিবে না যে, একমাত্র রাজকীয় শাসন-শক্তির পীড়নেই সন্ত্রাসবাদের ভিত্তি উপড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। তিনি চাহিয়াছেন এই হেতু জনসাধারণের এতদনুকূলে আন্তরিক সহানুভূতি এবং নির্ভীক অভিব্যক্তি। কিন্তু জনসাধারণের এই সহযোগিতা সম্বন্ধে যে বড় কথাটী তিনি বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য "……a vigorous public opinion born of the conviction that the future happiness of Bengal will be seriously imperilled………"

অর্থাৎ এই অভিমতের গোড়ায় থাকা চাই জনগণের বিশ্বাস, যে বাঙলার ভবিষ্যৎ সুখশান্তির ইহা অন্তরায়।— "প্রবর্ত্তক" এই ক্ষেত্রে যদি সত্য কথা না বলে, আমরা ঈশ্বরের নিকট দায়ী হইব এবং কপট ব্যবহারের ফলে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি উভয় পক্ষের কল্যাণ-সাধনে কৃতকার্য্য হইব না। গভর্ণর বাহাদুরের উক্তি প্রসঙ্গে আমরা বলিতে চাই, যে এই ভবিষ্য সুখশান্তি সম্বন্ধে একটা স্পষ্টধারণা তরুণকে দিতে হইবে। যাঁহারা বলেন, দেশের বেকার-সমস্যার ফলেই সন্ত্রাসবাদীর সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছে, তাঁহারা সত্যসত্যই সন্ত্রাসবাদীর মনোবৃত্তির আদৌ পরিচয় রাখেন না। বৃটেনের রাজ্য-শাসন ফলে দেশবাসী পাইয়াছে জাতীয়তার আস্বাদ তাহাদের প্রাণে জাগিয়াছে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। এই দান বিদেশীয় রাজশক্তির নিকট হইতে ভারত পায় নাই দৈবক্রমে, অথবা তাহার অসতর্ক অঙ্গুলীর ফাঁক দিয়া। প্রত্যেক ইংরাজ জানে, তাহার রাষ্ট্রশক্তি এবং আর্থিক সামর্থ্য জীবনের মূলমন্ত্র। ইংরাজের সংস্পর্শে আসিয়া প্রত্যেক ভারতবাসী স্বভাবতঃ এইরূপ চরিত্রই লাভ করিতে চাহে। এইক্ষেত্রে একজন জার্ম্মাণ পণ্ডিতে কথা উদ্ধৃত করিয়া বলি—"There is a idealistic impulse ·· which gives a sanction to England's struggle for power in the nam of civilization England felt that she stood for freedom" ··ইহার মর্ম্মার্থ :—একটা আদর্শ সংবেগ ইংলণ্ডকে শিক্ষা ও সভ্যতার নামে শক্তি-সঞ্চ উদ্বুদ্ধ করে—ইংলণ্ড অনুভব করিয়াছিল, সে দাঁড়াইয়াছে মুক্তির জন্য। এই জার্ম্মাণ পণ্ডিত আরও বলেন এই তত্ত্ব, "Every Englishman believed honestly and fanaticlly" অর্থাৎ প্রত্যেক ইংরাজ ইহা অকপট উন্মাদনার সহিত বিশ্বাস করিয়াছিল। এই হেতু ইংরাজের সংস্পর্শে আসিয়া স্বাধীনতার স্পৃহায় এ জাতি যে উদ্বুদ্ধ হইবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি! কিন্তু এই আদর্শ হেতু যদি জাতি বিপথে চলিতে চাহে, ইংরাজের শক্তি বিক্ষুব্ধ হইবেই—তবে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নিপীড়িত করিবে না, ইহা আমরা বিশ্বাস করি।

সন্ত্রাসবাদ-রূপ অভিব্যক্তিদ্বারা দেশের সত্যই অহিত-সাধন হইবে। এজন্যই ইহার প্রতিকার আমাদের করিতে হইবে। কিন্তু যাঁহারা প্রতিকারপরায়ণ হইবেন তাঁহারা সন্ত্রাসবাদ ভবিষ্য কল্যাণের অন্তরায়, যেমন এই বিশ্বা করিবেন—সেইরূপ সে পথে তরুণের জীবন চালিত করিতে হইবে, সেই পথও দেশবাসীর নিকট যেমন ইংরাজের নিকটও তেমনই তাঁহাদের স্পষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে—অবস্থা-বিশেষে কোথাও অন্ধকার রাখিলে চলিবে না।

আমাদের বিশেষ বক্তব্য দেশের তরুণদের প্রতি-এ জাতি যদি সত্যকে আশ্রয় করে, এ জাতির হৃদয় যা ঈশ্বরবিশ্বাসে পরিপূর্ণ হয়, এ জাতির মধ্যে প্রেম ও

[...] বন্ধন যদি সুদৃঢ় হয়, তাহা হইলে স্বাধীনতাস্পৃহার [...]র্থহেতু গতানুগতিক যত পথ আছে—সব ছাড়া [...] এক দিব্য অমোঘ পথ আমরা আবিষ্কার করিতে [...]রব, যে পথ বিদ্বেষের হলাহলে বিষপূর্ণ নহে, যে পথ নবরক্তে কলঙ্কিত হইবে না। সর্ব্বশক্তিময় ঈশ্বর-বিধানে এমন এক অপূর্ব্ব সমন্বয়ের পথ, যেখানে প্রাচ্য ও [পা]শ্চাত্যের মহামিলনেরই সঙ্কেত নিহিত আছে। যদি [আ]মরা সেই পথে চলিতে পারি, শুধু ইংলণ্ডের 'মিশন' [...] হইবে না, ভারতও দিব্য জীবন পাইবে।

[আ]মরা যতই এই অমৃতময় জীবনের, শুধু বাণী নয়, [...] নিদর্শন দেখাইতে পারিব বাঙলার সন্ত্রাসবাদ ততই [...] নিশ্চিহ্ন হইবে। সন্ত্রাসবাদ দেশের গভীর অকল্যাণ সাধনের হেতু, এই বিশ্বাসের সহিত আমাদের আর একটা বিশ্বাসও রাখিতে হইবে যে মুক্তি সঙ্ঘর্ষ-সৃজন ব্যতীত অন্য পথেও আসিতে পারে। সে পথ প্রেমের পথ, সে পথ মিলনের পথ—সে পথে প্রতিবাদের কণ্ঠ নাই—সত্যের ইষণা মধুময় ঋক্ উচ্চারণ করিয়া চলিয়াছে অবাধে অভীষ্ট সিদ্ধির লক্ষ্যে।

আগামী ১৫ই, ১৬ই সেপ্টেম্বরে 'সন্ত্রাসবাদ-নিরসনের' সভায়, জননেতৃগণ তরুণকে এইরূপ একটা অভ্রান্ত দিগ্দর্শনের সুবিধা দিবেন বলিয়াই আমরা আশা করি—একটা positive দিক্ দেখাইতে হইবে।

সন্ত্রাসবাদ দেশ চাহে না—যাহা চাহে, তাহা প্রত্যয়ের সহিত স্থাপন করার দরকার হইয়াছে।

প্রবর্ত্তক পল্লীসংস্কার সমিতি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব লেক্চারার [ঐ]তিহাসিক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের সভা[পতি]ত্বে প্রবর্ত্তক পল্লীসংস্কার সমিতির যে চতুর্থ বার্ষিক [অধি]বেশন 'যোগ ও ব্রহ্মবিদ্যা মন্দির' প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত [হয়, ত]াহাতে পুরাতন কমিটীর অবসান ও নূতন কমিরটী গঠন হয়। উক্ত সমিতির যুক্ত সম্পাদক শ্রদ্ধানন্দস্বামী [...]ক বিগত বৎসরের যে রিপোর্ট পঠিত হয়, তাহা বেশ [...]প্রদ ও সমিতির ক্রমোন্নতির পরিচায়ক। শ্রদ্ধেয় [...]লাল রায় এক সুদীর্ঘ বক্তৃতায় সমিতির অতীত [ইতিহা]স, উহার মর্ম্ম-প্রেরণা ও ভাবী কার্য্যপদ্ধতির নিগূঢ় [...] দেন এবং সমিতির বর্ত্তমান বৎসরে যত টাকা [...] খাতে আদায় হইবে তাহার এক চতুর্থাংশ সঙ্ঘের [...] হইতে দিতে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। সমিতিকর্ত্তৃক পরিচালিত একটি নৈশ-বিদ্যালয়ের ও দুইটি প্রাইমারী স্কুলের সমুদয় ছাত্রকে সাধারণভাবে উৎসাহিত করিবার জন্য পুরস্কৃত করা হয় ও একটি ছাত্রকে রৌপ্যপদক দেওয়া হয়।

মেলান্দহ কেন্দ্রাশ্রম-সংবাদ

সম্পাদক, নির্ম্মলচন্দ্র সেনগুপ্ত জানাইতেছেন যে, সঙ্ঘের পরিচালনায় একটি পুস্তকাগার, একটি বালিকা বিদ্যালয় (ছাত্রীসংখ্যা মোট ৩০, তন্মধ্যে মুসলমান ৮, হিন্দু ১০, অস্পৃশ্য ১২), কৃষক-পল্লীতে একটি মক্তব পাঠশালা (৪৩ জনই মুসলমান ছাত্র), একটি নৈশ-বিদ্যালয় (৩৪ জন ছাত্রের মধ্যে ২০ জন মুসলমান ও ৮ জন অস্পৃশ্য সহ হিন্দু ১৪ জন) ও আশ্রমপ্রাঙ্গণে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

সংশোধনঃ—প্রবর্ত্তক, ভাদ্রঃ অধ্যাপক শ্রীকুমুদনাথ চক্রবর্ত্তী মৈমনসিংহ জেলার লোক বা পি, এইচ্, ডি নহেন এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে মহাশয় আই, সি, এস নহেন (৫৩৫ পৃঃ)। ৫০৪ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের ফুটনোটে '৬৪০' স্থলে '৬৮০' এবং ৫০৫ পৃষ্ঠার চতুর্থ পংক্তিতে 'সুঞ' স্থলে 'সুঞ' হইবে। আশ্বিন সংখ্যার ৫৭২ পৃষ্ঠায় 'সই' স্থলে 'সই' হইবে।

মাস-পঞ্জী

সাময়িকী—

ফরাসী ভারতের নূতন গভর্ণর ও এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর

ফরাসী ভারতের নূতন গভর্ণর মঃ সলোমিয়াক

চন্দননগরের নূতন এডমিনিষ্ট্রেটর মঃ হেক

এই নবনিযুক্ত রাজপুরুষদ্বয়কে আমরা সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি।

পরলোকে অতুলপ্রসাদ

"ভারত-ভানু কোথা লুকালে ?
পুনঃ উদিবে কবে পূরব-ভালে ?"

প্রেমপুলকিত, জাতীয়-সঙ্গীত-রচয়িতা, প্রবীণ কবি অতুলপ্রসাদ সেন আর নাই। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, রাজনৈতিক ও ব্যবহারজীবী। 'উত্তরা' পত্রের সম্পাদন করিয়া তিনি বাণীর [illegible] করিয়াছিলেন। বাঙলার বাহিরে বাঙালীর মান-সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি রক্ষা করিয়া কেবল প্রবাসী বাঙালীর নয়, নিখিল বাঙলার তিনি শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন।

মিস্ মানু ব্যানার্জি

বিগত ৯ই সেপ্টেম্বর কলেজ স্কোয়ারে ন্যূনাধিক মাত্র ছয় ব[illegible] বয়স্কা কুমারী মানু ক্রমাগত ষোল ঘণ্টা সাঁতরাইয়া পূর্ব্ব রেকর্ড [illegible]

কুমারী মানু ব্যানার্জ্জী

করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। সকল ক্ষেত্রেই বাঙলার নারীর এই জাগরণ-চাঞ্চল্য যুগের লক্ষণ।

কৃষি—

ভাদ্র মাসের শেষে যে সকল বীজ বপন করার কথা বলা হইয়াছে তাহা এই মাসের প্রথমেই শেষ করা উচিত। শীতের সব্জী-চা[ষে] সাফল্য লাভ করিতে হইলে, এই মাসেই জমি প্রস্তুত ও চাপোয়ে বী[জ] বসান কার্য্য সমাধা করা কর্ত্তব্য। এই মাসের বপনোপযোগী ফসল :— ফুলকপি, বাঁধাকপি, বীট, গাজর, ওলকপি, পিঁয়াজ, পালম, ফ্রেঞ্চ[বিন] ইত্যাদি।

Published by Krishnadhan Chatterjee M. A.—Prabartak Publishing House, 61, Bowbazar St., Calcutta.
Printed by Krishna Prosad Ghosh, at Prakash Press—61, Bowbazar St. Calcutta.